সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

সূচীপত্র

সপ্তত্রিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, ১৩৫৭

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচী—মাসানুক্রমিক

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী লাল গামছা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

তুলির পোঁচড়

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

পৌষ—১৩৫৬

দ্বিতীয় খণ্ড | সপ্তত্রিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

গীতার সমন্বয়বাদ

শ্রীবাসনা সেন এম-এ, কাব্যতীর্থ

ভারতীয় সমস্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রে মুখ্যতঃ কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান প্রতিপাদিত হইয়াছে। গীতা শাস্ত্র যাহাকে আমরা সমস্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রের সারাৎসার বলিয়া মনে করি, সেই গীতার মধ্যেও কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানবিষয়ক তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার মধ্যে একবার কর্ম্মের প্রাধান্য, একবার ভক্তির প্রাধান্য, আবার জ্ঞানের প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় যে, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ যদি পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন না হইত তবে ভগবান কেন পৃথকভাবে তাহা নির্দ্দেশ করিলেন? সুতরাং গীতা পাঠমাত্রই তো পাঠকের হৃদয়ে অর্জ্জুনের ন্যায় সংশয় উপস্থিত হইবে, তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুন বলিতেছেন—

> জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মনস্তে মতা বুদ্ধিজনার্দ্দন
> তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব
> ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে
> তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥

যদি জ্ঞানযোগই শ্রেষ্ঠ হয় তবে কেন আমাকে এই ঘোর হিংসাত্মক কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছ? কখনও বা কর্ম্মের প্রশংসা, কখনও বা জ্ঞানের প্রশংসা করিতেছ—ইহাতে আমার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। যাহা দ্বারা শ্রেয়োলাভ করা যায় আমাকে তাহাই উপদেশ কর। অর্জ্জুনের এই উক্তির তাৎপর্য্য পাঠকমাত্রেরই হৃদয়ে উদিত হয়। কিন্তু নিবিষ্টভাবে গীতার তত্ত্ব অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে আপাততঃ বিরোধ পরিলক্ষিত হইলেও, চরম সিদ্ধান্তে কোন ভেদ নাই। সমগ্র গীতাশাস্ত্রকে তাই কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় শাস্ত্র বলা যায়।

অদ্বিতীয় বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতী সমগ্র গীতাকে কাণ্ডত্রয়ে বিভক্ত করিয়াছেন। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে

কর্ম্মকাণ্ড, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তিকাণ্ড ও অন্তিম ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানকাণ্ড—এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবদগীতা পরিসমাপ্ত হইয়াছে। গীতার প্রধান প্রতিপাদ্য যেমন পরম তত্ত্ব তেমনি এই পরম তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া কিরূপে মায়ার পারে ও এই সংসারের পারে যাওয়া যায় তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। জীব স্বভাবতঃ অপূর্ণাত্মাভিমানী, সেইজন্য তাহাকে কর্ম্ম করিতে হয়। সেই অভাব মোচনের জন্যই সে কর্ম্ম করে বলিয়া ফলে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হয়। অতএব গীতায় শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই দেখাইতে চেষ্টা করিলেন, এই কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্তি সম্ভব হয়—কি কৌশল অবলম্বন করিলে? যে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ তাহাই যখন মুক্তির কারণ হইবে, তখনই 'কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি' এই তাৎপর্য্য প্রতিপাদিত হইবে। এই কর্ম্মবন্ধন মোচনের প্রথম ও প্রধান উপায় হইল যজ্ঞ। এই যজ্ঞকর্ম্মই গ্রন্থির পর গ্রন্থি উন্মোচন করিতে করিতে মানুষকে যোগ-ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্য দিয়া পরম ও চরম মুক্তির ভূমিতে পৌছাইয়া দেয়। সেইজন্য গীতা বন্ধনের স্বরূপ প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিল 'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ'—এই কর্ম্মবন্ধনরূপ অজ্ঞানের হাত হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়? প্রথমেই তাই অর্জ্জুনের ঐ 'অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ'—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন 'কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্'॥ এই কামই জ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া রাখে। এই কামই আবার ইন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়া গজাইয়া ওঠে এবং মোহজাল বিস্তার করিয়া জীবকে গ্রাস করিয়া ফেলে। ইন্দ্রিয়ের বিষয়স্পর্শ হইতেই সুখ দুঃখানুভব ফোটে, আর সুখ দুঃখের অনুভব হইতেই বিষয়ের ধ্যান আরম্ভ হয়,—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে
সঙ্গাৎসঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

ইহাই মোহজাল বিস্তারের ক্রম এবং বন্ধন সৃষ্টির কৌশল, তখন চিত্ত ভোগের দিকে দৌড়াইবে।

কামাত্মনঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥

এই বন্ধন হইতে উদ্ধারের উপায় কি?—'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্'—কণ্টক দিয়াই যেমন কণ্টকের উদ্ধার করিতে হয় তেমনি এখানেও কর্ম্মদ্বারাই কর্ম্মবন্ধন শিথিল করিতে হইবে। এইরূপে একবার ইন্দ্রিয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে দৈবযজ্ঞ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ জ্ঞানযজ্ঞের ভূমিতে উঠিয়া 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ"—রূপ কর্ম্মের ও যজ্ঞের সর্ব্বাঙ্গে ব্রহ্মদর্শন করিতে করিতে ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিতে চিত্ত মগ্ন হইয়া যাইবে। ইহাই হইল কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মনিবৃত্তি। যাহা হইতে যে রোগের উৎপত্তি তাহাই তাহার ভেষজ ঔষধ—তবে তাহার সহিত কিছু মিশ্রণ প্রয়োজন। এখানে তাই কর্ম্মের সহিত বুদ্ধির যোগ প্রয়োজন। এই বুদ্ধি কোন বুদ্ধি? ইহাই অশক্তবুদ্ধি। সংসারের প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে একটা রহস্যময় প্রকোষ্ঠ আছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করাই বুদ্ধির কাজ, ইহাই মানবজীবনের সাধনা। আর যিনি এই রহস্যালোকে বসিয়া আছেন তিনিই পরমদেবতা। কিন্তু ইহার আবিষ্কারের চেষ্টা কোথায় করিতে হইবে? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, প্রথম কর্ম্মের মধ্যে এই রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা করাই সাধনার প্রশস্ত পথ।

'কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যম্ গহনা কর্ম্মণো গতিঃ'॥

ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা গীতা প্রথমেই কর্ম্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন, কেননা এই কর্ম্মের মধ্য দিয়াই ভগবান নিজের আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার এই জগৎ চক্রটাই কর্ম্মচক্র। তারপর এই কর্ম্মই পরম উৎকর্ষলাভ করিলে জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়—'সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে'। কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, ব্রহ্মেই সমাপ্ত। সুতরাং কর্ম্মে ও জ্ঞানে সাময়িক ভেদমাত্র, মূলতঃ কোন ভেদ নাই। এই মূলসূত্র ছিন্ন হইলেই জীবের কর্ম্মবন্ধন উপস্থিত হয়।

কর্ম্মতত্ত্ব বর্ণনাপ্রসঙ্গে গীতা প্রথমেই কর্ম্মকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।—কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম। কর্ম্ম ও বিকর্ম্ম উভয়ই ভোগফলপ্রদ। যেহেতু তাহাদের প্রেরণা আসে নিম্ন প্রকৃতি হইতে। প্রকৃতিই কর্ম্মের প্রেরকও বটে নিষ্পাদকও বটে—কেননা প্রকৃতির দুইভাগ—এক জ্ঞান, অপর ক্রিয়া—'প্রকৃতে 'ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ'

তারপর এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সাধনার সময় কর্ম্মভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া কিরূপে সাধনার স্তরে বা ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। এই যে সাধনের তিন স্তর—কর্ম্মস্তর, ভক্তিস্তর ও জ্ঞানস্তর, এই তিন স্তরের প্রত্যেক স্তরেই আবার ক্রমবিভাগ আছে। কর্ম্ম প্রথমে থাকে সকাম; এই সকাম আবার শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ভেদে দুই প্রকার। তারপর আসে কর্ত্তব্য-বোধে কর্ম্ম, ইহাই ধর্ম্ম স্তর। এই কর্ম্মই প্রীতি বা প্রেম চালিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়। ইহাই শেষে ভক্তিতে পরিণত হয়। ভক্তিতেও নিজের তুষ্টিই প্রথমে থাকে প্রধান লক্ষ্য, পরে হয় ইষ্টের তুষ্টি, অবশেষে জ্ঞানস্তরে উপনীত হইলে উপাস্য উপাসক, সেবা সেবক এক হইয়া যায়। শ্রুতি তাই বলিতেছেন—

'যত্র দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, যত্র
সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং
বিজানীয়াৎ।'

ইহাই জীবের স্বস্বরূপে স্থিতি—সমস্ত আধ্যাত্মিকতার পরিসমাপ্তি।

এইবার সংক্ষেপে গীতার ভক্তির স্তর বা সাধনার ক্রমটা আলোচনা করা আবশ্যক। গীতা অধ্যাত্মশাস্ত্র হইলেও বিশেষ করিয়া সাধন শাস্ত্র। সেইজন্য সাধন লইয়াই এখানে অধিক আলোচনা করা হইয়াছে। কিরূপে পরমতত্ত্ব জীবনে ফুটাইয়া তোলা যায় তাহাই গীতা বিশেষভাবে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রুতি অনুযায়ী "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে।" সেই মূল পরমার্থ সত্য সাক্ষাৎকার করিলে সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত কর্ম্মক্ষয় হয় তাহাই গীতায় মুখ্যভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। ভক্তিমার্গের চরম উৎকর্ষ প্রদানকালে ভগবান বলিয়াছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

ভক্তের প্রতি ভগবানের ইহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কথা কি হইতে পারে? ভক্তিদ্বারা পরমপুরুষকে লাভ করা—ইহা গীতার অষ্টম, নবম অধ্যায়ে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

'মর্য্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ' ভক্ত ভগবানে অর্পিতবুদ্ধি হইলে সেই পরমপদ নিঃসংশয়ে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভক্তের পাছে সন্দেহ হয় যে পুনর্জ্জন্মের হাত হইতে কি নিষ্কৃতি লাভ হইবে? তখনই ভগবান বলিতেছেন, 'মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।—ভগবদুপাসনায় চিত্ত শুদ্ধ হইলে, নিশ্চলবুদ্ধি হইলে মৃত্যুকালেও সেই ঈশ্বরচিন্তাই উপস্থিত হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—মৃত্যুকালে যে আমাকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে সে আমাকেই প্রাপ্ত হয়।—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্
যঃ প্রযাতি সঃ মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

মৃত্যুকালে এই ভগবদভক্তি কখনই সম্ভব নয় যদি উপাসক জীবনের সর্ব্বমুহুর্ত্তে উপাস্যের ধ্যান না করে। শাণ্ডিল্য ঋষি এই ভক্তি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 'সা পরাণুরক্তি-রীশ্বরে'। ঈশ্বরে যে পরম অনুরাগ তাহাই পরাভক্তি। বিষ্ণুপুরাণে ভক্তরাজ প্রহ্লাদ একস্থলে বলিয়াছেন—

'যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন—'বিষয়ীর বিষয়ে যেরূপ টান থাকে ভক্তের ভগবানের উপর সেইরূপ টান হওয়া চাই। বৈষ্ণবগণ এই ভক্তির পাঁচ প্রকার ভাগ করিয়াছেন—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ভক্ত ভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপাসনা করে। ভগবানকে পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইতে হইলে কি ভাবে তাহাকে ভজন করিতে হইবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহা গীতায় নির্দ্দেশ করিতেছেন—

'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাংনমস্কুরু
মামেবৈষ্যাসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।

এইরূপ ভগবদ্ভক্ত পথে সাধক ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে যখন ভগবানের বিভূতি জানিবার অধিকার জন্মে তখনই তাহার সেই দিব্যদৃষ্টি খোলে, যাহার ফলে সে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে সমর্থ হয়। ভগবানকে এইরূপে জানা দেখার একমাত্র উপায় অনন্যাভক্তি। এই অনন্যাভক্তি লাভ করিতে হইলে যে 'মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ। নির্বৈর সর্ব্বভূতেষু' হইতে হইবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহারই উপদেশ গীতার একাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন।

কিন্তু ভক্তিমার্গে এই অবস্থা কি সহজে লাভ করা যায়? এই কঠিন পথে অগ্রসর হওয়ার উপায় কি তাহাই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন 'অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্। অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥ অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব। মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বণ্‌ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌॥

ভগবদভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রথমে অভ্যাসের দ্বারা চেষ্টা করিতে হইবে, অভ্যাসেও অসমর্থ হইলে ভগবান বলিতেছেন—

'মৎকর্ম্ম পরমো ভব'—ভগবদপ্রীতি সাধনার্থ কার্য্যানুষ্ঠান করিলেও সিদ্ধি হইবে। তাহাতেও যদি ভক্ত অসমর্থ হয় তবে ভগবান চরম উপদেশ দিতেছেন 'সর্ব্ব-কর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান' ভগবানের শরণাপন্ন ও সংযতাত্মা হইয়া সর্ব্ব কর্ম্মের ফল ত্যাগ করিতে হইবে। এই ভক্তিমার্গে সাধনের দ্বারা ভক্তের কি অবস্থা হয়? ভক্ত তখন কি স্বরূপে অবস্থান করে?

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়োনরঃ॥
সম শত্রৌচমিত্রে চ তথামানাপমানয়ো।
শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥

এইরূপে ভক্তিমার্গে সাধনক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং এই পথেই ভক্ত ভগবানকে জানিতে সক্ষম হয়। ভগবানে ভক্তির ফলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। ভক্তি সাধনায় নিষ্ণাত ভক্তের এইরূপ লক্ষণ—

মচ্চিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্ত পরস্পরম্‌।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

এই শ্লোকে ভক্তের স্বরূপ অতি পরিস্ফুট হইয়াছে। ভক্ত তখন আর অন্য কথা বলে না, ভগবদ্‌ব্যতিরিক্ত অন্য বিষয়ে আনন্দ পায় না। ইহাই ভক্তিসাধনার চরম অবস্থা। ভক্তের কাছে তখন অন্য কিছু লাভ করা আর শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয় না—

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
যস্মিন্‌ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

তারপর জ্ঞান,সন্ন্যাস ও ত্যাগতত্ত্ব বুঝাইবার ছলে গীতা সমস্ত সাধন তত্ত্বটি অষ্টাদশ অধ্যায়ে অতি অপূর্ব্বভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। হিন্দু সাধনার চরম সাধনা হইল সন্ন্যাস। এই জন্য এই শেষ অধ্যায়ে অর্থাৎ গীতার পরিসমাপ্তিতে এই সন্ন্যাস ও ত্যাগকে উপলক্ষ করিয়া গীতার সমস্ত সাধনা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। কর্ম্মে জীবনের আরম্ভ, ভক্তি উপাসনায় জীবনের স্থিতি, আর সন্ন্যাসে বা জ্ঞানে জীবনের শেষ। মানুষ সন্ন্যাসকে সাধারণ ত্যাগ অর্থে গ্রহণ করিয়াই ভ্রমে পতিত হয়। এ ত্যাগ দ্রব্য-বিত্তাদি বাহ্য পদার্থ হইতে দূরে থাকা নয়। ইহা অসক্ততা, নির্লিপ্ততা, সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত অবস্থা। এই ত্যাগতত্ত্ব অতি দুর্বিজ্ঞেয়, কারণ জ্ঞানীর পক্ষেই ইহার যথাযথ অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব। হিন্দু সাধনার মূল কথাই হইল ত্যাগ। এই ত্যাগ যেমন যজ্ঞদানতপরূপ ক্রিয়াযোগেও প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি চরম জ্ঞানেও সর্ব্ব উপাধি ত্যাগরূপ মহাত্যাগ বা সন্ন্যাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শক্তির রাজ্যে, সাধনের রাজ্যে, ক্রমোৎ-কর্ষের রাজ্যে মানুষ নীচের ভূমি ত্যাগ করিয়া, অপকর্ষের ভূমি ত্যাগ করিয়া, উৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া চলে এবং এই ত্যাগই ক্রমশঃ সাধককে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ ভূমিতে পৌছাইয়া দেয়। জ্ঞানযোগের যথার্থ অধিকারী না হইলে কখনও তাহাকে সন্ন্যাস বা কর্ম্ম ত্যাগের উপদেশ দেওয়া সঙ্গত নহে। অধিকারীর অধিকারানুসারেই তাহাকে ব্যুৎপাদন করা উচিত।

'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানং কর্ম্মসঙ্গিনম্‌'

সুতরাং সাধারণের পক্ষে সহজ কর্ম্মের ত্রুটি দেখিয়া এবং জ্ঞানের উৎকৃষ্টতার কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি কর্ম্ম ছাড়িয়া জ্ঞানের জন্য হাত বাড়াইলে সমূহ ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছুই হইবে না। সেই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—

ন কর্ম্মনামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥

তবে প্রশ্ন এই যে জ্ঞানীর কর্ম্ম ত্যাগ কিরূপে সম্ভব? ইহার মীমাংসা আত্মার অবিক্রিয়ত্বে। আত্মা কর্ম্মের দ্বারা হ্রাস প্রাপ্ত হন না বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না—তিনি পরিপূর্ণ। এই আত্ম-স্বরূপ লাভই পরম জ্ঞানের অবস্থা। তখন 'সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে, জ্ঞানাগ্নি দগ্ধকর্ম্মানি ভষ্মসাৎ কুরুতে তথা। এই কর্ম্মসন্ন্যাস বা অপরিণামিতাই

গীতার প্রধান প্রতিপাদ্য। কেননা গীতা মুখ্যতঃ মোক্ষশাস্ত্র। এই মোক্ষও যাহা, স্বরূপে স্থিতিও তাহাই, সন্ন্যাসও তাহাই।

জ্ঞানীর লক্ষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—'বাসুদেব সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ। শ্রুতিও এই কথাই বলিতেছেন 'একোহিদেবঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা'—সর্ব্বভূতে সেই এক আত্মার অবস্থিতিরূপ বুদ্ধি হওয়াই জ্ঞানযোগের চরম সিদ্ধান্ত। সমস্ত সাধনার মূল লক্ষ্য হইল এই ভেদে অভেদে দর্শন। বহুর মধ্য হইতে এককে খুঁজিয়া বাহির করা। তাই কি বেদে, কি গীতায়, কি দর্শনশাস্ত্রে এই দ্বৈত দর্শনকে এক তত্ত্বে লইয়া যাওয়ার পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অতএব সমগ্র গীতা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে কর্ম্মমুক্ত না হইয়া ঠিক ঠিক ভক্তির সন্ধান মিলে না, সেই জন্য সন্ন্যাসও সম্ভব হয় না। এই কর্ম্ম ও ভক্তি মিলিত হইয়া সাধককে উন্নতির পথে লইয়া চলে—তত্ত্বজ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। জননীর মত হিতকারিণী গীতা কল্যাণকামী জীবের কি পাইতে হইবে, কি করিতে হইবে, কি হইতে হইবে—ইহা বিশদভাবে দেখাইয়া তাহাকে সীমার পারে লইয়া অসীমের সঙ্গে যুক্ত করিয়া তাহার মুক্তি সাধনের প্রয়াস পাইয়াছেন। জীবকে যজ্ঞদান তপকর্ম্ম দ্বারা বুদ্ধির শুদ্ধি সম্পাদন করিতে হইবে—'যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম॥ আর তাহাকে হইতে হইবে স্থিতপ্রজ্ঞ ও ভক্ত। প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্, আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।' 'ভক্ত্যা ত্বনন্যায়া শক্যঃ অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥' তারপর জীবকে পাইতে হইবে সেই 'ব্রহ্মপরমম্' বা পুরুষোত্তমকে। অতএব 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচ॥ ইহাই জ্ঞানযোগের শেষ কথা। মধুসূদন সরস্বতী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন 'স চ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারহেতু পরমপ্রেমা ত্রিধা তস্যৈবাহং মমৈবাসৌ সএবাহমিতি ত্রিধা। ভগবচ্ছরণ ত্বং স্যাৎসাধনাভ্যসপাকতঃ। ভগবদভক্তির তিনটি রূপ এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে—আমি তোমার, তুমি আমার এবং তুমি ও আমি অভিন্ন, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে এই সম্বন্ধ। (সিদ্ধান্ত বিন্দু ৮ম শ্লোক ৫৭৯ পৃঃ) ইহাই জীবের চরম কৃতার্থতা, তাহার চরম পরিণতি। এইরূপে সসীম জীব অসীম আত্মভাবে ফুটিয়া উঠিবার জন্যই জন্মের পর জন্মে অগ্রসর হইয়া চলে এবং শেষ জন্মে—'বাসুদেব সর্ব্বম্'—এই ভাব লাভ করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের উপরে উঠিয়া কৃতকৃত্য হয়।

সুতরাং সমগ্র গীতাশাস্ত্রে অধিকারীভেদ অনুসারে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছে। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি পূর্ব্বক ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরোপাসনায় প্রতিষ্ঠিত হইলে জীব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। তখনই জীবব্রহ্মের ঐক্য সাধিত হয় এবং শ্রুতিতে উক্ত একমেবাদ্বিতীয়ম্ নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' 'তত্ত্বমসি' অহং ব্রহ্মাস্মি এই সমস্ত মহাকাব্য সকলের বস্তুতঃ উপলব্ধি হইয়া থাকে। তখন উপাস্য, উপাসক সৃষ্ট স্রষ্টা, জ্ঞেয় জ্ঞাতার মধ্যে ভেদই আর থাকে না। সমস্ত ভেদই সেই সচ্চিদানন্দে বিলীন হইয়া যায়।
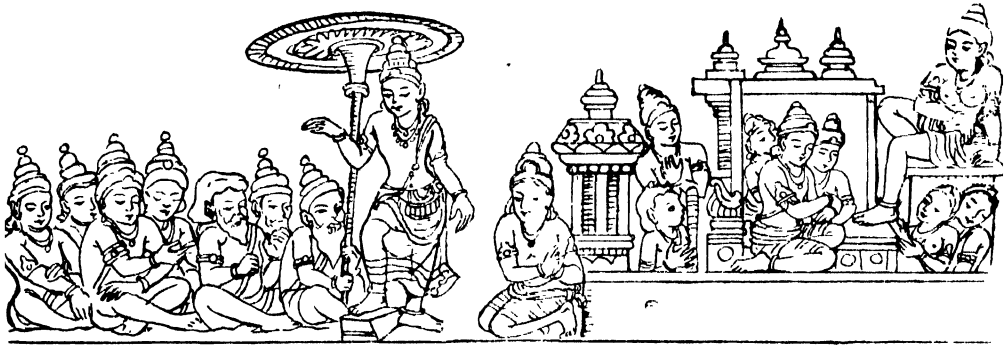
ভরত বড়, না ভারত

মল্লিকারঞ্জন রায়

পায়ে-চলা-পথটা বেরিয়ে গেছে কলোনীর শেষ সীমান্ত হতে। সে পথ ধরে কিছুটা এগিয়ে চলুন। পথ অসমতল ···বিস্তৃত রুক্ষ ধুলাকীর্ণ মাঠের মাঝে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তার অস্তিত্ব মাঝে মাঝে। হয় তো খানিকটা এগিয়ে গেছেন। মাইলখানেক। চোখের সামনে ভেসে উঠবে একটুখানি সবুজ রেখা—দূরে। এগিয়ে চলুন সেদিকে। কাছে গিয়ে দেখবেন প্রকাণ্ড একটা নিম গাছ, বহু পুরাণ। কতদিনের সে কথা কেউ বলে দিতে পারবে না। গাছের ঠিক নিচে গিয়ে আপনি আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে যাবেন—বেশ খানিকটা জায়গায় ঘাসের গালিচা বিছানো ···যেন শ্যামল বাংলার একটুকরো। হয়তো মনটা আপনার উদাসী হয়ে উঠবে বাংলার কথা ভেবে। হয়তো মনে পড়ে যাবে আপনার প্রিয়জনের কথা—সুদূর বাংলায় আছেন যিনি···

ঘাসের উপর বসে পড়বেন আপনি। আশে পাশে সাড়া নেই জনমানবের, নেই কোনো বসতি···। নির্জন, নিস্তব্ধ। শুধু বাতাসের করুণ ক্রন্দন গাছের পাতায় পাতায়। হঠাৎ চোখে পড়বে আপনার···এক পাশে একটা স্মৃতি ফলক। কার সমাধি। কালের কষাঘাতে জীর্ণ শীর্ণ অস্তিত্বটুকু শুধু বজায় আছে কোনোমতে। কার এ সমাধি? কেউ বলতে পারে না; বলতে যারা পারতো শত শত বছর আগে, তারা বিদায় নিয়েছে। নেই কোনো সরকারী নির্দ্দেশিকা। সমাধি শিখরে তবু মাঝে মাঝে আজও জ্বলে ক্ষীণ প্রদীপ, তার চিহ্ন চোখে পড়বে আপনার···

অজ্ঞাত, আকর্ষণহীন এ নগণ্য সমাধির পাশে বসে থাকতে ভালো লাগবে আপনার। মনে হবে যেন এর সঙ্গে কোন্ অদৃশ্য আত্মীয়তা আপনার··। বসে বসে ভাববেন আপনার প্রিয়জনের কথা। যাকে আপনি ভালোবাসেন, যে আপনাকে ভালোবাসে···। কিন্তু মিলন হলো না আজও দুজনের—অদৃশ্য কোন্ দুর্ব্বাসার অভিশাপে।

রাতের আঁধার নেমে আসবে···ফেরার পথে পা বাড়াবেন আপনি···

পরদিন বিকেলেও বেড়াতে বেড়াতে সেখানে গিয়ে হাজির হবেন আপনি নিজের অজ্ঞাতে···। দিনের পর দিন কোন্ অবোধ্য আকর্ষণ আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে সেখানে···। হয়তো নেই কিছু···এই না থাকাটাই আপনার বড় আকর্ষণ।···

*　　*　　*

সেদিন হয়তো গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে ক্ষীণ একটু চাঁদের আলো এসে পড়বে সমাধির উপর। হয়তো শুয়ে থাকবেন আপনি ঘাসের উপর। চমকে উঠে বসে পড়বেন···। একটি মেয়ে···! ক্ষীণ মৃতপ্রদীপ হাতে নেমে এলো যেন কোন অদৃশ্য লোক থেকে। প্রদীপখানি তুলে ধরে চেয়ে থাকবে মেয়েটি একান্ত করে ওই সমাধির পানে ···তৃষাতুর চোখে দেখবে যেন কি···তারপর এক সময় সন্তর্পণে প্রদীপখানি রেখে দেবে সমাধি শিখরে···উদাস নেত্রে চেয়ে থাকবে দূর আকাশের কোন নক্ষত্রের পানে···

কে? কে এই মেয়েটি···বিস্ময় আপনার বেড়ে যাবে ···ওর পোষাক দেখে···রাজপুত রমণীর ছবি যদি দেখে থাকেন তবে আপনার মনে হবে সে পোষাকের সঙ্গে যেন এর সাদৃশ্য আছে কিছুটা···

এক সময়ে মেয়েটি আপনার পাশে এসে বসবে। এই আশ্চর্য্যজনক পরিস্থিতিতে আপনি বাক্যহারা হয়ে যাবেন··· কথা বলাত পারবেন না প্রথমে।

মেয়েটি আপনাকে জিজ্ঞেসা করবে, আপনি রোজ আসেন এখানে? কেন?

আত্মস্থ হতে খানিক সময় লাগবে আপনার···। তারপর তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আপনি তার পরিচয় জানতে চাইবেন। মেয়েটি বলবে—"আমার পরিচয় জানলো না কেউ আজো। আপনিও নাই বা শুনলেন। তার চেয়ে একটা গল্প শুনুন—যদি আপত্তি না থাকে।"

আগ্রহে শুনে যাবেন আপনি···

পৃথ্বিরাজের সঙ্গে বিবাদ ছিল জয়চন্দ্রের···। তাঁকে জব্দ করতে জয়চন্দ্র ডেকে আনেন মহম্মদ ঘোরীকে। ঘোরীর সাথে পৃথ্বিরাজের যুদ্ধ হয় দুবার···। প্রথমবার ঘোরী পরাজিত হন। সে খবর ইতিহাসের পাতায় আপনি পড়েছেন। পৃথ্বিরাজের জয়লাভে যে সাহায্য করেছিল সবচেয়ে বেশী, তার নাম নেই ইতিহাসের পাতায়। এমন অনেক থাকে না···

প্রথম যুদ্ধ···দু পক্ষে প্রবল তোড় জোড়···সৈন্যদের ছাউনি পড়েছে···দলে দলে সৈন্য এসে জড় হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধ সুরু হচ্ছে না···। এক পক্ষ অন্য পক্ষের সৈন্যবলের প্রকৃত খবর জানে না···। কোনদিক থেকে কি ভাবে আক্রমণ করলে সুবিধা হবে তারি মন্ত্রণা চলছে দু'শিবিরে। নগরে থমথমে ভাব···সবাই কামনা করছে তাদের রাজার জয় হউক···পৃথ্বিরাজের জয়···

এমনি দিনে নগরে ফিরে এলো ভরতসিংহ···তার ঘোড়া এসে থামলো এক কুটীরে···ঠক্···ঠক্···দরজা খুলে বিস্ময়ে দাঁড়াল জয়ন্তী···চোখে আনন্দের রেখা···

ভরতসিংহ আর জয়ন্তীর শৈশব আর কৈশোর কেটেছে এক সঙ্গে খেলা করে··কত মধুর ছিল সে দিনগুলো। তারপর এলো যৌবন···পিতার খেয়াল হল মেয়েকে পাত্রস্থ করতে হবে। চলল পাত্রের সন্ধান···মেয়ের মুখে নেমে এলো আষাঢ়ের কালো মেঘ। মেয়ের মনে কোথায় বাধা মা জানতেন···স্বামীকে জানালেন তিনি সে কথা···

কিন্তু ভরতসিংহ দরিদ্র পিতৃমাতৃহীন···তার হাতে মেয়ে তুলে দেওয়া···তা হয় না। জয়ন্তীর পিতা ভরতকে ডেকে বললেন একদিন···খেলা করে করে অনেকদিন কাটলো। বয়স বেড়েছে এবার রোজগারের পথ দেখো···

ভরত বুঝল সব···একদিন বেরিয়ে পড়ল অজানা পথে অর্থের সন্ধানে···। জয়ন্তী জানাল···সে অপেক্ষা করে থাকবে···।

তারপর কেটে গেছে মাস ছয়···। ছয় মাস বাদে নিজ নগরে ফিরে এলো ভরত···।

ভিতরে নিয়ে গেলো তাকে জয়ন্তী···। পিতা তার যুদ্ধক্ষেত্রে অদূর সৈন্য শিবিকায়···। মাতা মারা গেছেন··· মাস দুই···। নির্জন গৃহ···

প্রথম মিলনের বিস্ময় কেটে গেলে ভরত কথা বলতে সুরু করল—"জানো জয়ন্তী, আর আমি দরিদ্র নই···অনেক ঘুরে ঘুরে কাজ পেয়েছি মহম্মদ ঘোরীর অধীনে—ছোট বলাধ্যক্ষের পদ···"

ঘৃণায় জয়ন্তীর নাসা কুঞ্চিত হল···। সে বলল···"কি করেছ···যবনের অধীনে ভৃত্য তুমি···আমাদের শত্রু সে···।"

"তুমি জানো না জয়ন্তী···এ যুদ্ধ জয়লাভ করলে আমি হব এ রাজ্যের রাজা তুমি রাণী···। ঘোরীর সাথে আমার চুক্তি হয়েছে···। তাই তো যোদ্ধার বেশ ছেড়ে নাগরিকের বেশে এসেছি পৃথ্বিরাজের সৈন্যের অবস্থানের খবর নিতে···"

"ভুল, ভুল···যবনের ছলনায় তুমি দেশের সর্ব্বনাশ ডেকে আনছ···ঘোরী নিজে হবে রাজা···যুদ্ধ জয় করে সে তোমাকেও করবে পদানত···ভরত এ দুর্বুদ্ধি তুমি ত্যাগ কর···'

"না তা হয় না, বড় আমাকে হতে হবেই। অনেক খবর আমি সংগ্রহ করেছি···এবার ফিরে যেতে পারলেই···

কিছুতেই তাকে ক্ষান্ত করতে পারল না জয়ন্তী···। বেদনায় তার মুখ মলিন হয়ে এলো···এই কি সেই ভরত, যাকে সে ভালোবাসত···? যার পথ চেয়ে বসে আছে সে? হঠাৎ তার ভ্রূ কুটীল হয়ে উঠলো···তারপর···

আদর আর সোহাগে ভুলিয়ে শত্রুপক্ষের অনেক খবর জেনে নিল জয়ন্তী···। তারপর ভরতকে বলল-"তুমি একটু বসো প্রিয়···আমি তোমার খাবার নিয়ে আসি। জয়ন্তী সে ঘর থেকে বের হয়ে অন্য ঘরে গেল···

ভরত বসে আছে, কিন্তু জয়ন্তীর আর দেখা নেই···। ভরত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে···রাত অনেক হয়ে গেছে···এর পর ফিরে যাওয়া কঠিন হয়ে উঠবে···। বাইরে এলো সে···কিন্তু তার ঘোড়া···? জয়ন্তী? তাড়াতাড়ি পায়ে হেঁটে আঁধারে আত্মগোপন করল সে···

জয়ন্তী? জয়ন্তী কোথায়? জয়ন্তী তার পিতার সাথে পৃথ্বিরাজের শিবিরে···ভরতের কাছ থেকে যত খবর সংগ্রহ করেছিল সব জানাল পৃথ্বিরাজকে···।

পৃথ্বিরাজ নিজ গলার মুক্তার মালা খুলে দিলেন

জয়ন্তীকে···। তার সৈন্তেরা চলল শক্র পক্ষকে আক্রমণ করতে···একদল চললো···ভরতকে আটকাতে···।

জয়ন্তী চলে এলো···তার চোখে জল···মুক্তার মালা লুটিয়ে পড়ল পথের ধূলায়···।

যুদ্ধের খবর ইতিহাসের পাতায় আছে···। পৃথ্বিরাজের আদেশ ছিল যে ভাবেই হোক ভরতকে জ্যান্ত ধরে আনতে হবে। কিন্তু এলো মৃত, রক্তাক্ত দেহ···। জয়ন্তীকে ডেকে পাঠালেন পৃথ্বিরাজ···। বললেন—"বহিন, তোমার জন্তই আমি জয়লাভ করেছি। যে দেশদ্রোহী আমার সর্ব্বনাশ করতে চেয়েছিল সে মৃত, তার সমুচিত শাস্তি সে লাভ করেছে। এবার বল তোমাকে কি পুরস্কার দেব।"

জয়ন্তী! সে কি বিচলিত হয়েছিল? তার অন্তর কি কেঁদেছিল? বাইরে সে অবিচলিত। অন্তরের খবর কে জানে···

জয়ন্তী বলল—"কিছু পুরস্কারের যোগ্যতা নেই আমার ···শুধু প্রার্থনা মহারাজ, দয়া করে ভরতসিংহের মৃতদেহ আমাকে আমার অভিষ্ট স্থানে নিয়ে যেতে দিন···"

পৃথ্বিরাজ বিস্মিত···কি এ বলে নির্ব্বোধ বালিকা···।

জয়ন্তীর পিতা বললেন—মহারাজ ওর প্রার্থনা অপূর্ণ রাখবেন না···

পৃথ্বিরাজ বললেন—"আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে। ভরতসিংহ জয়ন্তীর কে?"

"সে খবর নাই শুনলেন মহারাজ···"

"বেশ তাই হোক···"

পরদিন নিশীথে রচিত হল ভরতসিংহের সমাধি···। এই তুচ্ছ স্মৃতি ফলক···। রোপিত হল এই নিম গাছ···

মেয়েটি থামলে এবার···

আপনি জানতে চাইবেন···"জয়ন্তী কি প্রতিরাতে প্রদীপ দিতে আসতো এই সমাধি স্থানে···"

মেয়েটি জবাব দেবে না···।

আপনি আবার জিজ্ঞাসা করবেন···কিন্তু···আপনি কে তা তো বললেন না? আপনিই কি···

* * * *

হঠাৎ চক্ষু মেলে চেয়ে দেখবেন রাত অনেক হয়েছে··· ক্ষীণ চাঁদ বহুক্ষণ অস্ত গেছে···নিম গাছের নীচে সবুজ ঘাসের উপর আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন···

ভারতের সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস

শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার

ইউরোপীয় দেশগুলির সমবায় আন্দোলনের গোড়া আলোচনা করে দেখা যায় যে, সেখানে সমবায় দুঃস্থদুর্দ্দশা মোচনের উপায়স্বরূপ স্বাভাবিকভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রসারলাভ করেছিল। ভারতবর্ষে ঠিক উল্টোভাবে সমবায়ের প্রবর্ত্তন করেন গভর্ণমেণ্ট। এখানকার সমবায় আন্দোলনের ইতিবৃত্ত আলোচনার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের তদানীন্তন অর্থনৈতিক কাঠামোর একটু আলোচনা করা দরকার।

ইংলণ্ডের **Industrial Revolution** মজুর শ্রেণীর মধ্যে এক নবচেতনা আনয়ন করেছিল। কিন্তু একক ব্যক্তি-স্বাধীনতার আস্বাদন গ্রহণের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করায় মিলিত প্রচেষ্টার উৎস ও প্রেরণা তাদের মধ্যে এসেছিল। সমবায় তারই এক পরিণতি বলা যেতে পারে। ভারতবর্ষে অনুরূপ **Revolution** না হলেও পুরাতন ও মধ্যযুগীয় অর্থনীতির আমুল পরিবর্ত্তন সাধিত করল বিদেশী শাসন ও আনুসঙ্গিক বিদেশী ব্যবসার প্রবর্ত্তন। সস্তা পণ্যের আমদানী কুটীর শিল্পকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিল। ফলে কৃষির উপর নির্ভরশীলতার চাপ গেল বেড়ে। জমির আয়তন ক্রমান্বয়ে কমে যেতে যেতে এমন অবস্থায় এসে পৌছাল, যেখানে কৃষি লোকসানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। এছাড়া কৃষিজীবীর ঋণ গ্রহণের অভিশাপ ও ঋণভারগ্রস্ততা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে বিপর্য্যস্ত করে ফেলেছিল। মহাজনের অতি মাত্রায় সুদের হারের ফলে খাতক কৃষিজীবীর পুজি যেমন একদিকে ক্ষয় হতে লাগলো, অন্যদিকে তেমনি তার যৎসামান্য জমিজমাও মহাজনের কবলে পড়তে লাগল। এইখানে উল্লেখযোগ্য এই যে দেশে চুক্তি-আইনের বিশেষ কোন ব্যবস্থা না থাকায় মহাজন ও খাতকের মধ্যে যে কোন চুক্তিই আইনের চোখে গ্রহণীয় ছিল। ফলে মহাজনের তৃষিত দৃষ্টি ঋণদাদনের মূলে খাতকের জমির উপরই নিবদ্ধ থাকত এবং ঋণের পরিমাণ চক্রাহারে বাড়তে বাড়তে খাতকের ক্ষমতার বাহিরে যতদিন না গিয়ে পড়ত ততদিন আদায়ের চাড়ও সচরাচর মহাজনদের মধ্যে লক্ষিত হত না। মহাজনের উৎসাহ দেখা দিত খাতককে জমি থেকে বিচ্যুত করার সময়। এর উপর বাংলা দেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মহাজনদের এদিকে উৎসাহিত করেছিল। ফলে পূর্ব্বেকার গ্রাম্য অর্থনীতির কাঠামো চুরমার হয়ে গেল। যেখানে শতকরা ৭৫জন কৃষির উপর নির্ভরশীল সেখানে এই অবস্থার সৃষ্টি একটি চরম সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। তার উপর মাঝে মাঝে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি

এই গুরুতর অবস্থাকে আরও গুরুতর করে তুললো। অশিক্ষার দরুণ মিলে মিশে কাজ করার প্রেরণা তাদের মধ্যে জাগল না। দেশের সমাজ ব্যবস্থায় ও অর্থনৈতিক জীবনে চরম দুঃখ দুর্দ্দশার দিন ঘনিয়ে এল। তার জন্য স্থানে স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে বোম্বাই প্রদেশের পুণা ও আহম্মদনগর জেলায় খাতকেরা মহাজনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। মহাজনদের আক্রমণ করে কর্জ্জের নথি ও কাগজপত্র সব পুড়িয়ে দিল। এই বিদ্রোহ দমন করতে সামরিক বাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছিল।

বিদেশী গভর্ণমেণ্ট দেখলেন যে কিছু করার দরকার। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ কমিশন (Deccan Riots Commission) এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলেন যে, এক তৃতীয়াংশ কৃষকের দেনার পরিমাণ তার জমির পরিমাণ হতে ১৮গুণ—যা হতে ঋণগ্রস্ততার ভার বুঝতে পারা যায়। ১৮৮০ খৃঃ অব্দের দুর্ভিক্ষ কমিশন (Famine Commission of 1880) ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ ঘুরে এসে দেখছিলেন যে, কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ ঋণভারে জর্জ্জর এবং অন্য এক তৃতীয়াংশ ঋণগ্রস্ত হলেও চেষ্টা করলে ঋণমুক্ত হতে পারে।

দুইটি কমিশনের Reportএর উপর ভিত্তি করে গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি আইন পাশ করলেন, কৃষিজীবীর ঋণগ্রস্ততার ভার কমাবেন বলে—দাক্ষিণাত্য কৃষিজীবী বিষয়ক বিল (১৮৮৩), জমির উন্নতির জন্য ঋণদান বিষয়ক আইন (১৮৮৩), কৃষিজীবীদের ঋণলাঘব আইন (১৮৮৮)। আংশিকভাবে কিছু কিছু সুবিধা হলেও কোন আইনই কৃষককে সম্পূর্ণরূপে বাঁচাতে পারলে না। ১৮৯২ সালে Madras Government স্যার Federic Nichlorsonকে ইউরোপে পাঠালেন সেখানকার সমবায় সমিতিগুলির অনুকরণে সমবায় সমিতির প্রবর্ত্তন এদেশে করা যায় কিনা তা পর্য্যবেক্ষণ করতে।

তিনি ইউরোপের কৃষি ও অন্যান্য ভূমি ব্যাঙ্কসমূহের কার্য্যকারিতা ও কার্য্যক্রম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করে এসে প্রথম মত প্রকাশ করলেন যে, সমবায় পদ্ধতির প্রবর্ত্তনে কৃষিজীবীর ঋণগ্রস্ততার ভারও যেমন একদিকে কমবে, অন্যদিকে তেমনি তাদের ঋণদানের ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে। ১৮৯৫-৯৭ সালে তিনি যে report পেশ করেছিলেন তাতে তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গে ভারতবর্ষে সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপনের কথা বলেছিলেন। ইউরোপের ভূমিব্যাঙ্কের প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তার মতে এমন কোন পরিকল্পনা কার্য্যকরী হবে না যাতে ঋণদাতার, ঋণগ্রহিতার অবস্থার সঙ্গে সম্যক পরিচয়ের ব্যবস্থা না থাকবে। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত ব্যাঙ্ক ঋণগ্রস্ততার সমস্যার সমাধানই করতে পারবে না। কারণ তাতে ঋণদানের প্রধান বিচার্য্য বিষয়—ঋণের নিরাপত্তা ও ঋণগ্রহিতার সুবিধার ব্যবস্থা করতে হলে গভর্ণমেণ্টকে লোক নিয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারে প্রচুর খরচ করতে হবে। যদি তা সম্ভবও হয় তাহলে দেশের লোক প্রত্যেক ব্যাপারেই গভর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়বে, সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং সমবায় সমিতির একমাত্র সন্তোষজনক উপায়—যাতে কৃষিজীবী তার প্রয়োজনীয় যথাযথভাবে ঋণ পেতে পারে। তার মতে আইন প্রবর্ত্তন ও অন্যান্য অপ্রত্যক্ষ সাহায্য ও উপায়ের দ্বারা দেশে সমবায় কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপনকে উৎসাহ দিতে হবে। জার্ম্মাণীর প্রবর্ত্তিত সমবায় ব্যাঙ্কের অনুপাতে এদেশে সমবায় ব্যাঙ্ক গড়ে তুলবার পক্ষে তিনি মত প্রকাশ করলেন। ১৯০১ খৃঃ দুর্ভিক্ষ কমিশন এই মতকে সমর্থন করেন। ১৮৯৯ খৃঃ মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট নিকোলসনের রিপোর্ট অনুযায়ী কিছু না করারই সিদ্ধান্ত করেন। তাদের মতে গ্রামে গ্রামে ঋণদান (Renal credit) খুব জরুরী সমস্যা ছিল না। ইতিমধ্যে যুক্তপ্রদেশ হতে Mr. H. Dupenen, the people Bank of India নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তক ও নিকোলসনের report জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। যুক্তপ্রদেশ, বাংলা ও পাঞ্জাবের অঞ্চলে কয়েকজন জেলাশাসক নিজেদের চেষ্টায় কতকগুলি সমবায় সমিতি স্থাপন করেন। তন্মধ্যে পাঞ্জাবের স্যার ম্যাকল্যাগানের প্রচেষ্টাই বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করেছিল। যাহা হোক, এই সব উদ্যম ও প্রচেষ্টা সমবায়কে আকর্ষণীয় করে তুললেও, এগুলো বিক্ষিপ্তভাবে করা হচ্ছিল। সুসংবদ্ধ বা সুনিয়ন্ত্রিত হয় নাই। সাধারণ জয়েণ্ট স্টক ব্যাঙ্কের আইন এই সমবায় সমিতির পক্ষে প্রযোজ্য নয় একথা সহজেই বুঝতে পারা গিয়েছিল এবং একটি পৃথক সমবায় আইনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারা গিয়েছিল। নিকোলসনের Report এর উপর প্রাদেশিক Governmentর মত নিয়ে স্যার এডওয়ার্ড ল' সভাপতিত্বে এক কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটি র‍্যাফাইসেন ব্যাঙ্কের অনুপাতে এদেশে সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপনের সুপারিশ করেন। এই সমস্ত সুপারিশ ক্রমে Sir Efftson কর্ত্তৃক ১৯০৩ সালের ব্যবস্থাপক সভায় (Imperial legislative Council) সমবায় বিল উত্থাপিত হয়। Effetson সাহেব নিজে এবং অন্যান্য ভারতীয় সভ্যগণ এই বিষয়ে কৃতকার্য্যতা ও সহযোগিতার সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু Lord Curzon একরূপ জোর করে সমবায় সম্বন্ধীয় ১০এর আইন পাশ করেন।

এইভাবে এদেশে সমবায়ের জন্ম হলো। ইউরোপের সমবায়ের সঙ্গে ভারতবর্ষের সমবায়ের পার্থক্য এখানে। যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত্ত আন্দোলন হিসাবে সমবায় বিকাশ লাভ করেছিল, আর এদেশে বিদেশী সরকার প্রবর্ত্তন করলেন সেই সমবায়।

১৯০৪ সালের ১০ আইন

এই আইন পাশ হওয়ার পর হতে ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে বলা যেতে পারে। এই আইনে ঋণদান সমিতি গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। ঋণ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি গঠন অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখা হয়। এর কারণ এই নয় যে অন্য উদ্দেশ্যবিশিষ্ট সমবায় সমিতির প্রয়োজনীয়তা এখনও বুঝতে পারা যায়নি। প্রধান কারণ হল এই যে, অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে অন্য উদ্দেশ্যে

সমিতি চালানোর লোকের অভাব হওয়াই স্বাভাবিক হবে এবং তাহ'লে উন্নতির গোড়াতেই ধাক্কা খেয়ে সমবায় আন্দোলন আর অগ্রসর হতে পারবে না, এই ভয় হয়েছিল। সমবায় শিক্ষার দিক হতে সাদাসিদা ধরণের ঋণদান সমিতি কার্য্যকরী হবে এই কথা ভেবে লওয়া হয়েছিল। তা ছাড়া শুধু মাত্র এক উদ্দেশ্যে বিশেষ ঋণদান সমিতি স্থাপন হলে পরিচালনার সুবিধা হবে এই কথা ভেবেই এই আইনে অন্য কোন উদ্দেশ্যের সমিতি গঠনের ব্যবস্থারও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়নি। উপরন্তু সহরাঞ্চলের সমবায় সমিতি অপেক্ষা গ্রাম্য সমিতির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল বেশী। সমস্ত সভ্য সংখ্যার চতুর্থ পঞ্চমাংশ কৃষিজীবী হলেই সমিতিকে গ্রাম্য সমিতি, অন্যথায় নাগরিক সমিতি বলা হবে এই আইন করা হয়। গ্রাম্য সমিতিতে অসীম দায়িত্বের প্রবর্ত্তন করা হয় এবং সহরাঞ্চলের সমিতিতে দায়িত্ব সম্বন্ধীয় ব্যাপার সভ্যদের নিজেদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। ঠিক করে দেওয়া হয় যে গ্রাম্যসমিতির সমস্ত মুনাফা এবং নাগরিক সমিতির বেলায় Reserve fundএ জমা হবে। প্রত্যেক সমিতির প্রবেশ মূল্য, শেয়ার, সভ্যের আমানত ও বাহির হতে কর্জ্জ গ্রহণের দ্বারা নিজেদের কার্য্যকরী মূলধন সৃজন করবে এবং সৃষ্ট...অর্থ সভ্যদের মধ্যে দাদন করবে। সমিতি স্থাপনের উপর দৃষ্টি রাখার জন্য এবং আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে Registrar নিযুক্ত হবেন। সমিতির Audit পরিদর্শন গভর্ণমেন্ট অফিসাররা করবেন। প্রয়োজন হলে Registrar সমিতি উঠিয়ে দিতে পারবেন। মোটের উপর সমবায় আন্দোলন গভর্ণমেণ্টের সহানুভূতি সাহায্য ও উপদেশ লাভ করবে। আন্দোলনকে উৎসাহ দান করার জন্য আয়কর, stamp, registration প্রভৃতি হতে সমিতিকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। গভর্ণমেণ্ট প্রায় ৩ বৎসর সমিতিকে ২০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত শতকরা ৪৲ টাকা হার সুদে দিতে অঙ্গীকার করল, যদি অনুরূপ পরিমাণ টাকা নিজের থেকে তুলতে পারে। ১৯০৪ সালের আইনকে সমবায় ঋণদান বিষয়ক আইন বলা হয়েছিল। কারণ এই আইনে একমাত্র ঋণদানের উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া শুধু মাত্র ঋণগ্রস্ততার ভার কমাবার উদ্দেশ্য নিয়েই এই আইনের জন্ম হওয়ায় ঋণদান ঋণগ্রহণ সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে করা হয়েছিল।

১৯০৪ সালের আইনের দুটী প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হল সরলতা ও স্থিতিস্থাপকতা। অশিক্ষিত কৃষিজীবীর বোঝবার অসুবিধা না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রেখে জটিলতাবিশিষ্ট পরিকল্পনা যতদূর সম্ভব পরিহার করা হয়েছিল এবং যতদূর সম্ভব সহজবোধ্য করে আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ যাতে প্রত্যেক প্রদেশের বিশেষ বিশেষ অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সমিতি গড়ে উঠতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে কতকগুলি সর্ব্বথাপ্রযোজ্য মূলনীতির রচনাই ছিল এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টই সমবায়ের এই পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর হলেন এবং একজন করে Registrar নিযুক্ত করলেন। আন্দোলন এমনভাবে অপ্রত্যাশিত প্রসার লাভ করল যে ১৯০৪ সালের আইনটিকে নূতন কতকগুলি পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা গেল। ১৯০৬-৭ সালে সমিতির সংখ্যা ৮০৩ হতে ১৯১১-১২ সাল ৮১৭৭ হয়ে দাঁড়ায় এবং সভ্যসংখ্যা ৯০৮৪৪ হতে ৪,০০৩৩১৮ হয়ে দাঁড়াল। কার্য্যকরী মূলধন ও ২৩০,৭১৬৮৩৲ টাকা হতে বেড়ে ৩৯১৫৭৪১৬২ টাকায় গিয়ে দাঁড়াল।

১৯০৪ সালের আইনে ঋণ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যবিশিষ্ট সমবায় সমিতি গঠনের ব্যবস্থা হয়নি। তার উপর সমিতিসমূহের দ্রুত প্রসার ও নিকটবর্ত্তী স্থান হতে ঋণ পাওয়ার সমস্যা উদ্ভব হওয়ায় কেন্দ্রীয় সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়। প্রাথমিক সমিতিগুলি যখন দ্রুতভাবে গড়ে উঠতে ও কৃতকার্য্যের সঙ্গে কাজ করতে লাগল তখন একটি প্রধান সমস্যা তাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াল—কেমন করে সহজে মূলধন সংগ্রহ করা যায়। কেন্দ্রীয় সমিতি স্থাপনের কোন ব্যবস্থাই আইনে না থাকায় সেদিকে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করল। এইরূপ সমিতি স্থাপন করতে পারলে অতি সহজে মূলধন সংগ্রহ করা যাবে এটা বেশ বুঝতে পারা গেল। তা ছাড়া এইরূপ সমিতি স্থাপিত হলে তার দ্বারা প্রাথমিক সমিতিগুলি পরিদৃষ্ট, পরিচালিত ও প্রয়োজন হলে উপদিষ্টও হতে পারবে এটা বুঝা গেল। ১৯১২ সালের আইনে এগুলির ব্যবস্থা হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলন দ্বিতীয় পর্য্যায়ে এসে পড়ে। কেন্দ্রীয় সমিতি, প্রাদেশিক সমিতি, উৎপাদন, ক্রয় ও বিক্রয় সমিতি প্রভৃতি স্থাপন আইনতঃ গৃহীত হয়। গ্রাম্য ও নাগরিক সমিতির বদলে অসীম ও সসীম দায়িত্ববিশিষ্ট সমিতির উদ্ভাবন ব্যবস্থা করা হয়। গ্রাম্য সমিতিতে পূর্ব্বে শেয়ারের উপর কোন মুনাফা দেওয়ার ব্যবস্থা ১৯০৪এর আইনে ছিল না। ১৯১২ সালের আইনের প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের অনুমতি সাপেক্ষে সে ব্যবস্থা হয়। অসীম ও সসীম দায়িত্ব সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করা হয় যে, কোন সমিতিতে অন্য একটি সমিতির সভ্য হতে পারার ব্যবস্থা থাকলে প্রথমোক্ত সমিতি সসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট হবে। অপর দিকে যে সমিতিতে অধিকাংশ সভ্য কৃষিজীবী থাকবে এবং যেখানে সভ্যদের মধ্যে ঋণ দাদন একটি উদ্দেশ্য বলে পরিগণিত হবে সেই সমিতি অসীমদায়িত্ববিশিষ্ট হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে সমিতির সভ্যগণ দায়িত্ব সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

১৯১২ সালের আইন পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমবায় আন্দোলন নূতন প্রেরণালাভ করতে থাকে। সেই সমিতির সংখ্যা, তাদের সভ্যসংখ্যা ও উন্নতির গতি যথেষ্ট বেড়ে যায়, যদিও এই বাড়ার হার সকল প্রদেশে সমান হয় নাই। ১৯১৪-১৫ সালে সমিতির সংখ্যা ও প্রাথমিক সমিতির সভ্য সংখ্যা ১৭৩২৭ এবং ৮,০২৪৪৭৯ থাকে। ১৯২১-২২ সালে ঐ সংখ্যা যথাক্রমে ৫২১৮২ এবং ১৯৭৪২৯০ থাকে এবং ১৯২৭-২৮ সালে যথাক্রমে ৯৬০৯১ এবং ৩৭৮০১৭৩ হয়। কার্য্যকরী মূলধনের অঙ্ক ও উপরোক্ত বৎসরগুলিতে যথাক্রমে ১২২২৯২০০০ টাকা,

৩১১২২৫০০০, ৭৬৭০৮৭০০০ টাকা হয়। সুতরাং সকল দিক হতে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

১৯১২ সালের আইন পাশ হওয়ার পর আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন উদ্দেশ্যের সমিতি দ্রুতবেগে গড়ে উঠতে থাকে। যেমন ক্রয় বিক্রয় সমিতি, দুগ্ধ সরবরাহ সমিতি, তন্তু সমবায় সমিতি প্রভৃতি। কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যাও বেড়ে যায় এবং সমবায় আন্দোলন যে জনসাধারণের আস্থাভাজন হচ্ছে এর একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। আন্দোলনের সত্যকারের উন্নতি কতদূর হয়েছে তা পরিমাপ করে দেখার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৯১৪ সালে ম্যাকলাগান কমিটি নিয়োগ করেন।

এই কমিটির বিবরণী ১৯১৫ সালের Sept.এ প্রকাশিত হয়। এই বিবরণী প্রকাশ হওয়ার পর সমবায় আন্দোলনের তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে বলা যেতে পারে। সমবায় জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে বিকাশ লাভ করুক এই কথাই সুপারিশ করেন। তিনি ঋণদাদনের ক্ষেত্রেও যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার কথা কমিটিকে স্মরণ করে দেন। কমিটি ঋণদান সমিতি গুলোকে প্রতিপদক্ষেপে কেন্দ্রীয় সমিতির উপর নির্ভর না করে সভ্যগণের মধ্য হতে গৃহীত আমানতের বলে কার্য্যকরার পরামর্শ দেন। তাতে সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতার লক্ষণ একদিকে দেখা যাবে ও অন্যদিকে আমানতের পরিমাণও বেড়ে যাবে। যথাযথভাবে অডিট ও পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তার কথাও কমিটি উল্লেখ করেন। তা করা হলে জনসাধারণের আস্থা বেড়ে যাবে। কমিটির রিপোর্ট যখন বার করা হয় তখন দেশে জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধির পথে ছিল। সুতরাং রিপোর্টের সতর্কীকরণের মূল্য তখন আন্দোলনের মধ্যে যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তারা বুঝতে পারেন নি। ১৯৩২ সালে বিশ্বব্যাপী মূল্য হ্রাসের দিনে সেগুলোর সম্যক উপলব্ধি সম্ভব হয়।

সমবায় আন্দোলনের চতুর্থ অধ্যায় আরম্ভ হয় ১৯১৯ সালে। ভারত-গভর্ণমেণ্টের Reform Act পাশ হওয়ার পর থেকে এই আইনে সমবায় হস্তান্তরিত প্রাদেশিক বিষয় বলে পরিগণিত হয় এবং প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে মন্ত্রীর অধীনে প্রসারলাভ করতে থাকে। কয়েকটি প্রদেশ ১৯১২ সালের আইনকে ভিত্তি করে প্রাদেশিক আইন প্রণয়ন করে। বোম্বাই এ বিষয়ে অগ্রণী হয়, ১৯২৫ সালে নতুন আইন পাশ করে। ১৯২৭ সালে Burma, ১৯৩২ সালে Madras। ১৯৩৫ সালে Bihar Orissa ও ১৯৪১ সালে বাংলা নুতন আইন প্রণয়ন করে। অন্যান্য প্রদেশ তাদের নিজেদের আন্দোলনের উপযোগী করে ১৯১২ সালের ভারত আইনকে কিছু কিছু সংশোধন করে—নিজেদের আন্দোলনের উপযোগী করে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করে নেয়। এই সকল নুতন আইনের সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রায় দেখা যায় যে, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট Registrarকে ১৯১২ সালের আইন অপেক্ষা বেশী ক্ষমতা দান করেছে। বাংলা দেশের সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠন কার্য্যে সুবিধার জন্য ও সুষ্ঠু উপায়ে তার উন্নতিবিধানের জন্য ১৯৪০ সালের প্রাদেশিক আইনে Registrarকে আন্দোলন পরিচালনা ও পরিদর্শনের জন্য ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়। শিক্ষা ও প্রচার কার্য্যের জন্য বেসরকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে বোম্বাই সমবায় শিক্ষানিকেতন (Bombay Co-operative Institute) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কয়েকটি প্রদেশে আন্দোলনের গতি ও উন্নতি সম্বন্ধে যথাযথ অনুসন্ধানের জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান কমিটি স্থাপন করেন। তন্মধ্যে মধ্যপ্রদেশের Kinis Committee (১৯২২), যুক্তপ্রদেশের Okden Committee (১৯২৬), মাদ্রাজের Townsend Committee (১৯২৮) এবং পাঞ্জাবের Canent Committee (১৯২৯)র নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাংলাদেশে কোন কমিটিই নিযুক্ত হয় নি। এই সব কমিটি যে সকল সুপারিশ করেন সে সমস্তই প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট-সমূহ কার্য্যকরী করার চেষ্টা করেন। ফলে সকল প্রদেশেই লক্ষিত হয় যে সুপারিশ কার্য্যকরী করার ক্ষেত্রে প্রাদেশিক Bank সমূহকে প্রচুর ঋণদান এবং তাদের ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ায় দায়িত্বগ্রহণ—এই মোটামুটি সর্ব্বক্ষেত্রে করা হয়েছে।

আন্দোলনের পঞ্চম অধ্যায় আরম্ভ হয় ১৯২৯ সালে। বিশ্বব্যাপী মূল্য হ্রাসের (Depression) ঢেউ এদেশে লাগে। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য আশাতীত ভাবে কমে যায়। এতদিন মূল্যবৃদ্ধির দিনে সমবায় সমিতি গুলোর অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল, আজ চাকা একেবারে ঘুরে গেল। আন্দোলনকে ঢেলে সাজার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত হয় এবং এখন হতে আন্দোলনের প্রসারের পরিবর্ত্তে দোষ ত্রুটি সংশোধন এবং পুনর্গঠনই প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ১৯২৯-৩১ সালে কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটিগুলো যে সুপারিশ করেন তাতে এই কথাই বলা হয় যে স্বল্পমেয়াদী ঋণদান সমিতি গুলোকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে হলে গ্রাম্য ঋণগ্রস্ততার ভার একদিকে যেমন কমানো দরকার, অন্যদিকে তেমনি পৈতৃক ঋণের ভার হতেও কৃষিজীবীকে অব্যাহতি দেওয়া দরকার। এর ফলে দেশে জমিবন্ধকী সমিতির ও ঋণ সালিশী বোর্ডের সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে মাদ্রাজ অগ্রণী হয়ে প্রথম জমিবন্ধকী সমিতি বিষয়ক আইন ১৯৩৪ সালে প্রণয়ন করে। এ ছাড়া গভর্ণমেণ্টকে সময়ে সময়ে দেশের আন্দোলন সম্বন্ধে অবহিত করে রাখার জন্য ১৯৩০ সালে Reserve Bank of India কৃষি-ঋণদান বিভাগ খোলে।

যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালকে আন্দোলনের ষষ্ঠ অধ্যায় বলা যেতে পারে। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নৈরাশ্যজনক আবহাওয়া বদলে যায়। সমিতির সভ্যগণ বিশেষ করে কৃষিজীবী সভ্যগণের মধ্যে মহাজনের ও সমিতির পুরাতন দেনা পরিশোধ করার আগ্রহ লক্ষিত হয়। অধিকন্তু সুপরিচালিত Bank গুলোতে আমানতের পরিমাণও বেড়ে যায়। দেশে চাহিদা অনুপাতে জিনিষপত্রের সরবরাহ না থাকায়—দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং কৃষিজীবীর অর্থোপায় সুগম ও সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে সমবায় Bankগুলো হতে ঋণ

গ্রহণের তাগিদ কমে আসে এবং ঋণদান সমিতিগুলোতে টাকা বাড়তি হয়ে দাঁড়ায়। বাড়তি টাকা কিভাবে খাটানো যায় এইটাই এক সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু পণ্যদ্রব্যের স্বল্প সরবরাহ ও আনুসঙ্গিক দুষ্প্রাপ্যতা হেতু যে সমস্যার উদ্ভব হয় তার সমাধান করার জন্য সমবায়ের অপর একদিকে প্রসার লাভ ঘটে—সমবায় প্রথার উৎপাদন ও বণ্টন কার্য্য। যুদ্ধকাল পর্য্যন্ত সমবায়ের একদিকেই মূলতঃ বিকাশ ঘটেছিল—তা সমবায় প্রথার ঋণদান। যুদ্ধোত্তর কালে ঋণদান গৌণ-পর্য্যায়ে নেমে আসে এবং উৎপাদন ও বণ্টন কার্য্য মুখ্যস্থান অধিকার করে। ফলে এতদিনের অন্যায় সংশোধিত হয়। ইহা এদেশে সমবায় আন্দোলনের প্রতি যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর অর্থনীতির একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

নিম্নলিখিত তালিকা হতে দেখা যাবে যে ১৯২৯ সালের পর হতে যুদ্ধ আরম্ভ পর্য্যন্ত সমবায় আন্দোলনের প্রসারের হার পূর্ব্বাপর বৎসরের তুলনায় অনেক পরিমাণে কমে গেছে। যুদ্ধকালে এই অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয় এবং ভারতের সমবায় সমিতি সমূহের কার্য্যকরী মূলধনের অঙ্ক ১৯৩৮-৩৯ সালের ১০৬ কোটী টাকা হতে ১৯৪৪-৪৬ সালে ১৬৪ কোটী টাকায় এসে দাঁড়ায়। কিন্তু এ বৃদ্ধির হার যুদ্ধকালীন মূল্য বৃদ্ধির (Inflation) তুলনায় যথেষ্ট কম। ইহার প্রধান কারণ সমিতিগুলো হতে সভ্যদের টাকার চাহিদা কমে যাওয়া। এইজন্য সমিতিগুলোও আর মূলধন বাড়ানোর পক্ষপাতী হয় নি। অপরদিকে সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতার অভ্যাসের অভাব পরিদৃষ্ট হয়—যার ফলে তারা পুরাতন দেনা শোধ করার পর আর কোন টাকা জমাতে পারে নি। ফলে সমিতিগুলোতে আমানতের অঙ্ক কমে যাওয়ায় মূলধনের অঙ্কও কমে যায়। কিন্তু এই সময় ঋণদান ও দাদনের কার্য্যের মাত্রা যে বেড়ে গেল তা নিম্নে ২নং তালিকায় দেখলে বুঝতে পারা যায়। এই তালিকার ৬নং ভাগে দেখা যাবে যে খেলাপী টাকার পরিমাণ ও হার ক্রমশঃই কমে আসছে। এর থেকে এই বোঝা যায় যে সভ্যগণ নূতন ঋণ সম্যক পরিশোধ ত করছেই, উপরন্তু পুরাতন দেনার কিছু কিছু পরিশোধ করছে। সমবায় সমিতির উন্নতির এটা একটি লক্ষণ।

কিন্তু এই উন্নতি যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তরকালীন অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে এই উন্নতির কতটুকু স্থায়ী হয় তাহাই লক্ষ্য করার বিষয়। সমস্ত প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টই এই উন্নতিকে স্থায়ী করার জন্য নানারূপ পরিকল্পনার উদ্ভাবন করেছেন এবং অধিকতর উন্নতির দিকে বিশেষ করে দৃষ্টি রাখবেন। এইখানে উল্লেখযোগ্য এই যে এই প্রবন্ধে সারা ভারতের সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে বলা হয়েছে, কোন প্রদেশের বিশেষ দিকে দৃষ্টি রেখে বলা হয়নি।

(১) ভারতবর্ষের সমবায় সমিতি-সমূহের সংখ্যা, তাদের সভ্যসংখ্যা ও কার্য্যকরী মূলধনের বৃদ্ধির তালিকা—

বৎসর	হাজার অঙ্ক বিশিষ্ট		লক্ষ অঙ্ক বিশিষ্ট		কোটী অঙ্ক বিশিষ্ট	
	সমিতির সংখ্যা	বৃদ্ধির পরিমাণ	সভ্য সংখ্যা	বৃদ্ধির পরিমাণ	কার্য্যকরী মূলধন	বৃদ্ধির পরিমাণ
১৯২০-২১—১৯২৪-২৫	৫৮	—	২১'৫	—	৩৬'৩৬	—
১৯২৫-২৬—১৯২৯-৩০	৯৪	৩৬	৩৬'৯	১৫'৪	৭৪'৭৯	৩৮'৫৩
১৯৩০-৩১—১৯৩৪-৩৫	১০৬	১২	৪৩'২	৬'৩	৯৪'৬১	১৯'৭২
১৯৩৫-৩৬—১৯৩৯-৪০	১১৭	১১	৫০'৮	৭'৬	১০৪'৬৮	১০'০৭
১৯৪০-৪১—১৯৪৪-৪৫	১৫০	৩৩	৭২'২	২১'৪	১২৪'৩৫	১৯'৬৭

(২) ১৯৩৮-৩৯ হতে ১৯৪৫-৪৬ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সমবায় সমিতি সমূহের ঋণ সম্বন্ধীয় কার্য্যাবলীর তালিকা—

১	২	৩	৪	৫	৬
বৎসর	সমিতি সংখ্যা (লক্ষ অঙ্ক বিশিষ্ট)	সভ্যগণকে বৎসরের মধ্যে ঋণ দাদন (কোটী টাকার সংখ্যা)	সভ্যগণ কর্ত্তৃক বৎসর মধ্যে ঋণশোধ (কোটী টাকার সংখ্যা)	সভ্যগণের নিকট বাকী ঋণের পরিমাণ (কোটী টাকার সংখ্যা)	খেলাপী টাকার পরিমাণ (কোটী টাকার সংখ্যা
১৯৩৮-৩৯	১'২২	২৬'৪১	২৪'৩৬	৪৬'৯৫	১৪'০৫
১৯৩৯-৪০	১'৩২	২৬'৮০	২৫'৬৫	৪৭'১৩	১৩'৮৪
১৯৪২-৪৩	১'৪৬	৩২'৯৮	৩৪'৮৭	৪৪'১৩	১১'৭৭
১৯৪৩-৪৪	১'৫৬	৪০'০৬	৪০'৯৩	৪০'৭৪	১০'৩৬
১৯৪৪-৪৫	১'৬০	৪১'৭৬	৪২'১২	৪৪'৯৯	৯'১৬
১৯৪৫-৪৬	১'৭২	৫১'৭৫	৪৯'৬৮	৪৬'৯৪	৮'৫২

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রকাশিত

Review of co-operative movment in India হইতে গৃহীত

কালের মন্দির

শ্রী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মগধের দূত

মহাকবি কালিদাস রঘুর দিগ্‌বিজয় বর্ণনাচ্ছলে যে অমিত-বিক্রম মগধেশ্বরের বিজয়গাথা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম সমুদ্রগুপ্ত। এক হিসাবে সমুদ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডার অপেক্ষাও শক্তিধর ছিলেন; আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য তাঁহার মৃত্যুর পরেই ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার সমুদ্রমেখলাবৃত বিশাল সাম্রাজ্যকে এমন সুকঠিন শৃঙ্খলে বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার বংশধরগণ তিন পুরুষ পর্যন্ত প্রায় নিরুপদ্রবে তাহা ভোগ করিয়াছিলেন, শত বর্ষ মধ্যে সে বন্ধন শিথিল হয় নাই।

গুপ্ত সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরিল সমুদ্র গুপ্তের পৌত্র কুমারগুপ্তের সময়। তখনও সাম্রাজ্য কপিশা প্রাগ্‌জ্যোতিষ পর্যন্ত বিস্তৃত; কিন্তু বহিরাকৃতি অটুট থাকিলেও গজভুক্ত কপিত্থবৎ অন্তঃশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। যে দুর্দম জীবনশক্তি এই বিরাট ভূখণ্ডকে একত্রীভূত করিয়া রাখিয়াছিল, কালক্রমে জরার প্রভাবে তাহা শ্লথ হইয়া গিয়াছে।

কুমারগুপ্তের দীর্ঘ রাজত্বকালের শেষভাগে উন্মত্ত ঝঞ্ঝাবর্তের মত হূণ-অভিযান সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে আঘাত করিল। এই প্রচণ্ড আঘাতে জীর্ণ সাম্রাজ্য কাঁপিয়া উঠিল। কুমারগুপ্ত ভোগী ছিলেন, বীর ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার ঔরসে এক মহাবীর পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল—গুপ্তবংশের শেষ বীর স্কন্দ। তরুণ স্কন্দগুপ্ত তখন যুবরাজ-ভট্টারক পদে আসীন; রাজবংশের চঞ্চলা লক্ষ্মীকে স্থির করিবার জন্য স্কন্দ তিন রাত্রি ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া যুদ্ধযাত্রায় বাহির হইলেন। সেই দিন হইতে ক্ষয়গ্রস্ত পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যকে অটুট রাখিবার অক্লান্ত চেষ্টায় দীর্ঘ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে ও সৈন্য শিবিরে যাপন করাই এই ভাগ্যহীন বীরকেশরীর পূর্ণ ইতিহাস।

যুবরাজ স্কন্দ পঞ্চনদ প্রদেশে হূণ অক্ষৌহিণীর সম্মুখীন হইলেন। হিংস্র বর্বর হূণগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করিল, কিন্তু অসামান্য রণপণ্ডিত স্কন্দের সহিত আঁটিয়া উঠিল না। তথাপি আশ্চর্য এই যে, তাহারা নিঃশেষে দূরীভূত হইল না। পঞ্চনদ প্রদেশ নদনদী ও পর্বত দ্বারা বহুধা খণ্ডিত; চক্রবর্তী গুপ্তসম্রাটের অধীনে প্রায় পঞ্চাশটি ক্ষুদ্রবৃহৎ সামন্তরাজা ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য রচনা করিয়া এই দেশ শাসন করিতেন। হূণদের আক্রমণে সমস্তই লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছিল, কূলপ্লাবী বন্যায় খড়কুটার সহিত মহীরুহও ভাসিয়া গিয়াছিল। অতঃপর স্কন্দের আবির্ভাবে বন্যার জল নামিল বটে কিন্তু নানা স্থানে আবদ্ধ জলাশয় রাখিয়া গেল। পরাজিত হূণ অনীকিনীর অধিকাংশ দেশ ছাড়িয়া গেল, কতক প্রকৃতি-সুরক্ষিত দুর্গম ভূমি আশ্রয় করিয়া রহিয়া গেল।

কুটিল রোগ যেমন তীব্র ঔষধের দ্বারা বিদূরিত না হইয়া দেহের দুর্লক্ষ্য দুরধিগম্য স্থানে আশ্রয় লয়, কয়েকটা হূণ গোষ্ঠীও তেমনি ইতস্তত সানু-সঙ্কট-বন্ধুর স্থানে অধিষ্ঠিত হইল। হয় তো স্কন্দ আরও কিছুকাল এই প্রান্তে থাকিতে পারিলে সম্পূর্ণরূপে হূণ উৎপাত উন্মূলিত করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি থাকিতে পারিলেন না, সাম্রাজ্যের অপর প্রান্তে গুরুতর অশান্তির সংবাদ পাইয়া তাহাকে ফিরিতে হইল। পঞ্চনদ প্রদেশ বাহ্যতঃ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রহিল বটে, কিন্তু ধর্ষিতা নারীর ন্যায় তাহার প্রাক্তন অনন্যপরতা আর রহিল না।

বিটঙ্ক নামক ক্ষুদ্র গিরিরাজ্য এই সময় একদল হূণের করতলগত হইয়াছিল। এই হূণদের প্রধান পুরুষ রোট্ট রাজ্যের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী ধারা দেবী নাম্নী এক কুমারীকে অঙ্কশায়িনী করিয়া নূতন রাজবংশের সূচনা করিয়াছিলেন।

প্রথম সংঘর্ষের বিস্ফুরিত অগ্ন্যুদগার নিভিয়া যাইবার পর বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে বিদ্বেষ-ভাব হ্রাস পাইতে লাগিল। উগ্র হূণ প্রকৃতি পারিপার্শ্বিক প্রভাবের ফলে শান্ত হইয়া আসিল। সর্বাপেক্ষা অধিক পরিবর্তন হইল স্বয়ং মহারাজ রোট্টের। ধারা দেবীর কোমল এবং সহিষ্ণু অন্তরে না জানি কোন অপরিমেয় শক্তি ছিল, তিনি এই দুর্ধর্ষ বর্বরকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিলেন। রোট্ট ক্রমশঃ বুদ্ধের করুণাবাণীর শরণাপন্ন হইলেন, তাঁহার নামের পশ্চাতে ধর্মাদিত্য উপাধি যোজিত হইল। কপোত-কূটের যে চৈত্য হূণদের প্রথম আগমনে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছিল তাহা পুর্নগঠিত হইল।

রোট্ট ধর্মাধিত্যের রাজত্বকালের সপ্তমবর্ষে মহাদেবী ধারা একটি কন্যা প্রসব করিয়া চিরদিনের জন্য তাঁহার পরম সহিষ্ণু কোমল চক্ষুদুটি মুদিত করিলেন। কিন্তু রোট্ট আর নূতন মহাদেবী গ্রহণ করিলেন না—একটিমাত্র কন্যার নাম রাখিলেন রট্টা যশোধরা।

প্রথম হূণ অভিযানের পর শতাব্দীর একপাদ ক্ষয় হইয়া গেল। ওদিকে স্কন্দগুপ্ত পিতার মৃত্যুর পর সম্রাট হইয়াছেন। সাম্রাজ্যের চতুঃসীমা ঘিরিয়া বিদ্রোহ এবং অশান্তির আগুন জ্বলিতেছে; ধীরে ধীরে মগধকে কেন্দ্র করিয়া বহ্নিচক্র অগ্রসর হইতেছে। রাজ্যের অভ্যন্তরের ও পুষ্যমিত্রীয়গণ গোপনে মাৎস্যন্যায় ও চক্রান্তের বিষ ছড়াইতেছে। এই বিষবহ্নির মধ্যে স্কন্দ ক্লান্তিহীন নিদ্রা-হীনভাবে যুদ্ধ করিয়া ফিরিতেছেন। তাঁহার বিপুল বাহিনী কখনও লৌহিত্যের উপকূলে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহীর অন্তরে আতঙ্ক সঞ্চার করিতেছে, আবার পরদণ্ডেই সেতুবন্ধ অভিমুখে যাত্রা করিয়া শান্তি-সেতু বন্ধনের প্রয়াস পাইতেছে। বর্ষান্তে মহারাজ তাঁহার মহাস্থানীয়ে পদার্পণ করিবার অবকাশ পান না। সচিবগণ পাটলিপুত্রে থাকিয়া যথাসাধ্য রাজকার্য চালাইতেছেন।

সাম্রাজ্যব্যাপী এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে রাজকার্য যে সুচারু-রূপে চলিতেছিল না তাহা বলা বাহুল্য। ভূমিকম্পে যখন মাথার উপর গৃহ ভাঙিয়া পড়িতেছে তখন গৃহকোণে রক্ষিত ক্ষুদ্র তৈজস কেহ লক্ষ্য করে না। তুচ্ছ বিটঙ্ক রাজ্যের কথা পাটলিপুত্রের সকলে ভুলিয়া গিয়াছিল; পঁচিশ বৎসরের মধ্যে কেহ তাহার খোঁজ লয় নাই।

রাজ্যের প্রাচীন পুস্তপাল মহাশয়ের মৃত্যু হওয়াতে এক নবীন কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নবীনতার উদ্যমে তিনি একদিন অক্ষপটল-গৃহের পুরাতন নিবন্ধ পুস্তকাদি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বিটঙ্ক রাজ্যের নাম আবিষ্কার করিলেন। পঁচিশ বৎসর এই রাজ্য হইতে রাজস্ব আসে নাই। রাজ্যটা গেল কোথায়?

বহু নথিপত্র অনুসন্ধানের পর প্রকৃত তথ্য জানা গেল। চিন্তান্বিত নবীন পুস্তপাল মহাশয় দুঃসংবাদটা মহামন্ত্রীর কানে তুলিলেন।

স্কন্দ তখন পাটলিপুত্রে উপস্থিত। সুদূর কেরল দেশে যুদ্ধ করিতে করিতে একটা গুরুতর দুর্যোগের জনশ্রুতি শুনিয়া তিনি ত্বরিতে রাজধানী ফিরিয়াছেন। আবার নাকি হূণ আসিতেছে; লক্ষ লক্ষ শ্বেত হূণ বক্ষু নদী পার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। দুইজন চৈনিক শ্রমণ এই সংবাদ লইয়া কপিশায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেখান হইতে রাজদূত দিবারাত্র অশ্বচালনা করিয়া স্কন্দের নিকট বার্তা আনিয়াছে। কেবল যুদ্ধের ভার কয়েকজন প্রাচীন সেনাপতির উপর অর্পণ করিয়া স্কন্দ পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

মহামন্ত্রী বিটঙ্ক রাজ্যের সংবাদ লইয়া রাজসকাশে উপস্থিত হইলেন,—'একটা বড় ভুল হইয়াছে। বিটঙ্ক নামক পঞ্চনদ প্রদেশের একটা রাজ্য আমাদের হিসাব হইতে হারাইয়া গিয়াছিল। দেখা যাইতেছে হূণেরা সেটা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পঁচিশ বৎসর তাহারা রাজস্ব দেয় নাই।'

স্কন্দ তখন প্রাসাদের এক বিশ্রাম কক্ষে একাকী ছিলেন; মণি কুট্টিমের উপর বসিয়া অক্ষবাটের সম্মুখে পাশা ফেলিতেছিলেন, মন্ত্রীর কথায় স্বপ্নাতুর চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন। স্কন্দের বয়ঃক্রম এই সময় প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, কিন্তু বলদৃপ্ত দেহে কোথাও জরার চিহ্নমাত্র নাই; রমণীর ন্যায় কোমল চক্ষু দুটি যেন সর্বদাই স্বপ্ন দেখিতেছে। তাঁহার সুঠাম দেহ ও লাবণ্যপূর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া তাঁহাকে পরাক্রান্ত যোদ্ধা বলিয়া মনে হয় না, কবি ও ভাবুক বলিয়া ভ্রম হয়।

স্কন্দ দুই হাতে পাশা ঘষিতে ঘষিতে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—'পাশা বলিতেছে এবার হূণকে তাড়াইতে পারিব না। তিনবার পাশা ফেলিলাম, তিনবারই পাশা ঐ কথা

বলিল। গুপ্ত সাম্রাজ্য টলিতেছে, ভাঙিয়া পড়িতে আর বিলম্ব নাই।'—তারপর চকিতে সচেতন হইয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন—'আসন গ্রহণ করুন আর্য।'

মহাসচিব পৃথিবীসেন রাজার সম্মুখস্থ আসনে বসিলেন। অশীতিপর বৃদ্ধ, শুষ্ক দেহ বংশযষ্টির ন্যায় ঋজু ও গ্রন্থিযুক্ত; ইনি একাধারে এই বৃহৎ রাজ্যের মহাসচিব ও মহাবলাধিকৃত; স্কন্দের পিতা কুমারগুপ্তের সময় হইতে অনন্যমনে রাজ্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন।

পৃথিবী সেন নীরসকণ্ঠে বলিলেন,—'কবি কালিদাস একদিন আমাদের বলিয়াছিলেন—পাশার ভবিষ্যদ্বাণী, মণ্ডপের প্রতিজ্ঞা ও শত্রুর হাসি যাহারা বিশ্বাস করে তাহারা বিচারমূঢ়।—হায় কালিদাস!' দীর্ঘশ্বাস মোচনপূর্বক স্বর্গত কবির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া মন্ত্রী কহিলেন,—'এখন এই বিটঙ্ক রাজ্যটা লইয়া কি করা যায়?'

ঈষৎ হাসিয়া স্কন্দ বলিলেন,—'রাজ্যটা হারাইয়া গিয়াছিল? বিচিত্র নয়। কেবল যুদ্ধে আমার অঙ্গুরীয় হইতে একটি নীলকান্ত মণি কখন খসিয়া গিয়াছিল জানিতে পারি নাই। আজ প্রথম লক্ষ্য করিলাম। এই দেখুন।' বলিয়া অঙ্গুরীয় দেখাইলেন।

অতঃপর রাজা ও মন্ত্রী মিলিয়া দীর্ঘকাল মন্ত্রণা করিলেন। বিটঙ্ক রাজ্য অবশ্য তাঁহাদের চিন্তার অতি ক্ষুদ্রাংশই অধিকার করিল। অবশেষে স্থির হইল যে হূণ যখন আবার আসিতেছে তখন চতুরঙ্গ বাহিনী লইয়া স্কন্দ তাহাদের আগম-পথ রোধ করিবার জন্য এক মাসের মধ্যে পুরুষপুর যাত্রা করিবেন। উপরন্তু পঞ্চনদ প্রদেশে যত সামন্ত রাজা আছেন সকলের নিকট অচিরাৎ দূত প্রেরিত হইবে, যাহাতে এই সম্মিলিত সামন্তচক্র হূণদের বিরুদ্ধে ব্যূহরচনা করিয়া স্বরাজ্য রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকেন। বিটঙ্ক রাজ্যেও মগধের দূত যাইবে; তত্রত্য হূণ রাজাকে মগধের আনুগত্য স্বীকার করিবার আদেশ প্রেরিত হইবে। হূণ যদি স্বীকৃত না হয় তখন স্কন্দ তথায় উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবেন।

সচিব রাজ সন্নিধান হইতে বিদায় লইবার কিয়ৎকাল পরে বিদূষক পিপ্পলী মিশ্র আসিয়া দেখা দিলেন। অতি স্থূলকায় ব্রাহ্মণ, হস্তে একটি বৃহৎ কুষ্মাণ্ড। রাজা দেখিয়া বলিলেন,—'পিপুল, একি! কুষ্মাণ্ড কেন?'

কুষ্মাণ্ড মহারাজের পদপ্রান্তে রাখিয়া বিদূষক মন্ত্রীর পরিত্যক্ত আসনে বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন,—'মহারাজ, রিক্তপাণি হইয়া রাজ সমীপে আসিতে নাই, ইহাই শিষ্ট নীতি।'

রাজা বলিলেন,—'ঠিকই হইয়াছে, তোমার বুদ্ধি ও কলেবর দুই-ই কুষ্মাণ্ডবৎ। এটি কোথায় সংগ্রহ করিলে?'

পিপ্পলী বলিলেন, চালে ফলিয়াছিল। ব্রাহ্মণীকে অনেক স্তোক দিয়া বয়স্যের জন্য আনিয়াছি।

'ব্রাহ্মণীকে কী স্তোক দিয়াছ?'

'বয়স্য, ব্রাহ্মণীর একটি অকাল কুষ্মাণ্ড ভ্রাতুষ্পুত্র আছে, তাহার বড়ই দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা। এখন মহারাজ যদি তাহাকে কোনও দূর দেশে দূতরূপে প্রেরণ করেন তবেই তাহার সাধ পূর্ণ হয়। আমি মহারাজের নিকট নিবেদন করিব এই স্তোক দিয়া গৃহিণীর কুষ্মাণ্ডটি হস্তগত করিয়াছি।'

রাজা সহাস্যে বলিলেন,—'ধন্য পিপুল, তোমার বয়স্য-প্রীতি অতুলনীয়। তাহাই হইবে; তোমার ব্রাহ্মণীর ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেশ ভ্রমণে পাঠাইব। এখন এই কুষ্মাণ্ড রন্ধনশালায় প্রেরণ কর।'

কুষ্মাণ্ড স্থানান্তরিত হইলে স্কন্দ বলিলেন,—'পিপুল, এস পাশা খেলি। আর একবার ভাগ্য পরীক্ষা করিব। তুমি যদি আমাকে পরাজিত করিতে পার, বুঝিব নিয়তির বিধান অলঙ্ঘনীয়।'

পিপ্পলী মিশ্র বলিলেন,—'বয়স্য, পরাজিত করিতে পারি বা না পারি, নিয়তির বিধান চিরদিনই অলঙ্ঘনীয়। কারণ নিয়তি স্ত্রীজাতি।'

'দেখা যাক' বলিয়া স্কন্দ পাশা ফেলিলেন। ইহা আমাদের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইবার প্রায় তিন মাস পূর্বের ঘটনা। (ক্রমশঃ)

ত্তর বার্লিনে এক সপ্তাহ

ডক্টর সুবোধ মিত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ড্যালেরণের ওখানে সান্ধ্য ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। খাবার পর ডালেরণ পরিবারের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হ'ল। মিঃ

প্রফেসর ডক্টর ষ্টিকেল (বার্লিন) ও ডক্টর সুবোধ মিত্র

ডালেরণ যুদ্ধের বেশীর ভাগ সময়েই রাশিয়ান ফ্রন্টে কাটিয়েছিলেন। জার্ম্মানীর সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। অকপটে স্বীকার করলেন যে

হের ফন্ ডালেরণ পরিবার

জার্ম্মানীতে ইহুদীদের উপর একটু বেশী মাত্রায়ই অত্যাচার করা হয়েছিল, যদিও ইহুদীপ্রীতি এঁর এবং অন্যান্য জার্ম্মানদের একটুও নেই। এঁদের মতে হিট্‌লার ইহুদীদের নৃশংসভাবে না মেরে ফেলে শুধু জার্ম্মানী থেকে তাড়িয়ে দিলেই ভাল কর্ত্তেন। হিট্‌লারের উপর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এখনও বেশ বর্ত্তমান। ফুরার সম্বন্ধে কথা বল্‌তে বল্‌তে গলার স্বর বেশ নরম হ'য়ে আসে।

মিঃ ডালেরণ বল্‌লেনঃ "যুদ্ধে হারজিত আছেই; আমরাও ত' জিত্‌তে পারতাম। আজ আমরা হেরেছি, আজ আমরা সর্ব্বহারা।

লুবলিং ক্যাম্পে জার্মানদের কীর্তি

(অর্ধমৃতদের গভীর খাদে নিক্ষেপ করা হইতেছে)

এর উপযুক্ত শাস্তি আমরা মাথা পেতে নিচ্ছি এবং যতদিন প্রয়োজন হয় নেব। এ শাস্তি আমাদের প্রাপ্য, কেননা আজ আমরা পরাজিত। এর জন্য যে হিট্‌লারই দোষী তা নয়, এ আমাদের ভাগ্য। আজ রাশিয়াও ত' হেরে যেতে পারত।"

কিছুক্ষণ পরে মিঃ ডালেরণ আবার বল্‌লেন "আজ আমাদের যা অবস্থা হয়েছে, তাতে আমরা সব সহ্য কত্তে পারি। কিন্তু রাশিয়ানদের অত্যাচার আমাদের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দিচ্ছে; এ অত্যাচারের যে শেষ কোথায় তাও জানি না।"

কথায় কথায় ভবিষ্যৎ যুদ্ধের কথা উঠ্‌ল; মিঃ ডালেরণ স্থির কণ্ঠে বল্‌লেন: "যদি রাশিয়ানদের অত্যাচার এই ভাবে চলে—তা হ'লে যুদ্ধ নিশ্চিত। অবশ্য যুদ্ধ হবে রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার; জার্ম্মানরা সেদিন মরিয়া হ'য়ে লড়বে রাশিয়ার বিরুদ্ধে শুধু তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য। যে ভাবে আজ তারা বাস করছে এ ভাবে আর বেশীদিন চল্‌লে রাশিয়ার নির্ম্মম অত্যাচারে তাদের বেঁচে থাকাই সমস্যাজনক হয়ে উঠ্‌বে। হয় তৃতীয় যুদ্ধ অনিবার্য্য, আর তা না হ'লে সমস্ত জার্ম্মানী তথা সমস্ত ইউরোপকে কম্যুনিষ্ট হ'তে হবে।"

এতক্ষণ মিঃ ডালেরণ রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। এইবার একটু দম নিয়ে আবার বল্‌তে আরম্ভ করলেন: "আপনারা ইহুদীদের উপর অত্যাচারের কথা শুনে আমাদের খুবই ঘৃণা করেন সত্য এবং আমরাও আমাদের কৃতকার্য্যের জন্য সত্যিই ঘৃণার পাত্র। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি যে ঝোঁকের মাথায় হিট্‌লার খুব অন্যায় কাজই করেছিলেন এবং তার জন্য আমরা সকলেই দায়ী; কিন্তু আমাদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে তার খবর রাখেন কি আপনারা? যে অনুপাতে ইহুদীরা জার্ম্মানীতে অত্যাচারিত হয়েছিল, তার বহুগুণ সংখ্যায় এবং কঠোরতায় পোলাণ্ডের জার্ম্মানরা বিধ্বস্ত হয়েছে; জেকোস্লোভাকিয়ায়, হাঙ্গারীতে এবং যুগোস্লাভায় জার্ম্মানদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে।"

বার্লিনের একটী বিখ্যাত অংশ (Hallesches Tor) (যুদ্ধ-পূর্ব্ব অবস্থা)

বার্লিনের একটী বিখ্যাত অংশ (Hallesches Tor) (যুদ্ধোত্তর অবস্থা)

মিঃ ডালেরণ অবশেষে বললেন: "কিন্তু এসব ভেবে আর কি হবে? আমি জীবনটাকে realistic ভাবেই নিই। যতদিন বেঁচে আছি, আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে যাব; তারপর যা হয় হোক; সবই মাথা পেতে সহ্য করে যাব।"

*   *   *

মিসেস্ ডালেরণ এক প্রকার চুপ করেই ছিলেন এতক্ষণ। এইবার বল্‌লেন: দেখুন, আমার জীবনে আর কোনই optimism নেই। জীবনের ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে তারপর আর কিছুই প্রত্যাশা করি না। সবই ত' ছিল, আজ কিছুই নেই। আবার যদি সুযোগ ও সুবিধা হয় তাহ'লেও আর ঘর সাজাবার স্পৃহা নেই। মিসেস্ ডালেরণ শুধু নন্—বেশীর ভাগ জার্ম্মান মেয়েদের ভিতর এই রকম একটা অস্বাভাবিক নৈরাশ্য, একটা নিদারুণ ব্যর্থতা দেখতে পাওয়া যায়। এদের ভেতর এমন কেউই নেই যে স্বামী, পুত্র অথবা নিকটতম

আত্মীয় হারায় নি ; তারপর যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সঙ্কটে এদের জীবন আরও বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। তাই এই স্বামীপুত্রহারার দল এমন একটা সর্ব্বহারার পর্য্যায়ে এসে পড়েছে। জীবনের আশা ভরসা এবং মাধুর্য্য এদের কাছে অবাঞ্ছিত হ'য়ে পড়েছে।

যুদ্ধের অব্যবহিত পরে জার্ম্মানীতে এমন একটা সময় এসেছিল যখন আহার্য্য, পরিধেয় এবং বসতবাটীর অকুলন চরম অবস্থায় পৌঁচেছিল। টাকার দাম কমে যাওয়ায় কালো বাজারে টাকা দিয়ে জিনিষ কেনা যেত না ; জিনিষের পরিবর্ত্তে জিনিষ পাওয়া যেত। এই সব জিনিষের ভেতর সিগারেটই ছিল সবচেয়ে ঈপ্সিত জিনিষ। আহার্য্য থেকে আরম্ভ করে এ হেন জিনিষ ছিল না যা সিগারেটের পরিবর্ত্তে না পাওয়া যেত। বাড়ীতে সোনা রূপার জিনিষ যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, যথাসর্ব্বস্ব এমন কি কার্পেট পর্য্যন্ত দিয়ে সকলে সিগারেট সংগ্রহ করতো। এই সিগারেট সংগ্রহ করতো ধূমপানের জন্য নয়, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সুবিধার জন্য! এক একটা সিগারেটের পরিবর্ত্তে চর্বি, মাংস, আলু সবই পাওয়া যেত। এক সপ্তাহ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সাধারণ লোকে যে অর্থ উপার্জ্জন করত, তার মূল্য এক প্যাকেট সিগারেটের চেয়েও কম। এই সিগারেট-পাগলামী এত বেড়ে উঠেছিল যে আমেরিকান টমিরা

প্রাচীন বার্লিনের একটি রাস্তা

(Petri Street)

(যুদ্ধ-পূর্ব্ব অবস্থা)

প্রাচীন বার্লিনের একটি রাস্তা

(Petri Street)

(যুদ্ধোত্তর অবস্থা)

বিশ্ববিখ্যাত প্রফেসররা একজোড়া পুরাণো জুতা, একটা পুরোণো সোয়েটার এবং কিছু খাবার চর্বির জন্য আমাদের কাছে কত কাকুতি মিনতি করে লিখেছিলেন। জার্ম্মান টাকার দাম খুবই কমে গিয়েছিল। কালোবাজার পুরাদমে আরম্ভ হ'য়েছিল। এই সময় বার্লিনে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে।

সিগারেটের বদলে যা চাইত তাইই পেত। বর্ত্তমানে অবশ্য আমেরিকা নিয়ন্ত্রিত জার্ম্মান টাকা হওয়ায় এবং সিগারেটের প্রচুর আমদানী হওয়ায় এই অস্বাভাবিক অবস্থা আর নেই।

খুবই আকস্মিক ভাবে আমার একজন পুরাতন জার্ম্মান বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁর ঠিকানা আমার জানা ছিল না। একটি বইয়ের দোকানের মালিককে একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমার বন্ধুর কথা বলেছিলাম; তিনিই সন্ধান দিলেন যে আমার বন্ধু বোধহয় রাজস্ব বিভাগে কাজ করেন। ইনি এখন বার্লিনের অর্থনৈতিক বিভাগের একজন ডিরেক্টর। প্রথম যুদ্ধে একজন অফিসার ছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে যোগদান করেন নি; এমন কি তিনি হিটলারের নাৎসি পার্টিভুক্তও ছিলেন না। এঁর মত সুপণ্ডিত দেব-চরিত্র জার্ম্মান খুব কমই দেখেছি। জীবনের উপর দিয়ে তাঁর বহু ঝড় বয়ে গেছে; আঘাতের পর আঘাত পেয়ে যেন খাঁটী সোনা হয়ে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর প্রথম অনুযোগ হ'ল কেন আমি তাঁর চার পাঁচখানা চিঠির উত্তর দিই নি? কিন্তু যখন শুনলেন যে তাঁর একখানা চিঠিও আমার হস্তগত হয় নি তখন বললেন—খুব সম্ভবতঃ জার্ম্মান মিলিটারী অফিস চিঠিগুলো নষ্ট করে ফেলেছিল। জিজ্ঞাসা করলাম: "ওই শক্তিমান নাৎসি পার্টির ভেতর কী করে তুমি তোমার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলে?"

বললেন: "সে আর জিজ্ঞাসা কোরনা। বেঁচে আছি সেইটাই আশ্চর্য্য। এমন দিন ছিল না যেদিন কোন-না-কোন ভাবে নির্য্যাতিত না-হয়েছি। বোধহয় আমার দায়িত্বপূর্ণ কাজই আমায় বাঁচিয়ে রেখেছিল। অবশ্য নাৎসি পার্টিভুক্ত নয় এরূপ লোকের সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিল না; তাদের অনেককেই 'ডেশাও' কিংবা 'লুবলিং'এর Concentration Campএ জীবনপাত করতে হয়েছে। উকীল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর এবং পত্রিকা সম্পাদক কেউই বাদ পড়েন নি।"

হাঁসপাতালের কাজ ছাড়া অবশিষ্ট সময়ের বেশীর ভাগটাই এই বন্ধুর সঙ্গে কেটে যেত। কোনও লৌকিকতার বালাই ছিল না। খোলাখুলি-ভাবে হিটলারের নাৎসি জার্ম্মানীর আলোচনাই হ'ত বেশী। বলতেন: "হিটলারের সময় জার্ম্মানীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয়েছিল বটে, কিন্তু সাধারণের স্বোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবার উপায় ছিল না। সর্ব্বদাই একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় দিন কাটাতে হ'ত। কখন এবং কি কারণে যে ডাক পড়বে তা কারুরই জানা নেই। ভোর রাত্রে দরজায় ধাক্কা পড়ল, বোঝা গেল ডাক এসেছে, না বলবার উপায় নেই; সেই সময়ই স্ত্রী-পুত্রের নিকট থেকে চিরবিদায় নিয়ে যেতে হবে, কারণ—হয়ত বা আর ফিরবে না।"

"আজ আমরা রাশিয়ার অত্যাচারের জন্য অভিযোগ করছি, কিন্তু এই অত্যাচারের নমুনা ত নাৎসিরাই দেখিয়েছে।"

এ বিষয় কোনই সন্দেহ নেই। কী ভাবে যে এই নাৎসি জার্ম্মানী ইহুদী এবং বিপক্ষ দলের উপর নৃশংস ভাবে অত্যাচার করেছে তা ধারণারও অতীত। 'ডাশাও' এবং লুবলিং' ক্যাম্পে স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুরা

লুবলিং Concentration Campএ জার্মানদের কীর্ত্তি—হাজার হাজার নরনারী ও শিশুর কঙ্কাল

পিঁপড়ের মত মরেছে। লুবলিং ক্যাম্পের অত্যাচার আরও ভীষণ ছিল; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই একই পথের পথিক হ'তে হয়েছিল—অনশন, অনিদ্রা, নৃশংস প্রহার, গ্যাস ঘরে ঢুকিয়ে হত্যা, অর্দ্ধমৃতদের উঁচু স্থান থেকে গভীর খাদে নিক্ষেপ, সবই অতি সুচারুভাবে জার্ম্মান দক্ষতার সঙ্গেই করা হয়েছিল। মানুষ যখন ধাপে ধাপে নীচের দিকে নামতে আরম্ভ করে তখন কত নীচ যে হ'তে পারে তা কল্পনাতীত।

ব্রিটিশ ও আমেরিকা নিয়ন্ত্রিত জার্ম্মানীর অংশ আজ শাপমুক্ত; তারা সর্ব্বহারা হ'লেও আজ স্বোয়াস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলতে পাচ্ছে; রাত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পাচ্ছে এবং মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকবার সবচেয়ে যে বড় জিনিষ সেই সহজ ও স্বাভাবিক চিন্তাধারার স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে। অদ্ভুত এই জাতটার কর্ম্মপ্রেরণা এবং কর্ম্মশক্তি। এই অল্প সময়ের মধ্যে ধ্বংস স্তূপের ভেতর থেকে এক্সরের যন্ত্র, মাইক্রসকোপ, ক্যামেরা, ওষুধ এবং অন্যান্য যে সব বৈজ্ঞানিক জিনিষ-পত্র তৈরী করেছে তা একমাত্র এই জার্ম্মান জাতির পক্ষেই সম্ভব।

ভদ্রাচলামের ক্যাম্প

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

(শিকার-কাহিনী)

(পূর্বানুবৃত্তি)

মতলব খুঁজছিলাম কি ভাবে শিকারে বসা যায়। একটি নকল ঝোপ করলে তার ভিতর কতকটা আত্মগোপন করা চলে—কিন্তু খ্যাওড়া গাছ এত বেঁটে যে স্বাভাবিক গঠন বজায় রাখতে হলে মাটিতে গর্ত্ত করতে হয়—তাতেও অসুবিধার কিছু নেই—কিন্তু গুলি খেয়েও যদি বাঘ আড়ালের উপর লাফিয়ে পড়ে তাহলে রিপোর্ট লেখার সুবিধা পাওয়া যাবে না। একমাত্র উপায় মোটা বাঁশের খাঁচা করে—খ্যাওড়া গাছ আড়াল দিলে সব দিক রক্ষা হয়।

সিদ্ধান্ত কাছে আসতেই হুকুম বেরিয়ে গেল। মাচানের মাল-পত্র যোগাড় হতে সময় লাগল না। মড়া আগলাবার লোকগুলি এক জায়গায় বসে আছে, এখুনি বেরিয়ে পড়া ভাল।

বাঘের আনা-গোনার পথ জানতাম, মওড়ার দিকে বন্দুকের নল বার করার ব্যবস্থা করে—খাঁচা তৈরী হয়ে গেল। ছেলেটার যেটুকু অংশ পড়েছিল তাই ইস্পাতের তার (flexible steel wire) দিয়ে একত্রিত করে ঝোপের গোড়ার সঙ্গে কষে বাঁধিয়ে দিলাম। কঠিন দড়ির প্রয়োজন ছিল, কারণ বেশীর ভাগ সময়ে দেখেছি, সামান্য সন্দেহের কারণ থাকলে—নির্ব্বিঘ্ন হবার জন্য বাঘ খাওয়া-শিকারকেও ধরেই লাফ মারে—এবং ভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে খায়।

রোদ পড়তে দেরী নেই—লোকজনদের বিদায় করে দিয়ে খাঁচার ভিতরে ঢুকে পড়লাম। সরঞ্জাম গুছানর কাজ দ্রুত সেরে ফেলে, সর্ব্ব প্রথম, বাঁ দিকের বুক পকেটে পিস্তল পুরে দিলাম। মুহূর্ত্তে বের করে ফেলার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। মাটিতে বসলে সব সময় বাড়তি সাবধানতার গা ঘেঁসে থাকা আমার অভ্যাস।

অল্পক্ষণের ভিতরই আবেষ্টনী নিঝুম মেরে আসতে লাগল। গোধূলীর শেষ আলোয় বালি মাটি সোনা হয়ে গিয়েছে। নিরিবিলিতে ঝোপের আশে পাশে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক সুরু হয়েছে—তার সঙ্গে কুয়াসার পর্দা ঘন হয়ে উঠছে। দিনের আলো শেষ হতেই অন্ধকার যেন তেড়ে এল আমাকে ঘিরে ফেলার জন্য। ঘের ভাল ভাবেই পড়ল। ঝোপের ভিতর নিজের হাত পর্য্যন্ত দেখা যায় না। ঠিক এই সময় দূরে ফেউএর ডাক শুনলাম। যে দিক থেকে বাঘের আগমন প্রতীক্ষা করছিলাম সেই দিক থেকেই রাজদূতের ঘোষণা আসছিল।

ক্রমান্বয়ে বিপদ শঙ্কেত কাছে এসে পড়ল,—খুবই কাছে। উত্তেজনা চরমে উঠে গিয়েছে তার সঙ্গে হৃদস্পন্দন। টর্চ সংযুক্ত রাইফেল প্রস্তুত, ছেলেটার কাছ থেকে একটা কোন চেনা শব্দ শুনলেই অস্ত্র কাঁধে তুলে নি। অপর দিকে ফেউএর ডাক, আর এগুতে চায় না। একই জায়গা থেকে করুণ স্বর তুলে চলেছে। ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে গেল। প্রায় আধঘণ্টা সময় এইভাবে কেটে গেল। নতুন ঘটনার কোন সূত্রপাত নেই।

ফেউএর ডাক হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেল—তারপর আওয়াজ আসতে লাগল আমার ক্যাম্পের দিক থেকে। বাঘ তা হলে আমাদের চালাকি ধরে ফেলেছে—ক্যাম্পের দিকেই রওনা হয়েছে—কে জানে আজ আবার কাকে নেবে।

ঘণ্টা দেড়েক সময় পার হয়ে গেল—একই ভাবে বসে আছি, পায়ে ঝিনঝিনি ধরে গিয়েছে, সিগারেটের জন্য প্রাণ আনচান, শেষ পর্য্যন্ত দুত্তোর বলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। ভাবলাম আশাকে বাড়ন্তের দিকে এগিয়ে দিয়ে ঝকমারি পোহানয় কোন লাভ নেই। বাঘ আর ফিরছে না—একটা সিগারেট ধরিয়ে নেয়া যাক। বন্দুক বগল থেকে নামাতেই বাঁট কিছুর সঙ্গে সংঘর্ষণে খটাং করে আওয়াজ হল। পা দুটোকে আরাম দেবার চেষ্টায়—নড়ে বসতে গিয়ে—জলপাত্রকে (flask) উল্টে ছিলাম প্রায়। কি ভাবে তা সামলে ছিলাম মনে নেই। মোট কথা মৃৎ গহ্বরের মাচানে যেটুকু শব্দ হল তাকে জমাট নিস্তব্ধতার মাঝে হৈ-চৈ বলা চলে। সিগারেট বার করে দিয়াশলাই জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার উঠল, পর মুহূর্ত্তে, আমার মাচানের উপর যেন পাহাড় ধসে পড়ল। পায়ের তলায় দিয়াশালাইএর বাক্স চাপা পড়লে যে অবস্থা হয় মাচান সেইভাবে মড় মড় করে চেপটে গেল। ছাউনী মাথায় না ঠেকলেও সামনের বেড়া প্রায় গায়ের উপর ঝুঁকে পড়েছে, বাঘের মুখ ঠিক আমার মুখের সামনে, ভয়াল ক্রোধ প্রকাশ কালীন—বিকট গন্ধযুক্ত মুখের লালা আমার কপাল, চোখ, নাক, কানের উপর ছড়িয়ে পড়ছে। এই সময় যে কয়টা গলা খাকরানি শুনেছিলাম তার বর্ণনা দেবার শক্তি আমার নেই। আমার তৎকালীন মনোভাব বুঝতে হলে অভিজ্ঞতাটি নিজে সংগ্রহ করে নিতে হয়।

ঐটুকু সময়ের ভিতর, কিভাবে পিস্তল বার করেছিলাম, কিভাবে ঘোড়া টিপেছিলাম, কোন দিকে নল ছিল কিছুই মনে নেই। এইটুকু বলতে পারি পিস্তল ছুটেছিল। পিস্তলের আওয়াজে আশ্রয়ের সাড়া পেলাম—নিজেকে খোঁজার সুবিধা যুটল। ঘটনার আলোড়নে—ক্ষণিকের জন্য বেহুঁসের মত হয়ে গিয়েছিলাম।

পিস্তল ছোটার পর—অনেকটা সময় কেটে গেল। অতি সন্তর্পণে বন্দুকের বাঁট খুঁজতে লাগলাম, বহু কষ্টে ছোঁয়া পেলাম কিন্তু কাছে আনার উপায় নেই, কিসের বাধায় আটক পড়েছে—টানাটানি করতে

গেলে নতুন শব্দে আবার কি ঘটবে তার ঠিক নেই। অস্ত্রটিকে বাতিলের মধ্যে ফেলে দিলাম।

পলে পলে সময় কেটে যেতে লাগল—যে কোন সময় আহত শার্দ্দুলের প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হয়ে আছি। গুলি খেয়ে মাচানের সামনেই পড়ে আছে কিনা জানবার উপায় নেই। অন্ধকার, দূর ও কাছের কোন পার্থক্য রাখে নি। ঠায় জেগে রাত কেটে গেল।

ফরসা হতেই ঝোপের ফাঁক দিয়ে চার ধার দেখে নিলাম, কোথাও বাঘকে দেখতে পাওয়া গেল না। মাচানের অবস্থা আমাকে বিস্মিত করে দিল—ভাবতে লাগলাম,—বেঁচে গেলাম কেমন করে। বন্দুক রাখার গর্ত্তটি হাত দুই ফাঁক হয়ে গিয়েছে—অস্ত্রটির নল ব্যবহারে বাতিল হয়ে গিয়েছে—তার উপর এসে পড়েছে মাচানের ছাউনী। বাহিরে আসার পথও বন্ধ। মাটিতে গলা পর্য্যন্ত গর্ত্ত না থাকলে বাঘের ওজনসহ মাচানের চাপেই দম বন্ধ হয়ে মারা পড়তাম।

ক্যাম্প থেকে লোকজন আসার অপেক্ষায় বসে রইলাম। রদ্দুর উঠতে জনতার কোলাহল শোনা গেল। ওরা নিকটে আসতে বুঝলাম আর্দ্দালী দুঃসাহসিক কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আগুয়ান হয়ে আছে—জোর হুকুম চলেছে—ইধর নেহি উধার, লে জলদি চলো,—কুছ ডর নেহী, আগে চলো—আরো কত কি কথা। মানুষের কলরবের সঙ্গে গো জাতীয় জন্তুর ক্ষুরধ্বনিও শুনলাম। নিশ্চয় মোষ, আর্দ্দালীর বডিগার্ড (body guard) লোকেদের চেষ্টায় স্বখাত কবর থেকে বেরিয়ে এলাম।

ছেলেটার মুখ ফুলে উঠেছে, আজ রাত থেকেই পচতে আরম্ভ করবে। অন্য জায়গায় সুবিধা মতন মাচান করে, গলিত মাংসকে শিকারের টোপ হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না। যে ভাবেই বাঁধা যাক, গলা মাংসের উপর সামান্য টান পড়লেই হাড় খুলে যাবে।

বাঘ কি ভাবে এসেছিল দেখবার জন্য কুতূহলী হয়েছিলাম। জায়গাটা পরীক্ষা না করে পারলাম না। দুচার কদম ঘুরতেই দেখি, বহুবার আমার মাচান প্রদক্ষিণ করেছিল। সন্দেহ গাঢ় হয়ে উঠলেও শেষ পর্য্যন্ত লোভ সামলাতে পারে নি। যে সময় ছেলেটার কাছে এসে পড়েছিল সেই সময় আমার মাচানে নানা রকম শব্দ হয়। একে আহারে বিঘ্ন, তার উপর মানুষের তৈরী সন্দেহজনক শব্দে বাঘ আমার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। আক্রমণের চরম কারণ ঘটল দিয়াশালাইএর আলোয়।

আমার স্নায়ু একটু কড়া ধরণের। রাত্রের ঘটনার পরেও শিকারের সখ বা কর্ত্তব্যকে বাতিল করতে পারি নি। নানা ফন্দি মাথায় ঘুরতে লাগল। এই সময় আর্দ্দালী এসে আমার সামনে দাঁড়াল, প্রার্থনা, লম্বা ছুটি চাই, ছেলের ভারী অসুখ। খবর এসেছে চিঠিতে। একটি পোষ্ট কার্ড আমার সামনে ধরে দিল—হরফ তার ফারসি। কার্ডের খবর না পড়তে পারলেও ডাকের তারিখ দেখলাম গত মাসের, বললাম—চিঠির বয়স যে এক মাসের কাছাকাছি। অকাট্য নথী বেফাঁস হয়ে যায় দেখে অম্লান বদনে বলে বসল,—এতদিনে বাড়াবাড়ি হয়ে থাকবে। লোকটার কথায় কান না দিয়ে আহারে মন দিলাম। সকালের খানা আর্দ্দালীই নিয়ে এসেছিল। আমার বৃহত্তর কর্ত্তব্যে বিঘ্ন ঘটাতে আর সাহস পেল না।

তিনদিন কেটে গেল কোন খবর নেই। ক্যাম্প তোলার আদেশ দিয়ে দিলাম। সদর আপিস এখান থেকে একত্রিশ মাইল। একদিনে এতটা পথ হেঁটে পাড়ী দেয়া সম্ভব নয়, মাঝ পথে ষ্টেশনের কাছেই তাঁবু ফেলার ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল। ষ্টেশনও এখান থেকে কম হলেও পনের মাইল হবে।

ব্রেক ফাষ্টের পরেই বেরিয়ে পড়া গেল। গন্তব্য স্থানে যখন এসে পৌঁছালাম, তখন বেলা দুপুর।

আমাদের তাঁবু খাড়া করার ব্যবস্থা চলেছে, ঘোড়াটাকে বটের ছায়ায় বেঁধে আমিও ক্যাম্প চেয়ারে বসে বিশ্রাম করছিলাম। আমার পিছনেই খানিকটা জঙ্গলের মত। জঙ্গল একেবারে ষ্টেশন প্ল্যাট-ফরমের গা ঘেঁসা। ঘোড়াটা থেকে থেকে অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। কখন ক্ষুর দিয়ে মাটি উপড়ে ফেলে, কখন ডাক দিয়ে ওঠে, কখন বাঁধন ছিঁড়ে পালাবার পথ খুঁজতে থাকে। কিছু না হোক লেপার্ড এসে আমার বাহনটিকে জখম করে দিলেই তো চমৎকার। আর্দ্দালীকে বললাম, ঘোড়াটাকে জঙ্গলের ধারে না রেখে লোকজনের কাছে বেঁধে দাও। আর্দ্দালী খানিকটা পথ এগিয়েই—এমন ভাবে ফিরে এল যাতে মনে হয় ওর ওপরই বাঘ লাফিয়ে পড়তে চেয়েছিল। বাস্তবিকই সে ভয়ে বাক্যহীন হয়ে গিয়েছিল। কয়েক দিন ধরে ওর ব্যবহার দেখছি, ভয়ের ন্যাকামি অসহ্য হয়ে উঠেছে। কোন কথা না শুনে ধমক দিয়েই বললাম—ঘোড়া এদিকে নিয়ে এস—সঙ্গে সঙ্গে তাঁবু গাড়ার কুলীরা চেঁচিয়ে উঠল পুলী, পুলী (বাঘ)। আর্দ্দালী তখন একেবারে আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে অফিসিয়াল সব কেতা চুরমার করে। ঘোড়ার জীনে লাগান চামড়ার খাপে ম্যাগাজীন রাইফেল ঢোকান ছিল। পায়ের তলাতেই তখনো সেটা পড়ে। অস্ত্র বার করে নিয়ে জঙ্গলের দিকে এগুলাম কোথাও কিছু নেই, ঘোড়ার অস্থিরতাও থেমে গিয়েছে। লোকেরা বললে প্রকাণ্ড বাঘ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ঘোড়ার দিকে আসছিল, সকলে দেখেছে।

আমাদের আড্ডায় গোলমাল থেমে যাবার কিছুক্ষণ পরেই ষ্টেশন মাষ্টার আট দশ জন লোক সঙ্গে নিয়ে হন্ত দন্ত হয়ে এলেন আমাদের দিকে। নিকটে এসেই জানালেন তাঁহার সিগন্যালারকে ঘণ্টা তিন আগেই বাঘে মেরেছে। বাঘ তাড়া খেয়ে মানুষটাকে ছেড়ে পালায়, সিগন্যালার এখনও একই জায়গায় পড়ে আছে।

রাইফেল নিয়ে উঠলাম। ঘটনাস্থলে এসে দেখি মরা লোকটির স্ত্রী ও পুত্র শোকে অভিভূত। চার ধারে গ্রামের লোক জড় হয়েছে। লোক সরিয়ে, বাঘকে সনাক্ত করার চেষ্টা করলাম। পায়ের দাগ পাওয়া গেল না। ভীড়ের উৎপাতে সব একাকার হয়ে গিয়েছে। শোকের মাঝে লাস চাইতে দ্বিধা আসছিল কিন্তু কর্ত্তব্যের খাতিরে কঠোর হতে হল। ষ্টেসন মাষ্টারের চেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত সিগন্যালারের স্ত্রী রাজি হয়।

যেখানে মানুষটিকে ছেড়ে পালিয়েছিল—তার কাছেই দরজাহীন গুমটি ঘর। আবার মাটিতে! কিন্তু অন্য উপায়ই বা কি আছে,—কাছাকাছি কোন বড় গাছ নেই। তখন জীদও চেপে গিয়েছিল। মাটিতেই বসব ঠিক করে ফেললাম।

এবার আর বাঁশের আড়াল নিচ্ছি না, ষ্টেসন মাষ্টারকে জানালাম একটি বড় সড় ময়লা ও শক্ত কাঠের তক্তপোষ চাই। এ অঞ্চলে অত বড় সৌখিনতায় কেহ অভ্যস্ত নয়, মাষ্টার মশাই মাথা চুলকে বললেন "আমারটাই পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

তক্তপোষ আসতে চারটি মোটা ডালও সংগ্রহ হয়ে গেল। ঘরের ভিতর থেকে চাড় দিয়ে তক্তপোষের উপর ঠেকা লাগাব বলে। তখুনি, আশ্রয়ের পরীক্ষা করে নিলাম। ভিতর থেকে ঠেকা দিয়ে বললাম—পাঁচ ছয় জনে ছুটে এসে ধাক্কা লাগাও। পরীক্ষায়, আড়ালের শক্তি পাশ করে গেল। ঠেকা সরিয়ে বেরিয়ে এলাম। ঠিক আছে অন্ধকারে দরজা খোলা কি বন্ধ বোঝা যাবে না। মোটা খুঁটি পুঁতিয়ে লোকটাকেও তার দিয়ে বাঁধালাম। খুঁটিকে লতা পাতা দিয়ে ঢেকে এবং নিয়মিত পাহারার ব্যবস্থা সেরে ক্যাম্পে ফিরলাম।

বিকেল পার হতেই শিকারের জায়গায় আসতে হল। ধারণা জন্মেছিল একটু নিরিবিলি পেলেই বাঘ এদিকে এসে পড়বে।

বন্দুকের নল বার করার জায়গা খালি রেখে—আড়াল মজবুৎ করে ফেলা হল। লোকজনদের চলে যেতে বললাম।

লোকেদের সঙ্গে শেষের ট্রেণও বিদায় হল। ষ্টেশন জনমানব শূন্য, দূরে রাখাল গরু চরিয়ে গ্রামে ফিরছে—কখন সখন কুকুরের ডাক শুনছি। সন্ধ্যা ধীরে এগিয়ে আসছে,—অল্পসময়ের ভিতরই অন্ধকার রাজ্য বিস্তার করে ফেলল। তক্তার ফাঁক দিয়ে মরা মানুষটাকে দেখতে পাচ্ছি—আকার অস্পষ্ট হলেও—বোঝার কোন অসুবিধা নেই। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা রাতের দিকে হেলে পড়ল। এমনি সময় ষ্টেসন ঘেঁসা গ্রামে—এক সঙ্গে অনেকগুলি কুকুর ডেকে উঠল—তার সঙ্গে যোগ পড়ল মানুষের চিৎকার। একটু পরেই গোলমাল থেমে গেল। বুঝলাম চিতাবাঘ বেরিয়েছে কেলেঙ্কারী না করে বসে। ঘুরতে ঘুরতে এদিকে এসে পড়ল। সাজান আহার সামনে পেয়ে যাবে—আসল শিকারে বিঘ্ন ঘটিয়ে দেবে।

অভিজ্ঞতা অল্পক্ষণেই প্রামাণিক হয়ে গেল, ঠিক আমার পিছনেই চিতার ডাক শুনলাম। মিনিট তিন চার পরেই মাংস ছেঁড়ার আওয়াজ আসতে লাগল। অতি নিকটে একটা মানুষকে খেয়ে চলেছে, আর আমি রাইফেল হাতে নির্লিপ্তের মত বসে আছি। গত্যন্তর ছিল না একবার বন্দুক চললে নরভুক্‌কে আর পাওয়া যাবে না।—শেষ পর্য্যন্ত শিকারীর ধৈর্য্যকে আর পরীক্ষার মধ্যে রাখা গেল না।

সন্তর্পণে দাঁড়ালাম, তক্তপোষের পিছনে। বন্দুকের নল ধীরে উপরের খালি জায়গা থেকে বার করে শব্দের দিকে ঘোরালাম। সবে আলোর সুইচ টিপেছি—সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম বুক ফাটিয়ে দেয়া বড় বাঘের ডাক—পরমুহূর্ত্তে লেপার্ড আর মানুষ আড়াল পড়ে গেল। আলোর মাঝ পথে দেখলাম বাঘ, শূন্যে উড়ছে। ঘটনাগুলির সঙ্গে একই সময় যোগ দিল টিগ্রারের (বন্দুকের ঘোড়া) উপর আমার আঙ্গুলের চাপ। গুলি বেরিয়ে গেল।

কেমন করে বিনা নিশানায় গুলি চালিয়েছিলাম আমারমনে নেই। ধোঁয়া কেটে যেতে দেখলাম, হিংসার প্রতীক, মহাশক্তিশালীর ভয়ঙ্কর রূপ—অসাড় অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেল—মাত্র কয়েক হাত দূরে। সুধু বাঘ নয় চিতাও—ধীরে মানুষটার মুখের উপর নেতিয়ে পড়ল। টর্চের আলো তখনো জ্বলছে—পুনরায় গুলি চালাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম কিন্তু প্রয়োজন হল না, দুটোই মরেছে। এক গুলিতে দুই শিকার!—বাহবা পেলাম যথেষ্ট,—কেউ জানল না আসল শিকারী আমার কপাল।

পশ্চিম বাঙলায় লবণ উৎপাদনের পটভূমিকা

শ্রীসন্তোষকুমার রায়চৌধুরী

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক-সরকারের পক্ষ হইতে পশ্চিম বঙ্গ ও উড়িষ্যার সমুদ্রউপকূলে লবণ প্রস্তুতের বর্ত্তমানে কোন সম্ভাবনা আছে কিনা বা উৎপন্ন লবণ দ্বারা ঐ প্রদেশগুলিকে লবণের দিক হইতে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে বলিয়া প্রকাশ। পশ্চিমবঙ্গে এই আন্দোলন আজ নূতন নয় আর অপ্রত্যাশিত নয়—বরঞ্চ এই প্রদেশের লবণ শিল্প এককালে যথেষ্ট সমৃদ্ধই ছিল। সেই সমৃদ্ধি আজ নাই সত্যই, কিন্তু আছে অধিকতর উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী আর আছে আমাদের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের তাগিদে ও সেই সঙ্গে অনুকুল পরিবেশে লবণ প্রস্তুতের এই আন্দোলন নিশ্চয়ই সার্থক হইবে।

খ্রীষ্ট জন্মের ৩০০ বছর পূর্ব্বে মৌর্য্যবংশের রাজত্বকালেও বাঙলায় লবণ প্রস্তুত হইত। মিঃ এফ, এইচ, ম্যানহান তাহার 'বাঙলার প্রাচীন ইতিহাসে' মৌর্য্যবংশের ইতিহাস সম্বন্বিত 'অর্থশাস্ত্র' নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে—সেই প্রাচীন যুগেও এদেশে সরকারী তত্ত্বাবধায়ক লবণাধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে লবণ উৎপন্ন হইত এবং উৎপন্ন লবণের উপর কিছু করধার্য্য করিয়া উহার ব্যবসায়ের অনুমতি দেওয়া হইত। ('দি সল্ট ইণ্ডাষ্ট্রী ইন ইণ্ডিয়া')। তারও পরের যুগে মোগল সম্রাটগণের রাজত্বকালে এই বাঙলায় যে লবণ উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল তাহারও বহু ঐতিহাসিক নজীর পাওয়া যায়। পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে (১৭৫৭) লবণ উৎপাদনের কেন্দ্র হিসাবে সুন্দরবন

খ্যাত ছিল। অবশ্য তখনও তমলুক ও ২৪পরগণার কয়েকটী অঞ্চলে লবণ উৎপন্ন হইত এবং ঐ লবণ উৎপাদনের সহায়তার জন্য কয়েকটী বিশেষ অঞ্চল জ্বালানী কাঠের জন্য বিশেষ ভাবে রক্ষিত ছিল, তখন সমুদ্রের তীরবর্ত্তী অঞ্চলগুলিতে সমুদ্রের জল জ্বাল দিয়া লবণ প্রস্তুতের বিধি প্রচলিত ছিল। লবণ প্রস্তুতকারকদের ও ব্যবসায়ীদের সরকারকে কর দিতে হইত।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে বাঙলা তথা ভারতের স্বাধীনতা লুপ্ত হওয়ার পর ধীরে ধীরে ভারতের বুকে কায়েম হইয়া বসিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী পান। ঐ সালেই ধুর্ত্ত লর্ড ক্লাইব বাঙলার লবণ শিল্পের প্রচলন দেখিয়া লবণ ব্যবসায়ী সমিতি স্থাপন করিতে ও সেই সঙ্গে ঐ ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তাহা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু তিনি উহা সম্ভব করিতে না পারিলেও ওয়ারেণ হেষ্টিংস তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করেন লবণ শিল্পের উপর সরকারী কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়া এবং সেই সঙ্গে লবণ উৎপাদনকে নিজেদের মুঠোর মধ্যে আনিয়া। তখন সমস্ত উৎপন্ন লবণ সরকারকে বিক্রয় করিতে হইত একটা বাঁধা দরে, আর সরকার তাহাই বাজারে ছাড়িতেন দর ঠিক করিয়া দিয়া। ১৭৮০ সালে ওয়ারেণ হেষ্টিংস লবণের এজেন্সী প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহাদের মতে ঐ প্রথার প্রবর্ত্তন ও শিল্পকে সরকারের কুক্ষীগত করিয়া রাখিবার যে দুইটী কারণ ছিল তাহার একটী হইতেছে খাজনা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আর অন্যটী ভারতীয় মহাজনদের হাত হইতে লবণ উৎপাদকদের রক্ষণাবেক্ষণ।" (দি সল্ট ইণ্ডাষ্ট্রী ইন ইণ্ডিয়া)।

বাঙলা দেশে লবণ শিল্পের উপর বৃটিশ বণিকগণের একচেটিয়া অধিকার বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারিল না—বিলাতের লবণ উৎপাদকদের চেষ্টায়। তাহারা বার বার চেষ্টা করিতে লাগিল এদেশের লবণ শিল্প বন্ধ করিয়া দিয়া এদেশে বিলাতে উৎপন্ন লবণ চালু করিতে। তাহাদের আপ্রাণ চেষ্টায় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বাঙলায় প্রথম বাহির হইতে লবণ আমদানী হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে বিলাতে লবণ কর উঠিয়া গেল ও সেইসঙ্গে বাঙলা দেশে বিলাতের লবণ আমদানীর পরিমাণও বাড়িয়া গেল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে অতি সস্তাদরের প্রথম শ্রেণীর চেশায়ার লবণ' (Cheshire Falt) বাঙলা দেশকে ছাইয়া ফেলিল। তবুও ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সমুদ্রের জল ফুটাইয়া লবণ প্রস্তুত করার উন্নততর ব্যবস্থা পরিচালনা করিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এ ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি হয়। সরকার একচেটিয়া অধিকার উঠাইয়া দিয়া স্থানীয় প্রস্তুতকারকগণের উপর আবগারী কর ধার্য্য করেন ও অনুমতি লইয়া লবণ প্রস্তুতের চিঠি প্রবর্ত্তিত করেন। সেই প্রথম বাঙলার লবণ শিল্পের উপর আসিল সরকারী আঘাত। ১৮৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে এদেশে যেখানে ৪৫ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হইত সেখানে সস্তাদরের বিলাতী লবণের প্রতিযোগিতায় করভার ও ব্যয়ভার নিপীড়িত বাঙলার লবণ শিল্প লুপ্ত হইয়া আসিল মাত্র পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে। অবশেষে কূটনৈতিক ব্রিটিশ সরকার তাহার শেষ আঘাত হানিলেন লবণ শিল্পের উপর। "১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এদেশে লবণ উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইয়া গেল।" (ট্যারিফ বোর্ড রিপোর্ট অন সল্ট ইণ্ডাষ্ট্রী ১৯৩১)।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে বহির্বাণিজ্য ব্যাহত হওয়ায় এই প্রদেশে নূতন করিয়া লবণ প্রস্তুতের উদ্যোগ দেখা যায়। কিন্তু নানা কারণে সে প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নাই। পরবর্ত্তীকালে মহাত্মা গান্ধীর লবণ আন্দোলন ও গান্ধী-আরউইন চুক্তি এই শিল্পে অনেকখানি আলোকসম্পাত করে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় লবণ সম্পর্কীয় ট্যারিফ বোর্ডের রিপোর্ট এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত হয় লবণ আইন। তাহার পর হইতে বহু ফার্ম্ম ও বহু ব্যক্তি লাইসেন্স লইয়া লবণ তৈয়ারীর কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। তাহারা মেদিনীপুরের অন্তর্গত পুরুষোত্তমপুর, দাদনপুর, সেরপুর, কাঁথির নিকটবর্ত্তী কাদোয়া ও ২৪পরগণা জেলার কাকদ্বীপে লবণ তৈয়ারীর কার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। যাহা হউক বর্ত্তমান ভারত সরকার "বিনা লাইসেন্সে সর্ব্বোচ্চ দশ একর পরিমিত জমিতে লবণ উৎপাদনের কাজ পরিচালনা করিতে পারিবার সুবিধা দান করিয়া ব্যাপকভাবে লবণের উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া সত্যই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।" (ভারতের খনিজ সম্পদঃ বর্ত্তমানঃ বৈশাখ ১৩৫৬)।

ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে ও তাহারও পূর্ব্বে যাহারা লবণ প্রস্তুত করিত তাহাদিগকে বলিত 'মলঙ্গী'। ইহার উত্তাপের সাহায্যে সমুদ্রের জল হইতে লবণ প্রস্তুত করিত। এক চিল্কা হ্রদ অঞ্চলে করকচ লবণ তৈয়ারী ব্যতীত অন্য কোথাও রৌদ্রের সাহায্যে লবণ প্রস্তুতের বিধি প্রচলিত ছিল না। সমুদ্রতীরবর্ত্তী অঞ্চলে লবণাক্ত মৃত্তিকা হইতে 'পাঙ্গা' নামক একপ্রকার লবণ তৈয়ারী হইত, ব্রিটিশ আমলে প্রায় চল্লিশ হাজার লোক এই ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল।

লবণ উৎপাদনের জন্য সাধারণতঃ যে পরিবেশের প্রয়োজন হয় তাহা হইতেছে বাতাসে কম আদ্রতা, আবহাওয়ার উষ্ণতা, কম বৃষ্টি, বাতাসের অনুকূল গতি ও কাজের সময়ের দীর্ঘতা। (দি সল্ট ইণ্ডাষ্ট্রী ইন ইণ্ডিয়া)। ইহা ছাড়াও আর দুইটী জিনিষের প্রয়োজন আছে। প্রথমটা হইতেছে সমুদ্রের লবণাক্ত জলের গাঢ়তা, আর অন্যটী হইতেছে লবণ উৎপাদনের ভূমির অবস্থা। উপরোক্ত অবস্থাগুলির দিক হইতে পশ্চিম বঙ্গের স্থান কোথায় সেই সম্বন্ধে (শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগের) 'পশ্চিম বঙ্গের লবণ প্রস্তুতি' (বঙ্গশ্রী কার্ত্তিক ১৩৫৫) প্রবন্ধটী হইতে ভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আর্দ্রতা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে নিম্ন বঙ্গের আবহাওয়া লবণ প্রস্তুতির পক্ষে মন্দ নহে, কারণ মাদ্রাজ ও বোম্বাইএর সমুদ্র উপকূলে যেখানে প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হয় সেখানকার আর্দ্রতাও প্রায় এখানকার মত। বরঞ্চ শীতের সময় এখানে আর্দ্রতা কম থাকে।" শুধু আর্দ্রতা নয় আবহাওয়ার দিক হইতেও নিম্ন পশ্চিম বাঙলা কোকনদ ভাইজাগ প্রভৃতি অঞ্চলের চাইতে ভাল। বৃষ্টির দিক হইতেও মাদ্রাজের তুলনায় হিজলী, ২৪পরগণার নিম্ন অঞ্চলে এমন কিছু বেশী বৃষ্টি হয় না

যাহাতে লবণ চাষ চলিতে পারে না, কাঁথি ও সুন্দরবন উপকূলের বাতাসের গতিও মাদ্রাজের মতই, জমি ও সমুদ্রের জলের লবণাক্ত অংশের সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কারণ পুর্ব্বে ২৪পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলে প্রচুর লবণ প্রস্তুত হইত এবং বর্ত্তমানেও কিছু কিছু প্রস্তুত হয়।" সুতরাং আবহাওয়া স্থান প্রভৃতি দিক হইতে কোন পরিবেশই যে লবণ প্রস্তুতের পক্ষে প্রকৃতপক্ষে বাধা নহে সে বিষয় অবশ্য স্বীকার্য্য। অনেকে বলেন বাঙলাদেশের বেশী বৃষ্টিপাত ও বায়ুর আর্দ্রতাই লবণ প্রস্তুতির অন্তরায়। কিন্তু সে আশঙ্কা যে ভুল তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে বিভিন্ন পরীক্ষায়। তাছাড়া লবণ প্রস্তুতির কথায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ার কথা বিবেচনা করিলে চলিবে না, কারণ লবণ উৎপাদনের স্থানগুলি একমাত্র নিম্ন পশ্চিম বাঙলাতেই সীমাবদ্ধ। আর সেই অঞ্চলের আবহাওয়া লবণ প্রস্তুতের পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত।

পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে—১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এই দেশে প্রথম বিদেশী লবণ আমদানী হয় ও তাহার পর হইতে আমদানীকৃত লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তবে বিস্ময়ের কথা এই যে—"বিদেশ হইতে আমদানীকৃত লবণের সবটুকুই বাঙলা ও আসামের বাজারে সীমাবদ্ধ থাকিত।" (ট্যারিফবোর্ড রিপোর্ট অন সল্ট ইণ্ডাষ্ট্রী ১৯৩১)। মাত্র বাঙলা, আসাম ও বিহারের সামান্য অংশে বিদেশী লবণের চাহিদা থাকায় বিদেশী বণিকদের কৌশলে দর নিয়ত উঠানামা করিত এবং দর বৃদ্ধির অন্যতম যন্ত্র হিসাবে আমদানীকৃত লবণের পরিমাণও উঠানামা করিত। এই অবস্থার প্রতিরোধকল্পে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এদেশে লবণ আমদানী সমিতি গঠিত হয়। তাঁহারা অবস্থা অনেকখানি আয়ত্তে আনিয়াছেন সত্য কিন্তু এদেশে লবণ উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া বিদেশী লবণ বর্জন করিবার কোন ব্যবস্থাই করিতে পারেন নাই। এখনো পশ্চিম বাঙলার প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত লবণই সরবরাহ করে এডেন প্রভৃতি অঞ্চলসমূহ। মধ্যে মধ্যে মাদ্রাজের তুতিকোরিণ হইতে কিছু লবণ আসিত, বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশে তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। "গত ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ভারতের বহির্বাণিজ্যের হিসাবে দেখা যায় যে—ঐ এগার মাসে পশ্চিম বাঙলায় ২লক্ষ ৬৭হাজার টন লবণ আমদানী হইয়াছে যাহার মূল্য প্রায় দুই কোটী টাকা। ১৯৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে (এপ্রিল হইতে মার্চ্চ) সমগ্র ভারতে বিদেশের লবণ আমদানী হইয়াছিল ৩৭৮৮৫৮ টন তাহার মধ্যে পশ্চিম বাঙলায় আসিয়াছিল ৬৬২৬৮৩ টন। যাহার মোট মূল্য হইতেছে ২কোটী ৭৭লক্ষ টাকা।" (এ্যাকাউণ্ট রিলেটিং টু দি সী বোর্ণ ট্রেড এণ্ড নেভিগেশন অব ইণ্ডিয়া; মার্চ্চ ১৯৪৮ হইতে)। ঐ বিপুল পরিমাণ বহিরাগত লবণের আমদানী বন্ধ করিয়া পশ্চিম বাঙলা স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে কিনা, সেইটাই হইতেছে আমাদের প্রধান প্রশ্ন।

পশ্চিম বাঙলার আদিবাসীরা সাধারণতঃ সমুদ্র জল জ্বাল দিয়া তৈয়ারী শুষ্ক ও খাঁটী লবণ পছন্দ করে। সেইজন্য ঐ শ্রেণীর লবণই পশ্চিম বাঙলায় খুব বেশী পরিমাণ আমদানী হয়। তাছাড়া লবণের দিক হইতে ঐ শ্রেণীর লবণই গড়ে প্রথম শ্রেণীর পর্য্যায়ে। সমুদ্র জল জ্বাল দিয়া তৈয়ারী লবণের মোটামুটি গুণগুলি হইতেছে এই যে উহা সাদা রঙের, দানাগুলি ঝরঝরে ও সুন্দর এবং আর্দ্রতাহীন। বাঙালীদের মধ্যে এই শ্রেণীর লবণের প্রচলনের মূলে অতীত বাঙলার লবণ শিল্পের যে অনেকখানি সংস্কার আছে সেকথা বলা বাহুল্য।

কুটীর শিল্পের দিক হইতেও যে পশ্চিম বাঙলার লবণ শিল্পের অভ্যুত্থান ও ব্যাপক প্রচার একই সঙ্গে বেকার সমস্যা ও লবণ সমস্যার কিছুটা সমাধান করিতে পারে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলে কুটীর শিল্প হিসাবে লবণ শিল্পের চলন পুর্ব্ব হইতে কম হইলেও কিছুটা এখনও আছে। আইনের দিক হইতেও এই ধরণের কুটীর শিল্প সম্বন্ধে সহৃদয়তার সহিত বর্ত্তমান সরকার বিবেচনা করিয়াছেন। মিঃ সি, এইচ, পিট তাঁহার "রিপোর্ট অনদি ইনভেষ্টিগেশন ইনটু পসিব্লিটিজ অব সল্ট প্রডাক্সন ইন বেঙ্গল, বিহার এণ্ড উড়িষ্যা" শীর্ষক রিপোর্টে লবণ শিল্পের প্রসার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে—"আন্তরিকতার সহিত কাজ করা হইলে উপকূল অঞ্চলের প্রতি মাইলে মাসে ৪০০।৫০০ মণ লবণ উৎপন্ন হইতে পারে।" এই স্থলে উল্লেখযোগ্য এই যে—পশ্চিম বাঙলার সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলের দৈর্ঘ্য প্রায় একশত মাইল। সুতরাং লবণ উৎপাদনের পরিমাণও বড় কম হইবে না। মিঃ পিট সেই সঙ্গে সাধারণভাবে লবণ উৎপাদনের জন্য কাঁথির নিকটে, পুরুষোত্তমপুর, বৈচিবেনিয়া, তাজপুর, মস্কারমানি প্রভৃতি অঞ্চলগুলি মনোনীত করিয়া সুপারিশ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে—"পশ্চিম বাঙলায় লবণাক্ত মাটী হইতে লবণ উৎপাদন বন্ধ করিয়া শুধু মাত্র সমুদ্র জল হইতে লবণ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।" "এদেশে সমুদ্র জলকে রৌদ্রের সাহায্যে ঘনীভূত করিয়া উত্তাপের সাহায্যে লবণকে শুষ্ক করিয়া লওয়ার পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সহজ ও সাফল্যজনক হইবে।"

মিঃ সি, এইচ পিটের অনুসন্ধানের পরে ঐ ধরণের কোন পরীক্ষামূলক কাজ হইয়াছে কিনা জানা নাই। কিন্তু গবেষণা ও পরীক্ষামূলক কাজের যে প্রয়োজন আছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। একমাত্র জ্বালানী প্রভৃতি বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাপের কথা বাদ দিলে সমস্ত উপকরণ যখন সহজলভ্য ও পরিবেশ যখন অনুকুল তখন এ বিষয়ে অনুরাগী হইতে আমাদের ব্যবসায়ী মহলের কোন বাধা নাই বলিয়াই মনে হয়, আর কুটীর শিল্প হিসাবে উপকূলবর্ত্তী গ্রামসমূহের অধিবাসীরা লবণ শিল্পকে গ্রহণ করিতে পারে স্বচ্ছন্দে।* ১৯৩০ সালের লবণ আন্দোলন বাঙালী এখনো ভোলে নাই বলিয়াই মনে হয়। তখন ছিল আগ্রহ ও ইচ্ছা, ছিল না সুযোগ। আর আজ—সে সুযোগ সমুপস্থিত। কিন্তু আগ্রহ নাই। ইহা ঔদাসিন্য না অপমৃত্যু।

* তাহাতে নিজেরা তো উপকৃত হইবেনই বরঞ্চ দেশবাসীদেরও উপকৃত করা হইবে।

(দুই)

অধিকাংশ লোকই ফিরিয়া গেল। মনক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিল। তাহারা কি কল্পনা করিয়া আসিয়াছিল সেটা তাহাদের নিজেদের কাছেও স্পষ্ট নয়, কিন্তু এমন সংক্ষিপ্ত এমন কলরবহীন একটা ঘটনা তাহাদের কল্পনার—সে কল্পনা যতই অস্পষ্ট হোক—তাহার বিপরীত। গোটা অঞ্চলটা উত্তেজনায় কালবৈশাখার অপরাহ্ণের মত উত্তপ্ত হইয়া রহিয়াছে; একটা ঝড় বজ্রাঘাতের সঙ্গে বর্ষণ তাহাদের প্রত্যাশা। সেখানে এমন শব্দহীন আলোড়নহীন একটা স্তিমিত ঘটনা কোন মতেই মনঃপূত হইবার কথা নয়। যেন বহু প্রত্যাশার একটুকরা মেঘ দিগন্ত হইতে উঠিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, না একটা বিদ্যুৎ চমকে সৃষ্টির চোখ ধাঁধাইয়া জানাইয়া দিল—হ্যাঁ আমি আসিয়াছি, না-তাহার গর্জ্জনে সমস্ত কাঁপাইয়া বলিল—ভয় নাই, এমন কি খানিকটা ঝড় উঠিয়া ধুলা উড়াইয়াও দিল না, যাহাতে মানুষ ঠাণ্ডা বাতাস আসিবে এ প্রত্যাশাতেও একটু আশ্বস্ত হয়।

অনেকেই বলিল—ধু-রো! এই ঠাণ্ডায় শেষ রাত্রে—ধূ-র্!

—চল, চল। বাড়ী চল। ভোর হতে হতে বাড়ী পৌছুব। মাঠে অনেক কাজ।

—আমি বলি, না জানি কি হবে! এই রাতেই হয় তো কিছু মিছু হয়ে যাবে। যত—সব—। হুঁঃ! কার্তিক মাসের শেষ রাতের ঠাণ্ডা! কাতির শিশিরে হাতী পড়ে যায়, মানুষ তো মানুষ। একটা হুই ক'রে দিলে—চল, সব চল; ঠাকুর মাশায় আসবেন। তাঁর কথাতেই সব মাম্‌দোবাজী ফুস মন্তরে উড়ে যাবে। লে—বাবা। যত নষ্ট গুড়ের খাজা আমাদের—

নাম করিতে হইল না, নষ্ট গুড়ের খাজা নিজেই ফোঁস করিয়া সাড়া দিয়া উঠিল—কি বলেছিলাম, বলি হ্যাঁরে, কি বলেছিলাম আমি? বল—আমি কি বলেছিলাম?

—বল নাই—চল্ সব, ঠাকুর মাশায় আসছেন?

—ঠাকুর মাশায় এসেছেন কি, না?

—তা এসেছেন।

—তবে? তবে? বলি ওরে—তুই এমন ক'রে চেল্লাচ্ছিস কেন? নষ্ট গুড়ের খাজা! নষ্ট গুড়ের খাজা!

—এই দেখ। তুমি আবার 'আগ' করছ। এই শেষ রাতে 'আগাআগি' ভাল লাগে না। আমি বলছি—ঠাকুর মাশায় এলেন, বেশ কথা—তা' এই শেষ রাতে এসে হ'ল কি!

—কি হ'ল? বল হে, তোমরাই সব বুঝিয়ে বল—লটবরকে—কি হ'ল! এত বড় একটা মানুষ, দেখলে পুণ্য হয়, তিনি এলেন এতকাল পরে—এলেন আমাদের জন্তে, আসব না ছুটে? হ'লই বা শেষ রাত, হ'লই বা ঠাণ্ডা! এই—এই করেই হিঁদুর সব্বনাশ হয়েছে। দেখেছিলি—সেদিন লীগের সেক্রেটারী এসেছিল—সেদিন মিয়া-সায়েবদের ভিড়। দেখেছিলি? তোদের ছত্রিশ জাতের বাহাত্তোরটা হাঁড়ি, কেউ কারও ছোঁওয়া খাবি না, কেউ কারুর বিপদে সাহায্য করবি না, জাতজ্ঞাতের মড়া মরলে—তোরা ঘরে বসে মজা দেখিস, কুচক্রীর দল, ভীরুর দল, অবিশ্বাসীর দল, পাষণ্ডের দল—।

বাজার দ্বারমণ্ডলের পূর্ব্বদিকে মহিষতলী গ্রামের হেরম্ব মিত্র সুদীর্ঘ একটি গালাগালি বহুল বক্তৃতা দিয়া শীতকাতর শেষ রাত্রিরও শেষাংশটুকু গরম করিয়া তুলিল। হেরম্ব মিত্র গ্রামের মাতব্বর। অবস্থা বেচারার ভাল নয়, কিন্তু উৎসাহের তাহার অন্ত নাই। সামান্যতম কারণকে অবলম্বন করিয়া অসামান্য উৎসাহে সে গ্রাম আলোড়িত করিয়া দেয়। কোথায় মেলা, কোথায় চব্বিশপ্রহর মহোৎসব, কোথায় বারোয়ারী কালীপূজা, কোথায় জমিদারের সঙ্গে মামলা,কোথায় কাহার সঙ্গে কাহার কলহ—এই লইয়াই সে চব্বিশ ঘণ্টাই নিজেও মাতিয়া থাকে,

গ্রামকেও মাতাইয়া রাখে। এইখানেই তাহার মাতব্বরী সীমাবদ্ধ নয়—অন্তত সে তাহা রাখিতে চায় না, সে-মাতব্বরীকে সে প্রসারিত করিবার চেষ্টায় গত তিনবার ইউনিয়ন বোর্ডে মেম্বর হইবার জন্য ভোটে দাঁড়াইয়াছে কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত হইয়াছে—পাশের মুসলমান প্রধান খাঁয়ের পাড়া গ্রামের মাতব্বর আবুতাহের খাঁয়ের নিকট।

হেরম্ব মিত্র বলে—আবুতাহের পারে না এমন কাজ নাই। "লোকটার পরণে কয়েক বৎসর আগেও থাকিত তাঁতের খাটো বহরের লুঙ্গি। হঠাৎ আঙুল ফুলিয়া কলাগাছের মত লোকটা মোটা হইয়াছে, ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর হইয়াছে, আজকাল পরিতেছে ঢিলা-পায়জামা—আচকান।"

হেরম্ব জানে আবুতাহের তলে তলে নিজের গ্রামকে দাঙ্গার জন্য তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছে। হেরম্বও বসিয়া নাই। সে দ্বারমণ্ডল বাজার, দ্বারমণ্ডল জংসন, সদর শহর চরকীর মত পাক দিয়া ফিরিতেছে। সমস্ত আন্দোলনটার খবরাখবর তাহার নখাগ্রে। ন্যায়রত্নের আগমন উপলক্ষে সে স্বাভাবিক উৎসাহেই আসিয়াছে এবং দশজনকে উৎসাহিত করিয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে।

প্রবীণ মানুষ ভগবান মণ্ডল—ন্যায়রত্নের কালের মানুষ। ভগবান বলে—মহাগ্রামের ঠাকুর বাড়ীর ব্রহ্মত্র এ অঞ্চলে প্রতি গ্রামে। ওই যে আবুতাহেরের খাঁয়ের পাড়া—ও সীমাতেও দু বিঘে ব্রহ্মত্র আছে। আমরা পাঁচপুরুষ ধ'রে ওই জমি করছি। যখন দশ বছরের ছেলে আমি—তখন বাবা চাল দিতে যাবার সময় গাড়ীতে চাপিয়ে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল, সেই প্রথম দেখলাম টকটকে সোনার মত রঙ—বারো চৌদ্দ বছর বয়স ঠাকুর মশায়কে। আমাকে নাম জিজ্ঞাসা ক'রে নিয়ে গেলেন নিজের মায়ের কাছে, নাড়ু দিলেন মা—খেলাম, ঠাকুর মশায় নিজেহাতে আমাকে জল ঢেলে দিলেন—আমি খেলাম। ওরে বাবা—তখন কি জানতাম—উনি সাক্ষাৎ আগুন। সেই মানুষকে আজ পঞ্চাশ বছর দেখি নাই! পঞ্চাশ বছর!

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ভগবান অপরাধ করিয়াছিল। সামাজিক অপরাধ। যৌবনের অতি ক্ষুধায় সে এক বিধবার প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল। একদা সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়িল। সেদিন ন্যায়রত্নই ভগবানের প্রায়শ্চিত্ত বিধান দিয়াছিলেন। লোকমুখে বিধান শুনিয়া সে বিধান অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিল। ভগবান সেই দিন হইতে কখনও ন্যায়রত্নের সামনে আসে নাই। নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সে যে ভাবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল—তাহাতে লোক একবাক্যে বলিয়াছিল—মানুষের ভুল হয় বৈকি। কার না ভুল হয় বল? কিন্তু ভগবান মানুষের মত মানুষ, তার প্রায়শ্চিত্ত করেছে। শুধু সামাজিক ও শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্ত করিয়াই ভগবান ক্ষান্ত হয় নাই, বিধবাটিকে নবদ্বীপ পাঠাইয়া তাহার মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত মাসিক পাঁচটাকা হিসাবে খরচ জোগাইয়া আসিয়াছে। ন্যায়রত্নও এ সংবাদ শুনিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ পাঠাইয়াছিলেন—হেরম্ব মিত্রের পিতামহ তখন ছিলেন গ্রামের গমস্তা, তাহাকেই বলিয়াছিলেন—মিত্রজা, ভগবানকে বলো—আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত উপলব্ধিতে, মনের দহনে। শাস্ত্র, সেই উপলব্ধি, সেই দহন জাগ্রত করবার জন্য উপবাস—সর্ব্বসমক্ষে মন্ত্র পাঠ করে পাপ স্বীকার, অপরাধ মার্জ্জনার জন্য প্রার্থনা—ইত্যাদির বিধান দিয়ে থাকে। সমাজ শাসন ক'রে সেই বোধ জাগ্রত করাতে চায়। আমি শাস্ত্রের বিধান দিয়েছি। ওইটুকুর বেশী তো আমার অধিকার নাই। সমাজ ভোজ আদায় করেছে—এখন সমাজের যেমন অবস্থা তাতে ওই আদায় হলেই সে খুসী। কিন্তু আমার দুঃখ ছিল অভাগী মেয়েটির জন্য। শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্ত করেও তার পরিত্রাণ নাই। সমাজ ভোজ নিয়েও ঠাঁই দিতে পারবে না। তাই ভগবান যখন নিজেই প্রায়শ্চিত্তের এই বিধানটা নিজের ওপর চাপালে—তখন আমার মনটা শান্ত হ'ল, প্রসন্ন হ'ল। এই আমার আশীর্ব্বাদ। বলো তুমি ভগবানকে আমার নাম করে বলো।

মিত্তির জা—এ কথা ভগবানকে জানাইয়াছিল। ভগবান সেইখান হইতেই দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া ন্যায়রত্নকে নমস্কার জানাইয়াছিল; আশীর্ব্বাদ পাইয়াও কিন্তু ন্যায়-রত্নের সঙ্গে দেখা করে নাই।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভগবান ন্যায়রত্নের সম্মুখে আসে নাই। আজ কিন্তু থাকিতে পারে নাই, সে হেরম্বদের দলের সঙ্গে বাহির হইয়া

পড়িয়াছিল—বলিয়াছিল—একটু 'ধেরো-ধেরো' চলো দাদারা। রাত্তিরি কাল—শীতের রাত্তি—তার উপরে—বয়েস বলছে—আসি-আসি—আশীর ঘরের ফটক খুলছে; পড়ে গেলে আর উঠব না। আক্ষেপ নাই তাতে, তবে একবার ঠাকুর মহাশয়কে দেখবার সাধ, পঞ্চাশ বছর—আজ যাই—কাল যাই ক'রে—লজ্জা আর কাটাতে পারলাম না। আজ লজ্জা কাটিয়েছি!

সমস্ত পথটা ভগবান আর কথা বলে নাই। ষ্টেশনে ন্যায়রত্নকে দূর হইতে আবছা দেখিয়াই ফিরিতে হইয়াছে, কাছে যাওয়ার সুযোগ ঘটে নাই; একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া ফিরিতেছে। হেমন্ত মিত্রের গালিগালাজ পূর্ণ বক্তৃতায় বাধা দিয়া সে সবিনয়ে বলিল—মিত্তির ভাই একটা কথা বলি। রাগ করো না যেন! গালাগালকে লোকে বলে ঠাণ্ডা জল, তা ভাই এই শীতের রাতে ঠাণ্ডাজলে শরীর বড় শিরশির করছে। লোকে ক্ষুণ্ণ হবে বৈ কি দাদা, একবার ভাল ক'রে দেখতে পেলাম না, পেন্নাম করতে পেলাম না, এই শীতের শেষ রাতে ইষ্টিশানে থাকতাম—তা পর্য্যন্ত দিলে না।

এ কথাটা দেবু ঘোষ উপলব্ধি করিয়াছিল। কিন্তু উপায় ছিল না। একাদশীর উপবাস করিয়া অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ কাশী হইতে বাঙলা দেশ এই সুদীর্ঘ-পথ অতিক্রম করিয়াছেন—এই অবস্থায় তাঁহাকে এত লোকের উচ্ছ্বাসের সম্মুখীন করিবার কল্পনাও যে করা যায় না। তাহার উপর ন্যায়রত্ন যত দেশের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন—ততই যেন কঠিন শীতল স্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন। ট্রেণে চড়িয়া প্রথম দিকটায় কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন, সাহেবগঞ্জ পার হইতেই বলিলেন—এইবার দেশ কাছে এল। সাহেবগঞ্জ!

আরও খানিকটা আসিয়া একটা বড় ষ্টেশন।

ষ্টেশনটার নামের হাঁক শুনিয়া ন্যায়রত্ন চমকিয়া উঠিয়াছিলেন। গাড়ী ছাড়িতেই আধশোওয়া হইয়া দেহখানা এলাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন। দেবু ভাবিয়াছিল—ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু প্রপৌত্র অজয় মৃদুস্বরে বলিয়াছিল—না। ধ্যান করছেন।

ন্যায়রত্ন সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—শঙ্খপুর ষ্টেশন কি পার হলাম পণ্ডিত? শ্মশানমণ্ডল আসছে? কথা বলিতে বলিতেই ন্যায়রত্ন উঠিয়া বসিয়াছিলেন—অজয়ের দিকে গভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়াছিলেন—অজুমণি, তোমার দেশ এল ভাই!

ময়ূরাক্ষীর ব্রিজের উপর ট্রেণ উঠিতেই হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া প্রপৌত্রকে বলিয়াছিলেন—প্রণাম কর, তোমার বহু পুরুষের ভিটের দেশ।

ষ্টেশনে নামিয়া যেন নিতান্ত অবসন্ন অসুস্থের মত বলিলেন—অজয় আমার বিছানাটা বিছিয়ে দাও তো ভাই!

যে কেহ কাছে আসিল—সকলকেই এক কথা বলিলেন—কাল। কাল। কাল।

ন্যায়রত্নের কণ্ঠস্বরে কথাটা শুনিলে লোকে সজল চক্ষে তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়া বাকী রাত্রিটা সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষায় পূর্ব্বদিগন্তের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিত। তাঁহার একটা কথায় লোকে গলিয়া যাইত। যদি তিনি কথাটা একটু উচ্চকণ্ঠে বলিতেন; কোন একটা উঁচু কিছুর উপর দাঁড়াইয়া দেখা দিয়া বলিতেন! সে তো জানে, তাহার চেয়ে এ কথা তো ভাল করিয়া আর কেউ জানে না। হয় তো-ঠাকুর নিজেও জানেন না—তিনি এখানকার মানুষের মনের কোন মণি বেদীতে বসিয়া আছেন!

দেবু কথাটা বলিয়াওছিল। জংসন শহরের শেঠ মহাশয়েরা, বড় মাতব্বরেরা, কঙ্কনার বাবুরা—তাহার গ্রামের জমিদার শ্রীহরি ঘোষ প্রভৃতি কথাটা নাকচ করিয়া দিয়াছেন। ষ্টেশন কর্ত্তৃপক্ষের আপত্তি ছিল; পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষও আপত্তি করিয়াছেন। মুসলমান সম্প্রদায় দরখাস্ত করিয়াছে। এমনভাবে হিন্দুরা এখানে জমায়েত হইলে—যে কোন অজুহাতে শান্তি ভঙ্গ হইতে পারে। কথাটা যুক্তিযুক্ত। তবুও কর্ত্তৃপক্ষ ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনার জন্য আসিতে কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন নাই। শুধু স্থানীয় মাতব্বরদের সঙ্গে সর্ত্ত করিয়াছিলেন যে, কোন বক্তৃতা কেহ দিতে পারিবে না। এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই প্রতিটি আগন্তুককে জংসন শহর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। এই কারণেই জমিদার ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ দেবু ঘোষের কোন কথাই কানে তোলেন নাই। দেবু বলিয়াছিল—বক্তৃতা তো নয়,ঠাকুর মশায় শুধু বলবেন—আমি ক্লান্ত—

—আরে, সে কথা তো উনি ট্রেণ থেকে হাত জোড় ক'রে বলে দিয়েছেন। ষ্টেশন থেকে নড়লেন না পর্য্যন্ত।

না-না—ও সব হবে না। তোমাদের ওসব স্বদেশী ধারা ধরণ, এ সবের মধ্যে খাটিয়ো না। পুলিশ তা' হ'তে দেবে না।

পুলিশ সাহেবও দৃঢ় স্বরে বলিয়াছিলেন—যা বলবার আমি বলছি।

বলিয়াই তিনি ঘোষণা জানাইলেন—আধ ঘণ্টার মধ্যে সকলে ষ্টেশন এলাকা থেকে বেরিয়ে যাও। পর মুহূর্ত্তেই নিজের কথা সংশোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—ষ্টেশন এলাকা থেকেই নয়, এ শহর থেকেই চলে যেতে হবে। আপন আপন গ্রামে চলে যাও।

ষ্টেশনে দশজন আর্মড পুলিশ দশ গজ অন্তর পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়াছিল। ষ্টেশনের বাহিরটা সাধারণ কনেষ্টবল—চৌকিদার—সে প্রায় জন পঞ্চাশেক—ঘিরিয়া রাখিয়াছিল।

মাতব্বরেরা—গুরু গম্ভীর মুখভাব লইয়া—ঘন ঘন হাত নাড়িয়া—ইসারায় এবং চাপা গলায়—যাও—যাও—। চলে যাও সব। জলদি। যাও! বলিয়া ব্যস্ত হইয়া এমন-ভাবে ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন যে পল্লীবাসীরা শঙ্কিত না হইয়া পারিল না। তাহারা পরস্পরের গা-টিপিয়া মৃদুস্বরে বলিল—চল্‌রে বাপু—চল্‌। বলছে সব এমন ক'রে! তা—ছাড়া—।

তা ছাড়া তাহারা বন্দুকধারী পুলিশ দেখিয়া ভীতও হইয়াছিল। কয়েকদিন ধরিয়াই নূরুল হক ইনস্‌পেক্টার পঞ্চাশ জন আর্মডগার্ডের একটি দল লইয়া গ্রামে গ্রামে প্যারেড করিয়া ইতিমধ্যেই মানুষের মনে একটা ভীতি সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছে।

তাহারা চলিয়া গেল। ক্ষুণ্ণ হইয়াই গেল।

ষ্টেশনে থাকিল শুধু জনকয়েক। একজন ইনস্‌পেক্টার, একজন এ-এস-আই থাকিলেন সরকারী তরফ হইতে। শ্রীহরি ঘোষ এবং রামগোপাল ভকত চেয়ার পাতিয়া বসিয়া রহিলেন। আর রহিল দেবু ঘোষ।

ন্যায়রত্ন নিষ্পলক শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া শুইয়াছিলেন। এত সব কাণ্ডের তিনি কিছুই জানতে পারেন নাই। জানিতে চান নাই বলিয়াই জানিতে পারেন নাই। মৃদুস্বরে হইলেও এত মানুষের কথা—সে একটা কোলাহল—সে শুনিয়াও তিনি ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য কোন প্রশ্ন করেন নাই। প্রশ্ন করা দূরের কথা—বারেকের জন্য সেদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখেন নাই পর্য্যন্ত।

দেবু বুঝিয়াছেন—অন্তরে তাঁহার প্রচণ্ড আলোড়ন চলিতেছে। সুদীর্ঘকালের কত কথা কত স্মৃতি কত সুখ কত দুঃখ টগবগ করিয়া আগ্নেয়গিরির গর্ভের গলিত ধাতু সম্ভারের মত ফুটিতেছে। পাহাড় হইলে সে কম্পনে কাঁপিয়া উঠিত, কিন্তু মানুষ বোধ করি পাথরের চেয়েও অটল হইতে পারে। দেবুর অন্তর অকস্মাৎ ন্যায়রত্নের প্রতি গভীর সমবেদনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল;—মনে হইল—এর চেয়ে মর্ম্মান্তিক অবস্থা আর মানুষের হয় না; যেন কোন সুকণ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ স্বর বন্ধ হইয়া মূক হইয়া গিয়াছে। অথবা কোন মানুষ অন্তিম মুহূর্ত্তে বাকবদ্ধ পঙ্গু হইয়া সংসারের দিকে নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে।

ধূমায়মান গরম জল ভর্ত্তি একটি পিতলের বালতী হাতে একটি মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল। ন্যায়রত্ন তবুও কোন কথা বলিলেন না। তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না।

দেবু তাহার দিকে চাহিয়া কিছু ইঙ্গিত করিল। মেয়েটি জলের বালতী নামাইয়া রাখিয়া নতজানু হইয়া ন্যায়রত্নকে প্রণাম করিয়া বলিল—প্রণাম করছি আমি।

ন্যায়রত্ন নীরবে ডান হাতখানি নাড়িয়া নিষেধ করিলেন।—না।

—আমি স্বর্ণ, ঠাকুর মশায়। আমি তো এ কথা শুনব না।

ন্যায়রত্ন এবার ফিরিয়া তাকাইলেন। স্বর্ণ? কে স্বর্ণ?—ও! দেখুড়িয়ার তিনকড়ি মণ্ডলের সেই বালবিধবা কন্যাটি! একেবারেই চিনিবার উপায় নাই। শুধু সধবা বেশের জন্যই নয়—একটা আসল রূপান্তর ঘটিয়া গিয়াছে, যেন চাষীর ঘরের গৃহস্থালীর নিত্যব্যবহার্য্য ধাতুপাত্র গালাইয়া নিপুণ যন্ত্রশিল্পী কোন ধারালো দীপ্তিময় অস্ত্রে পরিণত করিয়াছে। ঠিক দেবুর মতই তাহার রূপান্তর।

দেবু মৃদুস্বরে বলিল—আমার স্ত্রী!

ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিলেন—ন্যায়রত্ন।—ও! হ্যাঁ। দেবু তিনকড়ির বালবিধবা কন্যাটিকে বিবাহ করিয়াছে বটে। দেবু নিজেই তাঁহাকে অনুমতি চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিল।

ন্যায়রত্ন মৃদুস্বরে বলিলেন—প্রণাম করো না। এক-একজন এক-একটা বিশেষ আচরণকে মেনে চলে। সংসারে যেমন দেশাচার আছে কুলাচার আছে তেমনি আত্মাচারও আছে। ওটাতে আঘাত করতে নেই। আমি এমনিই আশীর্ব্বাদ করছি।

—কিন্তু আমি যে গরম জল নিয়ে এসেছি। পা ধুইয়ে দেব। শীতের রাত্রি—

—গরম জল! ন্যায়রত্ন একটু হাসিলেন।—জল গরম ক'রে তো কোন কালে ব্যবহার করিনি মা। আজও অরুদয়ে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গঙ্গাস্নান করি। একটু পরেই তো যাব ময়ূরাক্ষীতে স্নান করতে। তুমি ওটা রাখ। বস' তুমি। তোমায় দেখে আনন্দ হচ্ছে। পণ্ডিত!

—বলুন।

—তোমাদের দুজনকে আমার আশীর্ব্বাদ করা হয় নি। তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি।

স্বর্ণ পায়ের কাছে বসিয়া বলিল—তা হ'লে যে প্রণাম করতে দিতেই হবে। মাথা যদি নোয়াতেই না দেন তবে আপনার আশীর্ব্বাদ ধরব কোথায়—ধরব কি ক'রে? ও তো হাতের অঞ্জলিতে নেওয়া যায় না। আপনিই বলুন।

ন্যায়রত্ন মৃদুস্বরে হাসিয়া উঠিলেন—তর্কশাস্ত্রে তোমার অধিকার জন্মেছে। কিন্তু আরও একটা কথা আছে। তোমরা প্রণাম করতে চাইলে—আমি বললাম—আমার নিজস্ব আচার আছে একটি—তাতে প্রণাম নেওয়া নিষিদ্ধ। আমি আশীর্ব্বাদ করতে চাচ্ছি, তাতে যদি তোমাদের আচারে বাধা থাকে তবে অবশ্যই না বলবে তোমরা। আর মাথা নিচু করার কথা বলছ—তার দরকার নেই মা, আলো জল বায়ু এদের মত আশীর্ব্বাদ সর্ব্বাঙ্গে বর্ষিত হয়; তা-ছাড়া—তোমরা দুজনে যতই লম্বা হয়ে থাক—আমি বুড়ো হয়ে যতই নুয়ে পড়ে থাকি, হাত বাড়ালে—মাথা নাগাল অবশ্যই পাব। কি বল?

দু জনের মাথার উপর দক্ষিণ হস্তের স্পর্শ বুলাইয়া দিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—কল্যাণ হোক। আত্মার কল্যাণ!

ওদিকে রাত্রি শেষ ঘোষণা করিয়া পাখীরা কলরব করিয়া উঠিল।

ন্যায়রত্ন হাত দুইটি জোড় করিয়া প্রণাম করিলেন। তারপর ডাকিলেন—অজয়!

অজয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ন্যায়রত্ন তাহার দিকে চাহিয়া পায়ের কাপড়খানা ভাল করিয়া ঢাকিয়া দিলেন। তাহাতেই অজয় জাগিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বসিয়া বলিল—পাখী ডাকছে!

—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি আর একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি আসছি স্নান ক'রে।

—সে কি? আপনি একা যাবেন কোথায়? দেবু প্রশ্ন করিল।

—এখানকার সব যে আমার পরিচিত পণ্ডিত। আশী বছরের পরিচয়। মধ্যে কয়েক বৎসর কাশী গিয়েছি।

—না। সে হয় না ঠাকুর মশায়। আমি সঙ্গে যাব।

অজয় তৎক্ষণে কাপড় গামছা ঘটি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

অজয় মৃদুস্বরে বলিল—ঘুম হবে না।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—চল। ঘুম হবে না যখন, তখন চল।

শ্রীহরি ঘোষ এবং পুলিশ ইনস্পেক্টর উঠিয়া কাছে আসিয়া বলিল—কোথায় যাবেন?

—স্নানে যাবেন। ময়ূরাক্ষীর ঘাটে।

—দাঁড়ান। লোক সঙ্গে দিই।

—কেন? লোক কেন? সবিস্ময়ে ন্যায়রত্ন প্রশ্ন করিলেন।

—দরকার আছে ঠাকুরমশায়। এখানকার অবস্থা আপনি জানেন না। শ্রীহরি ঘোষ হাত জোড় করিয়াও বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলিল—আপনাকে এ অবস্থায় কোন মতেই আমরা এইভাবে—এই সময়ে নদীর ঘাটে নির্জ্জনে যেতে দিতে পারব না। কোন কিছু যদি ঘটে যায় তবে—

—কিছু ঘটবে না শ্রীহরি। লোকের প্রয়োজন নাই। আমার সঙ্গে অজয় যাচ্ছে—দেবনাথ যাচ্ছে।

—অজয় ছেলে মানুষ—আর দেবনাথ। শ্রীহরির চোখে একটা যেন ঝিলিক খেলিয়া গেল, বলিল—দেবনাথকেই কে রক্ষা করে ঠাকুরমশায়—তার ঠিক নাই। আপনি জানেন না বোধ হয়, দেবনাথ তিনকড়ি পালের বিধবা মেয়েকে বিয়ে ক'রে সমাজে পতিত, শিবকালীপুর পরিত্যাগ ক'রে জংসনে এসে বাস করছে।

—আমি জানি শ্রীহরি।

—হ্যাঁ আমি জানি। লোকের কোন প্রয়োজন নেই।

—লোক আমাদের—মানে সরকারী লোক—কনেষ্টবল দুজন আপনার সঙ্গে যাবে। দায়িত্ব দেবু ঘোষের নয়, দায়িত্ব আমাদের।

দেবু হাসিয়া এবার বলিল—শ্রীহরিবাবু—এতটা পথ আমিই ওঁকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। নিরাপদেই এনেছি। লোক যদি পাঠাতে চাও, পাঠাতে পার। সঙ্গে সঙ্গে যাবে—আমরা তাতে আপত্তি করব কেন?

ন্যায়রত্ন বলিলেন—না। দেবু তোমাকেও আমি সঙ্গে নেব না। আমি আর অজয় দুজনে যাব। এস অজয়।

বৃদ্ধ অগ্রসর হইলেন।

ময়ূরাক্ষীর ঘাট।

প্রকাণ্ড প্রাচীন বট—বহু শতাব্দী ধরিয়া ঘাটের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। চারিপাশে ঝুরি নামিয়া সে এক মনোরম আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়াছে। ভিতরটা শুধু বালি। বটগাছের পল্লবের জন্য রোদ পড়ে না। রাত্রে হিম পড়ে না। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এই গাছতলাটি পথিকের আশ্রয় স্থল। নদীর ধারের দিকের মোটা বাঁকা শিকড় উঠিয়া রহিয়াছে অনেকগুলি। ওই শিকড়গুলিতে আগের কালে বন্দর-ঘাট দ্বারমণ্ডলে যে সব নৌকা আসিত, মোটা কাছি দিয়া ওই শিকড়ের সঙ্গে বাঁধা থাকিত। এখন একখানা জীর্ণ খেয়া নৌকা বাঁধা থাকে। কার্ত্তিক মাস, ময়ূরাক্ষীতে এখন হাঁটু জল। নৌকাখানা বালির উপর কাত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

পূর্ব্ব দিগন্তে প্রতি মুহূর্ত্তে আলোর আভাস উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে। ওপারে ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী পঞ্চগ্রামের বাঁধ।

ন্যায়রত্ন দাঁড়াইলেন।

—অজয়।

—ঠাকুর!

—ছেলেবেলার কথা কিছুই মনে নেই? গ্রাম মনে নেই?

—না ঠাকুর। শুধু মনে পড়ে একটা মস্ত খড়ের চালা।

—হ্যাঁ। আটচালা। টোল বসত সেখানে। যাবে ওপারে? বাঁধের উপর দাঁড়ালে বাড়ীর পিছন দিকের তালগাছটা দেখা যাবে।

—চলুন।

ন্যায়রত্ন কি ভাবিলেন। তার পর বলিলেন—যাব, পরে যাব। এখন থাক। এ ব্যাপারটা মিটে যাক। আমার যা বলবার আছে—বলে দায়মুক্ত হই—তারপর যাব।

—বেশ।

—চল। ঘাটে নামি। এই ভোরে তুমি স্নান করো না। দেশ আমাদের বটে—বড় ভাল দেশই ছিল এককালে। কিন্তু এখন শ্মশান ভাই। ম্যালেরিয়ায় জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। তুমি মুখ হাত ধুয়ে নাও।

ন্যায়রত্ন নদীতে নামিলেন।

অজয় মুখ হাত ধুইয়া ঘাটে বসিল।

পূর্ব্ব মুখে চলিয়া গিয়াছে ময়ূরাক্ষী। উত্তর দিকটায় পাঁচ ভাইয়ের বাঁধের ঘন জঙ্গল একটা অরণ্যপ্রাচীরের মত ময়ূরাক্ষীর ধারার সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় চলিয়া গিয়াছে। ওই বাঁধের ওপারে গেলে—তাহার বহু পুরুষের ভিটা দেখা যাইবে। এদিকে দক্ষিণ দিকটা উঁচু। লাল কাঁকর-মেশানো পাথরের মত শক্ত মাটি। ঘাটের দক্ষিণ পশ্চিম কোনে জংসন। সোজা দক্ষিণে ওই একটা দীঘায়তন ঘন সবুজ—ওটা কি? তার ওপাশে—আরও একটা সবুজ আভাস। দক্ষিণ পূর্ব্বে প্রান্তরটা ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে।

ন্যায়রত্ন স্নান শেষ করিয়া উঠিয়া আসিলেন।

—দেখছ?

—ওই সবুজ দেখাচ্ছে—ওটা কোন গ্রাম ঠাকুর?

—ওইটা? ওইটিইতো জয়তারা দেবীর আশ্রম। ওখানেই তো বিবাদ! তার দক্ষিণে ওই হ'ল—বাজার দ্বারমণ্ডল। এই যে সোজা রাস্তাটা চলে গিয়েছে—এইটেই এককালের রাজপথ। এই বটতলা—এই ছিল বন্দর। কি বলব অজয়, এই যে আজ বিবাদ—

—আরে—ইটা কে বটে? আঁ? ন্যায়রতন ঠাকুর মালুম হচ্ছে!

ন্যায়রত্ন চকিত হন না কিছুতে। তিনি মুখ ফিরাইলেন ধীরে ধীরে।

একখানা ডুলী ওপারে নদীর ঘাটে নামিতেছে। আরও একজন কেহ ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া সঙ্গে আসিতেছে।

—কে ঠাকুর? আপনাকে ডাকছে এমনভাবে?

—কেন? মনে মনে ক্ষুণ্ণ হচ্ছ? অপমান বোধ করছ? হাসিলেন ন্যায়রত্ন। কিন্তু কে তাহা তো ঠিক চিনিতে পারিতেছেন না।

অজয় বলিল—একজন বুড়ো মুসলমান।

—বুড়ো মুসলমান?

—হ্যাঁ—মাথায় ফেজ টুপী, মস্ত লম্বা পাকা দাড়ী—

ডুলীটা এপারের ঘাটে আসিয়া উঠিল। তাহার আগেই ঘোড়াটা আসিয়া উঠিয়াছিল। ঘোড়ার সওয়ার ঘোড়া হইতে নামিয়া সেলাম করিয়া বলিল—আপনি? ভাল আছেন?

কুসুমপুরের ইব্‌সাদ সেখ।

ডুলী হইতে নামিয়া বৃদ্ধ মুসলমান আগাইয়া আসিয়া বলিল—ভাল আছ? চিনতে পারছ?

সে হাতখানা বাড়াইয়া দিল ন্যায়রত্নের হাতখানা ধরিবার জন্য।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—হাজী? দৌলত?

—হাঁ। সাক্ষী দিতে আসছ? কিন্তু ছুঁইবা না না-কি আমাকে? আঁ?

ন্যায়রত্ন নমস্কার করিলেন, বলিলেন—ওভাবে তো আমরা সম্ভাষণ করি না দৌলত!

হাজী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল- দোষটা কি?

—আছে।

—কি? শুনি? আমি মুসলমান—আমারে ছুঁইবানা। এই তো?

—তোমার সঙ্গে হাত ধরে কি কোলাকুলি ক'রে সম্ভাষণ করার মত গাঢ় সদ্ভাব তো কখনও ছিল না দৌলত। সেই জন্যেই করব না। আর মুসলমানের কথা যদি বল—তবে বলব—মুসলমান কেন—পৃথিবীর কেউই আজ আমার কাছে অচ্ছুত নয়। কিন্তু উপাসনার সময়টায়—ওই দেখ আমার প্রপৌত্র বিশ্বনাথের ছেলে বসে রয়েছে, ওকেও আমি ছোঁব না।

দৌলত ডুলীতে গিয়া উঠিল--উঠাও ডুলী। আরে আসো আসো—চলি আসো ইব্‌সাদ।

(ক্রমশঃ)

বাংলায় ব্যাঙ্কিং

শ্রীশিবশঙ্কর দত্ত

বাংলা দেশে গত মহাযুদ্ধের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসার দেখা যায়। মহাযুদ্ধের মধ্যে মোটামুটি ভালভাবে কাজ চলে। কিন্তু যুদ্ধের শেষ ভাগ হইতে ব্যাঙ্ক জগতে এক সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে এবং বহু ব্যাঙ্ক কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের তুলনায় বাংলা দেশে ব্যাঙ্কের প্রসার মোটামুটি ভাল। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে শুধু বর্ত্তমান যুগে নহে, বহুকাল হইতেই বাংলা দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসার প্রচলন ছিল।

জগৎশেঠের নাম প্রথমেই উল্লেখ করা যায়, নবাবী আমলে বর্ত্তমান পদ্ধতির ব্যাঙ্ক ছিল না কিন্তু জগৎশেঠ ব্যাঙ্কারের কাজ করিতেন। মাণিকচাঁদ মুর্শিদকুলি খাঁর ব্যাঙ্কার ছিলেন। সুবর্ণবণিকেরাও বল্লাল সেনের সময় ব্যাঙ্কিং কাজ করিতেন। এই সকল ব্যাঙ্কারদের বড় বড় সহরে গদি ছিল এবং হুণ্ডির সাহায্যে টাকা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পাঠান হইত। তবে এই সকল ব্যাঙ্কার ব্যাঙ্কিং কাজের সহিত অন্য কারবার করিতেন।

ধীরে ধীরে এই সকল ব্যাঙ্কিং অপ্রচলিত হইয়া গিয়া আধুনিক ব্যাঙ্কিং দেখা দিল। ১৭৭০ সালে আলেকজাণ্ডার এণ্ড কোম্পানী ব্যাঙ্ক অফ হিন্দুস্থান প্রতিষ্ঠিত করেন। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, জেনারেল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অফ ক্যালকাটা এই সময়ে পর পর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাঙ্কগুলি সে যুগে সাধারণ ব্যাঙ্কিং ছাড়া দেশে নোট প্রথা প্রচলন করেন। সরকারী মুদ্রা ছাড়া এই সকল ব্যাঙ্কের নোট দেশে টাকা হিসাবে ব্যবহৃত হইত এবং তাহার পিছনে ছিলো কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতা; অংশীদারদের সীমাবদ্ধদায়িত্ব। বহির্বাণিজ্যের জন্য এক দেশ হইতে অন্য দেশে টাকা লেনদেন করা, কর্জ্জ দাদন প্রভৃতি ব্যাঙ্কিং কাজ এই সময় হইতে আরম্ভ হয়। ক্রমে ক্রমে এই সকল ব্যাঙ্কের কারবার প্রসার লাভ করে। কিন্তু তিনটি প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য পদ্ধতির ব্যাঙ্কিং দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় হইতেই ধীরে ধীরে ব্যাঙ্কিং প্রসার লাভ করিতেছে। আগেই আমরা লিপিবদ্ধ করিয়াছি যে আজকাল বাংলা দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে এক সঙ্কট দেখা দিয়াছে। এই সঙ্কটের মূল

অনুসন্ধান করিতে হইলে ব্যাঙ্কিং কাজের রূপ কি তাহা একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। অল্প কথায় বলিলে টাকাও ক্রেডিটের বিনিময়ে ব্যাঙ্কিং বলা যাইতে পারে। ব্যাঙ্ক যখন টাকা জমা রাখে, তখন আমানতকারীকে ক্রেডিট দেয় এবং ব্যাঙ্ক যখন টাকা দাদন করে তখন ক্রেডিট অর্জ্জন করে। অর্থনীতিবিশারদদের মধ্যে এই লেনদেনের প্রকৃতি লইয়া বহু তর্ক বিতর্ক হইয়াছে। টাকা দাদন দিয়াই আমানত সৃষ্টি করা হয় এইরূপ (Loans create deposits) অভিমত বহুকাল হইতে স্বীকৃত ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে একটি ভিন্ন মতবাদ দেখা দিয়াছে। এই মতবাদীরা ব্যাঙ্ককে স্বোপার্জ্জিত আমানতের উপর নির্ভর করিয়াই ক্রেডিটের কাজ করিতে হয় এই কথা বিশেষ জোরের সহিত বলিয়াছিল। মোট কথা এই লেনদেনের মধ্য দিয়াই ব্যাঙ্কিং এবং ব্যাঙ্কারের কাজ এই লেনদেন সুষ্ঠুভাবে পরিচালন করা। এই লেনদেনের গোলমালই ব্যাঙ্ক ফেলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ। আমানত টাকা ব্যবহার করিয়া উপযুক্ত পথে অর্জ্জন করিতে না পারিলে ব্যাঙ্কিং চলিতে পারে না। সেজন্য ব্যাঙ্কের পরিচালকদের কর্ত্তব্য কি ভাবে ব্যাঙ্কের অর্থ Invest করা হইবে তাহা স্থির করা; এই বিষয়ে ভুল বা অসাধুতার জন্যই অধিকাংশ ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে।

সাধারণতঃ ব্যাঙ্কের দুই প্রকার আমানত হয়। (১) সাধারণ আমানত (২) স্থির বা স্থায়ী আমানত ও সেভিংস আমানত। প্রথম শ্রেণীর আমানত পরিমাণ টাকা ব্যাঙ্কের Demand Liability বলিয়া পরিগণিত হয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর আমানত পরিমাণ টাকা time Liability বলিয়া পরিগণিত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে আবার সেভিংস আমানত টাকা ব্যবসায়ের দিক দিয়া প্রায় Demand liability শ্রেণীভুক্ত বলা যাইতে পারে। ব্যাঙ্কিং পরিচালনের সাধারণ নিয়মে time space liability পরিমাণ টাকার ⅓ অংশ invest করা উচিৎ। Demand liability পরিমাণ টাকা সব সময়ে ব্যাঙ্কে মজুত থাকা উচিৎ। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি এই নিয়মানুসারে চলেন নাই। ভুল বশতঃ বা কর্তৃপক্ষস্থানীয় লোকের সুবিধার জন্য নানা ভাবে যথা জমি, বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে বহু অর্থ এভাবে জড়িত হইয়া যায় যে সময়মত Demand liability মিটাইয়া দিবার টাকার অভাব হইয়া যায়। আমাদের দেশের ব্যাঙ্ক ফেলের ইতিহাস হইতে আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হয় ব্যাঙ্কিং জগতে অনেক পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা বড় কম নহে।

কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক ব্যাঙ্ক সুপ্রতিষ্ঠিত। আর যে ব্যাঙ্কগুলি বড় হইয়াছে তাহারাও দুই বা ততোধিক ব্যাঙ্ক একত্র হইবার ফলে ইহা হয় নাই—কতকগুলি অধিকসংখ্যক শাখার উদ্বোধন করিয়া বড় হইয়াছে। কিন্তু এই ধারার ফল অবাঞ্ছনীয় প্রতিযোগিতা, সেজন্য মনে হয় ব্যাঙ্ক জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় স্থাপন করা। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলি একত্রীভূত করিতে পারিলে এই দিক দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাজ হয়। কিন্তু হয়তো স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য সম্পূর্ণভাবে একত্রীভূত করা সম্ভব না হইতে পারে। সেক্ষেত্রে পরস্পর সাহায্যকারী ব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবসা করিবার জন্য কতকগুলি ব্যাঙ্কের মধ্যে সহযোগিতার চেষ্টা করা উচিৎ। এই সহযোগিতার কার্য্যকরী রূপ দিবার জন্য একটি বোর্ড গঠন করা যাইতে পারে। বিভিন্ন সহযোগী ব্যাঙ্ক হইতে প্রতিনিধি এই বোর্ডের সভ্য হইবেন এবং কাজের সুবিধার জন্য এই বোর্ডের সভ্যেরা একটি কার্যনির্ব্বাহক পরিচালক মণ্ডলী নির্ব্বাচিত করিতে পারেন। একজন নিরপেক্ষ লোক হিসাবে ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি ছাড়া অপর কোন বিশিষ্ট লোককে এই বোর্ডের সভাপতি করা যাইতে পারে। সভাপতি এবং তাহার অধীন পরিদর্শক সকল সহযোগী ব্যাঙ্ক পরিচালনের উপর বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন।

কিন্তু এই একত্রীকরণে কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমাদের দেশে সকল অঞ্চলের অবস্থা এক নহে। বিশেষত, গ্রামাঞ্চল এবং সহর এই দুই বিশেষ বিভাগ আমাদের মনে রাখিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কিংএর ধারার বিশেষ রূপ আছে। সেজন্য মনে হয় গ্রামাঞ্চলের ব্যাঙ্ক ও সহরের ব্যাঙ্ক একত্রীভূত করা উচিৎ নহে। তবে ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে গ্রামে সাধারণত ব্যাঙ্ক না হইয়া সমবায়-ব্যাঙ্ক মারফৎ কাজ হওয়া অধিক সুবিধাজনক।

এই সহযোগিতার মধ্য দিয়া যে নূতন ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা গঠিত হইয়া উঠিবে তাহাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারিবে। মোটামুটি কয়েকটি বড় ব্যাঙ্কের চারিধারে আরও কয়েকটি করিয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান জড়িত হইয়া কাজ করিতে থাকিবে। কিন্তু একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। এই সহযোগিতা এবং যোগাযোগ স্থাপনের জন্য যে বৃহত্তর সত্তার সৃষ্টি হইবে তাহার মধ্যে কোন দুর্ব্বল প্রতিষ্ঠান থাকিলে কুফল দেখা দিবে। সেজন্য বিশেষ ভাবে দেখা প্রয়োজন যে যে সকল ব্যাঙ্ক সহযোগিতা করিয়া নূতন ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সৃষ্টি করিবে তাহাদের বিক্রীত মূলধন, আদায়ীকৃত মূলধন এবং মজুত তহবীল কি তাহা দেখিতে হইবে। যদি কোন ব্যাঙ্ক এ সকল বিষয়ে অন্যায় পথে পরিচালিত হয় তাহা হইলে সেই ব্যাঙ্ককে সহযোগী হিসাবে গ্রহণ করা কঠিন, ব্যাঙ্ক পরিচালনে অন্য একটা পরিবর্ত্তনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে Demand liabilityর বেশীর ভাগ অংশই ব্যাঙ্ককে সকল সময় মজুত রাখিতে হয় বলিয়া কর্জ্জদাদন করিতে অনেক বাধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু যদি ব্যাঙ্ক এ ভাবে টাকা আমানত গ্রহণ করেন যে অনেক দেয় টাকা time liability এই পর্য্যায়ে জমা থাকে, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে সুবিধা হয়। অধিকদিনের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিয়া অথবা সেভিংস সার্টিফিকেট বা ক্যাশসার্টিফিকেট দিয়া এই উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সফল হইতে পারে। তাহা হইলে যে টাকা এই সকল বাবদে ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হইবে তাহার জন্য বিশেষ হারে সুদ দিয়াও ঐ টাকা দাদন করিয়া ব্যাঙ্ক ব্যাবসায় বেশ ভাল ভাবে চলিতে পারে।

ব্যাঙ্ক বিষয়ে কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতসরকার একটি আইন পাশ

করিয়াছেন। তাহাতে ব্যাঙ্ক পরিচালন বিষয়ে নানাবিধ নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। পরিশেষে আমরা তাই সকল বিধির বিষয় আলোচনা করিব।

Banking Companies Act 1949 অনুসারে ব্যাঙ্কের কর্জ্জ দাদন বিষয়ে আইন করা হইয়াছে। প্রথমত ব্যাঙ্কের ডিরেক্টারকে বা যে কোম্পানীতে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার আছেন, সেই কোম্পানীকে কোন বন্ধক না রাখিয়া কর্জ্জদাদন বে-আইনী করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্জ্জদাদন বিষয়ে প্রত্যেক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে রিপোর্ট চাহিবেন এবং উচিৎ মনে করিলে কর্জ্জদাদন বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন। ১৯৫১ সাল নাগাৎ প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে দৈনিক কার্য্যের শেষে নগদ টাকা, সোনা এবং কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতিতে একত্র করিয়া ব্যাঙ্কের সকল আমানতি টাকার অন্তত শতকরা দুই ভাগ পরিমাণ মজুত রাখিতে হইবে। বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি (assets) থাকিবে তাহা সকল আমানতি টাকার অন্তত শতকরা ৭৫ ভাগ হওয়া চাই। প্রত্যেক ব্যাঙ্কে আদায়ীকৃত মূলধন বিষয়েও আইন করা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকারের ব্যাঙ্কের জন্য বিভিন্ন মূলধন আদায় না হইলে ব্যাঙ্কিং কাজ করা বে-আইনী হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

যে সকল ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হয় নাই তাহাদিগকেও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালন পদ্ধতি হিসাবে চলিতে হইবে। Demand liabilityর শতকরা ৫ টাকা হিসাবে এবং time liabilityর শতকরা দুই টাকা হিসাবে টাকা প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে নগদ জমা রাখিতে হইবে অথবা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হইবে। যে সহরে ব্যাঙ্ক পরিচালিত হইতেছে তাহার বাহিরে নূতন শাখা উদ্বোধন করিতে হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

ব্যাঙ্ক জগতে বহু দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া ভারতসরকার এই কঠিন বিধিনিষেধকে সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আশা করা যায় যে এ সকল বিধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া ব্যাঙ্ক জগতে সুফল দেখা দিবে। কিন্তু ব্যাঙ্কিং ব্যাপারে সকলের মূলে রহিয়াছে আস্থা। সে জন্য যদি পুনরায় আস্থা ফিরিয়া আসে ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে ব্যবসা করা সহজ হইবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের দেশে সাধারণ ভাবে প্রত্যেক লোকের আয়ের পরিমাণ এত স্বল্প যে ব্যাঙ্কের হাতে ছাড়িয়া রাখিবার অর্থের খুবই অভাব। ইহাও আমাদের দেশে ব্যাঙ্কের সু-প্রসারের পথে বাধার সৃষ্টি করিতেছে।

যাই হোক ন্যায়পথে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালনে নূতন ব্যাঙ্ক আইনের বিধিনিষেধ অনুসারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতায় এবং সম্ভব হইলে একত্র হইয়া কাজ করিলে আমরা ব্যাঙ্কিং জগতে অন্যান্য দেশ হইতে পিছনে পড়িয়া থাকিবার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

ভলটেয়ার

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের অনুবৃত্তি)

Zadig গল্পের নায়ক বেবিলনের Zadig নামক এক দার্শনিক। মানুষের যতটা জ্ঞান থাকা সম্ভব, তাহা তাঁহার ছিল। সেমিরানাম্নী এক মহিলাকে ভালবাসেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল। একদিন দস্যুহস্ত হইতে সেমিরাকে রক্ষা করিতে গিয়া তিনি চক্ষুতে আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। চিকিৎসার জন্য মিশরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হার্মিসকে আনা হইল। তিনি রোগীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, চক্ষু নষ্ট হইয়া যাইবে। কবে কোন সময় দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইবে, তাহাও গণনা করিয়া বলিয়া দিলেন। আরও বলিলেন, যে আঘাত যদি দক্ষিণ চক্ষুতে হইত, তাহা হইলে আরোগ্য করা যাইত, কিন্তু বাম চক্ষুতে বলিয়া তাহা সম্ভব হইবে না। বেবিলনের অধিবাসিগণ শুনিয়া দুঃখিত হইল এবং হার্মিসের জ্ঞানের তারিফ করিতে লাগিল। জাডিগের চক্ষুর ক্ষত কিন্তু শুকাইতে আরম্ভ করিল এবং দুই দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া গেল। তখন এক গ্রন্থ লিখিয়া হার্মিস নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়া দিলেন যে জাডিগের চক্ষুর আরোগ্যলাভ করা উচিত হয় নাই। জাডিগ সে গ্রন্থ স্পর্শও করেন নাই।

আরোগ্যলাভ করিয়াই জাডিগ সেমিরার নিকট গমন করিলেন। কিন্তু গিয়া শুনিলেন অন্য একজনের সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। এক চক্ষু লোককে তো আর বিবাহ করা চলে না !

তখন জাডিগ এক কৃষক রমণীকে বিবাহ করিলেন। বিবাহের পরে স্ত্রীর ভালোবাসা পরীক্ষা করিবার জন্য এক বন্ধুর সহিত ষড়যন্ত্র করিলেন। স্থির হইল জাডিগ মৃত্যুর ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকিবেন। তাঁহার বন্ধু তখন গিয়া তাঁহার স্ত্রীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিবেন। নির্দিষ্টদিনে বন্ধু গিয়া দেখিলেন, জাডিগ মৃতের মত পড়িয়া আছেন, তাঁহার স্ত্রী রোদন করিতেছেন। বন্ধু কিছুক্ষণ সান্ত্বনার কথা বলিয়া পরে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। জাডিগের স্ত্রী প্রথমে ভীষণ আপত্তি করিয়া পরে সম্মত হইলেন। জাডিক সেই মুহূর্ত্তে উঠিয়া পড়িলেন এবং বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া বনে চলিয়া গেলেন।

বনবাস ত্যাগ করিয়া জাডিগ এক রাজার উজীর হইলেন। তাঁহার চেষ্টায় রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল এবং প্রজাগণ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে রাণী তাঁহার প্রেমে পড়িয়া গেলেন।

রাজা দুই জনকেই বিষ প্রয়োগে হত্যা করিতে মনস্থ করিলেন। জানিতে পারিয়া জাডিগ আবার বনবাসী হইলেন।

বনে গিয়া জাডিগের অন্তঃকরণে নির্বেদ সঞ্জাত হইল। মনে হইল মনুষ্য-জাতি বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের এক কণার উপর অবস্থিত, পরস্পর হত্যাকারী। এক দল কীটমাত্র। এই সত্য উপলব্ধি করামাত্র তাঁহার মনের গ্লানি বিদুরিত হইয়া গেল। তিনি বিশ্বের ইন্দ্রিয়াতীত রূপের ধ্যান করিতে লাগিলেন। হঠাৎ রাণীর কথা মনে পড়িয়া গেল। হয়তো তাঁহার জন্য রাণীকে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছে. এই কথা মনে হইবামাত্র বাস্তব জগতের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল এবং তিনিও বনবাস ত্যাগ করিয়া লোকালয়ে ফিরিয়া আসিলেন।

পথে যাইতে যাইতে জাডিগ দেখিতে পাইলেন, একটা লোক একটি

ফ্রেডারিক দি গ্রেট

স্ত্রীলোককে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতেছে। স্ত্রীলোকটির সাহায্যে অগ্রসর হইলে লোকটি তাহাকে আক্রমণ করিল। আত্মরক্ষার জন্য জাডিগ সেই দুর্বৃত্তকে প্রহার করিলেন। সেই প্রহারে লোকটির মৃত্যু হইল। স্ত্রীলোকটী তখন তাহার প্রণয়ীকে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া জাডিগকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে জাডিগ বন্দী হইয়া ক্রীতদাসে পরিণত হইলেন। প্রভুকে দর্শন-শাস্ত্র শিক্ষা দিয়া জাডিগ তাহার বিশ্বাস অর্জন করিলেন। তাঁহার পরামর্শে রাজা বিধবাদের সহমরণ বন্ধ করিবার জন্য এক আইন প্রণয়ন করিলেন। সেই আইনে বিধিবদ্ধ হইল কোনও বিধবা সহমরণে ইচ্ছুক হইলে, সহমরণের পূর্বে কোনও সুন্দর পুরুষের সহিত তাঁহাকে এক ঘণ্টা কাটাইতে হইবে।

এইরূপে গল্প চলিয়াছে।

১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে Frederickএর সহিত Voltaireএর পত্র ব্যবহার আবদ্ধ হয়। Frederick তখনও যুবরাজ, The great হন নাই। ভলটেয়ারকে লিখিত প্রথম পত্রে ফ্রেডারিক লিখিয়াছিলেন "আপনি ভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। আমি যে আপনার সমকালে জন্মলাভ করিয়াছি,ইহা আমার জীবনের একটি বিশিষ্ট গৌরব বলিয়া মনে করি।" ফ্রেডারিক স্বাধীন চিন্তার উপাসক (Freethinker) ছিলেন। ভলটেয়ার আশা করিয়াছিলেন, যে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি জ্ঞানালোক বিস্তারে সাহায্য করিবেন এবং Dionysius এর উপর প্লেটো যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, ফ্রেডারিকের উপর তিনিও সেইরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইবেন। ফ্রেডারিকের পত্রের উত্তরে তাঁহার প্রশংসা করিয়া ভলটেয়ার যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে ফ্রেডারিক সেই প্রশংসাতে আপত্তি করেন। উত্তরে ভলটেয়ার লিখিয়াছিলেন "চাটু-বাদের বিরুদ্ধবাদী নরপতি অভ্রান্ত-বাদের (Infallibility) বিরুদ্ধ বাদী পোপের সহিত তুলনীয়।" Anti-machiavel গ্রন্থে ফ্রেডারিক যুদ্ধের অনৌচিত্য এবং শান্তিরক্ষা সম্বন্ধে রাজার দায়িত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভলটেয়ার আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন। কয়েকমাস পরেই কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ফ্রেডারিক Silesia আক্রমণ করিলেন। ইয়োরোপ একপুরুষ স্থায়ী রক্তস্রোতে নিমজ্জিত হইল।

১৭৪৫ সালে প্রণয়িনী সহ প্যারিসে ফিরিয়া আসিয়া ভলটেয়ার French Academyর সভ্য হইবার জন্য চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী ক্যাথলিক বলিয়া তিনি আপনাকে অভিহিত করেন এবং অক্লান্ত ভাবে মিথ্যা বলিতে থাকেন। সেবার তাঁহার চেষ্টা সফল না হইলেও, পরবৎসর তিনি Academyর সভ্য নির্ব্বাচিত হন। তখন তিনি Academyতে যে বক্তৃতা প্রদান করেন, ফরাসী সাহিত্যে তাহা উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য বলিয়া (classic) পরিগণিত হইয়াছে।

১৭৪৮ সালে ভলটেয়ার প্রণয়িনী একটা নূতন প্রণয়ী লাভ করেন জানিতে পারিয়া ভলটেয়ার ভীষণ রুষ্ট হন। কিন্তু Mrrquis de St. Lambert (নূতন প্রণয়ী) ক্ষমা প্রার্থনা করায় বিগলিত হইয়া বলিলেন "তা—বেশ করেছ! তুমি যুবক, আমি বৃদ্ধ। তোমার প্রতি

মার্কিজের অনুরাগ অসঙ্গত নয়। স্ত্রীলোকের স্বভাবই এই। আমি Richelieuকে স্থানচ্যুত করেছিলাম। তুমি আমাকে বহিষ্কৃত করেছো। এই রূপই হয়ে থাকে। একটা পেরেক অন্য পেরেককে বাহির করিয়া দেয়। এইরূপে সংসার চলে।” ১৭৪৯ সালে সন্তান প্রসবে Mme du Chatelet এর মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে তাহার স্বামী ও দুই প্রণয়ীই উপস্থিত ছিলেন। কেহই কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন নাই। প্রত্যেকের প্রতি সমবেদনায় প্রত্যেকের হৃদয় আর্দ্র হইয়াছিল।

ইহার পরে ফ্রেডারিক ভলটেয়ারকে তাঁহার Potsdamএর রাজ সভায় নিমন্ত্রণ করেন এবং পাথেয় বাবদ ৩০০০ ফ্রাঙ্ক পাঠাইয়া দেন। ১৭৫০ সালে ভলটেয়ার বার্লিনে উপনীত হন।

বার্লিনে ভলটেয়ার প্রচুর সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিলেন এবং ফ্রেডারিকের ব্যবহারে পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সন্তোষ স্থায়ী হয় নাই। দুই বৎসর পরে বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ হয় এবং ভলটেয়ার বার্লিন হইতে পলায়ন করেন। কিন্তু জার্মাণির সীমান্ত অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই জানিতে পারিলেন, ফরাসী সরকার তাঁহার প্রতি নির্বাসন দণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

Valtaireএর “An Essay on the morals and the Spirit of the nations from Charlemagne to Louis XIII” গ্রন্থই এই নির্বাসন দণ্ডের কারণ। এই গ্রন্থ তাহার লিখিত সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে বৃহত্তম এবং তাঁহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। কাইরীতে অবস্থান কালে Madame du Chateletএর তৎকালীন প্রচলিত ইতিহাসের সমালোচনা হইতে ইহার উৎপত্তি। Madame বলিয়াছিলেন “বর্ত্তমান ইতিহাসের সহিত পঞ্জিকার পার্থক্য কি? ইহা তো ঘটনাপরম্পরা একত্র সমাবেশ মাত্র। কোন্ রাজা কখন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, কে কাহার পুত্র, কাহার সহিত কাহার যুদ্ধ হইল, তাহা জানিয়া লাভ কি? কোনও ঘটনার সহিত অন্য ঘটনার সম্বন্ধ বর্ণনার চেষ্টা এ ইতিহাসে পাওয়া যাইবে না।” ভলটেয়ার বলিয়াছিলেন “ইতিহাসে দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ না করিলে এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলীর অন্তরালে মানব মনের ইতিহাস অনুসন্ধান না করিলে, প্রকৃত ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়। ইতিহাস রচনার কাজ দার্শনিকের। সকল জাতির মধ্যেই ইতিহাসের সহিত উপকথা মিশিয়া গিয়াছে এবং বহু শতাব্দীর ভ্রান্তি-জালে মানুষের মন এতই জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, যে দর্শনের প্রয়োগ দ্বারাও সে ভ্রান্তির অপনয়ন সহজসাধ্য নহে। ভবিষ্যতে আমরা যাহা চাই, ইতিহাসে তাহারই উপযোগী করিয়া অতীতকে রূপান্তরিত করি। এইরূপ ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যাহা ইচ্ছা তাহাই ইতিহাস দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে।”

এই ইতিহাস লিখিতে ভলটেয়ারকে বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল; বন্ধু লোকের নিকট পত্র লিখিয়া প্রকৃত ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ঘটনাবলীর প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহই ইতিহাস রচনায় জন্য একমাত্র প্রয়োজন নহে। সংগৃহীত ঘটনাবলীর একত্ববিধানকারী তত্ত্বের (principle) আবিষ্কার এবং সেই তত্ত্বসূত্রে ঘটনাবলী গ্রথিত করা ইতিহাসের পক্ষে অপরিহার্য্য। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সংস্কৃতির ইতিহাসই এই সূত্র। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে তাঁহার ইতিহাসে রাজাদিগের কাহিনী থাকিবে না; থাকিবে প্রজা সাধারণের কথা, থাকিবে যে সমস্ত শক্তি সমাজে পরিবর্ত্তন সাধন করে, সেই সমস্ত শক্তি ও তাহা হইতে উদ্ভূত আন্দোলনের কাহিনী। যুদ্ধের বর্ণনা থাকিবে না, থাকিবে মানব-মনের অগ্রগতির ইতিহাস। ইতিহাসের যে চিত্র তিনি মনে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহাতে যুদ্ধ ও বিপ্লবের জন্য সামান্য স্থানই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এক বন্ধুকে তিনি লিখিয়াছিলেন, “আমি যুদ্ধের ইতিহাস লিখিতে বসি নাই, বসিয়াছি সমাজের ইতিহাস লিখিতে, পরিবারের মধ্যে মানুষ কি ভাবে বাস করে, এবং কোন্ কোন্ কলার অনুশীলন করে তাহাই বর্ণনা করিতে। আমার উদ্দেশ্য মানবমনের ইতিহাস রচনা করা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় বর্ণনা নয়; বড় বড় লর্ডদিগের ইতিহাস লেখাও আমার উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। বর্ব্বর অবস্থা অতিক্রম করিতে মানুষ কোন্ পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাই আমি আবিষ্কার করিতে চাই”। ইতিহাস হইতে রাজাদিগের বর্জ্জনেই দেশের শাসনযন্ত্র হইতে তাহাদিগের বহিষ্কারের সূত্রপাত। ভলটেয়ারের ইতিহাস হইতে Baron দিগের সিংহাসনচ্যুতি আরম্ভ। ইহাই প্রথম দার্শনিক ইতিহাস. ইয়োরোপে মানব মনের ক্রমবিকাশের কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার আবিষ্কারের ইহাই প্রথম সুষ্ঠু উদ্যম। এই উদ্যমে অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যার স্থান নাই। প্রচলিত ধর্ম্মতত্ত্বের ভিত্তির উপর এইরূপ ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। Buckle বলেন ভলটেয়ারের এই গ্রন্থে আধুনিক ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের (Historical science) ভিত্তি রচিত হইয়াছে।” গিবন, নাইবুথর্, বাক্ল্ ও গ্রোট তাঁহার পন্থা অনুসরণ করিয়া ইতিহাস লিখিয়াছেন। এখনও এই ক্ষেত্রে কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে সক্ষম হন নাই।

সত্য বলিতে গিয়া ভলটেয়ার সকলেরই বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। পুরোহিত সম্প্রদায় রুষ্ট হইয়াছিলেন, কেননা ইয়োরোপে প্রাচীন ধর্ম্মের উপর খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিজয় ও তাহার দ্রুত প্রসারকে ভলটেয়ার রোমক সাম্রাজ্যের সংহতি—বিনাশের ও বর্ব্বরদিগের দ্বারা তাহার পরাজয়ের কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাহাদের রোষের আরও একটা কারণ এই ছিল, যে তিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া চীন, ভারতবর্ষ ও পারস্যদেশ ও তাহাদের ধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং প্রচলিত ইতিহাস-গ্রন্থে জুড়িয়া ও খ্রীষ্টান দেশসকলের বর্ণনা যতটা স্থান অধিকার করিয়া থাকিত, তাঁহার গ্রন্থে তাহা অপেক্ষা স্বল্পতর স্থান তাহার জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল। ফলে, পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে এক নূতন জগত উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল; ভূ-পৃষ্ঠে এশিয়া যতটা স্থান ব্যাপিয়া আছে, ভলটেয়ারের ইতিহাসে তাহা তদনুপাতিক স্থানলাভ করিয়াছিল। ইয়োরোপীয়েরা বুঝিতে পারিয়াছিল যে ইয়োরোপ তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর মহাদেশের সংস্কৃতির পরীক্ষাক্ষেত্র মাত্র। যে ইতিহাস হইতে এইরূপ ফল

উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহার দেশপ্রেম-বর্জ্জিত লেখককে ক্ষমা করা সম্ভবপর ছিলনা। যে লেখক আপনাকে মুখ্যতঃ মানব ও গৌণত ফরাসী বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন, রাজার আদেশে ফ্রান্সে তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল।

নির্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ভলটেয়ার কোথায় যাইবেন প্রথমে তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। জেনিভার সন্নিকটে উপযুক্ত স্থানের অনুসন্ধান করিতে করিতে 'Les-Dolices' নামক eslateএর সন্ধান পাইয়া তিনি তাহা কিনিয়া ফেলিলেন এবং তথায় বাস স্থাপন করিলেন। চারি বৎসর তথায় বাস করিয়া ১৭৫০ সালে সুইস ও ফরাসী সীমান্ত প্রদেশে (সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে) Ferney নামক স্থানে তিনি স্থায়ী বাস স্থাপন করেন। মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব পর্য্যন্ত তিনি Ferneyতেই ছিলেন।

Ferneyতে ভলটেয়ার নিজের বাগানে স্বহস্তে কাজ করিতেন, অনেক বৃক্ষও তিনি রোপণ করিয়াছিলেন। তাহাদের ফলভোগ করিবার আশা তাঁহার ছিলনা—বয়স তখন তাঁহার ৬৪ বৎসর। একদিন তাঁহার এক ভক্ত, তিনি ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের জন্য অনেক কিছু করিয়াছেন বলায়, ভলটেয়ার বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁ, চারি হাজার বৃক্ষ আমি রোপন করিয়া গেলাম।"

আকাশ ও মৃত্তিকা

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

কবিত্ব কল্পনা দিয়া যদি ভগবান্,
গ'ড়েছিলে আমার এ প্রাণ ;
যদি প্রভু, মর্ম্মমাঝে দিয়েছিলে দৈব অসন্তোষ
জৈবক্ষুধাতৃষা তবে কেন মোর তরে ?
অমৃতের লাগি' যার আকুল অন্তর—
তারো কি প্রাণান্ত হবে
প্রাণ-ধর্ম্ম পালিবার তরে
শাশ্বত প্রথায় ?

হায়,
এ দেহের অন্তহীন দাবী,
পশুসম রিরংসার এ কলুষ ভার,
বুভুক্ষার তীব্র জ্বালা—
বহিতে সহিতে হবে সবাকার মত
নতশীরে আজীবন ?
এ সবার হাত হ'তে নাহি কি নিস্তার ?

কি কদর্য্য পরিবেশ
সুন্দরের পূজারীর লাগি'!
গোলাপে কণ্টকসম—
সুললিত নারীদেহে ছুষ্টক্ষতপ্রায়
কবি ভাগ্যে চিরন্তন এ কি অভিশাপ—
এ কি বিড়ম্বনা!
সৃষ্টিছাড়া ক'রে যার গ'ড়েছিলে প্রাণ
কেন তবে তার তরে সে আদিম সৃষ্টির বিধান
দুঃসহ নির্ম্মম ?
বিশ্বের আনন্দ লাগি' যারে তুমি ক'রেছ সৃজন,
সে যে অনুক্ষণ
আনন্দের সিন্ধুতটে বসি' বসি' করিছে ক্রন্দন ?
চিরপিয়াসীর বুকে সাহারার তৃষা—
কীর্ত্তি—যশ—অমরতা সব মিথ্যা কথা!

আলেয়ার প্রলোভন!
মায়ামরীচিকা!
উদ্বাহুবামনচিত্তে চাঁদের স্বপন!
কে চাহে অমর হ'তে মরণের পরে,—
জীবনে যে পেল শুধু ব্যর্থতা বিশাল ?

হায় ভগবান্,
বক্ষ যার দিবারাতি ছন্দে স্পন্দমান,
চক্ষে যার কল্পনার মায়ার অঞ্জন—
তারেও করেনা ক্ষমা
দয়াহীন সংসার তোমার!
চিত্ত যার ভাবলোকে করিছে বিহার—
তারো তরে বাস্তবের পঙ্কিল পল্বল ?
তবে তার কি আশ্বাস—
কিসের সান্ত্বনা ?
কালস্রোতে ভাসাইয়া কাগজের তরী
তবে কোন্ ফল ?

তথাগতের পথে

নরেন্দ্র দেব

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বৈভার ও বিপুল পাহাড়কে পশ্চাতে ফেলে রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি রত্নগিরির উদ্দেশে। বৈভার ও বিপুল শিখরে অবস্থিত হিন্দু ও জৈনমন্দিরগুলি দূর থেকে ক্রমেই ক্ষুদ্রতর হ'য়ে আসছিল। রত্নগিরি বিপুল পর্বতেরই দক্ষিণ ভাগে। প্রকৃতপক্ষে একে বিপুল পর্বতেরই একটা অংশ বলা চলে। এই রত্নগিরির দক্ষিণ অংশেই হ'ল আমাদের গন্তব্য গিরি গৃধ্রকূট। গৃধ্রকূট বেশী উঁচু নয়। উপরে ওঠবার সুবিধার জন্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকে পর্বত দেহ কেটে কেটে সিঁড়ির মতো করে দেওয়া হয়েছে। উপরের দিকে বেশ একটি বড় গুহা দেখতে পাওয়া যায়। এইটিকেই 'আনন্দ গুহা' বলা হয়। এইখানে তথাগতের প্রধান শিষ্য আনন্দ তপস্যা করতেন।

আনন্দ গুহা ডাইনে রেখে পথ ঘুরে পর্বতের আরও উপরে উঠেছে।

গৃধ্রকূট পর্ব্বতশৃঙ্গে ওঠবার শৈল সোপান

দক্ষিণে আরও কয়েকটি গুহা আছে, এগুলিকে অতিক্রম করে উপরে উঠলে একটি সমতল ক্ষেত্র পাওয়া যায়। এই চত্বরটির চারিদিক ইট দিয়ে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। তথাগত গৌতম বুদ্ধ এইখানে বসেই বোধ করি শিষ্যবর্গকে উপদেশ দিতেন। বৌদ্ধযুগের সেই শ্রেষ্ঠ দিনগুলির কথা স্মৃতি পথে উদিত হ'য়ে সমস্ত হৃদয় মন শ্রদ্ধায় অবনত হ'য়ে পড়ে। হ্যাঁ, ঈশ্বরোপাসনা—সর্বশক্তিমান সর্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের ধ্যান ধারণার উপযুক্ত স্থানই বটে। অসীমের সঙ্গে সীমার যোগ দেখে এখানে আত্মহারা হয়ে পড়তে হয়। সমগ্র চিত্ত হ'তে একটা বিরাট সত্তার উপলব্ধি জেগে ওঠে যেন। এই পবিত্র ভূমে ভগবান বুদ্ধদেবের পদরজ মিশে আছে, আছে আনন্দ মহাস্থবির মৌদ্গল্যায়ন সারিপুত্তদের চরণরেণু, আছে বৌদ্ধভক্ত মহাপ্রাণ জীবকের পদধূলি।

গৃধ্রকূট থেকে নামবার পথে অল্প দূর এসেই দক্ষিণ পশ্চিমে পাওয়া যায় জীবকের আম্র কানন। রাজবৈদ্য জীবক ছিলেন মহারাজ বিম্বিসারের চিকিৎসক। মগধে তাঁর জন্ম। তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। ইনি তথাগতের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। স্বীয় আম্রকাননে এক মনোহর বিহার নির্মাণ করিয়ে ভগবান বুদ্ধদেবের ব্যবহারের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। আজ সেটির ধ্বংসাবশেষ গভীর জঙ্গলে সমাকীর্ণ। আমরা গৃধ্রকূট হতে নেমে বাণগঙ্গা যাবার পথে গাড়ী একটু ঘুরিয়ে নিয়ে 'মণিয়ার মঠ' দর্শন করতে গেলুম।

গৃধ্রকূটের চূড়ায় এই গিরি চত্বরে ভগবান তথাগত শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেন

'মণিয়ার মঠ' নামটা একটু রহস্যজনক। একটা উঁচু মাটির ঢিবির উপর এখানে একটি ছোট্ট জৈনমন্দির ছিল। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে জেনারেল কানিংহাম—যাঁর কাছে ভারত তার লুপ্তপ্রায় অতীত গৌরবের প্রত্নতাত্ত্বিক পরিচয় ও প্রমাণসমূহের জন্য ঋণী, তাঁর সন্দেহ হয় যে এ ঢিবির মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও বৌদ্ধস্তূপ চাপা পড়ে আছে। জৈনমন্দিরের কোনও ক্ষতি না করে তিনি একটু আধটু খোঁচাখুঁচি চালিয়েই দেখেন তাঁর

অনুমান মিথ্যা নয়। তিনটি মূর্তি তিনি এই ঢিবির তলা একটু খসিয়েই আবিষ্কার করেন। একটি পালঙ্কশায়িনী মায়ার শিয়রে শ্রমণবেশে বুদ্ধদেব, আর একটি সপ্তফণাবিস্তৃত এক নাগছত্র তলে দণ্ডায়মান একটি নাগসাধুর মূর্তি, যিনি জৈনতীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ বলে অনুমিত হয়েছেন, তৃতীয়টি এত ভোঁতা যে কার মূর্তি সেটা সনাক্ত করতে পারা যায় নি।

এর প্রায় ৪৫ বছর পরে ১৯০৫।৬ সালে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের Dr Blooh এখানে খননকার্য্য শুরু করেন। তিনি ঢিবির মাথার উপর থেকে ক্ষুদ্র জৈনমন্দিরটি ভেঙে উড়িয়ে দিয়ে একটি ইষ্টক নির্মিত বিরাট স্তূপ আবিষ্কার করেন। এই স্তূপটিকে এখন সযত্নে রক্ষা করবার চেষ্টা হয়েছে। মাথার উপর করোগেটেড টিনের এক চূড়া করে

এই স্তূপটিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে এর ভিত্তিমূল গুপ্তযুগে নির্মিত হলেও এর উপরিভাগ অনেকবারই নূতন নূতনভাবে নির্মিত হয়েছিল। কারণ ভিতরের অংশ যে মাপের ইটে তৈরী হ'য়েছিল, উপরের অংশ তার চেয়েও বড় আকারের ইটে নির্মিত হ'য়েছিল দেখা যায়। তাছাড়া আরও একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায় যে এটি প্রথম আরম্ভ হয়েছিল চক্রাকারে, তারপর চতুষ্কোণে রূপান্তরিত হয়, তারপর আবার কয়েকবার চক্রাকারপ্রাপ্ত হয়েছিল। এই স্তূপের উপরে উঠবার সিঁড়ি আছে এবং চারিপাশে প্রদক্ষিণ পথ বা বারান্দা ঘেরা আছে। সবার উপর শেষ যে গাঁথনি হয়েছিল সে আর ইটে তৈরী হয়নি, পাথরে নির্মিত হয়েছিল। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে এই প্রস্তরাংশের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দু,

চুণবালির গড়া মূর্ত্তির দুটি এখানে বড় ক'রে দেখানো হয়েছে

ছাউনি দিয়ে একে ঝড়বৃষ্টির আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রাখা হ'য়েছে। এই স্তূপের ভিত্তিমূলের চারিপাশ ঘিরে অতি সুন্দর সুন্দর চুণ বালির গড়া মূর্তি ছিল। মূর্তিগুলি তখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি। প্রত্যেক মূর্তিটি প্রায় ২ ফুট উঁচু, কোনোটি পুষ্পমাল্য শোভিত শিবলিঙ্গ, কোনওটি মুকুট-শোভিতশীর্ষ চতুর্ভুজ বানাসুরের মূর্তি, কোনওটিবা পঞ্চনাগ ও নাগিনীর ফণাধরা মূর্তি, কোনওটি পর্বত শিখরে উপবিষ্ট ও সর্বাঙ্গে সর্পবেষ্টিত গণেশ মূর্তি, কোনওটি ষড়ভুজ নটরাজ শিব—ব্যাঘ্রচর্মশোভিত হয়ে ভুজঙ্গ নিয়ে নৃত্য করছেন। এই মূর্তিগুলি থেকে প্রমাণ হয়েছিল যে এই স্তূপটি গুপ্তযুগে নির্মিত হয়েছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে একমাত্র নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত গণেশ মূর্তিটি ভিন্ন অন্য আর সব মূর্তিগুলি অপহৃত হয়েছে।

বৌদ্ধ ও জৈন পর পর তিনটি ধর্মের সংস্পর্শে এসেছিল এই 'মণিয়ার মঠ'। পুরাকালে এর কি সংজ্ঞা ছিল জানা যায় না, জৈন আমলেই নাকি এর নাম হয়েছিল 'মণিয়ার মঠ'।

১৯০৫-৬ সালের খননকার্য্যের পর নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে এটি কোনও মন্দির বা দেবদেউল নয়, কারণ এর মধ্যে প্রবেশের কোনও দ্বার নেই। একেবারে ভিত্তিমূলে বা তলদেশে সামান্য একটু উন্মুক্ত পথ আছে। এর ভিতর খনন করে প্রচুর ভস্ম পাওয়া গেছে। তাতে মনে হয় মৃত সাধুগণের চিতাভস্ম হয়ত সংরক্ষিত হ'ত এইখানে। এই মূল স্তূপের প্রাঙ্গণে আশে পাশে ইষ্টকনির্মিত অসংখ্য বেদী দেখতে পাওয়া যায়, কোনওটি গোল, কোনওটি চতুষ্কোণ, কোনওটিবা ষটকোণ। এই বেদীগুলি যে কি কাজে লাগতো তা অনুমান করা আজ কঠিন। তবে

এটা নিঃসন্দেহ বোঝা যায় যে ধর্মসংক্রান্ত কোনও অনুষ্ঠানেই এগুলির প্রয়োজন হ'ত। অথবা পরলোকগত প্রত্যেক সাধু যাদের মৃতদেহের ভস্মাবশেষ এই ভস্মস্তূপে রাখা হ'ত, তাদের স্মৃতির উদ্দেশে বা আঁধার মৃত্যু পথে আত্মাকে আলো দেখাবার জন্ম এই বেদীগুলির উপর প্রদীপ জেলে দেবার প্রথা ছিল।

খননকার্য্যের সময় মাটির ভিতর থেকে এখানে নানা আকারের প্রচুর মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। কোনও কোনও পাত্র প্রায় জালার মত বড়—৪ফুট উঁচু এবং সর্বাঙ্গে অসংখ্য গাড়ুর মুখের মতো নল লাগানো। এই মৃৎপাত্রগুলির আকার কোনওটি ভুজঙ্গ-ফণার মতো, কোনওটির বা কীর্ত্তিমুখের আকার, কোনওটি মানবাকৃতি। সরু লম্বা গলা, তলাটি গোল, কাঁধের চারিদিকে আবার প্রদীপের সারিও দেখা যায় কোনও কোনওটির। এই ধরণের অসংখ্য মৃৎপাত্র এখানে পাওয়া গেছে বলে

বহুনলমুখ সংযুক্ত কলসাকার মৃৎপাত্র

কেউ কেউ বলেন, মণিয়ার মঠ ছিল সন্ন্যাসীদের কুমোরশালা! তাঁরা মাটির যা যা গড়তেন উপরওয়ালারা তা অনুমোদন করলে তাঁরা সেগুলি সন্ন্যাসীদের এই সরকারী চুল্লীতে পুড়িয়ে নিতেন।

এ অনুমান একেবারেই অসঙ্গত। Dr. Blooh-এর মতে এটি ছিল রাজগৃহের একটি 'সর্ব দেবায়তন'। অর্থাৎ, এখানে পূজা দিলে হিন্দুর তেত্রিশ কোটী দেবদেবীকে পূজা দেওয়া হ'ত। তবে কেউ যদি একথা বলেন যে, ঐ বহুমুখী মৃৎপাত্র বা কলসগুলি সম্ভবতঃ পবিত্র তীর্থসলিলে পূর্ণ করে অথবা দুগ্ধ মধুতে ভরে পূর্বোক্ত বেদীগুলির উপর পুষ্প চন্দনে চর্চ্চিত ক'রে উৎসর্গ করা হ'ত নাগ-পূজার উদ্দেশে, তাহ'লে সেটা অনেকটা সম্ভাব্য বলে গ্রাহ্য হ'তে পারে। নাগবৃন্দ গিয়ে ওই একাধিক নল মুখে পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করে দুগ্ধ মধু পানান্তে তৃপ্ত হয়ে বেরিয়ে আসতেন। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ সার জন মার্শাল কিন্তু বলেন—ওটি মন্দিরও নয়, দেউলও নয়, স্তূপও নয়। ওটি একটি বিরাট শিবলিঙ্গ! যেমন বিরাট শিবলিঙ্গ কাশ্মীরে বারমুলার সন্নিকটস্থ ফতেগড়ে দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে আরও আবিষ্কার, অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে এই স্তূপের দেওয়ালের ভিতর পিঠে যে সব চূর্ণবালি ও লাল পাথরে তৈরী নাগ নাগিনীর মূর্তি, সাপের ফণা ও কুণ্ডলি-পাকানো অজগর

নাগছত্রযুক্ত নাগরাজের মূর্ত্তি

দেখতে পাওয়া গেছে এবং উত্তর ভারতের নানা স্থানে নাগপূজায় ব্যবহৃত মাটির ঘটগুলি আজও অবিকল এইরকম আকারেরই তৈরী হয় দেখে নিঃসন্দেহে জানা গেছে যে এটি সেকালের একটি প্রসিদ্ধ 'নাগতীর্থ' ছিল। বিশেষতঃ পাষাণবক্ষে নাগমূর্ত্তি উৎকীর্ণকরা যে ভাস্কর্য্য শিল্পের নিদর্শন এখানে পাওয়া গেছে, তার উপর মণিনাগের নাম পর্য্যন্ত খোদাই করা রয়েছে দেখা গেছে। এ থেকে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে এই মণিয়ার মঠ আর অন্য কিছু নয়, এটি সেই প্রাচীন মণিনাগের পুণ্য পীঠস্থান। মহাভারতেও উল্লিখিত আছে যে মণিনাগের আবাসস্থল রাজগৃহ।

অর্ব্বুদঃ শক্রবাপী চ পন্নগৌ শক্রতাপ নৌ।
স্বস্তিকস্তালয়শ্চাত্র মণি নাগস্তথোত্তমঃ॥

(মহাভারত, সভা পর্ব্ব, ৯ম শ্লোক)

অর্থাৎ: ইহার নিকটে শক্রতাপক অর্বুদ নাগ, স্বস্তিক নাগ এবং মণিনাগের উৎকৃষ্ট ভবন রহিয়াছে।

১৯৩৭-৩৮ সালে আবার এখানে খনন কার্য্য শুরু হয়েছিল। সেই সময় জানা গেছে যে এই সব ইষ্টকনির্ম্মিত স্থাপত্য কার্য্যের তলদেশে অসংখ্য পাথরের তৈরী প্রাসাদ মন্দির ও গৃহাদি আছে। হয়ত এতদিনে সে সব আবিষ্কৃত হ'ত যদি না অর্থাভাবে খননকার্য বন্ধ থাকতো।

মণিয়ার মঠ প্রদক্ষিণ করে আমরা উত্তর-পশ্চিমের পথ ধরে অগ্রসর হলুম। মনে রাখতে হবে যে আমরা অনেকদূর এলেও এখনও সেই বৈভার পর্ব্বতের সীমানা ছাড়াতে পারিনি। মণিয়ার মঠ থেকে কিছুদূরে পাহাড়ের দক্ষিণ গায়ে দুটি গুহা-গৃহ দেখা যায়। এদুটিকে বলা হয়

সোনভাণ্ডার

'সোনভাণ্ডার'। বিশেষজ্ঞদের মতে এ পাহাড়ের পাথর ঠিক গুহা নির্ম্মাণের উপযোগী নয়, তাই পুবদিকের গুহার ছাদ সম্পূর্ণ ধ্বসে পড়ে গেছে এবং পশ্চিমদিকের গুহার ছাদ ও দেওয়ালে প্রকাণ্ড ফাট ধরেছে। পশ্চিমের গুহার মধ্যে একটি প্রবেশদ্বার রয়েছে, দক্ষিণে একটি গবাক্ষও আছে। এই গুহার অভ্যন্তরে প্রাচীর দেহলি শীর্ষে কি যেন সব শ্লোক লেখা ছিল, কিন্তু কালের সর্ব্ব বিধ্বংসী স্থূল হস্তাবলেপনে তা প্রায় অস্পষ্ট হ'য়ে এসেছে, আর পড়া যায় না। কেবল প্রবেশ দ্বারের বাইরে বামদিকের দেওয়ালে যে শ্লোকটি লেখাছিল সেটি এখনও মিলিয়ে যায়নি। এই লেখা থেকেই গুহা নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য কি এবং কোন সময় এই গুহা নির্ম্মিত হয়েছিল তা' জানা যায়। শ্লোকটি এই:—

নির্ব্বাণ লভ্যায় তপস্বী যোগৈঃ শুভেঃ গুহেঃ র্হৎ, প্রতিমা প্রতিষ্ঠে

আচার্য্য রত্নম মুনি বৈরদেবঃ বিমুক্তে কারয়াৎ—দীর্ঘতেজঃ

শ্লোকটির পাঠ সন্দেহজনক, কারণ মধ্যে মুছে গেছে। অর্থ—মোটামুটি এই, "জ্যোতির্ম্ময় মহামুনি বৈরদেব—গুরুগণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ রত্ন—তাঁরই আদেশে অর্হৎ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত এই দুটি গুহা নির্ম্মিত হ'ল তপস্বীগণের মুক্তি ও মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে।

জেনারেল কানিংহাম এই ধ্বংসাবশেষ গুহাদুটি প্রথম আবিষ্কার করেন। ভগ্নস্তূপ পরিষ্কার করে এটিকে সযত্নে রক্ষা করবার চেষ্টা করছেন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ। ভগ্ন অবস্থা দেখেও বোঝা যায় যে এই গুহাদ্বয়ের সম্মুখে গাড়ীবারান্দার মতো প্রশস্ত ঢাকা বারান্দা ছিল। তার সামনে ছিল ইট দিয়ে বাঁধানো চত্বর বা অঙ্গন। এখনও এর ধ্বংসাবশেষ কিছু কিছু রয়েছে। গুহার ছাদের উপর উঠবার পাহাড় কাটা সিঁড়ি রয়েছে দেখে মনে হয় হয়ত গুহাদ্বয় দ্বিতল ছিল। গুহার
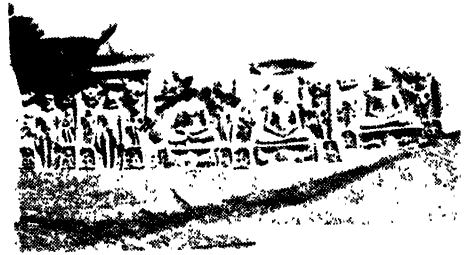
সোনভাণ্ডারস্থ পূর্ব্বগিরি গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ
জৈনতীর্থংকরগণের মূর্ত্তি

মধ্যে একটি গরুড়বাহন বিষ্ণুমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। মূর্ত্তির সুন্দর ভাস্কর্য্যকলা দেখে বোঝা যায় এটি গুপ্তযুগের তৈরী। এটি নাকি আগে বাইরের বারান্দায় উপুড় করা পড়েছিল। এটি যে পরবর্ত্তীকালে কেউ এখানে এনেছিলেন এরূপ সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে, যে-হেতু পাশের ছাদভাঙা গুহাটির দেওয়ালে সারি সারি ছোট বড় আকারের জৈনতীর্থংকরের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা আছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে কোনও জৈন ভক্ত জৈনসাধুদের বসবাসের জন্য এই গুহা নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। আর একটি 'শিখরাকার' কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ড ওখানে রয়েছে। এই প্রস্তর খণ্ডের শিখরাকার চারটি দিকই ত্রিভুজাকৃতি। প্রত্যেক দিকেই এক একজন জৈনতীর্থংকরের নগ্ন মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা রয়েছে। এই মূর্ত্তিগুলির পাদদেশে জোড়ায় জোড়ায় বৃষ, হস্তী, অশ্ব ও বানর উৎকীর্ণ করা আছে। এ থেকে বোঝা যায় যে এ মূর্ত্তি চতুষ্টয় জৈনদের চারটি আদি তীর্থংকর—ঋষভদেব, অজিতনাথ, সম্ভবনাথ এবং অভিনন্দন।

আমরা এইবার আমাদের রথ ফেরালুম জরাসন্ধের 'রণভূমির' দিকে। সোনভাণ্ডার সম্বন্ধে একটা গল্প এখানে প্রচলিত আছে যে ওটি নাকি মহারাজ জরাসন্ধের গুপ্ত ধনাগার। এর পথের সন্ধান নাকি

মণিয়ার মঠ থেকে কিছু দূরেই পর্ব্বতগাত্রে লেখা আছে। কিন্তু সে যে কি ভাষা, তা আজ পর্য্যন্ত কেউ নির্ণয় করতে পারেন নি। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই আঁচড়গুলির নামকরণ করেছেন "Sholl Insoriptions।" এ নাম যে কেন হ'ল তাও দুর্ব্বোধ্য! তবে স্থানটির পাথুরে রং কতকটা লালচে ধরণের প্রায় ঝিনুকের খোলের মতো বলা চলে। ষ্টেশন থেকে মাইল চারেক দূরে উদয়গিরির সানুদেশে খানিকটা প্রশস্ত

মণিয়ার মঠ

মনিয়ার মঠের প্রধান স্তূপের ভিত্তিমূলে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য্য শিল্প

সমতল স্থান—যেন মনে হয় পাথর দিয়ে বাঁধানো। আমাদের গন্তব্য বাণগঙ্গা থেকে এ স্থান মাত্র আধমাইল উত্তরে। এই সমতল ভূমির উপর হিজি-বিজি কতকগুলো এলোমেলো দাগ বা আঁচড়কাটা আছে। এই দুর্ব্বোধ্য অক্ষরগুলি যে নিরক্ষর ভাগ্যবানে বুঝতে পারবে তারই ভাগ্যে লাভ হবে গিরিব্রজপুরের নৃপতিগণের যুগ যুগ সঞ্চিত বার্হদ্রথ বংশের অফুরন্ত ধনভাণ্ডার। শোনা গেল হরফ পড়তে না পেরে কোনও কোনও ধনলোভী নাকি বলপ্রয়োগে এই রত্নভাণ্ডারে প্রবেশ ক'রতে উদ্যত হয়েছিলেন অর্থাৎ কামান বন্দুকের সাহায্যে পর্ব্বত ভেদ করে পথ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হতাশ হয়েছেন। এ পর্ব্বত নাকি ডিনামাইটও ফাটাতে পারে না, অতএব গঞ্জিকাসেবী পাণ্ডাদের এই গঞ্জিকাপুরাণ এইখানেই বন্ধ করে দেওয়া যাক।

'রণভূম্' বা জরাসন্ধের আখড়া নামে খ্যাত এই প্রাচীর ঘেরা স্থানটি সোনভাণ্ডার থেকে মাইল খানেক দূরে। জনশ্রুতি এই যে দ্বাপর যুগে মহাভারতে বর্ণিত মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেন এবং মগধেশ্বর মহাবীর জরাসন্ধের মধ্যে সুদীর্ঘ ২৮ দিন ব্যাপী মল্ল যুদ্ধ নাকি এই রাজকীয় মল্লভূমিতেই হ'য়েছিল এবং ভীমসেন কিছুতেই জরাসন্ধকে পরাস্ত ক'রতে না পেরে শেষ শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে অন্যায় উপায় অবলম্বনে সেই মহাবীরকে হত্যা করেন। গল্প যাই হোক, স্থানটা কিন্তু কুস্তীর

আখড়ার মতই। দুধের মতো সাদা নরম মাটি এখানে এই পাহাড়ের কোলে পাথরের বুকে। বাহুবলাভিলাষীরা এই মাটি নাকি মুঠো মুঠো নিয়ে সর্ব্বাঙ্গে মাখে, কপালে ছোঁয়ায়, জিভেও ঠেকায়! কারণ, তাদের বিশ্বাস যে এই মাটির গুণে তাদের দেহে অযুত হস্তীর বল সঞ্চারিত হবে।

করা হয়েছে। মহাকবি বাল্মিকী বলেছেন এই ক্ষীণাঙ্গী সুদর্শনা গিরি স্রোতস্বিনী গিরিব্রজের পঞ্চ শৈলের কণ্ঠে একগাছি কুসুম মাল্যের মতো শোভা পাচ্ছে।

দক্ষিণে আরও কিছুদুর অগ্রসর হয়ে ক্রমে আমরা বাণগঙ্গার

অজস্র মৃৎপাত্র

গৃধ্রকূটে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্ত্তি ও বৌদ্ধ আশ্রমের অন্যান্য নিদর্শন

'সুমাগধী' গিরি-নির্ঝরিণী

এই রণভূমের একপাশ দিয়ে একটি ক্ষুদ্র গিরি নির্ঝরিণী ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে। সম্ভবত এইটিকেই রামায়ণে 'সুমাগধী' নদী বলে বর্ণনা

পার্ব্বত্যকুলে এসে পৌছলুম। অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য এখানে। সমস্ত মন মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। (ক্রমশঃ)

পারিবারিক আয় বৃদ্ধির একটি সহজ উপায়, পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির কিছু কিছু আয় করা। প্রত্যেকে যদি কিছু কিছু আয় করে, তাহা হইলে সমষ্টিগত আয় নিতান্ত কম হয় না। কিন্তু প্রায়ই পরিবারে দেখা যায় যে এক ব্যক্তি আয় করে, আর সকলে বসিয়া তাহার আয়ের উপরে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহার ফলে আয়কারী ব্যক্তির উপর অত্যন্ত চাপ পড়ে। সংসারেরও অভাব মিটে না। অথচ পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিরা কিছু না করিয়া দিন কাটায়। এরূপ পরিবারে একদিকে অতিশ্রম ও অন্যদিকে পরম আলস্য দেখা যায়। একদিকে দায়িত্বের গুরুভারে অবসন্নতা, অন্যদিকে দায়িত্বহীনতাজনিত উচ্ছৃঙ্খলা। গৃহে শান্তি ও সুখের পরিবর্ত্তে কলহ ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়।

—সত্যাগ্রহ পত্রিকা

* * * *

আমাদের বিবেচনায় ভারত সরকার নিম্নলিখিত কার্য্যসূচী গ্রহণ করিলে জমীর অসুবিধার কতকটা প্রতিকার হইতে পারে।

(১) যে সকল জমি ভারত গবর্ণমেণ্টের সামরিক প্রয়োজনে বর্ত্তমানে লাগিতেছে না তাহা অধিকৃত (requisitioned) বা গৃহীত (acquired) এমন কি ক্রীত (purchased) হইলেও তাহার মালিকদিগকে প্রত্যর্পণ করা। ইহার দ্বারা সামরিক প্রয়োজন মিটিবে, অথচ জমিপ্রাপ্ত ব্যক্তির অসুবিধা ঘুচিবে। খাদ্যশস্যও উৎপন্ন হইবে। দেশের এই ঘাটতির দিনে ঘাটতি পূরণে সাহায্য হইবে। আমাদের বিশ্বাস, প্রত্যর্পণ করিতে হইলে যে সকল আর্থিক বা আইনগত বা অন্যবিধ অসুবিধার প্রশ্ন উঠিতে পারে তাহাদের সমাধান করা কঠিন হইবে না। অথবা ঐ জমিগুলিকে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিলে এই গবর্ণমেণ্ট উহা খাস মহাল রূপে গণ্য করিয়া ঐ সকল ব্যক্তিকে তাহাদের জমি রায়তি স্থিতিবান সত্বে বন্দোবস্ত দিতে পারে।

(২) সামরিক প্রয়োজনে যে সকল জমি রাখা আবশ্যক তাহাদের মালিকেরা যাহাতে প্রচলিত হারে দাম পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কারণ, সমাজের কোন শ্রেণীকে দরিদ্রতর করিয়া দিলে কোন না কোন সময়ে তাহাদের ভার কোন না কোন রূপে রাষ্ট্রের উপর বর্ত্তাইবে। তবে এবিষয়ে আইনগত অসুবিধা আছে। তাহা দূর করিতে পারিলে ভাল হয়।

(৩) ভারত গবর্ণমেণ্টের দেশরক্ষা বিভাগের কোন প্রতিনিধি এই সকল বিষয়ের সরজমিনে তদন্ত করিয়া অতি সত্বর ব্যবস্থা করুন, আমরা ইহা কামনা করি।

—সত্যাগ্রহ পত্রিকা

* * * *

ভারতে বর্ত্তমানে বৎসরে ২৬ লক্ষ টন লবণ দরকার হয়। উহার মধ্যে ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার টন লবণ ছাড়া আর সমস্ত লবণ ভারতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। উক্ত ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার টন লবণ প্রধানতঃ এডেন ও পাকিস্থান হইতে আমদানী হইয়া থাকে। সম্প্রতি ভারত সরকারের লবণ উপদেষ্টা কমিটি দিল্লীতে একটি সভায় স্থির করিয়াছেন যে, আগামী ১৯৫২ সালের মধ্যে ভারত যাহাতে লবণের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারে তৎপক্ষে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে। এজন্য ভারত সরকারের সল্ট কনট্রোলার শ্রী ডি এল মুখার্জ্জি বোম্বাইয়ে ভারতীয় লবণ প্রস্তুতকারক কোম্পানীগুলির প্রতিনিধিদের সহিত একটি বৈঠকে সমবেত হন। এই বৈঠকে পশ্চিম উপকূল, বোম্বাই, প্রভৃতি সমস্ত অঞ্চলের লবণ উৎপাদনকারিগণই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তাঁহারা লবণের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে যত প্রকার সম্ভব চেষ্টা করিবেন। ভারতকে প্রতি বৎসর পাকিস্থান হইতে ৭৪ হাজার টন সৈন্ধব লবণ আমদানী করিতে হয়। এই লবণ যাহাতে সম্বর ও খারাগোটাস্থিত গবর্ণমেণ্টের কারখানাগুলিতে প্রস্তুত হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে স্থির হইয়াছে।

—আর্থিক জগৎ

* * * *

কাশ্মীর সমস্যার প্রকৃত সমাধান প্রকৃতপক্ষে জাতিসংঘের সালিশ বা ভারত ও পাকিস্থানের নেতৃত্বের শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর করে না, কাশ্মীরের জনগণ, সেখানকার শ্রমিক—কৃষক—কারিগর—বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তদের উদ্যোগের উপর নির্ভর করছে; সঙ্কট অবসানের উপায় সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরশাসনের অবসান, জনমত প্রতিষ্ঠা, কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দাবীর ভিত্তিতে চতুর্দ্দিকে জনসাধারণকে সংগঠিত করতে পারলেই আসন টলবে ডোগরারাজের কুশাসন ও কুৎসিৎ সাম্প্রদায়িকতার, ব্যর্থ হবে সাম্রাজ্যবাদীদের জঘন্য চক্রান্ত; তার উপরে গড়ে উঠবে নয়া কাশ্মীর, ধরায় প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যিকারের ভূস্বর্গ সুন্দর কাশ্মীর।

—প্রতিধ্বনি

* * *

আজকাল আশ্রয়প্রার্থী ও আশ্রয়প্রার্থীর ছদ্মবেশী ব্যক্তিদের মধ্যে রাতারাতি গবর্ণমেণ্ট ও বেসরকারী ব্যক্তিদের জমিযায়গা দখল করিবার যে রেওয়াজ দাঁড়াইয়াছে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া খুব সময়োচিত কাজ করিয়াছেন। এদেশে প্রত্যেক ব্যক্তিই অভাবগ্রস্ত এবং ছোট বড় সকলেরই কোন না কোন বিষয়ে অভাব রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় যাহার যে অভাব রহিয়াছে সে যদি তাহা তাহার প্রতিবেশী বা গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি বেআইনী ভাবে দখল করিয়া পূরণ করিতে চাহে তাহা হইলে এদেশে মাৎস্যন্যায় প্রচলিত হইবে এবং ছোট বড় সকল ব্যক্তিরই জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিলুপ্ত হইবে। আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে যাহারা লোভ পরবশ হইয়া এইভাবে জমি দখলের ব্যাপারে যোগদান করিতেছেন তাঁহারা জানেন না যে উহার

ফলে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী প্রত্যেক ব্যক্তির সহানুভূতি হইতে উঁহারা বঞ্চিত হইতেছেন। কারণ উঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে বিপন্ন বোধ করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট আশ্রয়প্রার্থীগণকে উঁহাদের দখলীকৃত জমি ত্যাগ করিয়া জমির জন্য উঁহাদের নিকট আবেদন করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আশ্রয়প্রার্থীদের তাঁহাদের নিজের স্বার্থের জন্যই উহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা উচিত।

—আর্থিক জগৎ

* * * *

আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে, ভারত কেন্দ্রীয় সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণকল্পে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষক সংগ্রহের পরিকল্পনা করিয়াছেন। নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা সমন্বয় কেন্দ্রের উদ্বোধন প্রসঙ্গে শিক্ষাসচিব মৌলনা আবুল কালাম আজাদ বলিয়াছেন যে, প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা এবং বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুবকগণকে বাধ্যতামূলকভাবে কাজে লাগান যায় সরকার তাহার ব্যবস্থা করিতে রাজী হইয়াছেন। তিনি অবশ্য আরো বলেন যে, অর্থাভাবের জন্য এক্ষণেই অনুরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব হইতেছে না।

ইতিপূর্ব্বে ঘোষিত হইয়াছিল যে, শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তাকে যুদ্ধকালীন জরুরী প্রয়োজনীয়তার ন্যায় গণ্য করা হইবে। কিন্তু এক্ষণে সরকার যখন অর্থাভাবের কথা বলিতেছেন, আমরা পীড়াপীড়ি করার পক্ষপাতী নই। তবে আমরা দাবী করিব যে, সরকারের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যথাযথ অনুকূল হইবামাত্রই যেন এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হয়।

—নির্ণয়

* * * *

আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ভারত সম্প্রতি যে ১ কোটী ডলার কর্জ্জ পাইয়াছে, তাহার ফলে ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৎসরে ১০ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এই সম্পর্কে ভারত সরকারের কৃষি বিভাগের একজন কর্ম্মচারী বলেন যে, ভারত সরকার আগামী ৭ বৎসর কালের মধ্যে এ দেশের ৩০ লক্ষ একর আগাছা আচ্ছাদিত জমি চাষাবাদে আনিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অতিরিক্ত আরও ১ লক্ষ ২০ হাজার একর জমি আবাদে আনা হইবে। তিনি বলেন যে, এজন্য মোট খরচ হইবে ১৫ কোটী টাকা। উহার মধ্যে উপরোক্ত ১ কোটী ডলার ঋণ দ্বারা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে ট্রাক্টর ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় করা হইবে। বাকী সরঞ্জাম ডলার বহির্ভূত অঞ্চল হইতে ক্রয় করা হইবে। আশা করা যাইতেছে ১৯৫১ সালের জানুয়ারী হইতে মে মাসে চাষাবাদের যে মরশুম আসিবে তাহার পূর্ব্বেই আমেরিকা হইতে ৩৭৫টি ট্রাক্টর আসিয়া পৌঁছিবে। উহার সাহায্যে আগামী ৫ বৎসর কাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসরে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার একর করিয়া নূতন জমি আবাদে আনা সম্ভবপর হইবে। উহাতে প্রত্যেক বৎসরে অতিরিক্ত হিসাবে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টন রবি শস্য উৎপন্ন হইবে এবং যখন সমগ্র পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইবে তখন অতিরিক্ত হিসাবে বৎসরে ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইবে।

—আর্থিক জগৎ

* * * *

হ্যাণ্ডলুম এডভাইসরী কমিটি পশ্চিমবঙ্গের তাঁত শিল্পের উন্নতির জন্য বিদেশে এ প্রদেশের তাঁতবস্ত্রের কাটতি বাড়াইবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন, ইহা ভাল কথা। কিন্তু এ প্রদেশে তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস না করিতে পারিলে উহার মূল্য কমিবে না। বর্ত্তমান চড়া মূল্যে অন্যান্য স্থানের তাঁত বস্ত্রের প্রতিযোগিতার সমক্ষে দেশে বা বিদেশে উহা উপযুক্ত পরিমাণে বিক্রয় করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। কাজেই তাঁতশিল্পের স্থায়ী উন্নতি দেখিতে হইলে তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন খরচ অবশ্যই হ্রাস করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গে তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন মূল্য হ্রাস করিবার জন্য সস্তা মূল্যে উপযুক্ত পরিমাণ সূতা সরবরাহের ব্যবস্থাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হউন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

—আর্থিক জগৎ

* * * *

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মধ্যে চাউল, ডাইল, তরকারী, লবণ যেমন চাই-ই—তেমন চাই সরিষার তৈল। সরিষার তৈল না হইলে আমাদিগের স্নান আহার চলে না! এই সরিষার তৈলের মূল্য দিন দিন অতিশয় মহার্ঘ্য হইতেছে। বর্ত্তমানে সরিষার তৈলের সের প্রায় তিন টাকা হইয়াছে। গরীব লোকদের পক্ষে উহা ক্রয় করা সাধ্যাতীত হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ বাঙ্গালাদেশে সরিষার চাষ হয় না। উহার জন্য অন্য প্রদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। সরিষা তেল বলিয়া যাহা খাই তাহা অখাদ্য খনিজ তৈল। উহা খাইয়া আমাদের নানাবিধ রোগ হইতেছে। সেই কারণ আমার দেশের চাষীভাইদিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন সরিষার চাষ করিতে সচেষ্ট হন। ২১৪ জন অভিজ্ঞ চাষীর নিকট জানিলাম যে আমাদের এই দেশের মাটিতে সরিষা ভালই উৎপন্ন হয়। এই চাষে বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না ও বেশী জলেরও প্রয়োজন হয় না। তৈল ব্যবসায়ী ও তৈল কলের মালিকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন এই বিষয়ে চাষীগণকে উৎসাহিত করেন। সর্ব্বশেষ সরকার বাহাদুরকে ও প্রাদেশিক ধান্য-চাষী সংঘকে এ বিষয়ে দৃষ্টি দিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

—দামোদর

* * * *

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের গায়েই আঘাত সবচেয়ে বেশী লাগিতেছে বলিয়া আন্দোলনে তাহাদের চীৎকারই সবচেয়ে বেশী। ময়ুরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের মত তাহাদের অবস্থা হইয়াছে। সম্ভ্রান্ত সমাজে তাহারা স্থান চায় কিন্তু তাহার জন্য যথেষ্ট আয় নাই। আসলে 'ইতরেজনা'কে শোষণ করিবার জন্য পুঁজিপতিরা যে লোকদের কাজে লাগায় তাহারই [illegible] হইল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। উহাদিগকে মালিকেরা

গোমস্তা ও সহায়করূপে নিয়োগ করে। সহায়তার বিনিময়ে মালিকদের কাছে কিছু আর্থিক দস্তুরী এবং আরাম ও বিলাসের কিছুটা অংশ পাইয়া থাকে। আরাম ও বিলাসের প্রলোভনে লক্ষ লক্ষ অধীনস্থ চাকুরীয়ারা প্রলুব্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া উহা প্রাপ্তির যোগ্য হইবার আশায় কর্তাদের নকল করিয়া চলে। এইরূপে মধ্যবিত্তের সংখ্যা এখন এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, সকলের পক্ষে বাগাড়ম্বরপূর্ণ অলস জীবন টানিয়া চলা আর সম্ভব হইতেছে না। তাই তাহাদের শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। শোষণাত্মক সংস্থার সংগঠন, পালন এবং বিস্তার ঘটাইবার কৃতিত্ব যখন এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই প্রাপ্য, তখন শ্রেণীবিহীন সমাজ ব্যবস্থা স্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করাও তাহাদেরই কর্তব্য।

—হরিজন পত্রিকা

*　*　*　*

ভারতবর্ষে চিনি ব্ল্যাকমার্কেট বন্ধ করা খুব সোজা। প্রথমতঃ ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট নামক মিল মালিকদের জোটটা ভাঙ্গিয়া দেওয়া দরকার। তাহা হইলে দল পাকাইয়া একচেটিয়া কারবারের দ্বারা ক্রেতাদের অনিষ্ট সাধনের সুযোগ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হইবে। আমাদের দেশে কৌটিল্যের আমলে শ্রমিকদের সঙ্ঘ গঠন অনুমোদিত ছিল, কিন্তু মালিকদের কখনও জোট বাঁধিতে দেওয়া হইত না। আধুনিককালে আমেরিকাতে শেরমান আইন অনুসারে উহা নিষিদ্ধ। আমাদের দেশে এই পাপ ইংরেজ আমলে প্রবেশ করিয়াছে এবং এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। সুগার সিণ্ডিকেট ভাঙ্গিয়া দিলে মিলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা হইবে এবং তাহাতে দাম কমিবে। ইহারা ১৭ বৎসর যাবৎ চিনির উপর রক্ষণ শুল্ক ভোগ করিয়াছে, এখনও উহা বজায় রাখিতে চাহিতেছে। এবার এটা তুলিয়া দেওয়া দরকার। তাহা হইলে ইহারা বাহিরের প্রতিযোগিতায় পড়িয়া দাম আরও কমাইতে বাধ্য হইবে। বিড়লা-ডামলিয়া-থাপড়-শ্রীবাস্তব-নারাং-বেগসাদারল্যাণ্ডের পকেটে বছরে ২৫।৩০ কোটি টাকা তুলিয়া দিবার জন্য অনন্তকাল একটি "শিশু" শিল্প পোষার চেয়ে গুড় খাওয়া ঢের ভাল। সংরক্ষণ শুল্কের সাহায্যে চিনি-লর্ডেরা কি দাম আদায় করিতেছে তার একটু নমুনা সুগারকেন টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান সার টি বিজয় রাঘবাচার্য্যের মন্তব্যে পাওয়া গিয়াছে। তিনি হিসাব দিয়াছেন যে ব্রেজিলে চিনির দাম ৪০০ টাকা টন, অষ্ট্রেলিয়ায় ২৩৬ টাকা টন, দক্ষিণ আফ্রিকায় ২০৮ টাকা টন, আর ভারতবর্ষে ৭৭০ টাকা টন।

—যুগবাণী

*　*　*　*

বর্ত্তমানে যে প্রকার উন্নত প্রণালীতে ইউরোপ ও জাপানে মাছধরা, মাছ সংরক্ষণ ও মাছের চাষের ব্যবস্থা হয় ভারত সরকার সেই ধরণের একটি পঞ্চমবার্ষিক ব্যবস্থা এদেশে প্রবর্ত্তন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা মতে ভারতে প্রত্যহ ১০ হাজার টন মাছের সংস্থানের ব্যবস্থা করা হইবে। বর্ত্তমানে এদেশে প্রত্যহ ৫ হাজার টন মাছের যোগান রহিয়াছে। উক্ত পরিকল্পনা মতে ভারতের সমুদ্রোপকূল জরীপ করিয়া প্রথমে পরীক্ষামূলক ৭টি মাছ ধরার কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। উহার মধ্যে কলিকাতাতেও একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। এই সমস্ত কেন্দ্র হইতে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যবস্থা হইবে। এই কাজ ২ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে। অতঃপর মাছ সংরক্ষণ এবং সরবরাহের জন্য দেশের অভ্যন্তরে ঠাণ্ডা গুদাম এবং যানবাহনের ব্যবস্থা করা হইবে। ভারতের মিঠাজলে যে মাছ আছে ভারত সরকার তাহার সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা করিবেন। এজন্য ইতিমধ্যেই দিল্লীর নিকটস্থ কতিপয় পুকুরে প্রায় ৩৪০ রকম মাছ ছাড়া হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ মাছের চাষ, মাছ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার জন্য বোম্বাইয়ে একটা গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছেন। এদিকে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী পলতাতে এবং মাদ্রাজের মণ্ডপম নামক স্থানে শিক্ষাকেন্দ্রে ২৫ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। উক্ত পরিকল্পনায় এককালীন হিসাবে মোট ১ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক ৬৫॥ লক্ষ টাকা হিসাবে ব্যয় করিবেন। বোম্বাই, কোচিন, ভিজাগাপট্টম, চাঁদবালি এবং কলিকাতা (অথবা হুগলী নদীর মুখে অন্য কোনও জায়গায়) কেন্দ্রগুলি স্থাপিত হইবে।

—সৈনিক

*　*　*　*

ভারতের খাদ্যাভাব দূর করার পরিকল্পনার অন্ত নাই। শুনা যাইতেছে—১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ভারত খাদ্যে স্বাবলম্বী হইবে। চতুর্দ্দিকেই এই বিষয়ে বক্তৃতা চলিয়াছে। জলসেচের ব্যবস্থা হইতেছে। উৎপাদন-বৃদ্ধির অধ্যবসায়ের ত্রুটি নাই। ভারত খাইয়া পরিয়া বাঁচিতে না পারিলে তাহার অসাধারণ সংস্কৃতির পরিচয় ম্লান হইয়া পড়িবে। ভারতের প্রাক্তন কংগ্রেস-সভাপতি আচার্য্য কৃপালিনী বক্তৃতা দিতে গিয়া বলিয়াছেন—দেশবাসী যদি সপ্তাহে একদিন উপবাস করে, তবেই খাদ্যাভাব অনেক পরিমাণে দূর হয়। আর যাহা অপ্রয়োজন, সেই বস্তুর চাহিদা যদি কমে, চোরাবাজার অচল হইবে। উপবাসের কথা শুনিলে নিরন্ন, অভুক্ত ভারতবাসী শিহরিয়া উঠিবে। প্রতি মাসে যে জাতি একাদশীর ব্রত পালন করে, যে জাতি রামনবমী ও জন্মাষ্টমীর দিনে অনশন-ব্রতী হয়, দুর্গাষ্টমী ও শিবচতুর্দ্দশী যাহারা উপবাসে সংযম-ব্রত পালন করে, এই কথা তাহাদের দিকে চাহিয়া যে উক্ত হয় নাই, ইহা সহজেই অনুমেয়। ভারতের আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মে যে সকল উপবাস বিহিত আছে, তাহা স্বাস্থ্য ও অধ্যাত্মনীতিরক্ষার অনুকূল বলিয়া ভারতে প্রচলিত ছিল। ধর্ম্মের বালাই আর নেতৃবর্গের নাই। আজ অকারণ উপবাসে দেশের খাদ্যাভাব দূর করার এই বিধান অত্যন্ত বাহ্য। ভারতের প্রাণ ইহাতে উদ্বুদ্ধ হইবে না। আচার্য্য আরও বলেন—অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য খরিদের চাহিদা না থাকিলে দেশে চোরাকারবার উঠিয়া যাইবে। এই কথাও ঠিক নহে। খাদ্যদ্রব্য কোন দিনই অপ্রয়োজনীয় নহে। তরীতরকারীর মূল্য চড়া দরে যেমন বিকায়, চাল, চিনি, তেলও আদৌ মিলে না। টাকার জোর থাকিলে কিন্তু কিছুরই অভাব হয় না। আসলে জাতির প্রয়োজনই মিটে না,

অপ্রয়োজনের কথা উঠাইয়া বস্তুতন্ত্র জগৎ হইতে তিনি যে কত দূরে, তাঁহার কথায় ইহাই প্রমাণিত করিলেন। —নবসংঘ

* * * *

দুর্নীতি আছে বলিয়া সরকারী দুর্নীতি নিবারণ বিভাগের জন্ম। কিন্তু 'দুর্নীতি নিবারণ কল্পে সরকারকে সাহায্য করুন' বলিয়া বিজ্ঞপ্তি দেওয়াটা একটা ভাঁওতা ছাড়া আর কিছু নয়। বরঞ্চ উক্ত বিজ্ঞপ্তিটির ভাষা বদলাইয়া দুর্নীতি নিবারণের জন্য সরকারকে সাহায্য করিতে দিয়া বিপদে পড়ুন' বলিলে মানানসই হইত। আমরা সংবাদ পাইয়াছি জনৈক ভদ্রলোক দুর্নীতি নিরোধ অফিসারকে কোনও এক রিলিফ বিভাগের দুর্নীতির খবর দিয়া আইনের বেড়া জালে পড়িয়াছেন। ব্যাপারটি বর্ত্তমানে বিচার-সাপেক্ষ। সুতরাং আলোচনা করিয়া পুনরায় আদালত অবমাননার হাতে না পড়াই বাঞ্ছনীয়। তবে দুর্নীতি নিবারণের জন্য যে সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহা সাধারণ লোককে বিপদে পড়িবার আমন্ত্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এইভাবে চলিলে জলে থাকিয়া কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করিবার moral force আর কত দিন থাকিবে? —গণরাজ

* * * *

আমাদের কর্ত্তারা পাকিস্থানী প্রেমে একেবারে ডগমগ। কিন্তু পূর্ব্ব-পাকিস্থানী সাপ্তাহিক 'নকিব' কি বলিতেছেন?—"আগষ্টের আজাদীর পর হিন্দুস্থানে যে খাঁটী হিন্দু হুকুমতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাতে আমাদের কোন ভুল ধারণা নাই। শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র-লাঞ্ছিত তাহার জাতীয় পতাকাই প্রথম হইতে তাহার নির্ভেজাল হিন্দুত্বের প্রমাণ দিতেছে। তবে হিন্দুস্থানের চিয়াং কাইশেক পণ্ডিত নেহেরু এবং অন্যান্য হিন্দুস্থানী নেতৃবৃন্দ ভণ্ডামীপূর্ণ 'সিকিউলারিজম'-এর বুলি আওড়াইয়া এ-যাবত দুনিয়াকে ধোকা দিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু তাহাদের অবলম্বিত নীতি ও কার্য্যধারার ফলে ক্রমেই বিশ্বের নিকট তাহার ভণ্ডামী মুখোস খুলিয়া যাইতেছে।" চালাকি চলিবে না! 'নকীবের' ঈগল চক্ষুর নিকট সবই ধরা পড়িতেছে! 'নকীব' এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। ভারতীয় মুসলমানদের দুঃখ এবং ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় নকীব ইতিহাসের পাতা ঘাঁটিয়া কতকগুলি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। 'অতীতের ভয়াবহ অবস্থা' হইতে ভবিষ্যতের স্বধর্ম্মীদের বাঁচাইবার জন্য হিন্দুবংশোদ্ভব-নকীব 'সাবধান-বাণী'ও উচ্চারণ করিয়াছেন। —সারথি

* * * *

বিহার গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশের এক স্থানে ৩০ হাজার একর জমিতে যন্ত্রপাতি সাহায্যে চাষাবাদ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। উহাতে ব্যয় হইবে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। তবে এই স্থান হইতে বৎসরে ১৫ হাজার টন খাদ্যশস্য পাওয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট এই প্রদেশের নানা স্থানে ৮ হাজার কূপ এবং ২ শত নলকূপ স্থাপনেরও সঙ্কল্প করিয়াছেন। উহাতে ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে এবং উহার ফলে উক্ত প্রদেশে বৎসরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ২০ হাজার টন বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যায়। বিহার গবর্ণমেণ্ট এই প্রদেশের বড় বড় সহরের অধিবাসিগণ যাহাতে সস্তায় প্রচুর পরিমাণে তরিতরকারী পাওয়ার দরুণ খাদ্যশস্যের ব্যবহার কমাইতে পারে তজ্জন্য এই ধরণের প্রত্যেক সহরের চতুর্দ্দিকে তরি-তরকারী উৎপাদনের জন্য জমি খাস করিবেন বলিয়াও স্থির করিয়াছেন। —খাদ্যউৎপাদন

* * * * *

ষ্টেটস্‌ম্যান হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রভৃতি সহরের ইংরাজী দৈনিক কাগজগুলিতে বিজ্ঞাপন দেখিলাম কৃষকেরা বেশী করিয়া চাউল দিলে সরকার তাহাদের বোনাস্ দিবেন ঘোষণা করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনটি পড়িয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। মাত্র দুই বৎসরের স্বাধীনতায় কংগ্রেসী মন্ত্রীদের অভিভাবকত্বে বাংলার চাষীরা ষ্টেটস্‌ম্যান প্রভৃতি পড়িতে সুরু করিয়াছে ইহা কম গৌরবের কথা নয়। —যুগবাণী

* * * * *

বাস্তুহারাদের সমস্যা লইয়া পশ্চিম বঙ্গে যাঁহারা কাজ করেন তাহাদের মধ্যে শ্রীযুত অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। তাঁহার সাম্প্রতিক এক বক্তৃতায় তিনি বলিতেছেন—

'আর এক শ্রেণীর লোক জুটিয়াছেন যাহারা 'গাছের খান, তলারও কুড়ান', অর্থাৎ তাঁহারা এখানে বাস্তুহারা শ্রেণীভুক্ত হইয়া যথাসম্ভব সুযোগ সুবিধা আদায় করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে পূর্ব্ববঙ্গে যাইয়া সেখানকার লভ্যাংশও আদায় করিয়া আনিতেছেন। অপর এক শ্রেণী আছেন যাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই এখানে স্থায়ীভাবে কাজ কারবার করিতেন এবং প্রয়োজন মত কখনও কখনও স্বদেশে যাইতেন, তাঁহারাও অনেক বাস্তুহারা পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া যথাসম্ভব সুযোগ লাভের চেষ্টা করিতেছেন, এবং আমার বিশ্বাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে এই চতুর শ্রেণীর লোকেরাই প্রকৃত নিঃস্ব বাস্তুহারাদের তুলনায় ঋণ, এমন কি খয়রাতি সাহায্যও অধিক কুড়াইয়াছেন। এ ছাড়া আর এক শ্রেণী আছেন যাঁহারা নিরক্ষর বাস্তুহারাদের নানাপ্রকারে প্রবঞ্চিত করিয়া স্বীয় উদর পূরণ করিতেছে। ঋণ, জমি কিম্বা খয়রাতি সাহায্য আদায় করিয়া দিবার আশ্বাস দান করিয়া তাঁহারা নিঃস্ব বাস্তুহারাদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতেছেন ও আত্মসাৎ করিতেছেন। এই শ্রেণীর লোকদের বাছিয়া বাহির করা এবং তাহাদের মুখোস খুলিয়া ফেলিবার দায়িত্ব স্বয়ং বাস্তুহারাদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথা তাঁহারা সর্ব্বক্ষেত্রে প্রবঞ্চিত ও অতৃপ্তই থাকিয়া যাইবেন। তাঁহাদের অভাব অভিযোগ কদাপি মিটিবে না।" ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে এই শ্রেণীর বাস্তুহারা ও বাস্তুহারা-দরদীদের লোক অবাঞ্ছিত যদি বলে দোষ কি? —জনসেবক

ইউরোপীয়দের খাদ্য পদ্ধতি

ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস

ইউরোপীয় চরিত্রের সর্বাপেক্ষা অনুকরণীয় বৈশিষ্ট্য—তাদের আহারের সময়ানুবর্তিতা। যে যেখানেই থাকুক ট্রেনে, ষ্টিমারে, কলেজে, কারখানায় বা অফিসে, তাদের খাওয়ার সময়ের কোনও নড়চড় হয় না। আমাদের দেশে দেবতার পূজার সময় আমরা দণ্ড পল বিপল মেনে ভোগ-নৈবেদ্য প্রভৃতি দিয়া থাকি, কিন্তু নিজেদের আহারের বেলায় বাঁধাধরা নিয়ম মানতে আমরা নিতান্তই অনভ্যস্ত। শরীরতত্ত্ববিদেরা বলেন—আহারের নির্দিষ্ট সময় থাকলে পরিপাকযন্ত্রের যে সব জারকরসে খাদ্য জীর্ণ হয় সেগুলি ঐ সময়ে নিয়মিত বেশী ঝরায় ভুক্ত খাদ্যের পরিপাক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে।

সাহেবরা আহারের প্রথমে যে 'সুপ' খায় তাহাতে পাকস্থলী সরস হওয়ায় জারক রস সহজে নির্গত হয় এবং উহার দরুণ আহারকালে হিক্কা হতে পারে না। তদ্ভিন্ন সুপের মধ্যে মাংসের কুচি, হাড়ের ভিতরের মজ্জার রস প্রভৃতির মধ্যে যে সকল পদার্থ থাকে তাতে ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। সুপের মধ্যে টম্যাটো, ফুলকপি, গাজর প্রভৃতির কুচি সংযুক্ত হওয়ায় উহাতে বহু উপকারী ভিটামিন ও লবণ পদার্থও পাওয়া যায়।

ওদের আহার্য্যে ঝালমসলা বেশী থাকে না। এমন কি পেঁয়াজ রসুনের ব্যবহারও খুব কমই দেখলাম। শীতপ্রধান দেশ বলে ক্ষুধার তীব্রতা ওদের বেশী, তদ্ভিন্ন অতিরিক্ত শীতের দরুণ খাদ্যদ্রব্যে ব্যাধিবীজ ঢুকবার বা জন্মাবার সম্ভাবনাও অনেক কম। সুতরাং ঝালমসলার প্রায় অভাব বা অল্পতার দরুণ ওদের তেমন অসুবিধা জন্মে না। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে খিদে সাধারণতঃ কম পায়—সে কারণ জারকরস ইত্যাদি ঝরে কম। ঝালমশলার গন্ধে ও স্বাদে জারকরসগুলি বেশী মাত্রায় ক্ষরিত হয়; তদ্ভিন্ন অনেক প্রকার মশলাই ব্যাধিবীজ নাশক। কাজেই সাহেবদের দেখাদেখি মশলার ব্যবহার অযথা বেশী কমাতে গেলে আমরা মারাত্মক ভুল করব বলেই আমার ধারণা। আমাদের সরিষার তেলের ব্যাধি বীজনাশক ক্ষমতা সুবিদিত। হলুদের ত পচন-নিবারক ক্ষমতা যথেষ্ট। পাড়াগাঁয়ে অনেক সময় মাছ কুটে নুন হলুদ মেখে রেখে পরদিন রান্না করে—ইহা সকলেই জানেন। হলুদ মিশ্রিত থাকায় মাছ পচে উঠতে পারে না।

ইউরোপের সব দেশেই বিনা তেল বা চর্বিতে সিদ্ধ গোল আলু, সিদ্ধ ফুলকপি, কড়াইশুঁটি প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে লোকে প্রত্যহ খেয়ে থাকে। ওদের দেখাদেখি যদি আমরা ঐ সব পদার্থ কেবল সিদ্ধ করে খাই তবে ভুল করা হবে। আমাদের আলু সিদ্ধ, কলাসিদ্ধ প্রভৃতির মধ্যে ঘি বা তেল দিয়ে মাখিয়ে যেভাবে খেয়ে থাকি উহাই প্রশস্ত। কারণ আহারকালে আমরা তেল জাতীয় পদার্থ অতি কমই খেয়ে থাকি। ওদেশে প্রত্যেকবার আহার কালেই লোকে বেশ খানিকটা মাখন, ডিম, মাংস, মাছ প্রভৃতি খায়। উহাতে যথেষ্ট তৈল-জাতীয় পদার্থ তারা পায়। কাজেই তারা শুধু গোল আলু, কপি, কড়াইশুঁটি সিদ্ধ খেলেও মোটের উপর তাদের আহারীয় পদার্থে স্নেহপদার্থের ঘাটতি পড়ে না।

ওদেশে প্রত্যেকবার আহারের সময় ওরা বেশ খানিকটা মাছ মাংস অথবা পণির খায়। উহাতে মূল্যবান্ আমিষ জাতীয় পদার্থ তারা খেয়ে থাকে। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই দারিদ্র্যবশতঃ উপযুক্ত আমিষ পদার্থ সংগ্রহ করতে পারি না—ফলে উহার অভাবে শরীর সমান প্রকারে গঠিত হতে পারে না—রোগ প্রবণতাও এজন্য বেশী দেখা যায়। ওরা আধুনিক বিজ্ঞানকে কাজে লাগানর দরুণ নানা দিগ দেশ থেকে মাংস মৎস্যাদি আমদানী করে জাতীয় খাদ্যের পুষ্টিকারিতা বাড়িয়ে থাকে। পরিশ্রমী এবং উদ্যোগী বলে এরা মানুষের মত বাঁচার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করে খাদ্য আহরণ করে। রেশন প্রথাও এত উন্নত এবং লোকের কর্ত্তব্যজ্ঞানও এত বেশী যে খাদ্য বিষয়ে চোরা কারবার ঠাঁই পায় না। ধনী দরিদ্র সবাই তাদের ডিম ও দুধ পেয়ে শরীর রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে।

ওদেশের সর্বত্রই প্রধান আহারের শেষদিকে ননী প্রভৃতি সংপৃক্ত মিষ্টি ও পাকা ফল খেয়ে আহার শেষ করে। আমাদের দেশেও "মধুরেণ সমাপয়েৎ" বলে কথা আছে। কিন্তু অভাবের তাড়নায় আমরা ডাল ভাতের সংস্থানই করতে পারিনে—ফল মিষ্টি আর কি করে খাব। অবশ্য চিরদিন আমাদের এরূপ অবস্থা ছিল না। গ্রামের একটু অবস্থাপন্ন লোকেই দুধ-কলা, দুধ-আম, বাড়িতে পাতা দই গুড় কলা প্রভৃতি খেয়ে আহার শেষ করিতেন। গ্রামের সঙ্গে সম্বন্ধচ্যুত হওয়ায় আজ খাদ্য বিষয়ে আমরা ঐ সব উৎকৃষ্ট পদ্ধতি ভুলে মরবার পথে এসে দাঁড়িয়েছি। আধুনিক বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের দেশের অপর্য্যাপ্ত আম জাম প্রভৃতি এবং যে সব অজ-পাড়াগাঁয়ে দুধ সস্তা সে সব স্থানের দুধ ও ফল সংরক্ষিত অবস্থায় সস্তায় পেলে খাদ্যাভাব অনেকটা দূর করতে পারব। এর জন্য চাই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দীক্ষা এবং সঙ্গে সঙ্গে নিরলসভাবে কার্য্যে ব্রতী হয়ে জাতীয় ধন-সম্পদ বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগী হওয়া।

ওদেশ সম্বন্ধে আমার যা অভিজ্ঞতা তাতে মনে হল সুইজারল্যাণ্ডের রান্না অধিকতর মুখরোচক। বোধ করি মশলা ইত্যাদির একটু বেশী ব্যবহার করে। মাছ দিলে সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা লেবুখণ্ডও (অনেকটা আমাদের পাতিলেবুসহ ইলিশ মাছের মত) পাতে দিত।

ইংরেজ এবং মার্কিনদের তুলনায় জার্মান এবং সুইসরা ব্রেকফাষ্ট বা

প্রাতরাশে মাংস ডিম্বাদি কম ব্যবহার করে বলে মনে হল। ইংরেজ ও মার্কিনদের Breakfast প্রায় 'গাদিয়ে' খাওয়া গোছের, কিন্তু খাস জার্মান বা সুইসরা সকালে খুব অল্প খাদ্যই গ্রহণ করে—মাছ ডিম মাংস বড় একটা খায় না। ইজারল্যাণ্ডের খুব বড় হোটেলেও দেখেছি, বিশেষ অর্ডার না দিলে সকালে ডিম দেয় না। শুধু রুটি মাখন, জেলি বা মধু এবং চা কফিই এদের প্রাতরাশে সাধারণতঃ দিয়ে থাকে। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর সোয়াইটজারের কাছে শুনলাম সকালে তিনি একখণ্ড মাখনযুক্ত রুটি ও চা খেয়ে কলেজে আসেন। ১২টায় ফিরে লাঞ্চ খান।

মধুর ব্যবহার প্রাতরাশের সময় অনেক স্থলেই দেখেছি। মধু যে অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য তা আমাদের দেবতার নৈবেদ্যে উপহার স্থান দেখেই বুঝা যায়। মধুতে নানা প্রকার লবণ পদার্থ, ভিটামিন কার্বোহাইড্রেট ও উপকারী উপাদান থাকে; সুতরাং আমাদের মধ্যে যাঁদের সামর্থ্য আছে তাঁরা নিয়মিত মধু খেলে তাঁদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। সাহেবদের খাদ্য পুষ্টিকর উপাদানে ভরপুর। খাদ্য পদ্ধতিও প্রশস্ত। কিন্তু তাই বলে কেউ যদি উহার আংশিক অনুকরণ করেন তবে তিনি বড় ঠকবেন। সাহেবদের দেখাদেখি যদি মাছ মাংস ডিম্বাদি প্রচুর খেতে থাকি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের মত স্যালাড ও ফলমূল না খাই তাহলে স্বাস্থ্যের উন্নতি না হয়ে অকালমৃত্যুর পথই হবে প্রশস্ত। অবশ্য কাঁচা শাকপাতা দিয়ে তারা যেভাবে স্যালাড করে আমাদের ব্যাধিবীজপ্রধান গরমের দেশে ঐরূপ কাঁচা শাকপাতা খাওয়ার বিপদ আছে। আমাদের শাকসবজী নোংরা জায়গায় জন্মে—পাচক চাকরদের কর্তব্য জ্ঞানও কম: সুতরাং শাকপাতা আমাদের পৈতৃক প্রথায় রান্না করে খাওয়াই ভাল। তাতে ব্যাধিবীজের শরীরে প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে না। শাকের সি ভিটামিনের কথঞ্চিৎ ঘাটতি হলেও পাতিলেবু প্রভৃতি খেয়ে তার পূরণ করা চলে। সুইজারল্যাণ্ডে ত আমাদের দেশের শাক রান্নার মত শাকের ঘণ্টই খেয়েছি। অবশ্য স্যালাডও প্রায় দিনই থাকত। যাঁদের নিজেদের বাগান আছে এবং উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে স্যালাড তৈরীর ব্যবস্থা আছে তাঁদের পক্ষে উহা খাওয়া অসম্ভব নয়।

ওদেশে প্রাতরাশে অনেক সময় আপেল প্রভৃতি পাকা ফল বা বাতাবি জাতীয় লেবুর রস খেতে দিত। আমাদের দেশে যাঁদের আর্থিক সামর্থ্য আছে তাঁরা সকালে বাতাবি লেবুর রস পাকা টম্যাটোর রস খেলে উন্নত স্বাস্থ্যের অধিকারী হবেন বলেই মনে করি।

'আমাদের খাদ্য' পুস্তকে খাদ্যের উপাদান এবং খাদ্য সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ই দিয়েছি। কৌতূহলী পাঠক তাহা পাঠে উপকৃত হবেন বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সাহিত্যের ইতিহাসে অভিব্যক্তি

শ্রীকৃষ্ণনাথ মল্লিক

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রচলিত ইতিহাসের অপূর্ণাঙ্গতা লক্ষ্য করিয়া একদিন লিখিয়াছিলেন—প্রচলিত ইতিহাস ভারতবর্ষের "নির্জীব কালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র," কেবল মারামারি কাটাকাটির বর্ণনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু এই "রক্ত বর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্ন দৃশ্যপটের" অন্তরালে—"সেই ধূলি-সমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে, পল্লীর গৃহে গৃহে যে চেষ্টার তরঙ্গ নানক চৈতন্য তুকারাম—ইহাদের জন্ম দিয়াছিল, —তাহার সম্মিলিত রূপই ভারতবর্ষের সত্যকার ছবি। যাহার দ্বারা আমরা ভারতবর্ষের সেই মূলভাব ও আদর্শটিকে বুঝিতে পারিব—তাহাই হইবে ভারতবর্ষের সত্যকার ইতিহাস।"

(স্বদেশ)

রবীন্দ্রনাথ উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষকে লইয়া, ভারতের জাতীয় ইতিহাসের পটভূমিতে। জাতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজনীয়তা এবং সংগতি কতখানি তাহা ঐতিহাসিকগণের বিচার্য্য, তবে কথাটা যে, যে-কোনও দেশের সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গভীরভাবে প্রযোজ্য ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

বিভিন্ন যুগের আলঙ্কারিক এবং সমালোচকগণ 'সাহিত্য' শব্দটিকে কেন্দ্র করিয়া ইহার চতুষ্পার্শে যে ব্যূহ রচনা করিয়াছেন, তাহা যেমন দুর্গম তেমনি দুরতিক্রম্য। কিন্তু সেই মতভেদ নিষিক্ত তর্ক বহুল কণ্টকময় পথে পাদক্ষেপ না করিয়াও সাহিত্য সম্বন্ধে একটা কথা বোধহয় নিঃসন্দেহে বলা চলে, যে মনের সহিত ইহার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সাহিত্য এবং আর্টের প্রথমতম এবং গোড়ার কথাই বোধহয় এই। সাহিত্য মানব মনেরই সৃষ্টি এবং মানব মনই তাহার গ্রাহক ও রসোৎসুক। বাহ্যজগতের যে রূপ, রঙ্গ, বৈচিত্র্য—হাসি, কান্না, গান —সাহিত্যেও তাহাকেই ফিরিয়া পাই; কিন্তু ঠিক যেমনটি বাহ্যজগতে, ঠিক তেমনটি নয়। বিশ্লেষণ করিয়া পৃথক ভাবে দেখিলে এই দুইটির পার্থক্য বোঝা যায় না; সর্ব্বাঙ্গীণ রূপটি লইয়া বিচার করিলে কোথায় যেন একটা পার্থক্যের অনুভূতি জন্মায়। এই পার্থক্যটুকুর মূলে সাহিত্যিকের হৃদয়। বাস্তব জগৎ সাহিত্যিকের মনের মধ্য দিয়া আসে বলিয়াই এই পার্থক্যটুকু গড়িয়া উঠে। কেমন করিয়া এই পার্থক্যটুকু গড়িয়া উঠে, সাহিত্যকে মনের কোন কোন উপাদান ইহার খোরাক

জোগায়—প্রভৃতি প্রশ্ন তর্কবহুল অলঙ্কারশাস্ত্রের কথা—এখানে নিষ্প্রয়োজন। আমাদের বক্তব্য এইটুকু যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে মানব-মনের অংশ অনেকখানিই—কি লেখকের দিক দিয়া, কি পাঠকের দিক দিয়া।

তবে একটা কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অত্যন্ত প্রয়োজন যে সাহিত্য সচেতন মনের সৃষ্টি। জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে কবিগণ অত্যন্ত অচেতন হইতে পারেন—কিন্তু অনুভূতি ও সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁহারা অত্যন্ত সচেতন। বাস্তব পৃথিবীতে যেমনি, তেমনি কাব্যের জগতে—সচেতনতার অভাবে এক মুহূর্ত্তও চলে না। সাহিত্যের জগতে যে একটা কথা আছে, যাহাকে বলে 'সিমেট্রি'—তাহা এই সচেতন মানসের একটা প্রধান লক্ষণ। বাস্তব পৃথিবীতে পারম্পর্য্যহীন অনেক ঘটনা ঘটে—কিন্তু সাহিত্যে তাহা ঘটলে চলে না। ইহার মূলে ঐ সচেতন মানসের সিমেট্রি বোধ।

যেহেতু মনের সৃষ্টি এবং সেই মন সচেতন—তখন একথা বলা চলে—যে সাহিত্যে সাহিত্যিকের মনের প্রভাব আমরা পাই। সাহিত্যের মধ্যে তাঁহার অনুভূতি, তাঁহার চিন্তাধারা, তাঁহার আদর্শ, তাঁহার দৃষ্টি-ভঙ্গি—প্রভৃতির ইঙ্গিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। আবার কেবল সাহিত্যিককে লইয়াই ত সাহিত্য হয় না। সাহিত্যে পাঠকের'ও একটা অংশ আছে এবং এ অংশও মোটেই ন্যুন নয়। পাঠক মনের রুচি, চিন্তাধারা প্রভৃতিকে অস্বীকার করিয়া লেখকের যাহা একক সৃষ্টি কালের দরবারে, তাহা কখনও টিঁকিতে পারে নাই। ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকিয়া নবীন যুবা কাশীনাথ যেদিন গান গাহিয়াছিল এবং সভার সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল সেদিন শুভ্রকেশী বৃদ্ধ বরজলালকে উৎসব ঘর ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছিল, কারণ—

একাকী গায়কের নহেত গান, মিলিতে হবে দুই জনে।
গাহিবে একজন ছাড়িয়া গলা, আর একজন গাবে মনে॥

(গান ভঙ্গ—সোনার তরী)

পাঠক এবং লেখকের সম্পর্কটি এই দুইটি পংক্তিতে অত্যন্ত সুন্দর এবং সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা প্রাচীন আলঙ্কারিকবাদের সেই "সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী"রই টীকা এবং ব্যাখ্যাস্বরূপ।

সুতরাং সাহিত্যের মাঝে আমরা কেবল লেখক অর্থাৎ সাহিত্য-কারেরই মন খুঁজিয়া পাই না। যে সাহিত্য তৎকালীন পাঠক দ্বারা গৃহীত ও আদরণীয় হইয়াছিল তাহার মধ্যে আমরা তৎকালীন জন-সাধারণেরও মনে চিন্তাধারার সন্ধান পাই এবং এই মনের সন্ধানই সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, প্রাচীন যুগ আধুনিকতার পথে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। সেই আদিমযুগের বন-চারী উচ্ছৃঙ্খল অসভ্য জাতি পর্ব্বত সানুদেশের শিলাতল হইতে সোপানে সোপানে পদক্ষেপ করিয়া আধুনিক সুসভ্য নগরের হর্ম্ম্যতলে উপনীত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের এই অগ্রগমনের পথের দুই পার্শ্বে কি কোনও চিহ্ন তাহারা ফেলিয়া আসে নাই? আসিয়াছে। প্রস্তর যুগের শিলাগঠিত মারণাস্ত্র হইতে আধুনিক পূর্ব্বযুগের প্রাচীন সাহিত্য—সেই অগ্রগমনের ইতিহাসের কালজয়ী স্বাক্ষর।

শিলাময় যুগের মানব অন্নকেই বুঝিয়াছিল—তাহার পর তাহারা প্রাণকে আবিষ্কার করিল—তাহার পর মন ও বুদ্ধির ধাপে ধাপে আনন্দকে অনুভব করিল।

অন্নং প্রাণো মনোবুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চতে।
কোশাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংসৃতিং ব্রজেৎ॥

(পঞ্চদশী—১।৮৩)

—ব্রহ্মানন্দের স্বরূপত্ব বোধের দিক ছাড়াও মানব জাতির ইতিহাসের ধারায় ইহার মূল্য আছে। সাহিত্যের ইতিহাস সেই অগ্রগমনশীল মানব জাতির আনন্দময় সত্তার নানাভিব্যক্তির ইতিহাস।

সুতরাং কোনও দেশের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিয়া আমরা সেই জাতির অনুভূতি মূলক চিন্তাধারার নানাভিব্যক্তির সহিত পরিচিতি লাভ করি।—কথাটা কিন্তু আরও একটু ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। মানুষের চিন্তাধারার সহিত সমাজের একটা সম্বন্ধ আছেই। যে কবে কতদিন পূর্ব্বে কেহ জানে না—আদিম যুগের মানুষের অসুবিধামূলক অনুভূতির মধ্য দিয়া সমাজ সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার পর কত যুগ অতীত হইয়াছে সমাজ মানুষের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। সমাজের পথ ধরিয়া আসিয়াছে সংস্কার, পরার্থপরতা, দয়া, স্নেহ, প্রীতি; মানুষ তাহাদের একান্তভাবেই আপনার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু সমাজিক মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারিয়াছে? অগ্রগমনশীল মানবের প্রয়োজন নিত্যই নব নব। মানুষ প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থায় কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারে না।—একটা পাইলে আর একটার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। সাধারণ মানসে প্রথমে এই প্রয়োজন বোধ থাকে অত্যন্ত গোপনে, সংস্কারের আবরণে আপনাকে গোপন করিয়া। কিন্তু সাহিত্যিক তাঁহার সচেতন মানসে ইহাকে উপলব্ধি করেন এবং সাহিত্যে রূপদান করেন। ক্রমশঃ জনসাধারণের মনে এই প্রয়োজনবোধ স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পায় এবং সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন লাভ করে। তাই বলা হইয়া থাকে, সাহিত্যে ভাবীযুগের ছায়াপাত হয়।

সুতরাং যদি বলা যায় সাহিত্য সমাজের প্রতিফলন—তাহা হইলে সবটুকু বলা হয় না। সেই যুগের সমাজ ছাড়াও ভাবীযুগের সমাজের খানিকটা ছায়া সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমরা পাইয়া থাকি। এক যুগের মানুষ কিরূপ সমাজ চায় তাহা তাহার চিন্তাধারার মধ্য দিয়া সেই যুগের সাহিত্যে প্রকাশ পায়। সেইজন্যই সাহিত্যের আলোচনায় মানুষের চিন্তাধারা মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গি—মানুষের মনের প্রাধান্য বাঞ্ছনীয় এবং যাহার মধ্য দিয়া এই চিন্তাধারার, এই দৃষ্টি ভঙ্গির ধারাটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে, যাহার দ্বারা বিভিন্নযুগের সাহিত্যের পটভূমিকায় জাতির সভ্যতার ধারাটি—মনের ক্রমাভিব্যক্তির ধারাটি ফুটিয়া উঠিবে তাহাই হইবে সাহিত্যের সত্যকার ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের যে দৈন্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন—তাহা পরিপূর্ণতা করিবে সেই ইতিহাসের প্রস্তুতিতে। ইহার মধ্য দিয়া জাতি তাহার পূর্ব্ব পুরুষকে চিনিতে পারিবে, তাহাদের অগ্রগমনের ধারাটিকে চিনিতে পারিবে। অতীত ও বর্ত্তমানের এই প্রভেদ দূর হইবে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আরম্ভ দশম একাদশ শতাব্দী হইতে সিদ্ধাচার্য্যগণের গীতি-কবিতার মধ্য দিয়া। ঠিক ইহার পূর্ব্বেই বাংলা ভাষা মাগধি অপভ্রংশ হইতে জন্মলাভ করিয়া স্বতন্ত্র ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আরম্ভ হইলেও সাহিত্যের ইতিহাস এখানে আরম্ভ নয়। সাহিত্য ও ভাষা একটা বস্তু সামগ্রী নয়। পাঁচ জনে মিলিয়া একটা কমিটি করিয়া মানুষ ভাষা ও সাহিত্যের সূত্র-পাত কোনও দিন করে নাই। কালের ক্রম-অগ্রমান গতিপথে নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজন, যুগোপযোগী চিন্তাধারার অভিব্যক্তি সব মিলিয়া মিশিয়া একটা স্বয়ং সক্রিয় উপায়ে ভাষা ও সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া আসিয়াছে। বৈয়াকরণ আসিয়াছেন পর যুগে—স্বয়ংসৃজিত ভাষাকে বিজ্ঞানের ধারা দিয়া বাঁধিয়া দিতে। সুতরাং ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস অনুবর্ত্তন করিতে হইলে মাঝ পথ হইতে তাহার সঙ্গ লইলে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় জানা যায় না। আর তাহা ছাড়া সাহিত্য যেদিন সৃষ্টি হইল জাতিও সেদিনই সৃষ্টি হয় নাই। সাহিত্য ও ভাষা জাতির ক্রম বিকাশের ধারার একটা বিশেষ কালের অভিব্যক্তি মাত্র। যে কোনও দেশ হইতে হউক আর খৃঃ পূঃ যত অব্দেই হউক, যাহারা বাংলাদেশে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছিল, বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালী ত তাহাদেরই চিন্তা রাশির ধারা বহন করিয়া আসিতেছে—বিভিন্ন জাতির সহিত সংমিশ্রণে বিভিন্ন শক্তির সহিত সংঘাতে তাহাকে পরিপুষ্ট করিয়া। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়া যদি আমরা বাঙ্গালীর মনের সহিত পরিচয় লাভ করিতে চাই তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব যেদিন—সেদিন হইতে আলোচনা সুরু করিলে চলিবে না—যে মানসিক সচেতনতা—যে প্রয়োজনবোধ পণ্ডিত কর্ত্তৃক ঘৃণিত একটা কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের দরবারে উন্নীত করিয়া দিয়াছিল তাহারও সহিত সম্যক পরিচয় লাভ করিতে হইবে।

ইতিহাস ও সাক্ষ্য প্রমাণের অতীত আদিম মানবের গুরু পদভরে কম্পিত বিশাল অরণ্যানীর গভীর গহনে কি চেষ্টা উঠিয়াছিল, কি আশা ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কিছুটা আমরা অনুমান করিতে পারি কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া। সেই আদিম মানবের মনে প্রথম কোন বৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহাই বা আজ কে সঠিক বলিতে পারে। তবে সৃষ্টি বাসনা এবং ঈশ্বরের পরি-কল্পনা যে মানবের সুপ্রাচীন আদিম যুগেরই আহরণ ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই। সৃষ্টি বাসনা প্রথম দেখা দিয়াছিল অত্যন্ত স্থূলভাবে। আপনার সন্তান সন্ততির মধ্য দিয়া আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য পুরুষ ও নারী পরস্পরকে জীবনের সঙ্গী করিয়া লইয়াছিল। তবে এই বাসনা ছিল ইম-বর্গ, কিংবা ইভলিউ সানারি। ইতিহাসের প্রথম যুগের এই স্থূল ও দৈহিক সৃষ্টি বাসনা মানবের যে অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল, সেই অন্তর পরবর্ত্তীকালে ভাষা ও সাহিত্যের সৃষ্টির মত দুষ্কর কার্য্যে অগ্রসর হইল। প্রথম যুগে মানব আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিল সন্তান সন্ততির মধ্য দিয়া; পরবর্ত্তী যুগে মানব আপনাকে বাঁচাইতে চাহিল আপনার চিন্তার মধ্য দিয়া। আমার চিন্তা রাশি, আমার ভাবনা সঞ্চারিত হোক অপরের হৃদয়ে, স্থান, কাল, পাত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া ব্যপ্ত হোক বিশ্বচরাচরে, সঞ্চালিত করুক আগামী কালের মনুষ্য সমাজকে—মানুষের এই প্রকার একটা চিন্তার ফল প্রথমতঃ ভাষা এবং পরে সাহিত্য।

কিন্তু মানুষের চিন্তা ও একটিমাত্র পথ দিয়া চলে না। সময় অতি-বাহিত হইয়া যাইতেছে, মানুষের চিন্তাধারা বিস্তৃত ও বিস্তৃততর হইয়া চারিদিকে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। মানুষের সাহিত্যের মধ্য দিয়া অমরতার পথ প্রস্তুতির অবসরে মানুষের আর যে সকল বৃত্তি বিকশিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অন্যতম প্রধান।

আদিম মানুষ দেখিল পৃথিবী বিশাল এবং তাহার মধ্যে সে একা। সূর্য্য উঠিতেছে, প্রভাতের স্নিগ্ধতা মধ্যাহ্নের দীপ্ততার মধ্য দিয়া সায়াহ্নের মাধুরিমায় নিমীলিত হইতেছে। বাতাস বহিতেছে, কখনও দক্ষিণের মলয় বাতাস নরনারীর হৃদয় অকারণ পুলকে ভরিয়া দিতেছে, কখনও বা প্রলয়ের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমস্ত সৃষ্টিকে ছারখার করিয়া দিতেছে। মানব দেখিল ফুল ফুটিতেছে, গাছ পত্রে পুষ্পে সুশোভিত হইয়া আবার ঝরিয়া পড়িতেছে। আদিম মানব ভাবিল এই বিশাল বিচিত্র পৃথিবীতে সে একা। এই বিরাট একাকিত্ব, এই অসহ অসহায়ত্ব মানুষের চিন্তাও কল্পনা শক্তিকে ভগবানের দ্বারে পৌছাইয়া দিল। পাহাড় পর্ব্বত নদী, বৃক্ষ, বায়ু, জল—প্রতিটি প্রাকৃতিক বস্তুতে বিস্ময় বিমুগ্ধ মানব তাহার হৃদয় অঞ্জলি তুলিয়া দিল। ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মতত্ত্ব ত পরবর্ত্তীকালের যোজনা। ঈশ্বর পরিকল্পনার প্রথম যুগে ঈশ্বরের প্রতি দ্বিধাবিহীন, কুণ্ঠাহীন শ্রদ্ধা অর্পণ। পরবর্ত্তী যুগ বিজ্ঞানের—যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে স্বতঃ প্রণোদিত হৃদয়োচ্ছ্বাসের প্রতিষ্ঠা।

বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ সিদ্ধ আচার্য্যগণের গীতি কবিতায় মুখরিত। কিন্তু বাঙ্গালী মানসের কোন স্তর এই ধর্ম্মমূলক গীতি-কবিতার সৃষ্টি করিয়াছিল সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা কালে তাহাই বিবেচ্য। বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি, কালের দিক দিয়া জাতির উৎপত্তির অনেক পরবর্ত্তী স্তরের, ইহা নিঃসন্দেহ। চর্য্যাপদ-গুলিতে যে উপায়ে ধর্ম্মের তত্ত্ব ও পন্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিকতা সম্পন্ন ইহা লক্ষণীয়। মনুষ্য সৃষ্টির বহু পরের কথা—তখন প্রথম বিস্ময় ও যুক্তিহীন উচ্ছ্বাস কাটিয়া গিয়াছে—মানুষ ভাবিতে শিখিয়াছে—সকল কিছুকে বুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বাঁধিতে শিখিয়াছে। বিরাট সংস্কৃত সাহিত্যের সুমহান ঐতিহ্য পিছনে। দুঃখ শোক জরা ক্লিষ্ট মানব চাহিয়াছিল মুক্তি—শারীরিক এবং মানসিক। চিন্তাশীল সম্প্রদায় আছেন সর্ব্বযুগেই; চর্য্যাপদ গুলিতে রহিয়াছে সেই যুগের চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের সুদীর্ঘ চিন্তার ফল। যে জাতির অন্নের অভাব ছিলনা, কঠোর জীবন সংগ্রামে যাহাদিগকে লিপ্ত হইতে হয় নাই—সুজলা সুফলা বাংলা দেশের সরল নির্ব্বিরোধ গ্রাম্য জীবন তাহাদিগকে মানসিক চিন্তাধারার কোন সুউচ্চ পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছিল তাহার দৃষ্টান্ত এই চর্য্যাপদগুলি। সংস্কৃত সাহিত্য সুউন্নত ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য ছিল একান্তভাবে আভিজাত-

গণের গণ্ডির দ্বারা সুরক্ষিত। দেশের আপামর জনসাধারণ যাহা চাহিয়াছিল, যাহা চিন্তা করিয়াছিল—তাহার প্রকাশ কথ্য ভাষায় লিখিত এই গানগুলি। সংস্কৃতাভিমানী অভিজাত সম্প্রদায়ের কঠোর দৃষ্টির আড়াল করিবার জন্য তাই ইহার কবিগণের সচেষ্টতা—সন্ধ্যা ভাষার অনুসরণ।

এই চর্য্যাপদের যুগের পর দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন নাই। যাহারা শুধু চিন্তাই করিয়াছিল—যুদ্ধ বিগ্রহের উন্মাদনা যাহাদের মনে এতটুকুও শিহরণ জাগাইতে পারে নাই—মুসলমানগণের তীব্র আক্রমণ তাহারা প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। সরল শান্তিপ্রিয় আধ্যাত্মিক চিন্তায় বিভোর জাতি এই তুর্কী অভিযানে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এই দেড় দুইশত বৎসরের রক্ত চিহ্নিত ইতিহাস জাতির জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা পাই ইহার পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্য আলোচনা করিয়া।

তাহা হইলে সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতির মনে অভিব্যক্তির ইতিহাস খুঁজিতে গিয়া মধ্যে দুইশত বৎসরের একটি ছেদ পড়িতেছে। চর্য্যাপদে বাঙ্গালী মানসের যে পরিচয় পাইয়াছিলাম—তাহা এই দুইশত বৎসর অনেক কিছুই সঞ্চয় করিয়াছে। সুতরাং তুর্কী অভিযান শেষ হইলে যে সাহিত্য আমরা পাই—তাহা অনেকটা উন্নত স্তরের। এই সাহিত্যের ধারাকে মোটামুটী ভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (১) কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদের মধ্য দিয়া মঙ্গল কাব্যের গোড়াপত্তন ও (২) মালাধর বসুর ভাগবতের অনুবাদের মধ্য দিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের বীজ বপন।

কৃত্তিবাস রামায়ণ অনুবাদের মধ্য দিয়া যে মঙ্গল কাব্যের ধারার প্রবর্ত্তন করিলেন—তাহার একটা সুন্দর মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ সম্ভব। এই নূতন কাব্য ধারার প্রবর্ত্তনার পটভূমিকা স্বরূপ রহিয়াছে সুদীর্ঘ দেড়-দুইশত বৎসরের পরাজয়ের গ্লানি ও নিরুদ্ধ-অভিমান প্রহত প্রাণস্পন্দন—যাহার লিখিত নিদর্শন আজিও অনাবিষ্কৃত। তুর্কী আক্রমণ একদিন আসিয়া পড়িয়াছিল অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে আপনার ধ্যান ধারণায় নিরত বঙ্গবাসীর উপর। পরাজয়ের তীব্র জ্বালা ও মসী-চিহ্নিত বিপর্য্যয় বাঙ্গালী মানসের চিন্তাধারা ও কল্পনাকে যে পথে পরিচালিত করিয়াছিল—পরবর্ত্তী যুগের মঙ্গল কাব্য সেই পথেরই প্রকাশ। পরাজিত মানব যেমন তাহার নিশীথ শয্যায় আপনার উপর অলৌকিক বীরত্বের কল্পনা করিয়া সান্ত্বনা লাভ করে, তেমনি তুর্কী আক্রমণে বিপর্য্যস্ত জাতি অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন, অপরাজেয় আদর্শ-পুরুষের কল্পনা করিয়া সান্ত্বনা চাহিয়াছিল। গ্লানি লাঞ্ছিত দুইশত বৎসরের ইতিহাস তাই জাতিকে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের চন্দ্র-সদৃশ মানব রামচন্দ্রের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীর কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। তাই মঙ্গলকাব্যসমূহ দেবানুগৃহীত নায়কের তাৎপর্য্যহীন বীরত্ব কাহিনীতে পরিপূর্ণ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই নূতন কাব্য ধারার প্রবর্ত্তনা—এই নূতন বিষয় সন্নিবেশ—এই দিক দিয়া দেখিলে মুসলমান আক্রমণের একটি অত্যন্ত শুভ ফল।

মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মধ্য দিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে বীজ বপন করিলেন—তাহা চর্য্যাপদের কবির বাক্যধারারই অনুবর্ত্তন। দেশে বিপ্লব আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সে বিপ্লব পূর্ব্বতন চিন্তাধারার স্রোতকে ও রুদ্ধ করিয়া দিতে পারে নাই। তন্ত্রের যুগ হইতে কেমন করিয়া বৈষ্ণব যুগের উদ্ভব হইল, ধীরে ধীরে কেমন করিয়া এই পরিবর্ত্তন সম্ভব হইল—তাহা আজও অন্ধকারে। তবে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া খানিকটা ধারণা করা সম্ভব হইতে পারে। রাধাকৃষ্ণ কাহিনী, কাহিনী হিসাবে বহুদিনই এদেশে প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ ও শৈব আচার্য্যগণের সহজ ধর্ম্মতত্ত্ব তাহার সহিত কালের চক্রে মিশিয়া গিয়াছিল এবং কাহিনীর কৃষ্ণ দেবতায় পরিণত হইয়া গেল। মানুষের মানসিক বৃত্তিগুলিও ক্রমশঃ ক্রমশঃ সজাগ হইয়া উঠিতেছে। প্রেম এবং ভক্তি মানবকে এতখানি নাড়া দিয়াছিল যে তাহাদের স্রোতকে একই খাতে বহাইবার জন্য সেই প্রাচীন যুগেই একটা বিরাট প্রচেষ্টার কম্পন জাগিয়াছিল। জয়দেব, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কাব্যে এই প্রেম ও ভক্তির মিশ্রণের ধারাটি সুন্দর। জয়দেব প্রেম ও ভক্তি কতকটা স্বতন্ত্র ভাবে রাখিয়া মিশ্রণ ঘটাইয়াছিলেন—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এই প্রেম ও ভক্তিকে সম্পূর্ণ-ভাবেই মিশাইয়া দিয়াছেন তবে একটু যেন কাঁচাহাতে। অবশেষে কাব্যের কল্পনা বাস্তবরূপ লাভ করিল শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের মধ্য দিয়া। আপনার জীবন-খাতে প্রেম ও ভক্তির ধারায় ভারতের পূর্ব্বাঞ্চল প্লাবিত করিয়া, প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে স্পন্দন জাগাইয়া শ্রীচৈতন্য হইলেন যুগপ্রবর্ত্তক। কবি ভাবিলেন—এই ত প্রেমময়ী রাধা—এই ত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ—

"রাধা ভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপং"

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে এতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে চৈতন্যের পর বহুদিন ধরিয়া চৈতন্য প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মেরই অনুসরণ ও অনুবর্ত্তন চলিল। অগণিত ভক্তকবি চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত এই ধর্ম্মের তত্ত্ব ও মর্ম্ম অবলম্বনে বহুসংখ্যক গীতি রচনা করিয়া গিয়াছেন—যাহার সমাদর জনসাধারণের নিকট আজিও বজায় আছে। নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণকে হৃদয়ের একটি চিরন্তন শাশ্বত বৃত্তি স্বীকার করিয়া তাহাকে ভক্তির স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার পিছনে জাতির মনের যে গভীরতা ও উদারতা প্রকাশ পাইয়াছে—এই প্রসঙ্গে তাহাও বিবেচ্য।

এমনি করিয়া মুসলমান অভিযানের পর বাংলা সাহিত্য দুইটি পথ ধরিয়া যাত্রা সুরু করিল—একটি শাক্ত ভাব, অপরটি বৈষ্ণবভাব; একটি শক্তি ও বিজয়ার উপাসনা, অপরটি প্রেম ও ভক্তির আরাধনা। কিন্তু লক্ষণীয় যে উভয় পথই ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া। জাতির কল্পনা নেত্রে তখনও ঈশ্বরের মোহাঞ্জন লাগিয়া আছে। তাহার সকল ভাবনা, সকল চিন্তা, সকল পরিকল্পনার মূলে ঈশ্বর। ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া বাংলা সাহিত্যের এই দুটি ধারা আগাইয়া চলিয়াছে, কিন্তু স্বতন্ত্র স্বাধীনভাবে নয়। বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাংলা

দেশে এতখানি বিপ্লব জাগাইয়াছিল যে শাক্ত ধারাতেও বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদ্ভাসিত জোয়ার বহুলাংশেই পড়িয়াছিল। মঙ্গল কাব্যগুলি বিশেষ করিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাব্যগুলিতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই প্রভাব লক্ষণীয়। বৈষ্ণব ধর্ম্মের ধারা আধুনিক-কাল পর্য্যন্ত ত প্রায় অবিকৃত ভাবে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু মঙ্গল কাব্যেরধারা আরও বিভিন্ন ভাগ হইয়া সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ গঠন করিয়াছে।

প্রথম যুগে মানব ঈশ্বরের নিকট প্রশ্নহীন দ্বন্দ্ববিরহিত চিত্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ সে যত অগ্রসর হইয়া আসিল—তত তাহার নিষ্কলঙ্ক চিত্তক্ষেত্রে দুই একটি সংশয়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। এই সংশয়ের রন্ধ্রপথে মানব আসিয়া প্রবেশ করিল দেবতার স্থানে অভিষিক্ত হইয়া। মনুষ্য ইতিহাসের নূতন যুগ মনুষ্য অধিকারের যুগ; মানবের স্বীয় অধিকার দাবী এবং দেবতার পরিবর্ত্তে মানবের পূজা—আধুনিক যুগের প্রধান লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য। এই আধুনিকতা, মানবের এই অধিকার দাবী অবশ্য একদিনে আসে নাই; মানুষের চিন্তাধারার সহিত ক্রমশঃ ধীর পাদক্ষেপে ইহা অধুনা-কাল অবধি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। যেদিন পৃথিবীরই একজন মানব আপনার অপরিসীম প্রেম ও ভক্তিতে স্বর্গের দেবতার স্তরে উন্নীত হইয়াছিলেন—সেইদিনই পৃথিবীর মানুষ মানুষের অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগে বাংলা সাহিত্যে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের হাতে বৈষ্ণব ও শাক্ত উভয় ধারায় যে গীতি কবিতার উদ্ভব হইয়াছে তাহা বাঙ্গালী জাতির চিন্তাধারায় বিশিষ্টতার পরিচায়ক। মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম পাদক্ষেপে দেবতার নরত্ব আরোপ এবং মানবে দেবত্ব আরোপ। ইহার পরবর্ত্তী স্তর আপনার মহিমায় মহিমান্বিত মানবের বর্ণনা। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সমাশ্রিত সাধারণ মানবের প্রতিষ্ঠা আরও পরবর্ত্তী যুগের। ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদনের কাব্য কালানুক্রমিক ভাবে পাঠ করিলে মানবের এই ক্রমিক বাস্তবাভিমুখীন চিন্তা ধারার সহিত পরিচয় লাভ করা যায়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব ধারা চৈতন্যদেবের পর প্রায় অবিকৃত ভাবেই চলিয়া আসিয়াছে। বৈষ্ণব মহাজনগণের পদাবলিগুলি বাঙ্গালী মানসের সহিত এতখানি মিশিয়া গিয়াছে, সর্ব্বোপরি শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বাঙ্গালী জাতির উপর এত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে আজও কীর্ত্তনের আকারে পদগুলি গৃহীত ও আস্বাদিত হইতেছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের যে ধারাটি তুর্কী অভিযানের পরেই বীরত্ব কাহিনী লইয়া আরম্ভ হইয়াছিল—তাহা চৈতন্য আবির্ভাবের পর দুই ভাগে ভাগ হইয়া গিয়াছে। এই দুই ভাগই বাঙ্গালী জাতির মনের বিশিষ্টতার পরিচায়ক। বাঙ্গালীর যে মন চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত প্রেম ধর্ম্মে আপ্লুত হইয়া গিয়াছিল—মঙ্গল কাব্যের একটি ধারা তাহার সহিত প্রায় মিশিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর প্রাণ দেবতাকে স্বর্গের অনধিগম্য শীর্ষ দেশে অপাংক্তেয় করিতে পারে নাই—কৃষ্ণ ও রাধার মতই—মেনকা, ও উমাকে আপনার কুটীরে অবনমিত করিয়াছে। আপনার প্রাণের রক্ত ও রসে কবিতাগুলি সত্যই অপূর্ব্ব, এবং বাঙ্গালী বিশিষ্ট মানসের সৃষ্টি। মঙ্গলকাব্যের এই ধারা যাহা বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে শাক্ত পদাবলীর আকার ধারণ করিয়াছে—পরবর্ত্তী কালে বাউল গান—তর্জ্জা গান—ও কবিগণের আকার ধারণ করিয়াছে। মঙ্গলকাব্যের অপর ধারাটি ভারতচন্দ্র রঙ্গলালের হাতে যুগোপযোগী পরিবর্ত্তন লাভ করিয়া আগাইয়া গিয়াছে।

আখ্যায়িকার প্রতি আকর্ষণ মানুষের মনের একটা প্রধান অঙ্গ। মানুষ চিরকালই নিজের কথা শুনিতে চায়। মঙ্গল কাব্যের এই ধারাটি প্রধানতঃ আখ্যানমূলক। মঙ্গল কাব্যের উৎস স্থূল মানবের ভক্তি গদগদ মনোভাব। মঙ্গল কবিরা যাহা বর্ণনা করিতেন, যে দেব দেবীর গুণকীর্ত্তন করিতেন প্রথমে তাহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা দিয়া নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতেন। ফলে মঙ্গলকাব্যের একটি বৈশিষ্ট্যই ছিল ভক্তির আতিশয্য ও প্রাবল্য, অকারণ উচ্ছ্বাস; প্রশ্নহীন, যুক্তিহীন অস্বাভাবিকত্ব ইত্যাদি। কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যুগের অগ্রগতির সহিত মানবের মন যত সুসংবদ্ধ ও চিন্তাধারা যত দৃঢ়বদ্ধ হইয়া উঠে ততই এই অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণের ভাব কাটিয়া যায়। আপ্রশ্ন হৃদয় উচ্ছ্বাসের স্থানে ক্রমশঃ যুক্তিপ্রিয়তা, বুদ্ধির দ্বারা বিচার-প্রয়াস, প্রভৃতি স্থান গ্রহণ করে। ভাষাতেও ক্রমশঃ অকারণ উচ্ছ্বাস কমিয়া গিয়া ইঙ্গিতমূলক ক্ষুদ্র অথচ অর্থগূঢ় উক্তি আসিয়া আসন লয়—আধুনিকতার এই লক্ষণগুলি আমরা ভারতচন্দ্র হইতে দেখি; সুতরাং বলা হইয়া থাকে ভারতচন্দ্রে আধুনিক যুগ আরম্ভ।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের অভ্যুদয়ক্ষণে দুর্ব্বার বেগে যাহা ইহার উপর পতিত হইয়া আসার কালজয়ী স্বাক্ষর অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে—তাহা হইতেছে পাশ্চাত্য প্রভাব। বস্তুতই বাঙ্গালীর সমাজ, জীবন, সাহিত্য—সর্ব্বক্ষেত্রেই এই পাশ্চাত্য প্রভাব,বিশেষ করিয়া ইংরাজি প্রভাব বিরাট। এই ইংরাজি দর্শন, সাহিত্য ধ্যান ধারণার প্রভাব যখন প্রথম আসিয়া উপস্থিত হইল—তখন প্রথম দৃষ্টিক্ষেপে এই উজ্জ্বল আলোক বাঙ্গালীর অনভ্যস্ত চোখে ঠিক সহ্য হয় নাই। তাই বিভ্রান্ত দৃষ্টি হইয়া প্রথমটায় বাঙ্গালী আবিলতার স্রোতে গা ভাসাইয়াছিল। সাহিত্যেও ইহার নিদর্শন বিদ্যমান। কিন্তু কিছুকাল পরেই পশ্চিমাগত এই উজ্জ্বল আলোক বাঙ্গালীর চক্ষেও অভ্যস্ত হইয়া গেল, সে তাহাকে সহজভাবেই গ্রহণ করিল। বাঙ্গালী জাতির অভিব্যক্তির ইতিহাসে এই পাশ্চাত্য সাহিত্য ও ভাবধারার সবচেয়ে বড় প্রভাব বোধ হয় ইহাই—যে বাঙ্গালী যাহা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিতেছিল—ইহা তাহাকেই গতি চাঞ্চল্য দিয়া বহুদূর ঠেলিয়া দিয়াছে। স্বাভাবিক ভাবে জাতির মনে যে আত্মসচেতনা জাগিয়াছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য জাতির সহিত পরিচয় লাভ তাহাকেই সমৃদ্ধ করিয়াছে। ঈশ্বরের প্রতি স্থিরনিবদ্ধ দৃষ্টি তখন চঞ্চল হইয়া মানবের দিকেও ফিরিয়াছে—বলিষ্ঠ সুগঠিত ইংরাজি সাহিত্য সেই দৃষ্টিকে অবনমিত, নির্য্যাতিত ও উপেক্ষিতের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের রোমান্সের প্রচলন ক্রমশঃ উপন্যাসের উদ্ভাবন, সমালোচনা মূলক সাহিত্যের প্রবর্ত্তন, গরিমাময় স্ত্রী-চরিত্র অঙ্কন,—প্রভৃতির পিছনে এই ইংরাজি প্রভাব অনেক

পরিমাণেই কার্য্যকরী। ইংরাজি সভ্যতার সহিত সংঘর্ষের ফলে এ দেশের সমাজে যে পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইয়াছিল যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল—জাতির মন যেভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল—বিভিন্ন যুগের সাহিত্যে তাহা প্রকাশিত; মধুসূদন, বংকিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—তাহার প্রকাশক।

ইহারও পরবর্ত্তীকালে জাতির চিন্তাধারা আরও বিস্তৃত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। সমাজের অত্যন্ত নিম্নস্তরের এমন কি পতিতাদেরও দাবী সাহিত্যে স্বীকৃত হইয়াছে। যুগোপযোগী চিন্তাধারা, বিভিন্ন দেশের সহিত মেলামেশা, জ্ঞানের বৃদ্ধির মধ্য দিয়া বর্ত্তমান যুগের মানুষ আজ এমন মানসিক স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে পতিতাদের উপরেও ঘৃণার পরিবর্ত্তে আজ অনুকম্পা জাগিয়া উঠিয়াছে। উদার ও ব্যাপক মনোবৃত্তি আজ সকলকেই স্ব স্ব স্থানে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। শরৎচন্দ্রের পর বাংলা সাহিত্য আধুনিকতার পথে আরও অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

একটা কথা আজকাল প্রায়ই শুনা যায় যে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক ধারা নাকি নিম্নাভিমুখী। কিন্তু সাহিত্যকে মনের অভিব্যক্তি ও জাতির ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া বিচার করিলে মনে হয়—ক্রম-অগ্রসরমান জাতির ইতিহাসে উর্দ্ধমুখী, নিম্নমুখীর কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। যে সৃষ্টি সাধারণের দ্বারা গৃহীত—তাহাই জাতির চিন্তাধারার প্রকাশ—তাহাই এ যুগে সত্য। নীতি বা moralityর কোন প্রশ্ন নাই—কারণ সবই ত মানবের প্রয়োজন প্রসূত।

আজ যখন জাতিকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলার আয়োজন আসিয়াছে, বিশ্বের সকলের সম্মুখে যখন সগর্বে দাঁড়াইবার সময় হইতেছে, তখন সর্ব্বপ্রথম যাহা প্রয়োজন—তাহা হইতেছে জাতির আপনার ইতিহাসের সহিত পরিচয় লাভ। কিন্তু এই ইতিহাস যদি আমরা শুধু মাত্র বিদেশী শাসনবর্গের লিপিবদ্ধ তালিকা লইয়া গঠন করি তবে তাহা হইবে অসম্পূর্ণ। জাতির সত্যকার ইতিহাস রহিয়াছে জাতির সাহিত্যের মধ্যে। সেই সাহিত্য সাগর উন্মোচিত করিয়া রচিত হইবে জাতির জাতীয় ইতিহাস। ইতিহাস যুগবিভাগ অনুসারে হইবে, না শতাব্দীর হিসাবে হইবে সে তর্ক নিষ্প্রয়োজন। অভিব্যক্তি-মূলক ইতিহাসে বিভাগ কতটা সম্ভব তাহাও বিবেচ্য। তবে মানুষের মন ইহার প্রধান উপাদান—তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

মাকড়সা

শ্রীসত্যেন সিংহ

সুরযমলের চোখ দুটো বাথরুমের দেওয়ালে আটকে গেলো। তুচ্ছ একটা দৃশ্য তাঁর মনকে আজ গভীর ভাবে নাড়া দিলে। মাকড়সার জালে আবদ্ধ সবুজ রঙের গঙ্গাফড়িং। ক্রমে ক্রমে মাকড়সা ফড়িংটাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে, ফড়িংটাও প্রাণ নিয়ে সরে পড়বার প্রয়াসে তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছে। কিন্তু তার বড় দুটো পা মাকড়সার জালে জড়িয়ে যাওয়ায় কোন ক্রমেই সে উড়তে পারছে না—বহু আয়াসে একটু অগ্রসর হলেই মাকড়সাও সঙ্গে সঙ্গে চলে।

বড়বাজারের বিখ্যাত ব্যবসায়ী সুরযমলের এমন একটা দৃশ্য দেখে বিচলিত হওয়া খুবই আশ্চর্য্যের কথা। কিন্তু তিনি জৈনধর্ম্মাবলম্বী—জীবের কষ্ট তাঁর প্রাণে ব্যথা দেয়, তাঁর ধর্ম্ম নাশ করে। প্রতিদিন তিনি দুবার করে পিঁপড়ার গর্ত্তে সুমিষ্ট শর্করা ছড়িয়ে দিয়ে জীবের সেবা করেন, গঙ্গাফড়িঙের অবস্থা দেখে তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। কি কষ্টই পাচ্ছে না জানি বেচারি! এমনি অনেকক্ষণ তিনি বসে বসে দেখতে ও চিন্তা করতে লাগলেন। এক সময় হঠাৎ মন স্থির করে উঠে পড়লেন—ফড়িংটাকে ঐ দুর্ব্বৃত্ত মাকড়সাটার কবল থেকে নিষ্কৃতি দেবেন। এগিয়ে গেলেন সুরযমল জৈন, কিন্তু নিকটে গিয়ে আবার দাঁড়ালেন। মাকড়সাও তো একটা জীব—তার মুখের গ্রাস তিনি কেড়ে নেবেন? ফড়িং ও অন্যান্য কীট পতঙ্গ আহার করবে বলেই তো ভগবান মাকড়সার সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে বহু চেষ্টায় যে আহার মাকড়সা সংগ্রহ করেছে তাই তিনি তার মুখ থেকে ছিনিয়ে নেবেন? এক্ষেত্রেও কি জীব কষ্ট পাবে না? মাকড়সা বাঁচবে কি খেয়ে?

কঠিন সমস্যা। চিন্তিত মুখে সুরযমল বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পরে তিনি গদিতে গিয়ে বসলেন। নানা জনে নানা কাজের বিষয় নিয়ে অপেক্ষা কচ্ছিল। সংক্ষেপে সকলকে তিনি বিদায় দিলেন। মনে স্বস্তি নেই। কি করা উচিত তাঁর—

ফড়িংটার এতক্ষণ কি অবস্থা হোল একবার দেখে আসতে ইচ্ছে হচ্ছে।

বড় ছেলে এসে জানালেন—চাল আজ এক শত টাকা মণ অবধি উঠেছে, কিছু ছাড়বো বাজারে?

চমকে উঠলেন স্থরযমল, মাথার হলদে পাকানো পাগড়ীটা তাঁর ঢিলে হয়ে গেলো।—চাল? কত চাল মজুত আছে আমাদের আড়তে?

কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ছেলে বললেন—সব মিলিয়ে পাঁচ লাখ মনের কম তো নয়ই।

—দাঁড়াও, আমি আসছি। স্থরযমল আবার বাথরুমে গিয়ে প্রবেশ করলেন। ছেলেরা, কর্ম্মচারীরা অবাক হয়ে গেলো কর্ত্তার অস্বাভাবিক ভাবান্তরে।

ফড়িংটা তখনও ছট্‌ফট্‌ কচ্ছে। কিছুতেই সে মাকড়সার লালাসিক্ত সূক্ষ্ম জালের ফাঁস থেকে নিজের পা দুটোকে উদ্ধার করতে সক্ষম হচ্ছে না। গালে হাত দিয়ে স্থরযমল চেয়ে রইলেন। তাঁর ভাবনাগুলো দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ঐ ছোট্ট মাকড়সা অত বড় একটা ফড়িংকে ধরে কি করবে? প্রথমে তিনি মাকড়সার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে ইতস্ততঃ কচ্ছিলেন, এখন ভাবলেন ফড়িংটা তো মাকড়সার প্রয়োজনের অনেক বেশী। সে তো শুধু ফড়িঙের মৃত্যু ঘটাবে। একটা ক্ষুদ্র মাকড়সা বৃহৎ গঙ্গাফড়িংকে কখনই আহার করতে পারবে না। সমস্ত দ্বিধা তিনি মুছে ফেললেন—ফড়িঙের যন্ত্রণায় তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠলো। একটা কাঠি দিয়ে তিনি ফড়িঙের পা দুটো মাকড়সার জাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন—ফড়িংটা উড়ে গেলো মুক্তির আনন্দে। স্থরযমল সেদিকে আর চাইলেন না। মনটা তাঁর হালকা হয়ে গেলো। সকাল থেকে যে গুরুভারটা বুকের ওপর চেপে বসেছিলো সেটা নেবে গেলো।

তিনি আবার গদিতে এসে বসলেন। কর্ত্তার হাসি-খুসি মুখ দেখে সকলে আশ্বস্ত হোল। ছেলে আবার চালের বিষয় জিজ্ঞাসা করতে এলেন। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ ছেলের মুখের দিকে চাইলেন স্থরযমল। এ ধরণের দৃষ্টিপাত ছেলের সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরে। প্রথমটা সে হকচকিয়ে গেলো। ধীরে ধীরে স্থরযমল জিজ্ঞাসা করলেন—চাল আমাদের কত দামে খরিদ করা হয়েছিলো?

—আমরা চৌদ্দ টাকা মণ দরে কিনেছি।

পাগড়িটা মাথা থেকে নামিয়ে স্থরযমল পুনরায় প্রশ্ন করলেন—মণ প্রতি অন্যান্য খরচা আমাদের কত পড়েছে?

—তা প্রায় আট আনা হবে।

এবার স্থরযমল যা বললেন তা শুনে ছেলে নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারলেন না। বসেছিলেন, উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন।

—মাত্র পনেরো টাকা দরে সব চাল ছেড়ে দেবো—আপনি বলছেন কি?

—আমি ঠিকই বলছি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত মজুত করে শত শত মানুষকে আমি মারতে চাই না—জীবের সেবাই আমার ধর্ম্ম, জীবের মৃত্যু ঘটানো নয়।

বিদ্রোহের সুরে ছেলে বললেন—জীবের সেবা করলে ব্যবসা রাখা যাবে না।

কঠিন কণ্ঠে স্থরযমল ছেলেকে তিরস্কার করলেন—তোমার উপদেশ শুনতে চাই নি—আমার ইচ্ছামত কাজ যাতে হয় তাই দেখ গিয়ে।

সমস্ত ক্রোধ ও অভিমান দমন করে নতমুখে ছেলে পিতার আদেশ পালন করতে চলে গেলেন।

বাড়ীর সকলের স্থির ধারণা হোল স্থরযমলের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে—নইলে এত বড় ব্যবসায়ী কি এমন একটা আদেশ দিতে পারে। যদিও তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করবার ক্ষমতা কারুরই নেই, তবু ছেলেরা ষড়যন্ত্র সুরু করলেন—তাঁকে পাগল সাব্যস্ত করবার জন্য।

স্থরযমলের বাথরুমে যাওয়া বেড়ে গেছে। ঘন ঘন তিনি সেখানে যাতায়াত কচ্ছেন। তাঁর আহার কমে গেছে—রাত্রে নিদ্রা হয় না—বার বার বাথরুমে ছুটে যান। একটি দিনে তাঁর ললাটে গভীর চিন্তাজনিত রেখাগুলি দ্বিগুণ গভীর হয়ে ফুটে উঠেছে। চোখের দৃষ্টিতে মত্ত উদাসীনতার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে।

হু হু করে জলের দরে এতদিনের মজুত-করা চাল বেরিয়ে যাচ্ছে, তার অর্দ্ধেক প্রায় শেষ হয়ে এলো। অসন্তুষ্টিতে ছেলেদের মুখ ভার হয়ে আছে ঠিক ঐ বিফল মাকড়সাটার মত। গদিতে বসে স্থরযমল তাদের মুখ নিরীক্ষণ কচ্ছেন। মাথায় তাঁর পাগড়ি নেই, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ীর উদ্ভব হয়েছে, পরণের কাপড় হয়েছে

মলিন। সহরের সেরা ডাক্তার এসে দেখা দিলেন। দেহ ও মন দুয়েরই চিকিৎসায় তিনি পারদর্শী। আগেই ছেলেরা তাঁকে তালিম দিয়ে রেখেছিলেন; তাই অতি সাবধানতার সঙ্গে তিনি সুরযমলের সম্মুখে হাজির হলেন। হেসে সুরযমল ডাক্তারকে অভ্যর্থনা করলেন ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করতেও ভুললেন না। অল্প কয়েকটি কথায় ডাক্তার জানালেন যে, এই বাজারে নাকি সুরযমল সস্তায় চাল সরবরাহ করে দেশবাসীর উপকার কচ্ছেন তিনিও তাই এঁদের ডাক্তার হিসাবে কিছু চাল কিনে রাখতে চান।

আবার হেসে প্রশ্ন করলেন সুরযমল—কত চান?—

—তা হাজার মণ কিনে রেখে দিলেই ভাল হয়—আবার কখন দর চড়ে যাবে কিছু বলা তো যায় না।—ষ্টেথস্‌কোপটা নাড়াচাড়া করে ডাক্তার বললেন।

—হাজার মনে আপনার কোন প্রয়োজন নেই। আপনার খাবার জন্য একমণ চাল দিতে পারি।

ডাক্তার বিস্মিত হলেন, কিন্তু সে বিস্ময় প্রকাশ না করে বললেন—বেশ তাই দেবেন, এখন আসি তবে। নমস্কার করে ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন এবং পাশেই সুরযমলের ছেলের গদিতে প্রবেশ করলেন। ডাক্তারকে সম্বোধন করে ছেলে যে কথা বললো সেটা তীরের মত এসে বিঁধলো সুরযমলের কানে—কেমন দেখলেন? পাগল বলেই মনে হোল না?

হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে সুরযমল বাথরুমে গিয়ে প্রবেশ করলেন। সমস্ত দিন সেখান থেকে আর বার হলেন না। সুরযমল—বিখ্যাত ব্যবসায়ী সুরযমল বদ্ধ পাগল বলে প্রচারিত হতে সুরু হ'ল। ডাক্তার তাঁকে পাগল বলে অভিহিত করে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। সেই সার্টিফিকেট সুরযমলের ছেলেরা কাল আদালতে পেশ করে পিতার সমস্ত ব্যবসায়ের দায়িত্ব উত্তরাধিকারের দাবীতে নিজেরা গ্রহণ করবেন।

তখন মধ্যরাত্রি। বাড়ীর সকলে নিদ্রিত। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন সুরযমল। অতি স্বাভাবিক মানুষের মত তিনি এসে নিজের নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

ভোরবেলা সুরযমল গদিতে গিয়ে নিজের আসন গ্রহণ করলেন। ছেলেরা বা কর্ম্মচারিরা কেউ তখনো আসেনি। ছেলে ঠিক করেছিলেন আজ তিনি বাপের গদিতে বসবেন, ঘরে পা দিয়েই কিন্তু ছেলে থমকে দাঁড়ালেন। বাপ সুরযমল নীরবে মাথা হেঁট করে বসে কাজ করছেন। পরণে তাঁর ধোয়া ধুতি, সাদা লম্বা কোট, নূতন পাগড়ি সযত্নে মাথায় বসান। সদ্য-ক্ষৌরিত মুখমণ্ডলে প্রথম সূর্য্যের লালচে আভা পড়ে তাঁকে ঠিক তিনদিন আগের সেই বিখ্যাত ব্যবসায়ী সুরযমল বলেই বোধ হচ্ছে। পাগল সুরযমল যেন পালিয়ে গেছে। ছেলের পদশব্দে সুরযমল চোখ তুলে চাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—এই যে এসেছো, এত দেরী হয় কেন তোমাদের উঠতে বল দেখি। আচ্ছা এখন চাল আমাদের কত মজুত আছে।

—দেড়লাখ মণ।

গম্ভীর গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন সুরযমল—দেড়লাখমণ কেন, তিনদিন পূর্ব্বে আমি পাঁচলাখমণ চালের হিসাব পেয়েছি।

—আপনার আদেশমত এই তিনদিনে সাড়েতিনলাখমণ চাল পনেরো টাকা দরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

—আমার আদেশমত? তোমরা কি সব পাগল হয়ে গেছো—এ রকম একটা অন্যায় আদেশ আমি কখনো দিতে পারি? যাও দাঁড়িয়ে থেকো না আমার সম্মুখে—বাজারে চাল সরবরাহ একেবারে বন্ধ করে দাও। কেবল মজুত কর, মজুত কর।

ছেলে আগেই বুদ্ধি করে সাড়েতিনলাখমণ চাল অন্যের বেনামিতে কিনে মজুত করেই রেখেছিলেন কিন্তু সে তথ্য প্রকাশ না করে বোকা মানুষের মত মুখ করে বেরিয়ে গেলেন।

একটা বড় শীকারের পেছনে সমস্ত প্রচেষ্টা ও শরীরের লালা নিঃশেষ করে সুরযমলের নিষ্ঠুর হস্তক্ষেপে হতাশ হয়ে মাকড়সাটার নূতন শীকার ধরবার উদ্যম থাকলেও শক্তি ছিলো না। দুদিন অনাহারে নির্জ্জীবের মত পড়ে থেকে কাল মধ্যরাত্রে সুরযমলেরই বাথরুমে তাঁরই চোখের সামনে মাকড়সাটা শুকিয়ে মরে গেছে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আততায়ীকে ধরিবার জন্য কেহ কেহ চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু দক্ষ আততায়ী সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার ফেলিয়া যাওয়া একটি রিভলবার কেবল কুড়াইয়া পাওয়া গেল।

এই ঘটনার পর ঢাকা সহরের বহুস্থানে যথারীতি খানাতল্লাস ও ধরপাকড় সুরু হইল। প্রকৃত আততায়ীকে ধরিতে না পারিলেও পুলিশ আপন দক্ষতা প্রকাশ করিতে কসুর করিল না। নির্দ্দোষ ও নিরপরাধ লোকরাই পুলিশের হাতে প্রহৃত হইতে লাগিল। অত্যাচারের মাত্রা এতই গুরুতর রকমের হইল যে বহু লোককে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালেও ভর্ত্তি হইতে হইল। যাঁহাকে আততায়ী বলিয়া পুলিশের সন্দেহ হইল, কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও যাঁহাকে ধরিতে পারিল না—তাঁহার নাম বিনয় বসু।

১লা সেপ্টেম্বর লোম্যান সাহেব মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বিনয়

বিনয় বসু

বসুকে ধরাইয়া দিতে পারিলে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে বলিয়া ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিলেন।

বিনয় বসু তখন ঢাকা মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেন—মেধাবী ছাত্র হিসাবে তাঁহার সুনামও ছিল। তাঁহার পিতার নাম রেবতীমোহন বসু—তিনি থাকিতেন জামসেদপুরে। তাঁহাদের নিবাস ছিল ঢাকা বিক্রমপুরের রাউতভোগ-এ। বিনয় বসুকে ধরাইয়া দিতে পারিলে যে পুরস্কার দানের বিষয় ঘোষিত হয়, তাহাতে সরকার পক্ষ তাঁহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে তাঁহার বয়স বাইশ বৎসর বলিয়া উল্লেখ করেন। সুভাষচন্দ্রের বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স দলে ১৯২৮ সালে বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত এবং দীনেশ গুপ্ত যোগদান করিয়াছিলেন এবং তিন জনেই যথাক্রমে মেজর, লেফ্‌টেন্যাণ্ট এবং ক্যাপ্টেন-এর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাদল গুপ্তের পিতার নাম অবনীমোহন গুপ্ত—নিবাস বিদগাঁও এবং দীনেশ গুপ্ত ছিলেন যশোলঙ্গ-এর সতীশচন্দ্র গুপ্তের পুত্র। সতীশচন্দ্র জামালপুরের পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। দীনেশও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেন—আইন-অমান্য-আন্দোলন আরম্ভ হইলে তিনি পড়া ছাড়িয়া দেন।

ঢাকার ঘটনার পর বিনয় বসুর পুনরায় সাক্ষাৎ মিলিল ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর। সেদিন তিনি ছিলেন এক দুর্দ্দান্ত ও দুঃসাহসিক অভিযানের দক্ষ নায়ক। ঐ তারিখে বিনয় বসু তাঁহার অপর দুইজন সঙ্গী দীনেশ গুপ্ত ও বাদল (সুধীর) গুপ্ত সহ ডালহৌসি স্কোয়ারের রাইটার্স বিল্ডিং-এ দুপুর বেলায় হানা দিলেন। তাঁহারা তিন জনেই সাহেবী পোষাকে সজ্জিত ছিলেন—মাথায় টুপিও ছিল। তাঁহারা সরাসরি রাইটার্স বিল্ডিং-এর দ্বিতলে উঠিয়া গেলেন। বাংলার তৎকালীন ইনস্‌পেক্টর জেনারল অফ প্রিসনস্ কর্ণেল সিমসন তখন আপন কক্ষে বসিয়া অফিসের কার্য্যে রত ছিলেন। তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়াই বিপ্লবীরা তাঁহাকে গুলি করিলেন—সঙ্গে সঙ্গেই সিমসন সাহেবের দেহ চেয়ারের উপর এলাইয়া পড়িল। ইহার পর বিপ্লবীরা বাহিরের বারান্দায় আসিয়া চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ গুলি নিক্ষেপ সুরু করিলেন। জনৈক সেক্রেটারি তাঁহাদিগকে আঘাত করিবার অভিপ্রায়ে কি একটা বস্তু তাঁহাদের দিকে নিক্ষেপ করিলেন—কিন্তু তাহা তাঁহাদের গায়ে লাগিল না। বিপ্লবীরা তখন সেই ইংরাজ সেক্রেটারিকেও গুলি মারিয়া ভূতলশায়ী করিলেন। ইহার পর বিপ্লবীরা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, হোম সেক্রেটারি মিঃ আলবিয়ান মার-এর। তাঁহাদের গুলির আঘাতে মার্ সাহেবের কক্ষের দরজার কাচ ভাঙ্গিয়া গেল।

ইহার পর দ্বিতলের বারান্দায় বাধিয়া গেল এক রীতিমত খণ্ড-যুদ্ধ। বাংলার পুলিশ-বিভাগের তৎকালীন ইনস্‌পেক্টর জেনারল মিঃ ক্রেগ্ তাঁহার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বিপ্লবীদের লক্ষ্য করিয়া রিভলবারের গুলি চালাইলেন—কিন্তু তাহা বিপ্লবীদের গায়ে লাগিল না। মিঃ ফোর্ড নামে অপর একজন ইংরাজ অতঃপর মিঃ ক্রেগের হাত হইতে তাঁহার রিভলবারটি লইয়া বিপ্লবীদের লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইতে লাগিলেন। উহাও কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে লাগিল। পুলিশ-বিভাগের সহকারী ইনস্‌পেক্টর জেনারল মিঃ জোনস্ আসিয়াও কয়েক রাউণ্ড গুলি চালাইলেন—তাহাতেও কোন কাজ হইল না।

সেদিন যেন রণদুর্ম্মদ হইয়াই বিপ্লবীরা আক্রমণ পরিচালনায় মত্ত হইয়াছিলেন। একদিক হইতে অপরদিক পর্য্যন্ত দ্বিতলের প্রায় প্রতিটি কক্ষেই তাঁহারা একে একে হানা দিতে লাগিলেন। ইউরোপীয় অফিসার ও কর্ম্মচারীবর্গ প্রাণভয়ে এদিকে-সেদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। সকলের চোখে-মুখেই আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা, ভয়ে সকলেই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। লালবাজারের পুলিশ হেড-কোয়ার্টারে সংবাদ পৌঁছাইবামাত্র কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্ট, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার মিঃ গর্ডন ও মিঃ বার্ট প্রভৃতি শক্তিশালী পুলিশ-বাহিনী লইয়া অবিলম্বে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনজন বিপ্লবীকে পরাভূত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহু চেষ্টাতেও তাঁহারা কিন্তু বিপ্লবীদের কিছুই করিতে পারিলেন না। এক সময় দীনেশের বাহুতে পুলিশের একটি গুলি লাগিল বটে, তাহাতেও তিনি কিন্তু কাবু হইলেন না, পূর্ব্ববৎ সমানেই গুলি চালাইতে লাগিলেন।

তিনজনে অতঃপর পাসপোর্ট অফিস আক্রমণ করিলেন। সেই সময় সেখানে ছিলেন একজন আমেরিকান পাদ্রী—তাঁহার নাম জনসন্। প্রাণভয়ে তিনি কোনওমতে দেওয়ালের গা-নল বাহিয়া নীচে পলায়ন করিলেন।

বিপ্লবীদের গুলি এই সময় প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছিল। সেদিন তাঁহারা আসিয়াছিলেন জীবন লইবার এবং জীবন দিবার প্রতিজ্ঞা লইয়া; সুতরাং কার্য্য সমাধা করিয়া নায়ক বিনয় বসুর নেতৃত্বে একটি কক্ষে তাঁহারা মৃত্যু বরণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বাদল গুপ্ত ভক্ষণ করিলেন পটাসিয়াম সায়নাইড বিষ—মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িলেন। চেয়ারের উপর তাঁহার দেহ এলাইয়া পড়িল। বিনয় ও দীনেশ আপন আপন আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে আত্মহত্যার চেষ্টা করিলেন। ইহার ফলে উভয়েই গুরুতররূপে আহত হইলেন।

বিনয় জানিতেন যে পুলিশের নিকট তাঁহার পরিচয় গোপন থাকিবে না। তাই পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজের নাম সঠিকই বলিলেন, কিন্তু সঙ্গী দুইজনের পরিচয় দিলেন ছদ্মনামে। তাঁহাদের তিনজনের শরীর তল্লাস করিয়া পুলিশ অস্ত্র-শস্ত্র ও গুলি-বারুদ উদ্ধার করিল। বাদল গুপ্তের পকেট হইতে একটি জাতীয় পতাকাও পাওয়া গেল।

বিপ্লবীদের আক্রমণে সেদিন অন্যান্য যাঁহারা আহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জুডিসিয়াল সেক্রেটারি মিঃ নেলসন্ এবং সেক্রেটারি মিঃ ট্যয়নাম-এর নাম উল্লেখযোগ্য। Statesman পত্রিকায় রাইটার্স বিল্ডিংয়ের এই ঘটনাকে "Secretariat Raid" ও "Battle veranda" নামে অভিহিত করা হয়।

আহত অবস্থায় বিনয় ও দীনেশকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। দীনেশের গলার বাম পার্শ্বে গুলির আঘাত লাগিয়াছিল—আর বিনয়ের ললাটের উভয় পার্শ্বেই গুলির আঘাত চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইল। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকিয়া দীনেশ ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন—কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন বিনয় বসু। যে কয়দিন তিনি হাসপাতালে জীবিত ছিলেন—তাহার অধিকাংশ সময়ই তিনি অচৈতন্য অবস্থায় থাকিতেন। যখন তাঁহার সামান্য সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিত, তখন তিনি হাতের আঙুল দিয়া ক্ষতস্থান ঘাঁটিয়া বিষাক্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। এইভাবে তাঁহার ক্ষত শেষ পর্য্যন্ত 'সেপটিক' হইয়া গেল এবং ১৩ই ডিসেম্বর তিনি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার জননী শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন।

দীনেশ গুপ্ত সুস্থ হইয়া উঠিলে এক স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুন্যালে তাঁহার বিচার সুরু হইল। এই ট্রাইব্যুন্যালে বিচারক ছিলেন মিঃ গার্লিক, শ্রী এন, কে, বসু ও জনাব আদিলজ্জমান সাহেব। বিচারে দীনেশের প্রাণদণ্ড হইল। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে পর পর হাইকোর্ট ও প্রিভি কাউন্সিল-এ আপিল করা হয়—কিন্তু উক্ত দণ্ডাদেশ বহাল থাকে।

তাঁহার প্রাণদণ্ড রদ্ করাইবার প্রচেষ্টায় সারা দেশে রীতিমত আন্দোলন হইল—কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। ১৯৩১

দীনেশ গুপ্ত

সালের ৭ই জুলাই আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে দীনেশের ফাঁসি হইয়া গেল। ফাঁসির মঞ্চে আরোহণের পূর্ব্বে তিনি ইংরাজ প্রহরীকে আঘাত হানিয়া যান।

দীনেশের ফাঁসিতে কলিকাতায় হরতাল প্রতিপালিত হয়। মনুমেণ্টের পাদদেশে অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভায় দীনেশের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। অপরাহ্ণকালে একটি শোভাযাত্রা কৃষ্ণ পতাকাসহ চৌরঙ্গী হইতে ভবানীপুর প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের নিকট পর্য্যন্ত গমন করে। ৮ই জুলাই কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় দীনেশের ফাঁসিতে শোক প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সভা স্থগিত রাখা হয়।

১৯৩০ সালের ১২ই ডিসেম্বর কালীঘাটে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে চুণীলাল মুখোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হইলেন। তাঁহার নিকট পুলিশ একটি রিভলবার প্রাপ্ত হইল। এই প্রসঙ্গে আরও যে দুইজন ধরা পড়িলেন,

তাঁহাদের নাম—মণীন্দ্রলাল সেন ও সুবোধ দাশগুপ্ত। মিঃ গার্লিক, শ্রী এন, কে, বসু এবং জনাব আদিলজ্জমানকে লইয়া গঠিত ট্রাইব্যুন্যালে ইঁহাদেরও তিন জনের বিচার হয়। বিচারে তিন জনের প্রতিই প্রদত্ত হয় এক বৎসর হিসাবে কারাদণ্ড।

এই বৎসরেই ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার G. D. Montworency-র উপর আক্রমণ চালান হইয়াছিল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন সভায় তিনি গিয়াছিলেন সভাপতিত্ব করিতে। তাঁহার উদ্দেশে সেই সময় উপর্য্যুপরি কয়েকটি গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। গভর্ণরকে রক্ষা করিতে গিয়া সহকারী দারোগা চলন সিং নিহত হন এবং আর একজন শ্বেতাঙ্গ ইনস্পেক্টরও আহত হন। একটি ইউরোপীয় মহিলাও এই ঘটনায় আহতা হইয়াছিলেন। গভর্ণরের দক্ষিণ হস্তে গুলির আঘাত লাগে। তিনি পাশের ঘরে গিয়া নিজেই হাতের রক্ত পরিষ্কার করিয়া ফেলেন এবং নিজ আঘাতের বিষয়

বাদল (সুধীর) গুপ্ত

কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ফেলো (তিনি চিকিৎসকও ছিলেন) শেষ পর্য্যন্ত উহা জানিতে পারিয়া তাঁহার ক্ষতস্থানে ঔষধ দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেন।

আততায়ীকে ঘটনাস্থলেই ধরিয়া ফেলা হয়। তাঁহার নিকট হইতে জানা যায় যে তাঁহার নাম হরকিষণ, বয়স বাইশ বৎসর, বাড়ী পেশোয়ার জেলায়। কোনও একজন আফ্রিদির নিকট হইতে আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয় করিয়া গভর্ণরকে হত্যা করিবার জন্যই তিনি নাকি আসিয়াছিলেন। ১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারি হরকিষণ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

পাঞ্জাবের গভর্ণরকে হত্যা করিবার ষড়্‌যন্ত্র করার অভিযোগে "মিলাপ" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক দুর্গাদাস, চমনলাল এবং রণবীর সিং অভিযুক্ত হন। বিচারে তাঁহাদের প্রতিও মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়।

মেদিনীপুরের দাসপুর থানায় পুলিশের অত্যাচারের বিবরণ পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। স্বদেশী অন্দোলনের সময় মেদিনীপুরের নানা স্থানে যখন পুলিশী জুলুম চলিতেছিল, তখন মিঃ পেডি ছিলেন সেখানকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। ন্যায়পরায়ণ বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার শাসনকালে মেদিনীপুর জেলায় যে সকল অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তিনি তাহা বন্ধ করিতে পারেন নাই। সকল অত্যাচারই তাঁহার জ্ঞাতসারে এবং অনুমোদন ক্রমে অবশ্য নাও হয় তো সংঘটিত হইয়া থাকিতে পারে। মোটের উপর পেডি সাহেব লোক নেহাৎ মন্দ ছিলেন না এবং বহু সময় আপন প্রভাবে গভর্ণমেণ্টকে দ্রুত অর্থ বরাদ্দ করিতে বাধ্য করিয়া লোকের অসুবিধা নিবারণের চেষ্টা করিতেন; কিন্তু তৎসত্বেও তাঁহার শাসনকালে মেদিনীপুর জেলায় যে সকল অনাচার অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তাহার দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহার উপর গিয়া পড়িল। উপরন্তু আবার তাঁহারই সময়ে জেলখানায় বন্দীদের উপরও উৎপীড়ন অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া অভিযোগ উত্থাপিত হয়; সুতরাং বিপ্লবীরা পেডি সাহেবকে হত্যা করিয়া এই সকল অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন।

মেদিনীপুরের কলেজিয়েট স্কুলে যে শিল্প-প্রদর্শনী হয়, তাহাতে ১৯৩১ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি মিঃ পেডি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার কার্য্য যখন চলিতেছিল, তখন জনৈক বিপ্লবী তাঁহার উপর আগ্নেয়াস্ত্র হইতে গুলি বর্ষণ করিয়া পলায়ন করিলেন। কেহই আততায়াকে ধরিতে বা চিনিতে পারিলেন না। পেডি সাহেব আহত হইয়া টলিতে টলিতে পাশের ঘরে গেলেন এবং সেখানে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

এই ঘটনা উপলক্ষে পুলিশ সন্দেহবশতঃ বিমল দাশগুপ্তকে গ্রেপ্তার করে। বিচারপতি মেসার্স পিয়ারসন, এস, কে, ঘোষ এবং মল্লিক সাহেবের এজলাসে হাইকোর্টে বিমল দাশগুপ্তের বিচার হয়। প্রমাণাভাবে বিচারপতিগণ তাঁহাকে খালাস দেন।

বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণরের উপরও এই বৎসর আক্রমণ পরিচালিত হয়। গভর্ণর সার আর্ণেষ্ট হট্‌সন ১৯৩১ সালের ২৩শে জুলাই পুণার ফার্গুসন কলেজে গমন করিয়াছিলেন। কলেজের লাইব্রেরি কক্ষে তিনি যখন ছাত্রগণের সমক্ষে বক্তৃতা দিতেছিলেন, তখন বাসুদেব বলবন্ত গোগাটি নামে একটি উনিশ কুড়ি বৎসরের মহারাষ্ট্রীয় যুবক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলিবর্ষণ করেন। গভর্ণর কিন্তু অক্ষতদেহে বাঁচিয়া যান।

দীনেশ গুপ্তের বিচার প্রসঙ্গে মিঃ গার্লিকের নাম পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। মিঃ আর, আর, গার্লিক, আই-সি-এস ছিলেন আলিপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসনস্ জজ। অস্থায়ীভাবে তিনি হাইকোর্টেও কিছুদিন বিচারপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। কানে তিনি কিছু কম শুনিতেন। তাঁহাকে প্রেসিডেণ্ট করিয়া যে ট্রাইব্যুন্যাল গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, দীনেশ গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর বিচার হয় ও তাঁহাদের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়। ইহার ফলে বিপ্লবিগণের ক্রোধ গার্লিক সাহেবের উপর গিয়া পড়ে। ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে একখানি পত্রও একবার লেখা হইয়াছিল। দীনেশের ফাঁসির

দিন কুড়ি পরে ১৯৩১ সালের ২৭শে জুলাই শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে হত্যা করা হইল।

ঐদিনে তিনি আপন এজলাসে উপবিষ্ট হইয়া মোকদ্দমার শুনানী শ্রবণ করিতেছিলেন। আদালতের কার্য্য চলিতে থাকার সময়ই সহসা একজন যুবক তাঁহার এজলাসে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন। সেখানে তখন অধিক লোক ছিল না। গুলিবিদ্ধ হইয়া মিঃ গার্লিক চেয়ারের উপর এলাইয়া পড়িলেন। যথাসম্ভব দ্রুত তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইল বটে, কিন্তু সেখানে তাঁহার মৃত্যু হইল।

ঘটনার সময় সেখানে একজন সার্জেন্ট, একজন কনষ্টেবল এবং গোয়েন্দা বিভাগের একজন দারোগা ছিলেন। আততায়ীর সহিত তাঁহাদের তিনজনের ধ্বস্তাধ্বস্তি ও গুলি বিনিময় সুরু হইল। ইহার ফলে কনষ্টেবলটিও আহত হইল সাংঘাতিকভাবে। যুবকটিকে জীবন্ত ধরা সম্ভব হইল না—বিষ ভক্ষণ করিয়া তিনি ঘটনাস্থলেই আত্মহত্যা করিলেন। তাঁহার পকেট হইতে যে লিপিখানি পাওয়া গেল, তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

"তুমি ধ্বংস হও, দীনেশকে যে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছ, তাহার ফল ভোগ কর।"

লিপিখানির নিম্নে "বিমল গুপ্ত" নাম স্বাক্ষর পাওয়া যায়, কিন্তু উহাই তাঁহার প্রকৃত নাম কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তাঁহার দেহটি কাহারও দ্বারা সনাক্ত করানো যায় নাই। অনেকে উক্ত যুবকের উপাধি "ভট্টাচার্য্য" ছিল বলিয়া অনুমান করেন।

এই ঘটনার পর ৩০শে জুলাই তারিখে ডালহৌসি ইনস্টিটিউটে কিছু সংখ্যক লোকের এক সভা হয়। উক্ত সভায় ভারতীয় ও শ্বেতাঙ্গ উভয় সম্প্রদায়ের লোকই উপস্থিত ছিলেন। গভর্ণমেন্টের বিচার-বিভাগের বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার লেনসেট স্যাণ্ডারসন ঐ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উহাতে মিঃ গার্লিকের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা এবং দীনেশের ফাঁসিতে কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, উহার তীব্র সমালোচনা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ঢাকার কমিশনার মিঃ এ, ক্যাসেল্-এর উপর আক্রমণ চালান হয় ১৯৩১ সালের ২১শে আগষ্ট। ঐদিনে তিনি গিয়াছিলেন টাঙ্গাইলের সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ কার্য্যালয়ে। সেই সময় জনৈক বিপ্লবী তাঁহার উপর গুলিবর্ষণ করেন। মিঃ ক্যাসেল্ ইহাতে সামান্য আহত হন বটে, কিন্তু তাঁহার জীবন রক্ষা পায়।

হিজলীর বন্দী-নিবাসে এই সময় যে অত্যাচার সংঘটিত হয়—তাহা যেমনি নারকীয়, তেমনি মর্ম্মন্তুদ। কোনও সভ্য গভর্ণমেন্টের জেলখানার মধ্যে অসহায় নিরস্ত্র বন্দীদের উপর যে এইরূপ আক্রমণ পরিচালিত হইতে পারে, তাহা যেন বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; কিন্তু ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদী শাসনকালে অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছে—সাম্রাজ্যবাদকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কোনও অপরাধের অনুষ্ঠানেই তাঁহারা কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হন নাই। ক্ষমতালিপ্সা তাঁহাদিগকে নরঘাতন অনুষ্ঠানে প্রেরণা যোগাইয়াছে, নৃশংস নিষ্ঠুরতায় তাঁহাদিগকে মত্ত করিয়াছে, সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য করিয়াছে। বৃটিশ-শাসনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এইরূপ বহু দৃষ্টান্তই খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

মেদিনীপুর জেলায় খড়্গপুর হইতে প্রায় মাইল দেড়-দুই দূরে হিজলী বন্দীনিবাস অবস্থিত। এক সময়ে ঐস্থানে কয়েকটি সরকারী অট্টালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহারই কয়েকখানি বড় বড় বাড়ীতে গভর্ণমেন্ট বন্দী-নিবাস স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং কয়েক শত বন্দীকে সেখানে আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সকল বন্দীর অধিকাংশেরই কোন বিচার হয় নাই—রাজনৈতিক কারণে বিনা বিচারে অন্যায়ভাবে তাঁহাদিগকে শুধু সন্দেহবশে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল; সুতরাং বন্দীদের মন স্বভাবতঃই সর্ব্বদা বিক্ষুব্ধ হইয়া থাকিত। বিনা অপরাধে বিনা বিচারে যাঁহারা আবদ্ধ হইয়া আছেন, তাঁহারা যে সঙ্গতভাবেই বিক্ষুব্ধ অবস্থায় থাকিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি?

বন্দীদিগকে যে খোরাকী দেওয়া হইত, তাহাতে তাঁহাদের খরচ কুলাইত না। এজন্য তাঁহাদের মনে অসন্তোষ ছিল এবং তাঁহারা উহা বাড়াইবার জন্য পুনঃ পুনঃ দাবী করিয়াও ব্যর্থ মনোরথ হন। এই ব্যাপার লইয়াই কর্তৃপক্ষের সহিত বন্দীদিগের মূলতঃ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি গৌণ কারণ ছিল। আলিপুরের জজ মিঃ গার্লিক নিহত হওয়ার পর বন্দীগণ জেলখানায় আলোক-সজ্জা করিয়াছিলেন। এই ঘটনা লইয়াও বন্দীদিগের সহিত জেলখানার কর্তৃপক্ষের সদ্ভাব ক্ষুণ্ণ হয়। কোন কোন ইংরাজ অফিসার বন্দীদিগের সহিত এরূপ আচরণ করিতেন যে বন্দীদিগের আত্মসম্মানে তাহাতে আঘাত লাগিত। ১৯৩১ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর জনৈক বন্দীকে হিজলী বন্দীশালা হইতে অপসারিত করার সময় অন্যান্য যে সকল বন্দী তাঁহাদের সঙ্গীকে বিদায় জানাইতে প্রধান ফটক পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত বন্দীনিবাসের প্রহরীদের কিছু বচসা হয় এবং সামান্য ধাকাধাকিও হয়। প্রহরীরা ইহার ফলে উত্তেজিত হইয়া উঠে। ১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রি আন্দাজ সাড়ে আটটা-নয়টার সময় বন্দীনিবাসের প্রাঙ্গণে যে সকল বন্দী ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তাঁহাদের সহিত প্রহরীদের পুনরায় কথা কাটাকাটি হয়। বিপ্লবীদিগকে শায়েস্তা করিবার জন্যই প্রহরীরা যেন সুযোগ খুঁজিতেছিল। অল্প গণ্ডগোল আরম্ভ হইতেই বন্দীদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য তাহারা রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ করিতে থাকে। কোনও কোনও প্রহরী এই সময় এই গুজব রটাইয়া দেয় যে বন্দীদিগকে শায়েস্তা করিবার জন্য উপর-ওয়ালাদের আদেশ পাওয়া গিয়াছে। ইহার ফলে বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনা চরমে পৌছায় এবং প্রহরীরা ইচ্ছামত বন্দীদের উপর গুলি চালাইতে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রের মত এই আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত ও উপর্য্যুপরি

গুলিবর্ষণে নিরস্ত্র বন্দীগণ যেন দিশাহারা হইয়া যান। কেহ কেহ হয় তো তখন খাওয়া-দাওয়া সারিতেছিলেন, কেহ কেহ হয় তো গল্প-গুজবে রত ছিলেন। প্রহরীদের একতরফা অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণে অল্পক্ষণ মধ্যেই বন্দীদের এক শতেরও অধিক জন আহত হইলেন। তাঁহাদের যন্ত্রণা-কাতর আর্তনাদে জেলখানা পূর্ণ হইয়া গেল। যে দুইজন বিপ্লবী এই গুলিবর্ষণের ফলে জীবন হারাইলেন—তাঁহাদের নাম সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত।

সন্তোষ মিত্র ছিলেন তাঁহার পিতার একমাত্র পুত্র-সন্তান। তাঁহার পিতার নাম দুর্গাচরণ মিত্র। সন্তোষ মিত্র ও সুভাষচন্দ্র একই বৎসরে ১৯১৯ সালে অনার্স সহ বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এম-এ পরীক্ষায়ও সন্তোষ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তারকেশ্বরের পিতার নাম হরিনারায়ণ সেন।

মূর্খ ও নিষ্ঠুর প্রহরীদের দ্বারা যে নৃশংস অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল, তাহার সংবাদ অবিলম্বে কর্তৃপক্ষস্থানীয় সকলেই প্রাপ্ত হইলেন। খবর পাইয়াই মেদিনীপুরের তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডগ্‌লাস, কমাণ্ড্যান্ট মিঃ বেকার ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারগণ সকলেই গিয়া উপস্থিত হইলেন হিজলীর বন্দীনিবাসে। ব্যাপার দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এই শোকাবহ ঘটনার বিষয় জানিতে পারা মাত্র কলিকাতা হইতে সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন প্রমুখ নেতৃবর্গ হিজলীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নিজেদের দোষ ঢাকিবার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন যে বন্দীদিগের বিরুদ্ধে তাঁহারাই একটি মামলা রুজু করিবেন ; কিন্তু পুলিশ ইনস্পেক্টর তাঁহার রিপোর্টে বন্দীগণের বিরুদ্ধে মামলা চালানোর উপযোগী তথ্য ও প্রমাণ নাই বলিয়া মত প্রকাশ করায় এবং সরকারী উকিলও সেইরূপ অভিমত প্রকাশ করায় সরকার পক্ষ শেষ পর্যন্ত মামলা দায়ের করেন নাই।

ইহার পর বিচারপতি সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক ও ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ড্রামণ্ডের দ্বারা একটি বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা হয়। উক্ত তদন্তে বন্দীগণকে সাহায্য করিবার জন্য ও তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতি নেতৃবর্গ পুনরায় হিজলীতে গমন করেন। তদন্তের পর শ্রীযুক্ত মল্লিক ও মিঃ ড্রামণ্ড এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, বন্দীদের আচরণ কখনও কখনও বিরক্তিকর হইয়া থাকিলেও যথেচ্ছ গুলিবর্ষণ যথেষ্ট অন্যায় কার্য্য হইয়াছে।

ঘটনার পরদিন ১৭ই সেপ্টেম্বর সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্তের মৃতদেহ হাওড়া ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছায়। হাওড়া ষ্টেসন হইতে এক বিরাট শোকযাত্রা মৃতদেহ দুইটি লইয়া কেওড়াতলা শ্মশানঘাট পর্যন্ত যায়। সেইখানেই তাঁহাদের শেষকৃত্য সাধিত হয়।

২৬শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় গড়ের মাঠে দুইজন শহীদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য এক বৃহৎ জনসভার অনুষ্ঠান হয়। লক্ষাধিক লোক সেই সভায় যোগদান করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অনন্যসাধারণ ভাষায় শাসকবর্গের কলঙ্কলাঞ্ছিত নিষ্ঠুর কার্য্যের নিন্দা করিয়া শহীদ দুইজনের দেহমুক্ত আত্মার উদ্দেশে তাঁহার শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করেন।

(ক্রমশঃ)

আহ্বান

শ্রীকমলরাণী মিত্র

তবু ঘোচে নাক' শঙ্কা ও সংশয়,
তিমির রাত্রি বুঝিবা হলোনা শেষ !
তবু দিকে দিকে ধ্বনি উঠে জয় জয়
ভবিষ্যতের নিশ্চিত নির্দেশ ॥
চরম-লক্ষ্যে বাকী আছে আরো পথ,
আরো পথচলা আরো দৃঢ়তর পায়ে—
তবু দিকে দিকে ঘর্ঘর জয়রথ,
বিজয়-পতাকা গর্বে উড়িছে বায়ে ॥
মহা-ভারতের অমোঘ অজেয় বাণী
নিখিল বিশ্বে আলোকের বর্তিকা—
মুক্তি তীর্থে পথিক অগ্রগামী
জ্বালো সে আলোক লক্ষ দীপ্তশিখা !
সাধনা তোমার বজ্র কঠোর হো'ক
ত্যাগ সত্যের স্বার্থবিহীন ব্রতে,
তোমার পুণ্যে পুণ্য পিতৃলোক
তৃপ্তি লভিবে সপ্ত স্বর্গ হতে ॥
করযোড়ে করি আলোকের বন্দনা,
উদয়-শিখরে রাখিনু নমস্কার—
'জয় জয় হো'ক নিশঙ্ক অর্চ্চনা
জন্মভূমি এ ভারতের আত্মার।

টাকার মূল্যহ্রাসে ব্রিটেন ও ভারতের স্বার্থ

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রিটেন কর্ত্তৃক ডলারের হিসাবে ষ্টার্লিংয়ের মুল্যহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ডলারের হিসাবে টাকার মূল্য হ্রাস করিয়াছে।* যে অবস্থার মধ্যে পড়িয়া এই মূল্যহ্রাস ঘটিয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা আলোচিত হইল। এছাড়া মুদ্রা মূল্যহ্রাসের পর ব্রিটেন এবং ভারতের শাসন কর্ত্তৃপক্ষ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে যে আশা পোষণ করিতেছেন, তাহাও আলোচ্য প্রবন্ধে বিশ্লেষিত হইতেছে।

ব্রিটেন মুদ্রা মূল্যহ্রাসের পথ দেখায় এবং ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি (আমেরিকাস্থ 'ব্রিটিশ হণ্ডুরাস' বাদে), কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলি (পাকিস্থান বাদে) এবং কমনওয়েলথভুক্ত নয় এমন ষ্টার্লিং এলাকার ব্রহ্মদেশ, আইরিশ রিপাবলিক, ইরাক, আইসল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলি মুদ্রামূল্যহ্রাসের ব্যাপারে ব্রিটেনেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এছাড়া ব্রিটেনের সঙ্গে নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন, ইসরাইল, হল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, গ্রীস, পর্ত্তুগাল প্রভৃতি দেশও মুদ্রামূল্যহ্রাস করিয়াছে। ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ডলারের হিসাবে ষ্টার্লিংয়ের দাম কমাইবার সময় এই মুদ্রামূল্যহ্রাসের নীতি শুধু মাত্র ব্রিটেনের জন্যই গৃহীত হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং কমনওয়েলথের বা ষ্টার্লিং এলাকার দেশগুলির বা অপর কোন দেশেরই এই নীতি অনুসারে আপন আপন মুদ্রামূল্যের পরিবর্ত্তন সাধনের কোন প্রশ্ন ছিল না; কিন্তু ব্রিটেনের মুদ্রামূল্যহ্রাসের ফলে আন্তর্জাতিক মুদ্রাক্ষেত্রে ষ্টার্লিংয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া উল্লিখিত দেশগুলি ব্রিটিশ সিদ্ধান্ত অনুকরণ করিয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে টাকার মূল্যহ্রাসের ইহাই কারণ। পাকিস্তান অবশ্য তাহার আশাপ্রদ বহির্বাণিজ্যিক গতি, পাট, তুলা, চামড়া প্রভৃতি অর্থকরী পণ্য, কৃষিকেন্দ্রিক সরল অর্থনীতি, জনসাধারণের জীবনযাপনের নিম্ন-মান, শিল্প প্রসারের প্রভূত সুযোগ, বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রিটেনের তুলনায় মার্কিন সাহায্যের, মার্কিন পণ্যসংগ্রহের ও মার্কিন মূলধন লাভের আপেক্ষিক সুবিধা ইত্যাদি বিবেচনায় ব্রিটেনের সহিত হাত না মিলাইয়া মার্কিন মুদ্রা ডলারের সহিত পাকিস্তানী টাকার পূর্ব্বের হার বজায় রাখাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়াছে।

যুদ্ধোত্তর কালে ব্রিটেন সহ ষ্টার্লিং এলাকার ডলার সঙ্কট ক্রমেই এত তীব্র হইয়া উঠিতে থাকে যে, মার্কিন সাহায্য এবং ক্যানাডার নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিয়াও ব্রিটেনের পক্ষে ষ্টার্লিং এলাকার ঘাটতি ডলারের অর্দ্ধেকের বেশী সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। ইহার ফলে ষ্টার্লিং এলাকার অন্যান্য দেশগুলির ও ব্রিটেনের মজুত স্বর্ণ ও ডলার তহবিল ক্রমেই নিঃশেষ হইতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যে ব্রিটেনের ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ঘাটতি ছিল ৭ কোটি পাউণ্ড, ইহা ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বাড়িতে বাড়িতে ৬৩ কোটি পাউণ্ডে পৌছায়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ডলার বাণিজ্যে সমগ্র ষ্টার্লিং এলাকার ঘাটতি ছিল ১০২ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। অবস্থা কিরূপ অসহায় হইয়া উঠে তাহা নিম্নের তুলনামূলক হিসাব হইতে উপলব্ধি করা যাইবে :—

ষ্টার্লিং এলাকার নিট ডলার ও স্বর্ণ ঘাটতি

১৯৪৮ (জানুয়ারী—সেপ্টেম্বর)—৩৩ কোটি ষ্টার্লিং

১৯৪৯ (জানুয়ারী—সেপ্টেম্বর)—৩৭ কোটি ২০ লক্ষ ষ্টার্লিং

ব্রিটেনের মজুত স্বর্ণ ও ডলার তহবিল

১৯৪৮ (সেপ্টেম্বর)—১৪৬ কোটি ২০ লক্ষ ষ্টার্লিং

১৯৪৯ (সেপ্টেম্বর)—১১২ কোটি ৮০ লক্ষ ষ্টার্লিং

যুদ্ধের আগে মার্কিন পণ্যের দর তো এখনকার তুলনায় কম ছিলই, তাছাড়া ডলার অঞ্চলের সহিত ষ্টার্লিং এলাকার বাণিজ্যে ঘাটতি মিটাইতে ব্রিটেন তাহার ডলার এলাকাস্থ নিয়োজিত মূলধনের মুনাফা ব্যয় করিতে পারিত। যুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব্বের হিসাবে অধিকতর স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠায় আমদানী পণ্যের প্রয়োজন তাহার কমিয়া যায় অথচ পণ্য উৎপাদনের গড়পড়তা ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশে মার্কিন পণ্যের প্রভূত চাহিদা সত্ত্বেও ইহার দাম বাড়ে। ব্রিটেনে না হইলেও এই সময়ে ষ্টার্লিং এলাকার অন্যান্য দেশে মার্কিন পণ্যের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা দেখা যায়। ইতিমধ্যে যুদ্ধের প্রথম দিকে অর্থাৎ ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থা অনুসারে মার্কিন সাহায্য লাভের পূর্ব্বেই ব্রিটেন অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্র কিনিবার জন্য ডলার এলাকাস্থ তাহার নিয়োজিত মূলধনের ৪০ কোটি পাউণ্ডের বেশী খরচ করিয়া ফেলে এবং ফলে ডলার এলাকা হইতে এই মূলধনজনিত আয়ও আনুপাতিকভাবে কমিয়া যায়। এ অবস্থায় যথাসাধ্য ডলার এলাকার পণ্য আমদানী কমাইয়াও ব্রিটেন ডলার সঙ্কট এড়াইতে সমর্থ হয় না এবং শেষ পর্য্যন্ত ডলারের হিসাবে ষ্টার্লিংয়ের মূল্যহ্রাস ছাড়া পথ থাকে না। এইভাবে ষ্টার্লিংয়ের মূল্যহ্রাস সত্ত্বেও ব্রিটেন অন্তর্দ্দেশীয় অর্থনীতিক ভারসাম্য রক্ষায় পূর্ব্বানুসৃত নীতি চালু রাখিবারই ব্যবস্থা করিয়াছে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টার্লিং এলাকার দেশগুলি যে শতকরা ২৫ ভাগ ডলার এলাকাজাত পণ্য কম আমদানী করিবার সংকল্প করিয়াছে, তাহাতে শুধু ব্রিটেনের হিসাবেই ৪০ কোটি ডলার এবং সমগ্র ষ্টার্লিং এলাকার হিসাবে ১২০ কোটি ডলার বাঁচিয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ নিজ দেশে ব্যয় সঙ্কোচ

---

* গত মাসের ভারতবর্ষে আমার লেখা 'টাকার মূল্যহ্রাস' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

করিয়াও আর্থিক বাজারে সমতা রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। মুদ্রা মূল্যহ্রাসের ফলে যাহাতে দেশের মুদ্রাস্ফীতিরোধ নীতি কার্য্যকরী করার পক্ষে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি না হয়, তদুদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার ব্রিটেনে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মোট ২১০ কোটি পাউণ্ড খরচ কমাইবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই পরিমাণ ব্রিটেনের মোট জাতীয় আয়ের প্রায় এক পঞ্চমাংশ। কাজেই এই বিপুল ব্যয়সঙ্কোচের ফলে লোকের হাতে নগদ টাকার স্বাচ্ছল্য স্বভাবতঃই কমিয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে ডলার এলাকার পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি পাইবে বলিয়া ব্রিটেনে একই সঙ্গে মুদ্রাসঙ্কোচের কার্য্য অগ্রসর হইবে ও ডলার এলাকাজাত পণ্য বিক্রয় কমিবে বলিয়া ডলার সঙ্কটের তীব্রতা হ্রাস পাইবে।

ব্রিটেন মুদ্রামূল্যহ্রাস দ্বারা বৈদেশিক ঋণ এবং আভ্যন্তরীণ মুদ্রানীতির হিসাবে কিরূপ লাভবান হইয়াছে তাহা গত মাসের 'টাকার মূল্যহ্রাস' প্রবন্ধেই আলোচিত হইয়াছে। মুদ্রামূল্যহ্রাসের ফলে ডলার এলাকায় ষ্টার্লিং অঞ্চলের পণ্যের ঘাটতি যে ভাবে বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বিশেষ আশান্বিত হইয়াছেন। গত ১৭ই নভেম্বর ব্রিটেনের অর্থসচিব স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস্ ঘোষণা করিয়াছেন যে, সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় অক্টোবর মাসে ক্যানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৩৫ ভাগ ও ২৫ ভাগ ষ্টার্লিং মূল্যের পণ্য চালান বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ঘোষণায় আরও জানা গিয়াছে যে সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি হইতে ব্রিটেনের জন্য মজুত সোনা ও ডলারের পরিমাণ বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছে। এই বাবদ ইতিমধ্যেই বৃদ্ধি পাইয়াছে ২০ কোটি পাউণ্ড।

মুদ্রামূল্যহ্রাস দ্বারা ব্রিটেনের সবচেয়ে বেশী লাভ হইয়াছে সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থানের হিসাবে। সকলেই জানেন, ব্রিটেন অন্য দেশ হইতে কাঁচামাল আমদানী করিয়া শিল্পজাত পণ্য রপ্তানী করে। সস্তা হইবার ফলে ডলার এলাকায় ব্রিটিশ পণ্য এখন যত বেশী বিক্রীত হইবে, ব্রিটেনে ততই কলকারখানা অধিকতর চালু থাকিবার সম্ভাবনা এবং এইভাবে কলকারখানা চালু থাকিলে কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ অবশ্যই বাড়িয়া যাইবে। ব্রিটেনের ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিক কাঠামোর হিসাবে এইরূপ শিল্প-গতি ও কর্ম্মসংস্থানের সুযোগের গুরুত্ব যথেষ্ট।

যদিও ষ্টার্লিংয়ের সহিত যোগাযোগ রক্ষা, মুদ্রানীতির সমতাবিধান প্রভৃতি নানা হিসাবে ভারতের টাকার মূল্যহ্রাসের পক্ষেও যুক্তি আছে, তবু মুদ্রামূল্যহ্রাসের ফলে এই দিক হইতেই ভারতের সবচেয়ে অধিক অসুবিধা। ভারতে শিল্পপ্রসার হয় নাই বলিয়া শ্রমমূল্য এদেশে জাতীয় আয়ের অতি নগণ্য অংশ, এখানকার যে সব পণ্য আন্তর্জ্জাতিক বাজারে বিক্রীত হয়, তাহার অধিকাংশই খনি বা কৃষিজাত কাঁচামাল। এই কাঁচামালের মধ্যে পাট, তুলা ও কাঁচা চামড়ার স্থান উল্লেখযোগ্য হইলেও পাকিস্তান মুদ্রামূল্যহ্রাস না করায় এগুলির হিসাবে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে লাভবান হইবার সুযোগ কমিয়া গিয়াছে। তাছাড়া যে সব পণ্য এখন ভারত ডলার-এলাকায় পাঠাইতে পারে তাহার হিসাবে অন্তর্দ্দেশীয় চাহিদাও কিছু আছে, কাজেই টাকার মূল্যহ্রাসের দরুণ শতকরা ৩০.৫ ভাগ বেশী মাল পাঠাইয়া আগের সমপরিমাণ ডলার অর্জ্জনের হিসাবে ভারতের কতটা সুবিধা হইবে তাহা বলা কঠিন। শিল্প শ্রমবিক্রয়কারী ব্রিটেনের সহিত ভারতের এখানেই তফাৎ; ব্রিটেন মুদ্রামূল্যহ্রাস করিয়া দেশের শিল্পোন্নতি ও তৎসহ সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থানের আশা করিতেছে, কাঁচামাল রপ্তানীকারী ভারতের সে আশা করারও বিশেষ অর্থ হয় না। ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট পত্রিকা গত ২৩শে সেপ্টেম্বরের-সংখ্যায় আশঙ্কা করিয়াছেন যে মুদ্রা-মূল্য হ্রাসের ফলে ডলার এলাকার সহিত বাণিজ্যে ভারতের পাট জাত পণ্যের হিসাবে ৭ কোটি টাকা এবং চা, কাঁচা তুলা ও পাট, চামড়া প্রভৃতির হিসাবে ২ কোটি টাকা ক্ষতি হইবে। ইহার বিপরীত দিকে লাক্ষা, বাদাম, মশলা, অভ্র ও তৈলাদির হিসাবে ভারতের বাড়তি লাভ হইবে ৩ কোটি টাকা। কাজেই সব জড়াইয়া মুদ্রা-মূল্য হ্রাসের ফলে ডলার বাণিজ্যে অতঃপর ভারতের বৎসরে ৬ কোটি টাকার মত ঘাটতি হইবে। এছাড়াও ভারত সাধারণতঃ ডলার এলাকায় যে সব কাঁচামাল পাঠাইত, সেগুলির চাহিদা এত বেশী ছিল যে যোগাইতে পারিলে তখনই বাজার প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সেদিক হইতে বিচার করিলে এখন সস্তা করিয়া সেগুলির বাজার বাড়াইবার কথা আলোচনা করাই নিরর্থক। যন্ত্রপাতি এবং খাদ্যশস্যের জন্য ভারতকে এখনও বেশ কিছুদিন ডলার এলাকার উপর নির্ভর করিতে হইবে, কাজেই মুদ্রামূল্যহ্রাসের ফলে ডলার এলাকার পণ্যের দাম বাড়িলে তাহা ভারতের পক্ষে লাভজনক হইতে পারে না। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনে মার্কিন সাহায্যের অত্যাবশ্যকতার প্রশ্ন যদি সত্যই থাকে, তাহা হইলে মুদ্রামূল্যহ্রাস করা-না-করার সিদ্ধান্তে পাকিস্তান ভারতের তুলনায় লাভবান হইবেন বলিয়াই মনে হয়। এছাড়া ডলার এলাকার পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির অর্থ শেষ পর্য্যন্ত ষ্টার্লিং এলাকার পণ্যেরও কিছু মূল্যবৃদ্ধি। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু হইতে সুরু করিয়া ছোটবড় অনেকেই মুদ্রামূল্যহ্রাসের ফলে ভারতে পণ্যের দাম বাড়িবে না বলিয়া ভরসা দিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে এই ভরসার মূল্য যতই হোক, আসলে ইহার ফলে সাধারণ দেশবাসীর বেশী দুঃখ দূর হইবে না। যুদ্ধের জন্য ভারতের পণ্যবাজারে একটা ফাঁপা অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য্যভাবে এদেশে বাড়িয়া ছিল পণ্যের দাম। এখন যুদ্ধের পর লোকের আর্থিক স্বচ্ছলতা কমিতেছে বলিয়া বাজার এখন নামিবার দিকে যাইতেছে। ফাঁপা বাজারের চতুর্গুণ দাম স্বাভাবিকভাবেই অনেকখানি নামিবার কথা। বর্ত্তমানের তুলনায় বাজার অবশ্যই কিছুটা নরম হইবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক গতিতে যতটা নামা সম্ভব ছিল, টাকার মূল্যহ্রাসের ফলে পণ্যবাজার ঠিক ততটা আর নামিবে না। ডলার এলাকার পণ্যের মূল্য যতই বাড়ুক, এদেশের একশ্রেণীর অধিবাসীর (ইহাদের মধ্যে ছোট ব্যবসাদারের সংখ্যাই বেশী) পক্ষে এই পণ্য কেনা একেবারে বন্ধ করা কঠিন। কাজেই যদি তাহারা বাড়তি দামে ডলার এলাকার পণ্য কিনিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে তাহারা সেই বাড়তি দামটুকু তাহাদের উপর কোন না কোন

ভাবে নির্ভরশীল দেশের লোকের স্কন্ধেই চাপাইয়া দিবে। খাদ্যশস্য ও যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যাপারেও ভারতসরকারকে এখন কিছুদিন যথেষ্ট খরচ করিতে হইবে। অবশ্য ব্রিটেন মুদ্রামূল্যহ্রাসের পর ক্যানাডা ডলার এলাকার দেশ হইলেও তাহার মুদ্রামূল্য শতকরা ১০ভাগ হ্রাস করিয়াছে ; কিন্তু ক্যানাডার এই শতকরা ১০ভাগ মূল্যহ্রাসে সমগ্র ডলার এলাকা হইতে খাদ্যশস্য আমদানী সমস্যার অতি সামান্য সমাধানই হইতে পারে। ষ্টার্লিং এলাকার কাঁচামাল সস্তায় কিনিবার জন্য এবং বেশী দামে ষ্টার্লিং এলাকায় মাল বেচার অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া ডলার এলাকা শেষ পর্য্যন্ত পণ্যাদির দাম কমাইবে বলিয়া অনেকে এখন যে আশা করিতেছেন, তাহা আকাশকুসুম না হইলেও কার্য্যকরী হইতে সময় লাগিবে। এই অন্তর্বর্ত্তী সময়ে ডলার এলাকার পণ্য বেশী দামে সংগ্রহ করিয়া কাজ চালাইতে ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষকে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে। আন্তর্জ্জাতিক যে সব প্রতিষ্ঠানের অর্থ ব্যবস্থা ডলারের হিসাবে সংরক্ষিত, তাহাদের চাঁদার হিসাবেও ভারতের এখন বেশী খরচ হইবে। পাকিস্তানের সহিত গত বছরের (১৯৪৮ জুলাই—১৯৪৯, জুন) বাণিজ্যে ভারতের ঘাটতি হয় ২৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, পাকিস্তানের সহিত স্বাভাবিক বাণিজ্য সংরক্ষিত হইলে এই ঘাটতির পরিমাণ আরও বাড়িতে পারে। পাকিস্তানে ভিন্ন মুদ্রা বিনিময় হার প্রচলিত হওয়া মাত্র পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পণ্যাদির লেনদেন অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং ফলে মাছ, কাঁচা-বাজার ও খাদ্যশস্যের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে ঘাটতিও বাড়িয়াছে যথেষ্ট। এই ঘাটতি বাড়া মানেই পণ্যমূল্যবৃদ্ধি এবং জনসাধারণের সর্ব্বনাশ। অসম মুদ্রাহ্রাসের ফলে পাকিস্তানের পাট সম্পর্কে ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষ ও কলওয়ালাদের দারুণ দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে।*

যাহা হউক, বর্ত্তমানে অবস্থা যতটা সম্ভব আয়ত্তে রাখিতে হইলে ডলার এলাকায় শিল্পজাত পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধি, এদেশে যথাসম্ভব কম ডলারজাত পণ্য আমদানী, ষ্টার্লিং এলাকা হইতে পণ্য সংগ্রহ এবং আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিক সংস্কারে বিশেষ যত্নশীল হইতে হইবে। ষ্টার্লিং এলাকায় ডলার এলাকার পণ্য আমদানী ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা ২৫ভাগ কম করা হইবে বলিয়া এমনি স্থির হইয়াছে, তাছাড়া মার্কিন পণ্যের মূল্য বাড়িয়া যাওয়ায় জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের জন্য ভারত সরকারের কিছু ডলার দায় কমিবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারতের শিল্পজাত পণ্য, সৌখীন দ্রব্যাদি ও এদেশে অত্যাবশ্যক নয় এমন কাঁচা মাল রপ্তানী বাড়াইতেও ভারত সরকারের এখন সচেষ্ট হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ডলার অঞ্চল হইতে ভ্রমণকারীরা যাহাতে অধিক সংখ্যায় ভারতে আসেন, তজ্জন্য ডলার এলাকার বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য-প্রতিনিধিরা এখন প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন। ষ্টার্লিং এলাকা হইতে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণ পণ্য-সংগ্রহের দিকেও ভারত সরকার নজর দিতেছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। মনে হয় এই সব উপায়ে ডলার সঙ্কট কতকটা এড়ানো যাইবে।*

দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যও ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষ এখন চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টা যে মুদ্রাস্ফীতি রোধের প্রয়াসের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তাহা বলাই বাহুল্য। ব্যয়সঙ্কোচ এবং পণ্যবাজারে সমতা রক্ষা ইহার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। মুদ্রামূল্যহ্রাস-জনিত নূতন অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করার জন্য ভারত সরকার অর্থসচিব ডাঃ জন মাথাইয়ের সভাপতিত্বে একটি 'এড হক' কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কমিটির কাজ হইল মুদ্রামূল্যহ্রাসজনিত সমস্যার কুফল প্রতিরোধে এদেশে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে সেগুলি বিবেচনা করা। এই ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারীভাবে নিম্নলিখিত কার্য্যসূচী ঘোষিত হইয়াছে :—

(১) শুধু মাত্র অত্যাবশ্যক পণ্যের জন্য নিয়তম পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের উপযোগী বাণিজ্য-নীতি গঠন ;

(২) ভারতীয় মুদ্রার তুলনায় অধিকতর মুদ্রামূল্য সম্পন্ন দেশ হইতে যথাসম্ভব সস্তা দরে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ;

(৩) আইন ও শাসন বিভাগীয় ব্যবস্থা দ্বারা ফাটকাবাজী বন্ধ করা ;

(৪) অধিকতর পরিমাণ ডলার মুদ্রা অর্জ্জনের জন্য ডলার এলাকায় প্রেরিতব্য পণ্যের উপর রপ্তানী শুল্ক বসানো এবং বৈদেশিক পণ্য আমদানীকারক ভারত সরকার বা ভারতীয় উৎপাদক কেহই যাহাতে মুদ্রামূল্য হ্রাসজনিত সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত না হন, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(৫) মূলধন নিয়োগে উৎসাহ দিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জন-সাধারণকে সঞ্চয়ের দিকে আকর্ষণ ;

(৬) যুদ্ধকালীন মুনাফা সম্পর্কে কর তদন্ত-কমিশনের নিকট যাহাদের বিষয় প্রেরিত হয় নাই, তাহাদিগকে স্বেচ্ছায় কর মিটাইয়া দিবার সুযোগ দান ;

(৭) ব্যয়সঙ্কোচ নীতিতে চলতি বৎসরের রাজস্ব ও এককালীন ব্যয়খাতে ৪০ কোটি টাকা ও আগামী বৎসরে অন্ততঃ ৮০ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস ;

(৮) অত্যাবশ্যক পণ্যাদি ও খাদ্যদ্রব্যের খুচরা মূল্য শতকরা অন্ততঃ ১০ ভাগ হ্রাস।

এছাড়া ভারত সরকার বর্ত্তমানে নূতন লোক নিয়োগ বন্ধ রাখিয়া, কর্ম্মচারীদের রাহা-খরচ শতকরা ১০ ভাগ কমাইয়া এবং অন্যান্য নানা-ভাবে ব্যয় সঙ্কোচের চেষ্টা করিতেছেন। কর্ম্মচারীদের বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়াও কর্ত্তৃপক্ষ দেশের উপর হইতে মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমাইবার এবং এইভাবে সঞ্চিত অর্থ জনকল্যাণমূলক কাজে লগ্নী করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।*

* এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে ডলার বাণিজ্যে ভারতের ঘাটতি ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার স্থলে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ৮৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকায় উঠিয়া গেলেও ডলার এলাকার পণ্য আমদানী কমাইবার নীতি কার্য্যকরী হওয়ায় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ৪৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকায় নামিয়াছে।

* এই প্রবন্ধে 'ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস' প্রচারপত্র হইতে কিছু তথ্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

(পূর্বানুসরণ)

আলিমুদ্দিন মাষ্টার চলতে চলতে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন একবার।

উনিশ শো তিরিশ সালের সে ধ্বনির সঙ্গে 'আল্লা হো আকবর' জয়ধ্বনিত উঠেছিল আকাশে বাতাসে। তিন রঙা পতাকার সবুজ-সংকেত তাঁকে সেদিন দিয়েছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ-রক্ষার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। সেদিন তিনিও কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়েছিলেন:

"ইসি ঝাণ্ডেকে নীচে নির্ভয়,
বোলো ভারত মাতা কী জয়!"

'ভারত মাতা কী জয়!' সেদিন ভারত মাতাকে বন্দনা করতে জিভে জড়তা আসেনি, মনে জাগেনি পৌত্তলিক কুসংস্কারের প্রশ্ন। দেশের মাটিকে খানিকটা নিষ্প্রাণ বস্তুপিণ্ড বলেই মনে হয়নি সেদিন। 'সুজলাং সুফলাং সুখদাং বরদাং' এক বিচিত্র মাতৃকামূর্তি সেদিন আলোক-লেখায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল দৃষ্টির সম্মুখে। সে ভারত-বর্ষের পূজা-মণ্ডপে এসে অঞ্জলি সাজিয়েছিল: 'হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসিক-মুসলমান-খৃষ্টানী'—

কিন্তু তারপর? সাবানের ফেনায় গড়া বুদ্বুদ চোখের সামনে মায়ার মত মিলিয়ে গেল।

মনে পড়ছে হিন্দু মেয়েদের স্নিগ্ধ করাঙ্গুলিতে পরিয়ে দেওয়া সেই চন্দনের তিলক। সত্যাগ্রহের পথে নির্ভীক অভিযাত্রীর দল। আনন্দে-উৎসাহে সারা প্রাণ প্রদীপের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সেই চন্দন-চিহ্নকে সেদিন মনে হয়েছিল গৌরবের জয়টীকা।

মহিষবাথানের নোনা জল দিগন্তে হেলে-পড়া অস্ত চাঁদের আলোয় চিক চিক করে। হু হু করে রাত্রির দীর্ঘশ্বাসে সে জলে কলরোল ওঠে—মনে হয় মন্ত্রোচ্চার উঠছে: 'মোরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'। জ্যোৎস্না-ঝকিত কালো জলে ছায়া-ফেলা দীর্ঘকায় তালবীথি সারা রাত মর্মরিত হয়। দূরে আলোর মালা পরে রাত্রির অপ্সরী কলকাতা ঘুমিয়ে থাকে—উৎসব শেষে রঙ্গমঞ্চে লুটিয়ে পড়া কোনো সালঙ্কারা নর্তকীর মতো।

বাতাসে শীত ধরে। তাঁবুর মধ্যে বিনিদ্র চোখ মেলে চেয়ে চেয়ে দেখা যায়: একটার পর একটা উল্কা ঝরে পড়ছে। বৃশ্চিক রাশি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে ক্রমে পাণ্ডু হতে থাকে। সকাল থেকে আবার সংগ্রাম শুরু। পুলিশ আসবে—লাঠি আসবে, প্রিজন্ ভ্যানের খোলা দরজা অভ্যাগত-বরণের মতো এগিয়ে আসবে হাত বাড়িয়ে।

নিদ্রাহীন চোখে সমস্ত রাত বুকের মধ্যে কী যেন জ্বলতে থাকে। জ্বালা নেই—অথচ আশ্চর্য আগ্নেয় অনুভূতি আছে একটা। ঘুম আসে না, তবু স্বপ্ন ভাসতে থাকে। কন্যাকুমারীর প্রান্তরেখা থেকে সমুদ্রের সফেন জলে স্নান সাঙ্গ করে উঠে দাঁড়ালেন জননী ভারতবর্ষ; সিংহল তাঁর পায়ের তলায় ফুটে উঠল একটি রক্তকমলের মতো, সিন্ধু-শীকরলিপ্ত কেশজাল ছড়িয়ে পড়ল কারাকোরাম-শিবালিক থেকে খাসী-জয়ন্তীর বেণীবন্ধনে চন্দ্রনাথের সীমান্ত অবধি। বামকর প্রসারিত করে তিনি আরব-সমুদ্রের এলিফ্যাণ্টা থেকে প্রার্থনা করে নিলেন ত্রিশীর্ষ মহাকালের বরাভয়, দক্ষিণকরের নীবার-মঞ্জরী ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে দিলে গঙ্গাহৃদি শ্যামল বাংলার। উন্নত-কিরীটের তুষারশীর্ষে সৌরদীপ্ত স্বর্ণলেখা জ্বলতে লাগল, আকাশ থেকে আরত্রিকের রাশি রাশি দেবধূপ নেমে এল কুণ্ডলিত মেঘপুঞ্জের মতো।

তারপর ছয়মাস জেল। আরো ভাস্বর হল স্বপ্ন, প্রতিজ্ঞা হল আরো কঠিন। কিন্তু—

মনে পড়ছে কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী নিকুঞ্জবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। সঙ্গে ছিলেন আর একজন সহকর্মী—হৃষীকেশবাবু।

নিকুঞ্জবাবুর বাড়ির বাইরের লনে ফুটফুটে একটি ছেলে খেলা করছিল। হৃষীকেশ বললেন, তোমার বাবাকে

একটা খবর দাও খোকা, দরকারী কাজে আমরা এসেছি।

ছেলেটি ছুটে বাড়ির মধ্যে চলে গিয়েছিল। তারপরেই শোনা গিয়েছিল তার উচ্চকিত গলার স্বর: মা, মা, একটি ভদ্রলোক আর একটা মুসলমান বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

একটি ভদ্রলোক আর একটা মুসলমান। পার্থক্য এতই স্পষ্ট যে ব্যাখ্যা করে সেটা আর বোঝাতে হয়না। অপমানে কান দুটো জ্বালা করে উঠল, শরারের সমস্ত রক্তকণা মুহূর্তে এসে জমা হল মুখের প্রতিটি রোমকূপে।

হৃষীকেশবাবু অপ্রতিভের মতো হাসলেন। যেন কৈফিয়ৎ দিয়ে বলতে চাইলেন, ছেলেমানুষ।

—না, না, তাতে আর কী হয়েছে!—প্রাণপণে একটা কাষ্ঠহাসি হাসতে হল আলিমুদ্দিনকে। মনে পড়ে গেল সারদাবাবুর ক্লাশে সেই অভিজ্ঞতা: ওযে মুসলমান স্যার।

এক আধটা নয়, এমন অনেক খুঁটিনাটি। সর্বশেষ অভিজ্ঞতা হল আরো দিনকতক পরে।

হৃষীকেশবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্বটা দানা বেঁধে উঠেছিল একটু একটু করে। ভদ্রলোক অত্যন্ত নিষ্ঠাবান কর্মী, দেশের জন্যে সব কিছু সমর্পণ করে বসে আছেন। তাঁর মা 'হরিজন পল্লীতে' নাইট-ইস্কুল করেছেন, তাঁর বোন কল্যাণী স্বেচ্ছাসেবিকাদের নেত্রী।

আলি দা' বলে ডাকত কল্যাণী। নিজের বোন নেই আলিমুদ্দিনের, বড় ভালো লাগত মেয়েটিকে। আরো ভালো লেগেছিল—যেদিন হৃষীকেশবাবুর পাশে বসিয়ে তাঁকেও ভাইফোঁটা দিয়েছিল কল্যাণী: 'যমের দুয়োরে দিলাম কাঁটা'—। চোখ ভরে সেদিন তাঁর জল ঘনিয়ে এসেছিল, সেকথা আজও তো স্পষ্ট মনে পড়ে।

স্কুলের সেকেণ্ড্ ক্লাশে পড়ত কল্যাণী। মধ্যে মধ্যে তাকে দু' চারটে অঙ্ক বুঝিয়ে দিতেন আলিমুদ্দিন। হাতে যেদিন কোনো কাজ থাকত না সেদিন অযাচিতভাবেই এসে বসতেন হৃষীকেশের বৈঠকখানায়, ঘরে কেউ না থাকলেও খবরের কাগজের পাতা উল্টে সময় কেটে যেত। তারপরে হয়তো হৃষীকেশ অথবা কল্যাণী কেউ এঘরে এসে তাকে আবিষ্কার করত: বা:—এইযে, কখন এলেন আপনি?

—এই তো কিছুক্ষণ হল।

—তবু একবার ডাকেননি! আচ্ছা মানুষ তো! এতদিন ধরেও পরের মতো হয়ে রইলেন!

—পরের মতো নই বলেই তো বিনা-নিমন্ত্রণে নিশ্চিন্তে এসে বসে আছি। বাইরে থেকে কেউ এসেছি, এটাকে তারস্বরে ঘোষণা করতে চাইনি—হেসে জবাব দিতেন আলিমুদ্দিন।

কিন্তু এই নিঃশব্দে আসাটাই কাল হল তার পরে?

কাল? না—না, সেই হল আশীর্বাদ। সত্যকে চিনলেন তিনি, আবিষ্কার করলেন মুখোসের আবরণে লুকিয়ে থাকা বাস্তবের মুখশ্রীকে। মন্টিমবাথানের শীতার্ত রাত্রিতে জাগ্রৎ-স্বপ্নে-দেখা আলোকময়ী মহাভারতী মূর্তি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ল—আকাশ থেকে ঝরে-পড়া এক একটা উল্কাখণ্ডের মতো।

ঝিমঝিম করে সেদিন অল্প অল্প বৃষ্টি। এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছিল পূবদিক থেকে। ভিজতে ভিজতে আলিমুদ্দিন হৃষীকেশবাবুর বৈঠকখানায় এসে উঠলেন। বড় ভালো লাগছে সন্ধ্যাটাকে। কল্যাণীর মায়ের কাছে খিচুড়ি খাওয়ার আবদার করা যেতে পারে, গান শোনবার দাবী করা যেতে পারে কল্যাণীর কাছে।

হৃষীকেশ বৈঠকখানায় নেই। টেবিলে একটা শেজ-বাতি জ্বলছে। হাওয়ায় দোলা-লাগা ক্যালেণ্ডারগুলোর ছায়া নাচছে দেওয়ালের গায়ে। অভ্যাসবশে একটা ইজি-চেয়ারে আরামে এলিয়ে বসলেন আলিমুদ্দিন।

একটা ডাক দিতে যাবেন, ঠিক সেই সময়েই শব্দটা ভেসে এল। ভেসে এল অলক্ষ্য কোনো ব্যাধের স্থির লক্ষ্য একটি শাণিত তীরের মতো। বৃষ্টির ঝিরি ঝিরি, হাওয়ার শন্‌শনানি, আর উড়ন্ত ক্যালেণ্ডারের খস্ খস্ আওয়াজ তাকে প্রতিরোধ করতে পারলনা।

—কী দরকার অত মাথামাখি করার? সবটারই একটা সীমা আছে।

হৃষীকেশের মায়ের গলা। হরিজন পল্লীতে যিনি নাইট-ইস্কুল করেছেন, নিজের হাতে বোনা সুতোর খদ্দরের

শুভ্র শাড়ীতে যাঁকে কখনো কখনো ভুল হয়েছে তপতী ভারতবর্ষ মনে করে।

অপরাধিনীর স্বরে জবাব এল কল্যাণীর।

—তোমরাও বড্ড বেশি দোষ ধরো। কী এমন অপরাধটা হয়েছে? বাড়িতে নিয়মিত আসেন, এত ভালোবাসেন, দাদা বলে ডাকি—

কল্যাণীর মার স্বর আরো বেশি তীব্র শোনালো। শাণিত-তীরের ফলকাগ্রটা বিষনিষিক্ত।

—ওঃ, একেবারে সাতকেলে দাদা! জাত নয়, গোত্তর নয়—ও জাতকে বিশ্বাস আছে নাকি?

চেতনাটা যেন ক্রমশঃ অভিভূত হয়ে পড়ছে। ফাঁসির দড়িতে অবধারিতভাবে ঝুলে পড়বার পরেও বাঁচবার একটা প্রাণান্তিক অন্তিম আক্ষেপের মতো সমস্ত জিনিসটাকে অবিশ্বাস করবার চেষ্টা করছেন আলিমুদ্দিন—চেষ্টা করছেন একটা মর্মান্তিক প্রয়াসে। নিশ্বাস বন্ধ করে তিনি প্রতীক্ষা করতে লাগলেন—যেন এখুনি শুনতে পাবেন এ আক্রমণের লক্ষ্য তিনি নন।

কিন্তু আত্মবঞ্চনা চললনা বেশিক্ষণ। কল্যাণীর মা নিজেই সে স্বপ্নকে ভেঙে খান্ খান্ করে দিলেন পরমুহূর্তে।

—দিনরাত আলি দা' আর আলি দা'—নাম করে করে মেয়ে আমার অজ্ঞান। বেশ তো, দাদা আছে থাক, মাঝে মাঝে আসুক যাক—কিন্তু এ কী! আলি দা' একটা অঙ্ক কষে দিন, আলি দা' একখানা নতুন গান শুনুন—এ সমস্ত কী! ও জাতের সঙ্গে মাখামাখি কিসের!

ও জাত! ছেলেবেলায় সারদাবাবুর ক্লাসের সেই হাসির আওয়াজটা যেন আকাশ ফেটে ভেঙে পড়ল। দু হাতে কান চেপে ধরে উঠে পড়লেন আলিমুদ্দিন। সমুদ্রের অতল জলে যেন ডুবে যাচ্ছেন তিনি, নিশ্বাস নেবার মতো এতটুকু ফাঁকা আকাশ বুঝি কোনোখানে নেই!

যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন, তেমনি নিঃশব্দে পথে নেমে গেলেন আলিমুদ্দিন। দিক্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ালেন শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। চোখে যেন কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, সম্মুখের সব কিছু লক্ষ্য বস্তুকে চিরদিনের মতো তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। এলোমেলো ঠাণ্ডা বাতাস সাপের লেজের মতো তাঁর চোখে মুখে ঝাপটা মারতে লাগল সর্বাঙ্গে, বৃষ্টির ফোঁটা ঝরতে লাগল নাইট্রিক অ্যাসিডের জ্বালার মতো। অবশেষে নগ্ন পায়ের বুড়ো আঙুলে যখন নুড়ির একটা ঠোকা লাগল, নোখ ফেটে গিয়ে গড়াতে লাগল রক্ত—সেই মুহূর্তে নিজের মধ্যে ফিরে এলেন আলিমুদ্দিন।

—ওর গায়ে বিশ্রী রসুনের গন্ধ।

—একজন ভদ্রলোক, আর একটা মুসলমান।

—ও জাতকে বিশ্বাস আছে নাকি?

রক্তাক্ত বুড়ো আঙুলটা চেপে বৃষ্টি-ঝরা আকাশের তলায় পথের কাদার ওপরেই বসে পড়লেন আলিমুদ্দিন। তাঁর ধর্ম জানে, তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা জানে, নিজের বোনের চাইতে আলাদা দৃষ্টিতে কোনোদিন তিনি দেখেননি কল্যাণীকে।

সেই ভাই ফোঁটার তিলক তো এখনো তাঁর ললাটের স্পর্শানুভূতিতে জীবন্ত হয়ে আছে। সেই 'যমের দুয়োরে দিলাম কাঁটা'—সে তো তাঁরই প্রতি অকৃপণ মঙ্গল-কামনা। তবে?

কাটা নোখের অসহ্য মন্ত্রণাকে ছাপিয়ে তীব্রতর যন্ত্রণার মধ্যে তার উত্তর এল। কল্যাণী আছে, তার কল্যাণ কামনাও আছে। কিন্তু কল্যাণীর সামনে ভ্রাতৃত্বের সত্যিকারের গৌরব নিয়ে দাঁড়াতে জানলেই সেই কল্যাণ কামনার পূর্ণ ফল আসবে তাঁর হাতে।

কিন্তু সে কেমন করে? কী উপায়ে?

মাথা তুলে দাঁড়াও। ছোট হয়ে নয়, ঘৃণার অনুকম্পায় নয়, অনুগ্রহের প্রসাদের মধ্য দিয়েও নয়। যেদিন তাঁকে ছোট করে দেখবার মতো স্পর্ধাও কারুর থাকবেনা, যেদিন মক্কা থেকে মস্কো পর্যন্ত কাঁপিয়ে তোলা ইস্‌লামী সমশেরের দীপ্তি পড়বে ভারতবর্ষের মুখে—সেইদিন। সেইদিনই কর্ম দেবীর রাখীবন্ধন উৎসব সফল হবে শাহেন্‌শা বাদশা হুমায়ুনের সঙ্গে।

সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ভাবনার গতি মোড় ঘুরল। দিন কয়েক সীমাহীন অনিশ্চয়তায় কাটাবার পরে পথের নির্দেশ মিলল তাঁর।

—"I am first a mussalman, then an Indian"—

মৌলানা মহম্মদ আলীর উক্তি। দেশের কাজে সমর্পিত-প্রাণ জননায়কের স্বপ্নভঙ্গের স্বীকৃতি।

না, হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর তাঁর বিদ্বেষ নেই। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি ইংরেজকেই কি তিনি ঘৃণা করেন? না—তা নয়। কিন্তু হিন্দুর যে দৃষ্টিভঙ্গি মুসলমানকে বিচার করে, ইংরেজের যে মনোভাব ভারতবর্ষকে শাসন করে, তারই বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান।

এত বড় হিন্দু সমাজ। নতুন ভারতবর্ষকে গড়েছে, এনে দিয়েছে জাতীয় আন্দোলনের অমর মন্ত্র, আজাদীর শপথ। কেমন করে তিনি ভুলবেন তাঁর সেই অনন্তব্রতী সহকর্মীদের, কেমন করে ভুলবেন তাঁদের কথা—যাঁরা ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুক্তি ঘোষণা করে গেলেন হিন্দু আর মুসলমানের? মহিষবাথান যাত্রার আগে যে বোনেরা কপালে চন্দন চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল, যে মায়ের দল ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন, যে কল্যাণীর কল্যাণ স্পর্শ তাঁর জীবনের একটা অপরূপ সঞ্চয়, তাদের তিনি ঘৃণা করেন না। শুধু চান—তাদের কাছে প্রতিদিন পাওয়া এই ঘৃণার কলঙ্ককে মুছে নিতে, সোজা মাথায়, বলিষ্ঠ পেশল বুকে নিজের পূর্ণ মর্যাদায় দাঁড়াতে। হিন্দু হিন্দুত্বের ধ্বজা বয়ে বেড়াক—মুসলমান কেন ভুলে যাবে তার শেষ নবীর দীপ্ত বাণীকে, ভুলে যাবে তার দিগ্বিজয়ী তলোয়ারকে?

বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। মিত্রতা হয় সমমর্যাদার ভিত্তিতে। সেই সাম্য—সেই মর্যাদাকে আগে নিতে হবে আদায় করে। আগে করতে হবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা। 'পাকিস্তান হামারা'—

পথ চলতে চলতে কি এতক্ষণ দিবাস্বপ্ন দেখছিলেন আলিমুদ্দিন? এইবারে তিনি চোখ রগড়ালেন। ফতেশা পাঠানের বৈঠক থেকে বেরিয়ে নিজের খেয়ালে হাঁটতে হাঁটতে কতদূরে চলে এসেছেন তিনি! পাল-বুরুজ অনেক পেছনে পড়ে গেছে, তার চূড়োর ওপর উড়ন্ত জালালী কবুতরগুলোকে এতদূর থেকে দেখাচ্ছে ঠিক এক ঝাঁক প্রজাপতির মতো।

অতীতের রোমন্থন করতে করতে প্রায় এক মাইল পথ পার হয়ে এসেছেন আলিমুদ্দিন। হেঁটে চলেছেন উঁচু নীচু টিলা জমির লাল ধুলো ভরা পথ দিয়ে। বেলা প্রায় মাথার ওপর। মাঠের ভেতর দিয়ে একটা ঘূর্ণি উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে চলেছে, যেন রৌদ্রদগ্ধ সীমান্তের ওপার থেকে কারুর অদৃশ্য হাতছানি দেখতে পাচ্ছে। একটু দূরেই একটা উঁচু ডাঙার ওপর 'কারবালা'। প্রতি বছর পাল-নগরে মহরম শেষ হলে এই কারবালাতেই তাজিয়া বয়ে আনা হয়।

কারবালার পাশেই 'বাদিয়া'দের ছোট একটি গ্রাম: মুস্তাফাপুর। এলাকার মানুষগুলি তাঁর ভারী অনুগত, পালনগরে ফতে শাহ্‌র কাছে দরবার করতে গেলে প্রায়ই তাঁর কাছে সেলাম বাজিয়ে আসে। একটা হোমিওপ্যাথিক বাক্স আছে তাঁর, আর আছে একখানা 'সরল গৃহ-চিকিৎসা'। আপদে-বিপদে, সময়ে অসময়ে কিছু কিছু ওষুধ বিতরণ করে তিনি মুস্তাফাপুরের দুর্ধর্ষ বাদিয়াদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বলতে গেলে এরাই ফতেশার সামরিক শক্তি—দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় লাঠি, হাঁসুয়া আর বে-আইনি গাদা-বন্দুক নিয়ে এরাই সর্বাগ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে রণক্ষেত্রে। প্রত্যেকের গায়েই দুটো চারটে আঘাতের চিহ্ন আছে, অনেকেরই নাম তোলা আছে থানার দারোগাবাবুর দাগী আসামীর ফিরিস্তিতে। রাত বিরেতে প্রায়ই চৌকীদার এসে হাঁক পাড়ে: করমুদ্দি, ঘরে আছ? ও গণি ভুঁইয়া, তোমার খবর কী?

হোক দাগী, হোক দুরন্ত। তবু ইস্‌লামের এরাই প্রাণ-শক্তি—মনে মনে প্রত্যাশা রাখেন আলিমুদ্দিন। পাকি-স্তানের লড়াইয়ে এরাই আগামী মুহূর্তের জঙ্গী ফৌজ। ইস্‌লামী ঝাণ্ডার এরাই সত্যিকারের উত্তর সাধক।

মুস্তাফাপুরের বস্তিতে ঢুকে পড়লেন আলিমুদ্দিন। এসেছেন যখন, একবার খবর নিয়ে যাওয়া যাক।

বাদিয়াদের বস্তির চেহারা একটু ভিন্ন ধরণের। ক্ষেত-খামার, গাছ-গাছালি নিয়ে এদেশের গৃহস্থ পল্লীর মতো নয়, প্রতিটি বাড়ির সঙ্গে অন্য বাড়ির একখানা আমবাগান কিংবা একটা এঁদো ডোবার ব্যবধান নেই। এরা অদ্ভুতভাবে দলবদ্ধ—যেন নিজেদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের এতটুকু সীমারেখা টেনে রাখতে চায় না। সারি সারি চালা ঘর গায়ে-গায়ে সাজানো, মাঝখান দিয়ে সংকীর্ণ চলার পথ। সেই চলার পথটুকুও কখনো একটা খাটলি অথবা দুটো একটা জলচৌকি কিংবা আরো দশটা জিনিষে অবরুদ্ধ। যেন নিজেদের ভেতর দিয়ে কাউকে স্বচ্ছন্দে চলে যেতে দিতে চায় না—গণ্ডির মধ্যে আঁকড়ে রাখতে চায়।

—মাস্টার সাহেব যে! আদাব—আদাব।

সম্বর্ধনা এল পাশের একটি ঘরের দাওয়া থেকে। পাকা-দাড়ি এক বৃদ্ধ জলচৌকির ওপর বসে হুঁকো টানছে। কাঁচা পাকায় মেশানো তার বিশৃঙ্খল চুল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হয়ে ঝুলে পড়েছে তার দুকানের ওপর দিয়ে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং জ্বলন্ত; গা খোলা—হাতের আর কাঁধের পেশীগুলি ভাঙা চুরো অবস্থায় শরীরের নানা জায়গায় শিরা স্নায়ুর বাঁধনে শৃঙ্খলিত হয়ে আছে। দেখলেই মনে হয়, শুধু হাওয়াতেই তার বয়েস বাড়েনি, অনেক সমুদ্রের ভেতর দিয়ে তাকে পাড়ি জমাতে হয়েছে।

—আদাব, আদাব। ভালো আছো তো ইলাহী?

—জী আছি একরকম। তা এই দুপুরবেলা এদিকে কোথায়? কোনো রোগী আছে নাকি?

—না, রোগী খুঁজতে এলাম।—আলিমুদ্দিন হাসলেন।

—আসুন, আসুন, উঠে বসুন—ইলাহী আহ্বান জানালো: তামুক খান।

আমন্ত্রণ গ্রহণ করে দাওয়ায় উঠে বসলেন আলিমুদ্দিন। একটা খাটুলির ওপর বসলেন আরাম করে। ইলাহীর হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে তাতে মৃদু মন্দ টান দিতে দিতে তাঁর মনে হল, আঃ সত্যিই তিনি বড় ক্লান্ত! সকাল থেকে এখনো কিছু খাওয়া হয়নি, খাওয়ার কথা ভুলেও গিয়েছিলেন। ফতেশাহুর বৈঠকখানায় এস্তাজ চাচার সঙ্গে সেই তর্ক বিতর্ক, উত্তপ্ত মস্তিষ্কে পথে বেরিয়ে আসা। তারপর পথ চলতে চলতে স্মৃতির ওপর থেকে একটার পর একটা আবরণ সরিয়ে দেওয়া। সমস্ত বোধ যেন বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

—এখনো বুঝি চান-খাওয়া কিছু হয়নি মাস্টার সাহেবের?—মনের ভাবটা রূপ পেয়ে উঠল ইলাহী বক্সের জিজ্ঞাসায়।

—নাঃ—তামাকের খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে জবাব দিলেন আলিমুদ্দিন।

—সে কি কথা! এলাহী শিউরে উঠল: বেলা তিনপহর যে কখন পেরিয়ে গেছে! তা হলে আমার এখানেই যা হোক কিছু খানা-পিনার ব্যবস্থা করি।

—না-না ওসব কিছু করতে হবেনা—ধীরে ধীরে জবাব দিলেন আলিমুদ্দিন। বললেন, কোনো দরকার নেই ব্যস্ত হবার। একটু বেশি বেলাতেই খাওয়া আমার অভ্যেস।

—তা হোক। একটু চিঁড়ে-মুড়ির জলপান! নতুন গুড় আছে ঘরে—আগ্রহভরে আবার জানতে চাইল এলাহী।

—বলেছি তো কিছু করতে হবেনা—আলিমুদ্দিনের গলার স্বরে এবার যেন একটু বিরক্তি ফুটে বেরুল। মিনিট খানেক নিঃশব্দে তামাক টেনে জানতে চাইলেন, পাড়ার খবর কী?

—চলছে এক রকম করে!

—এক রকম কেন? ভালো নয়—হুঁকো নামিয়ে জানতে চাইলেন আলিমুদ্দিন।

এর মধ্যে কখন কালু বাদিয়ার ছেলে হোসেন একটা নিড়ানি হাতে করে এসে দাঁড়িয়েছে নীচের ফালি পথটুকুতে। সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে সেই-ই একটা ফোঁড়ন ছেড়ে দিলে কথার মাঝখানে।

—ভালো আমাদের থাকতে দেবে কেন সাহেব! শাহু কি তেমন লোক?

আচমকা যেন একটা ঢিল এসে ছিটকে লাগল আলিমুদ্দিনের কপালে। চমকে তাকিয়ে দেখলেন হোসেনের দিকে। কালো মুখের ভেতর থেকে দু সারি সাদা দাঁত বের করে উজ্জ্বল হাসি হাসছে সে।

—কী সব যা-তা বলছিস বেকুব?—চটে একটা ধমক দিলে ইলাহী: শাহু আমাদের ভাত দেয়না? আমরা খাইনা তার নিমক?

—খুন দিয়ে নিমক পাই চাচা। কিন্তু নিমকের চাইতে খুনের দাম বেশি—হোসেনের শাদা শাদা দাঁতে আবার সেই উজ্জ্বল হাসি। এবার যেন হাসিটাকে কেমন হিংস্র বলে মনে হল আলিমুদ্দিনের।

কেমন যেন অনুভব করলেন এ আক্রমণের লক্ষ্য শুধু শাহুই নয়—এর আঘাত সমানে তাঁরও ওপরে এসে পড়েছে। মুখ লাল করে বললেন, তোমার যে খুব লম্বা চওড়া কথা শুনতে পাচ্ছি!

—না জনাব, লম্বা কথা আমরা বলব কোত্থেকে! আমরা ছোটলোক, আমরা আছি কেবল খুন দেবার বেলায়, জেলে যাবার বেলায় আর উপোস করার বেলায়। লম্বা কথা বললেই বা তা শুনছে কে!

ব্যঙ্গোক্তিটা এবার আরো তীব্র, আঘাতটা তাঁর ওপরে আরো প্রত্যক্ষ। রাগে অপমানে স্তম্ভিত হয়ে রইলেন আলিমুদ্দিন মাস্টার—অনেকক্ষণ ধরে একটা কথাও জোগালো না তাঁর মুখে।

—আদাব মাস্টারসাহেব, চলি—হোসেন আর এক ঝলক শাদা হাসি বিতরণ করে বিদায় নিলে।

—কী আস্পর্দ্ধা! খানিক পরে সংক্ষেপে বলতে পারলেন মাস্টার।

—তা বটে, ভারী অন্যায়। ইলাহী বক্স মাথা চুলকোতে লাগল: তবে কিনা নেহাৎ অন্যায় বলেনি। আমরা তো তিনপুরুষ ধরে দেখে আসছি—

—কী বললে! হাতের হুঁকোটা ঠক্ করে নামিয়ে রাখলেন আলিমুদ্দিন: তোমরাও সবাই মিলে ওই সব ভাবছ বুঝি? মুসলমান হয়ে মতলব আঁটছ নিমকহারামীর?

—তোবা, তোবা।—দু হাতে কানে আঙুল দিলে ইলাহী বক্‌স। জিভ কেটে বললে, জী না—না, ওসব আমরা কখনো বলি না। দুঃখে কষ্টে মানুষের মুখ দিয়ে দুচারটে এটা-ওটা কথা বেরিয়ে পড়ে আর কি।

—এটা-ওটা কথা। না, না, এটা-ওটা কথাকে তো প্রশ্রয় দেওয়া যায় না—কড়া গলায় আলিমুদ্দিন বললেন। মুখে ছায়া পড়েছে, মনের মধ্যে ঘনিয়েছে মেঘ। শাহুর খাস জঙ্গী জোয়ানদের মধ্যেও একি অতৃপ্তি আর অভিযোগ মাথা তুলেছে আজ! এই হিংস্র, আর যন্ত্রের মতো নির্মম মানুষগুলোর ভেতরেও কি শুরু হয়ে গেছে নতুন করে চেতনার আলোড়ন! চেতনা জাগুক তা তিনিও চান—কিন্তু তার এ কী রূপ! এ রূপের সম্ভাবনা তাঁর মনে আসেনি, এর পরিণাম কী তাও তাঁর যা কিছু ধারণার বাইরে। হঠাৎ গভীর একটা আশঙ্কার সঙ্গে তিনি অনুভব করলেন, এক একটা রৌদ্রদগ্ধ চৈত্র-দুপুরে যখন আচমকা কোনো 'বাদিয়া'-পল্লীতে আগুন লাগে, আর হঠাৎ আকাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া দমকা হাওয়া উদ্দাম উল্লাসে একটির পর একটি খড়ের চালে সে আগুনকে বয়ে নিয়ে যায়—আধ ঘণ্টার মধ্যে এত বড় পাড়াটায় পড়ে থাকে শুধু রাশীকৃত ছাইয়ের পিণ্ড,—সেই আগামী অগ্নি-সম্ভাবনার একটি স্ফুলিঙ্গ কোথাও একটা চকমকি পাথরের মধ্যে লহমার জন্যে আত্মপ্রকাশ করল।

হঠাৎ ঘরের মধ্য থেকে একটা গোঙানির আওয়াজ ভেসে এল।

চমকে উঠলেন আলিমুদ্দিন: সে কি—অসুখ কার?

—আজ্ঞে না, ও কিছু না—ইলাহী বক্‌স জিনিসটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করল যেন।

কিন্তু আবার গোঙানির আওয়াজ এল। আলিমুদ্দিন বিরক্ত হয়ে বললেন, লুকোতে চাইছ কেন? অসুখ কার?

মাথা নত করে ইলাহী বক্‌স বললেন, আমার বড় বেটির।

—কী অসুখ?

—ইলাহী বকস নিরুত্তর হয়ে রইল।

—অসুখটা কী, তাও বলতে বারণ আছে নাকি? দরকার হলে আমি তো চিকিৎসা করতে পারি।

—আপনি পারবেন না জনাব।

—পারব না!

—না। ওর সারা গায়ে পারার ঘা বেরিয়েছে। অসীম লজ্জায় যেন মাটির মধ্যে মিলিয়ে গিয়ে জবাব দিলে ইলাহী বক্‌স।

—পারার ঘা!—শরীর শিউরে উঠল আলিমুদ্দিনের: ছিঃ, ছিঃ, কী করে হল?

—শাহুর বাড়ীতে বাঁদীর কাজ করত—সংক্ষেপে উত্তর এল।

—শাহুর বাড়ীতে!

—জী!—একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকালো ইলাহী বকস: শাহুকে ডাকত ধর্মবাপ বলে।—নিষ্প্রাণ শীতল কণ্ঠের উত্তর এল।

ঘরের মধ্যে আবার গোঙানি শব্দ। দূরে রৌদ্রজ্বলা মাঠ। অভুক্ত পেটে ক্ষিদের আগুন জ্বলছে। আলিমুদ্দিন মাষ্টারের মনে হল চারদিকের খরধার রোদে কালু বাদিয়ার ছেলে হোসেনের তীক্ষ্ণ শাণিত হাসিটা যেন বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছে।

(ক্রমশঃ)

জাতীয় জীবনে নারীশিক্ষা

শ্রীবিভা মুখোপাধ্যায়

রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের ক্রমবিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানব সভ্যতার ধারাও পরিবর্ত্তিত হয়। সেই সভ্যতার ধারাকে অবলম্বন করিয়া যুগে যুগে এক একটা স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। আজ যাহা নূতন, কাল তাহা পুরাতন; সেই পুরাতন আবার নূতনের বেশে দেখা দিতেছে বর্ত্তমানের আলোয়। যুগের স্বতন্ত্র মূর্ত্তিটিকে স্বীকৃতি দেওয়াই হইতেছে মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক যুগে রাষ্ট্র ও সমাজ অনুযায়ী শিক্ষাধারার ভিতরেও বিবর্ত্তনের স্বাক্ষর পরিলক্ষিত হয়। ভারতের জাতীয় জীবনেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আমাদের দেশে নারী শিক্ষা সুদূর অতীতেও প্রসারিত ছিল। বৈদিক যুগ হইতে বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কখনও বা ধারাটী বিস্তীর্ণ, কখনও বা শীর্ণ হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের সমাজব্যবস্থায় নারী একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। উচ্চতর শিক্ষালাভের পথে তাহাদের সেদিন কোন বাধাবিপত্তি ছিল না—স্বাধীনতা তাহাদের কোথাও তেমন ব্যাহত হয় নাই। সে যুগের নারীদের মধ্যে গার্গী, মৈত্রেয়ী, লোপমুদ্রা ও শাশ্বতী, লীলাবতী, ক্ষমা (খনা) প্রভৃতির নাম সুবিদিত। কিন্তু পৃথিবীর আবর্ত্তনের সঙ্গে যুগের সামাজিক পরিস্থিতির নানা রূপান্তর ঘটিতে থাকে। মনুর বিধিনিয়ম সমাজে প্রচারিত হইবার পর নারীর স্থান অনেকখানি সংকীর্ণ হইয়া আসে। স্বাধীনভাবে নিজেকে চালাইবার অধিকার হইতে তখন তাঁহারা বঞ্চিতা হইয়া পড়েন। বেদপাঠ তাঁহাদের জন্য নিষিদ্ধ হইল, ক্রমে সমাজে বাল্য-বিবাহের প্রচলন হইলে নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইল। স্বামীর গৃহে কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই হইল তখন তাঁহাদের একমাত্র অধিকার—এবং এই কর্ত্তব্য সম্পাদনের শিক্ষাই হইল তখনকার নারী-শিক্ষা।

বৈদিক যুগের পর বৌদ্ধযুগে নারীশিক্ষার ধারাটী আবার বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। বৌদ্ধমঠে বিদুষী ভিক্ষুণীরা বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমান যুগে এই প্রবহমান স্রোতটী পুনরায় শীর্ণ হইয়া বাহিরের জগত হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। বৈদিক যুগের পর হইতেই শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অধিকার ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। শিক্ষার মানটী ক্রমশঃ নিম্নতন হওয়াতে নারী-সমাজে নানা কুসংস্কার ধীরে ধীরে দানা বাঁধিতে থাকে এবং পরবর্ত্তী যুগের নারীও ইহা হইতে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছে না।

এদেশে ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতা প্রচারিত হইবার পর, আবার জীবনদর্শনে রূপান্তর ঘটিয়াছে। সমাজের পরিস্থিতির মধ্যে আসিয়াছে নানা পরিবর্ত্তন, নারীর সামাজিক জীবনধারা নূতন গতিতে প্রবাহিত হইয়াছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে নারী-শিক্ষার পথটী অবশ্য অনেকখানি সুগম হইয়া উঠিয়াছে। তাই নারীর গতিবিধির গণ্ডী আজ অনেক প্রশস্ততর। যুগের প্রভাবকে অস্বীকার করিবার ক্ষমতা কোথায়, পুরুষের স্বাধীন উন্মুক্ত চলার পথে সাম্প্রতিক নারীও অংশ গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। উচ্চতর শিক্ষা এবং জ্ঞান আহরণের পথ আজ তাহাদের সম্মুখে উন্মুক্ত। তবুও নারী-শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা আজ দেশে দেখা যাইতেছে না—তবে বাধা কিছু অপসারিত হইয়াছে মাত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক হইতে নারী-শিক্ষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। মহামতি ডেভিড হেয়ার, রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বেথুন সাহেব, রাধাকান্তদেব প্রভৃতি মহামান্য ব্যক্তির বদান্যতার কথা নারী-সমাজ কোনদিনই ভুলিবেন না। কয়েকজন স্বদেশী ও বিদেশী মহাপ্রাণ পুরুষের প্রচেষ্টায় এদেশে নারী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঘটিল। বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা ও কৃষ্টির পথে নারীর জয়-যাত্রা শুরু হইল।

সমাজে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজ আমরা সম্যকভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ, আনন্দ ও পরিপুষ্টির জন্য নারী ও পুরুষ উভয়েরই শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। **Man and woman is a composite whole.** নারী ও পুরুষ—এক অপরকে বাদ দিয়া চলিতে পারে না। নারীকে পিছনে ফেলিয়া রাখিলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। নারীর অজ্ঞানতা পারিবারিক জীবনে বহু অনর্থ সৃষ্টি করে। কেবলমাত্র পুরুষের মানসিক উৎকর্ষ জীবনকে কল্যাণময় ও আনন্দময় করিয়া তুলিতে সক্ষম হয় না। আমাদের দেশে অধিকাংশ নারী কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতাকেই পাথেয় করিয়া জীবনযাত্রা সুরু করে—এবং তাহার মারাত্মক প্রভাব আজ আমাদের সমাজদেহে প্রতিফলিত হইতেছে। পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র বাহির বিশ্বে—নারীর স্থান পরিবারের কেন্দ্রস্থলে। পরিবারের মধ্য-বিন্দুটীর স্থিতিসাম্য যদি না থাকে তবে পরিবারের জীবনে অকল্যাণ ও অশান্তি অনিবার্য্য। সুতরাং নারীশিক্ষার প্রচার ও প্রসার বাঞ্ছনীয়।

নারীশিক্ষার প্রয়োজন যে আছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আদর্শ কন্যা, আদর্শ পত্নী ও আদর্শ মাতার সৃষ্টি করাই প্রত্যেক রাষ্ট্রের আজ প্রধান লক্ষ্যবস্তু হইয়া উঠিয়াছে। সুপরিকল্পিত শিক্ষাবিধি জাতির জীবনের উন্নতি ও কল্যাণের ভিত্তি স্বরূপ। শিক্ষা-জনগণের অন্তর-শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া তোলে, শিক্ষার প্রভাবে জাতীয় জীবনে দেখা দেয় সংহতির রূপ—জাতির চিন্তা, ভাব এবং কর্ম্মপ্রেরণায় জাগে ঐক্যের সুর। শিক্ষার আলো মানুষের সুপ্ত

শক্তিকে বিকাশোন্মুখ করিয়া সমগ্র জনগণের মধ্যে সৃষ্টি করে বিপুল ঐক্য চেতনা।

আজ আমরা স্বাধীন—স্বরাজ আর গণতন্ত্র আজ আমাদের করতলগত। কিন্তু স্বাধীন ভারতেও শিক্ষার গণতান্ত্রিক কাঠামো বা রূপ এখনও পরিলক্ষিত হইতেছে না। বর্ত্তমানে আমাদের সমস্যা হইতেছে—নারীশিক্ষার বিস্তৃতি ও প্রকৃতি লইয়া, অর্থাৎ কি ভাবে ও কোন ধারায় এই শিক্ষার প্রণালী প্রবাহিত হইবে, তাহা নির্ণয় করা। ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান দেশ, পল্লীর দুঃখদুরবস্থা আজ বর্ণনাতীত। সাধারণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও দরিদ্র জনসাধারণ গ্রামেই বাস করে। গ্রাম্য পাঠশালায় এদেশের মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষার কিছুটা সুযোগ পাইয়া থাকে—অক্ষর পরিচয় এবং অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানলাভ করে। কিন্তু মানসিক বৃত্তির বিকাশের পক্ষে তাহা মোটেই যথেষ্ট নয়। দৈনন্দিন চলার পথে যে জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা অর্জ্জন করিবার সুযোগ ভারতীয় গ্রাম্য-বালিকাদের ঘটে না। গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য কখনও লাভ করে নাই। যে দেশে ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা শোচনীয়, সেদেশে নারীশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান পল্লীগ্রামে গড়িয়া তোলা একপ্রকার দুঃসাধ্য। মেয়েদের শিক্ষার যথার্থ সুযোগদানের প্রশ্নটা সম্পূর্ণভাবেই নিরুত্তর রহিয়াছে। গ্রামের চেয়ে সহরে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা কিছুটা ভাল। কিন্তু ভারতের মত দরিদ্র দেশের কয়জন লোক তাহাদের ছেলেমেয়েদের সহরে পাঠাইয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পারেন? সুতরাং বাধ্য হইয়া বহু মেয়েকে আকাঙ্ক্ষিত শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইতে হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে এইরূপ নির্মমতা পরাধীন দেশেই সম্ভব হইয়াছে।

আমাদের দেশে সহশিক্ষার ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। সহশিক্ষাকে অনেক পিতামাতা সুনজরে দেখেন না; সুতরাং ছেলেদের শিক্ষাকেন্দ্রে মেয়েদের প্রবেশ অধিকার নাই। সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সহজ নয়, তবে বাংলা দেশে নারীশিক্ষা প্রসারের সমস্যা সমাধান করিতে হইলে সরকারী অর্থসাহায্যের নিতান্ত প্রয়োজন। সহর অঞ্চলেও আরও অধিক নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে।

আমাদের শিক্ষা-সংস্কারের গোড়ার কথা হইবে সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার। সমগ্র দেশে প্রতিটী নারী যাহাতে অজ্ঞানতার অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া শিক্ষার আলো লাভ করিতে পারে, জাতীয় সরকারের সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। বর্ত্তমান ভারতের নারীসমাজে মাত্র মুষ্টিমেয় কয়জন উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাইয়া থাকেন—বৃহত্তর নারী গোষ্ঠী থাকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে। জাতির কাঠামো শক্ত করিয়া গড়িতে হইলে, চাই গণ-শিক্ষার বিস্তৃতি। গণ-শিক্ষা বিস্তারের সুব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সর্ব্বস্তরে সকল বয়সের নরনারী যাহাতে শিক্ষার যথার্থ অধিকার ও সুযোগ লাভ করিতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রাথমিক নারীশিক্ষা এবং বয়স্কাদের শিক্ষার কোন উচ্চ আদর্শ আমাদের নাই। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার আইন আমাদের দেশে তৈরী হইয়াছে ঠিকই, কিন্তু তাহাও দেশের সর্ব্বত্র আজও কার্য্যকারী হইয়া উঠে নাই। আধুনিক আবশ্যিক শিক্ষার নানা পরিকল্পনার কথা আমরা শুনিতেছি। কংগ্রেসের তরফ হইতে সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ জাতীয় শিক্ষার একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। নিখিল ভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের উদ্যোগেও একটী পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী রচিত ওয়ার্দ্ধা-পরিকল্পনা এবং ভারত সরকারের যুদ্ধোত্তর ভারতের শিক্ষা-পরিকল্পনা এদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবে কতখানি রূপ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই ভাবিবার বিষয়। গান্ধীজী সাত হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সের বালক বালিকাদের জন্য সাত বৎসর পরিসরের আবশ্যিক বুনিয়াদি শিক্ষার কথা বলিয়াছেন। এই সব পরিকল্পনা যদি দেশে সম্পূর্ণভাবে কার্য্যকরী হইয়া উঠে, তবে আমাদের শিক্ষা ব্যাপারে কিছুটা দুর্দশা দূর হইতে পারে।

যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও দেশে প্রচলিত আছে তাহাতে বালক বালিকারা যথার্থ শিক্ষা লাভ করিতে পারিতেছে না। বহুদিনের পুরাতন পরিত্যক্ত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদিগকে আজিও বিদ্যা-চর্চ্চার চেষ্টা করিতে হইতেছে। ইহাতে আনন্দ নাই—শিশু মনস্তত্ত্বের স্থান নাই। বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি নাই—আছে শুধু পুঁথির বোঝা ও রূঢ় শাসন। কিন্তু সাম্প্রতিক যুগ অতীতের সেই পদ্ধতিকে আর মানিয়া লইতে চাহিতেছে না। বর্ত্তমান শিক্ষায় আর্টের সঙ্গে রহিয়াছে বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান শিক্ষায় রাজ্যে আনিয়াছে এক নূতন যুগ-বিপ্লব। তাই আজ সৃষ্টি হইয়াছে 'Educational Psychologyর'। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মানসিক প্রবণতা ও সুপ্ত সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজন আছে। শিশুমন কি চায় এবং কতটুকু গ্রহণ করিতে সমর্থ, শিশুর আনন্দ কোন বিষয়ে এবং কোন পথে অগ্রসর হইলে সে জীবন-সংগ্রামকে জয়ী হইতে পারিবে এই সকল সমস্যার সমাধান করিতে চায় আধুনিক শিক্ষা। পৃথিবীর অন্যান্য অগ্রসর দেশগুলিতে সেইজন্য ইন্দ্রিয়মূলক শিক্ষা এবং কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে ছোট ছোট বালিকাদের জন্য। ফ্রোয়েবেল এবং মন্টেসরি পদ্ধতিতে এই রকম শিক্ষার একটা বিশিষ্ট অভিব্যক্তি দেখা যায়, নার্সারী স্কুলে শিক্ষার একেবারে প্রাথমিক স্তরে খেলাধুলা, আনন্দ এবং কর্ম্মের ভিতর দিয়া ইহা রূপান্তরিত হইয়া উঠে, স্বাধীন ভারতে যদি আজ নারী-শিক্ষার আদর্শ কোন পদ্ধতিতে পরিচালিত করিতে হয় তবে প্রথমে বালিকাদের জন্য এই মন্টেসরি পদ্ধতিতে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে অনেকটা ফলপ্রদ হইবে। পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও অনেক বাড়াইতে হইবে।

মানুষের জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের শিক্ষার প্রয়োজন। ভারতীয় নারীকে সম্যকভাবে শিক্ষিত করিতে হইলে বিভিন্নমুখী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। বালিকাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা আগেই বলা হইয়াছে। আমাদের দেশে তরুণীরা মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিয়া উচ্চতর শিক্ষালাভ করিবার জন্য কলেজের মুখে ধাবিত হন, দেশীয়

কলেজগুলিতে ভারতীয় নারীরা কতদূর শিক্ষিতা হইয়া উঠিতে পারেন, বলা শক্ত। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা পরীক্ষায় তাহারা শ্রেষ্ঠ স্থান অনেক বারই অধিকার করিয়াছেন। ইহা যোগ্যতার মাপকাঠি হইলেও, সুব্যবস্থিত শিক্ষার মাপকাঠি বলিয়া ধরা যায় না। সুশিক্ষিত ও সুসভ্য ইংরাজ জাতির শাসনাধীনে থাকিয়া দেড় শত বছরে আমরা যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি তাহার লাভ-ক্ষতির হিসাব নিকাশ করিলে দেখিতে পাইব যে তাহা আমাদের পুরুষের জীবনেও ফলপ্রসূ হয় নাই। এই শিক্ষা আমাদের স্বাবলম্বী করে নাই—আত্মশক্তি দান করে নাই—জাতীয় জীবনে এবং সকল প্রকার উদ্যম ও কর্ম্মশক্তির ভিতর দুরারোগ্য পক্ষাঘাত সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র। বিজাতীয় শিক্ষার আদর্শে যদি ভারতীয় নারীকে অগ্রসর হইতে হয়, তবে পুরুষের মত নারীদের জীবনও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। ইহার জন্যই বাংলার নারী জীবনের আদর্শের মধ্যেও যেন ভাঙ্গন ধরিয়াছে। পশ্চিমের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে অন্ধভাবে শিক্ষিত নারী সমাজ আজিকার দিনে অনুসরণ করিতেছে। তাই নারী-শিক্ষা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা হইল ইহার প্রকৃতি লইয়া। এ দেশে নরনারীর শিক্ষা-পদ্ধতি একই ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। ইহা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। জীবন আদর্শে নারীর একটী বিশিষ্ট স্থান আছে। এই বিশিষ্টতাকে কেন্দ্র করিয়া তাহাতে জীবন আবর্ত্তিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ভারতের নারীর বিশিষ্ট স্থান পরিবারের কেন্দ্রস্থলে, সন্তান-সন্ততির রক্ষণা-বেক্ষণ, গৃহের শৃঙ্খলা, আনন্দ, কল্যাণ সব কিছুই নির্ভর করে নারীর মমতাময়ী মূর্তির উপর। পরিবারে নারীর শক্তি অদৃশ্যভাবে বিরাজ করিতেছে। সুতরাং নারী ও পুরুষের শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্যের কথা সহজে আসিয়া পড়ে। অথচ এ দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় নারী ও পুরুষের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে কোন স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু জাতির সংস্কৃতি অনুযায়ী পারিবারিক জীবনের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই নারীকে স্বতন্ত্র শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। সেজন্যই আয়োজন এদেশের নারী-শিক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার। তাহার জন্য নূতন করিয়া পাঠ্য তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে, পাঠ্যক্রম এবং পরীক্ষা পদ্ধতিতে রূপান্তর সাধন করিতে হইবে, নানা রকমের গৃহস্থালী বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সূচীশিল্প, রন্ধনশিল্প, গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, শিশুমনস্তত্ত্ব, সঙ্গীত শিক্ষা, এবং সাধারণ গণিত, ইংরাজী, বাংলা, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস নারী-শিক্ষার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আজ সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ও এই বিষয় সচেতন হইয়াছে—মৃৎশিল্প, চর্মশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, রন্ধনশিল্প প্রভৃতি সেই বৃত্তিশিক্ষার তালিকায় সহজেই স্থান পাইতে পারে।

অধুনা প্রচলিত পদ্ধতিতে শিক্ষিতা হইয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপার্জ্জন নারীর পক্ষে নানা কারণে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। পুরুষের বেকার সমস্যা যেখানে এত ব্যাপক, সেখানে নারী সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নতির সহজ পথটী খুঁজিয়া বাহির করা আজ অত্যন্ত কঠিন। দেশে আর্থিক দুরবস্থার জন্য বহু নারীকে আজ জীবিকা উপার্জ্জনে তৎপর হইতে দেখা যাইতেছে। বাহিরে নারীর কর্ম্মস্থলটি বড়ই সংকীর্ণ। অর্থ-উপার্জ্জনের ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া এবং পুরুষের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া বর্ত্তমান সমাজে নারী আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইতে পারিবে কিনা সন্দেহ। এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির একান্ত প্রয়োজন। দেশের আর্থিক পরিস্থিতি উন্নত হইলে নারী সম্প্রদায় খানিকটা রেহাই পাইবে। কিন্তু বিপদের দিনে স্বামী, পুত্র ও ভাইদের গলগ্রহ হইয়া না থাকিয়া প্রয়োজনমত স্বাধীনভাবে যাহাতে তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, সে জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতের পল্লী অঞ্চলে কুটীর শিল্পের প্রসার ঘটিলে বহু নারী সেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিয়া সহজে জীবিকা-নির্ব্বাহের পথ খুঁজিয়া পাইবে।

যে শিক্ষা আমাদের চরিত্রে সংযম আনিবে, যাহা আমাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনিয়া দিবে আমাদের কুসংস্কার দূর করিবে এবং সর্ব্বোপরি মনুষ্যত্বের সন্ধান দিবে সেইরূপ শিক্ষাবিধি প্রবর্ত্তনের পথ যাহাতে সুগম হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রতিভাসম্পন্ন নারী ও পুরুষ সর্ব্ব দেশেই বিরল। সুতরাং প্রতিভা যাঁহাদের আছে তাঁহারা উচ্চতর সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের আলোচনা করুন, ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে ব্যবহারিক ও লোকায়ত শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আদর্শ ও লক্ষ্যহীন পথে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করিয়া রাখিলে চলিবে না। শিক্ষার বিলাস আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে। আমাদের যদি পরিপূর্ণরূপে বাঁচিতে শিখিতে হয় তবে নারী ও পুরুষের যথার্থ শিক্ষার পথটি সহজে প্রসারিত করিয়া তুলিবার পন্থা ভারতবাসীকে খুঁজিতে হইবে। না হইলে আলেয়ার পিছনে ছুটিলে ভারতের জাতীয় জীবনের অপমৃত্যু অনিবার্য্য। যে আদর্শে নারী শিক্ষার ধারা প্রচলিত করিলে বলিষ্ঠ সমাজ ও ভবিষ্য সন্তানগণের জীবনধারা এবং শিক্ষা-দীক্ষা বৃহত্তর কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহাই হওয়া উচিত নারী শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন কালে এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, নারীই ভবিষ্য-জাতির জননী ও বনিয়াদী শিক্ষার প্রথম ও প্রধান সহায়ক।
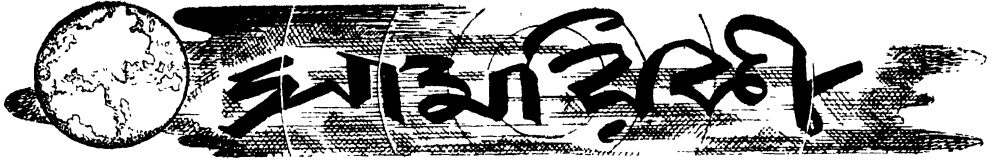
শান্তি-সম্মিলন—

যে সময়ে একদিকে ইংরাজ ও আমেরিকা যুক্তভাবে এবং অন্যদিকে রুশিয়া যুদ্ধায়োজনে বিশেষভাবে নিযুক্ত, ঠিক সেই সময়ে ভারতে শান্তি-সম্মিলন উপলক্ষে জগতের বিভিন্ন দেশের বহুসংখ্যক প্রতিনিধি সমবেত হইয়া শান্তি-প্রতিষ্ঠার কথা আলোচনা করিতেছেন। যাঁহারা এই সম্মিলনে সমবেত হইয়াছেন, পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়া তাঁহারা সকলেই অসাধারণ—কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার সহিত তাঁহাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ নাই। এ অবস্থায় শান্তি-সম্মিলন যে শুধু কাগজপত্রের সৃষ্টি করিবে, জগৎ হইতে বর্ত্তমান অশান্তি দূর করিতে সমর্থ হইবে না, ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের শান্তি-নিকেতনের আম্রকুঞ্জে শান্তি-সম্মিলন আরম্ভ হইয়াছে—এখানে ৮ দিন সভার পর মহাত্মা গান্ধীর সেবাগ্রামে সম্মিলনের ৮ দিন সভা হইবে। বিদেশী সুধীবৃন্দ এই দুইটি তীর্থস্থান দর্শন করার ফলে—রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি যে আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন—সেই আদর্শের সহিত পরিচিত হইবেন। আমাদের বিশ্বাস, জগতে সেই আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দ্বারাই একদিন শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে। পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাধারা ও কর্ম্মধারা যে জগতে শুধু অশান্তি সৃষ্টি করে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির চিন্তাধারা যে চির-শান্তিময় জগৎ প্রতিষ্ঠায় সমর্থ—এই বিশ্বাস লইয়া জগতের সুধীবৃন্দ যদি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তবেই জগত প্রকৃতভাবে উপকৃত হইবে। গান্ধীজির আদর্শে বিশ্বাসী নহে বলিয়াই আজও ভারতের জনগণ দুঃখদুর্দ্দশায় নিমগ্ন। মনে প্রাণে লোক গান্ধীজিকে গ্রহণ করে নাই বলিয়াই স্বাধীনতা লাভের পরও দেশে শান্তি আসে নাই। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির আশ্রমে গমন করিয়া, নিষ্ঠার সহিত সেই আদর্শের সহিত পরিচিত হইয়া, যদি তাহা প্রচার করেন, তবে আবার নূতন করিয়া জগতের জনসাধারণ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে এবং শান্তি-সম্মিলনের তাহাই লাভ বলিয়া আমরা মনে করিব। গান্ধীজির জীবিতকালে এই সম্মিলনের সূচনা হইয়াছিল—আমাদের দুর্ভাগ্য গান্ধীজি জীবিত থাকিয়া জগদ্বাসীর নিকট জীবন্ত আদর্শ দেখাইবার সুযোগ লাভ করিলেন না। তথাপি আমরা বিশ্বাস করি, এই সম্মিলন হইতে প্রত্যাগত বিশ্বের পণ্ডিতমণ্ডলী সেই আদর্শের প্রচারের সহায়ক হইয়া জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইবেন।

আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা—

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের উত্তর ভারতে পুনর্বসতি দান ব্যাপারে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আগত ব্যক্তিদের জন্য কোন অর্থ ব্যয় করেন নাই। তাহার ফলে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আগত জনগণের দুঃখদুর্দ্দশার অন্ত নাই। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে সকল হিন্দু আসামে বা বিহারে গিয়াছেন, সে সকল প্রদেশে সাম্প্রদায়িকতার জন্য বহিরাগত বাঙ্গালীদের দুঃখদুর্দ্দশার অন্ত নাই। অবশ্য উড়িষ্যা সরকার এক দল বাঙ্গালীকে উড়িষ্যায় পুনর্বসতির সুযোগ ও সুবিধা দান করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিম বাংলায় লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী পরিবার চলিয়া আসিয়াছে—বঙ্গ বিভাগের সময় স্থির ছিল, সরকার তাহাদের সাহায্য ও পুনর্বসতির ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে জন্য কিছুই করা হয় নাই। শাসন ব্যবস্থার গলদের জন্য যে সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও উপযুক্ত পাত্রে যায় নাই। এ বিষয়ে যদি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত করা হয়, তবে অনেক দুর্নীতি প্রকাশ পাইবে। মন্ত্রিসভা সেরূপ কোন তদন্তের প্রয়োজন বোধ করেন না—কারণ পুনর্বসতি বিভাগে নিযুক্ত সরকারী কর্ম্মচারীরা নানাভাবে মন্ত্রিসভার সমর্থক। অথচ সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টের সীমা নাই। পশ্চিমবঙ্গে বাড়ী ভাড়া খুব বাড়িয়া গিয়াছে, তাহারও উপযুক্ত ব্যবস্থা হইতেছে না। আশ্রয়প্রার্থীরা

কি ভাবে পশুর মত অল্পস্থানের মধ্যে বহুলোক বাস করিতেছে, তাহা দেখিলে পাষাণও গলিয়া যায়। দেশে দারুণ খাদ্যাভাব, যাহাদের নির্দ্দিষ্ট আয় আছে, তাহারাই সে আয়ে সংসার প্রতিপালন সঙ্কুলান করিতে পারে না। যাহাদের নির্দ্দিষ্ট আয় নাই, তাহারা খাদ্যাভাবে ও বস্ত্রাভাবে কি কষ্ট পায়, তাহা বর্ণনার অতীত। গত ২ মাস হইতে পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা পশ্চিমবঙ্গে বে-আইনিভাবে পতিত জমী দখল করিয়া তথায় গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছে। গত ২ বৎসরে কোন সরকারী পুনর্বসতি পরিকল্পনা প্রস্তুত বা কার্য্যকরী হয় নাই—কাজেই লোক বাধ্য হইয়া এইরূপ বে-আইনি কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছে। অবশ্য ইহাদের পশ্চাতে একদল স্বার্থান্ধ লোকও আছে। কিন্তু অধিকাংশ আশ্রয়প্রার্থীই অতি কষ্টের মধ্যে আছে। তাহাদের জন্য ইতিমধ্যে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সরকারের কর্ত্তব্য ছিল। এ অবস্থায় পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গবাসীদের মধ্যে অসন্তোষ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ২ মাস হইয়া গেল, সরকার একটি বিবৃতি প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই করেন নাই। যে সকল জমী অন্যায়ভাবে দখল করা হইয়াছে, তন্মধ্যে বহু জমী গত ২০ বৎসর কাল পড়িয়াছিল—মালিকের কোন লাভের কারণ ছিল না। মালিকও সেগুলিকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করেন নাই। এ অবস্থায় যদি সরকার উপযুক্ত মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দখলীকারের নিকট তাহা আদায় করিয়া মালিককে প্রদানের ব্যবস্থা করেন, তবে এই বিবাদের মনোভাব চলিয়া যাইবে। এ বিষয়ে সত্বর কোন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নচেৎ পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব্ব-বঙ্গবাসীদের সহিত বিরোধ দিন দিন বাড়িয়াই চলিবে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাদেশিকতা—

স্বাধীনতা লাভের পরও পশ্চিমবঙ্গে প্রাদেশিকতা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই শঙ্কিত হইতেছেন। বাঙ্গালার বাহিরে নানা প্রদেশে—বিশেষ করিয়া বিহারে ও আসামে বাঙ্গালীদের উপর নানাভাবে নির্য্যাতন হইতেছে বলিয়া বাঙ্গালায়ও বাঙ্গালীরা অবাঙ্গালীদের প্রতি ভাল মনোভাব রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। ইহা অবশ্যই অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। তাহা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারে অবাঙ্গালীর প্রভাব অধিক বলিয়া সেখানে বাঙ্গালী আর নূতন করিয়া প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারে সমর্থ হয় না—নানা ক্ষেত্রে অবাঙ্গালী বাঙ্গালী অপেক্ষা অধিক সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়া থাকে। যে সকল অবাঙ্গালী বাঙ্গালা দেশে আসিয়া বাস করিতেছে, তাহারাও ঐ সুযোগে বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালীদের উপর প্রভুত্ব করার চেষ্টা করে। এইভাবে বাঙ্গালায় বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী বিবাদ দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। সহরতলী অঞ্চলে বহু অবাঙ্গালীর বাস। বাঙ্গালী সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী বলিয়া প্রথমতঃ তাহাদের সকল স্থানে সুযোগ ও অধিকার দান করিয়াছে। তাহার ফলে সকল কার্য্যক্ষেত্রে এখন বাঙ্গালীদের পশ্চাদপদ হইতে দেখা যাইতেছে। ইহাতে বাঙ্গালীর মনে ক্ষোভের সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক—অবাঙ্গালীরা বাঙ্গালা দেশে বাস করুন, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু যদি প্রতি ক্ষেত্রে বাঙ্গালীকে অবাঙ্গালীর মুখাপেক্ষী হইয়া বাঙ্গালা দেশে বাস করিতে হয়, তবে বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা সহ্য করাও সহজ নহে। যাহাতে এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব দেশ হইতে দূরীভূত হয়, সরকার পক্ষ হইতে সেজন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন। নচেৎ বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহা বন্ধ করা সুকঠিন হইবে।

ভারতের রাষ্ট্রভাষা—

হিন্দী ভাষা ও দেবনাগরী বর্ণমালা ভারতের রাষ্ট্র-ভাষারূপে গৃহীত হওয়ায় এ বিষয়ে আলোচনা শেষ হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীরা এই ব্যবস্থায় সম্মত হইতে পারেন নাই। হিন্দীর প্রতি দক্ষিণ ভারতের বিদ্বেষের মূল কারণ, তাহাদের আশঙ্কা,উত্তর ভারত এই ভাবে দক্ষিণ-ভারতকে দাবাইয়া রাখিবে, দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম, কানাড়ী প্রভৃতির সহিত হিন্দী ভাষার কোন মিল না থাকায় দক্ষিণ ভারতের পক্ষে হিন্দী ভাষা শিক্ষা করা সহজসাধ্য হইবে না। আর এক দিকে উত্তর ভারতের মুসলমানগণ উর্দ্দু বর্ণমালা গৃহাত না হওয়ায় রুষ্ট হইয়াছেন। এই ব্যাপারে শিক্ষা-সচিব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পর্য্যন্ত তীব্র ভাষায় হিন্দু নেতাদের সঙ্কীর্ণতার ও আত্মম্ভরিতার নিন্দা করিয়াছেন। এখানে যুক্তির কোন বালাই নাই। পাকিস্তান পৃথক হইয়াছে—হিন্দুস্থানে উর্দ্দু বর্ণমালা দাবী করার কোনই অর্থ হয় না।

ইংরাজি আগামী ১৫ বৎসর কাল রাজকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইবে স্থির হইয়াছে। কাজেই হিন্দী যাহারা না শিখিবে, তাহারা ইংরাজির মারফত সকল কাজ করিতে সমর্থ হইবে। সংস্কৃত বা দেবনাগরী বর্ণমালা গৃহীত হইয়াছে, আমাদের বিশ্বাস, সংস্কৃত ভাষাকে যতই মৃত-ভাষা বলিয়া নিন্দা করা হউক না কেন, ঐ সংস্কৃত ভাষাই ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হইবার একমাত্র দাবীদার—কাজেই অদূর ভবিষ্যতে তাহাই ভারতের রাষ্ট্র ভাষা বলিয়া গৃহীত হইবে।

বর্দ্ধমানে ম্যালেরিয়া—

বর্ত্তমান বৎসরে বর্দ্ধমান জেলার প্রায় সকল স্থানে ম্যালেরিয়া এত ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়াছে—এরূপ বহু বৎসর পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। তাহার একমাত্র কারণ, খাদ্যাভাব বলিয়াই মনে হয়। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত নিরাশ্রয় লোকের দল গ্রামে গ্রামে যাইয়া বাস করিতেছে, কিন্তু কৃষি প্রভৃতির সুযোগ সুবিধা না থাকায় কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই। ধনী জমীদারের দল বহুদিন গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে, গ্রামগুলি শ্রীহীন—পচা পুকুর ও জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া আছে। আমরা বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, ম্যালেরিয়া দরিদ্রের ব্যাধি—কাজেই এ বৎসর যে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়িবে, তাহা আর বিচিত্র কি? বহু টাকা ব্যয় করিয়া সরকার কৃষি ও স্বাস্থ্য বিভাগ পুষিয়া থাকেন, তাহাদের কার্য্য সরকারী দপ্তরখানার ফাইলের মধ্যেই নিবদ্ধ—গ্রামের লোক ঐ সকল বিভাগের অস্তিত্বই বুঝিতে পারে না। স্বাধীন দেশেও এ অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইল না—এজন্য কাহাকে দোষী করিব?

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন—

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক ও পরিচালনা পদ্ধতি সম্বন্ধে তদন্তের জন্য সার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে যে কমিশন গঠিত হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহার কার্য্য-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। কমিশন স্বীকার করিয়াছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা সর্বাপেক্ষা অধিক শোচনীয়। ভারতের মোট ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শুধু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই মোট ছাত্র সংখ্যার শতকরা ২০জন অধ্যয়ন করে। কলিকাতার ১৮৮২ সালে কলেজে-পড়া ছাত্রসংখ্যা ৩৮২৭—১৯৪৭ সালে তাহা হইয়াছে ৪৫০০৮। বঙ্গ ভঙ্গের পরও ১৯৪৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪১ হাজার। বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৭৪টি কলেজের মধ্যে ৩৬টি কলিকাতা সহরে অবস্থিত। শুধু ৫টি কলেজে—বিদ্যাসাগর, সুরেন্দ্রনাথ, সিটি, বঙ্গবাসী ও আশুতোষে মোট ৩০৪৯২ ছাত্র অধ্যয়ন করে। সহরের ভিড়ের মধ্যে ছাত্র না রাখিয়া কলেজগুলিকে গ্রামাঞ্চলে লইয়া না গেলে ছাত্রদের মধ্যে দুর্নীতি যে বাড়িয়া যাইবে, সে কথা কমিশন একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। শিক্ষাদান ব্যবস্থা এতই অসন্তোষজনক যে ছাত্ররা সেজন্য প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে সমর্থ হয় না। সরকারী কলেজগুলির অবস্থাও গত ৩০ বৎসরে খারাপ হইয়া গিয়াছে। যে দেশে এত অধিক বেসরকারী কলেজ হইয়াছে, সে দেশে আর সাধারণ শিক্ষার জন্য সরকারী কলেজ রাখার প্রয়োজন দেখা যায় না। সরকারী কলেজগুলির জন্য অযথা সরকারী অর্থ অপব্যয়িত হইয়া থাকে। বেসরকারী কলেজগুলিতেও এত অধিক ছাত্র গ্রহণ করিতে দেওয়া উচিত নহে। বেসরকারী কলেজগুলিকে আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলা চলে না—ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বলিলেই ভাল হয়। কলেজ শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য অবিলম্বে কঠোর আইন প্রণীত হওয়া প্রয়োজন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর দেশবাসীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে—যদি শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ও উন্নতিসাধন না করা হয়, তবে দেশ যে ক্রমে অধঃপতিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বহু সত্য কথা প্রকাশ করিয়া সে বিষয়ে দেশবাসী জনগণের ও সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। ৫টি বড় কলেজের ছাত্রসংখ্যা যাহাতে এখনই কমান হয়, তাহার ব্যবস্থা প্রয়োজন। ঐ সকল কলেজে ছাত্রদের সহিত অধ্যাপকদের কখনই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হওয়া সম্ভব হয় না। মফঃস্বলে ছোট ছোট কলেজ করা হইলে ঐ সকল ছাত্র সেখানে যাইয়া অল্প খরচে শিক্ষালাভের সুযোগ পাইবে। এ বিষয়ে দানশীল ব্যক্তিগণেরও অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

বন সম্পদ বৃদ্ধি—

১৯৪৭ সালের সরকারী হিসাবে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গে ১৬৯৭৬১১ একর জমী বনভূমি। দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ী

জেলাতে ও ২৪পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে সরকারী বনভূমি আছে। তাহা ছাড়া ২৬৮১৯০ একর বনভূমি ব্যক্তিগত অধিকারে আছে। সম্প্রতি বনসম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে। প্রকাশ নদীয়া জেলাতে ২০০০ একর জমী, মেদিনীপুরে ১৫০১ একর জমী, বীরভূমে ৭৩ একর, মুর্শিদাবাদে ৫০ একর ও বাঁকুড়ায় ১৬৫ একর জমী বনভূমিতে পরিণত করার ব্যবস্থা হইয়াছে। সংবাদটি আশাপ্রদ সন্দেহ নাই কিন্তু অন্যান্য সকল ব্যবস্থার মত এই ব্যবস্থাতেও যেন 'পর্বতের মুষিক প্রসব' না হয়—ইহাই আমাদের কামনা।

সর্দ্দার পেটেল ও পণ্ডিত নেহরু—

গত ১লা নভেম্বর সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেলের ৭৫তম জন্মোৎসব ও গত ১৫ই নভেম্বর পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর ৬০তম জন্মোৎসব ভারতের সর্ব্বত্র পালিত হইয়াছিল। উভয় ব্যক্তিই বর্ত্তমানে ভারতীয় রাষ্ট্রের কর্ণধার এবং উভয়েই অসাধারণ বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন। সর্দ্দারজী ৭৫ বৎসর বয়সেও যে ভাবে কাজ করেন, তাহার হিসাব দেখিলে যে কোন যুবকও বিস্মিত হইবেন। ভারতে নূতন সংযুক্ত-ভারত প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে তিনি যে ভাবে দেশীয় রাজ্যগুলিকে রাষ্ট্রের অধীন করিয়াছেন, তাহা সকলের পক্ষেই বিস্ময়জনক। পণ্ডিত নেহরু এখনও কত কাজ করেন, তাহা তাঁহার আমেরিকাবাসের দৈনন্দিন কার্য্যসূচি দেখিয়া আমরা জানিতে পারি। তাঁহাদের উভয়ের পরিচালনাধীনে দেশ আবার তাহার লুপ্ত গৌরব লাভ করুক, ইহাই সকলে কামনা করে। পণ্ডিতজী ও সর্দ্দারজী দীর্ঘজীবী হইয়া দুঃখদৈন্যক্লিষ্ট ভারতবাসীর সুখ সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলে দেশবাসী চিরদিন তাহাদের কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

বিনা টিকিটে ভ্রমণ—

গত জুলাই মাসে ই-আই-রেলে বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীদের নিকট হইতে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭ শত ১১ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বুক করা হয় নাই, এমন মালের জন্যও ঐ মাসে ৭ হাজার ২ শত ৮৮ টাকা আদায় হইয়াছে। আমরা সকলে অপরকে আজ দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের নিজেদের মধ্যে দুর্নীতি কি ভাবে ব্যাপক হইয়াছে, তাহা এই বিনা টিকিটে ভ্রমণের হিসাব দেখিলেই বুঝা যায়। অনেকে বিনা টিকিটে ভ্রমণকারী ধরা পড়িলে তাহার মুক্তির জন্য সুপারিশ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করি না। প্রত্যেক লোক যদি বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীদের ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করি, তবে এই পাপ অতি সহজে দূর করা হয়। আমরা কিন্তু কেহই সে বিষয়ে চিন্তা পর্য্যন্ত করি না।

কলিকাতা কর্পোরেশনের ট্যাক্স—

কলিকাতা কর্পোরেশনের তদন্ত কমিশনের নিকট অভিযোগ করা হইয়াছিল যে সহরের বহু বাড়ীর ট্যাক্স কম ধরা হইয়াছে। এ বিষয়ে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চিফ ভ্যালুয়ার মত প্রকাশ করিয়াছেন—তিনি অনেকগুলি বাড়ীর ট্যাক্সের অঙ্ক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, প্রায় সব ক্ষেত্রেই উহা যাহা হওয়া উচিত ছিল, তাহা অপেক্ষা কম। এ বিষয়ে ৫ হাজার বাড়ীর ট্যাক্স পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে, শতকরা ৭৫টি বাড়ীর ট্যাক্স কম ধরা হইয়াছে, ১৫টির ঠিক আছে ও ১০টির বেশী আছে। এখন এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা কে করিবে? বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা ধনীদের দ্বারা গঠিত না হইলেও তাঁহারা ধনীদেরই সমর্থন করিয়া থাকেন। অধিকাংশ কেন, সকল বড়গৃহের মালিকই ধনী—কাজেই শতকরা ৭৫টি বাড়ীর ট্যাক্স বাড়াইতে গেলে ধনীদের পকেটে হাত পড়িবে—কাজেই 'বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধে কে?' যদি বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা এই সকল দুর্নীতি দমন না করেন, তবে আগামী নির্ব্বাচনে কেহই তাঁহাদের ভোট দিবেন না। অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিতে গেলেও মন্ত্রীদের আর ধনিক-তোষণ নীতি চালানো সম্ভব হইবে না। জনগণ আর কতদিন এই দুঃখদুর্দ্দশা ভোগ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে?

নূতন ভাগবত বিদ্যালয়—

১৮৬৪ সালে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ধনী কাশীনাথ মল্লিক মহাশয় তাঁহার ১৬১ হ্যারিসন রোডস্থ বাসগৃহ ও বহু সম্পত্তি ভাগবত ধর্ম্মপ্রচারের জন্য দান করিয়া গিয়াছিলেন। গত ১৪ই অগ্রহায়ণ তথায় পশ্চিমবঙ্গের মহাপরিপালক শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এক ভাগবত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। খ্যাতনামা বাগ্মী ও পণ্ডিত শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী ঐ বিদ্যালয়ের আচার্য্য।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য সভাপতিত্ব করেন ও কলিকাতার বহু সুধী উপস্থিত ছিলেন। বর্ত্তমান যুগে এই ধরণের বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক—কাজেই আমাদের বিশ্বাস—এই বিদ্যালয় দেশের প্রকৃত মঙ্গলসাধন করিবে।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার—

বাঙ্গালার খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাব্রতী ও কোবিদ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার গত ২৪শে নভেম্বর ৬৩ বৎসর বয়সে আমেরিকার ওয়াসিংটন সহরে হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী (ইউরোপীয় মহিলা) শ্রীমতী ইদা মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে ছিলেন ও তাঁহার একমাত্র কন্যা ইন্দিরা ফ্রান্সে পড়াশুনা করিতেছেন। ১৮৮৭ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৯০৪ সালে ডবল অনার্স সহ বি-এ পাশ করেন; সে সময়ে তাঁহাকে বিদেশে শিক্ষার সরকারী বৃত্তি ও ডেপুটীর চাকরী দেওয়া হয়—তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন ও ১৯০৬ সালে এম-এ পাশ করিয়া বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি মালদহের অধিবাসী ছিলেন ও মালদহ জেলার সকল সদনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯০৯ সাল হইতে তিনি এলাহাবাদে পানিনি কার্য্যালয়ে গবেষক ছিলেন এবং ১৯১৪ সালে বিলাত গমন করেন। বিশ্ব-যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় তিনি আমেরিকা যান ও তথায় ১০ বৎসর বাস করেন। ১৯২৫ সালে তিনি সস্ত্রীক স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, বহু ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন ও বহু সাময়িক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৬ হইতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন এবং গত কয় বৎসর অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তিনি বিদেশে বাংলার সংস্কৃতি প্রচারে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন ও ১২ বৎসর আমেরিকায় সংস্কৃতি প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অতি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন, সর্ব্বদা নিজেকে দেশের কল্যাণকর কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতেন।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

বাঙ্গালার প্রবীণতম রস-সাহিত্য-স্রষ্টা সাহিত্যাচার্য্য কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১২ই অগ্রহায়ণ সোমবার রাত্রি শেষ ৪ ঘটিকার সময় পূর্ণিয়ায় তাঁহার বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮৭ বৎসর বয়স হইয়াছিল। জীবন সায়াহ্নে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতকে স্বাধীনতা লাভ করিতে দেখিয়া তিনি নিজ ডায়েরীর পাতায় লিখিয়াছিলেন—

"এখন মোরে শ্রীপদে লও কৃপা করি রসরাজ।
শেষ কথাটি বলে যাই, স্বাধীন মোরা, স্বাধীন দেশ॥"

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

যৌবন কালেই তিনি সাহিত্য সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সংসার দর্পণ নামক সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণেশ্বরে ১৮৬৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার জন্ম হয়। দক্ষিণেশ্বর, উত্তর পাড়া ও বরাহনগর স্কুলে পড়িয়া তিনি অগ্রজের সহিত মীরাট ও আম্বালায় যাইয়া তথায় শিক্ষা লাভ করেন। ১৩০১ সালে তিনি 'লুপ্তরত্নোদ্ধার' নাম দিয়া কবিগান সংগ্রহ করেন—সে গানগুলি তাঁহার পিতার রচিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার

'সাধনা' মাসিক পত্রে ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কেদারনাথ 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক পত্রেও 'নন্দি শর্ম্মা' নামে কাব্য লিখিতেন। তিনি সরকারী চাকরী করিতেন, ১৯০২ সালে চীনে গমন করিয়াছিলেন ও ১৯০৫ সালে ফিরিয়া কাণপুরে কাজ পান। ঐ স্থানে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা হয়—কেদারনাথ অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯১০ সালে সরকারী চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সাহিত্য সাধনায় পুনরায় মন দেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা বর্ত্তমান, তিনি কয়েক বৎসর কাশীবাসের পর পূর্ণিয়া ভাট্টাবাজারে আসিয়া বহুকাল বাস করেন। তিনি দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক ছিলেন এবং লেখনীর মধ্য দিয়া তাহাদের সুখ দুঃখের কথাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ১৩২২ সালে প্রথম তাঁহার 'কাশীর কিঞ্চিৎ' প্রকাশিত হয়—তাহার পর তিনি অবিরাম বহু লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের পাঠকগণ সে সকলের সহিত সুপরিচিত। চীন-যাত্রী, শেষ খেয়া, আমরা কি ও কে, কবুলতি, দুঃখের দেওয়ালী, পাথেয়, কোষ্ঠীর ফলাফল, ভাদুড়ী মশাই, উড়ো খৈ, আই-হাজ, পাওনা, মা-ফলেষু প্রভৃতি অন্যতম। ১৯২৬ সালে দিল্লীতে, ১৯২৭ সালে মীরাটে, ১৯২৯ সালে নাগপুরে ও ১৯৩৪ সালে কলিকাতায় তিনি প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের সাহিত্য শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯৪১ সালে কাশীতে উক্ত সম্মিলনের তিনি মূল সভাপতি হন, কিন্তু অসুস্থতার জন্য যাইতে না পারিয়া লিখিত অভিভাষণ প্রেরণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহাকে জগত্তারিণী পদক দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

কলিকাতার দুগ্ধ সমস্যা—

ডাঃ সিক্কা নামক একজন অবাঙ্গালী বহুদিন যাবৎ বাঙ্গালা সরকারের কৃষি বিভাগে কাজ করিতেছেন। তাঁহার কার্য্যকারিতার কথা কেহ জানে না, তবে তিনি যে অনেক অকাজ করিয়া থাকেন, তাহা কাঁচড়াপাড়ার নিকট হরিণঘাটার পশুপালন কেন্দ্রের বিবরণ হইতে জানা যায়। তিনি এখন দুগ্ধ সরবরাহের কর্ত্তা হইয়াছেন এবং সম্প্রতি কলিকাতায় কি ভাবে দুগ্ধ-সমস্যার সমাধান করা যায়, সে বিষয়ে জনসভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন, কলিকাতায় জনগণ যে দুগ্ধ ক্রয় করে, তাহার শতকরা ৮৫ ক্ষেত্রে জলমিশ্রিত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তিনি ইহার প্রতীকারের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। বাঙ্গালার লোক সন্দেশ খাইয়া দুগ্ধের অপব্যবহার করে, ইহাই তাঁহার অভিমত। এ সকল বাজে কথা না বলিয়া এবং সরকারী গৌরী সেনের টাকায় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ না করিয়া তিনি যদি সত্যই কোন কাজ করিতেন, তবে লোক তাঁহার সমালোচনা শুনিত। এই সকল ফাঁকা কথার কোন মূল্য আছে বলিয়া কেহ মনে করে না।

পেশা হিসাবে ভিক্ষাবৃত্তি—

বোম্বায়ে পেশাদার ভিক্ষুকদিগকে আর সহরে ভিক্ষা করিতে দেওয়া হইবে না—আইন করিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য গভর্ণমেণ্ট তাহাদের জন্য আশ্রয়-স্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন। বিষয়টি খুবই প্রয়োজনীয়। কলিকাতা সহরে আবার ভিক্ষুকদের ভিক্ষা করাইয়া নাকি একদল লোক অর্থোর্জ্জন করে—তাহাই নাকি ব্যবসা। কলিকাতায়ও পেশাদারী ভিক্ষা বন্ধ করা প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সমাজ ব্যবস্থার যে গলদের জন্য লোক ভিক্ষা করিতে বাধ্য হয়, তাহার কি কোন সুবন্দোবস্ত করা যায় না। ভিক্ষুক ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত ভাবে পালন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে তাহারা আর ভিক্ষুক হইবে না, সমাজের উপকারী মানুষ হইবে—ইহা ত পরীক্ষিত সত্য। এ কার্য্যের জন্য যদি গভর্ণমেণ্ট অগ্রসর হন, তবে আইন করিয়া ভিক্ষা বন্ধ করার প্রয়োজন হইবে না।

পূর্ণবয়স্কদের শিক্ষা—

পূর্ণবয়স্কদের শিক্ষা প্রদানের জন্য সরকারী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, ইহা দেশবাসী সকলের পক্ষে আশা ও আনন্দের সংবাদ। দেশে কোটি কোটি লোক বাল্যে শিক্ষালাভের সুযোগ লাভ করেন নাই, আজ তাহাদের মধ্যে সাধারণ জ্ঞান প্রচার না করিলে রাষ্ট্র পরিচালনার নানারূপ অসুবিধা হইবে ও রাষ্ট্র অচল হইয়া যাইবে। এ কথা সত্য হইলেও দেশের একদল স্বার্থান্ধ লোক পূর্ণ-বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বাধাদান করিতেছে ও করিবে। কি ভাবে শিক্ষা দান করা প্রয়োজন, তাহা স্থির করা

সুকঠিন। সকলক্ষেত্রে একরূপ ব্যবস্থা চলিবে না। দেশের আবহাওয়া ও জনসাধারণের অবস্থা বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কথকতার মধ্য দিয়া শিক্ষা প্রচারের উপায় স্থির করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দেশের পূজা-পার্ব্বণ ও মেলাগুলিকে জনশিক্ষার কাজে লাগাইতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু নিরক্ষরতা দুরীকরণের অভিযান নহে, জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির শিক্ষাদান সর্ব্বাধিক প্রয়োজন। কে এই শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিবে? প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলক ভাবে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা প্রয়োজন। দেশে ত্যাগব্রতী জনসেবকের দলকে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। যে শিক্ষা মানুষকে অকর্ম্মণ্য ও পঙ্গু করিয়া দিয়াছে, ইংরাজ প্রবর্ত্তিত সেই শিক্ষার প্রসারের আর কোন প্রয়োজন নাই। নূতন ভাবে স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ গড়িবার জন্য সকল শিক্ষারই সংস্কার প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া বয়স্কদের শিক্ষাদান আরও কঠিন ব্যাপার। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি সপ্তাহে অন্তত একদিন করিয়া যদি ২ ঘণ্টা স্থানীয় নিরক্ষর পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষাদানের চেষ্টা করেন, তবে দেশের প্রভূত উপকার হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এ জন্য চিন্তা করিয়া আমাদের কর্ম্মপথ স্থির করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আমরা কি আজও তাহা গ্রহণ করিব না?

বিশ্ব-শান্তি—

গত জুলাই মাসে প্রেসিডেণ্ট টু্ম্যান বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবী ক্রমেই শান্তির পথে অগ্রসর হইতেছে। আমেরিকার সমরসজ্জা, এ্যাট্‌ল্যাণ্টিক চুক্তি, দ্রুততর এবং মারাত্মক বিমান পোত ও আণবিক বোমার ক্রমশঃ ব্যাপক ধ্বংস-শক্তির গবেষণা প্রভৃতি বিশ্ব-শান্তি স্থাপনের পথ প্রশস্ত করিতেছে কি না বলা যায় না; কিন্তু বর্ত্তমানে মাও সে তুং কর্ত্তৃক কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র স্থাপন হইতে চীনে গৃহবিবাদের কথঞ্চিৎ শান্তি এবং রুশ কর্ত্তৃক আণবিক বোমার গুপ্ততথ্য আবিষ্কার যে বিশ্বযুদ্ধের নিবারণ—অন্ততঃ বিলম্বের সূচনা করিতেছে তাহা সহজেই মনে করা যাইতে পারে। যাহার নাই, সে ত চাহিবেই, কিন্তু যাহাদের আছে, তাহারাও যে আরও বেশী চায়, ইহাই অশান্তির মূল। সারা পৃথিবীর সম্পদে যোগ্যতানুসারে সকলের অধিকার-সম্ভাবনা না হইলে শান্তি লাভ সম্ভব বলিয়া ত মনে হয় না।

সুলক্ষণ—

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ভারতের বাহিরে দূতাবাস প্রভৃতির ব্যয় হ্রাসের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বেই এই আদেশ জারি হওয়া উচিৎ ছিল; আমাদের মনে হয়, দূতাবাস স্থাপন কালেই—ভারতবর্ষের কেবল বিত্তের নয়, আদর্শের অনুযায়ী ব্যয় ব্যবস্থা করিয়া দূতাবাসগুলি স্থাপন করা উচিৎ ছিল। "জাতির জনক" বলিয়া চীৎকার করা যাঁহাদের পেশা, তাঁহারা প্রকাশ্যে বলেন, আড়ম্বর না থাকিলে ভারতের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং ভারতীয় দূতাবাসগুলির ব্যয় কল্পনারাজ্যের আমীর ওমরাহ বাদশাহের আড়ম্বর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে বলিয়া শোনা যায়। একবার মনে করিয়া দেখা ভাল যে মহাত্মাজী মাত্র আজানুলম্বিত বস্ত্রে বার্কিংহাম রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন; তাঁহার মর্য্যাদার হানি হইয়াছিল বলিয়া কখনও শোনা যায় নাই। "জাতির জনক" বলিয়া চীৎকার করিয়া লাভ নাই; তাঁহার আদর্শ কতকটাও কার্য্যে পরিণত হইলে সকলের মঙ্গল।

সত্যমেব জয়তে—

সত্যের জয় অথবা জয়ই সত্য অর্থাৎ যে প্রকারে হউক জয়লাভ করিলে তাহাই সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। ইহা ন্যায়ের অর্থ বলিয়া গ্রহণ করা চলে। বুদ্ধিমান লোকে বলিবে "যা হবার হ'য়ে গেছে" আর বিতর্কে লাভ নাই; "সত্য" এখানে "truth বা "honest dealings" না হইয়া "fact" অর্থে গ্রহণ করিলে অনেক অশান্তির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়; কারণ কথায় বলে "factum valet." আধুনিক যুগে ইহাই "সত্যমেব জয়তে" কথার অর্থ হওয়া ভাল। দেখা যাইতেছে "বৃহৎ কার্য্যে" এই সত্য বিশেষ চালু হইয়া উঠিতেছে। ভারতীয় অর্থসচিব বলেন, 'ডিভ্যালুয়েশন অর্থাৎ মুদ্রার মান হ্রাস করার ব্যাপারে ব্রিটিশ অর্থ-সচিবকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই, তাহা প্রয়োগ করা হইয়াছে; সত্য পথে গেলে ক্রিপ্‌স্‌ সাহেবের উচিৎ ছিল, ভারতবর্ষকে জানাইয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা। ভারতীয়

বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রী শ্রীক্ষিতীশ নিয়োগী বলেন যে পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্য সংক্রান্ত যে চুক্তি হয়, তাহা ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধি কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়া পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পাকিস্তানে সেই চুক্তি প্রচারিত হইবার সময় দেখা গেল, সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সর্ত্তটী প্রকাশিত হয় নাই। জেনারেল ডেল্‌ভোয়াঁ রাষ্ট্র সঙ্ঘের প্রতিনিধি হইয়া ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদ মিটাইবার জন্য নিযুক্ত হইয়া আছেন। তিনি কাশ্মীরের শত্রু একেণ্ডি সাহেবের মূল্যবান মালপত্র লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া কাশ্মীর সরকারের অজ্ঞাতসারে, পূর্ব্বতন মালিকের নিকট পৌছাইয়া দিলেন। তিনি এক্ষেত্রে ব্যবহার করিলেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের শ্বেতবর্ণ বিমান। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অপর একজন কর্ম্মচারী উইংকমাণ্ডার স্মিথ বিনা ছাড়পত্রে কাশ্মীর প্রবেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বে যে তারিখ পর্য্যন্ত ছাড়পত্র দেওয়া ছিল, তাহার অবসানের মাত্র দুই দিন পূর্ব্বে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিমান চাপিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রবেশ করিয়া আনন্দে কাশ্মীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ইহা এক সপ্তাহের সংবাদ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইহার পরও যদি জগতে সত্যের জয় হইতেছে বলিয়া কাহারও সন্দেহ থাকে, তিনি নূতন করিয়া ন্যায় ও ধর্ম্ম মতে দীক্ষা গ্রহণ না করিলে অশান্তি ভোগ করিবেন; তাহাতে পৃথিবীতে কাহারও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

খাদ্য মূল্য হ্রাস প্রচেষ্টা—

এত কাল বাদে মন্ত্রী মহোদয়দের টনক নড়িয়াছে যে দেশের লোকের আর্থিক অবস্থার তুলনায় খাদ্য দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বেশী এবং তাহার কিছু হ্রাস করা প্রয়োজন। শোনা যাইতেছে আগামী জানুয়ারী মাস হইতে শতকরা দশ টাকা কমাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইবে। এতদিন যে চেষ্টা হয় নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। সকলেই মনে করেন, লোকের খাদ্য দ্রব্যের উপর রাজ্য শাসন হইতে অপচয় পর্য্যন্ত সকল লোকসানের খরচ চাপাইয়া এরূপ চড়া দর করা হইয়াছে। ক্রয়কালীন যদি চাউল প্রভৃতি দেখিয়া লওয়া হয় এবং ভোজ্য চাউল যদি ক্রেতাকে দিবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলেই গৃহস্থের অনেক সুরাহা হয়। অপচয় ও চুরি বন্ধ বা যথাসম্ভব রদ করা, তণ্ডুল যথা সময়ে যথাস্থানে পৌছাইবার যান বাহনের ব্যবস্থা করা, ন্যায্য মূল্যে যথার্থ পরিমাণ তণ্ডুলাদি সংগ্রহ করিবার উপায় করিতে পারিলেই দর শতকরা দশ ভাগ কমে। এ সকলের ব্যবস্থা করা যাঁহাদের হাতে তাঁহারা যে এ বিষয়ে খুব আগ্রহশীল তাহা মনে হয় না। এই সঙ্গে গভর্ণমেণ্ট যেরূপ আস্ফালন করিয়া প্রকাশ করিতেছেন যে, দেশে সকল শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায় খাদ্য দ্রব্যের মূল্য আরও কমিবে। তবে চিনি প্রভৃতি ব্যাপারে সরকারী তৎপরতা, দূরদৃষ্টি ও কর্ম্মকুশলতার যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে হতাশ হইতেই হয়।

পঃ বাঙ্গালার প্রাথমিক শিক্ষা—

পশ্চিম বাঙ্গালায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা যে উৎসাহজনক নহে তাহা বিশেষ করিয়া না বলিলেও চলিতে পারে। বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪,১৫৩ ও ছাত্র সংখ্যা ১১,৫৬,১০৫ আর শিক্ষক আছেন ৪২,৯০০। বাঙ্গালা সরকার ৬ হইতে ১১ পর্য্যন্ত সকল বালক বালিকাকে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাও আবার বনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে। পশ্চিম বাঙ্গালার মোটামুটি আড়াই কোটী লোকের শতকরা ১২০৫ জন এই হিসাবে শিক্ষা লাভের অধিকারী হয়, অর্থাৎ অন্ততঃ ৩১ লক্ষ ছাত্র ছাত্রীর প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠ লওয়া প্রয়োজন। বর্ত্তমানে তাহার মাত্র এক তৃতীয়াংশ ছাত্র রহিয়াছে। আমরা কোথায় পড়িয়া আছি, তাহা ইহা হইতে অনুমান হয়।

দিল্লীতে টেলিফোনের চার্জ্জ হ্রাস—

একটানা মূল্য বৃদ্ধির সংবাদে অভ্যস্ত ভারতবাসী, হঠাৎ ব্যয় হ্রাসের সংবাদে উৎফুল্ল হইবার কথা। দিল্লীর টেলিফোন ব্যবহারকারিগণ বস্তুতই ভাগ্যবান, ১৬ই অক্টোবর হইতে তাহাদের কল-প্রতি মূল্যের হার কমিবার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ভাগ্যবানদিগের প্রতি হিংসা পোষণ করি না, কেবল বলি যে যাঁহারা টেলিফোন ব্যবহার করেন তাঁহার অধিকাংশই ধনী, আর না হয় অর্থোপার্জ্জনের জন্য টেলিফোন ব্যবহার করেন। সুতরাং সরকারী তরফে ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থা করিতে হইলে—ভাত, কাপড়, তেল, শাক-সব্জী অথবা বিক্রয়কর—রেল, ডাক মাশুল প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য দিলে ভাল হইত। এই দিকে সরকারের দৃষ্টি পড়িলে সকলে সুখী হয়।

টেবিল্ টেনিসের এক্স্ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন্ রিচার্ড বার্গম্যান্ ও এক্স্ বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন কমল ব্যানার্জি। মি. বার্গম্যান্ গত মাসে কলিকাতায় এক সপ্তাহের জন্য আসিয়া অক্লেশে সকলকে পরাজিত করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ন্সিপ্ টুর্নামেণ্ট বিজয়ী হইয়াছেন।
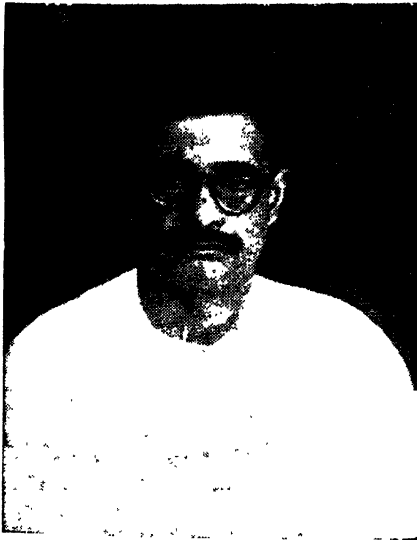
অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পিএচ-ডি বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট-আর্ট কাউন্সিলের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি ইংরাজি ও বাংলা উভয় সাহিত্যে সুপণ্ডিত। সরকারী শিক্ষা বিভাগ হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের কাজ করিতেছেন। আমরা তাঁহার এই সম্মান লাভে তাঁহাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

হিন্দু কোড বিল—

নয়া দিল্লীতে ভারতীয় পার্লামেণ্টের অধিবেশনে গত ২৮শে নভেম্বর প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু 'হিন্দু কোড বিল' নামক কুখ্যাত বিলটি গ্রহণের জন্য আবার সদস্যগণকে বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ঐ বিল উপস্থিত হওয়ার পর হইতেই দেশের জনগণ উক্ত

বিলটিকে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থার বিরোধী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং যাহাতে বিলটি পরিত্যক্ত হয়, সেজন্য লক্ষ লক্ষ আবেদন পার্লামেণ্টের সভাপতির নিকট প্রেরিত হইয়াছে। একদল লোক বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর—দেশের কিন্তু অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তিই ঐভাবে সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারের পক্ষপাতী নহেন। ভারত ক্রমশঃ কোন পথে চলিতেছে, তাহা চিন্তা করিয়া সকল মনীষীই শঙ্কিত হইয়াছেন। নূতন যে শাসনতন্ত্র রচিত হইল, তাহা ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইল বটে, কিন্তু তাহাকে বিলাতী ছাঁচে ঢালা 'ভারতীয়' জিনিষ বলা যাইতে পারে। কার্য্যকালে উহা ভারতের কতটা উপকার করিবে, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ বিদ্যমান। হিন্দু কোড বিলও যদি জোর করিয়া ভারতীয়দের উপর চাপান হয়, তবে দেশে ধ্বংসের বীজ রোপণ করা হইবে—ঐ বিল অনুসারে যে সমাজ সৃষ্ট হইবে, তাহাকে আর ভারতীয় সমাজ বলা চলিবে না। সেইজন্য দেশবাসী সকলে—মাত্র একদল তথাকথিত সংস্কারকামী ব্যতীত—ঐ বিলের বিরোধিতা করিতেছেন। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু কেন যে এ বিষয়ে জনমত উপেক্ষা করিবার জন্য জিদ ধরিয়াছেন, তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

মমি

শ্রীআশা দেবী

নীল নদে আসে বান—
ধুধু মরুবুকে জাগে হাহারব
স্ফিংয়ের চোখে প্রহরী দৃষ্টি জ্বলে,
জাগে নিষ্ঠুর কোন্ মায়াময় হাসি।
চারিদিক ঘিরে হুহু হুহু রবে
আসে সাইমুম ছুটে
হাজারো ঘোড়ার আশোয়ার যেন ছোটে বল্লম হাতে।
থর থর কাঁপে শাণিত আকাশ দিগন্ত পাণ্ডুর।
নীল নদে জাগে বান—
মরু কূলে কূলে যেন মৃদঙ্গ তার
গুরু গুরু বাজে—বাজে ঘন ঘন উদ্বেল উল্লাস।
মিশরের মমি তুমি কি স্বপ্ন দেখো
তোমার জীবনে আসে না তো বান
আসে না মরুর ঝড় ;
পিরামিড-ছায়ে শীতল শয়ানে
তুমি তো নিদ্রাতুর।
তুমি কি শুনিতে পাও—
মাটির পৃথিবী ডাকে হাত ছানি দিয়ে
ডাকিছে আগামী দিন ;
তোমারে জাগাতে নীল নদে আসে বান
তুমি কি শোননি তাও—,
হে মৃত অতীত, মেলো চোখ—মেলো চোখ—
হাজার হাজার বছর গিয়েছে—বহে নিরবধি কাল
জুডা ও নিনেভ, চাল্‌ডিয়া—বেবিলোন—
ইজিয়ানে ভাসে স্পার্টার রণতরী—
হে মমি ফারাও—সবার অগ্রভাগে
জ্বলেছে তোমার স্বর্ণ-কিরীট উদ্ধত মহিমায়।
আজ তুমি মৃত, লুকায়েছ শবাধারে
তোমারে ঘেরিয়া ঘন হ'য়ে আসে যুগের তমসা জাল
বিজ্ঞানী চোখে নগ্ন কৌতূহল—
সকল মহিমা আশ্রয় খোঁজে কীটে-কাটা ইতিহাসে।
মিশরের মমি, তুমি কি শুনিতে পাও—
দিগন্ত হতে ছুটে আসে ওই বিদ্রোহী সাইমুম,
নীল নদী জলে হাত ছানি দেয় দুর্জ্জয় প্রাণ গতি।
জাগো জাগো সম্রাট,
শবতনু তব ভেঙ্গে হোক গুঁড়া গুঁড়া—
সময়ের ঝড়ে সাইমুমে আজ বয়ে যাও—ভেসে যাও—
মৃত্যুশীতল অতীত পারায়ে অগ্নি-ভবিষ্যতে।

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

বিশ্ব-লিঙ্গিয়াডে আচার্য্য গোস্বামী ও ডাঃ প্রামাণিক

সুইডেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-লিঙ্গিয়াড শরীর চর্চ্চা কংগ্রেসে ভারতের তথা সমগ্র এশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেন আচার্য্য শ্যামসুন্দর গোস্বামী ও তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য ডাক্তার দীনবন্ধু প্রামাণিক। শরীর চর্চ্চার ক্ষেত্রে ভারতীয় যোগ-ব্যায়ামের প্রয়োজন যে কতখানি তার প্রমাণ এই দুইজন ভারতীয় যোগ-ব্যায়ামবীর বিশ্ব-লিঙ্গিয়াডে বেশ ভালভাবেই দিয়েছেন। এই বিশ্ব-লিঙ্গিয়াডে ৬৪টি জাতির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ৪ঠা আগষ্ট তারিখে আচার্য্য গোস্বামী ভারতের যৌগিক শরীর চর্চ্চা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন ও ৬ই আগষ্ট ডাঃ প্রামাণিক ভারতীয় যৌগিক প্রক্রিয়া প্রদর্শন করেন। আচার্য্য গোস্বামীর গবেষণামূলক বিজ্ঞানসম্মত বক্তৃতা এবং ডাক্তারপ্রামাণিকের যৌগিক প্রক্রিয়া সমবেত জনমণ্ডলী ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি-গণকে চমৎকৃত ও স্তম্ভিত করে। ২৭শে অক্টোবর আচার্য্য গোস্বামী ও ডাঃ প্রামাণিক বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে ষ্টকহলম ইণ্টারন্যাশানাল ক্লাবের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এই অনুষ্ঠানে আচার্য্য গোস্বামী যোগ এবং যোগের ধ্যান ধারণা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন। ডাঃ প্রামাণিক পেশী নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন প্রাণায়াম ও ধ্যান ধারণা মারফৎ যৌগিকতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। এই অনুষ্ঠানে আচার্য্য গোস্বামীর বক্তৃতা ও তৎসহ ডাঃ প্রামাণিকের যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা পেশী নিয়ন্ত্রণের অপূর্ব্ব কৌশল ষ্টকহলমের বিভিন্ন পত্রিকার উচ্ছ্বসিত

আচার্য্য শ্যামসুন্দর গোস্বামী ও তাঁহার শিষ্য ডাঃ দীনবন্ধু প্রামাণিক

প্রশংসা অর্জ্জন করে। বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি ১২টি দেশের বৈদেশিক প্রতিনিধিসহ সুইডেনস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীআর, কে নেহরু ও তদীয় পত্নীও ষ্টকহলমের এই ইণ্টার ন্যাশানাল ক্লাবের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কারোলিস্ক মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে আচার্য্য গোস্বামী ও ডাঃ প্রামাণিক যে সকল যোগ ব্যায়ামের কৌশল প্রদর্শন করেন তাহা সুইডিস জনসাধারণকে এরূপ আগ্রহান্বিত করে তুলে যে ষ্টকহলমে একটি যোগব্যায়াম শিক্ষার স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আচার্য্য গোস্বামী এখন

অপূর্ব্ব কৌশল প্রদর্শন করে আজ ধনবিজ্ঞানী অতি আধুনিক পাশ্চাত্য জনসমাজকে স্তম্ভিত করেছেন। এই প্রবীণ ভারতের প্রাচীন বক্ষে এরূপ কত সম্পদ যে লুকিয়ে আছে, লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তার খবর পাশ্চাত্য জগৎ তো দূরের কথা আমরা—এই আধুনিক মতবাদী ভারতীয়েরাই বা কতটা রেখে থাকি! পাশ্চাত্যের ধ্বংসাত্মক রাজনীতি, নানা ইজম্‌বাদ ও অন্যান্য অনিষ্টকর প্রভাব আজ ভারতের বুকে শিকড় গাড়ছে। এই প্রভাবে আজ আমরা নিজের দেশকে ভুলে, নিজের নিজত্বকে হারিয়ে
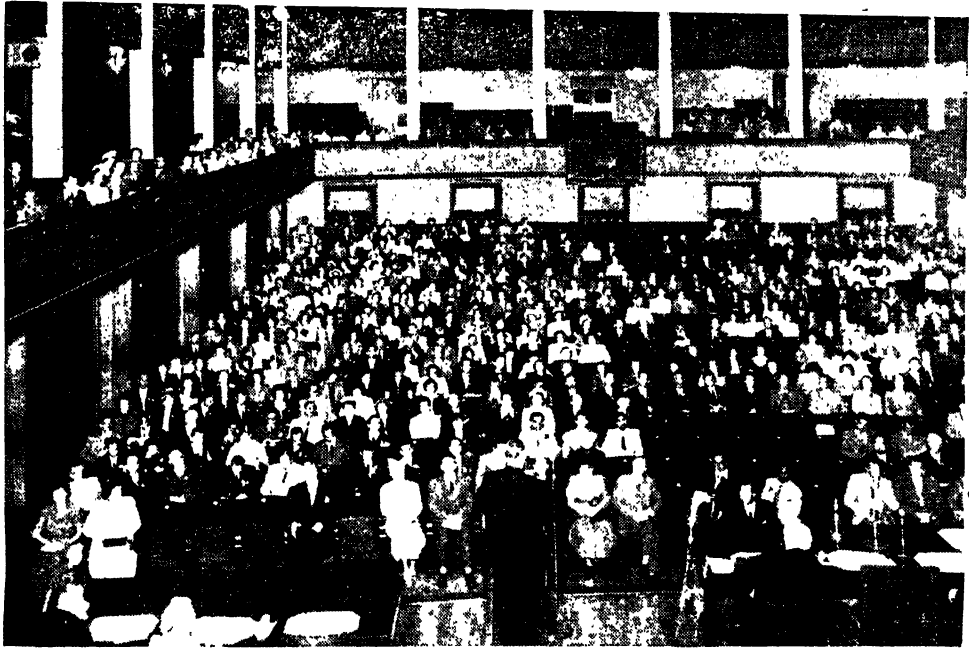
বিশ্ব-লিঙ্গিয়াড শরীর চর্চা কংগ্রেসের একটি দৃশ্য

মাসিক ৬০০০৲ টাকা পারিশ্রমিকে ষ্টকহলমে এরূপ একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত করে যোগাভ্যাস শিক্ষা দানে ব্যাপৃত আছেন। আচার্য্য গোস্বামীর এই স্কুলে ষ্টকহলমের অধ্যাপক, ছাত্রসমাজ, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন পর্য্যায়ের লোক যোগাভ্যাস শিক্ষা করছেন।

আচার্য্য শ্যামসুন্দর গোস্বামী ও তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য ডাক্তার দীনবন্ধু প্রামাণিক ভারতীয় যোগব্যায়ামের

অপরের পিছনে অন্ধের মত ছুটে চলেছি। এর পরিণতি কখনও ভাল হ'তে পারে না। এখন নিজেকে চেনবার, নিজের দেশকে জানবার প্রকৃত সময় এসেছে। যোগব্যায়ামের ন্যায় ভারতের লুপ্তপ্রায় ও অধুনাবিলুপ্ত আরও বহু সম্পদের পুনরুদ্ধার করে বিশ্বের দরবারে আমাদের স্বমর্য্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে। আজ এ কথা চিন্তাশীল ভারতীয় মাত্রেই স্বীকার করবেন।

আচার্য্য গোস্বামী ও ডাক্তার প্রামাণিক ভারতীয়

যোগব্যায়ামের আদর্শ আজ সভ্য জগতের সামনে তুলে ধরেছেন। কিন্তু এখানেই তাঁদের থামলে চলবে না—নিজের এই অজ্ঞ দেশের প্রতিও যথেষ্ট নজর দিতে হবে। ভারতবর্ষে ষ্টকহলমের অনুরূপ যোগব্যায়ামের স্কুল বা শিবির নানা জায়গায় স্থাপন করার দরকার। যাতে সাধারণে সহজেই এই ব্যায়ামগুলি অভ্যাস করতে পারেন তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষাদানের সুব্যবস্থাও করতে হবে। এই সব কাজ সহজে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এর জন্য গভর্ণমেণ্ট এবং দেশের শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তিদের সাহায্যও প্রয়োজন। বিশ্বলিম্পিয়াডে আচার্য্য গোস্বামী ও ডাঃ প্রামাণিকের সাফল্য লাভের পর আশা করি ভারত সরকার ভারতীয় যোগব্যায়ামের প্রসারের জন্য সচেষ্ট হবেন। আমরা আচার্য্য শ্যামসুন্দর গোস্বামী ও ডাক্তার দীনবন্ধু প্রামাণিককে তাঁদের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ষ্টকহলমের ইণ্টারন্যাশানাল ক্লাবে আচার্য্য গোস্বামী ও ডাঃ প্রামাণিক
বামদিকের দ্বিতীয় স্থান থেকে—ডাঃ প্রামাণিক, ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীআর, কে, নেহেরু, ইণ্টারন্যাশানাল ক্লাবের সভাপতি ব্রিলিয়টস্, আচার্য্য গোস্বামী, শ্রীমতী নেহেরু ও ডাঃ হান্না রীথ্

খেলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

প্রথম টেষ্ট ম্যাচ ঃ

কমনওয়েলথ ঃ ৬০৮ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) ও ১২ (১ উইঃ)

ভারতবর্ষ ঃ ২৯১ ও ৩২৭

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় দল বনাম কমনওয়েলথ দলের প্রথম টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় কমনওয়েলথ দল ৯ উইকেটে ভারতীয় দলকে পরাজিত করেছে।

ভারতীয় দলের পক্ষে মানকড় এবং অমরনাথ আহত থাকায় প্রথম টেষ্ট খেলায় যোগদান করতে পারেননি।

১১ই নভেম্বর দিল্লীর উইলিংডন ষ্টেডিয়ামে প্রথম টেষ্ট খেলা সুরু হয়। কমনওয়েলথ দলের অধিনায়ক এল লিভিংষ্টোন টসে জয়লাভ ক'রে প্রথম ব্যাটিংয়ের সুযোগ গ্রহণ করেন। টসে ভারতীয় দলের দুর্ভাগ্যের সমান ভাগীদার আর কোন দেশ আছে কিনা সন্দেহ। ওল্ডফিল্ড এবং লিভিংষ্টোন কমনওয়েলথ দলের প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন। লাঞ্চের সময় কমনওয়েলথ দলের পক্ষে ওল্ডফিল্ড এবং লিভিংষ্টোনের জুটি ৯১ রান করেন। লাঞ্চের পর মোট ১২৫ মিনিট খেলার পর দলের ১০০ রান উঠে। লিভিংষ্টোন ১২৩ রান করে ফাদকারের অফ ব্রেক বলে আউট হয়ে যান। তাঁর এ রানে ১০টা

বাউণ্ডারী এবং ২টো ওভার বাউণ্ডারী ছিল এবং তিনি দুবার আউটের হাত থেকে কোন রকমে রক্ষা পেয়ে যান। ওল্ডফিল্ডের জুটি হ'ন এ্যলে। ওল্ডফিল্ড ৪ ঘণ্টা ব্যাট ক'রে তাঁর নিজস্ব শতরান পূর্ণ করেন। তাঁর রানে ১০টা বাউণ্ডারী ছিল। চা-পানের সময় কমনওয়েলথ দলের এক উইকেটে ২৩৫ রান উঠে। ৪-৩০ মিনিটে ৫ ঘণ্টার খেলায় দলের ২৫০ রান উঠতে দেখা যায়। খেলার নির্দ্দিষ্ট সময়ে কমনওয়েলথ দলের ২ উইকেটে ২৮৪ রান উঠে। ওল্ডফিল্ড ১১০ এবং ক্রেয়ার শূন্য রান ক'রে নট আউট থাকেন। প্রথম দিনের খেলায় ভারতীয় দলের ফিল্ডিং খুবই খারাপ হয়েছে। মোট পাঁচটা ক্যাচ নষ্ট হয়। বিজয় মার্চ্চেণ্ট নিজেই একটা সহজ লো-ক্যাচ ফেলে দেন। উদয় মার্চ্চেণ্ট তাঁর দেখাদেখি স্লিপে তিনটে ক্যাচ নষ্ট করেন, তার মধ্যে একটা ক্যাচ ধরা খুবই সোজা ছিল।

১২ই নভেম্বর দ্বিতীয় দিনের খেলায় কমনওয়েলথ দলের ৮ উইকেটে ৬০৮ রান উঠে। সি এস নাইডু ১৯৪ রান দিয়ে ৩টে উইকেট পান। ফাদকারও ৩টে উইকেট পান ১৬৩ রান দিয়ে। এদিনের খেলায় বিজয় মার্চ্চেণ্ট এবং উদয় মার্চ্চেণ্ট দু'ভাই আহত হ'ন। ওল্ডফিল্ড ১৫১ রানে আউট হন। পেটিফোর্ডের ৬৫ নট আউট, ক্রেয়ারের ৫১, এবং ওরেলের ৫৮ রান উল্লেখযোগ্য।

১৩ই নভেম্বর, খেলার তৃতীয় দিনে কমনওয়েলথ দলের ক্যাপটেন পূর্ব্বদিনের ৮ উইকেটে ৬০৮ রানের উপরই দলের প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করলেন। মার্চ্চেণ্ট ভ্রাতৃদ্বয় খেলায় যোগদান করতে পারবেন না এ খবর শুনে ভারতীয় খেলোয়াড় এবং দর্শকেরা হতাশ হয়ে পড়লেন। সারভাতে এবং মন্ত্রী ব্যাট করতে নামলেন। সূচনা ভাল হ'ল না। দলের মাত্র ১ রানে সারভাতে কোন রান না করেই বোল্ড হ'লেন। দলের ৪০ রানের মধ্যে ৩টে উইকেট পড়ে গেল। চতুর্থ উইকেট পড়ল ৭৬ রানে। এর পর ফাদকার এবং অধিকারী পঞ্চম উইকেটের জুটি হয়ে দলের পতন রোধ করলেন এবং অন্যদিকে খেলার মোড়ও ঘুরিয়ে দিলেন। তাঁদের জুটিতে দলের ১৬১ রান উঠে। ফাদকার ১১০ রান ক'রে ক্রেয়ারের বলে বোল্ড হ'ন। ফাদকারের ব্যাটিং খুবই দর্শনীয় হয়েছিল এবং কোন সময়েই খেলায় বিপক্ষদলকে তাঁকে আউট করবার সুযোগ দেননি। তৃতীয় দিনের শেষে ভারতীয় দলের ৫ উইকেটে ২৫৫ রান উঠে। অধিকারী ৭৪ এবং উমীরগড় ১ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

১৪ই নভেম্বর, খেলার চতুর্থ দিনে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ২৯১ রানে শেষ হয়। ৩১৭ রান পিছনে থেকে ভারতীয় দল ফলো-অন করে। ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা ভালই হ'ল। ওপনিং ব্যাটস উমীরগড় এবং মন্ত্রী যথাক্রমে ৫৪ এবং ৫৫ রান করেন। চতুর্থ দিনের শেষে দেখা গেল ভারতীয় দলের পক্ষে ৩ উইকেটে ১৬৫ রান উঠেছে। হাজারে ৪৫ এবং ফাদকার ১ রান করে নট আউট থাকেন। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা শেষ পর্য্যন্ত এক হাত না লড়ে যে হার স্বীকার করবে না দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার ধরণ দেখে দর্শকেরা অন্ততঃ বুঝতে পারলেন। বাকি হাতে ৬টা উইকেট, হাজারের খেলায় দৃঢ়তা দেখে একটা ক্ষীণ আশা দেখা দিল, হয়ত খেলাটা ড্র যেতে পারে।

১৫ই নভেম্বর, টেষ্ট খেলার শেষ দিন। ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৩২৭ রানে শেষ হয়ে গেল। হাজারে ১৪০ রান করলেন। খেলাটা ড্র করার হাজারের আপ্রাণ চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হ'ল। অধিকারী ৪৪ রান ক'রে শেষ পর্য্যন্ত নট আউট থাকেন। কমনওয়েলথ দল তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। এবং জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১২ রান উঠতে ১টা উইকেট পড়ে। খেলা শেষ হওয়ার নির্দ্দিষ্ট সময়ের ৬৫ মিনিট আগেই খেলার ফলাফল চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হয়ে যায়। কমনওয়েলথ দল প্রথম টেষ্ট ম্যাচে ভারতীয় দলকে ৯ উইকেটে পরাজিত করে।

টেবল টেনিস ঃ

ক'লকাতায় ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত টেবল টেনিস টেষ্টম্যাচ খেলায় ইংলণ্ড ৫-০ গেমে ভারতবর্ষকে পরাজিত করেছে। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে এক-মাত্র চন্দ্রণাই একটা গেম পেয়েছিলেন বার্ণার সঙ্গে খেলায়। বার্ণা প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ গেমে চন্দ্রণাকে পরাজিত

করেন। ভারতীয় খেলোয়াড়দের পরাজিত করতে ইংলণ্ডের বার্জম্যান এবং বার্ণাকে কোন বেগ পেতে হয়নি। পৃথিবীর টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ান এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন খেলোয়াড় বার্জম্যান এবং বার্ণার খেলার কাছে ভারতীয় খেলোয়াড়দের খেলা নিষ্প্রভ হয়ে ছিল। ভারতীয় টেবল টেনিস খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড কত নীচে ভারতীয় খেলোয়াড়রা এ থেকে উপলব্ধি করতে পারলে ভারতবর্ষে বার্জম্যান এবং বার্ণার আগমন সার্থক হবে।

টেষ্টখেলার ফলাফল ঃ

বার্জম্যান ২১-১০, ২১-১৫, ২১-১৪ সেটে চন্দ্রণাকে পরাজিত করেন।

বার্জম্যান ২১-৯, ২১-৮, ২১-১৯ সেটে ভাণ্ডারীকে পরাজিত করেন।

বার্ণা ২১-৯, ২১-১৬, ২১-৯ সেটে ভাণ্ডারীকে পরাজিত করেন।

বার্ণা ২১-১৪, ১৭-২১, ২১-১৮, ২১-১০ সেটে চন্দ্রণাকে পরাজিত করেন।

বার্জম্যান ও বার্ণা ২১-১৪, ২১-১৫, ২১-১১ সেটে চন্দ্রণা ও কুমার ঘোষকে পরাজিত করেন।

প্রদর্শনী খেলা ঃ

আগন্তুক দল ৪-১ গেমে বাঙ্গলাদেশকে পরাজিত করেন। আগন্তুকদলে খেলেন বার্জম্যান ও চন্দ্রণা। বাঙ্গলা দলে ছিলেন ভাণ্ডারী, কুমার ঘোষ এবং জয়ন্ত। জয়ন্ত (বাঙ্গলা) ২১-১৬, ১২-২১, ২১-১৬ ও ২১-১০ সেটে চন্দ্রণাকে পরাজিত করেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া টেবল টেনিস ঃ

ক'লকাতায় ইউনিভারসিটি হলে অনুষ্ঠিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ান রিচার্ড বার্জম্যান সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন ভূতপূর্ব্ব পৃথিবীর টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ান ভিক্টর বার্ণাকে হারিয়ে। বার্জম্যান তিনটি বিষয়ে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেন।

ফলাফল ঃ

সিঙ্গলসে রিচার্ড বার্জম্যান ২১-১১, ২১-১১, ২১-১৯ সেটে ভিক্টর বার্ণাকে পরাজিত করেন।

ডবলসে—বার্জম্যান ও বার্ণা ২১-১২, ২৪-২২, ২১-১৫ সেটে কে ঘোষ ও চন্দ্রনাকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে বার্জম্যান ও মিসেস সি মদন ২৬-২৪, ১৭-২১, ২১-১৬, ১৫-২১, ২১-১৬ সেটে বার্ণা ও মিসেস বার্ণাকে পরাজিত করেন।

সুইডিস ফুটবল দল ঃ

মোহনবাগান ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হেলসিংবর্গ সুইডিস ফুটবল দলের প্রদর্শনী খেলাগুলি ক'লকাতার ফুটবল মহলকে এমনভাবে যে আকৃষ্ট করবে তা কেউ আশা করতে পারে নি। অসময়েও ফুটবল খেলা যে ক'লকাতার মাঠে দর্শকদের বিপুলভাবে আকৃষ্ট করতে পারে সাম্প্রতিক অনুষ্ঠিত সুইডিস দলের খেলা থেকে একটা দৃষ্টান্ত রয়ে গেল। লীগ বা আই এফ এ শীল্ডের গুরুত্বপূর্ণ খেলার মতই সুইডিস দলের প্রদর্শনী খেলার টিকিটের চাহিদা ছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত ক্লাব কর্তৃপক্ষ স্থানাভাবের জন্য বহু সহস্র দর্শককে হতাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই বিপুল জনসমাগণমকে মোহনবাগান ক্লাব কর্তৃপক্ষ যে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন তার জন্য প্রশংসা তাঁদের এবং দর্শকদের উভয়েরই প্রাপ্য। সুইডিস দলের খেলা সম্পর্কে বহু আলাপ আলোচনা খেলার মাঠে শুনা গেছে। প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের 'Physical fitness' দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। ফুটবল খেলার উপযোগী যে সব দৈহিক গুণাগুণ থাকা দরকার এ দলের সে সমস্তের কোন অভাব নেই, এমনভাবেই দলে খেলোয়াড় নির্ব্বাচন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ই বলিষ্ঠ ওজনে ভারী এবং দ্রুতগামী। ভারতীয় খেলোয়াড়রা তাদের পাশে অনেক দিক থেকেই অশোভন ছিল। ক'লকাতায় সুইডিস দল তিনটি ম্যাচ খেলেছে। প্রথম খেলা মোহনবাগানের সঙ্গে গোল শূন্য ড্র গেছে। দ্বিতীয় খেলায় ইষ্টবেঙ্গল দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করেছে। তৃতীয় খেলায় আই এফ এ দলকে ১-০ গোলে হারিয়ে হেলসিংবর্গ ফুটবল দল তাদের পূর্ব্ব-অঞ্চলের সফরে অপরাজেয় সম্মান লাভ করেছে। মোহন-বাগান ক্লাব তার গত ৭।৮ বছরের খেলোয়াড় জীবনে এত-ভাল খেলা কোন দিন খেলেনি; এতবড় নাম করা শক্তি-শালী দলের বিপক্ষে তাদের খেলা দর্শনীয় এবং উপভোগ্য

হয়েছিল। খেলার সমস্ত দিক বিচার করলে ঐ দিন মোহনবাগান ক্লাবের জয়লাভ এমন কি অযৌক্তিক হ'ত না। খেলার গোড়ার দিকে মোহনবাগানের যে বল দুর্ভাগ্যক্রমে বারের উপর দিয়ে গোল-কিপারকে পরাস্ত ক'রে চলে গেছে দর্শকেরা খেলা প্রসঙ্গে উল্লেখ করবার একটা বড় খোরাক পাবে। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব তাদের এ বছরের খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারে নি। তাদের আক্রমণ ভাগ এমন বিশৃঙ্খলভাবে যে খেলবে তা কেউ আশা করেনি। অনেকেই মোহনবাগানের সঙ্গে সুইডিস দলের খেলার ফলাফল দেখে আশা করেছিলেন ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের ফরওয়ার্ডরা এদের সঙ্গে জোর লড়বে। কিন্তু আমরা হতাশ হয়েছি। সুইডিস দল প্রথম দিনের তুলনায় ঐদিন উচ্চশ্রেণীর ফুটবল খেলা দেখায়। আমাদের শেষ আশা ছিল আই এফ এ জিততে পারলে আমাদের মুখ রক্ষা হয়। কিন্তু তাও পূর্ণ হ'ল না। আই এফ এ-র দল গঠনে পক্ষপাতিত্ব দেখে সকলই নিরাশ হয়েছিলেন, কার্য্যক্ষেত্রে আই এফ এ-র নির্ব্বাচন যে সঠিক হয়নি তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। এ ব্যাপার নতুন নয়। খেলোয়াড় নির্ব্বাচন কমিটির সভ্যরা দলীয় স্বার্থে জড়িত, জাতীয় সম্মানের এবং স্বার্থের কথা ভাববার মত লোকের একান্ত অভাব সেখানে আছে। তাঁরা যে ক্ষমতাবান এটা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন নিজ দলের বা দলীয় সভ্যের মনোনীত খেলোয়াড়ের স্বপক্ষে ভোট দিয়ে। আই এফ এ দলের খেলা সুইডিস দলের কাছে পরাজিত ইষ্টবেঙ্গল দলের খেলার থেকে অনেক নিকৃষ্ট হয়েছে। দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে কোন বোঝাপড়া ছিল না। হাতে একদিন সময় ছিল ঐ দিন একটা প্রদর্শনীয় খেলায় আই এফ এ-র নির্ব্বাচিত দলটি প্র্যাকৃটিশ করলে একসঙ্গে না খেলার দোষ ত্রুটি অনেকটা স্খলন হ'ত, খেলোয়াড়দের মধ্যে আগে থেকে একটা বোঝাপড়া হ'ত। এ সমস্তর ব্যবস্থা করার ভার আই এফ এ-র। কিন্তু সভ্যরা দলের খেলোয়াড় মনোনীত করেই খালাস।

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা" (বিস্তৃত পরিচিতি, টীকা-টিপ্পনী ও বঙ্কিমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ)—২॥৹

বিমল সেনগুপ্ত প্রণীত নাটক "দিন আগত ঐ"—৸৹, "মুসাফির"—১॥৹

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত "রোঁলার আলোকে গান্ধীজী"—১॥৹, "ছোটদের রামায়ণ-কথা"—১৲ ও "ছোটদের মহাভারত-কথা"—১৲

দীনেন্দ্রকুমার মিত্র প্রণীত "খণ্ডিত বাংলা"—২৸৹

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষ"—১৲, "চন্দ্রশেখর"—১৲

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত রোমাঞ্চ-উপন্যাস "অভিশপ্ত বংশ"—১৲

শ্রীসুজিৎকুমার নাগ প্রণীত "ছোটদের কবিতা"—৷৵৹

সুরেশচন্দ্র দাস প্রণীত "জ্যোতিষীর দৃষ্টিতে নেতাজী"—২৲

শ্রীমনোরঞ্জন রায়-সম্পাদিত "গীতাসার"—১।৹

শ্রীযামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রবেশিকা" (১ম ভাগ)—৩৲

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "ব্যবসায়ীর বিলাত ভ্রমণ"—২॥৹

শ্রীসন্তোষকুমার দে প্রণীত "উপজীবিকা হিসাবে বিজ্ঞাপন"—২॥৹

ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দাস প্রণীত "শ্রীশ্রীজগবন্ধু হরি লীলামৃত" (অষ্টাদশ খণ্ড)—১।৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শেষ

শিল্পী : দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

মাঘ—১৩৫৬
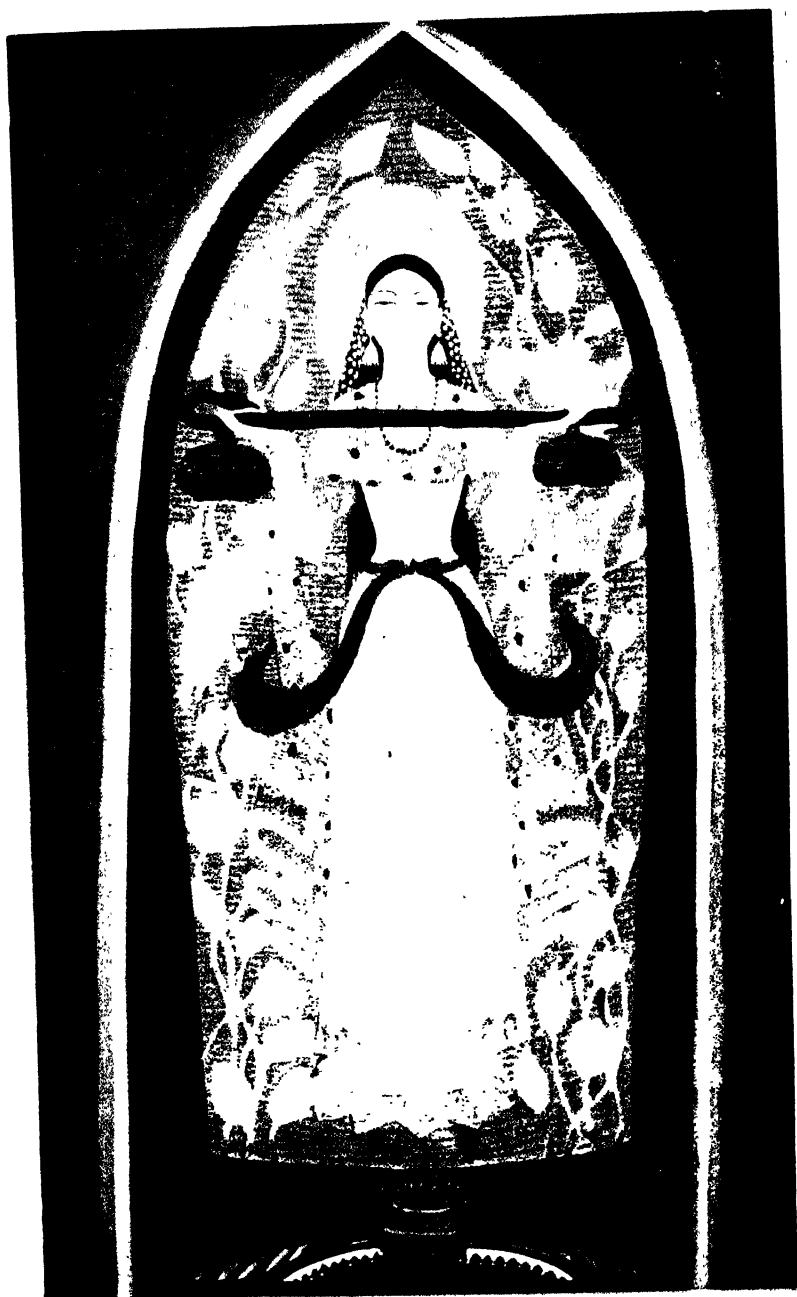
দ্বিতীয় খণ্ড | সপ্তত্রিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

গীতায় হিংসার আদর্শ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

মহাভারতের যে যুগসন্ধিক্ষণে ও যে প্রয়োজনে গীতার বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল আজ আবার তাহা অপেক্ষাও এক গুরুতর সঙ্কটকাল উপস্থিত। "যদাযদাহিধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত" সারা ভারত ব্যাপিয়া আজ অধর্মের অসত্যের পাপের ও দুর্নীতির যে অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা চলিয়াছে ইহার ফলে রাষ্ট্র বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ হইলেও ভারতবর্ষ বর্তমানে বিবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন, নানাভাবে বিপন্ন। যে মহাদেশ জাতিগত, সংস্কৃতিগত এবং ভৌগলিক অর্থে অবিচ্ছেদ্য ছিল তাহা দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব বাংলা হইতে লক্ষ লক্ষ নিরুপায় নরনারী নিজের দেশ ছাড়িয়া নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ভারতরাষ্ট্রের শরণাপন্ন হইয়াছে। পশ্চিম পাঞ্জাবের উৎপীড়িত কয়েক লক্ষ বাস্তহারা গীতাযুগের সেই প্রাচীন কুরুক্ষেত্রে সরকারী-শরণার্থী-শিবিরে আশ্রয় লইয়াছে। তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি, পিতৃপিতামহের স্মৃতিজড়িত জন্মভূমি কেমন করিয়া আবার তাঁহারা উদ্ধার করিবেন? তাঁহাদের অপমানিতা লাঞ্ছিতা জননী, জায়া ও কন্যার অমর্য্যাদার প্রতিকার করিবেন কিরূপে? এই কুরুক্ষেত্রে আশ্রয়প্রার্থীদের এক বিশেষ সম্মেলনে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু গত বৎসর বলিয়াছিলেন—"কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে দোষ দিলে কোনই ফল হইবে না। আমাদেরও হস্ত রক্তে রঞ্জিত এবং আমরা ইহার পুনরাবৃত্তি হইতে দিব না।" অপরপক্ষ যত অত্যাচার করুক, আমাদের হস্ত যেন রক্তে রঞ্জিত না হয়। এক পক্ষ যদি অন্যায় অধর্ম করে তাহা হইলে নিপীড়িতের দলকে কি তাহাই করিতে হইবে? ভাইয়ের বুকে ছুরি বসানো পাপ, অত্যাচারীরা যদি একথা না বুঝিয়া থাকে, তবে উদ্বাস্তগণ কি তাহা বুঝিয়াও ভ্রাতৃবিরোধে প্রবৃত্ত হইবে? হত্যা ও রক্তপাত করিয়া যে দেশ-উদ্ধার করা

হয়, তাহাতে সুখ কোথায় ? রক্ত-রঞ্জিত রাষ্ট্র-ভোগে লাভ কি ? গীতায় এ সকল প্রশ্নের আমরা কি সমাধান পাই ? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মোহগ্রস্ত অর্জুন ঠিক এই সকল যুক্তি দেখাইয়া যুদ্ধ করিতে বিমুখ হইয়াছিলেন—স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব। সেদিন দুইপক্ষের মধ্য-স্থলে দাঁড়াইয়া পরম ধার্মিক শ্রীকৃষ্ণ গীতার যে অমৃতময় উপদেশ দিয়া অবসন্ন অর্জুনকে বীরধর্মে সঞ্জীবিত করিয়া-ছিলেন—তাহাই অবলম্বন করিয়া এই প্রাচীন জাতি নূতন জন্ম, নূতন শক্তি লাভ করিবে এবং দ্বিখণ্ডিত দেশকে এক অখণ্ড মহাভারতে রূপান্তরিত করিবার অব্যর্থ সন্ধান পাইবে। গীতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া আবার ভারতবর্ষ তাহার প্রাচীন সমৃদ্ধ পার্থিব ও অধ্যাত্ম জীবনের পথে অগ্রসর হইবে—জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ অবলম্বন করিয়াই গীতার আরম্ভ। গীতাকার উপলক্ষ করিয়াছেন এই ঘটনা, কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য অধ্যাত্ম-জীবনের ভিত্তিতে পার্থিব মানব-জীবনের বিবিধ সমস্যার সমাধান, তৎকালপ্রচলিত বিবদমান দার্শনিক মতবাদের ও বিভিন্ন সাধন প্রণালীর সমন্বয়। বৈদান্তিক গ্রন্থ হিসাবে গীতার বৈশিষ্ট্য এই যে, গীতা পার্থিব জীবনের সমস্যাগুলিকে কোথাও উপেক্ষা করেন নাই। আমরা ক্রমশঃ গীতার সেই সকল কথা বুঝিবার চেষ্টা করিব। গীতা রহস্য বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে—এক ঐতিহাসিক মহাযুদ্ধই গীতার পটভূমি।

যুদ্ধ করিবার জন্য কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন, ব্যূহবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ অধিনায়কের আদেশের অপেক্ষা করিতেছেন। কুরুবৃদ্ধ পিতামহ শঙ্খ বাজাইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। সম্মিলীত ক্ষত্রবীরগণের তুমুল কোলাহলে রণভূমি শব্দিত, শত শত রণবাদ্য বাজিতেছে। এ যুদ্ধে অর্জুন পাণ্ডব সৈন্যের সর্বময় অধিনায়ক ; যুদ্ধক্ষেত্রের নক্সা, উভয় পক্ষের বলাবল, সৈন্য-গণের অবস্থান, যুদ্ধের ভাবী গতিবিধি বিশেষভাবে জানিয়াও তিনি প্রতিপক্ষের যোদ্ধৃগণকে একবার নূতন করিয়া দেখিবার জন্য উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে রথ স্থাপন করিলেন। অর্জুন আদর্শ ক্ষত্রবীর, এই যুদ্ধের পূর্বে অনেক যুদ্ধে অনেক শত্রুবধ তিনি করিয়াছেন। কিন্তু এতদিনের যুদ্ধায়োজন যখন কার্য্যে পরিণত হইয়া মহাযুদ্ধের আকার ধারণ করিল তখন অর্জুন এমন ব্যবহার করিলেন যাহা অতীব বিস্ময়কর। অর্জুন যুদ্ধ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প, ধনুর্বাণ তুলিয়াছেন—ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ; এমন অবস্থায় অসময়ে অকস্মাৎ তাঁহার অন্তরে এক অদ্ভুত পরিবর্তন উপস্থিত হইল, যাহার ফলে কৌরবগণ প্রদত্ত নিরবচ্ছিন্ন বঞ্চনা ও অত্যাচারের কাহিনী তিনি ভুলিয়া গেলেন। শোকে মোহে সন্দেহে অভিভূত হইয়া অর্জুন এই সংসারকে অসার বোধ করিলেন। যুদ্ধ করিতে বিমুখ অর্জুন কর্মত্যাগ সংসারত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে চাহিলেন—শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ-লোকে।

অর্জুন দেখিলেন প্রতিপক্ষে শত্রু কেহই নাই—সকলেই 'স্বজন'। এই যুদ্ধের ফলে স্বজনগণকে হারাইয়া তাঁহার জীবন কিরূপ দুঃখময় হইয়া উঠিবে তাহা ভাবিয়া অর্জুনের হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। সেই অতি ভয়াবহ আসন্ন সংগ্রাম-স্থলে প্রিয়জনকে যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থিত দেখিয়া কৃপায় আবিষ্ট অর্জুন বিষাদগ্রস্ত হৃদয়ে এই কথা বলিলেন—যুদ্ধে স্বজন বধ করিয়া আমি কোন মঙ্গল দেখিতেছি না—ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে। কৌরবেরা যদি আমাকে হত্যা করে তথাপি তাহাদিগকে হত্যা করিতে আমি ইচ্ছা করি না—এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন। লোভে হতবুদ্ধি হইয়া ইহারা কুলক্ষয়ের দোষ ও মিত্রদ্রোহের পাপ দেখিতে পাইতেছে না ; কুলক্ষয়ের ভয়াবহ পরিণাম জানিয়াও কেন আমরা এই ঘৃণিত কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইব না ?

> যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
> কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥
> কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
> কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন॥

অর্জুনের সকল যুক্তি কুরুকুলের মঙ্গল চিন্তা করিয়া প্রযুক্ত ; সমগ্র ভারতের ভবিষ্যৎ তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। ভারতের সামাজিক দেহ ও রাষ্ট্রজীবন গ্লানিগ্রস্ত, অধর্মে দেশ ভরিয়া গিয়াছে। স্বৈরাচারী দুর্যোধনের কুশাসনে ক্লিষ্ট জনগণ আর্তনাদ করিতেছে। রাজনীতিবিদ্ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য—কুরু, পাঞ্চাল, কোশল, মগধ প্রভৃতি বিবদমান রাষ্ট্রগুলিকে ঐক্যের বন্ধনে আনিয়া এক মহারাষ্ট্র গঠন, নানাভাবে বিভক্ত-ভারতবর্ষকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এক ধর্মরাজ্য

স্থাপন। কুরুপাণ্ডবের গৃহবিবাদ অবলম্বন করিয়া যে আগুন জ্বলিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন ইহাই মহাভারত গঠনের উপযুক্ত সময়। এ গৃহবিবাদ যাহাতে আপোষে মিটিয়া যায় সে চেষ্টা অবশ্য তিনি করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি জানিতেন সন্ধির কোন সম্ভাবনা নাই এবং সন্ধি স্থাপিত হইলেও তাহা স্থায়ী হইবে না, কোন ছল আশ্রয় করিয়া আগুন আবার জ্বলিয়া উঠিবে। সব ভাঙিয়া চুরিয়া এক রাজ্য গঠন পরিকল্পনায় রথীন্দ্র অর্জ্জুনই শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বাচিত সহচর, তাই যখন দেখিলেন অর্জুন কৃপায় আবিষ্ট, বিষাদ তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ তীব্র ভাষায় বলিলেন—

> কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্
> অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥
> ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎত্বয্যুপপদ্যতে।
> ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥

এ সঙ্কট সময়ে এই মোহ কেন তোমায় আক্রমণ করিল? যাহারা অনার্য্য, যাহারা স্বর্গ কামনা করে না, কীর্তিমান হইতে যাহাদের ইচ্ছা নাই, তাহারাই এপ্রকার মোহে আচ্ছন্ন হয়, এরূপ কাপুরুষোচিত সংগ্রামবিমুখতার পরিচয় দেয়। তুমি আর্য্য, স্বর্গকামী, কীর্তিমান—এ মোহ তোমাতে নিতান্তই অশোভন। ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ কর—ত্বং উত্তিষ্ঠ। বীর তুমি, বীরের মত যুদ্ধ কর, বীরের মত জয়লাভ কর, অথবা বীরের মত মৃত্যু বরণ কর।

শ্রীকৃষ্ণের এই সকল বাক্য শ্রবণে অর্জ্জুনের অবসন্ন হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। ইতিপূর্বে যুদ্ধ না করার কারণ হিসাবে তিনি স্বজনবান্ধব হত্যার আশঙ্কা ও কুলধর্মনাশের কথাই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিরস্কৃত হইয়া অর্জুনের অন্তরে কিছু পরিবর্তন ঘটিল, সাধারণভাবে আত্মীয়স্বজন বিনাশের কথা ছাড়িয়া পূজনীয় মহানুভব ভীষ্ম-দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করা অর্জুনের অসম্ভব বলিয়া মনে হইল এবং বিশেষ করিয়া মনে হইল বর্তমান সঙ্কটে তাঁহার বুদ্ধির দীনতা।

> ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
> যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েযুঃ।

আমরা জয়লাভ করি বা কৌরবেরা আমাদিগকে পরাজিত করে, এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টা যে ভাল তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

বুদ্ধিমান অর্জুনের এই প্রথম নিজ বুদ্ধির উপর অনাস্থা জন্মিল। জীবনে বার বার প্রতারিত হইলেও স্বীয় বুদ্ধির আশ্রয় মানুষ সহজে ত্যাগ করিতে পারে না, সামান্য কারণে কেহ নিজের জীবনের গতি সহসা পরিবর্তন করিতে যায় না। ভাব বৈলক্ষণ্য দেখিয়া মনে হয়, অর্জুনের পক্ষে আজিকার শোকের কারণ অতীব গুরুতর, তাঁহার অন্তরতম প্রদেশে বিপর্য্যয়কর ঝড় উঠিয়াছে, যাহার ফলে তিনি দাঁড়াইবার শক্তি হারাইয়াছেন, তাঁহার বজ্রমুষ্টি শিথিল হইয়াছে। যে সকল আদর্শ অনুসরণ করিয়া এতদিন তিনি কর্তব্যাকর্তব্য, ধর্মাধর্ম নির্দ্ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন আজ তাহা সহসা বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। অর্জুনের মনে হইল—যে বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া এতদিন তিনি জীবন পথে চলিয়াছেন, সে বুদ্ধির উপর এ দুঃসময়ে আর নির্ভর করা চলে না। তাই যিনি 'উত্তিষ্ঠ' বলিয়া ভরসা দিয়াছেন বিপন্ন অর্জুন এইবার তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া বলিলেন :—

> কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
> পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
> যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
> শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥

স্বার্থপর হৃদয়ের দীনতাবশে আমি ক্ষত্রিয় স্বভাব হইতে বিচ্যুত হইয়াছি, কি ধর্ম কি অধর্ম তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ কি তাহাই আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল; আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত, আমাকে শিক্ষা দাও।

এতদিনের সখা ও সারথিকে গুরুরূপে বরণ করিয়া অর্জুন আপনাকে তাঁহার হাতে একান্তভাবে সমর্পণ করিলেন। কর্তব্যবিমুখ পুত্রের কর্মচঞ্চলতা দেখিলে পিতার যেমন আনন্দ হয়, অর্জুনের আচরণে শ্রীকৃষ্ণের তেমনি আনন্দ হইল। অন্তরের আনন্দ গোপন করিলেও তাহার আভাস বাহিরে ফুটিয়া উঠিল, দেখা গেল যেন শ্রীকৃষ্ণ হাসিতেছেন—প্রহসন্নিব। হাসিমুখে শ্রীকৃষ্ণ গীতার উপদেশ আরম্ভ করিলেন।

যুদ্ধ না করার পক্ষে অর্জুন এ পর্য্যন্ত যত যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহাতে তিনি ধরিয়া লইয়াছেন মরণই জীবনের শেষ সীমা। আজ যাঁহারা আছেন যুদ্ধের ফলে তাঁহারা থাকিবেন না—এই কল্পনাই অর্জুনের শোকের

কারণ। আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু চিন্তাতে অভিভূত হইয়া তিনি গভীর শোকে নিমগ্ন ; শুধু তাই নয় অর্জুনকে যে সেই মৃত্যুর কারণ হইতে হইবে সে মানসিক যন্ত্রণাও দুর্বহ। মৃত্যু সম্বন্ধে অর্জুনের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য শ্রীভগবান তাঁহার উপদেশের আরম্ভেই মৃত্যুর স্বরূপ কি, আত্মার স্বরূপ কি তাহা বিশ্লেষণ করিলেন। মৃত্যু সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকাও প্রত্যেক মানুষের একান্ত প্রয়োজন—কারণ মরণান্ত-প্রসারী জীবনে পূর্ণ উৎসাহ আসিতে পারে না, মৃত্যুভয়ে ভীত মানুষ ব্যবহারিক জীবনের সম্যক পরিপুষ্টির সুযোগ অবহেলা করে। তারপর যতদিন না মানুষ মরণের ভয় হইতে মুক্ত হইয়া আপনার স্বাভাবিক অনন্ততা বোধ করে ততদিন তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের আরম্ভই হয় না। সেজন্য শ্রীভগবান গীতাতত্ত্বের প্রথমেই মৃত্যু প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করিয়াছেন। মরণ নাই, বিচ্ছেদ নাই—মানুষ তাহার মূলসত্তায় অমর, অবিনাশী, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাগ্রে এই কথাটী অর্জুনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন।

শ্রীভগবান বলিলেন—অর্জুন, তোমার ও আমার বহুবার জন্ম হইয়া গিয়াছে, সে সকল কথা আমি জানি, কিন্তু তুমি জান না। কত দেহ গ্রহণ করিয়া কতবার তুমি এই সংসারে আসিয়াছ—পিতারূপে, পুত্ররূপে, সখারূপে। মানুষ মরিতেছে আবার জন্মগ্রহণ করিতেছে—এইরূপে জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়া যাইয়া অমৃতত্ব লাভের যোগ্য হইয়া উঠিতেছে। আত্মবিকাশের পথে অগ্রসর হইবার জন্য জন্মে জন্মে মানুষ সুযোগ পাইতেছে। মৃত্যুতে বিনষ্ট হয় জড় দেহপিণ্ড, দেহের যিনি অধিষ্ঠাতা এবং যাহা মানুষের প্রকৃত সত্তা তাহার বিনাশ নাই। দেহের মৃত্যুতে কাহারও আত্মার ধ্বংস হয় না, এমন কি তাহার প্রকৃতি, তাহার প্রাণ মনের সংস্কারেরও ধ্বংস হয় না। বায়ু যেমন পুষ্প হইতে গন্ধ কণা (বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ) লইয়া যায়, দেহত্যাগের সময় দেহীও সেইরূপ জীবের স্বভাব সংস্কার লইয়া চলিয়া যায়। জন্মমরণ হয় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পঞ্চভূতাত্মক স্থূল দেহের—কিন্তু যাঁহার এই দেহ, যিনি এই অদ্ভুত দেহযন্ত্রকে ব্যবহার করেন সেই আত্মা অবিনাশী-অজ-শাশ্বত-পুরাণ। আত্মা এরূপ বস্তু নহে যে উৎপন্ন হইয়া লোপ পাইয়া আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না।

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
> নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

ভীষ্ম তোমার পিতামহ, কোলে পিঠে করিয়া কত উপদেশ দিয়া তিনি তোমাকে মানুষ করিয়াছেন ; দ্রোণ তোমার আচার্য্য, ছাত্রাবস্থায় কতদিন হাতে ধরিয়া তিনি তোমাকে অস্ত্রকৌশল শিখাইয়াছেন। তুমি ভাবিতেছ কেমন করিয়া গুরুজনের দেহে অস্ত্রাঘাত করিয়া তাঁহাদিগকে হত্যা করিবে। হে রথীন্দ্র, তুমি সর্বাগ্রে একথা জানিয়া রাখ—তোমাদের প্রাচীন কুরুবংশের সুবৃহৎ অস্ত্রাগারে এমন কোন মারণাস্ত্র নাই বা তোমার অস্ত্রগুরু এমন কোন কৌশল তোমাকে শিখান নাই যাহা দিয়া তুমি ইঁহাদের সত্যস্বরূপ যে আত্মা তাহার বিনাশ করিতে পার। অস্ত্রের আঘাত আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জলে ইহা সিক্ত হয় না, বায়ুও ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। জীর্ণ বসন ত্যাগ করিয়া মানুষ যেমন নিজ প্রয়োজনে নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, দেহের যিনি অধিষ্ঠাতা তিনি তাঁহার অসংখ্য জীবনে, ঊর্দ্ধগতির অনন্ত যাত্রাপথে কত অকর্ম্মণ্য দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন ও কত নবীন দেহ আশ্রয় করিয়াছেন। যিনি দেহীকে জন্মরহিত ও অব্যয় বলিয়া বুঝিতে পারেন তিনি কাহাকে হত্যা করিবেন ? যদি তুমি আত্মার এই নিত্য সর্ব্বব্যাপী স্থাণু এবং সনাতন রূপ জানিতে পার তাহা হইলে কাহারও জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়।

> দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
> তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥

স্বজন-বান্ধবের মৃত্যু-সম্ভাবনায় কাতর হইয়া অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে বিমুখ হইয়াছিলেন। এই বিষয়ে অর্জ্জুনের ভ্রান্তি দূর করিবার জন্যই পূর্ব্বোক্ত উপদেশ। উপদেশের প্রধান কথা এই যে যুদ্ধে দেহের বিনাশ হইতে পারে কিন্তু যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া দেহের ও প্রাণমনের বিকাশ হয় সেই আত্মার মৃত্যু নাই। দেহ বিনাশপ্রাপ্ত হইলেও শোক করিবার কিছু নাই কারণ এদেহের অবসানে আত্মা নিজ প্রয়োজনে আর একটী দেহ গ্রহণ করিবে ; সুতরাং যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার কোন কারণ নাই।

সমস্যাটীকে অর্জ্জুনের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিবার জন্য শ্রীভগবান বলিলেন—যদি তুমি মনে কর আত্মা অবিনাশী নহে, আত্মা দেহের সহিত জন্মগ্রহণ করে ও দেহের সহিত মরিয়া যায় এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হয় তাহা হইলেও কাহারো মৃত্যুতে শোক করা উচিত নয়।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥

জন্মের অপরিহার্য্য পরিণাম যখন মৃত্যু, জন্মিলেই মরিতে হইবে—এই যখন প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম, তখন সেই অনিবার্য্য পরিণতির জন্য কেন তুমি শোক কর? আরও দেখ, প্রাণীমাত্রেরই আদিও অব্যক্ত, অন্তও অব্যক্ত, শুধু মাঝখানে সাময়িক অস্তিত্ব। যে বস্তুর পূর্বাবস্থা কিছু জানা নাই, মৃত্যুর পরেও যে কি হয় তাহাও জানা যায় না, আজ শুধু আছে এইমাত্র জানি, তা যদি আজ নাই থাকে, তাহাতেই বা এত শোকের কারণ কোথায়?

অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, তাঁহার প্রকৃতি কর্মপ্রবণ। শ্রীকৃষ্ণ কখনও এরূপ মনে করেন নাই যে আত্মস্বরূপের বর্ণনা শুনিয়া অর্জ্জুন নিমেষমধ্যে আত্মজ্ঞানী হইয়া উঠিবেন। যে দেহাত্মবিবেক সাধক-জীবনের চরম পরিণতি সেই আশ্চর্য্য পরমতত্ত্বের কথা সর্ব্বপ্রথমে বলিবার কারণ—শিষ্যের হৃদয়ে আদর্শলাভের ব্যাকুলতা দৃঢ়তর করা। অর্জ্জুনের বর্তমান সংশয়াকুল অবস্থা লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাই স্পষ্ট বলিয়া দিলেন :—

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন—
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥

এক অবিনশ্বর আত্মা নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। দেহের জন্মমৃত্যু সেই সর্ব্বব্যাপী ভাগবত-সত্তাকে স্পর্শ করিতে পারে না। মানুষের মন এই মহান সত্তাকে ধারণা করিতে পারে না। কেহ কেহ এই অত্যাশ্চর্য্য সত্তার ইঙ্গিত পায় কিন্তু তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিতে পারে না। শুধু বর্ণনা শুনিয়াও সেই বিরাট সত্তার কথা বুঝা যায় না।

কর্মবীর অর্জ্জুনের ব্যবহারিক বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের মর্ম ধরিতে পারিল না। আত্মারস্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত উপদেশ শুনিয়াও অর্জ্জুনের সংশয় গেল না, তিনি নীরব হইয়া রহিলেন। গুরুজনের দেহনাশের কারণই বা অর্জ্জুন কেন হইবেন? সেজন্য অর্জ্জুনের যে বিষাদ তাহা দূর করিবার জন্য শ্রীভগবান কি করিলেন? তাই সর্ব্বশেষে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়টীকে কঠোর বাস্তব জীবনের দিক দিয়া, সামাজিক নীতির দিক দিয়া বিচার করিবার জন্য বলিলেন :—

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥

ক্ষত্রিয় তুমি, ক্ষত্রিয় জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, প্রকৃত সুখ কি তাহা ভুলিও না। ক্ষত্রিয় জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ধর্মের জন্য যুদ্ধ করা, নিজের ও পরিবারবর্গের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ করিয়া কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া অথবা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বীরোচিত গৌরবের সহিত জীবন যাপন করা। দুষ্টজনকে দমন করিয়া দেশে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন, সমাজপালন, লোক-রক্ষা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, আর্তত্রাণই ক্ষত্রিয়ের মহাব্রত। মহাভারতের সমাজ-দেহ, রাষ্ট্রজীবন দুষ্টক্ষতে পুঞ্জীভূত বিষাক্ত আবর্জনায় পচিয়া উঠিয়াছে। স্বাধিকার-প্রমত্ত দুর্য্যোধন ও তাহার সহকর্মিগণ পাণ্ডবদিগের ও প্রজাসাধারণের উপর যে অত্যাচার করিয়াছে তাহা স্মরণ কর। শান্তিপূর্ণ অহিংস উপায়ে সম্মানজনক আপোষ মীমাংসা যখন ব্যর্থ হইল তখনি তুমি বাধ্য হইয়া সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত। সম্পূর্ণ মোহমুক্ত মন লইয়া ভারতবর্ষের গণস্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর্তব্যাকর্তব্যের সমাধান কর। এ হেন সঙ্কট সময়ে ধর্মপক্ষ পরিত্যাগ করা, ভগবদ্ নির্দ্দিষ্ট কর্ম পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের অনুমোদিত পথ নহে। নরহত্যার ভয়ে ভীত হইয়া যুদ্ধ করিতে বিরত হইলে অধর্মকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, ক্ষাত্রধর্ম হইতে তুমি পতিত হইবে। এমন ধর্ম্ম-যুদ্ধের সুযোগ পাইলে ক্ষত্রিয়ের সুখী হইবারই কথা—সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্। নিজের

সুখদুঃখ লাভক্ষতি সমান জ্ঞান করিয়া কর্তব্যবোধে যুদ্ধ কর, ইহার ফলাফল কি হইবে সেজন্য চিন্তিত হইও না। লোক স্থিতির জন্য, রাজ্যের সমৃদ্ধির জন্য ধ্বংস যদি প্রয়োজন হয় তবে তাহাই কর, তাহাতে পাপ নাই।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈব পাপমবাপ্স্যসি॥

পণ্ডিতের মত বড় বড় কথা বলিয়া ভীষ্ম দ্রোণের জন্য কত কাঁদিলে, বলিলে কেমন করিয়া তাঁহাদের দেহে অস্ত্রাঘাত করিবে। ভীষ্ম তোমার পিতামহ, দ্রোণ তোমার আচার্য্য, কিন্তু আজ তাহারা প্রবল রাজার আশ্রিত, অত্যাচারী দুর্যোধনের অন্নদাস। দুর্যোধনের কুশাসনে দলিত তোমাদের অনুগামী দীন দুঃখী প্রজার জন্য, মূক সর্ব্বহারা কাঙালের জন্য, অসহায় দুর্ব্বলের জন্য তোমার চক্ষে জল নাই কেন? সেই দুষ্ট দুর্যোধনের হাতে রাজ্য তুলিয়া দিয়া তুমি ভিক্ষা করিতে অভিলাষী হইলে? রাজার ছেলে ভিক্ষা করিতে যাইও না, উহা পরধর্ম। যাহারা তোমার মুখ চাহিয়া দুর্যোধনের উৎপীড়নে চোখের জল ফেলিতেছে তাহাদের কথা ভাবিয়া স্বধর্ম পালন কর। অসহায়া কৃষ্ণার নির্বাক হৃদয়ের মর্মচ্ছেদী হাহাকার কেমন করিয়া আজ ভুলিয়া গেলে? তোমার কি মনে নাই প্রকাশ্য রাজদরবারে যেদিন দুর্বৃত্ত দুঃশাসন পাঞ্চালীকে ঘৃণ্যতমভাবে লাঞ্ছনা করিল, সে কুরুসভায় ভীষ্ম দ্রোণও উপস্থিত ছিলেন! তোমার ব্রহ্মচারী পিতামহ, অস্ত্রগুরু দ্রোণ তাঁহাদের কন্যাসম পাঞ্চালীর উপর পাশবিক অত্যাচার দেখিয়াও দেখেন নাই, কোন প্রতিবাদ করেন নাই, মহাপাপের অবাধ গতিতে বাধা দেন নাই, ভালমানুষ সাজিয়া উদাসীন রহিলেন। রাজবধূর গায়ে হাত দিবার সাহস দুর্যোধনের একদিনে হয় নাই, অনেক কাঙাল গরীবের উপর নির্ব্বিবাদে অত্যাচার করিয়া তবে দুর্মতির এই চরম দুঃসাহস জন্মিয়াছে। অর্জ্জুন, স্বয়ম্বর সভায় পরীক্ষা দিয়া তুমিই দ্রুপদতনয়াকে গৃহে আনিয়াছিলে, রাজনন্দিনীর মর্য্যাদা আজ তোমাকেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। মহাপাপে যাহারা পরোক্ষভাবে লিপ্ত, মহিয়সী নারীকে বিবস্ত্রা করিবার হীন ষড়যন্ত্রে যাহারা নির্লিপ্ত সাক্ষী, আজ তাহাদের ক্ষমা করিও না। এ মহাপাপের ক্ষমা নাই—ইহাই আমার পক্ষপাতশূন্য অমোঘ বিধান। গলিত আবর্জ্জনায় নিমজ্জিত, অধর্মে জর্জরিত ভারতবর্ষকে ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িবার জন্য মহাকালরূপে আমি কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছি—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

প্রতিপক্ষ সৈন্যদলে যে সকল যোদ্ধা দেখিতেছ তাহারা সেই দিনই আমার বিধানে মৃত্যু বরণ করিয়াছে, যেদিন নিষ্ঠুর দুঃশাসন দুর্যোধনের ইঙ্গিতে রাজমহিষী যাজ্ঞসেনীকে অপমান করিয়াছে—ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব। অর্জ্জুন, তুমি আমার ভক্ত সখা ইষ্ট, তুমি আমাকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছ, যাহা আমি নীতিগত আদর্শ হিসাবে করণীয় স্থির করিয়া ইতিপূর্বে করিয়া রাখিয়াছি—ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহা তুমি কার্য্যে পরিণত কর। ভীষ্ম দ্রোণ জয়দ্রথ কর্ণ এবং অন্যান্য যোদ্ধাকে রাষ্ট্রের অন্যায় ও পাপ সমর্থনের জন্য আমি পূর্ব্বেই মৃত্যুদণ্ডেদণ্ডিত করিয়াছি, সেই মৃত্যুদণ্ডেদণ্ডিত গণকে তুমি বধ কর, ব্যথিত হইও না, যুদ্ধ কর—যুদ্ধে শত্রুদিগকে নিশ্চয় তুমি জয় করিতে পারিবে। তুমি না মারিলে আমার ইচ্ছায় অন্যকেহ নিমিত্ত হইয়া তাহাদিগকে মারিবে। তাহাদিগকে এই যুদ্ধে মরিতেই হইবে কারণ যে পাপ তাহারা করিয়াছে ধ্বংসই তাহার স্বাভাবিক পরিণতি—ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে, যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ। হে রথীন্দ্র, ক্ষত্রিয়ের স্বধর্মপালনে অগ্রসর হও, দুর্জনের উৎপীড়ন হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা কর, অত্যাচারীকে বিধ্বস্ত কর, ধর্মের গ্লানি দূর কর, অখণ্ড মহাভারতে এক ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কর—ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।

মানবোচিত ধর্ম্মের প্রতি বাসুদেবের এই আবেদন ব্যর্থ হয় নাই। অর্জ্জুন প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—

নষ্ট মোহ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়াচ্যুত
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহ করিষ্যে বচনং তব।

হে অচ্যুত, তোমার কৃপায় আমি মোহমুক্ত হইলাম, স্মৃতিলাভ করিলাম। আমার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, আমি প্রকৃতিস্থ হইয়াছি। তুমি যাহা বলিলে তাহা আমি করিব।
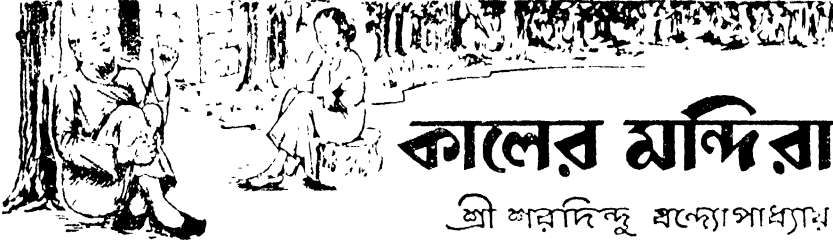
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অশ্বচোর চিত্রক যে বনের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়, প্রায় ছয় ক্রোশ ভূমির উপর প্রসারিত। বড় বড় গাছ ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া ঊর্ধ্বে মাথা তুলিয়াছে, তাহাদের শাখায় শাখায় জড়াজড়ি, নিম্নে রবিকরবিদ্ধ ছায়ান্ধকার। বনভূমি সর্বত্র সমতল নয়, স্থানে স্থানে উচ্চ হইয়া রুক্ষ উপলাকীর্ণ অঙ্গ প্রকট করিতেছে। কোথাও তরু পরিবেষ্টিত শষ্পাচ্ছাদিত উন্মুক্ত স্থান; কোথাও বা কঠিন রসহীন মৃত্তিকার উপর শুষ্ক কণ্টক গুল্ম। ক্বচিৎ দুই একটি ক্ষীণ ধারা প্রস্রবণ। এই বনে মৃগ শূকর শশক ময়ূর নানাবিধ শিকার আছে। প্রধান নগরীর উপকণ্ঠে রাজন্যবর্গের মৃগয়ার জন্য এইরূপ ক্রীড়া কানন সযত্নে রক্ষা করিবার রীতি ছিল।

এই বনের মধ্যে প্রায় তিন ক্রোশ পথ তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটাইবার পর চিত্রক বল্গার ইঙ্গিতে অশ্বের গতি হ্রাস করিল। বহুদিন চিত্রক ঘোড়ায় চড়ে নাই, তাই ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া বায়ুর খর প্রবাহে তাহার রক্তে গতির হর্ষোন্মাদনা জাগিয়াছিল। সে সহসা মস্তক উৎক্ষিপ্ত করিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু পরক্ষণেই সে থামিয়া গেল; দূর হইতে যেন মনুষ্য কণ্ঠের আহ্বান আসিল। অশ্ব একটি নিষ্পাদপ মুক্ত স্থানের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছিল, চকিতে তাহার গতি রোধ করিয়া চিত্রক চারিদিকে চাহিল। দেখিল, মুক্ত ভূমির কিনারায় এক বৃহৎ মধুক বৃক্ষতলে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পাশে একটি ঘোটক।

এতক্ষণ এই বনে একটি মানুষের সঙ্গেও চিত্রকের সাক্ষাৎ হয় নাই, সে সন্দিগ্ধচক্ষে এই ব্যক্তিকে নিরীক্ষণ করিল। দূর হইতে ভাল দেখা গেল না, তবু বেশভূষা হইতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। চিত্রক চক্ষুর উপর হস্তাচ্ছাদন দিয়া ভাল করিয়া দেখিল, লোকটি যেই হোক সে একাকী, কাছাকাছি অন্য কেহ নাই। তথাপি চিত্রক ইতস্ততঃ করিল; ভাবিল, পলায়ন করি। কিন্তু ঐ ব্যক্তির সঙ্গেও অশ্ব রহিয়াছে, পলাইলে পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারে। এরূপক্ষেত্রে কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া চিত্রক ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া রহিল।

এইবার অন্য ব্যক্তি অশ্বের বল্গা ধরিয়া তরু মূল হইতে বাহির হইয়া আসিল। তখন চিত্রক দেখিল, অশ্বটি খঞ্জ, তিন পায়ে ভর দিয়া খোঁড়াইয়া চলিতেছে।

ব্যাপার বুঝিয়া চিত্রক অগ্রসর হইয়া গেল। অন্য ব্যক্তি তাহাকে আসিতে দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, মধুকবৃক্ষের নিকটে উভয়ে মুখোমুখি হইল। কিছুক্ষণ দুইজনে পরস্পর পর্যবেক্ষণ করিল।

চিত্রক দেখিল লোকটির দেহ মেদ-সুকুমার, মুখমণ্ডল গোলাকৃতি, চক্ষুও তদ্রূপ। এক যোড়া সুপুষ্ট গুম্ফ মুখের শোভা বর্ধন করিতেছে বটে, কিন্তু গুম্ফের সুচারু প্রসাধন আর নাই, নানা দুর্যোগের মধ্যে পড়িয়া বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে। মস্তকে রক্তবর্ণ উষ্ণীষ, পরিধানে হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র ও অঙ্গাবরণ; উত্তরীয়টি তুম্বের ন্যায় উদর বেষ্টন করিয়া পাশে গ্রন্থিবদ্ধ। কটি হইতে একটি বৃহৎ তরবারি ঝুলিতেছে।

অপরপক্ষে সে ব্যক্তি দেখিল, মহামূল্য সজ্জায় অলঙ্কৃত একটি তেজস্বী অশ্ব, তাহার পৃষ্ঠে বসিয়া আছে এক দীনবেশী সৈনিক। অশ্ব ও অশ্বারোহীর বেশভূষা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহার ধারণা জন্মিল, অশ্বটি কোনও ধনীব্যক্তির সম্পত্তি এবং আরোহী এই অশ্বের রক্ষক।

সে বলিল,—'বাপু, বলিতে পার তোমাদের এই বন্য দেশে কোথাও লোকালয় আছে কি না?'

চিত্রক বুঝিল লোকটি তাহারই মত এদেশে নবাগত। সে নিশ্চিন্ত হইয়া বলিল,—'তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?'

লোকটি ঈষৎ রুষ্ট হইল। এই কিঙ্করটা তাহার সহিত সমকক্ষের মত কথা বলে! এ দেশের লোকগুলা কি একেবারেই গ্রাম্য, সম্মানার্হ বিশিষ্ট পুরুষ দেখিলে চিনিতে পারে না? সে গুম্ফ ফুলাইয়া বলিল—'কোথা হইতে আসিতেছি সে সংবাদে তোমার প্রয়োজন নাই। এই বন্য রাজ্যে প্রবেশ করিয়া অবধি কেবল পাহাড় পর্বতে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; মানুষগুলাও এমন অসভ্য যে মাগধী অবহট্‌ঠ ভাষা পর্যন্ত ভাল করিয়া বুঝে না। সাতদিন ধরিয়া অত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এখনও রাজধানী কপোতকূটে পৌঁছিতে পারিলাম না। কাল রাত্রে একগ্রামে গৃহস্থের কুটীরে আশ্রয় লইয়াছিলাম; প্রাতে উঠিয়া দাসীপুত্রটা কপোতকূটের সিধা পথ দেখাইয়া দিল। সেই অবধি পাঁচটা পাহাড় পার হইয়াছি, কিন্তু এখনও কপোতকূটের দেখা নাই। তারপর গণ্ডের উপর পিণ্ড, এই বনে প্রবেশ করিয়া ঘোড়াটা এক গর্তে পা দিল—' লোকটি সশব্দ নিশ্বাস ত্যাগ করিল,—'ঘোড়ার পা ভাঙিয়াছে, সমস্তদিন পেটে অন্ন নাই; যদি গুরুতর রাজকার্য না থাকিত কোন্ কালে এই দেববর্জিত দেশ ছাড়িয়া যাইতাম।'

চিত্রক প্রশ্ন করিল,—'তুমি কপোতকূটে যাইতে চাও? রাজকার্যে?'

লোকটি গম্ভীর ভাবে বলিল,—'হাঁ, গুরুতর রাজকার্যে। আমার নাম শশিশেখর শর্মা, মগধের রাজ-বয়স্য আমার—, কিন্তু সে যাক। কপোতকূট কি এখান হইতে অনেকদূর?'

পাঠক বুঝিয়াছেন, শশিশেখর শর্মা আর কেহ নয়, বিদূষক পিপ্পলী মিশ্রের ব্রাহ্মণীর ভ্রাতুষ্পুত্র। তাহার প্রশ্নের উত্তরে চিত্রক বলিল,—'কপোতকূট অনেকদূর, আজ রাত্রে পৌঁছিতে পারিবে না। ঘোড়া থাকিলে পৌঁছিতে পারিতে।'

মগধের রাজদূত চিত্রকের ঘোড়ার পানে লুব্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিতেছিল, বলিল,—'এটি কি তোমার ঘোড়া?'

'হাঁ।'

শশিশেখর পুরা বিশ্বাস করিল না, কিন্তু অবিশ্বাস করিয়াও কোনও লাভ নাই। সে উৎসুক স্বরে বলিল,—'তোমার ঘোড়া বিক্রয় করিবে?'

চিত্রক কুঞ্চিত নেত্রে তাহার পানে চাহিল,—'কত মূল্য দিবে?'

শশিশেখর অশ্বের প্রতি তাকাইয়া গুম্ফের একপ্রান্ত অঙ্গুলি দ্বারা আকর্ষণ করিতে করিতে বিবেচনা করিল, তারপর বলিল,—'সসজ্জ অশ্বের জন্য পাঁচ কার্ষাপণ দিব।'

চিত্রক ভাবিল, পরের দ্রব্য পরকে বিক্রয় করিয়া যদি পাঁচ কার্ষাপণ পাওয়া যায় মন্দ কি? অপহৃত অশ্ব নিজের কাছে রাখা নিরাপদ নয়, ধরা পড়িবার ভয় আছে। কিন্তু চিত্রক দেখিল, রাজদূত মহাশয়ের প্রয়োজনের গুরুত্ব বড় বেশী; প্রয়োজনের অনুপাতে পণদ্রব্যের মূল্য হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। চিত্রক অবজ্ঞা ভরে হাসিয়া বলিল,—'কার্ষাপণ! এই অশ্বের সজ্জার মূল্যই পাঁচ দীনার। তোমাদের মগধ দেশে সম্ভবত তোমরা গর্দভে আরোহণ করিয়া থাক, তাই অশ্বের মূল্য জাননা।' বলিয়া অশ্বের মুখ ফিরাইয়া প্রস্থানোদ্যত হইল।

শশিশেখর মনে মনে বড়ই ক্রুদ্ধ হইল; কিন্তু এদিকে অশ্বারোহী চলিয়া যায়। শশিশেখর ক্রোধ গলাধঃকরণ করিয়া ডাকিল,—'শুন শুন।—তুমি আমার অসহায় অবস্থা দেখিয়া অনুচিত মূল্য দাবী করিতেছ। পাটলিপুত্রে এরূপ করিলে দুই শত পণ দণ্ড দিতে হইত। কিন্তু এই অসভ্য বন্য দেশে—, যাক, পাঁচ দীনারই দিব।'

চিত্রক ফিরিয়া বলিল,—'পাঁচ দীনার তো সজ্জার মূল্য। অশ্বটি কি বিনা শুল্কে চাও?'

শশিখের বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল। সে অর্থ সম্বন্ধে বিলক্ষণ হিসাবী, অকারণে অর্থ-ব্যয় করিতে তাহার বড়ই অরুচি। অথচ এই অর্থগৃধ্নু রাক্ষসটা সুবিধা পাইয়া তাহার রক্ত শোষণ করিতে চায়। সে অস্থির হইয়া বলিল,—'আবার অশ্বের মূল্য। পাঁচটি দীনারেও যথেষ্ট হইল না? এটা কি দস্যুর রাজ্য?'

চিত্রক হাসিল,—'দস্যুর রাজ্যই বটে।—ভাবিয়া দেখ অশ্বের জন্য আরও পাঁচটি দীনার দিতে পারিবে? না পার—চলিলাম।'

আবার অশ্বারোহী চলিয়া যায়। তখন শশিশেখর বিষণ্ণ স্বরে বলিল,—'আমি—আমি ছয়টি দীনার এবং এই অশ্বটি তোমাকে দিব, পরিবর্তে তোমার ঘোড়া আমাকে দাও। ইহার অধিক আর আমি দিতে পারিব না।'

'তোমার অশ্ব লইয়া আমি কি করিব ? মৃত গর্দভের মূল্য কি ?'

'মৃত গর্দভ ! উহার সামান্য আঘাত লাগিয়াছে মাত্র, দুই দিনেই সারিয়া যাইবে। তখন উহাকে অনেক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবে।'

চিত্রক দেখিল, মগধের দূত আর বেশী উঠিবে না। তাহার ঘোড়াটি নিতান্ত মন্দ নয়, পায়ের আঘাত অল্প শুশ্রূষাতেই আরোগ্য হইবে। চিত্রকের একটি ঘোড়া থাকিলে ভাল হয়, যোদ্ধার অশ্বই সম্পদ। সে সম্মত হইল।

তখন শশিশেখর কটি হইতে উত্তরীয় খুলিয়া তদভ্যন্তর হইতে একটি থলি বাহির করিল। থলিটি বেশ পরিপুষ্ট। শশিশেখর সঞ্চয়ী ব্যক্তি, বিদেশ যাত্রার পূর্বে নানাবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু এই থলিতে ভরিয়া লইয়াছিল। রাজকোষ হইতে প্রাপ্ত স্বর্ণরৌপ্য তো ছিলই, উপরন্তু কড়ি ছিল, প্রসাধনের জন্য চন্দন তিলক ছিল, কঙ্কতিকা ছিল, মুখ-শুদ্ধির জন্য এলাচ লবঙ্গ হরীতকী ছিল—আরও কত কি ! আড় চক্ষে চিত্রকের পানে চাহিয়া শশিশেখর থলির মুখ খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

থলি হইতে দীনার বাহির করিতে গিয়া অসাবধানে কয়েকটি শলাকার ন্যায় ক্ষুদ্র বস্তু মাটিতে পড়িল। চিত্রক সেই দিকেই তাকাইয়া ছিল, এখন দ্রুত অশ্ব হইতে নামিয়া সেগুলি কুড়াইয়া লইল। হাতে তুলিয়া লইয়া দেখিল, গজদন্তের পাষ্টি !

দ্যূতক্রীড়ার দুর্নিবার মোহ আছে। চিত্রক উৎসুক বিস্ময়ে বলিল,—'দূত মহাশয়, আপনার থলিতে পাশা খেলার পাষ্টি দেখিতেছি !'

শশিশেখর কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল,—'অক্ষক্রীড়া চতুঃষষ্ঠি কলার অঙ্গ, পাটলিপুত্রের সজ্জন নাগরিক মাত্রেই পাশা খেলিয়া থাকেন। স্বয়ং পরম ভট্টারক—'

চিত্রক বলিল,—'তুমি আমার সহিত পাশা খেলিবে ? ঘোড়া বাজি রহিল, যদি জিতিতে পার, বিনা মূল্যে আমার ঘোড়া পাইবে ; আর যদি আমি জিতি, তোমার ঐ খঞ্জ অশ্ব লইব।'

মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া শশিশেখর দেখিল, হারিলে তাহার কোনও ক্ষতি নাই, জিতিলে বিশেষ লাভ—ছয়টি স্বর্ণ দীনার বাঁচিয়া যাইবে। সে বলিল,—'উত্তম, খেলিব। আমি বর্ণ শ্রেষ্ঠ হইলেও দ্বন্দযুদ্ধ বা দ্যূতক্রীড়ায় কেহ আহ্বান করিলে পশ্চাৎপদ হই না।'

তখন দুইজনে, অশ্ব ছাড়িয়া দিয়া, বৃক্ষতলে তৃণের উপর বসিয়া খেলিতে আরম্ভ করিল। অল্পকাল মধ্যেই উভয়ে খেলায় মাতিয়া উঠিল, শশিশেখরের ক্ষুধা তৃষ্ণা আর রহিল না।

কিন্তু উত্তেজনা মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে। খেলা যখন শেষ হইল তখন দেখা গেল শশিশেখরের অশ্বটির স্বত্বাধিকার হস্তান্তরিত হইয়াছে।

ক্ষোভে গুম্ফের প্রান্ত টানিতে টানিতে শশিশেখর বলিল,—'তুমি নিপুণ ক্রীড়ক বটে। ভাগ্য বলে আমাকে পরাজিত করিয়াছ। আবার খেলিবে ?'

চিত্রক বলিল—'খেলিব। এবার কি পণ রাখিবে ?'

'এবার তরবারি পণ।' বলিয়া শশিশেখর কটি হইতে তরবারি খুলিয়া পাশে রাখিল।

চিত্রক বলিল—ভাল, আমি দুটি অশ্বই পণ রাখিলাম।'

শশিশেখর হৃষ্ট হইয়া খেলিতে বসিল। কিন্তু এবারও ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার প্রতি বিমুখ হইলেন। তরবারি তুলিয়া লইয়া চিত্রক বলিল, 'আর খেলিবে ?'

যে পরাজিত হয় তাহার খেলিবার ঝোঁক আরও বাড়িয়া যায় ; কৃপণও তখন দুঃসাহসী হইয়া উঠে। শশিশেখর আরক্ত নেত্রে চাহিয়া বলিল,—'খেলিব। তুমি দুইবার জিতিয়াছ বলিয়া কি বার বার জিতিবে ?'

'উত্তম। আমি দুইটি অশ্ব ও তরবারি পণ রাখিলাম। তোমার পণ ?'

'আমার পণ—' শশিশেখর সহসা থমকিয়া গেল ; তাহার মস্তিষ্ক কোটরে ঈষৎ সুবুদ্ধির উদয় হইল। ঘোড়া ও তরবারি তো গিয়াছে, এইভাবে যদি সব যায় ?

তাহাকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া চিত্রক ব্যঙ্গ করিয়া বলিল,—'ভয় পাইতেছ ?'

সুবুদ্ধিটুকু ভাসিয়া গেল। শশিশেখর ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল,—'ভয় ! কোন অবাচীন এমন কথা বলে ? আমি যথাসর্বস্ব পণ রাখিয়া খেলিতে পারি। তুমি খেলিবে ?'

'আপত্তি নাই। কিন্তু আপাততঃ ঐ অঙ্গুরীয় পণ রাখিতে পার।'

শশিশেখর নিজ অঙ্গুরীয়ের পানে চাহিল। মগধের রাজকীয় মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরীয়, ইহাই বিটক রাজসভায় তাহার প্রবেশপত্র। কিন্তু শশিশেখর তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। সে অঙ্গুরীয় খুলিয়া সবেগে ভূমির উপর স্থাপন করিয়া বলিল—'তাহাই হোক। এস—এবার দেখিব।'

আবার খেলা আরম্ভ হইল। খেলার ফল কিন্তু ভিন্নরূপ হইল না। খেলার শেষে চিত্রক অঙ্গুরীয়টি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া নিজ তর্জনীতে পরিধান করিল, বলিল—'দূত মহাশয়, এবার আমি চলিলাম। আজ সারাদিন আহার হয় নাই, ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। আমাকেও অনেক দূর যাইতে হইবে।'

এতক্ষণে শশিশেখর একেবারে ফাটিয়া পড়িল; লাফাইয়া উঠিয়া গর্জন করিল,—'তুই কিতব! হস্তলাঘব করিয়া আমার পণ জিতিয়া লইয়াছিস!'

চিত্রকও বিদ্যুতের মত উঠিয়া দাঁড়াইল। কিতব শব্দটা অক্ষক্রীড়কের পক্ষে অত্যন্ত দূষণীয়। তাহার ললাটের তিলক-চিহ্ন আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল।

কিন্তু পরক্ষণেই তাহার ক্ষিপ্র রোষ অন্তর্হিত হইল। শশিশেখরের মেদ-মসৃণ দেহের উগ্র ভঙ্গিমা দেখিয়া ক্রুদ্ধ শজারুর শল্কাবৃত বিক্রমের চিত্র স্মরণ হইয়া গেল। সে তাহার স্ফীত-গুম্ফ মুখের পানে চাহিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, বলিল,—'পাষ্টি তোমার, আমি হস্তলাঘব করিলাম কিরূপে?'

কথাটা সঙ্গত। যাহার পাশা সে পাষ্টির মধ্যে ধাতু প্রবিষ্ট করাইয়া কৈতব করিতে পারে। শকুনি ও পুষ্কর তাহাই করিয়াছিল। কিন্তু শশিশেখরের তাহা বুঝিবার মত মনের অবস্থা ছিল না, সে চীৎকার করিতে লাগিল,—'তুই ধূর্ত কিতব, কিতবের অসাধ্য কাজ নাই—'

চিত্রক বলিল,—'ও শব্দ আর ব্যবহার করিও না, বিপদ ঘটিবে। ভাগ্যদেবী তোমার প্রতি বিমুখ তাই তুমি হারিয়াছ। শুন, আর একবার তোমাকে সুযোগ দিতেছি। তুমি এখনি বলিয়াছ যে সর্বস্ব পণ রাখিয়া খেলিতে পার। এস, সর্বস্ব পণ করিয়া খেল, আমিও সর্বস্ব পণ করিতেছি। যদি জিতিতে পারি, যাহা কিছু হারিয়াছ সমস্তই ফিরিয়া পাইবে, আমার ঘোড়াও পাইবে। সম্মত আছ?'

শশিশেখর কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া চিন্তা করিল। তাহার সর্বস্বই গিয়াছে, আছে কেবল থলিটি। থলিতে গুটিকয় স্বর্ণ রৌপ্যের মুদ্রা আছে সত্য, কিন্তু এই নির্জন অরণ্যে সেগুলি কোন্ কাজে লাগিবে? ঘোড়া ফিরিয়া পাইলে, আশা আছে লোকালয়ে পৌঁছিতে পারিবে, নচেৎ বনে রাত্রিবাস সুনিশ্চিৎ। বনে নিশ্চয় ব্যাঘ্র তরক্ষু আছে—! আসন্ন রাত্রির কথা ভাবিয়া সহসা তাহার হৃৎকম্প হইল। ইহা যে মৃগয়া কানন তাহা সে জানিত না।

শশিশেখর আর দ্বিধা করিল না, আবার খেলিতে বসিল। কিন্তু ভাগ্যদেবী সত্যই তাহার উপর রুষ্ট হইয়াছিলেন, সে জিতিতে পারিল না। ক্ষোভে হতাশায় পাষ্টি দূরে নিক্ষেপ করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

চিত্রক সযত্নে পাষ্টিগুলি তুলিয়া লইয়া বলিল,—'এ পাষ্টি এখন আমার। মনে রাখিও তুমি সর্বস্ব হারিয়াছ।'

শশিশেখর উন্মত্ত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল,—'তুই চোর তস্কর, কৈতব করিয়া আমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছিস্।'

চিত্রকের চক্ষু অসি ফলকের ন্যায় তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল,—'আর যাহা বল আপত্তি নাই, কিন্তু কিতব শব্দ আর উচ্চারণ করিও না। একবার নিষেধ করিয়াছি।'

উন্মত্ত শশিশেখর গর্জন করিয়া বলিল,—'কিতব! কিতব! কিতব! সহস্রবার বলিব। আমার হাতে যদি তরবারি থাকিত—'

চিত্রকের নাসা স্ফুরিত হইয়া উঠিল, সে শশিশেখরের তরবারি তাহার দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—'এই নাও তোমার তরবারি। কি করিবে? যুদ্ধ?'

শশিশেখর তরবারি তুলিয়া লইল। সে বোধ হয় কিছু অসিবিদ্যা জানিত, কিন্তু বর্তমান মানসিক অবস্থায় তাহাও বিস্মরণ হইয়াছিল। সে তরবারি ঊর্ধ্বে তুলিয়া চিত্রককে আক্রমণ করিল।

দুইবার অসিতে অসিতে ঠোকাঠুকি হইল, তারপর শশিশেখরের অস্ত্র ছিট্‌কাইয়া দূরে গিয়া পড়িল।

চিত্রক বলিল,—'ভাবিয়াছিলাম তোমাকে দয়া করিব, সর্বস্ব লইব না। কিন্তু তুমি অপাত্র। থলি দাও।'

ক্রন্দনোন্মুখ শশিশেখর ফুলিতে ফুলিতে থলি ফেলিয়া দিল।

'এবার তোমার উষ্ণীষ বস্ত্র দাও ও অঙ্গাবরণ দাও।'

শশিশেখর হতভম্ব হইয়া গেল।

'অ্যাঁ—তবে কি আমি উলঙ্গ থাকিব?'

চিত্রক হাসিল। 'সে তুমি জান। আমার সম্পত্তি আমি লইব।'

'তুমি চোর দস্যু তস্কর।'

'শীঘ্র দাও—নচেৎ কাড়িয়া লইব।'

হতভাগ্য শশিশেখর তখন নিরুপায় হইয়া মধুক বৃক্ষের অন্তরালে গেল, বস্ত্রাদি খুলিয়া চিত্রকের দিকে ফেলিয়া দিল। নিস্ফল ক্রোধের তপ্ত অশ্রুজল তাহার গুম্ফ ভিজাইয়া দিতে লাগিল।

নিজের সমস্ত সম্পত্তি লইয়া চিত্রক অশ্বে চড়িয়া বসিল। শশিশেখরের ঘোড়ার পৃষ্ঠে তরবারির কোষ দ্বারা সবেগে আঘাত করিতেই সে ঘোড়াইতে ঘোড়াইতে পলায়ন করিল। চিত্রক তখন বৃক্ষের কাণ্ড লক্ষ্য করিয়া বলিল—'তোমাকে তবু একটা দয়া করিলাম, তোমার তরবারিটা ফেলিয়া গেলাম। যদি নকুল অথবা শশক তাড়া করে, আত্মরক্ষা করিতে পারিবে।'

বেলা তখন পড়িয়া আসিতেছে, সূর্য তরুচূড়া স্পর্শ করিয়াছে। দিক্‌নির্ণয় করিয়া লইয়া চিত্রক সূর্যকে দক্ষিণে রাখিয়া দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইল।

শশিশেখর বনের মধ্যেই পড়িয়া রহিল। তাহার বর্তমান অবস্থায় তাহাকে আর পাঠক পাঠিকার সম্মুখে উপস্থিত করা উচিত হইবে না।

* * * *

প্রাকার-বেষ্টিত কপোতকূট নগরের উত্তর তোরণের নিকট চিত্রক যখন পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। তোরণের অনতিদূর পর্যন্ত গিয়া বন শেষ হইয়াছে; এইখানে আসিয়া চিত্রক অশ্ব ছাড়িয়া দিল। তারপর শশিশেখরের বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া, মস্তকে লোহজালিকের উপর উষ্ণীষ বাঁধিয়া স্বচ্ছন্দ অনুদ্বেগ পদক্ষেপে নগরে প্রবেশ করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্

শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ

শ্রীশ্রীভগবানের অপার করুণায় শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত বঙ্গভাষার দুর্লভ রত্নস্বরূপ "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" শ্রীগ্রন্থের সংস্কৃত পদ্যানুবাদ কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। ইহা যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অশেষ করুণা এবং ভক্তবৃন্দের আশীর্ব্বাদ ব্যতীত কিছুতেই সম্ভবপর হইত না, এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

যুদ্ধ চলিতেছে—দুর্ভিক্ষ দারুণ মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়াছে—সমস্ত কাজ-কর্ম্ম রুজি-রোজগার একরূপ বন্ধ বলিলেই হয়—দ্বারে মুহুর্মুহু 'একটু ফ্যান্ দাও, দুইদিন কিছু খাই নাই' করুণ আর্ত্তনাদ? ছেলে-মেয়েদের মুখে ভয় উদ্বেগ অস্বস্তির চিহ্ন সতত বেদনায়িত,—সংসার যেন শ্মশানের দৃশ্যে সতত আতঙ্কিত। জীবন দুর্ব্বহ দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। এমনই এক দুর্দ্দিনের রাত্রি প্রভাত হইতেই পিতৃপুণ্যে এই শুভ কার্য্যের সূচনা। কেমন করিয়া যে পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের বাসনা জাগিল, যাঁহারা তাঁহার কৃপা পাইয়াছেন, তাঁহারাই তাহা বলিতে পারেন, আমি পারি না।

কত বড় বিরাট গ্রন্থ!! আজ সেই প্রথম দিনের কথা মনে পড়িলে অবাক হইয়া যাই। আদি, মধ্য, অন্ত্যলীলার পয়ার গুলিকে অনুষ্টুপ্ ছন্দে অনূদিত করার বাতুল প্রচেষ্টা! অথচ ভয় ছিল, পাছে কবিরাজের ভাবটি ঠিক ঠিক ফুটিয়া না উঠে—পাণ্ডিত্য দেখাইতে গিয়া না অপরাধ বাধাইয়া ফেলি। পূজনীয় পিতৃদেবের সম্পাদিত সংস্করণ খানিই তখন আমার নিত্যপাঠ্য, বহু প্রভু সন্তানের মনীষা ও আশীর্ব্বাদ যাহার ছত্রে মাখানো রহিয়াছে। লিখিতে লিখিতে সাহস বাড়িয়া যায়। দুর্ভিক্ষের দুর্দ্দিন কাটাইয়া উঠিতে পারি বা না পারি, যতদূর হয়, ততদূর করিয়া গেলেও যোগ্যতর ব্যক্তি পরে অসমাপ্ত কার্য্যটি সম্পন্ন করিবেন—এই আশায় নিত্যসেবার মতই কার্য্য চলিয়াছিল।

কেহ কিছু জানে না, কাহাকে জানাইতেও সাহস হয় না—লজ্জা করে; লোকে কে কি মনে করিবে—আমার দোষ গুণ লইয়া আমি একাই চলিয়াছি; কিন্তু সতত মনে সংশয়—এ কি হইতেছে কিছুই তো বুঝি না; কেহ না দেখিলেই বা কেমন করিয়া বুঝি যে, কোন্ ধারা ধরিব—কোন্ পথে চলিব! অন্তর্য্যামী আমার সকল দুঃখ ঘুচাইয়া দিলেন। ভক্তজগতের পরমপূজ্যা শ্রীমতী ললিতা দিদি ডাক পাঠাইলেন। কি জন্য তাহা তখনও জানি না। এমন তো কতবারই কৃপা করিয়া

ডাকাইতেন। কত ইষ্টগোষ্ঠীর সৌভাগ্যদান করিয়াছেন। আজ কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার কাছেই শুনিয়া বিস্মিত হইলাম—"শ্রীগ্রন্থের অনুবাদ কতদূর হইল? আমাদের কি কিছু শুনাইবেন?" তিনি কেমন করিয়া খবর পাইয়াছিলেন, আজও জানি না।

মেঘ না চাহিতেই জল? যাহা মনে মনে নিত্য কামনা করিতাম, আজ ভক্ত কৃপায় তাহাই সম্ভাবিত হইল। একটিমাত্র অধ্যায়ের অনুবাদ শুনিয়া 'দিদি' যেরূপ উল্লসিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আমার হৃদয়ে দ্বিগুণ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। তারপর যেমন যেমন কার্য্য অগ্রসর হইয়াছে, তেমনি তেমনি কিছু কিছু অংশ শ্রবণ করিয়া প্রচুর উৎসাহ দান করিতেন। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, অনুবাদ যেদিন শেষ হইলেন শ্রীপাট অম্বিকায়, ঠিক সেইদিনই শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া শুনিলাম তিনি প্রেম-সমাধিলাভ করিয়াছেন। শেষ অংশ আর তাঁহাকে শুনাইতে পারি নাই।

আর একজন উৎসাহদাতার নাম এস্থলে শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিতেছি। বৈষ্ণবজগতের চিরস্মরণীয় প্রভুপাদ নিত্যধামগত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়। পূজনীয় পিতৃদেবের সহিত সৌভ্রাত্র সম্বন্ধে আমাকে চিরদিন পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। প্রেমকণ্ঠ শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয় ভক্তসুলভ ঔদার্য্যবশতঃ সম্ভবতঃ প্রভুপাদের নিকট অনুবাদের শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকিবেন। তাঁহারই নিকট সংবাদ পাইলাম—প্রভুপাদ রোগশয্যায় এবং আমাকে তাড়াতাড়ি দেখা করিতে আদেশ করিয়াছেন। আমি কলিকাতায় তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়া জানিলাম—চিকিৎসকদের মানা—বেশী কথা কওয়া ঠিক নয়। আমি নীরবেই শয্যাপ্রান্তে বসিলাম। তিনি কিন্তু কোন মানা মানিলেন না—বেশী কথা বলিতে পারিলেন না সত্য, কিন্তু প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন? বলিলেন—"শেষ করো? বড় প্রয়োজন ছিল। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কথা জগৎকে শুনাইবার এমন অপূর্ব্ব উপায় আর নাই।" একশত একটি রূপার টাকা একটি থলিতে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। দিয়া বলিলেন—সঙ্কোচ করিও না, মহাপ্রভুর নাম জগতে ব্যাপ্ত হইবে—আমি যে তোমার জন্য কতদিন এটাকা আলাদা করিয়া রাখিয়া দিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে ছাপার কাজ সুরু করিও। আজ তিনি নাই। তাঁহার আশীর্ব্বাদে শ্রীগ্রন্থের অনুবাদ শেষ হইয়াছে, যদিও ছাপা এখনও সুরু করিতে পারা যায় নাই।

সমগ্র অনুবাদ শুনাইতে না পারিলেও কিছু কিছু অংশ শুনাইয়া যাঁহাদের নিকট প্রেরণা, আশীর্ব্বাদ ও উৎসাহ লাভ করিয়াছি, তন্মধ্যে পাবনার বৈষ্ণবাচার্য্য শিরোমণি প্রভুপাদ শ্রীল মুরলীমোহন গোস্বামী, চণ্ডীপুরের প্রসিদ্ধ প্রভুপাদ শ্রীল রাধারমণ গোস্বামী, সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পণ্ডিতাগ্রণী ডাঃ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রভৃতির নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি। ৺কাশীতে সেবার ধর্ম্মসংঘের মহাযজ্ঞে গিয়া সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্যবর্য্য দামোদরলাল গোস্বামী মহোদয়কে মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদ শুনাই। তিনি এতদূর প্রসন্ন হইয়াছিলেন যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উহার হিন্দী অনুবাদ করিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন। তাহা আর হইল না।

বহু বিদ্বান ব্যক্তিও দয়া করিয়া ইহার কোন কোন অংশ শ্রবণকরতঃ প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন। সার্ টি, এল্, ভাস্বানী নবদ্বীপে এই দরিদ্র-গৃহে যখন শুভাগমন করেন, তখন এই অনুবাদ শুনিয়া প্রীতিপ্রকাশ করতঃ ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিব বলিয়া গিয়াছেন। অনুবাদ শেষ হইয়াছে, কিন্তু আজ তিনি কোথায় জানি না। তাঁহার "কৃষ্ণকুঞ্জে" পত্র দিয়াছিলাম, পত্র ফেরৎ আসিয়াছে।

'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহচর্য্যে কৃষ্ণনগরের জজকুঠীতে মাননীয় জজসাহেব শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার ও কয়েকজন সাহিত্যসেবী অনুবাদটি যে যথাসম্ভব literal হইয়াছে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। সিঁথি বৈষ্ণব-সম্মিলনীর সহৃদয়তায় ও অমানীমানদ স্বভাবগুণে বহুস্থানে এই অনুবাদের সংবাদ প্রচারিতও হইয়াছে। ফলে বহুস্থান হইতে অনুসন্ধানও আসিতেছে। অল্পদিন পূর্ব্বে পণ্ডিচেরী হইতেও শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের গ্রন্থাগারে এই অনুবাদ রক্ষা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পত্র আসিয়াছে। কিন্তু ছাপা এখনও আরম্ভই করিতে পারা যায় নাই।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অধ্যাপক Prof: Raydar নবদ্বীপে সংস্কৃত শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা জানিতে আসিলে এই অনুবাদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় এই অনুবাদ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ধর্ম্মমত বুঝাইবার পরম সহায় হইবে বলিয়া সাহেব ক্রত প্রকাশ দেখিবার বাসনা প্রকাশ করেন এবং এখনও ছাপা আরম্ভ হয় নাই জানিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। London University হইতে প্রকাশ করা সম্ভব কিনা সাহেব তাহারও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; কিন্তু ফল কি হইয়াছে তাঁহার পত্রের নিম্ন কয়ছত্র উদ্ধৃতি হইতেই জানা যাইবে—

"* * * I enquired as to the possibility of getting a grant for publication of your translation of Chaitanya Charitamrita, but there is no hope of London University having funds this year or 1950, as they have their money allotted for publications of their own. I realise the interest and value of your great work." * * *

গ্রন্থ ছাপা সম্বন্ধে কয়েকজন ভক্ত একদিন পাঠের সময় শ্রীযুক্তা ললিতা দিদির দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"উনি চেষ্টা করিলে এখনই হইতে পারে।" দিদি বলিয়াছিলেন—"যিনি করাইয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা হইলে তিনিই করাইয়া লইবেন।" সুতরাং ঐ বিষয়ে আমার চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র। যাহাতে গ্রন্থটিতে বেশী ভুল না থাকে এখন সেই চেষ্টাই করা উচিত। এ পক্ষে আমার প্রতি সদয় এমন কয়জন বন্ধুর সহায়তা পাইয়াছি। নবদ্বীপস্থ বঙ্গ বিবুধজননী সভার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুত ত্রিপথনাথ স্মৃতিতীর্থ, নদীয়ার রাজসভাপণ্ডিত শ্রীযুত মনোরঞ্জন স্মৃতিতীর্থ, নবদ্বীপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব টোলের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুত রামকণ্ঠ তর্কতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীঅতুলকৃষ্ণ পঞ্চতীর্থ প্রভৃতি এ বিষয়ে আমায় সহায়তা করিতেছেন। ভট্টপল্লীর সুকবি পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম্-এ বন্ধুজনোচিত সহৃদয়তা বশতঃ অল্প অবকাশ মধ্যেই কিছু দেখিয়া

গিয়াছেন, যথেষ্ট উৎসাহিতও করিয়াছেন এবং ভরসা দিয়াছেন যে যথা-সম্ভব সহায়তা করিবেন। বঙ্গের পণ্ডিতকুলচূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় নৈয়ায়িকপ্রবর শ্রীযুত চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ মহাশয় আশীর্বাদ করিয়াছেন এবং আমার বিশ্বাস, অন্যান্য বিদগ্ধ বন্ধুগণের সাহচর্য্যে যতদূর সম্ভব নির্ভুল করিবার চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।

অনুবাদটি সত্বর প্রকাশিত হইলে যে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারপক্ষে পরম সহায় হইবে—এমন কি আসন্ন তৃতীয় মহাযুদ্ধের দ্বারা বিধ্বস্ত বিশ্বের পরিস্থিতি মধ্যে শান্তির অমৃতনিষেচনের কার্য্য হইবে, এতবড় কথা পর্য্যন্ত বাংলা ভাষার বর্ত্তমান আচার্য্যস্থানীয় ডাঃ শ্রীযুত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ পি এচ্-ডি মহাশয় চেৎলার শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপে সমাগত নিখিল বঙ্গ বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনের সম্বর্দ্ধনা সভায় সভাপতির অভিভাষণে মন্তব্য করিয়াছিলেন। এই সভায় সমবেত বিশিষ্ট সাহিত্যসেবকগণের মধ্যে বৈষ্ণবসাহিত্যের পরমাচার্য্যস্থানীয় রায় বাহাদুর শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, প্রবীণ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীযুত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ এম্ এ, নিখিল বৈষ্ণব সম্মিলনীর সভাপতি কবিবর শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী প্রসিদ্ধ 'লীলামঞ্জরী' কবি শ্রীযুত বিষ্ণু সরস্বতী প্রভৃতি অনেকেই তুল্য মন্তব্য প্রকাশ করত, এই পবিত্র গ্রন্থের সংস্কৃত পদ্যানুবাদটিরই প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, বঙ্গের বিশিষ্ট বিদ্বান্ ও সাহিত্যসেবকগণের নিকট প্রচুর সম্বর্দ্ধনা প্রাপ্ত হওয়ায় মনে হইয়াছে যে এই অনুবাদ দ্বারাই প্রভুর নিজমুখবাণী সফল হইবে—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মম নাম॥"

অনুবাদটি দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত করাই স্থির হইয়াছে সত্য, তথাপি সর্ব্বসাধারণের রসাস্বাদনের সুযোগ হইবে মনে করিয়া যে অনুরোধ পাইয়াছি, তদনুসারে নিম্নে কিয়দংশ বাংলা অক্ষরেই প্রকাশিত হইল—

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্

মধ্যলীলা

অষ্টম পরিচ্ছেদঃ

সঞ্চার্য্য রামাভিধ ভক্তমেঘে।
স্বভক্তি সিদ্ধান্ত চয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধি রেতৈ রমুনা বিতীর্ণৈ
স্তজ্‌জ্ঞত্ব রত্নাকরতাং প্রযাতি॥ ১॥

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ জয় প্রভো।
জয়াদ্বৈত প্রভো গৌরভক্তবৃন্দ চিরংজয়॥
পূর্ব্বরীত্যা প্রভুশ্চাগ্রে চকার গমনংস্ততঃ।
জীবন্ নৃকেশরীক্ষেত্রমগচ্ছৎ কতিভি র্দিনৈঃ॥
দণ্ডবৎপ্রণতিঞ্চক্রে দৃষ্ট্বা নৃসিংহমেব তং।
বহু নৃত্যং স্তুতিগীতং প্রেমাবেশেন বৈ কৃতং॥

"শ্রীনৃসিংহ নৃসিংহ শ্রীনৃসিংহ জয়তাং প্রভো।
প্রহ্লাদেশ জয় শ্রীমন্ পদ্মাস্যপদ্মষট্‌পদ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে প্রথমশ্লোকস্য শ্রীধর স্বামিকৃত ব্যাখ্যায়াং ধৃতাগমঃ—

উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং
স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানা-
মন্যেষামুগ্র বিক্রমঃ॥ ২॥

ইত্থং নানা পঠিত্বা বৈ শ্লোকান্ তেন স্তুতিঃ কৃতা।
মাল্যপ্রসাদমানীয় নৃসিংহসেবকো দদৌ॥
কশ্চিদ বৈ পূর্ব্ববদ বিপ্রশ্চক্রে তস্য নিমন্ত্রণং।
তত্রাবস্থায় তদ্রাত্রি মবরোদ গমনং স্বতঃ॥
চচাল প্রাতকথায় প্রেমাবেশেন বৈ প্রভুঃ।
নাস্তি বা দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞান' রাত্রৌ চ দিবসে তথা॥
পূর্ব্ববদ বৈষ্ণবান্ কৃত্বা সর্ব্বান্ লোকান্ মহাপ্রভুঃ।
দিনৈ র্গোদাবরীতীরং কতিভিঃ সঃ সমাযযৌ॥
দৃষ্ট্বা গোদাবরীং তস্য বভূব যমুনাস্মৃতিঃ।
তীরে বৈ বনমালোক্যাভবদ বৃন্দাবন স্মৃতিঃ॥
বনে তস্মিন্ কিয়ৎ কালং নৃত্যগীতং বিধায় চ।
গোদাবরীং সমুত্তীর্য্য স্নানং তত্র চকার সঃ॥
ঘট্টং ত্যক্ত্বা কিয়দ্দূরে জলস্য সন্নিধৌ প্রভুঃ।
করোত্যাসীন এবাসৌ শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তনং॥
শ্রীরামানন্দরায়স্তু দোলামারুহ্য বৈ তদা।
স্নানার্থমাযযৌ তত্র বাদ্যভাণ্ডং বাদয়ন্॥
বহবো বৈদিকা বিপ্রাস্তেন সার্দ্ধং সমাযযুঃ।
স্নানাদিতর্পণঞ্চৈব চকারাসৌ যথাবিধি॥
রামরায়স্বয়ঞ্চেতি তং দৃষ্ট্বা জ্ঞাতবান্ প্রভুঃ।
মিলিতুং তেন বৈ তস্য মনশ্চোত্থায় ধাবতি॥
ততো তত্রোপবিষ্টঃ সন্ ধারয়ন্ ধৈর্য্যমেব সঃ।
দৃষ্ট্বা সন্ন্যাসিনং রামানন্দস্তু স্বয়মাযযৌ॥
শতভাস্বরকান্তিঞ্চ তমেবারুণবাসসং।
সুবলিতপ্রকাণ্ডশ্রীদেহং পঙ্কজলোচনং॥
বভূব মানসং তস্য তমালোক্য চমৎকৃতং।
দণ্ডবৎপ্রণতিং তস্মৈ সমাগত্য চকার সঃ॥
উত্থায়োবাচ—"উত্তিষ্ঠ কৃষ্ণকৃষ্ণে"তি কথ্যতাম্।
তমালিঙ্গিতুমেবাভূৎ সতৃষ্ণং মানসং প্রভোঃ॥
"কিং রামানন্দরায়স্ত্বং"—তথাপি পৃষ্টবান্ প্রভুঃ।
তেনোক্তং—"সোঽহমেবাস্মি শূদ্রো মন্দশ্চ দাসকঃ॥
তদা তং সুদৃঢ়ং তত্র সমালিলিঙ্গ বৈ প্রভুঃ।
প্রভুভৃত্যাবুভৌ প্রেমাস্তুতামেবমচেতনৌ॥

দ্বয়োঃ স্বাভাবিকপ্রেম সম্ভূতোদিতমেব চ।
সমালিঙ্গ্য মিথো দ্বৌ চাভবতাম্ পতিতৌ ভুবি ॥
স্বস্ত স্বেদাশ্রু বৈবর্ণ্যবেপথু পুলকান্বিতৌ।
গদগদং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ শ্রূয়তে মুখতো দ্বয়োঃ ॥
পশ্যতাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ চমৎকারোঽভবৎ তদা।
আরেভিরে বিচারঞ্চ তে সর্ব্বে বৈদিকা দ্বিজাঃ ॥
"অয়ং সন্ন্যাসিনস্তেজো ব্রহ্মতুল্যং হি দৃশ্যতে।
ইমং শূদ্রং সমালিঙ্গ্য ক্রন্দনং কুরুতে কথং ?
মহাপণ্ডিত এবায়ং গম্ভীরশ্চাথ ভূপতিঃ।
সন্ন্যাসিস্পর্শতোঽস্থির কথং বা মত্ততাং গতঃ ?"
এবং বিপ্রগণাঃ সর্ব্বে মনস্যচিন্তয়ন্ চ।
দৃষ্ট্বা তোবান বিজাতীয়ান্ চক্রে সম্বরণং প্রভুঃ ॥
সুস্থৌ ভূত্বা চ তৌ দ্বৌ চোপবিষ্টৌ বভূবতুঃ।
সস্মিতং বক্তুমারেভে তদা তেন মহাপ্রভুঃ ॥
"উক্তা বৈ সার্ব্বভৌমেন ভট্টাচার্য্যেণ তে গুণাঃ।
মহ্যং তু মানাচার্য্যো মেলনার্থং ত্বয়া সহ ॥
মিলিতুং ত্বয়া সার্দ্ধমত্রাগমনং মম।
ভবতঃ ইহ যত্নায়াসাৎ প্রাপ্তং ত্বদ্দর্শনং ময়া ॥"
তেনোক্তং—"সার্ব্বভৌমস্তু মাং ভৃত্যং কিং মন্যতে
মম হিতে পরোক্ষেঽপি সাবধানো ভবত্যসৌ ॥
তস্যৈব কৃপয়া প্রাপ্তং ত্বদীয়ং দর্শনং ময়া।
তস্যৈব প্রাপ্তসাফল্যং মনুষ্যজন্ম মামকং।
কৃপা যৎ সার্ব্বভৌমে তে তদতজ্ঞাতমেব চ।
অস্পৃশ্যং স্পৃষ্টবান যেন তুষ্টা কৃপাবশঃ স্বয়ম ॥
স ভবান্ ঈশ্বরঃ সাক্ষাৎ শ্রীমন্নারায়ণঃ স্বয়ম্।
স চাহং রাজসেবী বা বিষয়ী শূদ্রকাধমঃ ॥
মদীয় স্পর্শনে ত্বং তু ঘৃণাবেদভয়ং তথা।
বারয়ন্তি হি বেদাস্তে মাদৃশাং দর্শনাদপি ॥
নূনং তব কৃপা হি মাম্ কারয়েন নিন্দ্য কর্ম্ম চ।
কো বা জানাতি তে মর্ম্ম যত সাক্ষাদীশ্বর ॥
তবৈবাগমনমাত্র মম নিস্তার হেতবে।
দয়ালুঃ পরমস্ত্বং হি পতিতানাং পাবনঃ ॥
স্বভাবো মহতাং হ্যেষ সমুদ্ধর্ত্তুং পামরান্।
অসাদ নিজকার্য্যেঽসৌ তথাপি যাতি তদ্গৃহম্।

তথাপি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে তৃতীয়শ্লোকে গর্গং প্রতি নন্দবাক্যং—

মহদ্ বিচলনং নৃণাং
গৃহিণাং দীনচেতসাং।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন
কল্পতে নান্যথা কচিৎ ॥ ৩ ॥

ময়া সার্দ্ধং সহস্রঞ্চ ব্রাহ্মণাদিজনাশ্চ যে।
দ্রবীভূতানি সর্ব্বেষাং মনাংসি দর্শনাত্তব ॥
সর্ব্বেষাং বদনে কৃষ্ণ হরিনাম শৃণোম্যহম্।
সর্ব্বেষাং নয়নে চাশ্রু সর্ব্বাঙ্গে পুলকস্তথা ॥
আকৃত্যা চ প্রকৃত্যা চ লক্ষণমৈশ্বরং তব।
জীবে ন সম্ভবেৎ কর্হি হ্যয়মপ্রাকৃতো গুণঃ ॥
প্রভুস্তদাবদৎ—"ত্বং হি মহাভাগবতোত্তম।
দ্রবীভূতানি মনাংসি সর্ব্বেষাং দর্শনাত্তব ॥
অন্যেষাং কা কথা মায়াবাদিসন্ন্যাসিনং তথা।
প্লবমানোঽস্মি বৈ প্রেম্নি ত্বদীয়স্পর্শনেন চ ॥
সংস্কর্তুং মন্যতে চেদং কঠিনং হৃদয়ং মম।
মামাহ সার্ব্বভৌমস্তুন্ মেলনার্থং ত্বয়া সহ ॥",
দ্বাবেবং তৌ দ্বয়োশ্চৈব গুণান্ কুরুতঃ স্তুতিং।
দ্বৌ চ দ্বয়োর্দর্শনেন সদানন্দিতমানসৌ ॥
তৎকালে ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদ্ বৈদিকশ্চাপি বৈষ্ণবঃ।
চকার দণ্ডবন্ নত্বা প্রভোস্তত্র নিমন্ত্রণং ॥
বৈষ্ণবমিতি তং জ্ঞাত্বা স্বীচকার নিমন্ত্রণং।
রামানন্দ মুখাচ্চেত্থং হসিত্বৈবং তদা প্রভুঃ ॥
"ত্বন্মুখাৎ কৃষ্ণবার্ত্তাস্তু শ্রোতুমিচ্ছতি মে মনঃ।
তবৈতদ দর্শনং ভূরি প্রাপ্স্যাম ন পুনর্যদি ॥"
রায়েণোক্তং—"আগতশ্চেৎ সংস্কর্তুং মাঞ্চ পামরং।
দুষ্ট চিত্তং ন মে শুদ্ধং ভবেৎ তে দৃষ্টিমাত্রতঃ ॥
মার্জ্জনং কুরু চেৎ স্থিত্বা দিনানি পঞ্চ সপ্ত বা।
তদা শুদ্ধং ভবেচ্চৈব দুষ্টমেতন্ মনো মম ॥"
সোঽহং যদ্যপি বিচ্ছেদং শক্নুতো দ্বৌ ন চ দ্বয়োঃ।
তথাপি দণ্ডবন নত্বা রামরায়শ্চগাত্যসৌ ॥
তদাকরোৎ প্রভুর্ভিক্ষাং তস্য বিপ্রস্য বেশ্মনি।
সমাগতবতী সন্ধ্যা দ্বয়োঃ সোৎকণ্ঠয়োস্তদা ॥
স্নানং কৃত্বা সমাপ্যাসৌ চোপবিষ্টো সদা প্রভুঃ।
একভৃত্যেন বৈ রায়ঃ সমাগত্যামিলৎ তদা ॥
নমশ্চকার রায়োঽথ তমালিঙ্গত্তদা প্রভুঃ।
উপবিষ্টৌ রহঃস্থানে দ্বৌ চ কথয়তঃ কথাং ॥
প্রভুনোক্তং—"পঠ শ্লোকং সাধ্যনির্ণয়মেব চ।
তেনোক্তং বিষ্ণুভক্তিস্থ স্বধর্ম্মাচরণাদ্ভবেৎ ॥
শ্রীমদ্ বিষ্ণুপুরাণে হি তৃতীয়স্কন্ধ এব চ।
যথা তত্রাষ্টমাধ্যায়ে নবমঃ শ্লোক উচ্যতে ॥

বর্ণাশ্রমাচারবতা
পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থাঃ
নান্যত্তত্তোষকারণম্ ॥ ৪ ॥

বিশ্বের বিখ্যাত পত্রাবলি

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

(দ্বিতীয় পর্য্যায়)

ফ্রান্সিস বেকন—কারাগারে মার্জ্জনার আবেদন

পত্র পরিচয় :—

ইংলণ্ডের গৌরবোজ্জ্বল টুডার যুগের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন ফ্রান্সিস বেকন। জ্ঞানের গভীরতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, প্রকাশের ক্ষমতা, ভাষার সাবলীলতা বেকনকে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষীর সম্মান দিয়াছে। উচ্চ বংশের সন্তান, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, সহজাত প্রতিভার সম্পদে ফ্রান্সিস বেকন মধ্য যৌবনেই একজন খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী, গভীর দার্শনিক, সুপণ্ডিত সাহিত্যিক এবং বিচক্ষণ রাষ্ট্রধুরন্ধর রূপে পরিচিত হইলেন। সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ ছিলেন জহুরী, তিনি জহরের সন্ধান জানিতেন, সুতরাং ফ্রান্সিস বেকনকে তাঁহার উপদেষ্টা পদদানে কৃতার্থ করিলেন। বেকন ইংলণ্ডের Attorney Generalএর পদলাভ করিলেন। পরবর্ত্তী রাজত্বে প্রথম জেমসের সময় বেকন প্রতিষ্ঠিত হইলেন Lord chancellor পদে। রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রা ব্যবহারের অধিকারী বেকন; তাঁহার ক্ষমতা রাজ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বেকনকে "জ্ঞানের আলোকবর্ত্তিকা" এবং "বাগ্মিতার দৃষ্টান্ত" বলিয়া ইউরোপ সম্মান করিল।

প্রভূত সম্মান ও অতুল সম্পদের অধিকারী হইয়াও বেকনের চরিত্র বহু দোষদুষ্ট ছিল, তাঁহার গৃহে আড়ম্বরের আতিশয্য, ব্যয়বাহুল্য; সুতরাং তাঁহার নিত্য অভাব। তিনি প্রধান Solicitor পদের সুযোগে উৎকোচ গ্রহণ করিলেন। অর্থের বিনিময়ে ন্যায় বিচারের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলেন। অত্যন্ত অমিতব্যয়ী বেকন ঋণের দায়ে দুইবার কারারুদ্ধ হইলেন। নিজের পদোন্নতির জন্য বেকন দ্বিধা সংকোচশূন্য বিবেকবিহীন। প্রথম জীবনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক, কর্ম্মজীবনের বন্ধু আর্ল অব এসেক্সের বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। ফলে এসেক্সের প্রাণদণ্ড হইল। বেকন স্বচক্ষে এসেক্সের মৃত্যুর দৃশ্য দর্শনে উৎফুল্ল। সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ এই নীচ কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ বেকনকে দিলেন ১২০০ পাউণ্ড (এক লক্ষ আশি হাজার টাকা)। ঋণজালে জড়িত বেকনের ছিল অর্থের প্রয়োজন। এলিজাবেথের প্রয়োজন ছিল এসেক্সের মৃত্যু। প্রতিদ্বন্দ্বী বেকনের জিগীষার ইন্ধন হইল নারী এলিজাবেথের জিঘাংসা। এই ষড়যন্ত্রের অগ্নিতে ভস্মীভূত হইল এলিজাবেথের যৌবনের প্রেমাস্পদ আর্ল অব এসেক্স আর ফ্রান্সিস বেকনের কর্ম্মজীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী এসেক্স, তাই ইংলণ্ডের রাজপ্রাসাদে বিরাট ভোজের ব্যবস্থা হইয়াছিল—বেকন ছিলেন রাজপ্রাসাদের প্রধান অতিথি।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে এককালে অমন প্রতিভা এবং নীচতার সমাবেশ আর দ্বিতীয় নাই। বেকনই আরোহ তর্ক শাস্ত্রের (Inductive Logic) সঙ্গে ইউরোপের পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। ছত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি লাতিন ভাষায় অপরূপ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার রচিত Novum organum দার্শনিক দৃষ্টি ভঙ্গির পরিচয় দেয়, তাঁহার রচনার প্রতিছত্রে অভিজ্ঞতা জ্ঞানের অপূর্ব্ব বিকাশ, তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যগুলি পরবর্ত্তী যুগে প্রবাদ স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়।

রাজনীতি অতীব জটিল ব্যাপার। এই জটিলতার জালে একবার পতিত হইলে শত্রুর অভাব হয় না; বিশেষতঃ যদি রাজনীতিবিদের মধ্যে কোন ব্যক্তিগত ছিদ্র থাকে। বেকনের চরিত্রে ছিদ্রের অভাব ছিল না। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে যখন তাঁহার খ্যাতিতে ইউরোপের সুধীসমাজ উদ্বুদ্ধ, ইংলণ্ডের মনীষা চঞ্চল, বেকনের সম্মান রাজোচিত! ঠিক সেই সময় অকস্মাৎ শুনা গেল বেকন উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে অভিযুক্ত।

দেড় বৎসর বেকনের বিচার চলিয়াছিল, আর্ল অব-এসেক্সের অশরীরী ছায়া কারাগারে বেকনকে প্রতিমুহূর্ত্তে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিত; তাঁহার প্রভূত জাগতিক জ্ঞান সত্ত্বেও বেকন এসেক্সের মৃত্যুর দৃশ্যের স্মৃতির ভীতি হইতে মুক্তি পান নাই, বিচারে বেকন দোষী প্রমাণিত হইলেন। শাস্তি হইল অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য লণ্ডন টাওয়ারে কারাবাস, ৪০,০০০ পাউণ্ড (ছয় লক্ষ টাকা) অর্থদণ্ড এবং পদচ্যুতি। যাহা দুই বৎসর পূর্ব্বেও অসম্ভাব্য ছিল, অবস্থা বিপর্য্যয়ে তাহা বাস্তবে পরিণত হইল। অদৃষ্টের প্রতিশোধ।

ফ্রান্সিস বেকন লণ্ডন টাওয়ার হইতে রাজা জেমসের নিকট আবেদন করিলেন। তিনি জেমসের দুর্ব্বলতার সন্ধান জানিতেন; জেমস স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হইতেন। বেকন সেই দুর্ব্বলতার আশ্রয় লইয়া জেমসের নিকট মার্জ্জনার আবেদন করিলেন। সেই আবেদনের ভাষা অনবদ্য, প্রকাশ ভঙ্গী অপরূপ; যথেষ্ট সমালোচনার অবকাশ থাকিলেও এই আবেদন পত্রের ভঙ্গিমা ইংরেজী সাহিত্যে চিরন্তন হইয়া আছে।

পত্রানুবাদ :—

লণ্ডন টাওয়ার ১৬১১ খৃঃ অব্দ

মহানুভব সম্রাট, আমার এই বর্ত্তমান দুঃখের দিনে আমি আশার আলোর সন্ধান পাচ্ছি না; অবশ্য অতীত স্মৃতিগুলি আমার একমাত্র সান্ত্বনা। আজ আমার সর্ব্বোত্তম সম্পদ হলো স্মৃতির বিলাস। আমার স্মৃতিতে ভেসে আসছে—আমার ক্ষুদ্র কর্ম্ম শক্তিকে সম্রাট তাঁর সেবায় নিয়োজিত করবার সুযোগ দিয়েছিলেন এবং সম্রাট সেই সেবা গ্রহণ

করেছিলেন। আমি পূর্ব্বেও বহুবার সম্রাটের নিকট আবেদন করেছি যে, আমার সম্রাট অফুরন্ত করুণার অনন্ত উৎস। অতীত দিনে আমি সম্রাটের করুণা লাভে ধন্য হয়েছিলাম, সে স্মৃতি কি আমার সামান্য গৌরবের সামগ্রী?

সুদীর্ঘ উনবিংশতি বৎসরব্যাপী সম্রাটের অনুগ্রহ আমাকে অপরূপ ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত করেছিল। আজ এই তীব্রতম দুর্ভাগ্যের দিনেও আমার সেই ঐশ্বর্য্যের স্মৃতি অম্লান। আমার বিরুদ্ধে প্রচারিত অপরাধের মধ্যে এমন একটী অনুচ্ছেদ নাই যে সম্রাটের সঙ্গে আমার করুণা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ছিল। একি আমার পক্ষে সামান্য সান্ত্বনা যে সম্রাটের রাজোচিত ব্যবস্থার মধ্যে এই দীনতম দাসেরও স্বল্প পরিসর স্থান ছিল!

অবশ্য আমার দুর্ভাগ্যের আবর্ত্ত আজ এত গভীর যে তার সঙ্গে কোন জাগতিক বস্তুর তুলনা করা সম্ভব নয়, আমার এই সুদীর্ঘ কর্ম্ম জীবনের মধ্যে কখনো তিরস্কারের উপযুক্ত কাজ করেছি বলে সম্রাটের মনে পড়ে কি? আজ আমি আবার নিবেদন করব যে সম্রাট আপনার রাজোচিত ঔদার্য্যের গুণেই আমাকে কৃপা করেছিলেন। আমি সেই কৃপার উপযুক্ত ছিলাম না জানি, তবু আমি সম্রাটের অনুগ্রহেই, রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়েছিলাম। সম্রাট আলোচনা গৃহে বহুবার এই অধমের পরামর্শ গ্রহণ করে তাকে কৃতার্থ করেছিলেন। সম্রাটের সান্নিধ্যে এসেছিলাম—সেই কি আমার কম গৌরবের কথা? আমি কেবল সম্রাটের করুণা ও অনুগ্রহের কথাই চিন্তা করেছি; সেইগুলিই আমার আনন্দ ছিল। আজ সেই আনন্দ আমার নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমার নয়নের আলো আজ নিভে গেছে।

আজ আমার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, আজ বৎসরাধিক কাল আমি অপমানাহত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছি! সম্রাটের অনুগ্রহের দান ত আমি কখনো প্রত্যাখ্যান করিনি, তবু কেবল নিজেকেই জিজ্ঞাসা করছি,—সম্রাটের অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি কেন এই তীব্র অপমান ভোগ করবে। আমার পিতার পরিত্যক্ত প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আমার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই আমি আজ রিক্ত, বিত্তহীন।

আমি অলৌকিকতায় বিশ্বাস করি; তার চেয়েও বেশী বিশ্বাস করি সম্রাটের অনুগ্রহের উপর। আমার মহানুভব সম্রাট নিশ্চয়ই এই হতভাগ্য জীবকে অপমানবিদ্ধ দেখলে তৃপ্তি পাবেন না; সম্রাটের অনুগ্রহপ্রার্থী প্রজামণ্ডলীর মধ্য থেকে সম্রাট নিশ্চয়ই এই অধমের সত্ব লুপ্ত করে দেবেন না। সম্রাটের মুক্তহস্ত অতীত দিনে কতবার এই দীনতম দাসকে অলংকৃত ও কৃতার্থ করেছিল, সেই কথা আমি আজ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

সম্রাটের হৃদয় মহৎ; ভগবান সম্রাটের অন্তরকে আরও মহীয়ান করুন। সম্রাট করুণাময়; অনন্ত করুণার আধারে জগদীশ্বর সম্রাটকে অধিকতর করুণাময় করুন।

আমার সর্ব্বশেষ নিবেদন:—হে দেবতা, হে সম্রাট, হে প্রভু, এই অভাজনের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাকে করুণা করুন, সম্রাটের করুণা একদা যাকে বিত্তবান্ করেছিল আজ যেন সে সম্রাটের অনুগ্রহ বঞ্চিত হয়ে বিত্তহীন না হয়। যে মানুষ অতীতে ঐশ্বর্য্যের খনি ছিল, বার্দ্ধক্যে যেন সে ভারবাহী মাত্র না হয়ে পড়ে. আমি প্রার্থনা করি আমি যেন অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করি; অধ্যয়ন যেন আমার জীবনের উৎস হয়ে উঠে, আমি অধ্যয়ন করব না জীবনের জন্য; বরং আমি জীবন ধারণ করব অধ্যয়নের জন্য। আমার অধ্যয়ন আকাঙ্ক্ষার সংবাদ সম্রাট অপেক্ষা কে বেশী জানে?

অন্তরীক্ষ থেকে ঈশ্বর সম্রাটের উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুক, সম্রাটের শ্রীবৃদ্ধি হউক।

বিনীত

সম্রাটের পুরাতন ভৃত্য

ফ্রান্সিস সেন্ট-আলবন্সে।

পত্র পরিণাম:—কারাদণ্ডের পর ফ্রান্সিস বেকনকে চারি দিনের অধিক লণ্ডন টাওয়ারে বাস করিতে হয় নাই। রাজাদেশে বেকন মুক্তি লাভ করেন। ৪০,০০০ পাউণ্ড পরিশোধ করিতে হয় নাই। অবশ্য তিনি তাঁহার লুপ্ত রাজসম্মান পুনঃ লাভ করেন নাই; জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর তিনি অধ্যয়ন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন এবং তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক-গ্রন্থ রচনা করেন।

অপূর্ব্ব এই ফ্রান্সিস বেকন, বিভিন্ন প্রকৃতির সমাবেশ ছিল এই লোকটীর চরিত্রে। মনস্তত্ত্ববিদের পক্ষে ফ্রান্সিস বেকন একটী জীবন্ত পুস্তক।

অকথিত

শ্রীমতী রঞ্জিতা কুণ্ডু

যতটুকু বল, তারও বেশী তুমি বলনা,
মিছে কথা দিয়ে করনা কথনও ছলনা,
সত্য তোমার বাঁধা থাকে মোর কাছে।

ভাষাতীত দিয়ে ভাষাবে বন্ধু প্রকাশি
হৃদয়ের মাঝে উঠুক নীরবে বিকশি
অগীত তোমার অকথিত বাণী যা আছে।

রাঢ়ের প্রাচীন ইতিহাস

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল প্রত্নতত্ত্ববিদ্

সুপ্রাচীন রাঢ়দেশের অন্যতম রাজধানী রাঢ়াপুরীর নাম সর্ব্বজন বিদিত। সেই রাজধানী ও মহানগরীর ধ্বংসাবশেষ কোথায় বিদ্যমান রহিয়াছে এ বিষয়ে কাহারও দৃষ্টিপাত ছিল না। সমগ্র রাঢ়দেশের ধ্বংসস্তূপগুলি অনুসন্ধান করিয়া আজ প্রায় ১৫ বৎসর পরে বর্ত্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলপথে দ্বারবাসিনী নামক এক পল্লীবক্ষে 'রাঢ়াপুরীর প্রাচীন কীর্ত্তি উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি।

সুপ্রাচীনকালে এই স্থান এক পুণ্যতীর্থ ছিল। কারণ মহানাদ ও বক্রেশ্বর তীর্থের ন্যায় এখানে বহু কাহিনী বিজড়িত "জিয়ৎকুণ্ড", "কামনাকুণ্ড." "পাপহারিণীকুণ্ড" এবং "চন্দ্রকূপ" নামে চারিটি পবিত্র জলাশয় বিদ্যমান রহিয়াছে। কুণ্ডগুলি যোগিগণের যে সাধনার স্থান ছিল এবং তাহাদিগের যোগসাধনার প্রভাবে এইগুলির পবিত্র সলিলে সর্ব্বসাধারণের কতই না উপকার সাধিত হইত তাহা বলা বাহুল্য।

ঐতিহাসিক যুগের নিদর্শনস্বরূপ সর্ব্বাগ্রে এক প্রাচীন ইষ্টক নির্ম্মিত রাজবাটীর ধ্বংসস্তূপ পরিদৃষ্ট হয়। এই স্তূপ মধ্যে একটি প্রাচীন কূপের নিদর্শনও পাওয়া গিয়াছে। স্তূপের অনতিদূরে এক পরিখার পার্শ্বে "বড়ঢিপি" ও "ছোটঢিপি" নামে অপর দুইটি ক্ষুদ্র স্তূপ বড়রাণী ও ছোটরাণীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই স্তূপ হইতে কিয়দ্দূরে "সাতসতীন" নামক সাতটি পুষ্করিণী পাশাপাশি অবস্থিত হইয়া সাতজন মহিষীর স্মৃতিরক্ষা করিতেছে।

গত ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এই স্তূপের এক স্থান খননকালে কুষাণবংশীয় নৃপতি হবিষ্কের একটি সুবর্ণ মুদ্রা দ্বারবাসিনীর স্বর্গীয় মনীষী নগেন্দ্রনাথ আদক মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে মুদ্রাটি কলিকাতার হাজরা রোড নিবাসী রায় বাহাদুর শ্রীযুত নলিনীনাথ গুহমজুমদার মহাশয়ের নিকট সংরক্ষিত আছে। এই প্রকার এক সুবর্ণ মুদ্রা সরকারী প্রত্নতত্ত্ববিভাগের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে বগুড়া জেলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে দ্বারবাসিনী বক্ষে পাল যুগের যে সকল প্রস্তরমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছি তাহা প্রাচীন রাঢ়দেশের অমূল্য অবদান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। মূর্ত্তিগুলির মধ্যে বিবিধ বিষ্ণুমূর্ত্তি, সূর্য্য, হর-পার্ব্বতী এবং এক চতুর্ভুজ বরাহ মূর্ত্তি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কতিপয় ভগ্নমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে কিন্তু খুবই অস্পষ্ট। এতদ্ভিন্ন তথাকার হাট তলার পূর্ব্ব-দিকস্থ এক অরণ্যময় স্থানে একটি ভগ্ন প্রস্তরময় চণ্ডীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। অরণ্য মধ্যেই এক ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া পূজার্চ্চনার ব্যবস্থা হইয়াছে। সাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মূর্ত্তিটি স্থানান্তরিত করা সম্ভবপর হয় নাই। প্রস্তরমূর্ত্তির গঠনপ্রণালী পরীক্ষা করিয়া খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর পাল যুগের নিদর্শন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছি।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পাল যুগের দুই প্রকার বিষ্ণুমূর্ত্তি

দ্বারবাসিনীর উত্তরাংশে 'দিঘা' নামক পল্লীতে পাল রাজত্বের এক

প্রস্তরময় বিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মূর্ত্তিটির গঠনপ্রণালী পরীক্ষা করিলে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর একটি নিদর্শন বলিয়া অনুমিত হয়। মৎকর্ত্তৃক মূর্ত্তিটি হুগলী জেলার সারদাচরণ মিউজিয়মে সংরক্ষিত হইয়াছে। মূর্ত্তিটি দ্বারবাসিনী হইতে তথায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

কতিপয় ভগ্ন মূর্ত্তি

দ্বারবাসিনীর পূর্ব্বাংশে "পুণাজগড়" নামক স্থানে এক বট-বৃক্ষমূলে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর দুই প্রকার প্রস্তরময় বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং কতিপয় অস্পষ্ট ভগ্নমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি মৎকর্ত্তৃক সারদাচরণ মিউজিয়মে সংরক্ষিত হইয়াছে। পুণাজগড়ের অবস্থান পরীক্ষা করিলে বেশ প্রতীয়মান হয় যে—পাল রাজত্বে এই গড়টি রাঢ়াপুরীর অন্তর্গত ছিল। মূর্ত্তিগুলি দ্বারবাসিনী হইতে তথায় স্থানান্তরিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

পুণাজগড়ের পূর্ব্বভাগেই "মেঘসায়ার" একটি পল্লী। এই পল্লী "মেঘসায়ার" নামক একটি প্রাচীন সুবৃহৎ দীঘির জন্য প্রসিদ্ধ। দীঘিটি কোন এক হিন্দু নৃপতির কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। মেঘসায়ার বক্ষে পাল যুগের একটি প্রস্তরময় ভগ্ন নন্দীকেশর মূর্ত্তি, একটি কারুকার্য্যখচিত ভগ্ন প্রস্তর স্তম্ভ এবং আরও কতিপয় প্রস্তর ফলকাদি ও ইষ্টকাদি দৃষ্ট হয়। মেঘসায়ার রাঢ়াপুরীর অন্তর্গত ছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস।

বিদ্যাময়ী আদর্শ বিদ্যালয়

একণে দ্বারবাসিনী এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলস্থ রাজপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ, গড়, পুষ্করিণী, দীঘি, প্রাচীন মূর্ত্তি প্রভৃতি নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করিয়া আমার অনুমান হইয়াছে যে—পাল বংশীয় নৃপতি দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের রাজত্বকালে এতদঞ্চল সুসমৃদ্ধ হইয়াছিল।

গৌড়াধিপতি দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের রাজত্বকালে চান্দেলরাজ যশোবর্ম্ম দেব ১০১১ বিক্রমাব্দে (৯৫৪ খৃষ্টাব্দে) গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে খজুরাহো নগরে প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মণজীর মন্দির গাত্রস্থ এক শিলালিপিতে বর্ণিত আছে :—

"গৌড় ক্রীড়ালতাসিস্তুলিত যসবলঃ কোশলঃ কোশলানাং
নশ্যৎ কাশ্মীরবীরঃ শিথিলিত মিথিলঃ কালবন্মালবানাং
সীদৎ সাবন্তচেদিঃ কুরুতরুষু মরুৎসংজ্বরো গুর্জ্জরাণাং
তস্মাত্তস্যাং স যজ্ঞে নৃপ কুলতিলকঃ শ্রীযশোবর্ম্মরাজঃ।

—Epigraphica Indica, vol I, p. 126

এই আক্রমণের ফলে বিগ্রহ পাল গৌড়ের সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক রাঢ়দেশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় পরাক্রম প্রভাবে রাঢ়দেশ অধিকারে আনিয়া সুখ্যাতির সহিত রাজত্ব করিতে থাকেন।

তাঁহার ২৬শ রাজ্যাঙ্কে লিখিত "পঞ্চরক্ষা" নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে :—

"পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্বিগ্রহ পাল দেবস্য প্রবর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যে......সম্বৎ ২৬ আষাঢ় দিনে ২৪।"

—Bendall, Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in British Museum. P. 232; Journal of the Royal Asiatic Society, 1910, P. 151,

দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের শেষ জীবনে ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে। ১০৫৯ বিক্রমাব্দে (১০০২ খৃষ্টাব্দে) যশোবর্ম্ম দেবের পুত্র ধঙ্গদেব রাঢ় ও অঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে ধঙ্গদেব বিগ্রহ পালকে পরাজিত করিয়া সস্ত্রীক বন্দীকরতঃ কিছুকাল কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন।

এ বিষয় খাজুরাহোর বিশ্বনাথের মন্দির গাত্রে ধঙ্গদেব কর্ত্তৃক প্রোথিত এক শিলালিপিতে বর্ণিত আছে :—

"কা ত কাচী নৃপতি বনিতা বা ত্বমন্ধাধিপ স্ত্রী
কা ত্বং রাঢ়া পরিবৃঢ় বধূঃ কা ত্বমঙ্গেন্দ্র পত্নী।"

—Epigraphica Indica, vol. I. P. 145.

ধঙ্গদেব রাঢ়দেশের প্রস্তর মূর্ত্তি দর্শনে বিমুগ্ধ হন এবং রাঢ়াপুরীর বিষ্ণু, বরাহ, সূর্য্য, নন্দীকেশর প্রভৃতি মূর্ত্তির অনুরূপ মূর্ত্তিগুলি নির্ম্মাণ করাইয়া খাজুরাহোর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পুরোভাগে কৃষ্ণমিশ্র প্রণীত "প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকে" লিখিত আছে :—

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর একটি বরাহ মূর্তি ও পার্শ্বে একটি বিষ্ণুমূর্তি

"গৌড়রাষ্ট্রমনুত্তং নিরুপমা
তত্রাপি রাঢ়াপুরী, তত্রৈব ভূরীশ্রেষ্ঠী নাম নগরী।"

অর্থাৎ গৌড়রাষ্ট্র, রাঢ়াপুরী ও ভূরীশ্রেষ্ঠী সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। আমার মতে বর্ত্তমান দ্বারবাসিনী এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল লইয়া "রাঢ়াপুরী" নগরী পরিব্যাপ্ত ছিল।

খৃষ্টীয় ১৩১০ অব্দে রাঢ়দেশস্থ পাণ্ডুয়া যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই সাহ জোকাই নামক জনৈক মুসলমান ফকির কর্ত্তৃক রাঢ়াপুরীর প্রাচীন কুণ্ডগুলির মাহাত্ম্য নষ্ট হইয়া যায়। আজিও জিয়ৎকুণ্ডের তীরে সাহ জোকাইয়ের সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। সমাধির সন্নিকটে কতিপয় মোগল আমলের তাম্রমুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছি।

মোগল আমলে এতদঞ্চল সুসমৃদ্ধ ছিল। কেদারমতী নদীর তীরে মোগল বাদশাহগণের ভগ্ন প্রাসাদ, প্রাসাদ সংলগ্ন হাতীশালা এবং প্রাচীর বেষ্টিত একটি পুষ্করিণী বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন কিয়দ্দূরে "ঈদ গড়" এবং একটি ইষ্টক নির্ম্মিত সমাধি দৃষ্ট হয়।

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে—মেঘসায়ার দীঘির উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব কোণে মোগল আমলের দুইটি ইষ্টক নির্ম্মিত সমাধি এবং মেঘসায়ার পল্লী বক্ষে মোগল আমলের একটি ক্ষুদ্র জলাশয় রহিয়াছে।

প্রদর্শনী

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ্চ স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে মহাসমারোহের সহিত প্রত্নদ্রব্যগুলির এক প্রদর্শনী হইয়াছিল। তদানীন্তন বাংলার জলসেচ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় এম,

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়

বি, ই, সি, আই, ই মহোদয় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন এবং তৎকালীন হুগলী জেলার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ আচার্য্য আই, সি, এস মহোদয় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্র প্রত্নশালা

কুমার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হুগলী জেলার প্রখ্যাত জমিদার এবং বাংলার অন্যতম মনীষী রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য

দস্তান। সন ১২৭০ সালের ১৪ই ভাদ্র হুগলী জেলার উত্তরপাড়াস্থ রাজভবনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনের ত্রিশ বৎসরকাল

৺রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আলোচনা করিলে বেশ অবগত হওয়া যায় যে—তিনি একজন পরাক্রমশালী পুরুষ। তৎপরেই তিনি পুণ্যকর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করিলেন। সাধনা অপূর্ব্ব ত্যাগ ও দানশীলতায় তিনি ঋষি সদৃশ সর্ব্বজনের ভক্তির পাত্র হইলেন। কালের প্রভাবে এই পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষ সন ১৩১৮ সালের ১৩ই আশ্বিন নশ্বর দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাঞ্ছিত চিরশান্তিময় ধামে গমন করিলেন।

গত ১০ই জুন এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের স্মৃতিরক্ষাকল্পে রাঢ়াপুরীর প্রত্ন সম্পদ দ্বারা তথাকার জয়কৃষ্ণভবনে "রাজেন্দ্র প্রত্নশালা" স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ-সম্পাদক শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানটির দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুত শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন মহাশয় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ দলে দলে সমবেত হইয়া আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

মহানাদ ইউনিয়নের জনপ্রতিনিধি ডাঃ অবনীমোহন ভট্টাচার্য্য মহানাদবক্ষে সংগৃহীত গুপ্তযুগের নাম কীর্ত্তি খোদিত মূর্ত্তি একটি প্রস্তর স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ এই প্রতিষ্ঠানে দান করিয়া ধন্য হইয়াছেন। বর্ত্তমানে স্থানীয় সর্ব্বসাধারণের মধ্যে উহার ক্রমোন্নতিকল্পে আগ্রহ দেখা যায়। অদূর ভবিষ্যতে বহুবিধ প্রত্নদ্রব্য সংগৃহীত হইবে সন্দেহ নাই।

রাঢ়াপুরী ষ্টেশন নামকরণ

মোগল আমল হইতে "দ্বারবাসিনী" নাম প্রচলিত হইতেছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। রাঢ়ের প্রাচীন গৌরব রক্ষার্থে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে বোর্ডের কর্তৃপক্ষগণের নিকট নিবেদন করিতেছি তাঁহারা দ্বারবাসিনী ষ্টেশনের নাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক "রাঢ়াপুরী" নামকরণ যেন করেন।

ব্যবধান

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

তোমারে নায়িকা করি একদিন লিখেছি কবিতা
সবুজের ছায়াঞ্চলে কাটায়েছি মাধুরী যামিনী।
আমার ভবন ছিল আলাপে আলোকে দীপান্বিতা
স্বকর্ণে শুনেছি তব নূপুরের মৃদু রিণিঝিনি।
সেদিন আমার বক্ষে দোলা দিত সমুদ্রের ঢেউ,
তোমারও হৃদয়ে সখি পুরবীর ললিত ঝঙ্কার
ভাষা তার না বুঝিতে তুমি আমি ছাড়া অন্য কেউ
আকাশের শতভিষা একমাত্র সাক্ষী ছিল তার।
বনে বনে দেখিতাম ফাল্গুনের মত কলোল্লাস
প্রতিটি বিকচ পুষ্পে মন্দারের মধুর সুরভি
অপূর্ব পুলক দিত শিশির-সিঞ্চিত শ্যামা ঘাস,
উদয়াচলের পথে মূর্তিমান আরক্তিম রবি।
সংসারের যাত্রা পথে আমি আজ ক্লান্ত সারথিক,
অভাবে ও অনটনে অষ্ট অঙ্গ ক্ষত ও বিক্ষত।
অকাল বার্দ্ধক্য লভি আমারে নিন্দিয়া ধিক্ ধিক্
শতছিন্ন বক্ষোবাস সামালিতে তুমিও বিব্রত।
মরে গেছে প্রেম কবে দুঃখের গরল করি পান,
পাশাপাশি শুয়ে থাকি—তবু যেন কত ব্যবধান

মিলন-তীর্থ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

(১)

বাহিরে বড় রাস্তার উপর গুলি চলছিল, বোমা ফাট্‌ছিল, ভীষণ শব্দ। শ্রীহরেন্দ্র ঘোষাল বুঝলেন যে সেদিন আর মক্কেল আসবে না, বরং পুলিসের এবং জনতার হাত এড়াবার জন্য, গৃহে অজানার আগমন সম্ভবপর। হরেনবাবুর ভাষা কোনোদিনই সুরুচি-সম্পন্ন বা মনোজ্ঞ নয়। তিনি পুলিস, কম্যুনিষ্ট, কংগ্রেসী সরকার এবং নিজের সম্বন্ধে বাছা বাছা শব্দে অন্তরতম মনের ভাব ব্যক্ত ক'রে সদর দরজা বন্ধ করতে গেলেন।

কী কাণ্ড! রাসবেহারী এভিনিউ থেকে বহু লোক গলির পথে পালাচ্ছিল। একদল লোক আবার শ্লোগান বল্‌তে বল্‌তে হাঙ্গামার দিকে যাচ্ছিল। ঠিক্‌ যখন হরেনবাবু দ্বিতীয় পাল্লা কবাট বন্ধ করতে যাচ্ছেন তখন এক ভীত প্রৌঢ় তাঁর মুখের উপর তাকিয়ে বল্লেন—হরেন নাকি?

শ্রীহরেন ঘোষাল একটু ভুরু কুঁচ্‌কে পলায়নতৎপরকে চিন্‌লেন। বল্লেন—আরে নরেশ! এসো! এসো! গুলি খেয়ে মরবে আর না হয় ভেজাব। জাহান্নমে যাক রাজনীতি। জ্বালাতন!

তারপর উকীল এক হাত ধ'রে টেনে নরেশকে বাড়ির মধ্যে গুদামজাত করলেন। সেই ফাঁকে এক যুবক প্রবেশ করলে তাঁর গৃহে।

—কে বাপু! হ্যাঁ! গায়ে রক্ত যে। গায়ে পেট্রোলের গন্ধ।

নরেশবাবু ডাক্তার। রক্তাক্ত-দেহ পরিচর্য্যা তাঁর সাতাশ বছরের নিত্য-কর্ম্ম। তিনি যুবকটির বাম হাতের ফুটো মাংস-পেশী চেপে ধরলেন। তাকে ভিতরে টেনে নিলেন।

বদ্‌-মেজাজী হ'লেও ঘোষাল মশায় উকীল। কত ধানে কত চাল হয়, কার সঙ্গে কী ব্যবহার করতে হয়, সে তত্ত্ব সবিশেষ বিদিত। লাল চক্ষু, গায়ে পেট্রোলের গন্ধ, হাতে ছিদ্র, অথচ বাহিরে থাক্‌তে যে তরুণ প্রস্তুত নয়, সে জাত-সাপ। কিছু বে-ফাঁস বললে তার বাড়ির সেই দুর্দশা হবে, যা মাঝে মাঝে মঙ্গলের-দশা-প্রাপ্ত ট্রাম-গাড়ি ও বাঘ-মার্কা বাসের হয়। মনের আসল ভাব, মাতৃ-ভাষা, রাষ্ট্র-ভাষা বা বিদেশী ভাষায় ব্যক্ত না ক'রে উকীলবাবু বল্লেন—আহা! গুলি লেগেছে। নরেশ দেখ ভাই—প্রাথমিক প্রতিবিধান কর। আমি টেলিফোন করি।

যুবক বল্লে—না না দয়া ক'রে ঐটি করবেন না। ওরা আমাকে চেনে। পেলে আর ছাড়বে না। কংগ্রেসী শয়তান—গোষ্ঠী পোষক—উঃ!

তাড়াতাড়ি উভয় প্রৌঢ় মিলে তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে শোয়ালে। আলোতে মুখ দেখলে, চাঁদ-পানা মুখ, কুড়ি বাইশ বছরের ছেলে।

ঘোষালবাবু আর একবার মনোভাবের একটা তরঙ্গ গোপন ক'রে বল্লেন—নরেশ কি চাই বল। আমার এক প্যাকেট তুলো আছে, দু'টা ব্যাণ্ডেজ আছে। সেদিন আমার ছোট মেয়ের ফোড়া কাটা হয়েছে।

—এল্‌কোহল্‌ আছে?

—হ্যাঁ তাও আছে।

যখন উকীলবাবু ফিরলেন, তাঁর সঙ্গে এলেন সহধর্মিণী শ্রীমতী বিরাজমোহিনী। শ্রীমতীর তেমন বাক্‌-সংযম নাই। তিনি বল্লেন—ওমা! কাদের ছেলে গো! কেন বাবা তুমি লঙ্কাপোড়ার মধ্যে গিয়েছিলে?

যুবক বল্লে—ওটা আমার কাজ। একখানা বাস্‌ পুড়িয়েছি।

ঘোষাল গৃহিণী বল্লে—ভালো কাজ করনি বাছা! ছিঃ! ছিঃ! ভদ্রলোকের ছেলে, কিছু হ'লে মায়ের কি হ'বে বলতো। পোড়ার মুখোরা ওস্‌কায়, এদের কচি কচি মাথাগুলো খায়। আহা! হ্যাঁগা দাঁড়িয়ে কী দেখ্‌ছো। পাখাটা বাড়িয়ে দাও। হাঁসপাতালের গাড়ি আনো। ভয় নেই বাবা! ভয় নেই।

ঘোষাল দু'কথায় বুঝিয়ে দিলেন যে যুবকের সে পথ বন্ধ। ডাক্তারবাবু তুলো দিয়ে রক্ত মুছছিলেন, বিরাজমোহিনী ছেলেটির মাথায় হাত বুলোচ্ছিলেন, হঠাৎ বুঝলেন যে

াক্তার অপরিচিত। তাঁর অগাধ বিশ্বাস নিজের ডাক্তার হেমেন্দ্রবাবুর উপর। তিনি বল্লেন—যদি এঁকে সাহায্য করতে হয়তো হেমেন্দ্রবাবুকেই টেলিফোন কর।

তাঁর স্বামী বল্লেন—আবশ্যক হবে না। তুমি আমার কাছে নিশ্চয় নাম শুনেছ, আমার বাল্যবন্ধু, সহপাঠী, ফরিদপুরের বড় ডাক্তার নরেশ সেন। নরেশ বুঝেছ ধ হয় ইনি—

শ্রীমতী এবার একটু মাথার কাপড় টেনে দিলেন। নরেশবাবু বল্লেন—হাত জোড়া। নমস্কার করতে পারলাম না।

এবার প্রগল্‌ভার বাক্য-স্রোতের উৎস-মুখ বন্ধ হ'ল। কিন্তু যুগ-যুগান্তরের মাতৃত্ব দমন করা শক্ত। এবার যুবকটি চোখ বুজেছিল। তার মাথায় হাত বুলিয়ে শ্রীমতী বল্লেন—গুলি মুলি তো আট্‌কে নেই। পুলিস চোর ধরতে পারে না, যে বোমা ফাটায় তাকে ধরতে পারে না, কেবল গুলি ছুঁড়ে মরে। হাতে বন্দুক থাক্‌লে বন-মানুষও গুলি ছুঁড়তে পারে।

তাঁর কম্যুনিষ্ট-সুলভ বাণী ব্যথিতকে তুষ্ট করলে। আহত হাসলে।

ডাক্তারবাবু বল্লেন—না। গুলি মাংস ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। খুব কাছ থেকে মেরেছে।

বেচারা আহত বল্লে—আজ্ঞে হাঁা। একটা বাড়ির দেওয়ালে গুলিটা বিঁধে আছে। ওদের বীরত্বের নিশানা।

গৃহিণীর হাতে হক্ কথার মান-দণ্ড।

তিনি বল্লেন—আজ্ঞে হ্যাঁ! তুমিও বাছা ছাই ছেলে। কেন হাঙ্গামার মধ্যে গিয়েছিলে?

ছেলেটিও সাহসী। সে বল্লে—এ পুঁজিবাদি-পোষক গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ করতে। রক্তর বদলে রক্ত চাই।

—ওমা! কি ছাই-পাঁশ কথা! তোমার বাবা তোমায় মারে না? বাপ আছে? মা আছে?

রোগী বল্লে—হ্যাঁ মা।

—আমি তোমার মার সঙ্গে দেখা ক'রে বলে আসব। এখন না। সেরে গেলে তোমায় একটা ঘরে আটক করে রাখবেন। মহাত্মার বই পড়াবেন।

সভাস্থ তিনজন পুরুষ খুব হাসলে।

ঘোষাল মশায় বল্লেন—শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর। বড়বৌ, ওসব পেল্লাদ-মার্কা ছেলে। প্রথম দিকটা বাপমা দেখে না। দলে পড়ে। বড় বড় কথা শোনে। তারপর মনটা বিষিয়ে ওঠে। তখন শিব-বাটা খাওয়ালেও ভূত ছাড়ে না।

ডাক্তার বল্লে—এখন সমাজতত্ব ছেড়ে, আমাকে কাজ করতে দাও। কতকগুলা জিনিস আনিয়ে দাও। হাঙ্গামা যেন কমেছে। ওকে ঘুমাতে দাও।

গৃহিণী বল্লেন—আমি দেখছি। আপনারা ও ঘরে যান।

শ্রীমতী এবার যখন মহাত্মা গান্ধী, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং শ্রীঅরবিন্দের নাম করলেন, রোগী চক্ষু মুদে রহিল, প্রতিবাদ কল্লে না।

ও ঘরে গিয়ে কিন্তু দুই বন্ধু সমাজতত্ব ছাড়লেন না।

ডাক্তার বল্লেন—ভাই মনে আছে গান—তোমারি পতাকা যারে দাও। এখন সেটা হয়েছে—তোমারি পটকা যারে দাও তারে ধ্বংসের দাও শকতি। কটা অবুঝ দেশটাকে মাটি করছে।

ঘোষাল বল্লেন—বুঝলাম ছেলেরা অব্যবস্থচিত্ত, অস্থির-মতি, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু চারিদিকে দেখছে অভাব, অভাব, অভাব। সামনে একখানা নিবিড় কালো পরদা। তাদের দলে টানবার জন্য একদল বক্তা চোখা চোখা বচন কাটছে। পাশ করে শান্তশিষ্ট হ'য়ে ভবিষ্যতে খেতে পরতে পাবে তার আশা নাই। এক্ষেত্রে ছেলেরা পরের হাতের ক্রাড়নক হ'বে না তো কি? ওদের রাজনীতির ঘূর্ণী স্রোত থেকে তোলো, প্রাণে আশার বীজ দাও, ওরাই আবার গড়বার দিকে মন দেবে।

ডাক্তার বল্লেন—কিন্তু তার জন্য সরকারকে সবাই দায়ী করে কেন? তুমি কি বলতে চাও এসবের জন্য কংগ্রেসী-সরকার দায়ী।

ঘোষাল হেসে বল্লে—আমরা জানি ওটা ভুল। ভুলছো কেন ব্রাদাব, তোমার বয়স পঞ্চাশ আর তোমার ও ঘরের রোগীর বয়স কুড়ি কি বাইশ। তুমি আমি বুঝি—কোনো গবর্ণমেণ্ট ইংরাজের কাছে উত্তরাধিকারীসূত্রে একখানা ভাঙ্গা বাড়ি পেয়ে তাকে দু-বছরে ইন্দ্রপ্রস্থ বানাতে পারে না। কিন্তু সে কথা বোঝে কে আর বোঝায় কে? যার বোঝাবার কথা সে এখন শাসক-সম্প্রদায়ের অভিজাত।

দুই বন্ধু হাসলে। নিজেদের কথা হ'ল। নরেশবাবু

মনে করছেন ফরিদপুর ছেড়ে কলিকাতায় আসবেন তাই বাড়ি দেখতে এসেছেন।

হরেনবাবু বল্লেন—ঐ দেখ তোমারও জনতার বুদ্ধি।

নরেশবাবু সে কথা স্বীকার করলেন।

আবার দুই বন্ধু সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতির গহ্বরে পড়লেন।

হরেনবাবু উকীল। কাজেই তার্কিক।

তিনি বল্লেন—ডেমক্রেসী তো একটা দল পাকাবার অবকাশ। যার দলে যত লোক জুটবে তার জয় জয়কার।

ডাক্তার বল্লেন—হ্যাঁ। কিন্তু সেই দল অন্ততঃ তিন প্রকার। এক দল নিঃস্বার্থ দেশসেবক। এক দল মাথম-চোরা দল বাঁধছে টু-পাইস পাবার লোভে, আত্মীয়স্বজনের সুবিধার লোভে। আর তৃতীয় দল বেলুনের মত গ্যাস-ভরা, অনেক থিওরি, অনেক বুদ্ধি, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে তাদের ওপরে-ওড়া গ্যাস-বুদ্ধির সমন্বয়ের কোনো সম্ভাবনা নাই।

এবার হরেনবাবু তাল ঠুকে লাগলেন। তিনি বল্লেন—যে দলের আজ হাতে শক্তি, তার মধ্যে ঐক্য নাই, আর তাদের সবচেয়ে দুর্বলতা কোথায় জান ?

নরেশবাবু হেসে বল্লেন—তোমার এখনও যৌবনের উত্তেজনা আছে।

উকীলবাবু হেসে বল্লেন—কংগ্রেসের নেতারা বা তাদের মন্ত্রীরা, লোকের সামনে বেরোতে ভয় পায় কেন ? ইংরাজ বিদেশী যেমন পরদার আড়াল থেকে রাজত্ব করতো, এঁরাও তাই চান। ছিঃ। জনতা যদি সত্য মনিব, তা'হলে তাদের সামনে এসে বোঝাক।

ডাক্তার বল্লেন—এই সব ছেলের কাছে মার খাবার জন্যে ?

উকীল বল্লেন—কেন ? ইংরাজের মার খাওয়া, তাদের অত্যাচারে জেল যাওয়া এই সব কারণে তো আজ ওঁরা আমাদের শাসন করবার দাবী করছেন। নিজেদের সাধু উদ্দেশ্য এবং ভালো কাজের ফিরিস্তি দিতে গিয়ে যদি নির্য্যাতীত হন সমাজের সহানুভূতি কোন দিকে যাবে ? সহীদ্-তর্পণ করেন। নিজে সহীদ হ'য়ে নিজের আদ্য-শ্রাদ্ধ দেখা মন্দ কি ?

ডাক্তার বল্লেন—কেন ওঁরা তো মাঝে মাঝে বেতারে বক্তৃতা দেন।

এবার হরেন ঘোষাল অভদ্রর মত চীৎকার করে বল্লেন—আকাশবাণী! দৈববাণী! জন্মাষ্টমীর থিয়েটার! তোমারে মারিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে। চালে কাঁকর নেই, আধ-পেটা ভাত খাও ? এসবে কাঁকড়-ভোজী, অর্দ্ধ-ভোজী আরও ক্যাপচুরিয়াস হয়।

গৃহিণী এসে বল্লেন—পাশের ঘরে রোগী। চেঁচাচ্চ কেন ? ছেলেটা একটু ঘুমিয়েছে।

তখন দুই বন্ধু রাজনীতি ও পরচর্চা ছেড়ে, নিজেদের সুখ দুঃখের কথা আরম্ভ করলেন।

(২)

প্রায় এক ঘণ্টা পরে বাহিরের গণ্ডগোল থাম্‌লো। আবার মানুষ বাস-পোড়া, গুলি-ছোঁড়া হট্টগোল ভুলে নিজ নিজ ধান্ধায় মন সন্নিবেশ করলে। কলিকাতার স্মৃতি-শক্তি কম।

রোগীর কি হবে এবার সে চিন্তা হ'ল বন্ধুদের। রক্ত বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসা চাই। রোগী নিজের নাম-ধাম কিছুতে বল্‌লে না।

—আমায় যদি প্রাণ দিলেন মা—তো ওটা মাপ করুন, আমি আণ্ডার-গ্রাউণ্ড যাওয়া কম্যুনিষ্ট। বদমায়েস পুলিস আমায় পেলে—

শ্রীমতী বিরাজমোহিনী বল্লেন—আচ্ছা বাবা, আচ্ছা বাবা, এমনি বেঁচে থাকো। তোমার মাথা খারাপ।

কোণের ঘরে পাকীস্তানের রাজনীতি আলোচনা হচ্ছিল নরেশবাবুর ফরিদপুর ত্যাগের প্রসঙ্গে। হঠাৎ বাহির হতে কোমল কাতর কণ্ঠের শব্দ এলো—উকীলবাবু আস্‌তে পারি ?

—হ্যাঁ আসুন।

আজ তাঁদের নবীন অভিজ্ঞতার দিন। গৃহে এলেন একটি সুন্দরী নবীনা লজ্জাবনত মুখ।

ঘোষাল বল্লেন—এস মা! কিছু বলবে ?

যুবতী বল্লে—বড় বিপদে পড়েছি। আপনার টেলি-ফোনটা একবার ব্যবহার করতে পারি ? বড় বিপদ।

—হ্যাঁ নিশ্চয়।

মহিলা এদিক ওদিক তাকালো।

উকীল বল্লেন—ওঃ। নম্বরের বই ? আনছি।

ডাক্তার বল্লেন—কী বিপদ! আমি ডাক্তার, আমার দ্বারা কিছু উপকার হওয়া সম্ভব?

আগন্তুকের নাম শেফালী। সে বল্লে—আমার মা ভুগছেন। আজ ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেছে কিনা। আমার বাবাকে হেঁটে আসতে হবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র রোড থেকে। হাঙ্গামায় মার হৃদ্‌রোগটা বেড়েছে। তিনি একেবারে শুয়ে পড়েছেন।

উকীলবাবু ডিরেক্টরী লুকিয়ে রাখেন পাড়ার লোকের টেলিফোনের ভয়ে। যদি বই না পেয়ে তাঁরা অন্যত্র যান এই অভিলাষ। তিনি বই নিয়ে যখন ফিরলেন, ডাক্তার সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন।

—কাকে টেলিফোন করবে মা? কোনো ডাক্তারকে?

মেয়েটি বল্লে—না বাবাকে। তিনি যদি আফিস থেকে না বেরিয়ে থাকেন যা হ'ক কিছু করবেন। বড় ভয় হ'চ্ছে। মার অবস্থা খারাপ।

ডাক্তার বল্লেন—কতদূরে বাসা।

—কাছেই। পিছনের রাস্তায়।

পাশের ঘর থেকে গৃহিণী এ কথা শুনলেন। ভাবলেন, পুরুষেরা কি ক'রে বিদ্যাবুদ্ধির গর্ব করে? একজন মহিলার হৃদ্‌রোগ। স্বামী জেরা করছেন, ডাক্তার মানের সঙ্গে পাঁয়তারা কষছেন—বিনা ডাকে রোগীর বাড়ী যাবেন কিনা।

তিনি এ ঘরে এসে বল্লেন—ডাক্তারবাবু আজ পরের উপকারের জন্যে ভগবান আপনাকে এখানে এনেছেন, দয়া ক'রে যান না খুকীর সঙ্গে।

ঘোষাল বল্লে—তা তো খুকী বলেনি।

—আমি বলছি। যান নরেশবাবু। আবার ফিরে আসবেন। আজ এখানে খেতে হবে।

—এসো মা। বাবার আফিসে উকীলবাবু টেলিফোন করবেন।

ছোটো বাড়ি। নিচের ফ্ল্যাটের লোকেরা বাহিরে গেছে। উপরে এক শয্যায় শেফালীর জননী চক্ষু মুদে শুয়ে ছিলেন। একটি দাসী পায়ের কাছে।

ডাক্তারবাবু পথে দেখেছিলেন এক ঔষধের দোকান। তিনি ছুটে সেখান থেকে বুক-দেখা যন্ত্র, সুচ আর ডিজিটেলিস নিয়ে এলেন। মহিলার হৃদয়ের অবস্থা খারাপ।

শেফালীকে ভয় দেখালেন না নরেশবাবু। রুগ্নার হাতে সুচ বিঁধে ঔষধ দিলেন। দুমিনিট বাদে তিনি তাকালেন।

শেফালী বল্লে—মা—মা—কেমন আছ মা?

তিনি ঘাড় নেড়ে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বল্লেন—ভালো।

শেফালী বল্লেন—ইনি ডাক্তারবাবু।

রোগিণী মৃদু হাসলেন।

ডাক্তারবাবু বল্লেন—সুস্থ বোধ করছেন? একটু স্থির হয়ে থাকুন, ঘোরটা কেটে যাবে।

তাঁর নির্দেশে শেফালী মার মুখে একটু জল দিল। ডাক্তারবাবু নাড়ি টিপে বল্লেন—এবার চোখ বুজে থাকুন। কোনো ভয় নাই।

সিঁড়ির দরজায় শব্দ হ'ল। শেফালী ছুটে বাহিরে গেল, বাবা! বাবা! ব'লে।

নরেশবাবু আশ্বস্ত হ'লেন। ভাবনায় আজ মহিলার দুর্বল হৃদ্‌-পিণ্ড ওঁকে কষ্ট দিচ্ছিল। স্বামীর প্রত্যাবর্তনে রুগ্না নিশ্চয় উঠে বসবেন। তিনি তাড়াতাড়ি আর একবার সূচিকা বিদ্ধ করবার জন্য যন্ত্র বার করলেন।

বল্লেন—আপনি উত্তেজিত হবেন না। ওঠ্‌বার চেষ্টা করবেন্ না।

না। বোধ হয় বাড়ির কর্ত্তা নয়। শান্ত শিষ্ট মেয়েটির গলা বেশ জোর উঠেছে। ডাক্তার নরেশ সেন স্থির হয়ে শুনলেন। আবার হাঙ্গামা বাঁধলো নাকি?

—লজ্জা করে না? তোমার জন্যে আজ আমরা মাকে হারাতে বসেছি! ছ'মাস বাদে আজ বাড়ি ঢুকছো। ছিঃ!

অপর পক্ষের উত্তর নাই।

পরক্ষণেই এক যুবক এসে রোগিণীর কণ্ঠলগ্ন হ'ল।

—মা। মা। ক্ষমা কর মা! বাঁচো মা। আর যাব না! মা। মা!

জননী চক্ষু মেললেন। হাসলেন। ছেলের মাথায় হাত দিলেন।

ডাক্তার বল্লেন—উত্তেজিত হ'বেন না। দিন্ তো হাতটা আর একবার ফুঁড়বো।

ম্লান হাসি জননীর মুখে। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন।

ঔষধ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডাক্তার পিছনে তাকিয়ে দেখলেন এক আগন্তুক।

আগন্তুক বল্লেন—ধন্যবাদ। আমাকে হেঁটে আসতে হ'ল, দেরি হ'ল।

ডাক্তার বল্লেন না যে সে অসুবিধার জন্ত গৃহস্বামীর পুত্র দায়ী।

নিঃশব্দে নরেশবাবু বাহিরে গেলেন। রোগিণীর পুত্রকে কিছু বল্লেন না। সে মাথা নিচু ক'রে জননীর মলিন মুখের প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। আবার ফিরে এসে ডাক্তার বল্লেন—দেখ খোকা, মা একটু সামলালে হরেনবাবুর বাড়ি এসো। তোমার চিকিৎসার বাকী আছে। হাতটা ঝুলিও না। ঠিক এসো। না হ'লে অ্যাম্‌বুলেন্স ডাকব।

বাহিরে এসে ডাক্তার নিজেকে প্রশ্ন করলেন—হরেনের স্ত্রীর হাত এড়িয়ে ছেলেটা মিলন-তীর্থে এলো কেমন করে?

শিলং থেকে তিনসুখিয়া

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(আসাম-ভ্রমণ)

চাকা যদি উল্টো দিকে চলত হঠাৎ—ঘোড়ার মনে
কী ভাব হ'ত—করেছে কি কেউ অনুমান তিন ভুবনে?
লাট্টু ঘোরায় যে-শিশু সে দেখত যদি—বোঁ বোঁ ক'রে
লাট্টুই ঘোরাচ্ছে তাকে—উঠত না কি গোঁ গোঁ ক'রে?
হঠাৎ উঁচুপানে যদি জল চলতে করত সুরু,
সুজলা এই ধরার হিয়া করত না কি দুরু দুরু?
অথচ এমনটা রোজই ঘটছে; দেখি মেললে আঁখি
আলো শাদা: মুদলে নয়ন সে-ই কালো হয়—জানি না কি?
স্বাস্থ্য যখন চলে উজান—রোগ মনে হয় উপকথা:
জরায় যখন ধুঁকি—মনে হয় যৌবন আকাশলতা।
উল্টো চাপেই শিখি বেশি: কান্না এলে তবেই বুঝি
অঢেল হাসির মাঝে কী পাই—কেন তাকে নিত্য খুঁজি।

লাটপ্রাসাদে ছিলাম কালই—রূপের আগুন চারিধারে
জ্বলত যেথায় শৈলমালায়, মেঘনিঝরের রংবাহারে
ঘণ্টা দিতেই দুদিক থেকে আসত ছুটে কিঙ্করেরা:
যেন তাদের রাজ-অতিথির চরণমূলেই বাঁধা ডেরা!
প্রদেশপালের দুঃখ সে কী: "দুদিন থেকেই যাবেন চ'লে?
থাকতে হবে দু সপ্তাহ পরের বার—এ রাখছি ব'লে।"
চাকা তখন সুমুখ দিকেই চলেছিল—বলাই বেশি:
হঠাৎ এসে তিনসুখিয়ায় দেখলাম যা—সে কোন্ দেশী?

মোটর ক'রে নিয়ে এলেন বিমানঘাঁটি থেকে যিনি,
শুনলাম তাঁর চায়ের বাগান—বহু ধনের মালিক তিনি।
কিন্তু, হায় রে, প্রাসাদটি তাঁর আজ মেরামত হচ্ছে কি না,
তাই তাঁর আর এক বন্ধু দিলেন আতিথ্য—
যাঁর নাম জানি না।
এই যে মাথা গুঁজবার ঠাঁই—নেই সেখানে কেউ, সে খালি
বাড়ির তলায় থাকেন—না, নয় বনমালী, শুধুই মালী।
শাস্ত্রে ব'লে সে-গৃহ নয় গৃহ যাহার নেই গৃহিণী
তারোপরে নেই এ-গৃহের স্বামীটি—পাঞ্জাবী যিনি।

ব'সেই আছি···"স্নান করব"—"যান না,
ঘর তো খোলাই আছে।"
"বালতি?"—"এলো ব'লে!"—বসি ফের···কই,
আসে না যে!
কেউ কোথা নেই—শেষে ঢুকি স্নানাগারে কোমর বেঁধে।
"জল কোথায়?"—"বাঃ ঐ যে কলে!" নেই তোয়ালে,
মরি কেঁদে।
ভাগ্যে ব্যাগে গামছা ছিল—তেল ছিল—স্নান নিলাম সেরে।
অতঃপরম্? দুর্বাসা নয় যে—খেতে তায় কে দেবে রে?
ভাগ্যে উষা এসেছিল শিলং থেকে সেবার্থিনী!
তক্তাপোষ একনা আনলে সে—জুটিয়ে দিতেন কোন্ গৃহিণী?

কিন্তু হায় রে, ময়লা এত!—দেখে আমায় শঙ্কাকাতর
উষাই দিল বিছিয়ে একটি ফর্সা যদিও ছেঁড়া চাদর।
হোক না ছেঁড়া—নেই-মাতুলের চেয়ে কাণা মামাও শ্রেয়!
"মাভৈ দাদা!" বলল উষা, "আসছে চর্ব্য লেহ্য পেয়।"···

ছুটো বাজে··· কোথায় চর্ব্য লেহ্যই নেই—বলি কাকে?
"মধুসূদন"—জপতেই মন দেয় তাড়া: "সে কোথায় থাকে?"
যাহোক এল চুমকি ঘটি, ডাল তাতে—আধ ছটাক আলু···
সে যে কী ঝাল!—গৃহস্বামী যাই হোন্ নন, নন দয়ালু।
ছিল বেগুন, ছুটী তম্বী রুটিও ছিল, "আর না না না"
বলতে আমার হোলোই না: এ-গৃহরাজের আছেই জানা
আহার একটু লঘুই ভালো—জঠরাগ্নির ঘোর দাহনে
ভুলেছিলাম—এ-নীতিপাঠ দিলেন তিনি করিয়ে মনে।

হতাশভাবে পান খাচ্ছি ফিলসফার ভঙ্গিমাতে,
ডাকছি: "গুরু! খুব সমতার দীক্ষা দিলে আশীবাদে।
যাহোক্, তোমার করতে যে-কাজ নিমন্ত্রিত এইছি আমি
এই বিভূঁয়ে—না হয় যেন বিফল—যেন পাই প্রণামী,
দক্ষিণা যা দেবে ব'লে আনল এরা ভর্সা দিয়ে
সে-কাজ যেন না হয় বিফল খালি হাতে ফিরে গিয়ে।"
গৃহস্বামী ছুপুরবেলা হাসিমুখেই দেখি ব'সে
তক্তাপোষের পাশেই—আলাপ করতে হবেই কপালদোষে।
(গৃহস্বামী বলছি—কারণ যদিও তিনি থাকেন দূরে
তবু গৃহ তাঁরই—তিনি বললেন আমায় হৃষ্টসুরে)
স্বগতোক্তি করলাম আমি তখন খেদে: "হায় রে গুরু!
করেছিলাম তর্ক আমি—expression এই জীবন পুরু।
যদি দিতাম (হায় রে!) যদি নীরবতাই সরেস এত,
চুপটি ক'রে ব্রহ্ম হ'য়ে থাকলে কে কার খবর পেত?
আজকে অনুতাপে আমার তনু দগ্ধ তাই কি হোলো?
নীরবতার গুণ যে কত—ভেবে চোখ আজ ছলোছলো!"
কিন্তু গৃহস্বামী তবু ছাড়েন না তো—আছেন ব'সেই!
বলতে হ'ল (expression এর ওকালতি করার দোষেই):
"বিষ্টি বুঝি খু—ব্ এখানে?"—"তা আর বলতে—
যা পড়ে বাজ!"
"গাছে গাছে"—"ফুল আর ফল, পুকুরে জল,
আর জলে মাছ।"

আধটি ঘণ্টা এম্নি ধারা গল্প ক'রে হাঁপিয়ে উঠে
মরীয়া হ'য়ে বললাম: "আচ্ছা একটু ঘুমই?" অম্নি ফুটে
উঠল হাসি তাঁর মুখে: "তা বটেই তো—আর ছুপুরবেলা
ঠেশে খাওয়ার পরেই নিদ্রা— শরীরকে নেই করতে হেলা।"
ঠেশে খাওয়া? ক্ষিদেয় যখন উঠছে কেঁদে ব্রাহ্মী নাড়ী:
পিঙ্গলা সুষম্না ইড়া—ফিরব তো প্রাণ নিয়ে বাড়ি?
ছুপুরে সেই অতি-মলিন চটা-পড়া দেওয়াল-ওয়ালা
অন্ধ কূপে ক্লান্ত দেহেও ঘুম আসে না—এ কী জ্বালা!
(শিলং থেকে সোজা নেমে যে আসে ঘোর তিনশুকিয়ায়
ঘুম ছুপুরে স্বপ্ন যে তার—না যদি হয় মত্ত নেশায়।)
বার্ণার্ড শ'র জীবনস্মৃতি পড়তে তখন উঠে রুখে
ঘুমবিরহ গেলাম ভুলি, ফেললাম হেসে অশ্রুমুখে।
বলছেন শ তাঁর 'শোভিয়ান্' ঢঙে: "আমার জীবনস্মৃতি
লিখতে আমি চাই না, কারণ আমার মনের রীতিনীতি
ধরণ ধারণ আজো আমি ঠিক ধরতে পারি নি কো,
যেমন, আজো পাইনি হদিশ—মুখে কেন যাই বলি গো—
মাথা আমার ঠিক না বেঠিক্—আর সে বেঠিক কতখানি,
কারণ আমার সন্দেহ হয়—দেন যাঁকে বর বীণাপাণি
নাম যশ তাঁর হ'তে পারে আমার মতন জগৎজোড়া:
কিন্তু বলবে কে যে নামীর যশস্বীর নয় কপালপোড়া?
কেমন? ধরো মেক্সিকোতে আমেরিকান এক সেনানী
স্পেনের জাহাজ পুড়িয়ে দিয়ে মুমূর্ষুদের টানাটানি
ক'রে বলেছিলেন হেঁকে—জানেন তিনি সবকাজে
সবশক্তি ভগবানে বিশ্বাস তাঁর অটল আছে।
এই উক্তি বেরোয় যখন—সব কাগজেই জয়ধ্বনি
করল বীরের—রটিয়ে তিনি ধর্মাবতার, গুণমণি।
সেদিন মনের ধন্দ আমার উঠল ফেঁপে: মনে মনে
সন্দেহের এই তক্ষক ঠাঁই পেল—যখন জনে জনে
এমন কথায় ধর্মবাণী শুনছে—তখন থাকতে পারে
সংশয় কি আর—যে আমি পাগল, শুধু জানি না রে!
কারণ, যদি পাগল আমি না হই—মানতে হবেই হবে
আমি ছাড়া আর সকলেই বদ্ধ পাগল হায় এ-ভবে:
কাজেই উচিত নয় যে তারা গারদ ছেড়ে বাইরে রবে।"
হাসির কথায় হাসে—যারা কাঁদতে আজো জানে নাকো
এই কথাটি বিখ্যাত শ বলছেন—তাই হেসে জাগো।
হাসির 'পরে মারলে টোকা কান্নার ফুল পড়বে ঝ'রে

তাই যখনই কান্না পাবে হাসো হাসো—আরো জোরে।
মিলল প্রমাণ একটু পরেই। এই ছড়াটি আমি যখন
লিখছি হেসে কেঁদে এলেন কর্মী একটি বলিষ্ঠ মন।
বললেন : এ কী শুনি ? আপনি ডাক বাংলোয় যাবেন ?
সে কি !
আমরা যখন আছি সেবক—আপনি যে কে জানি নে কি ?
কী চাই বলুন ? শুধু বাঘের দুধ ছাড়া আর সবই পারি
করতে জোগাড় এক নিমেষে—আমরা তরুণ, কার কী
ধারি ?"
বললাম আমি কুণ্ঠাভরে : "ধন্য ! কিছুই চাই না আমি
গৃহিণী না-ই পাই যদি—চাই একটি সজাগ গৃহস্বামী
অন্ন জল বা শয্যা যিনি দেবেন রেখে নেকনজরে :
অন্ন বিনাও চলে—কিন্তু ঘুম বিনা যে মাথা ঘোরে !
—"ঘুম ! সে কি ! ঘুম পাড়িয়ে তবে করব আমরা
জলগ্রহণ :
শুইয়ে দেব এমন তোফা রাতে—মালুম হবে তখন।"
শিউরে উঠি : "আবার মশায়, উঠব তো ফের কাল
সকালে ?"
বললেন হেঁকে সাবাস জোয়ান : "আমাদের এই জোর
কপালে
আপনাকে অতিথি যখন—" বললাম আমি বাধা দিয়ে :
"হয়ত কপাল জোর আপনাদের খুবই—কিন্তু—
অর্থাৎ—ইয়ে
শুনুন, আমায় দিন না শুতে ডাকবাংলোয় আজকে রাতে
পড়বে যখন পোড়াকপাল কালই জোর কপালদের হাতে।"
"না না ঠাট্টা নয়—কি জানেন ? জানি আমি—অসুবিধে
হচ্ছে খুবই—কিন্তু—মানে মানুষের মন নয় তো সিধে—
কী হয়েছে বলব ? শুনুন। আমরা পোলিটিকাল কিনা :
তাই শহরের কর্তারা সব বললেন : "আমরা কেউ চাই না
দিলীপ রায়কে ঠাঁই দিতে—উঃ—কী যে দলাদলি মশাই !
জানেন না তো দলের ফেরে দয়ালরাজ হন কেমন কশাই।
তাই তো ভালো একটি ঘরও পেলাম না—যাক্, দুঃখ ক'রে
কী ফল বলুন ? কিন্তু আপনি পড়েন নি তো আজ
বেঘোরে—
তাই বলছি এই ঘরেতেই ঘুমিয়ে পড়ুন হাসি মুখে—
ডাকবাংলোয় কী ঘুমোবেন ?—এইখানেই বেশ
থাকুন সুখে।"
বললাম আমি : মাপ করবেন—বুদ্ধি আমার হয়ত অতি
নয় ধারালো—কিন্তু যদি ঐখানে যাই কার কী ক্ষতি ?
ডাকবাংলোয় চাই তো শুধু ঘুম দিতে—ফের সকালবেলা
মিলব আবার সবার সাথে—জমবে তখন গানের মেলা।"
এমন সময় একটি সুজন যেন স্বর্গ থেকে নেমে—
দেবদূতের মতই সে বললেন : "যাক্ তর্ক থেমে
আমার বাসায় চলুনই না—বলেছিলেন ওঁরা সবাই
আপনাকে খুব ভালো ঘরেই হয়েছে ঠাঁই দেওয়া, মশাই
কিছুই আমি জানতাম না—হবে গুণীর এমন দশা
শান্তি যদি হয় পেতে চাই তর্কের রাশ একটু কষা।
গেলাম তখন তাঁরি গৃহে চমকে খুবই উঠেছিলাম
তিনশুখিয়ায় এমন বাড়ি আছে—কবে শুনেছিলাম ?
এমন বাগান, বিজলি বাতি, ফ্যান্ স্নানাহার, সর্বোপরি
গৃহস্বামীর নামও দীনেশ ফের চাকা কি ঘুরল হরি !
গুরুবলে—এই বিভুঁয়ে এঁর আতিথ্যে বেশি ক'রেই
দেখব বুঝি—ভাঙা কপাল যায় জুড়ে সেই কপাল
জোরেই।"

(তিনশুখিয়া, ৪ঠা, ৫ই অক্টোবর ১৯৪৩)

দাদ্‌রা

পাসাণ দেবতা ফিরায়োনা মুখ,
কথা কও কথা কও,
মানুষে রাখিয়া মরণের মুখে,
নীরবে কেন গো রও।
অমরাবতীর নন্দন বনে
ঝরে নাক বুঝি ফুল,
অমর জীবনে শুধু আনন্দ,
ফোটে না ব্যথা মুকুল।
তাই তো বাজে না মরতের বুকে,
বেদনা ব্যথিত নও।

ভালবাসা যদি বিরহবিহীন,
কিবা আছে তার দাম।
বিরহের মাঝে আজও বেঁচে আছে,
প্রেমময় রাধা-শ্যাম।
দেবতা মানুষে কেন ব্যবধান,
কেন বল এ বিভেদ,
মানুষই গড়েছে দেবতা তোমারে,
মানুষই লিখেছে বেদ।
দেবতা সেদিন পতিতে যেদিন,
বুকে তুমি টেনে লও।

কথা ও সুর :—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীতারাপদ চক্রবর্ত্তী   স্বরলিপি—শ্রীনীহারকণা মুখোপাধ্যায় এম-এ

II পা পমা মণণপা | মজ্ঞা রা রা I সরা মণ্‌সণ্‌া সা | রগা গা গা I
পা ষা• ০০০ণ দে ব তা ফি০ রা০০০ য়ো না০ মু খ

ম্া দ্া দ্া | সা ন্া ন্সা I রসা -া ন্রসস | সন্া দ্া দ্া I
ক থা ক ও ক থা০ ক ০ ০০০০ ০ ০ ও

দ্া ন্া ন্া | ন্া সা জ্ঞা I জ্ঞসা -া -া | -া -া -া I
ক থা ক ও ক থা ক ০ ০ ০ ০ ও

{সা গা গা | গা গা গা I মা মা মা | মা মা মা I
{মা নু ষে রা খি য়া ম র ণে র মু খে

মা পা দা | দপা পণণদা পা I দপমদা পা -া | দপা মা মা} II
নী র বে কে০ ন০০০ গো র০০০ ০ • ০ ০ ও}

কথা কও কথা কও ইত্যাদি।

+ ০ + ০
II { পা পর্সণণা ণপা | মজ্ঞা রা রা I সা রা ণ্‌া | মা জ্ঞা রা I
অ ম০০০ রা ব তী র ন ০ ন্দ ন ব নে

সা জ্ঞা সা | জ্ঞা মা পা I সণা -া -া | -া -া -া I
ঝ রে না কো বু ঝি ফু ০ ০ ০ ০ ল

ণা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা I ণর্সা ণজ্ঞা জ্ঞর্সা | ণদা -া দা I
অ ম র জী ব নে শু০ ধু০ আ ন ০ ন্দ

দণা দণর্সা মণা | দা পজ্ঞা জ্ঞমপদা I মপা -া -া | -া -া -া } I
ফো০ টে০০ না ব্য থা০ মু০০০ ফু ০ ০ ০ ০ ল

পা পণা ণদা | পা মা মা I জ্ঞমা জ্ঞপা পমা | মজ্ঞা জ্ঞঋা সা I
তা ০ই তো বা জে না ম০ র০ তে র ব্য থা

ণ্‌া ঋা ঋা | গা গমা মদা I দমা -া -া | -া -া -া II
বে দ না ব্য থি০ ত০ ন ০ ০ ০ ০ ও

কথা কও কথা কও ইত্যাদি।

II { সা গা গা | গমা মা মা I মা পধণা ণধা | গপা পমা মা I
ভা লো বা সা০ য দি বি র০০ হ বি০ হী০ ন

রা মা পা | ধা রমপা ধর্সণা I পধা -া -া | -া -া -া I
কি বা আ ছে ভা০০ ০০র দা ০ ০ ০ ০ ম

ণা ণা ণা | ণা ণা ণা I ধা পধর্সণা ণধা | ধপা মা মা I
বি র হে র মা ঝে আ জো০০০ বেঁ চে আ ছে

মা রমপণদা পা | মজ্ঞা জ্ঞা সরমজ্ঞা I সা -া -া | -া -া -া I
প্রে ম০০০০ ম য়ু০ রা ধা০০০ শ্যা ০ ০ ০ ০ ম

সা জ্ঞা জ্ঞা | র্সা গা গপা I মা -া -া | -া -া -া } I
প্রে -ম ম য় রা ধা০ শ্যা ০ ০ ০ ০ ম }

{ পা পর্সণর্সা ণপা | মজ্ঞা রা রা I সরা সণ্‌া ণ্‌া জ্ঞা রা রা I
{ দে ব০০০ তা মা ন্থু যে কে০ ন ব্য ব ধা ন

সা জ্ঞা সা | জ্ঞা মা পা I সণা -া -া -া -া -া I
কে ন ব ল এ বি ভে ০ ০ ০ ০ দ

ণা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা I ণর্সা ণর্জ্ঞা র্জ্ঞর্সা | ণদা দা দা I
মা নু ষই গ ড়ে ছে দে০ ব০ তা তো মা রে

দণা দণর্সা র্সণা | দা পজ্ঞা জ্ঞমপদা I মপা -া -া | -া -া -া } I
মা০ নু০০০ ষই লি খে০ ছে০০০ বে ০ ০ ০ ০ দ }

পা পণা ণসা | পা মা মা I জ্ঞমা জ্ঞপা পমা | জ্ঞঋা সা সা I
দে ব০ তা সে দি ন প০ তি০ তে যে দি ন

ণ্‌া ঋা ঋা | ঋা গমা মদা I দমা -া -া | -া -া -া II
বু কে তু মি টে০ নে০ ল ০ ০ ০ ০ ও

কথা কও কথা কও ইত্যাদি।

রূপ ও অরূপ

শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়

বৈশেষিক দর্শনে পৃথিবীর সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে—"রূপরসগন্ধস্পর্শবতী পৃথিবী।" জন্ম লভিয়াছে এই পৃথিবীতে যাহারা এবং যাহা, তাহাদেরই আছে উপরোক্ত গুণাবলী। এই ধরণের মাটী, পাথর প্রভৃতি আপাত জড়ে বৃক্ষলতা-গুল্মাদিতে পশু-পক্ষী কীট পতঙ্গ-সরিসৃপাদিতে এবং স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষে, এই সমস্ত গুণগুলিই প্রকাশিত অল্পবিস্তর। সুতরাং এই দৃশ্য পৃথিবীর, জড়ের, অন্নময় দেহের আছে রূপ অর্থাৎ অবয়ব এবং আকৃতি। এই রূপের পিছনে আছে প্রাণ, তাহার কোনও রূপ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা প্রাণকে অস্বীকার করি না। কারণ আমরা নিয়তই তাহাকে করি প্রত্যক্ষ। বৃক্ষলতাদেরও আছে প্রাণ, অনুভূতি—যাহা প্রমাণ করিয়াছেন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু। প্রাণশক্তির ইতর বিশেষে ইহাদের সজীবতা হয় নষ্ট এবং অভাবে হয় মৃত্যু। পশু, পক্ষী প্রভৃতি জানোয়ারের সম্বন্ধেও ঠিক একই নিয়ম। মানুষেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। এই প্রাণেরই একটা অভিব্যক্তিকে বলা চলে বোধ শক্তি, স্পর্শে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। এই গুণনিচয় উপরোক্ত বৃক্ষাদিতে ও জানোয়ারে আছে। কিন্তু বোধের, প্রাণের উপরে যে ইচ্ছা, এবং যাহার বাহ্য হইতেছে মনন শক্তি, তাহার কোনও রূপত নাইই, উপরন্তু তাহাকে বোধ করিলেও তাহার প্রমাণ অন্য কিছু দেওয়া যায় না—কেবল আমাদের ইচ্ছাশক্তি ব্যতীত। পাশ্চাত্য জগতে মনোবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মন সম্বন্ধে আমরা খুব কমই জানি। মন সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে গবেষণা হইয়াছে তাহা অনেক উচ্চতর ধাপের। মনের কোন রূপ নাই বটে, কিন্তু তাহার বীর্য্য অসাধারণ। মানুষ মানসিক শক্তিবলে অনেক অলৌকিক কার্য্য করিয়াছেন। অনেক জড় জিনিসের সৃষ্টি এবং তাহাদের লয় করিয়াছেন। ইচ্ছাশক্তি—যাহা এই মনঃ শক্তিরই রূপান্তর মাত্র—তাহার দ্বারা অনেক কঠিন কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় হইয়াছে। এই ইচ্ছাশক্তির পিছনে আছে বিশ্বভূক ইচ্ছাশক্তির প্রেরণা। এই প্রেরণার আছে দুইটী দিক্—একটী অপরা এবং অপরটী পরা। পূর্ব্বোক্ত শক্তি আমাদের জন্মমৃত্যুর শৃঙ্খলে রাখেন বাঁধিয়া এবং পরেরটীর কাছে আছে মানুষের দিব্যজীবনের চাবিকাঠি। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান এই মনের ঊর্দ্ধে কোনও সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কিন্তু হিন্দুযোগদর্শন বলে যে মনের পশ্চাতেও আমাদের সত্তা আছে—যিনি অরূপ হইয়াও জীবে, বৃক্ষাদিতে রূপায়িত করিয়াছেন নিজেকে। এই রূপ ও অরূপের মাঝে আছে কি কোনও ধাপ কোন উত্তরণের ক্রম? আমাদের ব্রহ্মবিদ্ ঋষিরা এ সম্বন্ধে করিয়াছেন এত গবেষণা যে অন্য কোনও দেশে আর তাহা হয়নি। এই গবেষণার নাম দিয়াছেন তাহারা আধ্যাত্মিকতা বা ব্রহ্মবিদ্যা। সব সময়েই সূক্ষ্ম কোনও পদার্থের ধারণা করিতে হইলে আমাদের স্থূল হইতেই অনুসরণ আরম্ভ করিতে হয়। ঊর্দ্ধের এই ধাপগুলিকে উপনিষদে এইভাবে বর্ণিত করা হইয়াছে—"অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে। জাতান্যন্নেন বর্দ্ধন্তে। অদ্যতে ঽত্তি চ ভূতানি।" এই পৃথিবীতে অন্নের, জড়ের হইয়াছিল প্রথম সৃষ্টি। এই অন্নের দ্বারা সমস্ত ভূতগণ, সৃষ্ট প্রাণীসকল জন্মগ্রহণ করে এবং জন্মের পর এই অন্ন ভক্ষণের দ্বারাই পরিপুষ্ট হয়, পুনরায় অন্নেই বিলীন হয়। উপরোক্ত মন্ত্রে যে সত্য নিহিত আছে তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এই পৃথিবীর রস গ্রহণ দ্বারাই মানব হইতে মানবেতর সমস্ত প্রাণী এবং বৃক্ষলতাদি জন্মগ্রহণ করিয়াই হয় পরিপুষ্ট। এই পৃথিবীর আলো ও বাতাসের স্পর্শেই প্রাণীগণ যে পরিবর্দ্ধিত হন, তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। মৃত্যুর পরে এই দেহের ও রূপের এই মাটিতে এবং অপরাপর উপাদান পঞ্চভূতে বিলীন হয়। কিন্তু মৃত্যুর পরে অন্নময় দেহ ব্যতীত অপরাপর যে কোষ নিচয় থাকে বর্ত্তমান প্রাণ তাহাদের মধ্যে একটী। এই দৃশ্য জগত যেমন, তেমনি অদৃশ্য জগতও আছে, যাহাদের নামকরণ স্তর বলিলেই হয় ভাল। এই দৃশ্য জগতের পরের জগতই হইতেছে প্রাণের স্তর। সেখানে আকৃতি, অবয়ব কিংবা রূপের বালাই নাই। কিন্তু সেই জগতের প্রাণীরা ইচ্ছামত রূপধারণ করিতে পারে কিন্তু তাহা ঠিক আমাদের মত জড়দেহ নয়। এই প্রাণের স্তর হইতেই মানুষে আগমন প্রাণের। মানুষ, আমাদের মাঝে বিরাজিত স্থূল প্রাণকে অনুসরণ করিয়াই এই অদৃশ্য স্তরকে এবং স্তরের প্রাণীদের অনুভূত করিতে পারে। সেই প্রাণের আগমন হইতেই আমাদের দেহে প্রাণের কোষের সৃষ্টি। এই প্রাণের স্তরের ঘাত প্রতিঘাত, তরঙ্গই মানুষকে অনুপ্রাণিত করে কামনা, বাসনা, অহংকার প্রভৃতি রিপুর দ্বারা। মানুষের এই 'অহং'এর মূলেই আছে এই স্তরের অশরীরী প্রাণীদের ক্রিয়া। আমাদের এই সব রিপুকে প্রকৃত সত্যের দিকে যিনি চালিত করেন তাঁহাকেই উপনিষদ বলিয়াছেন "তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।" তিনি অন্নরসময় কোষ ব্যতীত প্রাণময় কোষের আত্মা স্বরূপ এবং তাঁহাকে পুরুষরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এই পৃথিবীই তাহার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ কাজ করিবার ক্ষেত্র। জড় কোনও পদার্থ যেমন প্রাণ ব্যতীত এক পলকও থাকিতে পারে না প্রাণও তেমনি জড়দেহ আশ্রয় করিয়াই জনম লভে, পরিপুষ্ট এবং ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হয়। প্রকৃতপক্ষে জীবনের ছন্দ, গানই হইতেছে প্রাণ। কিন্তু আমাদের এই প্রাণশক্তি অদৃশ্য প্রাণের স্তরের অমূর্ত্ত অশরীরী শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। সেই জন্যই ঊর্দ্ধ চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলেই আমাদের শরীরের বর্ত্তমান চেতনার হয় ঊর্দ্ধে

উঠিতে এবং এই আরোহণের সঙ্গে আমাদের প্রাণের স্তরের শক্তির সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। প্রশ্ন হইতে পারে যে এই আরোহণ, সাধারণ চেতনার উত্তরণের আছে কি কোনও প্রয়োজন? উপনিষদই দিয়াছে তাহার উত্তর। "যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে। তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষ মুচ্যতে ইতি।" যিনি এই উত্তরণের, চেতনার প্রসারের করেন চেষ্টা, তাহাকে প্রাণকেই ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করিতে হইবে। এই স্থূল প্রাণকে উপাসনা করিলে আমরা প্রাণের সূক্ষ্ম স্তরের সহিত হইব পরিচিত। এই পরিচিত হইতে পারিলেই আমরা অপর মানুষের, প্রাণীর এবং দৃষ্ট প্রাণবন্ত পদার্থের প্রাণের অসঙ্গতি ও দ্বন্দ্বের সহিত হইব পরিচিত। এই পৃথিবীতে বেশীরভাগ দ্বন্দ্বের, বাধার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, অপরকে প্রকৃতভাবে বুঝিবার অক্ষমতাই আছে এই সবের মূলে। কামনা, বাসনা প্রভৃতি বিপুল দ্বন্দ্ব হইতেই মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে হয় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। কিন্তু আমাদের যদি সেই দৃষ্টি খোলে তবে দেখা যাবে যে প্রকৃতপক্ষে এই বিরোধের মূলে কিছুই নাই। প্রত্যেক মানুষই কম-বেশী এই প্রাণের দ্বারা হয় চালিত। কিন্তু জানোয়ারেরা এই শক্তির ক্রীড়নকমাত্র। তবে মানুষে ও জানোয়ারে পার্থক্য কোথায়? মানুষের এমন একটা শক্তি, এষণার ইচ্ছা আছে যাহার দ্বারা সে এই প্রাণ শক্তির উদ্দাম বেগকে সংযত রাখিতে পারে এবং তাহার দ্বারা এই প্রাণের প্রতীক রিপুগণকে আহরণ করিতে পারে নিজের মধ্যে এবং বুঝিতে সক্ষম হয় যে তাহার এই উচ্ছৃঙ্খলতা ও উদ্দাম বেগের মূলে আছে এই সব অদৃশ্য শক্তির ক্রিয়া এবং এই বুঝিবার, উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা যাহার মাঝে যে পরিমাণে হয় পরিস্ফুট, তিনি সেই পরিমাণে অপরের অসঙ্গতির বিষয় বুঝিতে সক্ষম হন। এই বোঝা-পড়ার অভাবই আমাদের প্রাণের অসঙ্গতির কারণ। এই পথে চলিবার উপায় স্বরূপ উপনিষদ আমাদের স্থূল প্রাণকেই ব্রহ্মের প্রতীক্ বলিয়া উপাসনার কথা বলিয়াছে—যেন আমরা সূক্ষ্ম প্রাণের স্তরে এবং আমাদের প্রাণের কোষে পৌঁছাইতে পারি। ইহার ফলে আমরা যে শুধু সূক্ষ্ম প্রাণ-শক্তির কথাই জানিতে পারিব তাহা নহে, আমাদের স্থূল প্রাণের অসঙ্গতি, যাহার ফলে হয় অসুখের উৎপত্তি নানা-রকমের, তাহার বিষয়ও পূর্ব্ব-হইতেই জানিতে সক্ষম হইব, সুতরাং অনেকে আধি ব্যাধি হইতে হইব মুক্ত।

কিন্তু এই জানাই আমাদের শেষ কথা নহে। তাই উপনিষদ্ বলে, "তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব।" প্রাণের স্তর হইতে প্রাণের আগমনে যেমন প্রাণের সৃষ্টি, তেমনি এই বিশ্বে যে মনের স্তর আছে সেখান হইতে অন্নময় কোষে দেহে, মনের অবতরণই হইতেছে—মানব সৃষ্টির চরম রহস্য। এই মন হইতেই 'মানব' আজ এই পদবাচ্য। সুতরাং মনের উৎকর্ষতাই মানুষ সৃষ্টির অত্যন্ত স্বাভাবিক কথা। মনই মানুষকে অপর সৃষ্ট জীব হইতে পৃথক করিয়াছে। অন্য কোনও জীবে—যেমন বানর ইত্যাদিতে মনের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তাহার উৎকর্ষতা হয় নাই। কিন্তু মানুষেই ইহার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। কিন্তু মনের কোনও অবসর নাই। মনের সহিত স্বামী-বিবেকানন্দ গভীর সমুদ্রের তুলনা করিয়াছেন। এই তুলনা প্রকৃতপক্ষে অতুলনীয়। গভীর সাগরে নাই ঊর্ম্মিমালা, তেমনি মনের গভীরে নাই মনের বৃত্তির বিক্ষেপাবস্থা। এইরূপ মনের গভীরের উপলব্ধি না হইলে আমরা প্রকৃতপক্ষে মনের কোনও উৎকর্ষতালাভ করিতে সক্ষম হই না। মানব মন প্রকৃতপক্ষে সদাসর্ব্বদাই প্রাণের বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত এবং এই জন্যই মনঃস্থির না করিলে মানুষ কোনও মানবোচিত কাজ করিতে হয় না সক্ষম এবং এই অক্ষমতার উপরে উঠিতে না পারিলে আমরা মনের স্তরের কথাও জানিতে হই না সক্ষম। অথচ মনের এই স্তরের সহিত অপরিচিত মানুষের দ্বারা কোনও প্রকারের স্থায়ী শিল্প, কলা কিম্বা রস-সৃষ্টির হয় না সম্ভব। শ্রেষ্ঠ কবি যে, শিল্পী যে, তাহাদের সহিত অজানিত ভাবে এই জগতের সহিত হয় পরিচয়—কিন্তু সেটা একেবারে আকস্মিক এবং ক্ষণিক, কিন্তু এই মনের জগতের ভাবধারা তাহার মনে প্রতিফলিত হইলেই তবে প্রকৃতপক্ষে রসের সৃষ্টির সম্ভাবনা। এই সৃষ্টি, এই সংযোগ, নিরবচ্ছিন্ন রাখবার নামই হইতেছে এই স্তরের সহিত আমাদের যোগ। প্রাণের স্তরের মতন মনের স্তরেরও নানাবিধ পর্য্যায় আছে। ঋষি শ্রীঅরবিন্দ তাহাদের কয়েকটীর মাত্র এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন :—প্রবুদ্ধ মন, স্বজ্ঞ মন, প্রজ্ঞা মন ইত্যাদি। এই প্রত্যেকটী স্তরের অদৃশ্য শক্তি সকল আমাদের মনকে করে প্রভাবিত এবং যিনি যত উদ্ধস্থিত মনের স্তরের সহিত পরিচিত, তিনি তত স্থায়ী শিল্পের, চিত্রের পরিকল্পনাকে দিতে পারেন রূপ। সুতরাং এই সব স্তরের সহিত নিবিড় সম্বন্ধ-স্থাপন করাই উপনিষদের উদ্দেশ্য। তাই বেদের ঋষিগণ যে সব ছন্দ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা শাশ্বত, যে সব সামগান রচনা করিয়াছেন তাহা আজও মানব প্রাণে দেয় সাড়া এবং উপযুক্ত আধারে তাহা হইয়া উঠে জাগ্রত ও জীবন্ত। বস্তুতঃ কোনও প্রকৃত সৃষ্টিই হয়না সম্ভব এই পরিচয় ব্যতীত।

কিন্তু মানব মনের এই ভাব-ধারা পরিচালিত করিবার একটী পরিচ্ছেদ, একটা সীমা আছে—যাহার জন্য তাহার পক্ষে পরিপূর্ণ প্রকাশ করা হয় না সম্ভব। তাই উপনিষদ মানব চেতনাকে আরোও উর্দ্ধমুখী করিবার পথের সন্ধান দিয়াছে। "তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মাবিজ্ঞানময়ঃ। তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ। ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ। যোগ আত্মা। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" পরাবিদ্যার-জ্ঞানে জ্ঞানী হইবার একমাত্র যোগকারক হইতেছে এই বিজ্ঞানময় কোষে বিরাজিত পুরুষ। তাঁহার সঙ্গে যোগ স্থাপিত হইলে তবেই-বিশ্বরাজ্যে যে বিজ্ঞানময় স্তর আছে তাহাদের সহিত আমাদের হয় পরিচয়। সুতরাং পরাবিদ্যা যাহার কাম্য, বিজ্ঞানময় কোষ পর্য্যন্ত তাহার চেতনাকে প্রসারিত করিতেই হইবে। এই পুরুষ এবং এই স্তরের সহিত সুপরিচিত ছিলেন বলিয়াই রামকৃষ্ণদেব অপরা ব্যবহারিক বিদ্যার সহিত কোনও প্রকারের সংযোগ না থাকা সত্ত্বেও বেদ, বেদান্ত এবং উপনিষদ প্রভৃতির সুচিন্তিত পণ্ডিতী বিরোধ সকল মীমাংসা করিতেন অত্যন্ত সহজ, সরল এবং স্বাভাবিকভাবে। এই জগৎ সৃষ্টির

আদি-রহস্য যাহার করায়ত্ত তাঁহার নিকট মানবীয় সমস্যার সমাধান অত্যন্ত সহজ নিশ্চয়ই। এইরূপ কোনও পুরুষ যদি বৈজ্ঞানিক হন, তিনি মানবীয় বুদ্ধি, যুক্তি এবং তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত সমস্ত সমস্যার সমাধান করিবেন যে কোনও নামী বৈজ্ঞানিকের চাইতে সুষ্ঠুভাবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

এই বিদ্যালাভের শির অর্থাৎ মস্তক বিশেষ হইতেছে শ্রদ্ধা। কাহাকে শ্রদ্ধা? আপ্তকাম পুরুষ এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের শ্রদ্ধাই হইতেছে এই বিদ্যা জানিবার প্রধান কথা। আপ্তকাম পুরুষ কাহারা? যিনি এই জ্ঞানে জ্ঞানী তিনিই আপ্তকাম এবং তাঁহার প্রচারিত পথের সন্ধানের উপর আমাদের শ্রদ্ধার একান্ত প্রয়োজন। বস্তুতঃ শ্রদ্ধা, যাহার মূলে আছে বিশ্বাস, তাহার অবর্ত্তমানে কোনও বিদ্যার পথেই অগ্রসর হওয়া যায় না। দুই দুইয়ে যে চার হয় এই সিদ্ধান্তে স্থির বিশ্বাস না থাকিলে যেমন অঙ্ক শাস্ত্রে অগ্রসর হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, তেমনি যে সমস্ত মহাপুরুষ এই বিদ্যার সন্ধান পাইয়াছেন তাঁহাদের বাক্যের উপর আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকার প্রয়োজন। জিজ্ঞাসার প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই; কিন্তু যে জিজ্ঞাসার মূলে আছে শুষ্ক পাণ্ডিত্য তাহা সমস্যাকে জটিল করে এবং সে প্রশ্ন কোনও দিনই সুফল দিতে সক্ষম হয় না।

আরোও একটী প্রধান কথা হইতেছে—ব্রহ্মের, ঈশ্বরের, ভগবানের, পরা-শক্তির অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা। আমি যদি মনে করি ব্রহ্ম নাই, তবে নিশ্চয়ই ব্রহ্মকে পাইতে সক্ষম হইব না। এই বিদ্যা মানুষের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্ভবে না, সুতরাং মন এই ইন্দ্রিয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রশ্নের, অবিশ্বাসের পথে চলিলে সেই বস্তুকে পাওয়া সম্ভবপর নয়, সেইজন্যই একটী চল্‌তি কথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে যে, "বিশ্বাসে মিলায় হরি, তর্কে বহুদূর।" সুতরাং উপনিষদের ঋষি, যিনি আপ্তপুরুষ, তিনি বলিয়াছেন শ্রদ্ধাই এই বিদ্যার মস্তক স্বরূপ। মস্তক-বিহীন মানুষ যেমন কল্পনা করা যায় না, শ্রদ্ধাশূন্য হইয়া এই বিদ্যালাভও সম্ভবপর নহে। এই বাক্যে আমাদের বিশ্বাস অটুট থাকার একান্ত প্রয়োজন।

ঋতং অর্থাৎ এই পথে চলিবার সত্য জ্ঞানই ইহার দক্ষিণ বাহু স্বরূপ। প্রকৃত পথ না জানিলে যেমন অনেক সময় বিভ্রান্ত হইতে হয়, তেমনি যাঁহারা প্রকৃত সত্যের পথ জানেন না, তাঁহারা অনেকেই নানাপথে ঘুরিয়া শেষে পথ হারাইয়া বিভ্রান্ত হইয়া জীবনের শেষে হা হুতাশ করেন। সেইজন্য ঋষি আমাদের সাবধান করিতেছেন যে সত্য-পথে চলিবার উপযুক্ত লোক চাই। শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস যেমন শির, এইরূপ জ্ঞানী পুরুষের আশ্রয়ই তেমনি দক্ষিণ বাহু স্বরূপ। ইহার অভাবে এই পথে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। এই সমস্ত বাক্য এবং অভিজ্ঞতা হইতেই আমাদের দেশে গুরুবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

আর 'সত্য' ইহার বাম বাহু স্বরূপ। সত্য চিন্তা, সত্য বলা, এবং 'সৎ' দেহ গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টা ব্যতীত এই জ্ঞান লাভ করা মোটেই সম্ভবপর নয়। পরম-সত্য-বিদ্যা জানিতে হইলে যে সর্ব্বদা সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইবে এই কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। "কায়েন-মনসা-বাচা" সত্যের বাহক হওয়ার, সত্যের মহিমা প্রচার করা এবং দেহকে সত্যের আয়তন করারই প্রয়োজন। যে বস্তু সত্য নয় তাহার পিছনে ঘুরিয়া হয়রাণি হওয়ার প্রয়োজন, বৃথা আমাদের শক্তির অপচয় করা।

এই পুরুষের লক্ষ্যই হইতেছে আত্মার সহিত যুক্ত হওয়া এবং ইহার ক্ষেত্র হইতেছে মহত্তত্ত্ব। মহামায়া বা আদ্যাশক্তি হইতে পুরুষ বা জীব-ব্রহ্ম এবং প্রকৃতির সৃষ্টি। যখন সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিনগুণ সাম্যাবস্থায় থাকে তখনই "প্রকৃতি" এই অবস্থা বলা হয়। যে মানুষে যে গুণের আধিক্য তাহাকে সেইগুণ দ্বারা চালিত বুঝিতে হইবে। এই সাম্যাবস্থা হইতে যখন বুদ্ধিতত্ত্বের উদয় হয় অর্থাৎ পুরুষ যখন নিজেকে প্রজ্ঞান হইতে পৃথক বলিয়া ভাবে এবং রজোগুণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সেই অবস্থাকেই মহত্তত্ত্ব বলে। এক কথায় সৃষ্টির প্রাক্‌কালে প্রকৃতির প্রথম পরিণামের নামই মহত্তত্ত্ব। তাহা হইলে দেখা গেল যে মানুষের চেতনার এই প্রসারিত অবস্থাতে দেহে বিজ্ঞানময় কোষে বিরাজিত পুরুষের সাথে হয় পরিচয় এবং তাহার সংস্পর্শে আসিয়া এই বিশ্বে যে অনুরূপ স্তর আছে তাহার সহিত হয় সম্বন্ধ নৈকট্য।

ইহার পরেও বিশ্বে স্তর আছে এবং আমাদের দেহেও সেইরূপ কোষাচ্ছাদিত পুরুষ আছে। দেহের কোষের অবশ্য এই শেষ কথা হইলেও মানবীয় চেতনার ঊর্দ্ধ্ব ধাপের ইহা শেষ কথা নয়! "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্যপ্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।" এই পুরুষই হইতেছে আত্মা। ইনি ব্রহ্মের স্বরূপের অংশ প্রতিনিধি বিশেষমাত্র এবং ইনি অন্নময় দেহে প্রবেশ করিয়া জন্ম মৃত্যু স্রোতে পড়িয়াছেন বাঁধা। আনন্দময় তিনি। এই আনন্দের কণামাত্র পাইলেই মানুষ মনে করে স্বর্গসুখ। পূর্ব্বোক্ত কোষের বা আবরণের গাঢ় যবনিকার অন্তরালে তিনি থাকেন বিরাজিত। মানুষের মাঝে দেবতা তিনিই। ইনিই অন্তর গুরু। তাঁহার প্রকাশ হইবার ইচ্ছায় মানব মন হয় ভগবদ্‌মুখী এবং তিনি তখনই প্রকাশ হন যখন জন্মান্তরের অভিজ্ঞতারাজী সংগ্রহ করিয়া তিনি হন পরিপুষ্ট এবং পরিবর্দ্ধিত এবং মনে করেন যে মন, প্রাণ এবং দেহকে তিনি করিতে পারিবেন চালিত। পৃথিবীতে প্রিয় এবং শ্রেয় যাহা কিছু, স্বার্থশূন্য প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ যাহা, সবই সেই আনন্দময়ের বিকাশমাত্র। পুষ্পের সৌন্দর্য্যে যে আনন্দ উপজাত হয় এবং যে আনন্দে শুধু আছে দেবীর অধিকার, নিজের কোনও দাবী নাই, যাহাতে নাই উপভোগের ইচ্ছা, সে সবই সে আনন্দময়ের আনন্দের অভিব্যক্তি বা বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

সৃষ্টির পরবর্ত্তী তত্ত্বই হইতেছে 'অহং' তত্ত্ব। এই 'অহং' এর আবির্ভাব হইতেই মানুষ এই দেহ, প্রাণ ও মনের সহিত নিজেকে ভাবে অভিন্ন এবং তাহার ফলে এই হৃদয়গুহাস্থিত পুরুষ হয় আচ্ছন্ন, মানব চক্ষুর অন্তরালে হন অবস্থিত। সুতরাং চেতনার ঊর্দ্ধ্ব ধাপে অবস্থিত ব্রহ্মে, অরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে আমাদের এই সমস্ত ধাপগুলিকে অতিক্রম করিতেই হইবে।

দিনলিপির একপাতা

শ্রীবীণা দেবী

৫ই সেপ্টেম্বর ১০৬৯। সকালে আমরা পাশের গ্রামের ভাঙা মন্দির দেখতে গেলাম। আমরা স্বামীস্ত্রী আর সঙ্গে আমাদের অতিথি ইংরাজ মহিলা-শিল্পী মিসেস লেথাম।

বৃষ্টির দরুণ চারিদিকে জল ও কাদাভরা রাস্তার জন্য গ্রামে ঢুকবার মুখে উনি আমাদের নিয়ে মোটর থেকে নেমে পড়লেন। সরকারদের বাড়ীর সামনে গাড়ী রাখ্তে বলে' হেঁটে রওনা হ'লেন আমাদের নিয়ে। ডোবা পুকুর, পোড়োবাড়ী, ভাঙা দেওয়ালের পাশ দিয়ে জলকাদাভরা রাস্তায় খাল নালা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে এগিয়ে চল্লাম ওঁকে অনুসরণ করে। উনি দেখ্লেন—এ গ্রামের কোথায় কী মন্দির আছে, কা'র কোন্ রাস্তা, গ্রামের প্রত্যেক রন্ধ্র অলি গলি ঘুঁজি আনাচ কানাচ সবই জানেন।

প্রথমে দেখ্লাম এক ভাঙামন্দির—বিশেষ কিছু নেই—এক গড়নের বিশেষত্ব ছাড়া। গঠনটি ডুটার মতন। পরে আর এক মন্দির। ফটো তোলা হ'ল সেখানে। ১৭৫৫ শকাব্দে তৈরী। কোম্পানীর আমলের বিলাতী মুখ, বেশভূষা দেশী, দেব দেবীর পাশে কিছু কিছু স্থান পেয়ে গেছে। মন্দিরের চারিদিকে জল থৈ থৈ কর্ছে।

তারপরে গেলাম এক জঙ্গলাকীর্ণ ভাঙা মন্দিরে। এ মন্দিরটী একেবারে জঙ্গলেঢাকা ছিল, কাছে এগোন বা কিছুই দেখা যেত না। ওঁর আসা যাওয়া বলা কওয়ার ফলে গ্রামবাসীরা এখন অনেক জঙ্গল সাফ্ ক'রেছে—তবুও ভয়াবহ। প্রধান মন্দিরে ঢুক্তে বা পাশে মনসার বেদী ও মন্দির।—মনসাগাছ ভাঙাবেদী ও মন্দির থেকে সগর্বে মাথা উঁচু করে' বেরিয়ে পড়ে'—এই সীমানায় নিজের একচ্ছত্র আধিপত্যের কথাই যেন ঘোষণা ক'রছেন—বিক্ষিপ্ত ইঁটের স্তূপ ও ঘন জঙ্গল দেখে, সে বিষয়ে কারও সন্দেহও থাকে না। আমি তো প্রতি মুহূর্ত্তেই ভয় কর্ছিলাম এই বুঝি বেরোল ফোঁস্ করে'। শিল্পী দু'জনের কোনদিকেই খেয়াল নেই—ফোটো তুল্তেই ব্যস্ত। মন্দিরটী খুব বেশী পুরাণো মনে হ'ল। প্রধান মন্দিরে ঢুক্তে মাথার উপরে—মাঝে গণেশ, দু'পাশে দুটী পায়রা। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতার নাম বা স্থাপনের সময়ের কোন লিপি কোথাও পাওয়া গেল না। পাশে খুব বড় পুকুর—বাঁধানো ঘাটের প্রশস্ত সিঁড়ির চিহ্ন এখনও কিছু কিছু বিদ্যমান থেকে অতীতকালের বহুজনসমাগমের ও স্নান-উৎসবের সাক্ষ্য দিচ্ছে!

এরপরে গেলাম এক মন্দিরে। মন্দিরটী পঞ্চচূড়া। দরজায় ঢুক্তে মাথার উপরে রাম সীতা লক্ষ্মণ দাঁড়িয়ে, হনুমান গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রছে। শিলালিপিতে—'শকাব্দ ১৭৬৯ শ্রী দিগম্বর—এইটুকুমাত্র পড়া যায়। এই মন্দিরে উনি নতুন একটা জিনিষ আবিষ্কার করলেন। ইঁটের উপর থেকে প্ল্যাষ্টার খসে গেছে—তা'তে খুব ভাল করে' নিরীক্ষণ করতে দেখা গেল—পুরণো বাংলা হরফে লেখা আছে "চামছামো" "পাসকোনা" "মান" অতিকষ্টে পাঠোদ্ধার করা যায়। সামনের থামের ইটে লেখা আছে "থামছামো"—বীরভূমে এখনও গ্রামের লোকে "ছামো" বলে' সম্মুখকে বোঝায়—'ছামোখানে' অর্থাৎ সামনে, 'হামোদুয়োর' অর্থাৎ সামনের দরজা ইত্যাদি। পাশে কোণ বার করা ইঁটের গায়ে লেখা 'পাসকোনা অর্থাৎ পাশের কোণ তৈরী হবে। নীচের ইঁটের গায়ে লেখা আছে "মান"। এর থেকে বোঝা গেল—মন্দির গড়্বার আগে একটী ছোট আদর্শ একজন প্রধান শিল্পী তৈরী করে' নিতেন, সেই আদর্শ বা 'মডেল' অনুযায়ী ছাঁচকাটা ও ইঁট তৈরী হ'ত। তিনি কোন্ ছাঁচ কোন্ ইঁট কোথায় ব'সবে, লিখে নির্দেশ দিয়ে দিতেন, সেই নির্দেশ অনুযায়ী সহকারী কারিকররা গড়ে' তুল্তেন এইরূপ মন্দির—এবং তাঁরা ছিলেন বাঙালী শিল্পী গোষ্ঠী!

দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে মনে হ'ল—সেই মৃৎশিল্পের নিপুণ রসজ্ঞ শিল্পীরা, স্থপতিবিদ্যায় পারদর্শী সুদক্ষ কারিকররা, সেই সাধারণের সেবায় উৎসৃষ্ট প্রাণ-দানী, ধ্যানী—গাছ, পুকুর, দেবালয় প্রতিষ্ঠাকারী, শিল্পীর পৃষ্ঠপোষক বাঙালীরা আজ কোথায়? একশো বছর আগেও তো তাদের জীবনের পূর্ণ পরিচয় বহন ক'রছে—এই সব ভাঙাদেউল, মজাপুকুর, পুরণো বট, আর বিরাট প্রাচীর দেউড়ীর ধ্বংশাবশেষ!

তারপরে গেলুম জোড়া শিবমন্দিরে। দরজার মাথায় লিপি রয়েছে—শ্রী হরিশ শ্রী বিশ্বেশ্বর, সন ১২৩০। পাশে পঞ্চচূড়া বিশিষ্ট নারায়ণের মন্দির—বেশ বড়। অনেক কারুকার্যবিশিষ্ট এই মন্দির তিনটীই অপেক্ষাকৃত নূতন অর্থাৎ ১১৮ বছর আগের তৈরী। এখনও বেশ ভালই আছে এবং দেবতাও পূজা পাচ্ছেন নিয়মিত।

পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট মন্দিরটিতে ঢুক্তে বাম দিকে আগাগোড়া কৃষ্ণলীলা—গোলমন্থন, গাভীদোহন ইত্যাদি সব বৃন্দাবনের লীলা।—সেই সঙ্গে সাহেব চেয়ারে বসে আছে, সামনে কুকুর নিয়ে—তাও আছে;—বোধ হয় নীলকুঠীর সাহেবকেই শিল্পীরা তাদের ছাঁচে রেখে দিয়েছে। আরও আছে—রামরাজা হ'য়ে বসে' বামে সীতাদেবী, ছত্রধারী ভরত, লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন দাঁড়িয়ে—হনুমান জোড় হাতে আদেশের প্রতীক্ষায়। ডান দিকে নবগ্রহ, রাবণের সভা, অশোকবনে চেড়ী পরিবৃতা সীতাদেবী।

সেখান থেকে এলাম গ্রামের জমীদার বাড়ীর পূজার দালানে। মিসেস লেথ্যাম সুউচ্চ নাট মন্দির ও কলমকাটা থামবিশিষ্ট বিরাট পূজার দালান দেখে মুগ্ধ হ'লেন। প্রতিমা গড়া সুরু হ'য়েছে। জমীদার কান্তিভূষণ সরকার আমাদের সঙ্গে করে' নিয়ে ভোগমণ্ডপ, কাছারীবাড়ী ইত্যাদি সব ঘুরিয়ে দেখালেন।

তাঁরই সাহায্য নিয়ে আমরা একজন গৃহস্থের বাড়ীর মধ্যস্থিত

একটী মন্দির দেখ্‌তে সমর্থ হ'লাম,—যেটী ওঁর অনেক দিন থেকে দেখ্‌বার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু একেবারে অন্দরের মধ্যে ব'লে' ঢুক্‌তে পারেন নি। এ মন্দিরটি বেশ পুরণো, ১৩৬ বছর আগে শকাব্দ ১৭৩৫ সন ১২২০ সালে তৈরী লেখা রয়েছে। মন্দিরটির বিশেষত্ব—দোরের মাথায় মাঝখানে একটা পদ্মফুল দু'পাশে দুটি পায়রা এবং মন্দিরের গায়ে খুব শক্ত চুণের 'প্ল্যাষ্টার'এর উপর ফুল পাতার নক্সা কেটে লাল নীল রং দিয়ে চিত্র করা। এখনও সে চিত্রণ মাঝে মাঝে বেশ উজ্জ্বল ও নিখুঁত রয়েছে—এই ১৩৬ বছর ধরে' রোদ বৃষ্টি ঝড় ঝঞ্ঝা সহ্য করে' নিয়ে। কী আশ্চর্য্য চুণ, মশলা, রং তৈরী ক'রেছে, ব্যবহার ক'রেছে—সেই শিল্পী গোষ্ঠীরা!

কান্তিবাবুকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা গাড়ীতে উঠ্‌লাম। ইংরাজ মহিলাটি ক্রমাগতই বল্‌তে লাগ্‌লেন—তোমাদের গভর্ণমেণ্টের উচিত এ সব উদ্ধার করা—কেন তারা এদিকে মন দিচ্ছে না—আমি মনে মনে বল্‌লুম—দাঁড়াও বন্ধু, এই তো সবে তোমরা ছেড়ে গেছ—চুষে খেয়ে—দুশো বছর ধরে' রাজত্ব করে' যে গ্রামকে তোমরা একেবারে বিগত-বিভব, হৃত-সর্ব্বস্ব, মৃত পঙ্গু আত্মবিস্মৃত করে' রেখে গেছ জরাজীর্ণ অবস্থায়—দু'বছরেই কি আর আমাদের গভর্ণমেণ্ট মন্ত্র পড়ে' তাকে বাঁচাবে?—দু'শো বছরের মজা পাঁক উদ্ধার করতে কুড়ি বছর সময় তো লাগ্‌বেই—অক্লান্ত পরিশ্রম করলেও। মুখে বল্‌লুম—আমরা মন দিলেই গভর্ণমেণ্টেরও মন দেওয়া হবে, গভর্ণমেণ্ট তো এখন আমরাই।

রণক্ষত

ক্যাপ্টেন রামেন্দু দত্ত

মুখ্‌ড়ে ম'রে, দুঃখ-ক'রে, করবো কেন জীবন যাপন,
জীবন-জোড়া যুদ্ধ এবং দুঃখ যখন ললাট-লিখন?
নিঙ্‌ড়ে ল'ব অশান্তিরই কুক্ষি হ'তে শান্তি-বারি
শুষ্ক বুকে, রক্ত মুখে, যেটুক্ জল ঢাল্‌তে পারি!
উড়ুক বালি, তপ্ত হাওয়া; বজ্র বাজুক্ অন্ধকারে—
নেই বা এলো সে জন আমার, কাতর স্বরে ডাকছি যা'রে—
হয় ত এল পাপের পথের ছিট্‌কে-পড়া পথিক কেহ
সেই যদি দেয় শীতল ক'রে অতৃপ্ত মন, তপ্ত দেহ
নরক-ভোগের দুঃখ জুড়ায়, মিটায় আমার তৃষ্ণা ক্ষুধা;
মৃত্যু-রণের অঙ্গনে হয় বিষের পাত্র, সুরার সুধা,
তারেই ল'ব বরণ ক'রে, করবো হরণ প্রাণের বাণী
ক্ষণিক-সুধার-পাত্র বাহী হোক্ সে আমার মরণ-রাণী!

— ২ —

এ জীবনের সুরু হতেই ক্যাপ্টেনীতে হাতে খড়ি
কৈশোরেতেই স্বেচ্ছামৃত্যু-আহব-লীলা বরণ করি।
সোনার ঝিনুক-বাটি মুখে জন্মেছিলাম:—'প্রথম ছেলে'
বল্লেন দাদু, "আমার বাঁঝা মেয়ের কোলে মাণিক এলে!"
পিতৃকুলে মাতৃকুলে শ্রেষ্ঠ হ'ব কোষ্ঠী হ'ল
সাহেব-বাড়ীর জামা-জুতা সুদূর হ'তে আসতে র'ল!
ধনীর দুলাল কিন্তু শেষে পথের ধুলায় নাম্‌লো একা
কৈশোরে তাই নন্দকিশোর সঙ্গী হয়ে দিলেন দেখা!
বহুমূল্য অশন-ভূষণ হারিয়ে পেলাম অমূল্য ধন
বাঁচার তরে লড়্‌তে হ'ল, জয়ের তরে জীবন পণ!

— ৩ —

বিজয় লভি' বাঁচলো কবি; সুখের লোভী করলো পাপ:
পাপে মৃত্যু ঘট্‌লো, পেলো পত্নী-পুত্র-মনস্তাপ!
'সং'এর শ্রেষ্ঠ, 'সার' বা যাহা, সেই সে মজার সংসারে
নিত্য রণক্ষেত্র মজুত, সেনাপতির কাজ বাড়ে!
বিশ্বযুদ্ধ নম্বর দুয়ের মধ্যে হঠাৎ গেলাম জুটে
"একাদশ শিখ" নৌশেরাতে "রাজকমিশান্" নিলাম ছুটে!
স্থলবাহিনীর সে ক্যাপ্টেনীর কাজটা নয়কো কম বৃহৎ
'অনাহারী' পদবীটাও পেলাম জীবন রয় যাবৎ।

— ৪ —

সেনাপতির ভাগ্যদেবী আড়াল থেকে হাসেন হাসি
এক লড়ায়ের বদ্‌লী দিলেন, জুটিয়ে লড়াই রাশি রাশি!
প্রবঞ্চকের সঙ্গে লড়াই, লড়াই নিজের ভাগ্য সং
স্বাস্থ্য রাখার মস্ত লড়াই, মাম্‌লা-লড়া-ই দুর্ব্বিসহ!
অনাহারী পদবীও মর্য্যাদা তার রক্ষা করে—
আহার বিনা শুকাই, স্বাধীন দেশ চেয়ে রয় ব্যঙ্গভরে!
উত্তমর্ণ সমাজ, বা সে সংসার কি বন্ধুজন
কেউ দিল না রেহাই, পাওনা চুক্‌লো নাকো যতক্ষণ!
কবি ব'লে মুদি আমায় একটি পয়সা ছাড়েন নাকো
বন্ধু আসা বন্ধ করেন চা যদি না মজুত রাখো
কাপড়-জামা লেখাপড়া খাওয়া-দাওয়ার কম্‌তি হ'লে,
কন্যা ওঠেন বন্যা হয়ে, পুত্রেরা যান ছেড়ে চ'লে!
পরের মেয়ে ঘরের চেয়ে বাপের বাড়ী শ্রেষ্ঠ বলেন,
নেইক মোটর, রিক্সা চড়েই শ্রেষ্ঠী-কন্যা সেথায় চলেন!

— ৫ —

কিন্তু যে পাপ বাল্য হ'তে আজ অবধি চল্‌ছি ক'রে
অর্থাৎ এই পদ্য-লেখা, ঝঞ্ঝাট তা'র জীবন ভ'রে।
"সভাপতি হবেন আসুন," "মোর কাগজে দিন না লেখা,"
"পয়সা দিতে হবে না কি?—অকবিত্ব এ, কোথায় শেখা?"
আমি বলি, "তোমার কাছে, সমাজপতি! শিক্ষা মম!
হে মহাজন, ময়রা, মুদি, অধমর্ণে কেউ কি ক্ষম?
বাল্যবন্ধু, তোমার কাছে! পিতৃবন্ধু, তোমার কাছে!
কুটুম্বাত্মীয়ের কাছে; খাতির যেথায় সেথায় আছে!
পয়সা ফ্যালো, পাওনা মেটাও, উপরন্তু খাওয়াও চা
পান-সিগারেট্ জোটাও, তবে তুমি কবি সাহান্-সা'!"
নইলে তুমি "কিপ্‌টে কবি, লক্ষ্মীছাড়া, রুইন্‌ড্ ম্যান্"—
আজকে তোমার নেইক মোটর, মাথার ওপর "সিলিং ফ্যান্"—
ব্যাঙ্কে টাকার অঙ্ক কাহিল, টেলিফোনে নেইক নাম—
নওকো বণিক, নেইকো 'মোটা তন্‌খা-ওয়ালা কোইভি কাম'
তোমার কাছে আসা মানেই ধরিয়ে মাথা উঠে যাওয়া,
কেবল দুঃখ-কাহিনী সে; কোথায় আগের খাওয়া-দাওয়া?
নামেই তুমি কবি এবং ক্যাপ্টেনীটা ব্যর্থ তব
অর্থহীনের দুখের দিনের শেষ হ'লে ফের বন্ধু হ'ব!"
হস্ত যুড়ে বল্‌ছি, "প্রভু! বন্ধু হ'তে রক্ষা করো—
রণক্ষত 'ক্যাপ্টেনেরে' কাপ্তেনীয় সুযোগ ধরো!
আকৈশোরের সেনাপতি ইস্তফা আজ চাইছে দিতে
অনাহারী ক্যাপ্টেনীর সাধ বিন্দুমাত্র নাইকো চিতে॥

ভলটেয়ার

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অচিরেই Ferney বিদ্বজ্জনদিগের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। বিশ্বাসহীন পুরোহিত, উদারমতাবলম্বী অভিজাত, বিদুষী মহিলা, সকল শ্রেণীর লোকই তাঁহাকে দেখিতে আসিত। ইংলণ্ড হইতে গিবন ও বস্‌ওয়েল আসিয়াছিলেন ; ফ্রান্স হইতে আসিতেন Helvetius, d' Alembert ও অন্যান্য পণ্ডিত। অতিথির সংখ্যা ক্রমে অসম্ভবরূপে বাড়িয়া চলিল। ভলটেয়ার বিরত হইয়া পড়িলেন। এক বন্ধু আসিয়া কহিলেন, তিনি ছয় সপ্তাহ থাকিবেন। ভলটেয়ার বলিলেন, "তোমাতে ও Don Quixote এ তফাৎ কি? Don Quixote অতিথিশালাকে দুর্গ বলিয়া ভুল করিয়াছিল, আর তুমি আমার দুর্গকে অতিথিশালা বলিয়া ভুল করিয়াছ। ভগবান বন্ধুদিগের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করুন। শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে আমি নিজেই পারিব।" এই অবিরল প্রবাহিত অতিথি স্রোতের মধ্যে সকল শ্রেণীর পত্রলেখকের পত্রের উত্তর দিতে হইত। জার্ম্মাণীর কোনও নগরীর এক মেয়র লিখিয়াছিলেন, "গোপনে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ঈশ্বর কি বাস্তবিকই আছেন, না নাই? ফেরৎ ডাকে উত্তর দিবেন।" ডেনমার্কের রাজা তৃতীয় ক্রিশ্চিয়ান রাজ্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করিতে না পারার জন্য ত্রুটী স্বীকার করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। রুশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয়া ক্যাথেরাইন তাঁহাকে বহু উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া ঘন ঘন চিঠি লিখিতেন। Frederick the Great লিখিয়াছিলেন, "আপনি আমার সহিত ভয়ানক অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। সকলই আমি ক্ষমা করিয়াছি, সকলই ভুলিয়া যাইতেই আমার ইচ্ছা। আমি যদি উন্মাদ না হইতাম এবং আপনার প্রতিভার প্রতি যদি আমার শ্রদ্ধা না থাকিত, তাহা হইলে এত সহজে নিষ্কৃতি পাইতেন না। মিষ্ট কথা শুনিতে চান? শুনুন তবে সত্য কথা বলি। জগতে যত প্রতিভাশালী ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমি আপনাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। আপনার কবিতাকে আমি শ্রদ্ধা করি, আপনার গদ্য আমি ভালবাসি। আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও লেখকই এরূপ বিচক্ষণ বাগ্‌-বৈদগ্ধ্য এবং সূক্ষ্ম ও নিশ্চয়াত্মিকা রুচির অধিকারী ছিলেন না। কথোপকথনে আপনি মনোহারী, একসঙ্গে আনন্দদান ও শিক্ষাবিধান করিতে আপনি সুদক্ষ। আপনার অপেক্ষা অধিকতর চিত্তহারী আমি কাহাকেও জানি না। যখন আপনি ইচ্ছা করেন, তখন সমগ্র জগৎকে দিয়া আপনি আপনাকে ভালবাসাইতে পারেন। আপনার মনের সৌন্দর্য্য এত অধিক, যে আপনি বিরক্তি উৎপাদন করিলেও কেহই আপনার উপর রাগ করিয়া থাকিতে পারে না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আপনি যদি মানুষ না হইতেন, তাহা হইলে পূর্ণ হইতেন।"

এত গুণের অধিকারী, এমন সদানন্দ যিনি, তিনি যে নিরাশাবাদী (pessimist) হইবেন, ইহা কেহই ভাবিতে পারে নাই। প্যারিসে যখন ছিলেন, সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে মগ্ন থাকিয়াও তিনি Leibnitz এর অত্যধিক আশাবাদের (optimism) প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এক যুবক তখন তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া এক প্রবন্ধ লেখায় তিনি তাহাকে লিখিয়াছিলেন, "আমি শুনিয়া সুখী হইলাম, আপনি আমাকে আক্রমণ করিয়া এক বই লিখিয়াছেন। ইহাতে আমি আপনাকে সম্মানিত বোধ করিতেছি। যাবতীয় সম্ভবপর জগতের মধ্যে সর্ব্বোত্তম এই জগতে কেন এত লোকে আত্মহত্যা করে, পদ্যেই হউক, কিম্বা গদ্যেই হউক, তাহা যদি আপনি বলিতে পারেন, আমি বিশেষ বাধিত হইব। আপনার যুক্তি, কবিতা ও তিরস্কারের অপেক্ষায় রহিলাম। অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে আপনাকে কিন্তু নিশ্চয়তা দিয়া আমি বলিতেছি, যে এই বিষয়ে আপনিও কিছু জানেন না, আমিও কিছু জানি না।"

মানব জীবনের মূল্যসম্বন্ধে তাঁহার যে বিশ্বাস ছিল, উৎপীড়ন ও সংসারের অভিজ্ঞতার ফলে তাহা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। বার্লিনে Frederick এর নিকট যে ব্যবহার পাইয়াছিলেন, তাহাতে আশাও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ইহার পরে ১৭৫৫ সালের নভেম্বরে লিসবনের ভূমিকম্পের সংবাদে তাঁহার আশা ও বিশ্বাস একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। সেদিন ছিল একটী পর্ব্বদিন। ত্রিশ সহস্র লোক উপাসনা মন্দিরে সমবেত হইয়াছিল উপাসনার জন্য। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে তাহাদের অনেকেই নিহত হয়। এই ভীষণ আঘাতে ভলটেয়ারের চিত্তের তারল্য অন্তর্হিত হইয়া যায়। পরে, ফরাসী পুরোহিতগণ সেই ভীষণ সংহারলীলাকে যখন লিসবনের অধিবাসিগণের পাপের শাস্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার মনে ভীষণ রোষের সঞ্চার হইল। অমঙ্গলের অস্তিত্বের যে সমস্যায় প্রাচীনকাল হইতে মানবচিত্ত আলোড়িত হইয়া আসিতেছিল, এক ভাবোদ্দীপ্ত কবিতায় তিনি তাহা ব্যক্ত করিলেন : "হয় ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, তিনি এইরূপ অমঙ্গল রোধ করিতে সমর্থ, কিন্তু করেন না ; অথবা তিনি ইহা রোধ করিতে ইচ্ছুক হইলেও, ইহা রোধ করিবার শক্তি তাঁহার নাই। Spinoza বলিয়াছিলেন, মঙ্গল ও অমঙ্গল শব্দ মানুষের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, সমগ্র বিশ্ব-সম্বন্ধে তাহাদের প্রয়োগ করা যায় না। মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অমঙ্গল গণনীয়ই নহে।" ভলটেয়ার কবিতায় লিখিলেন, "সত্য বটে, আমি সমগ্রের একটী তুচ্ছ পরমাণুমাত্র, কিন্তু সমস্ত প্রাণীর অবস্থাই তো মানুষের মতন। মানুষের মতনই তাহারা দুঃখ ভোগ করে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শকুনি তাহার শিকারের অঙ্গ ছিঁড়িয়া খায়, ঈগলে শকুনিকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলে। ঈগল আবার মানুষের শরে

বিদ্ধ হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত মানুষ হিংস্র পক্ষীর খাদ্যে পরিণত হয়। জগতের প্রত্যেক অঙ্গই যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে। সকলেই জন্মিয়াছে যন্ত্রণা ভোগের জন্য ও পরস্পরের সংহারের জন্য। এই ভীষণ সংহারলীলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তুমি বলিবে, "প্রত্যেকের অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি হয়?" কি সুন্দর সুখের অবস্থা! অনুকম্পার্হ মরণশীল তুমি যখন কম্পিতকণ্ঠে উচ্চরবে ঘোষণা কর, "সকলই মঙ্গলময়", বিশ্ব তখন তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, তোমার অন্তর শতবার তোমার বুদ্ধিকে লঙ্ঘন করিয়া যায়। কোথা হইতে মানুষ আসিয়াছে, তাহার গন্তব্যস্থান কি, তাহা সে জানেনা। পঞ্চশয্যাশায়ী, যন্ত্রণা-পীড়িত, মৃত্যুগ্রস্ত, ভাগ্যের ক্রীড়নক, কিন্তু চিন্তা-শক্তির অধিকারী মানুষ। তাহার দূরদৃষ্টিক্ষম চক্ষু বুদ্ধিবলে হইয়া অস্পষ্ট নক্ষত্ররাজির পরিমাপ করিয়াছে। আমাদের সত্তা অনন্তে মিশিয়া গিয়াছে। আমাদিগকে আমরা দেখিতেও পাইনা, জানিও না। অহঙ্কার ও অন্যায়ের রঙ্গক্ষেত্র এই পৃথিবী মূর্খে পরিপূর্ণ। সেই মূর্খেরাই সুখের কথা বলে।...এক সময় ছিল, যখন আমি সুখের গান গাহিয়াছি। কিন্তু সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সহিত অভিজ্ঞতা বাড়িয়াছে,...গভীর অন্ধকারের মধ্যে আলোকের সন্ধান করিয়া এখন কেবলই দুঃখ ভোগ করিতেছি। কিন্তু তজ্জন্য আমার আক্ষেপ নাই।"

ইহার কয়েক মাস পরেই Seven years' war, আরব্ধ হইল। "Canadaর কয়েক একর বরফের জন্য" এই যুদ্ধকে ভলটেয়ার উন্মত্ততা ও আত্মহত্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তাহার পরে আসিল Rousseau কর্তৃক তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কবিতার উত্তর। Rousseau লিখিয়াছিলেন "মানুষ নিজের দোষে দুঃখভোগ করে। নগরে বাস না করিয়া মানুষ যদি উন্মুক্ত প্রান্তরে বাস করিত, তাহা হইলে ভূমিকম্পে মারা যাইত না।" পড়িয়া ভলটেয়ারের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল তিন দিনের মধ্যে তিনি Candide গ্রন্থ লিখিয়া শেষ করিলেন। এই গ্রন্থে তিনি রুসোর বিরুদ্ধে তাঁহার ভীষণতম অস্ত্রের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সেই অস্ত্র "ভল্টেয়ারের ব্যঙ্গ" (The Mockery of Voltaire)।

এই গ্রন্থে নিরাশাবাদের স্বপক্ষে যেরূপ স্ফূর্ত্তির সহিত যুক্তিপ্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা সাহিত্যে দুর্লভ। "জগৎ দুঃখময় প্রতিপাদন করিতে করিতে পাঠককে ইহার পূর্ব্বে কেহই এত প্রাণ খুলিয়া হাসাইতে পারে নাই। Anatole France বলিয়াছেন, "ভল্টেয়ারের অঙ্গুলিতে লেখনী দ্রুত চলিতে চলিতে হাস্যমুখর হইয়া উঠিয়াছে।"

গ্রন্থের নায়ক Candide, Westphaliaর Baron-of-Thunder-Ton-Trochএর আত্মীয়। লোকে বলিত Candide ছিলেন উক্ত ব্যারণের ভগিনীর পুত্র, এবং তাহার পিতা ছিলেন প্রতিবাসী একজন সাধু চরিত্রের লোক, কিন্তু যে বংশে তাহার পিতার জন্ম হইয়াছিল, ব্যারণের বংশের মত তাহার প্রাচীনতার দাবী ছিল না বলিয়া, তাহার মাতা তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই। Candide সরল প্রকৃতি ও সাধু চরিত্র যুবক। ব্যারণের এক সুন্দরী কন্যা ছিল, তাহার নাম কুনেগণ্ডে। Pangloss নাম্নীয় এক পণ্ডিত ব্যারণ পরিবারের শিক্ষা গুরু ছিলেন। তিনি Metaphysico-Theologico-Cosmonigo-logyর অধ্যাপক। তিনি বলিলেন "ইহা প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায়, যে যাহা কিছু ঘটে, সকলই অবশ্যম্ভাবী। জগৎ যে রূপ, তাহা অপেক্ষা অন্যরূপ হওয়ার সম্ভব ছিল না। প্রত্যেক দ্রব্যই বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। সুতরাং সে উদ্দেশ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইতে বাধ্য।"

একদিন কনেগণ্ডে দুর্গের সন্নিকটবর্ত্তী এক উদ্যানে ভ্রমণকালে দেখিতে পাইলেন, Dr. Pangloss তাঁহার মাতার এক সুন্দরী যুবতী পরিচারিকাকে পরীক্ষামূলক দর্শনে (Experimental Philosophy) শিক্ষা দান করিতেছেন। কনেগণ্ডের বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ অনুরক্তি ছিল। নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি তাহাদের দার্শনিক পরীক্ষামূলক কার্য্যাবলী দেখিতে লাগিলেন, তিনি বুঝিতে পারিলেন কারণ হইতে কার্য্যের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। Candideর সঙ্গে ইহার পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা লইয়া গৃহে কনেগণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। গৃহে ফিরিয়া Candideর সঙ্গে দেখা হইলে লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া গেল। Candide এর মুখও তথৈবচ। পরদিন নৈশাহারের পরে Candide এর সঙ্গে কনেগণ্ডে পর্দার পশ্চাতে প্রবেশ করিলেন। কনেগণ্ডের রুমাল কক্ষতলে পড়িয়া গেল। Candide রুমাল তুলিয়া লইলেন। কনেগণ্ডে নিষ্কলুষ মনে Candideর হাত ধরিয়া ফেলিলেন। Candideও নিষ্কলুষ মনে তাহার হস্ত চুম্বন করিলেন। তার পরে অধর অধরে মিলিত হইল, নয়ন উজ্জ্বলতা ধারণ করিল, জানু কম্পিত হইল এবং উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন। এমন সময়ে ব্যারণ Thunder-ten-troch পর্দার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং পদাঘাতে Candideকে দুর্গের বাহির করিয়া দিলেন। Candide মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে ব্যারণের স্ত্রী তাহাকে চপেটাঘাত করিতে লাগিলেন। দুর্গে হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

ইহার পরে একদিন Candide বন্দী হইয়া বুলগেরিয় সৈন্য-শিবিরে নীত হইলেন। সেখানে তাহাকে সৈন্যদলভুক্ত করা হইল; যুদ্ধ বিদ্যাশিখিবার জন্য তাহাকে কুচ-কাওয়াজ করিতে হইল।......বসন্তকালে একদিন তাহার মনে হইল, ব্যবহারের জন্যই পায়ের সৃষ্টি। এই বিশ্বাসে তিনি শিবির ত্যাগ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই ধৃত হইয়া শিবিরে আনীত হইলেন। সৈন্যদল ছাড়িয়া পলায়ন করিবার জন্য তাহার বিচার হইল। Court martial আদেশ করিলেন,—তাহাকে হয় সমগ্র সৈন্যদল কর্তৃক ছত্রিশবার বেত্রাঘাত অথবা একবার মস্তকে বারোটি বন্দুকের গুলি—ইহার মধ্যে একটি বাছিয়া লইতে হইবে। মানুষের ইচ্ছা স্বাধীন, এই জন্য তিনি দুইটির একটিও পছন্দ করিলেন না। কিন্তু ইচ্ছার স্বাধীনতার যুক্তি কোনও কাজে লাগিল না। অগত্যা তিনি বেত্রাঘাতে সম্মত হইলেন। সৈন্যদলে দুই হাজার সৈন্য ছিল। দুই বারে চারিহাজার আঘাত গ্রহণ করিয়া Candide রক্তাক্ত হইয়া শুইয়া পড়িলেন, এবং অবশিষ্ট বেত্রাঘাতের পরিবর্ত্তে তাহাকে গুলি করা হউক, এই প্রার্থনা জানাইলেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। তাহার চক্ষু বাঁধিয়া দেওয়া হইল,

কিন্তু গুলি করিবার অব্যাবহিত পূর্ব্বে তথায় বুলগেরিয়ার রাজা উপস্থিত হইলেন। সমস্ত শুনিয়া রাজা বুঝিতে পারিলেন Candide সংসার-জ্ঞানাভিজ্ঞ দার্শনিক। তিনি তাহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন। রাজার এই দয়ার কাহিনী চিরকাল ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইবে।

অভিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসায় Candide সুস্থ হইয়া দেখিলেন, বুলগেরিয়ার রাজার সহিত আবারিস রাজের যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। কামানের গোলায় প্রথমে এক এক পক্ষে ছয় হাজার লোক মরিল। তার পরে বন্দুকের গোলায়, এই সর্ব্বোত্তম জগতের বক্ষ কলুষিতকারী নয় দশ হাজার পাষণ্ড নিহত হইল। সঙ্গীণের আঘাতে কয়েক সহস্রের মৃত্যু হইল। মোট প্রায় ত্রিশ হাজার লোককে ধরাধাম ত্যাগ করিয়া যাইতে হইল। Candide এই হত্যাকাণ্ডের সময় দার্শনিকের মত কাঁপিতে লাগিলেন। ইহার পরে যখন উভয় সৈন্যদলে "To deums"—ঈশ্বরের গৌরবগান গীত হইতে লাগিল, তখন একদিন Candide পলায়ন করিলেন। রাশীকৃত মৃত ও মুমূর্ষু নরদেহের উপর দিয়া তাহাকে যাইতে হইল। ভস্মীভূত গ্রাম সকলের মধ্যে যুদ্ধের পরিণাম দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিলেন। দেখিলেন রক্তাক্ত দেহে ভূপতিত বৃদ্ধ, অদূরে শায়িত তাহার স্ত্রীর মৃত দেহের দিকে চাহিয়া আছে, স্ত্রীর রক্তপ্লাবিত দেহের উপর শিশু সন্তান পড়িয়া আছে। ধর্ষিতা ভূমিতলে পতিত হইয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। অর্দ্ধদগ্ধ অনেকে উচ্চৈঃস্বরে মৃত্যু কামনা করিতেছে। পদ, বাহু, মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। সম্ভাব্য যাবতীয় জগতের মধ্যে সর্ব্বোত্তম জগৎ ! ! !

দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া Candide হল্যাণ্ডে রিক্তহস্তে উপস্থিত হইলেন। আশা করিয়াছিলেন খ্রীষ্টানের বাসভূমিতে তাঁহাকে অনাহারে মরিতে হইবে না। কয়েকজন ভদ্রবেশী লোকের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করায়, তাহারা তাহাকে জেলে পাঠাইতে চাহিলেন। একজন ভদ্রলোক "দানশীলতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করায়, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি বিশ্বাস কর, খৃষ্ট-শত্রু (ant Christ সয়তান) পৃথিবীতে আছে ? Candide কহিলেন, "তা তো শুনি নাই। কিন্তু তিনি থাকুন বা থাকুন, আমার খাবার চাই" বক্তা বলিলেন "ভাগো ! খাবার তোমার মত লোকের জন্য নয়।" বক্তার স্ত্রী নিকটবর্ত্তী গৃহের জানালা দিয়া Candideর মাথায় এক বালতি ময়লা জল নিক্ষেপ করিলেন। জেম্‌স নামক একজন Ana Baptist দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। তিনি Candideকে গৃহে লইয়া গিয়া আহার্য্য ও নগদ দুই ফ্লোরিন দান করিলেন।

পরদিন রাস্তায় এক শীর্ণকায় ভিক্ষুকের সহিত Candideর দেখা হইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত, চক্ষু দীপ্তিহীন, নাসিকার অগ্রভাগ খসিয়া পড়িয়াছে, মুখ বাঁকিয়া গিয়াছে। ভিক্ষুক তাহার নাম ধরিয়া সম্বোধন করিল। Candide চমৎকৃত হইলেন এবং তাহাকে Pangloss বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তাহার নিকট শুনিলেন, বুলগেরিয়ার সৈন্য ব্যারনের দুর্গ আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়াছে, কুনেগণ্ডেকে ধর্ষণ করিয়া পরে হত্যা করিয়াছে, ব্যারণ ও তাহার স্ত্রীকেও হত্যা করিয়াছে। শুনিয়া Candide মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে Pangloss এর শোচনীয় অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। Pangloss কহিলেন "প্রেম, মানবজাতির সান্ত্বনা, বিশ্বের রক্ষক, প্রাণ জগতের আত্মা, সুকোমল প্রেমই তাঁহার দুর্গতির কারণ। এমন পবিত্র প্রেম হইতে কিরূপে এই ভীষণ অবস্থা উৎপন্ন হইল, Candide জিজ্ঞাসা করিলে, Pangloss কহিলেন "ব্যারণ মহিষীর পারিচারিকা Panquetar বক্ষলীন হইয়া আমি স্বর্গসুখ ভোগ করিয়াছি। তাহারই ফল এই। তাহার শরীরে উপদংশের বীজ ছিল—একজন পণ্ডিত সন্ন্যাসীর শরীর হইতে তাহা Panquetar শরীরে সংক্রামিত হইয়াছিল। এক বৃদ্ধা Countess এর শরীর হইতে সন্ন্যাসীর শরীরে সেই বীজ যায়। Countess এর শরীরে আসে এক সৈন্যাধ্যক্ষের শরীর হইতে; সৈন্যাধ্যক্ষের শরীরে সংক্রামিত হয় এক মার্কুইস পত্নী কর্ত্তৃক, মার্কুইসপত্নী পেয়েছিলেন এক Spaniardএর শরীর হইতে। এ সমস্তই অপরিহার্য্য ছিল। Candide তাহাকে জেম্‌সের নিকট লইয়া গেলেন। সেখানে সুচিৎকসায় Pangloss আরোগ্যলাভ করিলেন। দুই মাস পরে জেম্‌সকে লিসবন যাইতে হয়। Pangloss ও Candideকে তিনি সঙ্গে লইয়া গেলেন।

জাহাজে তিনজনের মধ্যে অনেক দার্শনিক আলোচনা হইল। Panglss বলিলেন "প্রত্যেক দ্রব্যই এমনভাবে সৃষ্ট যে তাহার উৎকৃষ্টতর হইবার সম্ভাবনা ছিল না।" জেম্‌স তাহা স্বীকার না করিয়া কহিলেন, "মানুষ তাহার প্রকৃতি কলুষিত করিয়াছে। হিংস্র প্রকৃতি লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে নাই অথচ ব্যাঘ্রের মত হিংস্র হইয়া পড়িয়াছে। ২৪ পাউণ্ড অথবা সঙ্গীন ঈশ্বর মানবকে দান করেন নাই, অথচ পরস্পরের বিনাশের জন্য মানুষ তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছে।" Panglon বলিলেন "সকলই অপরিহার্য্য ছিল। ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যই সর্ব্বজনীন মঙ্গল, সুতরাং ব্যক্তির দুর্ভাগ্য যত বেশী হয়, সাধারণের মঙ্গলও ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।"

হঠাৎ আকাশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ও প্রবল ঝটিকা আরম্ভ হইল। মাস্তুল ভাঙ্গিয়া গেল, পাল ছিঁড়িয়া উড়িয়া গেল। যাত্রীগণের মধ্যে কলরব উত্থিত হইল। ডেকের উপর গিয়া জেম্‌স নাবিকদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, এমন সময় এক নাবিক তাহাকে ভীষণ আঘাত করিয়া ডেকের উপর ফেলিয়া দিল, কিন্তু প্রহারকালে পদস্খলিত হইয়া জাহাজের বাহিরে পড়িয়া গেল। ভাঙ্গা মাস্তুল ধরিয়া সে ঝুলিতেছিল, জেম্‌স তাহাকে টানিয়া তুলিতে গিয়া নিজে সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। নাবিক ডেকে উঠিয়া তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। Candide তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু বাধা দিয়া Panglors কহিল "সমুদ্রে ডুবিয়া মরাই তাহার নিয়তি, সেই জন্যই সে লিসবন যাত্রা করিয়াছিল।" এই সময়ে জাহাজ ডুবিয়া গেল। সেই দুর্বৃত্ত নাবিক এবং Pangloss ও Candide ব্যতীত সকলেরই মৃত্যু হইল। তাহারা তীরে উঠিবামাত্র লিসবনের ভীষণ ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। প্রকৃতির সেই

ভীষণ তাণ্ডবে ত্রিশ সহস্র নরনারী প্রাণ হারাইল। রাস্তা-ঘাট ভস্ম ও লাভায় আচ্ছাদিত হইয়া গেল। অসংখ্য গৃহ ভূমিসাত হইল। সেই দুর্বৃত্ত নাবিক তখন লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল এবং এক যুবতীসহ আমোদে মত্ত হইল। Pangloss ও Candide আর্ত্তজনগণের সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। Pangloss কহিলেন "ভূমিকম্পের না হইবার উপায় ছিল না। আগ্নেয় গিরি যখন লিসবনে অবস্থিত, তখন তাহা অন্যত্র ফাটিবে কিরূপে? সকলই মঙ্গলের জন্য সংঘটিত হয়।" কৃষ্ণ পরিচ্ছদ পরিহিত—Inquisitionএর সহিত সংশ্লিষ্ট একটি লোক শুনিয়া কহিল "আপনি কি প্রাথমিক পাপে (Original Sin) বিশ্বাস করেন না? সকলই যদি মঙ্গলের জন্য হয়, তাহা হইলে মানুষের পতন (Fall) হয় নাই, তাহার শাস্তিও নাই।" Pangloss কহিলেন "মানুষের পতন ও তাহার জন্য অভিশাপ উভয়েরই এই সর্ব্বোত্তম জগতে প্রবেশ অপরিহার্য্য ছিল।" "তাহা হইলে আপনি স্বাধীন ইচ্ছায় বিশ্বাস করেন না?" Pangloss কহিলেন "নিরবচ্ছিন্ন নিয়তির (absolute necessity) সহিত স্বাধীন ইচ্ছায় বিরোধ নাই। স্বাধীন ইচ্ছাও অপরিহার্য্য।"

ভূমিকম্পের পরেই Catholic ধর্ম্মে অবিশ্বাসীদিগের বিশ্বাসের জন্য Inquisitionএর প্রতিষ্ঠা হইল। Coimbra বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করিলেন যে Catholic ধর্ম্মের বিরোধী পাপিষ্ঠদিগকে আস্তে আস্তে পোড়াইয়া মারিলে ভূমিকম্প বন্ধ হইবে। Pangloss ও Candide ধৃত হইয়া Inquisition সমাপে নীত হইলেন। Panglossএর ফাঁসী হইল, Candideকে বেত মারিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ভীত ও বিস্মিত Candide ভাবিলেন "এই যদি যাবতীয় সম্ভাব্য জগতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জগৎ, তবে অবশিষ্ট জগৎগুলি কিরূপ? দার্শনিক শ্রেষ্ঠ Pangloss, নরোত্তম জেম্‌স, রমণী রত্ন কুনেগণ্ডে এই সর্ব্বোত্তম জগতে তোমাদের এত কষ্ট কেন?"

কয়েক দিন পরে এক অচিন্তিত উপায়ে কুনেগণ্ডের সহিত Candideর দেখা হইল, কিন্তু এই মিলন স্থায়ী হইল না। আবার কুনেগণ্ডে Candide হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। Candide পলায়ন করিয়া আমেরিকায় গেলেন। Paraguay গিয়া দেখিতে পাইলেন দেশের যাবতীয় সম্পত্তি Jesuit পুরোহিতদিগের হস্তগত, প্রজা-সাধারণের কিছুই নাই—যুক্তি ও ন্যায় বিচারের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। এক ওলন্দাজ উপনিবেশে একহস্ত ও একপদ বিশিষ্ট ছিন্নবস্ত্র পরিহিত এক নিগ্রো বলিল "কলে কাজ করিবার সময় কোনও শ্রমিকের একটা আঙ্গুল যদি কলে আটকাইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সমস্ত হাতটিই কাটিয়া ফেলা হয়। কেহ যদি পলায়নের চেষ্টা করে, তাহার এক পা কাটিয়া ফেলে। তোমাদের চিনির অভাব দূর করিবার জন্য এই মূল্য দিতে হয়।" Eldorado দেশে গিয়ে Candide অনেক স্বর্ণ ও রত্ন সংগ্রহ করিলেন, এবং তাহা লইয়া দেশে ফিরিবার জন্য এক জাহাজ ভাড়া করিলেন। স্বর্ণ-রত্ন জাহাজে বোঝাই হইবামাত্র তাহার মালিক Candideকে তীরে ফেলিয়া রাখিয়া জাহাজ ছাড়িয়া দিল। সামান্য যাহা ছিল তাহা লইয়া দেশে ফিরিবার পথে জাহাজে Martin নামক এক প্রাচীন পণ্ডিতের সহিত Candideর আলাপ হইল। Candide জিজ্ঞাসা করিলেন, "মানুষ কি চিরকালই বর্ত্তমানের মত মানুষকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া আপনি বিশ্বাস করেন? মানুষ কি চিরকালই মিথ্যাবাদী, প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ, দস্যু, মূর্খ, তস্কর, পাপিষ্ঠ, ঔদরিক, মাতাল, কৃপণ, ঈর্ষ্যাপরায়ণ, উচ্চাভিলাসী, রক্ত পিপাসু পরনিন্দুক, লম্পট, ধর্ম্মোন্মত্ত ও ভণ্ড?" মার্টিন কহিলেন "তুমি কি বিশ্বাস কর, বাজপক্ষী চিরকালই দেখিবামাত্র কপোত মারিয়া খাইয়াছে?" Candide কহিলেন "নিশ্চয়।" মার্টিন—তবে? বাজের চরিত্র যদি চিরকালই অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া থাকে, তবে মানুষের চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস কর কেন? Candide—"ওঃ। কিন্তু মানুষ ও পশুতে প্রভেদ বিস্তর। ইচ্ছার স্বাধীনতা—।" তর্ক করিতে করিতে তাহারা Bordeauxতে পৌঁছিলেন। Candide ইয়োরোপের সর্ব্বত্র কুনেগণ্ডের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বহু অনুসন্ধানের পরে তাহাকে তুরস্ক দেশে প্রাপ্ত হইলেন। কুনেগণ্ডে এক রাজবাড়ীতে পরিচারিকার কাজ করিতেছিলেন। তাহার সৌন্দর্য্যের কণামাত্রও অবশিষ্ট ছিল না। দেখিয়া Candide দুঃখে অভিভূত হইলেন। কুনেগণ্ডে তখন Candide যে তাহাকে বিবাহ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। Candide প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন এবং কুনেগণ্ডেকে বিবাহ করিয়া তুরস্ক দেশেই বসতি স্থাপন করিয়া কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

চাঁদনীচকের ইতিকথা

শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুপ্ত

পুরাণ দিল্লীর পৌর সভায় গৃহীত প্রস্তাব যদি কথায় পর্যবসিত না হয়ে যথার্থই কার্যের দ্বারা সমর্থিত হয়, তা হলে চাঁদনী চক যে শীঘ্রই শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সাম্প্রতিক এক প্রস্তাব অনুযায়ী, চাঁদনী চকের অন্তর্গত ফোয়ারাটি অনতিবিলম্বে সংস্কৃত ও মার্জিত হয়ে নব কলেবর ধারণ করবে। চাঁদনী চকের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত নাভিপদ্মের মত—সৌন্দর্যের আকর এই ফোয়ারাটি।

দিল্লী পত্তনের সময় হতে আজ পর্যন্ত চাঁদনী চক এই নগরীর এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই চাঁদনী চক বা রূপা বাজার বিশেষ করে এই ফোয়ারা অঞ্চলটি। ইহার প্রতিটি ধূলিকণায় ইতিহাসের পদচিহ্ন নির্মম আঘাতে অঙ্কিত হয়ে আছে।

সাজাহান তনয়া জাহানারা বেগম চাঁদনীচক নামের স্রষ্টা। সে সময়ে চাঁদনীর রূপ ছিল অষ্টভুজাকার এবং মধ্যে তার ছিল একটি খাল। কালক্রমে সে খালটি ভরাট হয়ে পথের রূপ নিয়েছে; চাঁদনী চকও পরিবর্তিত রূপে বিস্তৃতি লাভ করেছে।

চাঁদনীর দুইশত বর্ষের দীর্ঘ জীবনধারা অবিরাম রক্ত-রঞ্জনে করুণ ও বীভৎস। নাদির শাহের আজ্ঞায় এই অঞ্চলে বেসামরিক জনসাধারণের বেপরোয়া হত্যানুষ্ঠান সে দেখেছে, ১৭৩৯ সালের ১১ই মার্চ; তিন মোগল রাজপুত্রের ছিন্ন মস্তকের প্রদর্শনী দেখেছে ১৮৫৭ সালে, এর কোতোয়ালির পুরোভাগে; আবার ইংরাজ কর্তৃক দিল্লী বিজয়ের পর শত শত নির্দোষ জনসাধারণের নির্বিরোধ হত্যার বর্বরতা—সেও ১৮৫৭ সাল।

তারপর, মোগল সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট বাহাদুর শা'র অভ্যুদয়; চাঁদনীচক তারও সাক্ষী। ইংরাজ কর্তৃক দিল্লী অবরোধ ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোবর্তী হয়ে বাহাদুর শাহ হস্তীপৃষ্ঠে এই অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল জনগণের উৎসাহ বর্ধন ও তাদের সাহস দান।

আর, যে ফোয়ারাটির সংস্কার সাধনে নিরত পৌরবাসী—আজ অশ্রুসজল কাহিনীর পটভূমিকায় তা সমুজ্জ্বল। ইংরাজ সেনাধ্যক্ষ হাডসন কর্তৃক নৃশংসভাবে নিহিত বাহাদুর শা'র পুত্রদের ছিন্নমস্তক এইখানটিতে স্থাপিত হয়ে প্রদর্শিত হয় বিপুল জনতার সামনে। তাছাড়া, সিপাহী বিদ্রোহের পর, ফাঁসিকাঠ খাড়া করে হাজার হাজার নিরপরাধ নরনারীর বীভৎস হত্যাকাণ্ডের রক্তাক্ত স্মৃতিও এই ফোয়ারাটির ললাট ফলকে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

১৯১২ সালের ১৩ই ডিসেম্বর—লর্ড হার্ডিঞ্জ আনুষ্ঠানিক ভাবে রাজধানীতে প্রবেশ করেন; তখন তাঁকে হত্যার চেষ্টা হয় এই চাঁদনী-চকেই। বস্তুতঃ, রূপার স্রোতের পাশে রক্তের স্রোত—এই চাঁদনীচকের চিরন্তন কাহিনী, হয়তো সমগ্র পৃথিবীরও।
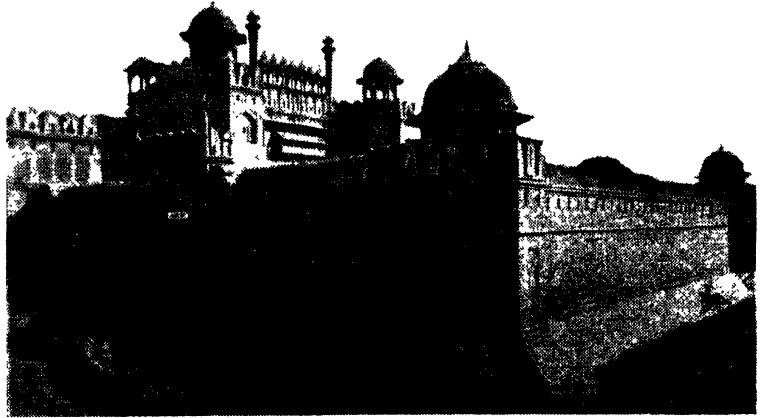
লাল কেল্লা

বিগত ত্রিশ বৎসর যাবৎ আবার চাঁদনীচক দেখেছে সশস্ত্র ইংরাজ প্রভুদের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র জনসাধারণের অভূতপূর্ব স্বাধীনতা সংগ্রাম।

ফোয়ারার কিছু দূরেই ঘন্টাঘর। ১৮৬৮-৬৯ সালের মধ্যে নির্মিত এটি। ইহার সম্মুখভাগে কংগ্রেসের ঐতিহাসিক অধিবেশন হয় ১৯৩২ সালে; সরকারী নিষেধাজ্ঞা অবমাননা করে পণ্ডিত মালব্য সভাপতিত্ব করেন তাতে।

১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭—ভারত ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল অবিস্মরণীয়

দিন। এই দিন এই অঞ্চলস্থ ইতিহাস প্রসিদ্ধ লাল কেল্লায়—সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘোষণা করে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অন্তরতম বাসনার প্রতীক স্বরূপ—ভারতের জাতীয় পতাকা উড্ডীন হল, পণ্ডিত নেহরু কর্তৃক।

ঘণ্টাঘর

ইহার পূর্ববর্তী রক্তাক্ত ইতিহাস কোনদিন ভুলবে না ভারতবাসী। ১৯৪২-এর জনজাগরণ দমনের উদ্দেশ্যে চাঁদনীচকের সমগ্র অঞ্চলটিই বিরাট সৈন্যাবাসে পরিণত হয়ে উঠেছিল—আর, ব্রিটিশ সৈন্যের যথেচ্ছাচার আর উচ্ছৃঙ্খলতায় প্রতিটি সূর্যোদয় রক্তরঞ্জিত হয়ে উঠেছে।

কোতোয়ালির নিকটবর্তী রোসন-উৎ-দৌলার মসজিদ। এখান থেকেই নাদির শাহের উদ্দেশ্যে গোলা বর্ষিত হয়েছিল। কথিত আছে, ২০০,০০০ লোক সেই হত্যাকাণ্ডে প্রাণবিসর্জন করে এবং নাদির শাহ আশি কোটি টাকা মূল্যের লুণ্ঠন দ্রব্য নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

বহুরূপী চাঁদীনচক। বহুবার তার রূপ বদল হয়েছে, রাজা ও রাজ্যের উত্থান পতনের সঙ্গে। পাঞ্জাব-আগত শরণার্থীর ভিড়ে এখন আবার নবরূপ নিয়েছে চাঁদনীচক। দিকে দিকে দৃষ্টিকটু বস্ত্রাচ্ছাদনে যেন তেন প্রকারে তৈরি বিপনি শ্রেণী সমগ্র পথটাই অবরুদ্ধ করে আছে। সেই বিচিত্র পরিবেশের মাঝে ফোয়ারাটি মুহ্যমান যেন; তার জলধারার উদ্ধত ফণা আর আকাশের পানে প্রসারিত হয় না এখন—ধীরবাহী, নিম্নাভিমুখী ক্ষীণ স্রোতা সে। তার স্নিগ্ধ প্রচ্ছায়তলে শরণার্থী নরনারীগণ তাদের অলঙ্কার বর্জিত অস্থায়ী বিপনি সাজিয়ে বসেছে—মূর্তিমান বীভৎসতার মত। মোগল বাদশাহ কালের রূপা বাজারের রূপের পলক আজ এসব থেকে তিলমাত্র বুঝবার উপায় নেই।

ঐতিহাসিক এই সব ঘটনাপুঞ্জের পটভূমিকায় চাঁদনীর মধ্যমণি এই ফোয়ারাটি আবার সুসংস্কৃত হয়ে নবরূপায়ণে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত আপনার প্রগলভ জলধারায় পূর্বের মতই অবিশ্রাম স্বয়ং স্নান করে চলবে—মূকদ্রষ্টা সে—মানুষের বিচিত্র জীবনপ্রবাহের ছায়া তার স্বচ্ছ জলে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিফলিত হয়ে মুহুর্মুহুঃ কেবল মিলিয়ে যাবে।

পরচর্চ্চা

শিল্পী—কুমারী কৃষ্ণা রুদ্র

তথাগতের পথে

নরেন্দ্র দেব

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বানগঙ্গা ক্ষুদ্র একটি পার্বত্য নদী। একেই তো এই শৈল প্রবাহিনীর উপলব্যথিত গতি, তার উপর আবার—আমরা যে সময় তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলুম—তখন অগ্রহায়ণের প্রায় শেষ। তিনি তখন বিন্ধ্যগিরি নিঃসৃতা রেবার মতো শীতে বিশীর্ণা। বর্ষায় যে ইনিই হঠাৎ কি প্রলয় মূর্তি ধারণ করেন সেটা কল্পনা ক'রে নিতে বিশেষ কষ্ট হল না। কারণ, একবার অজয় নদীর ঢল নামার মুখে পড়েছিলাম। অজয়ের শুষ্ক বুকে তখন ধূ ধূ করছে শুধু বালি। জলের চিহ্ন মাত্র নেই। বধূরা জলকে এসে বালি খুঁড়ে গাগরি ভরে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা নদীর মধ্যে নেমে বালির উপর মনের আনন্দে খেলছিলাম। হঠাৎ দূর থেকে এক বিপুল গর্জন কানে এল। চেয়ে দেখি—নদী গর্ভে নেমে যাঁরা এতক্ষণ নানা প্রয়োজনীয় কার্যে বিশেষভাবে লিপ্ত ছিলেন তাঁরা সকলেই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছেন। ব্যাপার কি ভাল করে বোঝবার আগেই দেখি শুষ্ক নদীর বালি ঢাকা নীরস বুক—তরতর করে স্নিগ্ধ জলে ভরে উঠতে লাগলো। আমরা লাফ দিয়ে নদীর বুকে দেবতার নৈবেদ্যের মতো সাজানো চোরা পাহাড়ের চূড়ার উপর উঠে পড়লুম। নদীর তীর থেকে তখন অনেক লোক চিৎকার করে আমাদের উত্তর দিকে চেয়ে দেখবার জন্য ইঙ্গিত দিয়ে পালিয়ে আসতে বলছিলেন। নিমেষের মধ্যে জল আমাদের হাঁটু পর্য্যন্ত উঠে পড়লো। উত্তরের দিকে সভয়ে চেয়ে দেখি তিন তালার সমান উঁচু এক রূপালী পর্দা রৌদ্রের আভায় উজ্জ্বল হয়ে প্রচণ্ড বেগে দক্ষিণের দিকে ছুটে আসছে। আমরা আতঙ্কে অস্থির হয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় নদীর পাড়ে উঠে আসবার চেষ্টা ক'রতে লাগলুম। সমস্ত লোক 'গেল' গেল, শব্দে হাহাকার করে উঠলো! এমন সময় কী যেন একটা দৈবীশক্তির বলে আমরা নদীর পাড়ে উঠে পড়লুম এবং প্রাণ ভয়ে পলায়মান লোক-গুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে দৌড়তে শুরু করলুম। গুড়ুম গুড়ুম করে যেন বন্দুকের আওয়াজ হচ্ছিল সেই বিপুল জলরাশির গতিবেগের সঙ্গে! চক্ষের নিমেষে ভীষণ স্রোত প্লাবিত করে দিয়ে গেল অজয়ের দুই তীর।

নদীতে ঢল নেমেছিল সেদিন।

বন্যার চেয়ে তার প্রলয় নাচন কিছুমাত্র অল্প নয়। সবাই বলতে লাগলেন আমরা যে বেঁচে গেছি সে নাকি আমাদের নেহাৎ পরমায়ুর জোরে।…হবেও বা! শীর্ণ বানগঙ্গা। ঝির্ ঝির্ ক'রে ক্ষীণ জল রেখা প্রবাহিত হ'চ্ছে। নদীগর্ভের শুষ্ক শিলাস্তূপ যেন ব্যঙ্গ করছিল আমাদের। ওরই মধ্যে একটু খুঁজে পেতে জল যেখানে কতকটা গভীর সেইখানে একটু 'কাকস্নান' ক'রে নেওয়া গেল। ক্ষুধা বোধ হচ্ছিল ভীষণ। ঠাকুর-চাকর আগেই এসে হাজির হয়েছিল এখানে। শ্রীমতী

বানগঙ্গার ধারে প্রাচীন নগরপ্রাকার

রাশগুপ্তার আদেশ ও উপদেশ অনুযায়ী তারা এসেই উনানে আঁচ দিয়ে খিচুড়ি চড়িয়ে দিয়েছিল। কাজেই বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা করতে হল না। নদীর পাষাণ বুকের মধ্যে বেদির ন্যায় উঁচু-নীচু ছোট বড় শিলা-খণ্ডের উপর সঙ্গে আনা কদলীপত্র বিছিয়ে আমরা সবাই বসে গেলাম। আলু পেঁয়াজ দেওয়া ফুলকপির গরম খিচুড়ি, সঙ্গে পাঁপড় ভাজা—ডিমের মামলেট, টমাটোর চাটনি সব কিছুই যেন অমৃতের মতো সুস্বাদু লাগছিল। লাগবারই কথা—কারণ বেলা তখন প্রায় ২টো বাজে! পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে যেন পাহাড়ীক্ষুধার সঞ্চার হয়েছিল সবারই উদরে। মেয়ে পুরুষ নির্ব্বিশেষে সেদিন যা খিচুড়ি খাওয়া হয়েছিল—তা সম্পূর্ণ

হিসাবের বাইরে। পূর্বেই বলেছি—শ্রীমতী দাশগুপ্তা একজন অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মহিলা। শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে পাণ্ডবের বনবাসকালে দ্রৌপদী যেমন অসময়ে শত শিষ্যসহ সমাগত দুর্বাসা ঋষির কেবল শাকান্নের দ্বারা পরিতোষ সাধন করেছিলেন—তাঁর নম্র আতিথেয়তার গুণে, শ্রীমতী দাশগুপ্তাও তেমনি সেই জঙ্গলাকীর্ণ বিজন পার্বত্যভূমে—সঙ্গে-আনা সেই স্বল্প আয়োজনের দ্বারাই সকলকে পরিতৃপ্ত করতে পেরেছিলেন।

ভোজনান্তে কিছুক্ষণ সেখানে বিশ্রাম করেছিলাম। এই বানগঙ্গার ঠিক ওপার থেকেই গয়া জেলা শুরু হয়েছে। পাটনা জেলার শেষ প্রান্তে এই বানগঙ্গা, অতএব একে ফ্রণ্টিয়ার বা সীমান্ত প্রদেশও বলা যেতে পারে। এখানে অতি প্রাচীন কালের এক নগর প্রাকারের ধ্বংসাবশেষের কিয়দংশ আজও দাঁড়িয়ে আছে দেখা যায়। প্রত্নতত্ত্ব বিশারদেরা বলেন, এইটিই নাকি রাজগৃহের শেষ সীমানাজ্ঞাপক প্রাচীর।

জৈনমন্দিরে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্তি

সেকালের গিরিব্রজপুর বা বার্হদ্রথপুরও এই সীমানারই অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে মনে হয়।

গয়া ও পাটনার সীমান্তবর্তী 'নওয়াদা' সাবডিভিশান বেশ উপভোগ্য স্থান। এই বানগঙ্গার ইতিহাস ছাড়াও এ অঞ্চলে বানগঙ্গা সম্বন্ধে একটি বেশ চিত্তাকর্ষক কাহিনী প্রচলিত আছে। গিরিব্রজপুরের কোনও এক রাজার রাজত্বকালে রাজ্যে অনাবৃষ্টির ফলে শস্য উৎপন্ন না হওয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। রাজ উদ্যানও শুকিয়ে উঠে, সমস্ত দুর্লভ তরুলতা পর্যন্ত মরতে বসেছে দেখে রাজা বিষম চিন্তিত হয়ে মন্ত্রীসভার অধিবেশন আহ্বান করলেন। মন্ত্রীরা পরামর্শ দিলেন যে, ঐ বানগঙ্গার জল সমস্ত পাহাড় বেয়ে রাজ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। বাঁধ বেঁধে ঐ জল আটকাতে হবে এবং সেই জল খাল কেটে রাজ্যের চারিদিকে নিয়ে যেতে হবে। মহারাজ এই পরামর্শ সমীচীন বোধে রাজ্যে ঘোষণা করে দিলেন রাজ্যে যারা বাস্তুকার পূর্ত বিশেষজ্ঞ ও যন্ত্ররাজ আছেন তাঁরা সকলে আসুন এই বাঁধ বাঁধবার জন্য। কিন্তু রাজ আহ্বানে কারুরই সাড়া পাওয়া গেল না।

প্রথমতঃ বানগঙ্গা স্বর্গের পুণ্যপ্রবাহিণী। তার স্রোত রুদ্ধ করতে গেলে ঐরাবতের মতো ভেসে যেতে হবে এই অন্ধ সংস্কার এবং এই হাজার হাত উঁচু পার্বত্য নদীতে বাঁধ বাঁধতে হলে হাজার হাজার বলিষ্ঠ শ্রমিক চাই যারা কঠিন পরিশ্রমেও কাতর হবে না। রাজ্যে মিললোনা সেরকম মজুর। দুর্ভিক্ষে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। রাজা অস্থির হয়ে উঠলেন। শেষে ঘোষণা করে দিলেন যে এক রাত্রির মধ্যে যে কোনও বাহাদুর এই বাঁধ বেঁধে দিতে পারবে তাকেই আমার অর্ধেক রাজত্ব ও আমার একমাত্র কন্যাকে উপহার দেবো। কিন্তু না পারলে তার প্রাণদণ্ড হবে।

এ ঘোষণার পরও কেউ এল না। রাজা যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছেন, তখন এগিয়ে এলেন রাজ্যে অনাদৃত অনার্যগণের দলপতি

'পাওয়াপুরী' মন্দির (সামনের দিক)

চন্দ্রাপৎ তাঁর বলিষ্ঠ অনুচরগণকে নিয়ে। রাজপ্রাসাদের উৎসব মণ্ডপে কি একটা পর্ব উপলক্ষে চন্দ্রাপৎ একবার রাজকন্যাকে দেখেছিলেন, তারপর থেকে তিনি সে সুন্দরী কন্যাকে আর ভুলতে পারেন নি। কিন্তু অনার্য এক সর্দারের পক্ষে আর্য রাজদুহিতার পাণিগ্রহণের দুরাশা যে আকাশকুসুমের মতই অসম্ভব এটা তিনি জানতেন বলেই নীরব ছিলেন। বামনের চাঁদ ধরবার সাধের মতই তা মনের মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় রাজার এই অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা দানের ঘোষণা তাঁর প্রাণে এক নূতন আশার সঞ্চার করলো। তখন অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে এই আশায় তিনি এগিয়ে এলেন এই অসাধ্য সাধনে।

মহারাজও তাঁকে খুব উৎসাহ দিলেন ও রাজ্যের সমস্ত শক্তি নিয়ে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছেন জানালেন।

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রাপৎ কাজ শুরু করে দিলেন তাঁর অসংখ্য বলিষ্ঠ অনুচরদের নিয়ে। রাজার দূত প্রহরে প্রহরে এসে রাজাকে সংবাদ দিয়ে যাচ্ছিল কাজ কতদূর অগ্রসর হল। তৃতীয় প্রহরে দূত

এসে সংবাদ দিলে বাঁধের কার্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সংবাদ শুনে মহারাজ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। অর্দ্ধেক রাজ্য ও রাজকন্যাকে দান করতে হবে ঐ বর্বর অনার্য সর্দারের হাতে? কখনই না। মন্ত্রীদের ডাক পড়ল। কূট মন্ত্রণায় স্থির হ'ল, মোরগ ডাকিয়ে দিয়ে ভোর হ'য়ে গেছে ঘোষণা করা হোক এবং রাজসৈনিকেরা গিয়ে রাত্রির মধ্যে ওদের কাজ ব্যর্থ হওয়ার জন্য ওদের বিতাড়িত করে চন্দ্রাপৎকে বন্দী করে নিয়ে আসুক প্রাণদণ্ডের জন্য।

রাত্রি শেষ হবার আগেই মোরগ ডাকছে শুনে এবং রাজসৈনিকদের ছুটে আসতে দেখে—সুচতুর—চন্দ্রাপৎ রাজার ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে পলায়ন করলেন। বাঁধ বাঁধা হয়ে গেছে দেখে রাজা আর তার পশ্চাদনুসরণ করলেন না বটে, কিন্তু চন্দ্রাপতের উপর তিনি যে অন্যায় অবিচার করলেন সেটা তাঁর মনে একটা দারুণ অনুতাপ এনে দিলে। তিনি অনুশোচনাবশে সিংহাসন ত্যাগ করে বানপ্রস্থ গ্রহণ করলেন। কিন্তু যাবার আগে ব্যবস্থা ক'রে গেলেন যে যারা এই বাঁধ বেঁধেছে তারা রাজভাণ্ডার থেকে পুরুষানুক্রমে মাথা পিছু সাড়ে তিনসের ক'রে পথ্য বা আনাজ পাবে। সেই থেকে এই প্রথা নাকি ও অঞ্চলে আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। প্রত্যেক শ্রমিক সেখানে মজুরী হিসাবে সাড়েতিনসের শস্য বা আনাজ পায়।

বানগঙ্গা দেখে এখন আর সে বাঁধের কোনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না বটে, কিন্তু সেই ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাচীন নগর প্রাকার ও পার্বত্য নদী বানগঙ্গার বর্তমান রূপ দেখে বেশ অনুমান করতে পারা যায় যে, একদা মানুষের স্পর্দ্ধা প্রকৃতির এই রম্য নিকেতনে এসে তার শক্তির ব্যভিচার করেছিল।

বানগঙ্গার আসল নাম ছিল "বাহান্নগঙ্গা"! অর্থাৎ এই এক নদীতে অবগাহন করলেই ভারতের ভাগীরথী যমুনা কৃষ্ণা কাবেরী গোদাবরী সরস্বতী প্রভৃতি ৫২টি পবিত্র নদীতে অবগাহন স্নানের পুণ্যলাভ হ'ত। এই "বাহান্নগঙ্গা" শব্দটি স্থানীয় অধিবাসীদের মুখের ভাষায় 'বাওনগংগা' হ'য়ে দাঁড়ায়। ক্রমে তা থেকেও হ্রস্বতা লাভ করে শেষে 'বানগঙ্গা' বা 'বনগংগা'য় রূপান্তরিত হয়েছে।

বাড়ী ফিরতে আমাদের সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ফেরবার মুখে সেই পার্বত্য অরণ্য পথে সূর্যাস্তের সোনালী সৌন্দর্যে—ঝলমল্ অপরাহ্ণ বেলায় আমাদের চোখের সামনে প্রকৃতির যে অসামান্য রূপ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিল—ইট-কাঠের প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ সহরে মানুষের চখে তা কদাচ পড়ে।

একদিন সকালে উঠে আমরা ওখানে পুরণচাঁদ নাহারের বাড়ী দেখতে গেলাম। কারণ, তাঁর বাড়ীতে শুনেছিলুম রাজগীর সংক্রান্ত প্রত্নতত্ত্বের একটি ছোটখাট মিউজিয়ম আছে। কিন্তু গিয়ে যা দেখলুম তা এমন কিছু নয়। ভাঙাচোরা ভাস্কর্য ও প্রস্তরশিল্পের সামান্য সংগ্রহ, তাতে মন ভরেনা। তবে হ্যাঁ, একজনের ব্যক্তিগত চেষ্টায় যেটুকু তিনি করেছেন তা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। পুরীর শ্রীযুক্ত বীরেন রায়ের কথা মনে পড়লো। উড়িষ্যার প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য কলা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত সংগ্রহও যে কত অসামান্য হ'তে পারে সেটা তিনি সকলকে প্রত্যক্ষ করিয়েছিলেন। তাঁর সমস্ত সংগ্রহই উপস্থিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ম অলংকৃত করছে।

রাজগীর সংক্রান্ত যা কিছু প্রত্নতত্ত্ব পরিচিতি শোনা গেল সে সমস্তই নাকি নালন্দা মিউজিয়মে সযত্নে রক্ষিত আছে। অদ্রীশকুমারের নিমন্ত্রণ রাখতে তো শীঘ্রই একদিন নালন্দায় যেতেই হবে, সুতরাং আক্ষেপ হলনা তেমন কিছু।

ইতিমধ্যে এসে গেল জৈনতীর্থস্থান পাওয়াপুরী দেখে আসার একটা সুযোগ।

আমরা পাওয়াপুরী রওনা হলুম বেলা একটার ট্রেণ ধরে।

মন্দিরাভ্যন্তরে আমরা

গৃধ্রকূটযাত্রী সঙ্গীরাও সবাই সঙ্গে এলেন। বেশীর মধ্যে সঙ্গী পেলুম আমরা মার্টিন লাইট রেল-ওয়ের অডিটার শ্রীমান বিনয় নন্দীকে। ভদ্রলোক নামেও বিনয়—কাজেও বিনয়। বিবাহ করেননি। একলা একখানি ক্ষুদ্র বাড়ী নিয়ে আছেন। সৌখীন লোক। বাড়ীতে ছোট একটু ফুল ফল ও শাকসব্জীর বাগান করেছেন। আমাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে তাঁর বাগানের ফুল ফল ও শাকসব্জী আমাদের বাড়ী তিনি প্রায়ই পাঠাতেন। একলা মানুষ, কত খাবেন আর? ছাদভরা লাউ কুমড়ো, বাগানভরা কপি, টমাটো, বীট, মুলো, গাজর, লেটুস্, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, ঢেঁড়স। ফুলও যথেষ্ট। গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা, ডালিয়া, কস্মস্, অজস্র ফুল তিনি পাঠাতেন আমাদের। শুধু তাই নয়,

বিনয়বাবুকে রেলের কাজে রোজই কোনও না কোনও ষ্টেশনে যেতে হ'ত। বাড়ী ফেরবার সময় তিনি ষ্টেশন থেকে সোজা আমাদের বাড়ী হ'য়ে তবে বাসায় যেতেন। সঙ্গে আনতেন নবনীতার জন্য কোনও দিন শীলাওয়ের বিখ্যাত খাজা, কোনওদিন কাশীর পেয়ারা, কোনওদিন গোলাপী রেউড়ী ও নানখাটাই, কোনওদিন বিহারের কুল, কমলা, কাজুবাদাম, দানার মোয়া, মুগের লাড়ু আরও কত কি। তিনি অবশ্য আনতেন বটে নবনীতার নাম ক'রে, কিন্তু, ভাগ বসাতাম আমরা সবাই।

পাওয়াপুরী যাবার দিন ইনি আমাদের শুধু সঙ্গী হয়েই যাননি। বিনয়বাবুই ছিলেন সেদিন আমাদের 'Friend, Philosopher and Guide! আমরা তাঁর কথামতো চটপট স্নানাহার সেরে বেলা ১১টার গাড়ীতে বিহার-শরীফে রওনা হলুম। সঙ্গে নেওয়া হ'ল শুধু একাধিক টিফিনক্যারিয়ার ও জলের কুঁজো আর শেষ ট্রেণ ফেল হলে রাত কাটাবার জন্য প্রত্যেকে এক একখানি গরম র‍্যাগ।

পাওয়াপুরী মন্দির (পশ্চাৎদিক)

রাজগীর থেকে বিহারশরীফ মাত্র ১৩ মাইল। কিন্তু মার্টিনের লাইট রেলওয়ে এইটুকু নিয়ে যেতে দেড়ঘণ্টার বেশি সময় নেয়। আমরা বিহার-শরীফে পৌছে পাওয়াপুরী যাবার জন্য মোটর বাস ধরতে গিয়ে শুনলুম সাম্প্রতিক বন্যায় নদীর পোল ভেঙে গেছে বলে বাস চলাচল অব্যাহত নেই। বিহারশরীফ থেকে পাওয়াপুরীর দূরত্ব মাত্র ৮ মাইল। নদীটি মাঝপথে। বাস নদীর ঘাটে যাত্রীদের নামিয়ে দেয়। নৌকায় নদী পার হ'য়ে ওপারে গিয়ে আবার বাসে উঠতে হবে। বাস যেথানে নামিয়ে দেবে সেথান থেকে আরও প্রায় মাইলটাক হেঁটে গেলে তবে এই প্রসিদ্ধ জৈনতীর্থে পৌছানো যাবে। কিন্তু ফেরবার সময় ফিরতি বাস পাবার কোনও স্থিরতা নেই। বাস যদিই বা পাওয়া যায় তাতে স্থান পাওয়ার কোনও নিশ্চয়তা নেই। অগত্যা, আমরা বাসে যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ ক'রে 'ট্যাক্সীর' সন্ধান করলুম। মাত্র দু'খানি ট্যাক্সী বিহারশরীফ থেকে পাওয়াপুরী যাতায়াত করে, কিন্তু, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে একখানি আগেই সওয়ারী নিয়ে বেরিয়ে গেছে, আর একখানি বিকল হ'য়ে পড়ে আছে। দু'খানি ট্যাক্সীই শোনা গেল 'ঝরঝরে'—পথের মাঝে নেমে ঠেলতে হয় নাকি প্রায়ই! অতএব ট্যাক্সী ছেড়ে তখন প্রত্যেক গাড়ীতে দু'জন হিসেবে ৬খানি 'সাইকেল্ রিক্সা' যাতায়াতের ভাড়া পাঁচ টাকা করে ৩০৲ স্থির করে আমরা ১২ জন যাত্রী রওনা হলুম পাওয়াপুরী।

সুন্দর পথ। সাইকেল রিক্সায় যেতে বেশ আরাম। দু'ধারে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে খোলা আকাশের নীচে দিয়ে গাড়ী চড়ে গড়িয়ে যেতে এত ভাল লাগছিল। বিশেষ করে নদীর ওপারের পথ এত চমৎকার যে মনে হচ্ছিল এ পথ যদি না ফুরোয় তবে অনন্তকাল ধরে যেতে রাজি আছি এমনি করে আরামে নিরুদ্দেশ যাত্রায়।

নদী পার না-হওয়া পর্য্যন্ত রোদের তাপ ছিল বেশ মৃদু উষ্ণ। রিক্সাওয়ালারা নদী পার হ'ল হেঁটেই। আমরা একখানি নৌকা নিয়ে ওপারে গিয়ে আবার রিক্সায় উঠলুম। বন্যার যে বিপুল ধ্বংসলীলা চ'খে পড়লো তা সত্যই ভীষণ ইটপাথরে গাঁথা। মজবুদ পাকা পোলটাকে ভেঙে তচ্‌নচ্ ক'রে দিয়ে গেছে বন্যার প্রচণ্ড স্রোত!

ওপারে রোদের তাত বেশ কমে এসেছে তখন। নভেম্বরের শেষ বেলা। মনোরম ঠাণ্ডা আবহাওয়া। ততোধিক মনোরম চারিদিকের শ্যামল পরিবেশ ও পল্লী সৌন্দর্য। নির্জন পথ। শুধু চলেছি আমরা কটি যাত্রী হাসি গল্প গানে সারাটা পথ মুখরিত করে। দূর থেকে পাওয়াপুরীর মন্দির চূড়া ও ধর্মশালাগুলি যখন চখে পড়লো, মন খারাপ হয়ে গেল। এমন সুন্দর যাত্রা আমাদের সমাপ্ত হয়ে এল জেনে। একেবারে পাওয়াপুরীর মন্দিরের দ্বারে নিয়ে গিয়ে রিক্সাগুলি আমাদের নামিয়ে দিলে। মন্দির দেখে আমরা খুশী হয়ে উঠলুম। ক্ষুদ্র একটি কৃত্রিম হ্রদের মধ্যে মর্মর শিলায় বিনির্মিত সুচারু মন্দির। হ্রদের উপর দিয়ে মন্দিরে পৌছবার জন্য অতি সুদৃশ্য এবং সুদীর্ঘ একটি কারুকার্যকরা লাল পাথরের সেতু আছে। পাওয়াপুরীর এই মন্দির-পথ কেবলই আমাদের অমৃতসরে দেখা শিখেদের 'স্বর্ণ দেউল' স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। তারই অনুকরণে যে এই মন্দিরটি তৈরি হয়েছে বোঝা তা গেল।

জৈন ধর্ম সম্প্রদায়ের একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান এই পাওয়াপুরী। চতুর্বিংশতিতম অর্থাৎ সর্বশেষ তীর্থংকর শ্রীশ্রীমহাবীরজী এইখানেই দেহত্যাগ করেছিলেন। জৈন শাস্ত্র অনুসারে জানা যায় যে আদিনাথ থেকে আরম্ভ করে পরপর চব্বিশজন তীর্থংকর জৈনধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাদের মধ্যে শেষ দু'জন হলেন পার্শ্বনাথ আর মহাবীর। 'তীর্থংকর' বলতে বোঝায় 'ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ'। এই সর্বত্যাগী সাধু মহাবীরের জীবনী পাঠে জানা যায় যে ইনিও একদিন আমাদেরই মতো একজন সংসারী মানুষ ছিলেন। সংসার আশ্রমে মহাবীরজীর নাম ছিল—রাজকুমার বর্ধমান। তিনি ছিলেন রাজপুত্র। অল্পবয়সেই তাঁদের সামাজিক প্রথা অনুযায়ী একটি সুন্দরী বালিকার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। বালিকার নাম যশোদাকুমারী। তাঁরা বয়োপ্রাপ্ত হবার পর তাঁদের একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তিরিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত শ্রীমহাবীর সংসার আশ্রমে ছিলেন। এই সময় তাঁর পিতার স্বর্গলাভ হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি গৃহত্যাগী হয়ে সন্ন্যাস

গ্রহণ করেন। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরকাল কঠোর তপস্যা ও সাধনার ফলে সিদ্ধিলাভান্তে তিনি 'জিন' অর্থাৎ 'জয়ী' বলে পরিচিত হন। এই 'জিন' নামটি থেকেই এঁদের প্রবর্তিত ধর্ম সম্প্রদায় 'জৈন' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

প্রায় তিরিশ বৎসর ধরে তিনি স্বীয় ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। খৃঃ পূঃ ৫২৭ অব্দে পূর্ণ বাহাত্তর বৎসর বয়সে কার্ত্তিকী অমাবস্যা তিথিতে এই পাওয়াপুরীতেই তিনি দেহরক্ষা করেন। সে সময় তিনি রাজা হস্তীপালের লেখশালায় অতিথিরূপে অবস্থান করছিলেন। মহাবীরের নির্বাণ লাভের পর যেখানে তাঁর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা হয়েছিল সেইখানে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। কথিত আছে যে এই সিদ্ধ সাধুর দেহাবশেষ পবিত্র ভস্ম মাটি কিছু কিছু সংগ্রহ ক'রে রাখার প্রবল আগ্রহে এত অসংখ্য ভক্ত ও শিষ্যগণ এখানের মাটি আঁচড়ে তুলে নিয়েছিলেন যে এই স্থানে একটি গভীর খাদের সৃষ্টি হয়েছিল।

সেই খাদটিকেই পরে একটি সুন্দর হ্রদে রূপান্তরিত করা হয়, এবং সেই হ্রদের মধ্যস্থলে এই অপূর্ব মন্দির নির্মিত হয়। এই মন্দির নির্মাণে তখনকার দিনেও প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল বলে শোনা যায়। শ্বেতমর্মর-মন্দির, স্বর্ণমণ্ডিত আমলকচূড়া, মন্দিরদ্বার রজতবিনির্মিত। মন্দিরাভ্যন্তরে বহুমূল্য স্বর্ণ সিংহাসনে মহাবীরের দ্বিরদ নির্মিত পাদুকা রক্ষিত আছে! এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর স্মৃতি-মন্দিরে রাজ-ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি। রাজ-ঐশ্বর্যকে যিনি একদা ধূলার ন্যায় জ্ঞান করে চলে এসেছিলেন, তাঁর স্মরণ-দেউলে এই প্রচুর স্বর্ণমণ্ডন আমার চখে নিতান্ত অশোভন এক বিড়ম্বনা বলেই মনে হ'ল। মন্দিরের স্থাপত্যকলা প্রশংসনীয়। ভারতীয় ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ হয়নি কোথাও। সবচেয়ে ভাল লাগল আমাদের সেই প্রস্ফুট কমল কুমুদ শোভিত স্বচ্ছ সরোবর যা অহরহ সেই পবিত্র মন্দির তল বিধৌত করছে। এই জন্যই বোধ করি এই মন্দিরের নাম হয়েছে 'পাওয়াপুরী' বা পয়ঃপুরী অর্থাৎ 'জলমন্দির'। স্ফটিকের মতো নির্মল জলে অসংখ্য রূপালী মাছ নিঃশঙ্কচিত্তে খেলা করছে। সূর্য-কিরণ-সম্পাতে এই মন্দির ও সরোবরের শোভা ও সৌন্দর্য যেন ঝলমল্ করছিল।

এই পাওয়াপুরী মন্দিরের নিকটেই আর একটি মন্দির আছে। এটির নাম 'গাঁওয়াপুরী' বা গ্রাম্য দেউল, অর্থাৎ 'স্থলমন্দির'। এইখানে মহাবীরজী তাঁর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শোনা যায় তাঁর পরলোকগমনের পর তাঁর সহোদর ভ্রাতা রাজা নন্দীবর্ধন এই মন্দিরটি নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। এই মন্দির ঘিরে একটি সুন্দর ধর্মশালা আছে।

এই দু'টি মন্দির ছাড়া আরও দু'টি ছোট মন্দির আছে এখানে; একটির নাম সমোসরণ মন্দির, আর একটি মহাতাব কুমারীর প্রতিষ্ঠিত মন্দির। এখানে জৈন-তীর্থযাত্রীদের সমাগম খুব বেশী বলে ধনী লক্ষপতি জৈন-ব্যবসায়ীরা অনেকগুলি ভাল ভাল ধর্মশালা এখানে নির্মাণ করিয়েছেন। একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও আছে। কার্ত্তিক-অমাবস্যায় প্রতি বৎসর এখানে অষ্টাহকালব্যাপী বিরাট মেলা হয় শেষ তীর্থংকর মহাবীরজীর তিরোধান উৎসব উপলক্ষে। এই সব জৈন-তীর্থযাত্রী পাওয়াপুরী ঘুরে রাজগীরে আসেন পঞ্চগিরি শীর্ষস্থ জৈন-মন্দিরগুলি পরিক্রমার জন্য।

আমরা পাওয়াপুরীর মন্দিরগুলি দর্শনের সময় ওখানকার পাণ্ডারা আমাদের মহাবীরের চরণে অঞ্জলি দেবার জন্য গোলাপ মল্লিকা প্রভৃতি

গাঁওয়াপুরী মন্দির দ্বার

সুগন্ধি ফুল এনে দিলেন দক্ষিণার বিনিময়ে। মন্দিরে জুতা খুলে নগ্ন পদে প্রবেশ করতে হয়।

আমরা মন্দির প্রদক্ষিণ শেষ ক'রে জলাশয়ের ধারে বসে টিফিন-ক্যারিয়ারগুলি খুলে জলযোগ শুরু করলুম। ক্ষুধা পেয়েছিল সকলেরই। কাজেই নানাবিচিত্র খাবারগুলির যথোচিত সদ্ব্যবহার করে আমরা বাড়ী ফেরবার জন্য রওনা হলুম। আবার সেই সুন্দর পথ, সুন্দর পরিবেশ, মনোরম অপরাহ্ণ বেলা। সেই নৌকাযোগে নদী পার হয়ে এপারে আসা। বিহার শরীফ থেকে শেষ ট্রেণ ধ'রে আমরা বাড়ী ফিরলুম প্রায় রাত্রি আটটায়। (ক্রমশঃ)

রামপ্রসাদ

অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি এচ্-ডি

(১)

বর্ষচক্রের আবর্তনে আবার রামপ্রসাদের স্মৃতি-বার্ষিকী উদ্‌যাপনের দিন ফিরিয়া আসিয়াছে এবং আমরা আবার তাঁহার সাধনা-পূত জীবন ও কাব্যের পর্যালোচনা করিবার অবসর পাইয়া ধন্য হইয়াছি। এই মাত্র যে রামপ্রসাদী সঙ্গীতের দ্বারা সভার উদ্বোধন সম্পন্ন হইল, তাহা আমরা রামপ্রসাদের যুগ হইতে কতদূরে সরিয়া আসিয়াছি সেই সত্য আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কালের দিক দিয়া তাঁহার সঙ্গে আমাদের ব্যবধান প্রায় দুই শত বৎসর। যখন পলাশীর যুদ্ধে কামান গর্জন বজ্রকণ্ঠে আমাদের রাজনৈতিক ভাগ্য-বিপর্যয় ঘোষণা করিতেছিল, তখন সেই রূঢ় কোলাহলের মধ্যেও রামপ্রসাদের প্রাণ-মাতান স্বর্গীয় সঙ্গীত সাধকের কণ্ঠোত্থিত হইয়া বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস প্লাবিত করিতেছিল। কিন্তু মনোবৃত্তির দিক্ দিয়া বিচার করিলে আমরা যেন রামপ্রসাদকে বহু শতাব্দী পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছি এইরূপ ধারণা জন্মে। তাঁহার গান আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে কোন এক বহুদিনলুপ্ত অতীতের স্মৃতিতে বিভোর করিয়া তোলে; আমাদিগকে বর্তমান জীবনের সহিত প্রায় সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক এক অপরিচিত ভাব-রাজ্যে ক্ষণিকের জন্য লইয়া যায়। যে সাধনা বলে রামপ্রসাদ আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও পরাধীনতার গ্লানিকে উপেক্ষা করিয়া শাস্ত-সংযত, আদর্শনিষ্ঠ জীবন যাপনের প্রেরণা দিয়াছিলেন, বর্তমান বাঙ্গালীর জীবনযাত্রা হইতে তাহার প্রভাব অন্তর্হিত হইয়াছে। বাঙ্গালার সুদূর পল্লীতে প্রসাদী সঙ্গীত আজ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে—বিরল ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে যদি বা এই গান শোনা যায়, তথাপি ইহার প্রাণশক্তি যেন নিঃশেষিত হইয়াছে এই রূপ মনে হয়। এ যেন প্রাণবেগচঞ্চল, আত্মবিশ্বাসে দৃপ্ত বলিষ্ঠ প্রেরণা বহন করে না; বাস্তব জীবনের লাঞ্ছনা-দুর্গতির উপর আত্ম-প্রতিষ্ঠার গৌরব ইহার মধ্যে লুপ্ত। ইহাকে যেন ভক্তির সমাধিপরে উদাসিনী স্মৃতির দীর্ঘশ্বাসের মত করুণ ও অসহায় শোনায়।

রামপ্রসাদের গান যদি কেবল কাব্য হইত, তাহা হইলে কাব্যোৎকর্ষের জন্যই ইহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকিত। কিন্তু ইহা কেবল, এমন কি মুখ্যত ও, কাব্য নহে। ইহার পিছনে বাঙ্গালা দেশের সুদীর্ঘ ধর্মসাধনার ইতিহাস আছে। এই সাধনা ও সাধনা-প্রসূত মনোবৃত্তির সহিত সম্বন্ধ শিথিল হইলে গানগুলির কাব্যরসাস্বাদনের শক্তিও সেই পরিমাণে কমে। যে যুগে বাঙ্গালা দেশ তন্ত্রসাধনায় নিবিষ্ট ছিল, মাতৃ-মূর্তির অনুধ্যান ও তাঁহার শরণভিক্ষা যখন ইহার একান্ত আকুতি ছিল, সেই ভক্তিরসোচ্ছ্বল প্রতিবেশেই রামপ্রসাদের গানের উদ্ভব। এক হিসাবে রামপ্রসাদ প্রচলিত তন্ত্র-উপাসনা পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর উঠাইয়াছিলেন; ইহার জটিল, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম অনুভূতির অনুশীলনের সুস্পষ্ট নির্দেশ তিনি দিয়াছেন। লৌকিক আচার-ব্যবহারের সহিত তুলনায় অন্তরের অকৃত্রিম, অনুষ্ঠান-বর্জিত ভক্তিসাধনার শ্রেষ্ঠত্ব তিনি তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, আড়ম্বরপূর্ণ রাজসিক পূজা হইতে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক উপাসনার দিকে তিনি আমাদের চিত্তকে ফিরাইতে চাহিয়াছেন। দীর্ঘযুগব্যাপী মাতৃপূজার পূর্ণ পরিণতি, শক্তি আরাধনার বিশুদ্ধ সার-নির্যাস রামপ্রসাদের গানে অপূর্ব কাব্যোৎকর্ষের সহিত অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে; অন্তরের গভীর আকুতি, নিঃসংশয় উপলব্ধি সরল, ভাব-ঘন, আত্মপ্রত্যয়স্ফূরিত ভাষায় নিখুঁতভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। যাঁহারা রামপ্রসাদ-জননী বঙ্গভূমির অতীত সাধনার কথা ভুলিয়াছেন, তাঁহাদের মনে যে রামপ্রসাদের প্রভাব ও ক্ষীণ, তাঁহার সুধাস্রাবী কণ্ঠস্বর যে সুদূরশ্রুত প্রতিধ্বনির ন্যায় অস্পষ্ট হইয়া আসিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

রামপ্রসাদ প্রসঙ্গে একটি কৌতূহলোদ্দীপক সমাজতত্ত্বঘটিত প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হয়। সমাজ-সংস্থিতির কোন্ বৈশিষ্ট্যের জন্য এই বিশেষ যুগে বাঙ্গালীর মন কালীধ্যানের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল? অবশ্য শক্তিপূজার প্রেরণা হিন্দু বহুদিন হইতেই অনুভব করিয়া আসিতেছিল—মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর সূক্ষ্ম দার্শনিক ভাবাবহের মধ্যে বিশ্ব-বিধানের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিতা মাতৃরূপে পরিকল্পিতা, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়রূপিণী এই চিৎশক্তির লীলা প্রকটিত হইয়াছে। নিছক সংহারাত্মিকা শক্তির সহিত হিন্দুধর্মের পরিচয় ও সুপ্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ—মঙ্গলকাব্যের নূতন দেবীসংঘের পূজা মূলত তাহাদের সংহারাত্মক প্রকৃতির ভয়-ভক্তি-মিশ্র স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যেখানে ঐশ্বর্যশালিনী, সর্ববিধ-সুখসম্পদ-প্রদায়িনী, সিদ্ধিদাত্রী দুর্গা মাতৃরূপে বাঙ্গালীর হৃদয়ে আসীনা, সেখানে এই শ্মশান-চারিণী, রক্তাপ্লুতদেহা, রিক্ত সর্বনাশের প্রতীক্, বিভীষিকারূপিণী কালীমূর্তি ধূমকেতুরূপে তাহার চিত্তাকাশে উদিত হইয়াছিল কেন এই প্রশ্নের আলোচনা প্রয়োজন। হয়ত বৈষ্ণব সাধনার অবিমিশ্র মাধুর্যের প্রতিক্রিয়া স্বরূপই জীবনের ভয়াবহ, বীভৎসরসপ্রধান দিকটা বাঙ্গালীর অনুভূতিতে প্রথম ধরা পড়িয়াছিল। জীবনের সবটাই যে বৃন্দাবনলীলা নহে, সেখানে সে সব সময়ই বাঁশী বাজে না, প্রেমের মধুর লীলা অভিনীত হয় না, হৃদয়ের কোমলতম বৃত্তিসমূহেরই একাধিপত্য চলে না, যমুনা-প্রবাহের মধুর সঙ্গীত, কেলিকুঞ্জের কান্ত সৌন্দর্য স্বপ্নমাধুরী রচনা করে না এই সত্য কঠোর বাস্তব অভিজ্ঞতার চাপেই তাহার মনে স্ফুরিত হইয়াছিল। অমাবস্যা নিশীথে, অস্থিকঙ্কাল-স্তূপ-রচিত মৃত্যুর বীভৎস প্রতিরূপ ও শ্মশানের প্রেত-বিভীষিকার পরিবেষ্টনে যে আর এক প্রকারের কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়া জীবনের

পরমা সিদ্ধি করায়ত্ত হইতে পারে এই আবিষ্কারই কালী-উপাসনার প্রধান প্রেরণা। আর একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এই দুই সাধনার মধ্যে কোন পরস্পর-বিরোধী বৈপরীত্য নাই। বৃন্দাবন-লীলার পরিসমাপ্তি কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের মহাশ্মশানে, প্রেমের পরিণতি জিঘাংসা-প্রণোদিত যুগাবসানকারী রক্তপ্লাবনে। এই উভয় লীলার নায়ক একই ব্যক্তি—পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। যিনি কৈশোরলীলায় প্রেমের বাঁশী বাজাইয়া নিখিল চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন, তিনি কুরুক্ষেত্র-ধ্বংসলীলার আপাত-নিষ্ক্রিয় দর্শক ও প্রভাসের আত্মঘাতী, মূঢ় হত্যাতাণ্ডবের শ্রেষ্ঠ বলি। কাজেই জীবনের এই নির্মম, শ্বাপদ-ধর্মী, হিংসাগহন দিকটাকে ধর্ম-সাধনার অঙ্গীভূত করার, মরণ-শীলতার চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া তাহার কেন্দ্রস্থলে গোপন-রক্ষিত সুধারস আহরণ করার একটা প্রয়োজন আছে। বৈষ্ণব সাধনার প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ—জীবনের সহজ বৃত্তিগুলিকে ভগবদভিমুখী করিয়া দিলেই, লৌকিক জীবনের সুখগুলিকে কৃষ্ণার্পিত করিলেই স্বতঃ উৎসারিত আনন্দের প্রবাহ বাহিয়াই সিদ্ধি ভাসিয়া আসিয়া অনুভূতি-লগ্ন হইবে। কোন প্রবৃত্তির উৎসাদনের, কোন বুভুক্ষার অবদমনের প্রয়োজন নাই—তাহাদের মুখ ফিরাইয়া দিলেই চলিবে। তন্ত্রসাধনায় মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উপর এতটা আস্থা নাই; দুরূহ, ক্লেশকর তপশ্চর্যার ভিতর দিয়া, কণ্টকাকীর্ণ পথে রক্তাক্ত চরণে অগ্রসর হইয়া সিদ্ধির শিখরদেশে পৌছিতে হইবে। হিন্দুধর্ম এই তন্ত্র-নির্দিষ্ট উপাসনার মধ্য দিয়া জীবনের সমস্ত রহস্যাবৃত জটিলতা, বাস্তবের সমস্ত বীভৎস ভয়াবহতা, দৃষ্টির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে প্রবাহিত সংহারলীলার পূর্ণ নিদারুণতা স্বীকার করিয়া লইয়া ইহারই প্রতিকারে ব্রতী হইয়াছে। রামপ্রসাদের ভাবপ্রবাহের সরল একটানা স্রোতে অনেক বাধা-বিঘ্নের মগ্নশৈল, অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘূর্ণাবর্ত লুকাইয়া আছে; তাঁহার সঙ্গীতের সুমিষ্ট স্বাদুতার মধ্যে জটিল দার্শনিক তত্ত্বের পাক দেওয়া রস উপাদানরূপে ব্যবহৃত; তাঁহার নিঃশঙ্ক নির্ভরশীলতার নির্মল, রৌদ্রদীপ্ত আকাশে আগন্তুক ও অতিক্রান্ত বিপদের পক্ষচ্ছায়া মধ্যে মধ্যে প্রতিভাসিত হয়।

(২)

প্রাকৃতিক জগতে জ্যোৎস্না ও অন্ধকারের ন্যায় মানবের অন্তর্জগতে মধুর ও ভীষণের প্রতি প্রবণতা পাশাপাশি বা পর্য্যায়ক্রমে প্রবাহিত। মানুষ ইহাদের মধ্যে কোন্ পথটি অবলম্বন করিবে তাহা অনেকটা নির্ভর করে জন্মের আকস্মিকতা, রুচি ও আদর্শের উপর; কিন্তু ইহাতে যুগপ্রভাবেরও যথেষ্ট অংশ আছে। এক এক যুগে মানব সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্যের পথ পরিত্যাগ করিয়া উৎকট বিভীষিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ঐতিহাসিক প্রতিবেশের বিশেষ রংটি তাহার চিত্তকে অনুরঞ্জিত করিয়া তাহার জীবন-দর্শন ও সাধনার প্রকৃতিটি নির্ধারণ করে। বিশৃঙ্খলা ও সঙ্কটের সময় বিশ্ববিধায়িনী শক্তির সংহাররূপিণী মূর্তিটিই তাহার মানস অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে; মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে, বিপর্যয়ের ভূমিকম্পে থরথর কম্পমান ধরিত্রীর উপর দাঁড়াইয়া সর্বনাশিনী শ্যামার ভয়ঙ্কর কালো রূপটিই চারিদিক হইতে চোখে পড়ে। বাঙ্গালা ধর্মসংস্কৃতির ইতিহাসে শ্যামাপূজার প্রাধান্য এক বিপদসঙ্কুল, অনিশ্চয়াত্মক অবস্থার পটভূমিকার উপর নির্ভরশীল। সপ্তদশ—অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে বিপ্লবের ঘনকৃষ্ণ মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, কালী উপাসনা তাহারই অনিবার্য, চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎ-বিলাস। শাক্ত কবির শ্যামার রূপবর্ণনাতে এই বর্ণের বৈপরীত্য, নিকষ-কালো দেহে রক্তধারার অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য, অসিত পদযুগলে রাঙ্গাজবার আরক্ত আভা, আঁধারের গায়ে উৎকট দীপ্তির তীব্র ব্যঙ্গ কবি-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। রণরঙ্গিনীর রণতাণ্ডবমত্ত নৃত্য, উলঙ্গিনীর সাধারণ ভব্যতা—শালীনতার স্পর্দ্ধিত অস্বীকার, পতি-বক্ষে স্থাপিত-চরণার সহজ দাম্পত্য রীতির উৎকট উল্লংঘন ভক্ত-সাধকের মনে যে ভক্তির ভীতি-রোমাঞ্চ জাগাইয়াছে, তাহা বর্ণনাভঙ্গীর প্রথাবদ্ধ গতানুগতিকতা, কবিযশঃপ্রার্থীর অনুপ্রাসের আতিশয্য, অপটু হস্তের ভাব-গ্রন্থন শিথিলতা ভেদ করিয়া বর্তমান যুগের পাঠকের চিত্তেও সংক্রামিত হইয়াছে। এই মূর্তি বিশেষ করিয়া কোন কোন যুগে বাঙ্গালীর কল্পনায় আবর্তিত হইয়াছে কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত। অবশ্য পুরাণে ও তন্ত্রশাস্ত্রে এইরূপ মূর্তির পরিকল্পনা আছে; কিন্তু শুধু প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের অনুসরণেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের কবির চিত্তাকাশে এই প্রলয়ংকরী মূর্তি এরূপ কাল-বৈশাখীর রক্ত-পিঙ্গল মেঘের মত উদিত হয় নাই। ইহার পিছনে নবযুগের প্রেরণা, নূতন উপলব্ধির শিরা-স্নায়ু অভিভবকারী তীব্রতা নিশ্চয়ই ছিল। যে সমস্ত সাধক কবি এই কালোরূপের অনুধ্যানে বিভোর হইয়াছেন, তাঁহাদের চোখে সত্যোদৃষ্ট রণক্ষেত্রের রক্তচ্ছবি, যুগান্তের সূর্যাস্তের শোণিতস্রাবী রশ্মিপুঞ্জ রংএর মায়া-তুলিকা বুলাইয়াছিল। বাস্তব জীবনের বিভীষিকা, মাথার উপরের আবীর-রাঙ্গা আকাশ ও পায়ের নীচের অস্থির, টলটলায়মান পৃথিবী তাঁহাদের কল্পনার রূপটিকে এত ভয়াবহরূপে উজ্জ্বল, এত মর্মান্তিকরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। এই ভয়-ত্রস্ত, অথচ আতঙ্ক-সাহসিক মনোবৃত্তিতে শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য অনুভূত হয়। হরিনাম আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় শান্ত অথবা শোক-বিহ্বল বৈরাগ্যের উৎস হইতে—যখন আমাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা শমিত ও মৃত্যুর অনিবার্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু কালীনামের উচ্চারণ আসে বিপদের উত্তেজনা ও বিপদ হইতে উদ্ধারের সঙ্কল্প হইতে—যখন আমরা পুরুষকারের অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে দৈবানুগ্রহের অনুকূল বায়ুর প্রত্যাশী। হরিকে আমরা আবেদন জানাই পার করিতে, কালীর নিকট প্রার্থনা করি রক্ষার জন্য। অবশ্য সমস্ত প্রার্থনার সুর শেষ পর্যন্ত এক হইলেও ইহার প্রেরণা-দায়ক মনোভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটু সূক্ষ্ম তারতম্য আছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে শাক্ত সঙ্গীত-

রচয়িতাদের মধ্যে অনেকেই রাজা, মহারাজা, দেওয়ান প্রভৃতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, বৈষয়িক ব্যাপারে আকণ্ঠ-নিমজ্জিত ব্যক্তি ছিলেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, মহারাজা নন্দকুমার, বর্ধমানাধিপতি মহাতাপচাঁদ, দেওয়ান রঘুনাথ রায় প্রভৃতি দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ শ্যামার প্রতি উচ্ছ্বসিত ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া সঙ্গীতের ভিতর দিয়া তাঁহাদের আবেগ ব্যক্ত করিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্মে সংসারত্যাগী বা নির্জন সাধনাতৎপর বৈরাগীর প্রাদুর্ভাব—শক্তি পূজায় বিত্ত ও প্রভাবশালীর ভিড়। ইঁহারা নিজ নিজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া সংসারসুখের অনিত্যতা ও অলীকতা, মায়াপাশের দুশ্ছেদ্যতা, সংসার-সংগ্রামের দুর্বিষহতা, সাধন পথের বিঘ্নভূয়িষ্ঠতা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়া কাতরকণ্ঠে মহামায়ার সহায়তাপ্রার্থী হইয়াছেন। ইঁহারা কেবল সাধনার ক্ষেত্রে নয়, বাস্তব জীবনেও জীবনের বিষাদময় পরিবর্তনশীলতা, ভাগ্যের ক্ষণভঙ্গুরতা আস্বাদন করিয়াছিলেন; সঙ্কট-সমুদ্রের নিমজ্জমান রুদ্ধশ্বাস ব্যক্তির অসহায় আর্তনাদ ইঁহাদের জীবনের ভিতর দিয়া রচিত সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। বাঙ্গালা সমাজের নেতা কৃষ্ণচন্দ্র ও নন্দকুমার এক মুহূর্তে প্রতিষ্ঠার উন্নত শিখর হইতে সর্বনাশের অন্ধতম গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন—নন্দকুমারকে অত্যাচারী বিদেশী প্রভুর বিচার-বিপর্যয়ে ফাঁসিকাষ্ঠেও ঝুলিতে হইয়াছিল। যাঁহাদের এরূপ চরম দুর্গতির সম্মুখীন হইতে হয় নাই, তাঁহারাও বৈষয়িক জীবনের বিষজ্বালা, দুর্দৈবের অতর্কিত কশাঘাত সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাজীকরের মেয়ের ভেল্কি, রহস্যময়ীর মাতৃস্নেহের উদ্ভট, বিপরীত অভিব্যক্তি, তাঁহার দুর্বোধ্য বিধানে মোদকপ্রার্থী বালকের প্রতি তিক্ত রসের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিপর্যয়মূলক অভিজ্ঞতা তাঁহাদের সত্যকার জীবনে যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছিল এবং ইহারই উপভুক্ত রসসার তাঁহাদের গানের শুভ্র পেয়ালায় বিন্দু বিন্দু করিয়া ক্ষরিত হইয়াছে। এই অঘটন ঘটন-পটীয়সী শক্তি যে তাঁহাদিগকে নানারূপে বিভ্রান্ত করিতেছেন, কুহকমন্ত্রে তাঁহাদের হিতাহিতবোধ আচ্ছন্ন করিতেছেন, দৈবী মায়ার দুরত্যয়তায় তাঁহাদের সংসার-অরণ্য হইতে নিষ্ক্রমণের পথ রুদ্ধ করিতেছেন, গন্তব্য পথে প্রলোভনের জাল বিস্তার করিয়া তাঁহাদিগকে হোঁচট খাওয়াইতেছেন —জীবনের এই বহুধা-পরীক্ষিত সত্যই তাঁহাদের কাব্যের প্রেরণা যোগাইয়াছে। অতি সাধারণ লোকের সহিত মায়ের এই লুকোচুরি খেলার ততটা প্রয়োজন হয় না, কিন্তু যাহারা বৈভবের স্বর্ণ সিংহাসনে আসীন হইয়াও তাঁহার নিগূঢ় রহস্যোদ্ভেদের দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, যাঁহারা কেবল বাপের কোলে সন্তুষ্ট না হইয়া মায়ের কোলেরও দাবী করে, তাঁহাদিগকে তিনি গোলকধাঁধায় ফেলিয়া, সম্পদের চোরাবালিতে ডুবাইয়া ভালরূপ পরীক্ষা না করিয়া ছাড়েন না। রামপ্রসাদ নিজে অবশ্য দেওয়ান-মহারাজাজাতীয় ছিলেন না; কিন্তু কৌতুকময়ী শঙ্করী তাঁহাকেও তহবিলদারী দিয়া তাঁহাকে আভিজাত্যের দুরবস্থার অংশীদার করিতে কার্পণ্য করেন নাই। রামপ্রসাদ কেবল তহবিলের খাতায় কালীনাম লিখিয়া বিষয়-ভূতের প্রতিষেধক মন্ত্র সাধনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পার্থিব মুনিবের প্রতি নিমকহারামী করিয়া তাঁহার আসল প্রভুর প্রতি অবিচল বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়াছিলেন।

(৩)

অবশ্য শক্তি-পূজার ক্ষেত্রে কেবল যে অভিজাত-বর্গের একাধিপত্য ছিল তাহা নহে; উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে অধিকাংশই সংসারী গৃহস্থ ও সংসারবিরাগী মুমুক্ষু পর্যায়ভুক্ত ছিল। কৌতূহলের বিষয় এই যে প্রচলিত শক্তি-পূজার প্রভাবে ধনীমানী ব্যক্তিদের মধ্যেও সংসারের অনিত্যতার ধারণা তীব্রভাবে স্ফুরিত হইয়াছিল। সমাজসংস্থিতির সঙ্কটময় মহাশ্মশানে, সত্যিকারের শ্মশানে সাম্যবোধের অনুরূপ, ধনী-দরিদ্র, মহারাজ-ফকিরের মধ্যে একটা বৈষম্য-নিরসনকারী ঐক্যভাব সংযোগসূত্র রচনা করিয়াছিল। মাতার প্রতি একান্ত নির্ভরশীলতায়, সংসার-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভের আকুতিতে, মাতৃস্নেহ-লাভের আগ্রহাতিশয্যে সকল সাধকের কণ্ঠে একই সুর ধ্বনিত হইয়াছে। রামপ্রসাদ এই সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যমণিরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হন। অনুভূতির প্রগাঢ়তায় ও প্রকাশভঙ্গীর স্বচ্ছ সারল্যে তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অবশ্য তাঁহার গানের মধ্যেও স্তর বিভেদ করা যায়। শাক্ত কবিদের সাধারণ বিষয়-প্রকরণ—যথা আগমনী-বিজয়া, রূপবর্ণনা ও আত্মনিবেদন—তাঁহার কবিতাতেও উদাহৃত হইয়াছে। আগমনী-বিজয়া ও রূপবর্ণনাতে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত নহে; তাঁহার স্থান যে সমজাতীয় কবিগোষ্ঠীর ঊর্দ্ধে তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। দেবীকে দুহিতারূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তনে ও সেখানে তিনদিন অবস্থিতির পর বিদায়গ্রহণে মাতার মনে যে প্রতীক্ষার সংশয়াচ্ছন্ন আগ্রহ, মিলনের আনন্দ ও বিরহের শোকোচ্ছ্বাস তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে, রামপ্রসাদ তাঁহার সমধর্মী অন্যান্য কবির ন্যায় তাঁহার গানে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু অনুভূতির কোন বিশেষ তীব্রতা, অন্তঃপ্রবাহিত ঝটিকার কোন অসাধারণ ব্যঞ্জনা, প্রকাশের কোন অনির্বচনীয় সৌকুমার্য, কোন হৃদয়দ্রাবী সুরকম্পন তাঁহার এই জাতীয় কবিতায় অনুভূত হয় না। হয়ত রামপ্রসাদের সাধক-জীবনে পারিবারিক স্নেহরস যথেষ্ট গভীরতা লাভ করে নাই। রূপবর্ণনাতেও তিনি গতানুগতিক প্রথার অবলম্বন করিয়াছেন—অনুপ্রাস ও অলঙ্কার বাহুল্য, প্রতি অঙ্গের স্বতন্ত্র আলোচনা ঠিক অনুভূতির সমগ্রতার অনুকূল হয় নাই। কিন্তু তাঁহার আত্মনিবেদনমূলক কবিতাগুলি যে অনুপম তাহা সন্দেহাতীত। তাঁহার এই বিষয়ক গীতগুলিতে দর্শনের জটিল তত্ত্ব, সাধনার নিগূঢ় অনুক্রম, জীবনের সমস্ত বিভ্রান্তকারী রহস্য, অন্তরের উল্লাস বিষাদ, আবদার-অনুযোগ, অশান্তি-নির্বেদ, বিনয়-দুঃসাহস প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তিসমূহ উপলব্ধির তীব্র অগ্নিশিখায় গলিয়া এক হইয়া গিয়াছে ও এই যৌগিক আবেগের দ্রবীভূত প্রবাহ কবির লেখনীমুখে এক অনিবার্য স্বতঃস্ফূর্ততার সহিত নিঃসারিত হইয়াছে। অধ্যাত্ম সাধনার গুহা-নিহিত তত্ত্ব যেন আটপৌরে জীবনের ক্ষুদ্র ভাব-লহরীতে প্রতিবিম্বিত হইয়া, উহারই পারিপার্শ্বিক ভাবাসঙ্গের সহিত বেমালুম মিশিয়া, বৈজ্ঞানিকের নিঃসন্দেহ প্রতীতির সহিত কবির

ঋজু, অন্তর্ভেদী প্রকাশভঙ্গীর সম্মিলন ঘটাইয়া এক নবসৃষ্টির অপরূপত্বে আমাদিগকে চমকিত করে। বৈষ্ণব ভক্ত কল্পনা করেন যে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' 'দেহি পদপল্লবমুদারং' এই চরণটি কবির ছদ্মবেশধারী স্বয়ং তাঁহার ইষ্টদেবতা রচনা করিয়াছিলেন। এই ভক্তজনানুমোদিত কল্পনার অনুবর্তনে আমরা বলিতে পারি যে রামপ্রসাদের প্রায় সমগ্র পদাবলী তাঁহার জননীরূপিণী মহামায়া কবির হাত হইতে লেখনী কাড়িয়া লইয়া নিজেই লিখিয়াছেন। ভগবানের দৈতবিলাস-রহস্য কি কেবল ভক্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকিবে, কাব্যক্ষেত্রে কি উহা প্রসারিত হইবে না?

(৪)

আজ রামপ্রসাদ যে সংস্কৃতি ও সাধনার প্রতীক্ তাহার সঙ্গে আমাদের সত্যকার সম্বন্ধ নির্ণয় করা প্রয়োজন। আন্তরিকতাহীন ভাববিহ্বলতার কুজ্ঝটিকাজাল হইতে সত্যের সূর্যালোককে উদ্ধার করিতে হইবে। সভাসমিতিতে রামপ্রসাদের গুণকীর্তন করিয়া, প্রবন্ধে তাঁহার সাহিত্যিক গুণের বিশ্লেষণ ও মূল্য নির্ধারণ করিয়া আমরা আমাদের জীবন হইতে তাঁহার আসল গৌরবকে বিসর্জন দিয়াছি। তাঁহার মূল্যবোধকে আমরা সাহিত্যে স্বীকার করিয়া জীবনে অস্বীকার করিতেছি। তাঁহার 'মন তুমি কৃষিকাজ জান না' গানটী মুখে গাহিয়া জীবনে সোনা ফলানর চেষ্টা ত দূরের কথা, আগাছা কাঁটাগাছে পূর্ণ করিতেও ইতস্ততঃ করিতেছি না। চোখে ভবল ঠুলি আঁটিয়া সংসারের ঘানিগাছে অবিশ্রান্ত ঘূর্ণমান হইয়া 'মা আমায় ঘুরাবি কত' গানে কৃত্রিম আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি। বাষ্প-গদগদ কণ্ঠে আমাদের প্রাচীন ঐশ্বর্যের গৌরব ঘোষণা করিয়া রিক্ত দারিদ্র্যের অনুসরণই জীবনাদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। রামপ্রসাদের বাস্তুভিটায় পুস্তকাগার স্থাপন করিয়া উহাকে জনমানবহীন শূন্যতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হইতে রক্ষা করিবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় বিড়ম্বিত হইতেছি। রামপ্রসাদের পুণ্য প্রভাব যাহাকে আকর্ষণ করিল না তাহাকে সস্তা নভেলের প্রলোভনে তীর্থশালার জল ভোগ করাইতেছি। কবি-সাধকের স্মৃতি কি কোন সদ্যোপ্রতিষ্ঠিত স্মৃতিমন্দিরে, না তাঁহার অমর কবিতায়, চিত্তের নিগূঢ়তলশায়ী অধ্যাত্ম প্রভাবে? সাধনায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ ও সিদ্ধিলাভ দুর্বল সাধারণ মানুষের আয়ত্তাতীত; কিন্তু সেই আদর্শের দিকে মানস-প্রবণতা ত অনুশীলন করা চলে। গৌরীশঙ্করের উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ সমতলবাসী মানবের পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু এই অনায়ত্ত আদর্শের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ, তাহার হিমশীতল বায়ুর স্পর্শরোমাঞ্চ-অনুভবও কি আমাদের কাম্য নহে? শক্তি হয়ত নাই, কিন্তু ইচ্ছাও নির্মূল হইল কেন? পক্ষীর ইচ্ছাশক্তির অবিশ্রান্ত প্রয়োগেই তাহার পক্ষোদ্গম সম্ভব হইয়াছে। দয়িতের সহিত মিলনের পথ প্রতিবন্ধ, কিন্তু মানস অভিসারের কল্পনা পর্যন্ত নিঃশেষিত কেন? রামপ্রসাদের নামে যে স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে প্রসাদী ভাবধারা সচল রাখিবার কোন আন্তরিক চেষ্টা আছে কি? না সেখানেও জড়বাদী শিক্ষার পাষাণস্তূপে অধ্যাত্ম অনুভূতির ক্ষীণতম স্পন্দনটুকুও পিষিয়া মারা হইয়াছে? সেখানে অন্ততঃ রামপ্রসাদী গানগুলি পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হইলে, বালক-বালিকার কণ্ঠে আধুনিক সিনেমা সঙ্গীতের পরিবর্তে এইগুলির প্রচলন হইলে, অন্ততঃ কাহারও কাহারও মনে একটু উচ্চ ভাবের বীজ উপ্ত হইতে পারিত। তাই আজ ঐতিহ্যবিচ্যুত বাঙ্গালীকে আত্মবঞ্চনার পালা শেষ করিয়া জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে—আমাদের প্রাচীন ধর্মসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিবৃন্দকে সাহিত্য-খেলার পুতুলরূপে ব্যবহার না করিয়া প্রাণশক্তির উৎসরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এখনও পল্লী অঞ্চলের সরল, নিরক্ষর তাঁতি চাষা-জেলেরা মানস প্রবণতার যে স্তর হইতে তাহাদের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে প্রসাদী-সঙ্গীত গাহিয়া জীবিকার প্রয়োজন ও আত্মার বুভুক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখে, শিক্ষাভিমানী, মার্জিতরুচি, উচ্চ চিন্তায় অভ্যস্ত আমরা কি ততটুকু নিষ্ঠা ও চিত্তশুদ্ধির পরিচয় দিতে পারি না?

আমরা

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত

অনেক স্বপ্ন স্মৃতির বাসরে ভরেছে মন
রঙিণ ফানুষে ঘুরেছি শুধুই অনুক্ষণ;
দেখিনি কখন নীলাকাশ হ'লো গভীর কালো:
ভেবেছিনু মনে ব্যথা নেই কিছু, এইতো ভালো।
চেয়ে দেখি আজ আলোকের কণা নেইতো হায়,
গভীর আঁধার—ঘন মেঘে মেঘে আকাশ ছায়,—

সীমাহীন কী যে একটি ব্যথা গুমরি মরে
তোমার আমার আকাশ পথের ও-প্রান্তরে!
ব্যথার সাগর পার হ'য়ে যাবো ভরসা নাই,—
সত্তা হারায়ে আঁধারে ডুবেছি আমরা ভাই।
জীবনের ভিত ফেটে চৌচির সাহারা ধু ধু,
আশার আলোর পিছু পিছু হায় ছুটি যে শুধু!

পূর্ব্বআফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা

স্বামী পরমানন্দ

দীর্ঘকাল যাবৎ পূর্ব্বআফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের আর্থিক স্থিতি মন্দ ছিলনা। অর্থনীতিদ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক কারণে ক্রমেই এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে চলিয়াছে। এইবার উগাণ্ডা ও তৎসংলগ্ন দেশের বহুস্থানে কার্পাস তুলার ফলন প্রচুর হওয়ায় ভারতীয় তুলা কলের মালিকদের ব্যবসায় সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ প্রথমে আশাপ্রদ প্রতীত হইলেও স্থানীয় শাসকবর্গের সংরক্ষণ নীতির যথোচিত ব্যবস্থার অভাবে উক্ত অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয় এবং অবধারিত বিপর্য্যয় ঘটে। ভারতীয় প্রবাসীদের মধ্যে তুলাকল মালিকেরাই সর্ব্বাধিক সঙ্গতিসম্পন্ন। এবার এইভাবে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হইল। প্রচুর তুলা গোলাজাত করিয়াও কাহাদের প্ররোচনায় আফ্রিকানরা ভারতীয়দের নিকট তুলা বিক্রয় করিল না, কেবল সাধারণ বাজার খরচের জন্য কিছু কিছু ছুটা তুলা বিক্রয় করিল মাত্র। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের নবনির্ম্মিত বৃহদাকার গুদাম খালি থাকিল; এবার তাঁহারা establishment খরচ কুলাইয়া উঠিতে পারিলেন না। ঘটনা দৃষ্টে ভিতরকার অবস্থা সম্বন্ধে ইহা অনুমান করা কঠিন নয় যে ইয়োরোপীয় তুলাকলের মালিকদিগকে পুনঃসংস্থাপনের ইহাই প্রাথমিক পর্ব্ব মাত্র। তুলাকলের পাশ্চাত্য মালিকরা এতদিন ভারতীয়দের সঙ্গে সম্মুখ প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে উন্নতিশীল ব্যাপারক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিবার গুপ্ত উপায় অনুসন্ধানে ছিল। সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীদের দ্বারা উদ্ভাবিত এই সাঙ্ঘাতিক প্রতিযোগিতায় ইয়োরোপীয়ান ও আফ্রিকান নিগ্রো ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যুগপৎ অবতীর্ণ হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। এক্ষেত্রে নিজ নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের দায়ে পাশ্চাত্য প্রভুরা আফ্রিকান নিগ্রোদিগকে সর্ব্বপ্রকার কৃত্রিম সমর্থন দ্বারা আপন উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত করিতেছেন।

এখন ইহা আর অপ্রকাশ্য নয় যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর খৃষ্টীয় পাদ্রীগণ সহর ও সুদূর পল্লীর সর্ব্বত্রই অন্তরাল হইতে আফ্রিকান নিগ্রোদিগকে উস্কানি দিয়া আসিতেছেন, যাহাতে উহারা প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বৈব বয়কট করে; এই প্রকার চেষ্টার ফল কোথাও কোথাও উগ্র আকারে দেখা গিয়াছে। ভাগ্যক্রমে কতিপয় আফ্রিকান নিগ্রোনেতার যথাকালীন সহানুভূতিপূর্ণ চেষ্টায় এযাত্রা দুর্ঘটনা বেশীদূর গড়াইতে পারে নাই। পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভারতীয় বণিকদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

নিরপেক্ষদর্শক নিঃসঙ্কোচে ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে—এই সব পাদ্রীরা পরিকল্পিত নির্দ্দিষ্ট পন্থার রাজনৈতিক পরিস্থিতির অন্তরাল হইতে জাতিবিদ্বেষ সৃষ্টি করিবার তালে আছেন। একথা ভুলিলে চলিবে না যে এই সব সম্ভ্রমশালী পাদ্রীদের উপরই মানব কল্যাণ, শান্তি স্থাপন ও শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতা বিস্তারের পবিত্র দায়িত্ব ন্যস্ত। এই অপচেষ্টা কি ভাগবত সাধনের বিড়ম্বনা নয়?

যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় জাতিবিদ্বেষের দাবানল হতভাগ্য প্রবাসী ভারতীয়দের জ্বালাইয়া সর্ব্বস্বান্ত করিতেছিল, তখন পূর্ব্বআফ্রিকায়ও ইহার অগ্নিশিখা পৌঁছিবার শঙ্কা ছিল। কিন্তু আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণলাভের সুবুদ্ধি উদয় হওয়ায় সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ একযোগে প্রশংসনীয় চেষ্টা করিলেন। এইভাবে তাঁহারা পূর্ব্ব আফ্রিকার নূতন ক্ষেত্রে উহার বীভৎসতা বিস্তারের সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ফল সুন্দর হইল। পূর্ব্ব আফ্রিকা এযাত্রা বাঁচিল। কিন্তু, যাদের উদ্দেশ্য হইল ভারতীয়দের বিতাড়িত করা এবং নিষ্কণ্টকভাবে নিজেদের একাধিপত্যকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা করিয়া লওয়া তাহারা এইরূপ ভয়াবহ জাতি-সংঘর্ষের সুযোগকে স্বকীয় উদ্দেশ্য সাধনে আহ্বান করিবার গুপ্ত অনুসন্ধানে আছে!

ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে প্রভাবশালী ইয়োরোপীয়ানদের মধ্যে এমন কতকগুলি সম্প্রদায় রহিয়াছেন যাঁহাদের স্বার্থ ও নীতি উদ্দেশ্যমূলকভাবে অন্তরাল হইতে পরিচালিত হয় যেন পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার সমৃদ্ধিশালী ঔপনিবেশিক অঞ্চল সমূহের অবিচ্ছিন্ন ভারতীয় অংশকে নিঃশেষে এবং চিরতরে বিতাড়িত করা যায়।

তথায় ভারতীয়দের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদলাভের যোগ্যতাসত্ত্বেও অধিকার নাই। হাইল্যাণ্ড বা উচ্চ মালভূমিতে শুধু পাশ্চাত্য শ্বেতকায় শাসক জাতিরই অধিকার আছে। এমন কি যাহাদের উহা মাতৃভূমি, তাহারাও উহার স্বাস্থ্যকর উর্ব্বর ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত; তাহারা শুধু শ্বেতাঙ্গ সেবার অধিকার লইয়া প্রভুদিগকে অতুল সম্পদের অধিকারী হইবার সহায়তা ও পরিশ্রম করিতে পারে মাত্র। রণবিজ্ঞানে দক্ষ শ্বেতাঙ্গজাতিই আফ্রিকার হীরা সোনা জহরৎ প্রভৃতি খনির মালিক। নেটিভ্ শ্রমের বেতনও নগণ্য। ভারতীয়দের স্থায়ী জমীলাভের সম্ভাবনা নাই। ব্যবসার পারমিট্ বৎসরান্তে "রিনিউ" করিয়া লইতে হয়। অশ্বেতকায় বহিরাগতের পারমিটে নিদারুণ কড়াকড়ি। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার উর্ব্বর ভূমির প্রকৃত মালিক শক্তিশালী শ্বেতাঙ্গ প্রভুরাই।

তদুপরি ভারতীয়দের দুরবস্থারমূলে আভ্যন্তরীণ কারণও আছে। হিন্দুদের সমাজগ্রন্থির অভ্যন্তরে আধুনিক আবর্জ্জনা জমিয়াছে; তা'ছাড়া প্রাচীনতার কুসংস্কারও আছে। তাঁহাদের ধার্ম্মিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক স্বার্থবোধের অভাব ও উদাসীনতা পরস্পরকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, অধিকন্তু, দাসসুলভ প্রাচ্যের

অন্ধানুকরণ ও বিলাসব্যসনের প্রবৃত্তি প্রবাসী ভারতীয়গণকে প্রবাসে পরাধীন ও স্বয়ং-অসম্পূর্ণ করিয়া রাখিবার একটা কারণও বটে। তাঁহাদের ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার গৌরবময় আদর্শকে প্রবাস-জীবনে পরিস্ফুট করিয়া তোলার বিশেষ প্রয়োজন আছে। পূর্ব্ব-আফ্রিকার বহু সহরে হিন্দুদের মন্দির বা ধর্ম্মস্থান নাই। জনসাধারণ নিজেদের ধর্ম্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, নীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে অচেতন ও জাতীয়ভাবে দুর্ব্বল থাকিয়া যাইতেছে। এমত অবস্থায় বৈদেশিক শিক্ষা সভ্যতার দ্বারা তাহারা কেনই বা প্রভাবান্বিত হইবে না?

খৃষ্টান ও মুসলমান প্রচারকগণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসিগণকে নিজ ধর্ম্ম ও সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার খুবই উদারতা ও উৎসাহ দেখাইয়াছেন। এই ক্ষেত্রে হিন্দুগণের জাতীয় সামাজিক ও ধার্ম্মিক কি কোনও কর্ম্মপন্থা নাই? স্বদেশে হিন্দুগণ যেমন এদিকে উদাসীন, প্রবাসী ভারতীয়গণও তাহাদের সংস্কৃতিকে বিদেশে প্রসারিত করিবার মহান দায়িত্বকে বরাবরই উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; ফলে স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের আন্তরিক সমর্থন লাভে তাঁহারা বঞ্চিত, শুধু তাহাই নয়, অধিকাংশ আদিম অধিবাসীর ধারণা—তথাকার ভারতীয়গণও শোষকদলের পর্য্যায়ভুক্ত। ইহার ফল সুদূরপ্রসারী ও মারাত্মক হইতে পারে, বিশেষতঃ, পূর্ব্বআফ্রিকার মত স্থানে। এখন অবস্থার চাপে স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রচার ও প্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আগ্রহ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। উভয়ত মিশনারী সমাজদ্বয় উদারতার মুখোস তুলিয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে পারে। নিজেদের অদূরদর্শিতার জন্য আফ্রিকায় প্রবাসসত্তার দাবীও উপেক্ষিত হইবে, সন্দেহ কি? অধ্যুষিত জাতিসমবায়ের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ে গ্রথিত এক সাধারণ জনসংহতি রচনায় ভারতীয়গণ বস্তুতঃ ক্রমেই বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। ইহাই পূর্ব্বআফ্রিকার বর্ত্তমানে সবচেয়ে বড় তথ্য, ভারতীয়ের নিকট।

তাহা যদি হয়, ভারতীয় ঔপনিবেশিক প্রবাসজীবন নিশ্চয়ই দুঃখের উৎস হইয়া উঠিবে। স্বাধীন ভারতের উপনিবেশ প্রসার ও নিরাপত্তার ব্যবস্থায় ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের উদাসীনতা অতিশয় মারাত্মক হইবে।

ভারত বিভক্ত হওয়ার পরেই পূর্ব্বআফ্রিকাস্থ ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে উহার বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছে, আভ্যন্তরীণ আলোড়ন দেখা দিয়াছে। ফলে, কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রে তাঁহারা তাহাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষাকল্পে পৃথক আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছেন। ইহাতে এই দাঁড়াইয়াছে যে তাঁহাদের বাস্তব জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির প্রসার লাভ করিতেছে। অবশ্য, পূর্ব্বআফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে উহাকে প্রশমিত করিবার চূড়ান্ত চেষ্টা হইয়াছে। ফল তেমন কিছু হইয়াছে বলিয়া মনে হয়না। স্বল্পসংখ্যক মুসলীম কর্ম্মীও ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষতিস্বীকার করিয়া পূর্ণাঙ্গ ভারতের প্রতি আনুগত্য রক্ষা এবং প্রেম প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক ও প্রশংসনীয় চেষ্টা করিলেও সাম্প্রদায়িক কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদের কোনও প্রভাব বর্ত্তাইতেছে না।

সম্প্রতি তথাকার মুসলীম শিক্ষা বিস্তার উদ্দেশ্যে বৃটিশ রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণ মোম্বাসায় একটি সাম্প্রদায়িক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনায় অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। এদিকে ভবিষ্যতে ইহার ফল বিষময় হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ভারতীয়গণকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে—তাঁহারা পাশ্চাত্য রাজনীতিজ্ঞদের হস্তে ক্রীড়নক হইবার বাহাদুরি না লইয়া কিরূপে ঐক্যবদ্ধভাবে নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবেন এবং তাঁহাদের দৃষ্টিকোণ ও অভ্যাসকে সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের মহামূল্য ঔপনিবেশিক সত্তাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে পারেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘপ্রেরিত ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশন পূর্ব্ব আফ্রিকার টাঙ্গানাইকা টেরিটরি, উগাণ্ডা প্রোটেক্টোরেট এবং কেনিয়া কলোনির ভারতীয়দের দ্বারা অধ্যুষিত বহু সহর ও গ্রামে এক বৎসর এবং চারিমাসকাল ব্যাপক পরিভ্রমণ, প্রচার ও সংগঠনকার্য্য দ্বারা বর্ত্তমান পরিস্থিতির প্রতীকারার্থ চেষ্টা করিয়াছেন। উক্ত মিশনের সভ্যগণ কখনও সমবেতভাবে, আবার কখনও ২।৩টি দলে বিভক্ত হইয়া বহু সহর ও গ্রামের স্কুলে, প্রতিষ্ঠানে এবং অনুষ্ঠানাদিতে সহস্রাধিক বক্তৃতা দিয়াছেন। সাংস্কৃতিক, সামাজিক, দার্শনিক, ধার্ম্মিক, নৈতিক, আন্তর্জাতিক বিষয়ের গম্ভীর আলোচনা সর্ব্বত্রই হইয়াছে। কোথাও প্রদর্শনী, খেলাধুলা, শরীর চর্চ্চা, সমবেত প্রার্থনা, সঙ্গীত ও ভজনাবলী, যোগশিক্ষাদান, ছাত্রসম্মেলন, শিক্ষকসম্মেলন প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, রাজনৈতিক ও সামাজিক দলাদলি এবং মতভেদের বিদ্বেষ যাহাতে প্রসারলাভ করিতে না পায় সে বিষয়ে সম্ভাব্য চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রবাসী ভারতীয়গণকে একই সাধারণ ক্ষেত্রে সম্মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নগর ও পল্লীতে মিলন মন্দির পরিচালক কমিটি স্থাপন, নাইরোবী ও মোম্বাসায় দুইটি স্থায়ী কর্ম্মকেন্দ্র "ভারতীয় সাংস্কৃতিক ভবন" করিয়াছেন। প্রবাসী বাঙ্গালী বালকবালিকাদের বাংলা পড়াইবার জন্য নাইরোবিতে (পূর্ব্ব আফ্রিকার রাজধানী) একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কামুলী ও কিটাল সহরে স্থানীয় জনগণের সাহায্যে ও মিশনের চেষ্টায় দুইটি মন্দিরসৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে; গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতিও উহাতে সংলগ্ন থাকিবে। জাঞ্জিবার ও টাঙ্গা সহরে বালকদের চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে দুইটি বাল মিলন মন্দির হইয়াছে। স্থানে স্থানে শরীর চর্চ্চার জন্য আখড়া স্থাপন করা হইয়াছে। সর্ব্বত্রই উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে এবং মিশনের সভ্যগণ সর্ব্বত্রই সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছেন; তাঁহারা প্রতি-বৎসর আফ্রিকায় প্রচারের জন্য আসিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের উৎসাহ ও সহানুভূতিলাভ করিয়া উক্ত মিশন পূর্ব্ব আফ্রিকায় গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাংস্কৃতিক অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ইরসাদ সেখ কিন্তু দৌলতের কথায় চলিয়া গেল না। সে দাঁড়াইয়া রহিল।
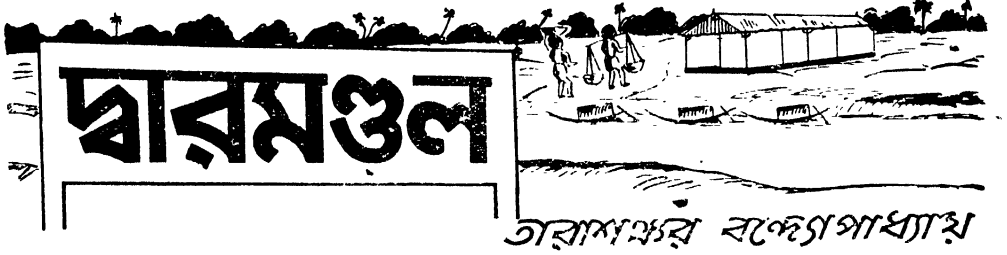
ন্যায়রত্ন বলিলেন—আমাকে কিছু বলবে ইরসাদ।

—বলব।

—কিন্তু একটু অপেক্ষা করতে হবে যে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত আমার উপাসনার সময়।

—কিন্তু—।

—ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত স্বল্পক্ষণস্থায়ী ইরসাদ। তা ছাড়া—উপাসনার আগে কোন পার্থিব আলোচনায় মনকে ব্যাপৃত করাও ঠিক হবে না। তোমার মুখ দেখে—; থাক সে কথা। তুমি অপেক্ষা কর—যদি না-পার তবে সময় ক'রে এস—আমার বাড়ীতে।

—সে সময় আমারও হবে না ঠাকুরমশায়। আমি আজই চলে যাব সদরে। আপনি বোধ হয় জানেন না—আমি এখন মোক্তারী করছি।

সে ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিল।

ন্যায়রত্ন ততক্ষণে পূর্ব্বমুখে একপদে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতে সুরু করিয়াছেন।

ইরসাদ ঘোড়াটার পেটে গোড়ালীর গুঁতা দিয়া চালাইয়া দিল—কিন্তু যাইতে-যাইতে আবার একবার ঘোড়াটাকে থামাইয়া বলিল—আপনি মাননীয় লোক, হিন্দুরা আপনাকে দেবতা মনে করে, আমরা মুসলমানেরাও আপনাকে শ্রদ্ধা করি মান্য করি—তার কারণ আপনি ভাল লোক, মহৎ ব্যক্তি। তার উপর আপনি বিশ্বনাথের ঠাকুরদাদা। সে আমাদের হামজুটি ছিল—তারে বড়ই ভালবাসতাম। কিন্তু আজ আপনি সাক্ষী দিবেন—হিন্দুর তরফ থেকে। মুসলমানদের তরফ থেকে আপনাকে আমাকেই জেরা করতে হবে। আদালতে কখনও সাক্ষী দিয়াছেন কিনা জানি না। বিশেষ ফৌজদারী আদালতে। তাই বলে রাখছি—যদি জেরা করতে গিয়া কিছু কঠিন কথা—বলেই ফেলি—তবে যেন মনে কিছু করবেন না।

সে ঘোড়াটার মুখ আবার ফিরাইল। কিন্তু অজয় ততক্ষণে ওদিকের গাছতলা হইতে উঠিয়া আসিয়া পথের উপর দাঁড়াইয়াছে। ঘোড়ার সামনে দাঁড়াইয়া সে বলিল—নমস্কার।

—আদাব। তুমিই বুঝি বিশ্বনাথের ছেলে? সে আমার দোস্ত ছিল।

—হ্যাঁ—আপনি সে কথা এখুনি ঠাকুরকে বললেন—শুনেছি আমি। আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। আপনি ওঁকে যে সব কথা বললেন—তার কোনটাই হয় তো মন্দ নয়—কিন্তু যে ভাবে বললেন—সেটা ভাল নয়। উনি—

মধ্যপথেই ইরসাদ বলিয়া উঠিল—ভাল নয়? কেন? মন্দ হ'ল কিসে?

—সুরে। মনে হ'ল—ভাল কথাগুলি খুব হিসেব করেই বললেন আপনি, কেবল সুরের কটুতা দিয়ে ওঁকে আঘাত করবার জন্যে। কথাগুলির ভদ্র এবং বিনীত অর্থের আবরণ দিয়ে কঠিন সুরে শাসিয়ে গেলেন। কেন বলুন তো?

ইরসাদ বিচিত্র দৃষ্টিতে অজয়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল—মৃদু অথচ ধারালো হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া উঠিল—সে বলিল—হুঁ। গোখুরার ডেঁকা কিনা! পাশ দিয়া মানুষ গেলেও—ফনা তুলে ফোঁস ক'রে উঠেছ। যাক—ছেলেমানুষ—আমার দোস্তের ছেলে তুমি। তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করব না। এখন পথ ছাড়। আমার অনেক কাজ।

অজয় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—কিন্তু আমার কথার জবাবটা যে আমি চাই। একজন বৃদ্ধ শ্রদ্ধাভাজন মানুষকে অকারণে এমন শাসালেন কেন?

ইরসাদ হাসিয়া বলিল—আমার আফশোষ হচ্ছে

ছোকরা—তোমার বাপজান বেঁচে নাই। থাকলে বলতাম—তার কাছে জবাবটা জেনে নিয়ো। এখন আমাকেই বলতে হচ্ছে তোমাকে—কি করব—উপায় নাই। সুরের কথা, ভঙ্গির কথা বললে না? তুমি ধরেছ ঠিক। কিন্তু তুমি নিজেই বল তো দেখি, যে লোকটা পণ্ডিত হয়ে—ধার্ম্মিক হয়ে আপনার ছেলেকে খুন করে, একমাত্র নাতি—তাকে ত্যাগ করে—তার স্ত্রী পুত্রদের ছিনিয়ে নেয়—সে লোকটাকে ভয়ে-বিস্ময়ে যতই শ্রদ্ধা করি—অন্তরের অন্তর তার উপর প্রসন্ন হয় কি করে? সুর কঠোর সে আপনি হয়ে ওঠে।

অজয় খপ করিয়া ঘোড়াটার মুখের পাশে লাগাম চাপিয়া ধরিয়া হেঁচকা টান মারিয়া বলিল—এ সব কি বলছেন আপনি?

ইরসাদ চমকিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাথার মধ্যেও আগুন জলিয়া উঠিল। মুখে হেঁচকা টান খাইয়া ঘোড়াটা জাতিগত স্বভাব মত সামনের পা দুটা উপরে তুলিয়া নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিল। ইরসাদ ঘোড়াটার ঘাড়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিজের দেহের সমগ্র ভার দিয়া তাহাকে মাটির উপর স্থির হইয়া দাঁড়াইতে বাধ্য করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—খবরদার! ছোড় দো!

অজয়ের আয়ত চোখ দুটি খসিয়া পড়া তারার মত অস্বাভাবিক প্রখর দীপ্তিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, মনে হইতেছে—চোখ দুইটা ফাটিয়া এখনি উল্কার মত বাহির হইয়া পড়িবে। সে বলিল—না।

সেই মুহূর্ত্তেই পিছন হইতে ন্যায়রত্ন শান্ত গম্ভীর স্বরে বলিলেন—ছেড়ে দাও অজয়! আমার কথা শোন ভাই।

অজয় লাগামের মুঠা ছাড়িয়া দিল, কিন্তু পথ ছাড়িয়া দিল না। বলিল—ওঁর কথাগুলো আপনি শুনেছেন ঠাকুর?

—শুনেছি অজুমণি।

ইরসাদ হাসিয়া উঠিল। বলিল—ওই শুন কি বলছেন তোমার ঠাকুর—শুন। প্রতিবাদে ওঁর বলবার কিছু নাই।

—ওঁর পথ ছেড়ে দাও অজয়।

ইরসাদ বলিল—হ্যাঁ বাপজান—আমার পথ ছাড়, তুমি বরং ওই ওঁর কাছে গিয়ে যাচাই করে নাও—কথাগুলা আমি সত্য বলেছি কি ঝুট বলেছি। দুনিয়ায় যে দোষই ওঁকে দি—উনি ঝুট বলেন—এ দোষ ওঁকে দিতে পারব না। ওই জন্যেই রাগ সত্ত্বেও শ্রদ্ধা করি।

কঠিন এবং ধারালো হাসি অজয়ের ঠোঁটের কোণে-কোণে ফুটিয়া উঠিল—সে বলিল—মিথ্যে বললেন কথাটা। শ্রদ্ধা করেন না; প্রমাণ আপনার কথাতেই আছে। ওঁকে অপমান করবার সঙ্কল্পটাই আজ সমস্ত কিছুর চেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে, তাই কতবড় মিথ্যে আপনি চতুর মোক্তার হয়েও বলে গেলেন—তা হয় তো আপনি নিজেও বুঝতে পারেন নি। আপনি নিজেই বললেন—উনি মিথ্যে বলেন—এ অপবাদ কেউ—এমন কি আপনিও দিতে পারেন না। অথচ গোড়াতেই শাসিয়ে রাখলেন—ওঁকে আপনি জেরা করবেন। যিনি সত্যবাদী তাঁকে জেরা করবার অভিপ্রায়টা কেন—বলতে পারেন? তাঁকে অপমান করবার জন্যই নয় কি? আপনি তো মোক্তার—বলুন না আপনি?

ইরসাদের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অজয়ের কথার জবাব সে খুঁজিয়া পাইল না।

কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া একটা জবাব সে দিল, যে জবাবটা সাধারণ উকীল মোক্তাররা হামেশাই দিয়া থাকেন—ইরসাদ বলিল—তুমি ছেলেমানুষ, তুমি ঠিক বুঝবে না। আদালত জায়গাই আলাদা, সেখানে আমি মোক্তার উনি সাক্ষী। ওঁতে আর একজন সাধারণ সাক্ষীতে কোন তফাৎ নাই। জেরা সেখানে আমাকে করতেই হবে।

অজয় একটু হাসিয়া পথ ছাড়িয়া ন্যায়রত্নের নিকট যাইতে যাইতে বলিল—তার অর্থ মিথ্যাবাদী সাক্ষীর মিথ্যাবাদকে প্রমাণ করার জন্য জেরা করাই শুধু ওকালতী বা মোক্তারী নয়, সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করবার জন্য জেরা করাটাও আপনাদের পেশার একটা অঙ্গ! সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক—জেতাটাই হ'ল মূল কথা। আইনের ফাঁকিটাই সত্য—আইন নয়—ন্যায় তো নয়ই।

ন্যায়রত্ন এবার বলিলেন—একটু দাঁড়াও ইরসাদ।

তাঁহার উপাসনা কিছুক্ষণ আগেই শেষ হইয়াছে। তিনি দুইবার অজয়কে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনাটা এমনই দ্রুতগতিতে আগাইয়া চলিয়াছিল যে চেষ্টা করিয়াও অজয় নিবৃত্ত হইবার অবসর

পায় নাই। যে মুহূর্তে অজয় নিবৃত্ত হইতে চাহিয়াছে সেই মুহূর্তে ইরসাদ তাহাকে শুধু আঘাতই করে নাই—তাহাকে যেন টানিয়া ফিরাইয়াছে। এবার অজয়ের আঘাতে ইরসাদ বিব্রত হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে অজয় পথ ছাড়িয়া তাঁহার দিকে সরিয়া আসিল। ন্যায়রত্ন এবার অবসর পাইয়া ইরসাদকে ডাকিয়া বলিলেন—একটু দাঁড়াও।

লাগাম টানিয়া অধীরতার সঙ্গে রেকাবশুদ্ধ পা দোলাইয়া ইরসাদ বলিল—বলুন কি বলছেন? অপমানের জ্বালায় সে তখন অধীর।

—তুমি এমন পাল্টে গেছ ইরসাদ?

—পাল্টাব না? বয়স বাড়ছে না? বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার ফাঁকিবাজী চোখে পড়ছে না? তখন ছিলাম মক্তাবের মৌলভী—সে এক সময় গিয়েছে। তারপরে মোক্তারী পাশ ক'রে পুরাণোকালের কাগজ ঘাঁটতে ঘাঁটতে কত কথা জানলাম। আপনারা এখানে পুরুষানুক্রমে—

ইরসাদের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল—থাক। সে সব কথা—ওই আদালতেই আপনাকে বলাব আমি। ওঃ—আপনার নাতি বিশ্বনাথ—থাক, সে কথাও থাক।

আর সে দাঁড়াইল না। ঘোড়াটাকে অকস্মাৎ ঘা কয়েক চাবুক মারিয়া ছুটাইয়া দিল।

ন্যায়রত্ন তাহার গমন পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অজয় কাছে আসিয়া বলিল—চলুন ঠাকুর। ওই দেখুন, অনেক লোকজন আসছে এই দিকে। দেবুকাকা রয়েছেন আগে। বোধ হয় আমাদের দেরী দেখে আসছেন ওঁরা।

—চল।

কিছুদূর আসিয়া হঠাৎ ন্যায়রত্ন ডাকিলেন—অজয়।

—ঠাকুর।

—ইরসাদ সেখ—যা বলে গেল সে শুনে তোমার মন কি চঞ্চল হয় নি ভাই?

—চঞ্চল হয়েছিল বই কি ঠাকুর—রাগ হয়েছিল। আপনি না-থাকলে—

—আমার আশঙ্কা হচ্ছিল অজুমণি।

—আমি ওকে ঘায়েল ক'রে দিতাম ঠাকুর। ডাল রুটি আর পশ্চিমের জল-বাতাসের গুণ অনেক। আমার গায়ে ওর চেয়ে বেশী জোর আছে। তা ছাড়া আমি বক্সিং জানি।

হাসিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—তা ছাড়া—তোমার কাছে বোধ হয় অস্ত্রও আছে।

অজয় চমকাইয়া উঠিল।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—অকস্মাৎ একদিন চোখে পড়ে গিয়েছিল ভাই। বালিশের তলায় রেখে তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। ঘুমের ঘোরেই বালিশটা সরিয়ে ফেলেছিলে বোধ হয়। আমি ঘরে ঢুকলাম—দেখলাম কালো শক্ত একটা জিনিষ। মাথার শিয়রের আলো পড়েছে তার উপর। দেখলাম—প্রথমটা মনে হ'ল খেলনার পিস্তল বোধ হয় শখ করে কিনেছ। কিন্তু জিনিষটা গড়ন-দেখে সন্দেহ হল। হাতে তুলে দেখলাম। ঠিক পরীক্ষার পদ্ধতি তো জানি না, তবে ওজন দেখে মনে দৃঢ় প্রত্যয় হ'ল—খেলনা এটা নয়। আমি সন্তর্পণে আবার তোমার বালিশ ঢাকা দিয়ে—তোমায় জাগিয়ে তুলে চলে এলাম। বলে এলাম—বিছানাটা ভাল করে ঝেড়ে পেতে নিয়ে শোও ভাই।

অজয় চুপ করিয়া রহিল।

ন্যায়রত্ন আবার বলিলেন—তোমায় বলি নি কিছু বলে বোধ হয় আশ্চর্য্য হচ্ছ। বলে কি করব? তোমার পিতামহ তোমার পিতা দুজনে তাদের জীবন দিয়ে আমাকে শিক্ষা দিয়ে গেছে যে, সে অধিকার আমার নাই।

এবারও অজয় কোন উত্তর দিল না।

ন্যায়রত্ন বলিয়াই গেলেন—ইরসাদ শেখ যে কথাগুলি বলে গেল—সেগুলি একেবারে মিথ্যা নয় অজুমণি। পূর্ণ সত্যও নয়। অর্দ্ধ সত্য। তোমায় আমি সঙ্গে এখানে এনেছি—সেই কথাগুলিই বলব ব'লে। দীর্ঘ দিন কথাগুলি মনের মধ্যে গোপন ক'রে রেখেছি। তোমার মা জানেন, কিন্তু তিনি কোনদিন সে কথা তোমাকে বলবেন না। আমাকেও বারবার বলেছেন বলবেন না, অজুকে আপনি এ সব কথা বল্‌বেন না। জেনে ওর হবে কি? জয়া মনে যা ভাবে সে আমি জানি। তার আশঙ্কা সে-সব কাহিনী শুনলে তুমি আমায় অশ্রদ্ধা করবে—ক্রুদ্ধ হবে

আমার উপর। হয় তো বা এই শেষ বয়সে আমাকে পরিত্যাগ করে চলে যাবে।

—আমি জানি ঠাকুর সে সব কথা।

—তুমি জান? কে বললে?

—মা বলেছেন ঠাকুর।

—জয়া বলেছে?

—হ্যাঁ। এখানে আসবার আগের দিন তিনি আমাকে বললেন—তুই দেশে যাচ্ছিস অজয়, সেখানে যাবার আগে তোর বংশপরিচয়টা সম্পূর্ণ ক'রে আমার কাছে জেনে যা। মানুষের সমাজ মানুষের মন অতি বিচিত্র বাবা, সেখানে আলোর পাশে অন্ধকারের মত' সত্যের সঙ্গে মিথ্যে বাসা গেড়ে থাকে। যে মানুষের অন্তরে সত্য ছাড়া মিথ্যা ঠাঁই পায় না—মিথ্যে তাকে আক্রমণ ক'রে বাইরে থেকে, পিছন থেকে সাপের মত ছোবল মারতে চায়। যে মানুষের সঙ্গে যাচ্ছিস—তাঁর জন্যে ভাবি না, বিষ তিনি জয় ক'রেছেন। কিন্তু তুই? সত্যকে তুই আমার কাছে জেনে যা। সেখানে গিয়ে অনেক কাহিনী শুনবি বাবা। তোর বাপ তোর পিতামহকে নিয়ে দাদুর বিরুদ্ধে অনেক কথা অনেক জনে বলবে। সেই কথার আঘাত তুই যদি সহ্য করতে না-পারিস—তাই আজ তোকে বলে দেব। নইলে এতদিন বলি নি—আরও কিছুকাল বলতাম না। সব শুনে—যদি তোর শ্রদ্ধা ওঁর উপর অটুট থাকে তবেই তুই ওঁর সঙ্গে যা। নইলে তুই থাক এখানে—আমিই ওঁর সঙ্গে যাব। সমস্ত শুনেই আমি আপনার সঙ্গে এসেছি।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—যাক। জয়া আমাকে একটা দায় থেকে উদ্ধার করেছে। ট্রেনে আসবার পথে সমস্তক্ষণ আমি প্রায় এই চিন্তাই করেছি।

অজয় এবার মৃদুস্বরে বলিল—ওঁরা এসে পড়েছেন ঠাকুর।

ন্যায়রত্ন মাথা হেঁট করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া পথ চলিতেছিলেন—এবার তিনি মাথা তুলিলেন। সামনে প্রায় হাত পঞ্চাশেক দূরেই রেলওয়ে ইয়ার্ড আরম্ভ হইয়াছে; তারের বেড়ার মধ্যে একটি ছোট ফটক; সেই ফটকের মুখে সকলে দাঁড়াইয়া আছে।

দেবু বলিল—আমরা একটু ভাবছিলাম। গৌর অবশ্য আপনাদের সঙ্গেই আছে—তবু—।

—কে? কে সঙ্গে আছে? তোমরা কি সঙ্গে লোক পাঠিয়েছিলে?

—আমরা ঠিক পাঠাই নি। গৌর নিজেই এসেছিল; তবে আমাকে বলে এসেছিল। আমি বারণ করেছিলাম—কিন্তু সে শোনে নি। তার বাপের তো সাক্ষাৎ দেবতা ছিলেন আপনি।

—গৌর? কার ছেলে?

—আমার শালা। তিনকড়ি মণ্ডলের ছেলে। ওই আসছে পিছনে পিছনে।

ন্যায়রত্ন পিছন ফিরিয়া দেখিলেন। সবল স্বাস্থ্যবান লম্বাচওড়া একটি ছেলে দূরে থাকিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে। হাসিয়া ন্যায়রত্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—কি করছে ছেলেটি? তিনকড়ির জমিজমা তো—সবই যেন শ্রীহরি ঘোষ নীলাম করে নিয়েছিল!

—হ্যাঁ। জমিজমা অনেক দিনই গিয়েছে। বাড়ীখানাও পড়ে গিয়েছে। ও এখানেই থাকে। করে না বিশেষ কিছু, খবরের কাগজের একটা কারবার করে। করবেই বা কখন। এ জেলার ষড়যন্ত্র মামলায় চার বছর জেল খেটে সবে মাস ছয়েক বেরিয়েছে। দেবু একটু হাসিল।

*　　*　　*　　*

ষ্টেশন প্লাটফর্মের উপর লোকজনের বেশ ভিড় জমিয়াছে ততক্ষণে। কড়া পুলিশ ব্যবস্থা সত্ত্বেও লোকজনকে বাধা দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। অধিকাংশ লোকই একখানা করিয়া পরের ষ্টেশনের টিকিট কাটিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। সবই প্রায় জংশন দ্বারমণ্ডলের আইনের ফাঁক ও ফাঁকি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ চতুর ব্যক্তি।

ন্যায়রত্ন প্লাটফর্মে আসিয়া উঠিবামাত্র সকলে ভিড় করিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। শ্রীহরি ঘোষ এবং স্থানীয় প্রধান মাড়বারী ব্যবসায়ী সুরযমল, প্রধান মিল-ওয়ালা মুখার্জ্জী সাহেব এবং হাট দ্বারমণ্ডলের অধিবাসী—এখানকার একজন বড় ব্যবসায়ী নবীন চন্দ্র ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। শ্রীহরিই মুখপাত্র হিসাবে বলিল—এইবার আপনি চলুন। কাল থেকে

উপবাস ক'রে আছেন—পারণ করবেন। তা-ছাড়া ষ্টেশন কর্ত্তৃপক্ষের আপত্তি আছে—আপনি থাকায়। জেলার কর্ত্তারাও সদর থেকে টেলিগ্রামে খবর নিয়ে টেলিগ্রামেই হুকুম পাঠিয়েছেন যেন ষ্টেশনে আপনাকে না-রাখা হয়। আপনি বরং ইচ্ছে হলে থানায় থাকতে পারেন। সেখানে ইনসপেকশন রুম খুলে দেওয়ার হুকুম দিয়েছেন। এ দিকে ভিড়ও জমতে সুরু হয়েছে। আমরা সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছি সুরযমলবাবুর বাড়ীতে—আপনি সেখানে চলুন।

ন্যায়রত্ন কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন—তা হ'লে আমি থানাতেই যাব।

—থানাতে যাবেন?

—হ্যাঁ।

সমস্ত জনতা যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। থানা? থানার মত কুটীল নিষ্ঠুর স্থান—আজ যে স্থানকে অপবিত্র বলিয়া সর্ব্বসাধারণে ঘৃণা করিয়া থাকে—সেইখানে যাইতে চান ন্যায়রত্ন?

ঠিক এই সময়েই জনতা পিছন হইতে মেয়েদের গলার কথা শুনিয়া সকলে পিছন ফিরিয়া চাহিল।—আমায় একটু যেতে দেবেন দয়া করে। একটু প'থ দেবেন।

এখানকার গার্লস হাই স্কুলের হেড মিষ্ট্রেস—মিসেস ভট্টাচার্য্য সম্মুখে আসিতে চাহিতেছিলেন। সকলে বিস্মিত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল।

মিসেস ভট্টাচার্য্য সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দেবু ন্যায়রত্নের নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। মিসেস ভট্টাচার্য্যকে দেখিয়া তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিল—অরুণা দেবী!

মিসেস ভট্টাচার্য্য তিরস্কার করিয়া বলিলেন—সরুন। সামনে ছাড়ুন। তাঁহার চোখে বহ্নিচ্ছটা যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে।

দেবু বলিল—না। ফিরে যান, বাড়ী যান।

—কি ব্যাপার? কি চান উনি? উনি তো গার্লস স্কুলের হেড মিষ্ট্রেস?

—হ্যাঁ। প্রণাম করবেন উনি।

—না। মেয়েটি দৃঢ় স্বরে বলিল।—প্রণাম করব, কিন্তু সেইটেই একমাত্র কারণ নয় আমার আসবার। ওঁকে আমি আমার বাড়ীতে যাবার জন্যে বলতে এসেছি।

—তুমি কে মা?

—আমি আপনার পৌত্রবধূ। আপনার পৌত্রের সঙ্গে একসঙ্গে রাজনৈতিক দলের কাজ করতাম। আপনার মনে আছে বোধ হয়—আপনি কাশী চলে যাবার আগে—আমরা এসেছিলাম এখানকার বন্যাপীড়িতদের অবস্থা দেখতে; এসে উঠেছিলাম—এখানকার ডাকবাংলায়। আপনি সকাল বেলা আপনার পৌত্রের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন,—আপনি যখন ঘরে ঢোকেন—

স্থির দৃষ্টিতে ন্যায়রত্ন মেয়েটির দিকে চাহিয়াছিলেন।

তিনি বলিলেন—হ্যাঁ মনে পড়ছে। আমি যখন ঘরে ঢুকি—তখন তুমি উঠে অন্য একটা ঘরে যাচ্ছিলে—বিশ্বনাথ তোমার হাত ধ'রে—তোমায় আটকে রেখেছিল। তোমার দাদাও যেন তোমাদের সঙ্গে ছিলেন। তখন তোমার নাম ছিল অরুণা সেন।

—হ্যাঁ। আপনি সম্পর্ক ছিন্ন করে—তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে কাশী চলে গেলেন, তিনি তখন আমায় বিবাহ করেন। এখানকার লোকই আমাদের বিবাহে উপস্থিত ছিলেন—দরকার হলে—তাঁকে ডাকছি আমি—

—সাক্ষীর প্রয়োজন তো নেই মা। তোমাকে তো মর্য্যাদাহীনা বলে বোধ হয় না।

—আমি, আমি সেই সাক্ষী ঠাকুর মশায়। কণ্ঠস্বর ইরসাদের।

ন্যায়রত্ন মুখ তুলিয়া চাহিলেন। অজয় এবার উঠিয়া দাঁড়াইল। ন্যায়রত্ন বলিলেন—বস অজয়। তোমার হাতখানা দাও। তিনি অজয়ের হাতখানা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া বসিয়া রহিলেন।

ইরসাদ যেন উত্তেজনায় থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে। সে বলিল—তখন বলি নাই। সবার সামনে বলব ব'লে বলি নাই। আপনার নাতি আর ইনি—এঁরা দুজনে মুসলমান হয়ে সাদী করেছিলেন, তাতে ক'রে—আপনার প্রথম পৌত্রবধুর সঙ্গে সাদী তালাক হয়ে গিয়েছে। তারপর সাদীর পরে—দুজনে শুদ্ধি ক'রে আবার হিন্দু হন। জিজ্ঞাসা করুন ওঁকে।

সমস্ত প্লাটফর্মটা স্তব্ধ হইয়া গেল। মানুষ যেন হতবাক হইয়া গিয়াছে, পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। শুধু টেলিগ্রাফের

খুঁটির গায়ে বাতাসের প্রবাহের স্পর্শে একটানা গোঁ-গোঁ শব্দ উঠিতেছিল। আর উঠিতেছিল দূরে সাইডিংয়ে মাল-গাড়ীর শান্টিংয়ের শব্দ।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ন্যায়রত্ন মেয়েটিকে বলিলেন—মা! এখনও কি তুমি আমাকে যেতে বলছ তোমার ওখানে?

—বলছি।

চারিদিকে অস্ফুট গুঞ্জন উঠিল।

মিসেস ভট্টাচার্য হঠাৎ বসিয়া পড়িয়া ন্যায়রত্নের পা দুইটা চাপিয়া ধরিয়া, পায়ের উপর মুখ রাখিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—নইলে আপনি আমাকে বলে দিয়ে যান—আমি কি নিয়ে থাকব?

জনতার মধ্য হইতে কে বলিয়া উঠিল—আপনি পা ছেড়ে দেন ওর। ওঁকে আবার স্নান করতে হবে!

সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুখের অর্গল মুক্ত হইয়া গেল।

—কি নিয়ে থাকব? এ্যাঃ—হারামজাদি মাগী—

দেবু মিসেস ভট্টাচার্যকে আকর্ষণ করিয়া বলিল—উঠুন—আপনি উঠুন। মিসেস ভট্টাচার্য!

ন্যায়রত্ন মেয়েটির মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—ওঠ মা। চল, আমি তোমার বাড়ী যাব।

আবার প্লাটফর্মটা স্তব্ধ হইয়া গেল।

ন্যায়রত্ন ডাকিলেন—অজয়। ওঠ। তোমার মায়ের হাত ধরে তোল।

অজয় অকস্মাৎ পাগলের মত মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল—না—না—ঠাকুর না। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

—অজয়!

—না—না। না!

ঠিক এই সময়েই পুলিশ ইনস্পেক্টর ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—ক্লিয়ার করুন, ষ্টেশন এরিয়া ক্লিয়ার করুন। বাইরে যান সব। কলকাতা থেকে স্পেশাল আসছে। মিনিষ্টার আসছেন—একজন বড় কংগ্রেস নেতা আসছেন। কলকাতায় আপোষ হয়ে গিয়েছে—দু পক্ষের। সেই মত ব্যবস্থা হবে এখানে। বৈকালে মিটিং হবে। বাইরে যান সব, বাইরে যান।

—সে কি?

—হ্যাঁ। এই টেলিগ্রাম। ক্লিয়ার আউট, ক্লিয়ার আউট!

আপোষ হইয়াছে—মুসলমানেরা ওখানে ছোট একটি মসজিদ করিতে পারিবেন। কিন্তু কখনও ওই এলাকায় গো-কোরবাণী করিতে পারিবেন না। মুসলমানেরা হিন্দু দেবস্থানের মর্য্যাদা কোন ক্রমে ভঙ্গ করিতে পাইবেন না, জয়তারার আশ্রমে মসজিদে নামাজের সময় বাজনা বাজিবে না। অন্য সময়ে বাজনায়, পূজায়, বলিতে মুসলমানদের কোন আপত্তি চলিবে না।

হিন্দু মুসলমানের দেশ। উভয় দাবীকেই মানিতে হইবে।

আজ মিটিংয়ের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে জয়তারা আশ্রমের এলাকার মধ্যে। সরকার হইতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে মিষ্টান্ন বিতরণ করিবেন।

কংগ্রেস নেতা মুসলমানদের হাতে মিষ্টান্ন দিবেন। লীগ মন্ত্রীমণ্ডলের মন্ত্রী দিবেন হিন্দুদের হাতে মিষ্টান্ন।

কংগ্রেস ও লীগ পতাকা ছাদাছাদি করিয়া বাঁধিয়া পোতা হইবে মঞ্চের উপরে!

* * *

উত্তেজনার মুখে অজয় প্লাটফর্ম হইতে লাইনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাইডিংয়ের মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল। ন্যায়রত্ন দেখিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার সর্ব্বশরীরে যেন একটা কম্পন বহিয়া গেল, বারেকের জন্য তাঁহার চোখ আপনা হইতে মুদিয়া গেল। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের একটা নিদারুণ মর্ম্মঘাতী ছবি তাঁহার মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল।

জংসন দ্বারমণ্ডল তখন জংসন হয় নাই, তখন দ্বারমণ্ডল ছিল একটি ছোট ষ্টেশন, এই ষ্টেশনের ডিসট্যান্ট সিগনালের কিছু আগে ছোট একটি জঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী রেললাইনের উপর পড়িয়াছিল রক্তাক্ত খণ্ড বিখণ্ড কতকগুলি মাংসপিণ্ড আর অস্থির টুকরা। তাঁহার একমাত্র পুত্র শশীশেখরের দেহাবশেষ। শশীশেখর—তাঁহার শশীশেখর—গৌরবর্ণ—মেদবর্জিত দীর্ঘদেহ—প্রশান্ত মুখ—খড়্গনাসা—চোখ দুটি ছিল ক্ষুদ্র—তাহাতে ছিল তীক্ষ্ণ দীপ্ত দৃষ্টি। তাঁহার নিষ্ঠুর আঘাতে শশীশেখর আত্মহারা হইয়া রাত্রের অন্ধকারে রেললাইন ধরিয়া পথ চলিতেছিল, সম্ভবত হুঁচোট খাইয়া লাইনের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, শেষ রাত্রে ডাকগাড়ী তাহার দেহকে খণ্ড বিখণ্ড মাংসপিণ্ডে পরিণত

করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। আজ আবার অজয় তেমনি আত্মহারা হইয়া সেই দ্বারমণ্ডলের রেললাইনের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

শিহরিয়া উঠিয়া চোখ খুলিয়া ন্যায়রত্ন দীর্ঘকাল পরে বেদনাহত আর্ত্তস্বরে ডাকিয়া উঠিলেন—অজয়! অজু ভাই! অজু!

দেবু বলিল—আপনি ব্যস্ত হবেন না। গৌর তার সঙ্গে গিয়েছে। আমি দেখেছি—সেও ঝাঁপিয়ে পড়েছে লাইনের ওপর।

ন্যায়রত্ন নীরবে চোখ বন্ধ করিয়া কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইয়া রহিলেন। সম্ভবত সুদীর্ঘকালের পর বাহির হইয়া আসা বেদনার উচ্ছ্বাসকে সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিলেন।

প্লাটফর্ম্মে জনতা তখন চলিতে সুরু করিয়াছে। পাথরের টালির উপর বহুসংখ্যক জুতার শব্দ একটা বিচিত্র ধ্বনির সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু কথাবার্ত্তার গুঞ্জন তখনও ফুটিতে পারিতেছে না। প্লাটফর্ম্মের ওমাথায় ইনস্পেক্টর তখনও ঘোষণা করিতেছে—ষ্টেশন থেকে চলে যান—আপনারা ষ্টেশন থেকে চলে যান। মিনিষ্টার আসছেন—কংগ্রেস লীডার আসছেন। সমস্ত মিটমাট হয়ে গেছে। স্পেশ্যাল ট্রেণ আসছে। চলে যান আপনারা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই—বোধহয় দশ মিনিটের মধ্যেই ষ্টেশনটা প্রায় জনশূন্য হইয়া গেল। শহরের রাস্তা ধরিয়া জনতা উত্তেজিত আলোচনা করিতে করিতে ফিরিয়া চলিয়াছিল। বাবু সুরজমলের ওখানে হিন্দুমহাসভার আলোচনা বসিবে, ফৈজুদ্দিন সাহেবের ওখানে মুসলমানদের আলোচনা বৈঠক বসিতে চলিয়াছে, দোকানে—গাছতলায়—সাধারণ লোকে ইতিমধ্যেই জমিতে সুরু করিয়াছে, কংগ্রেসকর্ম্মীরা চলিয়াছে নিজেদের আফিসে,—মিটমাট হইয়াছে—মঙ্গল হইয়াছে—এই মিটমাটকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ষ্টেশন প্লাটফর্ম্মে রহিল শুধু মালবাহকের দল, চা ও খাবারের ষ্টলের লোক, পাহারারত পুলিশ কয়েকজন; আর রহিলেন ন্যায়রত্ন, করুণা, দেবু এবং আরও জনপাঁচেক।

ইনস্পেক্টর আসিয়া দাঁড়াইল।

বলিল—তা' হ'লে? আপনি কোথায় যাচ্ছেন পণ্ডিত মশায়? এদিকের তো সব মিটে গেল। আপনার তো দায় চুকল। এখানে তো আর থাকতে দিতে পারব না।

ন্যায়রত্ন অরুণার দিকে চাহিয়া বলিলেন—চল মা। তোমার নিমন্ত্রণ আমি তো নিয়েছি।

অরুণা যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। রক্তশূন্য মৃতের মুখে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া সে দাঁড়াইয়া ছিল। ন্যায়রত্নের কথা বোধ হয় তাহার বোধগম্য হইল না।

দেবু তাহাকে ডাকিল—অরুণা দেবী! মিসেস ভট্টাচার্য!

—এ্যাঁ!

—চলুন। উনি আপনার ওখানে যাবেন।

পিছন হইতে গম্ভীর কণ্ঠে কে বলিল—তা হ'লে আপনাকে সমাজে পতিত হতে হবে ঠাকুর মশায়। বৃদ্ধ বয়সে আপনার মতিচ্ছন্ন হয়েছে দেখছি। আসুন, যেতে-যেতে আপনার কথা মনে ক'রে আমি ফিরে এলাম। আমরা এখানকার দশজনে আপনাকে এনেছি। চলুন আমার ওখানে চলুন। ওঁর ওখানে কোন মুখে আপনি যেতে চাচ্ছেন? ছি!

শ্রীহরি ঘোষ। শিবকালীপুরের পত্তনীদার।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—কে? শ্রীহরি?

—হ্যাঁ। আমি।

হাসিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—জাতি বল ধর্ম্ম বল—ওর আর কিছুই নাই আমার বাবা। ও সবই গিয়েছে। নতুন ক'রে যাবার আর কিছু নাই। ওঁর ওখানে আমাকে একবার যেতেই হবে। না গিয়ে আমার উপায় নাই! এতবড় জনসমাগমের মধ্যে উনি যে বেদনায় যে মমতায় অধীর হয়ে—সকলের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সহ্য করে চোখের জলে ভেসে আমার পা-চেপে ধরলেন—তার ছোঁয়াচ আমাকেও লেগেছে শ্রীহরি—আমাকে যেতেই হবে। আমি যাব। দেবু—তুমি অজয়কে দেখ। তাকে ফেরাও। চল মা!

অরুণা এতক্ষণে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল—সে বলিল—না। আপনার যথেষ্ট অমর্য্যাদা করেছি আমি। আমার বাড়ী নিয়ে গিয়ে আপনার লাঞ্ছনা আর বাড়িয়ে দেব না। ওদিকে—অজয়! অজয় চলে গেল রাগ করে!

—গেল, আবার ফিরবে। না—ফেরে—।

ন্যায়রত্নের ঠোঁট দুটি থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আত্মসম্বরণ করিয়াও কিন্তু ও কথাটা শেষ করিলেন না। ও কথাটা আর না তুলিয়া ক্ষীণ হাস্যের সঙ্গে বলিলেন—আর—লাঞ্ছনার কথা বলছ, ওটা পাওনা না থাকলে কেউ দিতে পারে না মা। ওটা হয়তো পাওনাই আছে আমার। চল, এখন চল। (ক্রমশঃ)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজ তত্ত্বাবধানে রংবুল পাহাড়ের লাল কার্ডিনি আলুর বীজ উৎপন্ন করিয়া প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ আলুর বীজ বহুল পরিমাণে পচা ছিল। বর্দ্ধমান জেলায় বিভিন্ন এলাকায় যে বীজ সরবরাহ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে বার আনা অংশ বীজের গাছ বাহির হয় নাই। সরকারী অর্থ এই ভাবে নষ্ট করিবার অধিকার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের আছে কিনা তাহা আজ মাননীয় মন্ত্রীদের অনুসন্ধান করিয়া দেখা প্রয়োজন হইয়াছে।

—বর্দ্ধমানের কথা

* * *

সম্প্রতি মহারাষ্ট্রে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগঠনের এক তুমুল আন্দোলন দেখা দিয়াছে। কর্ণাটক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর প্রস্তাবানুযায়ী তত্রত্য কংগ্রেস সভ্যবৃন্দ, প্রাদেশিক আইন সভা হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একজন মন্ত্রীও পদত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের বাংলার মন্ত্রী-মণ্ডলী ও আইন সভার সদস্যবৃন্দ বোধ হয় হাজার অকাজ ও সুকাজের মধ্যেও এই সংবাদটী দেখিয়াছেন। প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্ণধারগণেরও অপর দলের কৌশল ব্যর্থ করিবার নানা অভিসন্ধির মধ্যেও এই সংবাদটি নিশ্চয়ই তাঁহাদের দৃষ্টি গোচর হইয়াছে। এই অবস্থায় তাঁহাদের কর্তব্য খুবই সুস্পষ্ট। যত ত্যাগের বাহাদুরী বা শক্তির বাহাদুরীই করি জনসাধারণের বাঁচিয়া থাকিবার সবপ্রকার শুদ্ধ অনুভূতি যে স্বদেশ নেতার নাই, জনসাধারণ তাহাদিগকে আর সমর্থন করিবে না। আমরা আশা করি, বাংলার মন্ত্রী সভা, বাংলার কংগ্রেস, অন্যান্য যাবতীয় প্রতিষ্ঠান হইতে এই দাবী অবিলম্বে উপস্থিত হইবে। সহরে ও গ্রামে সর্বত্র ভারত বিভাগের সময় যেরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, সেইরূপ আন্দোলন অবিলম্বে অনুষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

—সংহতি

* * *

বিভিন্ন ধর্ম বা দাতব্য ট্রাষ্টএর হস্তে ন্যস্ত বিস্তৃত জমি, বাগিচা, ইমারত ও অন্যান্য সম্পত্তির বিষয় উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে এই সব সম্পত্তিতে উন্নত ধরণের ঘরবাড়ী, জলের কূপ, জলের নালা আছে কর্মচারীরাও নিযুক্ত আছে, কিন্তু এ সবই অবহেলায় পতিত হইয়া আছে। দুঃখের বিষয় এই ন্যাসগুলি দুর্নীতি ও অপকর্মের আকর হইয়াছে; অনেক ক্ষেত্রে ন্যস্ত সম্পত্তি মোহান্ত বা তথাকথিত ন্যাসরক্ষক-মণ্ডল বা সমিতির ব্যক্তিগত সম্পত্তির মত হইয়া আছে। সৎ কর্মচারী বা বেসরকারী সজ্জন দিয়া গবর্ণমেণ্ট এই সব ট্রাষ্টএর কার্যকলাপ সামান্য অনুসন্ধান করিলেই, লোকে প্রকৃত অবস্থা জানিয়া চমকিত হইবে। সামাজিক কার্যে সংশ্লিষ্ট সকল স্থানীয় মুখ্য লোকই এই অবস্থার কথা জানেন; কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবে কে?

প্রত্যেক রাজকর্মচারী নিজের কাজটুকু লইয়া ব্যস্ত, স্থানীয় স্বায়ত্ত-প্রতিষ্ঠানের সরকারী বা বেসরকারী সদস্যেরা নিজেদের কাজটুকু, আর নিজের ভোটারদের লইয়া ব্যস্ত, সাধারণের অন্যান্য কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবার তাঁহাদের অবসর নাই; থাকিলেও হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহারা নূতন প্রতিপক্ষ দল সৃষ্টি করিতে চান না। ঘুমন্ত কুকুর ঘুমাইয়াই থাক এই মন্ত্র মানিয়া সকলেই চলেন। স্থানীয় মুখ্যদের আগাইয়া আসা উচিত। কিন্তু মনে হয়, গবর্মেণ্ট সাহস করিয়া অগ্রসর না হইলে এদিক দিয়া কিছু হইবে না। অথচ বিষয়টি জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধনের মত বিতণ্ডার বিষয় নয়, কারণ ন্যস্ত সম্পত্তিগুলি শুধু সুব্যবস্থাকল্পে ন্যাসীদের হস্তে গচ্ছিত আছে, ইহা কাহারও ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকারভুক্ত নয়।

—সত্যাগ্রহ পত্রিকা

* * *

অতি সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে সরকারী দপ্তরগুলি পুনর্ব্বণ্টিত হইল। এই রদবদলের সময় গ্রাম পঞ্চায়েৎ নামধেয় একটি নূতন দপ্তরের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রবীণ কৃষিমন্ত্রী শ্রীযুত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা এই নূতন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আশা করা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে গ্রাম পঞ্চায়েৎ আইন বিধিবদ্ধ হইবে এবং অতঃপর পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বত্র গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ সভা গঠিত হয়, এই গ্রাম পঞ্চায়েৎ বিভাগ তাহার জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। এক্ষণে অবশ্য পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি পঞ্চায়েৎ অবিলম্বেই গঠিত হইবে।

ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাসে গ্রাম পঞ্চায়েৎ স্থাপনীর দৃষ্টান্ত নূতন নহে। যুক্তপ্রদেশ এই দিক দিয়া যথার্থ প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়াছে। বহুদিন হইল, যুক্তপ্রদেশের সর্ব্বত্র সহস্র সহস্র পঞ্চায়েৎ সভা গঠিত হইয়াছে এবং প্রশংসাজনকভাবে তাহারা কার্য্য করিয়া আসিতেছে। মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই এবং বিহারেও গ্রাম পঞ্চায়েৎ আইন প্রণয়নের কার্য্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের অস্বাভাবিক ও বিবিধ অসুবিধাকর পরিস্থিতির সহিত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনা করা চলে না সত্য। কিন্তু নিরপেক্ষ ব্যক্তি-মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়টির প্রতি অত্যন্ত বিলম্বে মনোযোগী হইয়াছেন।

—নির্ণয়

* * *

আজ কুচবিহার প্রদেশ বাংলাকে প্রত্যর্পণ করিয়া বাঙালীকে সন্তুষ্ট করা যাইবে না—ফিরাইয়া দিতে হইবে বিহারের বাংলা-ভাষা-ভাষী

অঞ্চলগুলিকে। আজ সারা ভারতে যে-বিশৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে—ইহার মূলে রহিয়াছে এই সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার কূট-মনোবৃত্তি। মহাত্মা গান্ধী যে-আদর্শে ভারতবর্ষ গড়িতে চাহিয়াছিলেন—সে-আদর্শ ভুলিলে চলিবে না, যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা ফিরাইয়া দিতে হইবে।

আজ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—কিন্তু অঞ্চলগুলি আজো সুসংবদ্ধ হইল না। রাডক্লিফের সীমানা-নির্দেশের শেষ রায় দানের সঙ্গে বাংলার সীমারেখা নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। প্রতি সাংবাদিকের আজ অতি বড় দায়িত্ব রহিয়াছে—বাংলার দাবী আজ উচ্চকণ্ঠে তাহাদিগকেই শুনাইতে হইবে। বাংলার ও বাঙালীর সর্বনাশ হইবার আগে বাঙালীকে আজ সচেতন হইতে হইবে। বাংলার জনগণ-মনের সম্মিলিত দাবী—ঘোষণা করিতে হইবে, বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চল আমাদের চাই-ই। —সৈনিক

* * * *

কাছাড় জেলার বহু মসজিদে পাকিস্তানী প্রচার কার্য্য চলিতেছে। কাশ্মীর ফাণ্ডের জন্য চাঁদা তোলা হইতেছে। করিমগঞ্জ ও কাছাড় জেলা আবার পাকিস্তানে যাইতেছে বলিয়া প্রচার চলিতেছে। জকিগঞ্জের (পাকিস্তান) কর্ম্মচারীরা করিমগঞ্জ সহরে বাসা করিয়া ও হোটেল সমূহে থাকিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রের সমস্ত সংবাদ লইতেছেন। অথচ আসামের সরকারী কর্ম্মচারীরা বাসার অভাবে যেখানে সেখানে বাস করিতে বাধ্য হইতেছেন। আসাম সরকার নির্বিকার। রাষ্ট্রদ্রোহী প্রচার কার্য্য বিনাবাধায় যে চলিতে পারে বোধহয় একমাত্র আসামেই তাহা সম্ভবপর। —জনশক্তি

* * * *

পশ্চিম বঙ্গের প্রদেশপাল মাননীয় ডাঃ কাটজু যুক্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে বলিয়াছেন—"অযোগ্য ব্যক্তিদের কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে।" কংগ্রেসে এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী প্রবেশ করিয়া কংগ্রেসের সুনাম নষ্ট করিতে বসিয়াছে। ডাঃ কাটজু যাহা বলিয়াছেন তাহা একান্তভাবে পালনীয়। সুবিধাবাদী সুযোগ-পন্থীদের লালসার চাপে পড়িয়া সত্যকার কংগ্রেসপন্থীরা আজ অবহেলিত হইতেছেন। কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিতে হইলে এই সব অবাঞ্ছিত, চোরাবাজারী ও পূর্ব্বতন ইংরেজ চাটুকারদের বিতাড়িত করিতেই হইবে। —আর্য্য

* * * *

ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রথার অভ্যন্তরে যে দুর্নীতি ঢুকেছে তারই বিষম ফলস্বরূপ কালোবাজারের উৎপত্তি। স্বাধীন রাজ্যে এরূপ কালোবাজার সরকারের পক্ষে চরম অগৌরবের কথা—এই কালোবাজারের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে সাধারণ লোক এর অত্যাচারে মৃতপ্রায় এবং এই মৃতের সমাধির ওপর কয়েকটি ধনী উত্তরোত্তর সৌধ নির্ম্মাণ করছেন। সরকারের যে এ জিনিষটা অজ্ঞাত আছে তা মনে করবার কারণ নেই ;—দীর্ঘ দুই বৎসরের মধ্যে তাঁরা এই কালোবাজারের স্রোত রুদ্ধ করতে সক্ষম হননি, ফলে সাধারণ লোকের কষ্টের সীমা নেই। আইন সভার সদস্যরা—যাঁদের মধ্যে অনেকে অতীতে চূড়ান্ত ত্যাগের পরিচয় দিয়ে দেশসেবার জন্য সানন্দে নির্যাতন বরণ করেছিলেন—আজ তাঁদের অধিকাংশই নিজের স্বার্থের জন্য মেরুদণ্ডহীন সরকারের অশেষ কৃপার পাত্র! কালোবাজার যাঁরা বন্ধ করবেন, তাঁরাই কালোবাজারীদের পৃষ্ঠপোষক! জনগণের সুখ দুঃখের সঙ্গে আইন সভার সদস্যদের কোন যোগ নেই; মন্ত্রীগণ তো শূন্যপথেই সাধারণতঃ বিচরণ করেন না সুতরাং তাঁদের নাগাল সাধারণ অনেকদিন আগেই পায় নাই। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে এঁদের প্রত্যেকেই বলে থাকেন তাঁরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি—দেশবাসীর সেবাই তাঁদের আদর্শ! সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা-লোভী জাতীয় সংবাদপত্রের অনেকগুলিই মন্ত্রী-মাহাত্ম্যে পঞ্চমুখ, সরকারের অলীক জয়গানে মুখরিত। —প্রতিধ্বনি

* * * *

ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস সভাপতি আচার্য্য কৃপালনী তেজপুরে (আসাম) এক বক্তৃতায় ক্রমবর্দ্ধমান প্রাদেশিকতার বিপদ সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে, সময় থাকিতে প্রাদেশিকতা যদি নিরোধ না করা হয়, তাহা হইলে দেশের সর্ব্বনাশ সুনিশ্চিত। আচার্য্য কৃপালনীর এই অভিমতের অভ্রান্ততা এতই স্বতঃসিদ্ধ যে, জনসাধারণকে যে এখনও প্রাদেশিকতার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিতে হয় ইহা অতীব পরিতাপের বিষয়। ভারত এক ও অখণ্ড। প্রত্যেক ভারতবাসী একথা নিয়ত স্মরণ রাখিবেন যে, তিনি সর্ব্বাগ্রে ভারতবাসী, তারপর অন্য কিছু। দৈনন্দিন আচরণের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব আমরা প্রায়শঃ বিস্মৃত হই বলিয়াই দেশের দিকে দিকে আজ প্রাদেশিকতা মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে এবং রাষ্ট্রের সমূহ ক্ষতি করিতেছে। এ বিষয়ে সাধারণের ভুলভ্রান্তির পরিমাণ বিরাট সন্দেহ নাই, তবে কোন কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের আচরণও দোষমুক্ত নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আসাম গবর্ণমেন্টের শরণার্থী সম্পর্কিত নীতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুচ্যুত হিন্দু সম্প্রদায়ের একটা অংশ আশ্রয়ের প্রত্যাশায় আসাম ভূমিতে গিয়া ঠাঁই লইয়াছে। এই সব বিড়ম্বিত-ভাগ্য অসহায়দের সম্পর্কে আসাম গবর্ণমেন্ট যে নীতি ও কার্যক্রম অনুসরণ করিতেছেন তাহা সর্ব্বভারতীয় ঐক্যের আদর্শের সহিত সঙ্গতিবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয় না। এই ক্ষেত্রে তাঁহাদের আচরণ সংশোধিত হওয়ার অবকাশ আছে। আচার্য্য কৃপালনী আসামের তেজপুরে আলোচ্য বক্তৃতা করিয়াছেন। এইজন্যই আমরা বিশেষ করিয়া আসাম গবর্ণমেন্টের কথা উল্লেখ করিলাম। —আর্থিক জগৎ

* * * *

ভারতবর্ষের জনসাধারণ অধিকাংশই পর্ণকুটীরেই বাস করিতে অভ্যস্ত। সুতরাং তাহাদের বিদ্যালয় গৃহ পর্ণকুটীর হইলে কোন ক্ষতি হইবার কথা নহে—অধিকন্তু তাহাই হওয়া যুক্তিযুক্ত। যদি কুটীরও তাহাদের না জোটে গাছতলাকে অবলম্বন করিয়া শিক্ষাদান ব্যবস্থা চালু করিলেও কোন ক্ষতি নাই। এখানে বড় কথা "শিক্ষার মন্দাকিনী

ধারা বহিয়ে দেওয়া সাধারণ ভাবে ঘাটে ঘাটে মর্তজনের দ্বারের সম্মুখ দিয়ে"। কিন্তু সরকার বনিয়াদী শিক্ষার নামে যে ব্যবস্থা চালু করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন তারা রীতিমত আড়ম্বরপূর্ণ। ইহা কখনই দরিদ্র ভারতবাসীর উপযোগী নয়। আমাদের মনে হয় দরিদ্র গ্রামবাসীদের নিকট হইতে যে ৪,০০০৲ টাকা এককালীন দান হিসাবে গ্রহণ করার পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে দরিদ্র ভারতের উপযোগী দুইটি প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের প্রারম্ভিক ব্যয় সঙ্কুলান হইবে। সুতরাং এ অযথা অর্থ ব্যয়ের পরিকল্পনা সরকারের ত্যাগ করা কর্তব্য বলিয়াই আমরা মনে করি—আর ইহাও তাহাদিগকে স্মরণ করিতে বলি যে দরিদ্র পল্লীবাসীদের পক্ষে এককালীন ৪,০০০৲ টাকা দান করা কি সহজ কথা। সুতরাং এখানেও তাহাদিগকে মুষ্টিমেয় ধনী সম্প্রদায়ের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

—সংগঠনী

* * * *

হরিণঘাটা সম্বন্ধে শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের সহিত সম্প্রতি আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইয়াছিল ; হরিণঘাটার কার্য্যাবলীর সঙ্গে তাঁর এক বিরাট কল্পনা নিহিত ছিল ; যে কল্পনাকে কার্য্যকরী করিতে পারিলে দেশের পল্লী অঞ্চলের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী ; এক কথায় তিনি হরিণঘাটাকে এমন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন, যে প্রতিষ্ঠান সকল দিকে আমাদের দেশের যুবকবৃন্দকে গ্রামমুখী (**village-minded**) করিবে। তাঁরা চাকরীর জন্য হরিণঘাটায় শিক্ষালাভ করিবে না, নিজ হস্তে দেশের মাটি হইতে সোনা ফলাইবার জন্যই শিক্ষালাভ করিবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বর্ত্তমান কৃষি শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছিলেন।

গরু সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের ন্যায় অভিজ্ঞতা ও গবেষণা ভারতবর্ষে আর কাহারও আছে কি না জানি না। সুতরাং হরিণঘাটার কার্য্যাবলী তাঁহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইলে বিভিন্ন দিক হইতে দেশের বিভিন্ন রকমের উন্নতি সাধিত হইবে। হরিণঘাটায় তাঁহার অবস্থিতি, তাঁহার কার্য্য প্রণালী, তাঁহার উদাহরণ, তাঁহার সকলের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ সেখানকার কর্ম্মচারীগণের ও শিক্ষার্থীবৃন্দের মনে যে আদর্শ, উৎসাহ, উদ্যম ও প্রেরণা দিবে তাহা অন্য কাহারও দ্বারা সম্ভব হইবে না। তাঁহার উপর হরিণঘাটার পরিচালনার ভার ন্যস্ত করিলে গভর্ণমেন্টের কোন দিকেই কোন ক্ষতি হইবে না, বরং সকল দিকেই লাভ হইবে এবং এই ব্যবস্থার দ্বারা গভর্ণমেন্ট জনসাধারণের আস্থা অর্জ্জন করিবেন।

খুবই দুঃখের বিষয় যে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহোদয়ের কলিকাতায় অবস্থান কালেও হরিণঘাটার কোন কর্ম্মচারী তাঁহার সহিত কোন সংযোগ রাখেন না।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহোদয় হরিণঘাটায় তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত করুন ইহাই জনসাধারণের ইচ্ছা। —খাদ্য উৎপাদন

* * * *

সেন্ট্রাল এডভাইসরী কাউন্সিল অব্ ইণ্ডাষ্ট্রীজের বৈঠকে এদেশে শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে যে দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল গত সপ্তাহে একটি প্রবন্ধে আমরা তাহা নিয়া আলোচনা করিয়াছি। বিভিন্ন শিল্পের অবস্থা ও সমস্যা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য ওয়ার্কিং পার্টি বা কার্য্যকরী সংসদ গঠন করা এবং অত্যাবশ্যকীয় শিল্প পণ্যের যোগান বাড়ানোর জন্য ১৯৫০ সালের হিসাবে প্রধান প্রধান শিল্পের সর্ব্বোচ্চ উৎপাদন হার বাঁধিয়া দেওয়া—দুইটিই খুব সঙ্গত প্রস্তাব বলিয়া আমরা বর্ণনা করিয়াছি। সুখের বিষয়, সর্দ্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে ভারত গবর্ণমেণ্ট ঐ দুই প্রস্তাবই অচিরে কার্য্যকরী করা সম্পর্কে মনোযোগী হইয়াছেন। ১৯৫০ সালের জন্য ১৭টি শিল্পের সর্ব্বোচ্চ উৎপাদন হার স্থির করিয়া গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই তাহা সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করিয়াছেন। শিল্পের নাম ও নির্দ্ধারিত সর্ব্বোচ্চ উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে এই—কয়লা ৩ কোটী ১০ লক্ষ টন, ইস্পাত ১০ লক্ষ টন, চিনি ১০ লক্ষ টন, সালফিউরিক এসিড ১০ লক্ষ টন, বস্ত্র (মিলের) ৪৫০ কোটী গজ, সুপারফসফেটস্ ৫০ হাজার টন, কাগজ ও পাজবোর্ড ১ লক্ষ ১০ হাজার টন, রিফ্রেক্টরিজ ২ লক্ষ ২৫ হাজার টন, কাঁচ ১ লক্ষ টন, এ্যালুমিনিয়াম ৩ হাজার ৫০০ টন, সাইকেল টায়ার ও টিউব ৬০ লক্ষটি, মোটর টায়ার ও টিউব ১০ লক্ষটি, ডিসেল ইঞ্জিন ৩ হাজারটি ও সুরাসার ১ কোটি গ্যালন। বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প কারখানায় সর্ব্বোচ্চ যে পণ্য উৎপাদন করা সম্ভবপর সে তুলনায় ১৯৪৮ সালে অনেক ক্ষেত্রেই কম পণ্য উৎপাদিত হইয়াছে। ১৯৪৯ সালে উৎপাদন আরও নামিয়া যাওয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ১৯৫০ সালের জন্য সর্ব্বোচ্চ উৎপাদন হার বাঁধিয়া দিতে গিয়া সে অবস্থা বিচার করিয়াছেন। প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে নজর রাখিয়া সকল শ্রেণীর শিল্প কারখানায় ১৯৪৮ সালের তুলনায় ১৯৫০ সালে উৎপাদন উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। দেশের কয়লা কোম্পানীসমূহের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ ৩ কোটী টন কয়লা উৎপাদন সম্ভবপর। ১৯৫০ সালের হিসাবে দেশে সেই স্থলে ৩ কোটী ১০ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন করিতে বলা হইয়াছে। ইহাতে কয়লা উত্তোলনের কাজ সম্প্রসারণের জন্য নূতন খনি খনন ও নূতন সাজ সরঞ্জাম বসানোর সঙ্কল্প ভারত গবর্ণমেণ্টের রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যাইতেছে। ১৯৫০ সালের জন্য বিভিন্ন পণ্যের যে সর্ব্বোচ্চ উৎপাদন হার বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে সকল শিল্প পরিচালকই দেশের কল্যাণে সেইরূপ বেশী হারে পণ্য উৎপাদনে আন্তরিকভাবে মনোযোগী হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

—আর্থিক জগৎ

* * * *

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই বৎসরই ২রা অক্টোবর তারিখে উল্টাডাঙ্গায় একটি স্বদেশী ডাকাতি হয়। ক্যানেল ওয়েষ্ট রোডে জনৈক ব্যবসায়ীর গদিতে এই ডাকাতি হইয়াছিল। কয়েকজন যুবক মোটরে করিয়া উক্ত ব্যবসায়ীর গদিতে গিয়া উপস্থিত হন এবং রিভলবার দেখাইয়া ৩০০৲ হস্তগত করেন। পুনরায় তাঁহারা মোটরে করিয়াই ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। কিছু-সংখ্যক লোক গাড়ীখানির অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়। কিছুদূর যাওয়ার পর গাড়ীখানি একটি গর্ত্তে পড়িয়া যায় ও আর চলিতে পারে না। তখন গাড়ী হইতে নামিয়া কয়েকজন পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পুলিশ কাহাকেও কাহাকেও ধরিয়া ফেলে। মোটরে উপবিষ্ট অবস্থাতে শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবীও গ্রেপ্তার হন। ইঁহাদিগকে অভিযুক্ত করিয়া এক মামলা রুজু হয়। বিচারে বিমলপ্রতিভা দেবী ও অপর একজন মুক্তিলাভ করেন। তিনজনের কারাদণ্ড হয়। ১২ই অক্টোবর যে শ্যামবাজার বোমার মোকদ্দমা হয়, তাহাতেও কয়েকজন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ২৯শে অক্টোবর European Association-এর সভাপতির উপর গুলি বর্ষিত হয়। ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে শান্তি এবং সুনীতি চৌধুরী নামে কুমিল্লা ফয়জুন্নেশা গার্লস্ স্কুলের দুইজন ছাত্রী গুলি করিয়া কুমিল্লার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ষ্টিভেন্সকে নিহত করেন। বিচারে শান্তি এবং সুনীতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন।

বিলাতে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বৈঠকের শেষ অধিবেশনে ভারতে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য সার তেজবাহাদুর সপ্রু ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর নিকট এক আবেগপূর্ণ আবেদন জানান। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী তদুত্তরে বলেন যে, ভারতে শাসনকার্য্যে বিঘ্ন সৃষ্টি না করিয়া শান্তি-রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলে সার তেজবাহাদুর সপ্রুর এই আবেদনে মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেন্ট নিশ্চয়ই সাড়া দিবেন।

এই ঘোষণার পর বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সদিচ্ছারও খানিকটা পরিচয় পাওয়া গেল। আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে সকল সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, বড়লাট লর্ড আরউইন ১৯৩১ সালের ২৫শে জানুয়ারি তাঁহাদিগকে মুক্তিদানের আদেশ দিয়া এক বিবৃতি প্রদান করিলেন। উক্ত ঘোষণা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশের প্রায় ত্রিশজন প্রভাবশালী নেতাকে ২৬শে জানুয়ারি মুক্তি দেওয়া হইল। ইঁহারা সকলেই ছিলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া যে সকল আদেশ জারি করা হইয়াছিল, তাহাও তুলিয়া লওয়া হইল।

মুক্তিলাভের পরই গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এলাহাবাদে গিয়া সমবেত হইলেন। সেখানে তখন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু গুরুতররূপে পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন। নেতৃবৃন্দ সেখানে কয়েকদিন যাবৎ একত্র আলাপ-আলোচনা করিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণাকে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে কংগ্রেসের যোগদানের পক্ষে যথেষ্ট আশ্বাস বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। এই সময় ৬ই ফেব্রুয়ারি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু দেহত্যাগ করিলেন।

বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে একটা মীমাংসা সংঘটিত করিবার জন্য সার তেজবাহাদুর সপ্রু, শ্রীজয়াকর, ভূপালের নবাব বাহাদুর, এবং শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় গান্ধীজীর সহিত উপর্য্যুপরি সাক্ষাৎ করিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদের পীড়াপীড়িতে পড়িয়া গান্ধীজী আপোষ রফা সম্বন্ধে কংগ্রেসের বক্তব্য পেশ করিবার জন্য বড়লাটের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার নিকট এক পত্র লিখিলেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হইল এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারি হইতে ৪ঠা মার্চ্চ পর্য্যন্ত দিল্লীতে বড়লাটের সহিত গান্ধীজীর কয়েকদিন ধরিয়া আলোচনা চলিল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণও দিল্লীতে আহূত হইলেন এবং গান্ধীজী তাঁহাদিগকে বড়লাটের সহিত তাঁহার আলোচনার ফলাফল জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। আলোচনাকালে এক এক সময় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে লাগিল যে মনে হইতে লাগিল, অন্যান্যবারের মত মধ্যপথেই বুঝি সেবারের আলোচনাও ফাঁসিয়া যাইবে; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে একটি সন্ধি-চুক্তি সম্ভব হইল। বৃটিশ গভর্ণমেন্টের পক্ষে লর্ড আরউইন এবং ভারতের জনগণের পক্ষে মহাত্মা গান্ধী উক্ত সন্ধি-চুক্তিতে স্বাক্ষর করিলেন। ইহার দ্বারা গভর্ণমেন্ট পক্ষ তাঁহাদের দমননীতি প্রত্যাহার করিতে এবং কংগ্রেস পক্ষ তাঁহাদের আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখিতে সম্মত হইলেন। কঠোর সংগ্রামের পর এইরূপে সাময়িকভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৯৩১ সালে লণ্ডনে পুনরায় দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক সুরু হইল। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য বোম্বাই হইতে আগষ্ট মাসের শেষ দিকে মহাত্মা গান্ধী "রাজপুতানা" জাহাজ যোগে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে গেলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং সরোজিনী নাইডু। যাত্রাপথে গান্ধীজী বহু স্থান হইতেই শুভেচ্ছামূলক পত্র ও টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা গিয়া ইংলণ্ডে পৌঁছাইলেন সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে। সেখানে তিনি নানা সভাসমিতি ও সংবাদ-পত্রের মারফত কংগ্রেসের দাবী ও উদ্দেশ্য ইংলণ্ডের ও বিভিন্ন দেশের জনসাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

গোল টেবিল বৈঠকের আমন্ত্রিত প্রতিনিধিরা সকলেই ছিলেন বড়লাটের মনোনীত সদস্য, সুতরাং তাঁহারা প্রায় সকলেই ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল ও সঙ্কীর্ণদৃষ্টিসম্পন্ন। বৃটিশ কর্তৃত্বের বাহিরে স্বাধীন, সার্ব্বভৌম, জাতীয়তাবাদী ভারতের কল্পনা করিবার তাঁহাদের শক্তি ছিল না। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টেরও তখন বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না ভারতীয়দের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরের। কাজেই দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকেও ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় অগ্রগতির কোনই সুরাহা হইল না—সমস্যা সমস্যাই রহিয়া গেল। আসল আলোচনার বিষয়গুলিকে ধামাচাপা দিয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যাকেই বৈঠকে প্রাধান্য দেওয়া হইল এবং তাহা লইয়াই সৃষ্ট হইল অনর্থক কৃত্রিম জটিলতার। কিছুদিন ধরিয়া ব্যর্থ অধিবেশনের পর ১লা ডিসেম্বর বৈঠক শেষ হইল।

অধিবেশনের শেষদিনে মহাত্মা গান্ধী এক ঐতিহাসিক বক্তৃতা দান করেন। অন্যান্য কথার সহিত তিনি বলিলেন,—"বৃটিশ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে, এমন আশা নিয়ে আমি কিছু বলছি না, কারণ তাঁদের সিদ্ধান্ত হয়তো ইতিপূর্ব্বেই স্থির হয়ে আছে। বহু বক্তা যদিও ব'লেছেন যে আলাপ-আলোচনার দ্বারাই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাবে, কিন্তু কংগ্রেস তা পুরোপুরি বিশ্বাস করে না; সেই জন্যই কংগ্রেসকে বাধ্য হয়ে ইংরেজদের পক্ষে অপ্রীতিকর অন্য পথ অনুসরণ ক'রতে হ'চ্ছে—প্রচার করতে হ'চ্ছে বিদ্রোহের বাণী। ভারতে আইন-অমান্য, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি চলতে থাকলে ভারতের কি দুর্গতি হবে, তা নিয়ে বহু বক্তাই দুশ্চিন্তা প্রকাশ ক'রেছেন। আমি একজন ঐতিহাসিক না হ'লেও একথা বলতে পারি যে যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ ক'রে গেছেন, তাঁদের রক্তে ইতিহাসের পাতা রাঙা হ'য়ে আছে। দুঃখকে বরণ না ক'রে কোনও জাতির স্বাধীন হওয়ার কোনও নজির আমার জানা নেই। সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে ওকালতি না ক'রেও একথা বলা যায় যে গুপ্তঘাতকের অস্ত্র, বিষ, রাইফেলের কার্ত্তুজ বা বর্শা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র—স্বাধীনতার অন্ধ-পূজারীরা আজ পর্য্যন্ত যা ব্যবহার ক'রে এসেছেন,—তার জন্যে ঐতিহাসিকেরা তাঁদের অপরাধী ব'লে গণ্য করেন নি। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যেই মানুষ লড়াই করে প্রাণ দেয় এবং যাদের কাছ থেকে মুক্তি চায়, স্বাধীনতার জন্যে তাদের হাতেই জীবন বিসর্জ্জন দেয়।"

গান্ধীজী তাঁহার এই সুদীর্ঘ বক্তৃতায় কংগ্রেসের আদর্শকে ব্যাখ্যা করেন—ইংরাজগণের সহিত ভারতীয়দের সম্মানজনক বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহও প্রকাশ করেন। সর্ব্বশেষে তিনি প্রদান করেন ধন্যবাদ। গান্ধীজী বলিলেন,—"I do not know in what direction my path would be, but it does not matter to me. Even though I may have to go in an exactly opposite direction, you are still entitled to a vote of thanks from the bottom of my heart."

১৯৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর গান্ধীজী শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিলেন। বৈঠক তো শেষ হইল, ইতিমধ্যে গভর্ণমেণ্টের নীতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। সত্য কথা বলিতে গেলে সাময়িকভাবে শান্তি স্থাপনের দ্বারা গভর্ণমেণ্ট যেন শক্তি-সঞ্চয়ের সুযোগ করিয়া লইয়াছিলেন, যাহাতে পরবর্ত্তী আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করা সম্ভব হইতে পারে। চুক্তি-দ্বারা স্থাপিত শান্তি যাহাতে ভবিষ্যতেও স্থায়ী হইতে পারে, সে চেষ্টা তাঁহাদের ছিল না। এই অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়কে তাঁহারা প্রস্তুতির সময় হিসাবেই গণ্য করিয়াছিলেন।

যুক্তপ্রদেশে কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল। গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট করিয়া কোনও ফল হয় নাই; উপরন্তু প্রজাদের আন্দোলন দমন করিবার জন্য সেখানে জারি করা হইল অর্ডিনান্স। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও খুদাই খিদমৎগার-দিগকে গভর্ণমেণ্ট সুনজরে দেখিতেন না। সেখানেও অর্ডিনান্স জারি করা হইয়াছিল এবং খান আব্দুল গফুর খান এবং তাঁহার ভ্রাতাকে বন্দী করা হইয়াছিল; কিন্তু বাংলা দেশে যে অর্ডিনান্স জারি করা হইয়াছিল, তাহাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর। মহাত্মাজী ইংলণ্ডে থাকার সময়ই মহাদেব দেশাই বেঙ্গল অর্ডিনান্স সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত নিম্নলিখিত ভাষায় লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—

"The Bengal Ordinance of 1931 is more ghastly than that of 1925. It reminds us of the days of the Sepoy Mutiny and the Amritsar massacre of 1919."

বাংলার বিপ্লবান্দোলন দমনকল্পে ১৯২৫ সালে একটি অর্ডিনান্স পাশ হওয়ার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমতঃ উহা বাংলার আইন-পরিষদে উত্থাপিত করিয়া পাশ করাইবার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু সরকারের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও যখন উহা আইন পরিষদে গৃহীত হইল না, তখন বাংলার তৎকালীন গভর্ণর লর্ড লিটন উহা তাঁহার অতিরিক্ত ক্ষমতাবলে আইনে পরিণত করেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া উক্ত অর্ডিনান্সের সাহায্যেই সরকার বিপ্লবীদিগকে শায়েস্তা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর যখন সন্ত্রাসবাদও উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিল, তখন বাংলা গভর্ণমেণ্ট আর একটি কঠোরতর আইন প্রবর্ত্তিত করার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে পূর্ব্বের আইনটি অচল হইয়া যাওয়ায় আশানুরূপ চণ্ডনীতি চালান যাইতেছে না; সুতরাং আর একটি নূতন আইনের অস্ত্র হস্তে লইয়া বিপ্লবীদের ও বাংলার জনসাধারণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া দরকার। তাঁহাদের এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই ১৯৩১ সালের ২৯শে অক্টোবর বেঙ্গল অর্ডিনান্স নামে আর একটি চণ্ড আইন জারি করা হইল।

এই আইনের সাহায্যে গভর্ণমেণ্ট প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। সন্দেহভাজন লোকদিগকে বিনা বিচারে অন্তরীণে আবদ্ধ করিয়া রাখার, যে কোন স্থানে পাইকারি জরিমানা আদায় করিতে পারার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের জন্মিল। সাধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী জজ ও জুরির দ্বারা অপরাধীর বিচার নিষ্পন্ন না করিয়া বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট-দিগের দ্বারা ডাকাতি, হত্যার চেষ্টা প্রভৃতি কয়েকটি অপরাধে অভিযুক্ত

আসামীদের স্বতন্ত্র বিচারের ব্যবস্থা হইল। হত্যা সংঘটিত না হইলেও হত্যার চেষ্টা করার অপরাধেই আসামীর মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারিবে বলিয়া বিধান দেওয়া হইল।

১৯৩২-৩৩ সালে বাংলা গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে "অশান্তির উপদ্রব" নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচারিত হয়। জনসাধারণকে গভর্ণমেন্টের অবলম্বিত নীতির যৌক্তিকতা বুঝানোই উক্ত পুস্তিকাখানির উদ্দেশ্য ছিল—যাহাতে তাহারা সর্ব্ববিষয়ে অশান্তি বিদূরণে অসহযোগিতা না করিয়া গভর্ণমেন্টের সহযোগিতা করে। আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বের ও পরের বাংলা দেশের অবস্থার যে চিত্র উহাতে পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ—

	১৯২৯ সাল	১৯৩০ সাল	১৯৩১ সাল
ডাকাতি	৬৯৩	১১০৩	১৯২৯

ডাণ্ডীতে লবণ-আইন ভঙ্গ সুরু হওয়ার পর সমগ্র ভারতে অশান্তি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তৃত হইয়া পড়ার যে বিবরণ উহাতে প্রদত্ত হয়, তাহা এই—

"১৯৩০, ১১ই এপ্রিল —বোম্বাইয়ে ও কলিকাতায় হাঙ্গামা।
১৪ই এপ্রিল —বোম্বাই বেলগাঁওয়ে দাঙ্গা।
১৫ই " —কলিকাতায় দাঙ্গা।
১৬ই " —করাচীতে দাঙ্গা ও পুণায় হাঙ্গামা।
১৮ই " —চট্টগ্রামে অস্ত্রাগারে ডাকাতী।
২০শে " —পাটনায় হাঙ্গামা।
২২শে " —মাদ্রাজে দাঙ্গা।
২৩শে " —পেশাওয়ারে বিষম দাঙ্গা-হাঙ্গামা।
২৭শে " —মাদ্রাজে পুনরায় দাঙ্গা।
২রা মে —অমৃতসরে হাঙ্গামা।
৬ই " —দিল্লীতে বিষম দাঙ্গা, কলিকাতায় দাঙ্গা এবং বোম্বাইয়ে, রাণাঘাটে ও জলন্ধরে (পাঞ্জাব) হাঙ্গামা।
৮ই " —শোলাপুরে এমন দাঙ্গা যে সামরিক আইন জারি করিতে হয়।
১৫ই হইতে ১৭ই মে —ময়মনসিংহে দাঙ্গা।
১৭ই মে —ঝিলাম জিলায় হাঙ্গামা।
২৪শে " —কলিকাতায়, করাচীতে ও মুলতানে হাঙ্গামা।
২৫শে " —সীমান্ত প্রদেশে মর্দ্দানের নিকটে দাঙ্গা এবং দিল্লীতে ও রাওয়ালপিণ্ডীতে হাঙ্গামা।
২৫শে ও ২৬শে মে —লক্ষ্ণৌএ দাঙ্গা।
২৭শে ও ২৮শে মে —বোম্বাইয়ে দাঙ্গা।
২৯শে মে —কলিকাতায় হাঙ্গামা।
৩১শে " —পেশাওয়ারে দাঙ্গা।
২রা জুন —ডেরাইস্মাইলখাঁয় ও মাদ্রাজ যোলিঙ্গানালুরে হাঙ্গামা।
৩রা হইতে ৭ই জুন —মেদিনীপুরে দাঙ্গা।
৫ই, ১২ই, ১৬ই ও ২১শে জুন —বোম্বাইয়ে হাঙ্গামা।
৮ই জুন —বোম্বাই কয়রার নিকটে ও মাদ্রাজে ভেলোরে দাঙ্গা।
৯ই " —অমৃতসরে হাঙ্গামা।
১০ই " —পাঁচলায় হাঙ্গামা।
২১শে " —কলিকাতায় হাঙ্গামা।
২৫শে " —টাঙ্গাইলে হাঙ্গামা।
২৬শে " —মাদ্রাজ ইলোরে দাঙ্গা।
৩০শে " —ভাগলপুরে হাঙ্গামা।
১লা জুলাই —যশোহরে হাঙ্গামা।
১লা হইতে ২রা জুলাই —বালেশ্বরের নিকটে দাঙ্গা।
৩রা জুলাই —বোম্বাইয়ে হাঙ্গামা।
৬ই " —পুণায় হাঙ্গামা।"

তালিকা বিস্তৃত হইবার ভয়ে আর দীর্ঘ করা হয় নাই; কিন্তু উহা হইতেই দেশব্যাপী অসন্তোষ ও বিক্ষোভের পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত ১৯৩১ সালে বাংলা দেশে ৬৭টি উপদ্রব এবং নয়টি হত্যাকাণ্ডের বিষয় উহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ সালেই দশ জন লোককে খুন করিবার চেষ্টা হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে—তন্মধ্যে পাঁচ জন আঘাত পায়। ডাকাতির সময়ও চারিজন লোককে খুন করা হয়। দেশে অশান্তি ছড়ানোর ফলকে উক্ত পুস্তিকায় প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—

"(১) বাঙ্গালায় ডাকাতীর সংখ্যা বাড়িয়াছে এবং বাড়িয়া চলিয়াছে;

(২) বাঙ্গালায় অনাচারীরা নানারূপ অনাচার করিতেছে;

(৩) বাঙ্গালার ভদ্রঘরের শিক্ষিতা যুবতীরাও খুন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।"

সর্ব্বশেষে উক্ত পুস্তিকায় যে আবেদন ছিল—তাহা সত্যই করুণ—

"দেশের এই অধঃপতনের জন্য কি নেতাদের কোন দায়িত্ব নাই? একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, তাঁহারা লোককে সরকারের সহিত সহযোগ করিতে বারণ করিয়া ও আইন ভাঙ্গিতে বলিয়া দেশে যে অবস্থা করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতেই দেশে অশান্তি ঘটিয়াছে এবং অশান্তি ঘটিলে উপদ্রব উৎপন্ন হইতে বিলম্ব ঘটে না।

বাঙ্গালায় যেমন সারা ভারতে তেমনই যে অশান্তি ছিল তাহাতে দেশের লোকের ধন-প্রাণ লইয়া সর্ব্বদাই টানাটানি হইত। ফলে দেশে উন্নতি হয় নাই। একশত বৎসরেরও অধিককাল চেষ্টায় এখন দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান শাসনের প্রধান গৌরব এই যে—ইহার দ্বারা দেশের লোকের ধন ও প্রাণ নিরাপদ হইয়াছে—সবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতে পারে না। ইহা হইয়াছে বলিয়াই দেশে নানা-

রূপ উন্নতি হইয়াছে। দেশে যদি অশান্তি থাকে, তবে শিক্ষার উপায় হয় না, ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হইয়া যায়, লোক মনে করে, সম্পত্তি যদি রাখিতে না পারে তবে সম্পত্তি করিয়া লাভ নাই। এখন সে ভাব দুর হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পথ ঘাট ভাল হইয়াছে। রেল, ষ্টীমার, ডাক, তার—এ সব দেশে নূতন যুগ আনিয়াছে। লোক প্রতিদিন পৃথিবীর খবর পাইতেছে। দেশে সেচের খাল হইয়াছে, আর তাহার ফলে শস্য অধিক জন্মিতেছে। বিদেশের সঙ্গে ব্যবসায়ে ভারতবর্ষ বহু ধন লাভ করিতেছে।

যদি এ সব নষ্ট হয়, তবে যে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা কি দেশের লোক বুঝেন না? দেশের যে অবস্থার কথা মনে করিলেও ভয় হয়, সেই অবস্থা ফিরাইয়া আনা কি কাহারও ইচ্ছা হইতে পারে? যদি না পারে তবে যাহাতে এই অশান্তি নষ্ট হয়—আবার শান্তি ফিরিয়া আসে—দেশের লোক আইন মানিয়া চলে—সরকারের সঙ্গে একসঙ্গে লোক কাজ করিয়া দেশের ও সমাজের উন্নতি ও মঙ্গল করিতে পারে—সেই চেষ্টা করাই দেশের শিক্ষিত লোকদিগের কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্য পালন করিলে তাঁহারা দেশের প্রতি ও সমাজের প্রতি প্রকৃত ভালবাসার পরিচয় দিতে পারিবেন। নহিলে নহে।"

এক আনা মূল্যের এই পুস্তিকাখানি ৫০,০০০ ছাপিয়া এইভাবে বাংলা গভর্ণমেণ্ট দেশের লোকের মতিগতি ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সত্যকারের সহযোগিতার পথকে যে তাঁহারাই রুদ্ধ করিতেছেন, ইহা তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন নাই।

১৯৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে পৌঁছাইয়া তৎপরদিনই মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের নিকট এক টেলিগ্রাম পাঠাইলেন। উহাতে তিনি যুক্তপ্রদেশ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বাংলার অর্ডিনান্স-এ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলেন এবং উহা সম্বন্ধে আলোচনার্থে বড়লাটের সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। বড়লাট কিন্তু সরাসরি তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া জানাইয়া দিলেন যে ভারত গভর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশসমূহে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা লইয়া তিনি গান্ধীজীর সহিত কোনও আলোচনা করিতে প্রস্তুত নহেন। ১৯৩২ সালের ১লা জানুয়ারি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গান্ধীজীর প্রস্তাব পুনর্ব্বিবেচনার জন্য বড়লাটকে অনুরোধ করা হইল এবং গান্ধীজীর সহিত বড়লাট সাক্ষাৎ করিতে অসম্মত হইলে পুনরায় আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে বলিয়াও জানাইয়া দেওয়া হইল। ইহাতে ফল ফলিল উল্টা। ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে গভর্ণমেণ্ট আবার পুরানো দমননীতি পুরাপুরি চালু করিয়া দিলেন। কংগ্রেস এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট সমুদায় প্রতিষ্ঠানকে পুনরায় বে-আইনী ঘোষণা করা হইল—ধর-পাকড়ও সুরু হইল পুরাদমে। উক্ত তারিখেই গান্ধীজী এবং সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল পুনরায় গ্রেপ্তার হইলেন। খান আব্দুল গফুর খান এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে ইতিপূর্ব্বেই কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। সুভাষচন্দ্রও গ্রেপ্তার হইলেন। শান্তি-চুক্তি বলবৎ থাকা কালেই গভর্ণমেণ্ট পুলিশের ব্যবহারের জন্য হাজার হাজার লাঠির অর্ডার দিয়া উহা মজুত করিয়াছিলেন; সুতরাং দমননীতি সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জনসাধারণের বিরুদ্ধে উহা বে-পরোয়া প্রযুক্ত হইতে লাগিল। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার বহু পরে সরকার লাঠির ব্যবহার সুরু করিয়াছিলেন—এবারে কিন্তু প্রথম হইতেই লাঠি চার্জ্জ চলিতে লাগিল। এলাহাবাদের "স্বরাজ-ভবন" পুলিশ দখল করিয়া লইল। গান্ধীজীর "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকার কার্য্যালয় পুলিশ তালাবদ্ধ করিয়া দিল। অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাত্রা এতই বৃদ্ধি পাইল যে, মনীষী রোমা রেঁালা ইহার বিরুদ্ধে আন্তর্জ্জাতিক প্রতিবাদ উত্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বৃটিশের প্রতিশ্রুতির অন্তঃসারশূন্যতা এবং তাঁহাদের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়ে বিপ্লবিগণ বরাবরই সজাগ ছিলেন, সেইজন্য গান্ধীজীর সহিত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের শান্তি-চুক্তি বলবৎ থাকা কালেও তাঁহারা আপন কার্য্য চালাইয়া যাইতে ত্রুটি করেন নাই। ১৯৩২ সালের প্রারম্ভেই যখন কংগ্রেসের সহিত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পুনরায় সংঘর্ষ সুরু হইল, তখন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ছিলেন পুরাপুরি প্রস্তুত, কিন্তু কংগ্রেসকে আবার নূতন করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করার অসুবিধায় পড়িতে হইল। বিপ্লবীরা তাঁহাদের প্রচেষ্টা বরাবরই বজায় রাখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে অধিক অসুবিধায় পড়িতে হইল না; সুতরাং ১৯৩২ সালে দমননীতি পুনরায় প্রযুক্ত হইতেই বিপ্লবীরাও তাহার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিলেন। ৬ই ফেব্রুয়ারি বাংলার গভর্ণর সার ষ্ট্যানলি জ্যাকসনকে আক্রমণের একটি চেষ্টা হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক সমাবর্ত্তন উৎসব উপলক্ষে ঐদিন সিনেট হলে যে সভার অধিবেশন হয়, চ্যান্সেলার হিসাবে সার ষ্ট্যানলি জ্যাকসন উহাতে সভাপতিত্ব করিতেছিলেন। শ্রীযুক্তা বীণা দাস সেই সময় তাঁহাকে গুলি করিবার চেষ্টা করিয়া ধৃত হইলেন। সভায় হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। পরে যখন বীণা দাসের বাটীতে খানাতল্লাস হইল, তখন সেখান হইতেও কিছু কার্তুজ প্রভৃতি পুলিশ প্রাপ্ত হইল।

বীণা দাস বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষ, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও মহিমচন্দ্র ঘোষকে লইয়া গঠিত ট্রাইব্যুন্যালে তাঁহার বিচার হইল। দুইটি অপরাধে তাঁহার মোট নয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল।

(ক্রমশঃ)

সরকারী ব্যয় হ্রাস কমিটী—

ভারত গভর্ণমেণ্ট সরকারী ব্যয় হ্রাস সম্বন্ধে তদন্তের জন্য যে কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, গত ১৬ই ডিসেম্বর ভারতীয় পার্লামেণ্টে তাহার রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে। কমিটী ২৩ কোটি টাকা খরচ কমাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন—তন্মধ্যে চলতি খরচ ৮ কোটি টাকা ও স্থায়ী কাজের খরচ ১৫ কোটি টাকা। বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় দপ্তরে কর্ম্মীর সংখ্যা ৬০৯১জন—তাহা কমাইয়া ১১৩৫জন করিতে বলা হইয়াছে। শিক্ষা, কৃষি ও স্বাস্থ্য বিভাগগুলি প্রাদেশিক সরকারের অধীন—তাহা সত্বেও কেন্দ্রে ঐ সকল বিভাগ অনাবশ্যকভাবে রক্ষার জন্য অতিরিক্ত বহু টাকা ব্যয় করা হইতেছে—তাহা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। কমিটী কতকগুলি অনাবশ্যক বেতন বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—খাদ্য-মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারীর ১৯৪৭ সালের এপ্রিলে বেতন ছিল মাসিক ৮শত টাকা—১৯৪৮এর ফেব্রুয়ারীতে ঐ ব্যক্তিকে অন্য পদ দিয়া বেতন করা হইল মাসিক ১৮শত টাকা। একজন পশু-চিকিৎসা অধ্যাপকের ১৯৪৬এর জানুয়ারীতে বেতন ছিল মাসিক ৬শত টাকা—১৯৪৮এর মার্চ্চে তাহাকে অন্য পদ দিয়া মাসিক বেতন করা হইল ১১৫০ টাকা। কমিটী শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় হ্রাস ব্যবস্থা প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রদেশগুলিতেও ঐ ভাবে বহু টাকা অপব্যয় করা হইতেছে—সে বিষয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা প্রয়োজন। যে সময় দেশের অধিকাংশ লোক খাদ্য ও বস্ত্র না পাইয়া অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছে ও ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে, সে সময়ে সরকারী দপ্তরে এই ভাবে অর্থের অপব্যয় কোন মতেই সঙ্গত নহে। দেশবাসী ইহার প্রতীকার প্রার্থনা করে।

চোরা কারবারীদের শাস্তি—

অধ্যাপক কে-টি সাহা ভারতের সর্ব্বত্র অর্থনীতিক পণ্ডিত বলিয়া সুপরিচিত। তিনি ভারতীয় পার্লামেণ্টে প্রস্তাব করিয়াছেন—চোরা-কারবারে লিপ্ত ব্যক্তিদের ও যাহারা সরকারী ট্যাক্স ফাঁকি দেয়, তাহাদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বর্তমান প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ১৯৪৫ সালে কারামুক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—তিনি ক্ষমতা লাভ করিয়া চোরা-কারবারীদের ল্যাম্প-পোষ্টে ফাঁসি দিবার ব্যবস্থা করিবেন। এখন আর তাঁহার সেদিন নাই। তিনি ক্ষমতা লাভ করার পর আড়াই বৎসর হইয়া গেল—তথাপি দেশে চোরা-কারবার ব্যাপকভাবেই বর্ত্তমান—পণ্ডিত নেহরু চোরা-কারবারীদের শাস্তির কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। বরং তিনি এখন চোরা-কারবারী ধনিক সম্প্রদায়ের সমর্থক—তাঁহার আদর্শে প্রদেশগুলিতেও দরিদ্রদের উপরই আইন প্রযুক্ত হয়—ধনীরা অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকেন। এ ব্যবস্থা আরও কতদিন চলিতে দেওয়া হইবে? দেশকে ধ্বংসের পথ হইতে কে রক্ষা করিবে? অধ্যাপক সাহার প্রস্তাব কি কাগজ-কলমেই থাকিয়া যাইবে?

হিন্দু কোড বিল—

কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে হিন্দু কোড বিলের আলোচনা কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি সীতারামিয়া পর্য্যন্ত বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—কংগ্রেস দল যদি জোর করিয়া বিলটি পাশ করে, তবে আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়লাভ করা কঠিন হইবে। এই কথা দ্বারাই বুঝা যায়, হিন্দু কোড বিল প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু জোর করিয়া পাশ করাইবার চেষ্টা করিলেও দেশের অধিকাংশ লোক তাহা সমর্থন করে না। পণ্ডিত নেহরু এ বিষয়ে কি বুঝেন, তিনিই জানেন। দেশের অগণিত জনগণের মত উপেক্ষা করিয়া কি তিনি দেশে নূতন সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে সমর্থ হইবেন?

কর্ণাটক প্রদেশ—

মাদ্রাজ প্রদেশকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া উত্তরাংশ অন্ধ্র প্রদেশ ও দক্ষিণাংশ তামিল প্রদেশ গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ২৬শে জানুয়ারী নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেই উভয় প্রদেশের শাসন ব্যবস্থা স্থির হইবে। বোম্বায়েও স্বতন্ত্র কর্ণাটক প্রদেশ গঠনের আন্দোলন চলিতেছে।

মহীশূর রাজ্য, কোলাপুর, সিন্দুর প্রভৃতি কয়েকটি দাক্ষিণাত্য রাজ্য, হায়দ্রাবাদের ৩টি জেলা, বোম্বাই প্রদেশের ধারোয়ার, বিজাপুর, উত্তর কানাড়া ও বেলগাঁও জেলা এবং মাদ্রাজের বেলারী জেলা লইয়া কর্ণাটক প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। সকল স্থানের লোকই কানাড়ী ভাষাভাষী—কাজেই কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি অনুসারে এই-বিরাট অঞ্চল লইয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন প্রয়োজন। এই বিষয় লইয়া ঐ অঞ্চলের নেতারা তীব্র আন্দোলন করিতেছেন—তথাপি কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ কেন যে কর্ণাটক প্রদেশ গঠনে বিলম্ব করিতেছেন, তাহা বুঝা যায় না।

লোক প্রেরণ প্রয়োজন—

পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশের আয়তন ২৮১৫৫ বর্গ মাইল ও জন সংখ্যা ২ কোটি ১৪ লক্ষ। কুচবিহার যুক্ত হওয়ায় ইহার আয়তন ১৩২১ বর্গ মাইল ও জন সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ বাড়িয়াছে। দেশীয় রাজ্য সমেত মধ্য প্রদেশের আয়তন ১৩০৩২৩ বর্গ মাইল ও জন সংখ্যা ২ কোটি ৬ লক্ষ। আয়তনের দিক দিয়া মধ্যপ্রদেশ সবাপেক্ষা বড়। ঘন-বসতিপূর্ণ পশ্চিম বঙ্গের লোকদিগকে কি মধ্যপ্রদেশে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করা যায় না? এ বিষয়ে রাষ্ট্র-নেতাদের চিন্তা করা প্রয়োজন।

সিংহল—

সিংহলে সম্প্রতি বৃটীশ কমনওয়েলথের পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন হইয়া গেল। উক্ত দ্বীপটির আয়তন ২৫৩৩৩ বর্গ মাইল—উত্তর দক্ষিণে ২৭০ মাইল ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ১৪০ মাইল। ১৯৪৬ সালের লোকগণনা অনুসারে লোক সংখ্যা ৬৬৫৮৯৯৯। বহু পাহাড় ও নদীতে দেশটি পূর্ণ। সিংহলী, তামিল, মুসলমান, ইউরেশিয়ান, ভেড্ডা, মালয়ী, মুর ও শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী আছে। সিংহল হইতে চা, রবার, নারিকেল ও মূল্যবান জহরত রপ্তানী হয়। কোন প্রয়োজনীয় জিনিষের দিক দিয়া সিংহল স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। যুদ্ধের সময় আমেরিকা সকল জিনিষ সিংহলে প্রেরণ করিত—এখন মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে অন্য ব্যবস্থা হইবে। বাঙ্গালার ব্যবসায়ীদের সিংহলের বাজারের প্রতি দৃষ্টি প্রদান প্রয়োজন। বাঙ্গালী বীর বিজয়সিংহের নামে তাম্রপর্ণী নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া সিংহল হইয়াছিল। বাঙ্গালীর সে সংস্কৃতির কথা মনে রাখা উচিত।

তিব্বত—

তিব্বতে পরস্পর-বিরোধী দুই শক্তি বর্ত্তমান। ১২ বৎসর বয়স্ক 'পান-চেন-লামা' 'জীবন্ত বুদ্ধ' বলিয়া পরিচিত—তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী 'দালাই লামা'র কবল হইতে তিব্বতকে উদ্ধার করিবার জন্য চীনের জেনারেল মাও-এর নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। কম্যুনিষ্টরাও এ বিষয়ে তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন। দালাই লামা লাসায় বাস করেন—তিনি শুধু রাষ্ট্রনায়ক নহেন, ধর্ম্মগুরু। ১৯২৩ সালে ত্রয়োদশ দালাই ও নবম পান-চেন-এ যুদ্ধ হয়। পান-চেন পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ১৯৩৫ সালে আপোষ হয় ও পান-চেনকে তিব্বতে ফিরিয়া আসিতে অনুমতি দেওয়া হয়। উভয় লামাই ঐ সময় দেহ ত্যাগ করেন ও চীনারা একজনকে পান-চেন নির্ব্বাচিত করিয়া কুমবেম-এ পাঠাইয়া দেন। এখন ১৪ বৎসর বয়স্ক চতুর্দ্দশ দালাই লামা ও ১২ বৎসর বয়স্ক দশম পান-চেন লামাতে বিরোধ চলিতেছে। জেনারেল মাও এখন তাহাদের ভাগ্য বিধান করিবেন।

সর্ব্বত্র অরাজকতা—

প্রায় এক পক্ষ কাল ধরিয়া প্রত্যহ কলিকাতা সহরের বুকের উপর কোন না কোন প্রকাশ্য স্থানে তথাকথিত কম্যুনিষ্ট দলের লোকেরা বোমা ফেলিয়া পুলিসকে ও জন-সাধারণকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার এ বিষয়ে কোন প্রতীকারের ব্যবস্থা করেন না। করিতে পারেন না, এ কথা বলিলে ভুল হইবে—কারণ পুলিসকে পর্য্যাপ্ত ক্ষমতা দিলে তাহারা অবিলম্বে এই অনাচার দূর করিতে পারে। বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য দেশে অর্থসাম্য নাই—এক দল লোক পেট ভরিয়া খাইতে পায় না—তাহাদের সংখ্যাই দেশে অধিক। একদল মোটা বেতনের সরকারী কর্ম্মচারী বা সরকারের অনুগ্রহ-প্রাপ্ত একদল চোরা কারবারী ছাড়া দেশের প্রায় সকল লোকই আজ অন্ন বস্ত্র সমস্যায় কাতর। কাজেই কেহ স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া কোন অনাচার দূর করিতে সরকারকে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয় না। মন্ত্রীরা মোটা বেতন ও ভাতা এবং স্বজন পোষণ লইয়াই সন্তুষ্ট, দেশবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশার কথা

ভাবিবার সময় তাঁহাদের নাই। কাজেই এ অবস্থায় দেশে যে অরাজকতা বাড়িয়া যাইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? আজ দেশ যখন শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে, তখনও কংগ্রেস-সেবক বলিয়া পরিচিত প্রদেশ-পালের ভবনে জাঁক-জমকের অভাব হয় না। লোক এই অসাম্য দেখিয়া কতকাল আর নীরবে সহ্য করিবে? কেন্দ্র হইতে প্রদেশ পর্য্যন্ত সর্বত্র শুধু বড় বড় কথা শুনানো হইতেছে—চাল, কাপড় বা খাদ্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের কোন ব্যবস্থা হইতেছে না—এ ব্যবস্থা করা না হইলে জন সাধারণই ক্রমে অরাজকতা সৃষ্টি করিবে—স্বতন্ত্র কম্যুনিষ্ট দলের প্ররোচনার প্রয়োজন হইবে না। এ কথা চিন্তা করিয়া দেশের শান্তিকামী ব্যক্তি মাত্রই আজ শঙ্কিত হইয়াছেন।

রাঁচিতে যক্ষ্মা চিকিৎসা কেন্দ্র—

ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, সারা ভারতে ২৫ লক্ষ লোক যক্ষ্মারোগে ভুগিতেছে এবং এদেশে প্রতি মিনিটে একজন করিয়া লোক যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু এদেশে মাত্র ৭ হাজার যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসার উপযুক্ত হাসপাতাল

রাঁচী যক্ষ্মা হাসপাতালের নূতন গৃহ

আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীকর্ম্মীরা যক্ষ্মারোগ চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য রাঁচীতে ২৪০ একর জমী ১৯৩৯ সালে সংগ্রহ করেন। গত বৎসর তথায় গৃহাদি নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে, আপাতত ৬০ জন রোগী রাখার ব্যবস্থা হইবে। এখনই ৫ লক্ষ টাকা না হইলে সকল কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হইবে না। মিশনের স্বামী বেদান্তানন্দ তথায় থাকিয়া কাজ করিতেছেন। মিশন সর্ব্বসাধারণের নিকট এই কার্য্যে সাহায্যপ্রার্থী। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি এই কার্য্যে মিশনকে উৎসাহিত করিয়াছেন। সাহায্যাদি বেলুড়ে মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ কর্ত্তৃক গৃহীত ও স্বীকৃত

রাঁচী যক্ষ্মা হাসপাতালের অন্যান্য নূতন গৃহ নির্মাণ

হইবে। আমরা দেশবাসী সকল সহৃদয় ব্যক্তিকে এই কার্য্যে সাহায্যদান করিতে অনুরোধ করি।

কলিকাতার নূতন সেরিফ—

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীশান্তিভূষণ দত্ত ১৯৫০ সালের জন্য কলিকাতার সেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টে কিছুকাল ব্যারিষ্টারী করার পর তিনি ব্যবসায়ে যোগদান করেন ও ১৯৪৬-৪৭ সালে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি হন। তিনি কলিকাতা ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশনের সভাপতি।

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ—

কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষা-সচিব শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ গত ১৮ই ডিসেম্বর ৫৭ বৎসর বয়সে কলিকাতা হিন্দুস্থান পার্কে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৯১৫ সালে এম-এস-সি পাশ করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন—কিন্তু বিপ্লব আন্দোলনে যোগদান করায় তাঁহাকে দেশত্যাগ করিতে হয়। ১৯১৬ সাল হইতে ২০ বৎসর তিনি আমেরিকায় ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করেন। তিনি বরিশালে ব্রজমোহন কলেজ ও ঢাকা জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন এবং বিলাতে ইণ্ডিয়ান হাই কমিশনারের ডেপুটী সেক্রেটারী ছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিচারপতি শ্রীরূপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের নেতৃত্বে এক কমিটী গঠিত হইয়াছিল। ঐ কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার সিণ্ডিকেটের অধীন না রাখিয়া বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব করিযাছেন। নূতন ভাইস-চান্সেলার শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় কমিটীর নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ চালাইবার ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন? বহু বৎসর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থায় গলদ চলিয়া আসিয়াছে। এখন ধীরে ধীরে তাহাকে গলদ-মুক্ত করিতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম যাহাতে আবার প্রতিষ্ঠিত হয়, সে বিষয়ে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির চেষ্টা করা উচিত। বর্ত্তমান আইন পরিবর্ত্তিত না হইলে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিনিধিমূলক জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব হইবে না।

সংস্কৃত শিক্ষার প্রচার—

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া বাংলাদেশে সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারের জন্য বহুবিধ চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। সমিতি সরকারী প্রতিষ্ঠান—তাহার মারফতে সরকারী অর্থ যাহাতে উপযুক্তভাবে ব্যয়িত হয়, যাহাতে সেই অর্থ দ্বারা প্রকৃত সংস্কৃত-শিক্ষার্থীরা সাহায্যপ্রাপ্ত হয় সে জন্য তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন না। তাহা ছাড়া প্রাচ্যবাণীমন্দির নামক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান করিয়া তাহার মারফতও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারে তিনি সাহায্য করিতেছেন। গত ৩রা জানুয়ারী কলিকাতা লাট প্রাসাদে উক্ত মন্দিরের বার্ষিক সভা উপলক্ষে সংস্কৃত নাটক 'বেণী-সংহার' অভিনীত হইয়াছিল। যাহাতে মন্দিরের কার্য্য ভাল করিয়া পরিচালিত হয়, সে জন্য প্রত্যেক সংস্কৃত শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরই সহযোগিতা করা কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালার আয়তন বৃদ্ধি—

গত ১লা জানুয়ারী কুচবিহার রাজ্যকে পশ্চিম বঙ্গের অধীন করা হইয়াছে—এই ব্যবস্থায় পশ্চিম বাঙ্গালার অধিবাসী মাত্রই আনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু এখনও মণিপুর, ত্রিপুরা ও আন্দামান কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের শাসনাধীন রহিয়াছে, অবিলম্বে তাহাদেরও পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। তাহার পর বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলিকে পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত না করিলে পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীদের বাসস্থান সংগ্রহ করা অসম্ভব হইবে। বাঙ্গালাকে ভাগ করার ফলে পূর্ব্ব-পাকিস্তানেই বাঙ্গালার দুই-তৃতীয়াংশ চলিয়া গিয়াছে। এক তৃতীয়াংশ মাত্র অবশিষ্ট—অথচ পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে বহু লক্ষ হিন্দু ও মুসলমান পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে। মানভূম, সিংহভূম, সাঁওতালপরগণা, পূর্ণিয়া ও হাজারীবাগ জেলার কতকাংশতে বাঙ্গালীরাই বাস করে—ঐ অঞ্চলের অধিকাংশ লোক বঙ্গভাষাভাষী—কংগ্রেস ভাষা হিসাবে প্রদেশ গঠনের নীতি গ্রহণ করিয়াছে—কাজেই ঐ সকল স্থানকে পশ্চিম বঙ্গে অন্তর্ভুক্ত না করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। রাষ্ট্রপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া অন্ধ্রকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করার ব্যবস্থা করিয়া লইলেন—কর্ণাটকও হয়ত শীঘ্রই স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইবে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীতে বাঙ্গালার সদস্য ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং বাঙ্গালা হইতে নির্ব্বাচিত কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের সদস্যগণ—এ বিষয়ে উদ্যোগী না হইলে বর্ত্তমান পশ্চিম বঙ্গের আয়তন বৃদ্ধি করা চলিবে না। কর্ণাটকের নেতারা যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, আমরা বাঙ্গালার নেতৃবৃন্দকে তাহার অনুসরণ করিতে অনুরোধ করি। তাহা না করিলে তাঁহারা যে বাঙ্গালার প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচিত হইবেন না ইহা তাঁহাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত।

স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া—

ইন্দোনেশিয়ার আড়াই হাজার দ্বীপে ৭ কোটি লোক বাস করে। প্রায় ৩ শত বৎসর ওলন্দাজ শাসনের অধীন থাকার পর গত ২৭শে ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। গত মহাযুদ্ধের সময় যখন ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীরা জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করে, তখনই ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। তাহার পর দীর্ঘকাল আলোচনার পর ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করিল। দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়ায় ভারত ও ব্রহ্মের স্বাধীনতা লাভের পরই ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা লাভ স্মরণীয় ঘটনা। ভারত বা ব্রহ্ম যেমন অন্যের সহিত বিচ্ছিন্ন থাকিয়া স্বাধীনতা ভোগ করিতে

পারিবে না—ইন্দোনেশিয়ার পক্ষেও সেই একই কথা। সেজন্য ভারতের প্রধান মন্ত্রী সকল রাজনীতিক ব্যাপারে দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়ার সকল দেশকে একত্র করিয়া পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কাজ করিতেছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতিরক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারেও পণ্ডিত জহরলাল দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়ার সকল দেশের মিলিত চেষ্টার পক্ষপাতী। সেজন্য ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা লাভে ভারতবাসী আজ সত্যই বিশেষ আনন্দিত। বহু ভারতীয় ইন্দোনেশিয়ায় বাস করে—ঐ অঞ্চলের বহু লোক ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করে। কাজেই উভয় দেশের সমবেত চেষ্টায় সকলের উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে, এ আশা আজ সকলেই করিতেছেন। স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার উন্নতি ভারতের উন্নতির পথেই অগ্রসর হউক, সকল ভারতবাসী এই প্রার্থনা করিবেন।

পরলোকে হরিদাস গাঙ্গুলী—

হুগলী সেওড়াফুলীনিবাসী খ্যাতনামা দেশসেবক হরিদাস গাঙ্গুলী সম্প্রতি ৬০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি শুধু সুচিকিৎসক ছিলেন না, বৈদ্যবাটীতে যুবক

হরিদাস গাঙ্গুলী

সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া নানা ভাবে ঐ অঞ্চলের উন্নতি বিধান করেন এবং কিছুকাল 'বন্দনা' নামক মাসিকপত্র সম্পাদন করেন। কলিকাতার সাহিত্যিক সমাজে তিনি সুপরিচিত ছিলেন এবং 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামক একখানি মাসিক-পত্রও কিছুকাল পরিচালিত করিয়াছিলেন।

হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভমেলা—

আগামী ফাল্গুন মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে পূর্ণকুম্ভমেলা হইবে। ৩রা ফাল্গুন শিবরাত্রি, ৪ঠা চৈত্র অমাবস্যা ও ৩০শে চৈত্র মহাবিষুব সংক্রান্তি—স্নানের প্রশস্ত দিন। কনখলে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একটি স্থায়ী হাসপাতাল আছে, তথায় ৫০জন রোগীর স্থান সঙ্কুলান হয়। মেলা উপলক্ষে তথায় ১০০ রোগী রাখার ব্যবস্থা হইবে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন স্থানে তিনটি অতিরিক্ত চিকিৎসা কেন্দ্র ও একটি ভ্রাম্যমান চিকিৎসা-বিভাগ খোলা হইবে। কনখল সেবাশ্রমে প্রতিদিন এক হাজার সাধু ও তীর্থযাত্রীর আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইবে। এই কার্য্যের জন্য বহু ডাক্তার, পুরুষ-নার্স, কম্পাউণ্ডার, স্বেচ্ছাসেবক, ঔষধ-পত্র ও খাদ্যদ্রব্যাদির প্রয়োজন। সেজন্য ২৫ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। মিশন এই কার্য্যের জন্য সকলের সহযোগিতা ও সাহায্য প্রার্থনা করেন। স্বামী রঘুবরানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের সম্পাদক, তাঁহার ঠিকানা কনখল পোঃ, জেলা সাহারাণপুর, যুক্তপ্রদেশ। আমাদের বিশ্বাস মিশনের এই বিরাট কার্য্যের জন্য অর্থের অভাব হইবে না।

চিকিৎসক সম্মিলন—

গত ৪ঠা ডিসেম্বর ২৪পরগণার রাজপুর গ্রামে ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক চিকিৎসক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাহার উদ্বোধন করেন এবং সভাপতির অভিভাষণে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টকে স্বাস্থ্য বিভাগের জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করিতে বলা হয়। এদেশে পুলিস বিভাগে সাড়ে ৩ কোটি, শাসনকার্য্যে দেড় কোটি টাকা ব্যয় হইলেও স্বাস্থ্য বিভাগে মাত্র সওয়া কোটি টাকা ব্যয় হয়। এত বড় দেশে স্থায়ী হাসপাতালে ৫৬৫০টি শয্যা ও দুর্ভিক্ষকালীন হাসপাতালে ১০১৫০টি শয্যা আছে। শেষোক্ত শয্যাগুলির অবস্থাও সন্তোষজনক নহে। প্রধান মন্ত্রী নিজে চিকিৎসক—কাজেই দেশবাসী আশা করে, বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা দেশের হাসপাতালগুলির অবস্থার উন্নতি বিধানে উপযুক্ত ব্যবস্থায় মনোযোগী হইবেন।

শ্রীভূদেবচন্দ্র বসু—

ইনি সম্প্রতি পুনায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে জীব-বিদ্যা বিভাগে সভাপতি হইয়াছেন। হুগলী জেলার প্রতাপ নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া ইনি ১৯১৭ সালে সেকেন্দারপুর স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাশ করেন ও ১৯২৩ সালে জীববিদ্যায় এম-এসসি হন। ১৯৩৫ সালে ইনি কলিকাতা

ডক্টর শ্রীভূদেবচন্দ্র বসু

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এসসি হন। ১৯২৪ সালে তিনি ডাঃ বেণ্টলীর অধীনে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। কিছুকাল কলিকাতা ট্রপিকাল মেডিসিন স্কুলে কাজ করিয়া ১৯৩৯ সালে ইনি মুক্তেশ্বরে ও ১৯৪১ সালে ইজ্জত-নগরে গবেষক নিযুক্ত হন। ইঁহার অধীনে ইজ্জত নগরে 'ইণ্ডিয়ান ভেটারিনারী রিসার্চ ইনিষ্টিটিউট' দিন দিন উন্নতিলাভ করিতেছে।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চৌধুরী—

ইনি পুনায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে রসায়ন বিভাগের সভাপতি হইয়াছেন। ১৮৯২ সালে নোয়াখালি জেলার সামচরে ইঁহার জন্ম—বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ১৯১৬ হইতে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত ইনি ডিগবয়ে আসাম অয়েল কোম্পানীতে কাজ করেন। ১৯২১ সালে বার্লিনে যাইয়া ১৯২৪ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডি-ফিল' উপাধি লাভ করেন। ১৯২৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক

ডক্টর জে কে চৌধুরী

নিযুক্ত হন ও পরে রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হন। ১৯৪৭ সালে ঢাকা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বসু বিজ্ঞান মন্দিরে রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত আছেন। কয়লা, তেল, চবি, সেলুলোজ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গবেষণা করিয়া দেশকে উপকৃত করিয়াছেন।

কৃষির উন্নতি—

কৃষির উন্নতি বিধান সম্পর্কে জনৈক বিশেষজ্ঞ প্রকাশ করিয়াছেন—কৃষির উন্নতি করিতে হইলে একদিকে আধুনিক উন্নত প্রণালী অবলম্বন করিয়া জমির উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে, অন্যদিকে কৃষক ও ভূমিহীন মজুরদিগকে তাহাদের শ্রমলব্ধ সম্পদ এরূপভাবে ও এরূপ পরিমাণে দিতে হইবে যে, তাহারা যেন শিল্প মজুরদের মত একইরূপ জীবিকানির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়। কারখানার মজুররা সপ্তাহে সাড়ে ৫ দিন কাজ করে,

চাষীর তুলনায় তাহাদের পরিশ্রমও কম করিতে হয়—কাজের দায়িত্বও নাই—সেজন্য চাষীরা চাষ না করিয়া কারখানার মজুর হইতে চায়। এ ব্যবস্থার প্রতীকারের জন্য দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে চাষের কাজের ভার গ্রহণ করিতে হইবে—তবেই দেশে কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িবে। উৎপাদন না বাড়িলে দেশে খাদ্যশস্যের অভাবও কমিবে না—মূল্য হ্রাস চেষ্টাও ব্যর্থ হইবে।

ডাক্তার আর-এন-ঘোষ—

ইনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পুনা (১৯৫০) অধিবেশনে অন্যতম শাখা-সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ১৮৯২ সালে ইঁহার জন্ম হয় ও ১৯১৬ সালে এলাহাবাদ

ডাক্তার আর-এন-ঘোষ

ইউইং খৃষ্টান কলেজ হইতে গ্রাজুয়েট হইয়া মুর কলেজ হইতে এম-এসসি পাশ করেন। কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা সমিতিতে গবেষণা করিয়া ইনি ১৯৩৬ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এসসি হন। পদার্থ-বিদ্যার শব্দবিজ্ঞানে ইঁনি বহু নূতন বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন। এলাহাবাদে ডাক্তার মেঘনাদ সাহার অধীনে যে বৈজ্ঞানিক দল গড়িয়া উঠিয়াছিল, ডাক্তার ঘোষ তাঁহাদের অন্যতম।

শ্রীনলিনীমোহন বসু—

ইনি এবার পুনায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের গণিত শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ১৮৯০ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ইনি রঙ্গপুর জেলা স্কুল হইতে ১৯০৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯১৪ সালে ইনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ফলিত গণিতে এম-এসসি হন। ৫ বৎসর কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে

শ্রীনলিনীমোহন বসু

গবেষণা ও অধ্যাপনার পর ১৯২১ সালে ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন ও ১৯৪৮ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত তথায় কাজ করেন। ১৯২৩ সালে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এসসি হইয়াছেন। ১৯৪৬ সালে কিছুকালের জন্য ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন। সম্প্রতি ইনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক ও গণিত বিভাগের অধ্যক্ষ পদে কাজ করিতেছেন। ১৯২৮ হইতে ১৯৩০ পর্য্যন্ত ইনি ইউরোপে বাস করিয়াছেন ও অধিকাংশ সময় জার্ম্মাণীর গটিং জেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করিয়াছেন।

পশ্চিম বঙ্গের দুরবস্থা—

গত ১লা জানুয়ারী নাগপুরে লাটপ্রসাদে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন—

"দেশ বিভাগের ফলে ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় হত্যাকাণ্ডের দিক হইতে পাঞ্জাবের ক্ষতি বেশী হইয়াছে। কিন্তু অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চিম বঙ্গই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। দেশ বিভাগের পূর্বেও পশ্চিম বঙ্গের জন সংখ্যা খুব বেশী ছিল—এখন উহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পশ্চিম বঙ্গে নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক সংখ্যা বেশী। দেশের বর্ত্তমান অর্থ-নৈতিক অবস্থায় এই শ্রেণীই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কষ্টভোগ করিতেছে। ব্যাপক বেকার সমস্যা, জিনিষ পত্রের অভাব ও অন্যান্য কারণেই পশ্চিম বঙ্গে এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।" পণ্ডিতজীর এই উক্তিতে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন। পণ্ডিতজী যে আমাদের দুরবস্থার কথা ভাবিয়াছেন, ইহাই আনন্দের বিষয়। কিন্তু ইহার প্রতীকারের জন্য পণ্ডিতজীর মন্ত্রি-সভা কি কোন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন? তাহা না করিলে পশ্চিম বঙ্গের এই দুরবস্থা দূর হইবে না। আশা করি, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভা সে বিষয়ে তাঁহাকে কর্ত্তব্য পালনের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পশ্চিম বাঙ্গালাকে তাহার বর্ত্তমান সঙ্কট হইতে রক্ষার ব্যবস্থা না করিলে পশ্চিম বঙ্গ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া শ্মশানে পরিণত হইবে।

বঙ্গভাষাভাষীদের কথা—

পশ্চিম বাঙ্গালার বাহিরে যে সকল বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল আছে, সে স্থানগুলিকে পশ্চিম বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করিয়া সে সকল স্থানের অধিবাসীদের সংস্কৃতি রক্ষার জন্য কলিকাতা ৬২ বৌবাজার ষ্ট্রীটস্থ ভারত সভা হইতে উহার সভাপতি অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তিকাখানি পাঠ করিলে মানভূম, ধলভূম, সাঁওতাল পরগণা, পূর্ণিয়া প্রভৃতির অংশগুলির বাঙ্গালায় অন্তর্ভুক্তির কারণ বুঝা যায়। স্বতন্ত্র বাংলা প্রদেশ গঠনের পূর্ব্বে ১৯১২ সালের ২৩শে জানুয়ারী রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে এক আবেদন প্রকাশ করিয়াছিলেন—তদবধি এ বিষয়ে বহু আন্দোলন হইয়াছে—কিন্তু বাঙ্গালার বাহিরের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলি বাঙ্গালাকে ফিরাইয়া দেওয়ার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। ১৯১২ সালের ৭ই এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে এ বিষয়ে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ১৯১৭ সালে ভারতসচিবরূপে মিঃ মণ্টেগু এদেশে আসিলে তাঁহাকে ও তৎকালীন বড়লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ডকে বিষয়টি জানান হইয়াছিল। ১৯২৮ সালে নেহরু কমিটী রিপোর্টেও ভাষা হিসাবে প্রদেশ গঠনের দাবী স্বীকৃত হইয়াছে। সাইমন কমিশন রিপোর্টও এ দাবী সমর্থন করিয়াছে। ১৯৪৬ সালের ৮ই ডিসেম্বর দিল্লীতে এক সর্বভারতীয় সম্মিলনে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন করার কথাই বলা হয়। কিন্তু বঙ্গভাষাভাষী এই অঞ্চলগুলি এখনও বাঙ্গালাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল না। এজন্য বাঙ্গালী কি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবে না কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইবে?

পরলোকে প্রফুল্লকুমারী হালদার—

ব্রহ্মপ্রবাসী খ্যাতনামা বাঙ্গালী এড্‌ভোকেট শ্রীবসন্ত কুমার হালদারের সহধর্ম্মিণী প্রফুল্লকুমারী দেবী গত ৩রা

প্রফুল্লকুমারী হালদার

ডিসেম্বর রাত্রিতে দুরন্তকর্কটরোগে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। চিকিৎসার জন্য বিমানে তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হইয়াছিল। বসন্তবাবু তাঁহার পত্নীর স্মৃতি রক্ষার্থ যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে একটি বেডের জন্য ৭৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা বসন্তবাবুর ও তাঁহার আত্মীয়স্বজনকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ছয়

রেশমের কুঠিয়াল ক্রু সাহেবের কুঠি এখনো আছে, রেশম নেই।

রেশম নেই, রেশমী সাহেবীয়ানাও নেই। মোটা জিনের আধ-ময়লা স্যুট—গলার টাইটা পর্যন্ত জরাজীর্ণ হয়ে এসেছে। একটা নতুন টাই কেনবার মতো অর্থ সঙ্গতি এখনো ঘটে ওঠেনি ক্রু-সাহেবের। মার্থার যে রঙীণ স্কার্টটা সংপ্রতি পেন্‌শন পেয়েছে, তার থেকে একটা ফালি কেটে নিয়ে আত্ম-সম্মান বাঁচানো যায় কিনা সেই চিন্তাতেই মগ্ন ছিল ক্রু-সাহেব।

সামনে একটা ঠ্যাং-ভাঙা টেবিলে ঠাণ্ডা হচ্ছে ছোটা হাজ্‌রী। একটা মুরগীর ডিম, দু টুক্‌রো মার্থার হোম্‌-মেড্‌ নোন্‌তা স্কচ-ব্রেড, দুটি সুপুষ্ট কলা—তাতে দু চারটি আঁঠি থাকা অসম্ভব নয়। আর আছে এক কাপ গৌড়ীয় চা, তার বর্ণ কৃষ্ণাভ। সংপ্রতি চিনি পাওয়া যাচ্ছে না বাজারে, অতএব আখের গুড়েই চায়ের মিষ্টতা সাধন করতে হচ্ছে।

মার্থার ঝাড়নের শব্দে ক্রু সাহেবের ধ্যানভঙ্গ হল।

পরিস্কার বাংলা ভাষায় মার্থা বললে, চা খাচ্ছ না যে?

করুণ চোখে কালো চায়ের দিকে তাকিয়ে দেখল ক্রু সাহেব। তারপর বিনীত কণ্ঠে বললে, বড্ড গন্ধ লাগছে। একটু চিনি হয় না মার্থা?

মার্থা ভ্রূভঙ্গি করে বললে, আমার চিনির দোকান আছে, না কল আছে?

—না, না, তা বলছি না। মানে, যদি কোথাও একটু থাকে টাকে—

—নিজে খাবার জন্যে লুকিয়ে রেখেচি কেমন?—খাঁটি বঙ্গনারীর মতো একটা মুখ ঝাম্‌টা মারল মার্থা: আজ তিন হপ্তা ধরে কত চিনি এনে দিয়েছ—মণ খানেক ঘরে জমা করে রেখেছি।

এতক্ষণে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল ক্রু-সাহেবের।

—দ্যাখো মার্থা ক্যারু, তোমার ভয়ঙ্কর মুখ হয়েছে আজকাল। তুমি ভুলে যাচ্ছ—

কথাটা শেষ হল না। তার আগেই মার্থা ঘরের ভেতরে অদৃশ্য হয়েছে।

মার্থা ক্যারু। হ্যাঁ ক্রু-সাহেবের আদত নাম ক্যারুই বটে। এ অঞ্চলের লোক গোড়ার দিকে স্বরভক্তি ঘটিয়ে উচ্চারণ করত কুরু। তারপরে হয়তো কোনো ইংরিজি-শিক্ষিত ব্যক্তি ভুলটা শুধরে দিয়ে বলেছে, নামটা কুরু হতে পারে না—হবে ক্রু; হয়তো ট্রেণের কোনো ক্রু-সাহেব তার মনশ্চক্ষের সামনে ভেসে উঠে থাকবে। সেই থেকেই ক্যারু সাহেব ক্রুতে রূপান্তরিত হয়েছে।

মার্থার রং-জ্বলে যাওয়া ফিকে গোলাপী গাউনটা যে-দিকে অদৃশ্য হয়েছে, অনেকক্ষণ ধরে সেদিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর একটা বিড়ির সন্ধানে পেন্টুলুনের পকেটে হাত ঢোকাতে আর একটা নতুন ভয়াবহ সত্যের সন্ধান মিলল। পকেটের নীচেকার সেলাই খুলে গিয়ে কখন একটি বাতায়ন রচিত হয়েছে, আর তার অবারিত পথে বিড়িগুলো কোনো মুক্ত দিগন্তের দিকে ডানা মেলেছে।

অগত্যা প্রচণ্ড একটা ক্রুর মুখভঙ্গি করে ক্রু ওরফে ক্যারু গুড়ের চায়ে একটা চুমুক দিল। একখানা রুটি তুলে নিয়ে একগ্রাসে গিলল সেটাকে। তারপর আধখানা কলায় কামড় দিয়ে তার আঁটিগুলোকে জিভের আগায় সংগ্রহ করতে করতে নিজের মধ্যে তন্ময় হয়ে গেল।

নীল সমুদ্রের সফেন ঢেউয়ের পর ঢেউ পেরিয়ে টেম্‌স নদীর মোহানা। দূরে ছবির মতো আঁকা টাওয়ার অব্‌ লণ্ডন। গোল্ডার্স গ্রাণ-এ ঝকঝকে তকতকে একখানা বিশাল বাড়ি: ক্যারুজ। ইণ্ডিয়ান সিল্‌কস্‌ অ্যাণ্ড ফেবরিক্‌স্‌।

কিন্তু ঢেঁকি কি কখনো স্বর্গে যায়? রাশি রাশি শুকনো পাতা, মরা পলু পোকা আর ভাঙা তাঁতের সঙ্গে করে ভারতবর্ষের নরম মাটির স্মৃতি মন থেকে মুছে গেছে

পার্সিভ্যাল্ ক্যারুর। এতদিনে বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে। আর যদি বেঁচেও থাকে—সেখানকার সংসারে, সেখানকার সমাজের পরিবেশে স্মাইদ্ ক্যার—অর্থাৎ ক্রু সাহেবের স্থান কোথায় ?

—রাস্কেল্! ওল্ড্ ফুল!

স্বল্পার্জিত ইংরেজি বিদ্যা নিয়ে বাপের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করল ক্রু-সাহেব।

রেশমের কুঠি করেছিল পার্সিভ্যাল—কয়েক বছর টাকাও কামিয়েছিল দু হাতে। সেই প্রথম যৌবনে এবং অপরিসীম প্রাচুর্যের ভেতরে তার চোখে রঙ্ ধরিয়েছিল উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি চাষার মেয়ে। জন্ম হল স্মাইদ্ ক্যারুর। মায়ের রঙ্ আর বাপের রক্ত নিয়ে। কিন্তু রক্তের প্রতি আকর্ষণের চাইতে রঙের প্রতি বিকর্ষণটাই পার্সিভ্যালের ছিল বেশি। তাই ব্যবসা তুলে দিয়ে এদেশ থেকে যখন চাটিবাটি তুলল, তখন স্মাইদ্‌কে ফেলে গেল রেশমহীন এই রেশমের কুঠিতে। মা-টা আগেই মরেছিল তাই রক্ষা।

স্মাইদের বয়েস তখন আঠারো বছর। কেঁদে বলেছিল, বাবা, আমার কী হবে ?

অসীম বিরক্তিতে ভ্রুকুটি করেছিল পার্সিভ্যাল।

—কী আবার হবে ? বড় হয়েছ, নিজের ভাগ্য নিজে তৈরী করে নাও। ইংল্যাণ্ডে তোমার মতো ধাড়ী ছেলেকে বসিয়ে খাওয়ানো হয়না—বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

—কিন্তু—

—কিন্তু আবার কী ?—বিরক্তির ভ্রুকুটিটা আরো বেশি প্রকট হয়ে উঠেছিল পার্সিভ্যালের মুখে : তোমাকে তো আমি দস্তুরমতো প্রপার্টি দিয়ে গেলাম। এই বাড়ি রইল, জমি-জমাও কিছু করে রেখেছি। নাউ ট্রাই ইয়োর লাক।

—আমাকে কি কখনো তোমার কাছে নিয়ে যাবেনা ? আমাকে দেখাবেনা আমাদের নেটিভ্ হোম—ইংল্যাণ্ড ?

—নেটিভ্ হোম—ইংল্যাণ্ড—একটা তির্যক হাসির রেখা প্রকটিত হয়েছিল পার্সিভ্যালের ঠোঁটের কোণায় : আচ্ছা হবে, হবে। কিছুদিন পরে তোমায় আমি প্যাসেজ পাঠাবো, স্ট্রেট্ চলেই যেয়ো। নাউ গুড্‌বাই মাই বয়—চিয়ার আপ্।

সান্ত্বনার মতো শেষবার ছেলের পিঠ চাপড়ে দিয়ে পার্সিভ্যাল্ পাল্‌কীতে গিয়ে উঠল। যতক্ষণ না পথের বাঁকে পাল্‌কীটা অদৃশ্য হল, ততক্ষণ দেখা গেল সে রুমাল নেড়ে নেড়ে ছেলেকে বিদায়-সম্বর্ধনা জানাচ্ছে।...জীর্ণ চেয়ারটার ওপর নড়ে-চড়ে বসল ক্রু-সাহেব। ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করে একটা শব্দ উঠল। তারপরে আজ একটু একটু করে কুড়িটা বছর পার হয়ে গেছে। পাল্‌কী চলে যাওয়া ওই ধুলোভরা পথটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেটেছে দিনের পর দিন, পেরিয়ে গেছে রাতের পর রাত। যে বটগাছটার তলায় পার্সিভ্যালের আরবী ঘোড়া দুটো বাঁধা থাকত, সেটা উপড়ে পড়ে গেছে ঝড়ে ; যে টিনের চালার তলায় চাষারা পলুর দাম নেবার জন্যে এসে দরবার করত, সেখানে এখন অজগর জঙ্গল।

সে প্যাসেজ আজো আসেনি। শুধু বহুদূর লণ্ডনের কোন্ এক গোল্ডাস গ্রীণে কী এক ক্যারু কোম্পানির মায়াস্বপ্ন দেখতে দেখতে আজো প্রতীক্ষা করে স্মাইথ্ ক্যারু। আশা নেই, অভ্যাস রয়ে গেছে। আজো কখনো কখনো ঘুমের মধ্যে মনে হয় পিয়ন এসে দরজার কড়া নাড়ছে : চিঠি হ্যায়—চিঠি।

কিসের ?

ইংল্যাণ্ডের ডাক-টিকিট মারা লম্বা একখানা খাম। খুলতেই একটুকরো চিঠি : মাই সান, পত্রপাঠ চলে এসো। ডাকে দুশো পাউণ্ড্ পাঠালাম। আমার সমস্ত সম্পত্তির তুমিই উত্তরাধিকারী, এখানে এসে ক্যারু কোম্পানির সব ভার আজ থেকে তোমাকেই নিতে হবে।

সে চিঠি এখনো আসেনি। কিন্তু কাল তো আসতে পারে ? কিংবা পরশু ? কিংবা তারও পরের দিন ? কে জানে,কিছুই বলা যায়না। পার্সিভ্যাল্ ক্যারুর বুকের ভেতর বিবেক কখনো মাথা চাড়া দিয়ে উঠবেনা এও কি সম্ভব ?

না কিছুই বলা যায়না। মরা একটা মেটে সাপের মতো লালমাটির ওই বিসর্পিল রাস্তাটা নিরুত্তর হয়ে আছে কুড়ি বছর ধরে। উত্তরের ওই রক্তাভ তারাটি কুড়ি বছর ধরে সকৌতুকে যেন একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে যায়। অন্ধকার ছায়া জমে জমে ওঠা কুঠি-বাড়ির কোনো রিক্ত কক্ষ থেকে তীক্ষ্ণ আকুতির স্বর মাঝে মাঝে ভেসে আসে—ভাঙা জানালায় বাতাসের ব্যঙ্গ।

লালমাটির তপ্ত বাতাসে তপ্ত কামনার কয়েকটা দিন। বাল্যে মায়ের কালো ছেলে, সাদা বাপ পথের ধুলোয় সে-দিনগুলোকে ঝেড়ে দিয়ে চলে গেছে। গোল্ডার্স গ্রীণ? আকাশের ছায়াপথের সঙ্গে তার পার্থক্য নেই কোথাও।

—চিঠি আছে সাহেব।

ক্রু-সাহেব চমকে উঠল। হিজলবনী পোষ্ট অফিসের পিয়ন রতন ভুঁইমালী। একখানা খাম দিয়ে সেলাম জানিয়ে চলে গেল। সাহেবের ওপর ভক্তি-শ্রদ্ধা আজো রয়েছে লোকগুলোর।

একখানা খাম। পুরোণো অভ্যাসেই ডাক-টিকেটের দিকে প্রথমে তাকালো ক্রু-সাহেব। না, ইংল্যাণ্ড নয়। ইণ্ডিয়া পোস্টেজ্। কলকাতার মোহর-মারা।

কিন্তু খামখানা খুলেই চক্ষুঃস্থির।

ডিয়ার ক্যাক্রু,

গত বছর ক্রিস্‌মাসের ছুটিতে তোমার সঙ্গে যে পরিচয় হয়েছিল আশা করি, এর মধ্যেই তুমি তা ভুলে যাওনি। তোমার সাহচর্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তা ছাড়া তোমার নেমন্তন্নও আমি ভুলিনি—শিকারের অতবড় প্রলোভন ছেড়ে দেওয়া শক্ত। বহুদিন থেকেই আসবার কথা ভাবছি, কিন্তু কাজের চাপে সময় পাইনি। এইবারে অফিস থেকে দু সপ্তাহের ছুটি মিলেছে। শুনে সুখী হবে ১৫ তারিখ বিকেলে এখান থেকে রওনা হয়ে ১৬ তারিখ ভোরের ট্রেনে তোমাদের স্টেশনে পৌঁছুব। আশা করি, তোমার কার'খানা স্টেশনে পাঠিয়ে দেবে। আর তুমি যদি নিজে উপস্থিত থাকতে পারো, তা হলে আরো ভালো হয়। ভালোবাসা নিয়ো ও মিসেস্ ক্যাক্রুকে জানিয়ো। ইতি

অ্যালবার্ট'

শুনে সুখী হবে! ক্রু-সাহেব পুরো পাঁচমিনিট বজ্রাহত হয়ে রইল। তারও পরে মনে পড়ল আগামী কাল ১৬ই তারিখ এবং কাল সকালেই বোয়ালমারী স্টেশনে বন্দুক কাঁধে অ্যাল্‌বার্টের আবির্ভাব ঘটবে। অসাড় শরীরটা আরো অসাড় হয়ে গেল। ছোটা হাজরীর যে আধখানা রুটি অনেকক্ষণ থেকে হাতের মধ্যে ধরা ছিল, সেটা হঠাৎ টুপ্ করে গলে পড়ল বুকপকেটের ভেতরে, ক্রু-সাহেব টেরও পেলনা ঘটনাটা।

এমন বিপদেও মানুষ পড়ে!

অপরাধের মধ্যে গত ক্রিস্‌মাসে কলকাতা বেড়াতে গিয়েছিল ক্রু সাহেব। একটা রেস্তোরাঁয় অ্যাল্‌বার্টের সঙ্গে আলাপ। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের স্মার্ট ছেলে, দিল-দরিয়া মেজাজ। পেট ভরে ডিনারটা সেই খাওয়ালো।

একটা পেগ্ পেটে পড়তেই প্রাকৃতিক নিয়মে অন্তরঙ্গতাটা এক ধাক্কায় আকাশে গিয়ে উঠল।

একটা বড় বিলিতি ফার্মে চাকরী করে অ্যালবার্ট। শ' চারেক টাকা মাইনে পায়। ব্যাচিলার মানুষ, স্যুটে নাচে, হকি-গলফ্ বেস্‌বল খেলে। প্রজাপতি জীবন কাটিয়ে বেড়ায়। নিজেই বিস্তৃত আত্ম-পরিচয় দিয়ে দিয়ে জানতে চাইল, তুমি?

এক্ষেত্রে নিজের মর্যাদা রাখতেই হয়। দুটো ঢোঁক গিলে ক্রু-সাহেব বলেছিল, প্ল্যাণ্টার।

—প্ল্যাণ্টার? তা হলে তো তুমি রীতিমতো বড়লোক। কিসের প্ল্যাণ্টার? টী?

—সিল্ক। বেঙ্গল সিল্ক।

—ওঃ—সিল্ক!—অ্যাল্‌বার্টের স্বর সশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল: খুব বড় ফার্ম বুঝি?

—তা একরকম মন্দ নয়।—বিনয় করে কথাটা বলতে গিয়েও আরো দুটো ঢোঁক গিলতে হয়েছিল ক্রু-সাহেবকে।

—ইট্ ইজ্ এ লাক্ দ্যাট আই মীট সো বিগ্ এ প্ল্যাণ্টার!—একটা সিগারেট 'অফার' করে জানতে চেয়েছিল অ্যাল্‌বার্ট: কোথায় তোমার ফার্ম?

মিথ্যা দিয়ে যাত্রা শুরু করলে আর ফিরে দাঁড়ানো কঠিন। তা ছাড়া মিথ্যের আর একটা সুবিধে এই যে সত্যের ভ্রূকুটি কোথাও থাকেনা বলে অবলীলাক্রমে যতদূরে খুসি চলে যাওয়া যায়—যত ইচ্ছে রঙের ওপর রঙের সোনালি বার্ণিশ চাপিয়ে দেওয়া চলে। হাওয়াতেই যদি প্রাসাদ গড়তে হয়, তা হলে একেবারে তাজমহল গড়াই ভালো; কারুকার্যে খচিত করে, হীরে জহরতের জেল্লা দিয়ে।

সুতরাং নিজের ফার্মের একটা মায়াময় বর্ণনা দিয়েছিল ক্রু-সাহেব।

যতদূরে চাও গ্রীণ আর গ্রীণ। মাঝে মাঝে আখরোটের বন। (এত জিনিস থাকতে হঠাৎ আখরোটের বন কেন

মনে এসেছিল সে কথা আজো বলতে পারেনা ক্রু-সাহেব।) এখানে ওখানে পাম্ গাছ—(দেশী তালগাছ আর বিলিতি পামের পার্থক্যটা খুব স্পষ্ট ছিলনা নিজের কাছে) আর ছোট ছোট ক্রকুলেট—কী চমৎকার টলটলে তার নীল জল। তাতে কার্প আর রুইমাছ কিলবিল করছে। (অবশ্য ক্রকুলেট বলতে মনে এসেছিল কাদাভরা কাঁদড়ের কথা, তার ভেতরে রাশি রাশি ব্যাং আর চ্যাংয়ের পোনা।) সেই মনোরম পরিবেশের মধ্যে তার ফার্ম। লাল ইঁটের বাড়িটি—আঃ—ইট ইজ এ ড্রিম!

শুনে অ্যাল্‌বার্টের চোখ জ্বল জ্বল করে উঠেছিল।

—তোমার কার আছে?

—অবশ্য।

—হাউ লাভ্‌লি!—খানিকক্ষণ চোখ বুজে ক্রু সাহেবের স্বর্গীয় জগৎটাকে ধ্যান করেছিল অ্যালবার্ট: ইট্ ইজ্ এ পিক্‌চার!

—যা বলেছ!—অ্যাল্‌বার্টের দেওয়া সিগারেটটার ধূমপান করতে করতে ক্রু সাহেব আরো বলেছিল: রোজ ভোরে উঠে দেখবে দিগন্তে হিমালয়ান রেঞ্জের নীল রেখা। আর সূর্য ওঠবার আগেই সেদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বুনো হাঁস তোমার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে যাবে।

এতখানি বর্ণনার মধ্যে এইটুকুতেই যা কিছু সত্য লুকোনো আছে। হিমালয়ান রেঞ্জ নয়, রাজমহলের পাহাড়। কিন্তু বুনো হাঁসের ঝাঁক সত্যিই আসে, বিশেষ করে শীতের আমেজ লাগলে ভোরের আকাশ তাদের কণ্ঠকূজন আর পাখার শব্দে প্রায়ই মুখর হয়ে থাকে।

—বুনো হাঁস!—অ্যাল্‌বার্ট প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল: মানে গেম্ বার্ড?

—তাই।

—প্রচুর পাওয়া যায়?

—সারা বাংলা দেশে গেম্ বার্ডের এমন জায়গা আর নেই। আমার এরিয়ার মধ্যেই তো দু তিনটে বড় বড় বিল রয়েছে।

—তা হলে তো শিকার করতে যাওয়া যায় তোমার ওখানে।

—এনিটাইম। খুবখুসিহবোতুমি এলে। অবশ্য শীতকালে এলেই ভালো হয়—সেইটাই বুনো হাঁসের সীজ্‌ন কিনা।

—আর বোলো না, আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে—অ্যাল্‌বার্ট থামিয়ে দিয়েছিল লোভ জাগানো বর্ণনাটা। তারপর পকেট থেকে নোট বই বের করে বলেছিল, তোমার ঠিকানা?

এইখানে আবার তিনটে ঢোঁক গিলে নিতে হয়েছিল ক্রু সাহেবকে। এর পর ইচ্ছে হয়েছিল রাশীকৃত মিথ্যার সঙ্গে মিথ্যে পরিচয়টাও দিয়ে বসে। কিন্তু এ সম্পর্কে মনঃস্থির করবার আগেই অসীম বিস্ময়ে দেখতে পেল, নিজের অজ্ঞাতেই কখন সে সত্যিকারের নাম-ধাম-ঠিকানা দিয়ে বসেছে।

—সুযোগ পেলেই তোমার আমন্ত্রণ রক্ষা করব আমি—ঠিকানা লেখা শেষ করে চোখ তুলে জানিয়েছিল অ্যালবার্ট।

ধবক্ করে কয়েক মুহূর্তের জন্যে থেমে গিয়েছিল হৃৎপিণ্ডটা। পরক্ষণেই আচমকা ধাক্কা খাওয়া একটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো অত্যন্ত দ্রুতবেগে দোলা খেয়েছিল বারকয়েক। শুকনো ঠোঁট দুটো চেটে নিয়ে বলেছিল, আন্তরিক সুখী হবো।

—থ্যাঙ্ক ইউ।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ অনুতাপ আর অস্বস্তির সীমা রইলনা যেন। তারপর গড়ের মাঠের খোলা হাওয়ায় চলতে চলতে ক্রমশ মাথাটা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল—অস্বস্তিকর মানসিকতার ওপরে সান্ত্বনার লঘু প্রলেপ পড়তে লাগল একটা। মনে হয়েছিল, মদের নেশার এই মুহূর্তগুলো কতদিন বেঁচে থাকবে অ্যাল্‌বার্টের স্মৃতির ওপরে? দুদিন পরেই ক্রমশ তা নিষ্প্রভ হয়ে আসবে, তারপরেই একটু একটু করে নিঃসীম বিস্মৃতির গভীরে যাবে হারিয়ে। সান্ত্বনাটা মনের মধ্যে ক্রমশ থিতিয়ে বসতে লাগল, তারপর এক সময়ে নিশ্চিত ভরসায় দানা বেঁধে গেল।

কিন্তু এক বছর পরে এমন করে যে পালে বাঘ পড়বে তা কে জানত? কে জানত, নেশা করলেও অ্যাল্‌বার্টের স্মৃতি সজাগ ও প্রখর থাকে, একটা ড্রিমল্যাণ্ডের আকর্ষণ এতদিন পরেও তাকে এমনভাবে হাতছানি দেয়?

এখন উপায়?

এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া চলে; আত্মহত্যা করা

চলে ; আর নয়তো ষ্টেশন থেকে নিয়ে আসবার সময় কাঁচা মাঠের কোনো নির্জন জায়গায় অ্যাল্‌বার্টকে খুন করা চলে।

কিন্তু কোনোটাই সম্ভব নয়।

হেমন্তের এই স্নিগ্ধ-সকালেও ক্রু সাহেবের জামার মধ্যে ঘাম গড়াতে লাগল। দিনের বেলাতেও দুটো কানে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক বাজতে লাগল ঝিম্ ঝিম্ করে। কাল ষোলোই তারিখ। কাল সকালেই অ্যাল্‌বার্ট এসে দর্শন দেবে বোয়ালমারী ষ্টেশনে। ষ্টেশনে না গিয়েও তাকে এড়ানোর উপায় নেই—রেশমের কুঠি বললেই এ অঞ্চলের যে কোনো লোক তাকে পথের হদিশ বাত্‌লে দেবে।

মার্থা বারান্দায় এল।

—মাথায় হাত দিয়ে ভাবছ কী এত? ওটা কার চিঠি?

ছোঁ মেরে চিঠি তুলে নেবার আর্টটা মেয়েদের মজ্জাগত এবং সেটা এত ক্ষিপ্রবেগে যে সাম্‌লে নেবার সময় পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ক্রু সাহেবও পেলনা।

চিঠিটার ওপর চোখ বুলিয়ে মার্থা ক্রু সাহেবের দিকে তাকালো। টানা টানা ভ্রূ দুটি প্রসারিত হয়ে গেছে সীমাহীন বিস্ময়ে।

—এ আবার কী ব্যাপার। অ্যাল্‌বার্ট কে?

—ও—ও আমার এক বন্ধুর চিঠি—কান্না চাপবার একটা প্রাণান্তিক প্রয়াস করে জবাব দিলে ক্রু সাহেব।

—বন্ধু।

—হ্যাঁ, কলকাতায় গিয়ে আলাপ হয়েছিল।

—কিন্তু—মার্থা আবার চিঠিটার ওপর দৃষ্টি ফেলল : ষ্টেশনে 'কার' পাঠাবার কথা লিখেছে। জ্বালা ভরা গলায় জানতে চাইল : কোন্ 'কার'টা পাঠাচ্ছ? বড়খানা, ছোটটা, না মাঝারিটা?

—ওটা—মানে, ওটা ও ভুল বুঝেছে—ক্রু সাহেব যেন বাতাসের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল : ভেবেছে আমার কার আছে।

—আর শিকারের নিমন্ত্রণটা?—মার্থার চোখে ইঁদুর ধরা বেড়ালের মতো খর শ্যেন দৃষ্টি।

—ওটা, বুঝলে না, ওটা—এই কথায় কথায় বলেছিলাম। মানে, আমি ঠিক ওকে নিমন্ত্রণ করিনি—

—করোনি—না?—ইঁদুর-ধরা দৃষ্টিটাকে আরো শাণিত করে মার্থা বললে, ওটাও তোমার বন্ধু ভেবে নিয়েছে, কেমন?

মুখের ঘাম মোছবার জন্যে রুমালের সন্ধানে বুক-পকেটে হাত দিয়ে ক্রু সাহেব রুমাল পেল না, পেল সেই কলাটা। সেটাকে হাতে তুলে নিয়ে বিহ্বলভাবে সেদিকেই তাকিয়ে রইল।

আশ্চর্য শান্ত-গলায় মার্থা বললে, কাল সকালেই তো এসে পড়ছে। তারপর তাকে নিয়ে বুঝি জমিদারের জলায় হাঁস মারতে যাবে? ভালোই হবে—তুমি আর তোমার বন্ধু অ্যাল্‌ব্যার্ট—দুজনকেই ধরে নিয়ে গিয়ে চাবুক হাঁকরাবে জমিদারের লোক। প্যাসিভ্যালের দিন আর নেই—সাহেব বলে তোমায় রেয়াত করবে এমন আশাও কোরো না।

—সে আমি কুমার ভৈরবনারায়ণের কাছ থেকে অনুমতি নিতে পারব—ক্রু সাহেব অস্ফুট কণ্ঠে জবাব দিলে।

—তা না হয় হল। কিন্তু তোমার এই বন্ধুটির দায়িত্ব নেবে কে, শুনি? গুড়ের চা, আর বিচে-কলা দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করতে হবে নাকি?

আর্ত অসহায় দৃষ্টিতে মার্থার দিকে তাকালো ক্রু সাহেব—যেন করুণা ভিক্ষা করল। তারপর বললে, যা হোক একটা উপায় করতেই হবে মার্থা। মস্ত মানী লোক—খাঁটি লর্ড বংশের ছেলে।

—লর্ড বংশের ছেলে!—মার্থার দু'চোখে রাশি রাশি জ্বালা ফুটে বেরুল : তোমার বন্ধু-বান্ধব তো লর্ড আর ব্যারণ বংশেরই হবে! গোল্ডার্স গ্রীণে তোমাদের কতবড় কারবার, কত বড় বনিয়াদী ব্যবসা : ক্যারুজ্! তুমিও তো লক্ষপতি লোক। শুধু গুড় দিয়ে চা খেতে হয়—এই যা দুঃখ!

একটা বীভৎস মুখভঙ্গি করে মার্থা বিদায় নিয়ে গেল। আর দাঁড়ালোনা।

ঠাট্টা করল—অপমান করে গেল! করবে বই কি—সে অস্ত্র নিজেই যে ওর হাতে তুলে দিয়েছে ক্রু সাহেব। শহরের এক নেটিভ্ ক্রিশ্চানের মেয়ে মার্থা। প্রেম করবার সময় অনেকগুলো কথাই বাড়িয়ে আর বানিয়ে বলতে হয়েছিল ক্রু সাহেবকে—দেয়ার ইজ্ নো ল—! বলেছিল, শুধু দিনকয়েকের জন্যে এখানকার কুঠিটা তাকে দেখা-শোনা করতে হচ্ছে; দিনকতক বাদেই বাপ লণ্ডন থেকে তার প্যাসেজ্ পাঠিয়ে দেবে। তখন এখানকার সব কিছু বিক্রী-বাটা করে দিয়ে সে আর মার্থা গিয়ে জাহাজে উঠবে—তারপরে হোম্—সুইট্ হোম্! হ্যাপি ইংল্যাণ্ড্!

কিন্তু কুড়ি বছর অপেক্ষা করেও যে প্যাসেজ্ আজও পায়নি ক্রু সাহেব, মাত্র দশ বছরেই তা কোথা থেকে পাবে মার্থা? ক্রু সাহেবের তবু আশা করবার অভ্যাস যায়নি, কিন্তু রূঢ় স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে মার্থার। কখনো কখনো সন্দেহ হয় মার্থা বুঝি তাকে ঘৃণা করে!

আপাতত ও সব ভেবে আর লাভ নেই। মার্থার সমস্যাটা এই মুহূর্তে এত জরুরি নয়। এখন প্রায় শিয়ে সংক্রান্তি—অ্যালবার্ট আসবে। সর্বাগ্রে এক্ষুণি একবার কুমার ভৈরবনারায়ণের ওখানে যাওয়া দরকার। (ক্রমশঃ)

খেলাধূলা

সম্পাদনা শ্রীক্ষেত্রনাথকুমার চট্টোপাধ্যায়

কমনওয়েলথ দল ও ভারতীয় ক্রিকেট

ভারত সফরকারী কমনওয়েলথ্ ক্রিকেট দল তিনটি বেসরকারী টেষ্টম্যাচ সমেত এগারটি খেলা শেষ করেছে। এই খেলাগুলির মধ্যে ছয়টিতে কমনওয়েলথ দল জিতেছে, চারটি খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে এবং বাকি খেলায় তারা হেরেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে দিল্লীতে প্রথম টেষ্টেই তারা ভারতীয় দলকে শোচনীয়-ভাবে নয় উইকেটে পরাজিত করে এবং দ্বিতীয় টেষ্টেও ভারতীয় দলকে ফলো-অন্ করতে বাধ্য করে, যদিও ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসে ভাল খেলে খেলাটির পরিণাম অমীমাংসিত রেখে নিজেদের সম্মান বাঁচিয়েছেন। তৃতীয় টেষ্ট খেলা অনুষ্ঠিত হয় কলিকাতার ইডেন উদ্যানে এবং এইবার দীর্ঘ তিন বৎসর পরে বিজয়লক্ষ্মী ভারতীয় দলের গলায় বরমাল্য দিলেন। কমনওয়েলথ্ দল পরাজিত হলো সাত উইকেটে। ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারত সফরকারী অষ্ট্রেলিয়ান সারভিসেস্ ক্রিকেট দলের বিপক্ষে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বেসরকারী টেষ্ট খেলায় ভারতবর্ষ বিজয় মার্চেন্টের নেতৃত্বে শেষ জয়লাভ করেছিল। তারপর এই সুদীর্ঘ তিন বৎসরে ভারতীয় দল ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতে ১৭টি টেষ্ট ম্যাচ খেলেছে কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী কোনবারেই ভারতের প্রতি প্রসন্না হননি। ভাগ্যলক্ষ্মীও তাঁর কৃপাদৃষ্টি থেকে ভারতীয়দলকে বঞ্চিত করে এসেছেন বহুদিন ধরে। ভারতীয় দলের অধিনায়কের টসে পরাজয় যেন একটি ট্রেডিসন্ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কমনওয়েলথ দলের বিপক্ষে তৃতীয় টেষ্টের অধিনায়ক বিজয় হাজারে টসে জয়লাভ করে দুর্ভাগ্যের এই অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খল ছিন্ন করে ভারতের বিজয় লাভের পথ প্রশস্ত করে দেন। কলিকাতায় এই নিয়ে ভারতীয় দল দ্বিতীয় বার জয়লাভ করলো। এর আগে কলিকাতার এই ঐতিহাসিক ইডেন উদ্যানে ভারতীয় দল ১৯৩৭-৩৮ সালে লর্ড টেনিসনের দলের বিরুদ্ধে তৃতীয় বেসরকারী টেষ্ট ম্যাচে বিজয় মার্চেন্টের নেতৃত্বে ৯৩ রাণে জয়লাভ করেছিল। গত বৎসর ওয়েষ্টইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে বোম্বায়ে

তৃতীয় টেষ্টের বীর
বিজয়ী অধিনায়ক **বিজয় হাজারে**

অনুষ্ঠিত পঞ্চম ও শেষ সরকারী টেষ্ট খেলায় ভারতবর্ষ মাত্র ছয় রাণের জন্য জয়লাভে বঞ্চিত হয়। এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভারতবর্ষ আজপর্য্যন্ত কোন সরকারী টেষ্ট ম্যাচে জয়লাভ করতে পারে নি এবং যে ভাবে চলেছে তাতে অদূর ভবিষ্যতেও জয়ের আশা না করাই ভালো।

কমনওয়েলথ্ দলের বিপক্ষে এই তৃতীয় টেষ্টের খেলায় ভারতের জয়লাভে কলিকাতা তথা সমগ্র ভারতের ক্রিকেট মহলে উচ্ছ্বাস ও উৎসাহের বন্যা বয়ে গেছে। বিজয় মার্চেণ্টের স্থলাভিষিক্ত বিজয়ী অধিনায়ক বিজয় হাজারে সারা দেশবাসীর কাছ থেকে অভুতপূর্ব্ব ও অসংখ্য অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা লাভ করেন। কিন্তু প্রায় টেষ্ট দলের সমতুল্য এই কমনওয়েলথ্ দলের বিরুদ্ধে ভারতের এই কৃতিত্বপূর্ণ জয়লাভেও আমরা বিশেষ উৎসাহিত হতে পারছি না। এর কারণে প্রথমেই বলতে হয় যে ভারতের এই জয়ের পশ্চাতে খেলোয়াড়দের কৃতিত্বের চেয়ে ভাগ্যদেবীর কৃপাদৃষ্টিটাই ছিল বেশি। কমনওয়েলথ্ দলের প্রথম ইনিংসে রে, স্মিথ ব্যাট করতে পারেননি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে পেটিফোর্ড ও থানিক্ষণ ব্যাট করবার পর, আউট না হয়েই অবসর গ্রহণ করে স্মিথের সহিত অসমর্থের তালিকাভুক্ত হন। প্রথম ইনিংসে একজন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে যখন খেলা ড্র করার পক্ষে সময় কাটান এবং রাণ তোলা একান্ত দরকার ঠিক সেই সময়েই দুইজন ব্যাটস্‌ম্যানের খেলতে না পারা যে একান্ত দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক তাতে কোন সন্দেহই নেই। পেটিফোর্ড ও স্মিথ ব্যাট করে সময় কাটাতে ও রাণ তুলতে পারলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেষ্টের মত ভারতীয় দলের সময়াভাবে জয়লাভে বঞ্চিত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল বলেই মনে হয়। অবশ্য দিল্লীতে প্রথম টেষ্টে ভারতীয় দলকেও মার্চেণ্ট ভ্রাতৃদ্বয় ব্যাট করতে সমর্থ না হওয়ায় এই রকমই দৈবদুর্ব্বিপাকের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ভারতীয় দলের মধ্যে একমাত্র অধিনায়ক হাজারে ছাড়া এই তৃতীয় টেষ্ট খেলায় আর কেহই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। বিশেষ করে কমনওয়েলথ্ দলের প্রথম ইনিংসে ভারতীয় দল তাদের চিরাচরিত ত্রুটীপূর্ণ ফিল্ডিং ও ক্যাচ ধরতে না পারার পরিচয় আরও একবার বেশ ভাল করেই দিয়েছে। এরূপ নিকৃষ্টস্তরের ফিল্ডিং, তৃতীয় শ্রেণীর উইকেট কিপিং, সাধারণ পর্য্যায়ের বোলিং ও অনিশ্চিত ব্যাটিং-এর সাহায্যে যে ভারতীয় দল জয়লাভে সমর্থ হয়েছে তা ভাগ্যদেবীর কৃপায় বললে অযৌক্তিক হবে না। তবে ভারতীয় দলের কৃতিত্ব যে একেবারেই নেই একথাও বলা চলে না। ভারতীয় দল তাদের দুজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় মার্চেণ্ট ও অমরনাথের সাহায্য না পেয়েও এই প্রায় প্রথম শ্রেণীর টেষ্ট দলের সমতুল্য কমনওয়েলথ্ দলকে সাত উইকেটে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতে সমর্থ হয়েছে। এ কৃতিত্বও কম নয়। তবে আমরা সর্ব্বভারতীয় দলের কাছ থেকে আরও উন্নতধরণের ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখবার আশা করি। কিন্তু দুই একজন ব্যতিরেকে আর সকলের খেলা দেখে আমাদের সে আশা ক্রমশঃই ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে।

টসের ভাগ্যযুদ্ধে বহুকাল পরে ভারতবর্ষ জয়ী হয়েছে। তৃতীয় টেষ্টে খেলার আগে ভারতের ভাগ্যবান অধিনায়ক **বিজয় হাজারে** ও কমনওয়েলথ অধিনায়ক **জক্ লিভিংষ্টোন**কে আগ্রহাকুল নেত্রে টসের ফলাফল লক্ষ্য করতে দেখা যাচ্ছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় দুটী টেষ্ট খেলাতেই ভারতীয় দল নিকৃষ্ট স্তরের খেলা খেলে ফলো-অন্ করতে বাধ্য হয়। অবশ্য দ্বিতীয় খেলাটিতে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। তৃতীয় টেষ্টে জয়লাভ করে সেই হৃত সম্মানের কিছুটা পুনরুদ্ধার করতে পারলেও সম্পূর্ণ কালিকামুক্ত হতে পারে নি। এখনও দুটী টেষ্ট খেলা হাতে আছে, এর মধ্যে অন্তত: একটিতেও জয়লাভ করে অপরটী অমীমাংসিতভাবে শেষ করতে পারলে ভারতবর্ষ দুটী টেষ্টে জয়ী হয়ে রবার লাভ করবে। কিন্তু ভারতীয় খেলোয়াড়দের খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড দেখে সে আশা বিশেষ করা যাচ্ছে না। ফিল্ডিং ও বোলিং ছাড়া ব্যাটিংএও ভারতীয় দল বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না। ব্যক্তিগতভাবে এক-আধজন ভাল খেললেও সমষ্টিগতভাবে ভাল খেলে অল্প সময়ে বিপুল রাণ তুলে বিপক্ষকে কাবু করে দেবার মত খেলা এখনও ভারতীয় ব্যাট্স্ম্যানরা দেখাতে পারছেন না। যে এক আধ জন ভাল খেলছেন তাদের উপর সব সময় নির্ভর করা যায় না ক্রিকেট খেলার সুপ্রচলিত অনিশ্চয়তার জন্য। তাছাড়া ভারতীয় খেলোয়াড়রা তাদের ত্রুটিপূর্ণ 'রাণিং বিটুইন দি উইকেট' এর জন্য রাণ আউট হবার ভয়ে অনেক মূল্যবান শর্ট রাণ নিতে পারেন না বা রাণ নিতে দ্বিধা করেন। তৃতীয় টেষ্টে ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে প্রায় পূরো দুদিন খেলে মাত্র ৪২২ রাণ সংগ্রহ করে। এই সময়ের মধ্যে তাঁদের ৬০০ বা অন্তত: ৫৫০ রাণ সংগ্রহ করা উচিত ছিল এবং তা করতে পারলে কমনওয়েলথ্ দল ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পেতো না। তা ছাড়া দ্রুত রাণ তুলতে না পারলে সময়াভাবে শক্তিশালী দলের পক্ষেও দুর্বল দলকে শুধু পরাজিত করাও অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে—বিশেষ করে টেষ্ট ম্যাচের মত গুরুত্বপূর্ণ খেলায় যখন কোণ-ঠাসা দল প্রাণপণে সময় কাটিয়ে খেলা ড্র করে দেবার চেষ্টা করে। ব্যাটিং ছাড়া বোলিংএর দিক দিয়েও ভারতীয় খেলোয়াড়দের খেলার অনেক উন্নতির দরকার। তবে ভারতীয় বোলারদের সপক্ষে একটা কথা বলবার আছে যে তারা ফিল্ডারদের দিক থেকে বিশেষ সাহায্য পায় না। ভারতীয় ফিল্ডাররা ক্যাচ ধরার চেয়ে ক্যাচ ফেলতেই বেশি ওস্তাদ আর বলের সামনে থেকে বলকে আটকাবার চেয়ে বলের পিছনে পিছনে ছোটার দিকেই যেন তাদের ঝোঁক বেশি বলেই মনে হয়। ফিল্ডারদের কাছ থেকে উপযুক্ত সমর্থন বা সাহায্য না পেলে কোন বোলারের পক্ষেই বেশি উইকেট পাওয়া বা বিপক্ষের ব্যাটস্ম্যানদের বেশি রাণ করতে না দেওয়া সম্ভব নয়। দিল্লীতে প্রথম টেষ্টে ভারতীয় ফিল্ডাররা অসংখ্য ক্যাচ ফেলে না দিলে কমনওয়েলথ্ দল এত সহজে ভারতীয় দলকে এরূপ শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতে পারত না। তৃতীয় টেষ্টেও এই রকম ক্যাচ ধরতে ব্যর্থতার পরিচয় দিতে ভারতীয় ফিল্ডাররা দ্বিধাবোধ করেন নি। তবে ভাগ্যগুণে ফলাফল অন্যরকম হয়। এই ফিল্ডিংএর উন্নতি যতদিন না হবে ততদিন ভারতবর্ষের পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট জগতে সম্মানজনক
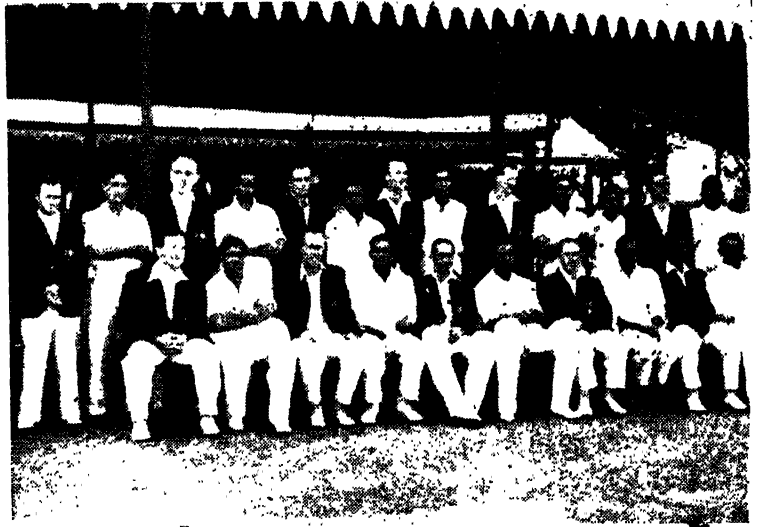
তৃতীয় টেষ্টে ভারত ও কমনওয়েলথ দলের খেলোয়াড়গণ।

স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা খুবই কম। দশ পনের বৎসর আগেও ফিল্ডিংএর এরূপ অবনতি লক্ষিত হয়নি। তখনও ব্যাটিং বোলিংএর মতন ফিল্ডিং'এ উন্নতি করবার দিকে খেলোয়াড়দের যথেষ্ট লক্ষ্য ছিল বলেই আমরা ভায়া, সি এস নাইডু, মাস্তাক আলি, অমরনাথ প্রভৃতির মত ফিল্ডারদের পেয়েছি। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে একমাত্র গুল মহম্মদ ছাড়া আর কোন ভাল ফিল্ডার তৈরী হয়েছে বলে মনে হয় না। ভাল করে ব্যাটিং ও বোলিং শেখার মত ভাল ফিল্ডিং করতে শেখাও যে খেলার একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ তা যেন আমাদের আজকালকার খেলোয়াড়দের কাছে অজ্ঞাত বলে মনে হয়। এই কথা উইকেট কীপিং সম্বন্ধেও বলা চলে।

ভারতের উইকেট কিপিং-এর ষ্ট্যাণ্ডার্ড যে অত্যন্ত পড়ে গেছে সে বিষয়ে দ্বিমত হবার মতন লোক বোধ হয় কেহই নেই। আমাদের দেশের এখনকার উইকেট রক্ষকদের উইকেট কিপার না বলে ব্যাক-ষ্টপার বা পিছনের বল আটককারী বলাই সঙ্গত। উইকেটের পিছনে ক্যাচ ধরা ও স্টাম্প করার মতন প্রয়োজনীয় বিষয় দুটিতে তাঁদের তেমন লক্ষ্য থাকে না বা ক্ষমতায় কুলায় না। কিন্তু ঐ কাজ দুটি যে উইকেট কিপিংএর অপরিহার্য্য অঙ্গ তা আমাদের দেশের উইকেট কিপাররা যে হৃদয়ঙ্গম করেন তা তাঁদের খেলা দেখে মনে হয় না। ফিল্ডিংএর মতন উইকেট কিপিংএর দিকেও খেলোয়াড়রা ঝোঁক না দেওয়ায় আজ আমরা দিলওয়ার, হিন্দেলকারের মতন উইকেট কিপার আর দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের দেশের ক্রিকেটের ফিল্ডিং ও উইকেট কিপিং এই দুটি অনাদৃত বিভাগের আশু উন্নতির যে একান্ত প্রয়োজন তা শুধু আমাদের দেশের খেলোয়াড়দেরই নয় আমাদের খেলোয়াড় নির্ব্বাচকমণ্ডলীরও মনে রাখা একান্ত দরকার। এই খেলোয়াড় নির্ব্বাচকমণ্ডলী সম্বন্ধে অনেক কিছু বলবার আছে কিন্তু স্থানাভাবে সব বলা সম্ভব নয়। তবে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে তাঁরা পক্ষপাতদোষ মুক্ত তো ননই তাছাড়া খেলোয়াড়দের খেলা দেখে তাঁদের দলে স্থান পাবার উপযুক্ততা সম্বন্ধে বিচার করবার ক্ষমতাও এই নির্ব্বাচকদের আছে বলে সব সময়ে মনে হয়না। উদাহরণ-স্বরূপ উইকেট কীপার মন্ত্রীর কথার উল্লেখ করা চলে। মন্ত্রী উপর্য্যুপরী কমনওয়েলথ দলের বিপক্ষে চারটি টেষ্টেই ভারতীয় দলে স্থান পেলেন, কিন্তু তৃতীয় টেষ্টে তাঁর উইকেট কিপিং ও ব্যাটিং দেখে আশ্চর্য্য হতে হয় এই ভেবে যে কি করে তিনি টেষ্ট দলে স্থান পেয়ে আসছেন। বাংলার উইকেট কীপার প্রবীর সেন, যিনি ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে পাঁচটি টেষ্টেই এবং অষ্ট্রেলিয়াতেও ভারতীয় টেষ্ট দলে স্থান পেয়ে এসেছেন, তাঁকে যে কেন টেষ্ট নির্ব্বাচকমণ্ডলীর চোখের সামনে থেকে একেবারে সরিয়ে দেওয়া হল তা বোঝবার ক্ষমতা আমাদের নেই। উইকেট রক্ষক হিসাবে মন্ত্রীর চেয়ে সেন যে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ তার পরিচয় কমনওয়েলথ্ বনাম ইষ্ট জোনের খেলায় সেন ভাল ভাবেই দিয়েছেন। জর্জ্জ ডাকওয়ার্থের মতন বিখ্যাত উইকেট রক্ষকও সেনের এই খেলা দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ব্যাটসম্যান হিসাবে মন্ত্রী অবশ্য গত মরসুমে ভাল ফর্ম্ম দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এবারে সে যোগ্যতাও তিনি হারি-

প্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়কদ্বয়।
বিজয় হাজারে ও জক্ লিভিংষ্টোন একসঙ্গে খেলতে নামচেন কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে

য়েছেন। তাহলে সেনকে কি হিসাবে অনুপযুক্ত বিবেচনা করা হল? বোধ হয় সেনকে মার্চেন্ট পরিচালিত দলে স্থান দিলে অমরনাথের প্রতি উৎকোচ নিয়ে সেনকে দলে স্থান দেওয়া হয়েছিল বলে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তা খণ্ডন হয়ে যাবে, সেনের উপযুক্ততা অধিনায়ক মার্চেন্ট ও নির্ব্বাচক মণ্ডলী পুনরায় স্বীকার করে নিলে। তাই কি? তাছাড়া তৃতীয় টেষ্টে সি, এস, নাইডুর কৃতিত্ব পূর্ণ বোলিং সত্বেও তাঁকে চতুর্থ টেষ্ট দলে স্থান দেওয়া হল না এই অজুহাতে যে কানপুরের ম্যাটিং উইকেটে তাঁর বোলিং ভাল হবে না বলে। কিন্তু বাংলার কৃতি বোলার এন, চৌধুরীর দ্রুত বোলিং ম্যাটিং উইকেটে আরও ভাল হবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তিনি চতুর্থ টেষ্ট দলে অতিরিক্ত খেলোয়াড়ের পর্য্যায়ে নেবে গেলেন। বোম্বের পলি উমরিগর গত বৎসর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে শতাধিক রাণ করেছিলেন বলে, বর্ত্তমানে ব্যাটিং এ বিশেষ কিছু করতে না পারলেও, বরাবর টেষ্ট দলে স্থান পেয়ে আসছেন। অথচ বাংলার উদীয়মান ব্যাটসম্যান পঙ্কজ রায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে সেইরূপ শতাধিক রাণ করবার যোগ্যতা দেখিয়েও আজ পর্য্যন্ত নির্ব্বাচক মণ্ডলীর মনের বাইরেই রয়ে গেছেন। হায়দারাবাদের অফ্-ব্রেক বোলার গোলাম আমেদকে গত মরসুমে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে ভারতীয় টেষ্ট দলে স্থান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ মরসুমে তাঁর কথা চতুর্থ টেষ্টের আগে আর নির্ব্বাচকদের মনে পড়ল না। এ ছাড়া অমরনাথের সম্বন্ধেও একটা পরিষ্কার কিছু হয়ে যাওয়া দরকার বলে মনে হয়। পায়ের আঘাতই কি তাঁর খেলায় যোগদান না করার একমাত্র কারণ? না আরও কিছু এর মধ্যে আছে? কিন্তু তাঁর মত চৌকস খেলোয়াড়ের অভাব আজ ভারতীয় দল বিশেষ করে বোধ করছে।

অধিনায়ক নির্ব্বাচন সম্বন্ধেও কিছু বলবার আছে। বিজয় মার্চেন্ট যদি খেলতে অসমর্থই হন তাহলে তাঁকে কেনই বা পুনরায় অধিনায়ক নির্ব্বাচিত করা হচ্ছে? একি কেবল তাঁকে খেলোয়াড় নির্ব্বাচনের অধিকারটুকু দেবার জন্যেই? তিনি যদি খেলতে অপারগই হন তাহলে তাঁর বোর্ড বা নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে জানিয়ে আগে থেকেই সরে দাঁড়ান উচিত, অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হবার পরে নয়। যাই হোক আশা করি অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় ক্রিকেট জগতের ভিতরকার এই সব গোলমালের নিষ্পত্তি হয়ে গিয়ে শীঘ্রই ভারতীয় ক্রিকেটের আবহাওয়া পরিস্কৃত হয়ে উঠবে। এবং খেলোয়াড়রাও তাঁদের দোষ ত্রুটির সংশোধন করে ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতিতে সাহায্য করবেন।

খেলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ ঃ

কমনওয়েলথ ঃ ৪৪৮ ও ১১০ (৩ উইকেট)

ভারতবর্ষ ঃ ২৮৯ ও ৪৩০ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)

বোম্বাইয়ে ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ দলের সঙ্গে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় বে-সরকারী টেষ্ট ম্যাচ শেষ পর্য্যন্ত ড্র গেছে। ১৬ই ডিসেম্বর, কমনওয়েলথ দল টসে জয়ী হয়ে খেলার নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ৭ উইকেটে ২৪৫ রান তুলে। নেভিল ওল্ডফিল্ড ১১০ রান ক'রে ফাদকারের বলে বোল্ড আউট হ'ন। ওল্ডফিল্ডের ১১০ রান উঠতে প্রায় ২৪৬ মিনিট সময় লাগে। তিনি ১৩টা বাউণ্ডারী করেন। ৬৩ রানের মাথায় মানকড়ের বলে মন্ত্রী তাঁকে একবার আউট করবার সুযোগ হারিয়েছিলেন। এই নিয়ে এবারের টেষ্ট সিরিজে ওল্ডফিল্ডের উপর্য্যুপরি ২টো সেঞ্চুরী হ'ল। দিল্লীর প্রথম টেষ্টে তিনি ১৫১ রান করেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট খেলোয়াড় ওরেল ৭৮ রান করেন। ফাদকার ৪৯ রানে ৩ এবং মোদী ৩৩ রানে ৩টে উইকেট পান।

১৭ই ডিসেম্বর দ্বিতীয় দিনের খেলায় পূর্ব্বদিনের নট আউট খেলোয়াড়দ্বয় পেটিফোর্ড এবং ফ্রিয়ার অষ্টম উইকেটে মিলিত হয়ে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। দলের

সপ্তম উইকেট পড়েছিল ২৪২ রানে। অষ্টম উইকেট পড়লো ৪০৮ রানে। অর্থাৎ অষ্টম উইকেটের জুটিতে ১৬৬ রান উঠেছিলো। ফ্রিয়ার ১৩২ এবং পেটিফোর্ড ৭২ রান করেন। ৪৪৮ রানে কমনওয়েলথ দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়।

চা-পানের ১০ মিনিট আগে ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। দলের মাত্র ২ রানে মন্ত্রী কেমন রান না করেই ল্যাম্বার্টের বলে বোল্ড আউট হ'ন। দ্বিতীয় দিনের নির্দ্ধারিত সময়ে ভারতীয় দলের ১ উইকেটে ৫৮ রান উঠে।

১৮ই ডিসেম্বর, টেষ্ট খেলার তৃতীয় দিনে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ২৮৯ রানে শেষ হয়ে গেল। বিজয় মার্চ্চেণ্ট এবং ডি জি ফাদকার উভয়েই দলের সর্ব্বোচ্চ ৭৮ রান করলেন। ফাদকার শেষ পর্য্যন্ত নট আউট রইলেন। এরপর মোদীর ৫৮ এবং হাজারের ৩৯ রান উল্লেখযোগ্য। ল্যাম্বার্ট ৭৬ রানে এবং ফ্রিয়ার ৮৯ রানে ৪টে ক'রে উইকেট পান।

১৯শে ডিসেম্বর, খেলার চতুর্থ দিনে কমনওয়েলথ দলের থেকে ১৫৯ রান পিছিয়ে থেকে ভারতীয় দল ফলো-অন ক'রে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিজয় মার্চ্চেণ্ট তাঁর মাত্র ৩ রানের মাথায় ভাগ্যক্রমে ক্যাচ আউট হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যান; ওল্ডফিল্ড তাঁর বল ধরতে না পেরে মাটিতে ফেলে দেন। এই বিপদের হাত থেকে বেঁচে গিয়ে মার্চ্চেণ্টের খেলার গতি অন্যদিকে ঘুরে যায়; তিনি নতুন জীবন পেয়ে রান তোলার দিকে লেগে পড়লেন। একমাত্র ট্রাইবের বলে তিনি বেশ সুবিধা করতে পারেননি। ৩ রানের মাথায় সৌভাগ্যক্রমে তিনি যেমন একবার আউট হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যান তেমনি দুর্ভাগ্যক্রমে মাত্র ৬ রানের জন্যে শতরান পূর্ণ করতে পারেননি; ৯৪ রানের মাথায় ওরেলের বলে 'এল-বি-ডবলউ' হ'য়ে তাঁকে বিদায় নিতে হয়। চতুর্থ দিনে শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় দলের ৪ উইকেটে ২৫৫ রাণ উঠে মোদী ৫১ এবং হাজারে ৬৪ রান করেন।

২০শে ডিসেম্বর, খেলার পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে ৮ উইকেটে ৪৩০ রান উঠলে পর ভারতীয় দল ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে। চতুর্থ দিনের নট আউট খেলোয়াড়দ্বয় অধিকারী এবং উমীরগর দৃঢ়তার সঙ্গে বিপক্ষের আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে বিপদের হাত থেকে দলকে রক্ষা করেন। তাঁদের পঞ্চম উইকেটের জুটিতে ১০৯ রান উঠে। অধিকারীও দুর্ভাগ্যক্রমে মাত্র ৭রানের জন্যে শতরান পূর্ণ করতে পারেননি; ৯৩ রানে ল্যাম্বার্টের বলে তাঁরই হাতে অধিকারী ধরা পড়ে আউট হ'ন। উমীরগর ৬৭ রান করেন। ট্রাইব ১৫৬ রানে ৪টে উইকেট পান।

খেলার নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কমনওয়েলথ দলের ৩ উইকেটে ১১০ রান উঠলে পর খেলাটি ড্র যায়।

কমনওয়েলথ: এন ওল্ডফিল্ড, ডবলউ প্রেস, জে হোল্ট, এফ ওরেল, ডবলউ এ্যালে, জে পেটিফোর্ড, এল লিভিংষ্টোন (অধিনায়ক), রে স্মিথ, এফ ফ্রিয়ার, জর্জ ট্রাইব, এইচ ল্যাম্বার্ট।

ভারতবর্ষ: বিজয় মার্চ্চেণ্ট (অধিনায়ক), এম মন্ত্রী, আর মোদী, বিজয় হাজারে, ডি ফাদকার, এইচ অধিকারী, পি উমীরগড়, ভিনু মানকড়, বি নিম্বলকার, সি এস নাইডু, সি রঙ্গচারী।

তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ:

ভারতবর্ষ: ৪২২ ও ১১৭ (৩ উইকেট)

কমনওয়েলথ: ১৯০ ও ৩৪৮

ক'লকাতার ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ দল বনাম ভারতীয় দলের বে-সরকারী তৃতীয় টেষ্ট খেলায় ভারতীয় দল ৭ উইকেটে কমনওয়েলথ দলকে পরাজিত করেছে। ইডেন উদ্যান সম্পর্কে দর্শক-শ্রেণীর যে সুদীর্ঘকালের বিশ্বাস আছে বহুবারের মত এবারও তা শেষ পর্য্যন্ত সত্যে পরিণত হয়েছে। ইডেন উদ্যানের উইকেট খাঁটি সোনা যাচাই ক'রে নেবার পক্ষে যেন কষ্টিপাথরের কাজ করে। ইডেন উদ্যানই ভারতীয় দলের সৌভাগ্যের পীঠস্থান। ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিজয় হাজারে ইডেন উদ্যানের মাটিতে দাঁড়িয়ে টসে জয়লাভ করলেন। উপর্যুপরি দশটি টেষ্ট খেলায় ভারতীয় দল টসে হেরে গিয়ে যে দুর্ভাগ্যের শৃঙ্খল রচনা ক'রে চলেছিলো অধিনায়ক বিজয় হাজারে ইডেন উদ্যানের টসে জিতে তার ব্যতিক্রম ক'রলেন। ক্রিকেট খেলায় টসে জিতে প্রথম ব্যাটিং করার সুযোগ পাওয়া

ভাগ্যের কথা এবং এর উপরই দলের সাফল্য কি পরিমাণ নির্ভর করে জনসাধারণের কাছে তা অবিদিত নয়।

১৯৪৯ সালের ৩০শে ডিসেম্বর, ইংরেজী বছরের শেষ দিনের আগের দিন ভারতীয় ক্রিকেট দলের কাছে একটি শুভ দিন। ভারতীয় দল টসে জিতে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো মুস্তাক আলী এবং ভিনু মানকড়কে দিয়ে। ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিজয় মার্চেন্ট হঠাৎ আহত হয়ে পড়ায় তৃতীয় টেষ্ট খেলায় যোগদান করতে পারবেন না, এ খবরে যেমন ক্রিকেট ক্রীড়ামোদিরা মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল, টসে জেতার খবর পেয়ে সকলেই তাঁর অনুপস্থিতির কথা ভুলে গিয়ে বিজয় হাজারের সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। দলের ৫০ রান উঠলো ৮০ মিনিটের খেলায়। মুস্তাক আলী এবং ভিনু মানকড় বেশ জমিয়ে তুলেছেন এমন সময় দলের ৫৯ রানে মুস্তাক আলী নিজস্ব ৪০ রান ক'রে ট্রাইবের বলে স্মিথের হাতে ধরা পড়ে আউট হলেন। ইডেন উদ্যানে মুস্তাকের গুণগ্রাহীর অভাব নেই : তাঁর আউটে দুঃখিত হলেও তাঁর তোলা জোরালো শক্ত বলটা স্মিথ যে ভাবে বাঁ হাতে ধরে এবং পরে শুয়ে পড়ে ক্যাচ আউট করার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ভারতীয় দর্শকমণ্ডলী মুস্তাক আলীকে হারিয়েও করতালি দিয়ে স্মিথকে অভিনন্দন জানিয়েছিলো।

লাঞ্চের সময় দলের ৮১ রান উঠে ; মানকড় এবং মোদীর যথাক্রমে ৩৮ এবং ৮ রান। লাঞ্চের পর মোদীর উইকেট দলের ৮৯ রানে পড়ে যায়। মোদী ৯ রাণ করেন। মানকড় এবং হাজারে খেলতে থাকেন এবং ট্রাইবের একটা বল বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে হাজারে দলের ১০০ রান পূর্ণ করেন। ১০০ রান উঠে মোট ১৩৪ মিনিটের খেলায়। দলের ১৫০ রান উঠতে সময় নেয় ১৮৫ মিনিট। চায়ের সময় ভারতীয় দলের ২ উইকেটে ১৮৬ রান উঠে। মানকড় ৯১ এবং হাজারে ৪৪ রান করে নট আউট থাকেন। চায়ের পর হাজারে ৯১ রানে আউট হ'লে হাজারে মানকড়ের জুটি ভেঙ্গে গেল। দলের রান তখন ১৮৬। খেলার নির্দ্ধারিত সময়ে ভারতীয় দলের ৩ উইকেটে ২১৩ রান উঠে। হাজারে এবং ফাদকার যথাক্রমে ৬০ এবং ১১ রান ক'রে নট আউট থাকেন। কমনওয়েলথ দলের ফিল্ডিং দর্শকমণ্ডলীর প্রভূত প্রশংসা লাভ করে। ইডেন উদ্যানে তৃতীয় টেষ্ট খেলার আগে গভর্ণর একাদশ দলের খেলায় একদিনেই ৯টা উইকেট নিয়ে ট্রাইব দর্শক এবং খেলোয়াড়দের মনে যে বিভীষিকার সঞ্চার করেছিলেন তৃতীয় টেষ্ট খেলার প্রথম দিনে দর্শকমণ্ডলী ট্রাইবকে উপেক্ষা করতে পারলো না। ট্রাইব ঐ দিনে ৮২ রানে ২টো উইকেট পেলেন।

৩১শে ডিসেম্বর টেষ্ট খেলার দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ৫২৫ মিনিট খেলার পর ৪২২ রানে শেষ হ'ল। দলের অধিনায়ক বিজয় হাজারে ১৭৫ রান ক'রে শেষ পর্য্যন্ত নট্ আউট থাকেন। এ পর্য্যন্ত ভারতীয় দল যে সব সরকারী এবং বে-সরকারী টেষ্ট ম্যাচে যোগদান করেছে, এই ৪২২ রানই হ'ল ভারতীয় দলের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ রান। হাজারের ১৭৫ রান তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কমনওয়েলথ দলের বিপক্ষে হাজারের এই দ্বিতীয় সেঞ্চুরী, অপর দিকে ইডেন উদ্যানের ক্রিকেট খেলায় এটা তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী। কোন রকম আউট হবার সুযোগ না দিয়ে তিনি যে ১৭৫ রান করেন তার মধ্যে ২০টা বাউণ্ডারী ছিল। বিভিন্ন রকমের ষ্ট্রোকে উইকেটের চারপাশে বল পাঠিয়ে তিনি রান তুলেন। তাঁর খেলায় সর্ব্বাপেক্ষা দর্শনীয় হয়েছিলো 'কভার ড্রাইভ' মার গুলি। দ্বিতীয় দিনের খেলায় তাঁর পরই রান করার দিক থেকে কৃতিত্ব লাভ করেন কিষেণচাঁদ। হাজারে-কিষেণ চাঁদের ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ৯২ রান উঠে। কিষেণচাঁদ ৪২ রান করে আউট হ'ন।

শেষের দিকে সি এস নাইডু হাজারের জুটি হয়ে বোলারদের কোন রকম ভ্রুক্ষেপ না করে ২৫ রান করেন। এমন কি বোলার এন চৌধুরী ট্রাইবের বল পিটিয়ে খেলে যে ৯ রান তুলেন দলের পক্ষে তা খুবই কাজের হয়েছিলো। শেষের দিকের খেলাটা দর্শকমণ্ডলীর কাছে খুবই উত্তেজনাপূর্ণ এবং উপভোগ্য হয়েছিলো।

ট্রাইব ৫৭'২ ওভার বলে ১২টা মেডেন নিয়ে এবং ১৪৪ রান দিয়ে দলের মধ্যে সব থেকে বেশী ৫টা উইকেট পান। স্মিথ পান ৪৫ ওভার বলে ৭১টা রান দিয়ে ২টো।

কমনওয়েলথ ক্রিকেট দলের প্রথম ইনিংসের সূচনা করেন অধিনায়ক লিভিংষ্টোন এবং ওওফিল্ড। নির্দ্ধারিত সময়ে

কোন উইকেট না হারিয়ে দলের ১৫ রান উঠে, লিভিংষ্টোন ১১ এবং ওণ্ডফিল্ড ৪ রান করে নট আউট থাকেন।

১লা জানুয়ারী ইংরাজি নববর্ষের প্রথম দিনটা কিন্তু কমনওয়েলথ দলের পক্ষে শুভ হ'ল না। খেলার এই তৃতীয় দিনে কমনওয়েলথ দলের দারুণ ভাঙ্গন দেখা দিল। কমনওয়েলথ দলের এই ভাঙ্গনের মূলে ছিল ফাদকার এবং এন চৌধুরীর বোলিং। মাত্র ১৯০ রানে কমনওয়েলথ দলের প্রথম ইনিংস চা পানের ১৫ মিনিট আগে শেষ হয়ে যায়। এবছরের টেষ্ট সিরিজে এটাই হ'ল দু' দলের পক্ষে সব থেকে কম রান। ফাদকার এবং চৌধুরীর মারাত্মক বোলিং সেই সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে কয়েকটি শক্ত ক্যাচ ধরা পড়ায় কমনওয়েলথ ক্রিকেট দলের মোট রান বেশী উঠতে পারে নি। এই খেলায় রে স্মিথ অসুস্থ থাকায় শেষ পর্য্যন্ত ব্যাট করতে নামেন নি। ভারতীয় দলের ফিল্ডিংয়ের প্রশংসা করা চলে না। খেলার গোড়ার দিকে উমীর গড় একটা সহজ ক্যাচ ফেলে দেন, যদিও পরে ওণ্ডফিল্ডের একটা শক্ত বল এক হাতে ধরে পূর্ব্বের ভুলের সংশোধন করেন। ওল্ডফিণ্ডএর আগে ফাদকারের বলে ফাইন লেগে মানকড়ের হাত থেকে ফস্কে গিয়ে ভাগ্যক্রমে সে যাত্রা বেঁচে যান। ভারতীয় দলের খারাপ ফিল্ডিংয়ের দরুণ কমনওয়েলথ দল রান তুলতে খুবই সুবিধা পেয়েছিল। ভারতীয় খেলোয়াড়দের হাত থেকে ২।৩টি ক্যাচ পড়ে না গেলে কমনওয়েলথ দলের প্রথম ইনিংস আরও অল্প রাণে এবং অনেক আগেই শেষ হ'ত। দলের সর্ব্বোচ্চ ৪২ রাণ করেন লিভিংষ্টোন। ফাদকার ২৪ ওভার বলে ৪টা মেডেন পান এবং ৫০ রান দিয়ে উইকেট পান ৩টে। চৌধুরী পান ৪টে ১৮ ৪ ওভার বলে ২টো মেডেন পেয়ে এবং ৫৬ রান দিয়ে। ফাদকারের দুর্ভাগ্য যে তাঁর বলেই বেশী ক্যাচ ফস্কেছিল। ভারতীয় দলের থেকে ২০২ রান পিছিয়ে থেকে চা-পানের পর থেকে কমনওয়েলথ দল 'ফলো-অন' করে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। নির্দ্ধারিত সময়ে ৪২ রান উঠলো কোন উইকেট না পড়ে।

২রা জানুয়ারী, টেষ্ট খেলার চতুর্থ দিনে কমনওয়েলথ দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা প্রথম ইনিংসের থেকে অনেক ভাল হ'ল। প্রথম ইনিংসের জুটী ফ্রিয়ার এবং ওল্ডফিল্ডের উইকেট যেন আর পড়তে চায় না এমনই তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে উইকেটে রেখে খেলছিলেন। দলের ৬১ রাণের মাথায় ওল্ডফিল্ড ফাদকারের বলে স্লিপে ক্যাচ তুলে হাজারের হাত থেকে কোনক্রমে ফস্কে গিয়ে সে যাত্রা বেঁচে গেলেন, তাঁর তখন ৪১ রাণ। এত বড় একটা বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে ওল্ডফিল্ড বুঝলেন 'রাখে হরি মারে কে'; মন থেকে আউট হবার ভয় ডর ঘুচে গেল। কিন্তু বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে খেলতে পারেন নি। শেষ পর্য্যন্ত ১৫৮ রাণ ক'রে ফাদকারের বলে প্রথম ইনিংসের মতই উমীর গড়ের হাতে ধরা পড়ে আউট হ'ন।

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত নাটক "এই স্বাধীনতা"—২৲
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় প্রণীত ইতিহাস "কংগ্রেসের ইতিবৃত্ত"—১৷৷৹
শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "খেয়াঘাট"—২৷৷৹
শ্রীশৈলেন নাথ প্রণীত উপন্যাস "নার্য্যালি"—৩৲
শক্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত কাব্যগ্রন্থ 'লাল টিপের কাব্য'—৷৵৹
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত "আত্ম সমর্পণ-যোগ বা সরল যোগপন্থা"—২৲
শ্রীদাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "স্বামী বিবেকানন্দ—কখন ও কেন আসিয়াছিলেন?"—১৲
শ্রীবিরূপাক্ষ প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "ঝঞ্ঝাট"—৲
শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত ইংরাজী গ্রন্থ "Road to Peace"—২৷৷৹
আংকেল দত্ত প্রণীত ইংরাজী পুস্তক "The Re-discovery of India—৩৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী— শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

ব্যাধ ও বাল্মীকি

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ফাল্গুন—১৩৫৬

দ্বিতীয় খণ্ড | সপ্তত্রিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস যাত্রা

অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম্-এ, পি-এচ্-ডি

রামায়ণে বর্ণিত শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস যাত্রার কাহিনী করুণ রসের আধার—দুই হাজার বছরেরও বেশী ইহা ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ নরনারীর চিত্ত দ্রব করিয়াছে। কিন্তু করুণ রস ছাড়াও ইহাতে প্রাচীন ভারতের যে ভৌগোলিক বিবরণ আছে আজ তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। শ্রীরামচন্দ্রের ঐতিহাসিকতা অর্থাৎ সত্য সত্যই এই নামে কোন মানুষ ছিলেন কিনা, এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু কাল্পনিক কাহিনী হইলেও রামায়ণের রচয়িতা ইহাকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি ভৌগোলিক সে বিবরণ দিয়াছেন তাহা মোটামুটিভাবে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

প্রথমেই বলা আবশ্যক যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রামায়ণের যে সমুদয় পুঁথি আছে তাহাদের মধ্যে গুরুতর পাঠভেদ বর্ত্তমান। ইতালীয় পণ্ডিত গোরেসিও বাংলাদেশে প্রচলিত পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া শতাধিকবর্ষ পূর্ব্বে রামায়ণের যে সংস্করণ প্রকাশিত করেন ইউরোপে তাহাই সমধিক প্রচলিত এবং ইহার উপর নির্ভর করিয়াই পণ্ডিত-প্রবর পার্জিটার রামচন্দ্রের বনবাস যাত্রার ভৌগোলিক বিবরণ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গবাসী প্রেস হইতে ৺পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত যে রামায়ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাহা অনেকাংশে বিভিন্ন। এই দুই গ্রন্থের তুলনা করিলে সহজেই বুঝা যায় যে বঙ্গবাসী সংস্করণই অধিকতর নির্ভর-যোগ্য। ৺পঞ্চানন তর্করত্ন লিখিয়াছেন যে তিনি ভারতে প্রচলিত নানাবিধ পুঁথি দেখিয়া এই গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন। কিন্তু আমি যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে মনে হয় তিনি বোম্বাই প্রদেশে প্রচলিত রামায়ণের পাঠই হুবহু গ্রহণ করিয়াছেন। মোটের উপর রামায়ণের বঙ্গবাসী সংস্করণকে বোম্বাই সংস্করণ বলাও চলে। কিন্তু বঙ্গবাসী

সংস্করণ বাংলা অক্ষরে লিখিত এবং এদেশে সমধিক পরিচিত —সুতরাং আমরা এই নামই ব্যবহার করিব। তর্করত্ন মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে এই আদিকাব্যের অতিশয় প্রাচীনতা হেতু এরূপ পাঠভেদের উৎপত্তি হইয়াছে যে দুই বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত রামায়ণ যে একই কবির লেখনীপ্রসূত তাহা হঠাৎ মনে হয় না (অস্যাদিকাব্যস্য অতিপ্রাচীনতয়া এবং পাঠভেদাঃ সঞ্জাতাঃ যৎপ্রভাবতো দেশদ্বয়ীয়য়োঃ পুস্তকয়োরেককর্তৃকত্ববুদ্ধিরেব সহসা ন সম্পদ্যতে)। একথা অনেকাংশে সত্য।

বঙ্গবাসী সংস্করণের রামায়ণ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে রামচন্দ্র সরযূ নদীর তীরস্থিত অযোধ্যা হইতে রথে চড়িয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া তমসা নদীর তীরে উপনীত হইলেন এবং প্রজাবর্গের সহিত তথায় সেই রাত্রি যাপন করিলেন। কিন্তু প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই উঠিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন "দেখ অযোধ্যার পৌরজন আমাদের অপেক্ষায় এক্ষণ পর্য্যন্ত বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া আছেন। ইঁহারা আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য যেরূপ যত্ন করিতেছেন তাহাতে বোধ হইতেছে যে ইঁহারা প্রাণ-পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিবেন, তথাচ সঙ্কল্প ত্যাগ করিবেন না; অতএব যে পর্য্যন্ত ইঁহারা ঘুমাইয়া থাকেন, আইস, আমরা তন্মধ্যেই শীঘ্র রথে উঠিয়া অকুতোভয়ে পথ অতিক্রম করি।" লক্ষ্মণ ইহাতে সম্মতি দিলে তাঁহারা দ্রুতগতিতে রথে চড়িয়া তমসা নদী পার হইলেন। পরে তিনি পৌরগণকে বঞ্চনা করিবার মানসে সুমন্ত্র-সারথিকে বলিলেন, 'তুমি রথে আরোহণ করিয়াই উত্তর দিকে যাও এবং মুহূর্ত্তকালমাত্র উত্তরাভিমুখে যাইয়া রথ ফিরাইও। যাহাতে পৌরগণ আমার গন্তব্য পথ জানিতে না পারেন তুমি সাবধান হইয়া সেইরূপ কর।' তদনুসারে সুমন্ত্র উত্তর দিকে একটু গিয়া পরে রথ ফিরাইয়া আনিলে রাম লক্ষ্মণ ও সীতাসহ তাহাতে চড়িয়া বনে যাইতে লাগিলেন এবং অবশিষ্ট রাত্রি মধ্যেই বহু দূর গমন করিলেন। পরে তিনি বেদশ্রুতিনাম্নী মহানদী পার হইয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে ক্রমে গোমতী ও স্যন্দিকা নদী পার হইয়া কোশল রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করিলেন এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গঙ্গাতীরে প্রিয়সখা গুহের রাজধানী শৃঙ্গবেরপুরে উপস্থিত হইয়া তথায় বনবাসের দ্বিতীয় রাত্রি যাপন করিলেন।

রাম যে চারিটি নদী পার হইলেন তাহার মধ্যে তমসা এখন পূর্ব্ব-টন্‌স, বেদশ্রুতি বিসুই ও স্যন্দিকা সই নামে পরিচিত। গোমতী নদীর প্রাচীন নাম লোকমুখে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গুম্‌তি এই আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে রাম অযোধ্যা হইতে বরাবর দক্ষিণ দিকে গিয়া মোটামুটি বর্ত্তমান কালের ফৈজাবাদ—এলাহাবাদ রেল লাইনের পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তা ধরিয়া ভরতপুরকুণ্ড ষ্টেশনের নিকট তমসা নদী, খজুরাহাটের নিকট বিসুই নদী, সুলতানপুরের নিকট গুম্‌তী নদী এবং প্রতাবগড়ের নিকট সই নদী উত্তীর্ণ হইয়া গঙ্গাতীরে উপনীত হন। শৃঙ্গবেরপুর এক্ষণে সিংরোর নামে পরিচিত। ইহার পূর্ব্ব নাম শৃঙ্গীবেরপুর এখনও প্রচলিত আছে। ইহা এলাহাবাদের ২২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এবং ইহার পার্শ্বে গঙ্গা নদীর প্রাচীন পরিত্যক্ত খাত এখনও বিদ্যমান।

পাজিটার সাহেব রামের বনবাস যাত্রার এই অংশের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে তমসা নদী পার হইয়া রাম সুমন্ত্রকে কিয়ৎক্ষণের জন্য রথ উত্তরদিকে নিয়া পরে ফিরাইয়া আনিতে আদেশ করিয়াছিলেন, এবং সুমন্ত্র এইরূপে রথ ফিরাইয়া আনিলে তাহাতে চড়িয়া বনে গিয়াছিলেন। রামায়ণের উভয় সংস্করণেই এই অংশের পাঠ একরূপই আছে। কিন্তু পাজিটার রামায়ণের এই অংশ হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে রামচন্দ্র নিজেই রথে চড়িয়া প্রায় ৫০।৬০ মাইল উত্তরদিকে গেলেন এবং পুনরায় সরযূ নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। তমসা নদী উত্তীর্ণ হওয়ার বর্ণনার পরে গোরেসিও সম্পাদিত রামায়ণে দুইটি শ্লোক আছে—ইহা বঙ্গবাসী সংস্করণে নাই। বস্তুত পূর্ব্বোক্ত যে দুই শ্লোকে তমসা নদী পার হওয়ার কথা আছে—এই শেষোক্ত দুই শ্লোক তাহারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে আছে :—

> তং স্যন্দনমধিষ্ঠায় রাঘবঃ সপরিচ্ছদঃ।
> শীঘ্রং তামাকুলাবর্ত্তামতরত্তমসানদীং॥

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আছে :—

> তং স্যন্দনমধিষ্ঠায় সভার্যঃ সপরিচ্ছদঃ।
> শ্রীমতীমাকুলাবর্ত্তামতরত্তাং মহানদীং॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের 'তং' এই সর্ব্বনামের সার্থকতা আছে কারণ ইহার পূর্ব্বেই স্যন্দনের উল্লেখ আছে। কিন্তু শেষোক্ত অধ্যায়ে এই শ্লোকের পূর্ব্বে স্যন্দনের কোন উল্লেখ নাই। বিশেষতঃ শেষোক্ত অধ্যায়ের এই দুইটি শ্লোক ব্যতীত আর সব শ্লোকই বঙ্গবাসী রামায়ণে আছে। এই সমুদয় বিবেচনা করিলে কোন সন্দেহ থাকে না যে শেষোক্ত অধ্যায়ের এই শ্লোক দুইটি প্রক্ষিপ্ত। সম্ভবতঃ প্রথমে ভ্রমক্রমে পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় হইতে ইহা শেষোক্ত অধ্যায়ে সংযোজিত হয়, পরে অর্থ সৌকর্য্যার্থে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হয়। পার্জিটার রামায়ণের অন্য সংস্করণ না দেখিয়া এই দুইটি শ্লোক খাঁটি বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন, এবং রাম শ্রীমতী মহানদী পার হইয়াছিলেন এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে শ্রীমতী নামটি অতি অদ্ভুত এবং এই নামের কোন নদীর উল্লেখ আর কোন স্থানে পাওয়া যায় নাই। কিন্তু শ্লোকের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দ্বারা তিনি রামকে উত্তরে বহুদূরে নিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তিনি অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করিলেন যে শ্রীমতী মহানদী সরযূ নদীকেই সূচিত করিতেছে। এক ভুল হইতেই আর এক ভুল আসে। রাম যদি সরযূতীরে গেলেন তবে পরবর্ত্তী নদী বেদশ্রুতি কোথায়? পার্জিটার সিদ্ধান্ত করিলেন যে চৌকা নামে যে শাখানদী অযোধ্যার প্রায় ৫০ মাইল উত্তরে সরযূ নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে তাহাই বেদশ্রুতি। অর্থাৎ তমসার তীর হইতে উত্তরে গিয়া রাম সরযূ নদী পার হইলেন, তার পর আবার এপারে ফিরিয়া আসিয়া চৌকা নদী পার হইলেন। তিনি বরাবর সোজা উত্তর দিকে গেলে কোন নদী পার না হইয়াই চৌকা নদীর পশ্চিম পাড়ে পৌছিতে পারিতেন—অথচ অনর্থক তিনবার নদী পারাপার করিলেন। তারপর মনে রাখিতে হইবে যে অযোধ্যার লোক জাগিয়া উঠিয়া পাছে তাহার সঙ্গ লয় এই জন্যই তিনি রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই তমসা পার হইলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত দক্ষিণ দিকে গিয়া গঙ্গাতীরে পৌছিলেন। অথচ পার্জিটারের মতে তিনি পরদিন প্রকাশ্য দিবালোকে উত্তর দিকে অযোধ্যার পাশ দিয়াই প্রায় ৫০।৬০ মাইল গেলেন, পরে অনর্থক তিনবার নদী পারাপার করিয়া লক্ষ্ণৌর নিকট গোমতী নদী পার হইয়া গঙ্গাতীরে পৌছিলেন। এইরূপ ঘুরপথে যাওয়া রামের পক্ষে একেবারে অস্বাভাবিক, এবং বস্তুতঃ রামের এইরূপ উত্তর দিকে যাওয়ার কথা গোরেসিও বা বঙ্গবাসীর রামায়ণ কোন সংস্করণেই নাই। উভয় সংস্করণেই আছে যে রাম শেষ রাত্রে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গঙ্গাতীরে পৌছিলেন। পার্জিটার রামকে যে ঘুরাপথে লইয়া গিয়াছেন তাহার দূরত্ব প্রায় ১৭০ মাইল এবং এই পথে রামকে অন্ততঃ ছয়বার নদী পার হইতে হইয়াছে। ১৪।১৫ ঘণ্টার মধ্যে দ্রুতগামী রথের পক্ষেও ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু রামায়ণের বর্ণনা অনুসারে রাম যে সোজা দক্ষিণ পথে গিয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহার দূরত্ব মাত্র ৬০ মাইল। সুতরাং এই পথেই রাম গিয়াছিলেন এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। পার্জিটারের মত ৫০ বৎসরের অধিককাল * পর্য্যন্ত বিদ্বন্মণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে গৃহীত হইলেও তাহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

প্রিয় সুহৃদ নিষাদপতি গুহের রাজধানী শৃঙ্গবেরপুরের নিকটে নৌকায় গঙ্গানদী পার হইয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতাসহ পদব্রজে দক্ষিণ দিকে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে অবস্থিত ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে যাত্রা করিলেন।

গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী এই প্রদেশ এক্ষণে দোয়াব নামে পরিচিত এবং ধনধান্যে সমৃদ্ধিশালী। কিন্তু তৎকালে ইহার অধিকাংশই হিংস্রজন্তুসমাকুল নিবিড় অরণ্য ছিল, এবং ইহারই মধ্যে একটু স্থান পরিষ্কৃত করিয়া ভরদ্বাজ মুনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাম তথায় উপস্থিত হইলে ভরদ্বাজ মুনি তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং সেইখানেই বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তদুত্তরে রাম বলিলেন "ভগবন্ এই আশ্রম হইতে আমাদিগের নগরী ও জনপদ অতি সন্নিকট, অতএব আমি এস্থানে বাস করিতে ইচ্ছা করি না; আপনি এরূপ আর একটি নির্জ্জন উত্তম আশ্রমের বিষয় বলিয়া দিউন।" তখন ভরদ্বাজ বলিলেন "বৎস, এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে চিত্রকূট নামে বিখ্যাত এক পুণ্য শুভদর্শন পর্ব্বত আছে, তুমি সেইখানে বাস কর।" রাম ইহাতে সম্মত হইলেন এবং ভরদ্বাজ মুনির নির্দ্দেশ অনুসারে গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থানে যাইয়া যমুনা নদীর উত্তর পাড়ে কিয়দ্দূর অগ্রসর

* ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের JRAS পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত হয়।

হইয়া ভেলার সাহায্যে ঐ নদী পার হইলেন। পরে যমুনা নদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী বনমধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন। নদীতীরবর্ত্তী এক সমতলভূমিতে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন এবং মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

চিত্রকূট পর্ব্বতের অবস্থান সম্বন্ধে বিশেষ কোন সন্দেহ নাই। যুক্তপ্রদেশের বাঁন্দা জিলার অন্তর্গত কার্ব্বি-তহসীলে এখনও চিত্রকূট অথবা চিত্রকোট নামে পর্ব্বত বিদ্যমান। ইহা কার্ব্বি হইতে ছয় মাইল এবং ঝান্সি-মাণিকপুর রেলওয়ে লাইনের চিত্রকোট রেলওয়ে ষ্টেশনের চারি মাইল দূরে। এই পর্ব্বতের পাদভূমির পরিধি প্রায় দেড় মাইল। পইস্থনি নদী ইহার অর্দ্ধ মাইল দূরে প্রবাহিত। মন্দাকিনী নামে এই নদীর এক শাখা ঐ পর্ব্বতের এক মাইল দূরে। স্থানীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে, যে নদী এখন পইস্থনি নামে পরিচিত উহারই প্রকৃত নাম মন্দাকিনী। চিত্রকূট পর্ব্বত হিন্দুদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। স্থানীয় প্রবাদ এই যে অযোধ্যা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া রাম সীতা ও লক্ষ্মণসহ এই স্থানে বাস করেন। পাহাড়ের গায়ে নাকি এখনও রামের পদচিহ্ন আছে এবং এইখানে চরণ-পদিকা মন্দিরে যাত্রীরা পূজা দেয়। এখানে অমাবস্যা, রাম-নবমী এবং অন্যান্য পর্ব্বে বড় বড় মেলা হয়। পূর্ব্বে তাহাতে ৩০।৪০ হাজার যাত্রীর সমাগম হইত। ইহার চতুষ্পার্শ্বে প্রায় ৩৩টি দেবস্থান আছে—যাত্রীরা সেখানে পূজা করে।

রামায়ণে উক্ত হইয়াছে যে রামচন্দ্র গিরিবর চিত্রকূটের মধ্যভাগ হইতে বিনির্গত হইয়া জানকীকে বিমলসলিল-বাহিনী রমণীয় মন্দাকিনী নদী দেখাইলেন। এই প্রসঙ্গে চিত্রকূট ও মন্দাকিনীর বিস্তৃত ও সুন্দর বর্ণনা আছে। ভরত যখন রামচন্দ্রকে ফিরাইবার মানসে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপনীত হইয়া রামের অনুসন্ধান করেন তখন মুনিবর তাঁহাকে বলেন—"ভরত এইস্থান হইতে সার্দ্ধযোজন-দ্বয় দূরে চিত্রকূট নামক পর্ব্বত আছে। রমণীয় কুসুমিত-কাননা মন্দাকিনী নদী তাহার উত্তর দিক দিয়া প্রবাহিতা হইতেছে। বৎস, সেই নদীর পরপারে চিত্রকূট গিরি এবং তাঁহার পর্ণশালা দেখিতে পাইবে।" কালিদাসের রঘুবংশেও চিত্রকূটের উপকণ্ঠে মন্দাকিনী নদীর উল্লেখ আছে (মন্দাকিনী ভাতি নগোপকণ্ঠে)।

নাম-সাদৃশ্য, প্রচলিত লোকপ্রবাদ এবং এই মন্দাকিনী নদীর সান্নিধ্য—এই সমুদয় বিবেচনা করিলে বর্ত্তমান চিত্রকূট পর্ব্বতই যে রামায়ণ বর্ণিত চিত্রকূট তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু একটি বিষয়ে বেশ একটু গরমিল দেখা যায়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ভরদ্বাজ রামকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার আশ্রম হইতে চিত্রকূট দশক্রোশ দূরে। অন্যত্র ভরতকেও বলিয়াছিলেন যে ইহার দূরত্ব সার্দ্ধযোজনদ্বয়। দশ ক্রোশ ও আড়াই যোজন একই দূরত্ব অর্থাৎ প্রায় কুড়ি মাইল সূচিত করে। ভরদ্বাজ রামকে বলিয়াছিলেন যে তিনি বহুবার উক্ত পথে চিত্রকূট গিয়াছেন—সুতরাং দূরত্ব বিষয়ে তাঁহার ভুল হইবার সম্ভাবনা কম। আর রাম সীতাকে লইয়া বনসঙ্কুল পথ দিয়া হাঁটিয়া দ্বিতীয় দিনেই চিত্রকূট পৌছিয়াছিলেন। ভরদ্বাজের আশ্রম হইতে যে চিত্রকূট ২০।২৫ মাইলের বেশী দূরে ছিল না ইহা হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়।

কিন্তু বর্ত্তমানে যেখানে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল সেই এলাহাবাদ হইতে চিত্রকূটের দূরত্ব প্রায় ৬৫ মাইল। সুতরাং হয় রামায়ণ-বর্ণিত দূরত্ব ভুল, নচেৎ রামায়ণের চিত্রকূট ও বর্ত্তমান চিত্রকূট বিভিন্ন, সাধারণত এইরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু ইহা ব্যতীত যে আরও একটি সম্ভাবনা আছে সাধারণত কেহ তাহা লক্ষ্য করেন না। এখন যেখানে যমুনা গঙ্গানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে রামায়ণের যুগে হয়ত তাহা হইতে অনেক পশ্চিমে এই দুই নদীর সঙ্গমস্থল ছিল। অতঃপর এই তিনটি সম্ভাবনার বিষয়ই আলোচনা করিব।

রামায়ণের এই অংশ যিনি রচনা করিয়াছেন তাঁহার যে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল আমরা পদে পদে তাহার পরিচয় পাই। এই অধ্যায়ের তিনটি স্থানে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার সবগুলিই পরস্পরের সমর্থক; সুতরাং রামায়ণ বর্ণিত ২০ মাইল দূরত্ব অন্য দুইটি সম্ভাবনার একান্ত অসম্ভাব না হইলে কখনই বর্জ্জন করা উচিত নয়।

রামায়ণের চিত্রকূট ও বর্ত্তমান চিত্রকূট যে অভিন্ন এ বিষয়ে বিস্তৃত প্রমাণ পূর্ব্বেই দিয়াছি। তবে পার্জ্জিটার সাহেব রামায়ণে বর্ণিত দূরত্ব ও বর্ত্তমান চিত্রকূটের অবস্থিতির সামঞ্জস্য বিধান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

এলাহাবাদ হইতে ২০।২৫ মাইল দূরে যে অনুচ্চ পর্ব্বতমালার আরম্ভ হইয়াছে তাহাই বরাবর পশ্চিমে চিত্রকূট অবধি গিয়াছে। পার্জিটার বলেন যে হয়ত এককালে এই সমুদয় পর্ব্বতমালাই চিত্রকূট নামে অভিহিত হইত—এবং ভরদ্বাজমুনি যে দশ ক্রোশ বা আড়াই যোজন ব্যবধান বলিয়াছেন তাহা এই চিত্রকূট পর্ব্বতমালার পূর্ব্বসীমা সম্বন্ধে প্রযোজ্য। কিন্তু এই যুক্তিও বিচারসহ নহে। ভরদ্বাজ মুনি স্পষ্ট ভরতকে বলিয়াছেন যে মন্দাকিনীর ওপারে চিত্রকূটে অবস্থিত রামের আশ্রম আড়াই যোজন দূরে। এলাহাবাদের ২০।২৫ মাইল দূরে চিত্রকূট পর্ব্বতমালার আরম্ভ স্বীকার করিলেও মন্দাকিনী নদীর দূরত্ব কিছুমাত্র কমে না। সুতরাং রামচন্দ্রের চিত্রকূটস্থিত আশ্রম যে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের মাত্র ২০ মাইল দূরে ছিল বর্ত্তমান সঙ্গমের সহিত তাহার সামঞ্জস্য বিধান করা যায় না।

এক্ষণে তৃতীয় সম্ভাবনার বিষয় আলোচনা করা যাউক। বর্ত্তমান কালে এলাহাবাদের সন্নিকটে যেখানে গঙ্গা ও যমুনা মিলিত হইয়াছে, সাধারণের বিশ্বাস যে আবহমানকাল হইতেই তাহা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই বিশ্বাসের মূলে কোন বিশেষ যুক্তি নাই। ভারতবর্ষের নদনদীর গতির যে গুরুতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ পঞ্জাব ও বঙ্গদেশের বহু নদীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ দুয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশেও যে এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহারও প্রমাণ আছে। মৌর্য্য রাজধানী পাটলিপুত্র (বর্ত্তমান পাটনা) গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত ছিল। কিন্তু এই সঙ্গমস্থল এখন পাটনার ২০।২৫ মাইল পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে। ঠিক এলাহাবাদের নীচে গঙ্গার অনেক পুরাণ খাৎ দেখিতে পাওয়া যায় যাহা বর্ত্তমান গঙ্গানদী হইতে বহু দূরে অবস্থিত। এককালে প্রাচীন শৃঙ্গবেরপুর অর্থাৎ বর্ত্তমান সিংরোরের নীচ দিয়াই গঙ্গা প্রবাহিত হইত, কিন্তু পরে ইহা অনেকদূরে সরিয়া যায়। সুতরাং ইহা কিছুমাত্র অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে যে গঙ্গা ও যমুনা নদীর স্রোতের পরিবর্ত্তনের ফলে ইহাদের সঙ্গমস্থল একাধিকবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

সাধারণ যুক্তি ব্যতীত এ বিষয়ে কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণও আছে। চীন দেশীয় পরিব্রাজক হুয়েনসাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এদেশ ভ্রমণ করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে হিংস্রজন্তু-সমাকুল বনের মধ্য দিয়া ৫০০ লি (প্রায় ১০০ মাইল) গিয়া তিনি কৌশাম্বীতে উপনীত হন। হুয়েন সাংয়ের জীবনীতেও এই কথা আছে, এবং আরও বলা হইয়াছে যে প্রয়াগ হইতে কৌশাম্বী পৌছিতে তাঁহার সাতদিন লাগিয়াছিল। বর্ত্তমান কোশাম নামক স্থানই যে প্রাচীন কৌশাম্বী ইহা এখন সকলেই স্বীকার করেন। এই কোশাম গ্রাম এলাহাবাদ হইতে মাত্র ৩০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। সুতরাং হয় হুয়েন সাংয়ের জীবনী ও ভ্রমণ কাহিনী উভয়ই মিথ্যা, নচেৎ গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল এলাহাবাদ হইতে অন্ততঃ ৬০।৭০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমান এলাহাবাদের অদূরেই চিরকাল যাবৎ যমুনা নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে, এই ধারণার সহিত রামায়ণে বর্ণিত রামের বনবাস-যাত্রার কাহিনী এবং হুয়েন সাংয়ের বৃত্তান্ত, ইহার কোনটিরই সামঞ্জস্য বিধান করা যায় না। সুতরাং আমাদের এই চিরাচরিত ধারণা সত্য নাও হইতে পারে এবং বিভিন্ন যুগে যমুনা নদী কখনও এলাহাবাদের পূর্ব্বে এবং কখনও বা ইহার পশ্চিমে গঙ্গানদীর সহিত মিলিত হইত, এরূপ সম্ভাবনা একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের আলোচনায় প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয়া পড়িল। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস যাত্রার প্রথম পর্ব্ব এইখানেই শেষ করিতেছি।

কোর্টশিপের কোর্টমার্শাল

শ্রীহেমেন্দ্র মল্লিক

ট্রেণ ছাড়িতে মিনিট পাঁচ-সাত মাত্র বাকী ছিল। ইণ্টার ক্লাসের ক্ষুদ্র কামরাটিতে একাকী বসিয়া বিজয় বিশ্বাস বি-এ নিতান্ত স্বার্থপরের মতই কামনা ও কল্পনা করিতে-ছিল যে, জীবনে অন্তত একবারও সে নিরুপদ্রবে গোটা কামরার একমাত্র মালিকরূপে ঘণ্টা দুই ভ্রমণ করিতে পারিবে।

জীবন বীমার পলিসি ও সেকেণ্ডহাণ্ড মোটর বিক্রির দালালি প্রভৃতি কাজে তাহাকে এত অধিক ভ্রমণ করিতে হয় যে, একাকী একখানা কামরা দখল করিয়া নিজের কল্পনার সঙ্গী হইয়াও ইচ্ছামত শুইয়া-বসিয়া ভ্রমণ করার প্রলোভনটা তাহাকে প্রবলভাবেই পাইয়া বসিয়াছিল।

কল্পনার বিষয়ও বিজয়ের ছিল। কেননা, বয়স তাহার সাতাশ কি আটাশ এবং এখনও সে অবিবাহিত। এই অবস্থায় সকলেই সর্ব্বদা কল্পনা-বিলাসী হয় ইহা বলি না, তবে তাহার বর্ত্তমান ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কথা জানা থাকিলে তাহার এই সাময়িক কল্পনা-বিলাসকে অনায়াসেই ক্ষমা করা যায়।

একটি সিগারেট ধরাইয়া পকেট হইতে খামখানা আর একবার বাহির করিল বিজয়। চিঠিখানার মাঝের প্যারায় ছিল :

···নতুন এস-ডি-ও চমৎকার লোক। আমার সঙ্গে বেশ জমে গেছে এর মধ্যেই। সেদিন নিজে থেকেই একটা ভালো ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর কথা আমায় জিজ্ঞাসা করছিলেন।···ওদিকে ওঁর গৃহিণীও শুনছি এক-খানা ছোট মোটর কেনবার জন্ত ইদানীং ওঁকে রীতিমত বিপন্ন করে তুলেছেন, মানে হঠাৎ বেশী রকম আর বেড়ে গেলে যা হয় আর কি !···অযথা উৎসাহিত করার ইচ্ছে আমার নেই, তবে সংক্ষেপে, তোমার এখানে একটা ডাবল সেঞ্চুরির চমৎকার স্কোপ আছে বলে মনে হচ্ছে।

শরৎদার প্রথম সন্তানের অন্নপ্রাশনের সময়ে নিমন্ত্রণ পাইয়াও বিজয় আসিতে পারে নাই। এবারে দ্বিতীয় সন্তানের পালা। নিমন্ত্রণের পত্রের মধ্যেই এ-হেন ডাবল সেঞ্চুরীর প্রলোভন পাইয়া ক্রিকেটার বিজয় বিশ্বাস যে যথাসময়ে কৃষ্ণনগরের টিকিট কিনিয়া রওনা হইবে ইহা আর বিচিত্র কি ? কিন্তু মাত্র এইটুকুই যে তাহার কল্পনার বস্তু তাহা ভাবিলে ভুল হইবে। ভাবে বিভোর হইবার মত আরও কিছু ছিল। সেটুকু ছিল শরৎদার চিঠির শেষ প্রান্তে মাত্র দেড় দুই ছত্রের মধ্যে :—ভালো চাও তো এবারে আসতে ভুল কোরো না ঠাকুরপো, ভীষণ ঠকবে। টুনু আসছে।—বৌদি !

টুনু অর্থাৎ মিস বিভা সেনের বিষয়ে বিজয় কেন, যে কোন যুবকেরই কল্পনা প্রাণ ও উন্মনা হইবার অধিকার আছে এটুকু নিঃসন্দেহেই সর্ব্বত্র ঘোষণা করা চলে। চাক্ষুস আলাপ না থাকিলেও তাঁহার পরিচয় ও বর্ণনা এত অধিকবার বিজয় শুনিয়াছে যে, অন্য অনেকের মত সে-ও নিঃসংশয়ে নিশ্চিত ছিল যে শরৎদার শ্যালিকা মিস বিভা সেন একটি সুপার কোয়ালিটির এ-ওয়ান আধুনিক সুপাত্রী !

প্ল্যাটফর্মে গাড়ী ছাড়ার প্রথম ঘণ্টা পড়িল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাহার কামরার দরজার নিকট হইতে একটা বালক-কণ্ঠের উচ্চ চীৎকারে বিজয়ের কল্পনা-খেয়ার পাল ফুটা হইয়া গেল।

পরক্ষণে দরজা খুলিয়া হাফ-প্যাণ্ট ও সিল্কের সার্ট পরা একটি বছর দশেকের বালক চীৎকার করিয়া উঠিল, —এইখেনে, এইখেনে অনেক জায়গা আছে ছোট পিশিমা —ছুটে এসো !

বিজয় বিশ্বাসের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। ছেলেটির চীৎকারের মিনিটখানেকের মধ্যেই একটি এগারো বৎসরের বালক ও আট বৎসরের দুটি বালিকাকে সঙ্গে লইয়া একটি মহিলা আসিয়া কামরায় প্রবেশ করিলেন। দুই খানি বড় বড় সুটকেশ ও একটি প্রকাণ্ড ফলের ঝুড়ির সাহায্যে ট্রেন ছাড়িবার সেই স্বল্প অবসরের মধ্যেই তিনি ছোট কামরাখানি রীতিমত সরগরম করিয়া তুলিলেন···

২

মনে হয় ট্রেণে উঠিলে সকলেই একটু আধটু স্বার্থপর হইয়া ওঠে। কেননা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিবার পরক্ষণেই দেখা গেল ছোট পিসিমা কিরকম অবজ্ঞাপূর্ণ ও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বিজয়ের দিকে চাহিতেছেন! ভাবখানা যেন—এটা আবার কে? এটাকে বের করে দিতে পারলেই কামরাটা কেমন নিজেদের ঘরের মত হত।

ফলে বিজয় তাহার বেঞ্চের একেবারে প্রান্তদেশে সরিয়া বসিল! কাহারও সহিত, বিশেষ করিয়া কোন সুন্দরী তরুণীর সহিত—তা তিনি যতই স্বার্থ সর্বস্ব ও অহঙ্কারী হোন না কেন—কোনপ্রকার অপ্রিয় সম্পর্ক স্থাপন করিতে তাহার একেবারেই রুচি ছিল না।

কিন্তু বেঞ্চের অপর প্রান্তে সরিয়া বসিয়া ছোট পিসিমার ক্রুদ্ধ দৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা পাইলেও বালক ও বালিকা তিনটি অবিলম্বেই সমগ্র কক্ষটিকে নিজেদের রাজত্বে পরিণত করিয়া ফেলিল। এ-জানালায় ও-জানালায় ছুটাছুটি করিয়া এবং ঘন ঘন উচ্চ চীৎকার তুলিয়া তাহারা বিনা আয়াসে প্রমাণ করিয়া দিল যে বিজয় বিশ্বাসকে ছোট পিসিমা বারকয়েক রাগত দৃষ্টি উপহার দিয়া কিঞ্চিত আস্কারা দিলেও তাহারা বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করিতে রাজী নয়!

তমসাচ্ছন্ন কালরাত্রিরও প্রভাত হয়। শীঘ্রই বিজয়ের মুখাবয়বে একটা ক্ষীণ হাস্য-রেখা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিল। আট হইতে এগারো বৎসরের তিনটি বালক বালিকা লইয়া দিনের বেলায় ট্রেণে যাত্রা করার অভিজ্ঞতা ছোট পিসিমার সম্ভবতঃ ছিল না। কেননা, সপ্তম বার উচ্চকণ্ঠে—"ঝুঁকোনা ভানু—কতবার বলব?"—বলার সময়ে দেখা গেল যে তিনি রীতিমত অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন।

ভানু সাময়িকভাবে বাধ্যতার লক্ষণ প্রকাশ করিলেও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছোট পিসিমা পুনরায় ধমকাইয়া উঠিলেন, ওকি হচ্ছে মিনু, স্থির হয়ে একজায়গায় বসতে পারচো না?

মিনু অর্থাৎ কনিষ্ঠা বালিকাটি একপাশে বসিবার সঙ্গে সঙ্গে ভানু বলিয়া উঠিল, কেন?

ছোট পিসিমা কহিলেন, কি কেন?

ভানু কহিল, এক জায়গায় বসব কেন?

তোমাকে তো বলিনি, মিনুকে বলেছি।

কেন? সব বেঞ্চি-ই তো খালি আছে, একজায়গায় বসব কেন?

ছোট পিসিমা একবার সন্তর্পণে বিজয়ের দিকে চাহিয়া লইয়া কহিলেন, দুরন্তপনা করা কি ভালো?

ভানু আবার কি একটা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে পিসিমা আগ্রহের ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিলেন, ছাখো ছাখো, কি সুন্দর একপাল গরু চলেছে কেমন—

মিনু কহিল, ওরা কোথায় যাচ্ছে পিসিমা?

ওরা অন্য মাঠে যাচ্ছে—

কেন অন্য মাঠে যাচ্ছে?

অন্য মাঠে আরও ঘাস আছে বলে।

হঠাৎ ভানু প্রশ্ন করিল, ধোৎ—ও মাঠেও তো অনেক ঘাস আছে, তবে অন্য মাঠে যাচ্ছে কেন?

অন্য মাঠের ঘাস আরও ভালো বলে।

কেন? অন্য মাঠের ঘাস আরও ভালো কেন?

ছাখো ছাখো মিনু কি সুন্দর একটা পাখী বসে আছে তারের ওপরে!

ভানু কহিল, অন্য মাঠের ঘাস ভালো কেন ছোট পিসিমা?

মিনু কহিল, সব পাখী সুন্দর না কেন পিশিমা?

ছোট পিশিমা কহিলেন, ঈশ্বর যাকে যেমন করে সৃষ্টি করেছেন সে সেই রকমই হয়েছে।

ভানু কহিল, ঈশ্বরটা ভারী হিংসুটে!

ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই ভানু!

কেন? সব পাখীকে সুন্দর করলেই তো পারতো ঈশ্বর! হিংসুটে নয়তো কি?

পিসিমা আর একবার গোপনে চাহিলেন বিজয়ের দিকে। বিজয় বিশ্বাস পরম পরিতৃপ্ত ভাবে সিগারেট মুখে ছোটপিসিমার এই অভিনব নির্য্যাতন দৃশ্য উপভোগ করিতেছিল! কতকটা সেটি বুঝিতে পারিয়াই যেন তিনি আত্মরক্ষার নূতন একটি পন্থা আবিষ্কার করিয়া কহিলেন, তার চেয়ে একটা গল্প বলি শোনো!

চিনু, মিনু ও ভানু সাগ্রহে ছোটপিসিমার নিকটে আসিয়া বসিল।

৩

ছোটপিসিমা যে গল্প বলিতেও জানেন না—তাহাও শীঘ্রই প্রমাণিত হইয়া গেল। তাঁহার কাহিনীটি একটি অতি-সুন্দর ও অতি-বাধ্য বালিকার সম্বন্ধে। মেয়েটি এত সৎস্বভাবের ও বাধ্য-বশীভূত যে সকলেই তাহাকে ভালোবাসে। বাড়ীতে, স্কুলে, খেলার মাঠে—সর্ব্বত্রই! এত ভালোবাসে যে একদিন হঠাৎ একটি ক্ষিপ্ত মহিষের সম্মুখে পড়িয়া গেলেও চতুর্দিক হইতে সকলেই তাহাকে উদ্ধার করিতে ছুটিয়া আসে এবং মেয়েটি লক্ষ্মী হওয়ার জন্যই সে-যাত্রা প্রাণে বাঁচিয়া যায়!

চিনু সম্ভবতঃ গল্পের উদ্দেশ্যটুকু ধরিয়া ফেলিয়াছিল, সন্দিগ্ধ স্বরে ভুরু বাঁকাইয়া সে কহিল, দুষ্টু মেয়ে হলে কি কেউ বাঁচাতো না?

চমৎকার! ঠিক এই প্রশ্নটি বিজয়ও করিতে চাহিতেছিল ছোটপিসিমাকে!

ছোটপিসিমা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, তা বাঁচাতো, কিন্তু দুষ্টু মেয়ে হলে কি অত জোরে ওরা ছুটে আসতো?

এইবার চিনু তাহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিল। নাক সিঁটকাইয়া অপূর্ব্ব দৃঢ়তর স্বরে সে কহিল, ছাই গল্প, একেবারে বোকা গল্প!

ভানু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কহিল, আমি তো সবটা শুনিই নি। গোড়াতেই বুঝতে পেরেছি যে ওটা একটা গল্প-ই না!

কনিষ্ঠতম টিনু-ও টানিয়া টানিয়া কহিল, বি—চ্ছি—রি!

কিছু মনে করবেন না, গল্প বলায় আপনার তেমন হাত-যশ নেই বলে মনে হচ্ছে—বেঞ্চের প্রান্তদেশ হইতে বিজয় বলিয়া উঠিল।

চমকিত ভাবে মুখ তুলিয়া ছোটপিসিমা খানিকটা আত্মরক্ষা ও খানিকটা প্রতিশোধ লওয়ার ভঙ্গিতে কহিলেন, বুঝতে পারবে এবং ভালোও লাগবে এমন গল্প খুব কমই আছে ছোটদের জন্য—এটা জানবেন!

মাপ করবেন, আমি একমত হতে পারলাম না আপনার সঙ্গে!

ক্ষণকাল কি যেন চিন্তা করিয়া লইলেন তিনি। তাহার পর পরিপুষ্ট রঙ্গীণ ওষ্ঠাধরে ঝিলিকমারা একটুকরা হাসি টানিয়া আনিয়া কহিলেন, তাহলে আপনি বোধ হয় সেই রকম একটা গল্প বলতে পারেন ওদের?

চিনু ও ভানু এক সঙ্গে বিজয়ের কাছে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, বলুন না একটা গল্প!

মিনুও গুটি গুটি বিজয়ের পাশে আসিয়া বসিল।

ছোটপিসিমার দিকে বক্র কটাক্ষে একবার চাহিয়া বিজয় আরম্ভ করিল।

৪

এক সময়ে একটা খুব ভালো মেয়ে ছিল। খুব লক্ষ্মী মেয়ে সে, তার নাম-ও ছিল লক্ষ্মী!

এইটুকু শুনিয়াই ভানুর যেন মনে হইল, সব গল্প-ই একরকম, সে যেই-ই বলুক! অতিশয় নিরাশ ভাবে সে জানালার দিকে চাহিল।

সে যা বলে সব শোনে লক্ষ্মী। স্কুলে অনেক মেডেল পেয়েছিল সে—তার সৎস্বভাব, বাধ্যতা ও ভালো পড়াশুনার জন্যে!

চিন্তিত স্বরে চিনু প্রশ্ন করিল, কি রকম দেখতে সে? খুব সুন্দরী?

না, তোমাদের দুজনের মত নয়, কিন্তু সে ভয়ঙ্কর লক্ষ্মী মেয়ে!

সহসা ভানুর আগ্রহ ফিরিতে দেখা গেল। ভয়ঙ্কর লক্ষ্মী—এমন একটি অভিনব বিশেষণের মধ্যে যে নূতনত্ব আছে ইহা তাহার ক্ষুদ্র বিচার শক্তিতে সে বেশ বুঝিতে পারিল। ভয়ঙ্কর লক্ষ্মী সেই মেয়েটিকে সে যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাওয়ার মতই আগ্রহাবিষ্ট হইয়া পড়িল। ভাই-বোন সকলের মধ্যেই কাহিনীটির মনোহারিত্ব সম্বন্ধে একটা সমর্থনসূচক চোখচাওয়াচাওয়ি হইয়া গেল।

—মেয়েটির বিষয়ে সকলেই এত ভালো বলত যে শেষকালে দেশের রাজাও সেটা শুনতে পেলেন। তিন-তিনটে মেডেল পাওয়া মেয়েটি যে কত ভালো, সকলের মুখে সেটা শুনে তিনি নিজেও একটা পুরস্কার দিতে চাইলেন লক্ষ্মীকে। রাজার একটা মস্ত বাগান ছিল শহরের বাইরে। তিনি লক্ষ্মীকে সপ্তাহে একবার সেই সুন্দর বাগানে বেড়াবার অনুমতি দিলেন।

ভানু প্রশ্ন করল, বাগানে ছাগল ছিল?

না, একটাও ছাগল ছিল না।

কেন, ছাগল ছিল না কেন ?

বিজয় এই সময় গোপনে লক্ষ্য করিল কামরার অপর প্রান্তে উপবিষ্টা ছোটপিসিমার মুখেও যেন একটু হাসি দেখা দিয়াছে !

কেন জানো ? রাজার বৃদ্ধা মা একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, একপাল ছাগল এসে তাঁর ছেলেকে মেরে ফেলেছে। সেই থেকে তিনি সকলকে বারণ করে দেন যেন রাজবাড়ীর কোথাও কোন ছাগল না থাকে।

ছোটপিসিমার মুখমণ্ডলে একটা মুগ্ধ প্রশংসার আলো যেন চকিতের জন্য চিকমিক করিয়া বিজয়ের সঙ্গে চোখাচোখী হইতেই পুনরায় মিলাইয়া গেল।

ভানু কহিল, রাজা সত্যিই ছাগলের হাতে মারা গেছল' নাকি ?

না, তিনি এখনও বেঁচে আছেন। শেষ পর্য্যন্ত কিসে মরেন সেটা কি এখন বলা যায় ? বাগানে একটাও ছাগল ছিল না কিন্তু একপাল শুয়োর ছিল !

চিনু কহিয়া উঠিল, শুয়োর ? ফুল ছিল না ?

না, আগে অনেক ফুলগাছে অনেক রং-বেরং-এর ফুল হত। কিন্তু মালীরা যখন এসে নালিশ করলে যে শুয়োরের পাল সব ফুল খেয়ে ফেলছে, তখন রাজা বললেন, দূর করে দাও ফুল, ফুল চাই না,—শুয়োরই ভালো !

বিজয় লক্ষ্য করিল যে তাহার শ্রোতা তিনটি এবার যারপর নাই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। রাজার সুন্দর পছন্দ সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা ও পূর্ণ সমর্থনের ভাব তাহাদের মুখে চোখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

লক্ষ্মী বাগানে এসে বড়ই নিরাশ হল। বাড়ীতে মাসীদের কাছে সে কথা দিয়ে এসেছিল যে রাজার বাগানে একটাও ফুল সে তুলবে না। এখন কোথাও কোন ফুল দেখতে না পেয়ে সে যেন কেমন বোকা বনে গেল। ফুলই নেই যখন তখন সে যে কত বাধ্য সেটা দেখাবে কি দিয়ে ? নিরাশ ভাবটা মনে চেপে রেখে সে অনেকক্ষণ বেড়ালো সেই বাগানে। চারিদিকে কত পুকুর—পুকুরে কত রঙ্গীন মাছ ! কত রকমের পাখী। যত ভালো ভালো গানের সুর যেন তাদের গলায় শুনতে পেল লক্ষ্মী ! সে বার বার ভাবলো, ভাগ্যিস আমি খুব ভালো মেয়ে, তাইত এমন সুন্দর বাগানে আসতে পেলাম ! তার ফ্রকে আটকানো মেডেল তিনটেও যেন আনন্দে ও অহঙ্কারে অধীর হয়ে গায়ে-গায়ে ঠোকাঠুকি আরম্ভ করে দিল !

হঠাৎ দূর থেকে গোটাকতক বাচ্চা শুয়োর তার ধবধবে সাদা জামা দেখে ছুটে এলো সেই দিকে !

কনিষ্ঠা মিনু প্রশ্ন করিল—কি রংএর ?

শুয়োরগুলো ? সুন্দর কাদা রং-এর। মাথার কাছে শাদায়-কালোয় মেশানো। তারা তার দিকে তেড়ে আসছে দেখে লক্ষ্মীও ছুটতে লাগলো ভয় পেয়ে। কিন্তু কোথায় যাবে সে ? মস্ত বড় বাগান, কেউ কোথাও নেই, কে-ই বা তাকে বাঁচাবে ! বুকের মধ্যে তার ঢিপ-ঢিপ করতে লাগলো। সে ভাবলো—ভালো মেয়ে না হলে কি এই বিপদ আমার হয় ? দুষ্টু মেয়ে হলে কেমন সকলের সঙ্গে খেলা করতে পারতাম, কিচ্ছুই হত না আমার ! হঠাৎ কাছে একটা ঘন ঝোপ দেখতে পেয়ে একলাফে সে তার মধ্যে গিয়ে লুকালো !

শুয়োরগুলো সেখানে পৌঁছিয়ে আর দেখতে পেল না লক্ষ্মীকে। চারিদিকে ঘোঁৎ—ঘোঁৎ করে তারা খুঁজতে লাগলো তাকে। কিন্তু লক্ষ্মী তখন নিশ্বাস বন্ধ করে চুপচাপ রয়েছে সেই ঝোপের মধ্যে বসে। কিছুক্ষণ খুঁজে তারা নিরাশ হয়ে চলে যাচ্ছিল এমন সময় লক্ষ্মীর ফ্রকে আটকানো মেডেল তিনটের ঠোকাঠুকির শব্দ হল। শুয়োরগুলো চমকে দাঁড়িয়ে পড়লো ! আবার শব্দ হল সেই মেডেলের ! ব্যস্। এক লাফে ঝোপের মধ্যে ঢুকে ওরা লক্ষ্মীকে টেনে ছিঁড়ে, কামড়ে কুটি কুটি করে ফেললো ! শেষ পর্য্যন্ত রইল কেবল সেই মেডেল তিনটে। লক্ষ্মী হওয়ার, বাধ্য হওয়ার ও ভালো পড়া শুনা করার পদকের জন্যই তাকে মরতে হল সেই শুয়োরদের হাতে !

সাগ্রহে ভানু প্রশ্ন করিল, শুয়োর বাচ্চারা কেউ মরেনি তো ?

না, তারা সব পালিয়ে গেল।

৫

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ চাপ। ট্রেণখানা দ্রুতবেগে ছোট একটি ষ্টেশনের পাশ দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

মত প্রকাশ করিল কনিষ্ঠা মিনুই সকলের আগে, গোড়ার দিকটা ভালো না, কিন্তু শেষটা কি সুন্দর !

তাহার দিদি অর্থাৎ চিনু গদ গদ স্বরে কহিল, খুব চমৎকার গল্প !

ভানু দৃঢ়স্বরে কহিল, এমন গল্প আমি কক্ষনো শুনিনি।

ছোট পিসিমার সঙ্গে আর একবার চোখাচোখী হইল বিজয়ের। সম্মুখ যুদ্ধে হারিয়া পার্শ্বদেশ আক্রমণের ভঙ্গিতে তিনি উষ্ণ স্বরে কহিলেন, এরকম নীতিহীন গল্প ছেলে-মেয়েদের কক্ষনো বলা উচিত নয়। ওদের অনেক-দিনের অনেক শিক্ষার গোড়ায় আঘাত করেছেন আপনি।

কৃষ্ণনগর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় ট্রেণের গতি হ্রাস হইয়াছিল। নিজের সুটকেসখানা হাতে লইয়া সহাস্যে বিজয় কহিল, আমার দুর্ভাগ্য যে আর একবার আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল হল না। যাক্— আমাকে নামতে হবে এবার। ভবিষ্যতে কোনদিন দেখা হলে ওদের বিষয়ে জানতে চাইব আপনার কাছে! আমার একটা অনুরোধ ঐ রকম নীতিহীন গল্প বলবেন ওদের মাঝে মাঝে—এই যে—আচ্ছা, আসি···

বিজয় দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িল কৃষ্ণনগর ষ্টেশনের কাঁকর বিছানো প্ল্যাটফর্মে, কিন্তু যাহার উপরে পড়িল তিনি সজোরে তাহার একটি হাত চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—আরে, তোমরা যে দিব্যি এক সঙ্গেই এলে দেখছি! এসো এসো টুনু—কিরে চিনু তোরা কেমন আছিস সব—দাঁড়া বিজয়, একসঙ্গেই যাবো সবাই ···এই কুলী···

বিজয় স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক! মনে হইল, ছোটপিসিমা, অর্থাৎ টুনু—অর্থাৎ মিস বিভা সেনও কম স্তম্ভিত হন নাই! বিস্ময়, পুলক ও বিমূঢ়ভাব মিশ্রিত তাঁহার তৎকালীন মুখভঙ্গি শরৎ-দার পাশে দাঁড়াইয়া বিজয় বিশ্বাস প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে লাগিল।

ষ্টেশনের বাহিরে শরৎদার মোটরের সম্মুখে আসিতেই গাড়ীর ভিতর হইতে মাথা বাহির করিয়া বৌদিদি কহিলেন, আরে একি? সবাই যে একসঙ্গে? কিন্তু এটা ভালো হল না ঠাকুরপো! এরকম চুরি করে কোর্টশিপ মেরে নিলে চলবে না তা বলে দিচ্ছি—আমার ঘটকী বিদায় আমি ছাড়বো না!

শরৎ-দা গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়া কহিলেন, থামো থামো— তুমি যে গাছে না উঠতেই এক কাঁদির মত করলে!

মিনু ও ভানুকে যথাক্রমে ক্রোড়ে ও পার্শ্বদেশে বসাইয়া সম্মুখের সীট হইতে বিজয় কহিল, আপনার দক্ষিণার কথাটায় আমার কোনই আপত্তি নেই বৌদি, যদি প্রথম দিকটায় উনি আপত্তি না করতেন!

বিভা সেন ও চিনুকে লইয়া গাড়ীতে বসিতে বসিতে বৌদিদি কহিলেন, কেন? গোলমালটা কিসের ঠাকুরপো?

ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠন সম্বন্ধে উনি আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারলেন না!

সশব্দে হাসিয়া উঠিয়া শরৎ-দা কহিলেন, অসম্ভব! আমাদের টুনু কখনো কারো কাছে হার মানেনি!

বৌদিদি কহিলেন, তুমি তাহলে চিনতেই পারোনি মিস বিভা সেনকে!

মিস বিভা সেনের পার্শ্ব আক্রমণ তখনও থামে নাই। তিনি কহিলেন, তাতো হল, কিন্তু হেরে গেলে উনি কি করবেন?

শরৎ-দা কহিলেন, কি আবাব করবে? ওর বড় বোনের কাছে হেরে আমি যা করছি,—নতুন করে সব শিখবে? তুই অত হাসছিস কেনরে চিনু?

আনন্দ-আবদারের ভঙ্গিতে চিনু কহিল, আমরা কেমন রোজ রোজ ছোটপিসেমশায়ের কাছে গল্প শুনবো!

শরৎ-দা সহাস্যে কহিলেন, এ্যাঁ, তুই যে কোর্টশিপের কোর্টমার্শাল করে ছাড়লিরে চিনু!

নূতন শাসনতন্ত্রের রূপ

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ

(১) ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে ইহা ভারতকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। ইহার তাৎপর্য্য মোটামুটি তিনটী। (ক) ভারতের নূতন রাষ্ট্র সর্বতোভাবে স্বাধীন। দেশের অভ্যন্তরে এবং সীমানার বাহিরে ইহার ক্ষমতা অপ্রতিহত। সম্প্রতি ইহা রাষ্ট্রীয় সমবায়ের সদস্যহিসাবে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে কিন্তু ভারত স্বেচ্ছায়ই সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। ঐ চুক্তি গণপরিষদের অনুমোদনসাপেক্ষ ছিল। (খ) ভারত হিট্‌লারী শাসন নহে; ইহা গণতন্ত্র, জনসাধারণের শাসন। রাষ্ট্রের আসল ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে। শাসনতন্ত্রের মুখবন্ধে লিখিত আছে, "আমরা, ভারতের জনগণ, মিলিতভাবে এই শাসনতন্ত্র রচনা, অনুমোদন ও গ্রহণ করিতেছি।" (গ) ভারত সাধারণতন্ত্র। যে রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হন প্রজাদিগের নির্বাচিত প্রতিনিধি তাহাকেই সাধারণতন্ত্র বলে। অবশ্য দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্তি হওয়ায় ভারতের সাধারণতান্ত্রিক অবস্থা খানিকটা কলুষিত হইয়াছে। কারণ এ সমস্ত দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণ প্রজাগণ কর্তৃক নির্বাচিত নন, উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহারা তাঁহাদের সিংহাসন দখল করিয়াছেন। এগুলি রাজতন্ত্র যাহা সাধারণতন্ত্রের বিপরীত।

(২) ভারতের শাসনতন্ত্র যৌক্তরাষ্ট্রিক (federal)। ইহার প্রধান লক্ষণ হইল—দুই তরফের সরকার পাশাপাশি বিরাজ করিবে, একটি কেন্দ্রীয়, বাকীগুলি স্থানীয় এবং ইহাদের প্রত্যেকেই এক একটি নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ক্ষমতার অধিকারী। লিখিত শাসনতন্ত্র, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নিয়মিত বণ্টন এবং শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা করিবার ও অংশগুলির মধ্যে বিবাদ মিটাইবার জন্য একটি সর্বোচ্চ আদালত—ইহারা হইল যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান অঙ্গ। এই বিবেচনায় নূতন শাসনতন্ত্রে ভারত যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু এই যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকিবে। (ক) আমেরিকায় রাষ্ট্রিকত্ব (citizenship) দ্বিখণ্ডিত; যুক্ত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকত্ব আর স্থানীয় রাষ্ট্রগুলির রাষ্ট্রিকত্ব দুইটী বিভিন্ন অবস্থা। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রিকগণ দেশের সর্বত্র সমান অধিকার ভোগ করিবে এবং সমান দায়িত্ব পালন করিবে। কেন্দ্র এবং অংশ বিশেষের মধ্যে রাষ্ট্রীয় অধিকার ও কর্তব্যের কোন প্রভেদ থাকিবে না। (খ) আমেরিকার স্থানীয় রাষ্ট্রগুলি নিজেদের শাসনতন্ত্র পৃথক্‌ভাবে রচনা করিয়াছে এবং সংশোধনও করে। ভারতের শাসনতন্ত্র অমোঘ এবং প্রদেশগুলির উপর সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। (গ) অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রগুলি চিরন্তন যুক্তরাষ্ট্র। তাদের আকার অপরিবর্তনীয়। কিন্তু ভারতের শাসনতন্ত্র এমনিভাবে পরিকল্পিত যে যুদ্ধের সময় বা অন্য কোনও জরুরী অবস্থায় তাহা একক রূপ গ্রহণ করিতে পারিবে। রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্রের ৩৫২ ধারায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া একক (unitary) শাসন প্রবর্তন করিতে পারিবেন। (ঘ) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ক্যানাডার অনুরূপ কিন্তু আমেরিকা বা অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভিন্ন, কারণ শাসনতন্ত্রের অবশিষ্ট ক্ষমতা (residuary powers) কেন্দ্রের হাতে।

(৩) নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভারতের শাসনযন্ত্র হইবে নামত রাষ্ট্রপতিমূলক (Presidential) কিন্তু কার্য্যত মন্ত্রিসভামূলক (Parliamentary)। বর্তমান রাজনীতির প্রচলিত মাপকাঠিতে আমেরিকা প্রথমটীর নমুনা, ইংলণ্ড দ্বিতীয়টীর। আমেরিকার সহিত ভারতের শাসনযন্ত্রের থাকিবে কেবল নামের সাদৃশ্য। আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি আছে, ভারতেও তাহাই থাকিবে। আমেরিকায় রাষ্ট্রগুলির শাসনকর্তার নাম Governor, ভারতের প্রদেশগুলিতেও ঐরূপ প্রদেশপাল থাকিবেন। কিন্তু আসল ক্ষমতার দিক হইতে শাসনতন্ত্র প্রণেতাগণের ইহাই ইচ্ছা যে, ভারত হইবে ইংলণ্ডের অনুরূপ; অর্থাৎ ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রদেশপালগণ স্ব স্ব মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে চলিবেন। মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্য হইবেন এবং সবসময়ে ইহার অধিকাংশ সদস্যের আস্থাভাজন থাকিবেন। পক্ষান্তরে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি তাঁর সচিবদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য নন; তাঁহারা আমেরিকার কংগ্রেস বা কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য নন এবং রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে অপসারিত করিতে পারেন।

(৪) ভারতীয় শাসনতন্ত্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহাতে রাষ্ট্রিকগণের (citizens) মৌলিক অধিকারের (fundamental rights) উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। প্রত্যেকের সমান সুযোগ, মতামত, ধর্ম ও সংগঠন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার এবং আরও অনেক রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকার করিয়া এবং অস্পৃশ্যতা বর্জন করিয়া একটি বিস্তৃত মৌলিক অধিকারের তালিকা শাসনতন্ত্রের তৃতীয় অংশে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, এগুলি আইনের ন্যায় বলবৎ (justiciable) অর্থাৎ ইহাদের কোনটী ক্ষুণ্ণ হইলে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালতে প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকিবে। আমেরিকার শাসনতন্ত্রে গোড়ার দিকে এরূপ কোন অধিকার তালিকাভুক্ত ছিল না, পরে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিয়া সে ভুল সংশোধন করা হয়। ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার শাসনতন্ত্রে এখনও কোন রাষ্ট্রিক অধিকার স্থান পায় নাই। মৌলিক অধিকারের কথার উল্লেখ না থাকিলে লিখিত শাসনতন্ত্র যে অঙ্গহীন হইয়া পড়ে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়নে যে স্তরের মনীষা নিযুক্ত হইয়াছিল, যেরূপ

দীর্ঘকাল ধরিয়া আলোচনা চলিয়াছিল এবং যে সুদীর্ঘ আয়তনের খসড়াটী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আশা করা গিয়াছিল যে সম্পূর্ণ নিখুঁত না হইলেও ইহা মোটামুটি ত্রুটিবর্জিত হইবে। কিন্তু দেশবাসীর সে আশা পূর্ণ হয় নাই। মনোযোগ সহকারে বিশ্লেষণ করিলে ইহার কতকগুলি মারাত্মক গলদ স্পষ্ট হইয়া পড়ে।

(১) নূতন শাসনতন্ত্রে মৌলিক ভাবধারার অভাব পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য ১৯৪৯ সনে যে শাসনতন্ত্র রচিত হইতেছে তাহা যে পৃথিবীর বিখ্যাত, সুপ্রতিষ্ঠিত, শাসনতন্ত্রগুলির প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইবে এরূপ আশা করা সমীচীন নহে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নূতন শাসনতন্ত্রের মুলধারাগুলির অধিকাংশ বৃটিশ রচিত ১৯৩৫এর ভারত শাসন আইন হইতে অক্ষরে অক্ষরে উদ্ধৃত। ঐ আইনের উদ্দেশ্য ছিল কথার মার-পেঁচে, বিশেষ ক্ষমতার বেড়াজালে ভারতীয় জনসাধারণের উপর স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ ও উৎপীড়ন। ইহার অনেক ধারা ইচ্ছাপূর্বক দ্ব্যর্থবোধক করা হইয়াছিল। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র বৃটিশ আমলের ভারত শাসন আইনের দেশী সংস্করণ বলিলে চলে। ফলে ইহার অবস্থা অনেকটা ময়ূরপুচ্ছধারী কাকের ন্যায় হইয়াছে।

(২) নূতন শাসনতন্ত্রে ভারতের ঐতিহ্য ও প্রাচীন রাজনৈতিক প্রথাকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। গ্রামবহুল ভারতে গ্রাম্য পঞ্চায়েতই ছিল শাসনব্যবস্থার ভিত্তি। ইহারই উপর নির্ভর করিয়া ভারত প্রাচীন-কালে শান্তি, মৈত্রী, শৃঙ্খলা ও সুশাসনের গৌরবময় শিখরে আরোহণ করিয়া জগতের আদর্শ হইয়াছিল। নূতন শাসনতন্ত্রে গ্রাম এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ কোনটাই স্থান পায় নাই। ইংরাজ দার্শনিক ডাইসী (Dicey) বলিয়াছিলেন যে, কতকগুলি বৃক্ষ আছে যাহারা সব দেশে জন্মায় না, ইহাদের প্রত্যেকের জন্য বিশেষ বিশেষ জমি ও আবহাওয়া প্রয়োজন; শাসনতন্ত্রও সেই ধরণের। এক দেশের শাসনতন্ত্র অন্য দেশের উপর চাপানোর চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হইবার সম্ভাবনা নাই।

(৩) নূতন শাসনতন্ত্রে 'রাষ্ট্র' (State) কথাটা এরূপ বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে যে তাহাতে কেবলই অনর্থ ও জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। কখনো ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে সাধারণভাবে ভারতীয় রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক শক্তিকে বোঝাইবার জন্য, কখনো বা প্রদেশগুলিকে, আবার কখনো দেশীয় রাজ্যগুলিকে রূপদান করিবার জন্য। শাসনতন্ত্রের ভাষা যতদূর সম্ভব সুস্পষ্ট হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেই হিসাবে প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি এতদিন যে নামে খ্যাত ছিল তাহা বজায় রাখিলে ভাষার সরলতার দিক থেকে শাসনতন্ত্র লাভবান হইত।

(৪) লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হইল—বিভিন্ন শাসনযন্ত্রের ক্ষমতা ও ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, যাহাতে তাহাদের মধ্যে বিবাদ বা সংঘর্ষের সম্ভাবনা কমে। কিন্তু ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে অনেক ধারাগুলি পরস্পরবিরোধী ও জটিলতাবর্দ্ধক। সেই কারণে সম্প্রতি স্যার উইলিয়ম আইভর জেনিংসের (Sir William Ivor Jennings) ন্যায় শাসনতান্ত্রিক পণ্ডিত মন্তব্য করিয়াছেন যে ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে ব্যবহারজীবীগণ বিশেষ লাভবান হইবেন। পদে পদে ইহার বিভিন্ন ধারা লইয়া ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবে। বিশেষত কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি ও তাঁহার মন্ত্রিসভা এবং প্রদেশে প্রদেশপাল ও তাঁহার মন্ত্রিসভার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ক্ষমতা সংক্রান্ত ধারাগুলি অস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থবোধক। শাসনতন্ত্রের ৫৩(১) নং ধারায়কেন্দ্রের শাসনক্ষমতা (executive power) একমাত্র রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত হইয়াছে। ৭৪ (১) নং ধারায় মন্ত্রিসভার ব্যবস্থা আছে যাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করিবেন ও পরামর্শ দিবেন।

ইংরাজী 'shall' কথাটার উপর জোর দিয়া ডাঃ আম্বেদকর গণপরিষদে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার কর্তব্যপালনে সাহায্য করিবেই এবং পরামর্শ দিবেই। অন্যান্য শাসনতন্ত্র প্রণেতাগণেরও অনুরূপ ইচ্ছা ছিল। পণ্ডিত নেহেরু এবং সদার প্যাটেলও গণপরিষদে ঐরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। উপনিবেশ-গুলির শাসনতন্ত্রে ও ভাষার ঐরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু ৭৫ (১) ধারায় বলা হইয়াছে যে প্রধান মন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং ৭৫ (২) ধারা অনুসারে তাঁহারা রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুসারে পদে বহাল থাকিবেন। প্রদেশের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ধারা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

কালের মন্দিরা
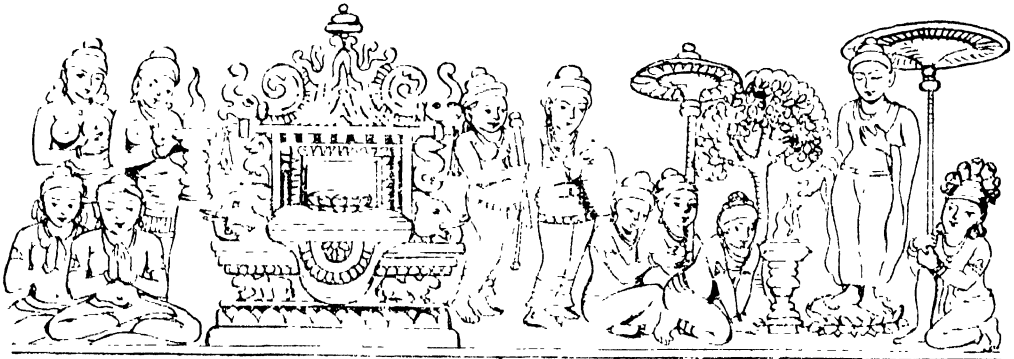
শ্রী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রাসাদ শিখরে

আকাশে প্রায় পূর্ণাবয়ব চন্দ্র। চন্দ্রালোকে কপোতকূট নগর অতি সুন্দর দেখাইতেছিল।

বিটঙ্ক রাজ্যটি পারিপার্শ্বিক ভূখণ্ড হইতে উচ্চে মালভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। মালভূমিও সমতল নয়, তরঙ্গায়িত হইয়া প্রান্ত হইতে যতই কেন্দ্রের দিকে গিয়াছে ততই উচ্চ হইয়াছে। কেন্দ্রস্থলে কপোতকূট নগর। রাজ্যের সর্বোচ্চ শিখরের উপর অধিষ্ঠিত বলিয়াই বোধহয় ইহার নাম কপোতকূট।

নগরটি রাজ্যের ক্ষুদ্র সংস্করণ; কোথাও সমভূমি নয়। চারিদিকে উচ্চ প্রাকারের দৃঢ় পরিবেষ্টনী; তন্মধ্যে মহেশ্বরের জটাজালবদ্ধ চন্দ্রকলার ন্যায় অপূর্ব সুন্দর নগর শোভা পাইতেছে।

বসন্ত রজনীতে চন্দ্রবাষ্পাচ্ছন্ন দীপালোকিত নগরের সৌন্দর্য শতগুণ বর্ধিত হইয়াছিল। পথগুলি আঁকাবাঁকা, দুই পাশে পাষাণ নির্মিত হর্ম্য। মাঝে মাঝে প্রমোদ বন; পথের সন্ধিস্থলে জলাধারের মধ্যবর্তী গোমুখ হইতে প্রস্রবণ ঝরিয়া পড়িতেছে। উল্কা-ধারিণী পাষাণ বনদেবীর মূর্তি রাজপথে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। বহু নাগরিক-নাগরিকা বিচিত্র বেশ প্রসাধনে সজ্জিত হইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতেছে, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না নিষিক্ত বায়ু সেবন করিয়া দিবসের তাপ-গ্লানি দূর করিতেছে। প্রমোদ বন হইতে কখনও বংশীরব উঠিতেছে; কোথাও লতা নিকুঞ্জ হইতে মৃদু জল্পিতপ্রায় কূজন ও অস্ফুট কলহাস্য উত্থিত হইতেছে; কঙ্কন মঞ্জীরের ঝঙ্কার কখনও কৌতুকে উল্লসিত হইয়া উঠিতেছে, কখনও আবেশে মদালস হইয়া পড়িতেছে। কপোতকূটে কপোত-মিথুনের অভাব নাই।

নগরীর একটি পথ দীপমালায় উজ্জ্বল। বিলাসিনী নাগরিকার ন্যায় রাত্রিকালেই এই পথের শোভা অধিক, কারণ প্রধানতঃ ইহা বিলাসের কেন্দ্র। পথের দুই পাশে অগণিত বিপণি; কোনও বিপণিতে কেশর সুরভিত তাম্বূল বিক্রয় হইতেছে, বিক্রেত্রী রক্তাধরা চঞ্চলাক্ষী যুবতী। ক্রেতার অপ্রতুল নাই, রূপশিখালুব্ধ নাগরিকগণ চারিদিকে ভিড় করিয়া আছে; চপল পরিহাস, সরস ইঙ্গিত, লোল কটাক্ষের বিনিময় চলিতেছে। যে পসারিণী যত সুন্দরী ও রসিকা, তাহার পণ্য তত অধিক বিক্রয় হইতেছে।

বিপণির ফাঁকে ফাঁকে মদিরাগৃহ। পিপাসু নাগরিকগণ সেখানে গিয়া নিজ নিজ রুচি অনুসারে গৌড়ী মাধ্বী পান করিতেছে। আসবে যাহাদের রুচি নাই তাহারা কপিত্থ সুবাসিত তক্র বা কলাম্ররস সেবন করিয়া শরীর শীতল করিতেছে। মদিরাগৃহের অভ্যন্তরে বহু কক্ষ; কক্ষগুলি সুসজ্জিত, তাহাতে আস্তরণের উপর বসিয়া ধনী বণিক-পুত্রগণ দ্যূতক্রীড়া করিতেছে। কোনও কক্ষে মৃদঙ্গ সপ্তস্বরা সহযোগে সঙ্গীতের চর্চা হইতেছে। মদিরাগৃহের কিঙ্করীগণ চষক ও ভৃঙ্গার হস্তে সকলকে আসব যোগাইতেছে।

নগর নারীদের গৃহদ্বারে পুষ্পমালা দুলিতেছে; অভ্যন্তর হইতে মৃদু রক্তাভ আলোকরশ্মি ও যন্ত্রের স্বপ্নমদির নিক্বণ পথচারীকে উন্মন করিয়া তুলিতেছে। পথে সুখান্বেষী নাগরিকের মন্থর যাতায়াত, কুসুমের মদমোহিত গন্ধ, প্রসাধন ও ভূষণাদির বৈচিত্র্য, কচিৎ কৌতুক-বিগলিতা নারীর কণ্ঠ হইতে বিচ্ছুরিত হাস্য, কচিৎ কলহের কর্কশ রূঢ়স্বর—এই সব মিলিয়া এক অপূর্ব সম্মোহন সৃষ্টি করিয়াছে।

বিলাস বিহ্বলতার আবর্ত হইতে দূরে নগরের আর একটি কেন্দ্র—রাজপুরী। পূর্বেই বলিয়াছি—নগর সর্বত্র সমভূমি নয়, কোথাও উচ্চ কোথাও নীচ। যে ভূমির উপর রাজপুরী অবস্থিত তাহা নগরীর মধ্যে সর্বোচ্চ, নগরীতে

প্রবেশ করিয়া চক্ষু তুললেই সর্বাগ্রে রাজপুরীর ভীমকান্তি আয়তন চোখে পড়ে, মনে হয় কপোতকূট দুর্গের মধ্যস্থলে আর একটি দুর্গ সগর্বে মাথা তুলিয়া আছে।

প্রথমে প্রাকার বেষ্টন; স্থূল চতুষ্কোণ প্রস্তরে নির্মিত—প্রস্থে দ্বাদশ হস্ত, দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্ধ ক্রোশ—বলয়ের ন্যায় চক্রাকারে পুরভূমিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। প্রাকারের অভ্যন্তরে সুড়ঙ্গ আছে; কিন্তু সে কথা পরে হইবে। নগরীর প্রধান পথ যেখানে আসিয়া প্রাকার স্পর্শ করিয়াছে সেইখানে উচ্চ তোরণদ্বার। ইহাই রাজপুরী হইতে আগম নিগমের একমাত্র পথ। শলাকা কণ্টকিত লৌহের বিশাল কবাট; দুই পাশে স্থূল বর্তুল তোরণ স্তম্ভ; তোরণ স্তম্ভের অভ্যন্তরে প্রতীহার গৃহ। শূলহস্ত প্রতিহার দিবারাত্র তোরণ পাহারা দিতেছে।

তোরণ অতিক্রম করিয়া সম্মুখেই সভাগৃহ। তাহার পশ্চাতে মন্ত্রগৃহ। অতঃপর দক্ষিণে বামে বহু ভবন—কোষাগার আয়ুধগৃহ যন্ত্রভবন—কাছাকাছি হইলেও প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র দণ্ডায়মান। মধ্যস্থলে রাজ অবরোধের মর্মরনির্মিত ত্রি-ভূমক প্রাসাদ—সাত কৌটার মধ্যস্থিত মৌক্তিক, সাতশত রাক্ষসীর বিনিদ্র সতর্কতা যেন নিরন্তর তাহাকে ঘিরিয়া আছে। দ্বারে দ্বারে যবনী প্রতীহারীর পাহারা।

এই ত্রিভূমক প্রাসাদের উন্মুক্ত ছাদে পুষ্পাকীর্ণ কোমল পক্ষ্মল আস্তরণের উপর অর্ধশয়ান হইয়া রাজকুমারী রট্টা যশোধরা প্রিয়সখী সুগোপার সহিত কথা কহিতেছিলেন। কথা এমন কিছু নয়, আকাশের দিকে চাহিয়া অলসকণ্ঠে দু'একটি তুচ্ছ উক্তি, তারপর নীরবতা, আবার দু'একটি তুচ্ছ কথা। এমনি ভাবে আলাপ চলিতেছিল। যেখানে মনের মধ্যে বিচ্ছেদ নাই, সেখানে অবিচ্ছেদ কথা বলার প্রয়োজন হয় না।

প্রপাপালিকা সুগোপার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় আছে। কুমারী রট্টা যশোধরাকেও তিনি দেখিয়াছেন, হয় তো চিনিতে পারেন নাই। যিনি কিশোর কার্তিকেয় বিদ্যুতের মত সুগোপার জলসত্রে দেখা দিয়াছিলেন, যাঁহার অশ্ব চুরি করিয়া চিত্রক পলায়ন করিয়াছিল, তিনি আর কেহ নহেন মৃগয়াবেশধারিণী রাজনন্দিনী রট্টা। হূণ-দুহিতা পুরুষবেশে মৃগয়া করিতে ভালবাসিতেন।

কবি কালিদাস বলিয়াছেন, বল্কল পরিধান করিলে সুন্দরী তন্বীকে অধিক সুন্দর দেখায়। হয় তো দেখায়, আমরা কখনও পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। কিন্তু যোদ্ধৃবেশ ধারণ করিলে রূপসীর রূপ বর্ধিত হয় একথা স্বীকার করিতে পারিব না। ভাল দেখাইতে পারে, কিন্তু অধিক সুন্দর দেখায় না। আমরা বলিব, কুমারী রট্টার মত যিনি তন্বী ও সুন্দরী, যাঁহার বয়স আঠার বৎসর—তিনি অলকগুচ্ছ কুন্দকলি দ্বারা অনুবিদ্ধ করুন, লোধ্ররেণু দিয়া মুখের পাণ্ডুশ্রী আনয়ন করুন, চূড়াপাশে নব কুরুবক ধারণ করুন, কর্ণে শিরীষ পুষ্পের অবতংস দুলাইয়া দিন, হৃৎস্পন্দনের তালে মণী-কঙ্কণ নৃত্য করিতে থাকুক, নাবিবন্ধে কর্ণিকার কাঞ্চী মূর্ছিত হইয়া থাক—লোভী পুরুষ তো দূরের কথা, অনসূয়া সখীরাও ফিরিয়া ফিরিয়া সে রূপ দেখিবে।

তেমনই, পুষ্পাভরণভূষিতা রট্টার পানে সখী সুগোপাও থাকিয়া থাকিয়া বিমুগ্ধ নেত্রে চাহিতেছিল। দুই সখীর মধ্যে গভীর ভালবাসা। রাজকন্যাও যখন সুগোপার পানে তাঁহার অলস নেত্রটি ফিরাইতেছিলেন, তখন তাঁহার হিমকরস্নিগ্ধ দৃষ্টি অকারণেই সখীকে প্রীতির রসে অভিষিক্ত করিয়া দিতেছিল। দুইজনে আশৈশব খেলার সাথী; যৌবনে এই প্রীতি আরও গাঢ় হইয়াছিল। সুগোপার স্বামী সংসার সবই ছিল, কিন্তু তাহার জীবন আবর্তিত হইত রট্টাকে কেন্দ্র করিয়া। আর, বিশাল রাজ অবরোধের মধ্যে একাকিনী কুমারী রট্টা—তিনিও এই বাল্য সখীকে একান্ত আপনার জানিয়া বুকে টানিয়া লইয়াছিলেন।

তবু, রাজকন্যার সহিত প্রপাপালিকার ভালবাসা, বিস্ময়কর মনে হইতে পারে। কিন্তু এতই কি বিস্ময়কর? রাজায় রাজায় কি প্রণয় হয়? রাজকুমারীর সহিত রাজকুমারীর প্রণয় হয়? হয় তো হয়, কিন্তু তাহা বড় দুর্লভ। যেখানে অবস্থার তারতম্য আছে সেইখানেই প্রকৃত ভালবাসা জন্মে। নির্ঝরের জল পর্বত শিখর হইতে গভীর খাদে ঝাঁপাইয়া পড়ে; উচ্চাভিলাষী ধূম নিম্ন হইতে ঊর্ধ্বে আকাশে উত্থিত হয়। ইহাই স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া রট্টার ধমনীতে হূণ রক্ত আভিজাত্যের প্রভেদ স্বীকার করিত না। হূণ বর্বর হোক, সে আভিজাত্যের উপাসক নয়, শক্তির উপাসক।

রট্টা একমুঠি মল্লিকা ফুল আস্তরণ হইতে তুলিয়া লইয়া

আঘ্রাণ গ্রহণ করিলেন, তারপর চাঁদের দিকে চাহিয়া বলিলেন—'মধুঋতু তো শেষ হইতে চলিল; এবার ফুলও ফুরাইবে। সুগোপা, তখন তুই কি করিবি?'

রট্টার বাম কর্ণ হইতে শিরীষ পুষ্পের ঝুমকা খুলিয়া গিয়াছিল, সুগোপা উঠিয়া সযত্নে সেটি পরাইয়া দিল। মুকুরের মত ললাট হইতে দু'একটি চূর্ণ কুন্তল সরাইয়া দিয়া বলিল—'ফুল যখন ফুরাইবে, তখন চন্দন দিয়া তোমাকে সাজাইব। চুলে স্নিগ্ধ স্নান-কষায় মাখিয়া কর্পূর সুবাসিত জলে ধারাযন্ত্রে তুমি স্নান করিবে, আমি তোমার মুখে চন্দনের তিলক, বুকে চন্দনের পত্রলেখা আঁকিয়া দিব; সিক্ত উশীরের পাখা দিয়া তোমাকে ব্যজন করিব। সখি, তবু কি তোমার দেহের তাপ জুড়াইবে না?' সুগোপার মুখে একটু চাপা হাসি।

হাসির গূঢ় ইঙ্গিত রট্টা বুঝিলেন, পুষ্পমুষ্টি সুগোপার গায় ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন—'তোর পাখার বাতাসে আমার দেহের তাপ জুড়াইবে কেন?'

সুগোপা বলিল—'যাঁহার পাখার বাতাসে অঙ্গ শীতল হইত তিনি তো আসিয়াছিলেন, তুমি যে হাসিয়াই তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলে।'

রট্টা ক্ষণকাল নীরব রহিলেন, তারপর হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—'সুগোপা, সত্য বল দেখি, গুর্জরের রাজকুমারের গলায় বরমালা দিলে তুই সুখী হইতিস?'

এইখানে পূর্বতন প্রসঙ্গ কিছু বলা প্রয়োজন।

ইদানীং মহারাজ রোট্ট ধর্মাদিত্য ঐহিক বিষয়ে কিছু অধিক অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজকার্যে তিনি বড় একটা হস্তক্ষেপ করিতেন না; কিন্তু কয়েকমাস পূর্বে একান্তমনে ধর্মচর্চা করিতে করিতে তিনি সহসা উদ্বিগ্ন হইয়া লক্ষ্য করিলেন যে তাঁহার কন্যার যৌবনকাল উপস্থিত হইয়াছে। এরূপ লক্ষ্য করিবার কারণ ঘটিয়াছিল।

রোট্ট যখন পঁচিশ বৎসর পূর্বে এই রাজ্য বিজয় করেন তখন তাঁহার এক সহকারী যোদ্ধা ছিল—তাহার নাম তুষ্ফাণ। তুষ্ফাণ তাহার বীর্য এবং বাহুবল দ্বারা রোট্টকে বহুপ্রকারের সাহায্য করিয়াছিল; এমন কি ভূতপূর্ব রাজাকে ধৃত করিয়া সে-ই স্বহস্তে তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছিল। তাই, রাজ্য কবলীকৃত হইলে রোট্ট তুষ্ট হইয়া রাজ্যের সীমান্তস্থিত চষ্টন নামক প্রধান গিরিদুর্গ তাহাকে অর্পণ করেন। পদমর্যাদায় রাজার পরেই তাহার স্থান নির্দিষ্ট হয়।

তাহার পর বহুবর্ষ অতীত হইয়াছে, তুষ্ফাণের মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পুত্র কিরাত এখন চষ্টন দুর্গের অধিপতি। কিরাত সুদর্শন যুবা—কিন্তু কুটিল ও নিষ্ঠুর বলিয়া তাহার কুখ্যাতি ছিল। লোকে বলিত, হূণ রক্তই তাহার দেহে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

এই কিরাত একদা নবযৌবনা তেজস্বিনী রট্টাকে দেখিয়া মজিল। অন্য কেহ হইলে হয় তো নিজ স্পর্ধায় ভীত হইয়া পলায়ন করিত, কিন্তু কিরাত নিজ দুর্গ ছাড়িয়া কপোতকূটে আসিয়া বসিল। রাজ সভায় নিত্য যাতায়াতে কুমারীর সহিত প্রত্যহই তাহার সাক্ষাৎ হয়। সুমিষ্ট ভাষণে কিরাত যেমন পটু, আবার মৃগয়াদি পুরুষোচিত ক্রীড়ায় তেমনই দক্ষ। মৃগয়ায় সে রাজকুমারীর নিত্য পার্শ্বচর হইয়া উঠিল।

তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে রাজকুমারীর বাকি রহিল না। হূণকন্যা শিশুকাল হইতে অন্তঃপুরের নীড় ছাড়িয়া মুক্ত আকাশে বিচরণ করিতে অভ্যস্ত, তাই তাঁহার বুদ্ধিও একটু অনবগুণ্ঠিত স্বচ্ছতা লাভ করিয়াছিল। মৃগয়াকালে তিনি কিরাতের অব্যর্থ লক্ষ্যের প্রশংসা করিলেন, উদ্যান বাটিকায় তাহার সরস চাটু বচনে হাস্য করিলেন; কিন্তু তাহার প্রশংসাদৃষ্টি মোহমুক্ত হইয়াই রহিল, হাসিতে অধররাগ ভিন্ন অন্য কোনও রাগ-রক্তিমা ফুটিল না। কিরাত অনুভব করিল, রাজকন্যা সর্বদাই তাহাকে মনে মনে বিচার করিতেছেন, তুলাদণ্ডে ওজন করিতেছেন। তাহায় দুর্দম অভীপ্সা আরও প্রবল ও ব্যক্ত হইয়া উঠিল।

নগরে এই কথা লইয়া লোকালুকি আরম্ভ হইল। সচিব ও সভাসদগণ পূর্বেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সর্বশেষে রাজাও লক্ষ্য করিলেন।

রাজা প্রথমে বিস্মিত হইলেন; তারপর সচিবদের ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন। উদ্ধতপ্রকৃতি কিরাতের প্রতি কেহই সন্তুষ্ট ছিলেন না; তাঁহারা মত দিলেন, একজন সামন্তপুত্রের সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইতে পারে না; বিশেষতঃ যখন কুমারীই রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী। তাহাতে রাজবংশের মর্যাদার হানি হইবে। বরং নিজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অন্যান্য রাজবংশের

সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা কর্তব্য। মিত্র যদি সম্বন্ধী হয়, তাহা হইলে বিপৎকালে সাহায্যপ্রাপ্তি বিষয়ে কোনও সংশয় থাকে না।

সচিবদের মন্ত্রণাই মহারাজের মনঃপূত হইল। তিনি রাজসভায় কিরাতকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া জানাইলেন যে, নিজ দুর্গাধিকার ত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল রাজধানীতে বিলাস ব্যসনে কালক্ষেপ করা তাহার পক্ষে অশোভন। কিরাত কিছুক্ষণ স্থির নেত্রে মহারাজের মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সভা ত্যাগ করিল। অব্যবহিত পরে সে অশ্বপৃষ্ঠে কপোতকূট ছাড়িয়া নিজ দুর্গে ফিরিয়া গেল।

কিরাতকে বিদায় করিয়া মহারাজ প্রাপ্তযৌবনা কন্যার বিবাহের কথা চিন্তা করিতে বসিলেন। জীবন অনিত্য; তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে রট্টার বিবাহ না হইলে সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া নিশ্চয় গণ্ডগোল বাধিবে। মন্ত্রীদের সহিত আলোচনার পর স্থির হইল, মিত্র গুর্জর-রাজের দ্বিতীয় পুত্র কুমার ভট্টারক বারণবর্মা মহাখ্যাতিমান বীরপুরুষ, তাঁহার নামে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হোক, তিনি আসিয়া কিছুকাল বিটকরাজ্যে অবস্থান করুন। তারপর রাজকন্যার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে উভয়ের মনোভাব বুঝিয়া যথাকর্তব্য নিরূপণ করা যাইবে।

সাড়ম্বর নিমন্ত্রণ লিপি যথাকালে প্রেরিত হইল। অবশ্য তাহাতে বিবাহের কোনও উল্লেখ রহিল না; কিন্তু মনোগত অভিপ্রায় গুর্জররাজ বুঝিলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিষ্কার করিয়া কথা বলিবার রীতি কোনও কালেই ছিল না।

অনতিকাল পরে গুর্জরের বারণবর্মা মহাসমারোহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রট্টার সহিত রাজসভায় তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিল। প্রথম দর্শনে রট্টা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কুমার ভট্টারক বারণ বর্মার মূর্তি বীরোচিত বটে, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় সমান; সম্মুখে উদর ও পশ্চাতে নিতম্ব রণভেরীর ন্যায় উচ্চ, মুখমণ্ডলে বিশাল গুম্ফ ও ভ্রূযুগল প্রায় তুল্য রোমশ। তাঁহাকে দেখিয়া গুর্জর-দেশীয় খ্যাতনামা হস্তীর কথা স্মরণ হয়। রট্টা ক্ষণকাল বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার পানে চাহিয়া থাকিয়া ছিন্ন বল্লরীর মত সভাস্থলেই হাসিয়া লুটাইয়া পড়িলেন।

বিবাহের প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ হইল। ক্ষুণ্ণ বারণ-বর্মা পরদিনই স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন।

সুগোপা সখীসুলভ চপলতায় রট্টাকে এই ঘটনার ইঙ্গিত করিয়া পরিহাস করিয়াছিল। এখন রট্টার প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল—'আমার কথা ছাড়িয়া দাও, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের গলায় মালা দিলেও আমি সুখী হইব না। কিন্তু আমার কথা ভাবিলে তো চলিবে না।'

রট্টা বলিলেন, 'তবে কাহার কথা ভাবিব?'

'নিজের কথা। এই যে দেবভোগ্য যৌবন, এ কি ফুলচন্দন দিয়া সাজাইয়া শুধু আমিই দেখিব? দেবতার ভোগে লাগিবে না?'

'আমার যৌবন আমি সঞ্চয় করিয়া রাখিব, কাহাকেও ভোগ করিতে দিব কেন?'

সুগোপা হাসিল।

'সখি, বিধি-প্রেরিত ভোক্তা যেদিন আসিবে সেদিন কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিবে না, তনু-মন সমস্তই তাঁর পায়ে সমর্পণ করিবে।'

'তুই না হয় মালাকরের পায়ে তনু-মন সমর্পণ করিয়া-ছিস, তাই বলিয়া কি সকলেরই একটি মালাকর চাই?'

'চাই বৈকি সখি, মালাকর নহিলে নারীর যৌবন নিকুঞ্জে ফুল ফুটাইবে কে?'

রট্টা আর কোন কথা না বলিয়া স্মিতমুখে আকাশের পানে চাহিলেন; চক্ষুদুটি তন্দ্রাচ্ছন্ন, যেন কোন্ অনাগত ভবিতব্যের স্বপ্ন দেখিতেছে। সুগোপা কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া শেষে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'মহারাজ যে কী করিতেছেন তিনিই জানেন। হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া চষ্টন দুর্গে গিয়া বসিয়া আছেন। এদিকে বসন্তঋতু নিঃশেষ হইয়া আসিল। কি জন্য গিয়াছেন তুমি কিছু জানো?'

রট্টা বলিলেন—'চষ্টনের দুর্গাধিপ কিরাত পত্র লিখিয়াছিল, কয়েকটি চৈনিক শ্রমণ বুদ্ধের পবিত্র বিহারভূমি দর্শন করিবার মানসে ভারতে আসিয়াছেন, তাঁহারা পাটলিপুত্র যাইবেন; পথে কয়েকদিনের জন্য চষ্টন দুর্গে বিশ্রাম করিতেছেন। তাই শুনিয়া মহারাজ অর্হৎ সন্দর্শনে গিয়াছেন।

সুগোপা মাথা নাড়িয়া বলিল—'বিশ্বাস হয় না,

কিরাতটা মহা ধূর্ত, ছল করিয়া মহারাজকে নিজ দুর্গে লইয়া গিয়াছে—নিশ্চয় কোনও দুরভিসন্ধি আছে। হয় নিভৃতে পাইয়া চাটুবাক্যে মহারাজকে দ্রবীভূত করিয়া তোমার পাণিপ্রার্থনা করিবে।'

'তুই কিরাতকে দেখিতে পারিস না।'

'তা পারি না। শুনিয়াছি এই বয়সেই সে ঘোর অত্যাচারী—অতিশয় দুর্জন।'

'শিকারে কিন্তু তার অব্যর্থ লক্ষ্য।'

'অব্যর্থ লক্ষ্য হইলেই সজ্জন হয় না। বাজপাখী কি সজ্জন?'

'কিরাত চমৎকার মিষ্ট কথা বলিতে পারে।'

'যে পুরুষ মিষ্ট কথা বলে, তাহাকে বিশ্বাস করিতে নাই।'

'তোর মালাকর বুঝি তোকে কেবলই গালি দেয়?'

সুগোপা দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল—'পরিহাস নয়। কিরাত তোমার পায়ের দিকে তাকাইবার যোগ্য নয়, কিন্তু সে তোমাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে! আমি জানি, তোমার জন্য সে পাগল।'

রট্টা অল্প হাসিলেন, তারপর গম্ভীর হইয়া বলিলেন—'শুধু আমার জন্য নয় সুগোপা, এই বিটক রাজ্যটার জন্য সে পাগল। কিন্তু ও কথা যাক। রাত্রি গভীর হইয়াছে, তুই এবার গৃহে যা।'

'তাই যাই। তুমিও ক্লান্ত হইয়াছ। একে সারাদিন বনে বনে মৃগয়া, তার উপর চোরের উৎপাত—জলসত্র হইতে এতটা পথ হাঁটিয়া আসিতে হইয়াছে। মানুষ ঘোড়া চুরি করে এমন কথা জন্মে শুনি নাই। আর কী স্পর্ধা—রাজকন্যার ঘোড়া চুরি! দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম লোকটা ভাল নয়।' নিজের লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করিয়া সুগোপার রাগ একটু বাড়িল—'দুর্বৃত্ত বিদেশী তস্কর! এখন যদি তাহাকে একবার পাই—'

'কি করিস?'

'শূলে দিই।'

'আমিও। এখন যা, চোরের উপর রাগ করিয়া পতি-দেবতাকে আর কষ্ট দিস না। সে হয় তো হাঁ করিয়া তোর পথ চাহিয়া আছে, ভাবিতেছে তোকেও চোরে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।'

'মালাকরের সে ভয় নাই, তিনি জানেন আমাকে চুরি করিতে পারে এমন চোর জন্মায় নাই। তিনি এখন কোন শৌণ্ডিকালয়ে পড়িয়া অপ্সরী কিন্নরীর স্বপ্ন দেখিতেছেন। যাই, তাঁহাকে খুঁজিয়া লইয়া গৃহে ফিরিতে হইবে তো।'

'প্রত্যহই বুঝি তাই করিতে হয়?'

'হাঁ।' সুগোপা মৃদু হাসিল, 'মালাকর লোকটি মন্দ নয়, আমাকে ভালও বাসে। কিন্তু মদিরা-সুন্দরীর প্রতি প্রেম কিছু অধিক। যাই, সপত্নীগৃহ হইতে পতি-দেবতাকে উদ্ধার করিয়া নিজ গৃহে আনি গিয়া।'

হাসিতে হাসিতে সুগোপা বিদায় লইল। তখন মধ্য রাত্রি হইতে অধিক বিলম্ব নাই। (ক্রমশঃ)

ভারতের তৈল সম্পদ ও সাবান শিল্প

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধি যে, "যা' নাই ভারতে তা' নাই ভারতে" অর্থাৎ ভারতে যাহা দুষ্প্রাপ্য মহাভারতেও তাহা সুলভ নহে। কালক্রমে প্রবচনটী কিন্তু একেবারেই উপকথায় দাঁড়াইয়াছে। এক কৃষিজ পণ্যের কথা ভাবিলেই কথাটির উপহাস প্রতি বৎসরে কড়কড়ে ১২৫ কোটী টাকার গম, বজরা কিম্বা ফুটবল মার্কা চাউল আমদানীর বহর হইতেই হৃদয়ঙ্গম হয়। তৈলজ সম্পদ যাচাই করিতে গিয়াও দেখি একই অবস্থা। পাঠ্যপুস্তকের হিসাবে দেখা যায় ভারত এখনও তৈল সম্পদে শীর্ষস্থান দখল করিয়া আছে। হাঁ, উৎপন্ন তালিকায় তিসি ও চীনা বাদামের কথা বলিতে গেলেই ভারতের কথা সর্বাগ্রে উঠিয়া থাকে বটে, কিন্তু সামগ্রিক হিসাবে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব আর নাই। বিভক্ত ভারতের অবস্থা আরও শোচনীয়; তৈল সম্পদের আংশিক বিনিময়ে দুনিয়ার বাজারে 'ডাল রুটী'র ব্যবস্থা করিতে হয়। আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনও প্রচুর। যেখানে ৩২ কোটী লোকের বাস সেখানে খাদ্যাদিতেও বিস্তর তৈল ব্যবহৃত হয়। জনসংখ্যার হার অনুসারে প্রতি সংখ্যক মানুষ নিত্যদিন যদি মাত্র এক আউন্স তৈল ব্যবহার করে তবে ৩৫ কোটী লোকের বৎসরে ৩২ লক্ষ টন তৈল দরকার হয়। কিন্তু দরিদ্র দেশের পক্ষে স্বাস্থ্যতত্ত্ব বাতুলতা, আমাদের দেশে খাদ্যের উপযুক্ত এই পরিমাণ তৈল উৎপন্নই হয় না। বাদাম,

তিল, মসিনা, সরিষা ও নারিকেল তৈলের সবটুকু খাদ্যাদিতে দেওয়া হইলেও ৩৫ লক্ষ টন হয় না। খাদ্যের অনুপযুক্ত রেড়ী, মহুয়া, তিসি কিম্বা কার্পাসবীজ তৈল শিল্পাদিতে ব্যবহৃত হয়। বৈদেশিক ধনভাণ্ডার হইতে টাকা আনিবার জন্য তিসি ও রেড়ী বিদেশে রপ্তানী করিতে হয়, বাদবাকী যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার কিয়দংশ রং ও বার্ণিশ তৈয়ারী করিতে কিম্বা যন্ত্রাদি মসৃণ ও তেলতেলে রাখিতে প্রয়োজন হয়। কাজেই সাবান তৈয়ারীর জন্য হাতে যে তৈল থাকা উচিত তাহার পরিমাণ বেশী নহে। খাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় বাদাম, নারিকেল ও মসিনার তৈল হইতে একটী বড় অংশ সাবানের জন্য খরচ করিতে হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা ভয়াবহ রূপে হ্রাস পাওয়ায় সমস্ত দেশে খাদ্যের উপযোগী স্নেহজ পদার্থের অত্যধিক ঘাটতি উপস্থিত হয়। বিজ্ঞান এই সমস্যার কতকটা মীমাংসা করিয়াছে বলা যায় কিন্তু বৈজ্ঞানিক মহলে মতবিরোধ থাকায় সাধারণ্যে একটী প্রতিকূল ভীতির অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। একদল বৈজ্ঞানিক বলেন যে হাইড্রোজিনেটেড্ তৈলে জীবের বংশধারায় অন্ধত্ব আসে, কেহ বলেন বন্ধ্যাত্ব আসে, সুদূর ভবিষ্যতে যাহাই হউক না বনস্পতি তৈল বা হাইড্রোজিনেটেড্ তৈল যে আজ ঘৃত সমস্যার আংশিক সমাধান করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বনস্পতিকরণ (Hydrogenation) পদ্ধতির অন্যতম সাফল্য নিম্নজাতীয় দুর্গন্ধ তৈলের উচ্চগুণ সম্পন্ন তৈলে উন্নীত লাভ। এই প্রক্রিয়ায় তৈলের আয়োডিন মূল্য (iodine value) হ্রাস প্রাপ্ত হয় ও তৈলের অসংপৃক্ত অংশের সংপৃক্ততা (Saturation) আসে। বেশী পরিমাণ হাইড্রোজেন অনুপ্রবিষ্ট তরল তৈল কঠিনাকার ধারণ করে সঙ্গে সঙ্গে আণবিক ওজনও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তৈলের স্বাভাবিক দুর্গন্ধ নষ্ট হওয়ায় এইরূপ কঠিনাকার তৈল নানাজাতীয় শিল্পজ কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। কাঠিন্য কম বেশী ইচ্ছা মতন পরিবর্তন সাপেক্ষ সম্ভব হওয়ায় বনস্পতি ঘৃত হইতে স্নো, ক্রীম, সাবান, মোমবাতি প্রভৃতি বিবিধপণ্য উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। বিজ্ঞান আজ খাদ্য ও অখাদ্য এই সীমারেখা প্রায় দূরীভূত করিয়াছে। দুর্গন্ধযুক্ত মৎস্য ও হাঙ্গর তৈল হাইড্রোজিনেশানের পরে মোমবাতি কিম্বা সাবানের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এই মাল জাপান হইতে এই দেশে প্রচুর আমদানী হইত।

বিভক্ত ভারতে প্রায় ৪০টী হাইড্রোজিনেশান কারখানা চালু রহিয়াছে, এক পশ্চিমবঙ্গেই ৬টী কারখানায় কাজ হইতেছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কারখানাগুলি একত্রে পশ্চিম ভারতের যে কোনও বিখ্যাত কারখানার পকেট এডিশন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মূলধন হিসাবে যেখানে প্রায় ৩০ কোটী টাকা বিনিয়োগ হইয়াছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মিলিত মূলধন তিন কোটী টাকা মাত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ও অন্তবর্ত্তীকালে এই ব্যবসায়ের প্রসার ঘটিয়াছে এবং প্রায় ২০ হাজার কর্মি সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে এই ব্যবসায়ে রুজি রোজগার করিতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে যে বিপুল তৈলবীজ ভারত হইতে রপ্তানী হইত তাহার এক প্রধান অংশ দেশীয় ব্যবসায়ে নিযুক্ত হওয়ায় কাঁচা মালের পরিবর্তে আংশিক পাকামাল রপ্তানীর সুযোগ আসিয়াছে। আমাদের দেশে এখনও খাদ্যে অব্যবহার্য্য তৈল হাইড্রোজিনেশান করা হয় না। প্রধানতঃ বাদাম, তিল ও কার্পাস বীজ তৈলই এই কাজে ব্যবহৃত হয় এবং বাৎসরিক ২০০,০০০ লক্ষ টন পরোক্ষভাবে খাদ্যের চাহিদা মিটাইতে খরচ হইতেছে।

বিভক্ত ভারতে প্রায় ২৩০ লক্ষ একর জমিতে তৈলবীজ চাষ হয়। সংখ্যাবিদেরা বলেন প্রায় ৭০ লক্ষ টন তিসি, বাদাম, রেড়ী, সরিষা, মসিনা ও তিলবীজ উৎপন্ন হয় এবং তৈল পাওয়া যায় প্রায় ২৮ লক্ষ টন। এতদ্ব্যতীত ভারতে উৎপন্ন নারিকেল তৈলের পরিমাণ প্রায় ১০৮০০০ টন কিন্তু ভারতের প্রয়োজনের তুলনায় নারিকেলতৈল কম বলিয়া আমাদিগকে আমদানী নারিকেল তৈলের উপর নির্ভর করিতে হয়। সাধারণতঃ পেনাং, সিঙ্গাপুর ও লঙ্কাদ্বীপ হইতে এই তৈল আমদানী হয় এবং এই পরিমাণ নেহাৎ কম নহে ৭৫০০০ টনের কিছু বেশী। বিভক্ত বঙ্গে নারিকেল উৎপন্ন হয় বটে তবে তৈল তৈয়ারী হয় না খাদ্যাদিতেই শেষ হইয়া যায়। নিম্নে নারিকেল চাষের জন্য নিয়োজিত জমির পরিমাণ, উৎপন্ন ফল প্রদেশ হিসাবে দেখান হইল।

বিভক্ত ভারতে নারিকেল চাষের জন্য জমির পরিমাণ ও
উৎপাদিত তৈলের পরিমাণ

প্রদেশ	জমির আয়তন		উৎপন্ন ফল	
	একর		হাজারে	
	১৯৪৪ ৪৫	১৯৪৫-৪৬	১৯৪৪ ৪৫	১৯৪৫-৪৬
মাদ্রাজ	৬১৫, ৪১১	৬১৭, ৯৯৭	১৪৮৩১০০	১৫৩৬৪০০
উড়িষ্যা	১০৯৫০	১০৯৪৯	২১৯০০	১৯০৭৩
পঃ বাংলা	১৬৪৪৮	১৬৪৪৮	২২২০৫	২২২০৫
বোম্বাই	২৫০৭০	২৪৬৭৫	৫৩০০০	৫৩০০০
আসাম (সিলেটবাদ)	৩৫৪৬	৩৬০০	২০৯৯৫	২১৫৩৪
ত্রিবাঙ্কুর	৫৭৫৬৭৩	৫৭৬৮৮২	১২০৮৯১৩	১২১১৪৫৩
কোচীন	৬৬৬৪২	৬৪৯৮৮	১৩৩২৮৪	১২৯৯৭৬
মহীশুর	১৭০১৮০	১৭৫৭৯৬	২৭২২৮৮	২৮১২৭২
পদু কোট্টা	১৪৯২	১৫৬৯	১৪৯	১৫৭
অন্যান্য	১০০০	১০০০	২০০০	২০০০
	১৪৮৬৪১২	১৪৮৯৯০৪	৩২১৭৮৩৪	৩২৭৭০৭০

সোজা অঙ্কে ১৫ লক্ষ একর জমিতে ৩৩০০০ লক্ষ নারিকেল জন্মে, ইহার মধ্যে ১৫,০০০ লক্ষ নারিকেল হইতে শাঁস পাওয়া যায় ২২০০,০০০ টন ইহার ৮০ ভাগ অর্থাৎ ১৭৬০০০ টন শাঁস তৈল উৎপাদনে পাওয়া যায় এবং উৎপাদিত তৈলের পরিমাণ ১০৮০০০ টন।

নারিকেলের পরেই খাদ্যপ্রাণ বিশিষ্ট তৈল বীজের মধ্যে বাদামই প্রধান। বাদাম নানাপ্রকার কাঠ বাদাম, কাজু বাদাম ও চীনাবাদাম ইহার মধ্যে চীনাবাদামের চাষই প্রচুর এবং মাদ্রাজ, বোম্বাই ও হায়দারাবাদে বিস্তর উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর মধ্যে উৎপন্নে ভারতীয়

বাদামই শীর্ষ স্থানে। কিন্তু বিপুল জনতার নিকটে এই প্রচুর পরিমাণও উল্লেখযোগ্য নহে। বিশেষতঃ যে দেশে খাদ্যাভাব অহরহ সেখানে বাদাম একটী উৎকৃষ্ট খাদ্য। আমেরিকায় বাদাম হইতে মাখম জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত হয় এবং বাজারে 'পি-নাট' বাটার নামে বিক্রীত হয়। এই মাখম প্রস্তুতিতে প্রথম শ্রেণীর অভগ্ন ফলগুলি বিশেষ পদ্ধতিতে ঝল্‌সাইবার পরে পরিষ্কৃত হয় এবং চূর্ণীকৃত এই দানাকে 'পেপসিন মিশ্রিত জলে নবনীকৃত করা হয়। স্বাদের জন্য গ্লিসারিণ্‌ ও লবণ যুক্ত করিবার পরে বায়ুহীন বোতলে কিম্বা কৌটায় ভর্ত্তি করা হয়। বাদামের দুগ্ধও খুব উপকারী এবং ছেলেদের পক্ষেও উপকারী। খোসা ছাড়ান বাদাম দুই একদিন জলে ভিজাইয়া অঙ্কুর উদ্‌গম হইবার প্রাক্কালে তুলিয়া চূর্ণ করা হয় এবং এই চূর্ণ আটগুণ জলে ভিজাইয়া জ্বাল দিতে হয় কিছুক্ষণ জ্বাল দিলে ঐ গুঁড়া মিশ্রিত হইয়া দুধের মতন দেখায়। ইচ্ছা মতন চিনি, লবণ ও এক ফোঁটা ভ্যানিলা দিলে স্বাদু হয়। এই দুগ্ধকে পণ্ডিতেরা গোদুগ্ধের সহিত তুলনা করিয়াছেন, নিম্নে কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেওয়া হইল।

	চীনাবাদামের দুধ	গো-দুগ্ধ
তলানী (Solid)	১০·৭৫%	১২·৮%
প্রটীন	৩·৭%	৩·৪%
চর্বি (Fat)	১·৫%	৩·৭৫%
শর্করা জাতীয় দ্রব্য (Carbo-Hydrate)	৩·০%	৪·৭৫%
ভস্ম (Ash)	০·৩%	০·৭০%

মানুষের শরীর পুষ্ট রাখিবার জন্য যে দশরকম অ্যামিনো এসিড্‌ প্রয়োজন বাদামে তাহা বর্ত্তমান। এক দাম বাদাম হইতে শরীরে ৫·৫ ক্যালোরী তাপ উৎপন্ন হয়। সেখানে এক দ্রাম গম, চাউল কিম্বা ভুট্টা হইতে ৩·৪৫ ক্যালোরী উত্তাপ পাওয়া যায়। বাদামের খইল জমির উর্বরতা সাধন করে সকলেই জানেন কিন্তু আধুনিক রসায়ন এই খইলকে যান্ত্রিক শিল্পের অঙ্গনেও হাজির করিয়াছে, 'আর্ডিল' রেশমের মতন মৃদু ও নরম এই খইল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

চীনাবাদামের পরেই তিসি উল্লেখযোগ্য তৈলবীজ, প্রধানতঃ মধ্যপ্রদেশ, হায়দারাবাদ, মধ্যদেশ, মৎস্য ইউনিয়ম, সংযুক্ত প্রদেশ এবং বিহারে ইহার উল্লেখযোগ্য চাষ। এই বৎসরে মোট ৩৮,০০,০০০ লক্ষ একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে এবং আশা করা যায় ৪৩৮,০০০ টন তিসি উৎপন্ন হইবে। গত বৎসর উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ছিল ৪৩১০০০ টন, আবাদ হইয়াছিল ৩৭৭৭,০০০ একর জমিতে। তিসির পরেই উল্লেখ যোগ্য চাষ হয় তিল এর, তারপরে মসিনা ও সরিষা। এবৎসরও ৪,৪৫৩,০০০ একর জমিতে মসিনা ও সরিষার চাষ হইয়াছে, সংখ্যা-বিদেরা অনুমান করেন উৎপন্ন শস্য হইবে ৭২৬০০০ টন। এই পরিমাণ গত বৎসরের অপেক্ষা কম। পূর্ব পাঞ্জাবে বাস্তুহারাদের পুনর্বসতির গোলযোগ ইহার অন্যতম কারণ। উত্তরা পথের সর্বত্র সরিষার চাষ হয়, পূর্বপাঞ্জাব, সংযুক্তপ্রদেশ ও বিহারে প্রচুর জন্মে। তিল চাষ নীচু জমিতে সর্বত্রই অল্লাধিক হইয়া থাকে ইহার মধ্যে উড়িষ্যা, বোম্বাই প্রদেশ, বিহার ও বঙ্গদেশ তিলচাষের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গে সকল রকম তৈলবীজই উৎপন্ন হয় তবে পরিমাণ সামান্য বরং লোকসংখ্যা হিসাবে নগণ্য। আহার্য্য তৈলের জন্যই বাঙ্গালীকে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের প্রতি অহরহ নির্ভর করিতে হয়।

বিভক্ত ভারতের তৈল সম্পদ ও পশ্চিমবঙ্গের একটী তুলনামূলক চিত্র এখানে সন্নিহিত হইল।

তৈলের নাম	বিভক্ত ভারত	পশ্চিমবঙ্গ	মন্তব্য
	১৯৪৫-৪৬	১৯৪৬-৪৭	বৎসরের বিভিন্নতায়
চীনাবাদাম	২৩০২০০০ টন	[illegible]	উৎপন্ন পরিমাণে
তিসি	২৯১০০০ টন	৮৪০০ টন	শতকরা ২।৩ ভাগ
সরিষা ও মসিনা	৭০২০০০ টন	২৯৫০০ টন	হ্রাস বৃদ্ধি হইলে
তিল	২৬৬০০০ টন	৫০০০ টন	তুলনামূলক পরি-
অন্যান্য (তিলব্যতীত)	×	২৫৭০ টন	স্থিতি অপরিবর্ত্তনীয়।

কৃষিজ ব্যতীত অরণ্যজাত তৈল সম্পদও ভারতে ন্যূন নহে। ভারতের চতুর্দিকে বিস্তৃত বনানী ও দিগন্ত মেখলা সমুদ্র। পাহাড় পর্বতে বহুবিধ তৈলজ ফল পাওয়া যায়। সমুদ্রোপকূলে নারিকেল ও তালবৃক্ষরাজি মহাকবি কালিদাসের বর্ণনা স্মরণ করাইয়া দেয়। পাহাড় ও পর্বতে নিম, করঞ্জা, পুন্নাগ, মহুয়া, নাগকেশর, চালমুগরা প্রভৃতি বৃক্ষ বিস্তর জন্মে। একমাত্র উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের অরণ্যজাত ফল সংগ্রহ সম্ভব হইলে শিল্পাদির তৈলভাব হ্রাস পাওয়া সম্ভব। করদ মিত্র রাজ্যগুলি শেষ হইয়া যাওয়ায় ফল সংগ্রহ এখন অনেকটা সরল হইয়াছে। নীতিহিসাবে রাস্তার উভয় পার্শ্বে মহুয়াগাছ রোপণ রাষ্ট্রের বিধি হইয়া দাঁড়াইলে একমাত্র বীরভূম, বাঁকুড়া সাঁওতালপরগণা অঞ্চল হইতে চতুর্গুণ ফল সংগ্রহ সম্ভব হইতে পারে। সামান্য আয়াসে বৎসরের পর বৎসর মহুয়া গাছ হইতে সংগৃহীত মহুয়া ফুল ও ফলে উৎকৃষ্ট কোহল এবং তৈল প্রস্তুত সম্ভবপর।

অরণ্যজাত এই সকল তৈল হইতে সোজা সাবান তৈয়ারীতে কিঞ্চিৎ অসুবিধা আছে। প্রত্যেক তৈলেই রকমারী গন্ধ ও রঞ্জন জাতীয় তৈল সংমিশ্রিত আছে। বিজ্ঞান এই সকল অসুবিধা অনায়াসে দূরীভূত করিতে পারে। দুর্গন্ধ দূরীকরণ কিম্বা তৈলের অসংপৃক্ত ভাগ হাইড্রোজিনেশান করিয়া উৎকৃষ্ট সাবানের তৈল প্রস্তুত করা সম্ভব। এক অঞ্চলে এইরূপ প্রচুর তেল পাওয়া সম্ভব হইলে সংগ্রহ করিবার কিম্বা স্থানান্তরে রপ্তানীর প্রশ্ন উঠে না। আঞ্চলিক তৈল পরিশোধনাগার স্থাপন করিলেই সমস্যার সমাধান হইতে পারে এবং স্বাধীনভারতে এইরূপ কারখানার জন্য স্থান ও মূলধন প্রাপ্তিতে অসুবিধার কারণ নাই।

জানা গিয়াছে মধ্য এসিয়ায় সূর্য্যমুখী গাছ প্রচুর জন্মে। সূর্য্যমুখী ফলের বীজে তৈল পাওয়া যায়। এই নিম্নশ্রেণীর তৈলকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিশোধিত করিয়া উৎকৃষ্ট সাবানের উপযোগী করা সম্ভব হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে জার্মানীর ঘটনা উল্লেখযোগ্য। প্রথম মহাযুদ্ধ বাধিলে কিছুদিন পরে জার্মানী, আফ্রিকা, চীন ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ হইতে বঞ্চিত হয়। আফ্রিকার অরণ্যে ও প্রশান্ত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে পাম ও নারিকেল যথেষ্ট ফলিত। এই উভয় ফলজাত তৈল ছিল জার্মান সাবান শিল্পের কাঁচা মাল। এই সম্পদ হস্তচ্যুৎ হওয়ায় রাজ্যের জনসাধারণ তথা সৈন্যবাহিনীর পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব লইয়া রাষ্ট্রকে ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইযাছিল। রসায়নবিজ্ঞান এই গুরুতর সমস্যা হইতে জাতি তথা শাসক সম্প্রদায়কে রক্ষা করে। তাহারা মানুষ ও পশু নিস্ত ময়লা (night Soil) হইতে চর্বি নিষ্কাশিত করেন। তারপর এই নিকৃষ্ট ও দুর্গন্ধপূর্ণ চর্বি ও তৈলকে হাইড্রোজিনেশান করিয়া উচ্চগুণ বিশিষ্ট চবি বা ষ্টিয়ারিণ-এ (Stearine) রূপান্তরিত করেন। এই সকল ষ্টিয়ারিণ হইতে স্নো, ক্রীম, সাবান ও নানাপ্রকার বিলাসের উপকরণ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। এতদিন সেখানকার বড় বড় মিউনিসিপ্যালিটীর নিত্যদিনের ময়লা (Sewerage) পরিষ্কার রাখা ছিল খরচা বহুল সমস্যা কিন্তু ব্যবসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য হইতে পণ্যদ্রব্য উৎপন্নে সমর্থ হওয়ায় মিউনিসিপ্যালিটী আর্থিক দিক হইতে খানিকটা স্বয়ং সম্পূর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। ১৯২৮ সালে এক মিউনিক মিউনিসিপ্যালিটী পাঁচহাজার মেট্রিক টনের বেশী ষ্টিয়ারিণ বিক্রয় করে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে অপরাপর নিকৃষ্ট পদার্থ ও তৈলকে উচ্চতর কোহলে রূপান্তরিত করিয়া নানাবিধ বস্ত্র পরিষ্কারক (detergent) দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ভেড়ার লোম হইতে নিকৃষ্ট একরকম চর্বি (Lanoline) পাওয়া যায়। সাধারণ উপায়ে এইরূপ চর্বির অধিকাংশ সাবানীভূত (Saponification) হয় না, কিন্তু বিজ্ঞান এইরূপ চর্বির cholestorol অংশকে উচ্চতর কোহলে পরিণত করিয়া উৎকৃষ্ট অবদ্রব সহায়ক (emulsifying agent) তৈয়ারী করিয়াছে। জার্মানজাতি যুদ্ধের মধ্যেও এইরূপ নানারকম সংশ্লেষিত সাবান (Synthetic Soap) তৈয়ার করিয়া জাতির আশু প্রয়োজন সমাধা করে।

পৃথিবীর বড় বড় সাবান কারখানাগুলিকে কয়েকটী দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখা যায়। এককালে ফরাসী দেশের সাবান খুব বিখ্যাত ছিল। সব চেয়ে বেশী ও সবচেয়ে ভাল সাবান এখন ব্রিটীশ সাম্রাজ্যে কিম্বা যুক্তরাজ্যে উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ব্রিটেন ছিল তৈলজসম্পদে সবচেয়ে প্রভাবশালী। মালয়, পেনাং এবং সিঙ্গাপুরের নারিকেল ও পামতৈল, দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকার বাদাম ও পাম তৈল, মিশর, আফ্রিকা ও আরবের অলিভ তৈল, ভারতের ও সিংহলের যাবতীয় তৈলজ সম্পদ ব্রিটেনের চরণ সেবার জন্য অকুণ্ঠিতচিত্তে দিন যাপন করিত। এই কারণে ব্রিটেনের সাবান শিল্প ছিল অপরাজেয়; পোর্ট সানলাইট এই সকল দেশের তৈলে সর্বদা তৈলাক্ত থাকিত। প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও একচেটিয়া ব্যবসায়ে ভাগ বসাইতে আসিল আমেরিকার যুক্তরাজ্য। আমেরিকার তৈল সম্পদ ও নূতনতর ব্যবহারিক (technical) জ্ঞান ব্রিটিশের বাজার অনেকটা কাড়িয়া লইল। আপোষ রফায় চতুর ব্রিটিশজাতি অবস্থা নাগালের বাহিরে উপলব্ধি করা মাত্রই নূতন রকম আপোষে জোট বাঁধিল, যুদ্ধের সময়ও দেখাদিয়াছিল বিবদমান ইংরাজ ও জার্মান জাতির বড় বড় ব্যবসায়ীর মধ্যে এই 'জোট' (cartel) প্রথা। সুদিনের আশায় ব্রিটীশ বণিক চটপট আমেরিকার ব্যবসায়ীদের সহিত জোট বাঁধে। লিভার ব্রাদার্স (Lever Bros.) রাতারাতি ইউনিলিভার কোম্পানীতে রূপান্তরিত হইল। সম্প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানে ইউনিলিভার কোম্পানীর কার্পাস বীজ তৈলের বৃহৎ কারখানা স্থাপন সেই পুরাতন নীতিরই পরিচায়ক। নিম্নে তৈল বাজারের প্রধান ক্রেতা ও বিক্রেতাদের একটী তালিকা দেওয়া হইল, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির লুণ্ঠনের আপেক্ষিক চিত্র এই তালিকা।

তৈলের নাম	আমদানী কিম্বা রপ্তানী দেশ	রপ্তানীর পরিমাণ (মেট্রিক টন)		আমদানীর পরিমাণ (মেট্রিক টন)	
		১৯৪৬	১৯৪৭	১৯৪৬	১৯৪৭
পামকারনেল তৈল	বৃঃ পশ্চিম আফ্রিকা	৩৩১২৫৯	৩৮৩৪৩৩	—	—
	ফঃ ” ”	৩৫,৩৬৯	৪৮৭৬২	—	—
	বেলজিয়াম কঙ্গো	৫৮,৯০৯	৪৮০৯১	—	—
	ব্রিটেন	—	—	৩৫৮৯৭৪	৩৬৪০০২
	ফ্রান্স	—	—	৭৫৭৫০	৮৫৩০০
	হলাণ্ড	—	—	১৫৩	১১৫৭৩
	ডেনমার্ক	—	—	২৩০৯	৫০৫৮
	বেলজিয়াম	—	—	৫৫৭৩২	৪০১৮৫
পাম তৈল	ব্রিঃ পশ্চিম আফ্রিকা	১০১১৫৭	১২০,০০০	*	
	মালয়	৮৩১৪	৪৫৩৩১		
	বেঃ কঙ্গো	—	৮৩৫৯৭		
চর্বি	অষ্ট্রেলিয়া	—	৩০৫৯		
	নিউজিলাণ্ড	২৪৭১৩	২৮৩৭৩		
	দঃ আমেরিকা	২১৪৭৫	২২৫৩৭		

* আমদানীকারকের ঠিক হিসাব পাওয়া যায় নাই, গ্রেটব্রিটেন যে তন্মধ্যে প্রধান ইহা নিঃসন্দেহ।

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মেদিনীপুরের বিপ্লবীদের প্রতিজ্ঞা ছিল যে মেদিনীপুরে কোনও শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাঁহারা থাকিতে দিবেন না। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল সন্ধ্যায় বিমল দাশগুপ্ত ও জ্যোতিজীবন ঘোষ তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জেমস্ পেডিকে হত্যা করেন। ইহারই এক বৎসর পরে পালা আসিল মেদিনীপুরের পরবর্ত্তী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর-কে-ডগ্‌লাসের। ডগ্‌লাস-হত্যা মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত শহীদ প্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্য্য বিমল ও জ্যোতিজীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

সমাবর্ত্তন উৎসবে বাংলার গভর্ণরকে আক্রমণ করিবার যে চেষ্টা হয়—তাহার কিছুদিন পরেই ডগ্‌লাস সাহেব বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হন। ধৃত হন প্রদ্যোৎকুমার। মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার অন্তর্গত কংসাবতী নদীতীরস্থ গোপালনগর গ্রামে ১৯১৩ সালের ৭রা নভেম্বর বিপ্লবী প্রদ্যোৎকুমারের জন্ম হইয়াছিল।

তাঁহার পিতার নাম ভবতারণ ভট্টাচার্য্য—মাতার নাম পঙ্কজিনী দেবী। ভবতারণের চারিটি পুত্র—তিন কন্যা। প্রদ্যোৎ ছিলেন পিতার চতুর্থ পুত্রসন্তান—ভগ্নীগণের অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ। প্রদ্যোতের পিতামহ ঈশানচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় একজন সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁনের রাজদরবারে তিনি ছিলেন সভাপণ্ডিত। তাঁহার একটি টোল ছিল—নানা স্থান হইতে ছাত্ররা সেখানে পড়িতে যাইত। ভবতারণও ইংরাজিশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। মেদিনীপুর সহরে আলিগঞ্জে তিনি Revenue Agent এর কার্য্য করিতেন।

প্রদ্যোতের দশ বৎসর বয়সের সময় ১৯২৩ সালের ১৫ই জুন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ইহার ফলে তাঁহার জননী শোকে অতিশয় মুহ্যমান হইয়া পড়েন এবং সংসারের সকল বিষয় তত্ত্বাবধান করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এই অবস্থায় প্রদ্যোতের স্নেহশীলা জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূই প্রদ্যোৎ ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নীগণের দেখাশুনার ভার গ্রহণ করেন।

অতি শৈশবেই প্রদ্যোৎ হার্ডিঞ্জ এম্ ই স্কুলে ভর্ত্তি হন, পরে তথা হইতে গিয়া ভর্ত্তি হন মেদিনীপুরের হিন্দু স্কুলে। মেধাবী ছাত্র হিসাবে তাঁহার সুনাম ছড়াইয়া পড়ে। হিন্দু স্কুল হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ১৯৩১ সালে প্রথম বিভাগে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। বিদ্যালয়ে পাঠ করিবার সময়ই তিনি বয়স্কাউটের সভ্য হইয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে নানা জনহিতকর কার্য্যে তাঁহাকে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। নাড়াজোল রাজ-পুস্তকাগারে গিয়া তিনি নিয়মিত বই পড়িতেন। জ্ঞানলাভের জন্য তাঁহার তীব্র আকাঙ্ক্ষা পরিদৃষ্ট হইত। তাঁহার সুন্দর আকৃতি, স্বাস্থ্য এবং স্বভাব দর্শনে মুগ্ধ না হইয়া কেহ থাকিতে পারিত না। অমর চট্টোপাধ্যায়ও একজন ভাল ছাত্র ছিলেন এবং তিনিই প্রদ্যোৎকে বিপ্লবীদলে লইয়া গিয়া মেদিনীপুরের তৎকালীন বিপ্লবী-নেতা দীনেশ গুপ্তের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। আপন প্রতিভায় প্রদ্যোৎ অল্পদিনের মধ্যেই বিপ্লবীদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন—অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া লাঠি, ছোরা, যুযুৎসু ও কুস্তি শিক্ষা প্রভৃতি সবই শেষ করেন। দুই তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি আপন দক্ষতায় দলের একজন প্রধান কর্ম্মী হইয়া উঠিলেন।

১৯৩১ সালে যখন গভর্ণমেণ্ট নূতন করিয়া দমননীতির প্রয়োগ সুরু করিলেন, প্রদ্যোৎ তখন মেদিনীপুর কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর বিজ্ঞান শাখার ছাত্র। পেডি সাহেবের পর মিঃ আর-কে-ডগ্‌লাস তখন মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁহারই আমলে হিজলীর বন্দী-নিবাসে মর্ম্মন্তুদ

প্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্য্য

অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। উক্ত ঘটনার পর সরকার পক্ষ হইতে যে বিভাগীয় তদন্ত-কমিটি গঠিত হয়, তাহার রিপোর্টে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের ঘটনার দায়িত্ব হইতে রেহাই দিয়া নিম্নপদস্থ সামান্য কয়েকজন কর্ম্মচারীর কার্য্যের সমালোচনা করিয়া ব্যাপারটি ধামাচাপা দিবার চেষ্টা করা হয়। বিপ্লবীরা ইহাতে ঘোরতর অসন্তুষ্ট হন এবং সকল কিছুর জন্যই তাঁহারা মিঃ ডগ্‌লাসকেই দায়ী সাব্যস্ত করেন। তাঁহাদের ধারণা হয় যে মিঃ ডগ্‌লাসই তদন্ত-কমিটির অভিমতকে ঐ ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিলেন। উপরন্তু তিনি দিবারাত্রই মদ্যপানে অপ্রকৃতিস্থ হইয়া থাকিতেন—কাজেই ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে তিনি শ্রদ্ধা-

লাভেরও যোগ্য ছিলেন না ; সুতরাং গভর্ণমেন্টের চণ্ডনীতি চালু হওয়ার পরই মেদিনীপুরেও আবার যখন অত্যাচার চলিতে লাগিল—তখন প্রদ্যোৎকুমার ও প্রভাংশুশেখর পালের উপর ভার দেওয়া হইল ডগ্‌লাস সাহেবকে হত্যা করার।

১৯৩২ সালের ৩০শে এপ্রিল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড অফিসে উক্ত বোর্ডের এক সভা হইতেছিল। চেয়ারম্যান হিসাবে উহাতে সভাপতিত্ব করিতেছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডগ্‌লাস। সেই সময় তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য প্রদ্যোৎ ও প্রভাংশু সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সভার কার্য্য যখন চলিতেছিল, তখন প্রদ্যোৎ মিঃ ডগ্‌লাসের উপর গুলি নিক্ষেপের মানসে বার বার তাঁহার রিভলবারের ট্রিগার টানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রিভলবারটি বিকল হইয়া যাওয়ায় একটি গুলিও উহা হইতে বাহির হইল না। সেই মুহূর্ত্তেই প্রভাংশুও তাঁহার রিভলবার হইতে পর পর কয়েকটি গুলি নিক্ষেপ করিলেন। গুলিবিদ্ধ হইয়া মিঃ ডগ্‌লাস তাঁহার সম্মুখস্থ টেবিলের উপরই হুমড়ি খাইয়া পড়িলেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সকলেই যেন ক্ষণেকের জন্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। চতুর্দ্দিকে সশস্ত্র প্রহরী—তাহারই মাঝখানে এই কাণ্ড। যখন সকলের চমক ভাঙ্গিল, তখন দেখা গেল যে দুইজন যুবক ছুটিয়া পলাইতেছেন। প্রহরীরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইল। প্রভাংশুকে পলায়নের সুযোগ করিয়া দিবার জন্য প্রদ্যোৎ তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন এবং রিভলবার দেখাইয়া প্রহরীদের বাধা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে ফল আশানুরূপ হইল। প্রভাংশু নিরাপদে পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন—কেহ তাঁহার সন্ধানও জানিতে পারিল না।

প্রভাংশুর স্থানত্যাগের পর প্রদ্যোৎও পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লোকজন আসিয়া পড়ায় তিনি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অফিস হইতে প্রায় চারশত গজ দূরে আশ্রয় লইলেন একটি ঝোপের মধ্যে। প্রহরীরা কিন্তু সেখান হইতে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিল। গ্রেপ্তার হওয়ার সময় প্রদ্যোতের পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ পাওয়া গেল। তাহাতে লেখা ছিল—

"ইহাদের মরণেতে বৃটিশেরা বুঝুক
আমাদের আহুতিতে ভারত জাগুক।"

থানায় গিয়া প্রদ্যোৎ অসহ্য গরম বোধ করিতে লাগিলেন। অগত্যা তাঁহাকে স্নান করিতে দেওয়া হইল ও পরিধানের জন্য দেওয়া হইল নূতন বস্ত্র। স্নানের পর তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়েন।

এই ঘটনার পর মেদিনীপুরে যথারীতি পুলিশী জুলুম সুরু হইল। বহু ব্যক্তিই ধৃত হইলেন। প্রদ্যোতের অন্যতম সহকর্মী ফণীন্দ্রনাথ দাস এবং প্রদ্যোতের তৃতীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর শব্বরীভূষণকেও গ্রেপ্তার করা হইল। সংবাদলাভের আশায় পুলিশ তাঁহাদের তিনজনের উপরই নির্য্যাতন চালাইতে লাগিল। পীড়নের দ্বারাও কিন্তু কোনও খবরই তাঁহাদের নিকট হইতে বাহির করা গেল না। ষড়যন্ত্রের বিন্দুমাত্র আভাসও মিলিল না। প্রদ্যোতের সহকারীর নাম সকলের অজানাই রহিয়া গেল।

আর কাহারও বিরুদ্ধে যখন কোন প্রমাণই সংগ্রহ করা পুলিশের পক্ষে সম্ভব হইল না, তখন অগত্যা একমাত্র প্রদ্যোৎকেই অভিযুক্ত করিয়া মামলা সুরু হইল। যে ট্রাইব্যুন্যালে এই মামলা আরম্ভ হইল—তাহার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন শ্রীকে-সি-নাগ। অপর দুইজন কমিশনার ছিলেন শ্রীভুজগেন্দ্র মুস্তফি ও জ্ঞানাঙ্কুর দে আই-সি-এস্। ব্যারিষ্টার শ্রীনিশীথচন্দ্র সেন ও বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রদ্যোতের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। প্রদ্যোতের বিরুদ্ধে খুনের ষড়্‌যন্ত্র ও খুনের সহায়তা করার অভিযোগ আনীত হইয়াছিল।

সাক্ষ্য-প্রমাণাদির দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইল যে প্রদ্যোতের গুলিতে মিঃ ডগ্‌লাসের মৃত্যু হয় নাই, কারণ তাঁহার রিভলবার বিকল হইয়া গুলিবর্ষণের অযোগ্য অবস্থায় ছিল ; কিন্তু তথাপি ২৮শে জুন তারিখে যখন মামলার রায় প্রকাশিত হইল, তখন দেখা গেল যে একমাত্র জ্ঞানাঙ্কুর দে ব্যতীত অপর দুইজন বিচারক প্রদ্যোতের মৃত্যুদণ্ডের বিধান করিয়াছেন। প্রদ্যোতের অল্পবয়স এবং হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার দ্বারা সংঘটিত না হওয়ায় জ্ঞানাঙ্কুর দে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডদানের অনুকূলে মত প্রকাশ করিলেন ; কিন্তু ট্রাইব্যুন্যালের সদস্যগণের অধিকাংশের মত অনুযায়ী প্রদ্যোতের মৃত্যুদণ্ডের আদেশই বলবৎ হইল।

ইহার পর মামলাটির পুনর্ব্বিচার হইল কলিকাতা হাইকোর্টে জাষ্টিস চারুচন্দ্র ঘোষ ও মিঃ জ্যাক-এর এজলাসে। শ্রী জে-সি-গুপ্ত ও শ্রীনিশীথচন্দ্র সেন প্রদ্যোতের পক্ষে হাইকোর্টে সওয়াল জবাব করিলেন। হাইকোর্টেও মৃত্যুদণ্ডই বহাল রহিল। অমৃতবাজার পত্রিকায় এই সময় প্রদ্যোতের মামলা উপলক্ষে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তাহাতে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকর অভিযুক্ত হইয়া প্রত্যেকে পাঁচশত টাকা হিসাবে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন।

প্রদ্যোতের জননী সরকারের নিকট তাঁহার পুত্রের প্রাণভিক্ষা করিয়া যে আবেদন করেন, কর্ত্তৃপক্ষ তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। মৃত্যুদণ্ড লাভ করিয়াও কিন্তু প্রদ্যোতের কোনও ভাবান্তর উপস্থিত হয় নাই। তাঁহার নির্লিপ্ত শান্ত ভাব দেখিয়া সকলেরই ইহা মনে হইত যে একমাত্র যিনি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছেন, শুধু তাঁহারই পক্ষে ইহা সম্ভব হইতে পারে। মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলের condemned cell এ আবদ্ধ থাকার সময়ও তাঁহাকে সর্ব্বদাই শান্ত ও হৃষ্ট দেখা যাইত। কেবলমাত্র জননীর কথা স্মরণ হইলেই তিনি কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়া পড়িতেন—কারণ জননীকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন বড় বেশী।

জেলে অবস্থানকালে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইস্‌লামের গ্রন্থ পড়িতে চাহিয়াছিলেন। আপত্তিজনক বিবেচিত হওয়ায় নজরুল ইস্‌লামের বই তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। ফাঁসির পূর্ব্বের নিঃসঙ্গ দিনগুলি তিনি রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ ও শ্রীমদ্ভগবদগীতা পাঠেই কাটাইয়া দেন।

প্রদ্যোতের ফাঁসি হয় মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে ১৯৩৩ সালের

১২ই জানুয়ারি সকাল ৬টার সময়। তাঁহার ফাঁসির সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে মেদিনীপুর ও কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে পথে পথে বিপ্লবীরা প্রদ্যোতের ছবি বিতরণ করেন। ফটোর নিম্নে লেখা ছিল—

"লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে
না রাখে কাহারও ঋণ
জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন।"

প্রদ্যোতের ফটো বিতরিত হইতে দেখিয়া পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ বুঝিতে পারে যে বিপ্লবীদল কিরূপ সক্রিয় রহিয়াছে। দলটির সন্ধান লাভের জন্য তাহারা আপ্রাণ চেষ্টা করে, কিন্তু কোনও হদিসই লাভ করিতে পারে না।

ফাঁসির দিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া প্রদ্যোৎ প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করেন এবং কপালে ফোঁটা পরিয়া পূজা সমাপ্ত করেন। জেলখানার লোক আসিয়া ফাঁসিমঞ্চে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করা মাত্র তিনি গাত্রোত্থান করেন এবং অকম্পিত পদে অগ্রসর হইয়া চলেন ফাঁসির মঞ্চের দিকে। ডগ্‌লাস সাহেবের পর মিঃ জে-ই-জে বার্জ্জ তখন মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। প্রদ্যোৎ মঞ্চে উঠিতেই তিনি প্রশ্ন করিলেন,—"Are you ready, Prodyot ?"

প্রদ্যোৎ শান্তভাবে বলিলেন—"One minute, please, Mr. Burge. I have something to say." ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে বলিবার অনুমতি দিলেন। প্রদ্যোৎ বলিলেন,—"We are determined, Mr. Burge, not to allow any European to remain at Midnapur. Yours is the next turn, get yourself ready." অল্প থামিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন,—"I am not afraid of death. Each drop of my blood will give birth to hundreds of Prodyots in all houses of Bengal. Do your work, please—"

অতঃপর প্রদ্যোতের ফাঁসি হইয়া গেল। ফাঁসির পর তাঁহার জনকয়েক আত্মীয় জেলখানার বাহিরে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পাদন করেন। মেদিনীপুরের জনসাধারণ তাঁহার প্রতি তাঁহাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ যথাযোগ্যরূপে তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

১৯৩২ সালের মে মাসে দুইটি স্বদেশী ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি হয় ১৩ই তারিখে ট্রেণে ঢাকা ও তেজগাঁও ষ্টেসনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে। তেজগাঁও ষ্টেসনে কয়েক ব্যক্তি টাকা লইয়া ট্রেণে উঠিয়াছিল। গাড়ী ষ্টেসন ছাড়িলে কয়েক ব্যক্তি ট্রেণে উঠেন এবং কয়েকজনের টাকা কাড়িয়া লইয়া গাড়ী থামাইবার জন্য শিকল টানেন। গাড়ী থামিলে তাঁহারা টাকা লইয়া পলাইয়া যান। জনৈক ব্যক্তি গুলির আঘাতে নিহত হয়।

এই ডাকাতি উপলক্ষে কয়েকজন ধৃত ও অভিযুক্ত হন। তন্মধ্যে একজন হন এপ্রুভার। বিচারে জ্যোতিৰ্ম্ময় সেনগুপ্তের সাত বৎসর কারাদণ্ড হয়। বীরেন্দ্রচন্দ্র দে ও অপর একজন খালাস পান। বীরেন্দ্র মামলায় খালাস পাইলেও অর্ডিনান্স বলে পুনরায় তাঁহাকে আটক করা হয়।

অপর ডাকাতিটি সংঘটিত হয় ২৯শে তারিখে "যুগান্তর" দলের কর্ম্মীদের দ্বারা। ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কমলপুরে কিশোরীমোহন বণিকের বাড়ী এই ডাকাতি হইয়াছিল। লুণ্ঠিত হইয়াছিল প্রায় ৪০০০৲ টাকা। এই উপলক্ষে বহু ব্যক্তি গ্রেপ্তার হন এবং বিচারে শেষ পর্য্যন্ত তিন জনের দশ বৎসর হিসাবে এবং এগারো জনের সাত বৎসর হিসাবে কারাদণ্ড হয়।

আইন-অমান্য আন্দোলন ঢাকা জিলার বিক্রমপুরেও বেশ ভালভাবেই চলিতেছিল। জনসাধারণ এই আন্দোলনে কার্য্যকরীভাবে অংশ গ্রহণ করেন এবং সভা সমিতির অনুষ্ঠান ও বিলাতীদ্রব্য-বর্জ্জন চলিতে থাকে পুরাদমে। মহিলারাও এই আন্দোলনে দলে দলে যোগদান করিয়াছিলেন।

কালীপদ মৈত্র তখন মুন্সীগঞ্জের মহকুমা-হাকিম। আন্দোলনের প্রসার ও প্রাবল্য দেখিয়া তাঁহাকে সহকারী হিসাবে সাহায্য করিবার জন্য কামাখ্যাপ্রসাদ সেনকে সাব ডেপুটি স্পেশাল অফিসার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। দমননীতির পরিচালনায় তিনি শীঘ্রই সে অঞ্চলে বিশেষ কুখ্যাত হইয়া উঠেন। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদিগকে পাইকারি হারে গ্রেপ্তার করা হইত, এমন কি নির্বিচারে লাঠি চার্জ্জের হুকুম দিতে এবং ধৃত ব্যক্তিদিগকে লাঞ্ছিত করিতে তিনি কসুর করিতেন না। মহিলা আন্দোলনকারীদিগের প্রতিও তিনি ভদ্রজনোচিত আচরণ করিতেন না, অনেকেই তাঁহার হস্তে অপমানিতা ও নিগৃহীতা হইতেন। ইহার ফলে তিক্ততা ক্রমশঃ এতই বৃদ্ধি পাইল যে সরকার পক্ষও তাঁহার জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন। কামাখ্যাবাবুর হিতাকাঙ্ক্ষীরা তাঁহাকে ছুটি লইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবার পরামর্শ দিলেন। তাঁহাদের পরামর্শে তিনি ছুটির আবেদন করিতেই ছুটি মঞ্জুর হইল। বেতন লইবার জন্য কামাখ্যাবাবু তখন ঢাকায় গেলেন।

১৯৩২ সালের ২৩শে জুন কামাখ্যাবাবু ঢাকায় গিয়া সদর মহকুমা-হাকিম শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে অবস্থান করিতে থাকেন। ঢাকায় ওয়ারী মহল্লায় র‍্যাঙ্কিন ষ্ট্রীটে ছিল শচীনবাবুর বাসা। একতলার যে ঘরখানিতে কামাখ্যাবাবুর থাকার ব্যবস্থা হয়, তাহার একদিকের একটি জানালায় লোহার শিক ছিল না ; তাহার ফলে যে কোন লোক ইচ্ছা করিলে বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিত। কামাখ্যা-বাবুর বিপদের কথা স্মরণ করিয়াই শচীনবাবু তাঁহাকে সর্ব্বদাই জানালাটি বন্ধ রাখিতে বলিতেন, কিন্তু কামাখ্যাবাবু গরমের জন্য জানালাটি প্রায়ই খুলিয়াই রাখিতেন।

২৬শে জুন কামাখ্যাবাবু রাত্রিকালে আহারের পর জানালাটি খুলিয়া রাখিয়াই শয়ন করেন। শেষ রাত্রের দিকে শচীনবাবুর হঠাৎ সন্দেহ হয় এবং সকলকে জাগরিত করিয়া স্ত্রী ও পুত্রসহ তিনি কামাখ্যাবাবুর কক্ষে গিয়া প্রবেশ করেন। সেখানে গিয়া তাঁহারা বারুদের গন্ধ পান

এবং দেখিতে পান যে শয্যার একদিকের মশারি উঠান অবস্থায় রহিয়াছে। কামাখ্যাবাবুর শরীরে কতকগুলি গুলির আঘাত-চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। ক্ষতগুলি হইতে তখনও রক্তস্রাব হইতেছিল। থানায় তৎক্ষণাৎ সংবাদ দেওয়া হয়, কিন্তু পুলিশ আসিয়াও অপরাধীর কোনও সন্ধান করিতে পারে না।

অসতর্কতার জন্য পরদিন ২৭শে জুন কিন্তু পুলিশ আসামীকে খুঁজিয়া বাহির করিল। ইছাপুরের "সারদা মেডিকেল হল"-এর সুরেশ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট পাঠাইবার জন্য একটি সংবাদ লইয়া জনৈক ব্যক্তি টেলিগ্রাফ অফিসে মধ্যাহ্নকালে উপস্থিত হন। উক্ত টেলিগ্রামের প্রেরিতব্য সংবাদটি নিম্নরূপ ছিল—

"Kamakshya's Operation Successful. No Anxiety."

সংবাদটি দেখিয়াই টেলিগ্রাফ অফিস হইতে তৎক্ষণাৎ ফোনে থানায় সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিশ ইনস্পেক্টরও অবিলম্বে সেখানে গিয়া উপস্থিত হন এবং যিনি সংবাদটি লইয়া গিয়াছিলেন তাঁহাকে পাকড়াও করেন। অতঃপর তাঁহাকে লইয়া নানা স্থানে হানা দিবার পর পুলিশ গ্রেপ্তার করিল ১৯ বৎসর বয়স্ক যুবক কালীপদ চক্রবর্তীকে।

কামাখ্যাবাবু যে কক্ষে নিহত হইয়াছিলেন, কালীপদকে সেই কক্ষে লইয়া যাওয়া হইলে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে থাকে এবং তিনি কাঁদিয়া ফেলেন। অতঃপর তিনি পুলিশের নিকট একটি স্বীকারোক্তি প্রদান করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, কামাখ্যা সেন মহিলাদিগকেও অপমান করিতেন বলিয়া তাঁহার মনে আঘাত লাগে এবং দেশের স্বার্থেই তিনি কামাখ্যা সেনকে গুলি করিয়া মারেন; সেই হত্যাকাণ্ডের জন্য তিনি একা ব্যতীত আর কেহই দায়ী নহেন; নিরপরাধ ব্যক্তিগণের উপর সন্দেহবশে অত্যাচার চলিতেছে বলিয়া অন্যের বিনা প্ররোচণায় তিনি সেই স্বীকারোক্তি প্রদান করিতেছেন।

কালীপদ স্বীকার করেন যে একটি অটোমেটিক পিস্তলের সাহায্যে তিনি কামাখ্যা সেনকে হত্যা করিয়াছেন; কিন্তু পিস্তলটি কিভাবে কাহার নিকট হইতে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত করেন নাই। তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়া যে মামলা হয়, তাহাতে ৮ই নভেম্বর তারিখে তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। কালীপদ শান্তভাবেই দণ্ডাদেশ গ্রহণ করেন।

কালীপদর জননী শৈলবালা দেবী পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করিয়া যে আবেদন করেন, তদুত্তরে ১৯৩৩ সালের ২২শে জানুয়ারি তাঁহাকে জানাইয়া দেওয়া হয় যে তাঁহার পুত্রের প্রতি কোনও করুণা প্রদর্শন করা হইবে না। ইহার কয়েকদিন পরেই কালীপদর ফাঁসি হইয়া যায়।

ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদকের উপর আক্রমণ চালান হয় ১৯৩২ সালের ৫ই আগষ্ট। সম্পাদক মিঃ ওয়াটসন যখন চৌরঙ্গী রোডের উপর দিয়া মোটরে করিয়া যাইতেছিলেন, তখন জনৈক আততায়ী গাড়ীর ফুট বোর্ডে উঠিয়া তাঁহার উদ্দেশে গুলি বর্ষণ করেন। মিঃ ওয়াটসন অল্পের জন্য রক্ষা পান। অফিসের দরোয়ান আততায়ীকে ধরিয়া ফেলে এবং জনৈক কনষ্টেবলও সেই সময় সেখানে গিয়া পড়ে। উভয়পক্ষে ধ্বস্তাধ্বস্তির মধ্যেই আততায়ী বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করেন।

(ক্রমশঃ)

ভলটেয়ার

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

Candide গ্রন্থের বহুল প্রচার হইয়াছিল। রোমান ক্যাথলিক ফরাসী জাতির মধ্যে এই অশ্রদ্ধবান গ্রন্থের জনপ্রিয়তালাভে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। জার্মানী ও ইংলণ্ডের লোকে তাহাদের ধর্ম্মের সংস্কার করিয়া লইয়াছিল। চার্চ্চের অভ্রান্তত্ব অস্বীকার করিয়াও বাইবেল-এর প্রামাণ্যতা স্বীকার করিয়া, যুক্তির সাহায্যে তাহারা যখন বাইবেলের ব্যাখ্যা করিয়াছিল, ফ্রান্স তখন যুক্তির আশ্রয়গ্রহণ করে নাই। কিন্তু যখন তথায় বিদ্যার আলোচনা আরব্ধ হইল, তখন অন্ধবিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যবর্তী কোনও আশ্রয় মিলিল না। ফলে ফরাসী মন একেবারে অবিশ্বাসের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। যখন La Metrie, Helvetius, Holbach. Diderot, D'Alembert শত্রুর মত পৈতৃক ধর্ম্ম আক্রমণ করিলেন, তখন বহু লোক তাঁহাদের কথা আগ্রহের সহিত শুনিল। ভলটেয়ারের Candide ও তাহারা সাদরে গ্রহণ করিল।

La Metrie (১৭০৯-৫১) সৈনিক বিভাগে চিকিৎসক ছিলেন। A Natural History of the Soul লিখিয়া তিনি কর্ম্মচ্যুত হন, এবং Man a Machine লিখিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হন। Frederick the Great তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। La Metrieর মতে জগৎ একটি বিরাট যন্ত্র, মানুষের আত্মা সেই যন্ত্রের অংশ। আত্মার স্বরূপ যাহাই হউক, জড় ও আত্মার মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বর্ত্তমান, একের বৃদ্ধিতে অপরের বৃদ্ধি, একের ধ্বংসে অন্যের ধ্বংস হয়। আত্মা যদি বিশুদ্ধ চৈতন্য মাত্র হয়, তাহা হইলে মনে উৎসাহের উদয় হইলে শরীর উত্তেজিত কেন হয়? শরীর অসুস্থ হইলেই বা মনের ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় কেন? একই মূল বীজ হইতে যাবতীয় দেহী (Organism) অভিব্যক্ত হইয়াছে। দেহী ও তাহার পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়াই এই অভিব্যক্তির হেতু। উদ্ভিদের বুদ্ধি নাই, প্রাণীর আছে—ইহার কারণ প্রাণীকে আহারের অন্বেষণে ঘুরিতে হয়,

উদ্ভিদের খাদ্য তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। যাবতীয় জীবের মধ্যে মানুষের বুদ্ধি অধিক—তাহার কারণ মানুষের অভাব ও তাহার গতি-শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যে সমস্ত বস্তুর অভাব নাই, তাহাদের মনও (Mind) নাই।

La Metrieর মতের ভিত্তির ওপর Hadvetius তাহার On Man নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ লিখিয়া তিনি প্রচুর অর্থ ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, La Metrieর মত তাহাকে নির্ব্বাসিত হইতে হয় নাই। তাহার মতে সুখের ইচ্ছাতেই মানুষের সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। বীরত্বপূর্ণ কার্য্য হইতে তাহার সুখ হয় বলিয়াই বীর পুরুষ বিপৎজনক কার্য্যে লিপ্ত হন। সূক্ষ্মদৃষ্টিসমন্বিত স্বার্থ সন্ধানই (Egoism) ধর্ম্ম (Virtue)। পুলিশের ভয়ই ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেক (Conscience)—ঈশ্বরের বাণী নয়। শৈশবে পিতামাতা ও শিক্ষকের উপদেশ এবং সমাজে প্রচলিত মত হইতে আমাদের ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ধারণা উৎপন্ন হয়। সমাজ বিজ্ঞানই চরিত্রনীতির ভিত্তি ধর্ম্ম বিজ্ঞান নয়। সমাজের পরিবর্ত্তমান প্রয়োজন দ্বারাই শ্রেয়ঃ নির্ণীত হয়, কোনও ধর্ম্মমত দ্বারা নয়।

Denis Diderot ছিলেন (১৭১৩-১৭৮৪) এই নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান। Baron d'Holbach তাঁহার System of Nature গ্রন্থে Diderotর মত প্রচার করিয়াছেন। এই মত অনুসারে অজ্ঞান ও ভয় হইতেই দেবতাদের সৃষ্টি হইয়াছে। দুর্ব্বলতা হইতে তাঁহাদের উপাসনা প্রচলিত হইয়াছে। কল্পনা, উৎসাহ (enthusiasm) ও চাতুরী তাহাদের সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচার করিয়াছে, মানুষের বিশ্বাস প্রবণতা তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে, ক্ষমতাশালী লোকেরা আপনাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাহাদিগকে ব্যবহার করিয়াছে। স্বেচ্ছাচারের আনুগত্যের সহিত ঈশ্বর বিশ্বাসের যথেষ্ট সম্বন্ধ। উভয়ের বৃদ্ধি ও পতন এক সঙ্গে হয়। যতদিন পর্য্যন্ত রাজার ও পুরোহিতের শাসন বর্ত্তমান থাকবে, ততদিন মানুষের স্বাধীনতালাভ ঘটিবে না। স্বর্গের যখন বিনাশ হইবে, তখনি পৃথিবী তাহার প্রাপ্য প্রাপ্ত হইবে। জড়বাদ দ্বারা জগতের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না হইতে পারে, সমস্ত জড়ই হয়তো প্রাণ দ্বারা সঞ্জীবিত, এবং চৈতন্যের একত্ব (Unity of Consciousness) জড় ও গতি দ্বারা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। কিন্তু চার্চ্চের সহিত সংগ্রামে জড়বাদই প্রকৃষ্ট অস্ত্র, এবং উৎকৃষ্টতর অস্ত্র আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত উহারই ব্যবহার করিতে হইবে। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন জ্ঞান ও শিল্পের প্রসারের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। শিল্প হইতে শান্তি আসিবে, জ্ঞান হইতে নূতন কর্ম্মশক্তি (Morality) উদ্ভূত হইবে।

১৭৫৭ সালে এই সমস্ত মতপ্রচারের উদ্দেশ্যে Diderot ও D'Alembert একটি বিশ্বকোষ (Encyclopedia) প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নানা খণ্ডে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম কয়েক খণ্ড চার্চ্চ কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। চার্চ্চের বিরোধিতার ফলে Diderotর বন্ধুদিগের অনেকে এই বিশ্বকোষের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ইহাতে Diderof বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হন। ভলটেয়ারও কিছুদিন বিশ্বকোষের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং এই সংঘের নেতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। বিশ্বকোষে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। পরে তিনি নিজেই Philosophic Dictionary নামে এক দার্শনিক কোষ লিখিতে আরম্ভ করেন। বর্ণমালাক্রমে বহু বিষয়ের উপর প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি এই কোষে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রবন্ধই জ্ঞানে সমুজ্জ্বল। দে কার্ত্তের (Descartes) "সন্দেহ" হইতে তিনি দার্শনিক আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। Bayle তাঁহাকে সন্দেহ করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন "প্রত্যেক দর্শনের উদ্ভাবয়িতাই না জানিয়া জানার ভাণ করিয়াছেন। জ্ঞান যাহাদের কম, তাহারাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিয়া বসে। প্রথম তত্ত্ব (First Principles) সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। ইচ্ছা কিরূপে আমাদের অঙ্গসঞ্চালন করে ইহাই যখন আমরা জানি না, তখন ঈশ্বর, দেবতা এবং মন সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা অহমিকার চূড়ান্ত। মনের সন্দেহাকুল অবস্থা প্রীতিকর নহে, কিন্তু উপরোক্ত বিষয় সকলে নৈশ্চিত্য নিতান্তই হাস্যকর ব্যাপার। কিরূপে আমার সৃষ্টি হইল তাহা আমি জানি না। কিরূপে আমার জন্ম হইল, তাহাও আমার অজ্ঞাত। জীবনের এক চতুর্থাংশ অতিবাহিত না হওয়া পর্য্যন্ত যাহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি অথবা অনুভব করিয়াছি, তাহার কারণ জানিতে পারি নাই। যাহাকে জড় বলা হয়, তাহাকে Sirius নক্ষত্রের আকারেও দেখিয়াছি, আবার অণুবীক্ষণদৃশ্য ক্ষুদ্রতম কণার আকারেও দেখিয়াছি। কিন্তু এই জড়পদার্থ কি, তাহা জানি না। "উত্তম ব্রাহ্মণ" নামক প্রবন্ধে (The Good Brahmin) ভলটেয়ার লিখিতেছেন, ব্রাহ্মণ বলিলেন "আমার জন্ম না হইলেই ভাল হইত।" আমি বলিলাম "কেন?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন 'গত ৪০ বৎসর যাবত আমি অধ্যয়ন করিতেছি। এখন দেখিতেছি এই চল্লিশ বৎসর বৃথা নষ্ট হইয়াছে। আমার শরীর যে জড়পদার্থ দ্বারা গঠিত তাহা আমার বিশ্বাস। কিন্তু চিন্তা (thought) কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারি নাই। ভ্রমণ ও পরিপাক কার্য্যের মত আমার বুদ্ধিও দেহেরই একটি স্বাভাবিক শক্তি কি না, আমার হস্ত দ্বারা কোনও বস্তু যেমন গ্রহণ করি, চিন্তাও মস্তকের সেইরূপ কোনও কাজ কি না তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। অনেক কথা আমি বলি, কিন্তু বলা যখন শেষ হয়, তখন যাহা বলিয়াছি, তাহার জন্য লজ্জাবোধ করি।" সেইদিন প্রতিবাসিনী এক বৃদ্ধার সহিত কথোপকথনকালে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহার আত্মার কিরূপে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা জানিতে না পারার জন্য তিনি কি দুঃখবোধ করেন। বৃদ্ধা প্রথমে আমার প্রশ্ন বুঝিতেই পারিলেন না। ব্রাহ্মণ যে যে বিষয়ের চিন্তা করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, ক্ষণকালের জন্যও তিনি সেই সকল বিষয়ের চিন্তা করেন নাই। বিষ্ণুর নানা অবতারে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, এবং গঙ্গাস্নান করিতে পারিলেই তিনি আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী মনে করেন। আমি এই

সরল স্ত্রীলোকের সুখের পরিচয় পাইয়া সুখী হইলাম, এবং ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া বলিলাম "আপনার গৃহের অদূরে যে বৃদ্ধা বাস করেন, তিনি কোনও বিষয়েই চিন্তা না করিয়াও সুখে আছেন, ইহা দেখিয়া কি আপনি লজ্জা বোধ করেন না ?" ব্রাহ্মণ বলিলেন "আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। আমিও অনেকবার ভাবিয়াছি, ঐ বৃদ্ধার মত যদি অজ্ঞ হইতে পারিতাম, তাহা হইলে সুখী হইতে পারিতাম। কিন্তু ওরূপ সুখ আমি কামনা করি না।"

ভলটেয়ার বলিয়াছেন "দর্শন যদি নিরবচ্ছিন্ন সন্দেহে পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলেও সেই সন্দেহ মানুষের বৃহত্তম ও মহত্তম প্রচেষ্টা। মায়াবী কল্পনার বলে নূতন নূতন মতের উদ্‌ভাবন না করিয়া জ্ঞানের অনতিপ্রসার অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট থাকাই আমাদের কর্ত্তব্য। নূতন তত্ত্বের উদ্‌ভাবনের জন্য চেষ্টা না করিয়া, পদার্থের নির্ভুল বিশ্লেষণ করিয়া, কোন্ তত্ত্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য আছে, তাহাই আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। কোন্ পথে বিজ্ঞানের অনুসরণ করা উচিত, বেকন তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। দে-কার্ত্ত সে পথ অবলম্বন না করিয়া বিপরীত পন্থার অনুসরণ করিয়াছেন—প্রকৃতির অধ্যয়ন না করিয়া তিনি তাহার রহস্য অনুমান দ্বারা আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়া উপন্যাসের সৃষ্টি করিয়াছেন। গণনা, পরিমাপ, তৌল ও পর্য্যবেক্ষণ করাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, আর যাহা কিছু তাহার প্রায় সমস্তই কপোল কল্পনা।"

এই সময়ে কয়েকটি ঘটনায় ভলটেয়ারের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। যে তরলতা ও হাস্যরসিকতা তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল, হঠাৎ তাহা গাম্ভীর্য্য ও কাঠিন্যে পরিণত হইল। রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, এবং অক্লান্ত ভাবে সেই যুদ্ধ পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

ফার্নি হইতে অনতিদূরে ফ্রান্সের টুলু (Toulouse) নগর। তখন ক্যাথলিক পুরোহিতগণই তথায় সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। কোনও প্রোটেষ্টাণ্টকে তথায় আইন অথবা চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিতে দেওয়া হইত না। কোনও প্রোটেষ্টাণ্ট সেখানে পুস্তক, ঔষধ, অথবা খাদ্যদ্রব্যের দোকান করিতে অথবা মুদ্রাযন্ত্র রাখিতে পারিত না। কোনও ক্যাথলিক প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ভৃত্য রাখিতে পারিত না। ১৭৪৮ সালে একটি প্রোটেষ্টাণ্ট ধাত্রীনিয়োগের অপরাধে এক স্ত্রীলোকের ৯০০০ ফ্রাঙ্ক অর্থদণ্ড হইয়াছিল। নগরে প্রতি বৎসর St Bertholomewর হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিবার্ষিকী আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইত। এখানে Calus নামক এক প্রোটেষ্ট্যাণ্টের কন্যা ক্যাথলিক ধর্ম্ম অবলম্বন করে। ইহার কিছুদিন পরে Calus এর পুত্র ব্যবসায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আত্মহত্যা করে। জনরব প্রচারিত হয় যে পুত্রও ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার উদ্যোগ করায় পিতা তাহাকে হত্যা করিয়াছে। Calusকে বন্দী করিয়া পুরোহিতগণ তাহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করে। ইহার ফলে তাহার মৃত্যু হয়। Calusএর পরিবারগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ফার্ণিতে ভলটেয়ারের আশ্রয় গ্রহণ করে। ভলটেয়ার তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া আশ্রয় দেন। (১৭৬১ সালে)

এই সময়ে Elizabeth Sirvens নামক এক মহিলার মৃত্যু হয়। (১৭৬২ সালে)। তখন জনরব রটে, যে উক্ত মহিলা ক্যাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণের আয়োজন করিতেছিলেন বলিয়া প্রোটেষ্ট্যাণ্টগণ তাঁহাকে কূপের মধ্যে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। ১৭৬৫ সালে La Barre নামে এক যুবককে কয়েকটি crucifix ভঙ্গ করার অভিযোগে বন্দী করা হয়। পীড়নের ফলে যুবক অপরাধ স্বীকার করে। তখন তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া, দেহ অগ্নিতে পোড়াইয়া ফেলা হয়। তাহার নিকট ভলটেয়ারের Philosophic Dictionaryর এক খণ্ড পাওয়া গিয়াছিল। তাহাও পোড়াইয়া ফেলা হয়।

ভলটেয়ার জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার স্মিত প্রফুল্ল আনন হইতে হাস্য অন্তর্হিত হইল। অন্তর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হইল। লেখনী আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হইল, এবং তাহা হইতে অনল ও লাভা নির্গত হইতে লাগিল। D'alembertকে লিখিলেন "আর পরিহাসের সময় নাই। হত্যাকাণ্ডের মধ্যে হাস্যপরিহাস চলে না, আমাদের বার্থোলেমুর হত্যাকাণ্ডের দেশে দর্শনালোচনা ও আনন্দের অবকাশ নাই।" দর্শনের আলোচনা ছাড়িয়া ভলটেয়ার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। বন্ধুবান্ধবদিগকে যুদ্ধে যোগ দিতে আহ্বান পাঠাইলেন। "কোথায় ডিডেরো, কোথায় বীর D'alembert, সকলে অগ্রসর হও, ধর্ম্মান্ধ প্রতারকদিগের শূন্যগর্ভ বক্তৃতা, ঘৃণিত কূটতর্ক, কল্পিত ইতিহাস, অন্তহীন অসঙ্গতির বিনাশ কর। যাহাদিগের বুদ্ধি আছে, বুদ্ধিহীনের দাসত্ব হইতে তাহাদিগকে মুক্ত কর, এবং যাহারা এখন জন্মগ্রহণ করিতেছে, তাহাদিগকে প্রজ্ঞা ও স্বাধীনতালাভে সাহায্য কর।" ভলটেয়ারের সুনিপুণ হস্তে দর্শন ডিনামাইটে পরিণত হইল। সেই ডিনামাইটে পোপের সিংহাসন বিপর্য্যস্ত হইল, তাঁহার মুকুট-দণ্ড স্খলিত হইয়া পড়িল, ফ্রান্সের রাজসিংহাসনের ভিত্তি চূর্ণ হইয়া গেল।

Madame de Pompodour তাঁহাকে cardinal পদের লোভ দেখাইয়া চার্চ্চ ও তাঁহার মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ভলটেয়ার অচল অটল। কার্থেজের ধ্বংস যেমন Catoর একমাত্র কাম্য ছিল, তেমনই চার্চ্চের ধ্বংস তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হইল। Treatise on Toleration গ্রন্থে তিনি লিখিলেন, "পুরোহিতেরা যদি তাহাদের প্রদত্ত উপদেশানুযায়ী জীবন যাপন করিত এবং মতভেদ সহ্য করিত, তাহা হইলে তাহাদের মতের অসঙ্গতি গ্রাহ্য করিতাম না। বাইবেলে যে সমস্ত কূটতর্কের বিন্দুমাত্রও সন্ধান পাওয়া যায় না, তাহাই খৃষ্টীয় ইতিহাসের রক্তাক্ত কলহের মূল। আজ যে বলিতেছে 'আমি যাহা বলি তাহা বিশ্বাস না করিলে ঈশ্বর তোমাকে নরকে পাঠাইবেন, কাল সে বলিবে 'আমি যাহা বিশ্বাস করি, তাহা যদি বিশ্বাস না কর, তোমাকে হত্যা করিব।" সমাজের স্বাস্থ্যের জন্য পরমতাসহিষ্ণুতার মূল পুরোহিত-তন্ত্রের ধ্বংস অপরিহার্য্য।

ইহার পর অবিরল স্রোতে পুস্তিকা প্রকাশিত হইতে লাগিল। দার্শনিকতত্ত্ব ইহার পূর্ব্বে এমন সরল ভাষায় ও এমন জীবন্ত হইয়া

প্রকাশিত হয় নাই। ভলটেয়ারের রচনা পড়িয়া দর্শন পড়িতেছি বলিয়া কাহারও মনে হইত না। কোনও কোন পুস্তকের তিনলক্ষ সংখ্যাও বিক্রীত হইয়াছিল। সাহিত্যের ইতিহাসে এমনটী পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। ভলটেয়ার রুবিকন অতিক্রম করিয়া রোমের দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

বাইবেলের ঐতিহাসিকতা ও অভ্রান্ততার তিনি যে সমালোচনা (Higher criticism) করিয়াছিলেন, তাহার উপাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন Spinoza, English Deists, ও Boyleএর Critical Dictionary হইতে। তাঁহার হস্তে এই সকল উপাদান ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

"জাপেতার প্রশ্নাবলীর" (Questions of Zapeta) জাপেতা পৌরোহিত্যের প্রার্থী। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শত শত ইহুদীকে আমরা পোড়াইয়া মারিয়াছি। এখন কিরূপে প্রমাণ করিব, যে ইহুদী জাতি চারি সহস্র বৎসর যাবৎ ঈশ্বরের অনুগৃহীত ছিল।" Old Testamentএ উল্লিখিত তারিখ ও বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে অসঙ্গতি দেখাইয়া জাপেতা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুই খৃষ্টীয় কাউন্সিলের মধ্যে যখন একটী অপরকে অভিসম্পাত করে, তখন তাহাদের কোনটী অভ্রান্ত জানিবার উপায় কি?" উত্তর না পাইয়া সরলচিত্তে প্রচার আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন—ঈশ্বর সকলের পিতা, পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা ও পাপের শাস্তা; তিনি ক্ষমাশীল। মিথ্যা হইতে সত্যকে, ধর্ম্মান্ধতা হইতে ধর্ম্মকে উদ্ধার করিয়া তিনি যে উপদেশ দিতে লাগিলেন, নিজের জীবনে তাহা অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইলেন। তিনি শান্ত, দয়ালু ও বিনীত ছিলেন। ১৬৩০ সালে তাঁহাকে আগুনে পোড়াইয়া মারা হইল।

তাঁহার Philosophic Dictionary গ্রন্থে Prophecy (ভবিষ্যৎবাণী) প্রবন্ধে হিব্রু গ্রন্থে উল্লিখিত ভবিষ্যৎবাণীর খৃষ্ট সম্বন্ধে প্রয়োগের বিরুদ্ধে Isac নামক পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করিয়া তিনি ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে লিখিলেন "এই সমস্ত অন্ধলোক তাহাদের নিজের ধর্ম্মের ও ভাষার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া চার্চ্চের সহিত কলহ করিয়াছে, এবং বলিয়াছে, যে এই সমস্ত ভবিষ্যৎবাণী যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না!!" গ্রীস, ভারতবর্ষ ও মিশর দেশকে ভলটেয়ার খৃষ্টীয় ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মাচারের উৎস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই সকল দেশে প্রচলিত মত গ্রহণ করার ফলেই খৃষ্টধর্ম্ম জয়যুক্ত হইয়াছে বলিয়াছেন।

Religion প্রবন্ধে ভলটেয়ার লিখিয়াছেন, "আমাদের পবিত্র ধর্ম্মই যে একমাত্র উত্তম ধর্ম্ম তাহাতে সন্দেহ নাই।" কিন্তু "আমাদের ধর্ম্মের" পরেই কোন ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা কম দোষযুক্ত, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে ধর্ম্মের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ক্যাথলিক ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। একস্থলে বলিয়াছেন, "এত নষ্টামী (villainy) ও অর্থহীন প্রলাপ (nonsense) সত্ত্বেও যে খৃষ্টধর্ম্ম ১৭০০ বছর বাঁচিয়া আছে, ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে ইহা ঐশ্বরিক ধর্ম্ম!!" অন্যত্র লিখিয়াছেন "এই সমস্ত হাস্যকর ও মারাত্মক কলহের যাহারা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারা সমাজের সাধারণ লোক নয়। যাহারা তোমাদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করিয়া আরামে বাস করিতেছে, তাহারাই তোমাদিগের মনে ধর্ম্মান্ধতার বিষ প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে, তোমাদিগকে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, উদ্দেশ্য তোমাদের মনে—ঈশ্বরের ভয় নয়—তাহাদের নিজেদের প্রতি ভয়ের সৃষ্টি।"

চার্চ্চের সহিত এই কলহ হইতে ভলটেয়ারের যে ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল না, তাহা অনুমান করিলে ভুল হইবে। নাস্তিকতা তিনি স্পষ্টই বর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন বলিয়া তাঁহার Encyclopedist বন্ধুদের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। The Ignorant Philosopher প্রবন্ধে তিনি Spinozaর মত নাস্তিকতার সমান বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। Diderot-কে তিনি লিখিয়াছিলেন "আমি Sandersonএর মতাবলম্বী নহি। Sanderson জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়াছেন। আমার ভুল হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অবস্থায় আমি এক বুদ্ধিমান মহান পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতাম, যিনি আমাকে দৃষ্টিশক্তি না দিলেও অনেক কিছু দিয়াছেন। যাবতীয় পদার্থের মধ্যে যে আশ্চর্য্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাহার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া অসীম ক্ষমতাশালী এক কর্ত্তা আছেন বলিয়া সন্দেহ করিতাম। তাঁহার স্বরূপ কি, এবং যাবতীয় সত্তাবান পদার্থের কেন তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার অনুমান করা যেমন দুঃসাহসিকতার কাজ, তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করাও তেমনই দুঃসাহসিকতামূলক। তুমি আপনাকে তাঁহার সৃষ্ট পদার্থের অন্যতম বলিয়া মনে কর, অথবা সনাতন এবং নিয়ত (necessary) জড়ের ভাণ্ডার হইতে খণ্ডীকৃত অংশ বলিয়া গণ্য কর, তোমার সহিত তাহা আলোচনা করিবার জন্য আমি উৎসুক হইয়া আছি। তুমি যাহাই হওনা কেন, তুমি সেই বিরাট সমগ্রের একটী মূল্যবান অংশ, যে বিরাটকে আমি বুঝিতে পারি না।"

Holbachকে ভলটেয়ার লিখিয়াছিলেন তাহার The System of Nature গ্রন্থের নামেই এক ঐক্যবিধায়ক ঐশ্বরিক বুদ্ধি সূচিত হইতেছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেও ভলটেয়ার অপ্রাকৃত ঘটনায় ও উপাসনার ফলোপধায়িত্বে বিশ্বাস করিতেন না। "প্রকৃত উপাসনা প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রমের জন্য প্রার্থনা নয়। প্রাকৃতিক নিয়মকে ঈশ্বরের অপরিবর্ত্তনীয় ইচ্ছা বলিয়া গ্রহণ করাই প্রকৃত উপাসনা।"

"স্বাধীন ইচ্ছা"তেও (free will) ভলটেয়ার বিশ্বাস করিতেন না। আত্মার সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী। "আত্মা কি, চারি হাজার দার্শনিক গ্রন্থ পড়িয়াও তাহা কেহ বলিতে পারিবে না।" আত্মার মরণোত্তর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছুক হইয়াও তিনি বাধা পাইয়াছেন। "মক্ষিকার মধ্যে আত্মা আছে, একথা কেহ বলেনা। তবে হস্তী, বানর, অথবা আমার ভৃত্যের মধ্যে আত্মা আছে বলা হয় কেন? মাতৃগর্ভে থাকিবার সময় দেহে আত্মা প্রবেশ করিবার পরেই যে শিশুর মৃত্যু হয়, সেও কি আত্মার পুনরুত্থানের (re. Surrection) দিনে উত্থিত হইবে। যদি উত্থিত হয়, তাহা হইলে কোন্ রূপে উঠিবে—ভ্রূণ, শিশু অথবা

প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের রূপে? যদি পুনরুত্থান হয়—যদি পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহা হইয়াই উঠিতে হয় তাহা হইলে পূর্ব্বের স্মৃতি লইয়াই উঠিতে হইবে। স্মৃতি যদি না থাকে, তাহা হইলে অনন্ততা কোথায় থাকিল! মানুষ কেন মনে করে যে, কেবল তাহাদের মধ্যেই অবিনশ্বর চৈতন্য বর্ত্তমান? তাহার অভিমানই হয়তো এই বিশ্বাসের কারণ। ময়ূরের যদি বাক্‌শক্তি থাকিত, তাহা হইলে সেও হয়তো তাহার আত্মার গর্ব্ব করিত এবং বলিত, সেই আত্মা তাহার পুচ্ছে অবস্থিত।"

চরিত্রনীতির জন্য যে আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস অপরিহার্য্য, ভলটেয়ার প্রথমে তাহা স্বীকার করিতেন না। প্রাচীন হিব্রুগণ আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিত না। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস না করিয়াও Spinoza নৈতিক চরিত্রের আদর্শ ছিলেন। কিন্তু ভলটেয়ারের মত পরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তখন তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, যে পরকালে শাস্তি ও পুরস্কার না থাকিলে, ঈশ্বরে বিশ্বাসের কোন নৈতিক মূল্য থাকে না। সাধারণ লোকের জন্য পুরস্কার ও শাস্তিদাতা একজন ঈশ্বরের প্রয়োজন। নাস্তিকদিগের সমাজ স্থায়ী হইতে পারে কিনা, Bayle এর এই প্রশ্নের উত্তরে ভলটেয়ার বলিয়াছিলেন, "পারে, যদি তাহারা দার্শনিক হয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে দার্শনিকের সংখ্যা কম। ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা যদি শান্তিতে বাস করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাদের ধর্ম্মের প্রয়োজন স্বীকার করিতেই হইবে।" "A. B. C." প্রবন্ধে বলিতেছেন, "আমার উকীল, আমার দর্জ্জি ও আমার স্ত্রীর ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে, ইহা আমি চাই। তাহাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকিলে আমি কম প্রতারিত হইব।" একচিঠিতে ভলটেয়ার লিখিয়াছিলেন, "আমি সত্য অপেক্ষা জীবন ও সুখকে অধিক মূল্যবান মনে করি।" 'God' প্রবন্ধে নাস্তিক বন্ধু Holbachকে বলিতেছেন, "তুমি নিজেই বলিতেছ, ঈশ্বরে বিশ্বাস কাহাকেও কাহাকেও পাপ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে। এই স্বীকৃতিই আমার পক্ষে যথেষ্ট। যদি এই বিশ্বাসে দশটী মাত্র হত্যা ও, পরকুৎসাও বন্ধ হয়, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবীরই এই বিশ্বাস অবলম্বন করা উচিত।" "ঈশ্বর যদি না থাকিতেন, তাহা হইলেও তিনি আছেন বলিয়া প্রচার করার প্রয়োজন হইত, "তুমি বলিতেছ, ধর্ম্ম অসংখ্য অমঙ্গলের সৃষ্টি করিয়াছে। ধর্ম্ম অমঙ্গলের সৃষ্টি করে নাই, করিয়াছে পৃথিবীব্যাপী কুসংস্কার। পরমপুরুষের উপাসনার প্রধান শত্রু এই রাক্ষস, যে মাতার গর্ভে তাহার জন্ম, তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছে। যাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, তাঁহারা মানবজাতির বন্ধু। ধর্ম্মমাতাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া এই কাল সর্প তাহার নিশ্বাস রোধ করিতেছে, মাতাকে আহত না করিয়া আমাদিগকে এই সর্পের মস্তক চূর্ণ করিতে হইবে।" Sermon On The Mount ভলটেয়ার আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যে ভক্তি অর্ঘ্য তিনি যীশুকে দান করিয়াছেন, সন্তদিগের গ্রন্থেও তাহা দুর্লভ। যীশু তাঁহার নামে অনুষ্ঠিত পাপের জন্য রোদন করিতেছেন বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। ভলটেয়ার নিজের জন্য একটি গীর্জা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। Theist প্রবন্ধে তিনি তাঁহার বিশ্বাস এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন: "যিনি যেমন শক্তিমান্, তেমনি মঙ্গলময়, যিনি যাবতীয় পদার্থের স্রষ্টা, যিনি নিষ্ঠুর না হইয়াও পাপের শাস্তিদাতা, যিনি স্বীয় কল্যাণ প্রবৃত্তি বশতঃ পুণ্যকর্ম্মের পুরস্কর্ত্তা, এবম্বিধ পরম পুরুষের অস্তিত্বে যিনি দৃঢ় বিশ্বাস করেন, তিনিই ঈশ্বরবাদী (Theist) সমগ্র বিশ্বের সহিত তিনি এই পুরুষের মধ্যে যুক্ত, পরস্পর বিবদমান কোনও সম্প্রদায়ের তিনি অন্তর্ভূক্ত নহেন। তাঁহার এই ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও দূরপ্রসারী। কেন না সরল ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা যাবতীয় ধার্ম্মিক প্রতিষ্ঠানের পূর্ব্ববর্ত্তী। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরবাদী যাহা বলেন, তাহা বুঝিতে পারে।...পিপিং হইতে Cayenne পর্য্যন্ত ভূভাগের যাবতীয় অধিবাসীই তাঁহার ভ্রাতা। যাবতীয় পণ্ডিত তাঁহার সহকর্ম্মী। তিনি বিশ্বাস করেন, দুর্ব্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে অথবা অর্থবিহীন আচারের মধ্যে ধর্ম্ম নাই, ভক্তির সহিত পূজা ও ন্যায়পরতাই ধর্ম্ম। পরের উপকারই তাঁহার পূজা, ঈশ্বরে আত্মনিবেদনই তাঁহার ধর্ম্মমত (creed)। মুসলমান তাঁহাকে বলে "সাবধান, মক্কাতীর্থ করিতে ভুলিও না। ক্যাথলিক পুরোহিত বলে "Notre Dame de Loretteএ যদি না যাও, তো তোমার নিপাত হউক।" ঈশ্বরবাদী মক্কা ও Lorette উভয়ই অগ্রাহ্য করিয়া দরিদ্রের সেবা ও অত্যাচারপীড়িতকে রক্ষা করেন!"

(ক্রমশঃ)

তথাগতের পথে

নরেন্দ্র দেব

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পাওয়াপুরী দেখে আমরা এত বেশী খুশী হয়েছিলুম যে, বেশ কিছুদিন এই জৈনতীর্থ সম্বন্ধে আলোচনা চলেছিল। কমলকুমুদকহ্লার-শোভিত বিশাল সরোবরের মধ্যস্থলে কনক কিরীট-শোভিত শ্বেতশুভ্র মর্মর মন্দির প্রদীপ্ত সূর্য কিরণে ঝলমল করছিল। সরোবরের প্রান্ত থেকে জলের উপর দিয়ে মূল মন্দিরে পৌঁছবার জন্য যে লোহিত শিলা রচিত সুদীর্ঘ সেতুপথ আছে, সেটি এত সুন্দর যে অমৃতসরের স্বর্ণ দেউলের সেতু পথকে মনে করিয়ে দেয়। অবশ্য এটি যে তারই অনুকরণে নির্মিত হয়েছে, বেশ বোঝা যায়। প্রধান মন্দিরটির আকার অনেকটা বিমানের মতো। তবে, উঁচু খুব বেশী নয়, কিন্তু দেখতে চমৎকার। পাওয়াপুরীর প্রধান দ্রষ্টব্য মহাবীরের চিতাভস্মের উপর নির্মিত এই মর্মর মন্দির। 'গাঁও মন্দির' কিন্তু, জলের উপর নয়। পূর্বেই বলেছি জল মন্দিরের কিছু দূরে বেশ নির্জন ও মনোরম স্থানে এই মন্দিরটি রাজমাতা কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরের চেয়ে মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের শোভাই বেশী। মাদ্রাজে যেমন মন্দিরের চেয়ে মন্দির তোরণ বা গোপুরমেরই জয়জয়কার। এই মন্দিরের ভিতর ঢুকে দেখা গেল ভিতরে চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ সেই প্রাঙ্গণের চারদিক জুড়ে একটি বিরাট ধর্মশালা।
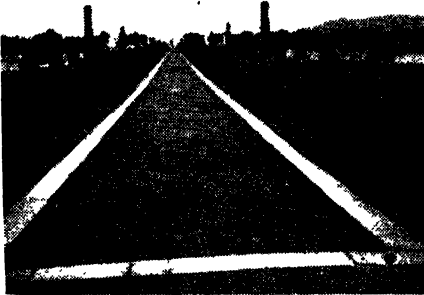
পাওয়াপুরী 'জলমন্দিরে' প্রবেশের লালপাথরে তৈরী সুদৃশ্য সেতুপথ

পাওয়াপুরী পর্ব শেষ হ'তে না হ'তেই নালন্দা যাবার জন্য মন অস্থির হ'য়ে উঠলো। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধযুগের এক অবিনশ্বর কীর্তি। রাজগীর স্টেশন থেকে মাত্র আট মাইল দূরে নালন্দার বিশাল ভগ্নস্তূপ মৃত্তিকাগর্ভ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ যে-গ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছে তার নাম ছিল 'বড় গাঁও'। নালন্দার নাম পর্যন্ত লোকে একেবারেই ভুলে গেছলো। নালন্দা স্টেশনের নামও ছিল আগে 'বড় গাঁও রোড স্টেশন। নালন্দা আবিষ্কারের পর 'বড় গাঁও রোড' স্টেশনের নাম 'নালন্দা'য় পরিবর্তিত হয়েছে। নালন্দা স্টেশন থেকে ধ্বংসস্তূপের দূরত্ব মাত্র দেড় মাইল। স্টেশনে কোনও যানবাহন পাওয়া যায় না। পূর্বাহ্নে ব্যবস্থা করলে গরুর গাড়ী ও পাল্কী সংগ্রহ হ'তে পারে। কিন্তু, তার প্রয়োজন হয় না, কারণ রাস্তা পাকা এবং পিচঢালা। দুধারে নানা রকমের গাছপালা ছায়া বিস্তার ক'রে রয়েছে। নালন্দা যাত্রীরা এ পথটুকু পদব্রজেই চলে যান। স্টেশনের ধারে একটি বৌদ্ধ ধর্মশালা আছে বটে, কিন্তু নালন্দা ধ্বংসাবশেষের কাছাকাছি যাত্রীদের থাকবার বা খাবার কোনও হোটেল নেই। সেখানে কোনও খাদ্যদ্রব্যাদিও মেলে না। অবশ্য নালন্দার মিউজিয়ম সংলগ্ন একটি 'রেস্ট-হাউস' আছে। সেখানে কেবলমাত্র সরকারী অফিসার ও সরকারের বিশিষ্ট অতিথিরাই স্থান পান। রাস্তার বাঁদিকে নালন্দার ধ্বংসাবশেষ এবং ডানদিকে মিউজিয়মটি। মিউজিয়ম সংলগ্ন একটি বাগান আছে,

'গাঁওমন্দির'

তারই একপ্রান্তে কিউরেটারের কোয়ার্টার। সবই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সযত্ন রক্ষিত। আমরা নালন্দা যাবার আগের দিন শ্রীমান অত্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে খবর পাঠিয়েছিলুম নালন্দা যাচ্ছি ভোরের ট্রেণে। অত্রীশ স্টেশনে গরুর গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিল। গাড়ীর ভিতরে খড়পাতা তার উপর সতরঞ্চ বিছানো, মাথায় ছই। আমরা ভোর ছ'টার ট্রেণে রাজগীর থেকে রওনা হয়ে সাতটার মধ্যেই নালন্দায় পৌঁছেছিলুম। গরুর গাড়ীতে দেড় মাইল রাস্তা এগুতে আরও একঘণ্টা লাগলো। কিন্তু, অত্যন্ত ভালো লাগলো ভোরবেলা সেই পথটুকু দিয়ে ধীরে ধীরে যেতে। নভেম্বর প্রায় শেষ হয়ে আসছে তখন। শীতের প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু প্রখরতা অসহ্য হ'য়ে ওঠেনি। সকাল সাতটা মাত্র। সূর্য উঠেছেন, কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব তখনও অনুভব হচ্ছিল না। বেশ ঠাণ্ডা। ছোটো গরুর গাড়ীর ছইয়ের মধ্যে আমরা খুব ঘেঁসাঘেঁসি হ'য়ে বসেছি। উৎসুক দৃষ্টি বাইরে নিবদ্ধ। রাস্তাটি পীচঢালা হ'লেও তার পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী তাকে পল্লীপথ বলেই আমাদের কাছে পরিচিত করে দিচ্ছিল। চলেছে আমাদের গরুর গাড়ী সেই পথ ধরে ধীর মন্থর-গমনে! প্রাচীন কালের যাতায়াতের যানবাহনগুলি, যেমন গরুর গাড়ী, পালকি, নৌকা, ডুলি প্রভৃতি দেখে বোঝা যায় সেকালের জীবনে কোনও বিষয়েই কিছুমাত্র তাড়া ছিল না। 'গতি' সম্বন্ধে তাঁরা ছিলেন উদাসীন। 'স্পীডম্যানিয়া' ব'লে কোনও বালাই ছিল না তাঁদের। অধুনা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমরা শুধু গতিশীলই নয় 'প্রগতি-পন্থীও' হ'য়ে উঠেছি। আজকের পৃথিবীতে ঘণ্টায় ৮০ মাইল বেগে মোটরে ছোটা বা ৩০০ মাইল বেগে বিমানে চলা অতি সাধারণ ব্যাপার। সে ক্ষেত্রে—এই দেড়মাইল পথ দেড় ঘণ্টায় যাওয়ার মধ্যে বেশ একটু নূতনত্ব আছে। এভাবে নূতন দেশে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দও আছে প্রচুর। মাটির প্রত্যেক ইঞ্চিটি মাড়িয়ে এবং চার পাশের সব কিছু সৌন্দর্যই উপভোগ করতে করতে যাওয়া যায়।

আমাদের গরুর গাড়ী চলেছে পশ্চিম মুখে। প্রশস্ত সরল পথ। দু'পাশে কত রকমের জানা অজানা যে লতা বৃক্ষরাজী। তার পিছনে উঁকি মারছে বিস্তীর্ণ সবুজ ধানের ক্ষেত। প্রভাত সূর্যের স্নিগ্ধ আলোয় তার সোনালীরূপ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। অজস্র তাল খেজুরের আশে পাশে এবং বাঁশের ঝাড়ের আড়ালে দেখা যাচ্ছে পর্ণকুটীরগুলি। তাদের সকলেরই কুটীর প্রাঙ্গণে চখে পড়ে গৃহসংলগ্ন উদ্যান। কত রকম ফলমুল তরিতরকারি আনাজ বাগানে ফলে রয়েছে। এরা অত্যন্ত সাদাসিধা সরল জীবনযাপন করে, কাজেই এদের প্রয়োজনও সামান্য। সেটুকু বোধ করি এরা নিজেরাই উৎপন্ন ক'রে নেয়। উদ্বৃত্ত বা কিছু,
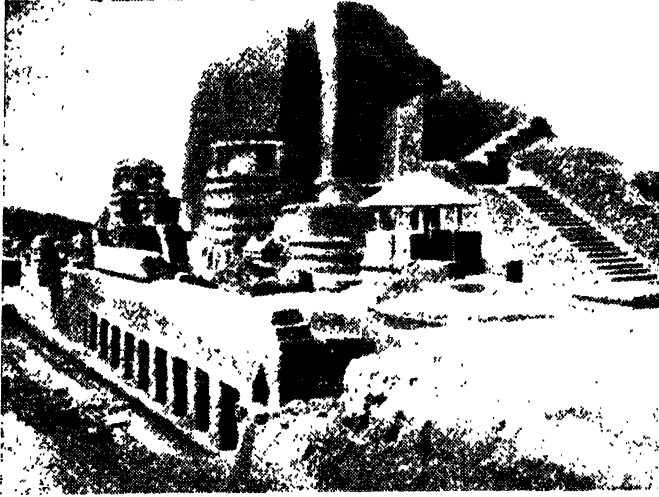
নালন্দায় আবিষ্কৃত প্রধান স্তূপ (এই ভগ্ন অবস্থাতেও ৪।৫ তলা বাড়ীর চেয়ে উঁচু)

নালন্দার প্রধান স্তূপের চতুষ্কোণ সংলগ্ন কারুকার্যখচিত একটি ভগ্ন চূড়া এবং তৎসন্নিহিত ভক্তগণের মানসিক পূজায় প্রদত্ত অসংখ্য ছোট ছোট স্তূপ

হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রয় ক'রে আসে। নিজেদের তাঁতের বোনা কাপড়ই এরা বেশীর ভাগ ব্যবহার করে। দামও বেশী নয়। আমরা কিছু সওদা ক'রে এনেছি।

আকাশ পরিষ্কার। স্নিগ্ধ উজ্জ্বল নীলাভ তার রূপ মনকে স্পর্শ করছিল। রোদটুকু ভাল লাগছে। বেলা বাড়ছিল। প্রভাত পাখীর কূজন বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে গেছে। একটা শান্ত নির্জনতা যেন এই পল্লী অঞ্চলকে গম্ভীর করে তুলেছে। পথের পাশে ঘাসে ঘাসে বনফুলে রংয়ের মেলা। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান বোধ করি সেই সকাল বেলার শীতের প্রকোপ তুচ্ছ করবার জন্যই উচ্চকণ্ঠে গান ধরেছিল। অবশ্য সেটা গান কি আর্তনাদ বোঝা শক্ত।

দূর থেকে নালন্দার একটি সুউচ্চ ভগ্ন স্তুপ যখন চোখে পড়লো বুঝলুম আমরা গন্তব্যস্থানে এসে পড়েছি। নইলে এতক্ষণ গরুর গাড়ীর মধ্যে বসে মনে হচ্ছিল আজ সারাদিনই হয়ত চলতে হবে। আমাদের এ যাত্রার বুঝি শেষ নেই!

যাত্রী এবার আমরা তিনজন—আমি নবনীতা ও নবনীতার মা। কারণ, নালন্দায় আমাদের অত্রীশের অতিথি হ'য়ে যেতে হয়েছিল। অত্রীশ ও বৌমা খুবই আদর যত্ন করলেন। সারাদিন ধরে রাখলেন সেখানে। প্রচুর রান্না বান্না করে খাওয়ালেন। অত্রীশের পঞ্চ কন্যা, সম্পর্কে আমাদের নাতনী—তারাও ক'জনে সেবাযত্নের প্রতিযোগিতা শুরু করে দিলে। ওখানে পৌঁছেই প্রথমেই হ'ল প্রচুর প্রাতরাশ। তারপর অত্রীশ আমাদের সঙ্গে নিয়ে বেরুলেন নালন্দার ধ্বংসাবশেষ দেখাতে। মাথা [পিছু ৵০ দু' আনা ক'রে টিকিট কিনতে হয়। ধ্বংসাবশেষ ও মিউজিয়ম দুইই দেখা যায় সেই টিকিটে। ওখানে পেশাদার 'গাইড'ও পাওয়া যায় এবং ইংরিজী বাংলা গাইড বুক'ও বিক্রী হয়। গাইড বইখানি আগে পড়ে তারপর একজন গাইড সঙ্গে নিয়ে নালন্দার ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাওয়া উচিত। তাতে দেখার ও বোঝার বিশেষ সুবিধা হয়। আমরা গিয়ে গাইডবুক পাইনি, শুনলুম সব কপি নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু সেজন্য আমাদের অসুবিধা হয়নি। কারণ আমাদের সঙ্গে ছিল চলন্ত গাইডবুক অত্রীশ নিজে। নালন্দার সমস্ত খুঁটিনাটি তার একেবারে কণ্ঠস্থ।
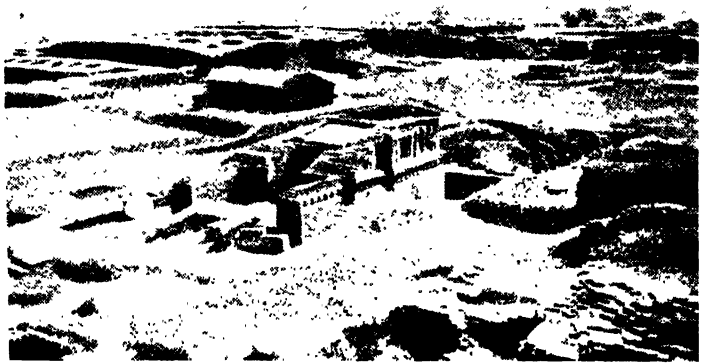
নালন্দার বৌদ্ধ বিহারগুলির ধ্বংসাবশেষ

নালন্দার প্রধান উপাসনা মন্দির। (এর সম্মুখেও মানসিক পূজায় প্রদত্ত অসংখ্য স্তূপ দেখা যাচ্ছে)

যদিও মহাপরিনির্বাণ সূত্রে উল্লিখিত আছে যে, বুদ্ধদেব শেষ জীবনে কুশীনগরে যাবার পথে নালন্দায় এসেছিলেন, তবু নালন্দা কখনো সারনাথ বা বুদ্ধগয়ার তুল্য বৌদ্ধগণের তীর্থস্থান বলে গণ্য হয়নি। তবে, আগেই বলেছি, এখানে যে আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, তা বৌদ্ধযুগের অতুল গৌরব। কাজেই তীর্থযাত্রীরা নালন্দা না দেখে বড় একটা

ফেরেন না কেউ। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে স্থাপিত বলেই বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। মৃত্তিকা গহ্বর হ'তে আবিষ্কৃত নালন্দার ধ্বংসাবশেষগুলির মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য হ'ল এই গুলি :—

১। স্তূপ শ্রেণী বৌদ্ধশ্রমণদের বাসগৃহের অর্থাৎ বৌদ্ধ মঠ বা বিহারের সম্মুখে সারিবদ্ধ বৌদ্ধস্তূপ।

২। বিহার শ্রেণী বৌদ্ধশ্রমণদের বাসগৃহ বা মঠ এবং উপাসনা মন্দির।

৩। বিশ্ববিদ্যালয় গৃহাবলী অধ্যাপক ও ছাত্রদের বাসগৃহ এবং অধ্যয়নশালা ও গ্রন্থাগার।

৪। প্রত্নশালা নালন্দায় প্রাপ্ত যাবতীয় সামগ্রীর সংগ্রহশালা।

শ্রীমান অদ্রীশ আমাদের সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত যত্নপূর্বক প্রত্যেক অংশ দেখিয়ে তার আনুপূর্বিক ইতিহাস ব'লে তার বিশেষত্বের পরিচয় দিয়ে

নালন্দার ধ্বংসস্তূপ (দূর থেকে দেখা যাচ্ছে)

এমন ভাবে সব বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যে, আমরা যেন কয়েক ঘণ্টার মত চলে গেলুম সেই দু'হাজার বছর আগের বৌদ্ধ যুগের সমৃদ্ধ সময়ে—যখন পাটলিপুত্র ওদন্তপুর শিলাদিত্যপুর রাজগৃহ ছিল সারা ভারতের গৌরবস্থল।

প্রথমে স্তূপ এবং মঠ বা বিহার গুলির কথাই বলা যাক। কারণ, এই সারিবদ্ধ বৌদ্ধস্তূপগুলি ঠিক বৌদ্ধ বিহার বা মঠগুলির সামনেই রয়েছে। এদের যেমন পৃথক করে দেখা চলে না তেমনি পৃথক ভাবে বর্ণনা করাও সম্ভব নয়। নালন্দার ধ্বংসস্তূপ মাটির কবর থেকে বেরিয়ে এসে যে ইতিহাস আমাদের শুনিয়েছে তাতে আমরা গর্ববোধ না ক'রে পারিনা। এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় আজ প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করেছে যে একদা এদেশে উচ্চশিক্ষা উচ্চতর স্তরেই উন্নীত হ'য়েছিল। নালন্দার এই বৌদ্ধ বিহার কত না শতাব্দী ধ'রে শুধু গৌড় সাম্রাজ্য নয়, পূর্ব এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠরূপে গণ্য হ'ত। পালরাজবংশের আনুকূল্যে ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে এই সময় বাংলার ইতিহাসে শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক স্বর্ণযুগ এসেছিল। কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় বলা চলে—সেদিন :—

"বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ংকর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপংকর।

* * * *

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে বরভূধরের ভিত্তি,
শ্যাম কাম্বোজে ওংকারধাম মোদেরি প্রাচীন কীর্তি।
ধেয়ানের ধনে মূর্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বিটপাল আর ধীমান যাদের নাম অবিনশ্বর।
আমাদেরি কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়
আমাদের পট অক্ষয় করে রেখেছে অজন্তায়।"

ভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানগুলির অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে পূর্বোক্ত বড়গাঁও পল্লীতে শ্রীযুক্ত বুখানান হ্যামিল্টন প্রথম 'নালন্দা'র সন্ধান পান কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি কৃতনিশ্চয় হ'তে পারেননি। শ্রীযুক্ত বুখানান হ্যামিল্টনের পূর্বেই স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহামও এইখানেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বলে সন্দেহাতীতরূপে ঘোষণা করেন এবং তাঁর প্রবন্ধের স্বপক্ষে কিছু প্রমাণও উপস্থিত করেন। কিন্তু আমাদের তদানিন্তন ইংরাজ শাসকবর্গ এ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল কিছুই করেননি। মাত্র ১৯১৫ সালে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এখানে খনন কার্য সুরু করেন এবং ভারতের এই অতুলনীয় প্রাচীন কীর্তিকে মাটির ভিতর থেকে উদ্ধার করেন। যা দেখে আজ বিশ্বের লোক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ছে। নালন্দার এই ধ্বংসাবশেষ দেখলে বোঝা যায় একদা এই বিশ্ববিদ্যালয় বিস্তৃত স্থান জুড়ে স্থাপিত হয়েছিল। এর নক্সা থেকে জানা যায় যে একদিকে ছিল যত বৌদ্ধ চৈত্য ও সব সাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্মিত সরকারি ভবনাদি এবং অপরদিকে ছিল যত মঠ বা বিহার ও সমস্ত বিদ্যালয়-গৃহ। এই গৃহগুলির কোন কোনোটি যে কয়েকতলা উঁচু এবং বিরাট আকারের ছিল সে পরিচয়ও পাওয়া যায়। তাছাড়া ধ্বংসাবশেষগুলির একাধিক স্তর দেখে বোঝা যায় যে গৃহগুলি বার বার নির্মিত হয়েছিল।

(ক্রমশঃ)

নেতাজী

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

আমি যে তোমার আগমন পথ চাহিয়া আছি
আমার নেতা, আমার নেতা !
দেশের জীবন দুঃখ-দাহনে
দারুণ ক্লেশা ।
কবে বা ধ্বনিবে বজ্র-বাণীর
সে নির্ঘোষ ?
দাও সাড়া দাও, দূরেই থাক বা নিকটে থাক,
নেতাজী বোস ।
এখনো অনেক বাকি আছে না-কি ?
সংগ্রাম বুঝি হয়নি শেষ ?
সেনাপতি, আজ কি আদেশ তব,
কি নির্দেশ ?
সাড়া দাও বীর, সাড়া দাও তুমি
বন্ধু, আজ !
এখনো রয়েছে অসমাপ্ত যে
অনেক কাজ ।

বিশ্বে যখন বহ্ন্যুৎসব
বীণায় দীপ্ত দীপক বাজে,
মৃত্যু-লীলায় মত্ত মানুষ,
দেবতা প্রলয়-নৃত্যে নাচে,
প্রবল পীড়নে পিষ্ট ভারত,
বাহিরে বাজিল তোমার ভেরী
ভেবেছি আমরা সময় আসে নি,
এখনো বুঝি বা অনেক দেরী ।
তুমি বলেছিলে, শোণিত মূল্যে
কিনিতে যে হবে স্বাধীনতায়,
পথে যা পেয়েছি কুড়ায়ে, করেছি
হৃদয়-রক্তে শুচি কি তায় ?
সকল পথের লক্ষ্য কি এক ?
সব সাধনার সমান ফল ?
দিল্লীর পথ হারায়ে ফেলেছি,
কি হবে ফুকারি দিল্লী চল !

নেতাজী সুভাষ, হেথা কি তোমার
আসার সময় হয়নি, হায়,
তোমার কণ্ঠ শুনিব বলিয়া
আছি যে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ।
খোল খোল দ্বার, বলি' বার বার
করাঘাত তুমি করেছ দ্বারে,
পূর্ব্ব আকাশে উষার উদয়,
আমরা ছিলাম অন্ধকারে ।
নিজেরে হারায়ে সেদিন আমরা চেতনা হারা,
আত্মহারা,
শুনেও শুনিনি সেই আহ্বান,
দিই নি সাড়া ।
ভেবেছি—স্বপ্ন, ভেবেছি এ ভুল,
সে ডাক তোমারি, বুঝিবে কে তা ?
শুনিনি বলিয়া অভিমান কোন রেখো না মনে,
আমার নেতা, আমার নেতা !

সবার শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী তুমি,
জগতে এমন দেখিনি কোথা,
কল্পনাতেও সীমা যে মেলে না,
কাহিনীতেও নাই এমন কথা ।
পূর্ব্ব এসিয়া একদিন উঠিল,
কি বিরাট সেই সংগঠন !
শিবাজী প্রতাপ তুলনা তোমার,
লেনিন এবং ওয়াশিংটন ।

কণ্ঠে যাহার অম্লান মালা,
বক্ষে স্বপ্ন চক্ষে জ্যোতি,
লক্ষ জীবনে যাহার প্রেরণা
মুক্তি-যজ্ঞে করিল ব্রতী,
যে তুমি সকল বিঘ্ন বিজয়ী
দুঃখ-জেতা,
সঙ্কটে যে চাই তোমারেই চাই, তোমারে ডাকি
আমার নেতা, আমার নেতা ।

নেতাজী তোমায় স্মরণ করি,
নেতাজী তোমায় বরণ করি,
স্বপ্ন সাধনা সফল হোক
তব বর্ত্তিকা দিক আলোক,
মোরা বার বার ও-নাম করি,
নেতাজী তোমায় প্রণাম করি
মহা-ভারতের হে মহাকবি,
যুগ স্রষ্টা হে বিপ্লবী,
আনিলে যে গতি, আনিলে আবেগ,
অনড় অচল জীবন সেথা,
আমি যে তোমার আগমন-পথ চাহিয়া আছি,
আমার নেতা, আমার নেতা !

জাপানে সন্তান পালন ও নারী-শিক্ষা

শ্রীহরিপ্রভা তাগাতা

জাপানের গ্রামে কয়েক বৎসর থাকার সুযোগ পেয়ে তথাকার গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আভাস আমার মাতৃভূমি বাংলার গ্রামের বোনেদের কাছে উপস্থিত করছি। এতদ্বারা আমার সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা উর্ব্বরা, অফুরন্ত লক্ষ্মীর ভাণ্ডারপূর্ণ দেশের বোনেরা জাপানের পাহাড় পাথরভরা ছোট অতি দরিদ্র দেশের মেয়েদের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে—স্বীয় উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি সাধনের দিকে উদ্যোগী হলে আনন্দিত হব।

জাপানের মায়েদের সন্তান কামনা ও সযত্নে শিশু পালনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেখা যায়। গর্ভবতী হলেই মা সর্ব্বদা চিকিৎসকের গৃহে যেয়ে পরামর্শ লন। গ্রামের কৃষকপত্নীরাও এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান আছে। গ্রামে গৃহেই প্রসব ব্যবস্থা করে এবং শিক্ষিতা ধাত্রী দ্বারা প্রসব করান হয়। সহরে অধিকাংশ মেয়েরা হাসপাতালে যায় এবং এজন্য হাসপাতালে যথেষ্ট ব্যয় হয়। সেখানে হাসপাতালে খরচ দিয়ে থাকতে হয়।

প্রথম সন্তান প্রসব কালে মেয়েরা প্রায় পিত্রালয়ে গমন করে। যুদ্ধ সময়ে অয়েলবথের অভাবে টাটকা খড়ের ছাই পুরে, পুরাতন বস্ত্রখণ্ড দ্বারা তোষক করে রাখে—তদুপরি প্রসব ব্যবস্থা করে এবং পরে ময়লাদি সহ ভূমিগর্ভে পুঁতে দেয়।

আঁতুড় ঘরকে এরা অশুচি মনে করে না। নিজ শয়ন-গৃহে কাঠের পাটাতনের মেজের উপরিস্থিত মোটা মাদুরের ওপর পরিষ্কার তোষক লেপ দিয়ে প্রসূতি ও শিশুকে রাখা হয়। অভিজ্ঞ ধাত্রী সপ্তাহ কাল প্রসূতি ও শিশুর পর্য্যবেক্ষণ করে।

একমাসান্তে শিশুর ক্ষৌরকার্য্য সমাধা হলে সুসজ্জিত শিশু কোড়ে মা মন্দিরে পূজার্চনা করে দেব আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন। প্রথম সন্তান তার মাতামহ গৃহ হতে তার প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী—শিশুর শীত গ্রীষ্মের পরিচ্ছদ বিছানা জুতা খড়ম বাক্স কাপড়কাচা টব বাসতী দোলনা ঠেলাগাড়ী খেলনা পুতুল—পরে স্কুলের পোষাক ব্যাগ জুতা ছোট সাইকেল ইত্যাদি পেয়ে থাকে। কর্ম্মব্যাপৃতা কৃষক শ্রমিকগৃহে—ছোট ছেলের দোলনা ও ঠেলাগাড়ী বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে করে। শিশুকে অতি সযত্নে শুইয়ে রেখে মা নিশ্চিন্তভাবে নিজের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, প্রয়োজন হলে শিশুকে ঠেলাগাড়ীতে বসিয়ে ঘাটে মাঠে দোকানে সঙ্গে করে নিয়ে যায়—২।১ মাস গেলেই শিশুকে চওড়া ফিতা দ্বারা মায়ের পীঠের সঙ্গে জড়িয়ে বেঁধে নেয়। শীতে তুলার জামা দিয়ে ঢেকে দেয়। মায়ের পীঠের গরমে লেপের মত তুলার জামার নীচে শিশু আরামে গরমে থাকে। পাইখানা প্রস্রাবের জন্য তুলার প্যাড দিয়ে, অয়েল-ক্লথে প্রস্তুত পাজামা পরিয়ে দেয়, তাতে শিশুর বা মায়ের বস্ত্রাদি অপরিষ্কার হতে পারে না। মাতৃ-দেহ-লগ্ন থাকায় শিশুর অসুবিধা মা সহজেই বুঝিতে পারেন এবং প্রয়োজন মত তার প্রতিকার করেন। এইভাবে শিশুকাল হতেই নিজ প্রয়োজন প্রকাশ করিবার শিক্ষা হয়।

শিশু আধস্বরে কথা বলতে আরম্ভ করলে মা অনর্গল তার সঙ্গে কথা বলতে থাকেন। শিশুকে পিঠে বেঁধে মা নানা কাজ কর্ম্ম করেন, ট্রামে বাসে চলা-ফেরা করেন। পথে চলতে, কাজকালে, শিশুর সঙ্গে কথা ব'লে ছড়া শুনিয়ে, গান শিখিয়ে, শিশুর বিরক্তিতে নে'চে দুলিয়ে নিত্য নূতন বিষয় শিখিয়ে শিশুর অজস্র প্রশ্নের জবাব দিয়ে মায়েরা চলেছেন—ট্রেণে ট্রামে বাসে এরূপ দৃশ্য সর্ব্বদা দেখা যায়। এতে মায়েদের বিরক্তি নেই। শিশুকে এঁরা মারধর করেন না।

এ দেশে প্রতি বৎসর তৃতীয় মাসের তৃতীয় দিন শিশু কন্যার এবং পঞ্চম মাসের পঞ্চম দিনে পুত্র সন্তানের পর্ব্ব দিন। শিশু জন্মের প্রথম পর্ব্বদিনে আত্মীয়দের নিকট হতে নানাপ্রকার পুতুল পায়। পাহাড়ের তুষার বরফ গলে যেতে শীতের প্রকোপ কমে আসে, বসন্তের সাড়া পেয়ে পুষ্প বৃক্ষলতা, "মোমো"বৃক্ষগুলির পীচ গাছ—সজীব হয়ে ওঠে। প্রকৃতির সজীবতায় শিশুরা তুলা-ভরা মোটা কিমোনোর বোঝা ছেড়ে ফেলে—হালকা হ'য়ে—বসন্তের প্রজাপতির মত রং বেরংএর কিমোনো প'রে নেচে নেচে ঘুরে বেড়ায়। এই দিনে শিশু "মোমোনো সেক্কু" পর্ব্ব উৎসব সম্পন্ন করে। জন্মের প্রথম সেক্কুতে ও পরে—আত্মীয়দের কাছ থেকে পাওয়া পুতুলগুলি, সযত্নে তুলে রেখে দেয়, এই দিনে সেই পুতুলগুলি বের ক'রে বাক্স বেঞ্চের গ্যালারী করে সুন্দর আস্তরণ ঢেকে, তার ওপর সুন্দর পরিচ্ছদে সজ্জিতা রাজা রাণী বুড় বুড়ী ছেলে মেয়ে নানা রংএর নানা ঢংএর পুতুলগুলি সাজিয়ে রাখে—সামনে ফুল বাতি আহার্য্য, ভাত পীঠা ফল সাজিয়ে দেয়। শিশুগণ তার ছোট বন্ধুদের ডেকে আমোদ ও আহার ক'রে বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ খেয়ে বেড়ায়। মা শিশুদের সব ব্যবস্থা ক'রে দেন। উৎসব শেষে পুতুলগুলি সযত্নে তুলে রাখে, বৎসরান্তে আবার তাদের উৎসবের সময় বার করে। পুতুল ভেঙ্গে গেলে, অপরিষ্কার হলে, ঠিক মত সাজান না হলে, শিশুর নিন্দা হয়। এজন্য ছোট্ট শিশুরাও সাবধানতা সহকারে তাদের সুন্দর পুতুলগুলি নাড়াচাড়া করে। এতদ্বারা শৈশবকাল হতেই তাদের মাতৃত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়।

পঞ্চম মাসের পঞ্চম দিনে ছেলেদের উৎসবে তারা বীর সেনা ঘোড়ার পুতুল পায়, আর কাপড়ে তৈরী খুব বড় কৈ মাছ প্রাঙ্গণের গাছে কিংবা ছাদে বাঁশ দিয়ে উচ্চে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়। পুত্র সন্তান গৃহে এসেছে—সকলে আনন্দ জ্ঞাপন করে।

৩।৪ বৎসর বয়সে ছেলে মেয়ে শিশু স্কুলে যায়। সেখানে শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে খেলাধূলা, নাচ-গান, ছবিআঁকা, কাদা-মাটীর পুতুল, বাগান

পাহাড় নদী গড়ে সারাদিন—প্রাতে ৯টা থেকে ৩টা পর্য্যন্ত কাটায়। মধ্যাহ্নাহারের ভাত বাক্স করে নিয়ে যায়—স্কুলে ঝোল ব্যঞ্জনাদি মিষ্টদ্রব্য পায়।

সপ্তম বৎসর বয়সে এপ্রিলে ছেলে মেয়ে প্রাথমিক স্কুলে ভর্ত্তি হয়। এই স্কুলে বিনাখরচে ৬ বৎসরকাল অধ্যয়ন করতে জাপানের সব ছেলে মেয়ে বাধ্য। নূতন পোষাক জুতা ব্যাগ বই নিয়ে, ছেলে মেয়ে ব্যাগটী পীঠে ঝুলিয়ে, মার সঙ্গে মহানন্দে স্ফূর্তিতে স্কুলে যেয়ে ভর্ত্তি হয়। এই দিনটী এদের বিশেষ দিন বলে—এতদিন প্রতীক্ষায় কাটিয়েছে।

স্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণ ছেলে-মেয়েদের কখনও মারধর করে না। স্কুলে ঝাড়ুদার দ্বারবান রাখা হয় না, ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক পর্য্যায় ক্রমে যাবতীয় কাজ করে। বিদ্যালয়ে শৈশব হতেই রন্ধন সেলাই এবং সেবা কাজ শেখান হয়। পাঠ্যাবস্থায়—কলেজে পড়লেও—ছাত্র ছাত্রীগণ মাথার চুলের বাহার করে না। ছাত্রগণ স্কুল কলেজে ও সৈন্য শিক্ষালয় পর্য্যন্ত চুলগুলি ছোট করে কাটে; ছাত্রীগণ ছোট চুল কোন প্রকার বিলাসহীনভাবে বাঁধে। অধ্যয়ন শেষ হলে চুলের যত্ন করে—তৎপূর্ব্বে নয়।

ছেলে মেয়ে একত্রে অধ্যয়ন ও খেলা-ধূলা করে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণ ছাত্র-ছাত্রীদের পাহাড়ে সমুদ্রে তীর্থে কলকারখানাদি দ্রষ্টব্য স্থানে বেড়াতে নিয়ে যান; জুলাই আগষ্ট মাসে নদী ও সমুদ্রে সাঁতার শেখান হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন শেষ হলে উচ্চ শিক্ষা ও কৃষি শিল্প-শিক্ষার্থে গমন করে। অনেকে কলকারখানায় উচ্চ শিক্ষা বা অর্থোপার্জ্জনার্থ গমন করে। মেয়েদের জন্য ভিন্ন উচ্চ শিক্ষালয় আছে।

জাপানী মেয়েদের সূচী-বিদ্যা শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষ হলে কয়েক বৎসর সূচী-শিল্প শিক্ষা করতে হয়। জাপানী পরিচ্ছদ হাতে সেলাই করতে হয়। পরিপাটী পরিচ্ছদ প্রস্তুত না শিখলে মেয়েদের সম্ভ্রান্ত সমাজে বিবাহ হয় না ও চলতেও অক্ষম হয়। এজন্য মেয়েরা সূচী শিক্ষালয়ে প্রতিদিন প্রাতে ৮টা হতে সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একাসনে উপবিষ্ট হয়ে সূচী শিক্ষা লাভ করে। মধ্যাহ্ন ভোজনের ভাত বাড়ী থেকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে—শিক্ষালয়ে বসেই তা খেয়ে নেয়।

বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য পরিচ্ছদের প্রচলন হওয়ায় দরজীর কাজ শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজন বোধে, সকলেই সেলাইয়ের কল, ইলেক্ট্রীক ইস্ত্রী কেনে ও দরজীর কাজ শিখে, পরিপাটিভাবে পোষাক পরিচ্ছদ প্রস্তুত ও বিক্রয় করে। এদের প্রতি গৃহে সেলাইয়ের কল ক্রয় করে।

সম্পন্ন গৃহে ফুল সাজান এবং "ওচা" (সবুজ পাতায় প্রস্তুত) প্রস্তুতি শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়। সূচী-শিল্প, ফুল সাজান এবং 'ওচা' শিক্ষা এই তিন কাজে জাপানী মেয়েদের যাবতীয় গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। পরিপাটী—পরিচ্ছদ পরিধান, নিখুঁত দৃষ্টিতে গৃহ সৌন্দর্য্য সাধনার্থ ফুল সাজান এবং অতিথিকে "ওচা" পরিবেশন—এই তিন কাজের ভেতর মেয়েদের বিশেষতঃ প্রকাশ পায়।

জাপানী গৃহে ফুল সকলেই ভালবাসে। গৃহ-দেবতার পূজার স্থানে ২।৪টী ফুল পাতার গুচ্ছ সাজানর ভেতর এদের সৌন্দর্য্য বোধ, গৃহকোণের ফুল পাতার টোলাটী ঘরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। সম্মুখস্থ ছোট্ট প্রাঙ্গণে বৎসরের যাবতীয় ফুল একটীর পর একটী ফুটে উঠছে। ফুলের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তায় জাপানের দোকানভর্ত্তি ফুল পাতা তোড়া গুচ্ছ বিক্রয় হয়।

ফুল পাতা সহ গাছের ডালটীর, ফুল পাতাগুলি নুইয়ে কেটে—একাসনে একদৃষ্টিতে বসে সাজান শিখে ঘরে সাজায় ও দোকানে বিক্রয় করে।

'ওচা' পরিবেশন ওচা পান পদ্ধতি শিক্ষায়।—এদের ওঠা বসা-চলা অঙ্গুলি পরিচালনের মধ্য দিয়ে ধীরতা নিষ্ঠা অধ্যবসায় সহিষ্ণুতা ইত্যাদি সব গুণগুলিকে ফুটিয়ে তোলে।

আসবাবহীন গৃহ কোণের দেওয়ালে কয়েকটা কালার আঁচড়টানা একখানি ছবি—তার নীচে এককোণে অদ্ভুত ছোট আঁকা-বাঁকা ডালটীতে আধ ফোটা ২।৪টী ফুল ও পাতা,—মাদুর মোড়া গৃহ প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থানে আসনে উপবিষ্ট সুবেশী অতিথির পরিচর্য্যায় রতা, সুসজ্জিতা তরুণী—ধীর পাদক্ষেপে, ওচাপাত্র হস্তে এগিয়ে আসছে—ধীরে অতি ধীরে—অতিথির সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হয়ে অভিবাদনান্তে ওচা পরিবেশন করে ফিরে দ্বার বন্ধ ক'রে চলে গেল, আর অতিথি সুন্দরীর প্রতি দৃকপাত না ক'রে অভিবাদান্তে 'ওচা'-পাত্র গ্রহণ করে ওষ্ঠে ছুঁইয়ে দিল।

এই ওচা পদ্ধতি পুরাকাল হতে প্রচলিত। জাপানের সামুরাই যোদ্ধাগণ দেশরক্ষা ও যুদ্ধাদির জন্য নির্জ্জন গৃহে গভীর মন্ত্রণায় নিমগ্ন থাকাকালে, তাদের চিন্তা ও কার্য্যে বিঘ্ন না ঘটিয়ে পরিচারক পরিচারিকাগণ এইভাবে ওচা পরিবেশন করত।

উচ্চ শিক্ষালয়ে বিশেষভাবে মার্জ্জিত ভদ্রভাষায়, বিনয় মিষ্টস্বরে কথা বলতে শিক্ষা দেওয়া হয়। সম্ভ্রান্ত গৃহের মেয়েরা অপরিচিতের বা অতিথির সঙ্গে বাক্যালাপে মার্জ্জিত ভাষা ব্যবহার করে এবং কণ্ঠস্বর বদলিয়ে মিষ্টস্বরে কথা বলে। সাধারণ কথার ভাষা এবং এই মার্জ্জিত ভাষা বিভিন্ন—আদব কায়দাও শৈশব হতে বিশেষ ভাবে শিখতে হয়।

প্রথম সাক্ষাতে অভিবাদন, কুশল প্রশ্নোত্তর ধন্যবাদ জ্ঞাপন, অযথা বিরক্ত করার জন্য ক্রটী স্বীকার ও ক্ষমাভিক্ষা এবং তদুত্তরে অপর পক্ষ আনন্দ জ্ঞাপন ইত্যাদি বহুবাক্য বিনিময়ের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ উভয়কেই মস্তক অবনত করা রীতি। প্রাতে মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে রাত্রিতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, কেহ বহির্গমনকালে ও পুনরাগমনে, বিদায়কালে বাক্য বিনিময় ও প্রতি বিষয়ে ক্ষমাভিক্ষা ও ধন্যবাদ মুখে লেগেই আছে। দাসদাসীকেও আদেশ ব্যঞ্জক কথা বলে না ও ধন্যবাদ জানাতে হয়। এদেশে গালাগালির প্রচলন নাই। বোকা ও পাগল এই দুটী কথা গালাগালিতে ব্যবহার করে। ক্রোধে এরা কাঁদে না বা ক্রোধ প্রকাশক বহুকথা বলে না। রক্তবর্ণ মুখ ও ব্যবহারে এদের ক্রোধ প্রকাশ পায়। অতি ক্রুদ্ধ ব্যক্তিও অন্য লোকের সম্মুখীন হইলে তাহার ভাব ভাষা কণ্ঠস্বর

সম্পূর্ণ বদলিয়ে গেছে। এ জন্য অত্যল্পকালে এদেশীয়দের প্রকৃত মনোভাব ও ব্যবহার বোঝা কঠিন।

সুশিক্ষিতা সুবিনীতা মধুরস্বভাবা জাপানের মহিলা, প্রাচ্যের প্রতীক স্বরূপা। তাদের বাক্যে ব্যবহারে পদক্ষেপে নারীত্ব ও নম্রতা ফুটে ওঠে।

এই মাধুর্যময়ী গ্রাম্য বালিকাও সভাসমিতি প্রকাশ্য স্থানে জীবন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করে, সাইকেলে চ'ড়ে বহুদূর পথ গমনাগমন করে। পুরুষের সঙ্গে সমভাবে চলে—ট্রামে বাসে চলা ফেরা করে এবং চালক কণ্ডাক্টরের কাজ করে। কারখানায় অফিসে হাসপাতালে ষ্টেশনে দোকানে হোটেলে, কৃষিক্ষেত্রে, সমুদ্রে মাছধরা প্রভৃতি সমস্ত কাজ এরা ক'রে, অথচ কৃষকপত্নী কৃষকমাতা জেলেনী সকলেই লেখা পড়া শেখে, দৈনিক কাগজ পড়ে।

ছেলেমেয়েদের শৈশবেই ছোট সাইকেল কিনে দেওয়া হয়। ছেলে ও মেয়ে সকলেই সাইকেল চালাতে শেখে। মেয়েরা দূর পথ সাইকেলে চলাফেরা করে। মেয়েদের কোন প্রকার অবরোধ প্রথা নাই। গৃহের ভাইবোনের মত শৈশবকাল হ'তে একত্রে অধ্যয়ন, খেলাধূলা করে, স্বল্প পরিচ্ছদে একত্রে নদী ও সমুদ্রে সাঁতার শেখে, পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে কোনরূপ দ্বিধা-সঙ্কোচের ভাব এরা মনে আনার সুযোগ পায় না—সহজ ও সরল ভাবে শৈশব কাল হতে মিশতে অভ্যস্ত হয়। ছেলেদের সঙ্গে এ ভাবে মেলামেশা খেলাধূলা করায় মেয়েরা ছেলেদের মতই সবল ও পরিশ্রমী হয়। পুরুষের সাহায্য ছাড়াই এরা অনেক পরিশ্রমের কাজ করতে সক্ষম হয়। মেয়েরা সকল অবস্থায় নিজকে রক্ষা করতে পারে এবং পুরুষ মেয়েদের ওপর কোন প্রকার পাশবিক অত্যাচারের সাহস পায় না। প্রয়োজনবোধে শান্ত নম্রপ্রকৃতির মেয়েরা ক্ষিপ্ত সিংহীর মত বিক্রমশালিনী হতে দেখা যায়—তারা উদ্দীপ্ত তেজে স্বাধীন জীবিকার্জ্জন করে চল্‌তে সক্ষম হয়।

স্বীয় উন্নতি প্রচেষ্টায় জাপানবাসী সমানে পাশ্চাত্যের অনুকরণ ক'রে আসছে—অন্যান্য অনুকরণের সঙ্গে এদের পরিচ্ছদ চালচলন অনেক বদলিয়ে গেলেছে। কিন্তু বর্ত্তমানে পরাজিত জাপানের মেয়েরা পাশ্চাত্যের সম্পূর্ণ অনুকরণে রত। এতদিন তাদের ঘাড় পর্য্যন্ত ছোট কাল চুল (বব্‌হেয়ার) ইলেকট্রিক কলে কুঁকড়িয়ে নিত কেবল—এক্ষণে রাসায়নিক ঔষধে কটা ক'রে নিচ্ছে। এখন মেয়েদের নম্রতা ব্যতীত চালচলন পদক্ষেপ ও ভাব বদলিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা দমাবার জন্য যুদ্ধ প্রিয় বীরের পূজা বন্ধ করার চেষ্টায় "ওমিয়া" দেবস্থান বনাকীর্ণ এখন।—এখন সহরে সহরতলীতে বায়স্কোপ থিয়েটার হলের সঙ্গে (dance hall) নাচ ঘর হচ্ছে আর ছেলেমেয়ে একত্রে dance করছে, আমোদ করছে—এখন তারা মার্কিণ অনুকরণে মার্কিণ অভিরুচিতে গঠিত হচ্ছে।

জাপানের নারী

জাপানে অধিকাংশ স্থলে ঘটকের মধ্যস্থতায় বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। পাত্র পাত্রীর মনোনীত সম্বন্ধও প্রায়ই ঘটক ঘটকী দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। ২০ বৎসরের নিম্নে মেয়েদের বিবাহ হ'তে দেখা যায় না। ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পিতা মাতার উপর নির্ভর করে এবং ঘটকের মধ্যস্থতায় চলে। বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হলে বাগ্‌দান অনুষ্ঠানের পর পাত্র পাত্রী পরস্পর ঘনিষ্ঠতা করে। বিবাহের পূর্ব্বে কনে একদিন কুমারী খোঁপা বেঁধে আত্মীয়গণ-সহ আশীর্ব্বাদি ও আমোদ প্রমোদ করে। জাপানের মেয়েরা আজকাল মাথার লম্বা চুল কেটে ফেলেছে—এখন তাদের ঘাড় পর্য্যন্ত ছোট চুল ইলেকট্রিকে কুকড়িয়ে নেয়—পাশ্চাত্য ধরণে বাঁধে। কিন্তু বিবাহ কালে এই ঘাড় পর্য্যন্ত কাট ছোট চুলে আরো কালী দিয়ে কাল ক'রে পর-চুল দিয়ে বড় জাপানী খোঁপা বাঁধে, তাতে ফুল কাঁটা ইত্যাদি গুঁজে চওড়া ফিতার মত একটুকরা কাপড় জড়িয়ে দেয়। মুখে সাদা রং, ঠোঁটে লাল, গালে গোলাপী, চোখের কোনে কাজল কালী দিয়ে—পটের ছবির মত কনে সাজান হয়, গাঢ় রং এর কিমোনো পায়ে লুটিয়ে পড়ে, কোমরে সোনালী রূপালী কাজ করা মূল্যবান চওড়া ফিতা জড়িয়ে, পেছনে বড় করে ফাঁস দিয়ে দেয়। সুসজ্জিতা কনে ঘটক ঘটকী ও কন্যা কর্ত্তা সহ ধীর পদক্ষেপে নতনেত্রে, কনে-সাজান-দাসীর নির্দ্দেশ মত তাহার সঙ্গে শ্বশুর গৃহে গমন করে। বধূ-আগমনে প্রতিবেশীগণ হর্ষধ্বনি ক'রে বিস্কুট কমলা লেবু ছড়িয়ে দেয়, পাড়ার ছেলেমেয়েরা মহানন্দে কুড়িয়ে খায়। বধূ গৃহদেবতাকে প্রণামান্তর অভ্যাগতগণের সম্মুখে বরের পার্শ্বে শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট হয়ে সকলের সঙ্গে 'সাকে'—জাপানী মদ পান করে। কনে পিত্রালয় হতে তার পোষাক পরিচ্ছদ শয্যা আসবাব গৃহ সামগ্রী নিয়ে আসে। বধূ পিত্রালয় হতে যা আনে তাহা তার নিজস্ব। জামাতাকে কোন উপঢৌকন দেওয়া হয় না।

দরিদ্র পিতামাতার কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে নিজের উপার্জ্জিত অর্থে বিবাহসজ্জা প্রস্তুত করে পিতামাতার সাহায্য করে থাকে এবং পাঠ্যাবস্থা শেষ হলেই অর্থোপার্জ্জন করে।

শ্বশুরালয়ে বধূকে শ্বশুর শাশুড়ীর মনোমত হয়ে চল্‌তে হয়। তার অন্যথায় শাশুড়ী ননদের গঞ্জনা ভোগ এদেশেও আছে। পিতামাতার মনঃপূত না হলে, স্বামী অনায়াসে স্ত্রী ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হয় না। বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা এখানে প্রচলিত আছে, বিচ্ছেদ হলে স্ত্রী তার দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে চলিয়া যায় এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই পুনর্বিবাহ করতে পারে।

বিবাহের পর জ্যেষ্ঠপুত্র, বা জ্যেষ্ঠের অনভিপ্রায়ে একপুত্র পিতামাতার নিকট একত্র বসবাস করে এবং পিতামাতা বৃদ্ধাবস্থায় তাঁদের তত্ত্বাবধান এবং ভাইভগ্নীর প্রতি যথা কর্ত্তব্য পালন করে। অন্যান্য সন্তান বিবাহের পর ভিন্ন বাস করে। পিতা যথোচিত সাহায্য ও ব্যবস্থা করে দেন। কন্যা-সন্তান বিবাহান্তে শ্বশুরালয়ে যায়, অপুত্রক পিতার কন্যাকে ঘর জামাই বিবাহ দেয় ও জামাতা স্বীয় পদবী ত্যাগ করে কন্যার পদবী গ্রহণ করে পুত্রস্থানীয় হয়।

এখানে স্ত্রীকে স্বামীর অনুগত হয়ে চল্‌তে হয়। দুর্নীতিপরায়ণ অসচ্চরিত্র স্বামীরও সকল অত্যাচার স্ত্রী নীরবে সহ্য করে এবং স্বামীর

শাসন মেনে চলে। এদেশের স্বামী স্ত্রীকে দাসীবৎ জ্ঞান করে অথচ স্ত্রী স্বামীকে গুরুর ন্যায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। সাধ্বী স্ত্রী অসৎ প্রকৃতি স্বামীর পরিবর্তন প্রচেষ্টায় স্বামীর মনোতুষ্টি সাধনের চেষ্টা করে। স্বামীর প্রতি সুমধুর ব্যবহার স্বামী সেবায় মেয়েদের একনিষ্ঠ চেষ্টা দেখা যায়। গৃহের যাবতীয় কাজ—সন্তানপালন, বাজার, দোকান, প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় ইত্যাদি সকল কাজ মেয়েরাই করে। এ সকল কাজে পুরুষ মাথা ঘামায় না। স্বামী কর্মক্ষেত্রে যাত্রাকালে তার পরিচ্ছদ ঠিক ভাবে গুছিয়ে দিয়ে, পোষাক পরিধানে সাহায্য করে, যাত্রাকালে হাঁটু গেড়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে অভিবাদনান্তে "দেয়ে ঘুরে এসো" বলে বিদায় দেন। সন্তান পরিজন গৃহের বাহিরে যাত্রা কালে "বাইরে যাচ্ছি" বলে যায়, আর মা "ঘুরে ফিরে এসো" বলেন।

স্বামী স্ত্রী এক সঙ্গে ট্রেনে বাসে চলার পথে স্ত্রী সন্তানকে পিঠে বেঁধে, পুঁটলীর হাতে বা সঙ্গে একটা পুঁটলীও নিয়ে চলেন—আর স্বামী তার সামনে ব্যাগটী হাতে, ট্রেনে উঠে বসে পড়লেন—স্ত্রী বসার স্থানাভাবে সামনে দাঁড়িয়ে রইল। এই দৃশ্য জাপানে সর্বত্র দেখা যায়। এতে পুরুষ কোন দ্বিধা বোধ করে না। বৃদ্ধা স্ত্রী ও অশক্ত মহিলাও খুব অতিরিক্ত বোঝা হাতে পুরুষ মহিলাকে বসার স্থান ছেড়ে দেয় না।

স্ত্রীর সহিত আমোদ প্রমোদ, স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার বাহ্যিক নিদর্শন প্রদর্শন অথবা তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এদেশীয় পুরুষের দেখা যায় না। স্ত্রী গৃহকর্ত্রী সন্তানের জননী, স্বামীর কাজকর্মে সুখ সুবিধার সাহায্য কারিণী। গৃহ সংসারের সকল ভার স্ত্রীর হাতে। সন্তানদের শিক্ষার ভারও স্ত্রীর ওপর। পুরুষ দেশরক্ষা ও অর্থোপার্জনে নিয়োজিত, মা সন্তানদের গড়ে তুলে দেশের জন্য ও অর্থোপার্জনে উপযুক্ত ক'রে দেবেন, প্রয়োজন হলে নিজেও অর্থোপার্জন করবেন।

স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত স্বামীও স্ত্রীর প্রতি অনুরাগের কোন নিদর্শন প্রকাশ করাকে নিজের অসম্মানজনক বলে মনে করে। বাহ্যিক যে কোনও ব্যবহারেও স্ত্রী স্বামীর মনোভাব জানে এবং এ দেশীয় প্রথা বলেই কোনরূপ ক্ষুব্ধ হয় না। স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে উভয়েই পুনর্বিবাহ করতে পারে। কিন্তু বুদ্ধিমতী স্ত্রী শান্তভাবে সকল অবস্থাতেই স্বীয় ভাগ্য পরীক্ষায় চলে। জাপানের মেয়েরা অত্যন্ত চাপা এবং সহিষ্ণু। স্বীয় দুঃখ ব্যথা সহজে প্রকাশ করে না—এদের মুখে বিনম্র হাসি সব অবস্থাতেই দেখা যায়—আনন্দে সুখে সম্পদে এরা হাসে, দুঃখ বিপদ শোকেও এরা হাসে রাগেও হাসে—বুকভাঙ্গা ব্যথা হাসির আড়ালে ঢেকে রাখে।

এদেশে পুরুষ প্রায় "মেকাকে" রক্ষিতা স্ত্রী রাখে এবং তা দোষণীয় মনে করে না। এদেশের "গেইসা" নর্ত্তকী স্ত্রীলোক শিক্ষিতা ও সুমার্জ্জিতা হয়, বুদ্ধিমান ধনশালী ব্যক্তি, শুধু আমোদ স্ফুর্তির জন্য এদের সঙ্গলাভে কাটায় না, অনেক মন্ত্রণা বুদ্ধি জটীল প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করে। এজন্য 'গেইসা'দের বিশেষ শিক্ষাচর্চ্চার প্রয়োজন হয়। আসর নিমন্ত্রণাদিতে 'গেইসা' বালিকা পরিবেশন ও নাচ গান ক'রে সকলের মনোরঞ্জন করে!

মেকাকে গেইসা লালসা পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিমায় পুরুষকে আকর্ষণ করে আর স্ত্রী করুণ নত দৃষ্টিতে হাসিমুখে স্বামীর অনুগমন করে। মেকাকে ও গেইসা বালিকা বিবাহাদি ক'রে সমাজে চলতে পারে তাহাতে কোনও বাধা নাই।

জাপানবাসীর দেশপ্রিয়তায়—দেশের জন্যই তাদের গৌরব ও জীবন মনে করে। সন্তানদের সেইভাবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। পুত্র, দেশের জন্য জীবন দান করতে শিক্ষা পায় আর কন্যা উপযুক্ত পুত্রের মাতৃত্ব পদপ্রাপ্ত হবে এই তাদের লক্ষ্য এবং সে ভাবে গঠিত হয়। দেশের জন্য জীবন দানে যাত্রাকালে—মা বোন স্ত্রী কখনও বিচলিত হন না বা অশ্রুমোচন করেন না। বৃদ্ধা মাতা বলেন, দেশের সন্তান দেশের কাজে চলেছেন—সন্তান প্রতিপালনের ভার ন্যস্ত ছিল মাত্র তাঁর ওপর। স্ত্রী বলেন দেশের কাজে যাও—স্বামীর সন্তান প্রতিপালন ক'রে স্বামীর নাম রাখার ভার তাঁর ওপর।

এ দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত। গ্রামে গ্রামে বড় বুদ্ধ মন্দির "ওষেরা"য় শিক্ষিত পুরোহিত পূজাদি করেন—গ্রামবাসীর ক্রিয়াকর্ম্ম সমাধা করেন। মন্দির পার্শ্বেই তাঁর বাসস্থান। মন্দিরের বৃহৎ পবিত্র সুন্দর সুদৃশ্য প্রকোষ্ঠে গ্রামবাসী সম্মিলিত হয়ে পূজার্চ্চনায় যোগ দেন। প্রতি গৃহে বুদ্ধ গৃহদেবতা অধিষ্ঠিত। ভক্তিভাবে সকলেই পূজোপাসনা করে।

জাপানে মৃত বীর আত্মার পূজা প্রচলিত। দেশের মঙ্গলার্থ এই সকল আত্মা ও অন্যান্য বহু দেবতা পূজিত হয়। পূজা স্থান "ওমিয়া"। প্রতি গ্রামে সহরে সমুদ্র তীরে নদী গিরি বন উপত্যকা পার্শ্বে বৃহৎ দ্বারসংলগ্ন বড় বড় বৃক্ষ ঘেরা ঝরণা পুষ্করিণী সম্বলিত উন্মুক্ত বৃহৎ প্রাঙ্গণ ঘেরা এই "ওমিয়াতে" দেবস্থানে অদৃশ্য দেবতার নিকট দেশের মঙ্গলের জন্য আত্মীয় জনের মঙ্গলার্থ প্রার্থনা জানায় উৎসবাদি করে। গ্রামের মেয়েরা পর্য্যায়ক্রমে এই প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করে।

রাষ্ট্রভাষা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়াছে। এখন কয়েক বৎসর ইংরাজিকেই রাখিতে হইবে ইহা সকলেই বুঝিতেছেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোন ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে? বিধান পরিষদে স্থির হইয়াছে যে রাষ্ট্রভাষা হইবে হিন্দি এবং লিপি হইবে দেবনাগরী, তবে সংখ্যার লিপি (১, ২, ৩, প্রভৃতি) হইবে ইংরাজি (যদিও ইংরাজি সংখ্যা লিপিকে অন্তঃরাষ্ট্রীয় লিপি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।) হিন্দুস্থানী ভাষা ও উর্দু লিপির সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ হইয়াছে ইহা সুখের বিষয়। গান্ধীজি হিন্দুস্থানী ও উর্দুর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, গান্ধীজির পরে পণ্ডিত নেহরুও খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রবল প্রতিকূল মতের প্রভাবে নেতাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। অক্ষরের লিপি হইবে দেবনাগরী, কিন্তু অঙ্কের লিপি হইবে ইংরাজি আমরা এই খিঁচুড়ি লিপির বিরোধী। যাহারা হিন্দী ভাষী নহেন তাঁহারা যদি নাগরী অক্ষরলিপি লিখিতে পারেন তাহা হইলে নাগরী অঙ্কলিপি শিখিতে এমন কি বেশী কষ্ট হইবে? যদিও বিধান পরিষদ হিন্দী ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার অনেক সারগর্ভ কারণ আছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে সংস্কৃত যাহাতে রাষ্ট্রভাষা হয় এজন্য জনমত গঠিত করিবার জন্য কলিকাতায় একটি সমিতি হইয়াছে, তাহার নাম হইয়াছে "সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি"। সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয় ইহার সভাপতি হইয়াছেন, বহু চিন্তাশীল মনীষী ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। এই সমিতির আফিস ২৯, সদানন্দ রোড, কালীঘাট। সংস্কৃত কেন রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত তাহার বহু উৎকৃষ্ট যুক্তি দিয়া ইঁহারা ইংরাজি ভাষায় একটি প্রচার পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐ পুস্তক হইতে আমরা নিম্নে কতকগুলি যুক্তি দিতেছি :—

(১) কোনও প্রদেশের ভাষা রাষ্ট্রভাষা হইলে ঐ প্রদেশের অধিবাসীদের সুবিধা হইবে, অপর প্রদেশের অধিবাসীদের অসুবিধা হইবে। কিন্তু সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা হইলে এরূপ আপত্তি হইবে না। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের ভাষাই সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন।

(২) ভারতের জাতীয় সংস্কৃতি সংস্কৃত ভাষাতেই লিপিবদ্ধ আছে। প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে প্রদেশের সংস্কৃতিই পাওয়া যায়।

(৩) বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্বীকার করিয়াছেন যে সংস্কৃতের ন্যায় নিখুঁত ভাষা পৃথিবীতে নাই। W. C. Taylor বলিয়াছেন Sanskrit is a language of unrivalled richness and variety," Frederick Schlegel বলিয়াছেন "Justly it is called Sanskrit, ie. perfect and finished." Prof Max Muller বলিয়াছেন "Sanskrit is the greatest language of the world, the most wonderful and perfect." Sir William Jones বলিয়াছেন "It is of a wonderful structure, more perfect than Greek, more copious than Latin, more exquisitely refined than either." Sir W. Hunter বলিয়াছেন "The grammar of Panini stands supreme among the Grammars of the world." M. Dubois বলিয়াছেন "Sanskrit is the origin of the modern languages of Europe," Prof. Thompson বলিয়াছেন "The arrangement of consonants in Sanskrit is a unique example of human genius."

(৪) গীতা, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের অন্তর্গত। এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিলে মনুষ্য চরিত্রের প্রভূত উন্নতি হয়।

(৫) হিন্দুর ধর্মকর্মে সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। সংস্কৃত জানা থাকিলে সেই সকল মন্ত্র পাঠ অধিকতর সার্থক হয়।

ভারতবাসীর পক্ষে ইংরাজি শিক্ষা করা যত কঠিন, সংস্কৃত শিক্ষা করা তাহা অপেক্ষা অনেক সহজ। সকল প্রাদেশিক ভাষাতেই বহু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পর্য্যন্ত সংস্কৃত বাধ্যতামূলক করা উচিত। তাহা হইলে অনেকেই সংস্কৃত শিখিতে পারিয়া সংস্কৃতের মহিমা উপলব্ধি করিবেন এবং বুঝিতে পারিবেন যে সংস্কৃতই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত।

পূর্ব আফ্রিকায়—ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচার

স্বামী অদ্বৈতানন্দ

পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রেরিত সাংস্কৃতিক মিশনের প্রচার কার্য্যের ধারাবাহিক ও বিস্তৃত ইতিহাস বাংলা তথা ভারতের বিবিধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে 'ভারতবর্ষের' পাঠক পাঠিকাগণের নিকট মিশনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করবো- যাতে তাঁরা সহজে এ বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারেন।

আফ্রিকা অভিযানের প্রাক্‌মুহূর্ত্তে আমরা আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে দেশের কতিপয় নেতার সহিত যখন সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা করি তখন যাদের নিকট হতে আমরা বিশেষ উৎসাহ ও সহায়তা পাই তাদের মধ্যে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীযুত বি জি-খের, শ্রীযুত এম এস-আনে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীযুত সি-এস-ঝা প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা যে শুধু আমাদিগকে কয়েকখানি পরিচয়পত্র দেন তাহা নহে—এঁদের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব্ব আফ্রিকার কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ ও অন্যান্য পরিচিত বন্ধুবান্ধবগণকে ব্যক্তিগতভাবে পত্র দিয়ে আমাদের মিশনের প্রচারকার্য্যকে সাহায্য করবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান। বলা বাহুল্য উক্ত সমর্থনপত্রগুলি আমাদের কার্য্য-সাধনের বিশেষ সহায় স্বরূপ হয়েছিল।

১৯৪৮ সালের [illegible]ঠা জুন খাণ্ডালা জাহাজে আমরা ১০জন সন্ন্যাসী বোম্বাই হ'তে রওনা হই। যাত্রার পূর্ব্বে বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্যগণ আমাদিগকে পিপলস্ হাউস ও জাহাজ ঘাটে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত ক'রে বিদায়সম্মান জানান। তাঁদের সে আন্তরিকতা সত্যই হৃদয়স্পর্শী। বর্ষাকালের দুরন্ত-দুর্ম্মদ সমুদ্রের সহিত অবিরাম সংগ্রাম করে ১৪ দিন পরে খাণ্ডালা আমাদের নিয়ে আফ্রিকার প্রথম বন্দর মোম্বাসায় উপনীত হয়।

পূর্ব্ব হ'তে সমাচার পাওয়ায় এখানকার চারটি দেশ- টাঙ্গানিকা, জাঞ্জিবার, উগাণ্ডা, কেনিয়ার প্রত্যেক সহরে আমাদের মিশনকে অভ্যর্থনা করবার জন্য অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়। মোম্বাসায় পূর্ব্ব আফ্রিকার ট্রেড কমিশনার মিঃ সন্ত সিং, স্থানীয় হিন্দু ইউনিয়ন, আর্য্য-সমাজ, শিখ-সমাজ, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, সোস্যাল সার্ভিস লীগ, গান্ধী সোসাইটী, থিওসফিক্যাল সোসাইটী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দসহ আমাদিগকে জাহাজে পরমাদরে অভ্যর্থিত করেন। এইভাবে তথাকার প্রত্যেকটি সহরের অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হতে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমরা যে আদর, সম্মান ও প্রচারকার্য্য বিষয়ে যে সাহায্য সহানুভূতি লাভ করেছি—তাহা ভাষায় অবর্ণনীয়। আমাদের দেড় বছরের সফরের মধ্যে আমরা ১০ জন সন্ন্যাসী গৃহে গৃহে আমন্ত্রিত হ'য়ে যে আন্তরিক সেবাযত্নের পরিচয় পেয়েছি এবং প্রত্যেক সহরে হতে বিদায়কালে যে সুকরুণ মর্ম্মস্পর্শী বিয়োগদৃশ্য দেখেছি—তা' স্মরণ হলে এখনো হৃদয় মন ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে পড়ে। অতিথি ও সাধু-সন্তকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করবার যে আন্তরিক সংস্কার হিন্দুজাতির মজ্জাগত—তিন সহস্রাধিক মাইল দূরে সমুদ্র পারে যেয়েও তারা তা' যে বিন্দুমাত্র বিস্মৃত হয়নি—ইহা একান্ত বিস্ময়ের বস্তু!

বাল্যকালে ভূগোল ও পর্য্যটকদের কাহিনী পড়ে আফ্রিকা মহাদেশ সম্বন্ধে যে ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল, সেদেশে যাওয়ার পর সেই ধারণার বহুল পরিবর্ত্তন ঘটেছে। আফ্রিকা অত্যন্ত গরম দেশ ভেবে আমরা সকলে গরম কাপড় চোপড় ছেড়ে গিয়েছিলাম; কিন্তু যেয়ে দেখলাম—তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সমগ্র পূর্ব্ব আফ্রিকা ঘুরে কোথাও মাথাফাটা গরমের সন্ধান পেলাম না। অবশ্য সাহারার মরুপ্রান্তে যাবার সুযোগ আমরা পাইনি, তবে সুদানের মরুভূমি হতে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত কাটালে সহরেও আমরা বিশেষ বর্ষা ও শৈত্য অনুভব করেছি। মোটের উপর পূর্ব্ব আফ্রিকার আবহাওয়ার মধ্যে গরম অপেক্ষা বর্ষা ঋতুর সর্ব্বাধিক প্রাধান্য লক্ষ্য করেছি। অবশ্য বন জঙ্গল কেটে ফেলায় কয়েকটি অঞ্চলের বার মাসের নিদারুণ বর্ষা এখনও অনেকটা কমে আসছে।

জলবায়ু স্বাস্থ্যকর বলা চলে। তবে যতদূর শুনলাম সহরগুলিকে বর্ত্তমানে স্বাস্থ্যকর অবস্থায় আনবার জন্য সরকারকে অশেষ যত্ন করতে হয়েছে, বিষাক্ত কীট ও মশা মাছির উপদ্রব হতে জনপদগুলিকে রক্ষা করবার জন্য বিবিধ বৈজ্ঞানিক উপায়ের সহায়তা নেওয়া হয়েছে, সহরের ১০ মাইলের মধ্যে গরু, ঘোড়া, ছাগল প্রভৃতিকে পর্য্যন্ত আনতে দেওয়া হয় না। অনেক সহরে দূর দূর স্থান হতে বহু ব্যয়ে ঝরণা হতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরগুলিতে বৈদ্যুতিক আলো, ও পাখার বন্দোবস্ত হয়েছে। খাঁটি দুধ, ঘি ও প্রচুর খাদ্যশস্য এবং ফল অপেক্ষাকৃত সস্তায় পাওয়া যায়।

প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখলে পূর্ব্ব আফ্রিকার অধিকাংশ স্থলকে নন্দনকানন বলে মনে হয়। বিচিত্র বৃক্ষ বিটপীতে ঘেরা অসংখ্য হ্রদ গিরিপর্ব্বতসমূহে সুসজ্জিত পূর্ব্ব আফ্রিকা যেন সৌন্দর্য্যের লীলা নিকেতন। তবে মধ্যে মধ্যে যোজনব্যাপী বৃক্ষলতাহীন প্রান্তর ভাগও পরিদৃষ্ট হয়।

দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে ইবর্জী-শিবজী ও জয়রাম নামক দুইজন কচ্ছদেশবাসী ভাটিয়া ব্যবসায়ী অন্ন-সংস্থানে নৌকাপথে জাঞ্জিবার বন্দরে উপনীত হন। তথাকার সুলতান তাদিগকে সাদরে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান ক'রে অন্যান্য ভারতীয় ব্যবসায়ীগণকে আহ্বানের জন্য নির্দ্দেশ দেন। সেই হতে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণের গমনা-

গমন ও বসবাস সুরু হয়। এক্ষণে তথায় ভারতীয়দের সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ—তন্মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। ভারতীয় খৃষ্টান, পার্শী, বাঙালী প্রভৃতির সংখ্যা নগণ্য।

ভারতীয়েরা মুখ্যতঃ ব্যবসায়ী ও চাকুরিয়া। গুজরাটীর সংখ্যা সর্ব্বাধিক তারপর পাঞ্জাবী ও অন্যান্য সম্প্রদায়। মুসলমানের মধ্যে আগাখানী ইস্‌মাইলী সম্প্রদায়ের প্রভাব প্রতিপত্তি বেশী। পূর্ব্ব-আফ্রিকার বড়-ছোট বাণিজ্য অনেকখানি ভারতীয়দের হাতে—অফিসগুলিতে বড় বড় কর্ম্মচারী ছাড়া অধিকাংশই ভারতীয়। আফ্রিকানরা ক্রমশঃ ছোট ছোট ব্যবসা ও কাজকর্ম্মে ঢুকুছে—২।৪ জন আফ্রিকান ব্যারিষ্টার এবং উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীও হয়েছে।

ভারত বিভাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্থানীয় Indian Associationকে কেন্দ্র করে সম্প্রদায় নির্বিশেষে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান বিশেষ সঙ্ঘবদ্ধ ছিল। বর্ত্তমানে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র মতাধিকারের দাবী স্বীকৃত হওয়ায় কাউন্সিল প্রভৃতিতে ভারতীয়দের শক্তি ক্ষীণ হয়েছে। আইন পরিষদে ইউরোপীয়ান ও আফ্রিকান সদস্যদের সমবায় শক্তি ভারতীয়দের চেয়ে অধিক হওয়ায় এবং ভারতীয়েরা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাদের রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক স্বাধিকার রক্ষিত হওয়া দুর্ঘট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হিন্দুদের মধ্যে অস্পৃশ্যতার বালাই প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে বলা চলে। তবে প্রাদেশিক ও শ্রেণী-সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ ও সংগঠনের অভাব এখনো সুস্পষ্ট। আর্য্যসমাজীরা সনাতনীদের চেয়ে অধিক ক্রিয়াশীল।

বড় বড় সহরে মন্দির ও ভজনমণ্ডলী প্রভৃতি আছে, তবে ধর্ম্ম বিষয়ে ঔদাসীন্যই সমধিক। আহারে-বিহারে, পানাসক্তিতে ভারতীয়গণ ইউরোপীয়ানদের পূর্ণমাত্রায় অনুকরণপ্রিয়। মেয়েরাই ধর্ম্ম ও আচার-বিচার যা কিছু রক্ষা করছেন। ধার্ম্মিক উৎসব পার্ব্বণ, গান্ধী-জয়ন্তী, স্বাধীনতাদিবসের অনুষ্ঠানাদি হয় তবে জনসাধারণের উৎসাহের অভাব। ভারতীয় স্বাধীনতালাভের পরে এই ভাবের একটু মোড় ফিরেছে বলে শুনলাম। পুরুষরা সর্ব্বদা সাহেবী পোষাক পরিচ্ছদে থাকেন, মেয়েরা ভারতীয় শাড়ী ব্লাউজ ইত্যাদি ব্যবহার করেন। পূর্ব্ব আফ্রিকায় কোনো কলেজ না থাকায় উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত নাই। তবে সম্প্রতি মহামান্য আগাখাঁ সরকারী সহায়তা নিয়ে মোম্বাসায় একটি মুস্‌লিম বিশ্ববিদ্যালয় খোলার তোড়জোড় কচ্ছেন। হিন্দুদের ছেলে মেয়েরা উচ্চশিক্ষার জন্য ইউরোপ ও ভারতে যায়। Indian Secondary schoolগুলিতে লণ্ডন ম্যাট্রিকের কোর্স—আমাদের দেশে 'আই-এ'-র সমান। কলেজ স্থাপনে হিন্দুদের উৎসাহের অভাব। শিক্ষার ব্যয়ভার সরকার অর্দ্ধভাগ বহন করেন। অবশ্য শিক্ষাকরের ব্যবস্থা আছে। ভারতীয়দের সংখ্যা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হতে থাকায় গভর্ণমেণ্ট শিক্ষার অধিকাংশ ব্যয় সম্প্রতি তাদের উপর চাপাতে চাচ্ছেন। মুসলমানেরা বড় বড় সহরে পৃথক স্কুলের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। নূতন প্রবেশ আইনের (Emmigration law) কঠোরতার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক সংগ্রহের অভাবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। স্কুলে সহশিক্ষার প্রথাই প্রায় সর্ব্বত্র অনুসৃত।

ব্যবসায় ও চাকুরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা (competition) কম হওয়ায় ভারতীয়েরা বেশ সুখী। মোটরের সংখ্যা খুব বেশী। এক নাইরোবী সহরে যত মোটর—সহর হিসাবে নিউইয়র্কের পরেই নাকি তার স্থান। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের দুর্নীতিও বেশ প্রবল—মূর্খ নেটিভদের ঠকিয়ে পয়সা কামাতে অনেকে সিদ্ধহস্ত। তবে ভারতীয়েরা আফ্রিকার উন্নতি ও বিকাশের জন্যও যথেষ্ট করেছেন। রেললাইন নির্ম্মাণে, ব্যবসায় বিস্তারে বসতি-স্থাপনে ভারতীয়দের উদ্যোগ একান্ত প্রশংসনীয় এবং এই সমস্ত কার্য্যের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে তারা ক্রমশঃ একটি আফ্রিকান কারিগরবর্গ তৈয়ার করেছেন। ভারতীয় দোকানে, গৃহ-নির্ম্মাণে, পাকশালায়—দর্জ্জি, মিস্ত্রী প্রভৃতি কার্য্যে তারা বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছে। তবে সত্য বলতে এদের প্রতি ভারতীয়দের প্রকৃত দরদ ও সহানুভূতির এখনও অত্যন্ত অভাব। স্বার্থের দায়েই তাদের শ্রমশক্তির কিছুটা সদুপযোগ করা হয়েছে মাত্র।

প্রধানতঃ চারিটি উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কাজ আরম্ভ করি—(ক) ভারত ও আফ্রিকার মধ্যে লুপ্তপ্রায় সাংস্কৃতিক সম্বন্ধের পুনরুদ্ধার (খ) ভারতীয়গণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা, (গ) হিন্দুদের মধ্যে সংগঠন, ধর্ম্ম ও সদাচারের প্রতিষ্ঠা, (ঘ) তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার।

উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পূর্ব্ব-আফ্রিকার প্রায় প্রত্যেকটি জনপদে ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক বক্তৃতা, সার্ব্বজনীন বৈদিক সন্ধ্যা ও পূজারতি, যজ্ঞ, ভজন-কীর্ত্তন, উৎসব ও পারিবারিক সম্মেলনাদি অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, হিন্দু মণ্ডল, মহিলা মণ্ডল প্রভৃতির প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে নবীন আলোক ও প্রাণশক্তির সঞ্চার করে তাদের শক্তিশালী করা হয়েছে। সহস্র নরনারী, বালক যুবকগণকে ব্যক্তিগতভাবে উপদেশ দান করে নীতিমান ও আদর্শনিষ্ঠ করবার চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছে। বহু মদ্যপায়ী ও জুয়াখোর মিশনের প্রচেষ্টার ফলে প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক মদ ও জুয়ার নেশা ছেড়েছে। লাঠি-খেলা, ছোরা খেলা, যুযুৎসু প্রভৃতি শিক্ষা দিয়ে ভারতীয়গণকে আত্মরক্ষায় সমর্থ হবার জন্য তৈয়ারী করা হয়েছে। আফ্রিকানদের পৃথক সভা ছাড়া ভারতীয়গণের সভা ও উৎসবে তাদের আমন্ত্রণ করে তাদের ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী করে তোলার প্রচেষ্টা করা হয়েছে—যার ফলে বহু শিক্ষিত আফ্রিকান আমাদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে দেখা সাক্ষাৎ করে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার ভাব ব্যক্ত করেছে। বলা বাহুল্য—আফ্রিকানদের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে এই যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির বাণী প্রচার এই প্রথম। আফ্রিকান বিদ্যার্থীগণকে বৃত্তি দিয়ে ভারতে পাঠাবার প্রচেষ্টার বিষয়ে মিশন বিশেষ উৎসাহ দান করে কতকগুলি ছাত্রকে ভারতে প্রেরণের ব্যবস্থা করেছেন। এতদ্ব্যতীত রোটারী ক্লাব, স্পোর্টস্‌ ক্লাব, সান্‌ডে ক্লাব প্রভৃতিতে আহুত হয়ে ইউরোপীয়ানদের মধ্যেও বহু বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। সর্ব্বসমেত দেড় বৎসরে ইংরেজী, হিন্দী, গুজরাটী ভাষায় এক সহস্রের উপর বক্তৃতা হয়। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি, কালীপূজা, গুরু-পূর্ণিমা

রথযাত্রা প্রভৃতি কয়েকটি উৎসব বিরাটভাবে অনুষ্ঠিত হয়—যাতে সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারীর বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয়! মিশন কর্তৃক মাউঙ্গায় অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা পূর্ব্ব আফ্রিকার ইতিহাসে একটি অভিনব বস্তুরূপে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমাদের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা নিজ হস্তে প্রতিমা নির্ম্মাণ করে ষোড়শোপচারে এই পূজা ও তৎসহ তিনদিনে তিনটি হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করেন।

দেড় বৎসরে মিশন পূর্ব্ব আফ্রিকার ৪টী প্রদেশের প্রায় ৬০টা ছোট বড় জনপদ পরিভ্রমণ কর্ত্তে ৪ সহস্র মাইলের উপর পথ রেল, ষ্টীমার, মোটর, বোট, বাস ও বিমানযোগে পরিভ্রমণ করেন। বহু স্থলের যাতায়াতের ব্যয়ভার স্থানীয় ভারতীয়গণই বহন করেন। এই দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণকালে আমরা অসংখ্য বন্য জন্তু জানোয়ারের সম্মুখীন হয়েছি। দলবদ্ধ হস্তী, জেব্রা, জিরাফ, হরিণ, বন্য গরু, গণ্ডার, হিপোপটেমাস (জলহস্তী), উটপাখী, বন্যমহিষ প্রভৃতি পশুপক্ষীতে পরিপূর্ণ আফ্রিকা সত্য সত্যই একটা আজব দেশ।

আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের ভীষণ কালো চেহারা, নাক চোখের বৈশিষ্ট্য ও পুরুষ-স্ত্রী নির্বিশেষে ছোট কোকড়ান চুল প্রভৃতি দেখলে মনে হয় এরা একটি বিশেষ শ্রেণীর (Peculiar type) মনুষ্য। কারণ কেবলমাত্র স্থানীয় গরম ও জলবায়ু ও বিশেষ প্রকৃতির আবহাওয়ার জন্যই যদি এদের চেহারা এত কালো ও কদাকার হতো তবে ওদেশে যে সকল আরবীয়, ভারতীয় ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজন বহু শত বৎসর ধরে ওখানে বসবাস কচ্ছে তাদের গায়ের রঙ ও চেহারারও পরিবর্ত্তন সাধিত হোত। মিশরপ্রান্তের অধিবাসীদের চেহারা এরকম নয়। তাই মনে হয় মিশরবাসীরা এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার কাফ্রিরা এক বংশ হতে আসে নি।

দেশ হিসাবে আফ্রিকার অধিবাসীদের সংখ্যা অতি কম। কাফ্রিদের বেশী বংশবৃদ্ধি হয় না। শুনা গেল—যৌনব্যাধির প্রাবল্যই ইহার বিশেষ কারণ। উগাণ্ডা প্রদেশে শতকরা ৯০টা স্ত্রী-পুরুষ নাকি এই ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত। সরকারী চেষ্টায় এই ব্যাধি নিরসনের চেষ্টা চলছে। পূর্ব্বাপেক্ষা এরা বর্ত্তমানে পারিবারিক জীবনের অধিক পক্ষপাতী হচ্ছে। তবে বড় হয়ে দুই ভাই কচিৎ একত্র থাকে। একটি খড়ের ঘরের মধ্যেই এদের রান্না শোওয়া থাকা সব কিছু। বিবাহের জন্য যৌতুক হিসাবে ৪০টী গরু ও কিছু অর্থ দিতে হয়। মাসাই নামে একটা সম্প্রদায় আছে—যাদের দেখতে আমাদের দেশের কানফাটা সন্ন্যাসীদের মতো।

কাফ্রিদের মধ্যে প্রান্তভেদে একটা সিংহ শীকার করতে না পারলে—তাদের বিবাহ হয় না। তাদের ভাষাভেদও আছে। তবে সহেলী বুগাণ্ডা প্রভৃতি ২।১টি ভাষা ইংরেজের চেষ্টায় রোমান হরফে সম্প্রতি লিখিত ভাষার স্তরে উন্নীত হয়েছে। সহেলী ওদের চলিত ভাষা। ভারতীয়গণ তাই দিয়ে কাজ চালান। ওদের ভাষায় সাহিত্য ও সঙ্গীত সবেমাত্র সুরু হয়েছে। শিক্ষিত নেটিভরা কেহ কেহ ইংরেজী বল্‌তে পারে। মিশনারীরা সরকারী সাহায্যে ওদের মধ্যে শত শত স্কুল, বোর্ডিং, হাসপাতাল খুলেছে ও ধীরে ধীরে তাদের আদর্শে এদের গড়ে তুলবার চেষ্টা কচ্ছে। এতকাল ওরা দেশী মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিল কিন্তু সম্প্রতি বীয়ার, হুইস্কি প্রভৃতি বিলাতী মদগুলির লাইসেন্স উঠিয়ে নেওয়ায় ওরা উগ্র সুরাপানে অধিকতর দুর্ব্বল ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে পড়ছে। শিক্ষিত ব্যক্তিদের ঘরে গ্রামফোন, রেডিও, চেয়ার টেবিল প্রভৃতি আসবাবপত্র আসছে। ভারতীয়দের প্রতি ওদের এখনো খুব বেশী স্নেহভাব নাই। তবে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে ওদের সহিত ভারতীয়দের প্রতারণা ও ঠগ-বুদ্ধি ওরা এখন বেশ বুঝতে পাচ্ছে। পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভারতীয়দের সাহায্য ছাড়া এখনো ওখানকার ব্যবসায় ও অফিসগুলির কাজকর্ম্ম চলা শক্ত। তাই দক্ষিণ আফ্রিকার মত সঙ্গীন অবস্থার সৃষ্টি হতে এখনো কিঞ্চিৎ দেরী আছে বলে মনে হয়।

শিক্ষিত আফ্রিকানরা মহাত্মা গান্ধীর আদর্শবাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ এবং ভারতের আদর্শে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিষয় কিছু কিছু ভাবছে। অশিক্ষিত বলে ওদের সংগঠন বলও যথেষ্ট।

আফ্রিকানদের মোগো, কলা ও ভুট্টা প্রধান আহার্য্য। ভারতীয়দের ঘরে চাকরের কাজ কর্ত্তে কর্ত্তে এরা ভাত খেতে শিখলেও ভাতের প্রতি এদের শ্রদ্ধা অতি কম। সম্প্রতি শিক্ষিত আফ্রিকানরা তরকারী ব্যঞ্জন কিছু কিছু খেতে অভ্যস্ত হয়েছে। বেশীর ভাগ মোগো কাঁচা কলা সিদ্ধ নুন মরিচ দিয়ে খেয়েই এরা পরিতৃপ্ত হয়। অভাব কম বলে গ্রামাঞ্চলে এরা বেশ কর্ম্মকুণ্ঠ। মেয়েরাই চাষবাস ও অধিকাংশ কাজকর্ম্ম করে। তারাই হাতে কোদালে কৃষিকার্য্য চালায়। লাঙ্গলের ব্যবহার নাই। তবে ইউরোপীয়ানরা সম্প্রতি কেনিয়ার হাইল্যাণ্ডগুলি একচেটে করে নিয়ে ট্র্যাক্টার প্রভৃতি দিয়ে বহু জমি একত্রে চাষবাস করে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করছে। ডেয়ারীগুলিরও অধিকাংশের মালিক তারা, ভারত হতে বিতাড়িত হয়ে অনেক বৃটিশ অফিসার এখানে এসে FARMING এর কাজ নিয়েছে। শুনলুম পূর্ব্ব আফ্রিকার খাদ্যশস্য দুধ মাখন ফল, মাংস প্রভৃতি বহুল পরিমাণে চালান হয়ে বিপন্ন ইংল্যাণ্ডবাসীদের জীবিকা নির্ব্বাহে কাজে লাগছে।

আফ্রিকা হতে প্রত্যাগত হওয়ার পূর্ব্বে মিশনের পক্ষ হতে নাইরোবী ও মোম্বাসা সহরে ২টা Indian Cultural Institute স্থাপিত হয়েছে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এর কাজকর্ম্ম চালাচ্ছেন। ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা, বৈদিক-সন্ধ্যা-উপাসনা, উৎসবাদির অনুষ্ঠান, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের সংস্কার ও সংগঠন এবং স্থানীয় আদিম অধিবাসীগণের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার প্রভৃতি কার্য্যক্রম নিয়ে তাঁরা কার্য্য আরম্ভ করেছেন।

১৯৪৯ সালের ২২শে আগষ্ট আফ্রিকার বন্ধুবান্ধবদের নিকট হতে বিদায় নিয়ে আমরা কাম্পালা জাহাজে স্বদেশ যাত্রা করি এবং ৩১শে আগষ্ট ভারতভূমিতে পদার্পণ করি।

দ্বারমণ্ডল

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাসখানেক পর।

দ্বারমণ্ডলের হিন্দু-মুসলমান বিরোধটা প্রভাতের মেঘাড়ম্বরের মতই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ায় পরিণতি লাভ করিয়া শেষ হইয়াছে। অজাযুদ্ধ বা ঋষিশাস্ত্র বলিয়া তুলনা কেহ দিল না। যুদ্ধ হইলে অজাযুদ্ধ হইবে না, শ্রাদ্ধ হইলে মাত্র কদলীপত্র ও আতপ-তণ্ডুলের আয়োজনে শেষ হইবে না। অন্তত একটা বৃষোৎসর্গের মত কাণ্ড হইবে ইহাতে সংশয় কাহারও নাই বলিয়াই ও দুটা উপমা কাহারও মনে উঠিল না। এ দিকে নির্দেশটা সচেতন মনের নয়, অবচেতন মনের।

প্রথম কয়েকদিন এই লইয়া সমালোচনার শেষ ছিল না। একদিকে লীগ আপিসে অন্যদিকে হিন্দুমহাসভার আপিসে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহাকেই বরং অজাযুদ্ধ ঋষিশ্রাদ্ধের সহিত তুলনা করা যায়। লীগ আপিসে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইয়াছিল কিন্তু হয় নাই। দৌলত হাপি এবং ইরসাদের মধ্যে চিরকালের বিরোধটা এই উপলক্ষে দম-পটকার মত প্রচণ্ড শব্দ করিয়া ফাটিয়াছে। হাপি এই মিটমাটটাকে আদৌ পছন্দ করে নাই। সে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী হইতে জেলা লীগ-সভাপতি সম্পাদক পর্য্যন্ত প্রত্যেককেই নিম্নর ভাষায় অভিযুক্ত করিয়াছে। সে বাংলাদেশের লীগ-সভাপতি খাঁসাহেবের দলের লোক। আপোষ তাহাদের দলের নীতিবিরুদ্ধ এবং মন্ত্রীমণ্ডলীর দলের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ বিরোধ হেতু মন্ত্রীমণ্ডলীর উদ্যোগে কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষে তাহার আপত্তির আর সীমা নাই। সে দিক দিয়া তাহার বক্তব্য মন্ত্রাত্বের জন্য হিন্দুদের সঙ্গে ইসলামের দাবী খর্ব্ব করিয়া আপোষ শুধু লজ্জার এবং ঘৃণার কথাই নয়, একেবারে আল্লাহতালার দরবারে গুনাহ। দৌলত ওইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই সে আরও কঠিন গালিগালাজ করিয়াছে; তাহার কারণ রাজনৈতিক নয়, অন্তরে তাহার একটা মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত আছে। সামান্য অবস্থা হইতে সে আজি এ অঞ্চলের বাসিন্দা মুসলমানদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অবস্থাপন্ন ব্যক্তি হইযাছে; বয়সেও সে প্রাচীন; অঞ্চলের অবস্থাপন্ন হিন্দুদের এবং সমাজপতিদের অনেক অবজ্ঞা বিশেষ করিয়া ঘৃণার স্মৃতি তাহার মনের মধ্যে ক্ষতের মত দগদগ করিতেছে। সবচেয়ে দুঃখ পাইত সে—যখন হিন্দু লেখাপড়া-জানা বাবুরা বলিত দৌলতের প্রপিতামহ ছিল—হিন্দু চাষী;—তাহার বংশাবলীর কোন পুরুষের রক্তে বিন্দুমাত্র আরব কি পারস্যের খাঁটী মুসলমানের রক্তের সংশ্রব নাই। আর দুঃখ পাইত যখন তাহাকে ছুঁইয়া তাহারা স্নান করিত। জমিদারেরা—বাবুরা এটা খুব মানিত না, এটা মানিত ওই ন্যায়রত্ন ঠাকুরের মত বামুনারা। বিশেষ করিয়া ন্যায়রত্ন ঠাকুর। দৌলতের মনে পড়ে—একবার সে ন্যায়রত্ন ঠাকুরের বাড়ীতে একটা নালিশ লইয়া গিয়াছিল। তখন অবস্থা তাহার ফিরিতে সুরু হইয়াছে, ছোট ছোট চামড়ার কারবারীদের কাছে সে চামড়া কেনে, পাইকারদের কাছে ছাগল ভেড়ার পাল কিনিয়া চালান দেয়, অন্যদিকে মহাজনী কারবারও ফাঁদিয়াছে, তখন সে অবহেলার লোক নয়। মহাগ্রামের জনকয়েক বখা ছোকরা তাহার ছাগলের পাল মাঠে বাহির হইলেই খাসী পাঁঠা ধরিয়া লইয়া গোপনে ভোজ লাগাইত। কুসুমপুরের সীমানা পার হইয়া মহাগ্রাম কি শিবকালীপুরের সীমানায় পা দিলে—আর সে খাসী বা পাঁঠা ফিরিত না। দৌলত তিক্ত হইয়া নালিশ করিতে আসিয়াছিল—ন্যায়রত্ন ঠাকুরের কাছে। ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথ তখন চার পাঁচ বছরের শিশু। সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটিকে মনের আবেগে কোলে তুলিয়া লইয়া আদর করিয়া বলিয়াছিল—ঠাকুরমশায় আপনার

ঘরে আকাশের চাঁদ নেমে এসেছে গো! কেমন লোকের পোতা দেখতে হবে!

ছেলেটিকে নামাইয়া দিতেই সে ন্যায়রত্নের কোলে উঠিয়া বসিতে গিয়াছিল, ন্যায়রত্ন দৌলতের সামনেই তাহাকে বলিয়াছিল—না দাদু। এখন আমার কোলে উঠিতে নাই! যাও জামাটা ছেড়ে এস, হাত পা ধুয়ে ফেল। দেখো, যেন গিয়েই মাকে ছুঁয়ে দিয়ো না! হ্যাঁ!

দৌলত মুখে কিছু বলিতে পারে নাই, কিন্তু মর্ম্মান্তিক অপমান বোধ করিয়াছিল। সে স্মৃতি আজও একটা দুরারোগ্য ক্ষতের মত দগদগ করিতেছে। সেদিন ভোর বেলা ন্যায়রত্নকে দেখিয়া হাত বাড়াইয়াই কথাটা তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছিল! নদীর ঘাটে ন্যায়রত্নকে সেদিন সে যে কথাটা বলিয়াছিল তাহা সেই বহুকালের পুরানো কথার জের। সেই কারণেই হঠাৎ হাতটা গুটাইয়া লইয়াছিল। ইহাদের সঙ্গে আপোষ। তাহার ইচ্ছা হয়—। দৌলতের চোখে আগুন জ্বলিয়া ওঠে। সে ইরসাদকে বলিয়াছিল—তুই মিনিষ্টারদের পা-চাটা, গদীর লোভে—যারা ইসলামের সঙ্গে বেইমানী করে—তারা ওই—কাফেরদেরও অধম! তুই কাফেরের কাফের।

ইরসাদ বুদ্ধিমান—নূতন যুগের মানুষ। আবেগ এবং ধর্ম্মান্ধতাই তাহার সর্ব্বস্ব নয়। সে রাজনীতি বুঝিতে সুরু করিয়াছে। ইতিহাস পড়িয়াছে। তাহার দেহে আরব বা পারস্যের মুসলমানের রক্ত নাই বলিলে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেও, তাহার পূর্ব্বপুরুষ এদেশেরই হিন্দু ছিল কথাটা স্বীকার করে;—এবং জোর গলা করিয়া এই কথাটা বলিয়া—এই সত্যটাকেই এ দেশের প্রতিটি পাদক্ষেপের ভূমির উপর মালিকানা স্বত্বের দাবীর ফারমান স্বরূপ জাহির করিয়া থাকে। মস্তিষ্ক তাহার বরাবরই সুস্থ এবং স্থির। আজকাল মোক্তারী করিয়া তাহার বুদ্ধি আরও শাণিত এবং মাথা আরও ঠাণ্ডা হইয়াছে। দৌলতের সঙ্গে ঝগড়া তাহার প্রায়ই হয়, দৌলত আগুনের মত জ্বলিয়া উঠে কিন্তু ইসরাদ রাগে না, হাসিয়া উত্তর দেয়, দৌলত তাহাতে আরও জ্বলিয়া যায়। এক্ষেত্রে কিন্তু ইসরাদও নিজেকে স্থির রাখিতে পারে নাই; 'কাফেরের কাফের' কথাটায় সে ধৈর্য্য হারাইল, আস্তিন গুটাইয়া বলিয়াছিল—সুদখোর সয়তান আজ তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন!

দৌলত বৃদ্ধ কিন্তু তাহার বড় নাতি মহম্মদ শক্তিশালী যুবা, সে কুস্তি করে, লাঠি খেলে, বন্দুক ঘাড়ে লইয়া শীকার করিয়া বেড়ায়—সে দৌলতকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল। —তোমার কল্জে আজ ছিঁড়ে ফেলব। সঙ্গে সঙ্গে একখানা ছোরা সে বাহির করিল।

হয়তো একটা কিছু হইয়া যাইত। কিন্তু ফৈজুল্লা সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার গৌরবর্ণ মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিয়াছে—চোখের দৃষ্টিতে নিষ্ঠুর রূঢ়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে—একটা আঙুল বাড়াইয়া ধমক দিয়া উঠিলেন, ফৈজুল্লা—খবরদার।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরটাই যেন চমকিয়া উঠিল। ফৈজুল্লা সাহেবের কঠিন তিরস্কারে দৌলত লজ্জা পাইল না—ভয় পাইল, ইসরাদ লজ্জা পাইল। ফৈজুল্লা বলিলেন—তোমাদের নিয়ে কাজ করা আমার বেওকুফি হয়েছে! এই জন্যই তোমাদের আমরা পশ্চিম দেশের লোকেরা মন্দ কথা বলি। ছি—ছি—ছি!

তারপর মসজিদ তৈয়ারীর কথা তুলিয়া প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়া ব্যাপারটাকে অজাযুদ্ধে পরিণত করিয়াছিলেন।

ওদিকে হিন্দুমহাসভার আপিসে দীর্ঘ বারোঘণ্টা ব্যাপী অধিবেশন চলিয়াছিল। কংগ্রেসকে গালিগালাজ দোষারোপ করিয়া, এই আপোষের প্রতিবাদ জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া, যে যাহার ঘরে ফিরিয়াছে। আরও দুইটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া অবশেষে কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে।

"বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা অরুণা ভট্টাচার্য্য সম্পর্কে যে লজ্জাকর ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে—সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া দেখা হউক, ইহা সত্য হইলে—তাহাকে অবিলম্বে পদচ্যুত করা হউক।"

প্রস্তাবটি খাতাকলমে কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু আসলে বাতিল করা হয় নাই।

আরও একটি প্রস্তাব আনিয়াছিল শ্রীহরি ঘোষ এবং কঙ্কনার বাবুদের বাড়ীর ছেলে ব্যারিষ্টার নরেন্দ্র মুখুজ্জে প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়াছিল। "মহাগ্রামের পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন ধর্ম্মবিশ্বাসহীনা অরুণা ভট্টাচার্য্যকে পৌত্রবধূরূপে স্বীকার করিয়া তাহার হস্তে অন্নগ্রহণ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের এবং সমাজের অপমান করিয়াছেন, নিজেও ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন—তাঁহাকে এ

অঞ্চলের সমাজপতির পদ হইতে অপসারিত করা হউক, সরকারকে অনুরোধ করা হউক তাঁহার মহামহোপাধ্যায় উপাধি যেন বাতিল করা হয়।" এ প্রস্তাবও শেষ পর্য্যন্ত কাগজ কলমে কায়েম করা হয় নাই। প্রস্তাব দুইটি লইয়া গবেষণা আলোচনা অনেক হইয়াছে। গবেষণা করিয়া দেখা গিয়াছে যে যদি শিক্ষয়িত্রী অরুণা ভট্টাচার্য্যাকে পদচ্যুত করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তবে ভবিষ্যতে শুদ্ধি করিয়া কেহ আর হিন্দুধর্ম্মে ফিরিয়া আসিতে চাহিবে না।

জংসন শহরের মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান সুরপতি চ্যাটার্জ্জী প্রস্তাবটি নাকচ করিয়া দিয়াছেন। সুরপতি জজকোর্টে ওকালতী করেন, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ-সাহেবের প্রিয়পাত্র, উৎসাহী ব্যক্তি, তিনিও উপস্থিত ছিলেন সভায়, তাঁর ভাই হিন্দুমহাসভার দ্বারমণ্ডল শাখার সম্পাদক, তাঁহাদের বাড়ীতেই মহাসভার আপিস। সুরপতি-বাবুও অন্তরে-অন্তরে মহাসভার সঙ্গে সহানুভূতিসম্পন্ন; কোনদিন যদি কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দিতেই হয় তবে মহাসভাতেই যোগ দিবেন। মহাসভাও তাঁহাকে পাইতে ব্যগ্র, এমন কি আগামী আইন-সভার নির্ব্বাচনে মহাসভার প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াইবার জন্ত তাঁহাকেই তাহারা পাইতে চায়। এই সব কারণেই সুরপতিবাবু উপস্থিতও ছিলেন এবং পরামর্শদাতার মত অকুণ্ঠিত অধিকারে কথাও বলিতেছিলেন। সুরপতিবাবু প্রথম বয়সে এ জেলায় দুর্দ্দান্ত নাম-করা ছেলে ছিলেন;—ফুটবলে মারপিট করিতে, থিয়েটারে হৈ-হৈ করতে, সভাসমিতিতে ঢেলাবাজীতে বা ঢাক বাজাইতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ ছিল না। কথাবার্ত্তার ঢঙও তাঁহার বিচিত্র। এককালে বাংলা-দেশে যে ঠোঁট-বাঁকানো মৃদুহাস্যের আভিজাত্য এবং বক্র-বাক্য-প্রয়োগ-পদ্ধতির যে ধারা বিদগ্ধ-মণ্ডল পরিচায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—সুরপতি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত সীমার মফঃস্বল শহরে তাহারই অনুকরণ করিয়া একটা স্বকীয় ঢঙ দাঁড় করাইয়াছিল; ফুটবলে,থিয়েটারে, সভা-সমিতিতে আজকাল সুরপতিবাবু গম্ভীর হইয়াছেন, পদমর্য্যাদা রাখিয়া চলিতে হয় কিন্তু কথাবার্ত্তার ঢঙ পরিবর্ত্তন করেন নাই। সভার মধ্যেই তিনি ধনী শেঠ সুরজমলের তরুণ ছেলেটির গলা ধরিয়া কাছে টানিয়া কি যেন ফিস ফিস করিয়া বলিতে ছিলেন, প্রস্তাবটা উঠিবামাত্র তিনি ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া তীর্য্যক দৃষ্টিতে চাহিয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিলেন—এই মরেছে রে বাওয়া! এ সব কি করছ তোমরা? ঠগ্ বাছতে যে গাঁ-উজোড় হয়ে যাবে ভাইটি। যুগটা মনে রেখে কথা কও। ও রেজল্যুশন নেবার কথাটি মুখে এনো না, সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।

কঙ্কনার বাবুদের ছেলে ব্যারিষ্টার নরেন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিয়াছিল—তার মানে? What do you mean?

—কথাটা তো খুব শক্ত নয় ব্যারিষ্টার ভাইটি। এই নারীপ্রগতির যুগে—divorce-হীন সমাজে সধবা মেয়ে সধবা ছেলেরা পবিত্র ইসলামে দীক্ষা নিয়ে divorce আদায় ক'রে—খাঁচার পাখা বনের পাখীর মত উচ্চ বৃক্ষচূড়ে ঠোঁটে ঠোঁট ঘষবার সুযোগ করে নিচ্ছে। তারপর শুদ্ধি। ব্যাস ওয়া-কেল্লা ফতে, জাত ধরমকে জয় জয়কার। divorce মিলল—জাত ফিরল, সাপ মরল, লাঠি ভাঙল না। এ চালাকী জানতে পেরে মুসলমানেরা আইন বানাচ্ছে একবার কলমা পড়লে—অন্তত আর বছর দুবছরের মধ্যে অন্য ধর্ম্মে যাওয়া চলবে না। এর ওপর তোমরা যদি দরখাস্ত কর মিষ্ট্রেসটার বিরুদ্ধে যে, ও এক সময় মুসলমান হয়েছিল—তা হ'লে মরতে যে তোমরাই বাওয়া। মেয়ে আর ছেলে—ঘি আর আগুন—প্রগতির যুগে ভাঁড়ার আর উনুন ছেড়ে যখন—ঘি গড়িয়ে পথে গড়িয়েছে, আর আগুনও উলুখড় ধরে কাছাকাছি এসেছে—তখন গলবে এবং জ্বলবে। মুসলমানপাড়ার পথ বেয়ে—ফিরে এসেছে বলে তোমরা যদি না নাও, ওরা ফিরে গিয়ে মসজেদের চেরাক জ্বালাবে মালিক। তোমাদের যজ্ঞিকুণ্ড বিনা হনুমানের আবির্ভাবেই নিভে যাবে।

যতই রসিকতা করিয়া কথা বলুন সুরপতি—কথাটার মধ্যে যুক্তি ছিল। অন্তত রাজনৈতিক জনসংখ্যা সমস্যার একটা যুক্তি ছিল, তাই রসিকতায় কেহ হাসিল না। শেঠ সুরজমলের ছেলে বলিল—সুর্পতিবাবু বহুত ঠিক বাত বলিয়েছেন। উয়ো বাতিল কর দেনা। বাতিলই হইয়া গিয়াছিল।

ন্যায়রত্নকে লইয়া প্রস্তাবটাকে কেহ খুব বেশী আমলই দেয় নাই। তবুও নরেন মুখার্জ্জী এবং শ্রীহরি ঘোষ অনেক-ক্ষণ বক্তৃতা করিয়াছিল। সুরপতি এটাতে খুব আপত্তি করে নাই—শুধু বলিয়াছিল—আরে রাম-রাম,

ধর্ম্মের ষাঁড়—পিঁজরে-পোলে গেছে। বুড়ো বামুন—কাশীতে বাস করছে—তাকে নিয়ে আর টানাটানি কেন?

নরেন মুখুজ্জে বলিয়াছিল—You don't know সুরপতি দা—

—I don't know? হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল সুরপতি।—শিবকালীপুরে দুর্গা বলে একটা মেয়ে ছিল জান? আমরা বলতাম কাল সরস্বতী,—হ্যাঁ একখানা চেহারা ছিল বটে। হঠাৎ শ্রীহরির দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল—শ্রীহরিবাবুকে জিজ্ঞাসা কর! সেই বনকুসুমের গন্ধে অনেক দিগ্‌ভ্রান্ত ভ্রমর-বোলতা-মাছি ও অঞ্চলে উড়েছে ভাইটি। আমাকে ভ্রমর বল, বোলতা বল, মাছি বল, আপত্তি করব না, মোটকথা পাখা আমার ছিল এবং উড়তামও। তোমার—। থাক তোমার গুরুজনের কথা তোমার কাছে বলব না। ও অরণ্যে উড়েছি—আর অরণ্যের সবচেয়ে বড় গাছটার উপর যে শঙ্খচিলটা বসে আকাশ চিরে ডাক দিয়ে সাবধান করতো, তাকে জানি না বলছ? তার উপর ওর নাতি বিশ্বনাথ আমার বয়সী ছিল যে।

শ্রীহরি ঘোষ বলিল—যদি জানেন, তবে অমত করছেন কেন? ওরাই তো সমাজটাকে এমন ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। কত জনকে পতিত করেছে—কত জনকে—কত মানী লোককে চোখ রাঙিয়েছে—মনে করুন তো! তবু আমরা এখনও দেবতার মত ভক্তি করি। তার এই ম্লেচ্ছ আচরণ!

সুরপতি এবার তাকিয়ার উপর শুইয়া পড়িয়া বলিয়াছিল—যা খুসী কর বাওয়া; আমি তোমাদের বাইরের লোক। তবে দরখাস্ত করলেই গভর্ণমেণ্ট উপাধি কেড়ে নেবে না, আর পতিত করারও আজ মানে কিছু হয় না। গান্ধী করছে হরিজন—অস্পৃশ্যতানিবারণ, তোমরা বাওয়া, চাও আর না চাও—মুখে না বল না। তার উপর শাস্ত্র-ফাস্ত্র পড়ি নাই, বুঝিও না খুব, ব্যাকরণ কৌমুদী কবে পড়েছি—মনে নাই, নর শব্দের রূপ শুধু এক লাইন মনে আছে—ব্যস তারপর সব জলপান করে দিয়েছি। এত বড় একটা পণ্ডিত, কাল সে মরবে—তাকে আজ পতিত করা—দুঃখ দেওয়া—ভাল বুঝি না আমি।

একটা সিগারেট ধরাইয়া সে ধোঁয়ার রিঙ ছাড়িতে সুরু করিয়াছিল।

মজলিসের সকলেই চুপ করিয়া কথাটা ভাবিয়া না দেখিয়া পারে নাই। অবশেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রায় সকলেই বলিয়াছিল—না—না। থাক।

—থাকবে? শ্রীহরি প্রশ্ন করিয়াছিল।

—থাক থাক; ওঁরা ঠিকই বলেছেন। নরেন মুখার্জ্জী বলিয়াছিল—ওঁরা ঠিকই বলেছেন। যাকে ভগবান মেরেছে—তাকে আর মারা উচিত হবে না।

—Thats good!

একপাশে বসিয়াছিল—দেবক সেন। পূর্ব্ববঙ্গের ছেলে, সবল দীর্ঘ দেহ, এখানে সে বৎসরখানেক আসিয়া ছোট একটি কবিরাজী ঔষধালয় খুলিয়াছে। মুখে একমুখ ঘন দাড়ি গোঁফ, কপালে একটা ক্ষত। এই দেবকী সেনই কাশী হইতে এখান পর্য্যন্ত ন্যায়রত্নকে রক্ষা করিবার ভার লইয়া দেবুর সঙ্গে কাশী গিয়াছিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত দেবকী একটি কথাও বলে নাই। এবার সে উঠিয়া বলিল—সুরপতিবাবু আপনাকে প্রণাম করছি।

সুরপতি বলিল—কবিরাজ মশাই। কি ব্যাপার? হঠাৎ প্রণাম—

হ্যাঁ। প্রণাম। একেবারে অকপট অন্তরে প্রণাম জানাচ্ছি। আপনি আজ আমাকে বাঁচিয়েছেন। জানেন, আমি এককালে কংগ্রেস করেছি। একেবারে বোমা পিস্তল নিয়ে কংগ্রেস। বছর পাঁচেক দ্বীপান্তর বাস করেছি। পাঁচ বছর পর আন্দামান থেকে ফিরলাম। ফিরে—। ফিরে এসে দেখলাম, আমার আর কেউ নাই ত্রিসংসারে। ছিল একটি বিধবা ছোট বোন, তাকে মুসলমান গুণ্ডারা একদিন রাত্রে ধরে নিয়ে গেছে। তার কোন সন্ধান পর্য্যন্ত নাই।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে কয়েক মুহূর্ত্ত পরে বলিল—ফিরে সব দেখলাম। দেখে আর ইচ্ছে হল না কংগ্রেসে যেতে। কংগ্রেসের মুসলমান তোষণ দেখে যেতে ইচ্ছে হ'ল না। পৈত্রিক বৃত্তি কবিরাজী পড়লাম, তার আগে এম-এ পাশ করেছিলাম, আন্দামানে অনেক পড়েছি—হিন্দু দর্শন, মার্কসবাদ অনেক কিছু। কিছুদিন কম্যুনিজিমকে সার ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বুকের দগ্‌দগে ঘা নিয়ে বরদাস্ত করতে পারি নি। আপনাদের এখানে এসে হিন্দু মহাসভার সভ্য হয়েছি।

শাস্ত্র জানি, রাজনীতি বুঝি, কাশী থেকে ওই ন্যায়রত্ন মশাইকে সঙ্গে নিয়ে এসে লোকটিকে কিছু কিছু জেনেছি। আজ যদি আপনি ওই লোকটিকে পতিত করবার চেষ্টা করার দুর্ম্মতি থেকে এই সব লীডারদের রক্ষা না করতেন তবে—আবার আমাকে হিন্দু মহাসভা ছেড়ে নিরালম্ব বায়ুভুখের মত ভেসে বেড়াতে হ'ত। আমাকে আপনি বাঁচিয়েছেন—আপনাকে সত্যি সত্যিই প্রণাম করছি। আচ্ছা উঠলাম।

দেবকী কবিরাজ উঠিয়া চলিয়া গেল।

সমস্ত সভাটা স্তব্ধ হইয়া গেল। বহু সভ্যের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

কংগ্রেস আপিসেও আলোচনার শেষ ছিল না।

এ আলোচনার ধারাটা অন্যরূপ। কংগ্রেসের এই আপোষ করার বিপক্ষে প্রায় সকলেই। শুধু যাহারা গান্ধীজীর জন্য কংগ্রেসের প্রতি আস্থাবান—তাহারাই এটাকে সমর্থন করিয়াছিল। বিপক্ষের দল সবই বামপন্থী। তাহারা অবশ্য মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধপন্থী নয়—তাহারা বলে অন্য কথা। এই ভাবে তোষণ করিয়া মুসলমানদের সহিত আপোষ অসম্ভব। তাহাদের মত—ধর্ম্ম—সে হিন্দু-এবং ইসলাম—দুইটাকেই বিলুপ্ত করিয়া দাও। তাহার পন্থা তাহারা জানে, কিন্তু কংগ্রেস সে পন্থা গ্রহণ করিতে চায় না, বিরোধ বাধিয়াছে সেইখানে। এখানে হিন্দু মুসলমান বিরোধের সূত্রপাতেই ইহাদের প্রস্তাব ছিল—জংসন শহরে, মিল এবং রেল শ্রমিকদের লইয়া কোন একটা অজুহাতে ধর্ম্মঘটের আন্দোলন জুড়িয়া দেওয়ার। অন্যদল বলিয়াছিল—সেটা এখন আকাশকুসুম। বামপন্থীরা হাসিয়াছিল।

দেবু বলিয়াছিল—বিজ্ঞানের যুগে বারুদে আগুন ধরিয়ে ছুড়লেই আকাশে ফুল ফোটানো যায়। আগুনের ফুল। দেখুন না, আপনারা মত দিয়ে দেখুন। আপনাদের ফুলটাও তো আসল ফুল নয়—ওটাও তো কাগজের ফুল। আগুনের ফুল তার চেয়ে ভাল।

আপোষের পরও সেই আলোচনারই জের চলিয়াছে।

আলোচনার মধ্যে মিসট্রেস অরুণা ভট্টাচার্য্য সম্পর্কেও অনেক কথা হইয়াছে। অরুণা ভট্টাচার্য্য দেবুর দলের কর্ম্মী। কর্ম্মীই শুধু নয়—নেত্রীস্থানীয়া। কংগ্রেসের মধ্যে ও আলোচনাটা প্রসঙ্গক্রমে উঠিয়াছিল মাত্র। কারণ স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হিসাবে অরুণা কংগ্রেসের সভ্য নহেন। তবে কর্ম্মী হিসাবে সুপরিচিতা। দেবুদের দলের গোপন খাতার কর্ম্মী। কংগ্রেসের বৈঠকে শেষে দেবুদের দলের আলোচনার মধ্যে সকলেই একবাক্যে প্রশ্ন করিয়াছিল—অরুণাদি—এ কি করলেন?

দেবু কোন উত্তর দিতে পারে নাই।

প্রশ্নটা সকলে দেবুকেই করিযাছিল। দেবুর সঙ্গে অরুণার অন্তরঙ্গতা সকলেই জানে। তাহারা ভাবিয়াছিল, ব্যাপারটা হয় তো দেবুর জ্ঞাতসারেই ঘটিয়াছে। রাজনীতি বুঝুক বা না বুঝুক—তাহারা এটা বেশ বুঝিতে পারে যে, প্রয়োজন হইলে যেমন জীবন দিতে হয় তেমনি মান মর্য্যাদা সব কিছুই ওই প্রযোজনে ভাসাইয়া দিতে হইতে পারে।

দেবুকে নিরুত্তর দেখিয়া আবার তাহারা প্রশ্ন করিল—দেবু দা।

—এঁ্যা?

—উনি এটা করলেন কেন? এ কি ভাল হল?:

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল—বুঝতে পারছি না।

* * *

এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন ন্যায়রত্ন।

দেবু দলের একান্ত গোপনীয় কথাগুলি গোপন রাখিয়া বাকী সমস্ত কথাই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে, উপদেশ সে চায় নাই, ন্যায়রত্নের মত অদৃষ্টবাদী হিন্দুপণ্ডিতের কাছে বৈজ্ঞানিক মনোভাবসম্পন্ন রাজনৈতিক কর্ম্মী সে উপদেশ চাহিতে পারে না; তবে এই সত্যপরায়ণ ব্যক্তিটির প্রতি শ্রদ্ধা তাহার অপরিসীম এবং এই পরিস্থিতির প্রায় প্রতিটি সমস্যার সঙ্গে তিনি ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত বলিয়াই বিশেষ করিয়া খুলিয়া বলিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত বলিয়াছিল—ঠাকুর মশায় সেই ছেলেবেলায় বাবা বলতেন—গোটা পঞ্চগ্রামের লোক বলত'—উনি সাক্ষাৎ দেবতা। তাই বিশ্বাস করেছিলাম, আপনার পা ছুঁয়ে প্রণাম করবার সৌভাগ্য হলে মনে হ'ত—আমার সকল বিপদ সকল অকল্যাণ কেটে গেল। বড় হয়েছি ক্রমে ক্রমে—কত দুর্ভাগ্যের মধ্যে দিয়ে কত শিক্ষা পেলাম,

সমস্ত দুর্ভাগ্যের দিনে আপনার যে সান্ত্বনা, অমৃতের মত যে সব উপদেশ পেয়েছি—সে সব আমার জীবনের অক্ষয় সম্পদ হয়ে রয়েছে। আপনার আশীর্ব্বাদে কত বই-ই তো পড়লাম, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বড় বড় বই; কিন্তু এটা বলব যে তা' সত্ত্বেও আপনার উপদেশ আমার কাছে সেই অমৃতই হয়ে আছে। আপনি আমার কাছে আজও সেই দেবতার মতই আছেন। আপনি এইটুকু শুধু বিশ্বাস করবেন ঠাকুর মশাই—যে এ ব্যাপারটা ঘটে গেল আমার অজ্ঞাতসারে। আরও একটা কথা—অরুণা দেবীকে বিশুভাই বিয়ে করেছিল—এটা আমি জানি। আপনি হয় তো জানেন না, আপনার সঙ্গে বিশুভাইয়ের যখন ছাড়াছাড়ি হল—আপনি এই জংসনের ডাক বাংলায়—অরুণা আর বিশুভাইকে দেখে—বিশুভাইয়ের গলায় পৈতে না দেখে অজয় আর বউদিকে নিয়ে কাশী চলে গেলেন—তখন আমি কিছুদিন মনের দুঃখে আপনার প্রতি বিশু-ভাইয়ের অভক্তি দেখে তার সঙ্গে সংশ্রব ছেড়ে দিয়েছিলাম। তার পর আবার তার সঙ্গে মিললাম জেলখানায়, উনিশশো তিরিশ সালে। বিশু তখন অডিন্যান্সে আটক রাজবন্দী, আমি আন্দোলন করে মেয়াদ খাটছি। সেইখানে সে আমাকে টানলে। আমাকে নতুন দীক্ষা দিলে, পড়বার সুযোগ করে দিলে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দেবু স্তব্ধ হইল। স্মৃতির আবেগ তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল।

ন্যায়রত্ন স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিলেন। দেবুর কথা শেষ হয় নাই বলিয়া তিনি কোন কথা বলেন নাই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন—নারায়ণ নারায়ণ।

দেবু ইঙ্গিতটা বুঝিয়াছিল, আত্মসম্বরণ করিয়া সে আরম্ভ করিয়াছিল—ওই জেলখানাতেই সে আমাকে জানিয়েছিল—অরুণাকে বিয়ে করার কথা। কিন্তু এমন-ভাবে তালাকের জন্যে মুসলমান ধর্ম্ম নিয়ে যে বিয়ে করেছে তার কথা আমাকে বলে নাই সে। আজও পর্য্যন্ত আমি জানতাম না। এইটুকু আপনি বিশ্বাস করবেন।

মৃদু শান্তস্বরে ন্যায়রত্ন বলিয়াছিলেন—বিশ্বাস আমি করলাম পণ্ডিত।

দেবু প্রতীক্ষা করিল—তিনি আরও কিছু বলিবেন। কিন্তু ন্যায়রত্ন ওইটুকু বলিয়াই চুপ করিলেন। অভ্যস্ত স্থির শান্ত দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দেবু আবার বলিল—উনি যে কেন এমন করলেন? সে হতাশভাবে বারবার ঘাড় নাড়িল। তারপর বলিল—এ যে কি হ'ল—এর ফল? বাক্য শেষ করিতে পারিল না—প্রশ্নের সুরটাই বড় হইয়া উঠিয়া তাহার অন্তরের উদ্বেগের পরিমাণটা ফুটাইয়া তুলিল।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—ভালই হয়েছে পণ্ডিত। ভালই হল। ভাবছ কেন? তারপর বলিলেন—এ সংসারে যা ঘটে পণ্ডিত, তা অবশ্যম্ভাবী। অনুশোচনা কর না, তা হ'লে ভয় পাবে। সাহস ক'রে দাঁড়াও পণ্ডিত, আঘাত এলেও—তা থেকে মঙ্গলই হবে।

দেবু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়াছিল—উত্তর খুঁজিয়া পায় নাই।

ন্যায়রত্ন বলিয়াছিলেন—অজয় কাশীর টিকিট কিনে ট্রেণে উঠেছে? গৌর সঙ্গে গেছে?

—হ্যাঁ। সে আমি নিজে খবর নিয়েছি। গৌর ট্রেণে চড়বার সময় বলে গিয়েছে। আমি কাশীতে টেলিগ্রাম করেছি। কাশীতে পৌঁছে গৌরও নিশ্চয় টেলিগ্রাম করবে।

সকরুণ হাসিয়া ন্যায়রত্ন বলিয়াছিলেন—কিশোর চিত্ত। আঘাতটা অত্যন্ত বেশী হয়েছে।

দেবু লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়াছিল।

বিশ্বনাথ যে দলের সভ্য হইয়া এই কাজ করিয়া গিয়াছে সেই দলেরই সভ্য সে। সে নিজেও বিধবা বিবাহ করিয়াছে। ধর্ম্মসঙ্গত বিবাহের আদর্শ তাহাদের কাছে মূল্যহীন। সে জানে—অজয়ের মা জয়ার ভালবাসাকে বিশ্বনাথ করুণার চক্ষে দেখিত। দুরূহ দুর্গম জীবনপথে চলিতে গিয়া পথের সঙ্গিনী অরুণাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পাইবার জন্য বিশ্বনাথ—তাহার জীবনধর্ম্ম জীবনাদর্শ বুঝিতে অক্ষম জয়াকে পরিত্যাগ করিয়া অরুণাকে বিবাহ করিয়া —তাহাদের দৃষ্টিতে তাহাদের বিশ্বাসমতে কোন অন্যায়ই করে নাই। ঠিক এই কারণেই ন্যায়রত্নের ওই শেষ কথা কয়টিতে লজ্জা পাইল। যতই বস্তুতান্ত্রিক হউক—একটি কিশোর চিত্তের বেদনার সত্যটা মনে করাইয়া

দিতেই বিশ্বনাথের লজ্জা যেন তাহার মাথা হেঁট করিয়া দিয়াছিল।

ঠিক এই সময়েই অরুণা আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল। ঝড়ের রাত্রের পর প্রভাতের বিপর্য্যস্ত পৃথিবীর মত তাহার মুখখানার উপর মানসিক বিপর্য্যয়ের ছাপ পড়িয়াছে। সারাটা দিন পর সে ফিরিল।

সকালে ন্যায়রত্ন তাহার বাসায় আসিয়া বিনা ভূমিকায় বলিয়াছিলেন—আমাকে শুধু একগ্লাস সরবত করে দাও। আর কিছু না।

অরুণার উপায়ান্তর ছিল না। তবু সে একবার বলিয়াছিল—না। আপনি আমাকে মার্জ্জনা করুন।

ন্যায়রত্ন পূর্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন—তুমি কেন সঙ্কোচ করছ?

অরুণা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—মুখে উত্তর দেয় নাই, চোখের কয় ফোঁটা জল—যাহা জানাইবার তাহা জানাইয়াছিল।

ন্যায়রত্ন বলিয়াছিলেন—বিশ্বনাথ আমার পৌত্র, সে তোমাকে যে কোন মতেই হোক বিবাহ করেছিল; তুমি—।

কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—যতদূর আমার জানা আছে—যতটুকু অনুমান করতে পারি তাতে তোমরা কোন ধর্ম্মকেই মান না। আমাদের ধর্ম্মানুযায়ী বৈধব্য-ধর্ম্মে তোমাদের আস্থা নাই। স্বচ্ছন্দেই তুমি আবার বিবাহ করতে পারতে। কিন্তু তা তো তুমি করনি। সুতরাং তার প্রতি তোমার অনুরাগকে তো অস্বীকার করতে পারি না। আমার জাতিধর্ম্মের কথা তুমি ভেবো না। যতদিন পর্য্যন্ত আচার লঙ্ঘন করলেই লোভ মাথা ঠেলে উঠে, আচার লঙ্ঘনের দ্বিতীয় সুযোগের জন্য মনকে চঞ্চল করে, ততদিনই ধর্ম্ম বল জাতি বল আচারগত থাকে। আমার ধর্ম্ম আর আচারগত নাই ভাই। তুমি আমাকে সরবত এনে দাও। আমি পিপাসা অনুভব করছি।

অরুণা সরবত আনিয়া নামাইয়া দিয়া বলিয়াছিল—এইবার আমাকে নিষ্কৃতি দিন। আপনি—। আবারও সে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল।

—আমায় যেতে বলছ? কিন্তু অজয় না-ফেরা পর্য্যন্ত তো যেতে পারব না আমি।

অরুণা পাশের ঘরে গিয়া ঢুকিয়াছিল।

ঘণ্টাখানেক পর সে বাহির হইয়া আসিল। বলিল—আমি স্বর্ণকে বলে যাচ্ছি সে আপনার খাওয়ার উদ্যোগ ক'রে দেবে। যেমন বলবেন—তেমনি ব্যবস্থাই আগে থেকেই করা আছে। ইস্কুলের হেডপণ্ডিত মশায়ের বিধবা মেয়ে—তিনি আমাদের ইস্কুলে শিশুদের ক্লাসে পড়ান, বড় মেয়েদের রান্না শেখান, তিনি রান্না করবেন। যদি নিজে রান্না করতে চান—তিনি যোগাড় করে দেবেন। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।

অপরাহ্নে দেবু অজয়ের সংবাদ লইয়া আসিল।

অজয় বেলা তিনটায় আপ ট্রেণে কাশীর টিকিট কিনিয়া চড়িয়াছে। গৌর তাহাকে অনেক ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিল—সে ফিরে নাই। গৌরও তার সঙ্গে গিয়াছে।

অজয়ের সংবাদ দিয়া দেবু ন্যায়রত্নকে ওই কথাগুলিই বলিতেছিল—এমন সময় ফিরিয়াছিল অরুণা।

দেবু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিয়াছিল—আপনি সারা দিন কোথায় ছিলেন? এ কি চেহারা হয়েছে আপনার?

অরুণা বলিযাছিল—অজয়ের খবর পেয়েছেন। সে ফিরল না, কিছুতেই ফিরল না। আমি খুঁজে তাদের বের করেছিলাম। সারাটা দিন—ময়ূরাক্ষীর ধারে বসেছিল, গৌর অনেক বুঝিয়েছিল, আমি শুধু দূরে আড়ালে দাঁড়িয়েই দেখলাম। কাছে যেতে পারলাম না।

সে হাঁপাইতেছিল। ন্যায়রত্ন বলিয়াছিলেন—বস তুমি, শান্ত হও। সুস্থ হও। মিথ্যে তুমি বুকের উপর অপরাধের বোঝা চাপিয়ে কষ্ট পাচ্ছ ভাই।

—না। বসব না। আমি রওনা হব।

—সে কি? কোথায়?

—কাশী, কাশী যাব আমি। আধ ঘণ্টার মধ্যে ট্রেণ। আপনি নিষেধ করবেন না আমাকে।

মৃদু হাসিয়া ন্যায়রত্ন বলিয়াছিলেন—না। নিষেধ করব না।

অরুণা চলিয়া যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই ন্যায়রত্নের টোলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকটি আসিয়া হাজির হইয়াছিলেন। এই ঘটনায় ছাত্রেরা প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম

তাহারা বিসর্জ্জন দিবে কি করিয়া? অধ্যাপক মহাশয়ও চাবী দিতে আসিযাছেন। তিনিও—।

মুখ কাঁচুমাচু করিযা বলিলেন—কিছুদিন অন্তত না গেলে—। অর্থাৎ ব্যাপারটা সমাজ কি ভাবে গ্রহণ করে—। মানে—আপনার অবিদিত তো কিছুই নাই, সামান্য ব্যক্তি আমি—।

ন্যায়রত্ন হাত বাড়াইয়া বলিয়াছিলেন—দাও—চাবী দাও।

তাহার পর উঠিয়া বসিয়া দেবুকে ডাকিয়াছিলেন—পণ্ডিত মহাগ্রামে যেতে হবে আমাকে।

* * *

মাসখানেক পর, ন্যায়রত্ন ময়ূরাক্ষী পার হইয়া দ্বারমণ্ডলের বন্দরঘাটের বটতলায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বাড়ীর বিগ্রহ সেবার নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন তিনি। পঞ্চগ্রামের একদা তাঁহারাই ছিলেন বিধানদাতা, সমাজপতি। আজ পঞ্চগ্রাম হইতে দ্বারমণ্ডলে তাঁহার বংশদেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে তাঁহাকে।

অজয় কাশীতে পৌছিয়াছে। গৌর ফিরিয়াছে। অরুণার সংবাদ গৌর জানে না। আর কোন সংবাদ আজও পান নাই।

দ্বারমণ্ডল ঘাটে দাঁড়াইয়াছিল—দেবকী সেন কবিরাজ। সে সসম্ভ্রমে আগাইয়া আসিল। (ক্রমশঃ)

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

১৯৪৯-এর ৯ই জানুয়ারী কলিকাতার তৎকালীন সেরিফ শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের বাড়ীতে স্বর্গীয় ডাঃ বিনয় সরকারের বঙ্গীয়-এসিয়া-পরিষদের এক বৈঠকের বিষয়বস্তু ছিল, আন্দামানে লোক-বসতি। সে সময়ে সরকারী মহল হইতে কথা উঠিয়াছিল, কিরূপে পূর্ব্ববঙ্গ অর্থাৎ ইস্‌লাম ভারতের পূর্ব্বাংশের বাস্তুচ্যুতদের জন্য আন্দামানে উপনিবেশ গঠন করা যায়। গরু মারিয়া জুতাদানের মত কংগ্রেসী সরকার ধর্ম্ম হিসাবে ভারত-বিভাগ স্বীকার করিয়া বাস্তুহারাদের সৃষ্টি করিয়া পরে তাহাদেরই নূতন বাস্তুদানের জন্য এইরূপ পরিকল্পনা গঠন করিয়াছিলেন।

বৈঠকে শ্রীযুক্ত লাহা ছিলেন সভাপতি, ডাঃ বিনয় সরকার উপস্থিত ছিলেন, প্রধান বক্তার নাম ভুলিয়া গিয়াছি। তিনি এক প্রকাণ্ড লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল আন্দামানের ভৌগলিক পরিবেশ, আবহাওয়ার বিবরণ, উদ্ভিদতত্ত্ব এবং লোকবসতির সুবিধা অসুবিধার আলোচনা। বিনয় সরকারের বৈঠকের নীতি ছিল এই যে, মাত্র কয়েকজন নিমন্ত্রিত বিশিষ্ট সভ্য লইয়া এই সমস্ত সভা হইত, সভায় একজন থাকিতেন প্রধান বক্তা এবং তাঁহার বক্তৃতার শেষে উপস্থিত প্রত্যেককেই সে সম্বন্ধে কিছু না কিছু বলিতেই হইত। ইহা হইতে কেহই অব্যাহতি পাইত না।

প্রধান বক্তার ভাষণের পর আমাদের সকলের বলিবার পালা আসিলে একজন পূর্ব্ববঙ্গীয় সভ্য এমনই এক বিরাট্, গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন যে, আমরা সকলেই অস্থির হইয়া পড়িলাম। তিনি প্রবাল দ্বীপ, ল্যাটেরাইট্ সয়েল, ইকোয়্টোরিয়েল জোন ইত্যাদি ভূগোলের বড় বড় শব্দ আনিয়া এমনই এক বক্তৃতা দিলেন যে, আমরা সাধারণ শ্রোতা কিছুই বুঝিলাম না। মোটের উপর ইহাই বলিলেন যে, আন্দামান পাহাড়ে-জায়গা, ওখানে পাথরের উপর মাত্র তিন ইঞ্চি মাটী আছে, অতএব চাস আবাদ হইবে না এবং "পুলিপোলাও'-এর দেশে মানুষ থাকিতেও পারে না, সেইজন্য আন্দামানে বাঙ্গালীর উপনিবেশ স্থাপন করার আশা দুরাশা মাত্র, ইহা অচিরেই পরিত্যাগ করা উচিত।

তাঁহার ঐ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতায় মেজাজ খারাপ হইয়া গেল। আমার পালা আসিলে আমি বলিয়াছিলাম, দূর হইতে ভূগোল পড়িয়া কোন জাতি কখনও কোন উপনিবেশ স্থাপন করে নাই। এতটা জায়গা, যদি বাঙ্গালীর অধিকারে আসার সম্ভাবনাই থাকে তবে অতি বুদ্ধিমানের

মত তাহা দূর হইতে পরিত্যাগ করা আদৌ উচিৎ নয়। মধুপুর, বৈদ্যনাথ, শিমুলতলা, ঝাঁঝা ইত্যাদি বিহারী জঙ্গলগুলি যদি বাঙ্গালীর পয়সায় স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, তবে সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী এই সুন্দর দ্বীপই বা কেন না হইবে। ইহার জন্য আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সেখানে যাওয়া, দেখা এবং বেড়ানো উচিত। ডাঃ সরকার তাহার সমাপ্তি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, যদি কোন সভা সেখানে যাইতে চায়, তাহা হইলে সত্যই ভালো হয়, সাধারণ লোকের যাওয়া আসার মধ্য দিয়া আন্দামানের ভয় ও দুর্নাম কাটিয়া যাইতে পারে। যদি কেহ যাইতে চান ত বড় ভালো হয়। তদবধি আমার ভ্রমণ-পরিকল্পনার তালিকায় আন্দামানের নাম অলিখিত অক্ষরে ছাপা হইয়া গেল। সুযোগ, সুবিধা এবং পাথেয় সংগ্রহের চেষ্টা মনে মনে চলিতে লাগিল। [ভূমিকায় এতগুলি কথা বলিতাম না, কেবল আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ সরকার আজ নাই বলিয়াই এই কথাগুলি বলিলাম। তিনি যে আমাদের অন্তরে কতখানি প্রেরণা এবং জ্ঞান দিতেন তাহা আজ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কেবলই স্মরণ করি।]

* * *

১৯৭৯এর আগষ্ট মাস। সহকর্মী অধ্যাপক শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন, তাঁহার 'লজে'র কয়েকজন বন্ধু আন্দামান যাইবেন। জাহাজ ছাড়িবে সেপ্টেম্বরে। হিসাব করিয়া দেখিলাম, আমার কলেজ বন্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বেই জাহাজ ছাড়িতেছে এবং পূজার ছুটীতে ঘুরিয়া আসা সম্ভব। ঠিক করিলাম, আন্দামান যাইব।

কিন্তু 'ট্রান্সপোর্টেশনে'র দেশে যাওয়া কি সহজ কথা! প্রথমতঃ জাহাজের টিকিট কেনা। একখানি মাত্র জাহাজ নিয়মিতভাবে কলিকাতা হইতে পোর্টব্লেয়ার নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের Car Nicobar নামক দ্বীপ ও মাদ্রাজে যাতায়াত করে। জাহাজখানি টারনার মরিসন্ কোম্পানীর, ভারত সরকার উহা চার্টার করিয়া রাখিয়াছেন। জাহাজটির নাম "এস, এস, মহারাজা", উহার বহন ক্ষমতা ১,৮০০টন। জাহাজে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও ডেক এই চারি শ্রেণীর স্থান আছে। ভাড়া যথাক্রমে ১১০৲, ৬৬৲, ৩০৲, ও ২০৲ টাকা। জাহাজে প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ৫০০ পাউণ্ড বা ২০ ঘন ফিট, দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী ২৫০ পাউণ্ড বা ১০ ঘন ফিট, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী ১২০ পাউণ্ড বা ৭ ঘন ফিট এবং ডেকের যাত্রী ৮০ পাউণ্ড বা ৫ ঘন ফিট পরিমাণ মালপত্র বিনা ব্যয়ে গ্রহণ করিতে পারেন। অতিরিক্ত মাল সঙ্গে লইবার জন্য টন প্রতি ১০৮৲ টাকা হিসাবে দিতে হয়। কেবলমাত্র মাল পাঠাইবার ভাড়া টন প্রতি ৭২৲ টাকা। জাহাজে খাওয়ার ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র। সেজন্য আলাদা দাম দিতে হয়। খাওয়াও চারি শ্রেণীর, মূল্য দৈনিক ১০৲, ৬৲, ৩৲ ও ২৲ টাকা। মদনলাল নামক এক হিন্দু পাচক ঐ জাহাজেই থাকে, তাহার নিকট হিন্দু খানা খাইলে দৈনিক ২৲ টাকা লাগে। যে কোন শ্রেণীর খাদ্যই ঐরূপ মূল্য দিয়া যে কোন শ্রেণীর যাত্রী খাইতে পারেন। উপরন্তু জাহাজে ১৬টি উনান আছে, কেহ পাক করিয়া খাইতে চাহিলে জাহাজ কোম্পানী বিনা পয়সায় কয়লা দিয়া উনান ধরাইয়া দেয়। দল বাঁধিয়া যাইতে হইলে এইরূপে পাক করিয়া খাওয়া বিশেষ আনন্দজনক।

এই ত জাহাজের নিয়ম। কিন্তু টিকিট কেনা বড় দুরূহ। কারণ যাত্রীদের টিকিট কিনিবার অনুমতি আন্দামানের চীফ্ কমিশনারের নিকট হইতে আনিতে হয়। আবার চিঠিপত্রেও তেমন কাজ হয় না, কারণ চিঠি যায় মাসে একবার, কাজেই এই কাজ টেলিগ্রামে করিতে হয়। আমরা কয়েকজনের জন্য এইরূপ অনুমতি আনাইয়া লইলাম। টেলিগ্রামেই অনুমতি পাইলাম। আন্দামানের চীফ কমিশনারকে টেলিগ্রাম করিতে গেলে তাঁহার টেলিগ্রাফিক্ ঠিকানা "Andamans"।

যথা সময়ে আমাদের টিকিট কেনার অনুমতি আসিল, কিন্তু যাঁহাদের সহিত একত্রে যাইব বলিয়া ঠিক ছিল, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন কারণে যাওয়া সম্ভব হইল না। অতঃপর 'একলা চল রে' নীতি অনুসরণ করিয়া স্থির করিলাম, একাই যাইব।

কিন্তু জাহাজ ছাড়িবার দিন দশেক পূর্ব্বে আমার আর দুইজন সহকর্মী অধ্যাপক বন্ধু আন্দামান যাইবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন। টেলিগ্রাম করিয়া তাহাদের টিকিট কিনিবার অনুমতি মিলিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাও চলিল। ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান ব্যাপার, টীকা লওয়া। জাহাজে চড়িবার জন্য কলেরা ও বসন্ত রোগের প্রতিষেধক টীকা লইতে হয়। জাহাজে চড়িবার অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে কলেরার টীকা

এবং অন্ততঃ পনর দিন পূর্ব্বে বসন্তের প্রতিষেধক টীকা লইতে হয়। এইরূপ নিয়ম আছে বলিয়াই আন্দামানে এই সমস্ত সংক্রামক ব্যাধি একেবারেই নাই। টীকা লওয়া ও তাহার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা প্রভৃতি নানা ব্যাপারে বহু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পর ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ শনিবার সকালে প্রিন্সেপঘাট মুরিং হইতে আমি, অধ্যাপক শ্রীসুনীলাভ গুহ ও অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই তিন মূর্ত্তিতে "এস এস মহারাজা" জাহাজে আরোহণ করিলাম। সম্বলের মধ্যে রহিল কতকগুলি পরিচয়পত্র। নির্ম্মলবাবুর এক ছাত্রের দাদা পোর্টব্লেয়ারে কাজ করেন, সেই ছাত্র তাহার দাদার নিকট চিঠি দিয়াছিল, আর আমাকে চিঠি দিয়াছিলেন মধ্য কলিকাতা পুলিশের ডেপুটী কমিশনার রায় বাহাদুর শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। অবশ্য ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত পত্র, তবে পুলিশের সাহায্যে আন্দামান গিয়াছিলাম একথা মনে করিয়া ভুলক্রমে যদি কেহ আমাকে অভিনন্দন বা চাকুরী বা পারমিট দিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে আমি মোটেই আপত্তি করিব না। সুনীলবাবু আন্দামানের এক মুসলমান ভদ্রলোকের উপর চিঠি লইয়াছিলেন, কি জানি যদি এক সম্প্রদায় দিয়া কাজ না হয়, তবে অন্য সম্প্রদায়ও হাতে থাকা ভালো। এইরূপে কতকগুলি অজ্ঞাত ও অনিশ্চিৎ ব্যবস্থা লইয়া আমাদের যাত্রা সুরু হইয়াছিল।

দুই

সকাল আটটায় জাহাজে চড়িলাম, বেলা সাড়ে দশটায় জাহাজ ছাড়িল। ধীর মন্থর গতিতে বাঁশী বাজাইয়া জাহাজ চলিতে লাগিল। দু'পাশের পরিচিত স্থান কাটাইয়া, আখড়ায় ইটখটি, বজবজের তৈলট্যাঙ্ক পাশে রাখিয়া সর্পিল-গতি গঙ্গার উপর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া বিকালে ডায়মণ্ড-হারবার পার হওয়ার পর দেখি একদিকে ক্ষীণ তটরেখা, অন্যদিকে দিগন্তহীন গঙ্গার বিপুল জল রাশি। সন্ধ্যার পর জাহাজের দুইদিকে কোথাও কোন কূল আর নজরে পড়ে না।

রাত্রি প্রায় সাড়ে সাতটার সময় গঙ্গাসাগরের আলোক স্তম্ভ পার হইয়া রাত্রি নটা নাগাদ স্যাণ্ডহেড পার হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িলাম। পোর্ট কমিশনারের পাইলট মোটর বোটে নামিয়া গেলেন। আহারাদির পর শয়ন করিলাম। জাহাজ দুলিতে দুলিতে সোজা দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিল। জাহাজের গতিবেগ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বরাবরই ঘণ্টায় দশ মাইল হিসাবে ছিল।

পরদিন রবিবার সকালে উঠিয়া দেখি জাহাজ পূর্ব্ববৎ দুলিতেছে। ডেকের উপর হাঁটিবার সময় মাতালের অভিনয় করিতে হয়। হু হু করিয়া সমুদ্রের ঝোড়ো হাওয়া বহিতেছে, অধ্যাপক নির্ম্মলবাবুর বড় বড় চুল রুক্ষ হইয়া চোখে মুখে আসিয়া পড়িতেছে এবং পা টলিতেছে, কলিকাতার রাস্তায় এভাবে ঘোরাঘুরি করিলে 'মাতোয়ালা হুয়া' বলিয়া পুলিসে তাহাকে অবধারিত ধরিয়া লইয়া যাইত। এদিকে জাহাজে অধিকাংশ লোকের 'উল্টী' বা বমন সুরু হইয়া গিয়াছে। ইহারই নাম সি-সিক্‌নেস্। ডেক হইতে প্রথম শ্রেণীর যাত্রী পর্য্যন্ত সকলেই বমনকার্য্যে ব্যস্ত। তবে নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে জোর করিয়া বলিতে পারি যে 'সি-সিক্‌নেশ' রোগটার অধিকাংশ মানসিক, সামান্য একটু কায়িক। পেট যদি ভরা থাকে এবং পাতিলেবু, আমড়া ইত্যাদি টক্‌রস যদি মধ্যে মধ্যে পেটে পড়ে এবং যদি সর্ব্বদাই জাহাজে ঘোরাঘুরি করিয়া গল্পগুজব ও স্ফূর্ত্তির ভিতর দিয়া কাটানো যায়, তাহা হইলে সি-সিক্‌নেস্ হইতেই পারে না। আমাদের তিনজনের এতটুকুও শরীর খারাপ হয় নাই, অথচ ভাদ্র মাসের বঙ্গোপসাগর, অর্থাৎ জাহাজের দোলা বড় কম হয় নাই।

এইরূপে রবিবার ও সোমবার কাটিয়া গেল। জাহাজের রেলিং-এ ভর দিয়া যেদিকেই মুখ করিয়া দাঁড়াই না কেন, ছোট বড় ঢেউ-এর পর ঢেউ শেষ পর্য্যন্ত আকাশে গিয়া মিশিয়াছে, এই এক দৃশ্যই দেখিতে পাই। জাহাজের পিছনে দাঁড়াইলেও সেই দিগন্তবিসর্পী জলরাশি, কেবল পার্থক্য এই যে, বিপুল কালো জলের মধ্যে যে পথ দিয়া জাহাজ চলিয়া আসিয়াছে, সেই পথের উপর সাদা ফেনা ঠিক যেন ছায়াপথের ন্যায় সাদা একটি চওড়া পথের সৃষ্টি করিয়াছে। আকাশে কোন পাখী নাই, জাহাজের বাহিরে বিশ্বজগতের কোন চিহ্ন নাই, জাহাজের ভিতরে লোকগুলি রবিবারের তুলনায় সোমবার আরও বেশী করিয়া ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। কেহ আর কোন গল্পও করে না, কেহ তেমন ঘোরাঘুরিও করে না, প্রত্যেকেই আপন আপন শয্যায় স্থির হইয়া শুইয়া আছে ও মাঝে মাঝে বমন

করিতেছে। জাহাজের ষ্টুয়ার্ড একজন ইউপি মুসলমান, বাংলা মুলুকে বাঙ্গালী বিবাহ করিয়াছেন, বাংলা দেশের জামাই বলিয়া আমরা তাহার সহিত রসিকতা করিতাম, তিনি বলিলেন—এবার প্রায় শতকরা সত্তর জন সি-সিক্‌নেসে ভুগিতেছেন। এমন কি ক্যাপ্‌টেনের পর্য্যন্ত শরীর খারাপ লাগিতেছে, সোমবার সারা দুপুর তিনি চাপা দিয়া শুইয়া লেবুর জল পান করিয়াছেন। এইরূপে সোমবার রাত্রি অতিবাহিত হইল।

মঙ্গলবার সকাল হইতে বৃষ্টি সুরু হইল। জাহাজের ঘড়িতে দেখি, ঘড়ি ঘুরিতে ঘুরিতে ৩৫ মিনিট আগাইয়া গিয়াছে। ভারতের ঘড়িতে যখন ১২টা বাজে, আন্দামানে তখন একটা, অর্থাৎ আন্দামানের সময় এখনও আমাদের পুরাতন বেঙ্গলটাইমের সহিত একই রূপ আছে। এই এক ঘণ্টা সময় জাহাজ চলিবার চারদিনের মধ্যে আস্তে আস্তে ঘুরাইতে ঘুরাইতে লইয়া যাওয়া হয়, আবার আন্দামান হইতে ফিরিবার সময় ঘড়িকে পিছাইতে পিছাইতে ভারতীয় বন্দরে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইণ্ডিয়ান ষ্টাণ্ডার্ড টাইমে আনিয়া ফেলা হয়।

মঙ্গলবার বেলা দশটা হইতে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের দর্শন মিলিল। সমুদ্রের মাঝখানে জঙ্গলে ঢাকা খানিকটা উঁচু পাহাড় দেখিয়া সকলের মুখেই কেমন একটা অব্যক্ত আনন্দ। মাটীর জীব মাটী দেখিয়া পুনরায় প্রাণ ফিরিয়া পাইল। আর সেই সঙ্গে আশ্চর্য্য এই যে, যাহার যত কিছু সি-সিক্‌নেস্‌, সমস্তই এক নিমেষে আরাম হইয়া গেল। সকলেই আপন আপন বাক্স-বিছানা গুছাইয়া বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। সেইজন্য আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস হইল যে, সি-সিক্‌নেস্‌ মানসিক রোগ, মাটীর দর্শন মিলিলে ঐ রোগ আর থাকে না, কারণ যে সময়ে দূর হইতে আন্দামানের পাহাড় দৃষ্টিগোচর হইল, সে সময়েও জাহাজের দোলন পূর্ব্বের ন্যায় সমানেই ছিল, এতটুকুও কমে নাই।

সমুদ্রের মধ্যে দ্রষ্টব্য দেখিলাম, নানাপ্রকারের মাছ। খালাসীরা জাহাজ হইতে বড়্‌শীতে সাদা ন্যাকড়া বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দেয়, চলন্ত জাহাজের টানে বড়্‌শীর ন্যাকড়া জীবন্ত মাছের ন্যায় জলের মধ্যে ছুটীতে থাকে এবং সামুদ্রিক মাছেরা উহাকে ভক্ষ্য মনে করিয়া যেমন গ্রাস করিতে যায়, সঙ্গে সঙ্গে বড়শীতে আটকাইয়া ধরা পড়ে। জাহাজের খালাসীরা এইরূপে বেশ অনেকগুলি মাছ ধরিয়াছিল। আর দেখিলাম অসংখ্য উড়ন্ত মাছ (Flying fish)। জাহাজের ঢেউ লাগিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ন্ত মাছ উড়িতে থাকে। তাহারা জলের প্রায় চার পাঁচ ফুট উপর দিয়া উড়িয়া সিধা একশ' সোয়াশো গজ পর্য্যন্ত যাইয়া আবার জলে পড়ে। এইরূপে উড়িবার সময় তাহারা তাহাদের গতিপথ বা গতিবেগ পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। শুনিলাম, কোন কোন সময় তাহারা এইরূপে অন্ধভাবে উড়িয়া জাহাজের উপরের ডেকে বা পোর্টহোল দিয়া জাহাজের খোলের মধ্যেও আসিয়া পড়ে। শক্ত জায়গায় পড়িলেই সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া যায়। খালাসীরা বলিল যে, এইরূপ উড়ন্ত মাছ ধরিতে পারিলে এক একটি আট দশ টাকায় বিক্রয় হয়, কারণ উহাতে খুব ভালো ঔষধ প্রস্তুত হয়।

জাহাজে স্নান ও পায়খানার বন্দোবস্ত ভালোই আছে। জাহাজের ম্যাথরকে টোপাজ বলে, ডেকের যাত্রীরা টোপাজের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের নির্দ্ধারিত ব্যবস্থায় অতিরিক্ত সুখসুবিধাও ব্ল্যাকমার্কেট হিসাবে জোগাড় করিয়া লইতে পারে। স্নান, আহার, শয়ন ও বিচরণ সবদিক দিয়াই জাহাজের চারদিক নিরতিশয় আনন্দজনক। (ক্রমশঃ)
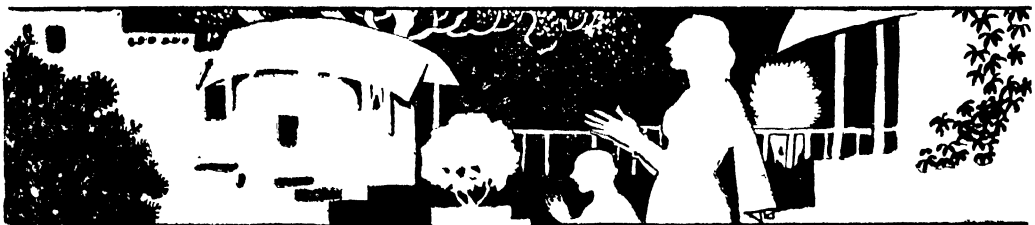
রাষ্ট্রভাষায় দেবনাগরী অক্ষর প্রবর্ত্তন

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এসসি

ত্রিশ বা চল্লিশ কোটী ভারতবাসীকে লেখাপড়া শিখাইবার অর্থ এইরূপ দাঁড়ায় :—তাহাদের লেখা শিখিতে প্রচুর কাগজ ও খাতার প্রয়োজন। তাহাদের সাহিত্য পিপাসা নিবারণের জন্য প্রচুর গল্পপুস্তক ও অন্যান্য পুস্তক, মাসিক পত্র, সাপ্তাহিক পত্র ও দৈনিক পত্রের প্রয়োজন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার একটি দৈনিক পত্রের গ্রাহক দশ পনর লক্ষ। কাগজ আসে কোথা হইতে? অরণ্য কাটিয়া তথা হইতে। বৃষ্টি বায়ুবিদ পণ্ডিতগণ (meteorologists) বলেন—অরণ্য বেশী কমিয়া যাইলে দেশের বৃষ্টি কমিয়া যায়। বৃষ্টি কমিলে চাষের ক্ষতি হয়। দেশে খাদ্যাভাব হয়। অতএব বুঝা যাইতেছে কাগজের ব্যবহার সংক্ষেপ করিবার প্রয়োজনীয়তা অদূর ভবিষ্যতে অনুভূত হইবে। তখন যুক্তাক্ষর ও মাত্রায় প্রয়োগের সুবিধা বিশদ হইবে।

বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে রাষ্ট্রভাষা হয় সে বিষয়ে বিশেষ উৎসুক। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের একজন বিশিষ্ট অবাঙ্গালী শিক্ষাবিদ বাঙ্গালাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার সপক্ষে বলিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার মত সাহিত্যসম্পদ ভারতের আর কোনও ভাষায় নাই। কালী সিংহ বা বর্দ্ধমানের রাজবাটীর মহাভারতের অনুবাদের ন্যায় সমগ্র সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ আর কোনও প্রাদেশিক ভাষায় নাই। অন্যান্য বহু সংস্কৃত গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ বাহির হইয়াছে। সেই অনুবাদ পড়িলে যে কোন অন্য প্রদেশের সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি অতি সহজেই বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে পারিবে। আর বাঙ্গালা ব্যাকরণ হিন্দি ব্যাকরণ হইতে সরলতর এবং বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার হিন্দি হইতেও অধিক। এই জন্যও, মাদ্রাজী, মারাঠি প্রভৃতির পক্ষে বাঙ্গালা গ্রন্থপাঠ সহজসাধ্য।

কিন্তু বাঙ্গালাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে হইলে বাঙ্গালীদিগকে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। নাগরী অক্ষরমালা গ্রহণ করিতে হইবে।

ভারতের এখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রয়োজন অর্জ্জিত স্বাধীনতার সম্পূর্ণীকরণ ও সংরক্ষণ। প্রাদেশিকতা ইহার একটি প্রধান অন্তরায়। প্রাদেশিকতা দূর করিতে হইলে সমগ্র ভারতের ভাষা ও পরিচ্ছদ যতদূর সম্ভব একরূপ করিতে হইবে। ভারতীয় রাষ্ট্রমহাসভা হইতে নিয়ম করিতে হইবে যেন ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে সমগ্র প্রাদেশিক ভাষার লিপি দেবনাগরী হইয়া পড়ে। উহাতে প্রাদেশিকতা অনেক পরিমাণে দূর হইবে।

দেবনাগরী অক্ষরমালা যে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত লিপি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সংস্কৃত, হিন্দি, পাহাড়ী ও মারাঠি ভাষা ঐ লিপিতে লিখিত হয়। গুজরাটী লিপিও অনুরূপ। বাঙ্গালী, তামিল, আসামী, উড়িয়া প্রভৃতি যে সব দেশের লিপি স্বতন্ত্র সেখানকার শিক্ষিতগণ সংস্কৃত পাঠ করিবার জন্য নাগরী লিপি পড়িতে বাধ্য হয়। যতদূর মনে হয় তাহাতে হিন্দিই রাষ্ট্রভাষায় পরিণত হইবে এবং দেবনাগরী অক্ষরেই উহা লিখিত হইবে। সম্প্রতি ইহা রাষ্ট্রমহাসভায় স্থিরও হইয়াছে।

বাঙ্গালা দেশের ভাষাবিদগণ এই মতে মত দিয়াছেন এবং শুনা যাইতেছে মৌলনা আজাদও নাগরী অক্ষরে মত দিয়াছেন। আজাদকেও বঙ্গদেশের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য করা হয়।

বাঙ্গালী ভাষাবিদগণের কেহ কেহ এবং অন্য প্রদেশেরও কেহ কেহ নাগরী অক্ষর সম্বন্ধে একটু বিরূপ-ভাব রাখিয়াছেন। তাহারা যেন রোমান অর্থাৎ ইংরাজী অক্ষরেই রাষ্ট্রভাষা লিখিত হউক এইরূপ অভিপ্রায় পোষণ করেন।

যে কোনও ইংরাজী অভিধান খুলিলেই দেখা যাইবে ইংরাজী বর্ণমালা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। শুধু ইংরাজী a র—**art, ape, fat, fast what, all** এই ছয় রকম শব্দের উচ্চারণ কার্য্যে প্রয়োগ হয়। এরূপ আরও আছে। বার্ণার্ড শ এজন্য কিছুকাল পূর্ব্বে বিশেষজ্ঞ দ্বারা ইংরাজী বর্ণমালা পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন ইংরাজী অক্ষরে টাইপ রাইটার ব্যবহার সুবিধা অনেক। নাগরী বা বাঙ্গালা অক্ষরে তাহা হইবে না। তদুত্তরে বক্তব্য ভাষা সৃষ্টি হইবার পরে টাইপ রাইটার সৃষ্টি হইয়াছিল। অন্য দেশের কৌশলীরা যাহা করিতে পারিয়াছে আমাদের কৌশলীরা তাহা পারিবে।

অন্যে বলেন, সংস্কৃতজ বর্ণমালায় যুক্তাক্ষর ও মাত্রার জন্য শিক্ষার্থীদিগকে অনেক বেশী আক্ষরিক সঙ্কেত ব্যবহার করিতে হয়। অতএব তাহাদের অনেক সময় নষ্ট হয়। তদুত্তরে বক্তব্য—ইংরাজী বর্ণমালা শিক্ষার্থীগণকে বড় অক্ষর, ছোট অক্ষর ও হাতে লিখিবার অক্ষর এই ত্রিবিধ অক্ষর সঙ্কেত অভ্যাস করিতে হয়। অতএব শ্রমের বেশী তারতম্য হইবে না।

কিন্তু যুক্তাক্ষর ও মাত্রার জন্য সংস্কৃতজ বর্ণমালার যে সুবিধাটা হইয়াছে, তাহা অনেকে বুঝিতে পারেন না। সেটা এই যে, অল্প স্থানে অনেক বেশী কথা লিখিতে বা ছাপিতে পারা যায়। প্রায় সিকি আন্দাজ স্থান সংক্ষেপ হয়। এই স্থান সংক্ষেপে শ্রম-সংক্ষেপ ও কাগজ ব্যবহার সংক্ষেপ হয়।

ঐ কাগজ-সংক্ষেপজনিত সুবিধাটা খুব বড় সুবিধা এবং দিন দিনই উহার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইবে। আমরা সর্ব্বাংশে ইঙ্গ-আমেরিকা সভ্যতার অনুকরণ করিতেছি। উহার মূলকথা—দেশের বিবিধ শিল্প নির্ম্মাণকরণ (industrialization) এবং জনগণের আবশ্যক দ্রব্য ব্যবহার করিবার শক্তিবর্দ্ধন (raising of standard of living)। এই প্রথার একটি অংশ—দেশের সমস্ত লোককে লেখাপড়া শিখাইতে হইবে।

সংস্কৃত লিপি সমগ্র ভারতে প্রচলিত হইলে আর একটা বড় সুবিধা হইবে। পুস্তক মুদ্রণের সুবিধা। এই সুবিধার জন্য পুস্তকের দাম অনেক কমিয়া যাইবে। বাঙ্গালী পুস্তকব্যবসায়ীগণ ও গ্রন্থকারগণের সুবিধা হইবে। একই প্রেসে হিন্দি, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক সহজে মুদ্রিত হইবে এবং সমগ্র ভারতে তাহার ক্রেতা মিলিবে। বাঙ্গালা গ্রন্থকারদিগেরও ঐ সুবিধা হইবে।

জনকতক বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষা যাহাতে রাষ্ট্রভাষা হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন। তাহাদের প্রচেষ্টা যে বাঙ্গালী জাতির হিতাকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা হইলে কোন প্রদেশ-বিশেষের লোকেরই রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারী সংগ্রহ করিবার পরীক্ষা সমূহের জন্য অতিরিক্ত সুবিধা থাকিবে। একটু বিচার করিলে দেখা যাইবে, এ সব পরীক্ষায় বাঙ্গালীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিযোগী মান্দ্রাজী ও মারাঠি। বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশ শিক্ষায় বাঙ্গালী হইতে হীন। বহু বাঙ্গালী বিহার ও যুক্তপ্রদেশে বাস করেন। তাঁহারা হিন্দি ভাল জানেন। কলিকাতা অঞ্চলের লোকের বাটিতে হিন্দুস্থানী বা বেহারী চাকর, রাঁধুনী ও দরওয়ান থাকার জন্য এখানকার অনেক বাঙ্গালী মোটামুটি হিন্দি কহিতে ও বুঝিতে পারে। অতএব হিন্দি রাষ্ট্রভাষা হইলে বাঙ্গালীরই সুবিধা অধিক।

হিন্দি ভাষা ও বাঙ্গালা ভাষা দুইয়ের প্রভেদ এত সামান্য যে হিন্দির প্রচলনের ভিতর দিয়াই বাঙ্গালা ক্রমশ রাষ্ট্রভাষায় পরিণত হইবে। কালি সিংহের মহাভারতের নাগরী ভাষায় লিখিত বাঙ্গালা পুস্তক পড়িয়া যে কোনও প্রদেশের লোকই সহজে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে পারিবে। রবীন্দ্র, শরৎ ও বঙ্কিমের লেখা পড়িবার জন্য বহু লোকে বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে চাহিবে।

হিন্দির আর একটা সুবিধার কথা ভুলিলে চলিবে না। সেটা বাক্‌চিত্র (talkies)। এটা একটা প্রকাণ্ড ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশ বিভাগের পর বাঙ্গালা ফিল্মের আরও দুর্দ্দশা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব-পাকিস্থানে ফিল্ম সেন্সার কোন ফিল্ম বন্ধ করিবে তাহা বলা যায় না। কিন্তু হিন্দি ফিল্ম সমগ্র ভারতে প্রচলিত হইতেছে। যেখানে লাভ বেশী সেখানে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া ভাল ফিল্ম নির্ম্মাণ সহজ। বম্বের ফিল্ম ব্যবসায়ীগণ বহু মুদ্রা ব্যয়ে যে সকল ফিল্ম প্রস্তুত করিতেছে তাঁহাদের কলা কৌশল অধিকতর মূল্যবান বলিয়া ঐ সকল ফিল্ম সকল ভারতীয় মহলেই চলিতেছে। অনেক বাঙ্গালী নট, নটি, চিত্রশিল্পী ও চিত্র গ্রন্থকার হিন্দি ফিল্মে বহু অর্থ উপার্জন করিতেছেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংরক্ষণ করিতে হইলে দ্রুত ভারতবর্ষীয়দিগকে এক জাতিতে পরিণত করিতে হইবে। প্রাদেশিকতা দূর করিতে হইবে। এই একজাতীয়তা বিধানের পক্ষে এক লিপি অন্যতম উপায়। ইহার ব্যবস্থার জন্য নিয়ম প্রণয়ন আইন বা অর্ডিনান্স দ্বারা নিয়ম করা হউক প্রত্যেক প্রাদেশিক সংবাদপত্রকে প্রথম তিন মাস ঐ পত্রে এক স্তম্ভ প্রাদেশিক লিপিতে ও উহার পার্শ্বে একস্তম্ভ (সেই পাঠ্যবস্তুই) নাগরী লিপিতে মুদ্রিত করিতে হইবে। দ্বিতীয় তিন মাসে ঐ ব্যবস্থা এবং তৎসহ আর এক স্তম্ভ শুধু নাগরী লিপিতে মুদ্রিত হইবে। ইহার পার্শ্বে কোনও প্রাদেশিক লিপি থাকিবে না। এইরূপে উত্তরোত্তর নাগরী লিপির বিস্তার করিতে হইবে।

আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক

শ্রীমনকুমার সেন

যুদ্ধোত্তর জগতে যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক অবস্থা দূর করিয়া শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে একক প্রচেষ্টায় তাহা কখনই সম্ভব নহে, তজ্জন্য সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার প্রয়োজন। একটু তাকাইয়া দেখিলেই যেমন আমরা বুঝিতে পারি যে বর্ত্তমানকালের যুদ্ধ-বিগ্রহের মূলে বহুবিধ অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যমান, তেমনি যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে অর্থনৈতিক পৃথিবী-ই যে ক্ষত-বিক্ষত হয় বেশী তাহাও উপলব্ধি করা কঠিন নহে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও আমরা যে এই রূঢ় সত্য মর্ম্মান্তিকভাবেই টের পাইতেছি তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। যুদ্ধের পরে সুদীর্ঘ চারি-পাঁচবৎসর গত হইতে চলিল, কিন্তু মানুষের জীবনযুদ্ধের বিরতির চিহ্নমাত্রও দেখা যাইতেছে কি? শুধু ভারতেই নহে, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেরই জনসাধারণ আজ এমনিভাবে আর্থিক সঙ্কটের নির্ম্মম বজ্রমুষ্টিতে পড়িয়া হাঁসফাঁস করিতেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান, শুভ সংকল্প লইয়াই হউক আর মতলব হাঁসিলের উদ্দেশ্য লইয়াই হউক, কতিপয় নেতৃস্থানীয় দেশ যে কয়েকটি সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সূচনা করিয়াছে আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক তাহাদের অন্যতম। 'সূচনা' বলিলাম এই জন্য যে, ইহাদের সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত বাগাড়ম্বর ও কৌশলপূর্ণ প্রচারকার্য্য যতটা হইয়াছে, কার্য্যক্ষেত্রে ততটা সার্থকতার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তত্রাচ অন্ততঃ আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আমাদের একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে উহার গত কয়েক বৎসরের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমরা উহার সদিচ্ছা সম্পর্কে যেরূপ সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছিলাম, চলতি বৎসরের কার্য্যকলাপ কিঞ্চিৎ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হওয়ায় ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা বর্ত্তমানে আশান্বিত হইয়াছি। এককথায় বলা যায়, অনুন্নত ও অল্প-উন্নত দেশগুলির পুনর্গঠন ও উন্নয়নের যে সাধু সংকল্প লইয়া আন্তর্জ্জাতিক

ব্যাঙ্কের জন্ম, এতাবৎকাল তাহাকে ইউরোপ ও আমেরিকার বহির্ভাগে প্রযুক্ত হইতে না দিয়া ব্যাঙ্ক সুবিবেচনার পরিচয় দেয় নাই। গত যুদ্ধে এশিয়ার দেশসমূহ, বিশেষভাবে তৎকালীন ব্রিটেনের ঘাঁটি ভারতবর্ষ ইউরোপের কোন দেশ হইতে কম লাঞ্ছনা ও ক্ষতি সহ্য করে নাই। দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে গুরুতর অর্থনৈতিক বৈষম্য রহিয়াছে তাহা দূর করিয়া জন-জীবনকে একটা সমতার স্তরে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে বিশ্বশান্তির আশা বৃথা। ব্যাঙ্কের যাঁহারা কর্ণধার, তাঁহাদের মুখেও এইরূপ বাণী আমরা বহুবার শুনিয়াছি এবং সেই সব ভাবিয়া অবাক হইয়াছি, তবে কি যথারীতি আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কও 'শুভ্র বেষ্টনীর' মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিয়া কেবল কথার মালা গাঁথিয়া এশিয়ার দুর্গত দেশগুলিকে পরিতুষ্ট করার চেষ্টা করা হইবে? যে কারণেই হউক ব্যাঙ্কের এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করিতেছি এবং এই পরিবর্তনের প্রথম প্রমাণ এই বৎসরের গোড়ার দিকে ভারতে 'আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক মিশনের' উপস্থিতি ও ভারতকে তাহার প্রার্থিত ঋণের আংশিক মঞ্জুর করণ। এই মঞ্জুরীর ক্ষেত্রেও অবশ্য ব্যাঙ্ক-মিশন সম্পূর্ণ সমদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই—পারিলে ন্যায্যরূপেই ভারতের প্রার্থিত ঋণ পুরোপুরিই দেওয়া সম্ভব হইত। সেই সঙ্গে ভারত সরকারের তরফ হইতে যাঁহারা মিশন সমীপে ঋণের আবেদন পেশ করিয়াছিলেন ও তৎসপক্ষে যুক্তি ও তথ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কর্তব্য তাঁহারা কতটা পালন করিতে পারিয়াছিলেন তাহাও সন্দেহের বিষয়। সম্প্রতিকালে বিশেষতঃ নেহেরুর আমেরিকা পরিভ্রমণের পর হইতে, ব্যাঙ্কের পরিচালনায় নেতৃবৃন্দের কেহ কেহ ভারতের অনুকূলে অনেক কথা বলিয়াছেন। সুতরাং আশা করা যায়, যুক্তিসঙ্গতভাবে দাবী জানাইতে পারিলে ভারতসরকার ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অগৌণে আরও ঋণ আদায় করিতে সক্ষম হইবেন। টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে ভারতের তরফ হইতে ব্যাঙ্কে দেয় চাঁদার পরিমাণ স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং এই অপ্রত্যাশিত ও অতিরিক্ত ব্যয়ের দিক হইতেও ভারতসরকার তাঁহাদের ঋণের দাবী অধিকতর যুক্তিসহকারে পেশ করিতে পারিবেন।

ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য :

প্রসঙ্গক্রমে আমরা ইতিপূর্বেই আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইঙ্গিত করিয়াছি। এক্ষণে ব্যাঙ্কের চুক্তিপত্রে (Articles of Agreement-এ) বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে :

(১) ব্যাঙ্কের সদস্য দেশগুলিতে মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া এবং তদ্বারা উৎপাদনমূলক কার্যাদি প্রশস্ত করিয়া অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়নে সহায়তা করা ;

(২) ব্যাঙ্কের 'গ্যারান্টি' বা প্রতিশ্রুতিতে বা কার্য্যকরী সহযোগিতায় ব্যক্তিগত বিদেশী মূলধন বিনিয়োগ উৎসাহিত করা ;

(৩) ব্যক্তিগত অর্থাৎ বেসরকারী বিদেশী মূলধন পর্য্যাপ্তরূপে না আসিলে ব্যাঙ্কের নিজ তহবিল হইতে কিংবা ব্যাঙ্কের উদ্যোগে জনসাধারণের মধ্য হইতে ঋণ সংগ্রহ করিয়া তদ্বারা সদস্য দেশগুলির মূলধনের অভাব পূরণ করা ; এবং

(৪) সদস্য-দেশগুলির মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের ধারা প্রসারিত করিয়া তাহাদের পারস্পরিক দেনা-পাওনায় যথাসম্ভব সমতা সৃষ্টিতে উৎসাহ দেওয়া।

মোটামুটি এই চারিটিই ব্যাঙ্কের প্রধান উদ্দেশ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলির বর্ণনায় অত্যাবশ্যক ও জরুরী গঠনমূলক পরিকল্পনার জন্য ঋণ প্রদানের সঙ্কল্পও ঘোষণা করা হইয়াছে। সুতরাং কোন কোন জরুরী ও অত্যাবশ্যক পরিকল্পনা কার্যকরী করার নিমিত্ত ভারত যে ঋণের আবেদন জানাইয়াছিল তাহা বিবেচনার অযোগ্য মনে করার কি হেতু থাকিতে পারে এই প্রশ্নই আমরা ইতিপূর্বে উত্থাপিত করিয়াছি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে, ব্যাঙ্কের উল্লিখিত আদর্শলিপি বা চুক্তিপত্র রচিত হয় ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত ব্রেটন-উড্‌স্ সম্মেলনে। সরকারীভাবে ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্যাঙ্ক কার্য্যারম্ভ করে ১৯৪৬ সালের ২৫শে জুন। ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য্যালয় ওয়াশিংটনে অবস্থিত, উহার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৪৮।

ব্যাঙ্কের মূলধন

ব্যাঙ্কের মোট মূলধনের পরিমাণ প্রায় দশ কোটি ডলার। সদস্য-দেশগুলিকে তাহার সঙ্গতি ও জনসংখ্যার অনুপাতে ব্যাঙ্কের অংশ বা 'শেয়ার' বিক্রী করিয়া তদ্বারা এই মূলধন সংগৃহীত হইয়াছে। বিক্রীত শেয়ারের শতকরা ২০ ভাগ আদায়কৃত। সদস্য দেশগুলিকে এই ২০ ভাগের ২ ভাগ স্বর্ণ কিংবা ডলারে এবং অবশিষ্ট ১৮ ভাগ নিজস্ব মুদ্রায় আদায় দিতে হইয়াছে। দেয় চাঁদার এই ১৮ ভাগ কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট দেশের সম্মতিক্রমেই ঋণস্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। আদায়ীকৃত ২০ ভাগ ছাড়া মূলধনের যে ৮০ ভাগ অনাদায়ী রাখা হইয়াছে তাহা হইতে কোনপ্রকার ঋণদানের নিয়ম নাই, উহা একমাত্র ব্যাঙ্কের নিজ প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

কেবলমাত্র আদায়ীকৃত অর্থই ব্যাঙ্কের একমাত্র সম্বল নহে। টাকা লগ্নীকরণে ইচ্ছুক জনসাধারণের নিকট 'বণ্ড' বিক্রয় করিয়াও ব্যাঙ্ক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। বলাবাহুল্য আমেরিকার জনসাধারণই এই লগ্নীকারকদের অধিকাংশ। ১৯৪৭ সালের জুলাইমাসে আমেরিকার বাজারে ব্যাঙ্কের বণ্ড বিক্রয়ের ঘোষণা সর্বপ্রথম প্রচারিত হয় এবং তাহাতে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায়। শতকরা ২½ সুদযুক্ত ২৫ বৎসরের মেয়াদে পরিশোধযোগ্য ১০ কোটি ডলার মূল্যের বণ্ড ইস্যু করা হয়। ইহা ছাড়া শতকরা ৩ ভাগ সুদযুক্ত ২৫ বৎসরের মেয়াদে পরিশোধ আর একশ্রেণীর বণ্ড ছাড়া হয়—তাহার মোট মূল্য ১৫ কোটি ডলার। এই বণ্ডগুলিকে আমেরিকার লগ্নীকারক জনসাধারণ ব্যাপক ভাবে ক্রয় করিয়াছে। শতকরা ৩ ভাগ সুদের বণ্ডগুলি কিছু

অতিরিক্ত মূল্যেও বিকিকিনি হইতেছে। ব্যাঙ্কের নিরাপত্তা ও সঙ্গতি সম্পর্কে অবশ্যই সংশয়ের কোন কারণ নাই, এবং ব্যাঙ্ক যে সকল সদস্য দেশকে ঋণদান করেন পূর্ব্বাহ্নে তাহাদের ঋণ পরিশোধের যোগ্যতা অর্থাৎ তাহাদের অর্থ-নৈতিক কাঠামো বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখা হয়। সুতরাং এই ব্যাঙ্কে অর্থলগ্নাকরার দিকে জনসাধারণের ঝোঁক বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে অস্বাভাবিক কিছু নাই। বিশেষভাবে আমেরিকার লগ্নীকারকগণ আরও বেশী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন এইজন্য যে, ব্যাঙ্কের কর্ত্তাব্যক্তিগণের মেজরিটিই মার্কিণ।

কোনও পরিকল্পনার জন্য ঋণের আবেদন জানাইলে তৎসম্পর্কে ব্যাঙ্কের নিকট এই কয়টি জ্ঞাতব্য বিষয় পরিষ্কাররূপে উল্লেখ করিতে হয়: (১) প্রস্তাবিত পরিকল্পনার খসড়া (২) পরিকল্পনার কার্য্যকারিতা সম্পর্কে উপযুক্ত প্রমাণ; (৩) পরিকল্পনাটি যে যথার্থই জরুরী তাহার যুক্তিসহ প্রমাণ; (৪) ঋণ প্রার্থনাকারী দেশের নিজের সামর্থ্য ও চেষ্টা চরিত্র সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য প্রদান এবং (৫) ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে উপযুক্ত আশ্বাস। সরকারী কিংবা বেসরকারী উভয়বিধ পরিকল্পনাতেই এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব আবশ্যক।

ব্যাঙ্ক মিশনের অনুসন্ধান কার্য্য সমাপ্ত হইবার পর গত ১৮ই আগষ্ট ভারতকে গভর্ণমেন্ট পরিচালিত রেলপথের পুনর্গঠন ও উন্নতির জন্য ৩ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে।

ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ

আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার উপরই নির্ভরশীল সেকথা বলাবাহুল্য মাত্র। জাতিপুঞ্জের সঙ্ঘবদ্ধতায় ইহার সৃষ্টি ও সংগঠন যতদিন এই সঙ্ঘবদ্ধতা থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত অল্পবিস্তর ইহার সার্থকতা নিশ্চয়ই থাকিবে। বস্তুতঃ দেশ বিদেশের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ়তর করিতে হইলে এবং সাম্য, মৈত্রী ও শান্তির মানব-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে এই ধরণের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। উদার দৃষ্টিভঙ্গী অথচ সতর্কতাপূর্ণ দূরদর্শিতা লইয়া অগ্রসর হইতে পারিলে আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক অর্থ নৈতিক জগতের অশেষ কল্যাণই করিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের অধ্যাপক নিয়োগ হয় কণ্ট্রাক্ট হিসাবে এক এক বৎসরের জন্য, কারণ বোধ হয় এই যে স্থায়ী অধ্যাপক হইলে তোষামোদ করিয়া এক্সটেনসন লওয়ার প্রয়োজন আর থাকিবে না। শ্রীযুক্ত এস এন ভট্টাচার্য্য চতুর্থবারের এক্সটেনসনে আছেন। তিনি সম্প্রতি একটি মামলা শেষ করিবার জন্য পূর্ণ বেতনে সাড়ে তিন মাসের ছুটি চাহিয়াছেন। ছুটির সাধারণ নিয়মে কণ্ট্রাক্ট নিয়োগে ইহা হয় না, এক্সটেনসনে থাকিলেও হয় না। আইন-কলেজ গভর্ণিংবডি পূর্ণবেতনে ইঁহার দেড় মাসের ছুটি মঞ্জুর করিয়াছেন। ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, বিচারপতি গোপেন্দ্রনাথ দাস ও প্রধান সরকারী উকীল শ্রীচন্দ্রশেখর সেন এই প্রস্তাবে আপত্তি করিয়াছিলেন দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। আইন কলেজের অধ্যাপকেরা কোনদিনই বেতনের উপর নির্ভর করিয়া সংসার চালান না, বেতনটা তাঁহাদের উপরি আয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মকর্ত্তাদের স্নেহের দান। তাঁহাদের আদালতে প্রাকটিশের যাহাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে গভর্ণিংবডি চিরদিনই তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াছেন। তাহার উপর যে কলেজের প্রিন্সিপাল সাড়ে তিন বৎসর পূর্ণ বেতনে ছুটি পাইয়াছেন, সেই কলেজের একজন প্রবীণ অধ্যাপকের সাড়ে তিন মাস ছুটিতে আপত্তি করা নিতান্তই অবিচার।

—যুগবাণী

* *

তিন কাঠা দশ ছটাক জায়গা। তাতে নটে, মারিশ, পিড়িং, পালং, পিঁয়াজ, রসুন, করলা, লাউ, কুমড়া, পুঁই, খামআলু, শাঁকআলু লাল আলু, গোল আলু, বরবটি, সিম, সেলেরি, মূলো, টম্যাটো, বাঁধা কপি, মটর, ফুল-কপি, ওল-কপি, লঙ্কা, বেগুন, ধনে, মৌরি, তুলসী, পুদিনা ক্যাড়িনিম (পাতা মসলার কাজ করে, মাদ্রাজীরা খুবই ব্যবহার করে), কলা, সজনে, পেঁপে, আখ, লেবু, ট্যাপিওকা, ঘৃতকুমারী। এ ছাড়া চার রকমের গাঁদা, হেনা ও গোলাপ।

কেউ বলতে পারেন যে, সখ করে কতকগুলি শাক-শব্জীর গাছ একত্র করা হয়েছে। কার্যতঃ গৃহস্থের উপকার হয় না, কারণ, সবগুলিই অত্যন্ত কম। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়; গৃহস্থের সুরাহাই হয়। সিম প্রচুর ফলে আছে, খেয়ে শেষ করে উঠতে পারা যায় না, পালং কেটে নিলে আবার গজায়, দৈনিক প্রত্যেক জিনিষের কিছু কিছু নিলে গৃহস্থের যথেষ্ট হয়ে যায়, আর দরকার হয় না, অথচ আরও প্রচুর থেকে যায়। পাড়াপড়শী, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়ীতেও দেওয়া হয়। সহরের লোক ভাবতে পারেন যে, এটি একটি পল্লীগ্রামে। কারণ, পাড়া গাঁয়ে ইহা সম্ভব। সহরে যদি সম্ভব হতো, তা হ'লে তাঁরাও এরকম করতেন। উপরে যে বিবরণ দেওয়া হ'লো, এটি পাড়াগাঁয়ে নয়, সহরেই। সহরে বাড়ীর উঠানেই এতগুলি গাছ করা সম্ভব হয়েছে এবং তার ফলভোগ করতে পারা যাচ্ছে।

কিন্তু এই সহর গঙ্গাতটবর্ত্তী উর্বর মৃত্তিকাশালী কলিকাতা নগর নয়, কিংবা ভাগীরথীর দুই কুলে যে সু-রসা ও সু-ফলা নগরীগুলি রয়েছে তারা নয়। এই সহর কঠোর মৃত্তিকাধারী দিল্লী। দিল্লীর বুকের ভেতর হতে স্নেহের স্ফূর্ত্ত মূর্ত্তি স্বরূপ এই সকল উদ্ভিদ বেরিয়েছে শাক-সব্জী, তরি-তরকারী, বৃক্ষ লতারূপে। সমস্ত জায়গাটি শ্যাম সুষমা-মণ্ডিত, নয়ন ও মন জুড়িয়ে দেয়, অথচ জিনিসগুলি কত কাজের! আবার এ সৃষ্টি অভ্যস্ত কৃষকের নয়। তারা তো সৃষ্টিকর্ত্তার কাজ করেই। এ সৃষ্টি লেখাপড়া-জানা, বিরল অবসর, ভদ্রলোক কৃষকের (Gentlemen farmer)। বিধান পরিষদের সদস্য শ্রীসতীশ চন্দ্র সামন্ত, শ্রীবসন্ত কুমার দাস ও শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বর্মন মহাশয়গণ অবসর কালে নিজেরা খেটে তাঁদের বাসার সংলগ্ন খোলা জায়গাটিতে এই জিনিসগুলি উৎপন্ন করেছেন। তাঁদের তৈরি জিনিস তাঁরা ভারতের খাদ্য মন্ত্রীকে পর্যন্ত উপহার পাঠিয়েছেন। যাঁদের কিছু জমি আছে—কেরাণী, চাকুরে, ধনী, ব্যবসায়ী ব্যক্তিরা এই কাজ করতে পারেন। এতে শরীর ভাল হবে, মন আনন্দ পাবে, গৃহস্থালীর সুরাহা হবে, এবং খাদ্যকৃচ্ছ্রতা ও তজ্জনিত মূল্যবৃদ্ধির হাত হতে রেহাই পাওয়া যাবে।

বসুন্ধরার বক্ষ হতে শ্যাম শস্য বের করিয়ে তার থেকে যথোপযুক্ত খাদ্য সংগ্রহ করা স্বাধীন ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। বিধান পরিষদের উক্ত তিন বন্ধু নানা অসুবিধার মধ্যেও যে কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিচ্ছেন তাহা আমাদের সকলের অনুকরণীয়।

—সত্যাগ্রহ পত্রিকা

*　　*　　*

বেকার-সমস্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। বাড়িবেই তো। একমাত্র চাকরিই আমাদের লক্ষ্য। কাগজের হকার আমাদের দেশে অবাঙালী—কয়টা বাঙালা এইকাজে আগাইয়া গিয়াছে? আমরা ফুটপাথে বসিয়া মাল বিক্রয় করিতে লজ্জা পাই, মুদীর দোকান করিতে আত্মমর্য্যাদায় বাধে—পানের দোকান করিতে মূলধনের দরকার হয় না, আত্মসম্মানবোধ আমাদের এইসব কাজ হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। চাকরি করিতে আমাদের মর্য্যাদায় বাধে না, মনিবের গাল খাইতে মানের হানি হয় না, যত অসম্মান শ্রম-লব্ধ কাজে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের বদলাইতে হইবে—নহিলে নিজের সঙ্গে জাতিকেও মারিব।　　—সৈনিক

*　　*　　*

গণপরিষদ স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীতরূপে "জন-গণ-মন-অধিনায়ক" সঙ্গীতকে গ্রহণ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা "বন্দে-মাতরম্" সঙ্গীতকেও সম মর্য্যাদা দিয়াছেন। কিন্তু আমরা আশা করিয়াছিলাম, যে মন্ত্রকে অবলম্বন করিয়া জাতি স্বাধীনতার দুর্গম পথে যাত্রা করিয়াছিল, মহান লক্ষ্য প্রাপ্তির স্মরণীয় দিবসে তাহারা সেই পুণ্য মন্ত্রকে গ্রহণ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিবে। তবে, আনন্দের কথা এই যে, স্বাধীনতা লাভের পর বাঙ্গালী উপেক্ষিত হইলেও, 'জন-গণ-মন' সঙ্গীতকে গ্রহণ করায় ইহাই প্রমাণিত হইল যে, স্বাধীনতা সাধনার প্রথম ঋষি বাঙ্গালী।　　—আর্য্য

*　　*　　*

মানভূমের সমস্যা সমাধানের সহজ ও সরল পন্থা রহিয়াছে। বাঙ্গলা দেশকে এই জেলাটি ফিরাইয়া দিলেই আর কোন গোলমাল থাকে না। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ যে ইহা জানেন না তাহাও নহে। কিন্তু বিহার কংগ্রেসের দু'চারি জন নেতার মনস্তুষ্টির জন্যই কোন সুমীমাংসা হইতেছে না। বিহারের অবিসম্বাদী নেতা ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারত রিপাবলিকের প্রথম প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন। প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির ঊর্দ্ধে উঠিয়া সর্ব্বভারতীয় জাতীয়তার দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়া এই ব্যাপারের মীমাংসা করা তাঁহার পক্ষে কঠিন নহে। তিনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর মানভূমে পুনরায় সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইলে তাঁহার সুনামের হানি ঘটিবে। মানভূমকে বাঙ্গলায় ফিরাইয়া দিলে এরূপ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সম্মুখীন তাঁহাকে হইতে হইবে না। পশ্চিমবঙ্গের আয়তন-বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ স্বীকার করিয়াছেন এবং কুচবিহারকে বাংলার সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। মানভূম সম্বন্ধেও এরূপ চিন্তা ঊর্দ্ধতন কংগ্রেস মহলে উদয় হইয়াছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। এ বিষয়ে কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা উচিত হইবে।

— যুগবাণী

*　　*　　*

সংপ্রতি ভারতরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশপালদিগের ভাতা ও সুযোগ সম্বন্ধে ভারত সরকার পুরাতন নির্দ্দেশ বাতিল করিয়া নূতন যে নির্দ্দেশ জারী করিয়াছেন তাহাতে ব্যয় সঙ্কোচের যে অপূর্ব্ব কসরৎ দেখান হইয়াছে তাহা অপূর্ব্ব তো বটেই—অচিন্তনীয়ও বটে।—আগা গোড়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগের চিরন্তন মুন্সীয়ানায় ভরপুর।

এই নির্দ্দেশে দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক প্রদেশপাল সাজ সরঞ্জাম বাবদ ভাতা পাইবেন ১৬০০০ টাকা, মোটর গাড়ী কিনিবার টাকা পাইবেন, বিনা ভাড়ায় সরকারী বাড়ী, বিনা খরচায় রেলের সেলুন, জলযান, বিমান ও মোটর গাড়ী ব্যবহার করিতে পারিবেন এবং ছুটির সময় মাসে ২৭৫০৲ টাকা হিসাবে ভাতা পাইবেন। ইহাকেও যদি ব্যয় সঙ্কোচ না বলা হয় তাহা হইলে ব্যয় সঙ্কোচ কাহাকে বলে?

যে মাদ্রাজের কতকগুলি অংশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে সেখানকার প্রদেশপালের আসবাবপত্র কিনিবার জন্য ৭০,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল মহাশয়ের জন্য সেই উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা হইয়াছে ৮৭,০০০ টাকা; বোম্বাই-এর ১,০৩,০০০ টাকা ইত্যাদি। কিন্তু এই ক'টা সামান্য টাকায় তো কোন ভদ্রলোকেরই চলিতে পারে না। তাই অন্যান্য নানান সাংসারিক খরচ খরচার জন্য পরম দয়ালু ভারত সরকার মাদ্রাজের প্রদেশপালের জন্য বরাদ্দ করিয়াছেন বার্ষিক ৪,৯২,৫০০ টাকা, পশ্চিম বাঙ্গালার জন্য ৩,৭০,৫০০ টাকা; বোম্বাইয়ের

জন্য ৩,৫৫,৮০০ টাকা ইত্যাদি। সেদিন সর্দ্দার প্যাটেল এক সভায় বলিয়াছেন 'কম খরচ কর, প্রাণ ভরিয়া খাটো।' —বিশ্ববার্ত্তা

* * *

কলহবিবাদ না করার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট যতই বিহিত সম্মান পুরঃসর পাকিস্থানকে সবিনয় নিবেদন জানাইতেছেন, পাণ্টা জবাবে পাকিস্থান ততই ঠোক্কর মারিতেছে। পাট আটক করার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট পাকিস্থানের কয়লা বন্ধ করিয়াছিলেন; পাকিস্থান রেলওয়েতে ভারতের মাল ও যাত্রীর যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিয়াছে। যুদ্ধ বিগ্রহ না করিয়া আপোষে সকল বিবাদ মিটাইবার জন্য ভারতের প্রধান মন্ত্রী পাকিস্থানকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন; পাকিস্থান উহা সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়া জানাইয়া দিয়াছে কাশ্মীর জুনাগড় ফেরৎ না দিলে আপোষের কথা উঠিতেই পারে না। ফিরোজ খাঁ নুন বলিয়াছেন, কাশ্মীরের জন্য যুদ্ধ যদি করিতেই হয় পাকিস্থান রাশিয়ার অধীনেও যাইবে তবু ভারতের কাছে মাথা নত করিবে না। পাকিস্থানের এই মনোভাব দেখিয়াও ভারত সরকার কোমলতার নীতি শ্রেয় বলিয়া মনে করিতেছেন কেন বুঝা যাইতেছে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, খোসামোদ করিয়া পাকিস্থানের মন পাওয়া যাইবে না। ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ তোষণ নীতি গ্রহণ করিয়া শুধু উপহাসাস্পদ হইতেছেন। —যুগবাণী

* * *

সর্দ্দার প্যাটেল কলিকাতায় অন্য অনেক কথার মধ্যে একটি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। তাহা হইল কলিকাতার অধিবাসীদের নাগরিক চেতনা সম্পর্কে। ক্যালকাটা ক্লাবে বণিক্ সভার প্রতিনিধিবৃন্দের সমক্ষে বক্তৃতা দিতে গিয়া তিনি সক্ষোভে বলেন, "কলিকাতার জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীন ভারতের নাগরিক-রূপে ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনে কেমন যেন একটা অবহেলা ও ঔদাসীন্যের ভাব চোখে পড়ে। নতুবা মুষ্টিমেয় কতিপয় লোক শত শত লোককে ভীতসন্ত্রস্ত করিয়া তোলে ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়? কয়েকটি তরুণবয়সী উপদ্রবকারী কেমন করিয়া সহরের শান্তি বিঘ্নিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হয়?" সর্দ্দারজী কলিকাতা সহরের একটি মূলগত গলদের প্রতি অভ্রান্তভাবে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কলিকাতাবাসীর পক্ষে ইহা যে বিশেষ সুনামের পরিচায়ক নয় তাহা বলা প্রয়োজন। আশা করি সর্দ্দারজীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত এই স্পষ্ট ভাষণ কলিকাতাবাসীগণকে আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিবে এবং তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপালনের প্রেরণা যোগাইবে। কলিকাতায় যাহারা অশান্তি উপদ্রব জীয়াইয়া রাখিবার অতি গর্হিত নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহারা যে শুধু রাষ্ট্রকেই আঘাত করিতেছে এমন নহে, রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া ব্যক্তিকেও আঘাত করিতেছে। —আর্থিক জগৎ

* * *

সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দ্দার প্যাটেল বলিয়াছেন যে, গান্ধীহত্যা মামলার জন্য মোট ব্যয় হইয়াছে প্রায় ৯ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার উপর। এই মামলায় সরকার পক্ষের প্রধান কৌঁসুলী পাইয়াছেন ৩,৮৮,২৩০ টাকা, তাঁহার দুইজন সহকারী পাইয়াছেন ২,৩৯,৭১৩ টাকা। বিবিধ খাতে ব্যয় হইয়াছে ২৯,৩০০ টাকা, স্পেশ্যাল জজের বেতন বাবদ ২৬,৪৩৭ টাকা, লাল কেল্লা বিচার ভবন নির্ম্মাণের জন্য ১,৫২,২৯০ টাকা এবং কর্ম্মচারীদের বেতন ২৫,০৫৭ টাকা ও পুলিসের জন্য ১,৫২,২৯০ টাকা। —বিশ্ববার্ত্তা

* * *

পশ্চিমবঙ্গের পতিত জমি সমেত অসংস্কৃত পুকুর ও বিল যাহাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দখল করিতে পারেন- তাহার জন্য সরকারকে যাবতীয় ক্ষমতা দিয়া এক বিল পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে উত্থাপিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই প্রস্তাবিত বিল সম্পর্কে জনৈক সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট মন্তব্য করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুত হেমচন্দ্র নস্কর বলিয়াছেন যে, এই বিল অনুমোদিত হইলে পশ্চিমবঙ্গে যে হাজার হাজার পুকুর অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, সরকার সেইগুলি দখল করিয়া উৎসাহী ব্যক্তিগণকে লীজ্ দিতে পারেন এবং ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গে মৎস্যের অভাব যে অনেকাংশে দূর হইবে, এই বিষয়ে তিনি সুনিশ্চয়।

পশ্চিমবঙ্গে কর্ষণোপযোগী জমির পরিমাণ একে অত্যন্ত অল্প, তাহার উপর যদি জমি পতিত থাকে ত' কথাই নাই। পুকুর সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হওয়া বহু পূর্ব্বেই উচিত ছিল। যাহাই হউক, ইহা আশা করা যায়, প্রস্তাবিত বিলটির গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া পরিষদ সদস্যগণ আর অধিক বিলম্ব করিবেন না। —নির্ণয়

* * *

২৪পরগণা জেলার হাবড়া থানার অধীন হাবড়া, কামারথুবা, বনবনিয়া, পুটিয়া কাজলা, চাঁদা প্রভৃতি গ্রামে বহু জমি পতিত অবস্থায় আছে। উল্লিখিত গ্রামগুলির মধ্যে জল সেচের কোন ব্যবস্থা নাই। ইহার ফলে চাষীরা জমি চাষ করিতে পারিতেছে না। চাষীরা স্থানীয় সোসালিষ্ট পার্টির নেতৃত্বাধীনে গ্রামে গ্রামে কিষাণ পঞ্চায়েত গঠন করিয়া এবং সমস্ত পঞ্চায়েত একত্র হইয়া একটি খাল খননের পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পরিদর্শন করিতেছেন। —সংগঠনী

* * *

কুমারী শান্তিলতা দোয়ারা নয়া দিল্লীর লেডী আরউইন গার্লস স্কুলের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ। তিনি সম্প্রতি গোয়া গিয়েছিলেন এবং সেখানে গোয়াবাসীরা বর্ত্তমানে যেভাবে তাদের জীবনযাপন করছে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছেন এবং সেখান থেকে ফিরে এসে একটি প্রবন্ধে তা ব্যক্ত করেছেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার যে ভারতীয় জাতীয়কংগ্রেস জয়পুর অধিবেশনে গোয়া সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তাতে বলা হ'য়েছে যে ভারতের মাটিতে বৈদেশিক অধিকার থাকবে না এবং গোয়াতেও সেই অনুযায়ী স্বাধীন ভারতের

অংশ হিসেবে গণ্য হ'তে হবে। বলাবাহুল্য গোয়ার সমস্যার এখনও কোন সমাধান হয়নি। —সৈনিক

* * *

অধীর মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ বলিয়া পরিচয় দিয়া ত্রিপুরা আগরতলা কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি ছাত্রদের ইংরাজী, বাংলা, গণিত এবং পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রও পড়াইতে সুরু করেন।

কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষের সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকট সঠিক সংবাদ জানিতে চান। রেজিষ্ট্রার জানান যে উল্লিখিত বৎসরের কাগজ পত্রে ঐরূপ কোন নাম নাই, ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় অদৃশ্য হন। পরে দেখা যায় যে, কয়েকজন ছাত্র তাঁহার নিকট বই ও বহু টাকা পাইবে। —বিশ্ববার্ত্তা

* * *

নির্ব্বাচনের প্রস্তুতি না হওয়াই যদি নির্ব্বাচন বন্ধ করিবার নজীর হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে এই নজীর যে অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় নজীর হইয়া দাঁড়াইবে তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। প্রস্তুতির প্রশ্ন বাদ দিয়া পণ্ডিত নেহরু অন্তবর্ত্তীকালীন নির্ব্বাচন প্রস্তাব বাতিল করিবার অনেকগুলি যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন। যুক্তিগুলির যুক্তিবত্তা যতই থাকুক, আমরা তাহার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন নির্ব্বাচন সম্পর্কে জনমত সংগ্রহ করা হইল অথচ পশ্চিমবঙ্গবাসী কিছুই জানিল না, ইহা সত্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার। আট মাস পরেই যেখানে সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে, সেখানে অন্তর্ব্বর্ত্তী নির্ব্বাচন হওয়া উচিত কি না, তাহা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু পণ্ডিত নেহেরু যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, তাহাতে ভারতীয় গণতন্ত্র সম্বন্ধে এবং নিয়মতান্ত্রিক বিধান সম্পর্কে জনসাধারণের মনে গভীর সন্দেহের সৃষ্টি হইবে, একথা তাঁহার বিবেচনা করা উচিত ছিল। তাঁহার এই সকল যুক্তি হইতে এই লোকের মনে জাগিতে পারে যে, আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনও কি এইরূপ যুক্তিতেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে? গণতন্ত্র ব্যয়বহুল একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য। —দৈনিক বসুমতী

* * *

মহীশূর গবর্ণমেণ্ট কেমন পল্লীগঠনে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, শুধু কমিটি, কনফারেন্স ও পরিকল্পনা নহে, যাহাতে গ্রামে গ্রামে বাস্তবিক গঠনাত্মক কাজ হয় সে জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছেন সম্প্রতি সে-সম্বন্ধে একটি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আরশংগুডি বাঙ্গালোর সহর হইতে ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহার জনসংখ্যা মাত্র চারিশত। গ্রামের কতকগুলি লোক নিজেরাই গ্রামসংগঠন কার্য্যে উদ্যোগী হইয়া একটি ছোট কমিটি গঠন করে, তাহাতে প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয়। তাহারা নিজেরাই সেচ্ছায় নিয়ম করে যে, গ্রামের প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তি সপ্তাহে একদিন গ্রামের জন্য বিনা বেতনে খাটিয়া দিবে। গ্রামের রাস্তা, ঘাট, খাল, পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতির সংস্কার করিয়া তাহারা দুই মাসের মধ্যেই সমস্ত গ্রামের চেহারা বদলাইয়া দিয়াছে। —সারথি

* * *

স্বাধীন ভারতই যে শান্তি-সম্মেলনের যোগ্য স্থান তাহাতে সন্দেহ নাই।...

পৃথিবীর ৩১টি দেশ হইতে ৮৩ জন শান্তিবাদী এই সম্মেলনে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন।...সোভিয়েট রুশিয়ার কোন শান্তিবাদী এই সম্মেলনে উপস্থিত নাই।...লোকলোচনের বহির্ভূত অবস্থায় রুদ্ধদ্বার কক্ষে এই সম্মেলনের অধিবেশন হইল। এমন কি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণেরও এই অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য হইল না। শান্তি-সম্মেলনের অধিবেশন রুদ্ধদ্বার কক্ষে হওয়ার তাৎপর্য্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না।

আজ সমগ্র পৃথিবী দুইটি শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। একদিকে ধনতন্ত্রবাদী গণতন্ত্র, আর একদিকে কম্যুনিজম।...সত্য ও অহিংসার আদর্শ অত্যন্ত উচ্চ ও মহৎ সন্দেহ নাই। কিন্তু সত্য ও অহিংসা দ্বারা শান্তি স্থাপন করা সম্ভব বলিয়া আজও প্রমাণিত হয় নাই। শান্তিবাদীরা যদি সত্য ও অহিংসার পথে পরাধীন দেশগুলিকে স্বাধীনতা দান করিতে পারেন, বর্ণ বৈষম্য যদি তাঁহারা দূর করিতে সমর্থ হন, এক শ্রেণী কর্ত্তৃক আর এক শ্রেণীর শোষণ বন্ধ করিতে পারেন, তাহা হইলেই যুদ্ধাশঙ্কা দূর হইয়া পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হইবে। —দৈনিক বসুমতী

* * *

পশ্চিমবঙ্গের অশান্তির অন্যতম কারণ উদ্বাস্তু সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গের অর্থ-নৈতিক সমস্যাকে উহা জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে তাহাদের স্থানাভাবের কারণ এ প্রদেশবাসীর হৃদয়হীনতা নয়, পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ আর্থিক অবস্থাই উহার একমাত্র কারণ! আত্মরক্ষার জন্য আপনার গৃহ পরিজন ত্যাগ করিয়া আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গবাসী দেখিয়াছে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের কঠোরতা। সরকার তাহাদের আর্থিক সাহায্য করিয়াও বুঝিতে পারিয়াছেন, এ সমস্যাকে সফল করিয়া তুলিতে পারা যায় না। তাই সর্দ্দারজীর ভাষায় তাহারা কেবল কাঁদিয়াছে! কিন্তু সে ক্রন্দন যে বৃথা যায় নাই, সে ক্রন্দন যে পরাজিতের ক্রন্দন নয়, তাহা পূর্ব পাকিস্তান বিভাগের দাবীতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সর্দ্দারজী ময়দানের সভায় নিশ্চয় উক্ত দাবীর ভিত্তিতে লিখিত প্রচারপত্র দেখিয়াছেন। যে ক্ষীণ কণ্ঠ একদিন পাকিস্তানের নিকট শান্তি, আশ্রয় এবং রক্ষণাবেক্ষণের অনুরোধ জানাইয়া পাইয়াছে কেবল অত্যাচার, আজ সেই ক্ষীণ কণ্ঠ ভারত সমুদ্রের উত্তাল জলরাশিকে লঙ্ঘন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে বিশ্বের দরবারে তাহাদের ন্যায্য দাবী জানাইতে। সর্দ্দারজী বলিয়াছেন, আমরা তাহাদের কথা বিস্মৃত হইতে পারিব না। কিন্তু মৌখিক সহানুভূতি এক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি

না। আফ্রিকা, সিংহল প্রভৃতি স্থানের প্রবাসী ভারতীয়দের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জাতীয় কংগ্রেস যদি সচেষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আপনার ঘরে যাহারা আজ বিদেশী হইয়াছে তাহাদের জন্য কি কিছুই করা যায় না? আজ পশ্চিমবঙ্গকে যদি বাঁচিতে হয় তবে বাস্তত্যাগীদের জন্য বাসস্থান খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে, তবে সে কোথায়? পূর্ব্ব পাকিস্থানে না, পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রের মধ্যে হিন্দুস্থানে, তাহাই সর্দ্দারজী ভাবিয়া দেখিবেন ইহাই আমাদের অনুরোধ! ভারতের মানচিত্রকে পরিবর্ত্তন করিবার আহ্বান কি তিনি মহানগরী কলিকাতায় পাইয়াছিলেন? —আর্য্য, বর্দ্ধমান

* * *

সম্প্রতি মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, স্বাধীনতা লাভের পর যে দুইটি বৎসর অতীত হইল, ইহাতে জনসাধারণের অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতিই হয় নাই। স্বাধীনতা অর্জ্জনের সময় তাহারা অনেক আশার স্বপ্নই দেখিয়াছিল। কিন্তু ইহার আলোক এখনও তাহাদের নিকট পৌছায় নাই।

মন্ত্রী মহাশয় খাঁটি সত্য কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি এটা দেখাইয়া দেন নাই যে স্বাধীনতার আশীর্ব্বাদ জনসাধারণকে পৌছাইয়া দিবার ক্ষমতা কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের হস্তেই ছিল—কিন্তু কার্য্যতঃ কয়েকজন কংগ্রেস নেতা ও কর্ম্মী স্বাধীনতার সৌভাগ্য লাভ করিলেন—বাকী সকলেই তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে।

বাংলা দেশের দৃষ্টান্ত দিয়াই বলি, বাংলা গভর্ণমেণ্ট যদি ইউনিয়ন বোর্ডগুলি উঠাইয়া দিতেন, চৌকীদারী টেক্স হইতে জনসাধারণকে মুক্তি দিতেন, গ্রামের লোককে নিজেদের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার অধিকার দিতেন—তাহা হইলে এক মুহূর্ত্তেই জনসাধারণ উপলব্ধি করিত যে সত্যই তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এবং দেশ স্বাধীন হইয়াছে এবং এটা করা মোটেই অসম্ভব ছিল না। কারণ গ্রামের লোক স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা গ্রামের শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিলে এত চৌকীদার রাখার প্রয়োজন হইবে না এবং গভর্ণমেণ্টের পুলিশকে সাহায্য করিবার জন্য যত চৌকীদার রাখা একান্ত আবশ্যক হইবে গভর্ণমেণ্টই তাহাদের বেতন দিবেন—সেজন্য অন্যান্য নানা বিভাগের অপ্রয়োজনীয় খরচ কমাইয়া দিবেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি একটু অসুবিধা প্রথমে হইলেও ইহা আদৌ অসম্ভব নহে এবং ইহা করিলে গ্রামের লোকের মধ্যে স্বাধীনতার আস্বাদের সহিত যে নূতন জীবনীশক্তির সঞ্চার হইবে তাহাতে গ্রামের মধ্যে সকল প্রকার গঠনমূলক কার্য্য করা সম্ভব হইবে, দেশের নিদারুণ খাদ্য সমস্যারও সমাধান হইবে।

—সারথি

* * *

আমাদের কেন্দ্রীয় পরিষদের বিশেষ উৎসাহী সদস্য শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথ মহাশয় সেদিন বিধান পরিষদে এই অনুরোধ করেন যে, প্রারম্ভে ভগবানের আবাহনপূর্ব্বক ভারত রাষ্ট্রের বিধানতন্ত্রের মুখবন্ধ রচিত হওয়া উচিত। এই প্রস্তাবটির মধ্যে বিদ্রূপ বা লজ্জার ব্যাপার কিছু ছিল বলিয়া মনে হয় না। কামাথ মহাশয়ের দ্বারা উত্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াই প্রস্তাবটি বিনা বিচারে সভা প্রত্যাখ্যাত হইল কি না ইহাই ভাবিতেছি। আলোচনার বিষয় যাহাই হউক না কেন, মৌন হইয়া কোন সময়েই থাকিবেন না এই অভ্যাসবশে কামাথ মহাশয় বোধ হয় অপর সঙ্গী-সদস্যদের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছেন তাই তাঁহার অনুরোধের এই অনাদর। অথবা আজ আণবিক গবেষণার যুগে ঈশ্বরের চেয়েও শক্তিশালী দেবতা হইল অণু বা এটম। তাই কি আমাদের বিধানতন্ত্র রচয়িতারা ঈশ্বরের নাম না লইয়া, মেরী করেলীর 'মাইটী এটম' গল্পের নায়কের মত মহাশক্তিমান এটমের নামেই আমাদের বিধানতন্ত্রের উদ্বোধন করিতে চান? —হরিজন পত্রিকা

* * *

বিরহের মাঝে মিলন তোমার

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

কোন অতীতের একখানি স্মৃতি আজিকে আসিছে মনে,
বাতাসের বুকে নিশিগন্ধার সলাজ সুরভি সম;
বিস্মৃতি-নীরে স্মৃতি-শতদল ফুটিল সংগোপনে,
বন্ধু আমার জীবনের পথে সবচেয়ে প্রিয়তম।
বন্ধু তোমার প্রীতির পরশে মনের আঙিনা আলো,
আলো ঝলমল জ্যোৎস্নাধবল শারদীয়া মধুরাতি;
তুমি এসেছিলে জীবনে আমার তাই বুঝি লাগে ভালো,
শ্যামল পৃথিবী, নীলিমার বুকে উজল তারকা ভাতি।

প্রভাতী আলোয়, কুসুম-সুবাসে, শুক্লা-রজনী-মাঝে,
দূর-বাঁশরীর-হৃদয়-ভুলানো-উদাসী সুরের তানে,
মনে প'ড়ে যায় ছবিখানি তব শত নিমেষের কাজে,
অস্ত-আকাশে বিদায়ী রবির পুরবী সুরের তানে।
জীবনেরে ঘিরি তুমি শুধু রাজো কেহ আর কোথা নাই,
বন্ধু আমার স্মরণ তোমার বিরহের ধূপছায়া;
আকাশে, বাতাসে, মানস-নয়নে তোমারে খুঁজিয়া পাই,
বিরহের মাঝে মিলন তোমার মিলনের মাঝে মায়া।

—সাত—

পুরোনো সাইকেলটায় চড়ে ক্রু সাহেব যখন জমিদার বাড়িতে পৌছুল, তখন সেখানে একটা হৈ চৈ চলছিল। পুলিস এসে পৌছেচে। জটাধর সিংয়ের লাশটার পাশেই বসেছেন দারোগা। কনস্টেবল দুজন এমন ভঙ্গিতে লাঠি হাতে দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে যে আচমকা দেখলে কেমন খট্‌কা লাগে। মাথার লাল পাগড়ি দুটো উঁচু হয়ে আছে একজোড়া গিন্নী শকুনের গলার মতো। আর খাকি ইউনিফর্মের সঙ্গে একজোড়া গোঁফ, রক্তাভ চোখ, আর সতর্ক বসবার ভঙ্গি দেখে মনে হয় যেন দারোগা একটা ম্যান-ইটারের মতো 'মড়ি' আগলাচ্ছেন।

মড়াটার কাছ থেকে একটা ভদ্ররকম দূরত্ব বাঁচিয়ে কুমার ভৈরবনারায়ণ। রক্তাক্ত শিরায় আকীর্ণ মোটা নাকটাকে ঘৃণাভরে কুঞ্চিত করে আছেন। একটা হায়না যেন ঊর্ধ্বমুখে বাতাস শুঁকছে—বাঘটা সরে গেলেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে নিহত শিকারের দেহটা।

ডাক্তার পান্নালাল মণ্ডল, এল, এম্, এফ্—ব্র্যাকেটে 'পি', দাঁড়িয়ে আছেন থতমত ভঙ্গিতে। তার কারণ আছে। নিজের বিদ্যের পরিচয় জাহির করতে গিয়ে বলছিলেন, গ্রিভিয়াস হার্ট, স্কাল্ ফ্রাকচার হয়ে ব্রেইনে—কিন্তু কষে তাঁকে এক ধমক লাগিয়েছেন তারণ তলাপাত্র।

—থামুন মশাই, আর ওস্তাদী ফলাবেন না। আছেন ভেটিরিনারী সার্জন, তাই থাকুন। নাক গলাতে যাবেন না পুলিশের ব্যাপারে।

—ভেটিরিনারী সার্জন।—সবাই মনে করেছেন একটা চমৎকার রসিকতা, হো হো করে হেসে উঠেছেন স্বয়ং কুমার ভৈরবনারায়ণ পর্যন্ত। কিন্তু হাসতে পারেননি পান্নালাল নিজে। গত সপ্তাহে দারোগাকে তিন পুরিয়া সিডিলিক পাউডার দিয়ে দুটাকা দাম নিয়েছিলেন, তারই শোধ তুলছেন তারণ তলাপাত্র।

পোস্ট-মাস্টার বিভুপদ হাজরা ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন ভৈরবনারায়ণের পেছনে। তুরীদের পঞ্চায়েতের প্রসঙ্গ তুলে ধমক খেয়েছিলেন কুমার বাহাদুরের কাছে, সুযোগ-সুবিধে পেলেই তার প্রায়শ্চিত্ত করবেন। আর একটু দূরেই কাছারীর সিঁড়ির ওপর নিঃসঙ্গ রঞ্জন বসে আছে দার্শনিকের মতো। তার মনটা এইমাত্র পরিক্রমা করে এসেছে একটা আদিগন্ত মাঠ; সেখানে টিলার ওপর আহীরদের বস্তি নিমগাছের ছায়া, যমুনা আহীরের অগ্নিগর্ভ চোখ আর—আর ঝুমরী। নাগিনা? না—ঠিক বলা হলনা। নতুন ইন্দ্রপ্রস্থের নতুন পাঞ্চালী। দাবদগ্ধ 'বরিন্দে'র মাঠে ছড়িয়ে গেছে তার ক্রোধদাহ—জটাধর সিং আগামী কুরু-প্রান্তরের প্রথম বলি।

দারোগা বাইবেলের সলোমনের মতো ডান হাতখানা সামনে বাড়িয়ে দিলেন। হাতে অবশ্য ন্যায়দণ্ড নেই, আছে একটা কপিং পেন্সিল। সেইটে দিয়ে সরেজমিন তদন্তের রিপোর্ট লিখছেন, অন্যমনস্কভাবে সামনের দুটো দাঁতও খুঁটেছেন এক টুকরো আলুর খোসার সন্ধানে। তারপর বিরক্ত ভাবে যখন মুখ খিঁচোলেন, তখন একটা বেগুনী দন্তরুচি বিচিত্রভাবে প্রকট হয়ে পড়ল।

পঞ্চবার তারণ তলাপাত্র জানতে চাইলেন, তা হলে খুনটা করল কে?

ভেটিরিনারী সার্জন ওত পেতেই যেন প্রতীক্ষা করছিলেন। খপ্ করে বলে বসলেন, সেটা জানবার জন্যেই তো আপনাকে ডেকে আনা হয়েছে মশাই।

দারোগা চোখ পাকিয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় অকুস্থলে ঢুকলেন ক্রু সাহেব।

টু প্লাস্ টু—ইকোয়্যাল্ টু ফোর। স্যুট এবং সাইকেল—ইকোয়্যাল্ টু—ডি-এস্-পি—টি-এস্-পি নয় তো? দারোগা তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন চাপ সরে যাওয়া স্প্রীংয়ের মতো। কনস্টেবলদের জুতোয় খটাস্ করে আওয়াজ উঠল প্যারেডের 'অ্যাটেন-শনের' ভঙ্গিতে।

কোঁচকানো নাকটাকে প্রসন্ন হাসিতে বিস্তৃত করে দিয়ে ভৈরবনারায়ণ বললেন, ঘাবড়াবেন না, ক্রু সাহেব।

—ক্রু সাহেব? সে আবার কে?—দারোগার স্বর শঙ্কিত: কোনো অফিসার-টফিসার নয় তো?

—না, না, সে সব কিছু না, বাজে লোক—বিভুপদ ভৈরবনারায়ণের বক্তব্যটা ব্যাখ্যা করে দিলেন।

—আঃ, বাজে লোক!—সলোমোন আবার সিংহাসন গ্রহণ করলেন। নিজের বোকামির প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্তই যেন কটমট করে তাকিয়ে রইলেন ক্রু সাহেবের দিকে।

দেউড়ির পাশে সাইকেলটাকে নামিয়ে রেখে তখন স্মাইদ্‌ ক্যারু কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। একবার বিহ্বল চোখে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করল।

ভৈরবনারায়ণ ডাকলেন, এসো সাহেব, এসো—

ক্রু বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল: এসব কী কাণ্ড?

ভৈরবনারায়ণ বললেন, খুন। আমার পাইক জটাধর সিং খুন হয়েছে।

—খুন।—ক্রু সাহেবের পা থেকে মাথা পর্যন্ত থর থর করে কেঁপে উঠল একবার, বিবর্ণ হয়ে গেল সমস্ত মুখ। ঘোলাটে বিহ্বল দৃষ্টিতে ক্রু সাহেব তাকিয়ে রইল কাপড়ে ঢাকা লাশটার দিকে। মুহূর্তের জন্তে চোখের সামনে সব কিছু চলন্ত ইঞ্জিনের চাকার মতো পাক খেলো একটা। তারপর আস্তে আস্তে ঘরবাড়িগুলো স্বাভাবিক হয়ে যখন যথাস্থানে ফিরে এল, তখন:

জলে ধুয়ে যাওয়া একটা ছবি। কাঁদড়ের কাদার তলে সবটা চলে গিয়েছিল, শুধু একজোড়া পা কিছুতেই ঢাকা পড়েনি। অনেক কাদা আর মাটির চাঙাড় চাপাতে হয়েছিল তার ওপর। তারপর—

—বোসো, বোসো সাহেব। অমন করে দাঁড়িয়ে কেন?

সারা শরীরে মস্ত একটা ঝাঁকুনি দিয়ে যেন চৈতন্ত ফিরে এল। ও কিছু না। কাঁদড়ের কাদার তলায় একটা বাদামী কঙ্কাল ছাড়া কিছু আর পাওয়া যাবেনা এখন। তাও কি কোনো বর্ষার উচ্ছ্বাস এতদিনে টেনে নিয়ে যায়নি মহানন্দার গর্ভে, মহানন্দা থেকে মহাসমুদ্রের অতল লুপ্তিতে?

ক্রু সাহেব বসে পড়ল। কোথায় বসল জানেনা। ঠিক পেছনে একটা চেয়ার না থাকলে হয়তো ধরাশায়ী হতে হত তাকে।

স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে একটা সিগারেট ধরালেন দারোগা। তাকালেন ভৈরবনারায়ণের দিকে।

—ইনি কে?

—ক্রু সাহেব। এঁর বাপের রেশমের কুঠি ছিল। এখন আর ব্যবসা নেই—তালুকদারী করেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি বটে নামটা—দারোগা একটা মুখভঙ্গি করিলেন। ক্রু সাহেব বসে রইল চুপ করে।

আরো দেড় ঘণ্টা ধরে নানা প্রশ্ন করবার পরে দারোগা উঠলেন। কাপ তিনেক চা, রাশীকৃত খাবার, আর তিনটে ডাব খাওয়ার প্রসন্ন পরিতৃপ্তিতে ঢেঁকুর তুলে বললেন, হুঁ, সোজা কেস্‌। ওই আহীরগুলোরই কাণ্ড। কয়েকটাকে ধরে থানায় নিয়ে গেলেই পেটের কথা বেরিয়ে পড়বে।

—আপনার ওদের ঠিক চেনা নেই—খোঁচা দেবার লোভটা সামলাতে পারলেন না পান্নালাল।

—বারো বচ্ছর ক্রিমিন্তাল ঘেঁটে তবে এস্‌-আই হয়েছি মশাই, গোরু-ঘোড়া ইঞ্জেকৃশন দিয়ে নয়।—পালটা জবাব দিলেন তারণ: কোনো চিন্তামণিকে চিনতে আমার বাকী নেই। বসে বসে দাদের মলম তৈরী করুন, আমার জন্ত মাথা ঘামাবেন না।

দারোগা বিদায় নিলেন।

মর্মান্তিক অপমানে গর্জাতে গর্জাতে উঠে পড়লেন পান্নালাল। আচ্ছা, আচ্ছা, এক মাঘে শীত যাবে না। অসুখ-বিসুখের সময় একবার ডেকে পাঠালে হয়। এমন ওষুধ প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন করবেন যে আজীবন তা মনে থাকবে দারোগার।

বিভুপদকেও উঠতে হল—তাঁর ডাক খোলবার সময় হয়েছে। তারও পরে চৌকীদারেরা এসে যখন লাশটাকে সহরে নিয়ে যাওয়ার জন্তে বার করে নিয়ে গেল, তখন আপনা থেকেই ভিড়টা পাত্‌লা হয়ে গেল। ভৈরবনারায়ণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, ক্রু সাহেব একবার নড়ে চড়ে বসল, আর রঞ্জন কাছারীর সিঁড়িতে বসে দার্শনিকের নিরাসক্তি নিয়ে একটার পর একটা লবঙ্গ চিবিয়ে চলল।

—তারপর, কী মনে করে ক্রু সাহেব?—ভৈরবনারায়ণ কী একটা ভাবছিলেন। সেই চিন্তার রেশ টেনে, কপালে গোটাকয়েক ভ্রূকুটি জাগিয়ে রেখেই জানতে চাইলেন ভৈরবনারায়ণ।

—নাঃ, কিছু না।—যা বলতে এসেছিল, বলতে পারল না স্মাইদ্ ক্যাক্‌। ওই লাশটা দেখবার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু বিপর্যয় হয়ে গেছে মনের মধ্যে। অ্যাল্‌ব্যার্টের ভয় নেই, সম্মানের ভয় নেই, মার্থার ভয়ও নেই। সব ভয় হারিয়ে গেছে একটা সীমাহীন ভয়ের অতলতায়। কাঁদড়ের কাদার তলা থেকে দুটো পা। বাকী শরীরটাকে দেখা যাচ্ছে না—শুধু মৃত্যু যন্ত্রণায় কুঞ্চিত একরাশ হুকের মতো বাঁকা বাঁকা আঙুলগুলি কী বীভৎস, কী ভয়ঙ্কর দেখতে!

অনেক 'রাজবদুদ্ধত' বর্ষার দিন ঘন নীল মেঘের কজ্জলিত ছায়া ফেলেছে লাল মাটির শিলীভূত রক্ত-সমুদ্রে। মাটি কেটে কেটে বয়ে গেছে খর-খড়্গের মতো ধারালো জলপ্রবাহ। শুধু মাটিই কাটেনি, মাটির অনেক পঞ্জরাস্থিকে। আর একটা মাত্র মানুষের কঙ্কাল! বাদামী রঙের কয়েক টুকরো হাতে আজো কি কোনো স্মারক অবশিষ্ট আছে তার?

—এমনিই দেখা শোনা করতে এসেছিলে তাহলে?—আর একটি অর্ধমনস্ক প্রশ্ন ভৈরবনারায়ণের।

—অনেকটা তাই।—একটা ঢোঁক গিলল ক্রু সাহেব।

—কোনো অসুবিধা হচ্ছে না?

—নাঃ।

—তোমার প্রজা-পত্তন ঠিক আছে সব?

—এখনো আছে বলেই তো মনে হয়—সহজ হবার চেষ্টা করতে লাগল ক্রু সাহেব।

—এখনো আছে বটে। কিন্তু বেশি দিন থাকবে তো?—আত্ম-জিজ্ঞাসার মতো করেই প্রশ্নটা নিক্ষেপ করলেন ভৈরবনারায়ণ।

—কেন বলছেন একথা?

—সাধে কি আর বলছি!—ভৈরবনারায়ণের গোরুর মতো প্রকাণ্ড মুখে যুদ্ধে আহত ষাঁড়ের মতো একটা বীভৎস কাতরতা ফুটে বেরুল: চারদিকে আগুন জলবার জো হয়েছে সাহেব। এইবেলা ঘর সামলাও, নইলে পরে আর সময় পাবে না।

—আপনারা যখন আছেন, তখন আমাদের আর ভাবনা কী!—ক্রু সাহেবের গলায় একটা চাটুকারিতার আমেজ ফুটে বেরুল: তা ছাড়া বড় গাছেই ঝড় লাগে। আমরা চুনোপুঁটি, আমাদের ঘাবড়াবার কিছু নেই।

—তাই কি?—ভৈরবনারায়ণ হঠাৎ যেন অতিরিক্ত সচেতন হয়ে উঠলেন। একবার আড়চোখে রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, লবঙ্গ-মুখে সে তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন।

—আপনার কি মনে হয়?—ক্রু সাহেব জানতে চাইল।

—মনে হয়, সময়টা পাল্‌টে গেছে। আজকাল আর বড় দিয়ে আরম্ভ হয়না। কচু গাছ দিয়ে লোক হাত পাকাতে সুরু করে, তারপর কুড়ুল বসাতে আসে শাল-গাছের গায়ে।

—ঠিক বুঝলাম না কথাটা।

—আরো কি স্পষ্ট করে বলতে হবে?—আবার রঞ্জনের দিকে আড়চোখে তাকালেন ভৈরবনারায়ণ: আজ জটাধর সিংয়ের মাথায় চোট পড়েছে। কিন্তু ওটা শুধু আরম্ভ—ওর লক্ষ্য আমার মাথা পর্যন্ত।

—এসব কথা কেন আপনি ভাবছেন?—ক্রু সাহেব কুমার বাহাদুরকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল: জমিদারের পাইক-পেয়াদা কখনো কি খুন হয়নি?

—হয়েছে বই কি। কিন্তু আজকের ব্যাপার তা নয়। আজকাল তুরীদের পঞ্চায়েৎ বসছে কালাপুথরীতে। জয়গড় মহলের প্রজারা বড় বেশি চড়া চড়া কথা বলতে শুরু করেছে।

—আপনি কি ভয় পাচ্ছেন?

—ভয়?—আহত ষাঁড়ের মুখে ক্ষুধার্ত সিংহের হিংস্রতা ফুটে বেরুল: আমার পূর্বপুরুষ দিনাজপুরের মহারাজার পক্ষ নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল কান্তনগরের যুদ্ধে। ভয় আমাদের রক্তে নেই। লাঠির জোরে আমাদের জমিদারী, লাঠির জোরেই তা রাখব। তবে ঘর শত্রু বিভীষণ যদি কেউ থাকে, তার ব্যবস্থাটা করতে হবে সকলের আগে।

গলাটা একটু চড়িয়েই শেষ কথাগুলো বললেন কুমারসাহেব, স্পষ্ট শুনতে পেল রঞ্জন। দুটো দাঁতের পাটির মধ্যে হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়ালো লবঙ্গটা।

ক্রু-সাহেব বিচলিত হয়ে বললে, আপনার কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছিনা।

—বুঝবে পরে। এখন একটা কথা মনে রেখো।

একটু একটু করে যারা কাজ শুরু করেছে, তারা ছোটদের দিকেই আগে নজর দেবে। হয়তো আমার আগেই এসে পড়বে তোমার পালা।

—ভেবে দেখব—ক্রু-সাহেব উঠে পড়ল।

—চললে ?

—হ্যাঁ, একটু কাজ আছে। কাল পরশু আসব।

অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল ক্রু-সাহেব। ক্লান্ত শিথিল ভঙ্গিতে তুলে নিলে পড়ে থাকা সাইকেলটা। না, অ্যালবার্টের কথা সে ভাবছে না। জটাধর সিংয়ের মৃত্যু যে ঝড়ের পূর্বাভাষ বয়ে এনেছে তার কথাও না। শুধু সেই জলে-ধুয়ে যাওয়া ছবিটা। বাদামী হাড়গুলোকে এখনো কি কেটে কেটে নিঃশেষ করতে পারেনি সময়ের ঘুণেরা ?

—ঠাকুর বাবু ?

রঞ্জন চমকে উঠল। কুমার বাহাদুর ডাকছেন।

—মনটা ভারী চঞ্চল হয়ে রয়েছে। চলুন, একটু পড়বেন।

আশ্চর্য কোমল গলার স্বর। প্রীতি আর দাক্ষিণ্যে স্নিগ্ধ। অপূর্ব অভিনয় করতে পারবেন কুমার বাহাদুর। অমায়িক করুণায় মধুর হাসি হাসতে পারেন ছুরিতে শান দিতে দিতে ?

—গীতা ?—নিজের গলার স্বরে বিস্ময়ের চমকটা সে চেষ্টা করেও রোধ করতে পারল না।

—হাঁ, বিশ্বরূপ-দর্শন যোগ। কী যেন সেইঃ 'পশ্যামিদেবস্তবদেবদেহে'—

—চলুন—

অনুগত বিনয়ে উঠে দাঁড়ালো রঞ্জন।

*　　*　　*　　*

সন্ধ্যা।

গীতাপাঠ শেষ হয়ে গেছে। বিশ্বরূপ-দর্শন যোগের ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে কখন আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন কুমার বাহাদুর। দুজন চাকর এসে প্রাণপণে দলাই-মলাই শুরু করেছে তাঁর হাত-পা। আর সেই ফাঁকে গীতা নামিয়ে রেখে উঠে পড়েছে রঞ্জন।

বাস্তবিক, অনেক যোগ্যতা থাকলে তবে মানুষে রাজা-রাজড়া হয়।

তা ছাড়া আর কী! এই যে দুটি চাকর পরমোৎসাহে কুমার বাহাদুরের গাত্র মর্দন আরম্ভ করেছে, এ বরদাস্ত করা সহজ মানুষের কাজ নয়। ওই দুটি ষণ্ডা লোকের এক-আধটা ডলুনি খেলেই সাতদিনে রঞ্জনের গায়ের ব্যথা সারত কিনা সন্দেহ। কিন্তু অলৌকিক শক্তি রাখেন কুমার বাহাদুর। আরামে তাঁর শরীরে ঘুমের ঘোর ঘনিয়ে আসে।

'তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি!'

বর্ণে বর্ণে এমন সত্য এর আগে আর উপলব্ধি হয়নি কোনোদিন। আর এই শক্তির জোরেই এরা এতকাল সমুদ্রের পর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসেছে—পাল উড়িয়ে এসেছে ঝড়ের ভেতর দিয়ে। অনেক বড় তুফান না তুলতে পারলে এদের ভরাডুবি অসম্ভব।

ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরে এসে রঞ্জন দেখল টেবিলের ওপর একটা চিঠি। মিতার চিঠি। ভালোবাসার সেই প্রথম পর্বের মতো আজ আর নীল খামে চিঠি লেখেনা মিতা। পৃথিবীর মাটিটা বড় বেশি ধুলোয় ভরে গেছে, তাই আকাশের নীল আর চোখে পড়বার উপায় নেই। সেই নীলকে আবার খুঁজে পাবার জন্যেই তো এই ধুলোর ঝড়ের মধ্য দিয়ে পথ চলা; শান্তি আর পরিতৃপ্তির শয্যাতে আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখবার জন্যেই তো আজকের এই বিষ-বিহ্বল জড়তা-ভঙ্গের দাবী।

নীল খাম নেই, তবু ছেলেমানুষি অভ্যাসটা আজো যায়নি মিতার। সেই কোণাকুণি করে ঠিকানা লেখবার একটা বিচিত্র ভঙ্গি। কৈশোরের স্বপ্নসঙ্গিনী সংঘমিত্রা—মিতা। আজ সে মিতাই বটে। তার এই কর্মক্ষেত্রের নতুন উদ্দীপনা।

চিঠিটা খুলল। বাড়িয়ে দিলে লণ্ঠনের আলোটা।

"শোনো। প্রথমেই কাজের খবর দিই।

মুকুলদা, তোমার চিঠি পেয়েছেন। বললেন, ওয়ার্কার এখনো এত কম যে ওখানে যাবার তেমন সুবিধেমতো কাউকে পাঠাতে পারছেন না। তোমাকে ওখান থেকেই যতদূর সম্ভব তৈরী করে নিতে হবে। তবে আসছে সপ্তাহের মধ্যে হয়তো দাদাকে একবার পাঠাতে পারে। দাদা গেলে কাজেরও সুবিধে হবে, তুমিও খুশি হবে

নিশ্চয়। এ সম্বন্ধে পার্টিকুলারস্‌ উনি পরে তোমায় জানাবেন। তোমার সমিতির জন্য বইপত্রও দাদার সঙ্গে যাবে।

এবার তোমাকে আর একটা ইণ্টারেস্টিং খবর দিই।

সেদিন সুতপাদি এসেছিলেন।

সুতপাদিকে নিশ্চয় ভোলোনি। আর ভোলবার কথাও তো নয়। তোমার যে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা আমার কাছে আছে, তাতে সুতপাদিকে নিয়ে কত কথার জালই না তুমি বুনেছ! আমাদের নেতা বেণুদাকে তিনি ভালোবাসতেন, অথচ জীবনে তাঁকে গ্রহণ করতে পারলেন না। সুতপাদি'র ঠাকুর্দার একটা আজগুবী খেয়াল, তিনি নাকি ওঁকে গোপীবল্লভের পায়ে নিবেদন করে দিয়েছিলেন!

এ নিয়ে তুমি তো খুব রোম্যাণ্টিক্‌ গল্প লিখেছ। কিন্তু জীবন অত রোম্যাণ্টিক্‌ নয়। সেদিনকার বিপ্লববাদের ভেতরে যে রঙ্‌ ছিল, সেই রঙের সঙ্গেই একাকার হয়ে ছিল এই দুঃখবিলাস। কিন্তু আজ আর রঙ্‌ নেই। এখন সুতপাদি অন্য রকম।

খুব মোটা হয়ে গেছেন আজকাল—আগেই তোমায় লিখেছিলাম। বড় বড় মোটরে চড়ে প্রায়ই এখানে ওখানে সভা-সমিতির উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন। চেয়ারে বসলে বেশ মানায় কিন্তু ওঁকে। চমৎকার বক্তৃতাও দিতে শিখেছেন। অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে রাজনীতির এমন একটা সামঞ্জস্য করে নিয়েছেন যে ওঁর ক্ষমতার ওপর আমার শ্রদ্ধা হল। সেদিন বৈদান্তিক সাম্যবাদের ওপর একটা বক্তৃতা করলেন ধর্মরক্ষণ সভায়। কাগজে করে অনেক সংস্কৃত শ্লোক টুকে এনেছিলেন।

ওসব কথা যাক। যা বলছিলাম। আমার কাছে এসেছিলেন কেন জানো? চম্‌কে উঠো না, ওঁর নিজের বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে।

হ্যাঁ—ওঁর নিজের বিয়ে। বয়েস তো কম হলনা, কত-দিন আর এমন করে প্রতীক্ষায় কাল কাটাবে বেচারা? গোপীবল্লভের কথা ভাবছ? ও কিছু না। সুতপাদি আজকাল শাস্ত্র পড়ছেন, কাজেই শাস্ত্র মতেই সব কিছুর একটা নিষ্পত্তি করে ফেলেছেন। খুব সম্ভব, তুলসী পাতায় গোপীবল্লভের নাম লিখে ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীর জলে।

কার সঙ্গে বিয়ে? সারদাবাবুর মেজো ছেলে রণদা চক্রবর্তীর সঙ্গে। রণদা চক্রবর্তী এখন এখানকার ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার, গত বছর স্ত্রী মারা যাওয়াতে ভারী মনঃক্ষুণ্ণ ছিলেন। সুতপাদি তাঁকে সারা জীবনের মতো সান্ত্বনা দেবার পুণ্যব্রত গ্রহণ করতে যাচ্ছেন।

আমাকে কিছু উপদেশও দিলেন। বললেন, কী হচ্ছে এসব পাগলামি? ওই সব ছোটলোক ক্ষেপিয়ে দেশ উদ্ধার হবে? তা ছাড়া এ ভাবেই বা আছিস কেন? রঞ্জনকে আসতে বলে দে, এবার বিয়েটা সেরে ফেল্‌। বারো বছর ধরে ঝুলিয়ে রাখা এ তোদের যে কী ভালবাসা আমি বুঝিনা।

আমি বললুম—অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বললুম:

'বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার,
ফেলে দেব আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।
দেখা হবে ক্ষুব্ধ সিন্ধু তীরে—'

কবিতা শুনে রাগ করে উঠে গেল। বললে, চুলোয় যা। কিন্তু বিয়েয় অবশ্য আসবি। আচ্ছা সত্যিই কি আমাদের—'

চিঠির বাকীটুকু নিজের ঘরের কাছেও যেন লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তে ইচ্ছে করল। মিতা—তার সেই ছোট্ট মিতা, আজ আর হরিণের সঙ্গে ছুটোছুটি করে না, তার সময় নেই। কিন্তু হরিণের মতো তার মনটি নিজের ভেতর থেকে কখন যে গাঢ় দুটি নীল চোখ মেলে তাকায়, মিতা নিজেই কি তা জানতে পারে?"

—বাবু!

রঞ্জন হঠাৎ চমকে উঠল। জানলার বাইরে থেকে ডাক আসছে।

—বাবু?

মিষ্টি মেয়েলি গলা। বাইরের অন্ধকার বাগানে কে একটি মেয়ে এল এমন সময়ে?

—কে?

যে ডাকছিল, সে এগিয়ে এল জানলার কাছে। লণ্ঠনের আলো পড়ল দুটি উজ্জ্বল চোখের ওপর, একখানা কালো ধারালো মুখখানাকে উদ্ভাসিত করে।

কালো শশী।

—কিরে, তুই এই বাগানে? এই অন্ধকারে?

—তোকে খবর দিতে এলাম।

—কী খবর?

—আজ রাতে ফের পঞ্চায়েৎ বসবে কালা-পুখরীতে। তোকে যাবার কথা বললে সোনাই মণ্ডল।

—কিন্তু—অসীম বিস্ময়ে রঞ্জন বললে, এ খবর তুই নিয়ে এলি কেমন করে?

কালো শশী মুখ টিপে হাসল, জবাব দিলে না।

—তুই এলি কেন?

—ওরা তো কেউ এই বাগানে ঢুকে এমন করে খবর দিতে পারত না।

—তা পারত না। কিন্তু তোর এমন সাহস হল কী করে? যদি পাইক-পেয়াদারা তোকে এই বাগানে ঢুকতে দেখতে পেত, কী হত তখন?

—আমার ঝাঁপিতে তাজা সাপ থাকে বাবু, তাজা তার বিষ—কালো শশী হাসল।

—তা বটে।

রঞ্জন আর কথা বলতে পারল না। তাজা সাপকে যে কঙ্কন ঝঙ্কারে দিনের পর দিন মাতাল করে নাচাতে পারে, পৃথিবীর কোনো সাপকেই তার ভয় নেই। বিষকন্যা হয়ে যে জন্মেছে, কোনো বিষই তাকে দহন করতে পারে না কোনো দিন।

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা হলনা। তার আগেই অন্ধকারের ভেতর আরো অন্ধকার একটা ছায়ার মতো চক্ষের পলকে মিলিয়ে গেল কালো শশী। (ক্রমশঃ)

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটিয়া ভারতবাসীর স্বাধীনতালাভ যখন নিশ্চিত হইয়া উঠিল, স্বাধীন ভারতের উপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন তখন উপলব্ধি করিতে লাগিলেন সকলেই। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনে মূল্যবান বিধান অবশ্যই কিছু কিছু ছিল, কিন্তু বিদেশী ইংরেজ শাসকসম্প্রদায়ের রচিত সংবিধান বলিয়া সমগ্রভাবে ইহা ভারতীয় স্বার্থের অনুকূল ছিল না। পণ্ডিত নেহেরু পরিচালিত অন্তর্বর্তী সরকার কাল বিলম্ব না করিয়া স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার আয়োজন করিলেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর শাসনতন্ত্রের খসড়া লইয়া আলোচনা সুরু হয়। তখনকার এই খসড়া রচনা করেন প্রধানতঃ ভারতসরকারের শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা শ্রী বি এন রাও। অতঃপর ভারতীয় গণপরিষদের সদস্যবৃন্দ এই খসড়ার উপর আলোচনা চালাইয়া ইহার আরও পূর্ণাঙ্গ একটি রূপ গঠনের ভার দেন ভারত-সরকারের আইনসচিব ডাঃ বি আর আম্বেদকরের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটির উপর। ইহা ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্টের কথা; আম্বেদকর কমিটি ৩১৫টি অনুচ্ছেদ ও ১৩টি তপশিল সমেত শাসনতন্ত্রের খসড়া গণপরিষদে পেশ করেন। এই খসড়া আকৃতিতে বিরাট হইলেও গণপরিষদের সদস্যগণ যে ইহা স্বাধীনভারতের পক্ষে স্বয়ং-সম্পূর্ণ বা উপযোগী বলিয়া মনে করেন নাই, তাহা খসড়া শাসনতন্ত্রের অনুচ্ছেদগুলির উপর তুমুল বিতর্ক হইতেই বুঝা যাইবে। কংগ্রেসী সরকারের নিয়োজিত কমিটির খসড়া লইয়া কংগ্রেসী সদস্য পূর্ণ গণপরিষদে এই ধরণের মতদ্বৈধতা ও বিতর্কের গুরুত্ব সত্যই খুব বেশী। খসড়া শাসনতন্ত্রের অসম্পূর্ণতা গণপরিষদের সদস্যবৃন্দের কাছে এত প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে যে, তাঁহারা ইহার অনুচ্ছেদগুলির উপর অজস্র সংশোধন প্রস্তাব আনিতে থাকেন। সর্ব্বসমেত খসড়া শাসনতন্ত্রের উপর ৭,৬৩৫টি সংশোধন প্রস্তাবের নোটিশ আসে। প্রয়োজন ও বৈধতার বিবেচনায় কতকগুলি বাতিল হইবার পরও শেষ অবধি ২,৪৭৩টি সংশোধন প্রস্তাব গণপরিষদে আলোচিত হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর গণপরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের স্বাক্ষরের পর স্বাধীন ভারতের যে শাসনতন্ত্র গৃহীত ও বিধিবদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হয়, তাহাতে মোট ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ ও ৮টি তপশীল আছে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, শাসনতন্ত্র গৃহীত হইতে মোটের উপর সময় লাগিয়াছে প্রায় তিন বৎসর। দিন গণনার হিসাবে তিন বৎসর দীর্ঘকাল সন্দেহ নাই। তবে এই প্রসঙ্গে ভারতের বহুবিচিত্র সমস্যা-সমূহের কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে। দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ ভারতের কৃষিকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থাকে এখন ক্রমে শিল্পবাণিজ্য-কেন্দ্রিক করিয়া তুলিতে হইবে, দৈন্য ও অশিক্ষায় ম্লান সাধারণ ভারতবাসীকে এখন স্বচ্ছল, শিক্ষিত ও দায়িত্বসম্পন্ন নাগরিকরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে, রাজন্যপ্রথার অবসান ঘটায় দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে সুদীর্ঘকালের বিচ্ছেদের ফলে যে বহুমুখী অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দূর করিতে হইবে। শাসনতন্ত্রের প্রত্যেকটি বিধান

রচনায় বা গ্রহণের সময় এই সব সমস্যা স্মরণ রাখিতে হইয়াছে। কাজেই শাসনতন্ত্র রচনায় ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষের একটু বেশী সময় লাগাই স্বাভাবিক।

আলোচ্য শাসনতন্ত্রে ভারতের যে শাসনব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় বা ফেডারেল বলা হইলেও অনেক ক্ষেত্রে (বিশেষ করিয়া সঙ্কটকালে) কেন্দ্রকে এত বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের আদর্শ সমগ্রভাবে এই শাসনতন্ত্রের দ্বারা কিছুটা ক্ষুন্ন হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কংগ্রেস ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের নির্ব্বাচনী কার্য্যতালিকায় যে আদর্শ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাতেও এই প্রাদেশিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার নীতি স্থান পাইয়াছিল। স্বাধীন ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তা প্রেসিডেন্টের নামে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা তো চলিবেই, তাছাড়া কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টেরও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোন প্রাদেশিক আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যাপক অধিকার দেওয়া হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের সপ্তম তপশিলে উল্লিখিত যুক্তরাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় তালিকায় যে ৯৭টি বিষয়ে কেন্দ্রের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলির জন্যই প্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষ অবাঞ্ছিতভাবে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হইতে বাধ্য হইবে। এই তপশিলেই কেন্দ্র ও প্রদেশের সহগামী বা যুক্ত তালিকায় ৪৭টি বিষয়ের উল্লেখ আছে। বিষয়গুলিতে কেন্দ্রের ও প্রদেশের যুক্ত অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কেন্দ্র যদি ইহাদের কোনটি সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা করে, কেন্দ্রের বিধান চালু থাকিবার সময় এ সম্পর্কে প্রদেশ এমন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে না যাহাতে কেন্দ্রের অবলম্বিত ব্যবস্থার কোন ভাবে ব্যতিক্রম ঘটে (অনুচ্ছেদ—২৫১)। সপ্তম তপশিলে রাষ্ট্রীয় বা প্রাদেশিক তালিকায় (ষ্টেট লিষ্ট) ৬৬টি বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে জাতীয় স্বার্থরক্ষার অজুহাতে শাসনতন্ত্রের ২৪৯ (১) অনুচ্ছেদে পার্লামেন্টকে হস্তক্ষেপের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের অষ্টাদশ খণ্ডে সঙ্কটকালীন বিধান হিসাবে প্রেসিডেন্ট স্বতন্ত্র প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত করিয়া এই শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণের পর্য্যন্ত অধিকার পাইয়াছেন (অনুচ্ছেদ ৩৫৬)*। এই খণ্ডেই জরুরী অবস্থার অজুহাতে পার্লামেন্টকে কেন্দ্রীয় তালিকা বহির্ভূত যে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে (অনু—৩৫৩)। অবশ্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সমতা সাধনের দ্বারা ভারতের সামগ্রিক উন্নতির কথা বিবেচনা করিলে প্রাদেশিক ব্যাপারে এইভাবে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের সুযোগ সন্নিবেশের পক্ষের যুক্তিও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া আশা করা যায় যে, ক্ষমতা থাকিলেও কেন্দ্র সেই ক্ষমতা বিশেষক্ষেত্রে ছাড়া ব্যবহার করিবে না (ইতিমধ্যে ভারতের দায়িত্বশীল কর্ত্তৃপক্ষস্থানীয় অনেকেই এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছেন)। ভারতে বর্ত্তমানে যে বিশৃঙ্খলা চলিতেছে এবং আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে যেরূপ অনিশ্চিত ভাব বিরাজ করিতেছে, তাহাতে নীতির হিসাবে একটু সঙ্কোচ থাকিলেও প্রয়োজনের দিক হইতে ভারতের মত সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাতেও কেন্দ্রের ক্ষমতা প্রসারের সুযোগ থাকা দরকার।

আগেই বলা হইয়াছে, ভারতে শাসনব্যবস্থার সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তৃত্ব রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্টের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। শাসনতন্ত্রে অন্ততঃ যে সব বিধান সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে প্রেসিডেন্টকে প্রদত্ত হইয়াছে অনেকটা এক নায়কের ক্ষমতা। ৬১ সংখ্যক অনুচ্ছেদে প্রেসিডেন্টকে পদচ্যুত করা সম্পর্কে পার্লামেন্টের কিছুটা অধিকার দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু এই প্রসঙ্গে যে সর্ত্ত আরোপ করা হইয়াছে, তাহাতে পার্লামেন্টের নির্ব্বাচিত সদস্যদের একাংশের আস্থাভাজন হইলেও প্রেসিডেন্টকে পদচ্যুত করা একরূপ অসম্ভব। এই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, ব্রিটেনের রাজার ন্যায় ভারতের প্রেসিডেন্ট পদ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি নয়, এদেশে প্রেসিডেন্ট হইবেন অত্যন্ত জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা; তাঁহাকে সমস্ত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্ব্বাচিত সদস্যদের ভোটে নির্ব্বাচিত হইতে হইবে। কাজেই এমন পরিস্থিতি আশা করা যায় না, যখন প্রেসিডেন্ট তাঁহার সমস্ত সমর্থক হারাইয়া পদচ্যুত হইবার জন্যই স্বৈরাচারী সাজিয়া বসিবেন। প্রেসিডেন্ট যদি প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার সহিত হাত মিলাইয়া থাকেন ভালই, যদি তা না থাকেন, তাহা হইলে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের ইচ্ছামতই ভারত শাসিত হইবার কথা, কারণ মন্ত্রীসভা প্রেসিডেন্টকে মাত্র পরামর্শ দিবার জন্য সংগঠিত (অনুচ্ছেদ—৭৪)। প্রেসিডেন্ট ইচ্ছা করিলে পার্লামেন্টের লোকসভা পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন (অনুচ্ছেদ—৮৫।২)। লোকসভার বা পার্লামেন্টের উপর প্রেসিডেন্টের এই হস্তক্ষেপের অধিকার গণতন্ত্রের অনুগ নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে সেদেশের প্রেসিডেন্টের ও কংগ্রেসের (আইনসভার) অধিকার সুনির্দিষ্ট ভাবে পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেখানে প্রেসিডেন্ট ভারতের প্রেসিডেন্টের মত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও আইনসভার উপর হস্তক্ষেপের অধিকার পান নাই। ভারতে স্বৈরাচারী কোন প্রেসিডেন্টের আবির্ভাব ঘটিলে পার্লামেন্টের বা মন্ত্রিসভার সহিত তাঁহার সংঘর্ষ বাঁধা বিচিত্র নয় এবং সেই সংঘর্ষের সময় বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তাঁহাকে নিয়ন্ত্রণ করা সত্যই অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইবে। কংগ্রেস এখন যেমন ভারতের শাসনকর্ত্তৃত্বের ব্যাপারে একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করিতেছে, এ অবস্থা চিরকাল বজায় থাকিবে এমন কোন কথা নাই। কংগ্রেসের সহিত সমান তালে

---

* এছাড়া উনবিংশ খণ্ডের ৩৬৫ সংখ্যক অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে—'যদি যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শাসনকর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের কোন বিধানানুযায়ী কোন রাষ্ট্রকে (প্রদেশকে) কোন নির্দ্দেশ মানিতে বা কার্য্যকরী করিতে বলা সত্ত্বেও রাষ্ট্র তাহা না করে, তাহা হইলে প্রেসিডেন্টের একথা ধরিয়া লওয়া বৈধ হইবে যে, এমন এক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, যেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের শাসনকার্য্য বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী চলিতে পারে না।'

চলিবার মত শক্তিমান অন্য কোন বিরোধী দলের উদ্ভব হইলে এবং তখন প্রেসিডেণ্টকে লইয়া উপরিউক্ত কোনরূপ সমস্যা দেখা দিলে, সেই সমস্যা ভারতে প্রভূত বিশৃঙ্খলার কারণ হইতে পারে। এসময় প্রেসিডেণ্ট যদি শাসনতন্ত্রের সুযোগ লইয়া আত্মক্ষমতার ক্রমবিস্তার সাধন করিতে পারেন, তাহা হইলে ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লবের পরবর্ত্তী কালে একনায়ক নেপোলিয়ন বোনাপার্টের উদ্ভব (১৭৯৯) অথবা দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্রের (Second Republic) অবসান ঘটাইয়া সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের আবির্ভাবের (১৮৫২) স্থায় অবস্থা ভারতেও দেখা দিতে পারে।

তবে এখনও পর্য্যন্ত ভারতে যে আবহাওয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাতে আশা করা যায় যে, প্রেসিডেণ্টকে লইয়া ভারত হয়তো কোন দিনই এরূপ দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হইবে না। অবশ্য এ সম্পর্কে শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা নাই, এখন কিছুদিন প্রেসিডেণ্টের কার্য্যকলাপে একটা রীতি গড়িয়া উঠিলে তাহাই ভবিষ্যতে স্থায়ী হওয়া স্বাভাবিক। ইতিমধ্যেই ভারতের শাসনকর্তৃপক্ষ একাধিকবার প্রেসিডেণ্টের নিয়মতান্ত্রিক পদমর্য্যাদা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। ভারতের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদও গত ২৬শে নভেম্বর গণপরিষদের সভাপতি হিসাবে নূতন শাসনতন্ত্রে স্বাক্ষর দান কালে বলিয়াছেন যে, ভারতের প্রেসিডেণ্ট হইবেন ইংলণ্ডের রাজার স্থায় নিয়মতান্ত্রিক প্রেসিডেণ্ট।* এছাড়া বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাও পরোক্ষভাবে প্রেসিডেণ্টের নিয়মতান্ত্রিক পদমর্য্যাদার ইঙ্গিত দেয়। শাসনতন্ত্রে বলা হইয়াছে—প্রেসিডেণ্টের কাজে সাহায্য করিবার ও তাঁহাকে পরামর্শ দিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী সহ একটি মন্ত্রীসভা থাকিবে (অনুচ্ছেদ ৭৪), প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী প্রেসিডেণ্ট অপরাপর মন্ত্রীদের নিয়োগ করিবেন (অনুচ্ছেদ ৭৫।১), এবং প্রেসিডেণ্ট যতদিন ইচ্ছা করিবেন মন্ত্রীগণ ততদিন স্বপদে বহাল থাকিবেন (অনু ৭৫।২); অথচ ইহার পরই ৭৫ (৩) সংখ্যক অনুচ্ছেদে আছে যে, মন্ত্রীসভা সমবেতভাবে লোকসভার (House of the people) নিকট দায়ী থাকিবেন। বলা নিষ্প্রয়োজন প্রেসিডেণ্ট এবং লোকসভা এই দুই প্রভু সত্যই যদি সক্রিয় হন, তাহা হইলে মন্ত্রীসভার পক্ষে কিছুতেই একসঙ্গে উভয়ের সেবা সম্ভব নয়।* এক্ষেত্রে প্রেসিডেণ্ট যদি নামমাত্র সর্ব্বময় কর্ত্তা হন এবং ব্রিটেনের রাজার স্থায় সবসময় মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে চলেন, তবেই জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত লোকসভা মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেশের সুশাসন অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত করিতে পারে। এইভাবে প্রেসিডেণ্টের মন্ত্রীসভার সহিত সহযোগিতার নীতি ক্রমে অলিখিত বিধানে পরিণত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। শাসনতন্ত্রে প্রেসিডেণ্টকে নিয়মতান্ত্রিক প্রেসিডেণ্টরূপে ঘোষণা করিলে হয়তো এই পদে যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যাইত না, এ হিসাবে প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা সংস্থান করিয়া শাসনতন্ত্র উপযুক্ত ব্যক্তিদের প্রেসিডেণ্ট (এই পদ অস্থায়ী, ইংলণ্ডের রাজার স্থায় স্থায়ী ও বংশানুক্রমে ভোগ্য নয়) পদপ্রার্থী হইতে আগ্রহান্বিত করিবে। এইসঙ্গে যদি প্রথম প্রেসিডেণ্ট ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ হইতে প্রচলিত প্রথানুসারে প্রেসিডেণ্টের মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলাই রীতি হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সঙ্কটের সম্ভাবনাও অবশ্যই অনেকটা কমিবে।

শাসনতন্ত্রের ৩৬৮ সংখ্যক অনুচ্ছেদে পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্যের ভোটে আলোচ্য শাসনতন্ত্রের বিধান পরিবর্ত্তনের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান অবস্থায় বহু সমস্যাপীড়িত ভারতের জন্য সর্বদিক হইতে সম্পূর্ণ শাসনতন্ত্র রচনা একরূপ অসম্ভব। ইহার পর যেরূপ প্রয়োজন মনে হইবে, পার্লামেণ্ট শাসনতন্ত্র সেইভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া ভারতকে রাষ্ট্র হিসাবে অধিকতর শক্তিশালী করিবার সুযোগ পাইবে। অবশ্য এই সূত্রে উল্লেখ করা যায় যে, উপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ভার থাকিলে তবেই শাসনতন্ত্রের পূর্ণ মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। উপরোক্ত ৩৬৮ অনুচ্ছেদের সুযোগ লইয়া পার্লামেণ্ট সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতাও ভবিষ্যতে এমনভাবে সম্প্রসারিত করিতে পারেন, যাহাতে সুপ্রীম কোর্ট অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে শাসনতন্ত্রের বিধানাদির বিশ্লেষণ সম্পর্কিত আপন গুরুতর দায়িত্ব পালনে সক্ষম হইবে। বাস্তবিক বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা একটু সীমাবদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। প্রাপ্তবয়স্ক ভারতবাসীদের ভোটে আইনসভার যেসব সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন এবং প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র

* "We have had to reconcile the position of an elected President with an elected Legislature and, in doing so, we have adopted more or less the position of the British monarch for the President...They (Ministers) are, of course, responsible to the Legislature and tender advice to the President who is bound to act according to that advice. Although there are no specific provisions, so for as I know, in the Constitution itself making it binding on the President to accept the advice of his Ministers, it is hoped that the Convention under which in England the king acts always on the advice of his Ministers will be established in this country also and the President, not so much on account of the written word in the Constitution but as a result of this very healthy convention, will become a Constitutional President in all matters."

* এসম্পর্কে অধ্যাপক উইলিয়াম বেনেট মুনরো তাঁহার—'The Governments of Europe' গ্রন্থে (পৃঃ ৪৩৬) বলিয়াছেন—"A ministry must be responsible either to the chief executive or to the legislative body. It can not be responsible to both, for no ministry can serve two masters."

পরিচালনা ব্যবস্থায় যাঁহাদের মতামতের গুরুত্ব হইবে অসীম, নির্ব্বাচনের পর তাঁহাদের কোনদিন নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন দেখা দিলে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সেক্ষেত্রে কিরূপ অধিকার থাকিবে, শাসনতন্ত্রে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ নাই। ভবিষ্যতে প্রয়োজনের তাগিদে এদিক হইতেও হয়তো শাসনতন্ত্র সংশোধনের প্রয়োজন হইতে পারে।

শাসনতন্ত্রের তৃতীয় খণ্ডে ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি বর্ণিত হইয়াছে। এই মৌলিক অধিকারই রাষ্ট্রের নাগরিক জীবনের সম্পূর্ণতার ভিত্তি। উপরিউক্ত তৃতীয় খণ্ডে আইনের চক্ষে সকলের সমানাধিকার (অনুচ্ছেদ ১৪) অবাধে চলাফেরার, মতপ্রকাশের ও সঙ্ঘবদ্ধ হইবার (ইউনিয়নগঠনের) অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৯।১), অস্পৃশ্যতা বিলোপ (অনুচ্ছেদ ১৭), বেগার প্রথার বিলোপ (অনুচ্ছেদ ২৩।১), ধর্ম্মগত স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ২৫—২৮), শাসনতন্ত্রের প্রদত্ত অধিকার সংরক্ষণে আদালতের সাহায্যলাভের সুযোগ, (অনুচ্ছেদ ৩২।৩) ইত্যাদি যেসব মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত হইয়াছে, ব্যক্তি ও সমাজজীবনের বিকাশের হিসাবে সেগুলির গুরুত্ব যথেষ্ট। অবশ্য এই খণ্ডে মৌলিক অধিকার উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্র কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্কোচসাধন করিতে পারিবেন, তাহাও বলা হইয়াছে। এই ব্যক্তিস্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের বিধানের জন্য, বিশেষ করিয়া নিরাপত্তামূলক কয়েদের (অনুচ্ছেদ ২২) বিধানের জন্য অনেকেই অল্পবিস্তর মনোক্ষুণ্ণ হইয়াছেন এবং কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়াছেন যে, তৃতীয় খণ্ডে নাগরিকদের একহাতে কতকগুলি মৌলিক অধিকার দিয়া শাসনতন্ত্ররচয়িতাগণ অন্যহাতে সেগুলি ফিরাইয়া লইয়াছেন। অবশ্য সাধারণতন্ত্রী ভারতে ব্যক্তিস্বাধীনতা নিরোধমূলক যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনই দুঃখের বিষয়, তবে এই বিধানের জন্য শাসনতন্ত্রের সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ন্যায় বহু বিভিন্ন ধরণের ভূখণ্ডের সমবায় ও অসংখ্যপ্রকার মনোবৃত্তিসম্পন্ন অধিবাসীদের সম্মেলনের ভিত্তিতে গঠিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষার প্রয়োজনের কথাও মনে রাখিতে হইবে। নিরাপত্তামূলক কয়েদের অধিকার রাষ্ট্র পাইয়াছে সত্য, কিন্তু এইভাবে যাহাকে বন্দী করা হইবে, তাঁহার রাষ্ট্রশত্রুতা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা চাই এবং হাই-কোর্টের বিচারপতি হইবার মত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত পরামর্শদাতা বা এ্যাডভাইসারি বোর্ডের অনুমোদন না থাকিলে এইভাবে কাহাকেও নিরাপত্তামূলক কয়েদী করিয়া রাখা চলিবে না। এক্ষেত্রে একথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, পৃথিবীর প্রায় সব সভ্য রাষ্ট্রই রাষ্ট্রবিরোধীদের স্বল্পায়াসে নিয়ন্ত্রণ করিবার পথ খুলিয়া রাখেন। সোভিয়েট গঠনতন্ত্র অনুসারে রাশিয়ায় কম্যুনিজম ছাড়া অন্য কোনরূপ রাজনৈতিক মতবাদের অস্তিত্ব রক্ষাই সম্ভব নহে।

গোপী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

আমরা কিশোরী লীলাময়ী গরবিনা
মর্ত্তের মেয়ে স্বর্গের পথ চিনি।
অমল কোমল মোরা বন-ফুল হার,
মোরা বিষলতা ভবানীর তরবার,
দলে চলে যাই দেমাকে দামিনী জিনি।

২

দেহি ভগবানে মোরা তনু মন সঁপি'
আমরা সাধিকা, অমৃতগাত্রী গোপী।
এ দেহ তাঁহারি—তাঁহারি জন্য বাঁচি,
যতখন হেথা রাখেন, রয়েছি, আছি,
নব নব রূপে যুগে যুগে তাঁরে লভি।

৩

করেছি লভিতে শুধু তাঁর পরশন—
কত বার দেহ সাগরেতে তর্পণ।
করেছি কঠোর কঠিন তপস্যা।
কোটী পূর্ণিমা, কোটী অমাবস্যা।
সর্ব্বংসহ যজ্ঞের আয়োজন।

৪

হোমানলে পুড়ি, শুকাই পঙ্কতপে,
দেহ করি শুচি লভিতে সুদুর্লভে।
শ্যামের অঙ্গ পরশে হয়েছি ধনী।
দুখ যন্ত্রণ তাঁহারি পরশ গণি'
সব ভুলে যাই তাঁহার মুরলী রবে।

৫

আমরা 'জোয়ান' ফরাসী বীরাঙ্গনা,
তাঁহার অনল-পরশে হই যে সোনা,
মৃত্যু যাতনা লাঞ্ছনা নিপীড়ন
সুধা সিঞ্চিত তাঁহারি আলিঙ্গন
বহ্নি কুণ্ডে আমরা পদ্মাসনা।

৬

মোরা পদ্মিনী চিতানলে দেহ ডারি—
তিল ও তুলসী দিয়া যে হয়েছি তাঁরি।
এ দেহের পর কেবল তাঁহারি দাবী
বিপর্য্যয়কে তাঁহারি সোহাগ ভাবি
জীবনের নাথ—এ তনুর অধিকারী

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবস—

গত ২৬শে জানুয়ারী ভারত রাষ্ট্রের সর্বত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হইয়াছে। গত ৩ বৎসর ধরিয়া ভারতের গণ পরিষদ ভারত রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে শাসন ব্যবস্থা বা সংবিধান রচনা করিয়াছেন, তাহা গত ২৬শে নভেম্বর চূড়ান্তভাবে গণ পরিষদে গৃহীত হয় এবং গত ২৬শে জানুয়ারী হইতে তাহা সমগ্র ভারত-রাষ্ট্রে কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা হয়। ইংলণ্ড ও আমেরিকার শাসন ব্যবস্থা হইতে ভাল ভাল অংশ গ্রহণ করিয়া ভারতের সংবিধান রচিত হইয়াছে এবং সকলেই আশা করেন যে নূতন শাসন ব্যবস্থা দ্বারা ভারতে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। এতদিন পর্য্যন্ত ভারতের রাষ্ট্র-নায়কগণ বৃটীশ রচিত শাসন

দিল্লীর লাটভবন হইতে বিদায় প্রাক্কালে বিদায়ী রাষ্ট্রপালের জনৈক শুভার্থীর সহিত রসালাপ।—পশ্চাতে ভারতীয় নূতন রাষ্ট্রসংঘের প্রথম সভাপতি—ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ

ব্যবস্থা অনুসারেই দেশ শাসন করিতেছিলেন এবং প্রয়োজন বোধে তাহার সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া লইতেছিলেন। এখন যে নূতন আইন প্রচলিত হইল, তাহা সর্বতোভাবে গণতান্ত্রিক। কোন দেশের শাসন-ব্যবস্থাই চূড়ান্ত করা যায় না—কাজেই নূতন সংবিধান অনুসারে কার্য্য করার সময় তাহারও ত্রুটিসমূহ ক্রমে ক্রমে সংশোধন করা হইবে। গণতন্ত্রের সঙ্কল্পবাক্য নিম্নে প্রদত্ত হইল—তাহা হইতে তাহার স্বরূপ বুঝা যায়। "ভারতের সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার, চিন্তা, ভাব প্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম্মমত, ও উপাসনায় স্বাধীনতা, সামাজিক মর্য্যাদা ও সুযোগলাভের সমানাধিকার প্রদানের এবং ব্যক্তির মর্য্যাদা ও জাতীয় ঐক্যের প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জনগণের মধ্যে সৌভ্রাত্রের উন্মেষ করিবার পবিত্র সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছে।"

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত বিভক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভের পর হইতে প্রায় আড়াই বৎসর কাল অতীত হইয়াছে—ভারতের জনসাধারণ স্বেচ্ছায় ভারত-বিভাগে সম্মতি দিলেও তাহার পরবর্ত্তী অবস্থা তাহাদের মনকে শান্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। কাশ্মীর রক্ষার ব্যবস্থা ও হায়দ্রাবাদ জয় করা হইলেও পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান-বাসী হিন্দুদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। সিন্ধুদেশ হইতে বহু হিন্দুকে চলিয়া আসিতে হইয়াছে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শুধু যে হিন্দুরা নির্য্যাতীত হইতেছে তাহা নহে, খান ভ্রাতৃদ্বয়ের মত বহু জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরও দুঃখ দুর্দ্দশার শেষ নাই, পাঞ্জাবের লোক-বিনিময় সত্ত্বেও পশ্চিম-পাঞ্জাবে এখন আর হিন্দুদের পক্ষে বসবাস সম্ভব হইতেছে না। পূর্ব্ব পাকিস্তানে এখনও এক কোটিরও অধিক হিন্দু অসহায় অবস্থায় বাস করিতেছে, প্রত্যহ সংবাদপত্রসমূহে তাহাদের উপর অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশিত হইলেও ভারত-রাষ্ট্র তাহাদের রক্ষার কোন ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইতেছেন না—পূর্ব্ব পাকিস্তানের দুর্বৃত্তরা আসাম বা পশ্চিম বাংলায় প্রবেশ করিয়া নানা-প্রকার অত্যাচার, লুণ্ঠন প্রভৃতি করিতেছে—এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও ভারত রাষ্ট্রবাসী হিন্দুদের সুখে ও শান্তিতে বাস করা সম্ভব নহে। তাহার উপর ভারত রাষ্ট্রে জনগণের খাদ্য ও বস্ত্র সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা এখনও পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ করিতে সমর্থ হন নাই—বৃটিশ আমলের শাসন ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি এখনও সংশোধিত হয় নাই। দেশে দুর্নীতি অবাধে চলিতেছে, ধনিক কর্ত্তৃক শ্রমিক শোষণ-নীতির পরিবর্ত্তনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই, সরকারী

কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের অধিক বেতন গ্রহণ, অনাবশ্যক ব্যয়, স্বজন-পোষণ প্রভৃতি ব্যবস্থাও দূরীভূত হয় নাই—অথচ দরিদ্র জনগণকে ৪ গুণ বেশী মূল্যে খাদ্য ও বস্ত্র ক্রয় করিতে হইতেছে—রাষ্ট্র-পরিচালকগণ মুখে মহাত্মা গান্ধীর স্তুতি ও তাঁহার নীতির সমর্থন করিলেও কার্য্যে গান্ধী-নীতি বর্জ্জন করিয়াই দেশের শাসন কার্য্য চালাইতেছেন।—এই অবস্থায় জনসাধারণের পক্ষে 'গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা' দিবস উৎসবে যোগদান করা সম্ভব হয় নাই—তাই গত ২৬শে জানুয়ারী দেশের কোথাও আমরা স্বতস্ফূর্ত্ত আনন্দ প্রকাশ দেখিতে পাই নাই। সেদিন মাত্র সরকারী বা সরকারের পৃষ্ঠ-

গত ২৬শে জানুয়ারী সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবসে কলিকাতার লাটভবনে বৃক্ষরোপণ উৎসব ফটো—তারক দাস

পোষিত প্রতিষ্ঠানগুলিতেই অল্প মাত্র আনন্দ প্রকাশ দেখা গিয়াছে। যে সকল দোষ-ত্রুটি, অভাব অভিযোগের কথা বলা হইল, তাহার জন্যই দেশের জনগণের মধ্যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। যতই প্রচার কার্য্য হউক না কেন, যতদিন না রাষ্ট্র জনগণের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার ব্যবস্থায় অবহিত হইবে, ততদিন দেশ হইতে অসন্তোষ দূর করা যাইবে না। এই অসন্তোষ থাকার ফলে একদল রাষ্ট্র-বিরোধী লোক দেশের মধ্যে যত্রতত্র নানাপ্রকার অশান্তি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইতেছে। যে মেদিনীপুর জেলা এক সময়ে কংগ্রেসের দুর্গ বলিয়া বিবেচিত হইত, আ[জ] সেই মেদিনীপুর জেলাতেই অধিক পরিমাণে ও অধিক সংখ্যক স্থানে রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে দেখি[য়া] দেশের শান্তিকামী ব্যক্তিমাত্রই শঙ্কিত হইয়া পড়িতেছেন। কলিকাতার মত সহরেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবসে নানাস্থা[নে] অনাচার অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি-মফঃস্বলে ও নানাস্থানে রাষ্ট্রবিরোধী সভা ও মিছিল প্রভৃ[তি] দেখা গিয়াছিল।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মানুষের ম[নে] শান্তি আসে নাই। বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে দিন দিন হিন্দু উপর পাকিস্তান সরকার কর্ত্তৃক অনাচার বৃদ্ধি পাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গবাসী ও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত হিন্দুদের মন অত্যন্ত চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ হইয়া আছে। ইহার প্রতীকারের উপায় রাষ্ট্রকে সত্বর গ্রহণ করিতে হইবে। নচেৎ দেশের মধ্যে শান্তি রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় কয় দিন মুর্শিদাবাদ জেলার ঘটনা আজ পশ্চিম বাঙ্গালার সকল অধিবাসীকেই চিন্তাকুল করিয়াছে—প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু পর্য্যন্ত সে জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা সাম্প্রদায়িকতাবাদী নহি—ভারত রাষ্ট্রে সম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নাই—লৌকিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবসে যে সঙ্কল্পবাক্য গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে সাম্প্রদায়িকতার কোন প্রশ্ন আসিতে পারে না। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঘটনা দিন দিন মানুষের মন চিন্তান্বিত করিয়া তুলিতেছে। খুলনা জেলায় নানাস্থানে হিন্দুর উপর পাকিস্তানী রাষ্ট্রের অত্যাচারের ফলে সে স্থান হইতে হিন্দুরা দলে দলে ভারত রাষ্ট্রে চলিয়া আসিতেছে। আসাম সীমান্তের পূর্ব্ব-পাকিস্তান হইতেও ঐ একই কারণে হিন্দুরা হাজারে হাজারে আসামে চলিয়া যাইতেছে। পাকিস্তান রাষ্ট্র তাহাদের রক্ষার কোন ব্যবস্থা করেন না—কুমিল্লার মত সমৃদ্ধ সহরে যে ভাবে হিন্দু দলন চলিতেছে, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে সভ্য মানুষমাত্রকেই বিস্মিত হইতে হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত হইতেও বহু স্থানে পাকিস্তানীরা রাজ্যের গ্রামসমূহ আক্রমণ করিয়া সে সকল স্থানের অধিবাসীদের ত্রস্ত করিয়াছে। মৈমনসিংহ জেলায় শুধু পাকিস্তানী অত্যাচার নহে, কম্যুনিষ্টদের অনাচারে ও লোক বিপন্ন হইয়াছে, এ অবস্থায় রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য সত্বর স্থির করা প্রয়োজন। ভারত রাষ্ট্র যদি সত্বর এ বিষয়ে কর্ত্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর না হন, তবে দেশের মধ্যে অশান্তি ও অসন্তোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ও আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। ভারত রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে হইলে এখন রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের পক্ষে কঠোরভাবে কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘের প্রথম সভাপতির সম্মুখে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলালের শপথ গ্রহণ

ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘের প্রথম সভাপতির পুলিস ও সৈন্য বাহিনী পরিদর্শন

সীমানা-বিরোধ সিদ্ধান্ত—

পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ এবং আসাম ও পূর্ববঙ্গের মধ্যে সীমানা সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসার জন্য বিচারপতি মিঃ বাগের সভাপতিত্বে যে ট্রাইবিউনাল গঠিত হইয়াছিল গত ৫ই জানুয়ারী তাহার সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ভারত-রাষ্ট্রের পক্ষে বিচারপতি শ্রীচন্দ্রশেখর আয়ার ও পাকিস্তানের পক্ষে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন উহার সদস্য ছিলেন। ৪টি বিষয়ে বিবেচনা করা হইয়াছে—তন্মধ্যে একটি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হইয়াছে। তিনটি ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তানের সদস্যের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। দুইটি ক্ষেত্রে সভাপতির সহিত ভারতীয় সদস্যের একমত দেখা ছিল, তাহার বেশীর ভাগ অংশ—প্রায় ৮খানি গ্রাম লইয়া ১০ বর্গ মাইল অঞ্চল পাকিস্তান পাইবে। ৩নং বিরোধ আসাম সীমান্তে পাথারিয়া সংরক্ষিত বন অঞ্চল সম্পর্কে। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হইয়াছে—ভারত ও পাকিস্তান কোন পক্ষের কোন লাভ বা ক্ষতি হয় নাই। দুই পক্ষই অধিক স্থান দাবী করিয়াছিলেন, কোন দাবীই স্বীকৃত হয় নাই। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে পাথারিয়ার যে অংশে তৈলখনি আছে বলিয়া বর্মা অয়েল কোম্পানী পরীক্ষা কার্য্য চালাইতেছেন, তাহা ভারতের অংশে ছিল এবং ভারতের দাবীই স্বীকৃত হইয়াছে। ৪নং বিরোধ কুশীয়ারা নদীর গতিপথ সম্পর্কে। ঐ স্থানে পাকিস্তানের

সর্দ্দার প্যাটেলের আগমনে কলিকাতার ময়দানে বিরাট জনসভা ফটো—পান্না সেন

গিয়াছে। ১নং বিরোধে সভাপতি ভারতীয় সদস্যের সহিত একমত—এ ক্ষেত্রে ভারতের দাবী বজায় রাখা হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ ও রাজসাহী জেলার মধ্যবর্ত্তী গঙ্গার মধ্যভাগে একটি স্থায়ী সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্রোত-ধারার গতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সীমা রেখা পরিবর্ত্তিত হইবে না। ২নং বিরোধে সভাপতির সহিত ভারতীয় সদস্য বা পাকিস্তানী সদস্য কেহই একমত হন নাই। সভাপতি যে রায় দিয়াছেন তাহা বাধ্যতামূলক হইবে। ইহাতে পাকি-স্তানের দাবী ৯০ ভাগ সমর্থিত হইয়াছে—কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানা ও নদীয়া জেলার করিমপুর থানার সীমানা লইয়া বিরোধ ছিল—নদীর চরের যে অংশ লইয়া বিরোধ দাবী স্বীকৃত হয় নাই। সভাপতি ভারতীয় সদস্যের সহিত একমত হইয়া ভারতকে একটি বিরাট অঞ্চলের অধিকারী স্থির করিয়াছেন। করিমগঞ্জ ও বিয়ানী-বাজার থানার মধ্যবর্ত্তী সীমারেখা হইতে বীরশ্রী পর্য্যন্ত ভারত ও পাকি-স্তানের সীমান্ত বলিয়া র‍্যাডক্লিফ সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছিল কিন্তু পাকিস্তান তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া ঐ স্থানে এক প্রকাণ্ড অংশ চাহিয়াছিল। ভারতীয় সদস্য শ্রীযুত আয়ার র‍্যাডক্লিফ সিদ্ধান্তই সমর্থন করেন। বিচারপতি বাগে ভারতীয় সদস্যের সহিত একমত হইয়া পূর্ব্ব সিদ্ধান্তই বহাল রাখিয়াছেন। ১নং ও ৪নং বিরোধে ভারতের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় নাই। ৩নং বিরোধ সম্পর্কেও কিছু বলিবার

নাই। কারণ বনাঞ্চলে সীমারেখা স্থির করা অসুবিধাজনক ছিল—এখন এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় উভয় পক্ষই নিজ নিজ এলাকা স্থির করিয়া লইতে পারিবেন। ২নং বিরোধে মাথাভাঙ্গা নদী লইয়া যে সমস্যা ছিল তাহা থাকিয়া গেল। নদীর একটি বড় চর (যাহা বর্ত্তমানে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানার মধ্যবর্ত্তী বলিয়া পাকিস্তান দাবী করিতেছে) পাকিস্তানে চলিয়া গেল। ঐ চরের অধিকাংশ মালিক করিমপুর থানার অধিবাসী—কাজেই তাহাদের আর ঐ চরে যাইয়া খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে না—সে দিক দিয়া ভারত বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। যাহা হউক—অপর তিনটি বিরোধ সম্পর্কে যখন ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই—তখন এই ক্ষতি সহ্য করা ছাড়া উপায় নাই। যে অঞ্চল লইয়া বিরোধ সে অঞ্চল যাহাতে সুরক্ষিত হয় ও পাকিস্তানীরা ভারতীয় এলাকার মধ্যে কোনরূপ গণ্ডগোল না করে, সে জন্য এখন ভারতের রাষ্ট্রচালকগণকে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে সকল ভারতীয় প্রজা চরের জমি হারাইল, তাহাদের সম্বন্ধেও সরকারের কর্তব্য পালন করা উচিত। সীমানা বিরোধের এই সিদ্ধান্তের ফলে কি পূর্ব্ব পাকিস্তানে সংখ্যাল্প-নির্য্যাতন বন্ধ হইবে?

পূর্ব্ব পাকিস্তানের কৈফিয়ৎ—

১৯৪৯ সালের ২০শে ডিসেম্বরের 'পর হইতে দেড় মাসেরও অধিক কাল ধরিয়া পূর্ব্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার ও নির্য্যাতন চলিতেছে, সে সকল বিবরণ গত একপক্ষকাল ধরিয়া সকল দৈনিক সংবাদপত্রেই বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এ বিষয়ে ভারতের পক্ষ হইতে পাকিস্তানের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিয়া দীর্ঘ পত্র বহুদিন পূর্ব্বেই প্রেরিত হইয়াছিল। সে পত্রের কোন উত্তর না দিয়া পূর্ব্ব পাকিস্তান কর্ত্তৃপক্ষ গত ৩রা ফেব্রুয়ারী এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া ঘটনার কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। পরদিনই অর্থাৎ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ঐ বিবৃতির উত্তরে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া পূর্ব্ব পাকিস্তান কর্ত্তৃপক্ষের মিথ্যাচার ও ভণ্ডামি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। ৯ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় উভয় বঙ্গের চিফ-সেক্রেটারীরা মিলিত হইয়া এ বিষয়ে আলোচনা করিবেন। কিন্তু এই আলোচনা দ্বারা নির্য্যাতীত ও নিপীড়িত হিন্দুরা কি কোন প্রকারে লাভবান হইবে? ইহার পরও পূর্ব্ব পাকিস্তানে হিন্দু-নির্য্যাতন বন্ধ হয় নাই। বাঙ্গালা দেশ বিভাগের পর এখানে যত অধিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, আর কোথাও এত সমস্যা দেখা যায় নাই। ইহার সমাধানের ব্যবস্থা না হইলে পশ্চিমবঙ্গরাষ্ট্র রক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

মৎস্য বিভাগের অনাচার—

সম্প্রতি পত্রান্তরে পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রের মৎস্য বিভাগের একটি অনাচার সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই ক্ষুব্ধ হইবেন, সন্দেহ নাই। স্বাধীনতা লাভের পর আড়াই বৎসরকাল অতীত হইলেও মৎস্য বিভাগ কলিকাতার বাজারে মৎস্য আমদানীর কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। কয় বৎসর ধরিয়া তিন টাকা সের দরে মৎস্য বিক্রীত হইতেছে, কাজেই মৎস্যপ্রিয় বাঙ্গালীরা মাছ খাওয়া প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। তিন টাকা সেরের মাছ কিনিয়া খাওয়া কয়জনের পক্ষে সম্ভব, সে কথা বলার প্রয়োজন নাই। অথচ বহু টাকা ব্যয় করিয়া একটি সরকারী মৎস্য বিভাগ রক্ষা করা হয়, তাহার জন্য যে ব্যয় হয়, সে টাকায় দেশের বহু লোক মাছ খাইতে পারে। সে বিভাগ যে শুধু অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় দেয়, তাহা নহে। সে বিভাগের কার্য্য পরিচালনার দোষে সম্প্রতি সরকারের ৮২ হাজার টাকা এককালীন লোকসান হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কাঁথি ও সুন্দরবন হইতে কলিকাতায় মৎস্য প্রেরণের যে পরিকল্পনা হইয়াছিল, তাহা দ্বারা সরকার বা জনসাধারণ কেহই লাভবান ত হয় নাই, অধিকন্তু উপরোক্ত টাকা লোকসান হইয়াছে। যে সকল অনভিজ্ঞ কর্ম্মচারার দোষে এই অব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে, তাহাদের কর্ম্মচ্যুত করিয়া উপযুক্ত শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। প্রকাশ, এক বিশেষজ্ঞ কমিটী এই লোকসানের খবর প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। আমরা আশা করি, উক্ত কমিটীর সদস্যগণ অপরাধী কর্ম্মচারীদের বিষয়েও পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রকে উপযুক্ত কর্ত্তব্য করিতে পরামর্শ দান করিবেন।

সোভিয়েট রাশিয়ার রাজ্যবৃদ্ধি চেষ্টা—

চীনা তুর্কীস্তান (সিনকিয়াং) চীনের অন্তর্ভুক্ত একটী প্রদেশ—তথায় প্রচুর ইউরেনিয়াম, প্লাটিনাম, কয়লা, লৌহ ও পেট্রল আছে। সম্প্রতি ঐ দেশের ভূতপূর্ব্ব

উন্নয়ন মন্ত্রী মহম্মদ আমীন বোগরা কাশ্মীর সীমান্তের লাডাকের পথে শ্রীনগরে আসিয়াছেন। তিনি এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন—সোভিয়েট-রুশিয়া চীনা-তুর্কীস্তানকে নিজ আয়ত্তাধীন করার ব্যবস্থা করিয়াছে। সিনকিয়াংএ ঐ দেশের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা ছিল—চীন-দেশের জাতীয় সরকার তথায় যে সকল প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত তৎদেশীয় জনগণের সম্প্রীতি সম্ভব হয় নাই; এই বিরোধের সুযোগ লইয়া কম্যুনিষ্টরা তথায় যাইয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এখন যদি রুশিয়াকে যুদ্ধে নামিতে হয়, তবে ঐ সুরক্ষিত দেশটি রুশিয়াকে বহু প্রকার যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করিতে সমর্থ হইবে। ভারতের কাশ্মীর সীমান্ত হইতে ও দেশটি দূরবর্ত্তী নহে—কাজেই তথায় কম্যুনিষ্ট প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া ভারতের পক্ষেও চিন্তার কারণ হইয়াছে।

ভারত আক্রমণের সংবাদ—

চীনের জাতীয়দলের নেতা চিয়াং-কাই-সেক চীন দেশ হইতে পলাইয়া বর্তমানে ফরমোজায় বাস করিতেছেন। তথায় তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, কম্যুনিষ্টরা ভারত-আক্রমণের সুবিধার জন্য ইন্দোচীনের মধ্য দিয়া পথ করিতেছেন। ইন্দোচীনের নেতা ডাঃ মিন গত ৩ বৎসর কাল ফরাসীর সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন এবং সোভিয়েট-রুশিয়া ইন্দোচীনের নূতন শাসনব্যবস্থাকে মানিয়া লইয়াছেন। চিয়াং-কাই-সেক অসাধারণ বুদ্ধিমান লোক—তাঁহার প্রদত্ত সংবাদে ভারতবাসী মাত্রই শঙ্কিত হইয়াছেন। কম্যুনিষ্টরা যে সমগ্র এশিয়ায় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী, এখন আর সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য কঠোর শাস্তি—

ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত কেন্দ্রীয় হিসাব পরীক্ষক কমিটী গত ১৯৪৬-৪৭ ও ১৯৪৭-৪৮ সালের সরকারী হিসাব পরীক্ষার পর যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সে বিষয়ে সকলেরই অবহিত হওয়া উচিত। সরকারী কর্ম্মচারীদের হিসাব রক্ষার ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য যতগুলি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার বেশীর ভাগই যথোপযুক্ত হয় নাই। কমিটী মন্তব্য করিয়াছেন, সরকারী অর্থের লেন-দেন ব্যাপারে কিছুমাত্র শৈথিল্যের প্রশ্রয় দেওয়া বিধেয় নহে এবং কোন আর্থিক ত্রুটিবিচ্যুতির দায়িত্ব যাঁহার বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইবে, তাঁহাকে উপযুক্ত দণ্ড দিতে হইবে। সরকারী সকল বিভাগেই শৈথিল্য দেখা যাইতেছে, তাহা নিবারিত না হইলে দেশের শাসনকার্য্য ভালভাবে চলিতে পারিবে না।

খান ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তির দাবী—

গত ৩০শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধীর তিরোধান দিবসে কলিকাতার মুসলমান-অধিবাসীবৃন্দ এক সভায় সমবেত হইয়া গান্ধীজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর সীমান্ত নেতা খাঁ আবদুল গফুর খান ও ডাঃ খান সাহেবের মুক্তির দাবী করিয়াছেন। তাঁহারা গান্ধীজির শিষ্য ও সহকর্ম্মী বলিয়া পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের আটক করিয়া রাখিয়াছেন ও আটক অবস্থায় তাঁহারা দারুণ কষ্টভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের মুক্তি প্রদত্ত না হইলে ভারতবাসী মুসলমানগণ সত্যাগ্রহ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। গত ২ বৎসরেরও অধিক কাল খান ভ্রাতারা নজরবন্দী অবস্থায় নির্য্যাতন ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের একমাত্র অপরাধ তাঁহারা সাম্প্রদায়িকতাবাদ নহেন। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের মুক্তির জন্য ভারতীয় রাষ্ট্রপরিচালকগণেরও চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কাশ্মীর সমস্যা—

গত ১লা ফেব্রুয়ারী দিল্লীর পার্লামেণ্টে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু স্বীকার করিয়াছেন যে কাশ্মীরে যুদ্ধ করিবার জন্য পাকিস্তানে উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে এবং পাকিস্তানের নেতারা সে জন্য দম্ভ প্রকাশ করিয়া যুদ্ধের কথা প্রকাশ করিতেছেন। কাশ্মীর-সমস্যা সমাধানের জন্য শান্তি-পরিষদে যাইয়া কোন আপোষ-মীমাংসা সম্ভব হয় নাই—কাজেই এখন ভারত রাষ্ট্রকে কাশ্মীর রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। কাশ্মীরের অধিকাংশ স্থানই বর্ত্তমানে ভারত রাষ্ট্রের শাসনাধীন—হানাদারেরা যে সামান্য অংশ দখল করিয়া আছে, সে স্থানগুলি তাহাদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া কাশ্মীরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। এত দিন ধরিয়া আপোষ চেষ্টা করিয়া যখন তাহা বিফলতায় পরিণত হইল, তখন আর অপেক্ষা করিয়া কি লাভ হইবে?

পুঁজিবাদ সমর্থন—

গত ২রা ফেব্রুয়ারী ভারতীয় পার্লামেণ্টে খ্যাতনামা শ্রমিক নেতা শ্রীখান্দুভাই দেশাই বর্ত্তমান রাষ্ট্র-পরিচালকগণকে পুঁজীবাদের সমর্থক বলিয়া অভিযোগ করায় তাহার উত্তরে সর্দ্দার পেটেল বলিয়াছেন—বর্ত্তমান ভারত-রাষ্ট্র পুঁজীবাদ সমর্থন করেন না—সেই জন্যই তাঁহারা শ্রমিকদের কল্যাণ কল্পে বহু আইন প্রস্তুত করিয়াছেন। কোন দেশে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত অধিকসংখ্যক শ্রমিক-কল্যাণজনক আইন প্রণীত হয় নাই। শুধু মধ্যপ্রদেশে বস্ত্রশিল্প হইতে যে ৫৭ লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছিল তন্মধ্যে ৪০ লক্ষ টাকা শ্রমিকদের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করা হইয়াছে। সর্দ্দার পেটেল যাহাই বলুন না কেন, যতদিন না সমাজে সাম্য প্রতিষ্টিত হইবে ও দরিদ্র জনগণ তাহাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও বস্ত্র পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাইবে, ততদিন শুধু মুখের কথায় কেহ শান্ত বা নিশ্চিন্ত হইবে না।

কলিকাতা কর্পোরেশন—

কলিকাতা কর্পোরেশন নামে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হইলেও গত ২ বৎসরকাল তথায় স্বৈরশাসন চলিতেছে। শাসন ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য নির্ব্বাচিত কাউন্সিলার দিয়া গঠিত প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দিয়া পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রের স্বায়ত্তশাসন বিভাগ কর্ত্তৃক নিযুক্ত সরকারী কর্ম্মচারীরাই উহার পরিচালন করিতেছেন। ব্যবস্থা ভাল কি মন্দ, তাহার বিচার না করিয়াও এই স্বৈরশাসন ব্যবস্থার প্রশংসা করা যায় না। গলদ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য যে কমিটী গঠিত হইয়াছিল গত ৩১শে জানুয়ারী তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কমিশন কোন করবৃদ্ধির প্রস্তাব না করিয়া যথোচিত কর নির্দ্ধারণ ও নির্দ্ধারিত কর আদায়ের উপর বেশী জোর দিতে বলিয়াছেন। যদি ঐ সকল উপায় অবলম্বিত হয়, তবে ১৯৫০-৫১ সালে কর্পোরেশনের আয় এক কোটি টাকা বাড়িয়া যাইবে। কমিশনের প্রস্তাব অনুসারে ৭৫ জন সদস্য লইয়া নূতন কাউন্সিল গঠিত হইবে এবং কাউন্সিল কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত একজন ম্যানেজার কর্পোরেশনের দৈনন্দিন কার্য্য পরিচালনা করিবেন। সিভিলিয়ানী শাসনেও কর্পোরেশনের অবস্থার কোন উন্নতি সম্ভব হয় নাই কাজেই সহরের অধিবাসীরা সত্বর কমিশনের নির্দ্দেশ কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিলে আনন্দিত হইবে। পশ্চিম বঙ্গ রাষ্ট্রের কার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে দেশবাসী ক্রমে বিশ্বাস হারাইতেছে। সরকারী কোন ব্যবস্থাই দেশবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিতে সমর্থ হইতেছে না। কাজেই নবনির্ব্বাচিত কাউন্সিলের উপর কর্পোরেশনের কার্য্যভার প্রদত্ত হইলে লোক নূতন ব্যবস্থায় আশান্বিত হইতে পারিবে।

ভারতে মুসলমান প্রবেশ—

গত ১লা ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে পার্লামেণ্টের অধিবেশনে একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার জানাইয়াছেন যে ১৯৪৭এর ১৫ই আগষ্ট হইতে গত ১লা নভেম্বরের মধ্যে প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ মুসলমান পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বহু লক্ষ হিন্দু অত্যাচারিত হইয়া ভারতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে—এবং সরকার তাহাদের সাহায্য দানের ব্যবস্থার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল মুসলমান কেন ভারতে আসিয়াছে, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করা কি সরকার এত দিন প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন নাই। ঐ সকল মুসলমান যে ভারত রাষ্ট্রে বাস করিয়া পাকিস্তানের গুপ্তচরের কাজ করিতেছে, তাহা বহু ঘটনায় প্রমাণিত হইয়াছে। যে সকল মুসলমান ভারত রাষ্ট্রের অধীনে ছিল, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র—কিন্তু নবাগত মুসলমানদের ভারতে বাস সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে কি করিয়া ভারত রাষ্ট্র বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা যাইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। পাকিস্তান সীমান্তবাসী বহু মুসলমান ভারত রাষ্ট্রে বাড়ী থাকা সত্বেও পাকিস্তানে যাইয়া বাড়ী করিয়াছে ও উভয় রাষ্ট্রে যাতায়াত করিয়া থাকে—তাহাদের সম্বন্ধেও পুলিস কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে না। তাহারা যে ভারত রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধন করিতেও ইতস্তত করে না, তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া সত্বেও তাহাদের সহ্য করা হয়। ভারতের রাষ্ট্রপরিচালকগণকে এখন কঠোরতার সহিত এই সকল অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে হইবে।

ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ—

সর্বসম্মতিক্রমে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ নূতন ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বা রাষ্ট্রসংঘের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি বিহারবাসী হইলেও কলিকাতায় থাকিয়া বিদ্যার্জন করেন ও প্রথম কর্ম্মজীবন কলিকাতায়

অতিবাহিত করেন। শেষ গভর্ণর জেনারেল বা বড়লাট শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারীর কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া মাদ্রাজে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে নাকি মাসিক হাজার টাকা পেন্সনও দেওয়া হইবে। রাজেন্দ্রবাবু প্রথম সভাপতি হইয়া এমন কোন আশার কথা বলিতে পারেন নাই, যাহা দ্বারা দেশবাসী বর্ত্তমান সঙ্কটকালে আশান্বিত হইতে পারে। বিহারের বাঙ্গালী-প্রধান স্থানগুলি পশ্চিম বাংলার সহিত সংযুক্ত করার জন্য বাঙ্গালায় যে আন্দোলন চলিতেছে, সে সম্পর্কে রাজেন্দ্রবাবু যদি উদারতা প্রকাশ করিতেন, তবে লোক তাঁহার নির্বাচনে আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিত। ভাষা অনুসারে প্রদেশ বিভাগ স্থির হইলেও পশ্চিমবঙ্গের বেলায় সে সম্বন্ধে কিছু করা হইল না। ময়ূরভঞ্জ উড়িষ্যায় ও খরসোয়ান-সেরাইকোলা বিহারে চলিয়া গেল। মণিপুর ও ত্রিপুরা হয়ত আসামে যাইবে—(অবশ্য এখনও যায় নাই), সিংহভূম, মানভূম, গিরিডি, সাঁওতাল পরগণা, পুর্ণিয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছুই করা হইল না। বিহারবাসী রাজেন্দ্রবাবুর পক্ষে এখন এ সকল বিষয়ে অবহিত হইয়া বাঙ্গালীদের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার সময় আসিয়াছে। সভাপতি পদ-লাভের পর তাঁহার এ সকল কথা চিন্তা করার সময় আছে কিনা কে জানে?

ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ

সর্বার্থ সাধক পরিকল্পনা—

স্বাধীনতা লাভের পর দেশের উন্নতির জন্য মোট ৪৬টি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে—তন্মধ্যে ১৭টির ব্যয় ১ কোটি টাকার কম, ১৬টি ১ হইতে ৫ কোটি টাকার, ৪টি ৫ হইতে ১০ কোটি টাকার ও বাকী ৯টির জন্য ১০ কোটির অধিক টাকা ব্যয় হইবে স্থির হয়। তন্মধ্যে (১) পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে দামোদর পরিকল্পনা (২) উড়িষ্যায় হীরাকুন্দ পরিকল্পনা (৩) যুক্তপ্রদেশে রিহান্দ পরিকল্পনা (৪) পূর্ব্ব পাঞ্জাবে ভাকরানাঙ্গাল পরিকল্পনা (৫) মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদে তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা ও (৬) পশ্চিমবঙ্গে ময়ূর পরিকল্পনা প্রধান। ইহার মধ্যে দামোদর পরিকল্পনা সর্ব্ব বৃহৎ—গত বৎসর উহার তিলাইয়া বাঁধ নির্মিত হইয়াছে ও কোনার বাঁধের কাজ চলিতেছে। ইহা দ্বারা ১০লক্ষ একর পতিত জমীতে শস্য উৎপন্ন হইবে ও অনেক জমীতে বৎসরে ৩টি ফসল ফলিবে। তাহা ছাড়া ২লক্ষ কিলোওয়াট

বিজলী শক্তি দ্বারা ঐ অঞ্চলে ব্যাপক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে। হীরাকুন্দের কার্য্য ১৯৫৪ সালে শেষ হইবে ও মহানদীর উপর তিনটি বাঁধ হইলে সম্বলপুর অঞ্চলে ১০লক্ষ একর পতিত জমীতে চাষ হইবে। ঐ স্থানে ৩লক্ষ কিলোওয়াট বিজলী শক্তিও উৎপন্ন হইবে। ভাকরা নানগাল কার্য্য দ্বারাও ৫৬লক্ষ একর জমীতে চাষের সুবিধা হইবে। তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনাও ১৯৫৪ সালে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। যদি অর্থের যোগান সমানভাবে দেওয়া যায়, তাহা হইলে আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে কৃষি ও ও শিল্পে ভারতকে যথেষ্টভাবে সমৃদ্ধ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। সকল কার্য্যেই দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ভিন্ন সরকারের পক্ষে কার্য্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে না।

শ্রীকালিদাস মিত্র—

ইনি সম্প্রতি পুনায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে খাদ্যবিজ্ঞান শাখার সভাপতি হইয়াছেন। কালিদাসবাবু

ডক্টর কালিদাস মিত্র

প্রবাসী বাঙ্গালী, তাঁহার পিতা যতীন্দ্রলাল মিত্র আরায় (বিহার) উকীল ছিলেন। চুঁচড়ায় কালিদাসবাবুর জন্ম হয় ও বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে আই-এসসি পাশ করিয়া ১৯২৫ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে ইনি এম-বি পাশ করেন। ১৯২৭ সালে বিহারে স্বাস্থ্য বিভাগে কাজ লইয়া ইনি ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে গবেষণা করেন। ইনি ১৯৩১ সালে কলিকাতার ডি-পি-এচ এবং ১৯৩৬ সালে লণ্ডনের ডি-টি-এম্ এণ্ড এচ্ উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে বিহারে 'নিউট্রিসন অফিসার' নিযুক্ত হন। ১৯৪৩ সালে এম-বি-ই হন। ১৯৪৪ সালে বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ নিবারণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪৫ সাল হইতে দিল্লীতে 'নিউট্রিসন ডিরেক্টর' পদে নিযুক্ত আছেন। ১৯৪৬ সালে সিঙ্গাপুরে ভারত সরকারের প্রতিনিধি ছিলেন। এক বৎসর এবাডিনে ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি হিসাবে গবেষণা করিয়াছেন।

ভারতের রাষ্ট্র সংখ্যা—

২৬শে জানুয়ারী ভারতে যে নূতন রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা মোট ২৮টি। নিম্নে রাষ্ট্রগুলির নাম প্রদত্ত হইল—প্রথম ৯টি প্রদেশ বলিয়া লিখিত ছিল—(১) আসাম (২) বিহার (৩) বোম্বাই (৪) মধ্যপ্রদেশ (৫) মাদ্রাজ (৬) উড়িষ্যা (৭) পাঞ্জাব (৮) উত্তর প্রদেশ বা যুক্ত প্রদেশ (৯) পশ্চিম বঙ্গ। কুচবিহার পুর্ব্বেই পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। (১০) হায়দ্রাবাদ (১১) জম্মু ও কাশ্মীর (১২) মধ্যভারত (১৩) মহীশূর (১৪) পাতিয়ালা ও পূর্ব্ব পাঞ্জাব রাষ্ট্র সমূহ (১৫) রাজস্থান (১৬) সৌরাষ্ট্র (১৭) ত্রিবাঙ্কুর-কোচীন (১৮) বিন্ধ্যপ্রদেশ (১৯) আজমীর (২০) দিল্লী (২১) ভূপাল (২২) বিলাসপুর (২৩) কুর্গ (২৪) হিমাচল প্রদেশ (২৫) কচ্ছ (২৬) মণিপুর (২৭) ত্রিপুরা ও (২৮) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। মণিপুর ও ত্রিপুরা কতদিন কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক স্বতন্ত্রভাবে শাসিত হইবে বলা যায় না—ঐগুলি বাংলার অন্তর্গত হওয়া উচিত। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জদ্বয়কে বাঙ্গালার অন্তর্গত করিলে বাঙ্গালীদের বাসস্থান বাড়িবে, দ্বীপগুলিও উন্নতি-লাভ করিবে। অন্যান্য ছোট রাষ্ট্রগুলিকেও পরে পার্শ্ববর্ত্তী বড় রাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলে শাসন ব্যয় কমিবে ও শাসন ব্যবস্থাও ভাল হইবে। আজমীর, ভূপাল, বিলাসপুর, কুর্গ, কচ্ছ প্রভৃতি সম্বন্ধে ঐরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে।

কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ে সাধারণতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপাল ডাঃ কাটজু কর্ত্তৃক খেলাধুলার পুরস্কার দান

২৭শে জানুয়ারী ভারতের প্রধান সেনাপতি ডাঃ কারিয়াপ্পা কর্ত্তৃক কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয় পরিদর্শন

পরলোকে ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র—

সার ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র গত ২৬শে জানুয়ারী সকালে তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৮৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৯০৪ সালে তিনি ব্যারিষ্টার হন ও ১৯২২ সালে বাংলার ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল ও ১৯২৫ সালে এডভোকেট জেনারেল হন। ১৯২৮ সালে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের আইন সচিব হন ও পরে ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৭ পর্য্যন্ত বাংলার শাসন পরিষদের সদস্যের কার্য্য করেন। ১৯৩৭ সালে দিল্লীতে এডভোকেট জেনারেল হন ও সে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বরোদা রাজ্যের দেওয়ান হইয়াছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম দেশীয়-রাজ্য ভারতে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করিয়া বরোদা রাজ্যকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন ও সে বিষয়ে সর্দ্দার পেটেলকে প্রভূত সাহায্য করেন। ১৯৪৭ সালে নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে তিনি পশ্চিম বাংলার অস্থায়ী রাষ্ট্রপাল হইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনাচার তদন্তের জন্য যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার সভাপতি-রূপে কাজ করিতে করিতে তিনি চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন লোক অতি অল্পই দেখা যায়।

পরলোকে নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত—

গত ২২শে জানুয়ারী বিখ্যাত শিল্পপতি নগেন্দ্র-নাথ রক্ষিত ৬৪ বৎসর বয়সে কলিকাতা ৮৪ রসারোডের
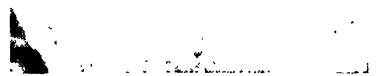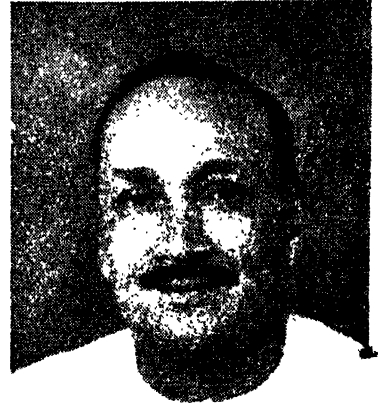
নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত

বাটীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি রেলের কারখানায় শিক্ষানবীশ হইয়া কার্য্যশিক্ষা করেন ও চাকরী না করিয়া ব্যবসা-জীবন গ্রহণ করিয়া পরে টাটানগর আয়রণ ফাউণ্ড্রী ও বেলুড়ের ন্যাশানাল আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কোম্পানীর অন্যতম মালিক হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় গ্রাম বর্দ্ধমান জেলার আকালপৌষে রাস্তা, স্কুল, হাসপাতাল, বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,

তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন ও বিহারী বাঙ্গালী সমিতির সভাপতিরূপে সর্ব্বত্র বাঙ্গালীর সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষায় যত্নবান ছিলেন। দেশের সকল সদনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল।

পরলোকে সুরেন্দ্রনাথ সেন—

এলাহাবাদ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন গত ১০ই জানুয়ারী পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কবি দেবেন্দ্রনাথের নাতা ছিলেন

ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন

এবং মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁর রচিত হিন্দোল, তুষার, বৈকালী, নিদাঘ প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার কবিত্ব শক্তি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি পাঠ্যাবস্থায় কোন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন নাই, তাঁহার অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সর্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন।

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস, দর্শন ও মুসলেম সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-লিট উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি এম-এ ও পি-আর-এস—কিছুকাল ভাগলপুর কলেজে অধ্যাপনার পর তিনি মিশরের কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলেম সংস্কৃতির অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত মিশরের ডায়েরী ও

ডক্টর শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী
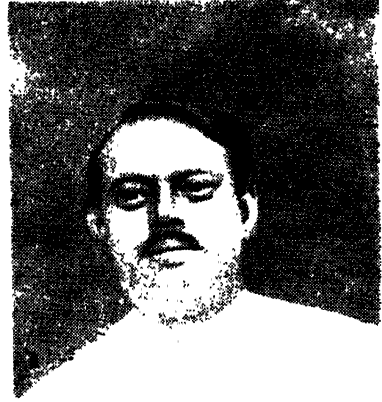
জাহানারার আত্মকাহিনী বাঙ্গালী পাঠক সমাজে আদর লাভ করিয়াছে। তিনি ভারতবর্ষের নিয়মিত লেখক; আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

নেতাজী স্মৃতি—

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ১৮৯৭ সালে ২৩শে জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—তাই গত ২৩শে জানুয়ারী ভারতের সর্ব্বত্র নেতাজী দিবস পালন করিয়া সুভাষচন্দ্রের জীবন ও আদর্শের কথা আলোচনা করা হইয়াছিল। ঐ দিন এবার সরস্বতী পূজা পড়ায় সকল বাণী পূজা প্রাঙ্গণে নেতাজী উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। নেতাজী জীবিত আছেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও দেশবাসী সর্বদা মনে করে যে তিনি জীবিত আছেন এবং যেদিন ভারত তাঁহার প্রয়োজন অনুভব করিবে, সেদিন আবার তিনি আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইবেন। জ্যোতিষীদেরও

বিশ্বাস যে নেতাজী জীবিত আছেন। সেজন্য ভারতবাসী তাঁহার মৃত্যুর কথা চিন্তা পর্য্যন্ত করিতে পারে না। নেতাজী যে বিরাট ত্যাগ, সেবা ও প্রেমের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তিনি যে সাহসিকতা ও বীর্য্য দেখাইয়া গিয়াছেন, ভারতবাসী যদি সে কথা স্মরণ করিয়া নিজেদের জীবন পরিচালন করে, তবে ভারত আবার বিপন্মুক্ত হইয়া প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে। বর্ত্তমান স্বাধীনতাকে প্রকৃত জনকল্যাণজনক করিয়া তুলিতে হইলে আজ সকলকে নেতাজীর আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। নেতাজী দিবসে ভারত যদি সে সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবেই নেতাজী-দিবস পালন করা সার্থক হইয়াছে।

সর্ব্বোদয় দিবস—

গত ৩০শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু দিবসটিকে সর্বোদয়-দিবসরূপে ভারতের সর্বত্র পালন করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। হিংসা, মুনাফাবৃত্তি ও শোষণ ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মূল গলদরূপে বর্ত্তমান। মহাত্মা গান্ধী এই গলদ দূর করিয়া দেশকে কল্যাণের পথে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। সর্বোদয় দিবসে সকলে সেই কথারই আলোচনা করিয়াছেন ও তাহার প্রতীকারের উপায় নির্ণয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মুষ্টিমেয় লোক মূলধন ও বুদ্ধিবৃত্তি সহায়ে উৎপাদক ব্যবস্থার উপর প্রভুত্ব করিতেছে। মোটা আয় ও বেশী রকম সুযোগ সুবিধা আদায় করিয়া তাহারা বিলাস ব্যসনে দিন কাটাইতেছে—অপরদিকে অধিকাংশ লোক কম আয় লইয়া নানারূপ অভাব-অনটনের ভিতর দিন যাপন করিতেছে। এই শ্রেণীর বৈষম্য, বঞ্চনা ও দুঃখগ্লানির জন্য সার্বজনীন কল্যাণ ও সুখশান্তির সকল আশা ও কল্পনা ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। দুর্নীতি ও অনাচার সমাজ জীবনকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। সেজন্য গান্ধীজি সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় একদল কংগ্রেস কর্ম্মী পরস্পর বিবাদ কলহ লইয়া ব্যস্ত, আর একদল পদ লাভে নিজেদের লইয়া উন্মত্ত—আজ গান্ধীজির কথা ভাবিবার বা তাহা কার্য্যে পরিণত করার লোকের সংখ্যা খুবই কম। সেজন্য সর্বোদয় দিবসে সকলের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। শুধু মুখে গান্ধীজির নাম লইয়া তাঁহার আদর্শকে ধ্বংস করার চেষ্টার নিন্দাই করা হইয়াছে। গান্ধীজির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপায়—তাঁহার আদর্শে সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

শ্রীঅশোককুমার মিত্র—

ইনি সম্প্রতি লণ্ডনের ইনিষ্টিটিউসন অফ ইলেকট্রীকাল ইঞ্জিনিয়ার্সের এসোসিয়েট মেম্বার ও আমেরিকার রেডিও এঞ্জিনিয়ার্স ইনিষ্টিটিউটের মেম্বার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীঅশোককুমার মিত্র

বর্ত্তমানে ইনি দমদম বিমান কেন্দ্রের বেতার বিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। ইনি কথা-শিল্পে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন ও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

গো-হত্যা নিবারণ—

প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে জব্বলপুরবাসী মুসলমানগণ ঘোষণা করিয়াছেন যে অতঃপর তাঁহারা আর গো-হত্যা করিবেন না ও গো-মাংস ভক্ষণের অভ্যাস ত্যাগ করিবেন। এই ঘোষণা যদি স্বাভাবিক হয়, ইহার মধ্যে ভীতি না থাকে, তবে এই কার্য্য অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রে গো-হত্যা করিলেই তাহাতে হিন্দু অধিবাসীদের মনে দুঃখ হইবে—অন্য মাংস খাইতে কাহারও আপত্তি নাই। তাহা ছাড়া ভারতে যে ভাবে দ্রুত গো-বংশ ধ্বংস হইতেছে, সেদিক দিয়াই গো-হত্যা বন্ধ করা প্রয়োজন। আমাদের বিশ্বাস, ভারতের সর্বত্র মুসলমানগণ, জব্বলপুরবাসী মুসলমানগণকে অনুকরণ করিয়া দেশরক্ষা ব্যাপারে ভারত-রাষ্ট্রকে সাহায্য

করিবেন। গো-সম্পদের দ্বারা রাজ্যের সমৃদ্ধি বিবেচিত হইবার যোগ্য।

শ্রীসুধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—

গত ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রে যে নূতন সংবিধান (শাসন ব্যবস্থা) অনুসারে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার রচনাকারী শ্রীসুধীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক

শ্রীসুধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

একজন বাঙ্গালী। এই কার্য্যে ইনি সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন—ইহাতে বাঙ্গালী মাত্রেই গৌরব-বোধ করিবেন সন্দেহ নাই। শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতার অধিবাসী, এম-এ, বি-এল পাশ করিয়া কিছুকাল ইনি আলিপুরে ওকালতী করেন ও পরে বাঙ্গালার ব্যবস্থা বিভাগে সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন। বাঙ্গালায় ব্যবস্থা বিভাগের কার্য্যে নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া ইনি কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের আইন বিভাগে কার্য্য পান ও গত ৩বৎসর ধরিয়া ভারত শাসনের নূতন আইন প্রণয়নে সকলকে সাহায্য করেন। সম্প্রতি ইনি ভারতীয় পার্লামেণ্টের জয়েণ্ট সেক্রেটারী পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

রাস্তা নির্ম্মাণ ব্যবস্থা—

ভারতে সম্প্রতি যে পরিমাণে মোটরগাড়ী, বাস, লরি প্রভৃতির প্রচলন হইয়াছে সে পরিমাণে নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ বা কাঁচা রাস্তা পাকা করা করা হইতেছে না। ভারতীয় রোড কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীব্রিজমোহন লাল এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, মোটর প্রভৃতি বাবদ সরকার যে কর আদায় করেন তাহার শতকরা ৪ভাগ রাস্তা নির্ম্মাণে ব্যয় করা উচিত—সে হিসাবে ১৯৪৮-৪৯ সালে সাড়ে ৭ কোটি টাকা রাস্তা নির্ম্মাণে ব্যয়িত হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু মাত্র ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। পল্লীগুলিকে উন্নত করিতে হইলে সর্বপ্রথমে যাতায়াতের ব্যবস্থা প্রয়োজন—সেজন্য ভাল রাস্তা দরকার। আমাদের বিশ্বাস, রাষ্ট্র পরিচালকগণ ভবিষ্যতে এ বিষয়ে অবহিত হইয়া পল্লীবাসীদের পথের অভাব দূর করিবেন। শুধু রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে নহে, জনকল্যাণের জন্যও গ্রামসমূহে যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতি হওয়া প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা—

পশ্চিম বাংলা সরকার প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারের জন্য যে নূতন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, বাংলার প্রধান শিক্ষাবিদ্‌গণ তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। সম্মিলিত প্রতিবাদ বিবৃতিতে বলা হইয়াছে—"সম্পূর্ণ নূতন পাঠ্য-তালিকাসহ সহসা ১৯৫০ সাল হইতে পশ্চিম বাংলা সরকার প্রাথমিক শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে যাইতেছেন দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষার বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার অবশ্যই পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন, কিন্তু সে জন্য সরকারী ব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য নহে। জনপ্রিয় সরকারের পক্ষে জনসাধারণের বিশেষতঃ শিক্ষাবিদ্‌গণের সম্মতি গ্রহণ প্রয়োজন ছিল। নূতন যে শিক্ষাপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহার কার্য্যকারিতায় সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিণামে ক্ষতি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।" এই বিবৃতি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। আশা করি, পশ্চিম বাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগ এ বিষয়ে কর্ত্তব্য পালনে অনবহিত থাকিবেন না।

পরিকল্পনা রচনা—

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর গত জানুয়ারী মাসের অধিবেশনে একটি পরিকল্পনা কমিশন নিয়োগের জন্য ভারতীয় গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে—(১) পরিকল্পনা রচনার সময় কমিশনকে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে—(ক) বিকেন্দ্রীকরণ, সহযোগিতা ও যতখানি সম্ভব ব্যক্তি স্বাধীনতার বিকাশ (খ) সকলের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থা (গ) সকলের জন্য উপযুক্ত জীবিকার ব্যবস্থা (ঘ) মানুষের কাজ করিবার পক্ষে অনুকূল ও উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি (ঙ) সকলের জন্য উপযুক্ত ধর্ম্মসংস্থান ও মনুষ্যত্ব বিকাশের ব্যবস্থা (২) জীবনযাত্রার মানের ক্রমোন্নয়নের জন্য পর্য্যাপ্ত উৎপাদন ব্যবস্থা এবং একটা যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সমাজগত কল্যাণে আবশ্যক সমুদয় জিনিষের নিম্নতম প্রয়োজন উৎপাদন ব্যবস্থা (৩) জাতির সম্পদ ও লোক সম্পদের শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থার এবং উপযুক্ত কারিগরি শিক্ষা ও ট্রেণিংএর সাহায্যে জাতির লোক-সম্পদের বৃদ্ধির উৎকর্ষতা সাধন ও শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা (৪) জীবনযাত্রার উপযুক্ত মান ও দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও বহিরাক্রমণ প্রতিরোধের পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা পূর্ব্বক জাতীয় ও আঞ্চলিক স্বয়ংপূর্ণতা সাধন।

উপরের উদ্দেশ্য সমূহ হইতে কমিশনের কার্য্য কিরূপ হইবে তাহা বুঝা যায়। সকল দেশেই পূর্ব্বে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া কাজ আরম্ভ করা যায়। আমাদের স্বাধীন ভারতে আড়াই বৎসর পরে কর্ত্তৃপক্ষের যে এ বিষয়ে চৈতন্যোদয় হইয়াছে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। আশা করা যায়, কমিশনের কার্য্য শুধু কাগজপত্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে না—তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিবে।

আসামে বাঙ্গালীর অবস্থা—

আসাম হইতে সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেণ্টে ৬ জন নূতন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—তন্মধ্যে ৪ জন অসমীয়া ও ২ জন মুসলমান। আসামের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ বাঙ্গালী—কাজেই অন্তত একজন বাঙ্গালীকে পার্লামেণ্টের সদস্য করা উচিত ছিল। কিন্তু প্রাদেশিকতা সে পথে বাধা দিয়াছে। এ বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

চীন ও আফগানিস্তান—

ভারতীয় রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিভাগ সম্প্রতি চীনের কম্যুনিষ্ট মাও গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়াছেন—তখন পর্য্যন্ত বৃটেন এবিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করেন নাই—আমেরিকাও মাও গভর্ণমেণ্টের বিরোধী। এ বিষয়ে বৃটেন ও আমেরিকার মুখ না চাহিয়া ভারতীয় রাষ্ট্র সাহসিকতার পরিচয় দেওয়ায় শুধু ভারতবাসীর নিকট নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভারতের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় রাষ্ট্র আফগানিস্তানের সহিতও সন্ধি করিয়াছে। কাজ দুইটির ফলে ইংরাজ ও আমেরিকা ভারত সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা ঠিক করিয়া লইতে পারিবে। ভারত ও চীন মিলিত হইলে পূর্ব্ব এসিয়ায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ আর প্রাধান্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। তাহা বিশ্বের পক্ষেই কল্যাণজনক হইবে বলিয়া সকলে আশা করেন।

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

চতুর্থ টেষ্ট ঃ

কমনওয়েলথ ঃ ৪৪৮ ও ২৩৭ (৩ উইঃ ডিক্লেঃ)

ভারতবর্ষ ঃ ৩৮৬ ও ৮৪ (৪ উইকেটে)

কানপুরের গ্রীন পার্ক গ্রাউণ্ডে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ দলের সঙ্গে ভারতীয় দলের চতুর্থ বে-সরকারী টেষ্ট ম্যাচ শেষ পর্য্যন্ত ড্র গেছে। যুক্তপ্রদেশে এই প্রথম টেষ্ট ক্রিকেট খেলা হ'ল। খেলা হয়েছিলো ম্যাটিং উইকেটে লাল পিচের উপর। ক'লকাতার ইডেন উদ্যানে ভারতীয় দল টসে জিতে সৌভাগ্যের যে ভিত্তি স্থাপনা করেছিলো কানপুর তার অগ্রগতির পথে বাধা হ'ল। কমনওয়েলথ দল টসে জিতে ব্যাট করতে নামলো। সূচনা তাদের খুব ভাল হ'ল না। কোন রান না ক'রে দলের মাত্র ২ রানে ওল্ডফিল্ড হাজারীর বলে মন্ত্রীর হাতে ধরা পড়ে বিদায় নিলেন। দ্বিতীয় উইকেট পড়লো দলের ১৯ রানে। এরপর লিভিংষ্টোন এবং ওরেল জুটি হয়ে খেলার পতন রোধ করলেন। দলের ১৭০ রানে লিভিংষ্টোন ৮০ রান ক'রে হাজারের বলে এল-বি-ডবলউ হয়ে আউট হন। প্রথম দিনের খেলার নির্দ্ধারিত সময়ে কমনওয়েলথ দলের ৩ উইকেটে ২৩৬ রান উঠে। ওরেল ১২২ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

১৫ই জানুয়ারী, খেলার দ্বিতীয় দিনে কমনওয়েলথ দলের প্রথম ইনিংস ৪৪৮ রানে শেষ হয়। ওরেল শেষ পর্য্যন্ত ২২৩ রান ক'রে নট আউট থাকেন। হাজারে, গাইকোয়াড় এবং গোলাম মহম্মদ প্রত্যেকে ৩টে ক'রে উইকেট পান। চা-পানের পর ভারতীয় দলের মুস্তাক আলি এবং মানকড় একঘণ্টা ব্যাট ক'রে প্রথম ইনিংসে ৪৬ রান তুলেন।

১৬ই জানুয়ারী, খেলার তৃতীয় দিন ভারতীয় দলের ৫ উইকেট ২৭৯ রান উঠে। মুস্তাকআলী ১২৯ রান করে ট্রাইবের বলে আউট হন। পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য রান ফাদকারের ৬৪। ট্রাইব ৭৩ রানে ৩টে উইকেট পান।

১৭ই জানুয়ারী, খেলার চতুর্থ দিনে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ৩৮৬ রানে শেষ হয়ে যায়। অধিকারী ৬১, কিষণচাঁদ ৩৯ এবং উমীরগড় ২৯ রান করেন। ট্রাইব মোট ৫টা উইকেট পান ১২২ রানে। কমনওয়েলথ দল প্রথম ইনিংসের ৬২ রানে অগ্রগামী থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। কমনওয়েলথ দলের গোড়াতেই দারুণ ভাঙ্গন দেখা দিত যদি না ভারতীয় দল একাধিক ক্যাচ নষ্ট না করতো। নির্দ্ধারিত সময়ে কমনওয়েলথ দলের ১০২ রান উঠে ২ উইকেটে।

১৮ই জানুয়ারী, খেলার পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে কমনওয়েলথ দল তাদের ৩ উইকেটে ২৩৭ রান উঠলে পর ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড ক'রে।

ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা শুভ হ'ল না। একঘণ্টার খেলায় মাত্র ১৮ রানে চারজন নামকরা খেলোয়াড় মুস্তাক আলি, মোদী, মানকড় এবং ফাদকার আউট হয়ে গেলেন। দলের এই দারুণ ভাঙ্গনের মুখে হাজারে এবং অধিকারী এলেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে তাঁরাই শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় দলের সম্মান রক্ষা করলেন। নির্দ্ধারিত সময়ে ৪ উইকেটে ৮৪ রাণ উঠলে পর বে-

সরকারী চতুর্থ টেষ্টম্যাচ খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হল।

কমনওয়েলথ দল: এল লিভিংষ্টোন (অধিনায়ক), এন ওল্ডফিল্ড, ডবলউ প্রেস, এফ ওরেল, এফ ফ্রিয়ার, ডবলউ এ্যালে, ডবলউ ল্যাংডন, জি পোপ, জি ট্রাইব, ডি ফিটজমরিস, এবং এইচ ল্যাম্বাট।

ভারতীয় দল: ভি হাজারে (অধিনায়ক), ভি মানকড়, মুস্তাকআলি, আর মোদী, ডি জি ফাদকার, জি কিষণচাঁদ, এইচ আর অধিকারী, পি উমরীগড়, এম কে মন্ত্রী, এইচ গাইকোয়াড় এবং গোলাম মহম্মদ।

পূর্ববর্ত্তী বে-সরকারী টেষ্ট খেলায় ভারতীয় দলের সাফল্য

১৯৩৫-৩৬: ভারতবর্ষ (১৪৯ ও ৩০১) ৬৮ রাণে লাহোরের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে জ্যাক রাইডারের অষ্ট্রেলিয়ান একাদশ দলকে (১৬৬ ও ২১৬) পরাজিত করে।

১৯৩৫-৩৬: ভারতবর্ষ (১৮৯ ও ১১৬) ৩৩ রাণে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত বে-সরকারী চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচে জ্যাক রাইডারের অষ্ট্রেলিয়ান একাদশ দলকে (১৬২ ও ১০৭) পরাজিত করে।

১৯৩৭-৩৮: ভারতবর্ষ (৩৫০ ও ১৯২) ৯৩ রাণে ইডেন গার্ডেনে অনুষ্ঠিত বে-সরকারী তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে লর্ড টেনিসন দলকে (২৫৭ এবং ১৯২) পরাজিত করে।

১৯৩৭-৩৮: ভারতবর্ষ (২৬৩) এক ইনিংস ও ৬ রাণে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত বে-সরকারী চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচে লর্ড টেনিসনদলকে (৯৪ এবং ১৬৩) পরাজিত করে।

১৯৪৫-৪৬: ভারতবর্ষ (৫২৫ এবং ৯২৪ উইকেটে) ৬ উইকেটে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বে-সরকারী টেষ্ট ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস একাদশদলকে পরাজিত করে।

পৃথিবীর টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

সোয়াথলিং কাপ (পুরুষদের টিম ইভেণ্ট):

পুরুষদের টীম ইভেণ্টে চেকোশ্লোভাকিয়া ৫-৩ খেলাতে গত বছরের বিজয়ী হাঙ্গারীকে পরাজিত ক'রে এ বছর সোয়াথলিং কাপ বিজয়ী হয়েছে।

চেকোশ্লোভাকিয়া 'বিগ্রুপে' প্রথম স্থান অধিকার করে ৮টা খেলায় জয়ী হয়ে, কোন খেলায় পরাজিত না হয়ে।

অপরদিকে হাঙ্গারী 'এগ্রুপে' প্রথম হয় ৬টি খেলায় জয়ী হয়ে, কোন খেলায় না হেরে।

এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের খেলার ফলাফল—জয়—২, হার—৪।

কোর্বিলোন কাপ (মহিলাদের টিম ইভেণ্ট):

মহিলাদের টীম ইভেণ্টের ইণ্টার গ্রুপের ফাইনালে রুমানিয়া ৩-২ খেলায় হাঙ্গারীকে হারিয়ে এ বছর কোর্বিলোন কাপ বিজয়ী হয়েছে।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

পুরুষদের ডবলসে—রিচার্ড বার্জম্যান (বৃটেন) ১২-২১, ১৫-১৮, ২১-৭, ২১-১৪, ২১-১৩ পয়েণ্টে এফ সোসকে পরাজিত ক'রে পুনরায় পৃথিবীর টেবল টেনিস বিজয়ী হয়েছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি ১৯৩৭, ১৯৩৯ এবং ১৯৪৮ সালে বিজয়ী হন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে—মিস এ্যাঙ্গেলিয়ার রোসিনু (রুমানিয়া) ২২-২০, ২১-১৫, ২১-২৮ পয়েণ্টে পূর্ব্ব বিজয়ী মিস সিজি ফার্কসকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলসে—এফ সিডো এবং এফ সোস (হাঙ্গেরী) ১৫-২১, ২১-১৬, ২১-১৩, ২১-১৭ পয়েণ্টে জে এনড্রিউস এবং এফ টোকারকে (চেকোশ্লোভাকিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলসে—মিস ভি বিরেগী (ইংলণ্ড) ও মিস এইচ ইলিয়ট (স্কটল্যাণ্ড) ১৩-২১, ২১-১১, ২১-১৯, ২১-১৭ পয়েণ্টে মিস জি ফার্কাস (হাঙ্গেরী) এবং মিস এ রোসিনুকে (রুমানিয়া) পরাজিত করেন।

ন্যাশনাল লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার কোন বিভাগীয় ফাইনালে ভারতীয় টেনিস খেলোড়গণ খেলবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নি। ভারতীয় এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় এবং এশিয়ান সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান দিলীপ বসু প্রতিযোগিতার তৃতীয় রাউণ্ডে যুগোশ্লাভিয়ার ডি মিটিকের কাছে ২-১ সেটে পরাজিত হন। প্রথম সেটে দিলীপ বসু বিজয়ী হন। ফাইনালে গা না লাগিয়ে খেলার দরুণ দিলীপ বসু শেষ পর্য্যন্ত নিজ নাম অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি। ভারতীয় ২নং খেলোয়াড় সুমন্ত মিশ্র সেমি-ফাইনালে এম্পোনের

কাছে পরাজিত হ'ন। স্কোর ছিল, ৮-৬, ৫-৭, ৩-৬, ৬-০, ৬-৩।

ফাইনাল ফলাফল ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলসে এফ এম্পোন (ফিলিপাইনস) ৫-৭, ৮-৬, ৮-৬, ৬-১ সেটে পি ম্যাসপিকে (স্পেন) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে মিসেস পি টড (আমেরিকা) ৬-২, ৬-২, সেটে জি মর্গানকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলসে এফ এম্পোন এবং সি কার্মোনা (ফিলিঃ) ৬-২, ৬-৮, ৬-২, ৬-২ সেটে পি ম্যাসপি এবং জে বার্টোলিকে (স্পেন) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে মিসেস পি টড (আমেরিকা) এবং ডি মিটিক (যুগোশ্লাভিয়া) ৪-৬, ৬-৩, ৭-৫, সেটে মিস জি মর্গান (আমেরিকা) এবং পি ওয়াসারকে (বেলজিয়াম) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলসে মিসেস টড এবং মিস জি মর্গান (আমেরিকা) ৬-৩, ৯-৭ সেটে মিস জিন কুইর-টিয়ার এবং মিস জেম হোচিংকে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

প্রাদেশিকব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা ঃ

কলকাতায় ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটুটে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় বোম্বাই ৩-১ গেমে বাঙ্গলা প্রদেশকে পরাজিত করেছে।

ফলাফল—

পুরুষদের সিঙ্গলসে জর্জ্জ লুইস (বোম্বাই) ১৫-৭ ও ১৭-১৫ পয়েণ্টে সুনীল বসুকে (বাঙ্গলা) পরাজিত করেন।

পুরুষদের সিঙ্গলসে মনোজ বসু (বাঙ্গলা) ১৫-১৩ ও ১৫-১ পয়েণ্টে এইচ ফেরীরাকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে মিসেস এন লুইস (বোম্বাই) ১১-২ ও ১১-৪ পয়েণ্টে কুমারী পি বসুকে (বাঙ্গলা) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে জর্জ্জ লুইস ও মিসেস লুইস (বোম্বাই) ১৫-৬, ৪-১৫ ও ১৫-৩ পয়েণ্ট কেশবদত্ত ও মিস গসকে পরাজিত করেন।

পূর্ব্বাপর বৎসরের বিজয়ীগণ

১৯৪৪—দিল্লী ; ১৯৪৫—পাঞ্জাব ; ১৯৪৬—পাঞ্জাব ; ১৯৪৮—খেলা হয়নি ; ১৯৪৯—বোম্বাই—

অল্ ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসীপঃ

ক'লকাতায় ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটুটে অনুষ্ঠিত অল্ ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার পুরুষদের ডবলসের ফাইনাল খেলাটি সবদিক থেকে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষের ১নং ও ২নং খেলোয়াড় দেবন্দর মোহন এবং জর্জ লুইস নিজ প্রদেশের ম্যাগুইও উল্লালের কাছে পরাজিত হন।

ফাইনাল ফলাফল :

পুরুষদের সিঙ্গলসে দেবন্দর মোহন (বোম্বাই) ১৫-৬, ১৫-৪ পয়েণ্টে জর্জ লুইসকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে মিস পি গস (বাঙ্গলা) ১১-৭, ১১-৫ পয়েণ্টে এন লুইসকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলসে ম্যাগুইও উল্লাল (বোম্বাই) ১৯-১৫, ১৫-১২, ১৭-১৪ পয়েণ্টে জি লুইস ও দেবন্দর মোহনকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলসে মিসেস আচার্য্য এবং মিস টাণ্ডি (ইউপি) ১৫-১২, ১০-১৫ ও ১৫-৮ পয়েণ্টে মিস পি গস ও মিস পি বসুকে (বাঙ্গলা) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে মিঃ এবং মিসেস লুইস (বোম্বাই) ১৫-১১, ১১-১৫, ১৫-১২ পয়েণ্টে এইচ ফেরীরা ও মিস বি ফেরাসকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু

১৩১নং প্যাঁচ

যদি কেহ ডান হাত দিয়া ঘুষি মারিতে আসে তৎক্ষণাৎ দুই হাত দিয়া তাহার ডান মুঠোটি ধরিয়া (১৩১নং প্যাঁচের

১৩১নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

১ম চিত্র) ও বাঁ পা-টি তাহার ডান পায়ের ডান ধারে আগাইবার সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকে পুরাভাবে ঘুরিয়া হাতটি

১৩১নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

নিচে নামাইতে নামাইতে বাঁ 'গুলি' তাহার ডান কনুইয়ের পিছন দিকে লাগাইয়া (১৩১নং প্যাঁচের ২য় চিত্র) বাঁ

১৩১নং প্যাঁচের ৩য় চিত্র

দিকে কাৎ হইতে হইতে তাহার গোড়াতে, কনুইয়ে ও কব্জিতে চাড় দিতে দিতে (১৩১নং প্যাঁচের ৩য় চিত্র)

১৩১নং প্যাঁচের ৩য় চিত্র

ঝোঁক দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারা যাইবে (১৩১নং প্যাঁচের ৪র্থ চিত্র) (ক্রমশঃ)

তোমায় লাভই পরম পাওয়া

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

জীবনের চল্‌তি পথে হঠাৎ হ'লো মনে,—
তোমায় আমার হয়নি ডাকা ক্ষণে কি অক্ষণে!
পেলাম বাধা প্রতিদিনের করার কাজে মোর;
পিছন্ ফিরে চিন্‌নু তোমা শিথিল মনের জোর!
রিক্ত হিয়ার ব্যর্থ-রোদন হ'লোই এতো কাল,
আপন্ নিয়ে চলতে গিয়ে ছিন্ন তরীর পাল।
জোয়ার, ভাঁটা এলো গেলো এ মোর চলা পথে,
তোমার কথা জানিয়ে দিল বানের ধ্বংস রথে।
চিনিয়ে তোমা বললো ডাকি 'জীবন দুখের বোঝা,
অনন্ত কাল ধরেই শুধু অনন্তেরে খোঁজা'।
এত দিনে পেলাম তোমা নিবিড় বানের টানে—
স'রে গেলে—বন্ধু কেন, কিসের অভিমানে?
—পড়লো মনে তোমায় আমায় কত দিনের চেনা;
দেবার মত নেইকো কিছুই শুধ্‌তে তোমার দেনা।
শেষের নতি জানাই তোমায় ওগো অন্তর্য্যামী,—
তোমায় লাভই পরম পাওয়া—ভুল্‌বো না তো আমি।
দুঃখ যখন দেবেই প্রভু, ধৈর্য্য দিয়ো মনে;
সে যেন না বিরোধ ঘটায় তোমায় আমার সনে।

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

ধীরেন্দ্রনাথ প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "দক্ষিণেশ্বর" (১ম খণ্ড)—২৲
শ্রীবটকৃষ্ণ মণ্ডল-অনূদিত কাব্যগ্রন্থ "এলিজি"—১।০
শ্রীফণিভূষণ রায় প্রণীত "বঙ্গের রাজনৈতিক বর্ণ পরিচয়"—১৲
শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত পত্রসমষ্টি "তন্ময়"—৩।০
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত জীবনী "ক্ষুদিরাম"—॥০

রেকর্ড সমালোচনা

(জানুয়ারী মাসের—এইচ্-এম্-ভরি বাংলা রেকর্ড)

চারণদল অভিনীত "যেন ভুলে না যাই" N 31157—রেকর্ডখানি পরবশ ভারতের ব্যথার ইতিহাস, জাতির স্বাধীনতার সংগ্রাম কাহিনী। শান্তিনিকেতনের সংগীত ভবনের শিক্ষিকা শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোঃ N 31149—রেকর্ডে, তাঁর অনুভূতিমুখর কণ্ঠে এবার যে দু'খানি রবীন্দ্রগীতি পরিবেশন ক'রে ছন তা গীতিনৈপুণ্যে সমৃদ্ধ হয়েছে। সুরসাগর জগন্ময় মিত্রের দু'খানি আধুনিক গান "প্রেমের তাজমহল" ও "আমি স্বপন দেখেছি কাল রাতে" N 31148—শিল্পীর প্রতিষ্ঠিত গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। গাজীর গাদের ঢংএ নারায়ণ নন্দী ও সম্প্রদায় N 31151—রেকর্ডে যে গান দু'খানি পরিবেশন ক'রেছেন, তা আজকের দিনের সাধারণ মানুষের ব্যথার অভিব্যক্তি। মহীতোষ চট্টোঃ ও সম্প্রদায় অভিনীত "সোনার দেশে খোকন" N 31150—ছোটদের এক সোনার স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে যাবে। দেশের শিশুরা—যারা আগামী কালের নাগরিক, তাদের প্রাণের প্রাচুর্য এনে দিতে এমনি ধরণের গাথার বিশেষ প্রয়োজন আছে। "ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে মোদের বাঁধন টুটবে" N 31154—আর "কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল্ কর্‌রে লোপাট" N 31152—বাঙ্গালীর এই প্রিয় গান দু'খানি সুগীত হয়েছে। এ ছাড়া "বামুনের মেয়ে" হ'তে "রাধার কি হ'ল" (কীর্ত্তন) N 31155 রেকর্ডে ও "উল্টোরথ" হ'তে দু'খানি গান N 37153 রেকর্ডে সুনিপুণ ভাবে পরিবেশিত হয়েছে।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—মণি গাঙ্গুলী　　　প্রাণ ও প্রিয়া　　　ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

চৈত্র—১৩৫৬
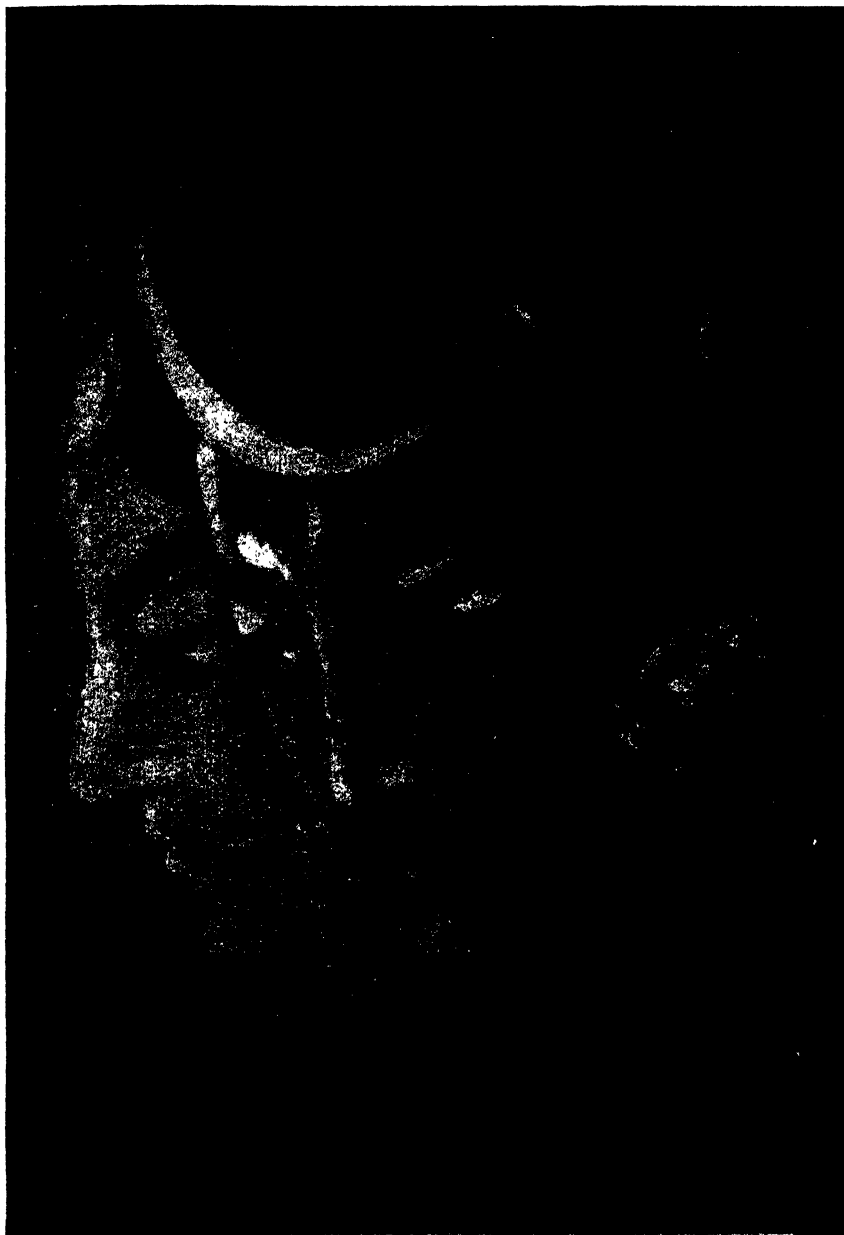
দ্বিতীয় খণ্ড | সপ্তত্রিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

প্রাচীন উড়িষ্যায় স্ত্রীরাজ্য

ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-আর-এস, পি-এচ-ডি

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে অনেক রাজকার্য্যপরিচালিকা মহিলার উল্লেখ দেখা যায়। ভারতীয় সাহিত্যে স্ত্রীরাজ্য-সংজ্ঞক একটি রাষ্ট্রের নামও পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ উহা হিমালয়ের সানুদেশে অবস্থিত ছিল এবং রাজ্যটির শাসনভার স্ত্রীলোকগণ কর্তৃক পরিচালিত হইত। কিন্তু এই স্ত্রীরাজ্যের শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় নাই। যে সকল মহিলা প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কাকতীয়বংশীয়া রাণী রুদ্রাম্বা বা রুদ্রম্মর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিঃসন্তান অবস্থায় কাকতীয়রাজ গণপতির মৃত্যু হইলে ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে রুদ্রাম্বা সিংহাসনে আরোহণ করেন। দীর্ঘ একত্রিশ বৎসরকাল তিনি দক্ষিণ ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলস্থিত বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ভেনিস্‌বাসী পর্য্যটক মার্কোপোলো রাণী রুদ্রাম্বার শাসনদক্ষতার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বিদর্ভ অর্থাৎ বেরার অঞ্চলের বাকাটকবংশীয় নরপতি দ্বিতীয় রুদ্রসেনের মৃত্যু হইলে তদীয় মহিষী প্রভাবতী গুপ্তা 'যুবরাজের জননী'রূপে প্রায় তের বৎসর কাল বাকাটক রাজ্যের শাসনভার পরিচালনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন কাশ্মীরের ইতিহাসে রাণী দিদ্দার নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি কাশ্মীর-রাজ ক্ষেমগুপ্তের (৯৫০-৫৮ খ্রী') মহিষী ছিলেন। স্বামীর রাজত্বকালেই তিনি যথেষ্ট প্রভাব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ক্ষেমগুপ্তের মুদ্রায় "দি-ক্ষেম" অর্থাৎ দিদ্দা-ক্ষেম লিখিত দেখা যায়। ক্ষেমগুপ্ত মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাঁহার পুত্র অভিমন্যু এবং তিনজন পৌত্র ৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; কিন্তু এই সময়ে বিধবা রাণী দিদ্দাই কাশ্মীরের রাজনীতি ক্ষেত্রে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। অতঃপর তিনি স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণপূর্ব্বক বাইশ বৎসরকাল রাজ্যশাসন

করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সংখ্যার দিক্ হইতে দেখিলে প্রাচীন উড়িষ্যার ইতিহাসেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক রাষ্ট্রপালিকা মহিলার উল্লেখ দেখা যায়। উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ ভৌম-কর বংশের শাসন সময়ে দীর্ঘকালের জন্য ঐ দেশে প্রকৃতপক্ষেই 'স্ত্রীরাজ্য' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রাচীনকালে উড়িষ্যাদেশে গোস্বামিনী নাম্নী জনৈক মহিলা রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃত কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তাঁহার শাসনকালে প্রজাগণ যে সুখে শান্তিতে বাস করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ ভৌম-কর বংশীয় রাজা দ্বিতীয় শুভাকর অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, রাণী গোস্বামিনীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াই প্রজাগণ রাজমাতা ত্রিভুবনমহাদেবীকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল। রাণী ত্রিভুবনমহাদেবীর শাসনকালের কতিপয় তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনি কয়েক বৎসর রাজত্ব করিবার পর তাঁহার পৌত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন।

উপরে আমরা উড়িষ্যায় যে 'স্ত্রীরাজ্য' প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করিয়াছি, উহা ভৌম-করবংশের রাজত্বের শেষ দিকের ঘটনা। রাজা চতুর্থ-শুভাকর সম্ভবতঃ অপুত্রক অবস্থায় স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার পর গৌরী নাম্নী তাঁহার অন্যতমা মহিষী সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই সময় হইতে উপর্য্যুপরি চারিজন মহিলা ভৌম-করদিগের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। রাণী গৌরীমহাদেবীর পর তাঁহার কন্যা দণ্ডিমহাদেবী রাজ্যলাভ করেন। অতঃপর উড়িষ্যার সিংহাসন দণ্ডিমহাদেবীর বিমাতা ভঞ্জকুলসম্ভূতা বকুলমহাদেবীর করতলগত হয়। বকুলমহাদেবীর পরে রাজা চতুর্থ শুভাকরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা মহিষী ধর্ম্মমহাদেবী সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। ইতিহাসে সাধারণতঃ দেখা যায়, রাজা অপুত্রক অবস্থায় স্বর্গারোহণ করিলে, মৃত রাজার সিংহাসন রাজবংশীয় অপর কোন পুরুষের দ্বারা অধিকৃত হয়। কখনও কখনও মৃত রাজার দূর-সম্পর্কীয় কোন আত্মীয়কেও উত্তরাধিকার লাভ করিতে দেখা যায়। আবার কখনও বা বিধবা রাজ-মহিষী কাহাকেও দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে স্থাপন করিতেন। কিন্তু উড়িষ্যার ভৌম-করদিগের ইতিহাসে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারণ করা কঠিন। সম্ভবতঃ প্রাচীন উড়িষ্যাবাসিগণের পক্ষে স্ত্রীলোকের শাসন অনাকাঙ্ক্ষিত মনে করিবার কোন গুরুতর কারণ উপস্থিত হয় নাই।

উড়িষ্যার ভৌম-করবংশীয়দিগের রাজ্য মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ হইতে গঞ্জাম্ জেলার পূর্ব্বাঞ্চল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই দেশের নাম ছিল তোসলী বা তোসলা। অতি প্রাচীনকালে তোসলী নগরী উড়িষ্যাঞ্চলে অবস্থিত কলিঙ্গ রাজ্যের রাজধানী ছিল। ভুবনেশ্বরের নিকটবর্ত্তী ধৌলি সম্ভবতঃ প্রাচীন তোসলী নগরীর অবস্থান নির্দ্দেশ করে। কালক্রমে ঐ নগরীর নাম সমগ্রদেশের প্রতি প্রযুক্ত হয়। ভৌম-করদিগের শাসনাধীন তোসলী রাজ্য উত্তর তোসলী এবং দক্ষিণ তোসলী নামক দুইটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। বিরজা এবং গুহেশ্বরপাটক নগরে ভৌম-কররাজগণের রাজধানী ছিল। সম্ভবতঃ এই দুইটিই বর্ত্তমান যাজপুরের প্রাচীন নাম।

ভৌম-করবংশীয় রাজগণ সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় সপ্তম, অষ্টম এবং নবম শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তাম্রশাসন সমূহে একটি অব্দ বা সালের ব্যবহার দেখা যায়। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই সালটি ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত হর্ষসংবৎ ব্যতীত আর কিছু নহে। আঙ্গুল-ঢেঙ্কানল অঞ্চলের নন্দ বা নন্দোদ্ভবংশীয় রাজা ধ্রুবানন্দের তাম্রশাসনে এবং খিজিঙ্গকোট্ট অর্থাৎ আধুনিক ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত খিচিঙ্গের আদিভঞ্জবংশীয় নরপতি রণভঞ্জের দুইখানি তাম্রশাসনে ঐ সালের ব্যবহার দেখা যায়। সম্ভবতঃ এই দুইটি রাজবংশ প্রথমে ভৌম-করবংশীয় রাজগণের অধীনতা স্বীকার করিত। পরে ভৌম-করদিগের দুর্ব্বলতার সুযোগে ইহারা প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করে। এই ধারণা সত্য হইলে আধুনিক আঙ্গুল, ঢেঙ্কানল, ময়ূরভঞ্জ ও কেওনঝড় অঞ্চলে ভৌমকরদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত রাণী দণ্ডিমহাদেবীর একখানি তাম্রশাসনে এই ধারণা সমর্থিত হয়।

কিছুকাল পূর্ব্বে ভুবনেশ্বরে অবস্থিত উড়িষ্যা প্রাদেশিক চিত্রশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহী মহাশয় পরীক্ষার্থ আমার নিকট একখানি তাম্রশাসন প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে লিখিত হইয়াছে যে, ১৮০ অব্দে

সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে পরমভট্টারিকা মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বরী দণ্ডিমহাদেবী ধর্ম্মগাটিনামক গ্রামবাসী জনৈক ব্রাহ্মণকে একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, লিপিতে যে অব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে উহাকে অনেকে হর্ষসংবতের সহিত অভিন্ন মনে করিয়া থাকেন। তাহা হইলে ঐ ১৮০ অব্দকে খ্রীষ্টীয় ৭৮৬ অব্দ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। খ্রীষ্টীয় ৭৮৬ অব্দে দুইবার সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল। প্রথমটি ৩রা এপ্রিল তারিখে এবং দ্বিতীয়টি ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে। ইহার কোন একটি সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে রাণী দণ্ডিমহাদেবী ব্রাহ্মণকে গ্রাম দান করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। উক্ত গ্রামটি যমগর্ত্তা-মণ্ডলের অধিপতি ভূদস্যাব নামক রাজার অনুরোধে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই রাজা রাণী দণ্ডিমহাদেবীর জনৈক সামন্ত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং উল্লিখিত যমগর্ত্তামণ্ডল দণ্ডিমহাদেবীর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু যমগর্ত্তামণ্ডল ঠিক কোথায় অবস্থিত ছিল, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। ইহা যে আধুনিক অনুগুল এবং বোনাইগড় অঞ্চল ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল, এইরূপ অনুমান করিবার কিছু কারণ আছে। উড়িষ্যার তুঙ্গবংশীয় নরপতি গয়াড়তুঙ্গ এবং বিনীততুঙ্গের কতিপয় তাম্রশাসন ঐ অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। তাম্রলিপিতে তুঙ্গবংশীয় রাজগণ যমগর্ত্তামণ্ডলের অধীশ্বররূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। আবার গয়াড়তুঙ্গের নাম হইতেও মনে হয় যে, পূর্ব্বে এই তুঙ্গবংশ ভৌমকর-বংশের অধীন ছিল। কারণ গয়াড় নামটি কিছু অসাধারণ বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু ভৌম-করবংশে অন্ততঃ দুইজন নরপতির এই নাম দেখা যায়। যাহা হউক, যমগর্ত্তামণ্ডলাধিপতি ভূদস্যাব তুঙ্গবংশেরই জনৈক আদিনরপতি ছিলেন কিনা, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না; কিন্তু যমগর্ত্তামণ্ডল আধুনিক অঙ্গুল-বোনাই অঞ্চলে অবস্থিত ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এই অঞ্চল রাণী দণ্ডিমহাদেবীর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। দণ্ডি-মহাদেবী যে গ্রাম দান করিয়াছিলেন, উহা তমুর সংজ্ঞক বিষয় অর্থাৎ জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ এই তমুর অর্থাৎ আধুনিক অঙ্গুলের অন্তর্গত তালমুল ব্যতীত অপর কিছু নহে। দণ্ডিমহাদেবীর শাসনকালে ভৌম করবাজ্যের সীমা অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়াই বোধ হয়।

দণ্ডিমহাদেবীর লিপিতে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরবর্ত্তী-কালের অবস্থা নিম্নোদ্ধৃত হৃদয়গ্রাহী শ্লোকসমূহে লিখিত হইয়াছে।—

> তস্য ত্রিবিষ্টপজুষঃ পরমেশ্বরস্য
> দেবী সমস্তজনতানতপাদপদ্মা।
> সিংহাসনং শশিকলামলকান্তিগৌরী
> গৌরীব গৌরবপদং চিরমধ্যরোহৎ॥
> ততো দণ্ডীমহাদেবী সুতা তস্য মহীয়সী।
> মহামহীনসামর্থ্যা চিরকালমপালয়ৎ॥
> অবিচ্ছিন্নায়তিঃ পাংশৌ বংশে করমহীভৃতাম।
> চিকীর্ষুরা শতাকের যা বভূব বিভূষণম॥
> মানস্যামূর্তিসৌন্দর্য্যসন্দর্ভা দধতী বপুঃ।
> যা রাজচন্দ্রলেখেব বিলসৎকান্তিচন্দ্রিকা।

ইহাতে দণ্ডিমহাদেবীর দৈহিক সৌন্দর্য্যেরও উল্লেখ দেখা যায়। রাণীর শাসনদক্ষতা, পরাক্রম এবং অন্যান্য গুণাবলী সম্বন্ধে তাঁহার সভাকবি আরও লিখিয়াছেন—

> তস্যাঃ প্রতাপনতদুর্দ্দমশত্রুভূপ-
> মৌল্যগ্রধৌতনখচন্দ্রকমণ্ডলানি।
> পাদাম্বুজদ্যুতিবনান্তরমন্থরাঙ্ক
> লক্ষ্মীনিবেশকরবিন্দদলোল্লসিতা॥
> উদ্যানেষু শিলীমুখাবলীবধো হারেষু মুক্তাস্থিতি-
> দোষাসঙ্গকৃতি প্রাকারকরণে বিক্ষেপ সন্দেহতা।
> রাত্রৌ তীক্ষ্ণকরগ্রহঃ কুমুদিনী প্রান্তোদয়ঃ কেবলং
> কান্তাকুন্তলসন্ততৌ কুটিলতা যস্যাঃ প্রভুত্বে ভুবি॥
> রম্যালোকোৎসুকিতনয়নানন্দপীযূষবর্ত্তিঃ
> সেবাসক্তাখিলক্ষিতিপতিসভাপদ্মিনীরাজহংসী।
> কালেয়োত্থিতপিঞ্জরকুন্তলধনস্বর্ণযষ্টি-
> র্যা নিঃশেষপ্রণয়িসুমনোনন্দনোদ্যানলক্ষ্মীঃ॥

অবশ্য এই প্রশংসার কতখানি তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য এবং কতখানি কবিসুলভ অতিশয়োক্তি, তাহা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে। কারণ রাণী ধর্ম্মমহাদেবীর তাম্রশাসনে শ্লোকগুলি তাঁহার প্রতি আরোপিত দেখা যায়। কিন্তু প্রথমে এইগুলি দণ্ডিমহাদেবীকে উপলক্ষ করিয়াই রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

কালের মন্দিরা

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মন্দিরা ভবন

রাজপুরী হইতে বাহির হইতে গিয়া সুগোপা দেখিল তোরণদ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এমন প্রায়ই ঘটে, সেজন্য সুগোপার গতিবিধি বাধাপ্রাপ্ত হয় না। সে প্রতীহারকে গুপ্তদ্বার খুলিয়া দিতে বলিল।

কোনও অজ্ঞাত কারণে প্রতীহারের মনে তখন কিঞ্চিৎ রস সঞ্চার হইয়াছিল; সে নিজের দ্বিধা-বিভক্ত চাপদাড়িতে মোচড় দিয়া একটা আদি-রসাশ্রিত রসিকতা করিয়া ফেলিল। সুগোপাও ঝাঁঝালো উত্তর দিল। সেকালে আদিরসটা গো-রক্ত ব্রহ্মরক্তের মত অসেব্য বিবেচিত হইত না।

তোরণের কবাটে একটি চতুষ্কোণ দ্বার ছিল, বাহির হইতে চোখে পড়িত না। সুগোপার ধমক খাইয়া প্রতীহার তাহা খুলিয়া দিল, বলিল—'ভাল কথা, দেবদুহিতার ঘোড়াটা মন্দুরায় ফিরিয়া আসিয়াছে।'

সবিস্ময়ে সুগোপা বলিল—'সে কি! আর চোর?'

মুণ্ড নাড়িয়া প্রতীহার বলিল—'চোর ফিরিয়া আসে নাই।'

'তুমি নিপাত যাও।—দেবদুহিতাকে সংবাদ পাঠাইয়াছ?'

'যবনীর মুখে দেবদুহিতার নিকট সংবাদ গিয়াছে, এতক্ষণ তিনি পাইয়া থাকিবেন।'

সুগোপা অনিশ্চিত মনে ক্ষণেক চিন্তা করিল, তারপর সন্তর্পণে ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। প্রতীহার কৌতুকসহকারে বলিল—'এত রাত্রে কি চোরের সন্ধানে চলিলে?'

'হাঁ।'

প্রতীহার নিশ্বাস ফেলিল—'ভাগ্যবান চোর! দেখা হইলে তাহাকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিও।'

'তাই দিব। চোরের সংসর্গে রাত্রিবাস করিলে তোমার রস কমিতে পারে।' সুগোপা দ্বার উত্তীর্ণ হইল।

প্রতীহার ছাড়িবার পাত্র নয়, সে উত্তর দিবার জন্য দ্বারপথে মুখ বাড়াইল। কিন্তু সুগোপা তাহার মুখের উপর সজোরে কবাট ঠেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে নগরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

সুগোপা যতক্ষণ মন্দিরা গৃহে পতি অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে সেই অবকাশে আমরা চিত্রকের নিকট ফিরিয়া যাই।

কপোতকূটে প্রবেশ করিয়া চিত্রক উৎসুক নেত্রে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চলিল। নগরীর শোভা দেখিবার আগ্রহ তাহার বিশেষ ছিল না। প্রথমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইবে, প্রায় এক অহোরাত্র কিছু আহার হয় নাই। কটিবন্ধন দৃঢ় করিয়া জঠরাগ্নিকে দীর্ঘকাল ঠেকাইয়া রাখা যায় না, ক্লেশ যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা সহ্য করিতে হইয়াছে; কিন্তু দ্যূত প্রসাদাৎ এখন আর ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিবার প্রয়োজন নাই।

পথে চলিতে চলিতে শীঘ্রই একটি মোদক ভাণ্ডার তাহার চোখে পড়িল। থরে থরে বহুবিধ পক্কান্ন সজ্জিত রহিয়াছে—পিষ্টক লড্ডুক ক্ষীর দধি কোনও বস্তুরই অভাব নাই। মেদমসৃণ-দেহ মোদক বসিয়া দীর্ঘ খর্জ্জুর শাখা দ্বারা মক্ষিকা তাড়াইতেছে।

মোদকালয়ে বসিয়া চিত্রক উদরপূর্ণ করিয়া আহার করিল। একটি বালক পথে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিষ্টান্ন নিরীক্ষণ করিতেছিল, চিত্রক তাহাকে ডাকিয়া একটি লাড্ডু দিল। উৎফুল্ল বালক লাড্ডু খাইতে খাইতে প্রস্থান করিলে পর, সে জল পান করিয়া গাত্রোত্থান করিল; ভোজ্যের মূল্যস্বরূপ শশিশেখরের থলি হইতে

একটি ক্ষুদ্র মুদ্রা লইয়া মোদককে দিল, তারপর তৃপ্তি-মন্থর পদে আবার পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

গৃহদ্বারে তখন দুই একটি বর্তি জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে; গৃহস্থের শুদ্ধান্তঃপুর হইতে ধূপ কালাগুরুর গন্ধ বাতাসে ভাসিতেছে, প্রদীপ হস্তে পুরনারীগণ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া গৃহদেবতার অর্চনা করিতেছে। কচিৎ দেবমন্দির হইতে আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি উত্থিত হইতেছে। দিবাবসানের বৈরাগ্য-মুহূর্তে নগরী যেন ক্ষণকালের জন্য যোগিনীমূর্তি ধারণ করিয়াছে।

অপরিচিত নগরীর পথে বিপথে চিত্রক অনায়াস চরণে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। হাতে কোনও কাজ নাই, উদর পরিপূর্ণ—সুতরাং মনও নিরুদ্বেগ। যে-ব্যক্তি রাজপুরুষের ঘোড়া চুরি করিয়াছিল তাহাকে মাত্র তিনজন দেখিয়াছে, তাহারা চিত্রককে এই জনাকীর্ণ পুরীতে দেখিতে পাইবে সে সম্ভাবনা কম। দেখিতে পাইলেও তাহার নূতন বেশে চিনিতে পারিবে না। অতএব নগর পরিদর্শনে বাধা নাই।

নগর পরিভ্রমণ করিয়া চিত্রক দেখিল, উজ্জয়িনী বা পাটলিপুত্রের ন্যায় বৃহদায়তন না হইলেও কপোতকূট বেশ পরিচ্ছন্ন ও সুদৃশ্য নগর। সে তাহার যাযাবর যোদ্ধৃজীবনে বহু স্থানীয় মহাস্থানীয় দেখিয়াছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র অসমতল পাষাণ নগরটি তাহার বড় ভাল লাগিল। সে ঈষৎ ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিল, এখানে দীর্ঘকাল থাকা চলিবে না, বেশী দিন থাকিলেই ধরা পড়িবার ভয়। এদিকে তিনজন তো আছেই, তাহা ছাড়া শশিশেখর যে বন হইতে বাহির হইয়া আসিবে না তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?

ক্রমে রাত্রি হইল; আকাশে চন্দ্র ও নিম্নে বহু দীপের জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রাজভবন শীর্ষে দীপাবলি মণিমুকুটের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঘুরিতে ঘুরিতে চিত্রক একটি উদ্যানের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল, কয়েকজন ভদ্র নাগরিক দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছে। সে একজনকে জিজ্ঞাসা করিল—'মহাশয়, ওটা কি?'

নাগরিক বলিল—'ওটা রাজপুরী।'

সপ্রশংস নেত্রে রাজপুরী নিরীক্ষণ করিয়া চিত্রক বলিল—'অপূর্ব প্রাসাদ। মগধের রাজপুরীও এমন সুরক্ষিত নয়। রাজা ঐ পুরীতে থাকেন?'

নাগরিক বলিল—'থাকেন বটে, কিন্তু বর্তমানে তিনি রাজপুরীতে নাই। তাই তো এরূপ অঘটন সম্ভব হইয়াছে।'

'অঘটন?'

'শুনেন নাই? রাজকুমারীর অশ্ব চুরি করিয়া এক গর্দভদাস তস্কর পলায়ন করিয়াছে।'

'রাজকুমারীর অশ্ব—?' প্রশ্নটা অনবধানে চিত্রকের মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিল।

'হাঁ। কুমারী মৃগয়ায় গিয়াছিলেন, জলসত্রে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে।—আপনি কি বিদেশী?' বলিয়া নাগরিক সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে চিত্রকের মূল্যবান বেশভূষার পানে চাহিল।

'হাঁ। আমি মগধের অধিবাসী, কর্মসূত্রে আসিয়াছি।'

চিত্রক আর সেখানে দাঁড়াইল না।

আকস্মিক সংবাদে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইবে চিত্রকের প্রকৃতি সেরূপ নয়। কিন্তু এই সংবাদ পরিগ্রহ করিবার পর প্রায় প্রহরকাল সে বিক্ষিপ্ত চিত্তে ইতস্তত বিচরণ করিয়া বেড়াইল। সংবাদটা নগরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। কে জানিত যে ঐ অশ্বারোহীটা রাজকন্যা! রাজকন্যা পুরুষবেশে ঘোড়ায় চড়িয়া মৃগয়া করিয়া বেড়ায়! আশ্চর্য বটে। চিত্রক রাজকন্যার মুখাবয়ব স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু বিশেষ কিছু উদ্ধার করিতে পারিল না; তাহাকে দেখিয়া গর্বিত ও কিশোরবয়স্ক মনে হইয়াছিল এইটুকুই শুধু স্মরণ হইল।

রমণীর সম্পত্তি সে অপহরণ করিয়াছে, মনে হইতেই চিত্রক লজ্জা অনুভব করিল। সে ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধা, পরদ্রব্য সম্বন্ধে তাহার মনে তিলমাত্র কুণ্ঠা নাই; সে জানে, এই বসুন্ধরা এবং ইহার যাবতীয় লোভনীয় বস্তু বীরভোগ্যা। তবু, রমণী সম্বন্ধে তাহার মনে একটু দুর্বলতা ছিল। জীবনে সে কখনও নারীর নিকট হইতে কোনও দ্রব্য কাড়িয়া লয় নাই, স্বেচ্ছায় তাহারা যাহা দিয়াছে তাহাই হাসিমুখে গ্রহণ করিয়াছে, তদতিরিক্ত নয়।

হয় তো ঐ পুরুষবেশীর রূপ ও ঐশ্বর্য তাহার মনে ঈর্ষার সঞ্চার করিয়াছিল, হয় তো প্রপাপালিকার সহিত যুবকের ঘনিষ্ঠতা তাহার পৌরুষকে আঘাত করিয়াছিল;—সুগোপার সহিত নিজের ব্যবহার স্মরণ করিয়াও তাহার মন সবিস্ময় ক্ষোভে ভরিয়া উঠিল। অবশ্য

তাহার আচরণে অনেকখানি কৌতুক মিশ্রিত ছিল; তথাপি, কৌতুক কখন নিজ সীমা অতিক্রম করিয়া নিগ্রহে রূপায়িত হইয়াছিল তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। বুভুক্ষিত শ্রান্তিভগ্ন দেহে আশাহত অবস্থায় মানুষ যে কর্ম করে, পরিপূর্ণ উদরে সুস্থ দেহে সে নিজেই তাহার কারণ খুঁজিয়া পায় না।

আকাশের পানে চাহিয়া চিত্রক হাসিল। জীবনকে সে বহুরূপে বহু অবস্থায় দেখিয়াছে, তাই পশ্চাত্তাপ ও অনুশোচনাকে সে নিরর্থক বলিয়া জানে। নিয়তির গতি অনুশোচনার দ্বারা লেশমাত্র ব্যতিক্রান্ত হয় না, অদৃষ্টই নিয়ন্তা। চিত্রকের মনে হইল, ভাগ্যদেবী তাহার চারিপাশে সূক্ষ্ম ভবিতব্যতার জাল বুনিতে আরম্ভ করিয়াছেন—এই জালে ক্ষুদ্র মীনের মত আবদ্ধ হইয়া সে কোন অদৃষ্টতটে উৎক্ষিপ্ত হইবে কে জানে?

চন্দ্রের দিকে দৃষ্টি পড়িতে তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল। মধ্যগগনে চন্দ্র, রাত্রি গভীর হইতেছে। সচকিতে সে চারিদিকে চাহিল; দেখিল বৌদ্ধ চৈত্যের নিকটস্থ উচ্চ ভূমির উপর সে একাকী দাঁড়াইয়া আছে। এখানে পথ গৃহ-বিরল, লোক চলাচলও কম। দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, একটি স্থান আলোকমালায় ঝলমল করিতেছে। বহু নাগরিকের মিলিত স্বরগুঞ্জন তাহার কর্ণে আসিল।

চিত্রক কিছুকাল যাবৎ ঈষৎ তৃষ্ণা অনুভব করিতেছিল; ঐ আলোক-দীপ্ত পথের দিকে চাহিয়া তাহার তৃষ্ণা আরও বাড়িয়া গেল। নগরে অবশ্য মদিরাগৃহ আছে, এ কথাটা এতক্ষণ তাহার মনে হয় নাই। রাত্রির জন্য একটা আশ্রয়ও খুঁজিয়া লইতে হইবে। সে আলোকলিপ্সু পতঙ্গের মত দ্রুত সেই দিকে চলিল।

রজনীর আনন্দধারা তখন অন্তঃস্রোতা হইয়া আসিয়াছে। পুষ্প-বিপণিতে পুষ্পসম্ভার প্রায় শূণ্য, পসারিণীদের চক্ষে আলস্য; রাজপথে নাগরিকদের গতায়াত ও ব্যস্ত আগ্রহ মন্দীভূত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। নবীনা রাত্রির নবযৌবন-সুলভ প্রগল্‌ভতা প্রগাঢ়যৌবনার রসঘন নিবিড় মাধুর্যে পরিণত হইয়াছে।

পুষ্পাসব গন্ধে আকৃষ্ট মধুমক্ষিকা যেমন কেবলমাত্র ঘ্রাণশক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রচ্ছন্ন ফুলকলিকার সন্নিধানে উপস্থিত হয়, চিত্রকও তেমনই পিপাসা-প্রণোদিত হইয়া একটি মদিরাগৃহের দ্বারে উপনীত হইল। মদিরাগৃহের ভিতরে উচ্চ চত্বরের উপর বসিয়া মুণ্ডিতশীর্ষ শৌণ্ডিক স্তূপীকৃত রজতমুদ্রা গণনা করিতেছিল, চিত্রক প্রবেশ করিয়া তাহার সম্মুখে একটী স্বর্ণদীনার অবহেলা ভরে ফেলিয়া দিল, বলিল—'পানীয় দাও।'

চমকিত শৌণ্ডিক যুক্তকরে সম্ভাষণ করিল—'আসুন মহাভাগ! কোন পানীয় দিয়া মহোদয়ের তৃপ্তিসাধন করিব? আসব সুরা বারুণী মদিরা—যে পানীয় ইচ্ছা আদেশ করুন।'

'তোমার শ্রেষ্ঠ মদিরা আনয়ন কর।'

'যথা আজ্ঞা।—মধুশ্রী!'

শৌণ্ডিক কিঙ্করীকে ডাক দিল। নূপুর কাঞ্চী বাজাইয়া একটি তন্দ্রালসা কিঙ্করী আসিয়া দাঁড়াইল। শৌণ্ডিক বলিল—'আর্যকে সুঘটিত কক্ষে বসাও, শ্রেষ্ঠ মদিরা দিয়া তাঁহার সেবা কর।'

কিঙ্করী চিত্রককে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া বসাইল। কক্ষটি সুচারুরূপে সজ্জিত; কুট্টিমের উপর শুভ্র আস্তরণ; তদুপরি স্থূল উপাধান, তাম্বূল করঙ্ক প্রভৃতি রহিয়াছে। চারি কোণে পিত্তলের দীপদণ্ডে বর্তিকা জ্বলিতেছে। ধূপশলা হইতে চন্দনগন্ধী সূক্ষ্ম ধূম ক্ষীণ রেখায় উত্থিত হইতেছে। প্রাচীর গাত্রে সমুদ্র মন্থনের চিত্র; সুধাভাণ্ড লইয়া সুরাসুরের মধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব বাধিয়া গিয়াছে।

চিত্রক উপবিষ্ট হইলে কিঙ্করী নিঃশব্দ ক্ষিপ্রতার সহিত মদিরা-ভৃঙ্গার, চষক ও সুচিত্রিত স্থালীতে মৎস্যাণ্ড আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিল, তারপর আদেশ প্রত্যাশায় কৃতাঞ্জলি-পুটে দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইল। চিত্রক এক চষক মদিরা ঢালিয়া এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিল, তারপর তৃপ্তির সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'সেবিকে, তুমি যাও, আমার আর কিছু প্রয়োজন নাই।'

মধুশ্রী সাবধানে কবাট ভেজাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। একাকী বসিয়া চিত্রক স্বাদু মৎস্যাণ্ড সহযোগে আরও কয়েক পাত্র মদিরা পান করিল। ক্রমে তাহার চক্ষু ঢুলু ঢুলু হইয়া আসিল, মস্তিষ্কের মধ্যে স্বপ্নসুন্দরীর মঞ্জীর বাজিতে লাগিল। সে উপাধানের উপর আলস্যভরে অঙ্গ প্রসারিত করিয়া দিল।

মদিরাজনিত মৃদু বিহ্বলতার মধ্যে চিন্তার ধারা আবছায়া হইয়া যায়; একটা অহেতুক স্ফূর্তি আলস্যের সহিত মিলিয়া মনকে হিন্দোলার মত দোল দিতে থাকে। চিত্রকের অবস্থা তখন সেইরূপ। সে নিজের অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া, তারপর অঙ্গুরীয় চোখের কাছে আনিয়া ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল। তখন মনের মধ্যে শশিশেখরের সহিত আলাপের কথা তাহার নূতন করিয়া মনে পড়িয়া গেল।

নিজ মনে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে সে উঠিয়া বসিল, কটি হইতে থলিটি বাহির করিয়া তাহার মুখোদ্ঘাটন পূর্বক একটি একটি সামগ্রী বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল। স্বর্ণপ্রসূ থলির সমস্ত বৈভব এখনও পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই।

তিলক চন্দন দেখিয়া তাহার মুখের হাস্য প্রসার লাভ করিল, কঙ্কতিকাটি তুলিয়া ধরিয়া সে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। একটা লবঙ্গ মুখে দিয়া সকৌতুকে চিবাইল, সব শেষে জতুমুদ্রালাঞ্ছিত কুণ্ডলাকৃতি লিপি খুলিয়া গম্ভীরমুখে পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। মগধের লিপি, বিটঙ্করাজের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। পাঠ করিতে করিতে চিত্রক তাহাতে নিমগ্ন হইয়া গেল।

এই সময় দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া কে একজন ঘরের মধ্যে উঁকি মারিল; কাজলপরা একটি চোখ ও মুখের কিয়দংশ দেখা গেল মাত্র। চিত্রককে দেখিয়া কাজলপরা চোখ ক্রমশ বিস্ফারিত হইল, তারপর ধীরে ধীরে কবাট আবার বন্ধ হইয়া গেল। চিত্রক পত্রপাঠে নিবিষ্ট ছিল, কিছু দেখিল না; দেখিলেও বোধ করি চিনিতে পারিত না।

বলা বাহুল্য যে উঁকি মারিয়াছিল সে সুগোপা। পতি অন্বেষণে কয়েকটি মদিরাগৃহ ঘুরিয়া শেষে সে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়াই শৌণ্ডিক হাসিমুখে বলিয়াছিল—'প্রপাপালিকে, তোমার মাণ্ডূকটি তো আজ এখানে নাই।'

সুগোপা বলিয়াছিল—'তোমার কথায় বিশ্বাস নাই, আমি খুঁজিয়া দেখিব।'

'ভাল, তাই দেখ।'

তখন এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিতে খুঁজিতে একটি ঘরে উঁকি মারিয়া সহসা তাহার চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছিল। বেশভূষা অন্য প্রকার, কিন্তু সেই দুর্বৃত্ত অশ্বচোরই বটে।

কিছুক্ষণ সুগোপা দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর পা টিপিয়া শৌণ্ডিকের নিকট ফিরিয়া গেল। চুপি চুপি বলিল—'মণ্ডূক, নগরপালকে সংবাদ দাও।'

বিস্মিত মণ্ডূক বলিল—'সে কি। কি হইয়াছে?'

'চোর। যে চোর আজ কুমারী রট্টার অশ্ব চুরি করিয়াছিল সে ঐ প্রকোষ্ঠে বসিয়া মদ্যপান করিতেছে।'

মণ্ডূকের মুখে ভয়ের ছায়া পড়িল। দুষ্কৃতকারীকে মদিরাগৃহে আশ্রয় দিলে শৌণ্ডিককে কঠিন রাজদণ্ড ভোগ করিতে হয়। সে বলিল—'সর্বনাশ, আমি তো কিছু জানি না।'

'তাই বলিতেছি, যদি নিজের প্রাণ বাঁচাইতে চাও শীঘ্র নগরপালকে ডাকিয়া আন।'

'নগরপালকে এত রাত্রে কোথা পাইব? তিনি নিশ্চয় গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার কাচা ঘুম ভাঙাইয়া কি নিজের পায়ে দড়ি দিব?'

সুগোপা চিন্তা করিল।

'তবে এক কাজ কর। দুইজন যামিক নগররক্ষী ডাকিয়া আন, তাহারা আজ রাত্রে চোরকে বাঁধিয়া রাখুক, কাল প্রাতে মহাপ্রতীহারের হস্তে সমর্পণ করিবে।'

'সে কথা ভাল,' বলিয়া ব্যস্তসমস্ত মণ্ডূক বাহির হইয়া গেল।

অধিক দূর যাইতে হইল না। রাত্রিকালে যামিক রক্ষীরা পথে পথে বিচরণ করিয়া নগর পাহারা দিয়া থাকে। একটা তাম্বূল বিপণির সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুইজন যামিক-রক্ষী বোধ করি রাত্রিতে পাথেয় সংগ্রহ করিতেছিল, মণ্ডূকের কথায় উত্তেজিত হইয়া তাহার সঙ্গে চলিল।

সুগোপা অল্প কথায় ব্যাপার বুঝাইয়া দিল; তখন চারিজনে চিত্রকের প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। চিত্রক তখন লিপি পাঠ শেষ করিয়া থলি কোমরে বাঁধিয়াছে, ভৃঙ্গার হইতে শেষ মদিরাটুকু ঢালিয়া পান করিতেছে। অস্ত্রধারী দুইজন পুরুষকে সম্মুখে দেখিয়া সে বলিল—'কি চাও?'

সুগোপা পিছন হইতে বলিল—'তোমাকে চাই।'

চিত্রক ত্বরিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তরবারি বাহির করিবার পূর্বেই রক্ষীরা তাহাকে পাড়িয়া ফেলিল।

সুগোপা তখন সম্মুখে আসিয়া বলিল—'অশ্ব চোর, আমাকে চিনিতে পার ?'

চক্ষু সঙ্কুচিত করিয়া চিত্রক তাহার পানে চাহিল। অদৃষ্টের জাল গুটাইয়া আসিতেছে। সে অধরোষ্ঠ চাপিয়া বলিল,—'প্রপাপালিকা !'

সুগোপা রক্ষীদের দিকে ফিরিয়া বলিল—'ইহাকে সাবধানে পাহারা দিও। অতি ধূর্ত চোর, সুবিধা পাইলেই পলাইবে।'

একজন রক্ষী বলিল—'সাবধানে কোথায় রাখিব ? রাত্রে কারাগার তো বন্ধ আছে।'

হঠাৎ সুগোপার মনে পড়িয়া গেল। উদ্বেলিত হাসি চাপিয়া সে বলিল—'রাজপুরীর তোরণ-প্রহরীর কাছে লইয়া যাও। আমার নাম করিয়া বলিও, সে সমস্ত রাত্রি চোরকে পাহারা দিবে।'

সুগোপাকে নগরের সকলেই চিনিত। প্রপাপালিকা হইলে কি হয়, রাজকুমারীর সখী। রক্ষীরা দ্বিরুক্তি না করিয়া চোরকে বাঁধিয়া রাজপুরীর দিকে লইয়া চলিল।

ভাগ্যক্রমে চিত্রকের থলিটি রক্ষীরা কাড়িয়া লইল না। তাহারা সাধু-চরিত্র বলিয়াই হোক, অথবা যে চোর রাজকন্যার ঘোড়া চুরি করিয়াছে তাহার উপর বাট্‌পাড়ি করিলে গোলযোগ হইতে পারে এই জন্যই হোক, চিত্রকের থলিতে তাহারা হস্তক্ষেপ করিল না। (ক্রমশঃ)

বিশ্বের বিখ্যাত পত্রাবলী

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস, ডি-লিট, শাস্ত্রী

পত্র পরিচয়

১৯১৬ সাল, প্রথম মহাযুদ্ধ জটিল আকার ধারণ করেছে। রাশিয়ার অবস্থা মহা সংকটময়। দেশব্যাপী বিপ্লবের সূচনা। জারিণা মহা-ধুরন্ধর ধর্মযাজক রাসপুটিনের মন্ত্রমুগ্ধা; জার নিকোলাস জারিণা আলেকজাণ্ডারের অঙ্গুলি সঞ্চালনে পরিচালিত। জার নিকোলাসের ছিল আত্মবিশ্বাসের অভাব, জারিণার ছিল আত্মবিশ্বাসের প্রাচুর্য্য। সে বিশ্বাসের অন্যতম উৎস ছিল রাসপুটিনের প্রেরণা। জার নিকোলাস যুদ্ধের ব্যাপারে সাম্রাজ্যের সম্রান্ত ব্যক্তি ও সেনানায়কদের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য সৈন্য শিবিরে উপস্থিত হয়েছেন। ডিসেম্বর মাস, ১৯১৬ সাল।

সাময়িক সংবাদপত্রে রাশিয়ার জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিদিন তীব্র সমালোচনা চলেছে—জারের মাসিক আয় ৪০ লক্ষ মুদ্রা, তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্য ২০ কোটি মুদ্রা; তাঁর ভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল ৩২ কোটি মুদ্রা মূল্যের মণিমুক্তা রত্নরাজি। জারের শাসনতন্ত্রে প্রজার কোন অধিকার ছিল না, শাসনপরিষদের ক্ষমতা আলোচনার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। জারিণা এবং রাসপুটিনকে কেন্দ্র ক'রে নানা প্রকার কুৎসা ও বিদ্রূপ রাশিয়ার জনসাধারণের মুখে প্রচলিত ছিল। ফরাসী বিদ্রোহের পূর্ব্বে যেমন ষোড়শ লুইর পত্নী মেরিয়া এণ্টোনিয়াকে কেন্দ্র ক'রে প্যারিস সংবাদপত্র চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, মস্কোর সংবাদপত্রের ইঙ্গিতে জারিণাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন।

রাসপুটিনের শক্তি অপরিসীম; তাঁর মধ্যে ছিল ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা, ধর্ম্মের আবরণে তিনি রাশিয়ার অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর অপরূপ মায়াজাল সৃষ্টি করেছিলেন। জারিণা বিশ্বাস করতেন যে রাসপুটিন ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত; সুতরাং রাসপুটিনের প্রসাদে এবং প্রার্থনায় জারতন্ত্রের কোন অমঙ্গল হতে পারে না। কিন্তু রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে এবং রাজ অন্তঃপুরে জারের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলেছিল। উদ্দেশ্য ছিল রাসপুটিনকে দূর ক'রে দিতে হবে, জারিণাকে তার প্রভাব মুক্ত করতে হবে; তা' সম্ভব না হলে সম্রাটকে এই বিষাক্ত পরিস্থিতি থেকে অপসারিত করতে হবে। কিন্তু জার উত্তর দিলেন—রাসপুটিনের অবর্ত্তমানে আমার শাসনতন্ত্রের কোন ভিত্তি নেই। তখন প্রজাবর্গ জারের নিকট আবেদন পত্র প্রেরণ করল :—

"আমরা ভদ্র এবং শক্তিশালী মন্ত্রীমণ্ডলী আশা করি।" জারিণা স্তম্ভিতা; কি দুঃসাহস প্রজাবর্গের! তারা সম্রাটের নিকট আবেদন করে, অনাহূত হয়ে উপদেশ দেয়। সুতরাং রাসপুটিনের আশীর্ব্বাদ-পুত একটা আপেল প্রেরণ ক'রে জারিণা লিখলেন—"সম্রাট রাসপুটিন প্রদত্ত ফলটি ভক্ষণ করবেন। আপনার মনের শক্তি বর্দ্ধিত হবে…সম্রাট আপনার পূর্ব্বপুরুষ পিটারের মতন মহৎ হবেন, আইভানের মতন ভীষণ হবেন।

এই জারিণা ছিলেন ইংলণ্ডের সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার দৌহিত্রী, জার্ম্মানীর ডিউক আলেসের কন্যা। তিনি ছিলেন ইংরেজের মত কূট-বুদ্ধি, অন্যদিকে জার্ম্মানের মত দৃঢ়চিত্ত।

জার যখন সৈন্যশিবিরে আলোচনায় ব্যাপৃত, জারিণা লিখলেন এই

পত্র জারকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য। এই পত্রে পাওয়া যাবে রাশিয়ার আসন্ন বিপ্লবের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ঃ—

পত্রানুবাদ

সারসকোজে সেলু
৯ ডিসেম্বর, ১৯১৬,

আমার প্রিয়তম,
আমার পরমারাধ্য,
আমার সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।

যে সময়-সংঘাত এবং অবস্থা-সংকটের মধ্য দিয়ে আমরা দিনগুলি অতিক্রম করে এসেছি, তারপর আপনাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই না। ভগবানের অপারসীম করুণা এবং আশীর্ব্বাদে আমাদের পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন সূচিত হচ্ছে। আর একটু ধৈর্য্য ধরুন, প্রার্থনার উপর গভীর বিশ্বাস রাখুন, ভগবানের সহায়তার উপর আর একটু নির্ভর করুন, তারপর সব দিক সুপরিচালিত হবে। আমার স্থির বিশ্বাস রয়েছে যে আপনার রাজত্বে রাশিয়ার শুভদিন প্রত্যাসন্ন। আপনি আপনার মনের স্থৈর্য্য রক্ষা করে যান, অন্যের কথা বা লেখা যেন আপনাকে বিভ্রান্ত না করে। যা' অপবিত্র, যা' রাশিয়ার পক্ষে অকল্যাণ তা' বিস্মৃতির গহ্বরে লীন হয়ে যা'ক।

আপনি দৃঢ় হো'ন ; মানুষ জানুক যে আপনি রাশিয়ার সম্রাট,—আপনার আদেশ পালিত হবে। শান্ত শিথিল শাসনের দিন নিঃশেষ হয়ে গেছে। আজ আপনাকে প্রতিজ্ঞায় অটল এবং কর্ম্মব্যবহারে কঠোর হতে হবে। রাশিয়ার প্রজাবর্গকে আপনার সম্মুখে অবনত হতে হবে, আপনার আদেশ নতমস্তকে পালন করতে হবে ; আপনার নির্দ্দেশানুযায়ী—তারা কাজ করবে। কার পরামর্শ আপনি নেবেন এবং কখন নেবেন, তা' আপনার ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করবে। রাশিয়ার জনগণকে আজ্ঞানুবর্ত্তিতা শিক্ষা দিতে হবে। "আজ্ঞানুবর্ত্তিতা" শব্দের অর্থ তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। তারা সেই "অতি প্রাচীন শব্দটীর" অর্থ বিস্মৃত হয়ে গেছে। আপনি আপনার সহৃদয়তা ও ক্ষমা দ্বারা প্রজাবর্গের মনোভাব পরিবর্ত্তন করে দিয়েছেন। মনে পড়ে আপনি কতবার অপরাধীকে ক্ষমা করেছেন? সে ক্ষমাকে তারা দুর্ব্বলতার প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করেছে। রাজার ঔদার্য্যকে তারা শাসন-শক্তির অভাব বলে বিবেচনা করেছে?

এই সংবাদ সম্রাটের অবিদিত নয় যে রাশিয়ার জনগণ সম্রাট মহিষীকে ঘৃণা করে। তার কারণ কি সম্রাট জানেন? জনগণের বিশ্বাস যে আমি অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যখন কোন জিনিষের প্রয়োজন অনুভব করি, কোন বিষয় কর্ত্তব্য বলে স্থির করি, তখন আমি আমার সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন করি না, আমার এই মনোভাব তারা সহ্য করতে পারে না। কিন্তু সম্রাট স্মরণ রাখবেন—যারা দৃঢ়চিত্ত মানুষের প্রতি বিরূপ, তারা দুষ্টবুদ্ধি।

আপনার নিশ্চয় মনে আছে মিঃ ফিলিপস আমাকে আপনার প্রতিমূর্ত্তি উপহার দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন সম্রাজ্ঞীর অনুমতি ভিন্ন কোন লোক সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারে না। আপনি অতিশয় ভদ্রব্যক্তি, সরল বিশ্বাসী, দয়ার্দ্রচিত্ত। আপনি কাহাকেও কোন জিনিষ প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না, দুষ্ট লোক আপনার উদার চিত্তের সুযোগ নিয়ে অনর্থ সৃষ্টি করে, তারা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবে তারা আমার সম্মুখে উপস্থিত হতে সাহস পাবে না ; আমি তাদের উপস্থিতির ব্যাপারে সম্রাটকে সতর্ক করে দেবো, মিঃ ফিলিপস্ সে কথা জানতেন। দুষ্ট লোক আমাকে ভয় করে, তারা আমার চক্ষের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করতে পারে না ; অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আসে যারা, তারা আমার প্রতি শ্রদ্ধাবান নয়। আপনি লক্ষ্য করে দেখুন রাশিয়ার জনসাধারণ এবং সেনাগণ আমার প্রতি কত অনুরক্ত, তারা সম্রাট পরিবারকে কত শ্রদ্ধা করে। ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে দুইটি শ্রেণী আছে। তারা আমার স্বরূপ সম্বন্ধে আর সচেতন। আমার জীবনের প্রারম্ভে আমাকে না জেনে যারা আমাকে যেভাবে আঘাত করছিল, আর তারা তা' করে না। আমি কি প্রত্যাশা করি জানেন—যখন কোন লোক আপনার বা আমার নিকট কোন অভদ্র পত্র লেখে, কিংবা আমার কাজের বিরুদ্ধে অশোভন ইঙ্গিত করে, তখন অপরাধীকে সম্রাট শাস্তি দেবেন। সম্রাট সেখানে দুর্ব্বল হতে পারবেন না।

কাল সম্রাট সেই বিদ্রোহী "বারামচোব" এর সঙ্গে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। সেই সংবাদ আমি গ্রিগরির নিকট শুনেছি। আমি জানি তার সঙ্গে কি বিষয় আলোচনা করেছেন। আমি আপনার জন্য কত ভাবনা নিয়ে, উদ্বেগ নিয়ে প্রতি মুহূর্ত অপেক্ষা করেছি। প্রথমে আপনি "বারামচোব"কে তিরস্কার ক'রে পত্র লিখুন। তার কি দুঃসাহস যে সম্রাটের নিকট পত্র লিখেছে অনাহূত। এ কি আবদার? সে কি সাম্রাজ্যের অভিজাতমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বোত্তম যে বিনানুমতিতে সে সম্রাটের নিকট পত্র লিখিবে? আমার স্মরণ আছে এই প্রথমবার নয়, সে আর একবার অতীতেও আমাকে পত্রাঘাত করেছিল। আপনার নিকট লিখিত তার পত্র ছিন্ন করে ফেলুন, তাকে তিরস্কার ক'রে সেই পত্রের উত্তর দিন। সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রসভার সভ্যকে একটু শাসন করুন, ভবিষ্যতের জন্য এতে শিক্ষা হবে। সেই শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

আমরা আর বেশী পরনির্ভর হতে প্রস্তুত নই। আমাদের দৃঢ় হতে হবে। টেপোভ'কে আপনার প্রধান পার্শ্বচর নিযুক্ত করা হয়েছে। তার প্রতি কাজে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে হবে। "গুরকো"কে জানিয়ে দিবেন, সে যেন রাজনীতির আবর্ত্তে জড়িয়ে না পড়ে, আর যেন রাজনীতি আলোচনা না করে। তার স্মরণ করা উচিত যে এই রাজনীতির আবর্ত্তই "নিকোলাশা" এবং "আলেকসিয়েভ"কে সর্ব্বনাশের পথে নিয়েছিল। ভগবানের অপার করুণা যে তাদের রোগাক্রান্ত ক'রে আপনাকে তার কবল থেকে মুক্ত করেছেন। সে যুদ্ধের ব্যাপারে আপনার নির্দ্দেশ পালন না ক'রে দুটি লোকের মতানুসারে পরিচালিত হত। এমন কি সে আমার বিরুদ্ধেও প্ররোচিত

হয়েছিল—আপনার নিশ্চয় মনে আছে সেই বৃদ্ধ ইভানভ কি বলেছিলেন ...

আমার বিশ্বাস অচিরকালের মধ্যে সমস্ত অমঙ্গল শেষ হয়ে যাচ্ছে, আকাশ মেঘ মুক্ত হবে, অশুভ পরিস্থিতি কল্যাণময় হবে।

আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু রাসপুটিন নিয়ত আপনার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা ক'রে প্রার্থনা করছেন। তিনি ধর্ম্মবিশ্বাসী, ভগবানের অনুগ্রহভাজন, তাঁর প্রার্থনা আপনাকে শক্তি দান করবে, আপনার আশা পূর্ণ করবে। সাধারণ লোক আপনার মহত্ব সব সময় বুঝতে পারে না; আপনার প্রশান্তি ও স্থৈর্য্য দেখে তারা মনে করে যে আপনি কিছু বোঝেন না, সুতরাং তারা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, তারা আপনাকে ভীত করতে চেষ্টা করে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

যদি "গর্কি" আপনার নিকট পত্র লেখেন, মনে করবেন তার পশ্চাতে "মাইকেলের" হস্তচিহ্ন রয়েছে। তার জন্য আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। আজ আর সে এখানে নেই। অনেক সময় শ্রম "ভাল মানুষের" ছদ্মবেশে উপদেশ দিয়ে সৎ লোকের অনিষ্ট করে। আজ আমাদের সুদিন ফিরে এসেছে। আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ধর্ম্মপ্রাণ রাসপুটিন স্বপ্ন দেখেছেন রাজ্যের মঙ্গল সমাগত। সেই মহাপুরুষের স্বপ্নের মূল্য আছে। প্রিয়তম, আমার মধুময়, আপনি "কুমারী মনিজোড"র মঠে গিয়ে একবার প্রার্থনা করুন। আপনি মনে শান্তি পাবেন, মনে বল পাবেন। আপনি চা পান ক'রে আমাদের "রাজকুমার"কে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। সেখানে নির্জনতার মধ্যে একটা বিরাট প্রশান্তি আছে। আপনি মঠের দীপাধারে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবেন। প্রজাবর্গ জানবে যে আপনি ধর্ম্মবিশ্বাসী খৃষ্টান। লজ্জা করবেন না। আপনার দৃষ্টান্ত মানুষ অনুসরণ করবে—নয় কি?

আগামী রজনী আমাদের কত মধুর হবে। আমি সে কথা কল্পনা করতে পারি না! আপনাকে আমি আমার বাহুর আলিঙ্গনে জড়িয়ে রাখব; এই কথা মনে করলে আমার হৃদয়ের সমস্ত বেদনা দুঃখে নিঃশেষ যায়! আমার অনির্ব্বাণ প্রেম শিখা, বিরামহীন প্রার্থনা, সুগভীর বিশ্বাস, আর সীমাহীন শক্তি দিয়ে আপনার সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দেব। আপনার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করব। আপনি যে আমার বর্ণনাতীত আনন্দের উৎস, আমার হৃদয়ের দেবতা, আমার স্বামী। ভগবান আপনাকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমাদের রাজকুমারের মস্তকে ভগবানের করুণাধারা সিঞ্চিত হউক। দূর থেকে আমার উষ্ণ চুম্বনে আপনার দেহ রোমাঞ্চিত করে দিলাম। যখন আপনার মনে অবসাদ আসবে, আপনি আমাদের ভবিষ্যৎ বাদশার—রাজকুমারের নিকট গিয়ে বসবেন, তার সঙ্গে একটু খেলা করবেন, তাকে চুম্বন করবেন। আপনি বেশ শান্ত হয়ে উঠবেন।

আমার সমস্ত প্রীতি এই পত্রের সঙ্গে আপনাকে উৎসর্গ ক'রে দিলাম।

আজ রজনীতে আপনার সুনিদ্রা হবে, আমার সুন্দর মন আপনার সঙ্গে রয়েছে, আমার প্রার্থনা আপনার চতুর্দিক পরিবেষ্টন ক'রে রয়েছে, ভগবানও "পীতমাতা মেরী" আপনাকে কখনো পরিত্যাগ করবেন না, আপনি যে মহানুভব।

আপনার চিরন্তন, অতি আপনার,

প্রিয়তমা

পত্র পরিণাম :—

১৭ই মার্চ ১৯১৭ সাল—আর মাত্র ১০০ দিন সময়—১৬ই ডিসেম্বর রাসপুটিনকে আমন্ত্রণ করলেন প্রিন্স "যুসুপভ"। পরে পানপাত্রে মিশিত করলেন পটাসিয়াম সাইনেডের তীব্র বিষ। রাসপুটিনের দেহ ক্ষতবিক্ষত হল গুলির আঘাতে। জারিণার পত্রের উত্তর দিয়েছিলেন নিকোলাস—তিনি ধন্যবাদ দিলেন জারিণাকে—"তোমার পত্র পেয়েছি, তোমার দুর্ব্বলচিত্ত স্বামীকে তুমি তীব্র তিরস্কার করছ, তবু আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ কর।" জারিণা লিখলেন—আমার ইচ্ছা হয় আমার মনের অফুরন্ত শক্তি দিয়ে আপনার দুর্ব্বল চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে দিই......রাশিয়ার জনসাধারণ আমাকে বলেছে, তারা চায় তীব্র কশাঘাত। কশাঘাতে জর্জ্জরিত না হলে তারা জারের সদিচ্ছার গভীরতা সম্যক উপলব্ধি করতে পারে না।...জারিণা হতোৎসাহ হবার পাত্রী নন। তিনি সমস্ত শক্তি নিয়ে, ইচ্ছা নিয়ে পর্ব্বতশৃঙ্গকে অক্ষত রাখতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু যুদ্ধে বিধ্বস্ত জাতি অন্নহীন, বস্ত্রহীন। প্রজাকুল খাদ্যের জন্য বস্ত্রের জন্য রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকে সমবেত। জার শক্তিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে রাজপদ ত্যাগ করলেন। বিরাট গিরিশিখর ধূলায় অবলুণ্ঠিত হল। জার নিকোলাস এবং রাজপরিবারকে কারারুদ্ধ করা হল। তার তিনমাস পরে উরাল পর্ব্বতের এক অখ্যাত বন্দীশালায় জারপরিবারকে সামান্য বিচারের প্রহসনের পর হত্যা করা হল। জারিণা আলেকজান্দ্রিয়া ফিয়েডোরোভনা সেই নীরব হত্যাকাণ্ডের শেষ সাক্ষী।

ভলটেয়ার

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চার্চ্চের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিবার পরে ভলটেয়ার সেই সংগ্রামে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে শাসনতন্ত্রের পীড়ন ও অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার অবসর তাঁহার ছিল না। রাজনীতিতে তাঁহার শ্রদ্ধাও বেশী ছিল না। তিনি এক সময়ে বলিয়াছিলেন "রাজনৈতিক আন্দোলন আমার কর্ম্ম নয়। মানুষের নির্বুদ্ধিতার হ্রাস করিতে ও তাহাকে অধিকতর সম্মানের যোগ্য করিতেই আমি চিরকাল চেষ্টা করিয়াছি।" আর এক সময়ে ব্যবস্থাপ্রণেতাদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"যাহারা আপনাদিগের স্ত্রী ও পরিবার শাসন করিতে পারেন না, তাঁহাদেরই বিশ্ব পরিচালিত করিবার জন্য আগ্রহের অন্ত নাই।" ভলটেয়ার প্রভূত অর্থের মালিক হইয়াছিলেন, তাঁহার রাজনৈতিক মত ও এইজন্য রক্ষণশীল ছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিস্তারই তিনি সমস্ত রাজনৈতিক সমস্যার প্রতিকার বলিয়া মনে করিতেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে চরিত্রের বিশেষত্ব ও আত্মসম্মানের উদ্ভব হয়। কৃষক যদি নিজে জমির মালিক হয়, তাহা হইলে জমির চাষও ভাল হয়। দেশের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল না। যুক্তির দিক হইতে যদিও তিনি প্রজাতন্ত্রই পছন্দ করিতেন, প্রজাতন্ত্রের ত্রুটি সম্বন্ধে তিনি অন্ধ ছিলেন না। প্রজাতন্ত্রে দলাদলির সৃষ্টি হয়। দলাদলিতে অন্তর্বিপ্লব যদি নাও হয়, জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়। ছোট ছোট যে সমস্ত রাষ্ট্রের ধনসম্পদ বেশী নাই এবং যাহাদের ভৌগোলিক অবস্থান এরূপ যে বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার ভয় নাই, প্রজাতন্ত্র সেই সমস্ত রাষ্ট্রেরই উপযোগী। সাধারণতঃ আপনাদিগকে শাসন করিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। যতই ভাল হউক, কোনও প্রজাতন্ত্রই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। যাবতীয় শাসনপ্রণালীর মধ্যে প্রজাতন্ত্র প্রথমে উদ্ভূত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক পরিবারের সমবায় হইতে ইহার উৎপত্তি। আমেরিকার Red Indian দিগের বিভিন্ন দল প্রজাতন্ত্র দ্বারাই শাসিত হইত। আফ্রিকার নিগ্রোদিগের মধ্যে প্রজাতন্ত্রের অভাব নাই। কিন্তু আর্থিক অবস্থার বৈষম্য হইলেই প্রজাতন্ত্রের বিনাশ হয়। সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক বৈষম্যের আবির্ভাব অপরিহার্য্য। রাজতন্ত্র ভাল কি প্রজাতন্ত্র ভাল, চারি হাজার বৎসর ধরিয়া তাহা আলোচিত হইয়া আসিতেছে। ধনীরা বলিবে—অভিজাততন্ত্র (aristocracy) ভাল; সাধারণ লোকে বলিবে—প্রজাতন্ত্র ভালো। মুষ্টিমেয় সংখ্যক রাজারাই কেবল রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। তবু প্রায় সমস্ত পৃথিবী রাজতন্ত্রশাসিত কেন? উত্তর যদি চাও, তবে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবার প্রস্তাব যে ইন্দুরেরা করিয়াছিল তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর।" একজন পত্রপ্রেরক রাজতন্ত্রের সমর্থন করিয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। উত্তরে ভলটেয়ার লিখিয়াছিলেন—"হাঁ, রাজতন্ত্র ভালো। যদি মার্কাস অরেলিয়াসের মত রাজা হয়। অন্যথা একটা সিংহই থাকুক, অথবা একশত ইন্দুরে থাকুক, তাহাতে দরিদ্র লোকের কি আসে যায়?"

সাধারণতঃ দেশপ্রীতি বলিতে যাহা বোঝায়, ভলটেয়ারের তাহা ছিল না। স্বদেশপ্রীতির অর্থ নিজের দেশ ব্যতীত অন্য সকল দেশকে ঘৃণা করা। অন্য দেশের ক্ষতি না করিয়া যিনি নিজের দেশের উন্নতি কামনা করেন, ভলটেয়ারের মতে তিনি স্বদেশহিতৈষী ও বিশ্ব-নাগরিক (Citizen of the world) উভয়ই। ফ্রান্সের সঙ্গে যখন ইংলণ্ড ও প্রাসিয়ার যুদ্ধ চলিয়াছিল, তখন ভলটেয়ার প্রাসিয়ার রাজা ও ইংলণ্ডের সাহিত্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন। যুদ্ধকে তিনি ঘৃণা করিতেন। "যুদ্ধ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। সুতরাং সব হত্যাকারীরই শাস্তি হয়, হয়না কেবল সেই সকল লোকের, যারা ভেরী ও দামামার তালে তালে হাজার হাজার লোক হত্যা করে।" "মাতৃগর্ভে অবস্থানের সময় মানুষের অবস্থা থাকে উদ্ভিদের মত। ভূমিষ্ঠ হইবার পরে তাহার অবস্থা হয় ইতর জন্তুর মত। পরিণত বুদ্ধির অবস্থা প্রাপ্ত হইতে কুড়ি বৎসর লাগে। তাহার শারীরিক গঠনের সম্বন্ধে সামান্য একটু জ্ঞানলাভ করিতে মানুষের লাগিয়াছে তিন হাজার বৎসর। তাহার আত্মাসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে অনন্ত কালের প্রয়োজন। কিন্তু তাহাকে হত্যা করিতে একটি মাত্র ক্ষণই যথেষ্ট।"

বিপ্লবদ্বারা সমস্যার সমাধান হয় বলিয়া ভলটেয়ার বিশ্বাস করিতেন না। সাধারণ লোকের বুদ্ধির উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। "সাধারণ লোকে যখন তর্ক করিবার ভার লয়, তখন সর্ব্বনাশ হয়।" "যাহারা বলে সকল মানুষই সমান, তাহাদের কথার অর্থ যদি হয় যে সকল মানুষেরই স্বাধীনতায়, নিজের সম্পত্তিতে ও রাষ্ট্র কর্ত্তৃক রক্ষণাবেক্ষণে সমান অধিকার, তাহা হইলে তাহারা ঠিকই বলে। সাম্য একদিকে যেমন খুবই স্বাভাবিক পদার্থ, অন্যদিকে তাহা মায়া মরীচিকা মাত্র। যখন লোকের অধিকার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, তখন তাহা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু যখন ইহার দোহাই দিয়া সমানভাবে সকলের মধ্যে সম্পত্তি ও ক্ষমতার বণ্টনের চেষ্টা হয়, তখন নিতান্তই অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। সকল নাগরিকই সমান স্বাধীন হইতে পারে, কিন্তু সকলের বল সমান হইতে পারে না। ইংরাজেরা ইহা জানে। স্বাধীন হওয়া অর্থ আইন ভিন্ন অন্য কিছুরই অধীন না হওয়া।" Turgot, Condorcet, Mirabeau প্রভৃতি ভলটেয়ারের শিষ্যগণের মতও ইহাই ছিল। তাঁহারা সকলেই শান্তিপূর্ণ বিপ্লব চাহিয়াছিলেন। কিন্তু অত্যাচার-পীড়িত জনসাধারণ ইহাতে সন্তুষ্ট ছিল না। তাহারা স্বাধীনতা ততটা চাহে নাই, যতটা চাহিয়াছিল সাম্য।—স্বাধীনতার বিনিময়েও

সাম্যই তাহাদের কাম্য ছিল। রুসোও এই মতাবলম্বী ছিলেন—তিনিও চাহিয়াছিলেন "সাম্য।" যখন তাঁহার শিষ্য মরাট ও রোবস্‌পিয়ার ফরাসী বিপ্লবের নেতৃত্বলাভ করিল, তখন স্বাধীনতার ফাঁসী হইল—সাম্যই বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হইল।

এক সময়ে ভলটেয়ার লিখিয়াছিলেন "যাহাই চোখে পড়ে, তাহাই বিপ্লবের বীজ ছড়াইতেছে বলিয়া মনে হয়। একদিন বিপ্লব আসিবেই, কিন্তু তাহা দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইবে না। বর্তমানে যাহারা যুবক, তাহারা ভাগ্যবান। অনেক ভাল ভাল জিনিষ তাহারা দেখিতে পাইবে।" যখন ইহা লিখিয়াছিলেন, তখন ভাবিতেও পারেন নাই, ফ্রান্সে বিপ্লব কি ভীষণরূপে দেখা দিবে।

আইন করিয়া আদর্শ রাষ্ট্রের সৃষ্টি (Utopia) করা যায়, ইহা ভলটেয়ার বিশ্বাস করিতেন না। তিনি জানিতেন, মানব সমাজের বিকাশ ঘটে কালের শক্তিতে, ন্যায়ের যুক্তি বলে নয়। দরোজা দিয়া বাহির করিয়া দিলেও, অতীত জানালা দিয়া আবার ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে। পৃথিবীর অবিচার ও দুঃখকষ্ট কি উপায়ে হ্রাস করিতে পারা যায়, তাহাই সমস্যা। টারগো (Turgot) যখন ষোড়শ লুইএর মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন, তখন ভলটেয়ার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিলেন "সত্যযুগ সমাগত। এইবার রাষ্ট্রে সমস্ত সংস্কার সাধিত হইবে, জুরীর বিচার প্রবর্ত্তিত হইবে, করভারের লাঘব হইবে, দরিদ্রদিগকে কোনও করই দিতে হইবে না।" তখন বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহার সুচিন্তিত আদর্শ বর্জন করিয়া ফ্রান্স রুসোর ভাবে ভাবিত হইয়া সর্ব্বধ্বংসী রক্তাক্ত পথ অবলম্বন করিবে। ফ্রান্সের বিপ্লবমুখী জটিল মন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল—এক অংশ ভলটেয়ার কর্তৃক প্রভাবিত, অপর অংশ রুসোর প্রভাবের অধীন। "এক অংশে লঘুক্ষিপ্র পদ সঞ্চার, বৈদগ্ধ্য, তেজ, মাধুর্য্য, বলবতী যুক্তি, দর্পিত বুদ্ধি ও নক্ষত্রের চারু নৃত্য, (Nietzsche) অন্যদিকে নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ, উদ্দাম কল্পনা ও ভাবস্বপ্নের মনোহারী চিত্র। কিন্তু রক্তাক্ত বিপ্লব রুসোও চাহেন নাই। ১৭৯৪ সালের ৭ই মে তারিখে তাহার শিষ্য রোবস্‌পিয়ার যখন তাঁহাকে বিপ্লবীদিগের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া মানবজাতির শিক্ষাগুরু বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন এবং ওক-পত্রের মুকুট উপহার দিয়াছিলেন, তিনি যদি তথায় তখন উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেন এবং বিপ্লবের নায়কদিগকে শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন।

ভলটেয়ার ছিলেন যুক্তিবাদী (rationalist), রুসো ছিলেন "বেদনার উপাসক"(romanticist)। সত্য ও কর্তব্য নির্দ্ধারণে ভলটেয়ারের অবলম্বন ছিল যুক্তি (reason), রুসোর অবলম্বন ছিল "বেদনার (feeling) অনুভূতি।" রুসো বলিয়াছিলেন "মস্তকের মত হৃদয়েরও যুক্তি আছে, যাহা মস্তক বুঝিতে পারে না।" উভয়ের মধ্যে এই বিরোধ বুদ্ধি ও সহজাত প্রবৃত্তির (instinct) বিরোধ। যুক্তিতে রুসোর বিশ্বাস ছিল না। তিনি চাহিতেন কর্ম্ম। রক্তাক্ত বিপ্লবে তাঁহার তত ভয় ছিল না। বিপ্লবের ফলে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেও মানবের অন্তরস্থ ভ্রাতৃভাব তাহাদিগকে পুনর্মিলিত করিবে বলিয়া তিনি আশা করিতেন। স্বাধীনতার বাধা আইনগুলি অপসারিত হইলে, সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই ছিল তাহার মত।

Discourse on Inequality গ্রন্থে রুসো লিখিয়াছেন—মানুষ স্বভাবতঃ দোষহীন। সমাজে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার ফলেই মানুষ মন্দ হয়।

ইহার পূর্ব্বেই রুসো বিজ্ঞান ও কলাকে মানুষের প্রধান শত্রু বলিয়াছিলেন, এবং সভ্যতাকে মানুষের যাবতীয় দুঃখ কষ্টের কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহার Discourse on Inequality পাঠ করিয়া ভলটেয়ার বলিয়াছিলেন, "মানব জাতির বিরুদ্ধে লিখিত আপনার নূতন গ্রন্থ আমি পড়িয়াছি। তাহার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি।......আমাদিগকে পশুতে পরিণত করিবার চেষ্টায় আপনি যে রসিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। আপনার গ্রন্থ পাঠ করিয়া চারি হাতপায়ে হাঁটিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সে অভ্যাস ৬০ বৎসর পূর্ব্বে বর্জন করিয়াছি, সুতরাং দুর্ভাগ্যক্রমে পুনরায় ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব।" Social contract গ্রন্থে অসভ্য অবস্থার গুণকীর্তন দেখিয়া তিনি এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, "বানরের সঙ্গে মানুষের যেরূপ সাদৃশ্য, রুসোর সহিত দার্শনিকের সাদৃশ্য তাহা অপেক্ষা অধিক নহে।" অন্যত্র তিনি রুসোকে "Diogenes এর পাগল কুকুর" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। তবুও যখন জেনিভাগবর্ণমেণ্ট তাঁহার গ্রন্থ পোড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন, তখন তিনি সেই কার্য্যের নিন্দা করিয়াছিলেন এবং রুসোকে লিখিয়াছিলেন "আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহার একটা কথাও আমি সত্য বলিয়া স্বীকার করি না। তবু প্রাণ দিয়াও আমি আপনার তাহা বলিবার অধিকার রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব।" বহু শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য রুসো যখন পলায়ন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহিত বাস করিবার জন্য তিনি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

রুসোর সভ্যতার নিন্দা ভলটেয়ার বালসুলভ প্রলাপ বলিয়া গণ্য করিতেন এবং সভ্য মানুষ যে অসভ্য মানুষ হইতে অধিক সুখী, তাহাতে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। তিনি রুসোকে বলিয়াছিলেন "স্বভাবতঃ মানুষ পশু, সভ্য সমাজে মানুষের অন্তরস্থ পশু শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে এবং তাহার বুদ্ধিও বুদ্ধিগ্রাহ্য সুখের বৃদ্ধির সুযোগ ঘটে।" ফ্রান্সের তৎকালিক অবস্থা যে ভাল নহে, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন, কিন্তু তাহাতে ভাল যে কিছুই নাই, তাহাও নহে বলিতেন। "The world as it goes" গ্রন্থে ভলটেয়ার এক গল্প বলিয়াছেন। Persepolis নগরের অধিবাসীদিগের কদাচারে ভীষণ রুষ্ট হইয়া এক দেবতা ঐ নগর ধ্বংস করা উচিত কিনা, তাহা প্রতিবেদন (report) করিবার জন্য বারবুক নামক এক দূত প্রেরণ করিলেন। বারবুক নগরে পাপের প্রাবল্য দেখিয়া নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেও, নগরবাসিগণের ভদ্রতা, সদ্ব্যবহার ও পরোপকারপ্রবৃত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। পাপের যথাযথ বর্ণনা দিলে, নগরের ধ্বংস নিশ্চিত জানিয়া তিনি এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। বহুমূল্য ধাতু ও মণিমুক্তার সহিত অকিঞ্চিৎকর ধাতু, প্রস্তর ও মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা তিনি এক সুন্দর মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া প্রভুর নিকট উপস্থিত

হইলেন, এবং কহিলেন, "কেবল স্বর্ণ ও হীরক নির্মিত নহে বলিয়া কি এই সুন্দর মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন?" নগর রক্ষা পাইল। পূর্ব্বে মানুষের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সাধন না করিয়া, তাহাদের প্রতিষ্ঠান সকলের পরিবর্ত্তন করিলে, মানুষের অপরিবর্ত্তিত প্রকৃতির মধ্যে তাহারা পুনঃ প্লাবিত হইয়া উঠে। Church, state প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করে মানুষ। আবার মানুষের প্রকৃতিও গঠিত হয় এই সকল প্রতিষ্ঠান দ্বারা। মানুষের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান, আবার প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ মানুষ। ভলটেয়ারের মতে এই দুষ্টচক্র ভেদ করিবার একমাত্র উপায় শিক্ষা দ্বারা মানুষের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করা। কিন্তু রুশোর বিশ্বাস ছিল, যে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগচালিত বক্ষের দ্বারাই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস সম্ভবপর। ধ্বংসের পরে হৃদয়ের প্রয়োজনায় নূতন প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে। তাহা দ্বারাই সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রী, রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস যে কেবল বুদ্ধিদ্বারা সম্ভব নহে তাহা সত্য, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিদ্বারাই যে তাহা সম্ভবপর হয়, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু পরিবর্ত্তন যদি কেবল হৃদয়াবেগ দ্বারাই সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে তাহার স্থায়িত্বের সম্ভাবনা কম। সহজাত প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগ—উভয়েরই জন্ম অতীতে। অতএব, অতীতের প্রতি উভয়েরই প্রবল আকর্ষণ আছে। অতীতের প্রতিষ্ঠানের অনুরাগী হইয়াই তাহারা অতীত প্রতিষ্ঠান হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। সুতরাং এই সহজাত প্রবৃত্তি ও হৃদয়াবেগ দ্বারা যে প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট হইবে, তাহা অতীত প্রতিষ্ঠানের অনুরূপই হইবে। রুশোর মতের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার বীজ লুক্কায়িত ছিল। ফরাসী বিপ্লবের উন্মাদনা যখন নির্বাপিত হইল, তখন অতীতের "সুখ ও শান্তির দিনে"র জন্য ফরাসী হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই প্রতিক্রিয়ার ফল Chateau briand, De Stoel, De Maistre ও Kant.

১৭৭০ সালে ভলটেয়ারের বয়স যখন ৭৬ বৎসর তখন তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার এক আবক্ষ মূর্ত্তি নির্মাণের জন্য অর্থ-সংগ্রহ করেন। সহস্র সহস্র লোক চাঁদা দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। ধনাদিগের চাঁদা এক মাইটে (অর্দ্ধ ফার্দিং) সীমাবদ্ধ করা হইয়াছিল। Frederick the Great জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, তাঁহাকে কত দিতে হইবে, উত্তর দেওয়া হইল "এক ক্রাউন ও তাহার নিজের নাম।" ভলটেয়ার তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া লিখিলেন "অন্যান্য বিজ্ঞানের সহায়তার উপর একটি কঙ্কালের মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সাহায্য করিয়া আপনি দৈহিকগঠন বিদ্যার (anatomy) চর্চায় সহায়তা করার জন্য আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।" এই মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠায় ভলটেয়ারের আপত্তি ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন "আমার মুখের যে কিছুই অবশিষ্ট নাই। চক্ষু কোটরের মধ্যে তিন ইঞ্চি ঢুকিয়া গিয়াছে, গণ্ডদেশ জীর্ণ পার্চমেন্টে পরিণত হইয়াছে, সামান্য কয়েকটি দাঁত ছিল, তাহাও আর নাই।" একদিন তাঁহার প্রিয় কোনও ব্যক্তি তাঁহাকে চুম্বন করিলে বলিয়াছিলেন "জীবন মৃত্যুকে চুম্বন করিতেছে।"

ভলটেয়ার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়াছিলেন। এক সময় বলিয়াছিলেন "ভয় হয়, পাছে মানুষের হিতকর কিছু করিবার পূর্ব্বেই মরিয়া যাই।" হিতকর অনেক কার্য্যই এই দীর্ঘজীবনে তিনি করিয়াছিলেন। তাঁহার Ferney-র গৃহ অত্যাচারপীড়িত অনেক বিপন্ন লোকের আশ্রয় স্থান ছিল। বহুদূর হইতে বহুলোক সাহায্যের জন্য তাঁহার নিকট আসিত, আপদবিপদে লোকে তাঁহার পরামর্শ চাহিত। কাহাকেও তিনি বিমুখ করিতেন না। দরিদ্রলোকে অপরাধ করিয়া আসিয়া তাঁহার নিকট অপরাধ স্বীকার করিত, তিনি তাহাদিগকে আইনের কবল হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়া তাহাদের জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। এক দম্পতী একবার তাঁহার স্বর্ণ চুরী করিয়া নতজানু হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করে। তাহাদিগকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন "আমার ক্ষমা তোমাদের করায়ত্ত। ঈশ্বরের ক্ষমা ভিক্ষা কর।" নিজের সম্বন্ধে একবার বলিয়াছিলেন "আমাকে কেহ আক্রমণ করিলে, শয়তানের মত লড়াই করি, কিন্তু অন্তরে আমি একটি সাধু লোক। হাসির মধ্যে আমার লড়াই শেষ হয়।"

৮৩ বৎসর বয়সে প্যারিসে যাইবার জন্য তাঁহার অদম্য ইচ্ছা হইল। চিকিৎসকেরা প্যারিস গমনে আপত্তি করিলেন। যে নগর হইতে তিনি নির্বাসিত হইয়াছিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার তাহা দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া ভলটেয়ার অতিকষ্টে প্যারিসে উপনীত হইলেন এবং একেবারে বন্ধু D' Argentalএর গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন "মরণ মুহূর্ত্ত রাখিয়া আমি তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি।" পরদিন হইতে দলে দলে লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। Benjamin Franklin তাঁহার পৌত্রকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। যুবকের মাথায় হাত দিয়া ভলটেয়ার তাহাকে ঈশ্বর ও স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে উপদেশ দিলেন।

কিন্তু প্যারিসে সহ্য হইল না। সত্বরই ভলটেয়ার পীড়িত হইয়া পড়িলেন। সংবাদ পাইয়া একজন পুরোহিত আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভলটেয়ারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি কহিলেন "আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছি।" ভলটেয়ার কহিলেন "তাহার প্রমাণ?" পুরোহিত ফিরিয়া গেলেন। ইহার পরে ভলটেয়ার নিজেই একজন পুরোহিতকে ডাকাইয়া আনিলেন। কিন্তু "ক্যাথলিক ধর্ম্মে আমি পূর্ণ বিশ্বাসী," ইহা লিখিয়া সহি না করিলে, তিনি তাঁহার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না। ভলটেয়ার তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন তিনি নিজে একখানা কাগজে লিখিলেন "ঈশ্বরে ভক্তি, বন্ধুদিগের প্রতি ভালবাসা, কুসংস্কারের প্রতি ঘৃণা পোষণ করিয়া এবং শত্রুদিগকে ঘৃণা না করিয়া আমি মৃত্যুবরণ করিতেছি।" ইতি ভলটেয়ার, [illegible] লিখিয়া কাগজখানা আপনার সেক্রেটারিকে দিলেন।

মৃত্যুর কিছু বিলম্ব ছিল। পীড়িত অবস্থায় একদিন French Academy-তে গমন করিলেন। পথে উদ্দাম জনতা তাঁহার যে

অভিনন্দন করিয়াছিল, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত কোনও বিজয়ী সেনাপতিও কখনও তাহা প্রাপ্ত হন নাই। একাডেমিতে গিয়া তিনি অভিধান সংস্কারের প্রস্তাব করিলেন, এবং 'A' অক্ষরের নিম্নস্থ সমস্ত শব্দের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

একদিন তাঁহার নূতন নাটক Irene এর অভিনয় দেখিতে ভলটেয়ার থিয়েটারে গমন করিলেন। নাটকটি ভাল হয় নাই, কিন্তু দর্শকেরা নাটকের গুণাগুণ বিচার করিল না। ৮৩ বৎসরের বৃদ্ধ যে নাটক লিখিতে পারিয়াছেন, ইহাতেই সকলে আশ্চর্যান্বিত হইল। মুহুর্মুহু করতালিধ্বনিতে রঙ্গগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। সেই দিন গৃহে ফিরিয়া ভলটেয়ার বুঝিতে পারিলেন আর বিলম্ব নাই, মরণ নিকটবর্ত্তী। ১৭৭৮ সালের ৩০শে মে তারিখে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। প্যারিসের ধর্ম্মযাজকগণ খৃষ্টীয় মতে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ব্যাঘাত উৎপন্ন করায়, বন্ধুগণ তাঁহার দেহ গোপনে প্যারিসের বাহিরে লইয়া গেলেন। তথায় একজন পুরোহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় পৌরোহিত্য করিতে সম্মত হইলেন। "পবিত্র ভূমিতে" ভলটেয়ারের সমাধি হইল। ১৭৯১ সালে তাঁহার দেহ প্যারিসে আনীত হইয়া Pantheon এ সমাহিত হইয়াছিল। সমাধির উপরে মাত্র তিনটি শব্দ উৎকীর্ণ আছে—"এখানে শায়িত ভলটেয়ার।"

ব্লড-প্রেশার

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সারারাত্রি কেটেছে দারুণ দুশ্চিন্তায়—মাথায় আগুন জ্বলছে—দেহ যাচ্ছে পুড়ে…এক ফোঁটা ঘুম নেই চোখে… সারিডনের দু-দুটো বড়ি…ভাগানিন্…কোনো কিছুতে সামাল দেলেনি।

সকাল হতেই স্ত্রী ভুবনেশ্বরী বললেন—মুখ ধুয়ে এখনি অনিল ডাক্তারের ওখানে যাও! একখানা রিক্শ ডেকে আনতে বলি জগাকে ··

বিছানায় বসে সতীশ·· বালিশে মাথার ভর…মস্ত নিশ্বাস ফেলে বললেন—কিন্তু জানো তো, ব্লড-প্রেশারের কোনো ওষুধ নেই·· ডাক্তারেরা বলেন। মিথ্যে কতকগুলো ওষুধ কিনে বাজে খরচ!

কথাটা শুনে ভুবনেশ্বরী চমকে উঠলেন—ডাক্তারদের মুখে একথা তিনি শুনেছেন·· আরো শুনেছেন, ব্লড-প্রেশার রোগটি দেহে ভর করলে রোগীর প্রাণটুকু ঝুলতে থাকে যেন মাছ সুতোয় বাঁধা…একটু নড়া চড়াতেই…

নিশ্বাস চেপে ভুবনেশ্বরী বললেন—তবু চেষ্টা করতে হবে তো! যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ!

সতীশ বললেন—কিন্তু সংসারের এই হাল্…মুদির দোকানে গেল মাসের টাকাটা এখনো দিতে পারিনি… ইংরিজি মাসের আজ ষোল তারিখ ··

ভুবনেশ্বরী বললেন—প্রাণের দিকে চাইতে হবে সব আগে!…শোনো, কথা কাটাকাটি করো না · আমার কাছে দশ টাকার একখানা নোট আছে…অতি কষ্টে বাঁচিয়ে রেখেছিলুম · সেখানা দিচ্ছি·· অনিল ডাক্তারকে ভালো করে দেখিয়ে ওষুধ যা তিনি দেন, কিনে তবে বাড়ী ফিরবে! যে রিক্শ করে যাবে তাকে ছেড়ে দিয়ো না ·· সেই রিকশ করেই ফিরবে। আজ রোববার·· আফিস যাওয়া নেই…তোমায় আজ একটিবারও আমি নড়াচড়া করতে দেবো না·· পুরোপুরি বিশ্রাম·· বুঝলে?

সতীশ বললেন—বুঝি সব ··কিন্তু এ ভাবে কতদিন চালাবো? যে নৌকো ফুটো হয়ে গেছে, তাতে কত তাপ্পি দেবে ভুবন?

শেষের দিকে সতীশের কথাগুলো বাষ্পভারে আর্দ্র হয়ে এলো। একথায় ভুবনেশ্বরীর চোখের সামনে ভবিষ্যতের যে ছবি ফুটলো চকিতে, তাতে মনখানা অসহায় নৈরাশ্যে হু-হু করে উঠলো!…

সতীশ বললেন—গেল হপ্তায় ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলুম…তোমাকে বলিনি ··কত জানো?

সভয় দৃষ্টিতে ভুবনেশ্বরী তাকালেন সতীশের পানে।

সতীশ বললেন—একশো আশি! ভুবনেশ্বরীর মনে হিসেবটা তখনি জল জল্ করে উঠলো…ব্লড-প্রেশারের আর কোনো তত্ত্ব না জানলেও এটুকু জানা আছে, যত বছর বয়স তার সঙ্গে নব্বই যোগ দিলে হয় নর্ম্যাল…সতীশের বয়স

বিয়াল্লিশ···তার সঙ্গে নব্বই যোগ করলে হয় একশো বত্রিশ। সে জায়গায় আটচল্লিশ বেশী!

মনে মনে ভগবানকে ডেকে মুখে তিনি বললেন—আজ এখন এসো তো দেখিয়ে · তারপর অফিস থেকে যদি অন্ততঃ এক মাসের ছুটী না নাও, দেখো, তখন কি করি!

মৃদু হেসে সতীশ বললেন—তুমি যা খুশী করতে পারো ভুবন···কিন্তু আমার করবার যে কিছু নেই · ছাপোষা গেরস্থ মানুষ · তার এমন বড়-মানুষী রোগ কেন যে হয়! ··

অনিল ডাক্তার দেখলেন ··দেখে বললেন—আরে, একটু বাড়িয়ে তুলেছেন দেখছি। খুব খাটুনি চলেছে অফিসে!

সতীশ বললেন—গোলামের প্রাণ···ডাক্তারবাবু যাবে না · দেতো ঘোড়াগুলোকে দেখলে ভয় হয় কখন মুখ থুবড়ে পড়ে···আমাদেরও সেই দশা!

অনিলডাক্তার বোকলেন · তিনি কাগজ টেনে দু-তিনটে ওষুধের নাম লিখলেন, লিখে বললেন—এগুলো সব এসেছে ···বলছে তো খুব কাজ দেবে। দেখুন একবার! কখন কোনটা খেতে হবে লিখে দিলুম···আর পারেন যদি দু-তিন দিন অন্ততঃ রেষ্ট নিতে ·

সতীশ বললেন—অফিস কামাই করে?

ডাক্তার বললেন—পারলে ভালো হয়—একান্ত তা না পারেন, অন্ততঃ একটা রিক্‌শ করে অফিসে যাওয়া-আসা। না হলে এখনকার দিনে ট্রামে-বাসে চড়ে যাওয়া সর্ব্ব-রোগ তাতে প্রশ্রয় পেয়ে মানুষকে চেপে ধরে!

ডাক্তারের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আবার রিক্‌শায় বসা···এবারে ওষুধ-কেনা ·

ট্রাম-রাস্তার উপর ডিসপেন্সারি · রিক্‌শাওলাকে দিলেন নির্দ্দেশ···রিক্‌শ চললো···

সতীশের মনে প্রচণ্ড কলরব · যেন মিনিষ্টারদের আলোচনা-তর্ক

—পয়সা খরচ তো অনেক হচ্ছে; ফল? তার চেয়ে ও পয়সাগুলো থাকলে এর পর সংসারের কিছু তিল্লে! ·

—কিন্তু ডাক্তারবাবু বললেন, নতুন এসেছে এ ওষুধগুলো···কাজ দেবে ··অর্থাৎ ধন্বন্তরি!

—ক্ষেপেচো! এ সব ব্যবসাদারী! ওষুধওলারা মানুষের প্রাণ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছে·· ছিনিমিনি খেলা ·টকা-ফকা লাগে যদি তুক্ তো কেল্লা মাবে···

—তবু চেষ্টা চাই · ভুবনেশ্বরী বলেছেন, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ! তুমি যদি আজ চলে যাও·· ভাবো তো··· তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ভুবনেশ্বরী কতখানি অসহায় হবেন! এক পয়সা সঞ্চয় নেই—দিন আনো, দিন খাও ·

—হুঁ · দশটাকা দিয়ে ওষুধগুলো না হয় কিনলুম · এমন ঢের কিনেছি···কিছু হয়নি। মুদির দোকানে দেনা ··পরশু রেশন আসবে—কোন দিক দিয়ে কোনটাকে সামলাবো?···

হঠাৎ হাতে করাঘাত···সঙ্গে সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান —সতীশ যে · আরে·· গুড় দেও!

চমকে চেয়ে সতীশ দেখেন—শ্রীপতি!

শ্রীপতি বললে—কোথায় চলেছো?

সতীশ বললে—ডিস্‌পেন্সারিতে ওষুধ কিনতে।

—বাড়ীতে কার অসুখ হলো.. আপনার?

—আমার নিজের!

—কি অসুখ?

—ব্লড-পেশার!

—হুঁ ··কিন্তু আমি ভাই অকূল সমুদ্রে পড়েছি—কূলের সন্ধানে দিশাহারা হয়ে ঘুরছি। তুমি ওল্ড ফ্রেণ্ড—হঠাৎ তোমায় দেখে—

শ্রীপতি বাল্যবন্ধু স্কুলে এক ক্লাশে দুজনে পড়েছেন—তারপর প্রথম যৌবনে একসঙ্গে তাস-পাশা খেলা···সখের থিয়েটারে অভিনয় ··ছুটীছাটার দিনে মাছ ধরতে যাওয়া · এখনই কালেভদ্রে দেখা হয়। শ্রীপতিকে সতীশ দেখেন —কখনো ট্যাক্সি চড়ে চলেছে · কখনো দেখেন সাহেবি-পোষাকে···দেখে হিংসাও হয়েছে ··শ্রীপতি লাকি ডগ্··· জীবনটা বেশ কাটিয়ে চলেছে···দায় নেই, দুঃখ নেই··· সদাই হাসি-মুখ · উৎফুল্ল উচ্চকণ্ঠে আলাপ-আলোচনা—সেই শ্রীপতি অকূল সমুদ্রে পড়ে কূলের সন্ধানে সতীশকে ধরেছে—সবিস্ময়ে সতীশ তাকালেন শ্রীপতির পানে—চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

শ্রীপতি বললেন—গোটা আষ্টেক টাকা চাই, ভাই··· ধার ঘণ্টা তিন-চারের জন্য। যে দিব্যি করতে বলো,

রাজী ··· চার ঘণ্টার মধ্যে তোমার আট টাকা শোধ করে' দেবো, তার সঙ্গে প্রাপ্য দুটো টাকা ···

শ্রীপতির অকূল সমুদ্রে এবার পড়লেন সতীশ! সতীশ বললেন—আমার কাছে আছে একখানা দশটাকার নোট ···তিনটি ওষুধ কিনতে হবে··· জানি না দশ টাকাতেই হবে, না তার ওপর আরো কিছু···

শ্রীপতি হাতখানা প্রসারিত করে' বললে—কুছ পরোয়া নেই—নোটখানা তুমি দাও··· দিয়ে এসো আমার সঙ্গে··· বসে থেকে টাকা আদায় করে' নিয়ে যাবে···আই গ্যারান্টি··· আজ তো রোববার··· ছুটী ···বেরতে হবে না! কাম এ্যালং মাই ফ্রেণ্ড!

সতীশ জানেন শ্রীপতি চিরকাল হাই-ডিগার ক্লাশের লোক···খরচ করতে জানে পয়সার উপর তার মায়া কম··· হাতে টাকা থাকলে মেজাজ হয় দিল-দরিয়া! তবু···

কুণ্ঠিত স্বরে সতীশ বললেন—কিন্তু বাড়ী থেকে গিন্নী রিক্‌শ করে' দিয়েছেন, এতে তুলে বলে দেছেন, ছাড়া নয়, এই রিক্‌শতেই ওষুধ কিনে ফিরতে হবে!

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে শ্রীপতি বললে—বয়স হয়েছে, এখনো স্ত্রীর কথা এমন মেনে চলো! আরে ছ্যাঃ লজ্জা পাইয়ে দিলে সতীশ!··· যাক, রিক্‌শর কত ভাড়া? ···এই—

বলে রিক্‌শওলার হাতখানা ধরে শ্রীপতি বললে—বাবুকে নামিয়ে দাও চাঁদ—এই নাও একটি টাকা তোমায় দিচ্ছি···ভাড়া— নামো সতীশ···

অনুরোধ নয়···অনুজ্ঞা! সে অনুজ্ঞার সঙ্গে কায়িক শক্তি। সতীশের হাত ধরে শ্রীপতি তাকে টেনে নামালো রিক্‌শ থেকে···সতীশ বিব্রত ···সন্ত্রস্ত ···বললে— আহাহা ··

শ্রীপতি বললে—আমাকে তো চেনো··· বসেছি অকূল সমুদ্রে···তুমি এসে উদয় হলে নির্ভর করবার কূল···এ কূল হাতে পেয়ে আমি ছাড়বো না! চলে এসো সুড়সুড় করে'··· জাষ্ট এ গুড বয়···পথের ··· যদি সীন্ ক্রীয়েট করতে না চাও!···

সতীশ ভালো মানুষ লোক কোলাহল-কলরবে রুচি নেই! ক'মাস আগে অফিসের বাবুরা পেন্-ষ্ট্রাইক্ করেছিল···কে জানে, তার ফলে কি ঘটবে এই ভেবে সাবধানী সতীশ ডাক্তারের সার্টিফিকেট পেশ করে' ব্লড-প্রেশারের কল্যাণে ও'দিনটায় নিয়েছিল ছুটী!

শ্রীপতি দুরন্ত, উদ্দাম হয়ে ওঠে···তার খেয়াল! কে জানে কথা না শুনলে ফলে কি বিষম চ্যাঁচামেচি সুরু করে দেবে— তারপর ইদানীং মদের মাত্রা বাড়িয়েছে। মাতাল আর দাতাল—এদের পাল্লায় পড়লে হুঁসিয়ার থাকতে হয়—বিয়াল্লিশ বছরের জীবনের অভিজ্ঞতায় সতীশের তাও আছে জানা!

রিক্‌শকে বিদায় দিয়ে একশো নব্বইয়ের প্রেশার সমেত সতীশকে করতে হলো শ্রীপতির অনুধাবন!···রগ দুটো আবার দপ্‌দপ্ করছে কে জানে হয়তো মানসিক উত্তেজনায় প্রেশার আরো দশ বেড়ে গেল!

সতীশকে নিয়ে শ্রীপতি এলো গ্রে ষ্ট্রীট পার হয়ে শোভাবাজার ষ্ট্রীট ধরে খানিক এগিয়ে নাগের বাগানের এক গলিতে। গলির মধ্যে ফটকওয়ালা বাড়ী। সেই বাড়ীর বাইরের ঘরে মাদুর নয়, মেঝেয় ফরাশ পাতা বিছানা···বিছানার মাঝামাঝি দশ-বারোজন ভদ্রলোক ঘ্যাঁষাঘেঁষি বসে কি যেন যজ্ঞসাধন করছে··· চীৎকার হাসি গালাগাল···পুরাণে পড়া নরমেধযজ্ঞের কথা সতীশের মনে জাগলো!

হাতের আঙুলগুলো সঘন সঞ্চালিত করতে করতে শ্রীপতি বললে—নাউ-অর নেভার··· দশ টাকার নোটখানা ··· কুইক-কুইক বড় জোর চারটি ঘণ্টা ভাই··· ইচ্ছা হয় বসে খেল, দ্যাখো, ইচ্ছা না হয়···ওধারে ঐ খবরের কাগজ রয়েছে ···স্বাধীন দেশের সুখ সৌভাগ্যের খবর পড়ো···

সতীশের সাধ্য কি, ছাড়ান পাবেন! দশ টাকার নোটখানা বার করে দিলেন···মনে হলো, হৃদয়পিঞ্জর খুলে প্রাণপাখীটিকে যেন

টাকা নিয়ে শ্রীপতি প্রায় ঝাঁপ দিয়ে ওদের মধ্যে পড়লো···সঙ্গে সঙ্গে অট্টরব— এই যে শ্রীপতি—

—ওঃ ···গোহার হেরেও লজ্জা নেই! শ্রীপতি বললে— খেলায় হার জিত্ আছেই। হেরে যে পালায় তাকে স্পোর্টসম্যান্ বলা চলে না।

— হুঁ···কত মূলধন এবার?

—দশ···

—মোটে দশ !…

শ্রীপতি বললে—দশেই কি দশা করি ছাখো না !…

সতীশ চেয়ে চেয়ে দেখলেন · প্রমত্ত খেলা চলেছে—একখানা বোর্ড…বোর্ডে একটা গোল ডিস্ক… একটা লাল ছোট বল ··সেটাকে ঘিরে ক'জনে বসেছে…যেন গ্রামোফোন ডিস্কে রেকর্ড ঘোরানো ··উপুড় হয়ে ঝুঁকে সকলে দেখছে ··আর সব হৈ-চৈ হল্লা · ফাইভ্ টেন… টোয়েনটি·· ওয়ান—হানড্রেড !·

মনে হলো তিনি স্বপ্ন দেখচেন না তো ? · সকালে উঠে রিক্শয় চড়ে ডাক্তারের বাড়ী·· সেখানে হাতে রবারের নল জড়ানো · ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন্ লেখা · সেগুলো সত্য ? না, এইখানে বসে আছেন তিনি সকাল থেকে · বসে বসে স্বপ্ন দেখচেন ? ·

পনেরো মিনিট সময় লাগলো বুঝতে ! এবং বুঝলেন, ওদের চলেছে জুয়ো খেলা ··বাজি রেখে জুয়ো-খেলা · সভ্য ভদ্র জুয়ো। বুকখানা ধুক্ করে উঠলো মাথা ঝন্ঝন্ করছে · এ তিনি কি করেছেন ? সেখানে প্রায় হলো · ওষুধ নিয়ে বাড়ী ফিরবে…ভুবনেশ্বরী সেখানে আকুল উদগ্রীব হয়ে ঠাকুর-দেবতার মানত করছেন·· আর সতীশ ·

উপায় কি ?…এমনি বেরিয়ে যাবেন ? কিন্তু দশ-দশটা টাকা ! গরীব গৃহস্থের কাছে এ দশ টাকার কতখানি দাম ! নিজে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করে · কত সুখ সাধ বিসর্জ্জন দিয়ে সংসারের কোন্ অভাবনীয় বিপদের মুহূর্ত্তে উত্তীর্ণ হবার জন্য বেচারী ভুবন—এ দশটা টাকা কত দিনে হয়তো সঞ্চয় করেছিলেন সে টাকা জুয়াড়ির হাতে—

মনে পড়লো, ঘরে কত দিকে কত অভাব…ছোট ছেলেটার বাকসের সিরাপ ফুরিয়েছে ··টুনির গরম জামাটা দর্জ্জীর কাছে সেরে আনা হচ্ছে না ··মুদির দোকান·· রেশান·· সে সব জলাঞ্জলি দিয়ে ভুবনেশ্বরী সতীশের জীবনটাকে বেঁধে রাখবার জন্য এ দশ টাকা বার করে দেছেন…

না, না, না—জুয়াড়ির হাত থেকে এ টাকাগুলো উদ্ধার না করে তাঁর মুক্তি নেই…এর জন্য প্রাণটাও যদি যায়… এমনি লক্ষ রকম ভাবনার মধ্যে ওদের চীৎকার ওঠে…

ফিফ্‌টি…থার্টি…করুণ চোখে সতীশ চেয়ে দেখেন… শ্রীপতি ? ··তার উল্লাস ··জিতছে ?…আহা, জিতুক… জিতুক ··ভগবান, তুনিয়ার সব লোকের সব প্রার্থনা এখন না ·এখন না ··শুধু সতীশের প্রার্থনাটুকু শুনে পূরণ করো ··শ্রীপতিকে জিতিয়ে দাও·· জিতিয়ে দাও…

পরে তুজন একজন করে আরো লোক এসে জমছে খেলার দু-তিনটে সেন্টার খোলা হয়েছে…সতীশ দেখছেন নির্বাক বিস্ময়ে ··মনে হচ্ছে · পৃথিবীর সব কাজ-কারবার বুঝি মিটে গেছে · টাকা পয়সা রোজগারের সব পথ বুঝি বন্ধ · তাই পয়সা রোজগারের জন্য মানুষরা আজ এখানে এসে এই টাকার নেশায় মেতে বসছে ·

তারপর কোথা দিয়ে নটা · দশটা…এগারোটা বেজে গেছে, খেয়াল নেই। বারোটায় ঘড়ি বাজতে সতীশের চোখ পড়লো ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো বড় ঘড়িটার পানে ··

ইস্ বারোটা ! · পাঁচ মিনিটের মধ্যে এতগুলো ঘণ্টা বেজে গেছে · আশ্চর্য্য ··সতীশের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো · আর নয় · ও টাকাগুলোর মায়া করা চলে না আর !…

সতীশ উঠে পড়লেন—পা টলছে—গা টলছে—পৃথিবীখানাই যেন টলমল করছে…বুকে ভারী পাথর চাপানো দু'চোখে যেন লঙ্কা ঘষে দেছে কে ·

সতীশ নিঃশব্দে এলেন বাড়ীর বাহির পথে। সামনে কখানা রিক্শ ·

কিন্তু না, রিক্শ নেওয়া চলে না ! দশ-দশটা টাকা জলে গেছে, তার ওপর আবার শ'বাজার থেকে হাতীবাগান রিক্শ ভাড়া··

শ'বাজারের মোড়—পিঠে যেন কে ঘাসের চাপড়া ছুড়ে মারলো। ফিরে তাকিয়ে সতীশ দেখেন শ্রীপতি… শ্রীপতি বললে—লাকি ব্রাদার…এমনি ক'রে বন্ধুকে ত্যাগ করে আসতে হয় !

রাগ,দুঃখ,আক্রোশ ··সতীশের মনে যেন চরকি বাজীতে কে আগুন দেছে ! সতীশ জবাব দিলেন না…

শ্রীপতি বললে – এই নাও ব্রাদার তোমার দশ টাকার সেই নোট…আর যা প্রমিশ করেছিলুম—টু রুপীজ এক্সট্রা !

সতীশের মাথার উপর থেকে পাহাড়ের বোঝা গেল সরে—সতীশ নিলেন দশ টাকার নোট…বললেন—ও দু'

টাকা নেবো না···আমি মহাজনী কারবার করিনি তোমার সঙ্গে।

শ্রীপতি ছাড়বার পাত্র নয় বললে—আহা না, না মহাজনী নয়···তুমি যেমন ফ্রেণ্ড ইন নীড্ আমিও তেমনি ফ্রেণ্ড ইন ডীড···কথা দিয়েছি যখন মরদকি বাত্···

—না, না, না শ্রীপতি···

শ্রীপতি টাকা দুটো সতীশের পকেটে ফেলে পকেটটা চেপে ধরে বললে—সুদ নয় সতীশ, সুদ নয়···বন্ধুর প্রীতি··· রিগার্ডস, কমপ্লিমেণ্টস···না নিলে মনে করবো তুমি রাগ করেছো···

নিতে হলো···নিয়েও মুক্তি নেই। শ্রীপতি ধরলো সতীশের একখানা হাত চেপে···বললে—কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে তোমাকে ছাড়ছি না ব্রাদার···

কৃতজ্ঞতা! সতীশ বললেন চমকিত কণ্ঠে।

—নিশ্চয়! পাঁচশ টাকার জন্য সকাল থেকে কার কাছে না হাত পেতেছি···কেউ দেয়নি! কাল···কাল রাত্রে সাতাশ টাকা হেরে বাড়ী ফিরেছি···যাকে বলে, রিক্ত, সর্বহারা! রাত তখন তিনটে—গিন্নী চটে আগুন! বললুন—মড়া পুড়িয়ে ফিরেছি শ্মশান! ব্যস···ভোরে বেরিয়েছি যে টাকা রিকুপ করে ঘরে ফিরবো প্রতিজ্ঞা নিয়ে! দশটা টাকা ভাগ্যে তোমার কাছ থেকে পেয়েছিলুম···তুমি এমন ম্যাজিক···যেন লাক্কী হ্যাণ্ড সেক্! পেয়েছি কত জানো—পঞ্চাশ টাকা···সতীশ জবাব না দিয়ে থাকতে পারলেন না, বললেন—রাত তিনটে পর্যন্ত খেলা··· তারপর সকালেও···তোমাদের ঘুম নেবে না বুঝি?

—না···মিণ্ট খোলা, ব্রাদার দেখেছো তো চাকা ঘুরছে···যত ঘুরবে তত টাকা বেরুবে···সত্যি এক এক সময় এমন হয় যে পকেটে একটি পাই পয়সা থাকে না থাকে শুধু বকেয়া দেশলাই আর দেশলাইয়ের খালি খোলটা··· কিন্তু যাকগে···এসো ফ্রেণ্ড···ঐ মোড়ের দোকানে মটন পাওয়া যায় খাসা—বাজার করে নিয়ে যাবো···গৃহিণী হুল হয়ে যাবেন···হতভম্বের মতো সতীশ বললেন—কিন্তু আমি···

—তুমি আমার চাঁদ গেষ্ট আজ! তোমার জন্য কূল পেয়েছি···তোমাকে কি ছাড়তে পারি!

সতীশ বললেন—আমাকে ওষুধ কিনে বাড়ী যেতে হবে বাড়ীতে আমার ওয়াইফ ভাববেন!

হো হো করে হেসে শ্রীপতি বললে—আরে ওয়াইফ··· ওয়াইফদের স্বভাব হলো ভাবা···তার জন্য কার কোথায় কি আটকাচ্ছে হুঁ···এসো—এসো···

আবার ধর-পাকড়···সতীশ যেন কেঁচো···পথে লোকের ভিড়···হাত কাড়াকাড়ি করা চলে না—এখনি ঐ ভিড় জমাট বেঁধে ঘিরে দাঁড়াবে—ব্যাপার কি!···

শ্রীপতি মটন কিনলো···গলদা চিংড়ী কিনলো···কপি কিনলো···নতুন আলু কড়াইশুঁটি···সন্দেশ···দই-রাবড়ি··· এক কুলির মাথায় জিনিষ তুলে রিক্শ ডাকলো···সতীশকে বললে—ওঠো···

মিনতিভরা কাতর কণ্ঠে সতীশ বললেন—কিন্তু ভাই, এসব রিচ ফুড আমি খাই না—ডাক্তারের বারণ।

শ্রীপতি তুবড়ির মতো ফেটে পড়লো—ডাক্তাররা বারণ করবেই তো—খেতে হুকুম দেবে ওরা শুধু বলবে— আমাদের দাওয়াই খাও আর ইঞ্জেকশন ছাড়া আর কিছু না··· স্নেক, মানে দাওয়াই-ওভার!

রিক্শর উপর বসলেন সতীশ···শ্রীপতি বসলো পাশে। রিক্শ চললো কুলি চললো ঝাঁকা মাথায় নিয়ে সেই রিক্শর সঙ্গে···

শ্রীপতি সুখে ভোজনের ফিরিস্তি দিচ্ছে···আর সেই সঙ্গে বললে কিনা তোমার কাল থেকে মরে আছি বাবা··· তুমি আমার মৃতসঞ্জীবনী···

সতীশের চোখের সামনে সব কেমন ঝাপসা কানে এসে লাগছে শ্রীপতির কথা···মনে হচ্ছে, কে যেন কাকে ও সব কথা বলছে।

টুন টুন ঘণ্টার আওয়াজ করতে করতে রিক্শ ঢুকলো শ্যামপুকুরের এক গলিতে···ছোট একখানা দোতলা বাড়ী ···বাড়ীর সামনে এসে শ্রীপতি হাঁকলো—ব্যস—ব্যস— এই বাড়ী।

গাড়ী থেকে শ্রীপতি নামলো···তার পর সতীশ··· রিক্শ ভাড়া দিয়ে কুলিকে নিয়ে অতঃপর গৃহপ্রবেশ··· সতীশকে যেতে হলো তার পিছনে···ল্যাংবোটের মতো।

বাড়ীতে ঢুকেই ছোট্ট উঠান—উপরে বারান্দা··· উঠানের ওদিকে রোয়াক···কুলির ঝাঁকা থেকে জিনিষ-

পত্র রোয়াকে নামিয়ে তাকে পয়সা দিয়ে বিদায় করে' শ্রীপতি হাঁকলো—ওগো···

সে ডাকে রোয়াকের পাশের ঘর থেকে বেরুলেন ওগো···বিপুল দেহ নিয়ে !

শ্রীপতি বললে—বাজার করে' আনলুম···দীভাত খাবো—ইনি আমার বন্ধু এঁকে নেমন্তন্ন করে··

ওগোর বপুর পরিধি দেখে সতীশের চোখে লাগে ধাঁধাঁ···নিঃশব্দে তিনি দাঁড়িয়ে···দুচোখের দৃষ্টি ওগোর উপর নিবদ্ধ···তারপর যা হলো···

যেন বাজির দোকানে আগুন লাগলো !

শ্রীপতির ওগো নিঃশব্দে এলেন এগিয়ে মটর-চিংড়ীর স্তূপের কাছে··· এবং দু'পায়ের সবল তাড়নায় সেগুলোকে বিপর্যস্ত করে' তিনি ছাড়লেন হুঙ্কার—মদ খেয়েছো··· বটে !···সারা দিন আড্ডা দিয়ে বেলা একটায় ফিরে সর্বনাশ হচ্ছে···দীভাত খাবো ! আমার গতরটা গতর নয়···পাথর··· উঁ···

সতীশ নড়বার চেষ্টা করলেন···পারলেন না। পা দুখানা যেন ভারী লোহার থাম !

কাঁচুমাচু হয়ে শ্রীপতি বললে—মানে টাকা কিছু রোজগার হলো···বেলা হয়ে গেল তাই···মানে···

—রেখে দাও তোমার মানে !···আমি পারবো না··· তোমার বাঁদী পেয়েছো বটে !···ঘরে একটা পয়সা নেই··· ধার-ধোর করে' মনশাকে বাজারে পাঠিয়ে সে করে' আমি

কথাগুলোর পর মস্ত একটা নিশ্বাস···তারপর ওগো ফিরে তাকালেন সতীশের দিকে···বললেন—কেমন ধারা ভদ্দরলোক তুমি গা ! ভদ্দর লোকের অন্দরে ঢুকে হাঁ করে' দাঁড়িয়ে আছো !···আমার সাধ হয়ে থাকে— আর কোনো মানুষ নেই সহরে···এত বড় ধাড়ী লোকটার ঘাড়ে চেপেছো !···বেরিয়ে যাও···বেরিয়ে যাও বলছি আমার বাড়ী থেকে···না হলে···চিনিয়ে দেবো এখনি··· আমি কেমন মানুষ !

কথা শেষ করে' ফুলকপিটার গায়ে ওগো এমন কিক্ করলেন···মোহনবাগানের ফরোয়ার্ডের কিক্ এঁর কাছে কোথায় লাগে—ফুলকপিটা ধাঁইসে এসে লাগলো সতীশের বুকে···এবং সতীশ···

অভিভূতের ভাব কাটলে সতীশের উপলব্ধি হলো, তিনি পথে···এবং চলেছেন,না···ভুল নয়···হাতীবাগানের দিকেই !

বাড়ী ফিরে যা দেখলেন···অর্থাৎ উদ্বেগে আতঙ্কে ভুবনেশ্বরী তাঁর পিসতুতো ভাই মহীন্দ্রকে ডাকিয়ে এনেছেন ···মহীন্দ্র সতীশের সন্ধানে অনিল ডাক্তারের ওখান থেকে ···ভুবনেশ্বরীর পরিচিত সতীশের বন্ধুদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে সন্ধান নিয়ে এসেছে···এখন আবার একবার উদ্যোগ করছে···এবারে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে···

সতীশ সবিস্তারে কৈফিয়ৎ দিতে চাচ্ছিলেন·· ভুবনেশ্বরী বললেন—থাক থাক, ফিরেছো গো···একটু হরলিক্স করে দি, খাও···খেয়ে শুয়ে থাকো···আজ আর এত বেলায় স্নান করো না···তার পর মাছের ঝোল আছে ···দুটি ভাত চড়িয়ে দিই···খাও···

সন্ধ্যার একটু আগে···অনিল ডাক্তার এ-পাড়ায় একটা কল-এ এসেছিলেন···সতীশের সন্ধানে এবাড়ীতে এসে ঢুকলেন···সতীশকে দেখে বললেন—কোথায় গেছলেন মশাই ?

সতীশ বললেন—পথে এ্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল···

—ও···আচ্ছা দেখি আর একবার···

হাতে ক্যাপের সেই রবারের নল জড়ানো···একবার··· দুবার···তিনবার···ডাক্তারের যেন বিশ্বাস হয় না

ভুবনেশ্বরী বললেন—কি দেখলেন ?

ডাক্তার বললেন—গোলমাল হচ্ছে নাকি !

ভুবনেশ্বরী বললেন—তার মানে ?

—ও বেলা দেখেছি দুশোর কাছাকাছি···আর এখন দেখছি

—কত ?

—ওয়ান হাণ্ড্রেড এ্যাণ্ড ফিফটী···

—দেড়শো !

ভুবনেশ্বরীর দু চোখে বিস্ময়···

সতীশ ছিলেন নির্বাক···ডাক্তারের কথা শুনে তিনি বললেন—সুস্থ বোধ করছি বটে···শরীরটা বেশ ঝরঝরে মনে হচ্ছে···

অনিল ডাক্তার বললেন—কিন্তু হঠাৎ···এর মধ্যে···

মৃদু হেসে সতীশ বললেন—এর মধ্যে যা হয়ে গেছে··· মানে, স্বপ্নাদ্য ওষুধ···নয়ত কিওর···আপনারা অনেক পয়সা খরচ করে' ডাক্তারী বিদ্যা শিখেছেন, আপনারা মানবেন না···কিন্তু আমি না মেনে পারছি না···প্রত্যক্ষ ফল !

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

তিন

২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ মঙ্গলবার দুপুরে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের পীঠস্থান আন্দামানকে স্বচক্ষে দেখিলাম। এইখানে অগ্নিযুগের যোদ্ধা শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, বীর শ্রীবিনায়ক দামোদর সাভারকর, ভাই পরমানন্দ, শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী এবং আরও কত অসংখ্য মহাপুরুষই তাঁহাদের জীবনের বহু অমূল্য সময় অতিবাহিত করিয়াছেন, কেহ বা এইখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া দ্বীপটিকে আরও পবিত্র, আরও মহিমাময় করিয়া গিয়াছেন। এইখানে এই আন্দামানেই নেতাজী সুভাষ স্বাধীন ভারতের প্রথম পত্তন করেন। এইখানে আজাদ হিন্দ সরকার স্বগৌরবে স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে আন্দামানের স্থান নগণ্য বটে, কিন্তু স্বাধীন ভারতের নব ইতিহাসে আন্দামান চিরদিনই সগৌরবে বিরাজ করিবে।

এই আন্দামান একটি দ্বীপ নহে, ইহা দ্বীপপুঞ্জ। ২০৪টি ছোট বড় দ্বীপের সমাহারকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ বলে। তন্মধ্যে Great Andaman নামক যে দ্বীপটি আছে উহাই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই গ্রেট আন্দামান আবার তিনভাগে বিভক্ত, যথা North Andaman, Middle Andaman এবং South Andaman। উত্তর আন্দামানের বন্দরের নাম Port Cornwallis ইহা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই স্থান হইতে মধ্য আন্দামান পর্যন্ত সমস্তই গভীর জঙ্গল, লোকালয়হীন। এই অঞ্চলের গভীর জঙ্গলে 'জারোয়া' নামক আন্দামানের আদিম অধিবাসীগণ বাস করে। এই জারোয়ারা অত্যন্ত হিংস্র, তীর ধনুকের ব্যবহার জানে এবং সহর অঞ্চল হইতে বা জঙ্গলের মধ্যগামী ট্রলি রেলের লাইন হইতে লোহা চুরী করিয়া লইয়া গিয়া উহা দ্বারা তীরের ফলা প্রস্তুত করে। গাছ-গাছড়া হইতে বিষ আহরণ করিয়া তীরের ফলায় সেই বিষ মাখাইয়া শত্রুর উপর প্রয়োগ করে। এখানকার সরকারের বনবিভাগের অগ্রবর্তী দল পুলিসের সাহায্যে 'জারোয়া' অধ্যুষিত অঞ্চলে যাইবার সময় মধ্যে মধ্যে ইহাদের দেখা পায়, কিন্তু ইহাদের বড় একটা ধরিতে পারে না। ইহারা উলঙ্গ থাকে, কাঁচা মাংস খায় এবং শীতকালে পাহাড়ের উপর জলাভাবহেতু টিলে কখনও কখনও নীচে নামিয়া আসে। একদা মিলিটারী পুলিসের প্রধান নায়ক Mc. Carthey একটি জারোয়া স্ত্রীলোক ও তাহার পাঁচটি সন্তানকে বন্দী করিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন, তাহাদের নিকট হইতে জারোয়া ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু অতঃপর আর কিছুই করিতে পারেন নাই। ১৯৪৯-এর ফেব্রুয়ারী মাসে আর একবার তিনজন জারোয়াকে ধরা হইয়াছিল। তাহাদের সকলকেই চীফ-কমিশনারের বাংলো বাটীর নীচের তলায় একটি ঘরে আটকাইয়া রাখা হইয়াছিল, কিন্তু এমন এক অজ্ঞাত উপায়ে তাহারা পলায়ন করিয়াছিল যে তাহাদের কোন তল্লাস আর পাওয়া যায় নাই। জারোয়াদের সংখ্যা দ্রুত কমিয়া আসিতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ইহাদের সংখ্যা ৫০০০ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়, বর্তমানে একশতেরও কম বলিয়া অভিজ্ঞরা মনে করেন। অবশ্য এই সংখ্যা নিতান্তই আনুমানিক, কারণ কোন লোকগণনাকারী খাতাপেন্সিল লইয়া এই রাজ্যে লোকগণনা করিতে পারে না। অতএব সংখ্যাগুলি আদৌ নির্ভরযোগ্য নহে।

আন্দামান দ্বীপটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা একটি পাহাড়—যেন দ্বীপের শিরদাঁড়ার মত চলিয়া গিয়াছে। এই পাহাড়টি সমুদ্র হইতে সাত-আটশ' ফুট উঁচু, ইহার সর্বোচ্চ শিখর দক্ষিণ আন্দামানের মাউণ্ট হ্যারিয়েট, ইহার উচ্চতা ১২০০ ফিট। ভৌগোলিকের মতে এই গিরিশ্রেণী হিমালয়েরই শাখা, ব্রহ্মদেশ ও মালয়ের মধ্য দিয়া আসিয়া হিমালয়ের কতকাংশ সমুদ্রের তলায় আত্মগোপন করিয়া আবার আন্দামানরূপে দেখা গিয়াছে। ইহা লম্বে ১৯২ মাইল এবং ইহার মধ্যভাগের উচ্চ শিরদাঁড়া হইতে দুই ধারে ঢালু হইয়া সমুদ্রে মিশিয়াছে। কাজেই প্রস্থে ইহা কোথাও বা পাঁচ মাইল, কোথাও বা ত্রিশ মাইল। গড়ে আন্দামান

দ্বীপটি প্রস্থে ১৬।১৮ মাইল বলা যায়। এই লম্বা দ্বীপটির মধ্যে মধ্যে খালের ন্যায় সরু দীর্ঘকায়া নদী প্রবাহিত আছে। এই নদীগুলি আন্দামানের পশ্চিম সমুদ্রের সহিত পূর্ব্ব সমুদ্রের যোগসাধন করিয়াছে। এই আন্দামানের দক্ষিণ অংশেই বিখ্যাত বন্দর পোর্টব্লেয়ার। পোর্টব্লেয়ারের নিকটেই ইহার সহর, সহরের নাম "Aberdeen", এবং ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া একশত বর্গমাইল স্থান লোকবসতির উপযুক্ত। Aberdeen সহরের পরিমাণ ১৬ বর্গমাইল। আন্দামানের মোট ভূমির পরিমাণ ২২০০ বর্গমাইল, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলির পরিমাণ ৩০৮ বর্গমাইল। গেজেটিয়ার গ্রন্থের মতে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের মোট আয়তন ২৫০৮ বর্গমাইল। এই পোর্টব্লেয়ার কলিকাতা হইতে ৭৯২ মাইল, মাদ্রাজ হইতে ৭৮০ মাইল, রেঙ্গুন হইতে ৩৬২ মাইল, সুমাত্রা হইতে ৮৬০ মাইল এবং পিনাং হইতে ৫৪০ মাইল দূরে অবস্থিত।

আন্দামান একটি পুরাণ-বর্ণিত দ্বীপ বলিয়া অনুমান করা যায়। সংস্কৃত হনুমান শব্দ মালয়ের ভাষায় হন্ডুমান এবং সেই শব্দ হইতে আণ্ডামান নামকরণ হইয়াছে বলিয়া নবম শতাব্দীতে লিখিত আরবীয়গণের বিবরণমূলক গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। এই বিবরণ Encyclopaedia Britannica-য় প্রদত্ত হইয়াছে। বাংলা মঙ্গল কাব্যে সম্ভবতঃ আন্দামানকেই আন্ধারমাণিক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বাঙ্গালী সওদাগর সিংহলে বাণিজ্য করিতে যাইবার সময় আন্ধারমাণিকের সাক্ষাৎ পাইতেন। 'আনন্দবন' শব্দের সহিত আন্দামান শব্দের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা শব্দতাত্ত্বিকের গবেষণার বস্তু হইতে পারে। কিন্তু এখানে সভ্য মানুষের বসবাসের ইতিহাস নাই বলিলেই হয়। সে বিষয়ে ইহা নিতান্তই অর্ব্বাচীন।

ভারতবর্ষে ইংরাজের আধিপত্য কায়েম হওয়ার পর ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে পালতোলা জাহাজে চড়িয়া ইংরাজগণ প্রথমে আন্দামানে আসেন। এই সময় তাহারা উত্তর আন্দামানে অবতরণ করিয়া ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতের তদানীন্তন বড়লাটের নাম অনুসারে এই বন্দরের নাম দেন Port Cornwallis। অতঃপর তাহারা দক্ষিণে নামিয়া গিয়া দক্ষিণ আন্দামানে অবতরণ করেন এবং অবতরণকারী ক্যাপ্‌টেনের নাম অনুসারে সেই বন্দরের নাম করণ করেন পোর্ট ব্লেয়ার। ব্লেয়ার সাহেব স্কটল্যাণ্ডের লোক, তিনি বন্দরের নিকটবর্ত্তী স্থানটীকে তাঁহার জন্মভূমি স্কটল্যাণ্ডের Aberdeen সহরের নামঅনুসারে নাম দেন Aberdeen। আন্দামানের ইতিহাসে এইরূপ নামকরণ এখনও চলিয়া আসিতেছে। এখানে ভারতের যুক্তপ্রদেশের লোকেরা যে অংশে বসতি স্থাপন করিয়াছে, সেই সব গ্রামের নামকরণ করিয়াছে, মথুরা, বৃন্দাবন ইত্যাদি। যে অংশে সাহেবরা বসতি স্থাপন করিয়াছেন, সেখানকার নাম দিয়াছেন, Aberdeen, Bird's line, Hopetown ইত্যাদি। বর্ম্মীরা তাহাদের বসতির নাম দিয়াছেন 'টেম্পল মাউ'। বর্ত্তমানে যে সমস্ত বাস্তুহারা এখানে গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ অমরবাবুর নাম অনুসারে মঙ্গ্‌লুটনের এক পাহাড়ের নাম দেওয়া হইয়াছে অমর পাহাড়। প্রথম ঔপনিবেশিকের খুসি অনুসারে এই সব স্থানের নামকরণ করাই এখানকার রীতি হিসাবে চলিয়া আসিতেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে, নূতন উপনিবেশের এই-রূপেই নামকরণ করা হয়। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ইহার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যাইবে। New York, New Jersey, New South wales ইত্যাদি অসংখ্য নাম এইভাবেই গঠিত হইয়াছে।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে পোর্ট ব্লেয়ার এবং এ্যাবার্ডিনের নামকরণ হইলেও ওখানে লোকবসতির কোন বন্দোবস্তই হয় নাই। আন্দামান পূর্ব্বের ন্যায় সভ্যতাবর্জ্জিত দ্বীপরূপেই পরিত্যক্ত রহিল। পরে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার সিপাহী বিদ্রোহের অপরাধীদের বিচার শেষ করিয়া দণ্ডিত সিপাহীদের যাবজ্জীবন কারাগারে আটক রাখিবার জন্য একটি বিরাট স্থায়ী কারাগার স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়া স্থির করিলেন যে, তাহাদের জন্য আন্দামানে জেল নির্ম্মাণ করিয়া সেইখানেই উহাদের প্রেরণ করিবেন। সেইজন্য এবার্ডিনের সমুদ্রতীরে এক একজন কয়েদীর জন্য এক একটি কক্ষ বিশিষ্ট এক বিশাল জেলখানা প্রস্তুত করা হইল। উহারই নাম হইল Cellular jail এবং ঐখানেই সিপাহীবিদ্রোহ নামক ভারতের প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধের বন্দীদের প্রেরণ করা হইল। তাহারাই

ঐতিহাসিক যুগে আন্দামানের প্রথম ঔপনিবেশিক। তাহারা উর্দ্দুভাষাভাষী ছিল বলিয়া আন্দামানের ভাষা হয় উর্দ্দু, এবং অদ্যাবধি উর্দ্দুই ওখানকার প্রচলিত ভাষা। প্রথম ঔপনিবেশিকদের ভাষাই স্থানীয় ভাষারূপে কায়েম হইয়া গিয়াছে, তবে এখন বাঙ্গালী সংখ্যায় প্রচুর বলিয়া বাংলা ভাষার প্রচলনও কম নাই।

১৮৫৮ হইতে আন্দামান Penal Settlement বা কয়েদীর উপনিবেশরূপে চলিয়া আসিতেছে। আন্দামানের অতি নিকটস্থ 'চাথাম' ও 'রস্' নামক দুইটি অতি ক্ষুদ্র দ্বীপের প্রথমটি সাঁকোর দ্বারা আন্দামানের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে, এবং 'রস্' দ্বীপটিকে সুন্দর করিয়া গঠন করিয়া ঐখানে চীফ্ কমিশনারের বাংলো, প্রধান মেডিকেল অফিসারের বাংলো, সুবোণী। ক্লাব ও নাচঘর, Swimming Pool, ব্রিটিশ্ সেনানিবাস, বৈদ্যুতিক পাওয়ার হাউস, পল্টনবাজার প্রভৃতি গঠিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে এই 'রস্' দ্বীপ হইতে পোর্ট ব্লেয়ার পর্য্যন্ত ষ্টীমার সার্ভিস চলাচল করিত। ইহাতে এক এক জনের ভাড়া ছিল দুইপয়সা করিয়া।

'রস' দ্বীপটি ক্ষুদ্র ও নিতান্ত সুন্দর, ছবির মতো। কলিকাতা হইতে যাইবার সময় জাহাজ এই 'রস' দ্বীপের ধার দিয়া 'চাথাম' দ্বীপে যায়। বর্ত্তমানে 'চাথাম' দ্বীপই পোর্টব্লেয়ারের বন্দর। ইংরাজ রাজত্বে আন্দামানের চিফ্ কমিশনার 'রস' দ্বীপেই থাকিতেন। জাপানী অধিকারের সময় জাপানীরা 'রস' দ্বীপের প্রাসাদেই তাহাদের প্রধানদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পুনরাধিকারের সময় ইংরাজের গোলায় 'রস' দ্বীপের প্রাসাদের সামান্য কয়েকটি স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে 'রস' দ্বীপটি জনশূন্য। তিনজন কর্ম্মচারী এখানে বাস করে। এ ছাড়া এই দ্বীপে আর কোন স্থায়ী বাসিন্দা নাই। সরকারী হিসাবে এখানে সাপের উপদ্রব হইয়াছে, কিন্তু আমরা এই দ্বীপে কয়েক ঘণ্টা ছিলাম, সাপের কোন চিহ্ন দেখি নাই এবং যে তিনজন এখানে থাকেন, তাঁহাদের নিকট হইতেও এমন কোন সর্পভীতির কথাও শুনি নাই।

এই 'রস্' দ্বীপে ভারতের বড়লাট লর্ড মেয়ো দেহত্যাগ করেন। এ সম্বন্ধে একটি চমৎকার ইতিহাস আছে। ভবিষ্যতে এই ইতিহাস অবলম্বনে হয়ত উপন্যাস রচিত হইবে। ভারত সরকার ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে যে বিবৃতি দেন তাহা হইতে দেখা যায় যে Earl of Mayo ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে "Glasgow" নামক জাহাজে চড়িয়া আন্দামানে আসিয়া সকাল ৯॥০টায় অবতরণ করেন। ঐদিন তিনি আন্দামানের নানা স্থান ঘুরিয়া বিকাল ৫টায় Mt. Harriet এ উঠেন এবং তথা হইতে অবতরণ করিয়া সন্ধ্যা ৭টার পর 'রস' দ্বীপে যাইবার জন্য পোর্ট ব্লেয়ারের জেটীতে আসিয়া জাহাজে উঠিবার সময় ছুরিকাহত হন। খাইবার পাস অঞ্চলের 'কুকি খেল' জাতির অন্তর্ভুক্ত উলীর পুত্র শের আলি নামক একজন ত্রিশ বৎসর বয়স্ক মুসলমান যুবক পেশোয়ারের কমিশনার কর্ণেল পোলককে হত্যা করার অপরাধে ২রা এপ্রিল ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। করাচী এবং বোম্বাই জেল ঘুরিয়া ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে আন্দামানে প্রেরিত হয়। এখানে আসার পর কিছুকাল ভালোভাবে ব্যবহার করায় ১৫ই মে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে আন্দামান জেলের নিয়ম অনুসারে ইহাকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার অনুমতি দেওয়া হয় এবং শের আলি Hopetown-এ নাপিতের কার্য্য করিতে থাকে। এই লোকটি পোর্ট ব্লেয়ারের জেটীর উপর লর্ড মেয়োকে সাধারণ রুটী-কাটা ছুরীর দ্বারা দুইবার আঘাত করে। অতঃপর লর্ড মেয়োকে তৎক্ষণাৎ লক্ষ্যে করিয়া 'রস' দ্বীপে আনা হয় এবং সেইখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এখান হইতে মেয়োর দেহ কলিকাতায় আনা হয় এবং কলিকাতা হইতে Ireland-এ তাঁহার স্বদেশে পাঠানো হয়। ইহার পর 'রস্' দ্বীপেই শের আলির বিচার হইয়াছিল। General Stewart, Superintendent of the Penal Settlement যিনি পরে ভারতের Commander-in-chief হইয়াছিলেন, তিনিই ইহার বিচার করেন এবং ফাঁসীর হুকুম দেন। ১১ই মার্চ্চ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে শের আলির ফাঁসী হয়। খাইবার পাশের যে স্বাধীনতাকামী মুসলমান যুবক ইংরাজকে সহ্য করিতে না পারিয়া প্রথমে কমিশনার কর্ণেল পোলককে হত্যা করিয়াছিল, সেই মুসলমানই সুবিধা পাইয়াই, একক কাহারও সাহায্য না লইয়াই, নিশ্চিত মৃত্যু অনুভব করিয়াও লর্ড মেয়োকে হত্যা করে। এই কাহিনীর মধ্যে ঐ নিরক্ষর যুবকের যে স্বাধীন প্রাণস্পন্দন পাওয়া যায় তাহা সাধারণের জানা নাই বলিয়াই তদানীন্তন সরকারী

বিবৃতি হইতে এই কাহিনীটি বিশদভাবে এই প্রসঙ্গে প্রদত্ত হইল।

'রস' দ্বীপ সম্বন্ধে আর একটি কথা না বলিলে বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকে। ইংরাজ রাজত্বে 'রস' দ্বীপ আন্দামানের সর্ব্বোচ্চ অফিসারদের বাসস্থান ছিল, জাপানী রাজত্বেও ইহা সেই মর্য্যাদাই লাভ করিয়াছিল, কিন্তু জাপানীদের নিকট হইতে ইহা পুনরুদ্ধার করার পর এবং বিশেষতঃ ভারত স্বাধীন হওয়ার পর 'রস' দ্বীপ পরিত্যক্ত হইয়াছে। পরিত্যক্ত হওয়ার মূল কারণ এই যে, বর্ত্তমানের নীতিতে শাসককে জনসাধারণের মধ্যেই থাকিতে হইবে, দূরে থাকিতে দিতে বর্ত্তমান সরকার চান না। কাজেই রস দ্বীপ, ইহার সেনানিবাস ও স্নানশালা, কর্টনবাজার, হাসপাতাল, নাচঘর ও গির্জ্জা, এ সমস্তই এখন প্রত্নবিভাগের অধীনস্থ অট্টালিকার ন্যায় জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। এখানে এখন কোন কাজ হয় না, কেবল এই দ্বীপের পাওয়ার হাউসটি এখনও চালু আছে। এখানে বিদ্যুৎ-উৎপাদন করিয়া সেই বিদ্যুতে এই দ্বীপে অবস্থিত একটি বাতিঘরে রাত্রে জাহাজকে আলো দিবার জন্য আলো জ্বালা হয়। এই দ্বীপটি ঘুরিতে ঘুরিতে মনে হইল, এখানে একটি অতি সুন্দর প্রথম শ্রেণীর স্বাস্থ্যনিবাস গঠিত হইতে পারে। ভালো হোটেল এবং ছোট ছোট বাসা নির্ম্মাণ করিয়া এখানে পর্য্যটকের ভূস্বর্গ নির্ম্মাণ করা যায়, কিম্বা ভ্রেঙ্গুলার মতো স্যানাটোরিয়ম্ গঠন করা যায়। এই দ্বীপের মধ্যস্থলে দাঁড়াইলে চতুর্দ্দিকের সমুদ্র এক সঙ্গে দেখা যায়। দিগন্ত বিস্তৃত নীলাম্বুরাশির মধ্যে ফেনমণ্ডিত উচ্ছ্বাসবহুল ক্ষুদ্র এই 'রস' দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অনুপম, তবে শুনিলাম এখানে নাকি পানীয় জলের নিতান্ত অভাব। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে সে অভাব দূর করা বোধ হয় নিতান্ত অসম্ভব নয়। মনে হয়, স্বাধীন ভারত এই 'রস' দ্বীপ ও নিকটবর্ত্তী এইরূপ ক্ষুদ্র কয়েকটি জনহীন দ্বীপের উন্নতিবিধান করিয়া ভ্রমণপিপাসা ও স্বাস্থ্যান্বেষণের উপযোগী মনোরম দ্বীপ-নিবাসও সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিতে পারেন। সৌন্দর্য্যে ও মনোহারিত্বে ইহা ভারতের অনুপম সম্পদ হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। (ক্রমশঃ)

"গীতগোবিন্দ" কি ছেলেভুলানো ছড়া ?

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী এম-এ, ডি-ফিল্ (অক্সন)

এমন একদিন ছিল সেদিন জগতের শ্রেষ্ঠ ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃত সম্বন্ধে কেবল বিদেশেই নয়, দেশেও নানাবিধ ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত ছিল। নতুবা দেশে বেদোপনিষদের নামে সর্ব্বনাশপ্রসূ সামাজিক কুপ্রথার প্রচলন হ'তে পারত না; বিদেশেও ভারতীয় ধর্ম্মকে ভূতপ্রেত সাপের পূজা এবং ভারতীয় দর্শনকে "A system of mysticism and magic" বলে উপহাস করা চলতো না। সৌভাগ্যের বিষয়, এই অজ্ঞতাপ্রসূত ধারণার অবসান আজ হয়েছে এবং ভারতীয় সভ্যতার ধারক ও বাহক সংস্কৃতের প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় কৃষ্টির প্রকৃত রূপটী জগৎসমক্ষে প্রকটিত হয়ে বিশ্বের ইতিহাসে ভারতের অপূর্ব্ব দানের কথা প্রমাণিত করেছে। বিশেষ করে, স্বাধীন ভারতে অল্প দিনের মধ্যেই সংস্কৃতের চর্চা ও গৌরব প্রভূত বৃদ্ধি পেয়েছে। সেজন্য আজও যদি আমাদের, ভারতীয়দের মনেই সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও মন্দ ধারণা থাকে, তা হ'লে তা' কেবল অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় তাই নয় অতীব দুঃখেরও বিষয়। গোড়ার দিকেও বিদেশী বিশেষজ্ঞদের এই ধারণা জয়দেব বিরচিত 'মধুর কোমলকান্ত' কাব্য "গীতগোবিন্দ" সম্বন্ধেও হয়।

সম্প্রতি একটী মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করে আমরা সত্যই বিস্মিত ও দুঃখিত হয়েছি:—

"প্রাচীন বাংলার লৌকিক কবিতাগুলির আদর্শ কিন্তু বাংলা দেশেরই শ্রীজয়দেব রচিত "গীতগোবিন্দ" নামে সংস্কৃত ভাষায় লেখা একটী ছড়াকাব্য। কিন্তু বলার মধ্যে না বলার কৌশলটির অভাবে, এই কাব্য বড় দরের কবিতা হয়ে উঠতে পারেনি। এই কাব্যে সুরের ঝঙ্কার আছে বটে, কিন্তু সুরের ধ্বনি নেই। তবে এক আধ জায়গায় অজ্ঞাতে ধ্বনি যেন হঠাৎ ফুটে বের হয়েছে। যেমন গোড়াতেই—

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ" ইত্যাদি"

চুইটী লাইনে তমালবৃক্ষরাজি ঘন শ্যামল বনভূমির অপরূপ চিত্রটী আমাদের মনের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। সেটা অনুপ্রাসের গুণে বা উপমার প্রসাদে নয়। কেবলমাত্র বাক্য সংযমের জন্য। কিন্তু

ভাবহীন অবান্তর কথাগুলোও শুধু সুরের ঝঙ্কারের দ্বারা মানুষের মন কতখানি আকৃষ্ট করতে পারে, তার দুটী প্রধান প্রমাণের মধ্যে একটী আছে ছেলে ভুলানো ছড়া, আর একটী গীতগোবিন্দ কাব্য। যেমন,

"ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে"

মানুষের শিশুসুলভ মন ছন্দের কাছে চিরকালই পরাজয় স্বীকার করে এসেছে। এজন্যই বাংলা দেশের গীতগোবিন্দ কাব্য ভারতবর্ষের সর্বত্র সমাদৃত।" (শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় লিখিত "বাংলা কবিতার আদি কথা"—বেতার জগৎ, Vol. XXI, No. 3:৬ প্রকাশিত, পৃঃ ১০৭)॥

সংস্কৃত-সাহিত্য-মণিমঞ্জুষার উজ্জ্বলতম রত্নসমূহের অন্যতম "গীতগোবিন্দ"-কাব্যকে যে কেহ "ছেলে-ভুলানো ছড়া"র ন্যায় "ভাবহীন অবান্তর কথা"র সমষ্টিতে মাত্র পর্যবসিত করতে পারেন, তা সত্যই অচিন্তনীয় ব্যাপার।

প্রথমতঃ, ছেলে-ভুলানো ছড়াও যে সম্পূর্ণ "ভাবহীন অবান্তর কথা" এবং "সুরের ঝঙ্কারে"র দ্বারাই মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে, সে সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ হতে পারে। শব্দের ঝঙ্কার বা বাক্যের লালিত্যে শিশুমন স্বভাবতই আকৃষ্ট হয় সত্য। কিন্তু শিশু একটু বয়ঃপ্রাপ্ত হলেই, কেবল শব্দের ঝঙ্কারে নয়, ভাবের মৌলিকতাতেও সে সমভাবে আনন্দ লাভ করে—তথাকথিত ভাবহীন, অবান্তর, অসংলগ্ন কথাগুলির মধ্যেও সে একটী অপূর্ব কল্পনারাজ্যের সন্ধান পায়, যা নীরস বস্তুতান্ত্রিক পূর্ণবয়স্কদের কারো কারো কাছে নিতান্ত হাস্যকর মনে হলেও, কল্পনাপ্রবণ শিশুর নিকট অশেষ আনন্দেরই নির্ঝর। সেদিক থেকে দিদিমার রূপকথা ও ধাইমার ছেলে ভুলানো ছড়া সমপর্যায়ভুক্ত। যথা, প্রাচীন ছড়া—

"আগডুম্ বাগডুম্ ঘোড়াডুম্ সাজে
ঢাল মৃদঙ্গ ঘাঘর বাজে
বাজ্‌তে বাজ্‌তে চল্‌লো ঢুলি
ঢুলি গেল সেই কমলাপুলি।"

অথবা—

"হট্টিমাটিম্ টিম্
তারা মাঠে পাড়ে ডিম্
তাদের লম্বা দুটো শিং
তারা হট্টিমাটিম্ টিম্।"

নবীন ছড়া—

"রামগরুড়ের ছানা
হাঁসতে তাদের মানা
হাঁসির কথা শুন্‌লে বলে
হাঁসব না না না না।"
(সুকুমার রায়চৌধুরী)

আমাদের কারো কারো এগুলি ভাবহীন, অবান্তর, অসংলগ্ন বা অসম্ভব বলে মনে হলেও, যাদের জন্য এগুলি রচিত, তাদের কাছে এ সব নিগূঢ় অর্থ পরিপূর্ণরূপেই প্রতিভাত হয়। এমন কি, পূর্ণবয়স্কদের মধ্যেও অনেকে রূপকথা এবং শিশু-ভুলানো ছড়া পাঠ করে প্রচুর পরিতৃপ্তি লাভ করেন; অন্ততঃ তাঁরা নিশ্চয়ই কেবল শব্দের ঝঙ্কারের লোভেই নিরর্থক ভাবহীন অবান্তর কথাগুলিমাত্র পাঠ করেন না।

কিন্তু সে কথা না হয় বাদই দিলাম—তর্কের খাতিরে না হয় ধরেই নেওয়া যাক্ যে ছেলেভুলানো ছড়া "ভাবহীন অবান্তর কথা"রই সমষ্টিমাত্র, যা কেবল "সুরের ঝঙ্কারের" জন্যই মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে, অন্য কোনও কারণে নয়। কিন্তু যে "গীতগোবিন্দ"কে জগতের শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য বলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই গীতগোবিন্দই ছেলেভুলানো ছড়ার মত "ভাবহীন অবান্তর" কথামাত্র, এই উক্তি এরূপ অদ্ভুত যে এর প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন। গীতগোবিন্দের গুণ ও গরিমার বিস্তৃত বিবরণও সমভাবে নিষ্প্রয়োজন। কারণ, বেদ, উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থাদির গুণাবলীর বর্ণনাপ্রচেষ্টা যেমন হাস্যকর, গীতগোবিন্দেরও ঠিক তাই।

কেবল একটী কথার উল্লেখ করছি। শ্রীগীতগোবিন্দ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। চৈতন্য মহাপ্রভু থেকে আরম্ভ করে শ্রীরূপ, সনাতন, শ্রীজীব প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যগণ এবং তৎপরবর্তী শত শত জিজ্ঞাসু ও ভক্তবৃন্দ গীতগোবিন্দ পাঠ করে অমৃতলোকের সন্ধান পেয়েছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গীতগোবিন্দ যে মহাপ্রভুর বিশেষ প্রিয় ছিল, তার বহু উল্লেখ আছে।

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শোনে পরম আনন্দ॥"
(চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য, ২।৭৭)

"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ।"
(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য লীলা, ১০।১০৫)

"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ"
মধ্যে মধ্যে প্রভু আপনে শ্লোক পড়িয়া
শ্লোকের অর্থ করেন প্রভু প্রলাপ করিয়া।"
(চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য ১৭।৬—৭)

মহাপ্রভুর ন্যায় ভগবদবতার কি কেবল শব্দের ঝঙ্কার বা ছন্দোমাধুর্যে আকৃষ্ট হয়েই "ভাবহীন অবান্তর" কথা পাঠে বৃথা সময়ক্ষেপ করে প্রভূত আনন্দ লাভ করতেন? সংসারতাপক্লিষ্ট জনের অশেষ শান্তি ও তৃপ্তির উৎসস্বরূপ এই শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্য বিশেষ করে বৈষ্ণবদের কাছে শ্রীমদ্ভাগবতগীতার মতই পরম শ্রদ্ধা, গৌরব ও

আদরের বস্তু। আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনার নিগূঢ় রূপের সঙ্গে অপরিচিত বিদেশী পণ্ডিতগণও এরূপ সর্বজনসমাদৃত, অশেষ শক্তির আকর এই ধর্ম-গ্রন্থকে "ভাবহীন অবান্তর ছেলেভুলানো ছড়া"য় মাত্র পর্যবসিত করে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন নি।

গীতগোবিন্দকে নিগূঢ় অর্থে জীব ও ঈশ্বরের মিলনসূচক আধ্যাত্মিক গ্রন্থ, অথবা সাধারণ অর্থে নরনারীর প্রেমমূলক গীতিকাব্য—এই উভয় অর্থেই গ্রহণ করা যায়। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটী গ্রহণ করলে একে "ভাবহীন অবান্তর কথা" মাত্র সার বলে বর্ণনা যে কিরূপ অর্থশূন্য, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। কৃষ্ণের জন্য রাধার ব্যাকুলতা এবং পরিশেষে উভয়ের মিলনের বর্ণনার মধ্যে ভক্ত আক্ষরিক অর্থ অতিক্রম করে' অন্তর্নিহিত সুগভীর অধ্যাত্মভাবের সন্ধান পান, এবং সমগ্র কাব্যটী তাঁর নিকট পরম প্রেমময় দেবতার জন্য সাধকের আকুল আকূতির একটী উজ্জ্বলতম চিত্ররূপেই প্রতিভাত হয়। কিন্তু এই নিগূঢ় দার্শনিক অর্থ বাদ দিলেও, কেবল সাধারণ অর্থ গ্রহণ করলেও গীতগোবিন্দকে "ভাবহীন অবান্তর কথা" মাত্র বলা সমভাবে অনুচিত। কেবল একটী নিছক গীতিকাব্য বলে গ্রহণ করলেও, গীতগোবিন্দের অধিকাংশ কাব্যই আক্ষরিক অর্থ ও লক্ষ্যার্থ ব্যতীত একটী অপূর্ব ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার দ্বারা বিভূষিত। অর্থাৎ, আলঙ্কারিকদের ভাষায়, সমগ্র কাব্যটীই প্রায় "ধ্বনি" বিমণ্ডিত। "ধ্বনি" কি ? বাক্য বা শব্দের বাচ্যার্থ বা আক্ষরিক অর্থ এবং লক্ষ্যার্থ ব্যতীত তৃতীয় নিগূঢ় অন্তর্নিহিত অর্থই ব্যঙ্গার্থ বা ব্যঞ্জনা, এবং যেস্থলে এই ব্যঞ্জনাই প্রধান, সেস্থলেই ধ্বনির প্রকাশ। যথা, "গঙ্গায়াং ঘোষঃ"—"গঙ্গাতে গোয়ালাপল্লী" এই বাক্যে 'গঙ্গায়াং' বা "গঙ্গাতে" শব্দটীর আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করলে সমগ্র বাক্যটীর অর্থ হয়ে দাঁড়ায় "গঙ্গাবক্ষে গোয়ালপল্লীটী অবস্থিত।" কিন্তু এরূপ অর্থ এস্থলে গ্রহণ করা চলে না। সেজন্য "গঙ্গায়াং" শব্দটীর লক্ষিত বা লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করে এস্থলে অর্থ বুঝতে হবে :—"গঙ্গাতীরে গোয়ালপল্লী অবস্থিত।" কিন্তু আরো একটু অগ্রসর হয়ে শব্দটীর অন্তরালে প্রবেশ করে' আমরা যদি "গঙ্গায়াং" কথাটীর দ্বারা গঙ্গার পবিত্রতা, শীতলতা প্রভৃতি অর্থও বুঝি, তা হইলে সেটি হইবে তার ব্যঙ্গার্থ, ব্যঞ্জনা বা ধ্বনি। অতএব এই নিগূঢ় অর্থ বা "ধ্বনির" দিক থেকে সমগ্র বাক্যটীর অর্থ : "গঙ্গাতীরবর্তী গোয়পল্লীটি পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর মতই শান্ত, স্নিগ্ধ, সুপবিত্র, সুশীতল"। ধ্বনিবাদীদের মতে এই ধ্বনিই কাব্যের প্রাণ—বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ নয়। যে কাব্য শব্দের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে এক অব্যক্ত অজানা ও অসীম কল্পলোকের সন্ধান দেয়, সে কাব্যই প্রকৃত কাব্য।

পুনরায়, "ধ্বনি"র মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ধ্বনি, যা পাঠকের বা শ্রোতার প্রচেষ্টা ব্যতীতই তার মানসপটে মুহূর্তমধ্যেই প্রতিফলিত হয়। এই ধ্বনির নাম "অসংলক্ষ্যক্রমধ্বনি"।

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ"—

এটি এই ধ্বনির বর্ণনা। এস্থলে কবির অপূর্ব বর্ণনাকৌশলে কাব্যের অন্তর্নিহিত সুষমা এক নিমেষেই পাঠকচিত্তকে উদ্বেলিত করে। যথা কুমার সম্ভবে উমার সেই অনবদ্য বর্ণনা—

"আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব॥" (৩।৫৪)

এই স্থলে বাচ্যার্থ বা আক্ষরিক অর্থ এবং লক্ষ্যার্থ অতিক্রম করে উমার অপরূপ লাবণ্য, কোমলতা, শুচিতা প্রভৃতি নিমেষের মধ্যেই পাঠকচিত্তে উদ্ভাসিত হয়।

গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে উক্ত প্রবন্ধকারের উক্তি- 'কিন্তু বলার মধ্যে না বলার কেরামতির অভাবে এই কাব্য বড়দরের কবিতা হয়ে উঠতে পারে নি। এই কাব্যে সুরের ঝঙ্কার আছে, কিন্তু সুরের ধ্বনি নাই"— সত্য একটী আশ্চর্যজনক উক্তি। বস্তুতঃ, এই কাব্যে বলার মধ্যে না বলা বাণী, সুরের ঝঙ্কারের মধ্যে সুরের ধ্বনি যেরূপ সমহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, সেরূপ অপর কাব্যে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। প্রবন্ধকারের উদ্ধৃত কবিতাটীই এর একটী শ্রেষ্ঠ উদাহরণরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে—

"পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥"

এ স্থলে প্রিয়ের আগমনোৎকণ্ঠা, প্রতীক্ষমানা নারীর আকুল আগ্রহ, আশঙ্কা, আনন্দের যে অপরূপ চিত্রটী আমরা পাই, তা জগতের কাব্য সাহিত্যে বিরল। বস্তুতঃ, সমগ্র গীতগোবিন্দ কাব্যটীকে "অসংলক্ষ্য ক্রম ধ্বনির" অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণরূপে গ্রহণ করা চলে। বিখ্যাত ধ্বনিপ্রতিষ্ঠাকার আনন্দবর্ধন বলেছেন যে, একটি প্রস্ফুটিত শতদলের শত দলকে একটি সূচ দিয়ে বিদ্ধ করতে যেটুকু সময় লাগে, "অসংলক্ষ্যক্রম-ধ্বনি" মাত্র সেটুকু সময়ের মধ্যেই পাঠক বা শ্রোতার মর্মদেশে প্রবেশ করে' তার চিত্তকে এক অজানাভাবে উদ্বেলিত করে তোলে। গীত গোবিন্দের কবিও অপূর্ব কবিত্ব শক্তি বলে শব্দগুলি এরূপভাবে সাজিয়েছেন যে পাঠ বা শ্রবণমাত্র কেবল সুরের ঝঙ্কারেই আমাদের হৃদয় নৃত্য করে ওঠে না, ভাবের মাধুর্যেও সমভাবে পরিপ্লুত হয়ে উঠে।

বস্তুতঃ, গীতগোবিন্দ ভাব ও ভাষার অপূর্ব সমন্বয়ে কাব্যজগতে অতুলনীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। ভাবও নিগূঢ়, অথচ ভাষাও সুমধুর—এরূপ সমন্বয় স্বভাবতঃই বিরল। কিন্তু জয়দেব এই দুঃসাধ্য কাজেও সফল হয়েছেন। সেজন্য দেশী বিদেশী, প্রাচীন নবীন সব সমালোচকই গীতগোবিন্দকে একটি অপূর্ব মৌলিক, একক সৃষ্টি বলে সাদরে অভিনন্দিত করেছেন। ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষায় গীতগোবিন্দ অনূদিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ইহা ল্যাটিন (Born, 1836), জার্মান (প্রথম অনুবাদ Dalberg কৃত, Erfurt, 1802 ; দ্বিতীয় অনুবাদ Majer কৃত, Weimar, 1802 ; তৃতীয় অনুবাদ Wogel, 1907 প্রভৃতি) ; ইংরাজী (Sir William Jones, Arnold প্রভৃতির অনুবাদ) ; ফরাসী (Sylvain Levir ভূমিকা সহ Courtillierর অনুবাদ, Paris

1904), ওলন্দাজ (ভাষায় Fad legon র অনুবাদ, Santpoort, 1932) প্রভৃতি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষায় অনুদিত হয়েছে এবং যদিও অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য, মাধুর্য্য বহুলাংশে খর্ব হয়, তথাপি এই অনুবাদের মধ্যে গীতগোবিন্দের রসসুধা পান করে সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ মোহিত হয়েছে। বিখ্যাত ইংরাজ পণ্ডিত Arnold এবং জার্মাণ সংস্কৃতবিদ্ Rueckert প্রধানতঃ এই গ্রন্থের যথাক্রমে ইংরাজী এবং জার্মান ভাষায় অনুবাদের জন্যই সাহিত্য জগতে অমরত্ব লাভ করেছেন। তাঁরা উভয়েই মুক্তকণ্ঠে এ গ্রন্থের অনবদ্যত্ব স্বীকার করেছেন। সুবিখ্যাত জগদ্বরেণ্য প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ Keith র মতামত এ স্থলে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করে আমার নিবেদন শেষ করছি। অবশ্য পূর্বেই বলেছি যে শ্রীগীতগোবিন্দের গুণাবলীর প্রশংসাপত্রের প্রয়োজন আজ আর নাই। তথাপি ভারতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে অপরিচিত, ভারতীয় রচনাশৈলীতে অনভ্যস্ত, বিদেশীর কাছেও এ কাব্যটি কি অপরূপ মহিমমণ্ডিতরূপেই প্রতিভাত হয়েছে, তারই সামান্য নিদর্শনস্বরূপ এ মন্তব্যটী উদ্ধৃত হচ্ছে —

"Jayadeva's work is a master piece ; and it surpasses in its completeness of effect any other Indian poem It has all the perfection of the miniature word pictures which are so common in Sanskrit poetry : with the beauty which arises, as Aristotle asserts from magnitude and arrangement. * * * There can be no doubt that * * * Aischylos, Sophokles, and Euripides can attain in their choruses effects more appealing to our minds than Jayadeva but their medium is not capable of so complete a harmony of sound and sense. We are apt to regard with impatience the insistence of the the writers on poetics on classing styles largely by the sounds preferred by different writers ; but there is no doubt that the effects of different sounds were more keenly appreciated in India than are by us, and in the case of the Gitagovinda the art of wedding sound and meaning is carried out with such success that it can not fail to be appreciated even by ears less sensitive than those of Indian writers " (History of Classical Sanskrit Literature p. 195).

সংক্ষেপে এর ভাবার্থ এই যে—জয়দেবের কাব্য একটী সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য-রূপে পরিগণনীয় এবং এতে ভাব ও ভাষার যে অপূর্ব সম্মেলন দৃষ্ট হয়, তাতে এমন কি বিদেশীরাও বিমুগ্ধ হয়েছেন। গ্রীক প্রভৃতি অন্যান্য কোনও সাহিত্যেই ভাব ও ভাষার এরূপ অনুপম সমন্বয় সম্ভবপর নয়।

ভাষার মাধুর্য্যে, ছন্দের ঝঙ্কারে, ভাবের নিগূঢ়তায় গরীয়ান্, সর্বজন-বন্দ্য, জগতে অতুলনীয় এই আধ্যাত্মিক গীতিকাব্য "শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ"ই যদি "বড়দের কাছে ভাল হয়ে উঠতে না পেরে", কেবল "অর্থহীন অবাস্তব কথা" এবং "ছেলে-ভুলানো ছড়াই" হয়ে দাঁড়ায়, তাহ'লে জগতে "কবিতা" বিবাচ্য কোনও বস্তুই নাই, নিঃসন্দেহ।

জমিদারী বিলোপে বিঘ্ন

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

কংগ্রেস যখন বিদেশী শক্তির সহিত স্বাধীনতালাভের সংগ্রাম করিতেছিল তখন জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করিয়া চাষীকে জমির মালিক করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল। কংগ্রেস রাজ্যশাসনক্ষমতা লাভ করিবার পর কৃষকের পক্ষ হইতে সে দাবী আজ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রায় সকল গভর্ণমেণ্ট হইতে নানাভাবে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি পালন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। প্রতি গভর্ণমেণ্টেই এক একটী আইন প্রণয়ন করিয়া ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

জমিদারী বিলোপ করা কাজটি অতি সহজ, অন্ততঃ বিশেষ কোনও অসুবিধা আছে বলিয়া মনে হয় না। যাহার আছে, তাহা লইতে বেশী সময় লাগিবার কথা নয়। ভোটের জোরে যখন সবই হইবে, তখন এত বড় একটা দাবী আইন দ্বারা রূপায়িত করিবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা দেখা যায় না।

কল্পনা, প্রস্তাব ও রূপ নানা স্তরের কথা। প্রকৃতপক্ষে লোকের মস্তিষ্কে কোনও বিষয় কল্পনায় আবির্ভূত না হইলে, তাহার উৎপত্তি নাই। একের মাথায় যাহা জন্মলাভ করে তাহা পরস্পরে ভাবের আদান প্রদান দ্বারা বিস্তৃতিলাভ করে এবং ক্রমে সেই ধারণা অপরে সংক্রামিত হইয়া পুষ্টিলাভ করে। জগতের কল্যাণের বস্তু হইলে এবং বাধাবিপত্তির সম্ভাবনা কম থাকিলে তাহা শীঘ্র রূপ ধারণ করে। মাঝের অবস্থা কম বেশ সকল ক্ষেত্রেই দৃষ্ট হয়। লোকে আলোচনার ক্ষেত্র হইতে ক্রমে একটি বিধির মধ্যে আসিতে চায়, জনসাধারণে তাহা প্রকাশিত হইলে ক্রমে প্রস্তাবের আকার ধারণ করে ; পক্ষে ও বিপক্ষে লোক জুটিয়া যায় ; বৃহৎ ব্যাপারে তর্কাতর্কি মারামারি চলিতে থাকে, শেষ পর্য্যন্ত একটা বিধিবদ্ধ আইন, লিখিত বা অলিখিত, না থাকিলে কাজের কোনও শৃঙ্খলা থাকে না।

কালের গতিতে, লোকের প্রয়োজনের চাপে, অবস্থার প্রভাবে আবার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইয়া পড়ে ; ঘাত প্রতিঘাত চলিতে থাকে, পুরাতনকে ভিত্তি করিয়া লোকে আবার অগ্রসর হইতে থাকে।

জমিদারী প্রথা বিলোপের জন্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই ;

এখন প্রস্তাব অবস্থা পার হইয়া বিধিবদ্ধ আইনে রূপ গ্রহণ করিলে তাহা আবার বিচার্য্য বিষয়ে পরিণত হইতে পারে। ব্যাপারটি গুরু, সুতরাং ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যে সকল অসুবিধা আসিয়া দেখা দেয় তাহা একেবারে উপেক্ষা করিলে সুশৃঙ্খলায় কার্য্য-সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

যাঁহারাই হাতে শাসনযন্ত্র পাইয়াছেন তাঁহারাই পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া জমিদারী বিলোপের বিপক্ষাচরণ করিতেছেন তাহা বলা সঙ্গত নহে। বাস্তবিকই মনে প্রাণে বিশ্বাস লইয়া অনেকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু কি ভাবে করা যায় তাহার উপায় খুঁজিয়া পাইতেছেন বলিয়া মনে হয় না।

শ্রেয়ঃ কাজের বিঘ্ন বহু। কার্য্যক্ষেত্রে কতরূপে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে বৎসরাধিককাল পূর্ব্বে তাহা 'ভারতবর্ষে' আলোচনা করিয়া-ছিলাম। জমিদারী নাই জীবনের বহু বৎসর চাষী হইয়া কাটাইয়াছি। সুতরাং জমির উপর দরদ লইয়া আলোচনা করিতে গিয়াও যে সকল অসুবিধা তখন মনে হইয়াছিল, তাহা এখনও যেন সম্পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। ক্রমে ক্রমে তাহা দূর করিতে না পারিলে বর্ত্তমান জমিদারদিগের অনেকেরই বিলোপ হইবে, কিন্তু জমিদারী থাকিয়া যাওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

প্রজা জমিদারকে খাজনা দেয়। একই লোক, এক স্থানে প্রজা অন্যস্থানে জমিদার। যে জমি ভোগ করিবে সেইই হয় জমিদারকে খাজনা দিবে, না হয় রাজা বা রাষ্ট্রকে খাজনা দিবে। বিনা খাজনায় জমি ভোগ করিলে রাজ্য চলিবে না। ভূমিরাজস্ব সকল দেশে সকল কালের একটা বড় আয়।

বর্ত্তমান অবস্থায় সরকারী খরচ যেরূপ বাড়িয়াছে, তাহাতে চিরস্থায়ী প্রথায় জমিদারের নিকট খাজনা বৃদ্ধি করা না হওয়া সত্ত্বেও যে টাকা পাওয়া যায়, তাহা নিজ তত্ত্বাবধানে আদায় করিতে গভর্ণমেণ্টের বহু খরচ পড়িয়া মোট আয়ের পরিমাণ অনেক কমিয়া যাইত। আদায়ের যে খরচ বাড়িয়াছে, তাহা জমিদার বহন করেন, কিন্তু তাহা গভর্ণমেণ্টকে দেয় টাকা হইতে বাদ দেওয়া হয় না। তাহা ছাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রাজস্ব বৃদ্ধি করা হয় নাই বটে, কিন্তু নানাবিধ সেস্ (cess) চাপাইয়া প্রকারান্তরে রাজস্বের পরিমাণ অন্ততঃ শতকরা পাঁচ হইতে আট টাকা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট এসকল জমি নিজ তত্ত্বাবধানে লইলে নূতন সেস্ পাইবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ ক্ষেত্রে জমির খাজনা বৃদ্ধি করিতে হইবে। জমিদারের নিকট যে হারে খাজনা দিয়া প্রজা জমি ভোগ দখল করে, তাহা অপেক্ষা খাজনা শীঘ্রই বৃদ্ধি পাইবে। পশ্চিম বাঙ্গালার হিসাবে দেখা যায়, জমিদারের প্রজা অপেক্ষা খাস মহলের প্রজার খাজনার হার অনেক বেশী এবং জমিদারের প্রজা যে স্বত্বে জমিতে স্বত্ববান্—খাসমহলের প্রজার স্বত্ব তাহা অপেক্ষা অনেক কম; অন্ততঃ উচ্ছেদের ব্যাপারে খাসমহলের প্রজার বিপদ অনেক বেশী।

প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক প্রজা জমির মালিক হইলেই যে তাহার সুখ শান্তি বাড়িবে এমন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। অভাবে পড়িলেই জমি বিক্রয় করিবে, উত্তরাধিকার সূত্রে জমির বণ্টন হইয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর খণ্ডে জমি বিভক্ত হইয়া যাইবে। অনেক সরিক হইলে খাজনা ও অন্যান্য দায় পরিশোধ ব্যাপারে মালিকদের মধ্যে বিরোধ বিশেষ বাধা উপস্থিত করিবে। ইহা বর্ত্তমানে যে নাই তাহা নহে; এখন জমিদারের সহিত রফা করিয়া অনেক সময় উদ্ধার হওয়া যায়। সকল জমিদারই নির্দ্দয় দায়িত্বজ্ঞানহীন নহেন সুতরাং এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেই যে কৃষির উন্নতির সকল পথ মুক্ত হইবে, এরূপ মনে করা ভুল।

জমিদারকে ক্ষতিপূরণ করিয়া জমি গ্রহণ করাই সকল সভ্য গভর্ণ-মেণ্টের কাজ। এ টাকা কোথা হইতে আসিবে, তাহা সমস্যার কথা। গভর্ণমেণ্টের নাই; থাকিলেও তাহা নাগরিকদের টাকা। যাহারা জমি ব্যাপারে কোনওরূপে লাভবান্ নহেন, টাকা এরূপভাবে ব্যয়ে তাঁহাদের আপত্তি থাকিতে পারে; অন্ততঃ ন্যায়তঃ এ ব্যাপারে তাঁহাদের রেহাই দেওয়া প্রয়োজন। যে সকল প্রজা মালিক হইবেন, তাঁহাদেরই এই টাকা দেওয়া যুক্তিযুক্ত। উত্তর প্রদেশ গভর্ণমেণ্ট এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। সাধারণ নিয়মে ত্রিশ বৎসরের খাজনা এক সঙ্গে দিলে, জমি নিষ্কর স্বরূপ ভোগ করা যায়। (অবশ্য সকল স্থলে এই আইন প্রযুজ্য নয়)। উত্তর প্রদেশ সরকার দশ বৎসরের খাজনা দিয়া জমিতে স্থায়ী স্বত্ববান হইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ফল এখনও আশানুরূপ হয় নাই। যতদূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় শেষ পর্য্যন্ত এই চেষ্টা ফলবতী হইবে না। বিহার গভর্ণমেণ্ট বিল পাশ করিয়া নিজেরাই নাকচ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। খুব তাড়াতাড়ি কৃষক প্রজাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। তত তাড়াতাড়ি এ ব্যাপার সম্পাদন করা যায় না, তাহা পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখা হয় নাই। যাঁহারা সতর্কতা অবলম্বন করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথায় কেহ কর্ণপাত করেন নাই। পশ্চিম বাঙ্গালা সরকার অন্যান্য প্রদেশের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। এই রাষ্ট্রের বহু সমস্যা রহিয়াছে তাহার মধ্যে এই গুরুতর সমস্যার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া হয় ত তাঁহারা বুদ্ধিমানের কাজ করিতেছেন। মাদ্রাজেও বিল ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে; কিন্তু সকল দিক বিবেচনা করিয়া বলিতে হয়, সেখানেও কার্য্যকালে নানা বাধা বিপত্তি দেখা দিবে।

যখন জমিদারী বিলোপের দাবী ক্রমশঃই শক্তি সংগ্রহ করিতেছে, তখন ইহা একদিন মানিতেই হইবে। কিন্তু তাহা যদি মঙ্গল অপেক্ষা অধিকতর অমঙ্গলের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে গভীর পরিতাপের বিষয় হইয়া পড়িবে। একটা বিষয় আমার সর্ব্বদাই মনে পড়ে। চাষে আমার খুব অনুরক্তি আছে এবং সুযোগ পাইলেই আমি চাষ করিয়া থাকি; সুতরাং আমি খানিকটা জমি পাইলে যে লইতে পারি, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, আমাদের গ্রামের জমিদার নামে মাত্র জমির মালিক। আমরা প্রত্যেকে যে যতটা জমি ভোগ করি, তাহার খাজনা সময়মত চুকাইয়া দিলে, জমিদার একে-বারে শক্তিহীন। সুতরাং আমিই যে জমির মালিক, তাহা অবিসংবাদিত রূপে সত্য। গভর্ণমেণ্টের হিসাবে পরিবার পিছু অন্ততঃ পাঁচ একর জমি

না হইলে সংসার চলিবে না। কিন্তু চাষের উপযোগী কত জমি আছে, যাহা পাঁচ একর হিসাবে প্রত্যেক পরিবারকে দেওয়া যাইতে পারে? এই হিসাবে যাঁহারা পাইবেন, তাহা অপেক্ষা যাঁহারা নিরাশ হইবেন, তাঁহাদের সংখ্যা অধিক হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। যে হারে অন্নাভাব বৃদ্ধি পাইতেছে, সে দিক দিয়া যাঁহার সংসারে একটীও কর্ম্মহীন বেকার থাকিবে, তাঁহার নামে পাঁচ একর জমি করিয়া রাখিবার চেষ্টা সকলেই করিবে। যখন জমিদারের জমি ছাড়াইয়া প্রজার মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা হইবে, তখন জমির জন্য যে চাহিদা হইবে, তাহা মিটাইতে গিয়া গভর্ণমেণ্ট কতদূর অপ্রিয় হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। বর্ত্তমানে যাঁহারা জমিদারের জমিতে কোনওরূপ স্বত্ব, স্বামিত্ব ভোগ করেন, অথবা ব্যবহার দ্বারা দাবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেই জমি বণ্টনের চেষ্টা হইবে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু তাহাতে কতদূর সুফল আশা করা যাইতে পারে? অনেকেই ত জমির মালিক বর্ত্তমানে আছেন; সেই গণ্ডীর বাহিরে আর কত ঘর কৃষক পরিবার বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার।

বর্ত্তমানে ভূমি সংক্রান্ত আইনের পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। কৃষির ব্যাপারে অর্থনীতি রাজনীতি আনিয়া অযথা জটীল করার কোনও সার্থকতা নাই। এ বিষয়ের উপযুক্ত কাল নির্ব্বাচন করিয়া অগ্রসর হওয়াই প্রয়োজন। যেখানে জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হওয়ার দরুণ চাষ আবাদের বিঘ্ন হইতেছে, সেখানে প্রতি পরিবারের হিসাবে পাঁচ একর জমি ভাগ করিয়া ফেলিলে লাভ অপেক্ষা লোকসানের সম্ভাবনাই বেশী বলিয়া মনে হয়।

রাজনৈতিক দলপুষ্টির জন্য এত বড় গুরুতর ব্যাপার লইয়া খেলা করা চলে না। একটী পথ বাছিয়া লইয়া এবং তাহার ফলাফল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া তবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। ব্যবস্থা পরিষদের ভোট আজকাল অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারে; কিন্তু যে সকল অসাধ্য ব্যাপার কেবল বক্তৃতা ও ভোট দ্বারা সাধিত হয় না, জমি ব্যবস্থা তাহাদেরই অন্যতম। এই শুভকার্য্যে যে সকল বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, তাহার গুরুত্ব সম্যক অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করা প্রয়োজন এবং তাহা দূর করিতে গিয়া যাহাতে অপর গুরুতর অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রেই ভাবিয়া রাখা দরকার।

আমাদের সম্মানিত বিজ্ঞানী অতিথিগণ

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সারা জগতের সুধীসমাজ আজ একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে অতি প্রাচীন দিনে—যখন আধুনিক উন্নত দেশসমূহের অনেকেই ছিল অজ্ঞানতার ঘনান্ধকারে—তখনই আমাদের ভারতে অনুশীলন চলছিল উচ্চতর বিজ্ঞান-সাধনার। বহুকালের পুরাতন যে ইতিহাসের যতটুকু আমরা জানতে পেরেছি তাতে মুনি ঋষি-যুগের যে মনীষীদের প্রতিভা যে অতি উচ্চজ্ঞানের সন্ধান পেয়েছিল—সে কথা আজ সুপ্রমাণিত। কিন্তু যে সাধনার ধারা আমরা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারিনি। মধ্যযুগে নানা প্রতিকূল পরিবেশে ভারতীয় প্রতিভা অনেকাংশে বিজ্ঞানচর্চায় বিমুখ হয়ে পড়ে এবং বেশ কিছু দিনের জন্য এদেশে বিজ্ঞান-অনুশীলন বন্ধ থাকে বললেও অত্যুক্তি হয় না। সারা পৃথিবী এমন দুর্ভাগ্যে পড়েনি—তাই ইতিমধ্যে অন্য কয়েকটি দেশ জ্ঞানানুশীলনে অগ্রণী হয়ে ওঠে—প্রাচীন সভ্যতায় যারা উৎকর্ষ এনেছিল—সেই ভারতবাসী—আমরা গেলাম পিছিয়ে। আর সেই থেকে আজও আমরা পিছিয়েই আছি জীবনের নানাদিকে নানাভাবে। বিজ্ঞান জগতে আমাদের পুনরভ্যুত্থান ঘটেছে অল্পদিন আগে—মোটামুটি মাত্র গত শতাব্দীতে। কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যেই আমাদের এ সাধনার পথে যে সাফল্য লাভে আমরা গৌরবমণ্ডিত হয়েছি—তাও নেহাৎ তুচ্ছ নহে। অল্পদিন আগে সুরু হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি বিজ্ঞান-অনুশীলনে ভারতের দান জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে আরম্ভ করে এবং ধীরে ধীরে সারা জগতের বৈজ্ঞানিকদের সান্নিধ্যে তাঁদের সাথে এক গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে, পরাধীন ভারতের বিজ্ঞান-কর্ম্মিগণও একথা প্রমাণ করলেন যে সুযোগ-সুবিধা বর্জিত হয়েও—নানা প্রতিকূল পরিবেশে বিভিন্ন বাধাবিপত্তির মাঝেও তাঁরা যে ভাবে তাঁদের প্রতিভার বিকাশ করতে পেরেছেন—তা কিছু কম প্রশংসনীয় নয়! এইভাবে ভারতীয় প্রতিভা বিংশ-শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় যে সাহায্য করেছে—সারা জগতের বিজ্ঞানীদের নিকট তা আর আজ অবহেলার বস্তু নয়। তাই বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকদের সাথে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের যোগাযোগও হয়ে উঠছে ঘনিষ্ঠতর—পারস্পরিক সাহচর্য্য, আনুকূল্য ও সহানুভূতির যোগসূত্রে সবার মাঝে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে—তার ফলে দেশকালের সীমা গণ্ডী কাটিয়ে সমস্ত দুনিয়া একসাথে ভোগ করবে বিজ্ঞান সাধনার সুফল।

বিভিন্ন দেশের অনেক বৈজ্ঞানিক কর্ম্মীর সাথেই ভারতীয় বিজ্ঞান-সেবীদের পরিচিত হওয়ার সুযোগ এসেছে—বিদেশে শিক্ষালাভের সময়। সে সমস্ত বৈজ্ঞানিক কর্ম্মীর অনেকেই পরে নামকরা বৈজ্ঞানিক-রূপে সুপরিচিত হয়েছেন। এদেশেও বিভিন্ন সময়ে অনেক বৈজ্ঞানিক এসেছেন—বিশেষতঃ গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতির বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক এদেশে উপস্থিত হয়ে সারা ভারতের বিজ্ঞানীদের মহাসম্মেলনে

সকলের সাথে মিশেছেন। গত ১৯৩৮ সনে কলকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের যে রজত জয়ন্তী উৎসব হয়েছিল তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জেমস জীনস্। এবারে জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পুণাতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের যে ৩৭তম বার্ষিক সম্মেলন হয়ে গেল তাতেও কয়েকজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এসে যোগ দিয়েছিলেন বিভিন্ন দেশ থেকে। বৃটেন, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ও সুইডেনের বিজ্ঞানীদের সাথে এখানে মিলেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা এবং সোভিয়েট রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকেরা। এদের কয়েকজন কলকাতায়ও এসেছিলেন। প্রধানতঃ তাঁদের এবং অন্য কয়েকজনের সম্বন্ধেই কিছু কথা আপনাদের বলছি।

আমাদের এবারকার অতিথি বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে সব চেয়ে সর্ব্বাধিক আগ্রহ ও ঔৎসুক্য ঘিরে ছিল জোলিও কুরি দম্পতিকে নিয়ে। এঁরা হলেন ফ্রান্সের অধ্যাপক ফ্রেডরিক জোলিও এবং তাঁর স্ত্রী ডাঃ শ্রীমতী ইরিণ জোলিও কুরি। ডাঃ ইরিণ সুপ্রসিদ্ধা মাদাম মেরি কুরির মেয়ে। মাদাম মেরি কুরি স্বাভাবিক স্বতঃদীপ্ত ধাতু রেডিয়াম আবিষ্কার করে যশস্বিনী হয়েছিলেন—এবং নোবেল পুরস্কারে তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছিল। অধ্যাপক ফ্রেডরিক জোলিও কুরি ও শ্রীমতী ইরিণ রেডিও অ্যাকটিভ্ বা কৃত্রিম স্বতঃদীপ্ত ধাতু আবিষ্কার করে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন এবং দুজনে নোবেল পুরস্কারও লাভ করেছেন। ৫২ বৎসরের এই মহিলা-বিজ্ঞানী ইরিণ এদেশে এসে কয়েক দিন খুবই ব্যস্ততায় কাটিয়েছেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেওয়া ছাড়াও অন্যান্য অনেক অনুষ্ঠানেই তাঁকে উপস্থিত হতে হয়। কলকাতাতে তিনি ভারতের প্রথম ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নামক আণবিক গবেষণা ভবন এবং চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালেরও উদ্বোধন করেন। পুণাতে ওয়েষ্ট ডিসেম্বর অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের এক অধিবেশনে আণবিক বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্ত্তন সম্বন্ধে বক্তৃতা বলেন যে সাধারণ মানুষের অ্যাটম্ বোমার নাম শুনেই আণবিক শক্তি সম্বন্ধে ভয় করার কোনও হেতু নেই। ভবিষ্যতে গঠনমূলক কাজেই আণবিক শক্তির আসল নিয়োগ ঘটবে এবং মানুষের কল্যাণেই তার প্রয়োগ হবে—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। পুণাতে যে জাতীয় রসায়ন গবেষণাগারের উদ্বোধনও এই সময় করা হয় সেখানেও ইরিণ উপস্থিত থেকে তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান ও এই গবেষণাগারের সাফল্য কামনা করেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে যে সমস্ত বিশেষ প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে ফ্রেডরিক জোলিও পরমাণবিক বলবিদ্যা সম্বন্ধে এবং ইরিণ কৃত্রিম স্বতঃদীপ্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক ফ্রেডরিক হচ্ছেন ফ্রান্সের আণবিক শক্তি সম্পর্কীয় সর্ব্বময় কর্ত্তা (হাইকমিশনার ফর অ্যাটমিক এনার্জী) তিনি বলেন যে ফ্রান্সে তারা অসামরিক কাজের জন্যই আণবিক শক্তিকে প্রয়োগ করার সাধনা করছিল। অধ্যাপক ফ্রেডারিক জোলিও বিশ্ব-বিজ্ঞানী সঙ্ঘের সভাপতি। পুণায় বিজ্ঞান কংগ্রেস অধিবেশনের সময়ে ভারতীয় বিজ্ঞানসেবী সঙ্ঘের এক অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"শান্তি ও মানবসেবায় বিজ্ঞানের প্রয়োগ—ইহাই বিশ্বের প্রত্যেক বিজ্ঞানীর আদর্শ হওয়া উচিত।" ভারতীয় বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য করে তিনি বলেন যে বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই দেশবাসীর কল্যাণের জন্য গবেষণা করবেন—কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে তাদের বেতন ও অবস্থার এমন উন্নতি হওয়া উচিত, যাব ফলে তাঁরা সন্তোষজনকভাবে কাজ করে যেতে পারেন। বিশ্বের বিজ্ঞানীদের মানবকল্যাণ ও প্রগতির জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন—আপনাদের রাজনৈতিক মতবাদ যাই হোক না কেন—আসুন মানবকল্যাণের জন্য আমরা একসাথে কাজ করি।

কলকাতায় এসে গত ১১ই জানুয়ারী শ্রীমতী ইরিণ কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে যে নূতন ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নামক গবেষণা ভবন প্রতিষ্ঠিত হয় তার উদ্বোধন করেন। তাঁর প্রতি জনসাধারণের যে কি গভীর ঔৎসুক্য ছিল—এই দিন তার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়, অনুষ্ঠান কক্ষে স্থানাভাব হেতু সহস্রাধিক দর্শনাকাঙ্ক্ষী গবেষণা ভবনের বাহিরে শ্রীমতী জুলিয়ো কুরিকে দেখবার আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন এবং তাদের দেখা দিতে বাধ্য হয়ে ইরিণকে অনুষ্ঠানের মাঝে একবার বাইরে এসে এদের সাথে মিলিত হইতে হয়। তার পরদিনই চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে ক্যানসার হাসপাতালের উদ্বোধন অনুষ্ঠানও ইরিণকেই করতে হয়। এরপর ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স নামক সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞান-অনুশীলন কেন্দ্রে শ্রীমতী ইরিণ জুলিয়ো কুরিকে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পদক দানে সম্মানিত করা হয়। ইতঃপূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক নিলবোর, পোর্টসিদ অধ্যাপক হার্লো এবং টেনেসি ভ্যালির সভাপতি ডাঃ মর্গান প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানিগণ এই পদক লাভ করেছিলেন। এখানে শ্রীমতী ইরিণ রেডিয়ম আবিষ্কারের কাহিনীও বিবৃত করেন।

বৃটেন থেকে যে দুজন সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এসেছিলেন বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগ দিতে—তাদের একজন অধ্যাপক স্যার রবার্ট রবিনসন, আর অন্যজন অধ্যাপক জে, ডি, বার্ণাল। স্যার রবার্ট রবিনসন হচ্ছেন বৃটেনের রয়াল সোসাইটির সভাপতি। জৈব রসায়নে এর গবেষণা প্রচুর এবং ইনি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ জৈব রাসায়নিক। এই ৬২ বৎসরের প্রবীণ বৈজ্ঞানিক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক। হর্মোন প্রস্তুত করে তিনি শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি স্থাপন করেছেন। তা ছাড়া নর্দিন ষ্টিকনিন্ শ্রেণীর পদার্থ বিষয়ে তার গবেষণাও যথেষ্ট মূল্যবান বলে স্বীকৃত হয়েছে। এই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ১৯৪৭ সনে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। পুণায় জাতীয় রসায়ন গবেষণাগারের উদ্বোধন উৎসবে উপস্থিত থেকে তিনি তার দেশবাসী বৈজ্ঞানিকদের তরফ থেকে এই ভারতীয় গবেষণাগারের সাফল্য কামনা করে বক্তৃতা দেন। সস্ত্রীক কলকাতা এসে রবিনসন বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ১১ই জানুয়ারী ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স নামক বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান বিমলাচরণ স্বর্ণপদক দিয়ে এই

বৃটিশ বৈজ্ঞানিককে সম্মানিত করেন। ইতঃপূর্ব্বে স্যার হেনরি ডেট ও সুপ্রসিদ্ধ আইনষ্টাইনকে এই পদকে সম্মানিত করা হয়েছিল। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এও স্যার রবিনসনের জন্য এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠানে স্যার রবিনসন পেনিসিলিন সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা করেছেন।

অপর বৃটিশ বৈজ্ঞানিক জে, ডি, বার্ণাল লণ্ডনের বিরবেক কলেজের পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক। একজন বিশিষ্ট মার্কসপন্থী বলে তিনি সুপরিচিত। বিশ্ববিজ্ঞানী সঙ্ঘের তিনি সহ-সভাপতি। পূর্ব্বে বলা হয়েছে অধ্যাপক জোলিয়ট কুরি এর সভাপতি। এই বৈজ্ঞানিকের জন্ম হয়েছিল এক কৃষকের গৃহে। এই প্রতিভাবান বিজ্ঞান-কর্ম্মী মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে রয়্যাল সোসাইটির সভ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এখানের বিশেষজ্ঞ তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরূপে পারদর্শিত হয়েছেন। একটা মজার খবর এই যে গত মহাযুদ্ধের সময় অধ্যাপক বার্ণাল ছিলেন আমাদের লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা। পুণায় ভারতীয় বিজ্ঞান-সেবী সঙ্ঘের এক অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন—ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সঙ্ঘকে ট্রেড ইউনিয়ন প্রথায় পরিচালিত করা উচিত। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য কিরূপ অর্থ পাওয়া যাবে এবং তা কি ভাবে বণ্টিত হবে—তারই ওপর বিজ্ঞানের অগ্রগতি নির্ভর করছে। কলকাতায় এসে অধ্যাপক বার্ণালকেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হয়। বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে "জীবনের সূত্র" (অরিজিন অব লাইফ) নামক এক বিশেষ মনোজ্ঞ বক্তৃতা শুনে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়েছেন। তারপর বিজ্ঞান কলেজে এবং ইণ্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটিতে অধ্যাপক বার্ণালের সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন করা হলে সেখানেও তিনি বক্তৃতা করেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন কালেও অধ্যাপক বার্ণাল 'বিজ্ঞানের ইতিহাস' সম্বন্ধে এবং প্রোটিন প্রভৃতি জৈব পদার্থ সম্বন্ধেও বিশেষ প্রবন্ধ শুনিয়েছিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেও এসেছিলেন কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, এদের একজন আমাদের কাছে নূতন নয়, আগেও তিনি ভারতে ছিলেন কিছুদিন এবং সেজন্য আমাদের পরিচিত। তিনি হচ্ছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডাঃ আর্থার এইচ কম্পটন। ইনি ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য পদে সগৌরবে কাজ করছেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ধন্য হয়েছে ডাঃ কম্পটনকে ১৯২৬-২৭ সালে বিশেষ অধ্যাপকরূপে পেয়ে। এক্স-রে ও কসমিক রশ্মি সম্বন্ধে ডাঃ কম্পটনের গবেষণা বিশেষ মূল্যবান। ১৯২৭ সালে এই প্রতিভাবান বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। সি টি আর উইলসনের সাথে যুক্তভাবে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞান সাধকগণ ডাঃ কম্পটনকে তাদের বিজ্ঞান-সভার সম্মানিত সদস্য করেছেন। আমাদের ইণ্ডিয়ান একাডেমি অব সায়েন্সেরও তিনি অন্যতম সদস্য। আমেরিকার আণবিক বোমা নির্ম্মাণের ভার যে বিজ্ঞানী-পরিষদের ওপর ন্যস্ত ছিল ডাঃ কম্পটন তার অন্যতম উচ্চতর কর্ম্মী ছিলেন। গত ৫ঠা জানুয়ারী বিজ্ঞান কংগ্রেস অধিবেশনে এই মার্কিন বৈজ্ঞানিক তাঁদের নিষ্ঠুর আণবিক বোমা নির্ম্মাণের পটভূমিকা বিবৃত করে সকলকে চমকিত করেন।

আমেরিকার ন্যাশনাল ব্যুরো অব ষ্ট্যাণ্ডার্ডস-এর অধ্যক্ষ ডাঃ এডওয়ার্ড কণ্ডনও এসেছেন এদেশে। ভারত সরকারের অতিথিরূপে তিনি আমাদের দেশের বিভিন্ন গবেষণাগারগুলো পরিদর্শন করছেন। কলম্বিয়া, প্রিন্সটন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা এবং কিছুদিনের জন্য ওয়াশিংটন রিসার্চ ল্যাবরেটরীর অধ্যক্ষরূপে কাজ করার পর ১৯৪৫ সালে ডাঃ কণ্ডন ন্যাশনাল ব্যুরো অব ষ্ট্যাণ্ডার্ডসের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই প্রতিষ্ঠানের ওপরই আমেরিকায় জাতীয় শিল্প বিজ্ঞান গবেষণার মান-নির্দ্ধারণ ও পরিচালন ব্যবস্থার ভার দেওয়া আছে। আমরা আশা করি ডাঃ কণ্ডনের ভারত ভ্রমণ আমাদের দেশের শিল্প বিজ্ঞান গবেষণার উন্নতির পথে অনেক সাহায্যের নির্দ্দেশ দেবে।

মার্কিন মুলুক থেকে আরও একজন নাম-করা বৈজ্ঞানিক এসেছেন—বিজ্ঞান জগতে এর দানও নেহাৎ নগণ্য নয়। ইনি হচ্ছেন নিউইয়র্কের ব্রুকলিন পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের প্লাষ্টিক সংক্রান্ত গবেষণার অধ্যক্ষ—ডক্টর হরমান মার্ক। ইনি আসলে জার্ম্মানীর লোক এবং ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ-ডি ডিগ্রীধারী। ইনি ১৯৪০ সালে প্রথম ব্রুকলিন পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে জৈব রাসায়নিকের অধ্যাপক রূপে কাজে যোগদান করেন এবং বর্ত্তমান পদে পরে উন্নীত হন। তিনি তন্তু, প্লাষ্টিক প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ এবং আমেরিকার ইনষ্টিটিউট অব ফিজিক্সেরও অধ্যক্ষ। ইনিও সেদিন কলকাতা এসেছিলেন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্সে গত ১২ই জানুয়ারী এক বক্তৃতাও করেছেন।

আরও একজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক আমাদের দেশে অবস্থান করছেন এবং আমাদের জাতীয় রসায়ন গবেষণাগারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন—এর নাম অধ্যাপক ম্যাকবেন। অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় গবেষণাগারের সর্ব্বময়কর্ত্তা হিসাবে তাঁর কাছ থেকে দেশ অনেক কিছু সাহায্য পাওয়ার আশা করে আছে।

রাশিয়া থেকে সুপ্রসিদ্ধ জৈব রাসায়নিক ডক্টর এঙ্গেল হার্ট তাঁর এক সহকর্ম্মী ডাঃ বাট্রিভ্‌কে নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছেন—মাসখানেক এখানে সফর করার উদ্দেশ্য নিয়ে। এই ৫৬ বছরের প্রবীণ বিজ্ঞানী ভিটামিন 'এ' এবং মনুষ্য দেহে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা করে সুনাম অর্জ্জন করেছেন। ইনি বর্ত্তমানে মস্কোর প্যাভ্‌লভ্‌ ফিজিওলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ। রাশিয়াতে আণবিক গবেষণার উন্নতি সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন যে যদিও অল্পদিন আগে রাশিয়াতে আণবিক গবেষণা সুরু হয়েছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই মস্কোর একাডেমি অব সায়েন্স এ বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। পাহাড়-কাটার কাজেই কেবল ধ্বংসাত্মক অস্ত্র হিসাবে রাশিয়াতে আণবিক শক্তির প্রয়োগ করা হচ্ছে, কিন্তু ধ্বংসাত্মক কাজে আণবিক শক্তি প্রয়োগ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও তাঁদের নেই এবং বর্ত্তমানে গঠনমূলক

কাজে জাতীয় উন্নতির জন্যই সেখানে আণবিক শক্তিকে নিয়োগ করার সাধনা বেশ ভালভাবেই চলছে।

সুইডেন থেকে অধ্যাপক ও, ই, এইচ রিডবেক ও অধ্যাপক হর্মান ভোল্ড এসেছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগ দিতে। অধ্যাপক রিডবেক ভ্রাম্যমান তড়িৎ-চুম্বক ঢেউ ও ইলেকট্রন বিম্ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পদার্থবিদ।

ফ্রান্স থেকে জোলিয়ো-কুরি দম্পতি ছাড়া আরও এসেছিলেন ডাঃ চারলস কিশার এবং এল্ ঢুমপট।

উল্লিখিত স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিকবৃন্দ ছাড়া আরও কয়েকজন বৈদেশিক মনীষি বিজ্ঞানীকে আমরা এবার অতিথিরূপে পেয়ে ধন্য হয়েছি। জগৎ-সভায় বিজ্ঞানে ভারতের আসন প্রতিষ্ঠিত হলেও আমাদের অক্লান্ত সাধনা চলতেই থাকবে সবার মাঝে শ্রেষ্ঠ আসন লাভের আশায়। ভারতীয় মনীষা সারা জগতের জাগরণের সেবায়—তাদের কল্যাণ সাধনে—নিজের শ্রেষ্ঠ দান দিতে অগ্রসর হয়ে আসবে। গোটা পৃথিবীর সম্মানরূপে আমাদের অতিথেয়তার প্রতিদান সেদিন ফিরে পাব।

বাস্তু-ত্যাগী

জসীমউদ্দীন

দেউলে দেউলে কাঁদিছে দেবতা পূজারীরে খোঁজ করি,
মন্দিরে আজ বাজেনাক শাঁখ সন্ধ্যা সকাল ভরি।
তুলসীতলা সে জঙ্গলে ভরা, সোণার প্রদীপ লয়ে,
রচে না প্রণাম গাঁয়ের রূপসী মঙ্গল কথা কয়ে।
হাজরা তলায় শেয়ালের বাসা, সেওড়া গাছের গোড়ে,
সিঁদুর মাখান, সেই স্থান আজি বুনো শুয়োরেরা খোঁড়ে।
আঙনার ফুল কুড়াইয়া কেউ যতনে গাঁথে না মালা,
ভোরের শিশিরে কাঁদিছে পূজার দূর্ব্বা শাপের থালা।
দোল-মঞ্চ সে কাটলে ফাটিছে, ঝুলনের দোলাখানি,
ইঁদুরে কেটেছে নাট মঞ্চের উড়েছে চালের ছানি।
কাক চোখ জল পদ্মদীঘিতে কবে কোন রাঙা মেয়ে,
আলতা ছোপান চরণ দুখান মেলেছিল ঘাটে যেয়ে।
সেই রাঙা রঙ ভোলে নাই দীঘি, হিজলের ফুল বুকে,
মাখাইয়া সেই রঙিন পায়েরে রাখিয়াছে জলে টুকে।
আজি ঢেউ হীন অপলক চোখে করিতেছে তাহা ধ্যান,
ঘন-বন-তলে বিহগ কণ্ঠে জাগে তার স্তব গান।
এই দীঘি জলে সাঁতার খেলিতে ফিরে এসো গাঁর মেয়ে,
কলমি লতা যে ফুটাইবে ফুল তোমারে নিকটে পেয়ে।
ঘুগুরা কাঁদিছে উহু উহু করি, ডাহুকের ডাক ছাড়ি,
গুমরার বন সবুজ শাড়ীরে দীঘল নিশাসে ফাঁড়ি।
ফিরে এসো যারা গাঁও ছেড়ে গেছো, তরু লতিকার বাঁধে,
তোমাদের কত অতীতদিনের মায়া ও মমতা কাঁদে।
সুপারীর বন শূন্যে ছিঁড়িছে দীঘল মাথার কেশ,
নারকেল তরু উর্ধ্বে খুঁজিছে তোমাদের উদ্দেশ।
বুনো পাখীগুলি এডালে ওডালে কই কই করে কাঁদে,
দীঘল রজনী খণ্ডিত হয় পোষা কুকুরের নাদে।

কার মায়া পেয়ে ছাড়িলে এদেশ, শস্যের থালা ভরি,
অন্ন-পূর্ণা আজো যে জাগিছে তোমাদের কথা স্মরি।
আঁকা বাঁকা বাঁক শত নদী পথে ডিঙি তরার পাখী,
তোমাদের পিতা পিতা-মহদের আদরিয়া বুকে রাখি,
কত নাম হীন অথই সাগরে জুঝিয়া ঝড়ের সনে,
লক্ষীর ঝাঁপি লুটিয়া এনেছে তোমাদের গেহ-কোণে।
আজি কি তোমরা শুনিতে পাও না সে নদীর কল গীতি,
দেখিতে পাওনা ঢেউএর আদরে লিখিত মনের প্রীতি?
হিন্দু মুসলমানের এ দেশ, এ দেশের যার কবি,
কত কাহিনীর সোনার সূতায় গেঁথেছে যে নাড়া ছবি।
এ দেশ কাহারো হবে না একার, যতখানি ভালোবাসা,
যতখানি ত্যাগ যে দেবে, সেথায় পাবে ততখানি বাসা।

বেহুলার শোকে কাঁদিয়াছি মোরা গাংকিনা নদী সোঁতে,
কত কাহিনীর ভেলায় ভাসিয়া গেছি দেশে দেশ হতে।
এমাম হোসেন শকিনার শোকে ভেসেছে হলুদ পাতা,
রাধিকার পার নূপুরে মুখর আমাদের পার-ঘাটা।

অতীতে হয়ত কিছু ব্যথা দেখি পেয়ে বা কিছুটা ব্যথা,
আজকের দিনে ভুলে যাও ভাই সেসব অতীত কথা।
এখন আমরা স্বাধীন হয়েছি, নূতন দৃষ্টি দিয়ে,
নূতন রাষ্ট্র গড়িব আমরা তোমাদের সাথে নিয়ে।
ভাঙ্গা ইস্কুল আবার গড়িব, ফিরে এসো মাষ্টার।
হুঙ্কারে ভাই তাড়াইয়া দিব কালো অজ্ঞানতার।
বনের ছায়ায় গাছের তলায় শীতল স্নেহের নীড়ে,
খুঁজিয়া পাইব হারাইয়া যাওয়া আদরের ভাইটিরে।

তথাগতের পথে

নরেন্দ্র দেব

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নালন্দার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পর পর তিনটি স্তরের তিন রকম গাঁথুনি দেখে বোঝা যায় এর বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহ, মঠ ও বিস্তৃত বিহারগুলির কোনও কোনওটি অন্ততঃ তিনবার ভেঙে চুরে নূতন ক'রে গড়া হয়েছিল। বৌদ্ধবিদ্বেষীদের নিষ্ঠুর ধ্বংসাভিযান ও আক্রমণের ফলে নালন্দা একাধিকবার বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং বৌদ্ধ ভক্তগণের অকুণ্ঠ সাহায্য ও আনুকূল্যে একাধিকবার সেগুলি পুনর্নির্মিত হয়েছিল। নালন্দার এই বিহারগুলিতে বহুশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ বাস করতেন।

নালন্দার প্রধান বৌদ্ধ স্তূপ

(১নং স্তূপ) চার কোণে চারিটি সুদৃশ্য চূড়া ছিল এবং চমৎকার কারুকার্য করা প্রাকার বা বেষ্টনী ছিল। এক কোণের ভগ্ন চূড়ার নিম্নাংশটুকু দেখা যাচ্ছে। এটি একটি ছোট-খাটো পাহাড়ের মতো উঁচু

ভারতের ইতিহাসে এই সকল মনীষীর খ্যাতি চিরস্থায়ী হ'য়ে আছে। বাঙালী অধ্যাপক শীলভদ্র একদা এই নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। চীন পরিব্রাজক হিয়ুয়েনচাঙ্ এই সময় ভারতে এসে নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র স্বরূপ এঁরই কাছে ৭।৮ বৎসর সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। তাঁরই বিবরণ থেকে জানা যায় যে তথাগত নালন্দা বিহারে একবার এসে তিন মাস ছিলেন এবং প্রতিদিন শ্রমণ ও ছাত্রদের ধর্মোপদেশ দিতেন।

নালন্দার ইতিহাস থেকে জানা যায় যে ভগবান বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণ লাভের পর শক্রাদিত্য, বুদ্ধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত, বালাদিত্য ও বজ্র প্রমুখ মহারাজারা নালন্দায় কয়েকটি সুন্দর বিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন। বুদ্ধের অনুরাগী রাজন্যগণ ও অপরিচিত ধনী ভক্ত শ্রেষ্ঠীগণের বিপুল বদান্যতায় এবং শিল্পীদের আন্তরিক সশ্রদ্ধ সহযোগিতায় নালন্দার গৃহগুলি ভারতের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য নৈপুণ্যের পরিচায়ক ব'লে গণ্য হয়েছিল। তাছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উৎকৃষ্ট পঠন পাঠনের জন্য এশিয়ার প্রায় প্রত্যেক দেশেরই জ্ঞান-পিপাসু লোক এখানে জ্ঞানার্জনের জন্য আসতেন, কারণ ঐ সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি পড়েননি, পণ্ডিতমণ্ডলী তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করতেন না। এখানে যে কোনও ছাত্র ইচ্ছা করলেই পড়বার সুযোগ পেতো না। উচ্চ শিক্ষায় অধিকার আছে কিনা পরীক্ষা ক'রে নিয়ে তবে ছাত্রদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হ'ত। তখনকার দিনে প্রাচীন ও আধুনিক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত দেশবিখ্যাত যে সব অধ্যাপকমণ্ডলী এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে গৌরবান্বিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নাগার্জুন, শীলভদ্র, জ্ঞানচন্দ্র, জিনমিত্র, স্থিরমতি, গুণমতি, চন্দ্রপাল, বিটপাল, ধীমান ও ধর্মপাল প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ এঁরা ছিলেন সে যুগে সর্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। এঁদের অগাধ পাণ্ডিত্য, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রে অসীম জ্ঞান, তর্ক, বিচার ও মীমাংসায় এঁদের অসাধারণ দক্ষতা সেদিনের পৃথিবীর বিদগ্ধ সমাজের কাছে এঁদের সুপরিচিত ক'রে তুলেছিল। আরও গৌরবের কথা যে এঁদের মধ্যে অনেকেই বাঙালী ছিলেন। দেশ দেশান্তরের জ্ঞান-পিপাসুরা বহুদূর থেকে বহু শ্রম স্বীকার ক'রে ছুটে আসতেন এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপকমণ্ডলীর পদপ্রান্তে বসে নব নব বিষয়ে জ্ঞান লাভ ক'রে তাঁদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে সুসম্পূর্ণ করে তোলবার আশায়। হিয়ুয়েন চাঙের সাক্ষ্য প্রমাণ উদ্ধৃত করে বলা যেতে পারে তাঁরা কেউ এখানে এসে হতাশ হতেন না। তাঁর বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে সে সময় এখানে নানা দেশের প্রায় দশহাজার ছাত্র অধ্যয়ন করতেন। কেউ বৌদ্ধ আচার্যদের কাছে বৌদ্ধশাস্ত্র পড়তেন, কেউ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছে বেদ, উপনিষদ, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি অধ্যয়ন করতেন, কেউ বৈদ্য বিশেষজ্ঞদের কাছে আয়ুর্বেদীয় রসায়ন বিজ্ঞান শিক্ষা করতেন। নালন্দা বিহারস্থ সহস্রাধিক

বৌদ্ধ ভিক্ষুকের মধ্যে এমন বহু অধ্যাপক ছিলেন যাঁরা এক একজন কুড়ি তিরিশ এমন কি পঞ্চাশটি পর্য্যন্ত বিষয়েও অধ্যাপনা করতে পারতেন। হিয়ুয়েন চাঙ্‌ এখানে শিক্ষালাভ করে শেষে একত্রে পঞ্চাশটি বিভিন্ন বিষয়ে পুঁথি পড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য এরকম অসাধারণ পণ্ডিত সেখানে ছিলেন মাত্র দশজন।

হিয়ুয়েন চাঙ্‌ ও ইৎসিঙ্‌ প্রমুখ চীন পরিব্রাজকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে মাত্র বারো-তেরোশো বছর আগেও এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কী বিরাট এক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য ছিল। ধর্ম ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পীঠ এই নালন্দায় সেদিন আটটি বিভিন্ন বিষয়ের বিশাল গ্রন্থশালা ও পাঠাগার ছিল। ছাত্র, শ্রমণ, অধ্যাপক, শিল্পী, রাসায়নিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতিদের ব্যবহারের জন্য তিনশতাধিক গৃহ ছিল। নানা প্রদেশের দশসহস্র ছাত্রের শিক্ষার উৎকর্ষসাধনের জন্য প্রায় তিন হাজার শ্রমণ-অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন।

নালন্দার সর্ববৃহৎ মঠ বা সংঘারাম (২নং মঠ) দৈর্ঘ্যে ২০০ ফুট ও প্রস্থে ১৭০ ফুট যে ভিত্তিমূল মৃত্তিকাগর্ভ থেকে বেরিয়েছে তার কারুকার্য্য-খচিত ও দেবদেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ স্থাপত্যকলা অতুলনীয়

বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের দীর্ঘ কাল পরে অর্থাৎ আজ থেকে ঠিক দেড়হাজার বছর পূর্বে এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজা মহারাজাদের স্বেচ্ছায় ও শ্রদ্ধায় প্রদত্ত প্রায় দশখানি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। বলাদিত্য শিলাদিত্য শুক্রাদিত্য ইত্যাদি আদিত্য নামধেয় নৃপতিবৃন্দ পর পর এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছিলেন। মগধ বিলাসপুর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রভৃতি নগরাধীপ পালবংশীয় নৃপতিগণ, যথা, গোপাল, মহীপাল, নরপাল, রামপাল, গোবিন্দপাল ইত্যাদি রাজন্যবৃন্দ ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রধান পৃষ্ঠপোষক। এঁদেরই অকুণ্ঠ দান ও উদার আনুকুল্যে নালন্দা হয়ে উঠেছিল সেদিন বিশ্বসেবাব্রতী ঐশ্বর্য্যশালী ও জ্ঞানসমৃদ্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মৃত্তিকা গর্ভ হ'তে টেনে বার-করা এই নালন্দার ধ্বংসস্তূপ দেখে কেবলই মনে হচ্ছিল—এ যেন কোন সমাধি শয়নে চিরনিদ্রিতা সুন্দরী রূপসীর তনু দেহের কংকালাবশেষ মাত্র। এ কি সেই বিশ্ব-বিশ্রুত নালন্দা? একদা যার স্নিগ্ধ শীতল নির্মল নীরোচ্ছল অসংখ্য তড়াগ ও জলাশয়—যা মানস-সরোবরেরও ঈর্ষা উৎপাদন করতো, শ্বেত লোহিত নীলাব্জ শোভিত ছিল যার স্বচ্ছ তরল বক্ষতল! কোথায় গেল আজ সেই দ্বিতল ত্রিতল, নবতল প্রাসাদ ও হর্ম্যরাজী—একদা যা বিদেশী পরিব্রাজকবৃন্দকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে তুলতো। কোথায় সেই বিরাট বিহার, সঙ্ঘারাম ও বৌদ্ধস্তূপ—সহস্রাধিক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী শ্রমণ—যেখানে বিভিন্ন বিষয়ের গুরু, শিক্ষক ও উপদেষ্টা ছিলেন। কোথায় সেই গগনস্পর্শী দেবদেউল যার পবিত্র শিখরদেশে একদা প্রভাত রবির স্বর্ণ কিরণ উদয়লগ্নে ঝলমল করে উঠতো—কোথায় সেই সুবিশাল অষ্টবিধ পুস্তকাগার? রাজেশ্বর বলাদিত্যের সেই মঠ কোথায়? কোথায় সেই কারুকার্যমণ্ডিত স্থাপত্য শিল্পসম্ভার? কীর্তিমুখ, চক্রধ্বজ, সিংহদ্বার, পদ্ম ও হংসমিথুন উৎকীর্ণ করা চন্দ্রাতপ, অলিন্দ, গৃহবলভী? কোথায় সেই বিচিত্র বর্ণে অনুরঞ্জিত স্তম্ভ, প্রাকারমঞ্চ ও বেষ্টনী—যার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন একাধিক পরিব্রাজক তাঁদের ভারত-ভ্রমণ বিবরণের মধ্যে?

নালন্দা আজ শুধু ধ্বংসাবশেষ। বিরাটের বিস্তৃত ধ্বংসস্তূপ। একদা মহামহিমান্বিত ঐশ্বর্য্যগৌরবের ধূলিধূসরিত অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। আজও সবটুকু খুঁড়ে বারকরা সম্ভব হয়নি। বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন ভূতপূর্ব নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র এক তৃতীয়াংশ এ পর্য্যন্ত মৃত্তিকার তলদেশ থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, বাকী অংশ সবই এখনও ভূগর্ভে সমাহিত।

এই এক তৃতীয়াংশ ধ্বংসাবশেষই আজ বর্তমান জগতের বিস্ময় উৎপাদন করছে। বহু বিস্তৃত ছিল এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। দূর থেকে অনেকটা মনে হয় আমরা যেন কোনও প্রাচীন দুর্গ দেখতে পাচ্ছি। নালন্দার যেটুকু মাটির নীচে থেকে উদ্ধার হয়েছে তার নক্সা দেখে বোঝা যায় একদিকে ছিল সারিবন্দি যত চৈত্য বিহার ও সাধারণ গৃহ এবং ঠিক তার বিপরীত দিকে ছিল পর পর শ্রমণ ভবন ও বিদ্যালয় গৃহগুলি, মঠ ও উপাসনার মন্দির।

একটি পুরাতন ক্ষুদ্র ও ভগ্ন প্রবেশ-দ্বার দিয়ে প্রথম প্রবেশ করলাম ভারতের এই গৌরবময় প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানে। এই ক্ষুদ্র প্রবেশ পথের বামে ১নং মঠ এবং দক্ষিণে ৪ ও ৫ নং মঠ। আমরা বরাবর সেই পথে সোজা অগ্রসর হ'য়ে একটি উন্মুক্ত স্থানে এসে পড়লুম। তারপর আমরা ১নং স্তূপটি দেখতে গেলুম। নালন্দায় যতগুলি স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে এইটি সকলের চেয়ে উঁচু এবং দেখতেও বেশ জমকালো। এই স্তূপের শীর্ষ দেশে ওঠবার জন্য নির্মিত বিশাল সোপানশ্রেণীও আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু সেটি ব্যবহার করা বিপজ্জনক বোধে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ তার পাশেই আর একটি সিঁড়ি গেঁথে রেখেছেন।

অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি
(প্রধান স্তূপের উপর এই মূর্ত্তিটি আছে।)

এই স্তূপের সর্বোচ্চ তলে উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখলে সমগ্র নালন্দা ভূখণ্ডের দৃশ্য উপভোগ করা যায়।

স্থাপত্য-কলা ও ভাস্কর্য শিল্পের বৈচিত্র্য এবং এই স্তূপের গায়ে যে চূর্ণবালির মূর্তি উৎকীর্ণ করা আছে এগুলি একটু মনোযোগের সঙ্গে দেখলেই বোঝা যায় যে বিভিন্ন সময়ে এর বিভিন্ন অংশ নির্মিত হয়েছে। সমস্ত স্তূপটির ভিত থেকে চূড়া পর্যন্ত একসঙ্গে ও একই সময়ে গাঁথা হয়নি। বিশেষজ্ঞেরা বলেন এই স্তূপটির স্থাপত্যকলা ও ভাস্কর্য শিল্প না কি গুপ্তযুগেরই গৌরব বহন করছে। গগনস্পর্শী এই বৃহৎ স্তূপটির চতুর্দিক ঘিরে অসংখ্য ছোট বড় ও মাঝারী পূজা-মানসিকে উৎসর্গ করা 'স্তূপ' আছে দেখা যায়। এই বিশাল স্তূপের উত্তর-পূর্ব কোণে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের একটি চমৎকার মূর্তি আছে। সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এটিকে রক্ষা করিবার জন্য একটি চালা তৈরী করে দিয়েছেন এর মাথার উপর। এই মূর্তিটিও খুব বড়। নালন্দার মৃত্তিকাগর্ভ থেকে যতগুলি মূর্তি পাওয়া গিয়েছে—তার মধ্যে এই বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের মূর্তিটিই সব চেয়ে বৃহৎ। প্রায় সাড়ে ছ'ফুট উঁচু। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে নাগফনাছত্রযুক্ত যে মূর্তিটি দেখতে পাওয়া যায় বিশেষজ্ঞেরা সেটিকে বৌদ্ধ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক মহাযানপন্থী সিদ্ধ নাগার্জুনের মূর্তি বলে সনাক্ত করেছেন। ইতিহাস বলে এই রসায়নের যাদুকর এবং সর্ববিদ্যাবিশারদ নাগার্জুনই ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সর্বাধ্যক্ষ। ভক্তেরা দেবতার নামে বা গুরুর নামে উৎসর্গিত যে সব স্তূপ ও মূর্তি এখানে নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন তার অনেকগুলিতে শিলালিপির আকারে দাতার নাম ও তাঁর ইচ্ছা উৎকীর্ণ করা আছে।

এখান থেকে নেমে এসে আমরা শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত বোধ করায় একটু বিশ্রাম করলুম এই স্তূপের পাদমূলে। একদা কত ভক্ত বণিক ও ধনী শ্রেষ্ঠী তার ঐশ্বর্য উজাড় করে দিয়েছিলেন এখানে। কত রাজপুত্র ও রাজকন্যা এখানে চিরবাস পরে প্রবেশ করেছে। কত নৃপতি তার রাজমুকুট খুলে রেখে নগ্নপায়ে সসম্ভ্রমে এখানে এসে তাদের মাথা নত করে গেছে। সেখানে বসে বসে কল্পনায় আমরা যেন চলে গিয়েছিলুম অতীতের সেই ঐশ্বর্যময় প্রাচীন যুগে। নালন্দা তখন পূর্ণ গৌরবে বিরাজিত। মন্দিরে মঠে উপাসনাগৃহে গম্ভীর মধুর ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। শ্রবণে ভেসে আসছে যেন অদূর সঙ্ঘারাম থেকে বৌদ্ধ শ্রমণ শ্রমণাদের মিলিত কণ্ঠের মন্ত্রগীত ও থেরীগাথা। ওঙ্কারনাদের মতো সারা আকাশে বাতাসে ঝংকৃত হ'চ্ছে যেন জপচক্রে "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ নমঃ" অগুরু চন্দনে ও গন্ধ ধূপের সুরভিতে স্থানটি যেন মহিমান্বিত পবিত্রতায় ভরে উঠেছে। কত তীর্থযাত্রী—কত পুণ্যার্থী—কত পরিব্রাজক আসছে যাচ্ছে তাদের অঞ্জলিপুটে পুষ্প অর্ঘ, মাল্য ও নৈবেদ্যের উপকরণে পূর্ণ করে নিয়ে। দশ হাজার ছাত্রছাত্রী সারিবন্দী আসনে বসে এক সঙ্গে দুলে দুলে এখানে অধ্যয়ন করছেন। গম্ গম্ করছে সমস্ত স্থানটা তাদের পঠন-পাঠনের মৃদু গুঞ্জন ধ্বনিতে। সাবধানে পা ফেলে চলেছে সবাই, যেন কারু কোনো কাজে বিঘ্ন উপস্থিত না হয়!

কতক্ষণ আমরা সেখানে বিস্মৃত অতীতের মধুর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলুম জানি না, নবনীতার তৃষ্ণা নিবারণের তাগিদে বাস্তব জগতে ফিরে আসতে হল। শ্রীমান অভ্রাংশ আমাদের জন্য সুশীতল পানীয় আনিয়ে দিলেন। তখন সূর্য কিরণের প্রখরতা বেড়েছে। আমরা একে একে সমস্ত গরম পোষাক খুলে ফেলে উঠে পড়লুম নালন্দা ধ্বংসস্তূপের বিশেষ বিশেষ অংশগুলি পরিদর্শনের জন্য। ১নং স্তূপ দেখে আমরা এইবার ১নং মঠে এসে প্রবেশ করলুম। সেটিতে পর পর ৯টি বিভিন্ন স্তর বেরিয়েছে। উত্তরমুখী এর প্রবেশ দ্বার। এর মধ্যে প্রবেশ ক'রে প্রথমেই চোখে পড়ে চতুর্দিকের প্রস্তর স্তম্ভের ভগ্ন মূল। স্তম্ভগুলির উপর একটি চক মিলানো বারান্দা ছিল মঠের প্রাঙ্গণ ঘিরে। অগ্নি সংযোগে এটিকে যে একবার ধ্বংস কর-

বার চেষ্টা হয়েছিল তার চিহ্ন আজও বিদ্যমান। এই মঠের প্রথম স্তর দেখে অনুমান হয় পালরাজবংশের তৃতীয় নৃপতি দেবপালের সময় অর্থাৎ ৮১৫-৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এটি নির্মিত হয়েছিল। এটি ছিল একটি দ্বিতল সৌধ। দ্বিতল ধ্বংস হবার বা ভেঙে পড়বার পর আবার যখন নূতন করে নির্মিত হয়েছিল, তখন পুরাতন একতলার দেওয়ালের উপরই তৈরী করা হয়েছিল। নীচের তলে যে বিগ্রহ পীঠ বা দেববেদী পাওয়া গেছে সেটি পূর্বদিকের চকে। বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন যে এখানে একটি বিরাট বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত ছিল। বেদীর বিপরীত দিকে একটি মঞ্চ আবিষ্কৃত হয়েছে, অনুমান হয় গুরু বা আচার্যদের এখান থেকেই ছাত্রদের উপদেশ দিতেন। ছাত্ররা সব মঠের প্রাঙ্গণে বসে গুরু মুখে উপদেশ শুনে জ্ঞানার্জন করতো। উত্তর পশ্চিম কোণে একটি কূপ আছে। প্রাঙ্গণের চারিদিকে সারিবন্দী যে সব ঘর আছে, নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সেগুলি ছিল ছাত্রদের বাসগৃহ। এই সব ঘরের ছাদ কিন্তু পেটা ছাদ নয়, অর্ধ গোলাকৃতি খিলেনের ছাদ। প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য কলায় খিলানের উপর এত বড় ছাদ এইখানেই প্রথম দেখতে পাওয়া গেছে। এখানে একটি পাথরের উপর ভগবান বুদ্ধদেবের জীবনের অষ্টবিধ অবস্থার সচিত্র বিবরণ উৎকীর্ণ করা ছিল। ভারতের প্রাচীন ভাস্কর শিল্পের পরিচয় স্বরূপ এগুলি সমস্তই সংগৃহীত হ'য়ে এখন নালন্দা প্রত্নশালায় সযত্নে রক্ষিত আছে। এই মঠের প্রশস্ত সোপানশ্রেণী এবং চারিদিকের দেওয়াল বেশ মজবুত কংক্রীটে তৈরী হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় সে যুগের বাস্তুকারেরা কত উঁচু দরের শিল্পী ছিলেন।

৪নং মঠটিতে উল্লেখযোগ্য দুটি ব্যাপার দেখলুম। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় পাশের দেওয়ালে আলো আসবার জন্য ঘুলঘুলি করা আছে। এ জিনিস ভারতের প্রাচীন স্থাপত্যের মধ্যে আর কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। সর্বত্রই দেখি সিঁড়ি অন্ধকার। আর একটি উল্লেখযোগ্য হ'চ্ছে ৪১৩-৪৫৫ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত যিনি গুপ্তসম্রাট ছিলেন সেই মহারাজ কুমারগুপ্তের একটি মুদ্রা পাওয়া গেছে এখানে। নালন্দায় যতগুলি মুদ্রা পাওয়া গেছে এটি তারমধ্যে সবচেয়ে পুরাতন। তারপর ৫নং মঠ। উল্লেখযোগ্য কিছু দেখতে পাওয়া যায় নি। এরপর ৬নং মঠ। এটিও যে একদা দ্বিতল ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সিঁড়িটি থেকে। এই মঠে ইট বিছানো প্রাঙ্গণ দেখতে পাওয়া গেল, আর দেখতে পাওয়া গেল দু'সারি উনুন। বোধকরি ছাত্রদের ও অধ্যক্ষদের রন্ধনশালা ও ভোজনাগার ছিল এটি। অনেকে বলেন এরকম খোলা-মেলা জায়গায় কখনই পাকশালা হ'তে পারে না। খুব সম্ভব এখানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বসনাদি রঞ্জনের জন্য রং জ্বাল দেওয়া হ'ত।

৭নং মঠের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি পাথরের মন্দির ছিল। তার ভিত্তিমূলে ২১১ খানি উৎকীর্ণ করা ভাস্কর্য চিত্র আছে। এই শিলাপটে নানা বিভিন্ন দৃশ্য দেখা গেল। বিবিধ যোগাসনে, বিচিত্র ভঙ্গীতে নানা মানুষ চোখে পড়ল। কিন্নরগণ বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছেন, মকর-মিথুন জল-কেলিরত। অগ্নিদেবতা, কুবের, গজলক্ষ্মী, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতিকে চেনা গেল। জাতকের কাহিনীও কিছু কিছু উৎকীর্ণ রয়েছে, যেমন—একটা নজরে পড়লো—'কচ্ছপ জাতক।' বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন এগুলি ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর ভাস্কর্য কলা।

এরপর আমরা ৮নং মঠে গেলুম। এটি পূর্ববর্ণিত অন্যান্য মঠেরই মতো, কেবল আকারে একটু বৃহৎ এবং দেখতেও খুব জমকালো। এ মঠটিও অন্তত দুবার ভেঙে গড়া হয়েছিল বোঝা যায়।

৯নং মঠের প্রাঙ্গণে ৬টি বড় বড় রংয়ের পাত্র পাওয়া গেছে। এখানে প্রথম দেখতে পাওয়া গেল ভূগর্ভস্থ দীর্ঘ পয়ঃপ্রণালী। ১০নং মঠের বিশেষত্ব হ'ল—এখানে প্রবেশদ্বারের উপর খিলান করা আছে যা অন্য
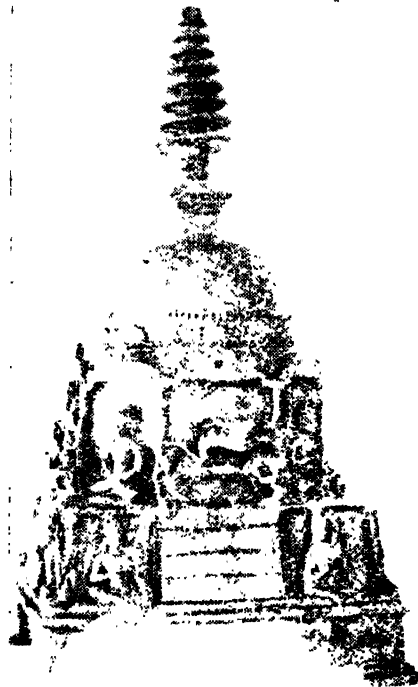
তথাগতের জীবনের অষ্টবিধ বিশেষ ঘটনা উৎকীর্ণ করা বৌদ্ধস্তূপ। স্তূপটি ব্রোঞ্জ ধাতু নির্মিত

কোনটিতে নেই। গাঁথুনি কিন্তু কাদার। আগের মঠগুলিতে চূণবালির গাঁথুনি ছিল। আগের মঠগুলিরও কমবেশী প্রায় সবটাই খুঁড়ে পাওয়া গেছে। কিন্তু ১১নং মঠের বিশেষ কিছু অস্তিত্ব নেই, কেবল ২৫টি ভাঙা থাম যার তলাটা শুধু লেগে আছে ভিত্তি প্রাচীরের উপর। এখানে চূণবালি গোলার অনেকগুলো পাত্র পাওয়া গেছে যার মধ্যে অবশিষ্ট মশলা—বিশেষ করে মাখা চূণবালি শুকিয়ে রয়েছে।

মঠগুলির স্থাপত্যকলা প্রায় সবই একরকমের। হয় সম চতুষ্কোণ, নয়ত রেক্টাঙ্গুলার। ক্ষেত্রের দুদিকে কোথাও বা তিন দিকে সারিবন্দী

ঘর। মাঝে একটি উঠান, উঠানের চারিদিকে ছাত্রদের পাঠকক্ষ, তার সামনে বারান্দা, বারান্দাগুলির ছাদ আবার প্রস্তর স্তম্ভ বা ইটের তৈরী থামের উপর ন্যস্ত। প্রধান প্রবেশদ্বারের সামনেই বিগ্রহ পীঠ। এই পীঠের উপর বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তি থাকতো। ১নং মঠের এক কোণে যেমন একটি জলের কূপ আবিষ্কৃত হয়েছে, তেমনি আরও একাধিক মঠের অঙ্গনে এক কোণে এক একটি কূপ বেরিয়েছে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে নালন্দায় কোনও জলকষ্ট ছিল না এবং প্রত্যেক মঠটি ছিল আত্মনির্ভরশীল। মঠের দেওয়ালে ছিল চূণবালি লাগানো; ঘরের মেঝেয় পাথর বসানো, ইট লাগানো অথবা কংক্রীট করা। এই সারিবন্দি

নালন্দার ত্রৈলোক্য বিজয় মূর্ত্তি (ব্রোঞ্জ্ ধাতু নির্ম্মিত)
(ইনি শিব-পার্বতীকে পদতলে দলিত ক'রে তাণ্ডব নৃত্য করছেন।)
এথেকে হিন্দু ধর্মের প্রতি বৌদ্ধদের বিদ্বেষ সূচিত হচ্ছে।
একটি পাথরে গড়া ত্রৈলোক্যবিজয় মূর্তির ভগ্নাবশেষ
নালন্দার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পাওয়া গেছে

মঠের প্রত্যেকটি প্রবেশদ্বার পশ্চিমমুখী কেবল ১এ এবং ১বি ছাড়া। চৈত্য ও বিহারের প্রবেশদ্বার সবগুলি পূর্ব মুখী! দু'পাশের এই হর্ম্ম্যরাজীর মাঝখানে ছিল প্রশস্ত পথ।

চৈত্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৩নং চৈত্যের উত্তরে আবিষ্কৃত ১২নং চৈত্যটি। এটি যে বিভিন্ন যুগে দু'বার নির্ম্মিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ভিত্তি মূলের দুটি পৃথক স্তরের অস্তিত্ব থেকে। এই স্তূপের দেওয়ালে কতকগুলি কুলুঙ্গী আছে; এবং দেওয়ালেও নানা কারুকার্য করা। প্রত্যেক কুলুঙ্গীর মাথাটি নানা আকারের মন্দিরের চূড়ার মতো; দু'পাশে দুটি ফুলকাটা থাম এবং নীচের দিকটিতে চৌকীর পায়ার মতো কাজ করা। কাজেই কুলুঙ্গীগুলি দেখতে ভারি সুন্দর। এই সব কুলুঙ্গীর মধ্যে নাকি প্রত্যেকটিতে একদা কোনও না কোন দেব-দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন দু'একটি ছাড়া সেগুলির আর চিহ্ন নেই। উত্তরে ও দক্ষিণে দুটি চৈত্য আবিষ্কৃত হয়েছে যে দু'টির ভিত্তি মূলের দৈর্ঘ ১৭০ ফুট ও ১৫০ ফুট। শোনা যায় এখানে নাকি চূণবালির তৈরী দুটি বিরাট বুদ্ধ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

আরও উত্তরে ১৩নং চৈত্য পাওয়া গেল। এটির বড্ড ভগ্ন অবস্থা, কিন্তু এর দেওয়ালে যে কারুকার্য উৎকীর্ণ করা আছে তা সত্যই বিস্ময়কর। এই চৈত্যের পূর্ব দিকের প্রাঙ্গণে সম্ভবতঃ বিগ্রহপীঠ ছিল একটি। এখন আর তার কোনও চিহ্ন নেই। তবে আশে পাশে কতকগুলি মানসিক করা স্তূপ রয়েছে দেখা গেল। এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও দ্রষ্টব্য বস্তু হ'ল ধাতুনির্মিত মূর্তি গড়বার জন্য বিশেষ ধরণের কয়েকটি চুল্লী পাওয়া গেছে।

১৪নং চৈত্য দেখতে গিয়ে চোখে পড়লো একটি মূর্তির ভগ্নাবশেষ-পাদপীঠ মাত্র এবং কিছু রঙীণ ছবির টুকরো। এজিনিস একমাত্র অজন্তা ছাড়া ভারতের আর কোথাও দেখা যায় না। এই যে ভগ্ন পাদপীঠ—বিশেষজ্ঞেরা বলেন এর উপর তথাগতের এক প্রকাণ্ড দণ্ডায়মান মূর্তি ছিল।

নালন্দার চতুর্দিকে আরও অসংখ্য দেখবার, শেখবার ও জানবার মতো বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে, যা দেখে বোঝা যায় ভারতবর্ষ একদিন সভ্যতার কত উচ্চস্তরেই না উঠেছিল। জ্ঞানে বিজ্ঞানে স্থাপত্যে ভাস্কর্য্যে চিত্রকলায় ভারত বোধকরি গুপ্তযুগ থেকে পাল যুগ পর্যন্ত জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল।

মৃত্তিকা প্রস্তর চূণবালি ও ইটের গাঁথনি এখানে পর পর দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ স্থাপত্য শিল্পের ক্রমোন্নতির প্রায় সকল স্তরই এই একটি জায়গায় বিদ্যমান রয়েছে। নালন্দার সবচেয়ে বড় একখানি ইটের আকার দৈর্ঘে ১৭ ইঞ্চি, প্রস্থে ১২ ইঞ্চি এবং পুরু তিন ইঞ্চি। আজকের দিনের ইট পুরু তিন ইঞ্চিই আছে বটে, কিন্তু দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৭ ইঞ্চি করে হ্রাস পেয়েছে। বোধকরি সেদিনের মানুষের আকৃতির চেয়েও আজকের মানুষরাও দৈর্ঘে ও প্রস্থে অনেক হ্রাস পেয়েছে। ১৭ × ১২ মাপের ইট নিয়ে দেওয়াল গাঁথবার হিম্মৎ আজকের কোনও মিস্ত্রীরই নেই এবং সেই ইট বয়ে এনে দেবার মজুরও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

(ক্রমশঃ)

খোশবাগের বাঘ

অধ্যাপক শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

মুর্শিদাবাদের কিছু দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে খোশবাগ। এখানে একটী প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যানবাটিকার মধ্যে নবাব আলিবর্দী খাঁ ও হতভাগ্য সিরাজ চিরনিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে। নির্জন সমাধি উদ্যানটি নিবিড় বৃক্ষছায়ায় আবৃত। নিকটে কোনও লোকালয় নাই। অর্ধ মাইল দূরে খোশবাগ ক্ষুদ্র গ্রাম, একটি গোয়ালা পল্লী ও তাহার কিঞ্চিৎ পশ্চিমে নদীর তীরে একটি মুসলমান পাড়া। গোয়ালারা নিকটবর্তী বহরমপুর সহরে দুগ্ধ দধি ছানা মাখন সরবরাহ করিয়া থাকে; মুসলমান পল্লীর অধিকাংশই চাষী গৃহস্থ। শান্ত পরিবেশের মধ্যে তাহাদের অনাড়ম্বর জীবন বেশ কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ তাহাতে বিঘ্নের সৃষ্টি হইয়াছে। খোশবাগের চারিদিক অরণ্যাকীর্ণ; প্রাচীন গৃহসমূহের ভগ্নস্তূপের উপর আগাছার জঙ্গল। এই জঙ্গলে বাঘের আবাস হইয়াছে। রাত্রে গোয়ালে গরু ছাগল মেষ রাখিয়া গৃহস্থের স্বস্তি নাই। বেড়া ভাঙ্গিয়া গরু বাছুর ছাগল লইয়া যাইতেছে। দিনের বেলায়ও গোচারণের মাঠে পালে বাঘ পড়িয়া ছাগল মেষ মুখে তুলিয়া লইয়া যাইতেছে। গৃহস্থের গরু ছাগল প্রভৃতির অনেকগুলিই তাহাদের উদরসাৎ হইয়াছে। সংবাদ পাইয়া একদিন আমরা দুই বন্ধুতে সেখানে উপস্থিত হইলাম।

আমাদের শিকার প্রণালী একটু অভিনব Un-orthodox। সাধারণতঃ মড়ি (Kill)র উপর বসিয়া বৃক্ষ শাখায় মাচান বাঁধিয়া শিকার করা হয়। অথবা Beat করিয়া বাঘের সন্ধান পাইলে যে জঙ্গলে উহা অবস্থান করিতেছে তাহা লোকদ্বারা ঘিরিয়া ফেলা হয়। জঙ্গলের একদিকে বৃক্ষলতাবিরল স্থানে মাচানে অথবা কোনও উচ্চ-ভূমিতে শিকারী অপেক্ষা করিতে থাকে। Beaterএর দল অপরদিক হইতে নানারূপ শব্দ করিতে করিতে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে জঙ্গল ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। তাড়া খাইয়া বাঘ শিকারীর অভিমুখে অগ্রসর হয় ও তাহার দৃষ্টিপথে পড়িলেই গুলিবিদ্ধ হয়। হস্তীদ্বারাও অনেকে জঙ্গল Beat করাইয়া থাকেন। ১০।১২টী হাতী দিয়া জঙ্গলটা ঘিরিয়া হাওদাপৃষ্ঠে শিকারী জঙ্গল ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইতে থাকে ও পলায়নপর ব্যাঘ্র নয়নগোচর হইলেই গুলি করা হয়। এই দুই প্রকার শিকারই বিশেষ ব্যয়-সাধ্য। মহারাজা রাজা জমিদারগণেরই সাধ্যায়ত্ত। আর দুইক্ষেত্রেই অভিজ্ঞ Beaterএর প্রয়োজন। মধ্যবিত্ত শিকারীর পক্ষে সাধ্যাতীত। আমরা নিজেদের সামর্থ্যোপযোগী উপায় অবলম্বন করিয়া থাকি। ব্যয় কিছুই নাই বলিলে চলে। Bait এ ছাগল বা মেষ বাঁধিয়া অথবা মড়ি (kill)র নিকট ঝোপের মধ্যে গরুর গাড়ীর ছই প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। ছইখানি শাখাপল্লবে সম্পূর্ণ আবৃত করা হয়, বাঘে উহার অস্তিত্ব যেন বুঝিতে না পারে। ছইএর সম্মুখভাগে ৬'' ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৪।৫'' ইঞ্চি প্রস্থ একটী ফাঁক থাকে। ঐ রন্ধ্র পথে ছইএর মধ্য হইতে Bait অথবা মড়ি দেখা যায় ও Bait বা মড়ির নিকট বাঘ আসিলে গুলি করা হয়। অবশ্য এরূপ শিকারে বিপদের আশঙ্কা কিছু থাকে। তবে সমস্তই শিকারীর সাহস, তৎপরতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের উপর নির্ভর করে।

আমরা সংবাদ পাইয়াছিলাম যে সেদিন বেলা ৯টার সময় পল্লীসংলগ্ন পুষ্করিণীর পাড়ে ব্যাঘ্রের গর্জন শোনা গিয়াছে। উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে পুষ্করিণীর একটী পাড়ের কিয়দংশে জঙ্গল রহিয়াছে, অপর পাড়গুলি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। তবে কিছুদূরে একটী কবরখানা আছে ও সে স্থানটী স্যাওড়া প্রভৃতির জঙ্গলে আচ্ছন্ন। ব্যাঘটি ওখানেই আশ্রয় লইয়াছে অনুমান করিয়া নিকটবর্তী নগরেই গাড়ীর ছই পাওয়া গেল ও ডালপালা দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া সম্মুখে ১০।১২ হাত দূরে একটি মেষ বাঁধিয়া দিলাম। আয়োজন করিতেই সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। আমরা তাড়াতাড়ি ছই এর মধ্যে প্রবেশ করিলাম ও লোকজন প্রস্থান করিল। পুষ্করিণীর পাড় হইতে নামিয়া তাহারা অন্তর না যাইতেই বাঘটি আসিয়া ছাগলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। আমি বন্দুকটি তুলিয়া গুলি করিলাম; বাঘটী নক্ষত্রবেগে পলাইয়া গেল ও অল্প কিছুক্ষণ পরেই তাহার মুমূর্ষু আর্তনাদ শোনা গেল। ছই হইতে বাহির হইয়া আশে পাশে অনুসন্ধানে বুঝিলাম যে বাঘটী কবরখানার জঙ্গলেই প্রবেশ করিয়াছে। বনের মধ্যে রাত্রে প্রবেশ করা নিরাপদ নহে। পরদিন প্রাতঃকালে জঙ্গল হইতে বাহির করিয়া আনিলে দেখা গেল বাঘটী প্রায় ৭½ ফুট লম্বা।

পূর্বেই বলিয়াছি যে খোশবাগের জঙ্গলে বাঘ একটী নহে এবং উহাদের উপদ্রব কেবল খোশবাগেই আবদ্ধ নহে। বাঘে এক রাত্রে ৩০ মাইল লইয়া চরাই করিয়া থাকে ও খোশবাগের আশে পাশে ৫।৭ খানি গ্রামেই উহাদের উৎপাত হইতেছে। ইহার ২ মাইল দক্ষিণে জ্যালীশ পাড়া গ্রাম। এককালে বেশ বর্দ্ধিষ্ণু ছিল। রেশমবস্ত্র বয়নের ইহা একটী কেন্দ্র ছিল। বহু সমৃদ্ধ তন্তুবায়ের বাস এখানে ছিল। রেশম-শিল্পের অবনতির সহিত গ্রামের শ্রীও অন্তর্হিত হইয়াছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জঙ্গলাকীর্ণ ইষ্টকস্তূপ ইহার প্রাচীন সমৃদ্ধির সাক্ষ্য এখনও দিতেছে। আচার্য প্রভুর কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর পাট এখানে ছিল। সুবৃহৎ কারুকার্য শোভিত মন্দির, প্রশস্ত নাটমন্দির আজ সবই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। যে দেবালয় প্রাঙ্গণ এককালে ভক্ত সমাগমে সর্বদা মুখরিত থাকিত তাহা আজ শ্বাপদের আবাসে পরিণত হইয়াছে। সেদিন সন্ধ্যার

পূর্বে নিকটবর্তী আম বাগান হইতে একটী গোবৎস বাঘে লইয়া যায়। পরদিন প্রাতে অনুসন্ধান করিয়া দেখি যে মন্দিরের প্রাচীর-সংলগ্ন ঝোপে উহা অর্দ্ধভুক্তাবস্থায় পড়িয়া আছে। মড়ির নিকট বসিবার উপযুক্ত স্থানাভাবে আমরা বৈকালে মন্দিরের ভগ্ন প্রাচীরের উপর বসিবার ব্যবস্থা করিলাম। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই কাল বৈশাখীর বৃষ্টি ঝড় আরম্ভ হইল। সর্বাঙ্গসিক্ত হইয়া রাত্রি ৮টায় নামিয়া আসিলাম। পরদিন গিয়া দেখি যে রাত্রে বাঘ আসিয়া আহার করিয়াছে ও মড়িটি টানিয়া লইয়া গিয়াছে। গাছের ছই পাতিয়া বসিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ছইএর মধ্যে পাতিবার জন্য তক্তা আনিতে দুইজন লোক বাগানের একটী ঘরের দরজা খুলিতেই ভিতর হইতে ব্যাঘ হুঙ্কার দিয়া উঠিল ও নিমেষে ভগ্নবাতায়নপথে বাহির হইয়া নিকটস্থ আমবাগানে প্রবেশ করিল। পূর্বরাত্রে বৃষ্টিতে সব ভিজিয়া যাওয়াতে বাঘটী এই নির্জন ঘরে আশ্রয় লইয়াছিল। যাহা হউক ছইখানি শাখাপত্রে ঢাকিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সন্ধ্যার অপেক্ষা করিতেছি। একটী শৃগাল আসিয়া মড়ি টানাটানি করিতে লাগিল। আগেই একটি রজ্জু দিয়া মড়িটী একটি গাছের শিকড়ের সহিত দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রজ্জুটী লতাপাতায় ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এরূপ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন। মড়ি যে অবস্থায় (position) রাখিয়া গিয়াছে তাহার কোনও পরিবর্তন দেখিলে বাঘ আর সে মড়ির নিকট আসে না। রাত্রি ৮।৩০ পর শৃগালটী তড়িৎগতিতে পলায়ন করিল। বুঝিলাম যাহার প্রতীক্ষা করিতেছি তাহার শুভাগমন হইয়াছে। মিনিট পনের পর ঝোপের মধ্য দিয়া বাঘটি অতি সন্তর্পণে মড়ির দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিছুদূর আসিলে যেন তাহার দ্বিধার ভাব লক্ষিত হইল, দুই পা পিছাইয়া গেল। শৃগালের টানাটানিতে মড়ির পূর্বাবস্থার কিছু পরিবর্তন হওয়ায় বোধ হয় তাহার সন্দেহ হইয়াছিল। শৃগালের গায়ের গন্ধ পাইয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলে পুনরায় অগ্রসর হইল। মড়ির নিকট আসিয়া দাঁড়াইতেই বন্ধুবর হ— গুলি করিলে বাঘটি সেখানেই পড়িয়া গেল। এটি দৈর্ঘ্যে ৮ ফুটেরও কিছু বেশী।

পরপর দুইটি বাঘ নিহত হইলেও খোশবাগের উপদ্রব কিছু কমিল না। সেদিন রাত্রে গোশালা হইতে একটি ছাগল বাঘে লইয়া যায়। ছাগলটি ওজনে অর্দ্ধ-মনেরও বেশী। কিন্তু উহা বাঘে মুখে তুলিয়াই লইয়া গিয়াছে, টানিয়া লইয়া যাওয়ার কোন চিহ্ন কোথাও দেখিলাম না। বুঝিলাম বাঘটি বিশেষ বৃহৎ ও শক্তিশালী। অনুসন্ধানে জানিলাম যে প্রাতঃকালে দূরে একটি ঝোপের মাথায় ৫।৭টি কাক খুব কোলাহল করিতেছিল। দুই খণ্ড জমীর মধ্যে একটি অপ্রশস্ত নালা, নিকটে একটি জলা। জলার ধার হইতে নালা পর্যন্ত আগাছার জঙ্গল ও নালাটি লম্বা ঘাসে আচ্ছন্ন। সেই ঝোপের মধ্যেই অর্দ্ধভুক্ত ছাগলের সন্ধান পাওয়া গেল। মড়ির নিকট হইতে মাত্র ৫।৬ হাত দূরে ছইপাতা হইল। এত নিকটে বসা খুব নিরাপদ নহে; কিন্তু দূরে বসিতে হইলে গুলির পথ করিবার জন্য জঙ্গল কাটিতে হইত ও তাহাতে বাঘের সন্দেহ জন্মিত। সূর্যাস্তের পূর্বেই দুই বন্ধুতে ছইএর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ক্রমে গাঢ় অন্ধকার নামিয়া আসিল। নিকটস্থ মড়িটিও আর দেখা যায় না। আশেপাশের ঝোপে কোনও জন্তুর অতি সন্তর্পণে চলাফেরা অনুমান করিতে পারিতেছিলাম। শীতের রাত্রি ৮টা অতিবাহিত হইল। ব্যাঘ্রপ্রবরের আগমন সম্বন্ধে ক্রমেই সন্দিহান হইয়া উঠিতেছি। এমন সময় পার্শ্বের জমিতে বাঘের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইলাম ও ১০।১২ মিনিট পর বাঘটি আসিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। অতি সাবধানে ছইএর রন্ধ্রপথে বন্দুকের নলটি বাহির করিয়া টর্চের বোতামে হাত দিতেই উজ্জ্বল আলো জ্বলিয়া উঠিল। আহার-নিরত বৃহদাকার বাঘটী মুখ তুলিয়া চাহিতেই উহার বক্ষঃস্থলের শুভ্র রোমরাজি লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলাম। বাঘটির সারাদেহ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল ও নিমেষ মধ্যে আমাদের ছইএর দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বন্ধুবর হ— গুলি করিতেই বাঘটী ১০।১২ হাত দূরে গিয়া পড়িয়া গেল। পরে দেখিয়াছি প্রথম গুলিটি হৃদপিণ্ড ও অন্ত্র ভেদ করিয়া গিয়াছে। তবুও বাঘটি Charge করিতে পারিয়াছিল। এটি দৈর্ঘ্যে ৮½ ফুট ছিল। ইহার পূর্বে এত বড় বাঘ আর এ অঞ্চলে মারা পড়ে নাই।

খোশবাগে কিন্তু শান্তি ফিরিল না। এক ব্যাঘ্র দম্পতীর উৎপাতে লোকে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। একমাসের মধ্যে ৬।৭টি গোবৎস, ছাগ ও মেষ তাহাদের উদরসাৎ হইল। একদিন Beit বাঁধিয়া বসিয়াও কিছু সুবিধা করিতে পারি নাই। বাঘ আমাদের সম্মুখীন হইল না। ইহার সব 'মার'গুলিই বেলা ৩।৪টার মধ্যে হইয়াছিল। রাত্রে বাঁধা ছাগল দেখিয়া বিপদ অনুমান করিয়া নধর ছাগমাংসের লোভও ত্যাগ করিল। যাহা হউক কয়েকদিন পর রাত্রে গোয়াল হইতে একটি বড় বাছুর লইয়া গেল। আমরাও মড়ির নিকট পূর্বের মত ছই পাতিয়া বসিলাম। সূচীভেদ্য অন্ধকারে, একহাত দূরের জিনিষও দেখা যায় না। লতাপাতার স্থানচ্যুত হওয়ার সামান্য শব্দের উপর নির্ভর করিয়া বাঘের চলাফেরা অনুমান করিতে হইতেছিল। একবার মনে হইল কিসে যেন মড়ি টানিতেছে। টর্চের আলো ফেলিতেই দেখি যে ঝোপের মধ্যে বাঘটি সরিয়া যাইতেছে। সম্মুখের ডালপালায় গুলি বাধা পাইবে; টর্চ নিবিল। এই ক্ষণিকের আলোকরেখা উহাকে আমাদের অবস্থিতি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেবে কিনা এই সন্দেহ মনে জাগিয়া থাকিল। আশায় অপেক্ষা করিতেছি। ১৫।২০ মিনিট পর হঠাৎ দেখি যে আমার চোখের সম্মুখে হাতখানেক দূরে কে যেন একটি সাদা পর্দা টানিয়া দিয়াছে। ঐ অন্ধকারেও উহা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। বুঝিলাম যে বাঘটা আসিয়া ওখানে দাঁড়াইয়াছে। উহার উদর বক্ষঃ ও পায়ের সাদা লোমরাজি অন্ধকারের পটভূমিকায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এ অবস্থায় গুলি করা নিজের বিপদ সুনিশ্চিত টানিয়া আনা। ট্রিগারে হাত দিয়া নিস্তব্ধ ভাবে রহিলাম যেন নিশ্বাসও পড়িতেছিল না। মিনিটখানেক কাটিতেই পর্দা অন্তর্হিত হইল। বাঘটি মড়ির দিকে আগাইয়া গিয়াছে। তখন অনুমানে লক্ষ্য স্থির করিয়া আলো জ্বালিতেই দেখি মড়ি হইতে অল্পদূরে গাছের অন্তরালে উহার গায়ের spot (গুল) দেখা যাইতেছে। গুলি করিলাম, টর্চটী

বন্দুকের নল হইতে পড়িয়া গেল। কি ঘটিল দেখিতে পাইলাম না। অল্পক্ষণ পরেই কিছুদূরে উহার মরণ আর্তনাদ ৩,৪ বার শোনা গেল। রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে অনুসন্ধান করা যুক্তিযুক্ত হইল না। পরদিন প্রাতে বন হইতে বাহির করিলে দেখিলাম যে আমাদের শিকার-করা বাঘের মধ্যে এটীই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রায় ৯ ফুট। খোশবাগে ইহার পরও বাঘের উপদ্রব হইয়াছে। স্থানীয় লোক বলে যে এখনও ২।৩টী বাঘ আছে।

এই কয়েক বৎসর মধ্যে বাঘের উপদ্রব যেন কিছু বাড়িয়াছে। সহরের উপকণ্ঠে হানা দিতে উহারা ত্রুটী করে না। গত বার জজকোর্ট হইতে দুই ফার্লং দূরে এক পল্লী হইতে ছাগল লইয়া যায়। সংবাদ পাইয়া দুই বন্ধুতে গিয়া দেখি যে অড়হর ক্ষেতের নীচে এক নালাতে মড়িটি রাখিয়া গিয়াছে। সে পল্লীতে গরুর গাড়ীর ছই পাওয়া গেল না। মড়ির নিকট মাচান বাঁধিবার কোনও গাছ নাই। অড়হর জমীর প্রান্তে নালার ঠিক উপরে একটা খাগড়াগাছের ঝোপে দুই বন্ধুতে আশ্রয় লইলাম। প্রথম রাত্রে ২ একটী শৃগাল মড়ির আশে পাশে ঘোরা-ফেরা করিতে লাগিল; কিন্তু রাত্রি ১টার পর তাহারা দূরে সরিয়া গেল। অনুমানে বুঝিলাম বাঘটী নিকটে কোথাও অপেক্ষা করিতেছে কিন্তু মড়ির নিকট অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করিতেছে। জানিনা কি কারণে উহার সন্দেহ জন্মিল। আমরা মড়ি স্পর্শ করি নাই। যে অবস্থায় (position) রাখিয়া গিয়াছিল সেই অবস্থায়ই আছে। যাহা হউক নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতেছি। অষ্টমীর চন্দ্রমা ক্রমে পশ্চিমে লীন হইয়া অস্তমিত হইল। নিবিড় অন্ধকার ধরণীর বুকে নামিয়া আসিল। মড়িটী আর দেখা যায় না। হিমে সেই অনাবৃত স্থানে বসিয়া থাকাও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। বন্ধুবর হ— বলিলেন যেন বামদিকে বাঘের পায়ের শব্দ শোনা গেল। সেদিকে লক্ষ্য করিয়া টর্চের বোতামে হাত দিতেই সুস্পষ্ট আলোকে দেখি যে ১৫।১৬ হাত দূরে একদৃষ্টে মড়ির দিকে চাহিয়া বাঘটী দাঁড়াইয়া আছে। গুলি করিতেই ছুটিয়া অড়হর ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল ও তাহার পরই উহার মুমূর্ষু আর্তনাদ শোনা গেল। বাঘটী ৭½ ফুট হইবে।

Bait—অপেক্ষা মড়িতে বাঘের আসার সম্ভাবনা অনেক বেশী। গরু বা ছাগল মারিয়া উহা খাইয়া নিঃশেষ করিতে না পারিলে ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া যায় ও পরদিন সন্ধ্যায় আসিয়া উহার সদ্ব্যবহার করে। কিন্তু কোন কারণে সামান্য সন্দেহ হইলে আর ঐ মড়ি স্পর্শ করিতে আসে না। একবার একটী দুগ্ধবতী গাভী বাঘে মারিয়াছে সংবাদ পাইয়া আমরা যাই ও মড়ির নিকট আম্র বৃক্ষের শাখায় মাচান বাঁধিয়া আমরা অপেক্ষা করিতেছিলাম। তখন শরৎকাল। স্নিগ্ধ কৌমুদী ধারায় স্নাত হইয়া প্রকৃতি অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়াছে। শাখার অন্তরালে দূরে একটী ঝিলের এক অংশ দেখা যাইতেছে। মৃদু বায়ুহিল্লোলে আলোড়িত বীচিমালার উপর রজত কিরণ প্রতিফলিত হইয়া অপরূপ শোভার সৃষ্টি করিয়াছে। পল্লীর শ্রান্ত কর্মকোলাহল বহু পূর্বেই সুপ্তি সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। প্রকৃতির এই শান্ত সৌন্দর্য-সুষমা মন যেন কেমন আবিষ্ট করিয়াছিল। এই ব্যাধবৃত্তি হইতে উহা যেন দূরে সরিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ ব্যাঘ্রের গর্জনে সজাগ হইয়া উঠিলাম। বাঘটি আশে পাশে বহুক্ষণ ডাকিয়া দূরে চলিয়া গেল। পর পর আরও দুই রাত্রি ঐ মড়ির উপর বসিলাম, কিন্তু বাঘ মড়ির নিকট অগ্রসর হইল না। তৃতীয় দিন একটী তথ্য আবিষ্কৃত হইল। সেদিনও একটা বাঘ আসিয়া আশেপাশে ডাকিতেছিল। রাত্রি ১২টার সময় দূরে আর একটী বাঘের গর্জন শোনা গেল। এটী তাহার উত্তর দিলে দ্বিতীয়টী আরও নিকটবর্তী হইয়া আবার গর্জন করিল; এটী প্রত্যুত্তর দিল। এইরূপে কয়েকবার ডাকাডাকির পর—দ্বিতীয়টী আসিয়া প্রথমটীর সহিত মিলিত হইল। আমরা আশা করিতেছিলাম যে এইবার যুগলে আসিয়া মুখরোচক আহার্যের সদ্ব্যবহার করিবে। কিন্তু আমাদিগকে হতাশ হইতে হইল। দুইটিতে বহুক্ষণ গর্জন করিলেও মড়ির ত্রিসীমানায় অগ্রসর হইল না। প্রথমদিন আমরা সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার পর মাচান বাঁধিয়াছিলাম ও বাঘটি বোধ হয় কোথাও থাকিয়া সমস্তই লক্ষ্য করিয়াছিল ও সেজন্যই মড়িতে আসে নাই।

মুর্শিদাবাদের পূর্বাঞ্চলের গ্রামগুলি ক্রমশই শ্রীহীন জনবিরল হইয়া পড়িতেছে। এই অংশ নদীবহুল ছিল। ভৈরব জলঙ্গী প্রভৃতি নদী পদ্মা হইতে বাহির হইয়া ইহাকে শতধা খণ্ডিত করিয়া প্রবাহিত হইত। এই সব জলপ্রণালী একদিকে যেমন সেচের সুবিধা করিয়া কৃষিকার্যের সহায়তা করিত, অন্যদিকে বৃষ্টির জলনিকাশের ব্যবস্থা করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান করিত। জলপথে বাণিজ্যের প্রসারেরও সাহায্য হইত। আজ এই নদীগুলির অধিকাংশই মজিয়া গিয়াছে, গ্রাম ম্যালেরিয়ায় জনশূন্য হইয়াছে ও অরণ্যের অধিকার ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। এককালের বর্ধিষ্ণু গ্রাম আজ শ্বাপদের আবাস-ভূমিতে পরিণত। শঙ্করপুর এইরূপ একটা গণ্ডগ্রাম ছিল—সেখানে দুইটী রেশম কুঠি,—বামারপাড়া, কুমারপাড়া, ময়রাপাড়া প্রভৃতি বিভিন্ন পাড়া; চার পাঁচশত ঘর লোকের বাস। গ্রামের পার্শ্ব দিয়া একটী স্বল্পপরিসর কিন্তু সুগভীর স্রোতস্বিনী প্রবাহিত ছিল। নদীটী মজিয়া গিয়াছে, ম্যালেরিয়ায় গ্রাম প্রায় জনশূন্য। প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা পড়িয়া আছে, আর আম কাঁঠালের বাগানগুলি আজ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া ব্যাঘ্রের আবাসভূমি। তাহাদের উৎপাতে গ্রামের লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা দুই বন্ধুতে একদিন তথায় উপস্থিত হইলাম। গোয়ালপাড়ার নিকটে বাঘের যাতায়াতের পথের পাশে ছই পাতা হইল। কয়েক দিন পূর্বেই বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সম্মুখের জমিতে দুই তিনটী বাঘের পদচিহ্ন (pug marks) সুস্পষ্ট রহিয়াছে। Bait এর জন্য ছাগল আনিতে গিয়াছে, আমরা দুই বন্ধুতে ছই এর বাহিরে গল্প করিতেছি। এমন সময় নিকটবর্তী আম্রকাননে দুইটা বাঘের গর্জন উপর্যুপরি শোনা গেল। ইহার পরই আম্রবাগানের দিক হইতে দুইটা গরু প্রাণপণে ছুটিয়া আসিয়া আমাদের পাশ দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিল। সম্ভবতঃ উহাদের বাঘে তাড়া করিয়াছিল। ছাগল বাঁধিয়া দিতেই আমরা ছই এর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মিনিট কয়েক পরেই একটী বাঘ আসিয়া ছাগলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেই বন্ধুবর হ—গুলি করিলেন। বাঘটীর ইহলীলার অবসান হইল। এটীও ৮ ফুটের কম নহে।

পূর্বে জমিদারদিগের অনেকেরই শিকারের সখ ছিল। আর তাঁহাদের সাহচর্যে তাঁহাদের বন্ধুগণেরও manly sports এর অনুশীলনের সুযোগ মিলিত। এক্ষণে কলিকাতা বাস, মোটর বাড়ী ও রেডিও আভিজাত্যের একমাত্র নিদর্শন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে শিকার ব্যসন পর্যায়ে নির্বাসিত। আমরা দেশে martial spirit পুনর্জাগরুক করিবার জন্য Rifle club প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার কথা অনেকেই বলিয়া থাকি। দেশের শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ শিকারের অনুশীলনে উৎসাহ দিলে অনায়াসেই সুফল ফলিতে পারে।

মহাপুরুষ—শিবানন্দ

স্বামী পূর্ণানন্দ

বর্ত্তমান সভ্য ও সুশিক্ষিত জগৎ-জন-সমাজে সুপরিচিত "রামকৃষ্ণ মঠ" ও "মিশনের" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর সহকর্মী ছিলেন তাঁরই মহাসাধক ও শক্তিমান গুরুভ্রাতাগণ। এই মঠ ও মিশনের মহাপুণ্যকেন্দ্র বেলুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৯৮ সালের ৯ই ডিসেম্বর। এই দিনই স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র দেহভস্মাস্থিপূর্ণ "আত্মারামের কৌটা" নব বেলুর মঠের মন্দিরে নিজে মাথায় বহন করে' এনে প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ মুখেই একদিন স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন, "তুই মাথায় করে' নিয়ে গিয়ে আমায় যেখানে রাখবি, আমি সেখানেই থাকবো। সুতরাং এই মঠেই যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর দেবদেহে নিরন্তর বাস করছেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

এই পুণ্য ও সদা জাগ্রত দেবস্থানের গঠনে, রক্ষণে ও উন্নতিসাধনে যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের আজ্ঞাবাহী যন্ত্ররূপে নিযুক্ত হন, স্বামী শিবানন্দ তাঁদেরই অন্যতম। স্বামী শিবানন্দ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দ্বিতীয় প্রেসিডেণ্ট বা সর্ব্বাধ্যক্ষ।

স্বামী শিবানন্দ শুধু সঙ্ঘের সর্ব্বাধ্যক্ষরূপেই খ্যাতি অর্জন করেন নি। তিনি সর্ব্বজনের দ্বিধাশূন্য শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করেছিলেন—তাঁর অবিচলিত গভীর ভগবৎপ্রীতি, ঈশ্বর লাভের জন্য কঠোর সাধনা, মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা ও সহানুভূতি, গুণীমাত্রের গুণগ্রহণে ও সমাদরে অকুণ্ঠিত ভাব এবং সর্ব্বক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে নরনারীকে অনুপ্রাণিত করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা প্রভৃতি মহৎ গুণের জন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সার্থকতা দেখতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মভাবহীন, বিশ্বাসহীন, দুর্গত মানুষের সমাজে প্রত্যক্ষ সাধনার ও ভগবৎ কৃপালাভের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণের স্বহস্তে সুগঠিত জীবন যাঁরা লাভ করেছিলেন, সেই ব্রহ্মানন্দ, বিবেকানন্দ, প্রেমানন্দ, সারদানন্দ, অখণ্ডানন্দ, বিজ্ঞানানন্দ প্রভৃতির অন্যতম ছিলেন এই শিবানন্দ। এই শিবানন্দ সমগ্র রামকৃষ্ণসঙ্ঘে ও ভক্তসমাজে "মহাপুরুষ" মহারাজ নামেই ছিলেন সুপরিচিত। অবশ্য আজও তিনি এই "মহাপুরুষ" নামেই জনসমাজে পরিচিত হয়ে আছেন এবং চিরদিনই তাঁর এই "মহাপুরুষ" নাম জনসমাজকে অনুপ্রেরণা দান করবে বলেই মনে হয়। এই "মহাপুরুষ" নামের একটি অতি চিত্তাকর্ষক ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। একদিন বলরামবাবুর বাড়িতে বসে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা প্রসঙ্গে বলেন, "এক ঠাকুরই ছিলেন কামজিৎ। নইলে, বিবাহিত জীবনে কামজিৎ পুরুষ জগতে বিরল।" এই কথা শুনে শিবানন্দ বললেন—"তা কেন, ঠাকুর আমার ভেতর এমন শক্তি সঞ্চার করেছিলেন যে, তার বলে আমিও কাম জয় করতে পেরেছি। তাঁর কৃপায় সবই সম্ভব।" এই কথা শুনেই বিবেকানন্দ সবিস্ময়ে বললেন, "তাহলে তো আপনি "মহাপুরুষ"!" সমবেত গুরুভ্রাতাগণ এবং স্বামীজি এত বিস্মিত ও চমৎকৃত হলেন যে, সেইদিন থেকেই স্বামী শিবানন্দকে গুরুভ্রাতাগণ ও মঠবাসী সকল সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ সকলেই পরম শ্রদ্ধাভরে "মহাপুরুষ" বলে সম্বোধন করতে আরম্ভ করেন। আজও সেই নামেই শিবানন্দের পরিচয় চলে আসছে জনসমাজে।

স্বামীজির উচ্চারিত মহা মহেন্দ্রক্ষণের এই "মহাপুরুষ" নাম শিবানন্দের সাধক জীবনে, জ্বলন্ত বাসনা ত্যাগে, সংসারের প্রতি তাঁর বৈরাগ্যে, সর্ব্বপ্রাণী প্রেমে ও ভগবৎ অনুভূতিতে, অক্ষরে অক্ষরেই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এমন একজন মহাযোগীর এমন সত্যানুসন্ধিৎসু কামজয়ী সাধকের প্রেমপূর্ণ জীবন আজকের অশান্তিময় চরিত্রবলশূন্য বাংলায় বহুল প্রচারের ও আলোচিত হবার প্রয়োজন—অনেক দেশব্রতী ও মানব কল্যাণসাধকের অনুভূত হয়ে আসছিল, বহুদিন ধরে'।

আজ বিশেষ আনন্দের সঙ্গেই দেখছি, সে অভাব বিশেষ ভাবেই পূরণ করতে চেষ্টা করেছেন, স্বামী শিবানন্দেরই একনিষ্ঠ সেবক, একান্ত ভক্ত শিষ্য,—স্বামী অপূর্ব্বানন্দজি তাঁর বহুকষ্টে সংগৃহীত "মহাপুরুষ শিবানন্দ" নামক জীবনীখানা প্রকাশ করে। জীবনীখানা ৩২০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে। সুতরাং নিতান্ত ক্ষুদ্রও বলা চলে না। আর এই বইখানার বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, বইখানি আগাগোড়া পরম শ্রদ্ধাভরে—জাগ্রত চেতনায়—অতি যত্নে গ্রথিত করেছেন লেখক, তাঁর নিজের চোখে দেখা ও কানে শোনা ঘটনা ও কথা থেকেই। এর মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা, অতিরঞ্জন, বা মিথ্যা প্রচারের চেষ্টা মোটেই হয় নি। শিবানন্দের অপূর্ব সাধনার কথা এবং অসাধারণ মানবপ্রেম ও মানবকল্যাণ সাধনের অতুলনীয় চেষ্টাকে ভাষার সহায়ে সত্যকার রূপদানের চেষ্টাই লেখক যথাসাধ্য করেছেন। এজন্য লেখক এবং প্রকাশক স্বামী আত্মবোধানন্দ উভয়েই জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ। উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং বাগবাজার থেকে সকলেই অতি সহজে বইখানা সংগ্রহ করে' পড়ে দেখতে পারেন।

অতি সুন্দর প্রচ্ছদপট, গ্রন্থের আকার, শিবানন্দের সাধক জীবন থেকে আরম্ভ করে' দেহাবসান পর্য্যন্ত ছয়খানি অতি সুস্পষ্ট চিত্র এবং ছাপা বাঁধাইএর তুলনায়, বর্ত্তমান বাজারের কথা ভাবলে, মাত্র সাড়ে তিন টাকা দাম, কোন ধর্ম্মপ্রাণ সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছেই অত্যধিক বলে মনে হবে না।

আমরা শুধু এই অভিনব "মহাপুরুষ শিবানন্দ" জীবনীখানার বহুল প্রচারই কামনা করছি না। এই গ্রন্থপাঠে দেশের যুবা বৃদ্ধ—নর ও নারী সকলেরই অশেষ কল্যাণ সাধিত হোক্, এইটিই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

১৯৩২ সালেই কুমিল্লা গুপ্তচর হত্যার ষড়যন্ত্র ও ইটাখোলা ট্রেণ লুঠ মামলা হইয়াছিল। কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জে একজন গুপ্তচরকে হত্যা করিবার জন্য একটি ষড়যন্ত্র হয়। এই সম্পর্কে অভিযুক্ত হন—বিরাজ দেব নামক জনেক বিপ্লবী এবং বিচারে তাঁহার প্রতি প্রদত্ত হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড। আসাম প্রদেশের ইটাখোলা নামক ষ্টেশনে ডাকাতির অভিযোগেও তাঁহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ফলে তাঁহাকে সর্বসমেত ৪২ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়।

মিঃ সি এম গ্রাসবী ছিলেন ঢাকার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। তাঁহার উপরে বিপ্লবীরা আদৌ প্রসন্ন ছিলেন না। ১৯৩১ সালের ২৯শে আগষ্ট নবাবপুর রোড দিয়া মোটরে করিয়া যাইবার কালে আততায়ীর গুলিতে তিনি আহত হন। গ্রাসবি সাহেবের দেহরক্ষী আততায়ীকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলে—তিনও আহত হইয়া ধৃত হন, তাঁহার নাম বিনয়ভূষণ রায়। বিচারে তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড লাভ করেন।

Statesman পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ওয়াটসনকে দ্বিতীয়বার আক্রমণের চেষ্টা হয় ঐ বৎসরই ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে। ঐদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার মোটরখানি ঘুরিতে ঘুরিতে যখন ষ্ট্রাণ্ড রোড ও নেপিয়ার রোডের সঙ্গমস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সহসা পশ্চাদ্দিক হইতে আর একখানি মোটর তাঁহাদের গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পড়ে এবং উক্ত গাড়ী হইতে মিঃ ওয়াটসনকে লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। ওয়াটসন সাহেবের গাড়ীর হুড তখন খোলা অবস্থায় ছিল। তাঁহার যে মহিলা ষ্টেনোগ্রাফারটি তখন তাঁহার সঙ্গে গাড়ীতে ছিলেন—তিনি এই বিপদের মুখে যথেষ্ট সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেন। গুলির শব্দ শুনিতে পাইয়াই তিনি ওয়াটসন সাহেবকে অতি দ্রুত গাড়ীর নিম্নদেশে ঠেলিয়া দেন এবং নিজে উপর হইতে তাঁহাকে আড়াল করিয়া রাখেন। বিপ্লবীদের নিক্ষিপ্ত গুলিতে সেই মহিলা ষ্টেনোগ্রাফারটির বামহস্ত জখম হয় এবং গাড়ীর চালকও আহত হয়। ওয়াটসন সাহেব নিজেও আঘাত পান। ইতিমধ্যে একজন সার্জেণ্ট ঘটনাস্থলে আসিয়া আক্রমণকারীদের লক্ষ্য করিয়া গুলি বর্ষণ করিতে থাকিলে বিপ্লবীরা মোটর লইয়া প্রস্থান করেন।

ঘটনার প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে তাঁহাদের গাড়ীখানি মাঝেরহাটে বুড়াশিবতলায় গিয়া উপস্থিত হয়। ননী লাহিড়ী ও গোপাল চৌধুরী নামক দুইজন বিপ্লবী গুলির আঘাতে গুরুতররূপে জখম হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মৃতদেহ পরে ঐ গাড়ীখানি হইতে উদ্ধার করা হয়। দলের অবশিষ্ট বিপ্লবীরা সেখানে গাড়ী ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যান।

প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে থাকিয়া ওয়াটসন সাহেব আরোগ্যলাভ করেন। অতঃপর উক্ত ঘটনার জন্য পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। আলিপুরের স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করিয়া যে মামলা হয়, তাহাতে কয়েকজনের প্রতি কঠোর সাজা হয়। সেই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল হইলে সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড এবং প্রমোদরঞ্জন বসুর দশ বৎসর কারাদণ্ড বহাল থাকে।

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেডির হত্যা-প্রসঙ্গে বিমল দাশগুপ্তের দণ্ড হওয়া এবং প্রমাণাভাবে তাঁহার মুক্তি পাওয়ার বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে। বিমল দাশগুপ্তের পিতার নাম অক্ষয় দাশগুপ্ত। অক্ষয়বাবুর নিবাস ছিল বরিশালে, কিন্তু তিনি মেদিনীপুরে শিক্ষকতা করিতেন। বিমল দাশগুপ্ত তখন মুক্তি পাইলেও শীঘ্রই আর একটি আক্রমণ পরিচালিত করিতে গিয়া ধৃত হইলেন। ১৯৩২ সালের ২৯শে অক্টোবর ইউরোপীয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতি মিঃ ই-ভিলিয়ার্স মধ্যাহ্নকালে যখন ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থ গিলেণ্ডার হাউসের উপরতলায় অপর কয়েকজনের সহিত আলাপ আলোচনায় রত ছিলেন, তখন সাহেবী পোষাকে সজ্জিত বিমল দাশগুপ্ত সেখানে গিয়া তাঁহাকে গুলি করেন। কয়েকজন সাহেব ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া বিমলকে ধরিয়া ফেলেন।

মিঃ বার্টলি, শ্রীএন-কে বসু এবং শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষকে লইয়া গঠিত এক ট্রাইবুন্যালে বিমলের বিচার সুরু হয় ৩০শে অক্টোবর হইতে। বিচারের সময় তিনি বলেন যে, ইউরোপীয়দিগের অন্যায় আন্দোলনের ফলেই হিজলী এবং চট্টগ্রামে ভয়াবহ উৎপীড়ন চালান হইয়াছে এবং সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ মানসেই তিনি মিঃ ভিলিয়ার্সকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১২ই নভেম্বর ট্রাইব্যুন্যাল তাঁহাকে দশবৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া রায় দান করেন।

রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ চার্লস লিউক ২৮শে নভেম্বর তারিখে যখন জেলখানা ত্যাগ করিয়া জেনারেল পোষ্ট অফিসের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার উপরও রিভলবারের গুলি বর্ষিত হয়। আহত অবস্থায় মিঃ লিউককে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আনা হইয়াছিল।

বিপ্লবীরা যে মেদিনীপুরে কোনও শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেটকে থাকিতে দিবেন না, তাহার প্রমাণ পুনরায় পাওয়া গেল। ডগ্‌লাস সাহেবের পর এইবার পালা আসিল মেদিনীপুরের পরবর্তী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্জ্জের। ১৯৩৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে মেদিনীপুর সহরে একটি ফুটবল ম্যাচ হইবার কথা ছিল। স্থানীয় টাউন ক্লাবের সহিত মহমেডান ক্লাবের খেলা। বার্জ্জ সাহেব নিজেই স্থানীয় টাউন ক্লাবের পক্ষে খেলায় নামিতে মনস্থ করেন। লোক হিসাবে মিঃ বার্জ্জের যথেষ্ট সুনাম

ছিল। অনেকেই তাঁহার শিষ্টাচার, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং সাহসের প্রশংসা করিত। আপনার বিপজ্জনক অবস্থার বিষয় জানিয়াও তিনি অবাধে জনসাধারণের সহিত মেলামেশা করিতেন এবং সহরের যুবকগণের সহিত ফুটবলও খেলিতেন। যাহা হউক, ব্যক্তিগত বিচারের দ্বারা নহে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই বিপ্লবিগণ তাঁহাকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। খেলা আরম্ভ হওয়ার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তিনি যখন আপন মোটরে করিয়া আসিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া মাঠের মধ্যে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন কয়েকজন যুবক অতর্কিতে তাঁহার উপর গুলিবর্ষণ করিলেন। আঘাত এতই গুরুতর হইল যে মিঃ বার্জ্জ ঘটনাস্থলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গের সশস্ত্র প্রহরীরা আততায়ীদের লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইতে লাগিল। ইহার ফলে একজন তৎক্ষণাৎ গুলিবিদ্ধ হইয়া নিহত হইলেন এবং আর একজন গুরুতরভাবে আহত হইলেন। আহত যুবকটি "আমাকে মেরে ফেল" "আমাকে মেরে ফেল" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সঙ্গের অপর যুবকগণ পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন। আহত যুবকটিকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইল—সেখানে তিনিও প্রাণত্যাগ করিলেন। মিঃ বার্জ্জকে হত্যা করিতে গিয়া এইভাবে যে দুইজন বিপ্লবী জীবন দান করিলেন—তাঁহাদের নাম অনাথবন্ধু পাঁজা ও মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত।

এই ঘটনার পর মেদিনীপুরে পুনরায় নূতন করিয়া খানাতল্লাস, ধর-পাকড় ও পুলিশী জুলুম সুরু হইল। বার্জ্জ সাহেবের পর মেদিনীপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন মিঃ গ্রিফিথস্। পুলিশ এবং মিলিটারির অত্যাচার একই সঙ্গে চলিতে লাগিল। কত নিরপরাধ ব্যক্তিও যে প্রহারে জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন—তাহার সংখ্যা নাই। বহু লোক সহর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সমস্ত সহরে যেন শ্মশানের নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও আততায়ীদের অন্য কাহাকেও বা হত্যার ষড়যন্ত্রকারীদের কাহাকেও পুলিশ ধরিতে পারিল না। কোনও অপরাধীকে ধরাইয়া দিতে বা ধৃত করিবার উপযোগী সংবাদ সরবরাহ করিতে পারিলে সংবাদদাতাকে ২৫০০৲ টাকা পুরস্কার প্রদত্ত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। পরে এই পুরস্কারের টাকা বৃদ্ধি করিয়া ক্রমশঃ ৫০০০৲ টাকা ও ১০,০০০৲ টাকা করা হইল, কিন্তু তথাপি কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না।

অবশেষে পুলিশ কোনও সূত্রে মেদিনীপুরের উকিল যামিনীজীবন ঘোষের দুইজন পুত্রের নাম জানিতে পারে এবং তাঁহাদের গ্রেপ্তার করে। তাঁহার একজন পুত্র কোনও কথাই প্রকাশ করিলেন না—কিন্তু অপর পুত্রটি স্বীকারোক্তি প্রদান করিয়া সকল তথ্য ফাঁস করিয়া দিলেন। ইহার পর আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়া একটি ট্রাইব্যুন্যালে তাঁহাদের বিচার সুরু হয়। এই ট্রাইব্যুন্যালের চেয়ারম্যান ছিলেন জজ মিঃ ওয়েট্। যামিনীবাবুর যে পুত্রটি স্বীকারোক্তি প্রদান করিয়াছিলেন—তিনিই হন এই মামলায় রাজসাক্ষী। পরলোকগত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, শ্রীনিশীথচন্দ্র সেন, জে-সি-গুপ্ত, সন্তোষকুমার বসু প্রভৃতি আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিতে থাকেন।

কিছুদিন ধরিয়া অধিবেশনের পর মামলাটির শুনানী ও সওয়াল শেষ হয়। ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মামলাটির অনুকূলে বিশেষ সাক্ষ্য-প্রমাণ নাই। রাজসাক্ষীর প্রদত্ত সাক্ষ্য অপর কাহারও দ্বারা সমর্থিত বা অন্য প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই। টাকার লোভেও অনেকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল। এতৎসত্ত্বেও কিন্তু রায় প্রকাশিত হইলে দেখা গেল যে বিচারকগণ ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তী, নির্ম্মলজীবন ঘোষ এবং রামকৃষ্ণ রায়ের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। সনাতন রায়, নন্দদুলাল সিংহ প্রভৃতি অপর পাঁচজনও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। অনেকে ইহা বিশ্বাস করেন যে জুরির সাহায্যে বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হইলে এইরূপ বিচার প্রহসন ঘটিতে পারিত না।

যাহা হউক, বার্জ্জ সাহেবের হত্যার পর পুলিশ কোনও সূত্রে জানিতে পারে যে ডগলাস-নিধনে অংশগ্রহণকারী প্রদ্যোতের অপর সহকারী ছিলেন প্রভাংশুশেখর পাল। মিঃ বার্জ্জ নিহত হওয়ার দশবারো দিন পরেই কলিকাতায় প্রভাংশুকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাঁহার উপর নানাবিধ উৎপীড়ন চলিতে থাকে। বহু চেষ্টা করিয়াও কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা উপস্থাপিত করিতে পারার মত কোনও প্রমাণ পুলিশ সংগ্রহ করিতে পারে না। অগত্যা তাঁহাকে বিনা বিচারেই বন্দী করিয়া রাখা হয়।

ভারতে বলশেভিকবাদ প্রচারের জন্য ১৯২৮ সাল হইতে কয়েকখানি বিলাতী ও ভারতীয় সংবাদপত্র এক প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেন। ইহার ফলে ভারত গভর্ণমেণ্ট অতিশয় শঙ্কিত হন এবং ভারতে বলশেভিকবাদ কতদূর প্রসারলাভ করিয়াছে তাহা অনুসন্ধানের জন্য ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে মিঃ ইটন নামক একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করেন। অনুসন্ধান কার্য্য সমাপ্ত করিয়া ১৯২৯ সালের ১৫ই মার্চ মিঃ ইটন যে রিপোর্ট দাখিল করেন, তাহাতে তিনি বলশেভিক-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এক ভারতব্যাপী ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব সমর্থন করেন। ইহার ফলে ঐ বৎসরেই মার্চ্চ মাসের শেষাশেষি পুলিশ ভারতের প্রায় দুইশত স্থানে খানাতল্লাস করিয়া বহু দলিল ও কাগজ-পত্র হস্তগত করে এবং এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থান হইতে ৩১ জন লোককে গ্রেপ্তার করে। এই ৩১ জনের মধ্যে বোম্বাই হইতে ১৩ জন, বঙ্গদেশ হইতে ৯ জন, যুক্তপ্রদেশ হইতে ৫ জন এবং পাঞ্জাব হইতে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সরকার মনে করেন যে এই ষড়যন্ত্রটির কেন্দ্র ছিল মীরাট-এ এবং সেই কারণে মীরাটেই মামলাটির বিচারকার্য্য সম্পন্ন করা স্থির হয়। তদনুযায়ী মীরাটের এডিশন্যাল ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হোয়াইট-এর এজলাসে এই ৩১ জনকে অভিযুক্ত করিয়া ১৯২৯ সালের ১২ই জুন যে মামলা রুজু হয়—তাহাই মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত।

এই মামলাটি পরিচালনার জন্য গভর্ণমেণ্ট বিরাট আয়োজন করেন

এবং ইহাতে বহু লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। কয়েকজন বিশেষ কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করা হয় কেবলমাত্র এই মামলাটির তদ্বির করিবার জন্য। এই মামলা পরিচালনার ভার দেওয়া হয় কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার মিঃ ল্যাংফোর্ড জেমস্-এর উপর। গভর্ণমেন্টের তরফে ডেপুটি পুলিশ ইনস্পেক্টর মিঃ হর্টন এই মামলাটি দায়ের করেন। ইংলণ্ডের রাজাকে বৃটিশশাসিত ভারত-সাম্রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া ১২১ (ক) ধারামতে অপরাধ অনুষ্ঠানের অপরাধে আসামীদিগকে অভিযুক্ত করা হয়।

মামলাটি চালাইবার জন্য আসামীদের তরফে যে প্রচুর টাকার প্রয়োজন, তাহা মিটাইবার জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একটি সেণ্ট্রাল ডিফেন্স কমিটি গঠিত হয় —বঙ্গদেশেও তাহার একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছিল।

মামলার শুনানী চলিতে থাকার সময়েই একজন অভিযুক্ত আসামীর মৃত্যু হয়। দীর্ঘদিন ধরিয়া ইহার শুনানী চলার পর ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসে মামলাটি স্থানান্তরিত হয় মীরাটের সেসন জজ মিঃ আর এল-ইয়র্ক-এর নিকটে। তিনশতাধিক সাক্ষী এই মামলায় সাক্ষ্য দান করে। ১৯৩২ সালের মার্চ মাসে সাক্ষ্যপ্রমাণাদি গ্রহণ সমাপ্ত হয়। এসেসাররা তাহাদের অভিমত জ্ঞাপন করেন ১৯৩২ সালের ১৬ই আগষ্ট। ১৯৩৩ সালের ১৬ই জানুয়ারি মীরাটের সেসন জজ এই মামলার রায় দেন। তাহার বিচারে তিনজন মুক্তিলাভ করেন এবং অবশিষ্ট [illegible] জন বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এই রায়ের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপিল করেন। উক্ত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মিঃ ইয়ং মামলাটির পুনর্বিচার করিয়া ১৯৩৩ সালের ৩রা আগষ্ট তাঁহাদের রায় দেন। সেসন আদালতে দণ্ডিত ২৭ জনের মধ্যে আরও ৯ জন এই পুনর্বিচারের ফলে নির্দোষ সাব্যস্ত হইয়া মুক্তিলাভ করেন। ইহা ব্যতীত আরও পাঁচজনকে বিচারপতিদ্বয় এই বিবেচনায় মুক্তি দিবার আদেশ দেন যে সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া বিচারকার্য্য চলিবার ফলে তাঁহাদিগকে যে দীর্ঘ কয়েক বৎসর আটক থাকিতে হইয়াছে—তাঁহাদের অপরাধ অনুযায়ী দণ্ডের তুলনায় তাহাই যথেষ্ট। ১২ বৎসর হইতে ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের দণ্ডকাল হ্রাস করিয়া ৩ হইতে ১ বৎসর পর্য্যন্ত করা হইল। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত একজন আসামীর প্রতিও তিন বৎসর মাত্র কারাবাসের আদেশ হইল। ৪ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত আর একজন আসামীর প্রতি প্রদত্ত হইল মাত্র [illegible] মাস কারাদণ্ড। টাইপ করা ফুলস্কেপ কাগজের ১৭৭ পৃষ্ঠায় এই রায় প্রদত্ত হয়। আদালতে সমগ্র রায়টি পাঠ করিতে কয়েকদিন সময় লাগে।

বিস্ফোরক পদার্থ তৈয়ারীর অভিযোগে প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া কয়েকজনের বিরুদ্ধে আর একটি মামলা চলিতেছিল—উহা দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গভর্ণমেন্ট মামলা তুলিয়া লইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে মুক্তিদান করেন।

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা এই সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ্য মামলা। হিজলী, দেউলী ও বক্সা বন্দী-নিবাস হইতে কয়েকজন বিপ্লবী কোনও মতে পলায়ন করেন এবং তাঁহাদের কেহ কেহ অন্যান্য বিপ্লবীদের সহায়তায় এক ব্যাপক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। সশস্ত্র বিপ্লব পরিচালনার উদ্দেশ্যে তাঁহারা অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করিতে থাকেন এবং একটি পরিকল্পনাও রচিত হয়। এই ষড়যন্ত্র বাংলা, পাঞ্জাব, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ, গুজরাট, দিল্লী, বিহার, উড়িষ্যা—এমন কি ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। পুলিশ অনুসন্ধান কার্য্য চালাইতে চালাইতে ১৯৩২ সালের ২৮শে ডিসেম্বর পলাতক বন্দী জিতেন্দ্রনাথ গুপ্তকে গ্রেপ্তার করে। ঐ বৎসরেরই ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বক্সা বন্দী-নিবাস হইতে তিনি পলায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে পুনরায় গ্রেপ্তারের পর তাঁহার নিকট হইতে বহু আপত্তিজনক দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অতঃপর পুলিশ কলিকাতায় আরও বহু স্থানে খানাতল্লাস করে এবং প্রভাত চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। তল্লাসীর ফলে বহু কার্ত্তুজ, বোমা, আপত্তিকর পুস্তিকা ও কাগজপত্র প্রভৃতি পুলিশের হস্তগত হয়।

১৯৩৩ সালের ৭ই আগষ্ট আলিপুরে একটি ট্রাইব্যুনালে ৩৮ জন আসামীর বিরুদ্ধে এক মামলা উপস্থাপিত হয়। ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইয়াছিল মেসার্স টি-বি জেমসন, আর সি সেন এবং মৌলভী এম-ওয়াই-সিরাজি-কে লইয়া। আসামীদের বিরুদ্ধে খুন ও ডাকাতির ষড়যন্ত্র এবং অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইন ভঙ্গের অভিযোগ আনীত হয়। সরকার পক্ষে মামলাটি পরিচালিত করিতে থাকেন পাবলিক প্রসিকিউটর রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আসামীদের পক্ষ সমর্থন করেন ব্যারিষ্টার জে-সি গুপ্ত, বি কে চৌধুরী প্রভৃতি। দিন কয়েক পরে ১৪ই আগষ্ট তারিখে আরও দুইজন বিপ্লবীকে এই মামলায় জড়িত করা হয়।

মামলাটি চলিতে থাকার সময়েই ১৯৩৩ সালের ১লা আগষ্ট আলিপুর জেল হইতে দুইজন বিচারাধীন আসামী পলায়ন করেন। ইহার পর হইতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে অন্যান্য আসামীগণকে আদালতে আনিবার সময় পায়ে বেড়ী পরাইয়া আনা হইত। কর্ত্তৃপক্ষের আশঙ্কা হইয়াছিল যে সাবধান না হইলে অন্যান্য আসামীরাও হয় তো পলাইয়া যাইতে পারেন।

ট্রাইব্যুনালের অন্যতম কমিশনার মিঃ আর সি সেন পীড়াগ্রস্ত হইয়া ১৯৩৪ সালের ১২ই ডিসেম্বর পরলোক গমন করেন। তাঁহার স্থলে ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে মিঃ আর-এইচ্ পার্কার কমিশনার নিযুক্ত হন। ১৯৩৫ সালের ১লা মে তারিখে মামলার রায় প্রকাশিত হয়। বিচারে ৬ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং ৭ জনের দশ বৎসর, ৯ জনের সাত বৎসর, ৪ জনের ছয় বৎসর, ১ জনের পাঁচ বৎসর, ১ জনের তিন বৎসর এবং ২ জনের এক বৎসর হিসাবে কঠোর কারাদণ্ড হয়। দুইজন আসামী এই মামলায় রাজসাক্ষী হইয়াছিলেন। চারিজন অভিযুক্ত ব্যক্তি মুক্তিলাভ করেন।

এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসরস্থ রোশনলাল ব্রহ্মচারীর সহিতও এই সকল বিপ্লবীর যোগাযোগ ছিল। মাদ্রাজে একটি বাড়ীতে রোশনলালের সন্ধান পাইয়া পুলিশ তাঁহাকে তথায় গ্রেপ্তার করিতে যায় এবং বাড়ীটি ঘেরাও করে। তাঁহার দলের বিপ্লবীরা তখন পুলিশের উপর বোমা নিক্ষেপ করে। ইহার ফলে জনৈক পুলিশ কনষ্টেবল আহত হয়। পুলিশও গুলি চালাইলে গোবিন্দরাম নামক জনৈক বিপ্লবী নিহত হন। শেষ পর্য্যন্ত পুলিশ সকল বিপ্লবীকেই গ্রেপ্তার করে। বাড়ীটি তল্লাস করিয়া বিবিধ বিস্ফোরক দ্রব্য ও বিপ্লববিষয়ক পুস্তিকাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রোশনলাল ব্রহ্মচারী প্রভৃতির দ্বারাই "Hindusthan Socialist Revolutionary Party" গঠিত হইয়াছিল।

এই সময়কার আর কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত হিলি ষ্টেসনে যে সরকারী ডাক লুঠ হয়, সে সম্পর্কেও ১৯৩৩ সালে একটি ষড়যন্ত্র মামলার উদ্ভব হয়। উক্ত মামলায় হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য ও প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে, তিনজন দশ বৎসর ও কয়েকজন পাঁচ বৎসর হিসাবে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। রংপুরে ডাকাতির ষড়যন্ত্র প্রভৃতি করার অভিযোগে এই বৎসরই রংপুর ষড়যন্ত্র মামলা হয়। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া প্রেম বর্ম্মী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড এবং আরও কয়েকজন কারাদণ্ড লাভ করেন।

দিনাজপুরে ডাকাতি প্রভৃতি সম্পর্কে ১৯৩৪ সালে আর একটি ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা হয়। উহাতে নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের ১২ বৎসর ও দীনেশ দাসের ১২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

১৯৩৪ সালে বাংলার গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসনকে হত্যার জন্য চেষ্টা চলে। দার্জিলিং-এর লেবং নামক স্থানে ঘোড়দৌড়ের মাঠে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি বর্ষিত হয়। গভর্ণর অক্ষতদেহে রক্ষা পান। কয়েকজনকে এই ব্যাপারে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত আসামীদের বিচার হইলে ভবানী ভট্টাচার্য্যের প্রতি ফাঁসির আদেশ হয় এবং মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার ঘোষ, উজ্জ্বলা মজুমদার, মধু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়।

চট্টগ্রাম জেলার বাথুয়া নামক স্থানে ডাকাতি করার জন্য এই বৎসর প্রিয়দা চক্রবর্ত্তী, মোক্ষদা চক্রবর্ত্তী এবং আরও কয়েকজন অভিযুক্ত হইয়া কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন।

১৯৩৫ সালেও কয়েকটি মামলা হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ২০।২২জন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা নামে একটি বড় মোকদ্দমা হয়। পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত ইহাতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড লাভ করেন এবং প্রফুল্ল সেন প্রভৃতি অন্যান্য কয়েকজনের প্রতি চার হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ঢাকা সহরে হীরালাল চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্যক্তিকে গুপ্তচর সন্দেহে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হন অমূল্য রায়। বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। এই বৎসরের জুন মাসে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালীপাড়া মদনপুর গ্রামের কালীপদ ভট্টাচার্য্য নামক একজন গোয়েন্দা পুলিশকে ছোরা লইয়া আক্রমণ করিয়া হত্যা করার অভিযোগে আশু ভরদ্বাজ ও অমূল্য চৌধুরীর প্রতি প্রদত্ত হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরদণ্ডের আদেশ।

১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চট্টগ্রামে একজন গুপ্তচরকে হত্যার চেষ্টা করার জন্য অমূল্য আচার্য্য দশ বৎসর কারাদণ্ড লাভ করেন।

(ক্রমশঃ)

ভারতের তৈল সম্পদ ও সাবান শিল্প

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

(২)

ব্যবসায়ী সংস্থার পশ্চাতে রাজনৈতিক গুরুত্ব প্রায় সমান হওয়া সত্বেও যান্ত্রিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জ্ঞানের প্রখরতা ব্যবসায়ে কৃতিত্ব প্রদান করে। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মাণী পরাভূত হওয়ায় সকল রকম বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হয়। কর্মনিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দৃঢ় জাতীয়তা-বোধ পুনরায় তাহাকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। তৈল-শিল্পের কথাই ধরা যাউক। ক্রীত তৈলবীজই তাহার একমাত্র সম্বল। বৃটেন ছিল মহাযুদ্ধের পরে ভারতীয় তৈলবীজের প্রধান আমদানীকারক। সোজা 'হাল' বন্দরে এই বীজ আমদানী হইত এবং এখানে নিষ্কাশিত হওয়ার পরে মধ্য ইউরোপ, জার্মাণী ও বাল্টিক দেশসমূহে এই তৈল রপ্তানী হইত। ১৯২৬ সালের পরে হামবুর্গ বন্দর আস্তে আস্তে এই নূতন ব্যবসা আরম্ভ করে। হামবুর্গ বাল্টিক সাগরের উপকূলে অবস্থিত। এই কারণে মধ্য ইউরোপ ও বাল্টিক দেশসমূহের প্রধান সরবরাহকারী বন্দর হিসাবে পরিণত হইবার সুযোগ ছিল, তৈল ব্যবসায়ে শিল্প প্রতিভাপূর্ণ জাতি এই অবস্থান বন্দরের পুরামাত্রাই আদায় করিল। প্রতিযোগিতায় শীঘ্রই ইংলণ্ডীয় তৈল ব্যবসা এতদঞ্চল হইতে উঠিয়া গেল। ১৯৩০ সালের মধ্যে দেখা গেল জার্মাণী ভারতীয় তৈলবীজের প্রধান আমদানীকারক, ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা অক্ষুন্ন ছিল এবং মধ্য ইউরোপে জার্মাণীর নিষ্কাষিত তেলের কারবার একচেটিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছিল! যান্ত্রিক দক্ষতার অভাবনীয় সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙ্গালী তৈল নিষ্কাসনী ব্যবসায়ীর স্থান কোথায়? ভবিষ্যৎ কি।

শিল্পে অপচয় নিবারণ এবং উপজাত দ্রব্য তৈয়ারী স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার অন্যতম উপায়। নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর

পরিমাণ কাগজ কিম্বা কাগজের মণ্ড প্রস্তুত হয়। এই সকল দেশে মণ্ড প্রস্তুত করিবার কালে বিস্তর ক্ষারজ নোংরা রস অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য হিসাবে ফেলিয়া দেওয়া হইত। বৈজ্ঞানিক দেখিলেন, এই নোংরা রস হইতে একরকম কটু গন্ধপূর্ণ সাবান আলাদা করা যায়। মৃদু অম্লরসের সাহায্যে এই সাবান হইতে তেল আলাদা করা সম্ভব হইলেও নানাবিধ জৈবপদার্থ মিশ্রিত থাকায় ইহা শীঘ্রই পচিয়া যাইত। এই কারণে বহুদিন পর্য্যন্ত এই তৈল কাজে লাগান যায় নাই। বৈজ্ঞানিকের ঐকান্তিক চেষ্টায়, বিশেষ করে, নূতন প্রক্রিয়ায় এই তৈল দুর্গন্ধশূন্য করা হইয়াছে। দেশের প্রয়োজন মিটাইয়াও এই প্রকার তৈল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে আমাদের দেশেও এই তৈল আমদানী হইয়াছে। এই তৈলের নাম Tall oil টাল তৈল। সুইডিস ভাষায় Tall অর্থে গাছ বোঝায়। আজকাল আমাদের দেশেও প্রচুর কাগজ উৎপাদিত হইতেছে, কাঁচা উপাদান এখানে কাঠ নহে, বাঁশ কিম্বা ঘাস, ক্ষারের সহিত সিদ্ধ হইবার পরে এখানে বিস্তর অপ্রয়োজনীয় ক্ষারজ রস ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই অপ্রয়োজনীয় রসে প্রয়োজনীয় কত মূল্যবান বস্তু প্রতিদিন নষ্ট হইতেছে কিনা কে বলিতে পারে?

গায়ে মাখা সাবানের আধুনিক কাল উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের দান। শতাব্দীর শেষের দিকে আমাদের দেশে শিল্পের গোড়াপত্তন হইলেও বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে স্বদেশী আন্দোলনের সময়। কুটীর শিল্প হিসাবে কলিকাতা ও অন্যত্র কাপড়কাচা সাবান তৈয়ারীর অস্তিত্ব থাকিলেও গায়ে মাখা সাবান ছিল না। সে যুগের দেশী সাবান বলিতে নেবু কিম্বা কাঁচা আমের সুরভিপূর্ণ জলে ভাসা সাবান কিম্বা ঐইরকম সাধারণ সাবানই বুঝাইত। প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে "বেঙ্গল সোপ", "ন্যাশনাল সোপ" কিম্বা "বুলবুল সোপে"র কথা আজ মনে আসে। এই সঙ্গে মনে আসে "ন্যাশনাল সোপে"র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্যার নীলরতন সরকারের নাম। বাংলা দেশে উচ্চ শ্রেণীর গায়ে মাখা সাবান প্রথম তৈয়ারী হয় "ক্যালকাটা সোপ ওয়ার্কসে"।

স্বদেশী যুগের প্রথম পর্য্যায়ের শেষে অধিকাংশ কারবারই নানা কারণে পাততাড়ি গুটাইয়া ফেলে। তার পরে দ্বিতীয় পর্য্যায় শুরু হয় ১৯২০ সালে। অসহযোগ আন্দোলনের পরে এই দ্বিতীয় স্বদেশী আন্দোলন বিপুল শক্তি ও গতি লাভ করে। চতুর্দিকেই এগিয়ে চলা আরম্ভ হয়। স্বদেশী সাবান শিল্পেও জোয়ার আসে। আমদানী বাণিজ্যের দ্রুত নিম্নগতি ও স্বদেশী শিল্পের অগ্রগতি নিম্নের তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই উপলব্ধ হইবে।

সাল	আমদানী (হন্দরে)	আমদানী মূল্য টাকা	উৎপন্ন হন্দরে	বর্ত্তমান উদ্বৃত্তন উৎপন্ন ক্ষমতা
১৯১৬-১৭	৩১০১৬১	১০০,৩৬,৬৮০		
১৯১৮	......	......	৪৪০০০০	২৩০০০০ টন
১৯২৬-২৭	৪০২ ৬৭৫	১১২৪১২৭৮	......	
১৯২৯-৩০	৪৪৭ ৯৩০	১৬৬৬৮৪০১	......	
১৯৩৩-৩৪	৭০৭,৪১৩	৭৮৩৭৩৬১	......	
১৯৩৮-৩৯	......	......	১০০০০০০	
১৯৩৪-৩৫	৫৫৫.৭	৩৮২৭২৬১	......	
১৯৪১-৪২	২১৯৩	[illegible]		
১৯৪৭-৪৮	...	......	৩০০০০০০	

উল্লিখিত তালিকায় একটি সত্য অস্ফুট আছে। কয়েকটি বৈদেশিক সাবান কারখানা ১৯৩০ সালের এইদিকে এদেশে কাজ আরম্ভ করে। আমদানী হ্রাসের অন্যতম কারণ ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহ। কিন্তু ভারতীয় ব্যবসা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের নিকট আজ আশঙ্কার কারণ নাই। ভারতে উদ্বৃত্ত ২৫০০০০ টন উৎপাদন সক্ষম কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় আগামী পাঁচ বৎসরে এই উৎপাদন সীমা ৩০০,০০০ লক্ষ টনে উন্নীত করা।

বিজ্ঞানের নবতম অবদান সাবান শিল্পে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনিতেছে। মার্কিনী নূতন পদ্ধতি "সার্পল" রীতি (sharple's method) বোম্বাই প্রদেশের একটি কারখানায় চালু হইতেছে। এই নূতন কারবারী রীতি সাফল্যলাভ করিলে সাবান শিল্পের দৃষ্টিভঙ্গী হয়তো সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, অধিকন্তু 'সার্পল' পদ্ধতিতে উৎপাদন-মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে সাবান সস্তা সত্যই অগণিত দরিদ্র ভারতের জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষায় দেবতার আশীর্বাদ হইয়া দাঁড়াইবে।

ভারতীয় সাবান শিল্পে ভারতীয় মূলধন প্রায় দশ কোটি টাকা নিয়োজিত হইয়াছে এবং ২০ বৎসরের মধ্যে ভারত আমদানীকারক দেশ হইতে রপ্তানীকারক দেশে পরিবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে। রপ্তানীর পরিমাণ এইখানে দেখান হইল, যুদ্ধ পরিস্থিতি আংশিক সাহায্য করিলেও বিস্তৃতি আরম্ভ হইয়াছে ইহা নিখুঁত সত্য।

সাল	রপ্তানীর পরিমাণ হন্দরে	মূল্য (টাকা)
১৯৩৩-৩৪	১১৫৭০	২,৩৩,৬০৪
১৯৩৭	১২,০০০	১৭,২১,২৭১
১৯৪৩-৪৪	৭১,৭০৭	১১,৭৬,০৪২
১৯৪৬-৪৭	২৬,৭০৬	১৮,৯৭,৮৭২

ভারত গভর্ণমেণ্টের পরিকল্পনানুযায়ী ৩০০,০০০ লক্ষ টন সাবান উৎপাদন সম্ভব হইলে তৈলজ পদার্থ প্রায় ২৫০,০০০ টন প্রয়োজন হইবে, গত যুদ্ধে সাবান উৎপাদনে কলিকাতা ও বোম্বাই সমান হওয়ার আংশিক কারণ উভয়ই প্রধান শিল্পাঞ্চল এবং ভারতের দুই বিপরীত সীমান্তে অবস্থিত। বাংলায় অধিকাংশ বড় কলকারখানা কলিকাতা এবং তাহার সন্নিহিত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। বাংলা বিভক্ত হওয়ায় কলিকাতার শিল্পবাণিজ্যের স্বাভাবিক বাজার পূর্ব পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে। কাজেই বিভক্ত বাংলার রাজধানী ব্যবসা বাণিজ্যে পূর্ব গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইবে ইহা অবিশ্বাস্য মনে হয়। বোম্বাইএর

সুবিধা সেখানে ব্যবসায়ীরা টাকাওয়ালা লোক কিন্তু কলিকাতায় মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীই ব্যবসায়ে নামিয়াছে এবং সবেমাত্র নামিতেছে এই কারণে এবং আঞ্চলিক তেলের সুবিধার জন্য সাবান শিল্প অবাঙ্গালীর একচেটিয়া ব্যবসায়ে পরিণত হইতে চলিয়াছে। লাঙ্গল যার জমি তার—এই বহুশ্রুত ধ্বনির অনুকরণে "তৈল যাহার সাবানও তাহার" প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে।

একদিন বাংলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই 'স্বদেশী' যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। বিদেশী শাসন শৃঙ্খলা টুটিবার কল্পনার সহিত জাতীয় বিদ্যালয়, জাতীয় ব্যাঙ্ক, বীমা প্রতিষ্ঠান, রসায়ন ও কলাশালা, বস্ত্রশিল্প, দিয়াসলাই, পাখা ও বিস্কুট প্রভৃতির সহিত সাবান শিল্পেও জাতির মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল কিন্তু পলিমাটির দেশে 'চরৈবেতি' সঙ্গীত দানা বাঁধিতে পারে নাই, এগিয়ে চলার পথে গাঁধি নামিয়া আসিল। টাকাও শিল্পীর অভাবই কি একমাত্র কারণ? বাঙ্গালী টেক্‌নিসিয়ানকে বিশাল ভারতের সর্বত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিন্তু তাহার নিজ ভূমিতে সে কেন 'পরবাসী' হইয়া পড়িল তাহার কারণ বিশ্লেষণ স্বাধীন ভারতে একান্ত প্রয়োজন; চাঁদ, শ্রীমন্ত ও ধনপতি সদাগরের জাতি বাঙ্গালীর চরিত্রে দৃঢ়তা নাই, ব্যবসায়ের জ্ঞান নাই ধৈর্য ও সততা নাই এই মিথ্যা অপবাদ সত্য নাও হইতে পারে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে অনেকগুলি সাবান কারখানা কাজ করিতেছিল, যুদ্ধের সুযোগ সুবিধায় সর্বত্র আরও নূতন কারবার স্থাপিত হইল। বাংলাদেশের কারখানাগুলি স্বাভাবিক কারণে কলিকাতা ও হাওড়া অথবা ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে কেন্দ্রীভূত হইল। জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর ১৯৪৭ সালের হিসাবে বাংলাদেশে ১২০টী কারখানা গঠিত হইয়াছিল তন্মধ্যে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের ৪৮টী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হইবার পর বাংলার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ মনে হওয়া স্বাভাবিক এতগুলি কারখানা যেখানে সেখানকার ব্যবসা বাণিজ্য নিশ্চয়ই অগ্রগামী—কিন্তু ব্যাপারটী ছিল একেবারেই বিপরীত। এতগুলি কারখানায় কি সাবান তৈয়ারী হইত? না। নিছক ধাপ্পাবাজীই ইহার বিরাট সত্য। এইরূপ ঘটনার মধ্যেই আছে দায় পরাধীন জাতির জাতীয় অধঃপতন। লুক্কায়িত যথার্থ ইতিহাস! বাঙ্গালী সর্বত্র কেন হটিয়া যাইতেছে? ইহাই তাহার প্রচ্ছন্ন উত্তর। আজ স্বাধীনতার আলোকে নিজেকে চিনিয়া লওয়া প্রয়োজন। পাপ পুরাতন হইলেও ঘৃণ্য এবং পরিত্যজ্য। 'পারমিট' প্রাপ্তির জন্য সরকারী অনুগ্রহপ্রাপ্ত কালোবাজারী দালালদের যৌথ কোম্পানীর সাইনবোর্ড-রূপ ব্যাঙ্ক এবং তাহার আড়ালে আত্মগোপনের কাহিনী চিরকালের জন্য নিঃশেষ হউক।

সাবান শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক সম্বন্ধে একটী শিক্ষণীয় তথ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিবার জন্য ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সার্ভের রিপোর্ট হইতে অখণ্ড বঙ্গের যৌথ সাবান কারখানা, শ্রমিকের সংখ্যা এবং গড়পড়তা মূলধনের তালিকা এখানে দেওয়া হইল। যৌথ কোম্পানী ব্যতীত ব্যক্তিগত কারখানা ছিল কাজেই রিপোর্টটী সম্পূর্ণ চিত্র নহে।

কেন্দ্র	কারখানার সংখ্যা	মোট মূলধন	প্রত্যেক কম্পানীর গড় মূলধন
(ক) কলিকাতা ও হাওড়া	৭২	৪,৭৪০,০০০	৬৪,৪৪৮
ঢাকা—নারায়ণগঞ্জ	৪৮	৪৫০০০০	৯৩৭৫
	১২০	৫০,০০,০০০	

(খ) সাবানের কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিক

	সাবানের ধরণ	শ্রমিক (বাঙ্গালী)	শ্রমিক (অবাঙ্গালী)
কলিকাতা ও হাওড়া	গায়েমাখা	৬১২	৩১৭
	কাপড় কাচা	৫৩৮	১০০৩
ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ	গায়ে মাখা	৭০	৪৫
	কাপড় কাচা	৬৫০	২১০

দেশ বিভক্ত হওয়ার পরে অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু একটি সত্য এই চিত্র হইতে উদ্‌ঘাটিত হইতেছে বাংলা দেশে সাবান কারখানায় নিযুক্ত মূলধনের স্বল্পতা, যেখানে টাটা অয়েল কোম্পানীর আদায়ী মূলধন এক কোটী টাকা, সোয়াইকার পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, প্রিয়কার ৩০ লক্ষ টাকা, গডরেজের ৬ লক্ষ টাকা, সেখানে ১২০টী কারখানার মিলিত মূলধন প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। এই হাস্যকর পরিস্থিতিতে এবং অসম প্রতিযোগিতায় বাঁচিবার আশা বাতুলতা নহে কি? দ্বিতীয়তঃ শ্রমজীবী সমস্যা, জাতীয় জীবনের সকল স্তরেই এই সমস্যা আজ উৎকট অভিশাপরূপে উপস্থিত। গাড়োয়ান হইতে শয়ন পর্যন্ত সমাজ জীবনের সর্বত্র হইতে বাঙ্গালী শ্রমিক বিদায় লইয়াছে; কাজেই কারখানায় যেখানে কায়িক পরিশ্রম বেশী সেখানে বাঙ্গালী শ্রমিকের ন্যূনতাই আজ বড় কথা নহে। সাবান কারখানার শ্রমিক প্রধানতঃ মুসলমান, তাহার উপর অবাঙ্গালী অর্থাৎ পশ্চিমা মুসলমান। বাঙ্গালী সমাজের জীবনযাত্রা প্রতিপদে বিভিন্ন প্রদেশের শ্রমিকের কাছে বাধা পড়িয়াছে অথচ বাঙ্গালী সমাজের একটি বড় অংশের আজ পেটে অন্ন নাই, অঙ্গে বসন নাই, মধ্যবিত্ত সমাজের মাথা গুঁজিবার ঠাঁই নাই, তখন শুধু অভিমান করিয়া অবাঙ্গালীর উপরে বিষোদ্গার করিলে চলিবে কেন? দিশেহারা বাঙ্গালীকে আজ চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া উচিৎ কোনও কাজই তুচ্ছ নহে। শুধু বলিলে চলিবে কেন "ঐ লোকটি লোটা কম্বল সম্বল ক'রে বাংলায় এসে বড় লোক বনে গেল।"

বাংলার বহুমুখী সমস্যার মধ্যে তেল ও তেলজ দ্রব্যের সমস্যা আজ বিশেষভাবে প্রকট হইয়াছে। এককালে ব্যবসা বাণিজ্যের এক বিরাট অংশ কলিকাতা বন্দরে নির্বাহ হইত, কারণ সেদিন কলিকাতা ছিল সমগ্র ভারতের রাজধানী। অনেক শিল্পের পথপ্রদর্শক হওয়ার আংশিক কারণও ছিল তাহা। দেশী ও বিদেশী সাবান কারখানা এখানেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তৈল নিষ্কাষণের কারখানাও এখানেই প্রসার লাভ করিয়াছিল, কয়েকটি বৈদেশিক তৈল নিষ্কাশণ ও পরিশোধন

যন্ত্রও এই নগরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রাদেশিকতা, পারস্পরিক ঈর্ষা এবং প্রদেশে প্রদেশে গণজাগরণ কলিকাতা নগরীর এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য ব্যাহত করিয়াছে। যে প্রদেশে তৈলবীজ বেশী জন্মে সেই প্রদেশের অভিপ্রায় তৈল নিষ্কাশণ ব্যবসা তাহাদের করতলগত থাকুক। সামগ্রিক রাষ্ট্রচৈতন্য প্রাদেশিকতার নিকট পরাজিত হওয়ায় কেবলমাত্র আমদানী তেলে বৃহৎ সাবান কারখানা প্রতিযোগিতায় বাচিতে পারে না; বিজ্ঞানের অগ্রগতির সহিত তৈল পেষণ যন্ত্রের উন্নতি না হওয়ায় প্রাদেশিক মুনাফা দিয়া ক্রীত তৈলবীজ নিষ্কাশণে উৎপন্ন তেলে ঘাটতি মিটান যায় না। দুই দুইবার স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগ পাইয়াও বাংলাদেশে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কোনও সাবান কারখানা গড়িয়া উঠে নাই অথচ এই প্রদেশে অবস্থিত গায়েমাখা ও কাপড়কাচা সাবানের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান লিভার ব্রাদার্সের কথা কেহ বা না জানে। ইহার প্রধান কারণ বাঙ্গালীর হাতে তৈলজ শিল্পের বড় কারখানা নাই। বিবিধ সাবান শিল্পগুলির মূলধন, কলকারখানা আধুনিক এবং স্বয়ংপূর্ণ নহে। গ্লিসারিণ প্রভৃতি উপজাত দ্রব্য সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা কোনটিতেই নাই। সাবান শিল্পের সহিত তৈল নিষ্কাশণ কিম্বা নিম্ন শ্রেণীর তৈলকে হাইড্রোজিনেট করিবার ব্যবস্থা কোনও বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানে নাই। কেবলমাত্র ইহাই শেষ কথা নহে তৈল নিষ্কাশণ ও তৈলবীজের ব্যবসা অবাঙ্গালীর হাতে প্রায় একচেটিয়া বলিলে খুব অত্যুক্তি করা হয় না। এই বিসদৃশ অবস্থার কারণ বিভক্ত বাংলায় তৈলবীজের অবস্থা নিরতিশয় নিরুৎসাহজনক। এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতির ভবিষ্যৎ কি? শস্যশ্যামলা বাংলার দুলাল ভাগ্যের পাশা খেলায় আজ শুধু রিক্ত নহে সর্বস্বান্ত।

বাঙ্গালীর বহুবিধ সমস্যা আজ ঘরোয়া সীমানা অতিক্রম করিয়া সমস্ত দেশ পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। জাতির সকল স্তরেই রাষ্ট্রচৈতন্য ও দেশাত্মবোধের অভাব এই সমস্যাকে জরুরী করিয়া তুলিয়াছে, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বাংলায় অর্থ-নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনৈতিক চেতনায় আজ সংঘাত উপস্থিত। লোকভারে প্রপীড়িত, সঙ্কীর্ণ ও পঙ্গু বাংলা পূর্ব ভারতের সীমান্ত-রক্ষী, এই কারণেই ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারদিগের সমস্যার প্রতি এখনই মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বাংলার আশু প্রয়োজন তাহার সম্প্রসারণের স্থান। বহুদিন হইতে পশ্চিম সীমান্তে মানভূম, ধলভূম, দুমকা, জামতাড়া এবং কিষেণগঞ্জ বাংলার সহিত মিলিত হইয়া এক ভাষাভাষী অঞ্চল গঠন করিতে চাহে। এই সম্মিলিত ভূখণ্ডের সহিত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ একত্রীভূত হইলে জনসংখ্যার চাপ সাময়িক একটু আলগা হইতে পারে। সম্প্রতি কিছু সংখ্যক বাস্তুহারাকে আন্দামানে পাঠান হইয়াছে, একজন বাঙ্গালী অফিসার আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের চীফ কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। আরও উদ্বাস্তু বসবাসের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছে; নববঙ্গের এই নূতন সীমানায় অন্যান্য সমস্যার সহিত তৈল শিল্পের একটি সুরাহা সম্ভব। দামোদর ও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা সম্পাদিত হইলে বাংলার এই পশ্চিম সীমান্তে বন্য ও কৃষিজাত তৈল সম্পদ বহুগুণ বাড়িয়া যাইবে। বন্য তৈলজের মধ্যে করঞ্জা, নাগকেশর, মহুয়া এবং চালমুগরা প্রচুর পাওয়া যাইবে, রাস্তার দুইধারে মহুয়া গাছ লাগাইলে হয়তো সাবানের অন্যতম উপাদানের অভাব হ্রাস পাইবে। কৃষিজাত সরিষা, মসিনা ও বাদাম এই অঞ্চলে প্রচুর জন্মিবে। তারপরে অন্যতম সম্ভাবনা, সমুদ্রমেখলা পরিবেষ্টিত আন্দামানের নারিকেল। আয়তনে এই দ্বীপপুঞ্জ প্রায় মেদিনীপুর জেলার সমান তৈলজ সম্পদের সম্ভাবনায় পূর্ণ। কুটির শিল্প হিসাবে 'কোপরা (নারিকেলের শাঁস), নারিকেল খোলার শিল্প এবং নারিকেল ছোবড়ায় দড়ি, ম্যাটিং ইত্যাদি প্রস্তুতির প্রচুর সম্ভাবনা। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচীন সমগ্র ভারতের পক্ষে কত গুরুত্ব কিন্তু নারিকেলের তেল উৎপাদন হিসাবে ভারতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সমুদ্র পরিবেষ্টিত আন্দামানের লবণাক্ত তীরভূমি পূর্ব ভারতে সদা জাগ্রত অন্যতম সীমান্ত প্রহরী। স্থলভাগের সীমানা অতিক্রম করিয়া লবণাম্বু জলধির সমুদ্রে মৎস্য ও হাঙ্গর শিকার নববঙ্গের সামনে এক নূতন ধরণের ব্যবসায়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবে। মৎস্য ও হাঙ্গর তেল হইতে ভিটামিন আলাদা করা সম্ভব হইলে উদ্বৃত্ত তেল হাইড্রোজিনেটেড হইয়া বিবিধ পণ্যের কাঁচামালে পরিণত হইবে। আন্দামানের অরণ্যজাত কাষ্ঠ পূর্ব ভারতের কাষ্ঠের অভাব বিদূরিত করিয়া শিল্প জগতের মাল স্থানান্তর সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিবে। প্রকৃত রাষ্ট্রচেতনা, দেশভক্তি, অতুলনীয় পরিশ্রম ও চরিত্র নিষ্ঠা পুনরায় বাঙ্গালীকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারে। সকলের মুখে আনন্দের হাসি ফুটাইয়া তুলিতে রাষ্ট্রের সহায়তা অবশ্য প্রয়োজন, কিন্তু সর্বাগ্রে চেষ্টা করা দরকার আমরা নিজে কতটা কি করিতে পারি। সমস্যা সমাধানে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে আত্মানুসন্ধান আজ একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষকগণ ও শিক্ষার সরকারী নয়া ব্যবস্থা

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বঙ্গবাসী মাত্রই অবগত আছেন মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকগণ প্রতীক ধর্ম্মঘট করিয়া সরকারী ব্যবস্থা ও নিস্পৃহতার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন (যদিও অধিকাংশ ভাবে) এবং পশ্চিম বঙ্গ সরকার বরাবর বিবৃতি দিয়া দেখাইতে চাহিতেছেন যে শিক্ষা বাবদ ব্যয় বরাদ্দ যথেষ্ট বাড়াইয়া শিক্ষকগণের দুর্দ্দশা মোচনের শুভ প্রচেষ্টা করা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে। কমুনিষ্টগণ ফতোয়া দিতেছেন, "ছাত্রের মাহিনা কমাও, শিক্ষকের মাহিনা বাড়াও,"—বর্ত্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সরকার ব্যয় বাড়াইতেছেন, অসন্তোষও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, ইহার অর্থ কি? এ আলোচনা বর্ত্তমানে অপ্রাসঙ্গিক নয়।

এই অসন্তোষের পিছনে কি আছে তাহা বলিতে গেলে কিছু ইতিহাস পর্য্যালোচনা দরকার। সরকার সেকালে এদেশে কতকগুলি ভারতীয় সাহেব সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন—যাঁহারা শিক্ষায় ও রুচিতে সাহেব হইয়া বিটিশ শাসনের কর্ণধার বা বাহন হইবেন। শিক্ষাটা আজিও সেই ভিত্তিতেই চলিয়া আসিতেছে, পরিবর্ত্তন হয় নাই বলিলেও হয়। তাহাদের প্রস্থানের পর এই সাহেবগণই শাসনতন্ত্র এবং সরকারী সমস্ত বিভাগ দখল করিয়া আছেন। অর্থাৎ বিটিশ গিয়াছে, কিন্তু ব্রিটিশ বুরোক্রেসী রহিয়া গিয়াছে। মনে পড়ে বাল্যকালে জনেক ব্যক্তির ভ্রাতা আত্মহত্যা করে—সে ভ্রাতৃশোকে না কাঁদিয়া পুলিশকে কি দিবে এই চিন্তায়ই কাঁদিয়া আকুল হইল—এবং ধার কর্জ্জ করিয়া কোনমতে পুলিশী জুলুমের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল সেই পুলিশ কংগ্রেসীগণকে ঠেঙ্গাইয়াছে, আজ ছাত্র ঠেঙ্গাইতেছে এবং সেইরূপই ঘুষ লইতেছে। শিক্ষা বিভাগেরও কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, যাঁহারা কংগ্রেসী কাজের জন্য স্কুলের সরকারী সাহায্য বন্ধ করিয়াছেন তাহারাই আজ শিক্ষা পরিকল্পনার কর্ণধার—পুরাতন মনোবৃত্তি তাহাদের আর নাই, প্রভুদের মনোবৃত্তি দূর হইয়া সেবার মনোবৃত্তি আসে নাই, আসিতে পারে না; কারণ তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গিই ঐরূপ। কাজেই খরচা বৃদ্ধি হইলেও তাহা শুভ হয় নাই।—

শিক্ষকগণের অবস্থা কি তাহা প্রথম বিচার্য্য। শিক্ষকগণ অর্থাৎ শিক্ষিত ভদ্রলোক, যাহাদের ভদ্রলোকের মত থাকিবার এবং বাঁচিবার মত রুচিজ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের উপার্জ্জন তুলনামূলক ভাবে নিম্নে দেওয়া হইল—

জুটমিলের দারোয়ান সর্ব্বসাকুল্যে (উপরি পাওনা ব্যতীত)		১১৭৲
„ শিক্ষিত শ্রমিক	২২৲—৩২৲ সপ্তাহ ··· মাসিক	৯৫—১৪০৲
„ সাধারণ "	১৪৸০ সপ্তাহে "	৬২৲
„ কেরাণী ···	··· ··· ···	১০২৸০
পোষ্টাফিসের পিওন ···	···	৬৫৲
গ্রাজুয়েট শিক্ষক (নতুন আইন) ···	···	৬৫৲
এম, এ, অধ্যাপক ···	··· ···	১০০৲
এম, এ, বিটি, ···	··· ···	৯০৲

অর্থাৎ একজন অশিক্ষিত শ্রমিক ও গ্রাজুয়েট শিক্ষকের জীবনের মান সমান। এবং এম, এ, বি, টি, শিক্ষকের মান শিক্ষিত শ্রমিকের অপেক্ষা কম। আলোচনা পরে করা হইবে।

অন্যান্য দেশে মাথা পিছু শিক্ষার ব্যয় নিম্নরূপ :—

আমেরিকা—১৬৷০
ইংলণ্ড- ১০/০
জার্ম্মানী—৯৲
রাশিয়া—৭৲
ভারতবর্ষ—৵০

অর্থাৎ শিক্ষা ব্যাপারে ভারতে খরচ নামমাত্র।

অন্যান্য প্রদেশে শিক্ষকের বেতন নিম্নরূপ—

	হেড মাষ্টার	গ্রাজুয়েট	আণ্ডার গ্রাজুয়েট
হায়দ্রাবাদ	৩০০৲	১৮০৲	৮৫৲
বোম্বাই	২৫০৲	১১৪৲	৯০৲
মাদ্রাজ	-	১৬৭৲	—
ইউ, পি,	২০০৲	১৬৫৲	৭২৲
বিহার	১৫০৲	১১০৲	[illegible]
পশ্চিমবঙ্গ	১৫০৲	৬৫৲	৫০৲

উপরিউক্ত হিসাব হইতে দেখা যায় বঙ্গদেশেই শিক্ষকের বেতন সর্ব্বাপেক্ষা কম কিন্তু সরকারী বিজ্ঞপ্তিতেই প্রকাশ জীবনযাত্রার খরচ বাড়তি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ কানপুরের পরেই। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষকগণের যে সর্ব্বনিম্ন বেতন হার ধরা হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ-

হেড মাষ্টার	এ—২৫০৲	গ্রাজুয়েট	বি, এ, বি, টি,	এম, এ, বি,টি.
	বি—২০০৲	৬৫৲	৭২৲	এম, এ,
	সি—১৫০৲			অনার্স বি, এ
				৯০৲

এখানে কয়েকটি বিষয় দ্রষ্টব্য। একজন এম, এ, বি, টি, যদি ভাগ্যবশে হেড মাষ্টার হন তবে তিনি ২৫০৲, ২০০৲, ১৫০৲ টাকা পাইবেন, এবং যদি সাধারণ শিক্ষক হন তবে ৯০৲ টাকা পাইবেন এবং একজন এম, এ বা বি, এ, অনার্স কলেজ হইতে আসিয়াই ৯০৲ পাইবেন এবং একজন ১৮ বৎসরের অভিজ্ঞ এম, এ, বি টি,ও ৯০৲ই পাইবেন। অভিজ্ঞতার মূল্য দেওয়া হইবে শোনা গিয়াছিল কিন্তু হয় নাই—হইলেও ৫৲—১০৲ হইবে। বর্ত্তমানে পাকিস্থানের বহু এম, এ, বি, টি, অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া সাধারণ শিক্ষকরূপে ৯০৲ পাইতেছেন, যেহেতু হেড মাষ্টার প্রতি স্কুলে একজনেই থাকেন।

ইহা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে প্রধান শিক্ষকগণের একটি সমিতি হইয়াছে, যাহাকে সরকারী প্রতিষ্ঠান না বলিলেও সরকারী নীতির সাহায্যকারী

সমিতি বলা যায়। প্রধান শিক্ষকগণ যেন শিক্ষকগণ হইতে বিশেষ শ্রেণীর জীব কোন একটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা হইয়াছে—বেতনের দিক দেখিলে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। শিক্ষকগণের ধর্ম্মঘট ব্যর্থ হওয়ার মূলে এই প্রধান শিক্ষক সমিতি—তাহারা ভিতর হইতে ধর্ম্মঘটে বাধা দিয়াছেন—পদমাহাত্ম্যে এবং পদমর্য্যাদার সুযোগে।

প্রধান শিক্ষকগণের মাহিনার সহিত সাধারণ শিক্ষকের এই বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত; কারণ ইহাই ছিল বুরোক্রেটিক নীতি। অন্যান্য প্রদেশে এরূপ উৎকট বৈষম্য নাই। I. C. S. ও I. P. S. I. M. S. গণকে রাজার দুলাল করিয়া সাধারণকে পীড়ন করিবার নীতি পুরাতন। ব্রিটিশের পরিত্যক্ত দুষ্টশাসনযন্ত্র-নির্ম্মিত নূতন আইন যে বুরোক্রেটিক হইবে ইহা আশ্চর্য্য কি? প্রধান শিক্ষকগণের দাপট অতিক্রম করিয়া যাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ না হয় ইহাই উদ্দেশ্য এবং সরকার আপাততঃ কিছু ফলও পাইয়াছেন। তাহা ছাড়া আর একটি চমৎকার আইন হইয়াছে—দুই বৎসর প্রত্যেককেই শিক্ষানবীশ থাকিতে হইবে—অর্থাৎ যিনি ১০ বৎসর শিক্ষকতা করিয়া যুক্তবঙ্গে সরকারী আইন অনুসারে Bonafide শিক্ষক ছিলেন তাহাকেও ২ বৎসর শিক্ষানবীশী করিতে হইবে। ধরুন ৪২ বৎসর বয়সের একজন শিক্ষক ৪৪ বৎসরে পাকা হইলেন এবং ৫৫ বৎসরে অবসর গ্রহণ করিবার সময়ে তাহাকে ৭৫।২।০ গ্রেডের ৯০৲ টাকায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বিদায় লইতে হইবে।

এই নূতন আইন প্রবর্ত্তনের ফলে একটা হতাশা দেখা গিয়াছে—ভারত স্বাধীনই হৌক আর যাহাই হৌক, শিক্ষকগণের যে কেহ নাই একথা নিশ্চিত, এমনি একটি অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছে—যাহা ছাত্রসমাজে সংক্রামিত না হইতেছে এমন নয়। একজন শিক্ষক—যদি তাহার বিবাহ করা বা সন্তানের জনক হওয়া অন্যায় না হয়, তবে তাহার ৬ জনের অর্থাৎ ২ জন পুরা ও ৪টি সন্তানের সংসার ৭৫৲ কিম্বা ৯০৲ টাকায় শুধু অনমাথাইও চালাইয়া দিতে পারিবেন না।

এই নয়া ব্যবস্থার ফল যাহা হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—(ক) প্রধান শিক্ষকের দাপট বৃদ্ধি ও সহকারীগণের প্রতি উপেক্ষা—আভ্যন্তরীণ অসন্তোষ, কাজের অসঙ্গতি, এবং শিক্ষাপ্রণালীর অবনতি (খ) সাধারণ হতাশা ও অসন্তোষ (গ) মুড়ি মিছরির একদর হেতু সহযোগিতার অভাব (ঘ) সরকারী সাহায্য স্কিমের বাহিরে থাকিবার মনোবৃত্তি এবং তাহা লইয়া দলাদলি—বিশেষতঃ প্রধান শিক্ষক ও সহকারীদের মধ্যে (ঙ) ছাত্র সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা,—কারণ শিক্ষকগণ যদি সাহায্য না করেন তবে ছাত্রগণকে নিয়মানুবর্ত্তী রাখা প্রধান শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব নয়। (চ) উচ্ছৃঙ্খলতা হইতেই নানা অশান্তি এবং তাহা হইতেছে (ছ) সরকারী পুলিশ খাদে অত্যধিক খরচ। অর্থাৎ শিক্ষার খরচা পুলিশ খরচায় পরিণত হইতেছে—

সামাজিক দিকে শিক্ষকগণ উপেক্ষিত, কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে টাকাই সম্মানের মাপকাঠী। কাজেই এই ব্যাধিগ্রস্ত সমাজে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা আর নাই। থার্ড ক্লাশ পড়িয়া একজন ফ্যাকটরীর ফোরম্যান ৩০০৲ পায় এবং কোট পেন্টালুন পরিয়া সিগারেট খায়, একজন এম. এ. শিক্ষক ছেঁড়া কাপড় পরে, বিড়ি খায়—সুকুমারমতি বালকেরা শিক্ষাকে তাই অশ্রদ্ধার চোখে দেখে—শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ থাকে না।

শিক্ষকের বেতন ব্যাপারে যে হাস্যকর বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, সাধারণভাবে এইরূপ বহু হাস্যকর বৈষম্য আছে। মাতৃভাষার উন্নতি সম্মান প্রভৃতি লইয়া চেঁচামেচির অন্ত নাই অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, ইতিহাস, ইংরাজি প্রভৃতি বিষয়ের এম, এ, হেডমাষ্টারীর উপযুক্ত, কিন্তু বাংলায় এম, এ, নয়। কার্য্যতঃ বহু বি, এ, হেডমাষ্টার হয় কিন্তু বাংলায় এম, এ নয়—অর্থাৎ সে বি, এ পাশ করে নাই এরূপ একজন আণ্ডার গ্রাজুয়েট। বাংলা জানাটাই তাহার মূর্খতা ও ইংরাজী অজ্ঞতার প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। ইহা ছাড়াও ডিগ্রি যে বিদ্যার মাপকাঠি নয় একথা সাধারণে বোঝে না—সরকারও বুঝেন না।

মোটের উপর সরকারী নয়া ব্যবস্থায় স্কুলের আভ্যন্তরীণ সহযোগিতা (co oparation) নষ্ট হইয়াছে এবং শৃঙ্খলা নষ্ট করিয়াছে, যাহার অবশ্যম্ভাবী ফল ছাত্রগণের উচ্ছৃঙ্খলতা ও কুশিক্ষা এবং এই উচ্ছৃঙ্খলতা একদিন রাজনৈতিক দলের প্রভাবে বিরাট অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ইহার সম্বন্ধে ভাবিবার সময় আসিয়াছে—শিক্ষকগণের মনের এই অসন্তোষ এখন ধূমায়িত, কিন্তু বহ্নিমান হইয়া যে কোন সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বানচাল করিয়া দিতে পারে। খুঁজিয়া দেখিলে দেখা যায় প্রতি স্কুলে শিক্ষকগণের দুইটি দল আছে—একটি হেডমাষ্টার ও তাহার স্তাবকগণ, অন্যটি সহকারী শিক্ষকগণ। এই উভয়ের বিরোধের মাঝে শিক্ষা ডুবিয়া যাইতেছে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ে—কোন স্কুলের জনৈক ভয়ঙ্কর হেডমাষ্টার ছেলেরা নকল করে বলিয়া নোটিশ দিলেন--"invigilators must be on their legs during the examination hours." ফল হইল। সকল শিক্ষক কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া ক্রমাগত হলে ঘুরিতে লাগিলেন এবং ছেলেরা অবাধে নকল করিতে লাগিল। বর্ত্তমানের স্কুলগুলি এই ভাবেই চলিতেছে—

এই অসহযোগিতার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে "হেডমাষ্টারী" ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া প্রয়োজন। হেতু আমাদের দেশে Arnoldএর মত হেডমাষ্টার নাই এবং হইবার সুযোগও নাই। এই ব্যবস্থা সকল স্কুলের পক্ষে সম্ভব না হইলেও বর্ত্তমানে বেশীর ভাগ স্কুলের পক্ষে সম্ভব; প্রধান বিষয়ের Senior teachersদের একটি সমিতি বা council করিয়া তাহারাই স্কুল পরিচালনা করিলে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সহযোগিতা আশা করা যায়। ভোটে নির্ব্বাচিত সমিতির সম্পাদক (Secretory) (executive Head) বা প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিবেন তজ্জন্য তিনি একটি allowance পাইবেন। এবং তিনি এক বৎসর বা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন। স্কুলের উন্নতি অবনতি নিয়মানুবর্ত্তিতার জন্যে তাহারা একক ও সমষ্টিগতভাবে (individually and collectively) দায়ী থাকিবেন। শিক্ষকগণ তাহাদের ডিগ্রী ও অভিজ্ঞতা অনুসারে বেতন পাইবেন। ইহার ফলে পরস্পরের প্রতি সমবেদনা গড়িয়া উঠিবে এবং ব্যক্তিত্ববান ব্যক্তিই ভোটে সম্পাদক হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা সুশৃঙ্খলতার সহিত কার্য্য চালাইতে পারিবেন—এবং তাহার হঠকারিতা নিরন্তর সহযোগীদের দ্বারা ব্যাহত হইবে অথচ অক্ষমতা কোন সময়েই আত্মপ্রকাশ করিবে না। শিক্ষকগণের বাঁচিয়া থাকিবার মত বেতন দিয়া ও শিক্ষাদানের সুযোগ দিয়াই শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি করা সম্ভব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

সারা পঞ্চগ্রাম ধ্বংসোন্মুখ। কিন্তু ধ্বংসোন্মুখ জীবনও ন্যায়রত্নের দিকে যেন শেষ শক্তি সংগ্রহ করিয়া বিমুখ হইয়া—পাশ ফিরিয়া শুইয়াছে।

টোল হইতে ছাত্রেরা চলিয়া গেল। অধ্যাপক ন্যায়রত্নেরই ছাত্র, তিনিও সবিনয়ে বিদায় লইলেন। ন্যায়রত্ন তাঁহার হাত হইতে চাবী লইয়া দীর্ঘকাল পর বাড়ীতে ফিরিয়া মন্দিরের দ্বার খুলিয়া বিগ্রহকে প্রণাম করিয়া আপন মনেই হাসিয়াছিলেন। আগের কাল হইলে তিনি ওই প্রস্তর বিগ্রহের সঙ্গেই আপন মনে কয়েকটা কথা বলিতেন, কিন্তু আঘাতের পর আঘাতের মধ্য দিয়া তিনি এমনি এক উপলব্ধির স্তরে পৌছিয়াছিলেন যে, বিগ্রহের সঙ্গে কথা বলিবার মত হৃদয়াবেগ বা বিশ্বাস তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন অথবা অতিক্রম করিয়াছেন। যাক সে কথা। ঠাকুরের সঙ্গে ভক্তিগদগদ চিত্তে কথা বলুন বা না-বলুন, তাঁহাদের বংশের গৃহদেবতার পূজা তাঁহাকে করিতে হইবে। তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্র অঙ্গহানি হইতে দিলেন না।

কিন্তু আশী বৎসর বয়সে কাজটা তাঁহার পক্ষে সহজ হইল না। সমস্ত সংসারটায় মানুষ তিনি একা। প্রথম দিনই ভোরবেলা শয্যাত্যাগ করিয়া স্নানে বাহির হইতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বাড়ীর দরজায় জল দিয়া মার্জ্জনা করার প্রয়োজন—তাহার পর—বাড়ীটা পরিষ্কার করিতে হইবে, ঝাঁট দেওয়া—নিকানো—পূজার বাসন মাজা—কাজ অনেক। কাজগুলির হিসাব তাঁহার ভুল হইবার নয়, কিন্তু এ সব কাজের অভিজ্ঞতা তাঁহার নাই। খুঁজিয়া পাতিয়া ঝাঁটা গাছটা হাতে করিয়া ন্যায়রত্ন হাসিয়া ফেলিলেন। হঠাৎ হাসিটা বাড়িয়া গেল—তবু তো এঁটো বাসন নাই! কিছুক্ষণ ঝাঁটা টানিয়া ঝাঁটাগাছটাকে শেষ পর্য্যন্ত ফেলিয়া দিতে হইল। ভাবিয়া চিন্তিয়া গৃহের গণ্ডীকে সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়া সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিলেন। ঠাকুরের ঘর—ঠাকুর ঘরের বারান্দা—এবং টোল বাড়ীর মাত্র একখানি ঘর—এই লইয়া গৃহের গণ্ডী স্থির করিলেন। সেইটুকু পরিষ্কার করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন স্নানের জন্য। ময়ূরাক্ষী এখান হইতে খানিকটা দূরে। গোটা পঞ্চগ্রামের মাঠখানা পার হইতে হয়। এখানে স্নানের জন্য দীঘি আছে। গ্রামের প্রান্তে বহুকালের মজা দীঘি।

দীঘির ঘাটে আসিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন।

পঞ্চগ্রামের মাঠের পাঁচটি আলপথে পিঁপড়ের সারির মত মানুষের সারি। চলিয়াছে দ্বারমণ্ডল ঘাটের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত কণ্ঠের গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছে। পাঁচটা গানের সুর ও কথা একসঙ্গে মিশিয়া এমনি বিচিত্র রাগিণীর সৃষ্টি করিয়াছে যে বুঝিবার কিছু উপায় নাই।

—বাবাঠাকুর!

ন্যায়রত্ন পিছন ফিরিয়া দেখিলেন—একটি প্রৌঢ়া বিধবা একটা বোঝাই ঝুড়ি মাথায়, তাঁহাকে দেখিয়াই বোধহয় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বোঝার ভারে তাহার ঘাড়টা কাঁপিতেছে। মুখখানা সম্পূর্ণ অনাবৃত, এই অগ্রহায়ণের শীত-শীতল প্রভাতে—কতকটা ঠাণ্ডার জন্য কতকটা লজ্জার জন্য মুখখানি লাল হইয়া উঠিয়াছে, ভারের চাপে সে এমনি আড়ষ্ট যে চোখ তুলিয়াও চাহিতে পারিতেছে না, বাবাঠাকুর বলিয়া ডাকিয়াও সে মাটির দিকে চাহিয়া আছে। ন্যায়রত্ন চিনিতে পারিলেন না—প্রশ্ন করিলেন—তোমাকে তো চিনতে পারলাম না মা?

—আমি বাবাঠাকুর—। একটু থামিয়া বোধ হয় ভাবিয়া লইল—কি বলিয়া অর্থাৎ কাহার নাম বলিয়া পরিচয় দিবে। অবশেষে বলিল—আমি বাবাঠাকুর—নারকেলে-কুলতলা বাড়ীর কন্যে চম্পার ভাইয়ের পরিবার।

চমকিয়া উঠিলেন ন্যায়রত্ন। বর্দ্ধিষ্ণু সদগোপ বাড়ীর বধূ। নারকেলে কুলের গাছ বাড়ীতে ছিল বলিয়া কুলতলার

বাড়ী নামেই বাড়ীটা এ অঞ্চলে পরিচিত। ঐ বাড়ীর বিধবা কন্যা চম্পা এককালে সদগোপ পাড়ার মুখপাত্রী ছিল। অদ্ভুত মেয়ে ছিল সে। যেমন তাহার সাহস—তেমনি মার্জ্জিত কথাবার্ত্তা—তেমনি ছিল তাহার উদার হৃদয়। চম্পা অনেক দিন মারা গিয়াছে। বিশ্বনাথের বিবাহের বৎসরেই বোধ হয়। সেই বাড়ীর বধূ এই শীতের ভোর বেলা—এতবড় একটা বোঝা মাথায় কোথায় চলিয়াছে? তিনি প্রশ্ন করিলেন—কোথায় চলেছ মা? এই বোঝা মাথায়—।

মেয়েটি বলিল—জংসনে যাচ্ছি বাবা। ক্ষেতের বেগুন—মূলো—পালংশাক—নিয়ে যাচ্ছি—

—তুমি নিজে—

—হ্যাঁ বাবা। নিজে বেচলে—দুটো পয়সা বেশী পাই। পাইকারেরা আসে—তারা তো বাবা জংসনের দর দেবে না! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আর বাবা—সে রামও নাই—সে অযুধ্যেও নাই। এখানে কে কিনবে? কে খাবে? হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া বলিল—আমি যাই বাবাঠাকুর—ওই সব এসে পড়েছে।

ন্যায়রত্ন দেখিলেন—মেয়ে পুরুষে আরও প্রায় দশ বারোজন গ্রাম হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দ্বারমণ্ডলের ঘাটের পথ ধরিল। মেয়েদের মাথায় ঝুড়ি, পুরুষদের কাঁধে ভার। ন্যায়রত্ন বলিলেন—ওরা? ওরা কারা মা? ওই যে পিঁপড়ের সারির মত। মেয়েরা গান গাইতে গাইতে চলেছে—? ওরা? ওরা সব মজুরেরা না? কলে খাটতে যাচ্ছে? তিনি দেখাইয়া দিলেন—যাহাদের তিনি ঘাটে আসিয়াই দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

—হাঁ বাবাঠাকুর! সব চললো জংসনে খাটতে। তিন পহর খাটবে—বেটাছেলে আট আট আনা—মেয়েছেলে দু-আনা মজুরী। গাঁয়ে ঘরে কাজও নাই, থাকলেও ও মজুরী কে দেবে বলুন। ওদের দোষ কি বাবা—এই আমি হতভাগী—আমার কি নিজের মাথায় ঝুড়ি বয়ে জংসনে তরকারী বিক্রীর কথা বাবা? কিন্তু কি করব?

মেয়েটি চলিয়া গেল, তরিতরকারীবাহী মেয়ে-পুরুষের দল—দীঘির ওদিকের পাড়ের উপর দিয়া যাইতেছিল—সে দ্রুতপদে গিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিল, ন্যায়রত্ন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তিনি ভাবিতেছিলেন সেকালের কথা! সমৃদ্ধ পঞ্চগ্রাম। ফসল সমৃদ্ধ মাঠ, ধান-ভরা মরাই, মরাই-ভরা বিচালী-ভরা খামার, ঘরে ঘরে তরির বাগান—শাকের ক্ষেত, লাউ কুমড়া উচ্ছের মাচা, জোয়ান চাষীর দল, কত মানুষ—নাতিপুতিতে ভরা সুখের সংসার, সাদামাথা আশী পঁচাশী নব্বুই বছরের মাতব্বর সব, হা-হা করিয়া প্রাণমাতানো হাসি, বারো মাসে তের পার্ব্বণ, সে-সবের আর কিছুই নাই। দশ বৎসর পূর্ব্বেও তিনি যখন কাশী যান—তখনও যাহা ছিল—আজ তাহা নাই। বার বৎসরে একটা যুগ হয়—কিন্তু বার বৎসরও লাগিল না।

ঘাটে নামিতে সুরু করিলেন। হঠাৎ নজরে পড়িল—ওদিকের পাড়ে তরিতরকারীবাহীর দল থমকিয়া দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে তাঁহাকেই দেখিতেছে। কুলতলা বাড়ীর চাষী-বউ আঙুল দিয়া তাঁহাকেই দেখাইতেছে। ম্লান হাসি তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

স্নান সারিয়া ফিরিলেন, সমস্ত পথটার মধ্যে একজনও পুরুষের সঙ্গে দেখা হইল না। কয়েকটি অল্পবয়সী মেয়ে—ঘাটের উপর বা পথের ধারে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে সবিস্ময়ে দেখিল।

মহাগ্রাম পূর্ব্বে ছিল—আঠারো পাড়ায় গ্রাম। তিনি নিজেও আঠারো পাড়া দেখেন নাই, তবে বারোটি পাড়া তিনি দেখিয়াছেন। পণ্ডিত-পাড়া অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য পল্লী, কায়স্থ পল্লীর নাম ছিল মুন্সীপাড়া, বাজার পাড়াটা ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বড়—গন্ধবণিক—মোদক—তৈলিক—স্বর্ণকারদের বাস ছিল—দোকানও ছিল, একটা পাড়ায় বাস ছিল সদগোপ এবং গোপেদের, তন্তুবায় পল্লী, কর্ম্মকার পল্লী, কুম্ভকার পল্লী, রজক পল্লী, সাহা পল্লী, গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে ছিল—বাগদী—বাউড়ী—ডোম—হাড়ী প্রভৃতির বাস। আর একটি পল্লী ছিল—গ্রামের উত্তর দিকে—একটি পুকুরের পাড়ে কয়েক ঘর বৈষ্ণবের বাস—বৈরাগী পাড়া। তাহারই কাছেই ছিল—পটুয়া পাড়া।

বহু পূর্ব্বকালে—শঙ্খবণিকদের একটি স্বতন্ত্র পল্লী ছিল, যোগী সম্প্রদায়ের বাস ছিল, ওই দক্ষিণ দিকে ছিল—লাউড়ে পাড়া বা মাঝি পাড়া। বন্দর ঘাটের নৌকা চলাচলের কালে—তাহারা বড় বড় নৌকা লইয়া দেশ

বিদেশ ঘুরিয়া আসিত। সে সব অনেক কাল পূর্ব্বে—অনেক কাল।

—কে গো? কে? বলি কে যাও গো?

গ্রামের মধ্যেই খানিকটা বসতিহীন খোলা জায়গা। অনেকখানি জায়গা—প্রায় তিন চার বিঘা তো বটেই—বেশীও হইতে পারে; ন্যায়রত্ন থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ও—তন্তুবায় পল্লীর পড়িয়ানি কাটার মাঠ। ওই যে সারি বন্দী চারিটা গাছ, একটা বকুল—একটা অশথ—একটা শিরীষ—একটা বট। তন্তুবায় পল্লীর মধ্যে এই স্থানটুকু চিরকাল খালি পড়িয়া আছে। এইখানে তন্তুবায়েরা কাপড় বুনিবার পড়িয়ানি সুতা বাঁটিয়া লইত। মোটা পাথরগুলি আজও পড়িয়া আছে। ওই গাছ চারিটা ছায়া রচনা করিবার জন্য বহুকাল পূর্ব্বে তন্তুবায়দের প্রধানেরা লাগাইয়াছিল, বকুল এবং অশথ গাছ দুইটা তাহাদেরই প্রতিষ্ঠা করা গাছ। কিন্তু কে ডাকে? গোটা জায়গাটাই তো খাঁ-খাঁ করিতেছে।

—বলি, সাড়া দাও না ক্যানে গো? কানা মানুষ নিয়ে আমোদ লাগছে বুঝি?

ন্যায়রত্ন এবার সাড়া দিলেন—আমি শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন, বাবা। তুমি কে?

লোকটি যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—বাবাঠাকুর! ইহার পরই খানিকটা আবেগময় ভাষাহীন স্বর—যেন আপনি তাহার গলা হইতে বাহির হইয়া আসিল।

ন্যায়রত্ন আবার বলিলেন—তুমি কে বাবা? তুমি কই? হৃদয়াবেগে তিনিও খানিকটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন, কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিয়াছেন—বয়স্ক বৃদ্ধ, দৃষ্টিহীন বৃদ্ধ যে তাঁহার সমসাময়িক হইবে—ইহাতে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। সম্ভবত—তন্তুবায় পল্লীর কেহ হইবে। কে? দশবৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি দেশত্যাগ করেন—তখনও এ পল্লীতে প্রধান ব্যক্তি তিনজন বাঁচিয়াছিল, ফকীর দাস, রমন দাস ও ষষ্ঠী দাস।

—বাবাঠাকুর! বাবাঠাকুর! লোকটি কাঁদিতেছে। এবার ন্যায়রত্ন দেখিলেন—গাছতলার আড়াল হইতে লাঠী ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এক বৃদ্ধ। বাঁকিয়া গিয়াছে বুড়া। ন্যায়রত্নের দৃষ্টি এখনও আছে, কিন্তু বয়সের প্রভাবে দূর হইতে চিনিতে পারিলেন না। লোকটি লাঠী ঠুকিয়া পথের দিকেই আগাইয়া আসিতেছে। দৃষ্টিহীনতার মধ্যেও সে চলা-ফেরার অভ্যাসে দিব্য চলিয়া আসিতেছে—মধ্যে মধ্যে দাঁড়াইয়া হাতের লাঠীটা দিয়া সামনে হাতড়াইয়া দেখিয়া লইতেছে—লাঠীটা কিছুতে ঠেকিতেছে কি না—অর্থাৎ—কোন বাধা বিঘ্ন সামনে আছে কি না!

—ষষ্ঠী দাস! তুমি এমন হয়ে গিয়েছ বাবা!

ষষ্ঠী দাস কথা বলিতে পারিল না, দন্তহীন মুখের লোল ঠোঁট দুটি—ফাল্গুনের অশথবৃক্ষের শেষ পাকাপাতাটির মত থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

—আপুনি দেবতা—। আপুনি—। আমার কপাল—বাবা—এই দেখেন—। কথা সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। হঠাৎ লাঠীগাছটা ফেলিয়া দিয়া—বসিয়া পড়িল—তারপর মাটীর উপর মাথাটা লুটাইয়া দিয়া বলিল—প্রণাম করি বাবা, প্রণাম—করি।

ন্যায়রত্নের চোখে জল আসিল।

—পূজো হয়ে গিয়েছে দেবতা?

মৃদু হাসিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—পায়ের ধূলো নেবে?

—আজ্ঞে? খানিক জোরে বলেন বাবা, শুধু চোখ নয় বাবা—কানের মাথাও খেয়েছি!

—ন্যায়রত্ন কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়াই বলিলেন—নাও—পায়ের ধূলো নাও তুমি।

—নোব? হাত বাড়াইয়াও ষষ্ঠী প্রশ্ন করিল।

—নাও।

হাতড়াইয়া পা দুটি খুঁজিয়া লইয়া বৃদ্ধ মুখে কপালে মাথায় বুকে ধূলা বুলাইয়া লইয়া বলিল—আজ তিন বছর মরণের দিন গুণছি। বিধেতাকে বলি—তোমার বিচের নাই। এ বেঁচে থেকে আমার লাভ কি? তা—। বৃদ্ধের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—বলিল—তা' সাথক হ'ল বাবাঠাকুর। মরে গেলে—এ ধূলো পেতাম না। আঃ! আঃ! বুক জুড়িয়ে গেল! আর কঙ্কনার বাবুরা—চিহরি ঘোষ মাশায় বলে কিনা বাবা—পাঁচখানা গায়ের খবর পাঠিয়ে বলছে বাবা যে, ঠাকুরমাশায়—মাহাত্মি হারিয়েছে, নাতি মুসলমান হয়েছিল—তাঁকে আর তোমরা মেনো না! বাবা কঙ্কনার বাবুরা বামুন—সে তো নামে। জানি তো সব। আর চিহরিকে দেখলাম চাষ করতে লাঙল ধরে, তা'পরেতে—হ'ল পত্তনীদার—তা'পরেতে জমিদার—

হাকিম—তা হ'লেও তো সদগোপ! সে বাবা—আপনার মত দেবতার কুচ্ছো ক'রে—! শুনে আমার মনে হ'ল বাবা—যাক পিথিমী রসাতলে যাক—গিয়েছেই তো—আরও যাক—আরও যাক। মিছে কথার কি সীমে নাই বাবা! আপনাদের বংশ দেবতার বংশ—সেই বংশের ছেলে—সে জাত দেবে—মোসলমান হবে? হে হরি—হে ভগবান—হে কালী—হে দুগ্গা—মুখ খ'সে যায় না—

ন্যায়রত্ন বলিলেন—তুমি তাদের মিথ্যে অভিসম্পাত করছ ষষ্ঠী!—আমি যেদিন এখান থেকে কাশী চলে যাই তখন তো আমি গোপন ক'রে যাই নি যে, আমার নাতি ধর্ম্মত্যাগ করেছে—নাস্তিক হয়ে—গলার পৈতে ফেলে দিয়েছে। সে কথা কি তুমি শোন নি?

—শুনেছি বাবা—শুনেছি। কিন্তুক—সে কথা—আর এ কথা কি এক কথা হ'ল বাবা? আর আমার খোঁজে দরকার কি বল? মরে যে গেল—সে কোথায় জন্মাল—তার খোঁজ কে রাখে? এও তাই।

বুড়া দৃষ্টিহীন চোখে ন্যায়রত্নের দিকে অর্থহীনভাবে চাহিয়া রহিল—কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না, অবশেষে বলিল—মরে যে ভূত-ও হয় বাবাঠাকুর, মরণ মানেই তো জন্ম হয় না। কিন্তুক—আপনকার নাতি কি সত্যিই—

—হাঁ ষষ্ঠী। মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত সে হয়েছিল। তারপর অবিশ্যি—আবার ও না কি হিন্দু হয়েছিল। কিন্তু তার পক্ষে দুটোই মিছে কথা। মুসলমান হওয়াও মিথ্যে—আবার হিন্দু হওয়াও মিথ্যে!

দন্তহীন মুখে হাঁ করিয়া সে উপরের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া রহিল, সম্ভবত তাহার মনের মীমাংসাহীন প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতেছিল—চিরাচরিত ধারায়। ন্যায়রত্ন বলিলেন—আমি চললাম ষষ্ঠী।

ষষ্ঠী উত্তর দিল না। সেই উপরের দিকেই মুখ তুলিয়া দৃষ্টিহীন চোখে কুয়াসার মত গাঢ় সাদা পবিমণ্ডলের দিকে চাহিয়া বসিয়াই রহিল।

* * *

ন্যায়রত্ন বৃদ্ধ হইয়াছেন তবু দেহ তাঁহার সক্ষম আছে। পূজা সারিয়া ভোগ রান্না করিয়া, ভোগ দিয়া—অপরাহ্নে একবার গ্রামখানা ঘুরিতে বাহির হইলেন। তিনি গ্রামে ফিরিয়াছেন—এ সংবাদ সকলে না-পাইলেও অনেকে পাইয়াছে, কিন্তু তবু কেহ দেখা করিতে আসে নাই। এ জন্য তাঁহার মনে ক্ষোভ হয় নাই, কিন্তু বেদনা খানিকটা অনুভব করিয়াছিলেন। সে অবশ্য কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য। তাহার পরই তিনি নিজে-নিজেই হাসিয়াছিলেন। মানুষকে অকৃতজ্ঞও বলেন নাই, ঘৃণাও করেন নাই। বরং প্রণামই জানাইয়াছেন। অপরাধ তো তাহাদের নয়—অপরাধ তাঁহার। দীর্ঘ কয়েকশত বৎসর ধরিয়া যাহা তাঁহারাই বুঝাইয়াছেন—তাহাই তাহারা বুঝিয়া আসিয়াছে, অনেক মাশুল দিয়া বুঝিয়া আসিয়াছে। আজ সেই বোঝাবুঝির তত্ত্বকে এমন ভাবে 'না' করিয়া দিলে তাহারা যে দেউলিয়া হইয়া যাইবে, কি লইয়া বাঁচিবে? জীবনে অনেক মূল্য দিয়া অনেক আঘাত সহিয়া তিনি আজ যে সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন—যে উপলব্ধির বলে আজ তিনি ওই অরুণা মেয়েটিকে আপনার পৌত্রবধূ বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহারই গৃহে আতিথ্য গ্রহণে উদ্যত হইয়াছিলেন—সে সত্য প্রকাশ করাও সহজ নয়—প্রকাশ করিলেও—যাহারা তাঁহার মত আঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া কালের অনিবার্য্যতাকে উপলব্ধি করে নাই—তাহাদের পক্ষে গ্রহণ করাও সহজ নয়। তিনি তো নিজের চোখেই দেখিয়াছেন—অগ্রহায়ণের শীতজর্জ্জর রাত্রির শেষ প্রহরে এ অঞ্চলের মানুষের কত বড় জনতা সকল দৈহিক কষ্ট উপেক্ষা করিয়া গভীর আন্তরিকতা লইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে জংসন ষ্টেশনে ছুটিয়া গিয়াছিল; তাঁহার পায়ের ধূলা লইবার জন্য তাহাদের সে কি ব্যাকুল বাসনা! তাহারা আজ যে ওই একটি ঘটনায়—এমনভাবে তাঁহার দিকে বিমুখ হইয়া বসিয়াছে—সে কি সহজ বেদনায়? অনিবার্য্য অবশ্যম্ভাবীরূপে যাহা ঘটিয়াছে তাহাকে সহজভাবেই গ্রহণ করিয়া তিনি নিজেই বাহির হইলেন।

এক একটি করিয়া পাড়া ঘুরিলেন।

ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য পল্লীতে পুরুষ প্রায় নাই। বৈদ্যেরা বাস পর্য্যন্ত তুলিয়া চলিয়া গিয়াছে। তিনি যখন কাশী যান—তখনও বৈদ্য ছিল তিন ঘর। তিন ঘরের একঘর এখন কলিকাতায়—একঘর সদর শহরে, একঘর জংসনে। জংসনে যে ঘরটি আছে—সেই ঘরের কর্ত্তা নিরঞ্জন সেন—কবিরাজী করেন—ছেলে মেয়েরা পড়ে। কলিকাতায় যে ঘরটি আছে—সে ঘরের ছেলে এখন বড় চাকুরে। সদর

শহরে যিনি আছেন তিনি উকীল। ব্রাহ্মণ ছিল বিশ ঘর। তাঁহাদের অবশিষ্ট ঘর দশেক। পাঁচ ঘর শেষ হইয়া গিয়াছে। পাঁচ ঘর চাকুরী সূত্রে বাসায় থাকে। বাকী দশ ঘরের অবস্থা মর্ম্মান্তিক। তিন ঘরের ছেলেরা বিড়ি বাঁধে জংসনে, জন ছয়েক কলে চাকরী করে—পাচকের চাকরী।

এক ঘরের দুটি ভাই কঙ্কনায় বাবুদের বাড়ীতে চাকরী করে, দেব সেবা করে। জানিয়া শানিয়া ফেলিলেন ন্যায়রত্ন। তিনি তাহাদের জানেন, বাল্যকালে ইংরাজী ইস্কুলে পড়িতে গিয়াছিল কিন্তু পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া নীচের দিকের তিনটি শ্রেণীতে কাটাইয়া ইস্কুল ছাড়িয়া তাঁহার টোলে আসিয়া ঢুকিয়াছিল, বৎসর খানেক টোলে পড়িয়া—কঠিন সংস্কৃত পড়ায় ইস্তফা দিয়া—বেকার হইয়া বসিয়াছিল। অবশেষে ওইটুকু সংস্কৃত বিদ্যার জোরে কঙ্কনার বাবুদের পোষ্য কয়েকটি বিগ্রহের পূজার ভার লইয়াছে। বিগ্রহ পাথরের, বাবুরা সংস্কৃত জানেন না, বেশী খরচ করিতেও নারাজ, সুতরাং স্বল্প বেতনে উপবীত-ধারী ব্যক্তি দুটিকে নিযুক্ত করিয়াছেন; তাহারা উচ্চকণ্ঠে অনুস্বরে বিসর্গ লাগাইয়া যাহাই বলিয়া যাক—তাহাতেই তাঁহারা খুসী।

একঘরের একটি ছেলে জংসনে কংগ্রেসের আড্ডায় আসর পাতিয়াছে। অন্য দুটি ছেলে—চাকরী করে মাড়োয়ারীর গদীতে। ডবল চাকরী—ভাতও রাঁধিতে হয়—আবার গদীর অন্য কাজও করিতে হয়।

বাকী তিনটি ঘরের দুটি ঘরের পুরুষেরা বেকার; একজনের একটা পেশা আছে—পিতৃদায়—মাতৃদায়গ্রস্ত সাজিয়া দেশে-দেশান্তরে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। একজন—শিবকালীপুরে গগন ডাক্তারের আড্ডার সভ্য। একঘরের পুরুষ অভিভাবক নাই। শুধু দুটি বিধবা আছে।

বাজার পাড়াটায় দশ বারো বৎসর পূর্ব্বেও শনি মঙ্গল বারে হাট বসিত। দুই তিনখানা গ্রামের লোক আসিয়া জমিত। জংসন হইতে গরুর গাড়ী লইয়া বড় ব্যবসায়ীরা আসিয়া ধান চাল তরিতরকারী কিনিয়া লইয়া যাইত। মোদকদের ছোটখাটো দোকান বসিত—তেলে ভাজা—বাতাসা পাটালী—মণ্ডা রসগোল্লা বিক্রী করিত। তন্তুবায়েরা মোটা কাপড়, গামছার দোকান খুলিত। আজ সে হাটও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বাজারে মাত্র খান তিনেক মুদীর দোকান আছে, নামে মিষ্টান্নের দোকান হইলেও বাতাসা কদমা পাটালীর দোকান দুখানা অবশিষ্ট; তৈলিকদের বাড়ীতে ঘানি নাই; জংসনে তেলের কল বসিয়াছে, তৈলিকেরা চাষ করে; মহাজনী করে; একজন জংসনে খুলিয়াছে ফলের দোকান।

এক সদগোপ পল্লীর মানুষেরা আপন বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আছে, ঘর অনেক কমিয়াছে, দু চারজন শহরে বাজারে চাকরের কাজ গ্রহণ করিয়াছে—কিন্তু মোটামুটি তাহারাই যেন বাঁচিয়া আছে। গ্রামের শেষ প্রান্তে বাউড়ী-পাড়া প্রায় খাঁ-খাঁ করিতেছে। ঘর দুয়ার বন্ধ—উঠানে পাঁদাড়ে আশেপাশে মুরগী ছাগল চরিয়া বেড়াইতেছে; দুই চারিটা কুকুর উঠানে শুইয়া ঝিমাইতেছে; এক একটা গাছতলায় বৃদ্ধ অথর্ব্বেরা বসিয়া তামাক খাইতেছে; দুইটা বুড়ী পরস্পরের মাথার উকুন বাছিতেছে। বাকী সব গিয়াছে জংসনে। উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে বৈরাগী পাড়ায় মাত্র ঘর দুই বৈষ্ণব অবশিষ্ট। তাহার পাশে পটুয়াপাড়াটা একেবারে নিশ্চিহ্ন বলিলেই হয়, একখানা ঘরও অবশিষ্ট নাই, পড়িয়া আছে কতকগুলি ধ্বংসস্তূপ।

—রাধাগোবিন্দ প্রভু। প্রণাম হই!

বৃদ্ধ বাউল হরিদাস আজও বাঁচিয়া আছে। গাছতলায় বসিয়া সে তামাক খাইতেছিল। বৃদ্ধ ন্যায়রত্নকে দেখিয়াই চিনিয়াছে। ন্যায়রত্নও তাহাকে চিনিলেন। বলিলেন—হরিদাস! বেঁচে আছ?

—গোবিন্দের ইচ্ছে প্রভু। মরি নাই। ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছি—লোকজন মরে যাচ্ছে দেখছি, ফি জনকে বলছি—ও ভাই গিয়ে সেখানে বলিস—হরিদাসের ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিতে! তা কোথায় কি? ঘণ্টাও বাজে না—পালাও ফুরোয় না। আপনি—

—আমারও তাই হরিদাস!

—আপনার বোধ হয় কাজ আছে প্রভু! কাজ আপনাকে করতে হবে।

—তা-হলে—ওই কথাটা নিজে ভাব না কেন হরিদাস?

—ওই দেখেন বাবা, কিসে আর কিসে—ধানে আর তুষে। তুষে আগুন ধরালেই ছাই।

হাসিলেন ন্যায়রত্ন। হরিদাসের সঙ্গে তর্ক করিয়া লাভ নাই। ওই বিনয়ই উহার জীবনের ধর্ম্ম-তত্ত্ব—তৃণাদপি সুনীচেন—। ও কিছুতেই নিজের মূল্য স্বীকার করিবে না।

ও কথা ছাড়িয়া তিনি বলিলেন—পটুয়ারা আর কেউ বেঁচে নেই হরিদাস? গোটা পাড়াটা—

হরিদাস চকিতে একবার ওই দিকে তাকাইয়া লইয়া বলিল—বেঁচে আছে বাবা। তবে পাড়াটা নাই। ব্রজ ছেড়ে সব মথুরা গেলেন বাবা! হরিদাস হাসিল—বলিল—ওরা নাম মাত্র ধর্ম্মে মুসলমান ছিল বাবা, এবার সব পাকাপোক্ত ক'রে মুসলমান হয়ে গেল। সব উঠে গিয়েছে কুসুমপুরে। নতুন পাড়া ক'রে বসেছে সেখানে, হিন্দু নাম টাম ছেড়ে—ইসলামী নাম নিয়েছে। শুনছি এইবার সেখেরা ওদিকে নিয়ে করণ কারণও করবে।

ন্যায়রত্ন এবার তাকাইলেন—কুসুমপুরের দিকে।

সামনেই শিবকালীপুর; শিবকালীপুরের উত্তর পশ্চিম কোণে কুসুমপুর। কোণাকুণি উত্তর পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে বিস্তীর্ণ মাঠ। গ্রামগুলি বহুকালের বৃক্ষসমাচ্ছন্নতার শান্ত স্নিগ্ধ ছায়ার মধ্যে ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে। দেখা যাইতেছে সাদা দুটো চিলেকোঠা। গাছের মাথা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

—ও পাকা চিলে কোঠা দুটো? হরিদাস? ও দুটো তো ছিল না। একটা মনে হচ্ছে শিবকালীপুরে, ওটা বোধ হয় শ্রীহরি ঘোষের? না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু। ওটি ঘোষ প্রভুরই বটে। আর ওটি হ'ল কুসুমপুরের হাজী সাহেব প্রভুর। হঠাৎ হরিদাস থামিয়া গেল। তারপর বলিল—হ্যাঁ প্রভু—এই মীমাংসাটা হ'ল—এটা কেমন হ'ল প্রভু?

—কোনটা?

—আজ্ঞে, জংসনের ওই যে চণ্ডীমায়ের থানে—মসজিদের মীমাংসা?

—মীমাংসা তো আমি করি নি হরিদাস।

—তবে যে—লোকে বলছে—

—কি বলছে?

—বলছে—বাবাঠাকুরের নাতি মুসলমান হয়েছিল—তাই ভাগ খানিক ছেড়ে দিতে হ'ল।

চমকিয়া উঠিলেন ন্যায়রত্ন। তারপর হাসিয়া বলিলেন—না হরিদাস, ও তুমি ভুল শুনেছ।

* * *

ন্যায়রত্ন একে একে পঞ্চগ্রামের সব গ্রামগুলিই ঘুরিলেন।

সব গ্রামের এক দশা। শিবকালীপুরে জগন ডাক্তার বলিল—আপনি শেষটা এই করলেন ঠাকুর মশায়? আমার মশায় পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ নাই। আমি সোজাসুজি কথা বলি। বৃদ্ধ বয়সে মানুষের জোর কমে যায়, তা মানি, কিন্তু তাই ব'লে—। এটা আপনার ঠিক হয় নি। লোকে আর আপনাকে মানবে না।

ন্যায়রত্ন হাসিলেন। কি উত্তর দিবেন?

জগন বলিল—আপনি অবিশ্যি কি করবেন? এ কালই হয়েছে এমনি। নইলে বিশ্বনাথের মত মানুষ—আমরা তো ভাবতাম বংশ কালে আপনার পাট বজায় রাখবে। সে এমন কাজ করলে! দেখুন—তার কাণ্ড দেখুন—সে—তিনকড়ির বিধবা মেয়েটাকে পড়াতে গিয়ে শেষ বিয়ে ক'রে বসল। কিন্তু—কিন্তু আপনি ওই মেয়েটাকে নাত-বউ বলে স্বীকার করলেন কেন?

ন্যায়রত্ন আবার হাসিলেন।

জগন বলিল—শ্রীহরি ঘোষ, কঙ্কনার বাবুরা আপনাকে পতিত করবার জন্য গাঁয়ে গাঁয়ে বলে পাঠাচ্ছে। তা আমরা হ'তে দোব না। সে হবে না! কিন্তু—

ন্যায়রত্ন বলিলেন—ও সব কথা থাক জগন। আমি এখানে আর ঠাকুর সেজে আসি নি। দৈবক্রমে এসে পড়েছি মাত্র। এখন এখানকার খবর বল। সেই দেখতেই বেরিয়েছি।

—কি দেখবেন? কি শুনবেন? সব শেষ। সব খেয়ে ফেললে তিন চার বেটাতে। ওই শ্রীহরি ঘোষ, কঙ্কনার মুখুজ্জে বাবু, দৌলত হাজী—আর এখন দু তিন বেটা পেটোয়া মহাজন উঠেছে—তারাও।

ন্যায়রত্ন আর কথা বাড়াইলেন না। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। জগন তাঁহাকে ছাড়িল না, সঙ্গে সঙ্গে সেও অগ্রসর হইল।

মহাগ্রামের মত একই দশা। স্তিমিত গ্রাম জীবন; আনন্দ নাই, উৎসাহ নাই, শ্রী নাই; বহুকালের জীর্ণ লোলুপ রোগীর মত পাণ্ডুর চোখে অন্ন জলে দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া রহিয়াছে।

শিবকালীপুরের সঙ্গে মহাগ্রাম—এক জায়গায় পৃথক। শ্রীহরি ঘোষের অভ্যুদয় হইয়াছে এখানে। পাকাবাড়ী—বাঁধানো পুকুর—দেবালয় এই সব লইয়া গ্রামের একটা দিক

উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এখানকার বাউড়ী ও বায়েন পাড়ায় কিছু লোকজনও রহিয়াছে। ইহারা সকলেই খাটে শ্রীহরি ঘোষের বাড়ীতে। নিত্যই কোন-না-কোন-কাজ তাহার আছেই। বাকী সকলে এ গ্রাম হইতেই চলিয়া গিয়াছে।

ন্যায়রত্ন একটা ভিটির সামনে দাঁড়াইয়া বলিলেন—এইটা সেই দুর্গা ব'লে বায়েনদের মেয়েটির বাড়ী ছিল নয়?

—হ্যাঁ। দুর্গা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। মেয়েটা—

—মেয়েটির আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়েছিল।

—মেয়েটা দেবুকে ভালবাসত'।

—ভালবাসাই তো মানুষকে উদ্ধার করে জগন; আমি জানি সে কথা। ভালবেসেই মেয়েটি অসৎ পথ থেকে ফিরেছিল, ভালবেসেই সে যখন মরেছে—সে যেমন করেই মরে থাক—সে উদ্ধার পেয়েছে।

জগন অবাক হইয়া ন্যায়রত্নের মুখের দিকে চাহিল। তাহার মনে হইল ন্যায়রত্নের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। নহিলে এই কি সেই মানুষ! যে পাহাড়ের মত স্তব্ধ স্থির গম্ভীর ন্যায়রত্ন!

—ওরা কারা? ন্যায়রত্ন দেখিলেন পঞ্চগ্রামের বাঁধের উপর একসারি কাহারা চলিয়া আসিতেছে। মজুর নয়, চাষীরাও নয়। আকারে ছোট—।

—ওরা?—ও সব ছেলেরা। জংসন ইস্কুলে পড়তে গিয়েছিল। জংসনে ইস্কুল হয়ে কঙ্কনায় বাবুদের ইস্কুলে আর ছেলেরা বড় যায় না। ওখানে এখনও বাবুদিগে দেখলে—নমস্কার করতে হয়। এখনও বাবুদের ছেলেদের চালচলন আলাদা।

—এত ছেলে পড়ছে?

—তা পড়ছে। সব যে বোল ধরেছে—লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে। তা হচ্ছে—চাষাভূষি বাউড়ী বাগদী এরাও ইস্কুলে গিয়ে বছর কয়েক বি-এল-এ ব্লে পড়ে ঘরে এসে বসছে। বাস আর লাঙলও ধরবে না, গরুর জাবও কাটবে না, হুঁকোতে তামাকও খাবে না, বিড়ি চাই, জামা চাই। জোগাও···হতভাগা বাবার দল। ওই যে দেখছেন—জংসন শহর—ওটি একটি মহাস্থান—বুঝেছেন না, মন্দ করতেও যত—আবার ভাল করতেও তত। ওই ঠাঁইটি আছে—তাই গরীবগুলোরা খেটে খেয়ে বাঁচছে। ওই ঠাঁইটি আছে তাই জমীদার মহাজন এদের অত্যাচার থেকে বাঁচবার জায়গা আছে। আবার তেমনি অনাচার—না ধর্ম্ম না কিছু। যত ফ্যাশান—তত অপব্যয়। মহাস্থান ওটি—মহাস্থান। এক এক সময় মনে হয়—এই হতভাগা জায়গা থেকে—ওখানেই যাই, ছিরে ঘোষ আর কঙ্কনার মুখুজ্জেদের রাজ্যি থেকে বেরিয়ে গিয়ে রেহাই পাই। কিন্তু—না—শেষ পর্য্যন্ত লড়াই আমি করব!

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল।

ময়ূরাক্ষীর ওপারে—দ্বারমণ্ডল জংসনে আলো জ্বলিতেছে। মিলের ইয়ার্ডে ইয়ার্ডে বড় বড় উঁচু খুঁটিতে উজ্জ্বল পেট্রোম্যাক্স জ্বলিয়া উঠিতেছে। ষ্টেশনের ওভার-ব্রিজের মাথায় একটা আলো জ্বলিতেছে। দেখিতে দেখিতে মাথার উপরে শূন্য মণ্ডলটুকু আলোর আভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি ফিরিলেন। বাড়ী ফিরিয়া তিনি জয়াকে পত্র লিখিলেন। লিখিলেন—বিগ্রহ সেবার জন্য সে কি কাশী হইতে ফিরিয়া আসিতে রাজী আছে?

কয়েক দিন পর জয়ার উত্তর আসিল—না।

ওই সঙ্গেই সে লিখিল—অজয় ফিরিয়াছে। তাহার কাছেই সে সব শুনিয়াছে। অরুণা মেয়েটি তো কই তাহার সঙ্গে দেখা করে নাই!

ন্যায়রত্ন পত্রখানি বন্ধ করিয়া মনস্থির করিয়া ফেলিলেন। তাহার গৃহদেবতাকে তিনি দ্বারমণ্ডলের ওই সিদ্ধপীঠ জয়তারার আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন। দ্বারমণ্ডলের জয়তারার আশ্রমে দেবীর বেদীর নীচে সারি সারি শালগ্রাম শিলা সাজানো আছে, বাহিরে ভৈরব আশ্রমে অর্থাৎ সিদ্ধপীঠ রক্ষক শিবলিঙ্গের আশে-পাশে ভগ্ন অভগ্ন শিবলিঙ্গ পড়িয়া আছে। শরণার্থী দেবতার দল। এ অঞ্চলে যাহারা যখন সেবা চালাইতে অক্ষম হইয়াছে—তাহারাই দেবতাটিকে ওইখানে রাখিয়া আসিয়াছে। কোন কোন দেবতা কিছু সম্পত্তি বা অর্থ লইয়া আসিয়াছেন কিন্তু অধিকাংশ দেবতারা আসিয়াছেন—অনাথ আশ্রমের আশ্রয়প্রার্থীর মত।

সেকালে দ্বারমণ্ডল গড়িয়া উঠিয়াছিল—ওই জয়তারার আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়াই। সেকালে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ

এই দ্বারমণ্ডল হইতেই এই বিগ্রহ মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

*   *   *

এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করিয়াছে দেবকী সেন। তাহার গোপন অভিপ্রায় সে অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ না-করিলেও ন্যায়রত্নের কাছে গোপন রাখে নাই। তাহার ইচ্ছা, এই উপলক্ষে আর একটি সমারোহ করিয়া জংসন এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ হিন্দুদের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি করিবে। উৎসাহের মধ্যেই আছে উত্তেজনা। উত্তেজনাকে দীর্ঘস্থায়ী করিতে পারিলেই কাজ হইবে বলিয়া তাহার বিশ্বাস। এ কাজে তাহাকে কয়েকজন সাহায্যও করিতেছেন।

দেবু এ বিষয়ে উদাসীন। ন্যায়রত্নকে সে যে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে—ন্যায়রত্নের গৃহদেবতার উপরে তাহার সে শ্রদ্ধা নাই এবং এই লইয়া আবার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইতে পারে—এই কারণে সে একেবারে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দেবকী সেন অগ্রসর হইয়া আসিয়া ন্যায়রত্নকে প্রণাম করিয়া বলিল—আপনি একা এসেছেন ?

—দোসর তো নেই কবিরাজ।

—না। কাউকে সঙ্গে না-নিয়ে আপনি এমনভাবে চলা-ফেরা করবেন না।

ন্যায়রত্ন হাসিলেন।

—হাসির কথা নয়। একে আপনার বয়স হয়েছে—তার উপর ওদের ভাবভঙ্গি তো আপনি নিজেই দেখেছেন। হ্যাঁ—দেবুবাবুর কাছে একটা খবর পেলাম—অরুণা দেবী কাশীর পথ থেকে ফিরে কলকাতায় গিয়েছেন।

—কলকাতায় গিয়েছে ?

—হাঁ। লিখেছে, কোন মতেই সেখানে যাওয়ার মত মনকে শক্ত করতে পারেন নি। তারা যদি সেখানে তাঁকে অপমান করেন—এই সঙ্কোচে পথে ট্রেণ থেকে নেমে কলকাতা ফিরেছেন। এখানেও আর আসবার অভিপ্রায় নাই। এখানকার ইস্কুলের কাজে জবাব দিয়েছেন।

ন্যায়রত্ন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—মেয়েটি বড় দুঃখী—কবিরাজ।

সেন এ কথার উত্তর দিল না, থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—সাইডিংয়ের উপর দিয়ে আপনি যেতে পারবেন না। চলুন ঘুরে যাই।

সম্মুখেই রেলওয়ে সাইডিং। এক মাইলেরও বেশী লম্বা বিরাট রেলওয়ে সাইডিং। সারি সারি লোহার লাইন পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া আবার পৃথক হইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। কালো লোহার লাইন—তাহার উপরে ইঞ্জিনের চাকার ঘর্ষণের একটি শাণিত উজ্জল রেখা অন্ধের ব্যগ্র দৃষ্টির মত স্থির স্তিমিত অথচ উগ্র। মধ্যে মধ্যে পয়েন্টস। ওদিকে গুদাম। এক হইতে আট নম্বর পর্য্যন্ত মাল রাখিবার সারি সারি শেড। টিনে ছাওয়ানো গুদাম। আকণ্ঠ মালে বোঝাই হইয়া রহিয়াছে। লাইনের উপর দিয়া মালগাড়ী চলিয়াছে। কোন গাড়ীতে ইঞ্জিন আছে, কোনটায় নাই। ইঞ্জিনের ধাক্কায় সেগুলা অন্ধ উন্মত্ত ঘোড়ার মত ছুটিয়া চলিয়াছে। ছুটিয়া গিয়া গতিহীন স্তব্ধ মালগাড়ীর গায়ে সশব্দে ধাক্কা মারিয়া আবার খানিকটা পিছাইয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে ব্যবসায়ীদের লোকেরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গাড়ীর নম্বর টুকিতেছে, লেবেল মারিতেছে। এইখানেই সমগ্র দ্বারমণ্ডল জংসনের কর্ম্মশক্তির কেন্দ্র। মসলা খাদ্যবস্তু তেল ঘি চামড়া ধান চাল নানা বস্তুর গন্ধ মিশিয়া একটা বিচিত্র গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছে।

আশে-পাশে রেললাইনের পূর্ব্বদিকে সারি সারি মিলের ইয়ার্ড—চিমনী।

ন্যায়রত্ন অকস্মাৎ বলিলেন—আমি ভেবেছিলাম কবিরাজ—

—কি ?

—থাক। বলে লাভ নেই। বিরোধ বোধ হয় মেটবার নয়। ন্যায়রত্ন ভাবিতেছিলেন—জয়া ও অরুণার কথা।

দেবকী সেন বুঝিল—ন্যায়রত্ন হিন্দু মুসলমানের বিরোধের কথা বলিতেছেন। সে বলিল—কখনও মিটতে পারে না। যতই চাপা দিক—একদিন এর মীমাংসা হতেই হবে। আমার—। চোখে তাহার তীব্র দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল।—ঘটনার চক্রান্তে যা অনিবার্য্য, তাকে নিবারণ করবে কে ?

ন্যায়রত্নও ঠিক বুঝিলেন না দেবকী সেনের উক্তির

অর্থ। কিন্তু কথাটি তাঁহার ভাল লাগিল—বলিলেন—ঠিক বলেছ কবিরাজ—ওই হল মহাসত্য। যা ঘটে—তা কখনও নিষ্ফল নয়। তার ফল—অনিবার্য্য। বহুকাল আগে কবিরাজ—এই বিগ্রহ আমার পূর্ব্বপুরুষ—এই দ্বারমণ্ডল থেকেই নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর রচনা করা স্তোত্র আজও আমার বাড়ীতে আছে। তাতে লিখেছেন—অভিপ্রায় অনুযায়ী দেবতা আজ আমার গৃহে এলেন। আবার যদি কোন দিন তাঁর এ গৃহ পরিত্যাগের অভিপ্রায় হয়—তবে যেন আর কোন গৃহস্থ গৃহে তাঁকে না-দেওয়া হয়। ওই দ্বারমণ্ডলে—জয়তারার আশ্রমেই যেন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

(ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্র বসু

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

শরৎচন্দ্র বসুর মৃত্যুতে, একজন বিখ্যাত ও বরেণ্য বাঙ্গালী-প্রধানের জীবনাবসান ঘটিয়াছে, এই কথা বলিলে যতখানি বলা হয়, গুরুত্বের তুলনায় তাহা কিছুই নয় বলিয়া আমি মনে করি। হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গের পতন ঘটিলে হিমালয়ের অঙ্গহানির মত বাঙ্গালার স্বর্ণচূড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিলেও বোধ হয় সবটা বলা হয় না। মানুষটি হিমালয় শৃঙ্গের মতই বিরাট, উত্তুঙ্গ, অভ্রভেদী ও নিঃসঙ্গ ছিলেন। আবার, হিমালয়ের মতই অচল, অটল। হিমালয় যেমন অনন্তকাল প্রকৃতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াও চিরজয়ী, এই মানুষটিও তেমনই সারাজীবন পৃথিবীর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া, কখনও জিতিয়া, কখনও হারিয়া, শেষ বিচার-ফল অনন্ত কালের হস্তে ন্যস্ত করিয়া পৃথিবী হইতে চির বিদায় লইলেন। মানুষটি যেন সংগ্রাম করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; অজেয় ও অপরাজেয় ক্ষাত্র-বীর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকিতে থাকিতে বীরযোদ্ধৃপতি যুদ্ধক্ষেত্রেই ক্ষত্রিয়ের কাম্য মৃত্যু লাভ করিলেন। শরৎবাবুই বাঙ্গালী ও ভারতবাসীকে 'নেতাজী' দিয়াছিলেন; আর দিয়া গেলেন, রণদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়ের অপরিম্লান, অত্যুজ্জ্বল একখানি জীবনালেখ্য।

শরৎচন্দ্র বসু ছিলেন মস্ত ব্যারিষ্টার, মস্ত পার্লামেণ্টেরিয়ান, মস্ত তার্কিক, মস্ত কংগ্রেসী, মস্ত লেফটিষ্ট; কিন্তু তাঁহার ক্ষত্রিয়-শৌর্য্যের তুলনায় এ সকলই তুচ্ছ, হীনপ্রভ ও মলিন। এ যেন সেই পুরাকালের পরশুরাম। পরশুরামকে যেমন আমরা সৃষ্টির উদয়াচলে পরশু হস্তে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখি—যুগপৎ সুমেরু ও কুমেরুতে দেখি—রামায়ণে দেখি, মহাভারতেও দেখি; শরৎ বসুকেও পরাধীন ভারতেও দেখি, স্বাধীন ভারতেও দেখি, একমাত্র পৌরুষ সম্বল করিয়াই তাঁহার বিরামহীন, আপোষবিহীন, ক্লান্তিহীন ও অবিশ্রান্ত রণ-হুঙ্কার; আকাশে, মহাশূন্যে কান পাতিলেও শুনি, তাঁহার বিজয় রথের চক্র নির্ঘোষ। যখন পরশুরামের সহিত তুলনা করিয়াছি, তখন অকপটে সকল কথাই বলি। রামায়ণ-মহাভারতের পাঠকমাত্রেই জানেন, পরশুরামের মত কঠিন, কঠোর, শুষ্ক, নীরস ও নিষ্ঠুর এবং দাম্ভিক চরিত্র বিরল। পরশু হস্তে তিনি একবিংশতিবার ধরিত্রীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীকেও পুত্র হস্তে নিহত হইতে হইয়াছিল। শরৎচন্দ্র বসুর দম্ভ একদা গান্ধীজীর বিরুদ্ধেও উদ্যত হইয়াছিল; মহাত্মা গান্ধী-জওহরলাল-প্যাটেল পরিচালিত কংগ্রেস শরৎচন্দ্র বসুর হস্তে যতদূর নিগৃহীত হইয়াছে, এমন আর কখনও নহে। আবার ঊষর, উত্তপ্ত বালুকার তলে স্বচ্ছতোয়া ফল্গুর সুশীতল জলধারার মত কঠোর আবরণ নিয়ে শরৎচন্দ্র বসুর দয়ামায়া-স্নেহ প্রীতির প্রস্রবণ-সদৃশ হৃদয়-নির্ঝরিণীর সুমধুর কল ধ্বনি ছিল অবিরল, অবিরাম, অবিশ্রান্ত ও অফুরন্ত। এমন অতিথি-বাৎসল্য আর দেখি নাই; একালে এমন প্রাণঢালা ভালবাসা বাসিতে আর দেখি নাই; দুঃখীর দুঃখে এমন প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে আর কাহাকেও দেখি নাই; বিপদাপন্ন বন্ধুর বিপদে হরিশ্চন্দ্রের মত সর্ব্বস্ব দান করিয়া আসিতেও বুঝি আর কাহাকেও দেখি নাই। মানুষের উপকার হইবে বুঝিলে পাষাণসম কঠিনতাও অবহেলে গলিয়া দ্রব হইতে দিতে এই

লোকটিকে যেমন দেখিলাম, তেমনটি বুঝি কোন দেশে, কোন কালে কোন লোককেই কেহ কখনও দেখে নাই। শরৎচন্দ্র বসু ছিলেন, অখণ্ড ভারত, তথা সংযুক্ত বঙ্গের কঠোর সাধক; বঙ্গবিভাগের তীব্র বিরোধী। এখানে গান্ধীর মাহাত্ম্য তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; জওহরলাল-প্যাটেল প্রভৃতি বহুদিবসের সুহৃদ্, সহকর্মী, সহযাত্রীকে পরিত্যাগ করিতেও দ্বিধা হয় নাই; সমগ্র ভারত, সমস্ত বাঙ্গলার সম্মিলিত জনমতের বিরুদ্ধে বিশ্বের বর্জিত, নিতান্তই একক, একান্তই নিঃসঙ্গ গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গের মত অচঞ্চল দৃঢ়পদে, দৃঢ়চিত্তে দণ্ডায়মান থাকিতেও যাঁহার বাধে নাই, মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে, দ্বিখণ্ডিত, দ্বিধাবিভক্ত উভয় বঙ্গের ভাবী ও স্থায়ী কল্যাণ কামনায় দুর্নিবারবোধে সেই বঙ্গবিভাগ মানিয়া লইয়াই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তুষার গলিয়া জল হইল; শরৎ-চন্দ্র বসুও চির বিদায় লইলেন।

কংগ্রেসের সহিত শরৎ বসুর বিরোধ বহুদিনের, বহু পুরাতন। কংগ্রেস বিলাতের প্রধান-মন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাক-ডোন্যাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ যেদিন ক্লীবত্ববশে না-গ্রহণ না-বর্জ্জন করিয়াছিল, শরৎচন্দ্র বসু সেইদিনই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। ১৯৪৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে বিলাতের আর এক প্রধান-মন্ত্রীর কূটবুদ্ধি-উদ্ভূত বিষবৃক্ষের বীজ লণ্ডন হইতে সানন্দে বাহিত হইয়া ভারতের পবিত্র মৃত্তিকায় পাকিস্তান পাপতরু রোপিত হইয়াছিল, শরৎচন্দ্র বসু সেদিন কংগ্রেসের ছায়া পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তদবধি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাঁহার দুরন্ত দুর্দ্দান্ত রণনীতি পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল; মৃত্যুর শীতল হস্ত তদুপরি যবনিকা টানিয়া দিল তাই—নহিলে শেষ কোথায় ও কিরূপে, কি মর্ম্মন্তুদ আকারে যে হইত, কে বলিতে পারে?

প্রভাতকাল দিবসের অগ্রচিহ্ন, এই কথা জীবিত ও স্বর্গত, স্বদেশী ও বিদেশী মনীষীমাত্রের জীবনে খাটিলেও শরৎচন্দ্র বসুতে ব্যতিক্রমই দেখি। তেরো বছরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করা ভিন্ন প্রভাত একেবারে বৈচিত্র্য-বিহীন। শরৎচন্দ্র বসুর আবাল্যসুহৃৎ বন্ধুবর কালীচরণ ঘোষ লেখককে সমর্থন করেন। শরৎবাবু স্বয়ং লেখককে বলিয়াছিলেন, 'সুবি' না থাকিলে তাঁহাকে কখনই রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িতে হইত না। উক্তিটি সর্ব্বাংশে সমর্থন যোগ্য কি না জানি না; তবে 'সুবি' (সুভাষচন্দ্র) যে বহুলাংশে অগ্রজের প্রতিবিম্ব, ইদানীং কালের রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি যাহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা স্বীকার করিবেন। ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধী-মতিলাল বনাম সুভাষ-জওহরলাল বিরোধের ইতিবৃত্ত যাঁহারা জ্ঞাত আছেন, তাঁহাদের ইহাও জানা আছে যে, তরুণ সুভাষচন্দ্রের অনমনীয় দৃঢ়তার অন্তরালে আমরণ যোদ্ধৃপতি শরৎচন্দ্রই তাঁহার শক্তির গোমুখী। সুভাষচন্দ্র সেই অধিবেশনেই বৃটিশকে ভারত সাম্রাজ্যের পাততাড়ি গুটাইবার নির্দ্দেশ দিতে চাহিয়াছিলেন। পরে, জলপাইগুড়ির বঙ্গপ্রদেশীয় অধিবেশনে সুভাষের ভাষার প্রতিধ্বনি অগ্রজ শরৎচন্দ্রের জলদগম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে শুনা গিয়াছিল। রাজনৈতিক মন্ত্রদীক্ষা দুই ভ্রাতারই হয়ত (হয় ত নহে, সত্যই!) একই গুরুর নিকটে হইয়াছিল; উভয়েই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উচ্চাদর্শে উজ্জীবিত হইয়াছিলেন; কিন্তু সুভাষচন্দ্রের অদৃষ্টে দীর্ঘদিন "গুরুসেবা" বা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হয় নাই। অতি অল্পকাল মধ্যেই চিত্তরঞ্জনের দক্ষিণ হস্ত খানি বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রহ্মদেশের মান্দালয়ে প্রেরিত হয় এবং সুভাষচন্দ্রের মান্দালয়ে বন্দীবস্থাতেই দেশবন্ধুর দেহাবসান ঘটে। নেতাজী সুভাষ নেতাজী হইয়াই ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা নিঃসংশয়ে সত্য হইলেও মেজদা'র সহায়তা ভিন্ন সম্পূর্ণ সার্থকতা সম্ভব ছিল না, অবিসম্বাদিতরূপে ইহাও সত্য। নেতাজীর সহিত ডালহৌসী পর্ব্বতে প্রবাস কালে আমি এই চর্ম্মচক্ষুতে যাহা দেখিয়াছি, স্বকর্ণে যাহা শুনিয়াছি, তাহা না বলিলেও চলিতে পারে; কারণ, সুভাষচন্দ্রকে শরৎ বসুই যে স্বহস্তে মনের মত করিয়া গঠন করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এক সময়ে এ কথাও লোকের মুখে মুখে ফিরিত যে, ব্যারিষ্টার শরৎ বোস যে অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাহাও ঐ সুবিরই জন্য। কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে "সুভাষ সংহারের" পরে সুভাষচন্দ্র যখন অসুস্থ দেহে, ভগ্ন মনে জামাডোবায় তাঁহার অপর অগ্রজ (লেখকের নিকট কুটুম্ব) সুধীর বসুর গৃহে অতিথি, লেখক তখন কার্শিয়ঙে গিধা পাহাড় সন্নিকটে বাস করিতেছিলেন। সেই সময়ের আবহাওয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত; ঘটনাপ্রবাহ পঙ্ক-কলঙ্কিত; স্মরণ-

মাত্র আজও অন্তঃকরণ বেদনা বোধ করে। তাই যাহা বলিব, সংক্ষেপে ও ইঙ্গিতে বলিব। তখনও দ্বিতীয়বার নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র স্বীয় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি (ওয়ার্কিং কমিটি) গঠনের আশা ত্যাগ করেন নাই; তখনও মহাত্মার উদ্দেশে পুনঃপুনঃ প্রণতি প্রেরণের উৎসাহ মন্দীভূত হয় নাই; তখনও ওল্ডগার্ড রিভোল্ট 'কম্প্লিট' হইতে বহু বিলম্ব আছে; কিন্তু পঞ্জিকাকার জ্যোতির্গণনায় সৌরজগতের গ্রহনক্ষত্রের অণুপরমাণুমাত্র গতিবিধিরও যেমন নির্ভুল হিসাব নিকাশ করিয়া থাকেন, কোথায় বিহারের কয়লাখনি ঝামাডোবা—আর কোথায় হিমালয় শিখরে কার্শিয়ঙ, তথাপি পরবর্ত্তী কালে অনুষ্ঠিত কলিকাতার ওয়েলিংটন বাগানে এ-আই-সি-সি'র সভাধিবেশন হইতে ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্ম ও রামগড়ে আপোষহীন, বিরামবিহীন সংগ্রামের সম্পূর্ণ এবং অভ্রান্ত একখানি ঘটনাপঞ্জী তখনই সেই দিগন্ত হইতে দিগন্ত প্রসারিত ধূসর পর্ব্বতমালার একাংশে বিচিত্র বনকুসুম-শোভিত এক রম্যকুঞ্জভবন প্রাঙ্গণে প্রতিফলিত ছায়াচিত্রের মত উদ্ঘাটিত হইতে দেখিয়াছিলাম; আজও তাহা ভুলি নাই। এখনও মনে পড়ে, বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের দুই বিশাল বাহিনীর দুই সৈন্যাধ্যক্ষ দুই মহাসাগরের ব্যবধানে দেশরক্ষার্থ—আত্মরক্ষার্থ একই পরিকল্পনা একই সময়ে একই উদ্দেশ্যে একই লক্ষ্যে এক তানমানলয়ে কার্য্যে রূপায়িত করিবার সেই চিত্তচমকপ্রদ রোমাঞ্চকর কাহিনী। এ'ও যেন তাই। অনেককে বলিতে শুনিয়াছি, নেতাজীর কল্যাণেই দাদাজী। ভাবার্থ বোধ হয়, সুভাষচন্দ্র বরণীয় হইয়াই শরৎচন্দ্রকে বড় করিয়াছেন। দাদাজীর জন্যই নেতাজী—এ কথা সম্পূর্ণরূপে সত্য না হইতে পারে; তবে উভয়েই—পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে—বিরাট ও মহান্, এই একান্ত সত্য প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্ত্ত, প্রতি নিয়ত পরিস্ফুট হইয়া অনাদি অনন্তকাল পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইবে। একজনকে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন যেমন করা যায় না, উভয়ের মধ্যে ইতর বিশেষ—তারতম্য করিতে যাওয়াও তেমনি অপ্রাকৃত।

শরৎচন্দ্র বসু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে রামায়ণ মহাকাব্যের দুই নায়ক, রাম ও লক্ষ্মণের সহিত মিলাইয়া দেখিতে, জানি না কেন, আমার খুব ভাল লাগে। রাম ও লক্ষ্মণে অনেক প্রভেদ; আবার অদ্ভুত একাত্মতা। শরতে সুভাষে অনেক গরমিল; কিন্তু প্রাণে প্রাণে এমন মিলন যে, সে এক পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার। লক্ষ্মণবর্জ্জনের পর রামের বিলাপ গোটা রামায়ণ-খানিকে করুণ, অশ্রুসিক্ত করিয়া রাখিয়াছে; অনুজের অন্বেষণে শরতের ভগ্নদেহে বারম্বার অর্দ্ধ বিশ্ব ভ্রমণের কাহিনীও চোখে জল আনিয়া দেয়। সুভাষের সাধনা সম্পূর্ণ ও সার্থক করিবার অদম্য আগ্রহ জীবনের শেষ কয়েকটি বছর শরৎচন্দ্র বসুকে উন্মাদ অধীর করিয়া তুলিয়াছিল। যেন, দুটি পটুয়া ভাই একখানি প্রতিমা গড়িতেছিল; গড়িতে গড়িতে এক ভাই কোথায় চলিয়া গিয়াছে, নিরুদ্দেশ; অন্য ভাই এক হাতে চোখের জল মুছিতেছে, অন্য হাতে অসমাপ্ত প্রতিমা সম্পূর্ণ করিতে তনুমনধন উৎসর্গ করিয়াছে। প্রতিমার কোন্ অংশে কোন্ রং দিলে মানায়, কোন্ অঙ্গে কোন্ অলঙ্কার পরাইলে শোভন হয়, সে ভাবনা ত আছেই; কিন্তু তার চেয়েও বড় ভাবনা, নিরুদ্দিষ্ট ভাইটির সন্তুষ্টিবিধান। পথের উপর শত চক্ষু পাতিয়া চাহিয়া আছে, আশা—ভাই সেই পথে আসিবে, প্রতিমা দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিবে, তবে না তাহার সাধনা সফল হইবে। শরৎচন্দ্র বসুর শেষ জীবনের কার্য্যকলাপ বিশ্লেষণ করিলে আমরা কি ইহাই দেখি না যে, সুভাষচন্দ্র যেখানে সূত্র ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ সেই স্থান হইতে সেই সূত্র ধারণ করিয়া তরুণের উৎসাহ, যৌবনের প্রেরণা লইয়া দুর্গম দুস্তর যাত্রা করিয়াছিলেন?

গত বৎসরের শেষার্দ্ধে দ্বিতীয়বার ইয়োরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের মাত্র কয়েকদিন পরেই পুনরায় পীড়া বৃদ্ধি পায় এবং আত্মীয় পর সকলেই আশা ও ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিল যে, অন্ততঃ কিছুদিন নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম গ্রহণ করিবেন। কিন্তু ঐ যে আগেই বলিয়াছি প্রতিমা সম্পূর্ণ করিবার ভার তাঁহার 'পরে ন্যস্ত', বিশ্রামের অবসর কোথায়? সদাই ভয়, ভাই যদি আসিয়া দেখিয়া ফেলে, প্রতিমা অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে! তাই অহর্নিশ যেন একমাত্র সাধনা, সুবি যেখানে যে অবস্থাতেই থাক্, দেখুক, জানুক, বুঝুক, তাহার আরব্ধ কর্ম্ম অবহেলিত হয় নাই। এ যে ব্রতধারীর ব্রত; তাপসের তপস্যা। এখানে পীড়া পরাজিত; বাধা বিঘ্ন সমস্তই তুচ্ছ। সংসার, স্ত্রী পুত্র কন্যা স্বাস্থ্য

অর্থ কাম মোক্ষ শরৎচন্দ্র বসুর নিকট সকলই নগণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। সুবির সাধনা—সুবি অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা চাহিয়াছিল; সুবি দীনদরিদ্রের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করিয়াছিল; সুবি শোষণবিহীন, পীড়নশূন্য সমাজ-শ্রীর চিত্র আঁকিয়াছিল—সুবির স্বপ্ন সার্থক, সুবির আশা পূর্ণ করিতে, একক যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গে জীবন যায়, যাক্। শরৎচন্দ্র বসুর ইহাই হইয়াছিল, দৃঢ়পণ।

আমরণ যোদ্ধার চরিত্র যদি অনুশীলন করিতে হয়, তবে এই একটি দৃষ্টান্তই চোখে পড়িবে। সারা জীবন জ্ঞাত ও অজ্ঞাত, দৃশ্য এবং অদৃশ্য শক্তি ও মহাশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকাই ছিল, শরৎচন্দ্র বসুর ভাগ্যলিপি। চিত্তরঞ্জন দাশ প্রবর্ত্তিত "ফরোয়ার্ড" পত্রের তিনিই ছিলেন প্রধান পরিচালক এবং তাঁহার কর্ম্মকুশলতার গুণেই সংবাদপত্রখানি ভারতের সংবাদপত্র ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করিয়া এক অভিনব নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। প্রচারে, প্রভাবে, প্রতাপে ও পরাক্রমে শরৎচন্দ্র বসু পরিচালিত "ফরোয়ার্ড" যখন মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডবৎ প্রদীপ্ত, ঠিক তখনই "হরিফায়েড স্পেকটেটার"নামক এক পত্র প্রকাশ হইতেই"ফরোয়ার্ডের" জীবনাবসান। যাহার হস্তে পত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা, তাহার হস্তেই তাহার বিনাশ। বামুনগাছিতে একটি রেলগাড়ী 'কলিশন' উপলক্ষ করিয়া এমনই এক ভয়াবহ চিত্র রচিত হইয়াছিল যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের কর্তৃপক্ষ ত অতীব তুচ্ছ ও নগণ্য, বিলাতে বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। শিশুর কমনীয় অন্তরের উপর প্রেতলোকের তাণ্ডবে যে দশা ঘটে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের চাপে "ফরোয়ার্ড" পত্রেরও সেই দশা ঘটিল। উদ্যোগী-পুরুষসিংহ শরৎচন্দ্র বসু রাতারাতি পত্রের নাম পরিবর্ত্তন, ভোল বদল করিয়া "ফরোয়ার্ড"কে "লিবার্টি" রূপে প্রকাশিত করিয়া সংগঠন প্রতিভার পরিচয় দিলেন বটে কিন্তু লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধৃত হইল না। এই মনস্তাপ যে কত গভীর, কত মর্ম্মন্তুদ,অন্যে তাহা না বুঝিতে পাবে; কিন্তু সৃষ্টির গৌরব যাহার কণামাত্র আছে, সেই বুঝিবে যে, হিমালয় বলিয়াই সে প্রভঞ্জন উন্নতশিরে সহ্য করিতে পারিয়াছিল। একদিন, বঙ্গদেশে "বিগ ফাইভ্"—ভাষান্তরে পঞ্চপাণ্ডবের প্রতিপত্তিতে বৃটিশ সরকারও সন্ত্রস্ত থাকিতেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভাব উত্তরাধিকারী ও শিষ্যরূপে প্রখ্যাত শরৎচন্দ্র, বিধানচন্দ্র, তুলসীচন্দ্র, নির্ম্মলচন্দ্র ও নলিনীরঞ্জনই বঙ্গদেশে "বিগ ফাইভ্" বলিয়া কথিত। "ষ্টেট্সম্যান" পত্রের রাজনীতিক ভাষ্যকার পি-এন্-জি ওরফে প্রিয়নাথ গুহ উপাধিটির উদ্ভাবক। উত্তরকালে বিগ ফাইভ্ শিশুরঞ্জক পুস্তকের হারাধনের ছেলেদের মত একটি একটি করিয়া ছিট্কাইয়া পড়িয়াছিল। রাজনৈতিক মতদ্বৈধতায় সূত্রপাত হইলেও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ এমনই বদ্ধমূল হইতে দেখা গিয়াছিল যে, একের অপরের বিরুদ্ধে গুপ্তচর-বৃত্তির হীন সন্দেহারোপ করিতেও দ্বিধা দেখা যায় নাই। আবার, রাজনীতির কথা বলি। ১৯৩৫ সালের শাসন-তন্ত্রানুসারে সাধারণ নির্ব্বাচনের পর বঙ্গদেশে কংগ্রেস-কৃষকপ্রজা কোয়ালিসন (সম্মিলন) সাধন জন্য শরৎ বসু যখন কংগ্রেসের উচ্চমণ্ডলের দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিয়া বেড়াইয়াছিলেন,বাঙ্গলার তথা ভারতের কংগ্রেস তাঁহার প্রস্তাব পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ভারতের আটটি প্রদেশে কংগ্রেস স্বকীয় গভর্ণমেণ্ট (মন্ত্রীত্ব) গঠন করিলেও বাঙ্গলায় অনুমতি প্রদত্ত হয় নাই। অথচ, সেদিন বায়ু অনুকূল ছিল; মানুষের মন মিলনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়াছিল; রাজনৈতিক আবর্ত্তও ছিল সঙ্গম-আকুল; কংগ্রেস হেলায় সে সুবর্ণ সুযোগ না হারাইলে বাঙ্গলার ইতিহাস আজ ভিন্ন রূপ হইত। দীর্ঘকাল যাবত দুর্ভিক্ষ, দুর্ভাগ্য ও দুর্দ্দশার যে উত্তাল প্রবাহ বাঙ্গলার বুকের উপর দিয়া নিয়তির দুর্নিবার বেগে নিরন্তর বহিয়া যাইতেছে, বাঙ্গালী তাহা হইতেও পরিত্রাণ পাইত। ইহাতে শরৎচন্দ্রবসুরমনোবেদনা যতই গভীর হৌক,বাঙ্গালীর সামগ্রিক জীবনে ফ্রাস্ট্রেসনের সূচনা বোধ করি সেই দিনই হইয়াছিল। ইহার অবসান কবে ও কেমন করিয়া হইবে অথবা আদৌ হইবে কি-না, হায় কে তাহা বলিবে? অদৃশ্য ও অপরিচিত মহাশক্তিও শরৎচন্দ্র বসুর সহিত বড় কম বাদ সাধে নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে লীগ মন্ত্রীসভার পতন হইলে মৌলভী ফজলল হক্ সাহেবের নেতৃত্বে একবার একটি হিন্দু মুসলমান সংযুক্ত মন্ত্রী-পরিষদ গঠনের সুযোগ উপস্থিত হয়। বাঙ্গালী—বিশেষ করিয়া হিন্দু এবং উগ্র সাম্প্রদায়িক দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমানাতিরিক্ত ব্যক্তিমাত্রই নাজিবুদ্দী দুঃশাসনের চাপে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে সুরু করিয়াছিল; কাজেই দুর্য্যোধন দুঃশাসনের রাজ্যাবসানে বাঙ্গালী মাত্রই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ১৯৪৬-৪৭ সালে বঙ্গদেশে যে নারকীয় কাণ্ড সঙ্ঘটিত হইয়া বাঙ্গলার

ইতিহাসকে দুরপনেয় কলঙ্কলিপ্ত করিয়াছে, পাঁচ সাত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই আকাশে মেঘ সঞ্চার, তাহার অশুভ লক্ষণসমূহ প্রকটিত হইতেছিল। বাঙ্গালী সত্যসত্যই আতঙ্কবিহ্বল চিত্তে, হতাশাপীড়িত অন্তরে চিন্তা করিতেছিল যে, তাহার কৃষ্টি সংস্কৃতি, তাহার ধন মান প্রাণ সমস্তই বিপন্ন; তাহার চিত্তবৃত্তি গিয়াছে; তাহার বর্ত্তমান বিলুপ্ত; ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আশা-ভরসার রশ্মি-রেখার চিহ্নমাত্র না দেখিয়া বাঙ্গালী জাতি যখন নিরতিশয় নিরাশায় মুহ্যমান, তখন অকস্মাৎ একদিন ঘনমেঘাচ্ছন্ন কৃষ্ণাকাশে বিদ্যুদ্দীপ্তির মত সংবাদ প্রচারিত হইল, শরৎ বসু মহাশয় ফজলল হক্ সাহেবের সহিত সংযুক্ত মন্ত্রীসভা গঠনে সম্মত হইয়াছেন। সেদিনের উল্লাসের কথা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি হেন সাধ্য আমার নাই। কিন্তু হরিষে বিষাদের কারণ তখনও বিদ্যমান। কংগ্রেস কি রাজী হইবে? বিশেষতঃ বিশ্বযুদ্ধের দাবানল তখন ভারতের পূর্ব্বদ্বার পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের উপর অভিমান করিয়া—চোরের উপর রাগ করিয়া থালার অভাবে মাটিতে ভাত খাওয়ার অভ্যাস আমাদের আছে—কংগ্রেস, কংগ্রেস-শাসিত সপ্ত প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা অপসারিত করিয়া লইয়াছে; সেই কংগ্রেস কি বাঙ্গলায় মিতালী গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে দিবে? আজও গর্ব্বের সহিত, গৌরবের সঙ্গে, উল্লাসভরে মনে পড়ে, শরৎচন্দ্র বসুর দৃপ্ত পৌরুষ সেদিন মেঘস্বরে গর্জ্জন করিয়া বাঙ্গালীর বুক ভরাইয়া দিয়াছিল। কংগ্রেস—অর্-নো-কংগ্রেস্, বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর বিপদের দিনে বাঙ্গালী ভিন্ন বাঙ্গালীকে কে রক্ষা করিবে? বাঙ্গালী বড়, না কংগ্রেস বড়? বাঙ্গালা ডুবিলে, কংগ্রেস থাকিলেই বা কি, আর গেলেই বা কি! শরৎচন্দ্র বসুর গুরু চিত্তরঞ্জন একদিন নিদাঘের মেঘ গর্জ্জনবৎ বলিয়াছিলেন, কংগ্রেস বাঙ্গলাকে ছাঁটিয়া ফেলে ফেলুক, ভারতবর্ষের মানচিত্র হইতে বাঙ্গলাকে মুছিবে হেন সাধ্য কাহার? শরৎচন্দ্র বসুর মুখ দিয়া বাঙ্গলা দেশ ও বাঙ্গালী জাতিই তাহাদের অন্তরের ভাষা ব্যক্ত করিল, আগে বাঙ্গলাকে বাঁচাইতে হইবে; তার পরে কংগ্রেস। হাইকোর্টে তখন বোস্ সাহেবের উপার্জ্জন মাসে ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা। নিরাশা-নিপীড়িত বাঙ্গলার সেই অতি বড় দুর্দ্দিনে গাউন্ পরিত্যাগ করিয়া শরৎচন্দ্র বসু একাগ্রচিত্তে রাজনীতিক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। স্থির হইল, "হোম" ডিপার্টমেণ্টের ভার তিনি লইতেছেন। এই "হোম" ডিপার্টমেণ্টই বাঙ্গলার অগণিত হোমে নরকযজ্ঞের হোমাগ্নি জ্বালিয়াছিল; এই "হোমের" অনুকম্পাতেই সহস্র সহস্র বঙ্গীয় যুবক রাজরোষে রাজবন্দী, কারাগারে অবদ্ধ; এই "হোম" ডিপার্টমেণ্টের দৈত্য দানা—পুলিশ, ম্যাজিষ্ট্রেই বাঙ্গলাকে শ্মশানে পরিণত করিতে এই উদ্যত; "হোমেরই" অত্যাচারে, অনাচারে, নির্য্যাতনে ও নিপীড়নে বাঙ্গালী ম্লান, মৃতপ্রায়, মুমূর্ষু। শরৎ বসু ভিন্ন বাঙ্গালী জননায়ক আর কে আছে, যে এই দুর্দ্ধর্ষ "হোম"কে দমন, শাসন ও সংশোধন করিবে? বৃটিশ সেক্রেটারী, বৃটিশ কমিশনার, বৃটিশ গভর্ণর, বৃটিশ ভাইসরয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার—মুখোমুখী দাঁড়াইবার—সমানে সমান যুঝিবার শক্তি, সামর্থ্য, দম্ভ ও স্পর্দ্ধা আর কাহার আছে? বাঙ্গলা দেশ দুঃখ নিশি প্রভাতের জন্য প্রহর গণনা করিতেছে; সংবাদ বাহির হইয়াছে, পরদিন শপথ গৃহীত হইবে। অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত বাঙ্গালী শুনিল, রাত্রির অন্ধকারেই 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা'র ইচ্ছায় শরৎচন্দ্র বসু অন্তরিত! এত বড় ও নিদারুণ হতাশ্বাস বাঙ্গালীর জীবনে আর কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। বাঙ্গালীর ফ্রাসট্রেসন কি অকারণেই ঘনীভূত হইয়াছিল? নেতাজী সুভাসচন্দ্র বিজয়ীর বেশে, মুক্ত তরবারি হস্তে বিজয় পদক্ষেপে ভারতসীমান্তে—আসামে—ইম্ফলে—কোহিমায় স্বাধীন ভারতের পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন জানিয়া বাঙ্গালী যেদিন লক্ষ কণ্ঠে লক্ষ শঙ্খ নিনাদিত করিতে উদ্যত হইয়াছে, যুদ্ধের ভাগ্যচক্র সেইদিনই বিপরীত পথে বিঘূর্ণিত হইল কেন? চিত্তরঞ্জন দাশ ঠিক সে সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এসিয়ার মহাসম্মিলনের স্বপ্ন দেখিলেন, দুর্জ্জয় দার্জ্জিলিঙ সেই দিনই রাহু গ্রাসে পতিত হইল কেন?

ফ্রাসট্রেসনের কথা বলিতেছিলাম! ১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর দিল্লীতে পণ্ডিত জওহরলালের নেতৃত্বে ইণ্টারিম বা মধ্যবর্তী গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইলে শরৎচন্দ্র বসু অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের লং কোটের টেল্ ধরিয়া লীগের পাঁচজন সদস্য শাসন পরিষদে প্রবেশ করিতে চাহিলে

দুইজন হিন্দু সদস্যের বিদায় লইবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। রাজাজীর বিদায়ের সংবাদই দেশময় রাষ্ট্র ছিল; শেষ মুহূর্ত্তে একমাত্র বাঙ্গালী শরৎচন্দ্র বসুই পরিত্যক্ত হইলেন।

পারিবারিক জীবনে শরৎবাবুর উডবার্ণ পার্কের বাড়ীখানিকে নিঃসন্দেহে "সুখ-নাড়" বলিতে পারা যায়। এত বড় সাহেব লোগ, এৎনা বড়া ব্যারিষ্টার ও জাঁদরেল রাজনৈতিক জননায়কের গৃহ হইলেও বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য তথায় পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত ছিল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে, অপরিচিত অভ্যাগতবৃন্দকে স্বহস্তে লুচী ভাজিয়া না খাওয়াইতে পারিলে বসুজায়া সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। সেবার বিহার প্রদেশের কয়েকটি যুবক সাইকেলে ভারত ভ্রমণে বাহির হইয়া প্রায় মধ্যরাত্রে তরুণের তীর্থক্ষেত্র—শরৎচন্দ্র বসুর গৃহে উপস্থিত হয়। তাহারা রাত্রিটুকুর জন্য মাত্র আশ্রয় চাহিয়াছিল। বসু মহাশয় তাহাদের ভ্রমণকাহিনী শুনিতে শুনিতে, একবার দ্বিতলে—সিগার আনিতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, ছেলেরা কেহ টেবিলে, কেহ মেঝেতে কার্পেটের উপরে 'শয্যা' বিছাইবার উদ্যোগ করিতেছে। বলিলেন, কৈ হে, তোমাদের গল্প শেষ করলে না? ছেলেরা উৎসাহিত হইয়া আবার গল্প সুরু করিল। ইত্যবসরে গৃহস্বামিনী পুত্রকন্যা সমভিব্যাহারে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সদ্যঃপ্রস্তুত খাদ্যাদি লইয়া উপস্থিত। এমতাবস্থায় যাহা হয়—আগন্তুকগণ অত্যন্ত লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া শরৎচন্দ্র বসু কহিলেন, আরে! শুধু কি তোমরাই খাবে? আমরাও যে খাব! বলিয়া সত্য সত্যই তাহাদের সঙ্গে বসিয়া গেলেন; বলিলেন, তোমরা বলতে বলতে খাও; আমি শুনতে শুনতে খাই। তবে দেখো, শেষ পর্য্যন্ত তোমরাই না ঠকে যাও। মানুষটির সত্যকার পরিচয় এইখানে। আমি শতবার, সহস্রবার মুক্তকণ্ঠে বলিব, আধুনিককালে বিরল, এই মানুষটির কলঙ্কলেশশূন্য নির্ম্মল চরিত্র স্ফুরিত স্নেহপ্রীতি দয়ামায়া শতধারে প্রবাহিত হইত। যে সামাজিকতা ছিল বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব, দেশ হইতে সে ত উঠিয়া যাইতেই বসিয়াছে। শুনিতে পাই, যত "উপরে" চাহিবে, সামাজিকতা এ দেশের বস্তু কিনা তাহাতেও সন্দেহ জাগিবে। তবে কথাটা, বোধ হয়, কঠোর হইয়া পড়িতেছে! "উপর" প্রদেশে কি সামাজিকতা নাই? অবশ্যই আছে; তোমার আমার সঙ্গে না মিলিতে পারে; কিন্তু আছে। ছাগ গো মেষ হস্ত্যশ্ব প্রভৃতিরও সমাজ আছে; তাহাদিগকেও সামাজিকতা পালন করিতে কে না দেখিয়াছে? কিন্তু আমার সহিত মিল নাই বলিয়াই কি তাহা অস্বীকার করিতে হইবে? শরৎচন্দ্র বসুর আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে নারা মাত্রেরই মনে হইয়াছিল, প্রাণাধিকা দুহিতা রমার বিবাহের জন্যই বুঝি বা প্রাণটা ছিল।

শরৎচন্দ্র বসু সর্ব্বপ্রকারে বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধতা বিধিমতে করিয়াছিলেন। কলিকাতা সহরে ছেচল্লিশ সালের আগষ্টের চেঙ্গিসী কাণ্ড দেখিয়া, নোয়াখালির নাদির শাহী সৌকর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াও যে লোক জিন্নার জহ্লাদী দোস্তদিগের প্রতি আস্থা পোষণ করিয়া তাহাদের সহিত মিতালী করিয়া স্বাধীন বঙ্গ রাষ্ট্রের কল্পনা মনে স্থান দান করিতে পারে, তাহার আশাবাদ যে কতখানি দৃঢ়, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কমুন্যাল অকমুন্যালের কথা এ নহে; এ জীবন মরণের সমস্যা। বাঙ্গালা শ্যামাপ্রসাদকে আমি 'কমুন্যাল' বলিতে রাজী আছি (আমার বলা না বলায় ভারি আসে যায় কি না!), একদা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিন্দু মহাসভার সহিত তাঁহার সম্পর্ক নিকট ছিল; তাঁহাকে না হয় ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু অন্যতম বাঙ্গালী প্রধান বিধানচন্দ্র রায় যে কনফার্মড সিকিউলার, তাহা ত সকলেই জানে (রোগ কি জাতি বা ধর্ম্মের বিচার করে?)—সেই বিধানবাবুও বঙ্গবিভাগ দাবী না করিয়া পারেন নাই; কিন্তু শরৎচন্দ্র বসু অবিচল হিমাচল। পশ্চিম পাকিস্তান হিন্দুমেধযজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা হিন্দুশূন্য করিলেও, উত্তর পশ্চিমসীমান্ত, পাঞ্জাব সিন্ধুদেশ বিতাড়িত এক কোটীর অধিক হিন্দুর দুঃখে পাষাণ ভেদ করিয়া রোদন সমুদ্র কল্লোলিত হইতে দেখিলেও, পূর্ব্ব পাকিস্তানাগত গৃহহারা সর্ব্বহারা উদ্বাস্তুদিগের মর্ম্ম বিদারী চিত্র প্রতিনিয়ত স্বচক্ষুতে প্রত্যক্ষ করিলেও শরৎচন্দ্র বসুর সংখ্যাগুরু 'সুশাসিত' সংযুক্ত বঙ্গরাষ্ট্রের মনোরম স্বপ্ন ভঙ্গ হয় নাই। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে, একটির পর একটি সঙ্কটজনক-সঙ্গীন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, পাকিস্তানে হিন্দুর জীবন বিপন্ন, নারীর নারীত্ব বিপর্য্যস্ত, মনুষ্যত্ব বিধ্বস্ত ও নিরাপত্তা পর্য্যুদস্ত হইয়াছে, গগন পবন হাহাকারে ভরিয়া উঠিয়াছে, সুপরিকল্পিত ও হিংস্র

বর্ব্বরতার অনুশাসনে পাকিস্তান ভিন্নধর্ম্মীরহিত নিশ্ছিদ্র ইসলামীয় রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হইতেছে, যাহা দেখিয়া জওহরলালের মত প্রেমিকও হালে পানি না পাইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন, শরৎচন্দ্র বসু এ সকলই দেখিয়াছেন, তথাপি মুস্লিম অধ্যুষিত সংযুক্ত বঙ্গের ধ্যান অপরিবর্ত্তিত দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত না হইয়াছে কে? ইসলামের বর্ব্বর ইতিহাসের প্রতি বারম্বার তাঁহার মনোযোগ আকর্ষিত হইয়াছে; বিশ্বের ইসলামীয় রাষ্ট্রসমূহের চিত্রাবলীর দিকে দৃষ্টি পুনঃপুনঃ আকর্ষণ করা হইয়াছে, শরৎচন্দ্র বসুর মুস্লিম মনুষ্যত্বের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা তথাপি অসীম প্রত্যাশাপন্ন। তাই হঠাৎ একদিন, শরৎচন্দ্র বসুর ভুলও ভাঙ্গিল। কিন্তু হায়! ভুল ভাঙ্গার সঙ্গে হৃদয়ও ভাঙ্গিল। ভ্রম সংশোধনের সঙ্গে সঙ্গেই জীবনাবসান হইল। তাই মনে হয়, বহুদিন হইতেই হিমালয়ের তলদেশ ক্ষয়িত হইতেছিল; ঘটনার পর ঘটনার সংঘাতে বিশাল হিমালয়ের ভিত্তি কাঁপিতেছিল; আশা-তরুর শাখা প্রশাখা একটির পর একটি কাণ্ড্যুত হইয়াছে, তবুও নিরাশায় আশা—মূল তরু বুঝি বাঁচিবে। সোমবার ২০এ মার্চ্চ মধ্য রাত্রিতে অকস্মাৎ আশা-তরু ভূলুণ্ঠিত হইল, স্বেচ্ছামৃত্যু ভীষ্মের মত শরৎচন্দ্র বসুরও জীবনে বিতৃষ্ণা জাগিল, স্বর্ণচূড়া দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া অনন্তে লীন হইল। যে মনুষ্যত্বের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস বিশ্বের বিরুদ্ধতা করিতেও দ্বিধা হয় নাই; কংগ্রেস বর্জ্জনেও সঙ্কোচ হয় নাই; জওহরলাল-প্যাটেল প্রভৃতি সহকর্ম্মীর সহিত প্রকাশ্যে বৈরিতা করিতেও বাধে নাই; বিশাল ভারতে নিঃসঙ্গ, নিরানন্দ যাত্রীটির মত নিষ্প্রাণের গান গাহিয়া বেড়াইতেও উৎসাহের অভাব হয় নাই, যেদিন, যে মুহূর্ত্তে বহু আকাঙ্খিত, বহু প্রতীক্ষিত ও বহু প্রত্যাশিত জাতির পৌরুষ পুণ্যসলিলা জাহ্নবীর ও ইসলামীয় মনুষ্যত্ব ঢাকার বুড়ী গঙ্গার জলে সমাধিস্থ হইতে লক্ষিত হইল, হতাশাক্ষুব্ধ জাতির অনন্ত আশা-ভরসার একমাত্র মূর্ত্ত প্রতীক, শরৎচন্দ্র বসু জীবন ধারণের বাসনা প্রত্যাহার করিলেন। ভগ্ন পিঞ্জরের পক্ষী কেবলমাত্র মনোবলের শৃঙ্খলেই এতকাল আবদ্ধ ছিল, এখন শৃঙ্খল অপসৃত হইল। ২০এ ফেব্রুয়ারী (১৯৫০) রাত্রি ১১-৪০ মিনিটে প্রতিধ্বনি স্তব্ধ হইয়াছে। ঐ সেই অসম্পূর্ণ প্রতিমা পড়িয়া রহিয়াছে।

অবশেষে পাঠক, এই বঙ্গদেশে যদি কোনদিন হতাশা-বিক্ষুব্ধ এই বিরাট পুরুষবরের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা হয়, তবে অনাগত অনন্তকালের ভবিষ্যজাতির অবগতির জন্য, স্মৃতি মন্দির গাত্রে একখানি ক্ষুদ্র, শুভ্র সুনির্ম্মল মর্ম্মর ফলকে এই কয়টি কথা লিখিয়া দিও:

> "পৌরুষ ও পুরুষকারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াই এই অম্লান যোদ্ধা শর শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন।"

বন্দে মাতরম্

জয়হিন্দ।

অদ্যাবধি সেই লীলা করে গোরারায়

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

তোমার সে লীলা আজিও কি তুমি করিতেছ এই ধরণী তলে?
পোড়া চোখে তার চিহ্ন পড়েনা। আমরা ভাগ্যহীনের দল!
ঠেকিয়া কি গেলে ঠাকুর এবার কালের কুটিল করাল ছলে?
চারিদিকে শুনি পিশাচের হাসি, দেখি দুঃখীর চোখের জল।

জগৎ জুড়িয়া ধূমায়িত শুধু মারণাস্ত্রের যজ্ঞানল,
মানবের বুকে নরকের খেলা, দম্ভলোভের কুম্ভীপাক!
সবার উপরে মানুষ সত্য—এ বাণী যে আজ লুপ্ত হল।
হাসিছে হিংসা, নিচে অন্যায়, দিকে দিকে শুধু দুর্বিপাক।

প্রকটিত কর হে প্রেমকোমল, অধম তারণ তোমার লীলা,
পতিত নরের পাশব জীবনে আজ মানবতা মহিমা ধারা
যেমন করিয়া গলাইয়াছিলে জগাই-মাধাই-হৃদয়-শিলা।
তোমার প্রেমের পুণ্য-পরশে হেম হ'য়ে যাক লৌহ যারা।

বুঝিতে চাহিনা সে লীলা তোমার, দেখে যাহা শুধু ভাগ্যবান।
অভাগাজনের হে আপন জন, গোপনতা কেন তাদের লাগি?
স্বপ্ন তাদের সত্য করিয়া হও প্রকাশিত হে ভগবান,
নরলীলা যদি তব প্রিয়তম, বাঁচাও মানুষে ভিক্ষা মাগি।

—আট—

রাত্রে খেতে বসে আলিমুদ্দিন মাস্টার দেখলেন, বেশ বড় বড় পাকা মাছের টুকরো।

—এ মাছ কোত্থেকে এলরে?

—শাহু পাঠিয়ে দিয়েছে সাহেব। ধাওয়ারা আজ বিল থেকে বড় বড় দুটো রুই ধরেছিল।—ভৃত্য জিবাইল ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে দিলেন।

শাহু পাঠিয়েছে! সামান্য স্কুল-মাস্টারের ওপর ফতে শা পাঠানের কেন এই অযাচিত অনুগ্রহ। হঠাৎ যেন সৌভাগ্যের দরজা খুলে গেছে। মূল্য বেড়ে গেছে নিজের—আকস্মিক একটা স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে আলিমুদ্দিন মাস্টার।

কারণটাকে খুঁজে পেতে খুব দেরী হলনা মনের মধ্যে। শাহুর বৈঠকখানায় সকালে সেই বক্তৃতার পুরস্কার এটা। পাকিস্তান হামারা। মুসলমানের জন্যে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র—নতুন মাটিতে বিজয়ী ইস্লামী ঝাণ্ডার নবজন্ম। খুশি হবার কারণ আছে বইকি ফতে শা পাঠানের। আবার হয়তো চোখের সামনে স্বপ্ন দেখছে নতুন কোনো শাহী আমলের। পাকিস্তান এলেই আবার গিয়ে চড়াও হবে তখ্‌ত-এ-তাউসে, হাতে মাথা কাটতে পারবে হাজার হাজার মানুষের।

মাছের একটা টুকরো নাড়তে নাড়তে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন আলিমুদ্দিন।

না, আর তা হবেনা। আর ফিরে আসবেনা সেই স্বর্ণযুগ। তিনি যে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখছেন, সেখানে শিকল খুলে যাবে সমস্ত মানুষের। সেখানে গরীবের বুকের রক্ত শুষে টাকার পাহাড়ে চড়ে বসতে পারবেনা বখিলের দল, সেখানে কোরবানীর মাংস সকলে ভাগ করে খাবে, বড়লোক প্রার্থীর দু হাত ভরে জাকাত দেবে, বিলিয়ে দেবে সর্বস্ব। সেখানে সত্যব্রতী মানুষ হজরতের মতো পিঠ পেতে দেবে প্রাপ্য 'কোড়া'র হিসেব মিটিয়ে নেবার জন্যে।

কিন্তু ফতে শা পাঠানেরা কি তাই চায়? জীবনের সমস্ত অসত্য—শোষণ, মিথ্যা, অন্যায়—সব 'না-পাক্'কে বর্জন করে এরা কি কামনা করে সেই সত্যিকারের পাকিস্তান?

যদি না চায়, তবে এদের সঙ্গেই আবার শুরু হবে নতুন করে লড়াইয়ের পালা। সে লড়াইয়ের জন্যে মন তৈরীই আছে আলিমুদ্দিন মাস্টারের। এতদিন ধরে সত্যাগ্রহের কঠিন দীক্ষা তাঁর ব্যর্থ হয়নি। কোনো অন্যায় সহ্য করবনা, কোনো ফাঁকি বরদাস্ত করবনা। ইংরেজের কাছ থেকে দেশকে যদি ফিরিয়ে আনতে পারি, তাহলে তাকে ফের তুলে দেবনা ফতে শা পাঠানদের হাতে। শাহী আমলের মোহ আর নেই, প্রতিষ্ঠা করব দান-দুনিয়ার মানুষের রাজত্ব।

জিবাইল আবার সামনে এসে দাঁড়াল।

—খাচ্ছেন না মাস্টার সাহেব? কী ভাবছেন?

—হাঁ খাচ্ছি—ভাতের গ্রাস তুলতে গিয়েই আবার একটি ছবি মনে এল। ঝাঁ ঝাঁ রোদ ঠিকরে পড়ছে বাদিয়াদের পাড়ায়। দাওয়ার ওপর অদ্ভুত বিষণ্ণ ভঙ্গিতে কুঁজো হয়ে বসে আছে এলাহী।

—মেয়েটার গায়ে পারার ঘা বেরিয়েছে হুজুর।

—শাহুর ওখানে বাঁদীর কাজ করত, শাহুকে ডাকত ধর্মবাপ বলে।

শাদা দাঁত বের করে কেমন বিশ্রী ভাবে হাসছে হোসেন। হাতের ধারালো হাসুয়াটা ঝক্‌ঝক্ করছে!

ধর্মবাপ! তাই বটে। হঠাৎ অসহ্য ঘৃণায় শরীরের মধ্যে মোচড় খেয়ে উঠল আলিমুদ্দিনের। শানকীতে এই মাছের টুকরোগুলো যেন একটা কুৎসিত ব্যাধির বীজাণুতে আকীর্ণ। মৃত্যুযন্ত্রণায় মলিন একটি মেয়ের মুখ ভেসে

উঠল দৃষ্টির সামনে। যেন অভিশাপ দিচ্ছে, যেন একটা প্রলয়ের সূচনা আসছে ঘনিয়ে।

আলিমুদ্দিন মাস্টার উঠে পড়লেন।

—ওকি, খেলেন না?—বিস্ময়াহত গলায় জানতে চাইল জিব্রাইল।

—না, খেতে পারছি না—সংক্ষেপে জবাব দিলেন আলিমুদ্দিন।

—শরীর খারাপ?

—না, না, সে সব কিছু না। মুখ ধুতে ধুতে আলিমুদ্দিন আবার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন।

…কিন্তু মাছটা বড্ড ভালো ছিল হুজুর।—জিব্রাইলের স্বরে ক্ষোভ প্রকাশ পেল: তবে কি রসুই ভালো হয়নি?

—না, না, খুব চমৎকার হয়েছে। আমি এমনিই খেতে পারছি না—খড়মের শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলেন আলিমুদ্দিন। রাত প্রায় সাড়ে দশটা বাজে, তবু শুতে ইচ্ছে করল না। ঘরের মধ্যে কেমন একটা গুমোট গরম একরাশ তপ্ত বাষ্পের মতো জড়ো হয়ে আছে, শুলেও ঘুম আসবেনা। তার চাইতে বারান্দার এই তক্তাপোষটাতেই বসা যাক।

বেশ নির্জন জায়গায় বাসাটি। পেছনে একটা আমের বাগান ছাড়া বাকী দুদিকে মাঠ। বাঁ পাশে একটু দূরেই একটা উঁচু ডাঙার ওপর দশ বারোটা তাল গাছ সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার তলা থেকে কুমীরা বিল শুরু। এই অন্ধকারেও চোখে পড়ল—বিলের একফালি চকচকে জলে তারার ঝাঁক দোল খাচ্ছে; কানে এল তালগাছগুলোর পাতায় পাতায় খড়্‌খড়্‌ মড়্‌মড়্‌ করে বিনিদ্র রাত্রির প্রহর জাগার সংকেত।

তক্তাপোষের ওপরে ছেঁড়া সতরঞ্চিটায় শরীরটা এলিয়ে দিলেন আলিমুদ্দিন।

ঘরের ভেতর থেকে একটা কল্‌কেতে ফুঁ দিতে দিতে বেরিয়ে এল জিব্রাইল। খাটের তলা থেকে টেনে বের করলে গড়গড়াটা, কলকে চাপালো তার মাথায়, তারপর নলটা আলিমুদ্দিনের হাতে তুলে দিলে।

—মাস্টার সাহেবের মন-মেজাজ কি ভালো নেই?

একটু কেমন যেন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে জিব্রাইল। ব্যাপারটা বুঝে নিতে চায় ভালো করে, জেনে নিতে চায় মাস্টার সাহেবের মানসিক অবস্থাটা।

—একথা কেন বলছ?—অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করলেন আলিমুদ্দিন।

—না, তাই দেখছি—একটা চৌপাই টেনে নিয়ে যেন নিশ্চিত সংকল্পে আসন নিয়েছে জিব্রাইল। বিদেশী মাস্টার সাহেবের দেখাশুনো করবার কর্তব্যটা এখানে যখন তারই, তখন সে দায়িত্বকে সে তো অবহেলা করতে পারেনা।

—কী হয়েছে তাহলে? কারুর সঙ্গে কোনো রকম ঝগড়া-ঝাঁটি?

গড়গড়ায় একটা টান দিয়ে খানিক ধোঁয়া ছেড়ে আলিমুদ্দিন বললেন, মিথ্যে ওসব ভাবছ জিব্রাইল, আমার কিছু হয়নি।

এইবার জিব্রাইল চুপ করল, আলিমুদ্দিনও চুপ করলেন। ধানকাটা মাঠের ওপর দিয়ে কালো রাত্রির স্রোত তরঙ্গিত হয়ে বয়ে চলেছে। এই অন্ধকারেও পালনগরের বুরুজটা কালি দিয়ে মোছা একটা ছবির ঝাপসা রেখার মতো দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণের কোণটায় যেখানে দু তিনটি আলো দপ দপ করে উঠছে, ওইটেই বাদিয়াদের গ্রাম। ওইখানে এলাহী বক্সের মেয়ে বিয়ের যন্ত্রণায় জ্বলে-পুড়ে মরে যাচ্ছে।

কিন্তু শুধু কি ওখানেই? আরো কত—কত সংখ্যাতীত, কত দৃষ্টি আজ মনের অগোচর। এমনি করে জর্জরিত হয়ে যাচ্ছে বিষ-যন্ত্রণায়। কে তাদের সন্ধান রাখে? আর—আর এদের বনিয়াদের ওপরেই কি গড়ে উঠতে পারে পাকিস্তান… গুলিস্তাঁ হামারা?

সামনে মাঠের পথ দিয়ে দুজন লোক চলছিল লণ্ঠন হাতে। এই চুপ করে বসে থাকার বিরক্তিটা কাটিয়ে ওঠবার জন্যই যেন জিব্রাইল ডাকল: কে যায়?

—জলিন আর রসিদ ধাওয়া।—একজন উত্তর দিলে। গলার স্বরটা জড়ানো।

জিব্রাইল বললে, দারু টেনে এসেছে ব্যাটারা।

—মদ?—আলিমুদ্দিন চকিত হয়ে উঠলেন।

—হ্যাঁ, খুব খায়। জিব্রাইল ঘৃণাকুঞ্চিত মুখে বললে, গোপালপুরের হাটে মাছ বেচতে যায়, সেখান থেকে পেট

ভরে টেনে আসে। গোপালপুরের সরকারী দোকানটাকে ওরাই তো বাঁচিয়ে রেখেছে।

—সেকি কথা! মুসলমানের বাচ্চা!—উত্তেজিত শিরাগুলো মুহূর্তে উদ্যত হয়ে উঠল: ডাক, ডাক তো ওদের। কী অন্যায়! এদিকে পেট পুরে দুমুঠো খেতে পায়না, অথচ মদের বেলায়—

—এই জলিন, এই রসিদ মিঞা—হাঁক দিলে জিব্রাইল।

—এখন চেঁচিয়ে মরছ কেন মিঞা? মাছ নেই সঙ্গে —আবার জড়িত উত্তর এল দূর থেকে।

—শুনে যা ব্যাটারা। মাস্টার সাহেব ডাকছেন।

—কে ডাকছেন?

—মাস্টার সাহেব, মাস্টার সাহেব। শিগ্‌গির আয় এদিকে—

লোক দুটো থামল। নিজের মধ্যে কী একটা আলোচনা করল চাপা গলায়। তারপর পেছন ফিরল। ধীরে ধীরে ভীরু পায়ে মাস্টারের দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়াল।

—আদাব মাস্টার সায়েব।

—আদাব—

সংক্ষেপে প্রতি অভিবাদন জানিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোক দুটোর দিকে তাকালেন আলিমুদ্দিন। হ্যাঁ, মুখ-চেনা মানুষ। মাছের বাঁক কাঁধে নিয়ে দ্রুতগতিতে এদের পথ দিয়ে চলে যেতে দেখেছেন বহু দিন। কিন্তু লণ্ঠনের ম্লান বিষণ্ণ আলোয় এমন করে এদের মুখখানাকে দেখবার সুযোগ আগে তাঁর কখনো ঘটেনি।

একজনের বয়েস হবে পঞ্চাশের কাছাকাছি। শাদা রং ধরেছে দাড়িতে। জটা-বাঁধা চুলগুলো লালচে; অতিরিক্ত জল ঘাঁটার স্বাক্ষর, অথচ চুলে কখনো তেল পড়েনি। কালিপড়া চোখের কোঠরে বিষণ্ণ নির্বাপিত দৃষ্টি। আর একজনের বয়েস ত্রিশ-বত্রিশ হবে। মিশ্‌মিশে কালো রং—ভ্রূর ওপরে ক্ষতচিহ্নের একটা শাদা দাগ চকচক করছে লণ্ঠনের আলোয়।

মাস্টারের সামনে লোক দুটো দাঁড়িয়ে রইল বিনাত ভঙ্গিতে। স্পষ্ট দেখা গেল, নেশায় তাদের পা টলছে। অসহ্য ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে উঠলেন মাস্টার।

—তোরা মুসলমান?

—জী।—লোক দুটো ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। তাকিয়ে রইল নির্বোধ দৃষ্টিতে।

—মদ খাস?—আলিমুদ্দিনের স্বর কঠোর হয়ে উঠল।

—জী···তেমনি অসংকোচ উত্তর এল।

—জী!—আলিমুদ্দিন জ্বলে উঠলেন: বলতে সরম লাগল না? মুসলমানের বাচ্চা হয়ে মদ খাস, গুণাহ্‌ হয় তা জানিস্‌?

নেশার ঝোঁকে তারা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। তারপর বয়স্ক লোকটা—জলিল মাতালের হাসি হেসে জড়িত গলায় বললে, জী। কিন্তু সবাই খায়। থানার দারোগা সাহেব, শাহ্‌—

মুখের ওপর প্রবল একটা আঘাতের মতো এসে পড়ল কথাটা। কয়েক মুহূর্তের জন্ম স্তব্ধ হয়ে গেলেন আলিমুদ্দিন। এ প্রশ্নের এমন একটা উত্তর তিনি আশঙ্কা করেননি। মুহূর্তের জন্য মনে হল, এ মানুষগুলোর অপরাধের বিচার করবার অধিকার সত্যি সত্যিই তাঁর আছে তো?

কিন্তু অবস্থাটাকে সহজ করে দিলে জিব্রাইল।

কষে একটা ধমক দিলে সে।

—মুখ সামলে কথা বল্‌ বেয়াকুবের দল। দারোগা সাহেব আর শাহ্‌ কী করে, সে খোঁজ তোদের কাছে কে জানতে চেয়েছে?

জলিল একটু বিনীত হাসি হাসল: জী, সে ক্থা ঠিক। তবে হুজুর জানতে চাইলেন, তাই বললাম।

গড়গড়ায় আর একটা টান দিয়ে নিজেকে খানিকটা ধাতস্থ করে নিলেন আলিমুদ্দিন। বললেন, মদ খাস কিসের জন্যে?

—সারাদিন হাড়ভাঙা মেহনত করে তবে খাব কী সাহেব?—পাল্টা প্রশ্ন এল রসিদের তরফ থেকে।

—কী খাব সাহেব?—জিব্রাইল দাঁত খিঁচিয়ে উঠল: বলতে লজ্জা করে না? এদিকে পেটে ভাত নেই, ঘরের চালে খড় নেই, ওদিকে রোজগার সব চলে যাচ্ছে গোপালপুরের আবগারী দোকানে! কেন, ওই পয়সা দিয়ে কিনতে পারিসনা ভাত-কাপড়, ছাউনি দিতে পারিসনা ঘরের চালে?

—ঘরের চাল!

হঠাৎ লোক ছটো সমস্বরে হা হা করে হেসে উঠল। অদ্ভুত ভয়ঙ্করভাবে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে লহরে লহরে বয়ে গেল সে হাসির শব্দ। ভয়ানকভাবে চমকে উঠলেন আলিমুদ্দিন মাস্টার, গড়গড়ার নলটা খসে পড়ল হাত থেকে। না—এ মাতালের হাসি নয়। একটা বুকফাটা কান্না যেন হাহাকার করে বেরিয়ে এল খানিকটা অট্টহাসির ছদ্মবেশে।

—ওকি, অমন করে হাসছিস যে?

তীব্র গলায় আবার একটা ধমক দিতে চেষ্টা করল জিব্রাইল। কিন্তু সে হাসিতে এবার আর তারা দমে গেলনা, আবার খানিকটা ক্ষ্যাপার মতো প্রচণ্ড হাসি তরঙ্গিত হয়ে বয়ে গেল অন্ধকারের ভেতর দিয়ে।

—ঘর! ঘর বেঁধে কী হবে? আজ আছি, কালই চালা কেটে তুলে দেবে শাহু। কী হবে ঘর দিয়ে?

—চুপ!—বজ্রকণ্ঠে বললে জিব্রাইল।

—চুপ করেই তো আছি মিঞা। আমাদের তো কথা বলবার দরকার নেই।

খানিকক্ষণ তীব্রদৃষ্টিতে লোক ছটোর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন আলিমুদ্দিন। আস্তে আস্তে বললেন, চুপ করো জিব্রাইল। যা বলবার আমি বলছি।

চোখ পাকিয়ে জিবাইল বললে, না সাহেব, বড্ড বাড় বেড়েছে লোকগুলো। শাহুর নামে যা খুশি তাই বলে বেড়াচ্ছে। একবার যদি কানে যায়—

কিন্তু মদের নেশায় ভয়ডর কেটে গেছে লোকগুলোর—মনের ওপর থেকে সরে গেছে আশঙ্কা আর আতঙ্কের সঙ্গা আবরণটা। জীবনে পিছু হটতে হটতে এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখান থেকে আর সরবার উপায় নেই। এবার হয় সামনে ঝাঁপিয়ে পড়বে, নইলে হারিয়ে যাবে মৃত্যুর অন্ধকারে।

—মুর্দাকে আবার গোরের ভয়!—তিক্ত কণ্ঠে বললে রসিদ।

জলিল সেই কথাটারই জের টানল: কানে গেলে কী করবে শাহু? ঘর তুলে দেবে, এই তো? তাতে আর কী হবে? বানের পানিতে ভাসতে ভাসতে এসেছি, ভাসতে ভাসতে চলে যাব। আর মিথ্যে ভয় দেখিযোনা মিঞা। ব্যাগার খেটে গায়ের রক্ত জল করে দিলাম, জুতোর ঘা খেয়ে পিঠে আর জায়গা নেই কোথাও। কাকে ভয় করব ছনিয়ায়?

—ওই জন্যেই তো দারু খাই। নইলে বাঁচব কী করে?

আলিমুদ্দিন তেমনি তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তাদের দিকে, কিছুক্ষণ যেন জিব্রাইলও একটা কথা বলবার মতো খুঁজে পেলনা। ভয়ের শেষ সীমান্তে এসে যে মানুষ নির্ভয় হয়ে গেছে, কেমন করে দমিত করা যাবে তাকে? কোন্ উপায়ে তাকে বশীভূত করা সম্ভব?

আলিমুদ্দিন নিজেকে সংহত করে নিলেন। আস্তে আস্তে বললেন, তবু তো মুসলমান। মুসলমানের কী মদ খেতে আছে?

—আমরা কি মুসলমান?—তেমনি আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল জলিল। লোকটার নেশা কি কেটে গেল নাকি?

—কী বলছিস উল্লুক?—জিব্রাইল নিজেকে সামলাতে পারলনা।

—সত্যি কথা শুনলে তোমাদের তো ভালো লাগেনা মিঞা। কান কটকট করে। আমরা মুসলমান! তাহলে মসজিদে আমরা ঢুকতে পারিনা কেন? কেন নামাজের সময় আমাদের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়?

—সে কি!—আলিমুদ্দিন চমকে উঠলেন।

—ইমাম সাহেব আমাদের দেখলে কেন মুখ ফিরিয়ে চলে যান?—আবার প্রশ্ন করল জলিল।

—কী বলছে এরা? এও কি সম্ভব? এ জিনিস আছে নাকি ইসলামের মধ্যে?—সীমাহীন বিস্ময়ে কলের পুতুলের মতো যেন কথাগুলো আবৃত্তি করলেন আলিমুদ্দিন, বিস্ফারিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন জিব্রাইলের দিকে।

অপরাধীর মতো নতনেত্রে তাকিয়ে রইল জিব্রাইল। তারপর বললে, এরা যে ধাওয়া।

—এরা মাছ ধরে।

—বেশ তো।

মাটিতে একবার থু থু ফেলে জিব্রাইল বললে, কাছিমও ধরে।

—তাতে এমন কী অপরাধ হল?

—অপরাধ হলনা? তোবা তোবা। আপনি কী বলছেন মাস্টার সাহেব?

রসিদ জ্বলে উঠল হঠাৎ।

—মাছ ধরবনা, কাছিম ধরবনা, তবে খাব কী? তোমরা খেতে দেবে? সে বেলায় কোনো চাচার দেখা নেই।

জিব্রাইল বললে, এই—খবর্দার!

—না, না, তুমি থামো।—ক্লান্ত অবসন্ন গলায় আলিমুদ্দিন বললেন, ব্যাপারটা আমাকে একবার ভালো করে সব বুঝে নিতে দাও। সত্যিই কি এদের মসজিদে ঢুকতে দেওয়া হয়না?

—না।

—হিন্দুদের ছোটজাতের মতো মুসলমান হয়েও এরা অস্পৃশ্য?

—ঠিক তা নয়, তবে—জিব্রাইল দ্বিধা করতে লাগল : তবে, ভেবে দেখতে গেলে অনেকটা তাই দাঁড়ায় বটে। তবে আমাদের আর দোষ কী বলুন, মোল্লাদের হুকুম তো মানতে হবে।

—হাঁ, মোল্লা সাহেবদের হুকুম!—রসিদ আবার বক্রস্বরে বললে, হুকুম দিতে কোনো খরচ নেই তো। কিন্তু সব মিঞাকেই চিনি। আমাদের মুখ দেখলেও তো গুনাহ্ হয়, কিন্তু আমাদের ধরা মাছ তরিবৎ করে মুখে দিতে একটুও গুনাহ্ হয়না মোল্লাদের।

জিব্রাইল কী একটা বলবার জন্য উদ্যত হয়ে উঠছিল। আলিমুদ্দিন বললেন, থামো। সব আমায় ভালো করে শুনে নিতে দাও। বলো রসিদ, আর কী বলবার আছে তোমাদের।

—কী আবার বলব!—রসিদের মুখ আরো বিকৃত হয়ে উঠল : বললেই বা কে শুনতে যাচ্ছে আমাদের কথা? আমরা মানুষ নই, মুসলমানও নই, আমরা জানোয়ার। তাই মরলে পরে সকলের সঙ্গে আল্লাতলাতে আমাদের জায়গা হয়না—আমাদের মুর্দাকে গোর দিতে হয় ভাগাড়ে। গোরু-ঘোড়ার মতো আমরা বাঁচি, তাই মরবার পরেও গোরু-ঘোড়া ছাড়া আমাদের আর ঠাঁই কোথায়?

—ইয়া আল্লা!—আলিমুদ্দিন মাস্টার স্তব্ধ হয়ে রইলেন : এমন তো কখনো শুনিনি।

—শুনে লাভ কী মাস্টার সাহেব? আপনাদের সময় নষ্ট হবে।

—হুঁ!—আলিমুদ্দিন চুপ করে রইলেন। দুপুর থেকে পর পর এই দুটো ঘটনা যেন মনের মধ্যে মেঘের মতো এসে ছায়া ফেলছে। ম্লান করে দিয়েছে মনের উদ্দীপ্ত উৎসাহটাকে—একটা কুয়াশার অস্বচ্ছ আবরণ টেনে নিষ্প্রভ আর বিবর্ণ করে দিচ্ছে পাকিস্তানের উজ্জ্বল স্বপ্ন ছবিকে। সারাদিন দুনিয়ার মানুষের যে আজাদ-পৃথিবীর ধ্যান তিনি করে এসেছেন এতকাল, একি তারই ভিত্তি? নাকি এ কোনো চোরাবালির বনিয়াদ, যার ওপরে এক মুহূর্ত ভার সইবে না?

—আচ্ছা, আমি এসবের একটা ব্যবস্থা করছি—একটা নিশ্চিত প্রতিজ্ঞার মতো যেন স্বগতোক্তি করলেন আলিমুদ্দিন মাস্টার : এ চলবে না, কোনোমতেই না।

রসিদ হাওয়া খেলে, এবার আমরা চলি মাস্টার সাহেব। রাত হয়ে গেছে।

—একটু দাঁড়াও।—নিভে যাওয়া গড়গড়ায় ব্যর্থ একটা টান দিয়ে নলটা নামালেন আলিমুদ্দিন : আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। ইস্কুলে পাঠাও তোমাদের ছেলেদের?

—ইস্কুলে! কী হবে?

—কেন, লেখাপড়া শিখবে। মানুষ হবে।

—খরচা কোত্থেকে আসবে সাহেব?

—সে ব্যবস্থা আমি করব—দুঃখের মধ্যে আকস্মিকভাবে যেন অবলম্বন করবার মতো কিছু একটা খুঁজে পেয়েছেন আলিমুদ্দিন : ওদের বিনা পয়সায় পড়বার ব্যবস্থা করে দেব।

—কী হবে সময় নষ্ট করে?—একটা নিরুত্তাপ অবজ্ঞা ফুটে বেরুল জলিলের গলায় : তার চেয়ে এখন থেকে মাছ ধরলে কাজ দেবে।

—না, তা হবে না।—আলিমুদ্দিন কঠিন হয়ে উঠলেন : আমি বলছি। কাল সকালে খাওয়া দাওয়ার সময় ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে দেবে।

—না সাহেব, তার দরকার নেই। আর আমরা মাছ ব্যাগার দিতে পারব না।

—মাছ ব্যাগার! কেন?

—বাঃ, চিরকাল তাই তো হয়ে আসছে। বিনা উপকারেই ব্যাগার দিতে দিতে জান বেরিয়ে গেল, উপকার করলে আর রক্ষা আছে?

—বলছে কী, জিব্রাইল?—আলিমুদ্দিন অসহায় দৃষ্টিতে তাকালেন জিব্রাইলের দিকে: এদের মাছও কি এই ভাবে নিয়ে নেওয়া হয় নাকি?

জিব্রাইল অগ্নিবর্ষী চোখে লোকগুলোকে দগ্ধ করে ফেলতে চাইল: না সাহেব, সব কথা বড্ড বাড়িয়ে বলছে এরা। খাজনা তো দেয় বছরে চারগণ্ডা পয়সা, কিছু দেবে না তার বদলে? তোলা দেবে না জমিদারকে, থানার দারোগাকে!

—তোলা!—জলিল দপ্ করে উঠল: ওকে তোলা বলে! আমাদের মুখের গ্রাস, পেটের ভাত কেড়ে নেওয়াকে বলে তোলা? এই তো হানিফের বড় ব্যাটাটা মর মর, সরকারী দাওয়াখানার ডাক্তারবাবু বললে, শহর থেকে ভালো ওষুধ না আনলে বাঁচানো যাবে না। আজ হানিফের জালে যখন এই বড় বড় দুটো রুই মাছ পড়ল, তখন বেচারা ভাবল, বাজারে গেলে অন্তত দুগণ্ডা টাকা পাবে। কিন্তু পেল কিছু? শাহুর পাইক এসে মাছ দুটো তুলে নিয়ে গেল। পায়ে ধরে কাঁদল হানিফ, রোগা ব্যাটাটার দোহাই দিলে, লাথি মেরে মাছ কেড়ে নিয়ে গেল। এর নাম তোলা?

অসহ্য ক্রোধে জিব্রাইল হতবাক হয়ে রইল।

—মরবার পাখনা উঠেছে। এইবার মরবি।

—মরেই তো আছি—নতুন করে আর কী মরব?—চটাং করে জবাব দিলে রসিদ। তারপর জলিলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, চলো চাচা, রাত হয়ে গেল।

—হ্যা চল। আচ্ছা মাস্টার সাহেব, আদাব।

কিন্তু মাস্টার সাহেব সেই যে পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন, একটা প্রত্যভিবাদন পর্যন্ত তিনি জানাতে পারলেন না। তীব্রতম আঘাত পড়েছে, সাপের বিষের মতো একটা দুর্বিষহ জ্বালা ধরেছে সর্বাঙ্গে। অসহ্য যন্ত্রণায় তাঁর শিরাস্নায়ুগুলো পর্যন্ত যেন জ্বলে যেতে লাগল। এতদিন পরে, এইবারে মন যেন স্পষ্ট কণ্ঠে তাঁর কাছে উপস্থিত করল একটা নির্মম কঠিন প্রশ্ন: তাঁর সত্যিকারের স্থান কোথায়? ওই শাহুর বৈঠকখানায়, না নির্যাতিত এই অমানুষগুলোর বিড়ম্বিত জীবনের মধ্যে?

অস্বস্তিটাকে কাটাবার চেষ্টা করল জিব্রাইল।

—ওসব কথা কানে তুলবেন না মাস্টার সাহেব। মদের ঝোঁকে বলে গেল, কোনো মাথামুণ্ডু নেই ওসবের। কাল সকালেই দেখবেন সোজা ঘাড় আবার নুয়ে পড়েছে। মাটিতে। সামনে এসে ভুঁয়ে লুটিয়ে সেলাম বাজাবে তখন—এই বলে রাখলাম।

আলিমুদ্দিন জবাব দিলেন না। অন্ধকার, কালি-ঢালা মাঠ। বিলের জলে তারার ঝাঁক দোল খাচ্ছে। দূরে পাল-বুরুজের চুড়োটা যেন কবরখানার বুকের ভেতরে জেগে আছে নিঃসঙ্গ একটা অতিকায় জিনের মতো। সারি সারি তালগাছ সামনে কাঁদছে রাত্রির বাতাসে। সব হিসেবে গোলমাল হয়ে গেছে, মুহূর্তের মধ্যে এলোমেলো আর বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে চিন্তার তন্তুজাল। আবার কি নতুন করে ভাবতে হবে, আবার কি শুরু করতে হবে গোড়া থেকে?

গুলিস্তাঁ হামারা।

ধাওয়ারা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। দুলতে দুলতে চলে যাচ্ছে লণ্ঠনের আলো। এলাহী বখ্শ, ধাওয়ারা—সেইখানেই কি শেষ? আরো কত—কত সংখ্যাহীন, কত অজস্র?

আর তৎক্ষণাৎ একটা কথা মনে পড়ল বিদ্যুৎ চমকের মতো।

—ওই মাছগুলো শাহুর ওখান থেকেই তো দিয়ে গেছে, না জিব্রাইল?

আকস্মিক প্রশ্নে থতমত খেয়ে জিব্রাইল বললে, জী!

সমস্ত পেটটা পাক দিয়ে উঠল আলিমুদ্দিনের। মাছ নয়, একটা মুমূর্ষু মানুষের বুকের মাংস যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছেন তিনি। দ্রুতবেগে তিনি উঠে গেলেন ভেতর দিকে।

বিহ্বল জিব্রাইল শুনতে পেল আলিমুদ্দিন বমি করছেন।

(ক্রমশ)

দণ্ডীর দশকুমারচরিত

শ্রীপুষ্পরাণী ঘোষ

দণ্ডীর দশকুমারচরিত সংস্কৃত সাহিত্যে একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বর্ত্তমান যুগের পাঠকসমাজ অবশ্য ইহার সহিত তেমন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত নহেন; কিন্তু এককালে ইহার যথেষ্ট আদর ছিল। সুষ্ঠু রচনাভঙ্গী ও মনোহর বিষয়বস্তুর জন্য ইহা সর্ব্বকালেই যথেষ্ট সমাদর লাভ করিবার উপযুক্ত গ্রন্থ। দণ্ডী একজন বিশেষ নামকরা লেখক ছিলেন। তাঁহার যে যথেষ্ট সাহিত্যিক খ্যাতি ছিল প্রচলিত সুভাষিতাবলী হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। কালিদাস, বান ও ভবভূতির ন্যায় তাঁহারও ভাষার উপর যথেষ্ট অধিকার ছিল। প্রকৃতি বর্ণনায় ও ঘটনার বিবরণ প্রকাশে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দশকুমারচরিতের বহু স্থানেই তাঁহার বর্ণনাভঙ্গীর অতি মনোরম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বৃহৎ উপন্যাসের ন্যায় ছোট গল্প লিখিতেও যে দণ্ডী পারদর্শী ছিলেন দশকুমারের অন্তর্গত ছোট গল্পগুলি তাহার প্রমাণ।

দশকুমারের বিষয়বস্তু দণ্ডীর স্বকল্পিত বলিয়াই সুধীজনের অনুমান। অবশ্য ইহার দু'একটি ঘটনার সহিত গুণাঢ্যের "বৃহৎ কথার" দু'একটি গল্পের কিছু কিছু সামঞ্জস্য আছে কিন্তু তাহা অতি সামান্য; মনে হয় দণ্ডীর নিজের অজ্ঞাতসারেই ঐ সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল। দশকুমারচরিতের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তিও নাই। অবশ্য কতকগুলি গল্পে সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনার ছায়াপাত হইয়াছে কিন্তু তাহা ছায়াপাতই মাত্র—তাহার বেশি কিছু নহে। দণ্ডী বিশেষ কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। মনে হয় এই বিশাল গ্রন্থখানির বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিনব গল্পগুলি একান্তভাবেই দণ্ডীর স্বকপোলকল্পিত। সমসাময়িক কালের রাজপরিবার ও উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুষ্ঠু চিত্র সম্বলিত একখানি উপন্যাস সৃষ্টি করিবার প্রশংসা সম্পূর্ণরূপেই দণ্ডীর প্রাপ্য।

উপন্যাস হিসাবে দশকুমারচরিত একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। প্রঃ কিথ সত্যই বলিয়াছেন, "এই পুস্তকে কাব্যরীতির মাধুর্য্য কথা-সাহিত্যে প্রযুক্ত হইয়া লেখকের প্রতিভার ধারা প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

দশকুমারচরিতের একটি বিশেষত্ব আছে। সংস্কৃতে গল্প সাহিত্য মাত্রেই নীতিগর্ভ। কিন্তু দশকুমারচরিতের গল্পগুলির কোথাও নীতি প্রচারের বা উপদেশ দিবার ভাব লক্ষ্য করা যায় না। ইহা নিছক গল্পই। লেখক তাঁহার আশেপাশে যাহা দেখিয়াছেন—তাহার অতি উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন মাত্র। তাঁহার পারিপার্শ্বিক সমাজে বহু দোষ, ত্রুটি ও গ্লানি তিনি খুব ভালভাবেই লক্ষ্য করিয়াছেন; কিন্তু কি ভাবে সেগুলির উচ্ছেদসাধন করা যায় সে বিষয়ে কিছুই বলেন নাই—তিনি সে সকল পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন মাত্র। তিনি যেন একজন আধুনিক বাস্তববাদী সাহিত্যিক। দণ্ডীর এই বিশেষত্ব ভালই হউক বা মন্দই হউক অভিনব বলিয়াই উল্লেখযোগ্য।

এই লোকপ্রিয়, চমৎকার উপন্যাসটির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ প্রায়ই আনা হয় যে ইহাতে উচ্চভাব ও সুরুচির বড়ই অভাব। একথা একেবারে অস্বীকার করা চলে না। সত্যই ইহার মধ্যে চৌর্য্য, হত্যা ইত্যাদি নানা গর্হিত ও গুরুতর অপরাধের যথেষ্ট প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়, আর দণ্ডীর লেখার ভাবে সে সকলের প্রতি যথেষ্ট ঘৃণা ও বিরাগের ভাবও দেখা যায় না। মনে হয় তিনি সমাজের যে বিশেষ শ্রেণীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ঐ সকল অপবাদের যথেষ্ট প্রচলন ছিল—সমসাময়িক ইতিহাস ও অনুরূপ সাক্ষ্য দেয়। তবে সুরুচির অপবাদটা খণ্ডনযোগ্য। এইরূপ একটি বহু খ্যাত পুস্তকের বিরুদ্ধে সহসা ওরূপ অভিযোগ আনয়ন করা সঙ্গত নহে—এবিষয়ে এই বলা চলে যে মানুষের রুচির আদর্শ যুগে যুগে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন লাভ করে। আজ যাহা সুরুচির একান্ত অভাব বলিয়া বোধ হইতেছে—এককালে তাহাই হয়ত সাধারণ প্রচলিত প্রথামাত্র ছিল। দণ্ডী দশকুমারচরিতে মূলতঃ গল্পই বলিয়াছেন—গল্প বলাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য এবং তিনি ইহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। এবিষয়ে তিনি যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে ইচ্ছা করিলেই নানাপ্রকার লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় দিতে পারিতেন এবং আড়ম্বরবহুল ভাষার ব্যবহার করিতে পারিতেন তাঁহার লেখার ভিতর তাহার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু নিজের বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিবার জন্য তিনি কোথাও গল্পের প্রাধান্য নষ্ট করেন নাই। ঠিক এই কারণেই তাঁহার পক্ষে সূক্ষ্মভাবে চরিত্রচিত্রণও সম্ভব হয় নাই। তথাপি সুদক্ষ শিল্পীর মতই তাঁহার নিপুণ হস্তের দু'একটি বলিষ্ঠ রেখাপাতেই দশকুমারচরিতের বিভিন্ন কুশীল চরিত্রগুলি বিচিত্রভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দশকুমারচরিতে বহু দেশ ও নগরনগরীর উল্লেখ আছে। দেখা যায় যে তৎকালীন বণিক সম্প্রদায় বহু দূর দেশেও অভিযান করিতেন। প্রচুর বাণিজ্যসম্ভার লইয়া তাঁহাদের বিপুল বাহিনী নানা বিপদসঙ্কুল পথ দিয়া দেশদেশান্তর যাত্রা করিত; এমন কি আরব প্রভৃতি দেশের সহিত সমুদ্রপথে বাণিজ্যও তখন প্রচলিত ছিল। ভারতের এই সামুদ্রিক বাণিজ্য কালক্রমে লোপ পায়।

দণ্ডীর বর্ণিত সামাজিক চিত্রের মধ্যে বিশেষ কোন অভিনবত্ব নাই। হিন্দু সমাজের সাধারণ চিত্রই সেখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জন্মান্তরবাদ, কর্ম্মফল, দৈব ও অদৃষ্টে অবিচলিত বিশ্বাস, প্রতিমাপূজা, স্বপ্ন, নানারূপ মুদ্রা, জ্যোতিষ ও যাদুবিদ্যায়—অগাধ আস্থা, বহুবিবাহপ্রথা, সহমরণ-

প্রথা, দেবদ্বিজে ভক্তি, দশবিধসংস্কার, দ্যূতক্রীড়ায় আসক্তি—এসকলই ভারতীয় সমাজের সাধারণ চিত্র।

দণ্ডীবর্ণিত রাজপরিবারগুলির ইতিহাস হইতে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যায়। সে সময় গুপ্তচর বিভাগ বেশ উন্নত ছিল। রাজা ও রাজকুমারেরা শিকার বিশেষভাবে পছন্দ করিতেন, যুদ্ধের প্রতি তাঁহাদের প্রগাঢ় আসক্তি ছিল। প্রায়ই একরকম বিনাকারণেই যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইত। রাজকুমারদের বিবিধ বিষয়ে খুব উচ্চশ্রেণীর শিক্ষা দেওয়া হইত। দশকুমারচরিত হইতে এই সকল বিষয়ে কিছু উদ্ধৃত করিয়া আমার এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

প্রথমেই বলি দশকুমারদের শিক্ষার কথা। "তাঁহারা সকলপ্রকার লিপি ও সকল দেশের ভাষায় জ্ঞানলাভ করিলেন; ষড়াঙ্গ বেদ, কাব্য, নাটক, আখ্যানক (ছোট গল্প) আখ্যায়িকা ইতিহাস, কথা ও পুরাণ সমূহে পারদর্শী হইলেন; শব্দশাস্ত্র তর্কশাস্ত্র ব্যাকরণ মীমাংসা, জ্যোতিষ ও ধর্মশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন; কৌটিল্য ও কামন্দকের রাজনীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেন; বীণা ও অপরাপর বাদ্যযন্ত্রে নিপুণ হইলেন; সঙ্গীত ও সাহিত্যে কুশল হইলেন। তাঁহারা নানাবিধ গুণান্বিত মণিরত্নাদি প্রয়োগে, মন্ত্র ও ঔষধাদি ব্যবহারে এবং মায়া ও যাদুবিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করিলেন। রাজপুত্রেরা গজ, অশ্ব ও অন্যান্য বাহন আরোহণের যোগ্যতালাভ করিলেন, নানাবিধ অস্ত্রব্যবহারে অভ্যস্ত হইলেন এমন কি চৌর্য্য, দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি কপট কলাতেও পারদর্শিতা লাভ করিলেন।" এতো গেল রাজকুমারদের শিক্ষার কথা। এখন দেখা যাক দণ্ডীর মতে কি কি গুণ থাকিলে প্রকৃত রাজা হওয়া যায়। এইরূপ একজন রাজা সম্বন্ধে দণ্ডী বলিতেছেন; তিনি ন্যায়পরায়ণ, অমিতবলশালী, সত্যবাদী, বদান্য, বিনীত ও কীর্ত্তিমান ছিলেন। তিনি প্রজাদের আদর্শস্বরূপ ছিলেন ও তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। অনুচরদের তিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিতেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও স্নিগ্ধ গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইত। উচ্চ ও মহৎ কার্য্য করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই উৎসুক থাকিতেন এবং যেসকল কার্য্য সাধ্যায়ত্ত ও পরিণাম হিতকর—সেই সকল কার্য্যই করিতেন। তিনি ধর্ম্মের রক্ষক ছিলেন, পণ্ডিতদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন, পরিজনদের উন্নতিবিধান করিতেন এবং সজ্জনদিগকে সম্মানজনক কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। এই রাজা শত্রুদের সর্ব্বদা উপযুক্ত শাস্তিবিধান করিতেন। অমূলক জনরব বা অনর্থক চাটুবাক্যে কদাচ কর্ণপাত করিতেন না। তিনি অতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন; নিজেও সকল কলায় সুপণ্ডিত ছিলেন। নীতিশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, সামান্য উপকারেরও তিনি দ্বিগুণ প্রত্যুপকার করিতেন। রাজকোষ ও যানবাহনাদির পর্য্যবেক্ষণ তিনি নিজেই করিতেন এবং সযত্নে রাজ্যের প্রয়োজনীয় বিভাগগুলির অধ্যক্ষদের কার্য্যপরীক্ষা করিয়া যোগ্যজনকে যোগ্য পুরস্কারদানে তুষ্ট করিতেন। আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক; দৈব ও মানবীয় সকলপ্রকার আপদেরই তিনি নিরাকরণ করিতেন। সন্ধি-বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয় এই ষষ্ঠ প্রকার বৈদেশিক নীতিতেই তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। মনু প্রতিষ্ঠিত চাতুর্ব্বর্ণের চতুরাশ্রমের তিনি আশ্রয়স্বরূপ ছিলেন—এককথায় তিনি একজন পুণ্যশ্লোক নরপতি ছিলেন।"

ইহার পর অর্থনীতি শাস্ত্রের গুণাবলী বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়া দণ্ডী বলিতেছেন "অন্য সর্ব্ববিধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও অর্থশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা না থাকিলে নৃপতির পক্ষে সে পাণ্ডিত্য কোন কাজেই আসে না। স্বর্ণ যেমন অগ্নিশুদ্ধ না হইলে উজ্জ্বলতালাভ করে না, নরপতিও সেইরূপ অর্থশাস্ত্রাভিজ্ঞ না হইলে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না। সে রাজা সহজেই অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। কোন্ কোন্ কার্য্য আরম্ভ করা যুক্তিযুক্ত এবং কি ভাবেই বা তাহা সম্পন্ন করিতে হয় সেবিষয়ে তাঁহার কোন জ্ঞান জন্মে না, অবিবেচকের মত বৃথা আরব্ধ কার্য্যে সিদ্ধিলাভ হয়না—ফলে প্রজারা তথা অন্যান্য সকলেই তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। অশ্রদ্ধেয় রাজার আদেশ কেহই পালন করে না। যেখানে রাজাদেশ প্রতিপালিত হয় না, রাজা সেখানে প্রজাপালনে অসমর্থ প্রজারা সেখানে উচ্ছৃঙ্খলচিত্তে যথেচ্ছ ব্যবহার করে। ফলে রাজ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ধর্ম্মহীন, আচারহীন প্রজারা নিজেদের এবং রাজারও ইহপরকালের মহা অনিষ্টের কারণ হয়। কিন্তু অর্থশাস্ত্রের জ্ঞান থাকিলে এসকল বিভ্রাট কিছুই উপস্থিত হয় না। অর্থশাস্ত্রের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত কর্ম্মপথায় নিয়ন্ত্রিত সর্ব্ববিধ কার্য্যাবলী অতি সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয়। অর্থশাস্ত্র দেব দৃষ্টির ন্যায়—তাহা সর্ব্বদাই ভূত ভবিষ্যত ও বর্ত্তমানের সন্ধান বলিয়া দেয়, এমনকি এই দৃষ্টিশক্তি যাঁহার নাই সে রাজা পদ্মপলাশলোচন শোভিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে অন্ধই। কারণ তিনি রাজনৈতিক ব্যাপারসমূহের গূঢ়ার্থ নিরূপণ করিতে অসমর্থ। অর্থশাস্ত্রেই রাজকুমারদের প্রকৃত উত্তরাধিকার—অন্যান্য শাস্ত্রের জ্ঞান সে তুলনায় বাহ্যিক অলঙ্করণ মাত্র। ইহার সাহায্যেই ত্রিবিধ রাজশক্তির প্রয়োগে এই সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হওয়া যায়" দণ্ডীর দশকুমার চরিতে এইরূপ নানা জ্ঞানপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

পরিশেষে একথা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে বহুকালপূর্ব্বে দণ্ডী রাজার শিক্ষা, জ্ঞান ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন স্বাধীন ভারতের রাজপুরুষেরা যদি সেইভাবে নিজেদের শিক্ষিত করিয়া দেশ শাসনে অগ্রসর হন তবে দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করিয়া তাঁহারা প্রকৃত জনপ্রিয় নেতা হইতে পারেন।

শরৎচন্দ্র বসু—

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী সোমবার রাত্রি ১১টা ৪০ মিনিটের সময় বাঙ্গালার একমাত্র স্বাধীন-চেতা দেশ-নায়ক শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় মাত্র ৬০ বৎসর বয়সে তাঁহার ১নং উডবার্ণ পার্কস্থ গৃহে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর ১০ মিনিট পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি সুস্থ শরীরে ছিলেন ও 'নেশন' নামক ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্রের জন্য সম্পাদকীয় মন্তব্য রচনা করিয়াছিলেন। কয়দিন পূর্ব্বে তাঁহার অনুজ সুধীরচন্দ্রের পরলোকগমনে তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু যে এত সন্নিকট তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। তাঁহার পরলোক গমনে বাঙ্গালা দেশে সত্যই আজ একজন প্রকৃত তেজস্বী মানুষের অভাব হইল। তিনি চিরদিন অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন এবং সেজন্য কোনরূপ স্বার্থবুদ্ধি তাঁহাকে কর্ত্তব্য পথ হইতে সরাইতে পারে নাই। অনুজ সুভাষচন্দ্র যে নেতৃত্ব লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার জন্য শরৎচন্দ্রের উৎসাহ ও অর্থপ্রদান কতটা কাজ করিয়াছিল, তাহা প্রায় সর্বজন বিদিত। তিনি সুভাষচন্দ্রকে স্বগৃহে স্থান দিয়া ও তাঁহার সকল কার্য্যে সকল প্রকারে সাহায্য দান করিয়া তাঁহাকে বরেণ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ ধীশক্তি ও কর্ম্মশক্তির অধিকারী হইয়াও সে সকল শক্তি ৩০ বৎসর ধরিয়া অধিকাংশ সময়েই দেশের কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অন্যতম সহকারীরূপে রাজনীতিক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া পরে তিনি বাঙ্গালার রাজনীতিক জগতে অন্যতম জ্যোতিষ্করূপে পরিণত হইয়াছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর সেজন্য কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদে তাঁহাকে অন্যতম মন্ত্রীরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার স্বাধীন মনোবৃত্তির জন্য তিনি অধিক দিন সে চাকরী করিতে সমর্থ হন নাই। কি করিয়া বাঙ্গালার স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান বজায় রাখিয়া বাঙ্গালাকে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা যায়, তাহাই তাঁহার রাত্রিদিনের চিন্তা ছিল এবং সেজন্য তিনি সকল প্রকার শক্তি নিয়োজিত করিতেন। মানবকল্যাণে তাঁহার কত শক্তি ও অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, আজও তাহার হিসাবের দিন আসে নাই। মানুষের দুঃখে তাঁহার দরদী মন সর্বদা ব্যাকুল হইত এবং তিনি সর্বপ্রকারে সে বিষয়ে মানুষ মাত্রকেই সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার মত তেজস্বী ও চরিত্রবান নেতা রাজনীতিক্ষেত্রে অতি অল্পসংখ্যকই দেখা গিয়াছে। তিনি সকল প্রকার অন্যায় ও হীনতার উর্দ্ধে ছিলেন এবং সেই ভাবেই জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কাটাইয়া গিয়াছেন। তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াও অর্থের প্রতি মোহ শূন্য ছিলেন। শরৎচন্দ্র শরৎকালীন চন্দ্রের মতই নিষ্কলঙ্ক ও

বাংলার বিপ্লবী-নেতা শরৎচন্দ্র বসু

ফটো—য়ুনিভার্সাল আর্ট গেলারী

জন-নায়ক শরৎচন্দ্র বসু

ফটো— য়ুনিভার্সাল আর্ট গেলারী

শরৎচন্দ্র ও ডি-ভ্যালেরা

জ্যোতিপূর্ণ জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরলোক গমনে তাই আজ তাঁহার শত্রুমিত্র সকলেই সমানভাবে বেদনা অনুভব করিতেছে। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই।

কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ—

কংগ্রেস আন্দোলনের ফলেই দেশের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হইলেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কংগ্রেসের অবস্থা এখন সত্যই অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের নাম লইয়া একদল স্বার্থান্বেষী লোক সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা লাভে অগ্রসর হইয়াছে এবং কংগ্রেসের পবিত্র নাম কলঙ্কিত করিতেছে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে দখলে রাখার জন্য একদল কংগ্রেস-নেতা সেই সকল স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদীদিগকে সমর্থন করিয়া দেশে দুর্নীতি প্রসারের প্রশ্রয় দিতেছেন। ইহার ফলে আজ প্রকৃত কংগ্রেস-সেবকের দল—যাহাদের ত্যাগ ও
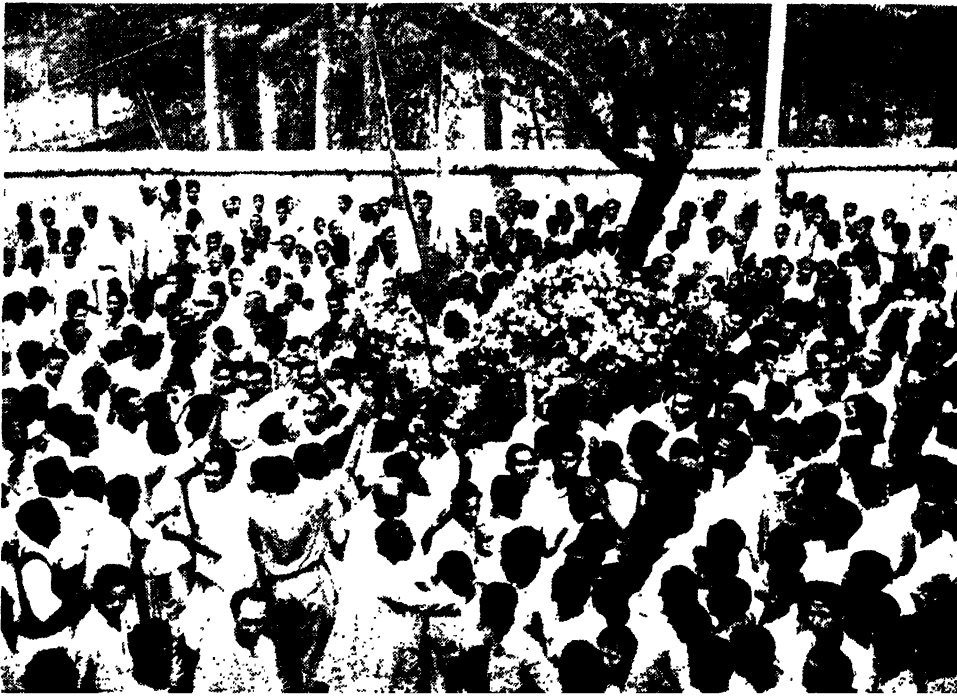
কেওড়াতলা শ্মশানঘাট অভিমুখে বাংলার তেজস্বী নেতা শরৎচন্দ্র বসুর শব-শোভাযাত্রা ফটো—য়ামিডার্ন আর্ট-গেলারী

নব-বিবাহিতা কন্যা ও জামাতা সহ শরৎচন্দ্র বসু

সপরিবারে শরৎচন্দ্র বসু

সেবার যারা ভারত মুক্ত হইয়াছে, তাহারা সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসে যোগদান করিতে ইতস্তত করিতেছেন। এ অবস্থায় কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা স্থির করিবার জন্য গত ১৮ই ও ১৯শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সময়ে ও তাহার পরে বহুদিন ধরিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভা চলিয়াছে, কিন্তু কংগ্রেসকে ঐ সকল সুবিধাবাদীদের কবল হইতে উদ্ধার করিবার কোন সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা স্থির হয় নাই। স্বাধীন ভারতে সকল অধিবাসীদিগকেই কংগ্রেসের সদস্য করা হইয়াছে এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান পরিচালনের জন্য একদলকে সক্রিয় সদস্য করা হইয়াছে। কিন্তু আজ সক্রিয় সদস্যের সংখ্যা এত অধিক দেখা যাইতেছে যে যথাযথভাবে তাহাদের পরীক্ষা করিয়া দেখা সম্ভব নহে এবং তাহার ফলে গঠনতন্ত্র অনুসারে উপযুক্তভাবে নির্বাচন পরিচালনের অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে। এ অবস্থায় আজ দেশবাসীর কর্ত্তব্য অত্যন্ত কঠিন। প্রকৃত কংগ্রেস সেবকগণ যাহাতে কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান পরিচালনের সুযোগ পান, সেজন্য সকলকে বিশেষ সাবধানতার সহিত কাজ করিতে হইবে। সকল প্রদেশেই আজ ক্ষমতা-লোলুপের দল দলাদলি সৃষ্টি করিয়া জনগণকে বিভ্রান্ত করিতেছে। প্রকৃত ত্যাগী ও সেবকের দলই যেন এ অবস্থায় কার্য্য প্রাপ্ত হন, সকলকে ইহা দেখিতে হইবে।

সুইজারল্যাণ্ডের মন্ত্রী ডাঃ অরমিন স্তানিকর ও ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের নূতন সভাপতি ডক্টর শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ

২৬শে জানুয়ারী ভারতের সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ইন্দোনেশিয়ায় সভা

রেলপথে আসাম সংযোগ—

বাঙ্গালা দেশের পূর্বাঞ্চল পাকিস্থানের মধ্যে পড়ায় নূতন রেল নির্ম্মাণ করিয়া আসামের সহিত বাঙ্গালার তথা

সমগ্র ভারতরাষ্ট্রের সংযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের ২৭শে জানুয়ারী কাজ আরম্ভ হয় ও ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারীর মধ্যে ১৪২ মাইলেরও অধিক নূতন রেলপথ নির্ম্মিত হইয়া ঐ দিন যাত্রী-গাড়ী চলাচল সুরু হইয়াছে। কিষণগঞ্জ হইতে ঠাকুরগঞ্জ ১লা জুলাই (১৯৪৮), ঠাকুরগঞ্জ হইতে নকসাল বাড়ী ৩১শে জুলাই (১৯৪৮) ও নকসাল বাড়ী হইতে শিলিগুড়ী ৯ই ডিসেম্বর (১৯৪৯) যাত্রী-গাড়ী চলাচল আরম্ভ হয়। মাদারীহাট হইতে হাসিমারা ২৫শে ডিসেম্বর (১৯৪৯) যাত্রী গাড়ী চলিয়াছে। ঐ নূতন রেলপথ নির্ম্মাণে প্রায় ৯ কোটি টাকা খরচ পড়িয়াছে। শিলিগুড়ী হইতে শিবক হইয়া বাগরাকোট এবং আলিপুর-ডুয়ার হইতে গোসাইগাও হাট হইয়া ফকিরাগ্রাম পর্য্যন্তও নূতন রেলপথ করিতে হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে উত্তর বঙ্গে নূতন পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া বিহারের সহিত আসামে মোটর বা লরী চলাচলের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রাজনীতিক প্রয়োজনে এই কাজ সম্পন্ন হওয়ার ফলে আজ পূর্ব্ব-পাকিস্তানের মধ্য দিয়া রেল চলাচল বন্ধ হইলেও পশ্চিম-বাঙ্গলা তথা ভারতীয় রাষ্ট্রকে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। ২২টি নদীর উপর পুল নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে, তন্মধ্যে তিস্তা, টর্সা ও সংকোষ নদীর নামই উল্লেখযোগ্য। এই কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় আজ দেশবাসী কত উপকৃত হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। জঙ্গল ও পর্বতের মধ্য দিয়া নানাপ্রকার বাধা বিপত্তির মধ্যে যাঁহারা এই কাজ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলের প্রশংসনীয়।

গঙ্গাসাগর মেলায় পুণ্য-সন্ধানী যাত্রীর দল

ফটো—শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গঙ্গাসাগরের দেবালয়

ফটো—শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গঙ্গাসাগর মেলা—সাগর সঙ্গমে স্নানার্থী নাগা সন্ন্যাসীর দল

ফটো—শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গঙ্গাসাগর মেলা
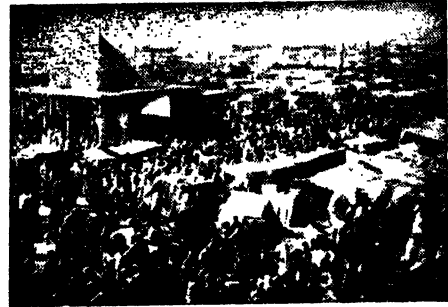
ফটো—শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জেলে হত্যাকাণ্ড—

কিছুকাল পূর্ব্বে আলিপুর জেলে কম্যুনিষ্ট বন্দীদের উপর গুলীবর্ষণের ফলে তিনজন বন্দী নিহত হইয়াছিল,

সম্প্রতি আবার মাদ্রাজের সালেম জেলে গুলীবর্ষণের ফলে তথায় ২২জন কম্যুনিষ্ট নিহত ও ১৩৭জন বন্দী আহত হইয়াছে। জেলের মধ্যে যে সকল বন্দী অরাজকতার সৃষ্টি করে, তাহারা যেমন নিন্দনীয়,যে সরকারী ব্যবস্থা তাহাদের অন্য প্রকারে সংযত করিবার উপায় না পাইয়া বা স্থির করিতে না পারিয়া তাহাদের হত্যা করে, তাহাদের কার্য্যও সেইরূপই নিন্দনীয়। দেশে একদল বিভ্রান্ত লোক কম্যুনিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থাকে অচল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে, প্রথম তাহাদের কার্য্যের সংবাদ পাইয়াই সরকারের কঠোরভাবে দমনের ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, প্রথম দিকে সে বিষয়ে সরকারী কর্ত্তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াও কোন ফল হয় না। শেষ পর্য্যন্ত যখন তাহাদের সংযত করা অসম্ভব হইয়া উঠে তখন সরকারী কর্ত্তারা হত্যাকাণ্ড করিতে কুণ্ঠিত হন না। প্রথম হইতে অপরাধ দমনের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইলে জেলের মধ্যে এইরূপ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইত না। কারাপ্রাচীরের মধ্যে একদল লোককে গুলী করিয়া হত্যা করা কোন সভ্য গভর্ণমেণ্টেরই উপযুক্ত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। আমরা সরকারী কর্তৃপক্ষের এরূপ কার্য্যের সমর্থন করিতে পারি না। কম্যুনিষ্ট দমন প্রয়োজন বটে, কিন্তু সেজন্য কারাগারের মধ্যে হত্যাকাণ্ড যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস উৎসবে সমবেত সুধীবৃন্দ

নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী—

গত ১৬ই ফাল্গুন মঙ্গলবার সকালে বাঙ্গালার খ্যাতনামা নট নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী ৫৮ বৎসর বয়সে কলিকাতা বাগবাজারে নিজ বাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পিতা ডাক্তার নিকুঞ্জ লাহিড়ী যে সময়ে দিনাজপুরে সিভিল সার্জেন ছিলেন, সে সময়ে তথায় নির্ম্মলেন্দুর জন্ম হয়। তিনি কলিকাতায় তাঁহার মাতুল স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গৃহে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন। আই-এ পর্য্যন্ত পড়িয়া কিছুকাল কলিকাতা কর্পোরেশনে কাজ করার পর তিনি অভিনেতার জীবন গ্রহণ করেন এবং সে কার্য্যে তাঁহার সাফল্যের কথা সর্ব্বজনবিদিত। মৃত্যুর ২ মাস পূর্ব্বে তিনি দেবদাস নাটকে বসন্তের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য ছিলেন ও প্রায়ই উদ্বোধন কার্য্যালয়ে উপস্থিত থাকিতেন।

পূর্ব্ববঙ্গ সমস্যা—

গত ২০শে ডিসেম্বর হইতে পূর্ব্ব-পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু-ধ্বংস কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম যখন খুলনা জেলার বাগেরহাটের একটি গ্রামে বহু হিন্দুকে অকারণে হত্যা করা হইল, তখন লোক উহা স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের কম্যুনিষ্ট ভীতির পরিচায়ক বলিয়া মনে করিয়াছিল এবং সে জন্য চিন্তিত বা ভীত হয় নাই। কিন্তু সেই হিন্দু বিতাড়ন তথা নিধন কার্য্য ক্রমে ক্রমে সমগ্র পূর্ব্ব বঙ্গে ছড়াইয়া পড়িল। ঢাকা সহর ও সহরতলীতে কি ভাবে সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন হিন্দু পরিবারসমূহকে সবংশে নিধন করা হইয়াছে, তাহার বিবরণ পড়িলে মনে হয়, পূর্ব্ববঙ্গে কোন আইনানুগ শাসনব্যবস্থা ত নাই-ই, তথায় মুসলমানগণ মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে। ঢাকা হইতে ক্রমে তাহা বিস্তার লাভ করিয়া কুমিল্লা, ফেণী, চট্টগ্রাম, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বত্র ধনী ও সম্পন্ন হিন্দুদিগকে হত্যা করিয়া শুধু তাহাদের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করা হইতেছে না, তাহাদের বাড়ীর নারীদিগের উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়া আক্রমণকারীরা তাহাদের পশুত্বের পরিচয় দিতেছে। ইহার ফলে ভারত রাষ্ট্রের কোন কোন স্থানে সামান্য মাত্র দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে—যে সকল লোক সর্ব্বহারা হইয়া পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিম বঙ্গে আসিয়াছে, তাহাদের নিকট এই সকল নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া তাহাদের পশ্চিমবঙ্গবাসী আত্মীয়স্বজনগণ অনেক

স্থানে ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইয়া পশ্চিমবঙ্গবাসী মুসলমান হত্যায় অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের শাসন-ব্যবস্থা পূর্ব্ববঙ্গের মত শক্তিহীন বা শিথিল নহে—কাজেই কোথাও অনাচার প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। ভারতীয় রাষ্ট্রে ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ লৌকিক শাসন-ব্যবস্থা বর্ত্তমান—কাজেই তথায় শাসকবৃন্দ কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা প্রচারিত বা অনুষ্ঠিত হইতে দেন নাই। কিন্তু এই সকল সামান্য ঘটনার বিবরণ পল্লবিত হইয়া পূর্ব্ব পাকিস্তানে প্রচারিত হইয়াছে—পূর্ব্ব পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট তথায় সর্ব্বদা মিথ্যা প্রচারের দ্বারা জনগণকে উত্তেজিত করিয়াছে ও তাহার ফলে দিন দিন পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর উপর অমানুষিক অত্যাচার, ও হিন্দুধ্বংস লীলা বাড়িয়াই চলিয়াছে। আজ ৫ই মার্চ্চ—গত দেড়মাসেরও অধিককাল ধরিয়া প্রত্যহ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে সকল বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে মৃত মানুষেরও ক্রোধ সঞ্চার হয়। ঢাকায় উড়োজাহাজের আড্ডায় যে ভাবে সমবেত হিন্দু জনতাকে ধ্বংস করা হইয়াছে, তাহার বিবরণ সহজ মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। মধ্য পথে ট্রেণ থামাইয়া ট্রেণ হইতে হিন্দু যাত্রীদিগকে নামাইয়া শুধু তাহাদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লওয়া হয় নাই, পতির সম্মুখে পত্নীর উপর ও পিতার সম্মুখে কন্যার উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়া নারকীয় লীলা প্রদর্শন করা হইয়াছে। মধ্য পথে যাত্রীবাহী ষ্টীমার থামাইয়া ষ্টীমার হইতে এক সহস্র হিন্দু যাত্রীকে নদীর চরে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বস্বহীন হইয়া নিরাশ্রয় অবস্থায় কত লোক যে তাহাতে মারা গিয়াছে, তাহার হিসাব নাই। পাকিস্তান হইতে হিন্দুদিগকে পশ্চিম বাঙ্গালায় আসিতেও বাধাদান করা হইতেছে। এই ভাবে প্রতিবেশীকে অত্যাচারিত, লুণ্ঠিত ও ধর্ষিত হইতে দেখিয়া বহু হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সকল সংবাদপত্র-প্রতিনিধিকে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে তাড়াইয়া দেওয়ার ফলে আজ পূর্ব্ববঙ্গের সঠিক খবর জানিবার উপায় নাই। পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্রসমূহে ভারতীয় রাষ্ট্রে মুসলমান-গণের উপর হিন্দুর অত্যাচারের মিথ্যা কাহিনী বড় বড় করিয়া প্রকাশ করা হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব পাকিস্তানে মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দু নিগ্রহের কাহিনী প্রকাশ বন্ধ রাখা হইতেছে। বরিশালে এই বলিয়া এক মিথ্যা সংবাদ রটনা করা হয় যে, কলিকাতায় মিঃ ফজলুল হক এবং তাঁহার কন্যা ও জামাতাকে হত্যা করা হইয়াছে—তাহার পরই বরিশালে শত শত মুসলমান দলবদ্ধ হইয়া উন্মত্ত অবস্থায় সহর ও সহরতলীর শত শত হিন্দুর বাড়ী পোড়াইয়া দেয় ও তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে এবং বহুশত হিন্দুকে হত্যা করে। ক্রমে সেই জনতা জেলার গ্রামে গ্রামে যাইয়া মুসলমানগণকে হিন্দু ধ্বংসে উদ্বুদ্ধ করে। তাহার ফলে সারা বরিশাল জেলায় নারকীয় হিন্দু ধ্বংস লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের যে সকল হিন্দু নেতা সারা জীবন ধরিয়া বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া ভারতে স্বাধীনতা আনয়ন করিয়াছে, তাহারাই আজ মুসলমানগণের ধ্বংসের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হইয়াছে। ফেণী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, মৈমনসিংহ প্রভৃতি স্থানে তাহাদেরই সর্ব্বপ্রথম হত্যা করা হইয়াছে। যে সকল পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দু গত আড়াই বৎসর ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গে ধীরে ধীরে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদের পূর্ব্ববঙ্গস্থ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি সকলকে এই ভাবে ধ্বংস হইতে দেখিয়া তাহাদের পক্ষে শান্ত থাকা আজ সত্যই কঠিন হইয়াছে। ইহার প্রতীকারে পশ্চিম বঙ্গ বা ভারতীয়-রাষ্ট্র গভর্ণমেণ্ট কিছু করিতে সমর্থ হন নাই—তাহাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভবও নহে এবং কি উপায়ে ইহার প্রতিবিধান হয়, তাহাও আজ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। ভারত বিভাগের পর উভয় দেশের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য বহু সম্মিলন ও বৈঠক হইয়াছে বটে, কিন্তু পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট সেই সকল সম্মেলন বা বৈঠকে গৃহীত মৈত্রীর চুক্তির কোনটাই রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। হায়দ্রাবাদ ও জুনাগড়ের মুসলমান রাজ্য পাকিস্তানের মধ্যে না যাইয়া ভারতীয় লৌকিক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে—কাশ্মীরের শতকরা ৮০ জন অধিবাসী মুসলমান হইলেও পাকিস্তান কাশ্মীরকে তাহার অন্তর্ভুক্ত করিতে সমর্থ হয় নাই—বরং পাকিস্তানের মুসলমান অধিবাসীরা লৌকিক ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছে। কাশ্মীর সমস্যা সম্বন্ধে ইউ-এন-ও বা সংযুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের কাছে মীমাংসা চাহিয়াও কোন ফল হয় নাই। এই সকল কারণে পাকিস্তানী মুসলমানেরা পাকিস্তানে হিন্দুকে বাস করিতে দিতে আর

সম্মত নহে। পাকিস্তানী সৈন্য প্রায়ই ভারত রাষ্ট্রে হানা দিয়া ভারতের অধিবাসীদের ধন সম্পত্তি লুঠ করিয়া থাকে এবং ভারতীয় রাষ্ট্র জয় করিয়া লইয়া তাহা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার চেষ্টা করে। সে বিষয়ে তাহারা আসামে যাহা করিয়াছে, তাহাতে ভারত রাষ্ট্র পরিচালকগণের ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। গত আড়াই বৎসরে পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে ১০ লক্ষাধিক মুসলমান ধীরে ধীরে আসামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসামের বহু জঙ্গলাকীর্ণ স্থান দখল করিয়া বসিয়াছে। আসামের বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার অদূরদর্শিতার ফলে আজ আসাম বিপন্ন হইতে চলিয়াছে। আসামে কঠোরভাবে শাসন না চালাইলে আসামকে মুক্ত করা কঠিন হইয়া পড়িবে। লীগ-শাসনের সময় হইতেই আসামে মুসলমান-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়—আজ সেই প্রাধান্য প্রকাশ্য-ভাবে দেখা না গেলেও আসামে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা আজ কম নহে—কাজেই কিছুকাল পরে আসাম যাহাতে পাকিস্তানের কুক্ষীগত হয়, সে চেষ্টার বিরাম নাই। পশ্চিমবঙ্গও আজ নানা ভাবে বিব্রত। গত আড়াই বৎসরে প্রায় ১৫ লক্ষ হিন্দু পূর্ব্ব-পাকিস্তান হইতে পশ্চিমবাঙ্গলায় চলিয়া আসিয়াছে। তাহাদের সাহায্য-দান ও পুনর্ব্বসতি সমস্যায় পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট শুধু বিব্রত নহে, কাতর। পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভাকে এ জন্য বহু শক্তি, অর্থ ও উদ্যম ব্যয় করিতে হইয়াছে, সে জন্য জাতিগঠনমূলক কার্য্যে তত অধিক মনোযোগ দিতে পারেন নাই। বর্ত্তমানে পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা অশান্ত হওয়ায় গত ২ মাসে ৫৭ হাজার হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদের আশ্রয় দান, সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি ব্যবস্থাও সহজ কার্য্য নহে। এই ভাবে যদি পূর্ব্ব-পাকিস্তানের বাকী সকল হিন্দুকে—হয় দেশত্যাগ করিতে, না হয় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে ভারত রাষ্ট্র তাহাদের রক্ষা-ব্যবস্থা লইয়াই বিপন্ন হইয়া পড়িবে। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এ বিষয়ে অনবহিত নহেন, পুনর্ব্বাসন-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মোহনলাল সকসেনা কলিকাতায় আসিয়া বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা কর্ত্তৃপক্ষের সহিত নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। পণ্ডিতজী নিজেও পূর্ব্ববঙ্গ সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব দুই দিন দুইটি দীর্ঘ বক্তৃতার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। জনসাধারণ পূর্ব্ব পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধ করিয়া এ সমস্যার সমাধানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে বটে, কিন্তু ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে তাহাও বিবেচনার বিষয়। আজ পূর্ব্ববঙ্গ-সমস্যা ভারত রাষ্ট্রের সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিরই মন বিব্রত করিয়াছে। কি ভাবে এ সমস্যার সমাধান করা যাইবে, তাহা স্থির হয় নাই। এ অবস্থায় আমাদের শান্ত থাকিয়া রাষ্ট্র পরিচালকদের নির্দ্দেশ মান্য করিয়া চলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। যত বিপদই আসুক না কেন, আমাদের ধৈর্য্য হারাইলে চলিবে না। বিপদ আসিয়াছে সত্য, কিন্তু এ সময়ে যদি আমরা ধীর ভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করি, তবেই জাতিকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইবে।

২৬শে জানুয়ারী ভারতের নূতন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দিল্লিতে সাধারণ সভা

ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনা—

ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নূতন 'কলেজ অফ্ ইণ্ডোলজী' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করিবেন। খ্যাতনামা বাঙ্গালী ঐতিহাসিক অধ্যাপক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ঐ কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ায় বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন। কিন্তু এই কলেজটি কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইলে বহু দিক দিয়া সুবিধা হইত। কাশীতে এজন্য নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে—কলিকাতায় বেলভেডিয়ার বা বারাকপুরস্থ লাটপ্রাসাদ অনায়াসে পাওয়া যাইত। কলিকাতাস্থ এসিয়াটিক সোসাইটী, ভারতীয় মিউজিয়াম ও জাতীয় পাঠাগার (ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী) গবেষকগণকে প্রচুর উপকরণ দান করিত। কলিকাতায় অধ্যাপক সুশীলকুমার দে, অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ সরকার, অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির মত বহু লোক অবসর গ্রহণ করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদের পরামর্শ ও উপদেশ সকলকে সাহায্য দান করিত। এখনও স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় কর্মক্ষম আছেন—তাঁহার দ্বারা বহু ছাত্র উপকৃত হইতে পারিত। নানা কারণে বাঙ্গালা দেশেই অধিক পরিমাণে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের আলোচনা হইয়াছে—কাজেই এখানেই কলেজ অফ্ ইণ্ডোলজি প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দলাদলি ও দুর্নীতি বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজকে কলঙ্কিত করিয়াছে—তাহার ফলে হয় ত আগামী বহু বৎসর বাঙ্গালীকে—সকল গুণ থাকা সত্ত্বেও—ভারতের সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছাইয়া থাকিতে হইবে।

কলিকাতায় পণ্ডিত নেহেরু—

ভারত রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ৬ই মার্চ্চ সোমবার বেলা ১১টায় কলিকাতায় পৌছিয়া ৯ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার বেলা ৩টায় কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ঐ কয়দিন সর্ব্বদা বাংলার জন-প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গ সমস্যা তাঁহাকে চঞ্চল ও ব্যথিত করিয়াছে, সে জন্য তিনি তাহার সমাধানের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বনগ্রামে বাংলা সীমান্তের অবস্থা দর্শন করেন ও উদ্বাস্তুদের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার প্রধান-মন্ত্রীদিগকেও কলিকাতায় আনাইয়া তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পণ্ডিতজী বাংলার জননায়ক ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেও সঙ্গে আনিয়াছিলেন—শ্যামাপ্রসাদ সকল সময়ে পণ্ডিতজীর কাছে থাকিয়া সকল কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন। পণ্ডিতজী ১৬ই মার্চ্চ পুনরায় কলিকাতায় আসিবেন এবং সমাধান ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিবেন। আজ বাংলা বিপন্ন, সে জন্য অন্য সকল কাজ বন্ধ রাখিয়া বাঙ্গালাকে রক্ষা করার চিন্তায় ও ব্যবস্থায় পণ্ডিতজীকে সর্ব্বদা ব্যগ্র দেখা গিয়াছে। পণ্ডিতজী এই গুরু রাজনীতিক কার্য্যের চাপ সত্ত্বেও সামাজিক কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। তিনি কলিকাতায় স্বর্গত শরৎচন্দ্র বসুর ও ৺ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্রের গৃহে যাইয়া শোকার্ত্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিয়া আসিয়াছেন। পণ্ডিতজীর অসাধারণ ধীশক্তি ও অমানুষিক কর্ম্ম-শক্তি বর্ত্তমানের বিপন্ন ভারত তথা বাংলাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হউক—সকলেই এই প্রার্থনা করিতেছে।

সরকারের উপায়ও নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছয় বৎসরে ২৬ কোটি টাকা খরচের একটি রাস্তা উন্নয়ন পরিকল্পনায় হাত দিয়াছেন, এ ছাড়া সমগ্রভাবে যানবাহন পরিকল্পনার উন্নয়ন, কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে বিজলীর সম্প্রসারণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনায়ও তাঁহাদিগকে অবিলম্বে হাত দিতে হইবে। এ সব ব্যাপারে যে টাকার দরকার, বর্ত্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে ও কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে সেই সমস্যা গুরুতর সন্দেহ নাই। নিরুপায় হইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদের বার্ষিক এক কোটি টাকা আয়ের মোটর গাড়ীর কর ও পেট্রোল কর বন্ধক রাখিয়া ঋণ সংগ্রহের প্রস্তাব করিয়াছেন। আয় কর ও পাটশুল্ক বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তাহাদের এই দুই খাতে বণ্টনযোগ্য অর্থের শতকরা ১২ ভাগ দিতেছিলেন। অখণ্ড বাংলা আয়-কর হিসাবে ভারত সরকারের নিকট হইতে পাইত শতকরা ২০ ভাগ ও পাটশুল্কের আদায়ী টাকার শতকরা ৬২½ ভাগ। পূর্ব্ব-বাংলা বিচ্ছিন্ন হইলেও পূর্ব্ব বাংলার অংশে এই খাতে যাহা সঙ্গতভাবে পড়িবার কথা, তাহার জন্য অত্যন্ত বেশী টাকা কমান হইয়াছে বলিয়া পশ্চিম বাংলা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট নীতি সংশোধনের আবেদন জানান। স্যার চিন্তামণি দেশমুখ মারফৎ নীতি সংশোধন করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বর্ত্তমানে বণ্টনযোগ্য আয় কর ও পাটশুল্ক হিসাবে শতকরা ১৩½ ভাগ দিবার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাও ন্যায়সঙ্গত হয় নাই বলিয়া মনে হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেটে পুলিস খাতে এখনও অত্যন্ত বেশী টাকা ধরা হয়, জনকল্যাণের প্রয়োজনের নিরিখে বিচার করিলে এই ব্যবস্থা যতশীঘ্র পরিবর্ত্তিত হয় ততই ভাল। ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দের বাজেটেও পুলিস খাতে মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা ১৩·৭ ভাগ বা প্রায় ৪ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, সাধারণ শাসনকার্য্যে ও পুলিসখাতে ব্যয় কমিয়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি শিল্প, সমবায় ইত্যাদি খাতে যত ব্যয় বাড়ানো সম্ভব হইবে, ততই প্রদেশের অগ্রগতি সূচিত হইবে।

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনার হিসাবে অর্থের প্রয়োজন ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে সন্দেহ নাই; বর্ত্তমান মুদ্রাস্ফীতির যুগে প্রত্যেক খাতে আগের তুলনায় বেশী টাকার বরাদ্দও করিতে হইবে, তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখন যদি যুদ্ধোত্তর ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দের অখণ্ড বাংলার আয়ের প্রায় সমান আয় (অখণ্ড বাংলা ১৯৪৬-৪৭—৩৯ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা, পশ্চিম বাংলা ১৯৪৯-৫০—খ্রীষ্টাব্দের সংশোধিত হিসাব—৩৪ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা) লইয়া এত টানাটানির মধ্যে চলেন, তাহা অবশ্যই অস্বস্তির কথা। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধোত্তর আর্থিক পুনর্গঠনের হিসাবেও পশ্চিমবঙ্গ এ পর্য্যন্ত লক্ষণীয় অগ্রগতি লাভ করিয়াছে বলা চলে না।

ভারতের রেল বাজেট

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ভারতীয় পার্লামেণ্টে রেলপথ ও যানবাহন মন্ত্রী এন গোপালস্বামী আয়েঙ্গার ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দের রেলবাজেট পেশ করিয়াছেন। এই সঙ্গে ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দের চূড়ান্ত হিসাব এবং ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধিত হিসাবও পেশ করা হইয়াছে।

এবারের বাজেট বক্তৃতায় রেলসচিব ভারতীয় রেলপথগুলির ক্রমোন্নতি সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতে ভারতের যুদ্ধোত্তর আর্থিক পুনর্গঠনের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন সকলেই কিছুটা আশান্বিত হইবেন। যুদ্ধের সময় ভারতীয় রেলপথগুলিতে অস্বাভাবিকরূপে মালের চাপ বাড়ে, ১৯৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের সরকারী রেলপথগুলির মোট আয় হয় ২২৫ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ যুদ্ধ সুরু হইবার বৎসর অখণ্ড ভারতের সরকারী রেলপথগুলির আয় হইয়াছিল ১০৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। ভারত বিভাগ সত্ত্বেও ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী রেলপথসমূহের আয় হইয়াছে ১০৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দের বাজেট পেশকালে এই বৎসর রেলপথের আয় ২১০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়, কিন্তু এবার ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধিত হিসাবে রেলসচিব এই আয় ২২১ কোটি ২০ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দের বাজেটে এবৎসর ভারতের সরকারী রেলপথগুলির ২১৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহার সঙ্গে ভারতের সহিত সংযুক্ত দেশীয় রাজ্যগুলির রেলপথের ১৭ কোটি টাকা আয় যুক্ত করিলে মোট আয় হইবে ২৩২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। পাকিস্তানের সহিত ক্রমবর্দ্ধমান বিবাদ ইত্যাদি সমস্যার জন্যই রেলপথের আয় গত বৎসরের তুলনায় প্রায় ১০ কোটি টাকা কম ধরা হইয়াছে। এইরূপ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান ঘটিলে আয় আরও কিছু বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয়।

চলতি বৎসরের বা ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধিত হিসাব অনুসারে এবৎসর রেলপথসমূহে ব্যয় অনুমিত হইয়াছে ১৮০ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। ইহার সহিত সুদের খাতে ২৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ধরিলে এবৎসরের হিসাবে প্রকৃত উদ্বৃত্ত থাকে ১১ কোটি ২ লক্ষ টাকা। গত বৎসরের বাজেটে এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ ৯ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছিল। উক্ত ১১ কোটি ২ লক্ষ টাকা হইতে রেলপথের ক্ষতিপূরণ তহবিলে ৪ কোটি ২ লক্ষ টাকা দিয়া বাকী ৭ কোটি টাকা ভারত-সরকারের রাজস্ব তহবিলে প্রদানের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দের বাজেটে যদিও নানা বিবেচনার অনুমানে যাত্রী-গাড়ীর হিসাবে আয় কম ধরা হইয়াছে এবং দেশীয় রাজ্যের রেলপথ বাদে ভারতের সরকারী রেলপথসমূহের আয় ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় প্রায় ১০ কোটি টাকা কমাইয়া ২১১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অনুমান করা হইয়াছে, ব্যয়ও কম করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে তদনুপাতে। আগেই বলা হইয়াছে এবারের বাজেটে পূর্ব্বতন দেশীয় রাজ্যগুলির রেলপথ সমেত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত রেলপথের হিসাবও করা হইয়াছে। ভারতের রেলপথসমূহে ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে মোট ব্যয় ধরা হইয়াছে ১৮৬ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। কাজেই দেশীয়

রাজ্যসমেত ভারতীয় রেলপথের মোট ২৬২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আয় হইতে এই ব্যয়বাদে সম্ভাব্য ৪৫ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। এবারের বাজেটে রেলপথ উন্নয়ন কমিটির (১৯৪৯) সুপারিশ অনুসারে রেলপথের মূলধন ভারতের করদাতাদের সম্পত্তি ধরিয়া সেই মূলধনের উপর শতকরা ৪ টাকা হিসাবে অবশ্য দেয় বার্ষিক লভ্যাংশ খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য ধরা হইয়াছে ৩১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা এবং বাকী নিট উদ্বৃত্ত ১৪ কোটি ১ লক্ষ টাকা হইতে ক্ষতিপূরণ তহবিলে ২ কোটি টাকা (এ ছাড়া ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে রেলপথ উন্নয়ন সম্পর্কিত ভারতসরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি প্রতি বৎসর বাধ্যতামূলকভাবে যে ১৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ তহবিলে রাখিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহাও সংরক্ষিত হইয়াছে), রেলপথ উন্নয়ন তহবিলে ১০ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ও মজুত তহবিলে ২ কোটি ১ লক্ষ টাকা রাখা প্রস্তাব হইয়াছে। রেলপথ উন্নয়ন তহবিল হইতে এই বৎসরে খরচ ধরা হইয়াছে ৪ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল এই তহবিলে ১৪ কোটি ৯ লক্ষ টাকা মজুত থাকিবে। [illegible] জানেন, ভারতকে রেল ইঞ্জিনের দিক হইতে স্বাবলম্বী করিবার উদ্দেশ্যে মিহিজামে (চিত্তরঞ্জন) একটি বিরাট কারখানা গড়িয়া উঠিতেছে। রেলসচিব বাজেট বক্তৃতায় এই কারখানা হইতে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইঞ্জিন পাওয়া যাইবে বলিয়া (১৯৫০ ৩টি, ১৯৫১-৩২টি, ১৯৫২-৮২টি, ১৯৫৩-৬৬টি এবং ১৯৫৪-৯০টি) এবং ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের পক্ষে প্রয়োজনীয় ১২০ খানি করিয়া ইঞ্জিন প্রতি বৎসর পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করিয়াছেন। এবারের বাজেটে এই কারখানা খাতে ৪ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে।

এবারের বাজেটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার পূর্ব্বোক্ত রেলপথ উন্নয়ন কমিটির সুপারিশ মানিয়া লইয়া রেলপথসমূহের ব্যয় খাতে প্রতি বৎসর ক্ষতিপূরণ তহবিলে ১৫ কোটি টাকা রাখিবার এবং মোট মূলধনের উপর শতকরা ৪ টাকা হিসাবে ভারতসরকারকে ৩১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা দিবার দায়িত্ব স্বীকার। অবশ্য ভারতের সরকারী রেলপথগুলির বর্তমান সচ্ছল আর্থিক অবস্থার হিসাবে এই দায়িত্ব গ্রহণ বাহুল্য নহে। ক্ষতিপূরণ তহবিলে যত বেশী টাকা থাকে ততই ভাল, ভারতসরকারের রাজস্ব তহবিলে সুদ হিসাবে ও সাধারণ হিসাবে ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে যে অর্থ দেওয়া হইতেছে, তাহার সহিত মোট মূলধনের উপর শতকরা ৪ টাকা হিসাবে লভ্যাংশের বিশেষ পার্থক্য নাই (৩০ কোটি ১১ লক্ষ টাকার স্থলে ৩১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা); কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কখনও যদি রেলপথের আয় অস্বাভাবিকভাবে কমিয়া যায়, তাহা হইলে এই দায়িত্ব পালন নিয়মিত কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে।

ভারতীয় রেলপথগুলির যাত্রী ও ব্যবসায়ীদের সুবিধার হিসাবে এবারের বাজেটে আশাপ্রদ মনোভাব দেখা যাইয়াছে। এই সুবিধা যত বাড়ে ততই আনন্দের কথা। অনেকে তৃতীয় শ্রেণীর রেল ভাড়া অবিলম্বে না কমানো [illegible] বাজেটের সমালোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে রেলদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী কে শান্তনম ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া যদি মাইল প্রতি এক পাই ও কমান যায়, তাহা হইলে রেলপথের বৎসরে ১৬ কোটি টাকা ক্ষতি হইবে এবং ফলে বর্তমান উদ্বৃত্ত বাজেট পরিণত হইতে পারে ঘাটতি বাজেটে। অথচ এক পাইয়ের কম ভাড়া হ্রাসের জনকল্যাণের হিসাবে বিশেষ অর্থও হয় না।

২৮।২।৫০

কি বা আসে যায়

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন গুহ

আলোয় মাতাল সোনালী ফাগুন দিনে
ভ্রমর আসিল রঙীন্ পাখায় উড়ি।
কি কথা কহিল মালতীরে কেবা জানে ?
মালতী শুকায়। সবটুকু মধু নিয়েছে হরণ করি।
নিঠুর ভ্রমর উড়ে উড়ে যায়, আনকূলে, আনকূলে।
কিবা আসে যায় মালতী শুকায় যদি বা আপন ভুলে ?

বাঁশী হাতে লয়ে আসিল অতিথি সাঁঝে।
তার বাঁশী কাঁদে "ওগো সুন্দরী বালা,
শ্রান্ত আমারে ঘুমাইতে দাও সুরভি বুকের মাঝে"।
ভুলিল কিশোরী, পরালো বঁধুরে আপন গলার মালা।
নিশিভোরে হায় ! কোথায় অতিথি ? পড়ে আছে ছেঁড়া দল
কিবা দাম হায় ! কুমারী-হিয়ার ভুল-ভাঙা আঁখিজল ?

*সরোজিনী নাইডু Destiny কবিতার মর্ম্মানুবাদ।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়
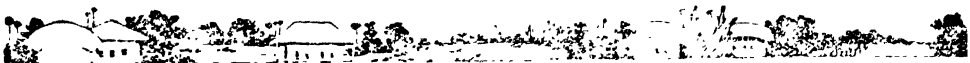
সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় দলের 'রাবার' লাভ ঃ

কমনওয়েলথ দলের সঙ্গে বে-সরকারী টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষ শেষ পর্য্যন্ত 'রাবার' লাভ করেছে। বে-সরকারী টেষ্ট খেলায় ভারতবর্ষ এই নিয়ে দুবার 'রাবার' পেল। প্রথম 'রাবার' পেয়েছে ১৯৪৫ সালে অষ্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস্ একদশ দলের সঙ্গে খেলায়। সেবার ৩টি বে-সরকারী টেষ্ট খেলার মধ্যে ১ম ও ২য় টেষ্ট ড্র যায়। মাদ্রাজের তৃতীয় টেষ্টে ভারতীয় দল ৬ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস একাদশ দলকে হারিয়ে প্রথম 'রাবার' সম্মান লাভ করে। এবারকার পাঁচটি বে-সরকারী টেষ্ট খেলার মধ্যে দিল্লীর প্রথম টেষ্টে কমনওয়েলথ দল ৯ উইকেটে ভারতীয় দলকে পরাজিত করে। বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এবং কানপুরের চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ শেষ পর্য্যন্ত অমীমাংসিত থেকে যায়। ভারতীয় দল ক'লকাতার তৃতীয় টেষ্টে ৭ উইকেটে এবং মাদ্রাজের পঞ্চম টেষ্টে ৩ উইকেটে জয়লাভ করায়, বেশী খেলায় জয়লাভের দরুণ টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় শ্রেষ্ঠ সম্মান 'রাবার' লাভ করেছে। এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ সরকারী টেষ্ট খেলায় 'রাবার' লাভ করতে সক্ষম হয়নি। এবারের বে-সরকারী টেষ্ট ম্যাচে 'রাবার' লাভের সম্মান সরকারী টেষ্ট ম্যাচের সমতুল্য মনে করা যেমন অযৌক্তিক হবে না, তেমনি 'রাবার' লাভের গুরুত্ব লাঘব করা যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ কমনওয়েলথ দলের শক্তিকে তুচ্ছ করা যায় না। পেশাদার খেলোয়াড় দ্বারা সুগঠিত এই ক্রিকেট দলের খেলা দর্শক এবং সমালোচকদের প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। প্রথম থেকে শেষ টেষ্ট পর্য্যন্ত উভয় দলই জোর লড়েছে। প্রথম টেষ্টে ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিজয় মার্চ্চেণ্ট আহত হয়ে শেষ পর্য্যন্ত আর ব্যাটই করতে পারেননি। টেষ্ট খেলার সূচনায় ভারতীয় দলের এ অশুভ ঘটনায় অনেকেই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। আহত বিজয় মার্চ্চেণ্টের জায়গায় তৃতীয় টেষ্টে বিজয় হাজারে অধিনায়ক হলেন এবং এ পরিবর্ত্তন যে শুভ হ'ল তার প্রমাণ পাওয়া গেল তৃতীয় টেষ্টে হাজারের টসে জয়লাভ করায়। তিনি কেবল একজন পয়গম্বর এবং দক্ষ অধিনায়কই নন্, তাঁর দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার জন্যেই ভারতীয় দল ভাঙ্গনের মুখে রক্ষা পেয়ে শেষ পর্য্যন্ত 'রাবার' পেয়েছে। একদিকে যেমন হাজারে এবারের বে-সরকারী টেষ্ট খেলায় ব্যক্তিগতভাবে প্রভূত প্রশংসা লাভ করেছেন, অপরদিকে তেমনি মাদ্রাজের চীপক মাঠ হাজারের নামের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য হয়ে রইলো। সেই সঙ্গে ক'লকাতার ইডেন গার্ডেনেও। এখানেই ভারতীয় দলের সৌভাগ্যের সূচনা দেখা দেয়।

এবারের মত মাদ্রাজের চীপক মাঠেই ইতিপূর্ব্বে একাধিক খেলার শেষ ফলাফল মীমাংসিত হয়ে গেছে। সুতরাং চীপক মাঠ ভাবাকালে খেলোয়াড় এবং দর্শকদের মানসিক উদ্বেগের কারণ হয়ে রইলো।

ভারতবর্ষের 'রাবার' পাওয়ার সাফল্যে ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব অধিনায়ক মিঃ ডগলাস জার্ডিন যে অভিনন্দন জানিয়ে মন্তব্য ক'রেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন বাক্‌সংযমশীল এবং ঝানু অধিনায়ক হিসাবে মিঃ জার্ডিনের খ্যাতি আছে। সুতরাং তাঁর এ প্রশংসা নিছক বাহ্যানুষ্ঠানপ্রিয় ব্যক্তির উক্তির সামিল নয়। তিনি বলেছেন 'Congratulations to India on winning her first rubber againts a strong representative side, particullerly after losing the

toss. Indian cricket arrived some time ags, but now it is on the up and up—a force for any country to reckon with."

ভারতবর্ষে আর্জেন্টিনা পোলোদল ঃ

আর্জেন্টিনার এক খ্যাতনামা পোলোদল ভারতবর্ষের সঙ্গে একাধিক প্রদর্শনী পোলো খেলায় যোগদানের জন্য ভারতবর্ষে অবস্থান করছে। ইতিমধ্যে জয়পুরে যে দুটি খেলা হয়েছে তার প্রথম খেলায় আর্জেন্টিনা পোলোদল ১০-৭ গোলে ভারতীয় পোলো এসোশিয়েসন দলকে পরাজিত করে। দ্বিতীয় খেলায় ভারতীয়দল ৮-৪ গোলে আর্জেন্টিনা দলকে হারায়। বোম্বাইয়ের প্রথম খেলায় ভারতীয় দল ৬-৪ গোলে জয়ী হয়। খেলায় পরাজয় স্বীকার ছাড়া আর্জেন্টিনা পোলোদলকে সব থেকে বড় ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে দলের বিশিষ্ট খেলোয়াড় Morico Inchansheকে চিরকালের মত হারিয়ে। এক প্রাক্‌টিস ম্যাচ খেলতে গিয়ে Morico Inchanshe ঘোড়ার পদাঘাতে আহত হয়ে শয্যাশায়ী হ'ন। যখন আরোগ্য লাভের পথে চলেছেন এমন এক সময়ে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে ৩৪ বছর বয়সে অকালমৃত্যু বরণ করেন। দলের এই দারুণ দুর্ঘটনার ফলে আর্জেন্টিনা দল ভারতবর্ষের পোলো খেলার সফর বাতিল ক'রে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সংকল্প করে। শেষ পর্য্যন্ত মৃত খেলোয়াড়ের পত্নী, যিনি এই পোলোদলের সঙ্গেই ভারতবর্ষে সফর করছিলেন, এই প্রদর্শনী খেলার উদ্যোক্তাদের আর্থিক ক্ষতি এবং নানাবিধ অসুবিধার কথা বিবেচনা ক'রে দলকে অবশিষ্ট খেলায় যোগদান করতে সম্মত হ'ন। এই শোকান্বিতা মহিলার উদারতা ভারতীয় ক্রীড়ামহল নতশিরে স্বীকার ক'রে তাঁর প্রতি সমবেদনা জানাবে। এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল জয়পুরের দুটি পোলো খেলার পর। সুতরাং বাকি খেলায় আর্জেন্টিনাদল যে দলের সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারবে না তা খুবই স্বাভাবিক।

এ প্রসঙ্গে ভারতীয় পোলো খেলার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ফুটবল, হকি, ক্রিকেটের মত পোলো খেলা ভারতবর্ষে জনপ্রিয় না হলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে পোলো খেলার জনপ্রিয়তা ভারতবর্ষে দিন দিন বেড়ে চলেছিল। ১৯৩০ সাল থেকে জয়পুর রাজ্য ভারতীয় পোলো খেলার তীর্থস্থানরূপে সুপরিচিত ছিল। আর্জেন্টিনা দলের সঙ্গে ভারতীয় দলের এই পোলো খেলাকেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পোলো খেলায় যোগদান হিসাবে গণ্য করা যায়। ভারতীয় পোলো এসোসিয়েশন দলের অধিনায়ক জয়পুরের মহারাজা পৃথিবীর একজন বিশিষ্ট পোলো খেলোয়াড় হিসাবে সুপরিচিত। তাঁর অধিনায়কত্বে জয়পুর পোলোদল ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডের বিশিষ্ট পোলো প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের নাম বিজয়ী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এসেছিলো।

পঞ্চম টেষ্ট ঃ

কমনওয়েল্থ ঃ ৩২৪ ও ২৪৭

ভারতবর্ষ ঃ ৩১৩ ও ২৬১ (৭ উইকেটে)

এই পঞ্চম টেষ্ট খেলার উপরই উভয় দলের 'রাবার' পাওয়া না-পাওয়া নির্ভর করছিলো, সুতরাং সারা ভারতবর্ষের ক্রিকেট ক্রীড়ানুরাগীরদলকে চীপক মাঠের খেলার প্রতিটি মুহূর্ত্তকে মূল্যবান জ্ঞানে অধীর আগ্রহে শেষ ফলাফল জানবার জন্যে এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মধ্যে কাটাতে হয়েছিলো। ভারতীয়দলের সমর্থকদের উদ্বেগের আরও বেশী কারণ হ'ল, যখন কমনওয়েলথদল টসে জয়লাভ করে ব্যাট করতে নামলো। ক্রিকেট খেলায় টসে জয়লাভ করার মানেই হ'ল, খেলার অর্দ্ধেক জয়লাভ করা, বিশেষ ক'রে এ রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ খেলায়।

১৭ই ফেব্রুয়ারী খেলার প্রথম দিনের নির্দ্ধারিত সময়ে কমনওয়েলথ দলের ৮ উইকেট পড়ে গিয়ে ২৯০ রাণ উঠে। দলের ওরেল ১৪৯ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন। পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য রাণ এ্যালে ৪৮। কমনওয়েলথদলের মাত্র ১ রাণে দলের ক্যাপটেন লিভিংষ্টোন আউট হ'ন। টসে হেরে গিয়ে খেলার সূচনাতেই ভারতীয় দল যে সাফল্যলাভ করলো এ দেখে সমর্থকেরা কিছুটা আশান্বিত হ'ল। ৩টে উইকেট পড়লো দলের ৬৩ রাণে। ৪র্থ উইকেটে ওরেল এবং এ্যালে জুটি হয়ে খেলার ভাঙ্গন রোধ করলেন। এ দু'জনের জুটিতে ৭০ মিনিটে ৮৯ রাণ উঠলে পর দলের ১৫১ রাণে এ্যালে রাণ আউট হ'ন ৮টা উইকেট পড়ে যায় দলের ২১৩ রাণে। এরপর

ফিজমরিস ওরেলের জুটি হয়ে ৭৩ মিনিটে ৭৭ রাণ তুললে পর সে দিনের মত ৮ উইকেটে ২৯০ রাণে খেলা বন্ধ থাকে। ফাদকার ৬৯ রাণে ৩টে উইকেট পান। ফাইনলেগে উমীরগড় ওরেলকে তাঁর ২৮ রাণের মাথায় ধরতে পারলে কমনওয়েথদলের আরও কম রাণ উঠতো।

১৮ই ফেব্রুয়ারী, খেলার ২য় দিনে কমনওয়েলথদলের ১ম ইনিংস ৩২৪ রাণে শেষ হয়। ওরেল দলের সর্ব্বোচ্চ ১৬১ রাণ করেন। দ্বিতীয় দিনে কমনওয়েলথ দলের বাকি ২টো উইকেট নিতে ভারতীয় দলের ২৭ মিনিট সময় লাগে। ভারতীয় দলের ১ম ইনিংসের সূচনা ভাল হ'ল না। দলের সর্ব্বোচ্চ ৭৭ রাণ করেন হাজারে। হাজারে এবং ফাদকার চতুর্থ উইকেটে জুটি হয়ে দলের ভাঙন রক্ষা করেন ২ ঘণ্টায় ১০৪ রাণ তুলে। নির্দ্ধারিত সময়ে ৫টা উইকেট পড়ে ভারতীয় দলের ১৮৫ রাণ উঠলে দেখা গেল কমনওয়েথদলের সমান রাণ করতে তখনও ভারতীয় দলের ১৩৯ রাণ দরকার, হাতে ৫টা উইকেট।

১৯শে ফেব্রুয়ারী, খেলার তৃতীয় দিনের লাঞ্চের সময় কমনওয়েথদলের রাণ সংখ্যা ছাড়িয়ে যেতে তখনও ভারতীয়দলের ৫৬ রাণ দরকার, হাতে ৪টে উইকেট। ৩১৩ রাণে ভারতীয়দলের ১ম ইনিংস শেষ হলে কমনওয়েলথদল ১ম ইনিংসের খেলায় ৩১ রাণে অগ্রগামী থাকে। ট্রাইব ৯০ রাণে ৪টে এবং ফিজমরিস ৪০ রাণে ৩টে উইকেট পান। কমনওয়েলথদল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু ক'রে নির্দ্ধারিত সময়ে ২ উইকেটে ৪৫ রাণ তুলে। চৌধুরী ৬ ওভার বলে ২টো মেডেন নিয়ে ১২ রাণে ২টো উইকেট পান।

২০শে ফেব্রুয়ারী, খেলার চতুর্থ দিনে কমনওয়েলথ-দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৪৭ রাণে শেষ হয়। দলের সর্ব্বোচ্চ ৮৪ রাণ ক'রে হোল্ট নট আউট থাকেন। তিনি ৬টা বাউণ্ডারী এবং ১টা ওভার বাউণ্ডারী করেন। ফাদকার ২৮ রাণে ৩টে এবং চৌধুরী ৭৮ রাণে ৩ উইকেট পান। মানকড় ৫৭ রাণে পান ২টো উইকেট। ভারতীয়দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং নির্দ্ধারিত সময়ে ১ উইকেটে ৫০ রাণ তুলে। ভারতীয় দলের জয়লাভের জন্যে তখন ২০৯ রাণ প্রয়োজন, হাতে ৯টা উইকেট, সময় পাঁচ ঘণ্টা।

খেলার পঞ্চম দিনে চীপক মাঠের উইকেট ব্যাটসম্যানদের কাছে রাণ তোলার দিক থেকে এক বিপদসঙ্কুল পথ, অপরদিকে বোলারগণ এ রকম উইকেটের অপেক্ষাতেই থাকে—এ যেন তাদের কাছে শিকার ধরা ফাঁদ। ভারতীয় দলের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা তারা টসে হেরে গেলেও কমনওয়েলথের বোলারগণ খারাপ উইকেটের সুযোগ পুরোপুরি নিতে পারেনি। হাজারে এবং উমরীগড়ের দ্বিতীয় উইকেটের জুটীতে প্রায় দু'ঘণ্টার খেলায় ১০৭ রাণ উঠে, হাজারে দলের সর্ব্বোচ্চ ৮৩ রাণ ক'রে আউট হ'ন। উমরীগড় আউট হ'ন ৫৯ রাণে। এ দুজন খেলোয়াড়ের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলাই ভারতীয় দলকে জয়লাভে প্রভূত সাহায্য করেছে। লাঞ্চ পর্য্যন্ত এঁরা নট্ আউট ছিলেন, দলের রাণ তখন ১ উইকেটে ১৪৩। চা-পানের সময় ৩টি উইকেট পড়ে ভারতীয়দলের ২২৪ রাণ উঠে, জয়লাভের প্রয়োজনীয় রাণের থেকে ৩৭ রাণ কম। জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৪ রাণ তুলতে যখন বাকি তখন স্কোর বোর্ডে ৭টা উইকেট পড়ে দেখা গেল ২৫৫ রাণ উঠেছে। হাতে ৩টি উইকেট এবং ১০ মিনিট সময়। খেলার এই অবস্থায় মুস্তাক আলি অধিকারীর জুটি হয়ে খেলতে নামেন। ২টো রাণ উঠলো প্রত্যেকে এক এক রাণ করলে। এর পর খেলা ভাঙ্গল নির্দ্ধারিত সময়ের ১১ মিনিট আগে মুস্তাক ড্রাইভ সেরে বাউণ্ডারী করলে প্রয়োজনায় ৩২ রাণের উপর ২টো রাণ বেশী উঠলো। উদ্বিগ্ন এবং উত্তেজনা থেকে রেহাই পেয়ে দর্শকমণ্ডলী ভারতীয়দলের জয়ধ্বনিতে মাঠ কাঁপিয়ে তুললো।

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত অভিনব গল্প-গ্রন্থ "কাঁচামিঠে"—২॥০
শ্রীরণজিৎকুমার সেন প্রণীত উপন্যাস "সানাই"—১॥০
প্রবোধ সরকার প্রণীত "ভালবাসা নহে অপরাধ"—২॥০
অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "ভগ্ননীড়"—২৲
শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য প্রণীত শিশু-উপন্যাস "দস্যুর পশ্চাতে"—১৷৹
শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "টাকার মূল্য হ্রাস"—৷৴০, "স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র"—২৲
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "বিশ্বাসঘাতক মোহন"—২৲, "স্বপনের দস্যু-জীবন"—২৲, "জেল-পলাতক মোহন"—২৲
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত নাটক "বিক্রমাদিত্য"—১॥০
জগদীশ গুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "নন্দা আর কৃষ্ণা"—২॥০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী — শ্রী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

"ওরা কার কথা কয়,
ওরে কিশলয়—"

ফটো—শ্রীজয়দেব গুপ্ত

বৈশাখ—১৩৫৭

দ্বিতীয় খণ্ড | সপ্তত্রিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

সন ১৩৫৭ সাল

জ্যোতি বাচস্পতি

সন ১৩৫৬ সালের ৭ই চৈত্র, ইং ২১শে মার্চ ১৯৫০ মঙ্গলবার, ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড বেলা ১০টা ৬ মিনিট সময়ে সূর্য্য বিষুব রেখার উপর আসবেন। সেইদিন সেই সময়কার গ্রহ-সংস্থান একবছরের মত পৃথিবীর উপর প্রভাব স্থাপন করবে। সে সময় গ্রহসংস্থান হবে এই রকম।

আমাদের দেশের প্রাচীন মনীষীরা এ সংক্রমণের গুরুত্ব বুঝতেন ব'লেই এর নাম দিয়েছিলেন মহাবিষুব সংক্রান্তি। বেদের মতে এইদিন মাধব মাসের আরম্ভ। এই গ্রহ-সংস্থান থেকে সাধারণতঃ বোঝা যাবে গ্রহগুলির প্রভাবে গোটা পৃথিবীর মানুষগুলি কী ভাবে প্রভাবিত হবে।

রাশিচক্রটি লক্ষ্য করলে প্রথমেই নজরে পড়ে যে, রবি মীন রাশিতে থেকে বুধ ও রাহুযুক্ত এবং তা প্রজাপতি, শুক্র, রুদ্র ও মঙ্গলের ঘনিষ্ঠ অশুভ প্রেক্ষায় পীড়িত। তার উপর কোন শুভ গ্রহেরই দৃষ্টি বা প্রেক্ষা নেই। সুতরাং এ বছরও

পৃথিবীতে শান্তি এবং শৃঙ্খলা বলে কিছু থাকবে না। পৃথিবীর সর্বত্রই কমবেশী উত্তেজনা লক্ষিত হবে এবং সব দেশেই সরকারের বিরুদ্ধে কমবেশী আন্দোলন মাথাখাড়া করবে। নানারকম বিপ্লবাত্মক মতবাদও বেশ উত্তেজনার সঙ্গে প্রচারিত হবে। কিন্তু সে উত্তেজনার পিছনে কোন সুচিন্তিত কর্ম-ধারা না থাকায়, তা শুধু মিথ্যা গণ্ডগোল, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ইত্যাদিতে অভিব্যক্ত হয়েই নিঃশেষিত হবে। প্রজা সাধারণ তা থেকে উপকৃত তো হবেই না, বরং নানা-বিচিত্রমতের মাঝে পড়ে বিভ্রান্ত হ'য়ে উঠবে। সবদেশেই এই সকল উত্তেজনাপূর্ণ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে এমনি ব্যতি-ব্যস্ত হ'তে হ'বে যে, তাঁরা প্রজাসাধারণের দিকে নজর দেওয়ার অবসর পাবেন না। এতে ক'রে প্রজাসাধারণের সহানুভূতি প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও পরোক্ষভাবে বিপ্লবীদের দিকে প্রসারিত হবে এবং দেশের প্রচলিত গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে তারা হয় একান্ত উদাসীন হ'য়ে উঠবে, না হয় তাকে ভীতি ও সন্দেহের চক্ষে দেখবে। সবদেশেই সংস্কারমূলক বিধি-বিধান কিছু কিছু প্রবর্তিত হবে বটে, কিন্তু তা প্রজা-সাধারণকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। অধিকাংশ দেশেই জনসাধারণ কামনা করবে আমূল সংস্কার, কিন্তু উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে তা সম্ভব হ'য়ে উঠবে না।

এ বৎসরও পৃথিবীর সর্বত্রই একটা অশান্ত আবহাওয়া লক্ষিত হবে। বিশেষতঃ শাসন-কর্তৃপক্ষকে এমন সব অপ্রত্যাশিত ঝঞ্ঝাট ও শঙ্কটের সম্মুখীন হ'তে হবে, যার সমাধানে তাঁদের সকল শক্তি প্রয়োগ ক'রেও আশানুরূপ কোন ফল হবে না। কি প্রজা সাধারণ, কি ধনিক-সম্প্রদায়, কোন পক্ষেরই আন্তরিক সহযোগিতা তাঁরা পারেন না।

মোট কথা, এ বৎসরও দুর্ভিক্ষ, লোকক্ষয়, উচ্ছৃঙ্খলা ও উত্তেজনার মধ্যে লোকে শান্তি খুঁজে পাবে না।

ইংলণ্ডকে এ বছর নানারকম শঙ্কটের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে। বিশেষতঃ তার বৈদেশিক ব্যাপারে নানারকম ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হবে; কোন মিত্র রাষ্ট্রের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়াও অসম্ভব নয় এবং আর্থিক বা বাণিজ্যিক ব্যাপার নিয়ে কোন কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও হ'তে পারে। এই ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে কোন রকম ষড়যন্ত্র হওয়াও অসম্ভব নয়। ইংলণ্ডে অর্থাভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হবে এবং দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি কারণে লোকক্ষয়ের আশঙ্কাও আছে। মন্ত্রীসভাকে এ বছরও নানারকম সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হবে। মন্ত্রীসভার পতনের বিশেষ আশঙ্কা আছে। পতন যদি না হয়, তা হ'লেও কোনরকম পরিবর্তন নিশ্চয় হবে। ইংলণ্ডের সাধারণ স্বাস্থ্যও এ বৎসর ভাল যাবে না। সহসা কোন ব্যাপক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে। আর্থিক ব্যাপার সামলাবার জন্য নানারকম ব্যবস্থা করলেও তা সম্পূর্ণ সফল হবে না। তা ছাড়া ঘরে শ্রমিক বিক্ষোভ, বাইরে উপনিবেশ নিয়ে গোলোযোগ, বৈদেশিক বাণিজ্য, জলপথ, আকাশপথ প্রভৃতি নিয়ে মতান্তর বা বিরোধ—এই সকল ব্যাপারে তাকে বেশ বিব্রত হ'তে হবে। মোট কথা ইংলণ্ডের পক্ষে এটি একটি দুর্বৎসর। যদিও একটা বাহ্যিক প্রলেপ দিয়ে তা ঢাকবার যথেষ্ট চেষ্টা দেখা যাবে, কিন্তু যেহেতু তার ভাগ্য এবার শনি ও মঙ্গলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তাকে ঘরে ও বাইরে সর্বত্রই ব্যতিব্যস্ত হ'তে হবে এবং কোন দিকেই সে স্বস্তি পাবে না।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়েছে শুক্র। ঐ শুক্র বরুণ ছাড়া অপর কোন গ্রহের শুভপ্রেক্ষা পায় নি। কাজেই তাকে নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে। বৈদেশিক নীতি, অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি প্রভৃতির সংশ্রবে তার নানারকম অপ্রত্যাশিত ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হবে। সমর-সজ্জা বৃদ্ধির দিকে তার খুব বেশী লক্ষ্য পড়বে, কিন্তু সমর-সজ্জা, অপরদেশের সঙ্গে আর্থিক সম্বন্ধ, শ্রমিকের অবস্থা, খাদ্য, পরিধেয়, ট্যাক্স ইত্যাদির ব্যাপার নিয়ে এবং বিশেষ করে বৈদেশিক নীতি নিয়ে কংগ্রেসের সভ্যদের মধ্যে মতভেদ ও প্রবল বাদ-বিতণ্ডা লক্ষিত হবে। এ বৎসরও তার আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টার অন্ত থাকবে না; কিন্তু সে চেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হওয়ার মোটেই কোন আশা নাই। কোন কোন মিত্ররাষ্ট্রের দ্বারা গুপ্ত-শত্রুতা বা কোন ষড়যন্ত্র হ'তে পারে এবং কারো কারো দ্বারা প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাও অসম্ভব নয়। তার বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারও নানাদিক দিয়ে প্রতিহত হবে এবং অনেক সময় বৈদেশিক ব্যাপারে অনর্থক অর্থক্ষয় হবে। অস্ত্রসজ্জা ইত্যাদিতে এবং নূতন কোন মারণাস্ত্র নির্মাণে যে পরিমাণে ব্যয় হবে সে অনুপাতে সাফল্য লাভ হবে না। তার কূটনীতি অনেক

ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং তার জনপ্রিয়তা অনেকাংশে হ্রাস প্রাপ্ত হবে।

রুশদেশ ও চীন, এ উভয়েরই ভাগ্যনিয়ন্তা হয়েছে বৃহস্পতি। এ বৎসরের রাশিচক্রে বৃহস্পতিই একমাত্র গ্রহ, যা রাহু ছাড়া অপর কোন গ্রহের দ্বারা কু-প্রেক্ষিত নয় এবং যা চন্দ্র ও প্রজাপতির শুভপ্রেক্ষায় অনুগৃহীত। দু'টি রাষ্ট্রেরই একই গ্রহ ভাগ্যনিয়ন্তা হওয়ায় উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি খুব দৃঢ় হবে। যদিও চীনদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এ বৎসরও শান্তিপূর্ণ হ'তে পারবে না এবং এ বৎসরও তার অন্তর্বিরোধ প্রভৃতি কারণে তাকে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে এবং অনেক-ক্ষেত্রে তাকে সামরিক শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে, তথাপি তার নূতন শাসনতন্ত্র ও বিধিবিধান জনসাধারণের সমর্থন লাভ করবে। এ বৎসরও তার প্রজাসাধারণকে অনেক দুর্দশা ভোগ করতে হবে এবং তার স্ত্রীলোক ও শিশুদের মধ্যে মৃত্যুর হার বর্ধিত হবে, কিন্তু ভবিষ্যতের আশায় অনুপ্রাণিত হয়ে জনসাধারণ সকল দুর্দশা সহ্য ক'রে যাবে এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করবে।

রুশ দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এ বছর সব দেশের চেয়ে ভাল হবে, তার উৎপাদন অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং প্রজাসাধারণের অবস্থা সাধারণতঃ বেশ স্বচ্ছল হবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অপর রাষ্ট্রের শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাকে কম-বেশী উদ্বেগ ও ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর দ্বারা তার বিরুদ্ধে নানা রকম প্রচার কার্য চলবে এবং সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সে নিজে শান্তির পক্ষপাতী হ'লেও, সমরসম্ভার বৃদ্ধি, অস্ত্রাদি নির্মাণ প্রভৃতি ব্যাপারে তার যথেষ্ট সময়, শক্তি ও অর্থ ব্যয়িত হবে। তার সামরিক বিভাগের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষার জন্য একটা প্রস্তুতি ও উত্তেজনা জনসাধারণের মধ্যে প্রকট হ'তে পারে। রুশ এ বছর অনেকটা নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকবার চেষ্টা করবে এবং তার প্রকৃত মনোভাব বা প্রকৃত নীতি বাইরের লোকের পক্ষে অনুমান করা কঠিন হবে।

এসব দেশ সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু বলা যায় কিন্তু তাতে আমাদের কোন লাভ নেই। ভারতের অবস্থা কী হবে তাই দেখা যাক্।

ভারতের এবছর লগ্ন হয়েছে বৃষ এবং তার যুগ্ম ভাগ্য-নিয়ন্তা হয়েছে প্রজাপতি ও বুধ। প্রজাপতি আছে দ্বিতীয়ে এবং বুধ অস্তগত ও নীচস্থ হ'য়ে আছে একাদশে। প্রজাপতির ঘনিষ্ঠ অশুভপ্রেক্ষা রুদ্র, শুক্র, রবি ও মঙ্গলের সঙ্গে, তা বৃহস্পতির সামান্য শুভপ্রেক্ষা ও দৃষ্টি পাচ্ছে এবং চন্দ্রেরও শুভপ্রেক্ষা তার উপর আছে। বুধের সঙ্গে রবির কন্‌জাংশন আছে—তার সম্বন্ধ হয়েছে রবি, রাহু, মঙ্গল, কেতু ও বরুণের সঙ্গে।

দ্বিতীয় ভাব থেকে সাধারণতঃ বিচার করা হয় দেশের আর্থিক অবস্থা, আয়, কর, শুল্ক ইত্যাদি এবং একাদশ ভাব থেকে বিচার করা হয় দেশের ব্যবস্থা পরিষদ, সভা-সমিতি, কর্পোরেশন ইত্যাদি ; সুতরাং এই সকল ব্যাপারের সংশ্রবে এ বৎসর নানা রকম ঘটনা ঘটবে যা সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করবে।

প্রজাপতি দ্বিতীয়ে থাকায় ভারতের আর্থিক ব্যাপারে এ বৎসর অনেক ওঠাপড়া চলবে। আর্থিক নীতি সম্বন্ধে সংস্কারমূলক কোন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে বটে, কিন্তু তা কাজে পরিণত করার পক্ষে নানারকম অপ্রত্যাশিত বাধা উপস্থিত হবে, যার জন্য কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট বিব্রত হ'তে হবে। পুঁজিপতিদের ষড়যন্ত্র এবং প্রকাশ্য বিরোধিতা মুদ্রাস্ফীতি কমাবার অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াবে। নানা অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে ব্যয়বাহুল্য ঘটবে। বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে অকস্মাৎ এমন অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, যাতে ক'রে তার আর্থিক ব্যবস্থা ব্যাহত হবে। তা ছাড়া পুঁজিপতিদের স্বার্থ বা লাভের খাতিরে এমন নীতি গৃহীত হ'তে পারে যাতে সরকারকে বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হবে। আর্থিক ব্যাপার নিয়ে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধ তীব্রতর হ'য়ে ওঠা সম্ভব। অবশ্য কর্তৃপক্ষের দ্বারা আর্থিক অবস্থার সমতা নিয়ে আসার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা হবে। কিন্তু তা সম্পূর্ণ সফল হবে না। আর্থিক নীতি সম্বন্ধে নানারকম অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন হবে এবং অর্থের বাজারে একটা অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য লক্ষিত হবে। আর্থিক ব্যাপার নিয়ে পার্লিয়ামেণ্টে এবং আইন-পরিষদে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা চলবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও লিমিটেড্ কোম্পানী ইত্যাদির ব্যাপারে এমন কোন নীতি প্রবর্তিত হবে, যার প্রতিক্রিয়ায়

আর্থিক জগতে একটা আলোড়ন উপস্থিত হবে। আর্থিক সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারকে বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু সে ঋণ তার পক্ষে খুব সুবিধাজনক হবে না।

মোট কথা আর্থিক ব্যাপার এ বৎসর ভারতের একটা মস্তবড় সমস্যা হবে। আর্থিক ব্যাপারে এমন সব অপ্রত্যাশিত ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হবে, যার সমাধান মোটেই সহজসাধ্য হবে না।

লগ্নপতি শুক্র নবমে থেকে প্রজাপতি, রুদ্র, রবি, মঙ্গল ও রাহুর দ্বারা পীড়িত হওয়ায় দেশের অবস্থার উন্নতির জন্য নানা ধরণের পরিকল্পনা হ'লেও তা কাজে পরিণত করা সম্ভব হবে না। দেশের জনসাধারণের মধ্যে একদিকে যেমন অভাব-অনটন ও দুঃখ-দুর্দশা প্রকট হ'য়ে উঠবে অপরদিকে তেমনি দুর্নীতি ও অপরাধমূলক আচরণে দেশ ছেয়ে যাবে। খাদ্যাভাব, বাসকষ্ট, রোগশোক, ইত্যাদি নানা প্রতিকূল আঘাতে উত্তেজিত হ'য়ে এমন কোন অপকর্ম নেই যা সাধারণ লোকে করতে চাইবে না। স্ত্রীলোক ও শিশুর পক্ষে এ বৎসরটি অত্যন্ত দুর্বৎসর—তারা নানাদিক দিয়ে অবহেলিত হবে এবং তাদের উপর নানা রকম অত্যাচারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। তা ছাড়া স্ত্রীলোকদের মধ্যে দুর্নীতিমূলক আচরণের আধিক্য হওয়াও অসম্ভব নয়।

এ বৎসর ভারতীয় ইউনিয়নের উপর তৃতীয়স্থ রুদ্রের বিশেষ গুরুত্ব আছে, কেন না তা ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা প্রজাপতির প্রথম সংযোগী প্রেক্ষায় পীড়িত। লগ্নপতি শুক্র এবং চতুর্থপতি রবিও ঐ রুদ্রের ঘনিষ্ঠ অশুভ প্রেক্ষায় পীড়িত হচ্ছে। এর ফলে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সঙ্গে মনোমালিন্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের দ্বারা তার বিরুদ্ধে নানা রকম ষড়যন্ত্র হবে এবং বিদেশে মিথ্যা প্রচার কার্য চলবে। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধিতা তো হবেই, এমন কি শক্তি পরীক্ষার উপক্রমও হ'তে পারে। তৃতীয়স্থ রুদ্র সংবাদপত্র, পুস্তকপ্রকাশ ইত্যাদির ব্যাপারেও বিচিত্র ঘটনা ও পরিস্থিতি নির্দেশ করে। সংবাদপত্রের ব্যাপারে কোন রকম আইন বা অর্ডিনান্স প্রবর্তিত হ'তে পারে, যাতে স্বাধীন মতামত প্রকাশে বিঘ্ন ঘটবে। রেলওয়ে, চলাচল-ব্যবস্থা, পোষ্ট, টেলিগ্রাফ ইত্যাদির ব্যাপারেও নানারকম অপ্রত্যাশিত ঘটনায় গভর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত হ'তে হবে। রেলওয়ে ও চলাচলের ব্যাপারে দুর্ঘটনারও বাহুল্য ঘটবে। দেশে পঞ্চম-বাহিনীর দ্বারা অথবা গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা রেলওয়ে, নদীর সেতু ইত্যাদিতে ধ্বংসমূলক কার্য অনুষ্ঠিত হওয়ার বিশেষ আশঙ্কা আছে।

শনি চতুর্থে থাকায় প্রেসিডেণ্ট এবং গভর্ণমেণ্টের পক্ষে বৎসরটি খুব শুভ নয়। তাঁদের জনপ্রিয়তা হ্রাস হবে। নানাদিক দিয়ে তাঁদের পরিকল্পনা বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং তাঁদের সবদিক দিয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হবে। বেকার এবং বাস্তুহারাদের ব্যাপারে নানারকম ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হবে। কৃষি এবং ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যাপার এবং বাসগৃহের সমস্যার সমাধান কোন-মতেই সুষ্ঠুভাবে হ'য়ে উঠবে না। এ বিষয়ে নানা ঝঞ্ঝাট মাথাখাড়া করবে। খনিতে দুর্ঘটনা এবং নানারকম প্রাকৃতিক উৎপাত, ভূমিকম্প, ঝঞ্ঝা প্রভৃতিতে ভূমির প্রভূত ক্ষতির আশঙ্কা আছে। ভূমিজীবী ও কৃষকদের পক্ষে বৎসরটি মোটেই ভাল নয়। গভর্ণমেণ্টের দ্বারা ভূমির উন্নয়নের চেষ্টা নানাদিক দিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হবে।

পঞ্চমে মঙ্গল থাকায়, বিশেষ ক'রে ঐ মঙ্গল সপ্তমপতি ও দ্বাদশপতি হওয়ায়, শত্রুর দ্বারা নানারকম দুষ্ট প্রচার-কার্য অনুষ্ঠিত হতে পারে। নারী এবং শিশুর বিরুদ্ধে নানা রকম অত্যাচার হওয়া সম্ভব। নারীধর্ষণ, ছেলে-চুরি প্রভৃতির প্রাচুর্য ঘটবে। আমোদপ্রমোদের স্থান, থিয়েটার, সিনেমা, সারকাস ইত্যাদিতে অগ্নিকাণ্ড, দাঙ্গাহাঙ্গামা, দুর্ঘটনা ইত্যাদির আশঙ্কা আছে। স্কুল কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উত্তেজনা ও বিদ্রোহমূলক মনোভাব প্রকট হবে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও দুর্ঘটনা, দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রভৃতি বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার ব্যাপারে নানারকম বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নীতিবোধ ও সংযমের অভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হবে। অনেক সময় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হবে।

ব্যবসায় জগতে দুর্নীতির প্রাচুর্য ঘটবে এবং চোরা-কারবার এ বৎসরও পুরোদমেই চলবে। পুঁজিপতিদের অত্যধিক লাভের লোভ সাধারণ বাজারকে বিকৃত করে তুলবে। মোট কথা, বাজারের বিশৃঙ্খলা গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা

ক'রেও দূর করতে পারবেন না এবং এই বিশৃঙ্খলার জন্য জনসাধারণ অশান্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে।

নবমে শুক্র থাকায় জলপথে বাণিজ্য, বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদি বৃদ্ধি পাবে বটে, কিন্তু তার অধিকাংশই পরিচালিত হবে পুঁজিপতিদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং পুঁজিপতিদের স্বার্থের জন্য এ সম্বন্ধে কোন নতুন আইনও পাশ হ'তে পারে, যা সাধারণ সমালোচনার বিষয় হবে এবং যার দ্বারা দেশের আর্থিক উন্নতিতে বাধা হবে। জাহাজ-নির্মাণ, বিমান-নির্মাণ ইত্যাদিতে অনর্থক ব্যয়-বাহুল্য ঘটবে এবং ব্যয়বাহুল্য হ'লেও সব সময় আশানুরূপ কাজ হবে না। ব্যাঙ্কের ব্যাপারে নানারূপ বিভ্রাট উপস্থিত হবে। স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা জনসাধারণ বিপথে চালিত, প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে এবং তা নিয়ে এমন কোন কেলেঙ্কারীর ব্যাপার ঘটা সম্ভব যার জন্য গভর্ণমেণ্টকে ব্যাঙ্ক, ইন্‌সিওরেন্স ইত্যাদির ব্যাপারে কোন নতুন বিধান বা আইন পাশ করতে হবে।

শুক্র নবমে থেকে মঙ্গল ও রুদ্রের দ্বারা পীড়িত হওয়ায়, একদিকে যেমন পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে ধর্ম বা সাম্প্রদায়িক ব্যাপার নিয়ে অত্যাচার, দাঙ্গাহাঙ্গামা ইত্যাদির জন্য ভারতকে বিব্রত হ'তে হবে, তেমনি আবার দেশের মধ্যেও ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের দ্বারা কোন নতুন আইন প্রবর্তনের চেষ্টা সম্ভব—যা নিয়ে তুমুল উত্তেজনার সঞ্চার হ'তে পারে। তা ছাড়া দেশের আদালতগুলিতেও দুর্নীতি, ব্যভিচার ইত্যাদি সংক্রান্ত বিচিত্র মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং আইন-আদালত-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যেও কোন ধর্মসভা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সংশ্রবে কোন কেলেঙ্কারীর ব্যাপার সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

দশমে বৃহস্পতি গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কতকটা শুভ। রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে কতকগুলি সংস্কারমূলক বিধি প্রবর্তিত হবে, যাতে ক'রে দেশে কতকটা শৃঙ্খলা আসবে এবং গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাবে। গভর্ণমেণ্টকে জনপ্রিয় করার জন্যও এ বৎসর যথেষ্ট চেষ্টা হবে, কিন্তু স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও নানারকম গণ্ডগোলের ব্যাপারে তা সম্পূর্ণ সফল হ'তে পারবে না। আর্থিক ব্যাপারে ঋণ, ব্যয়-সংকোচ ইত্যাদি দ্বারা কতকটা সমতা নিয়ে আসার চেষ্টা হলেও, গভর্ণমেণ্টকে আর্থিক অসুবিধা অনেক ভোগ করতে হবে, যার জন্য তার সকল ভাল পরিকল্পনা বাধাপ্রাপ্ত হবে।

একাদশে রবি, বুধ ও রাহু থাকায় পার্লিয়ামেণ্টের ব্যাপারে নানারকম অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। পার্লিয়ামেণ্টে সরকারী দলের মধ্যে অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা ভাঙন ধরতে পারে। কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে নিয়ে কোন রকম কেলেঙ্কারীর ব্যাপার ঘটতে পারে, বাদ-বিতণ্ডা অনেক সময় ব্যক্তিগত আক্রমণে পর্যবসিত হ'তে পারে। নেতৃত্ব নিয়ে অশোভন বিবাদ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতাও অসম্ভব নয়। নতুন আইনে নির্বাচনের ব্যাপার আর্থিক সঙ্কটের অজুহাতে এ বছরও হওয়া সম্ভব হবে না, যার জন্য নেতাদের বিরুদ্ধে নানারকম নিন্দা প্রচার হবে। ধর্ম, শিক্ষা, ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদির ব্যাপারে কতকগুলি আইন প্রবর্তনের চেষ্টা হ'তে পারে যা পার্লিয়ামেণ্টে এবং বাইরে অবাঞ্ছনীয় বাদ-বিতণ্ডা ও উত্তেজনা সৃষ্টি করবে। নেতৃস্থানীয় কোন সঙ্ঘের কোন রকম দুর্ঘটনা বা কঠিন পীড়ার আশঙ্কা আছে।

দ্বাদশে চন্দ্র—দেশের জনসাধারণের পক্ষে মোটেই শুভ নয়। দেশে অভাবগ্রস্ত, নিরাশ্রয় ও বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং অভাব-অনটনের জন্য সাধারণের মধ্যে যেমন আধি-ব্যাধির প্রাচুর্য ঘটবে, তেমনি তাদের মধ্যে নীতিবোধের অভাব লক্ষিত হবে এবং অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি এবং স্ত্রীলোক ও শিশুর উপর অত্যাচারের সংখ্যা খুব বেশী হবে এবং নারীসেবাব কোন প্রতিষ্ঠান, অনাথ আশ্রম প্রভৃতি নিয়ে কোনরকম কেলেঙ্কারী প্রচারিত হ'তে পারে। তা ছাড়া, আশ্রয়-শিবির ইত্যাদিতে অগ্নিকাণ্ড বা অন্য কোনরকমের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা আছে। আশ্রয় শিবির বা ঐ রকম কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের অধিবাসীদের ব্যবহার অনেক সময় দুবিনীত হ'য়ে উঠবে এবং তাদের দ্বারা কোনরকম দাঙ্গাহাঙ্গামা অনুষ্ঠিত হওয়াও বিচিত্র নয়। বাস্তহারাদের জন্য গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট চেষ্টা করলেও এবং তাদের জন্য অর্থব্যয় হলেও, বাস্তহারা-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান এবৎসরও হ'য়ে উঠবে না।

নেতৃত্বের অভাব এবছরও যথেষ্ট অনুভূত হবে এবং জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা এবছরও বিশেষ কমবে ব'লে মনে হয় না। একটা আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তার পরিস্থিতি এ বছরও জনসাধারণকে পীড়িত করবে, যার মধ্যে আশার আলোর কোন রেখা তারা খুঁজে পাবে না।

এ বছরও ভারতের জনসাধারণের পক্ষে দুর্বৎসর।

কালের মন্দিরা

শ্রী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বন্দিনী

তোরণ প্রতীহারের নাসিকায় বিলক্ষণ আঘাত লাগিয়াছিল। সুগোপার প্রতি রসে-ভরা প্রীতির ভাব আর তাহার ছিল না। তদুপরি দুইটা বিকশিতদন্ত যামিক-রক্ষী যখন একটা চোরকে তাহার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া চলিয়া গেল তখন শুধু সুগোপা নয়, সমস্ত নারী জাতির উপর তাহার মন বিরক্ত হইয়া উঠিল। দেবদুহিতার সখী না হইয়া অন্য কোনও লোক হইলে কখনই সে চোরকে সারা রাত্রি আগুলিয়া থাকিবার ভার লইত না। শান্তির সময়, দেশে কোনও প্রকার উপদ্রব নাই; এ সময়ে রাজপুরীর তোরণ পাহারা দিতে হইলে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিবার প্রয়োজন হয় না; দ্বারে ঠেস দিয়া চক্ষু মুদিত করিলেই প্রভাত হইয়া যায়। কিন্তু এখন এই অশ্ব চোরটাকে লইয়া সে চক্ষু মুদিবে কি প্রকারে? চোর যদি পালায় তবে আর রক্ষা নাই। তবে কি চতুঃপ্রহর রাত্রি জাগিয়া এই বন্ধ্যাপুত্র চোরকে পাহারা দিতে হইবে? অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া প্রতীহার বলিল—'বাপু অশ্বচোর, তোমার সাজসজ্জা দেখিয়া তোমাকে শিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া মনে হইতেছে। তুমি এমন কুকর্ম করিতে গেলে কেন? রাজকুমারীর ঘোড়া চুরি করিলে কি জন্য?

চোর উত্তর না দিয়া নির্বিকার মুখে আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। প্রতীহার পুনরায় বলিল—'আর যদি করিলেই, ধরা পড়িলে কেন? ধরা যদি পড়িলে, কল্য প্রাতে পড়িলে কি দোষ হইত?'

চোর এবারও কোনও উত্তর করিল না।

'তুমি তো কল্য প্রাতে নির্ঘাৎ শূলে চড়িবে। তবে আজ রাত্রে আমাকে কষ্ট দিয়া কী লাভ হইল?

প্রতীহারের বিরক্তি ক্রমশ হতাশায় পর্যবসিত হইতেছিল এমন সময় তাহার পাশে একটি কৃষ্ণ ছায়া পড়িল। চমকিয়া প্রতীহার দেখিল, পুর-ভূমির জীবন্ত প্রেত গুহ নিঃশব্দে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এ আখ্যায়িকায় গুহের স্থান অতি অল্পই; তবু তাহার একটু পরিচয় আবশ্যক। সে হূণ, হূণ অভিযানের সময় আসিয়াছিল। রাজপুরীর যুদ্ধে তাহার মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগে, কপালের বাম ভাগে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ফলে, গুহের স্মৃতি ও বাকশক্তি চিরতরে লুপ্ত হইয়া যায়। তদবধি সে রাজপুরীর প্রাকার বেষ্টনীর মধ্যে আছে, কেহ তাহাকে কিছু বলে না। দিবা ভাগে সে কোথায় থাকে কেহ দেখিতে পায় না; রাত্রে পুরভূমির উপর শীর্ণ খর্ব ছায়ার মত ঘুরিয়া বেড়ায়। রাত্রির প্রহরীরা কদাচিৎ তাহাকে দেখিতে পায়, সে তোরণ স্তম্ভের পাশে বসিয়া আপন মনে হাসিতেছে, অথবা অতৃপ্ত প্রেত-যোনির মত অন্ধকার প্রাকারের উপর সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। প্রহরীরা সাগ্রহে তাহার সহিত কথা বলিবার চেষ্টা করে কিন্তু গুহ নীরব থাকে; তাহার লুপ্ত স্মৃতির মধ্যে কোন্ বিচিত্র রহস্য লুক্কায়িত আছে কেহ অনুমান করিতে পারে না।

গুহ আসিয়া কয়েকবার সন্তর্পণে চিত্রককে প্রদক্ষিণ করিল; মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া যেন আঘ্রাণ গ্রহণ করিল; পশ্চাতে গিয়া কি যেন দেখিল—তারপর নিঃশব্দে হাসিতে হাসিতে প্রতীহারীকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে ডাকিল।

চিত্রকের হস্তদ্বয় পশ্চাতে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ ছিল; প্রতীহার গিয়া দেখিল কোন্ অজ্ঞাত উপায়ে রজ্জুবন্ধন ঢিলা হইয়া গিয়াছে, টানিলেই হাত বাহির হইয়া আসিবে। প্রতীহার ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—'আরে শৃগালপুত্র চোর, তুই আমাকে ফাঁকি দিয়া পালাইতে চাস?' দৃঢ়ভাবে রজ্জু বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল।

গুহের গলার মধ্যে অব্যক্ত হাসির মত একটা শব্দ হইল। প্রতীহার তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল,—'গুহ,

বড় রক্ষা করিয়াছ। এ চোর পালাইলে আমাকেই শূলে যাইতে হইত। এখন এই গর্ভ-কুষ্মাণ্ডটাকে বাঁধিয়া সারারাত্রি বসিয়া থাকি। আর বিশ্বাস নাই। একটা কূটকক্ষও যদি থাকিত, এই নষ্টবুদ্ধি তস্করটাকে তাহার মধ্যে বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম।'

গুহের চোখে যেন একটা ছায়া পড়িল; সে দাঁড়াইয়া নিজ অঙ্গুষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল।

প্রতীহারের মনে বহু অশান্তি সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে গুহকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—'গুহ, তোমাকে বলিতেছি, স্ত্রীজাতিকে কদাপি বিশ্বাস করিতে নাই। তাহাদের মত অবিশ্বাসিনী ক্লেশদায়িনী দুষ্টপ্রকৃতি—' উপযুক্ত বেগবান বিশেষণের অভাবে প্রতীহার থামিয়া গেল।

হয় তো নারীজাতির সম্বন্ধে প্রতীহারের উক্তিতে কিছু ছিল, গুহের চক্ষুর্দ্বয় সহসা অর্থপূর্ণ উত্তেজনায় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। সে সবেগে মস্তক আন্দোলন করিয়া প্রতীহারকে তাহার অনুসরণ করিবার সঙ্কেত করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল।

দুই তোরণ-স্তম্ভে দুইটি প্রতীহার-কক্ষ আছে, পূর্বে বলা হইয়াছে। এই কক্ষ দুটির প্রবেশদ্বারে কবাট নাই, তাই প্রতীহারদের বিশ্রামের উপযোগী হইলেও বন্দীকে বন্ধ করিয়া রাখিবার সুবিধা নাই। ইহাদের মধ্যে একটি সর্বদা ব্যবহৃত হইত, অন্যটি প্রয়োজনের অভাবে শূন্য পড়িয়া থাকিত। গুহ সেই অব্যবহৃত কক্ষটির মুখ পর্যন্ত গিয়া আবার হাতছানি দিয়া প্রতীহারকে ডাকিল।

প্রতীহারের কৌতূহল হইল। কিন্তু চোরকে একাকী ফেলিয়া যাইতে পারে না। সে ক্ষণেক চিন্তা করিয়া চিত্রকের হস্তরজ্জু ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া চলিল।

স্তম্ভগৃহের মুখে উপস্থিত হইয়া প্রতীহার দেখিল, গুহ চকমকি ঠুকিয়া একটি ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বালিয়াছে। চকমকি প্রদীপ কোথা হইতে পাইল সেই জানে, হয় তো পূর্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। প্রতীহার বুঝিল এই পরিত্যক্ত কক্ষটিতে গুহের যাতায়াত আছে।

দীর্ঘ অব্যবহারে ঘরটি অপরিচ্ছন্ন, কোণে ঊর্ণনাভের জাল। একটা চর্মচটিকা আলোকের আবির্ভাবে ত্রস্ত হইয়া মাথার উপর চক্রাকারে উড়িতে লাগিল।

প্রদীপ ধরিয়া গুহ কক্ষপ্রাচীরের কাছে গেল। অমসৃণ পাথরের দেয়াল, পাথরের উপর পাথর যেখানে যোড় লাগিয়াছে সেখানে কমঠ-পৃষ্ঠের ন্যায় চিহ্ন। গুহ প্রদীপ তুলিয়া ধরিয়া দেখিতে লাগিল, তারপর একটি স্থান অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া ধরিল। ধীরে ধীরে দেয়াল হইতে চতুষ্কোণ একটা অংশ সরিয়া গেল।

মহাবিস্ময়ে প্রতীহার দেখিল, একটি সুড়ঙ্গ পথ। ক্ষীণালোকে সুড়ঙ্গের বেশী দূর দেখা গেল না; কিন্তু সুড়ঙ্গ যে প্রাকারের ভিতর দিয়া বল্মীক-বিবরের ন্যায় বহুদূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। হূণেরা পুরী দখল করিয়াছিল বটে কিন্তু এই গুপ্ত সুড়ঙ্গের কথা জানিতে পারে নাই।

মিটিমিটি হাসিতে হাসিতে গুহ রন্ধ্র মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রতীহারকে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল। সুড়ঙ্গ অপরিসর নয়, দুইজন লোক পাশাপাশি চলিতে পারে। প্রতীহার চিত্রককে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

প্রায় ত্রিশ হস্ত যাইবার পর সম্মুখে একটি লৌহ কবাট পড়িল। রক্তবর্ণ অয়োমল-চিহ্নিত কবাট অর্গলবদ্ধ। গুহ ইন্দ্রকীলক সরাইয়া দ্বার খুলিয়া দিল। গহ্বরের ন্যায় অন্ধকার একটা স্থান দেখা গেল; কয়েক ধাপ সোপান এই অন্ধ-কূপের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে, আর কিছু দেখা যায় না।

উত্তেজিত প্রতীহার বলিল—'এ তো দেখিতেছি একটা কূট-কক্ষ! আশ্চর্য! কেহ ইহার সন্ধান জানিত না। গুহ, তুমি কি প্রকারে জানিলে?'

গুহ ললাটের ক্ষত চিহ্নটার উপর হাত বুলাইয়া যেন স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু স্মৃতির দ্বার খুলিল না।

প্রতীহার বলিল—'ভালই হইল। আজ রাত্রে চোরটা এইখানেই থাক, কাল প্রাতে আবার বাহির করিয়া লইয়া যাইব।—কে ভাবিয়াছিল প্রাকারের ভিতরটা ফাঁপা! তাহার ভিতর সুড়ঙ্গ আছে, কূট-কক্ষ আছে! যাহোক, গুহ, একথা তুমি জান আর আমি জানিলাম—আর কেহ জানিতে না পারে—'

প্রতীহারের মস্তকে নানাপ্রকার কল্পনা খেলা করিতেছিল; কে বলিতে পারে, ভূগর্ভস্থ গুপ্ত কক্ষে হয়তো পূর্ববর্তী রাজাদের কত রত্ন—ঐশ্বর্য লুক্কায়িত আছে।

'চোরটা জানিতে পারিল বটে কিন্তু কাল ও শূলে যাইবে, সুতরাং একপ্রকার নিশ্চিন্ত—' মনে মনে এই কথা ভাবিয়া প্রতীহার চিত্রককে সেই অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে ঠেলিয়া দিল, তারপর কবাটে অর্গল লাগাইয়া গুহের সহিত বাহিরে ফিরিয়া আসিল। মুক্ত আকাশের তলে আসিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ পূর্বক প্রতীহার গুহের দিকে ফিরিয়া দেখিল, অশরীরী ছায়ার ন্যায় গুহ কখন নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

* * *

কূট কক্ষের দ্বার বাহির হইতে বন্ধ হইয়া গেলে চিত্রক দেখিল রন্ধ্রহীন অন্ধকারের মধ্যে সে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু কূট কক্ষের বায়ু সম্পূর্ণ নিশ্চল ও বদ্ধ নহে, কোনও অদৃশ্য পথে বায়ু চলাচল হইতেছে—শ্বাস রোধ হইয়া মরিবার ভয় নাই।

চিত্রকের হস্তদ্বয় রজ্জুদ্বারা পশ্চাতে আবদ্ধ ছিল, প্রতীহার খুব দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়াছিল। কিছুক্ষণ চেষ্টা করিবার পর সে বন্ধনের ভিতর হইতে হাত বাহির করিয়া লইল। সৈনিকের বিচিত্র জীবনে এই কৌশলটি সে আয়ত্ত করিয়াছিল।

তারপর অন্ধকারে অতি ধীরে সে সোপান অবতরণ করিতে লাগিল। পাঁচ ছয়টি ধাপ নামিবার পর পদদ্বারা অনুভব করিয়া বুঝিল। সোপান শেষ হইয়া চত্বর আরম্ভ হইয়াছে।

এই চত্বর কতখানি বিস্তৃত তাহা জানিবার কৌতূহল চিত্রকের ছিল না, কূট কক্ষ হইতে পলায়নের পথ থাকা সম্ভব নয়, থাকিলেও এই অন্ধকারে তাহা আবিষ্কার করা অসাধ্য। চিত্রক শেষ সোপানের উপর বসিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল। তাহার মনে হইল সে জীবনের শেষ সোপানে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। তাহার হাসি আসিল। নিয়তির জালে সে ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য! তাহার অকিঞ্চিৎকর জীবনকে সমাপ্তির উপকূলে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য নিয়তির এত উদ্যোগ আয়োজন, এত ষড়যন্ত্র? সে যোদ্ধা, মৃত্যুর সহিত তাহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ। তবে আজ মৃত্যু সিধা পথে তীরের মুখে বা অসির ফলায় না আসিয়া এমন কুটিল পথে আসিল কেন? জ্ঞানের উন্মেষ হইতে নিজের জীবনের কাহিনী তাহার মনে পড়িল। মৃত্যু বহুবার তাহার সম্মুখে আসিয়াছে, আবার হাসিয়া অবজ্ঞাভরে ফিরিয়া গিয়াছে; কিন্তু এত আড়ম্বর করিয়া তো কখনও আসে নাই!

শৈশবের কথা তাহার ভাল করিয়া মনে পড়ে না। যখন তাহার অনুমান পাঁচবৎসর বয়স তখন কোন্ এক নগরে একটা বিকলাঙ্গ লোকের সহিত সে বাস করিত। লোকটা বোধহয় অর্ধ-উন্মাদ ছিল, কখনও তাহাকে প্রহার করিত, কখনও বা আদর করিত। তাহার একটা শাণিত ছুরি ছিল, সেই ছুরি দিয়া সে চিত্রকের দেহ কাটিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিত, আবার জঙ্গল হইতে লতাপাতা আনিয়া সযত্নে বাঁধিয়া সেই ক্ষত আরোগ্য করিত। একদিন হঠাৎ পাগলটা কোথায় চলিয়া গেল, আর ফিরিয়া আসিল না।

অতঃপর কিছুদিনের ঘটনা চিত্রকের মনে নাই, কি করিয়া কোথায় কাহার আশ্রয়ে কৈশোরের সীমান্তে উপনীত হইল তাহা তাহার স্মৃতি হইতে মুছিয়া গিয়াছে।

যৌবনের প্রারম্ভে সে এক যাযাবর বণিক সম্প্রদায়ের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহাদের সংসর্গে কিছু কিছু লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিল। স্বার্থবাহ বণিকেরা উষ্ট্র-পৃষ্ঠে পণ্য লইয়া দেশ দেশান্তরে বিচরণ করিয়া বেড়াইত, এক নগর হইতে অন্য নগরে যাইত। চিত্রক তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া বহু সমৃদ্ধ নগর দেখিয়াছিল। পুরুষপুর মথুরা বারাণসী পাটলিপুত্র তাম্রলিপ্তি উজ্জয়িনী কাঞ্চী—উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথের বিচিত্র শোভাশালিনী নানা নগরীর সহিত চিত্রকের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিয়াছিল।

বণিক সম্প্রদায় ধর্মে জৈন ছিল, তাহারা আমিষ আহার করিত না। অথচ মৎস্য মাংসের প্রতি চিত্রকের একটা প্রকৃতিগত আকর্ষণ ছিল, সে সুযোগ পাইলেই লুকাইয়া পশু মাংস আহার করিত। একদিন সে ধরা পড়িয়া গেল।

বণিক সম্প্রদায় তাহাকে বিদায় করিয়া দিল। চিত্রকের দেশ নাই, আত্মীয় নাই—জগতে সে সম্পূর্ণ একাকী। এই সময় হইতে তাহার যোধ্জীবনের আরম্ভ। তাহার দেহ স্বভাবতই বলিষ্ঠ, সে সহজে অস্ত্রচালনা করিতে শিখিল। জগতে যাহার কেহ নাই সে আত্মনির্ভর হইতে শেখে, চিত্রক বুদ্ধি ও বাহুবল সম্বল করিয়া জীবনযুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

আর্যাবর্তে তখন সর্বত্রই যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছে। চিত্রক যখন যে-পক্ষে পাইল যুদ্ধ করিল; কোনও রাষ্ট্রের প্রতি তাহার মমত্ব নাই, যেখানে অর্থলাভের সম্ভাবনা দেখিল সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইল। এক পক্ষের পরাজয়ে যুদ্ধ থামিয়া গেলে আবার নূতন যুদ্ধের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এইভাবে তাহার জীবনের শেষ দশবর্ষ কাটিয়াছে। সৌবীর দেশে একটা অন্তঃকলহজাত ক্ষুদ্র যুদ্ধ মিটিয়া গেলে সে আবার ভাগ্য অন্বেষণে বাহির হইয়াছিল। সৌবীর যুদ্ধে সে বিশেষ লাভবান হইতে পারে নাই, উপরন্তু তাহার অশ্বটি মরিয়াছিল। সেখান হইতে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে সে গান্ধার অঞ্চলে সমর-সম্ভাবনার জনশ্রুতি শুনিয়া সেই পথে যাত্রা করিয়াছিল। গান্ধারের পথ কিন্তু সরল নয়; গিরি-সঙ্কট-কুটিল অজ্ঞাত দেশের পাকচক্রে পথ হারাইয়া অবশেষে নিঃস্ব অবস্থায় সে বিটক রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। তারপর সুগোপার জলসত্র হইতে আজিকার এই ঘটনাবহুল দিবসটি বিসর্পিল গতিতে অগ্রসর হইয়া শেষে এই অন্ধকার কূটকক্ষে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। মুদিত বক্ষে চিত্রক নিজ জীবন-কথা চিন্তা করিতেছিল; চিন্তার সূত্র মাঝে মাঝে ছিন্ন হইয়া যাইতেছিল, আবার যুক্ত হইয়া আপন পথে চলিতেছিল। ক্লান্ত দেহ যতই নিদ্রার অতলে ডুবিয়া যাইতে চাহিতেছিল, আজিকার বহু ঘটনাবিদ্ধ মন ততই সচেতন থাকিবার চেষ্টা করিতেছিল।

নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যে এইরূপ দ্বন্দ্ব চলিতেছে, এমন সময় চিত্রকের চেতনা সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল কে যেন অতি লঘু করস্পর্শে তাহার মুখে হাত বুলাইয়া দিল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে সে কাহাকেও দেখিতে পাইল না; প্রথমে মনে হইল হয়তো চর্মচটিকার পাখার স্পর্শ; ইহারা সূচীভেদ্য অন্ধকারে নিঃশব্দে উড়িয়া বেড়ায়, স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা বাধাবন্ধ অনুভব করিয়া গতি পরিবর্তন করিতে পারে। হয়তো চর্মচটিকাই হইবে। কিন্তু যদি চর্মচটিকা না হয়? যদি জীবন্ত কোনও প্রাণীই না হয়? চিত্রকের মেরুযষ্টির ভিতর দিয়া একটা শিহরণ বহিয়া গেল। সে অন্ধকারে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সতর্কভাবে বসিয়া রহিল। আবার তাহার মুখের উপর লঘু করাঙ্গুলির স্পর্শ হইল, যেন কেহ অঙ্গুলির দ্বারা তাহার মুখাবয়ব অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার গণ্ডে তীক্ষ্ণ নখের আঁচড় লাগিল। চিত্রক প্রস্তুত ছিল, সে ক্ষিপ্র হস্ত সঞ্চালনে অদৃশ্য স্পর্শকারীকে ধরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুই ধরিতে পারিল না। যে স্পর্শ করিয়াছিল সে সরিয়া গিয়াছে। চিত্রক তখন উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'কে? কে তুমি?'

কয়েক মুহূর্ত পরে তাহার সম্মুখের অন্ধকারে গভীর নিশ্বাস পতনের শব্দ হইল। চিত্রকের সর্বাঙ্গের রোম কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে কম্পিতস্বরে বলিল—'কে তুমি? যদি মানুষ হও উত্তর দাও।' কিছুক্ষণ নীরব। তারপর অদূরে অস্ফুট শব্দ হইতে লাগিল। চিত্রক উৎকর্ণ হইয়া শুনিল। মানুষের কণ্ঠস্বরই বটে, কিন্তু শব্দগুলির কোনও অর্থ হয় না। যেন স্বপ্নের ঘোরে কেহ অস্পষ্ট অর্থহীন আকুতি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। মনুষ্য বুঝিয়া চিত্রক আবার স্বস্থ হইল। সে বলিল—'শব্দ শুনিয়া মনে হইতেছে তুমি মানুষ। স্পষ্ট করিয়া বল, কে তুমি।'

দীর্ঘকাল আর কোনও শব্দ নাই। চিত্রকের মনে হইল, সে বুঝি কল্পনায় শব্দ শুনিয়াছিল, সমস্তই এই কুহক-ময় অন্ধকারের ছলনা। তাহার স্নায়ুপেশী আবার শক্ত হইতে লাগিল। এ কিরূপ মায়া? অলৌকিক মায়া?

'আমি বন্দিনী……বন্দিনী……'

না, মানুষের কণ্ঠস্বর—ছলনা নয়। কথাগুলি অতি দ্বিধাভরে কথিত হইলেও স্পষ্ট। বক্তা যেন আরও নিকটে আসিয়াছে।

চিত্রক বলিল—'বন্দিনী? তুমি নারী?'

'হাঁ।' 'নিশ্চিন্ত হইলাম। ভাবিয়াছিলাম তুমি প্রেতযোনি।'

'তুমি কে?'

চিত্রক হাসিল—'আমিও বন্দী। তুমি কতদিন বন্দী আছ?

'কতদিন—জানিনা। এখানে দিন রাত্রি নাই, মাস বর্ষ নাই—' কণ্ঠস্বর মিলাইয়া গেল।

চিত্রক বলিল—'তুমি আমার কাছে এস। ভয় নাই, আমি তোমার অনিষ্ট করিব না।'

কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন হইল—'তুমি কি হূণ?'

'না আমি আর্য।'

তখন অদৃশ্য রমণী কাছে আসিয়া চিত্রকের জানুর উপর হাত রাখিল, চিত্রক তাহার হস্ত স্পর্শ করিয়া দেখিল, কঙ্কালসার হস্ত, শীর্ণ অঙ্গুলির প্রান্তে দীর্ঘ নখ। তাহার জানুর উপর হস্তটি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। চিত্রক বলিল—'উপবিষ্ট হও। আমাকে ভয় করিও না, আমিও তোমারই মত অসহায়। মনে হয় দীর্ঘকাল বন্দিনী আছ। তুমি অন্ধকারে দেখিতে পাও?'

'অল্প।'

'তোমার বয়স কত?'

এতক্ষণে রমণী যেন অনেকটা সাহস পাইয়াছে, সে সোপানের উপর উপবেশন করিল; যখন কথা কহিল তখন তাহার কথা আরও স্পষ্ট ও সুসংলগ্ন শুনাইল। যেন সে দীর্ঘকাল কথা না বলিয়া কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, আবার ক্রমশঃ সুসঙ্গত বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইতেছে।

রমণী বলিল—'আমার বয়স কত জানিনা। যখন বন্দিনী হই তখন কুড়ি বছর বয়স ছিল।'

'কে তোমাকে বন্দিনী করিয়াছিল?'

'হূণ।'

'হূণ? কোন হূণ?'

রমণী থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিল—'একটা কদাকার খর্বকায় হূণ। রাজপুরী হূণেরা আক্রমণ করিয়াছিল। আমি ছিলাম রাজপুত্রের ধাত্রী……আমি রাজপুত্রকে স্তন্যপান করাইতেছিলাম এমন সময় হূণেরা রাজ-অবরোধে প্রবেশ করিল……তাহারা রাজপুত্রকে আমার কোল হইতে কাড়িয়া লইয়া তলোয়ারের উপর লোফালুফি করিতে লাগিল……একটা কদাকার হূণ আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিল……'

'সর্বনাশ! এ যে পঁচিশ বছর আগের কথা! তুমি পঁচিশ বছর বন্দিনী আছ?'

'পঁচিশ বছর?……তা জানিনা।……কদাকার হূণটা আমাকে টানিতে টানিতে তোরণের স্তম্ভ গৃহে লইয়া আসিল……নির্জন স্তম্ভগৃহে আমি তাহার হাত ছাড়াইবার অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু……স্তম্ভগৃহের দেয়ালে একটা গুপ্তদ্বার ছিল, কেমন করিয়া খুলিয়া গিয়াছিল……হূণটা আমাকে এই অন্ধকারে ঠেলিয়া দিয়া গুপ্তদ্বার বন্ধ করিয়া দিল—'

'তারপর?'

'তারপর আর জানিনা……সেই অবধি এই রন্ধ্রের মধ্যে আছি। রন্ধ্র বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু বাহির হইবার পথ নাই…… সেই হূণটা মাঝে মাঝে খাদ্য ফেলিয়া দিয়া যায়, তাহাই খাই……হূণটা আমাকে অন্ধকারে দেখিতে পায় না তাই ধরিবার চেষ্টা করে না—'

চিত্রক পূর্বে মোঙের কাহিনীর কিছু অংশ শুনিয়াছিল, এখন রমণীর বৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে পঁচিশ বৎসর পূর্বের হূণ উৎপাতের চিত্র যেন অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল। রমণীর জন্য তাহার অন্তরে সমবেদনার উদয় হইল, সে অন্ধকারে তাহার হস্তে হস্ত রাখিয়া বলিল—'হতভাগিনী! তোমার স্বজন কি কেহ ছিল?'

রমণী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

'স্বামী ছিল—একটি কন্যা ছিল—'

'হয়তো তাহারা বাঁচিয়া আছে। কাল প্রাতে আমি বাহির হইব। যদি প্রাণে বাঁচি তোমার উদ্ধারের চেষ্টা করিব। তোমার নাম কি?'

'পৃথা।'

'ভাল, পৃথা, আমি এবার একটু নিদ্রা দিব, রাত্রি বোধ হয় প্রভাত হইতে চলিল। কাল প্রাতে সম্ভবত শূলেই চড়িতে হইবে; কিন্তু একটা উপায় চিন্তা করিয়াছি, হয়তো রক্ষা পাইতেও পারি।'

'তুমি কে, তাহা তো বলিলে না।'

'আমি চোর। তুমি কি রাত্রে ঘুমাও না?'

'কখন্ ঘুমাই কখন্ জাগিয়া থাকি বুঝিতে পারি না। তুমি ঘুমাও, আমি জাগিয়া থাকিব।' (ক্রমশঃ)

বৈষ্ণব সাধনার ইতিহাসে মহাপুরুষ শঙ্করদেব

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

উপনিষদের ঋষির চিন্তায় জেগেছিল যে, এই পরিবর্ত্তনশীল জগত রূপ থেকে রূপান্তরে যে নিত্য পরিবর্ত্তন হচ্চে তার মধ্যে চলছে শক্তির ও আনন্দের লীলা। সৃষ্টির আদিম যুগ থেকে বিস্ময়ে তাই তার গান জেগেছিল। সে চেয়ে থাকতো আকাশের দিকে নির্নিমেষ নয়নে "উপোষিতাভ্যাম্ ইব লোচনাভ্যাম্"। সে সবিতাকে প্রণাম জানাতো অকুণ্ঠিত চিত্তে, গ্রহনক্ষত্র তরুলতা মানুষের মধ্যে দেখতো সৃষ্টির স্পন্দন বলতো "অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষু পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্, জ্যোক্ পশ্যেম সূর্য্যমুচ্চরন্তম অনুমতে মৃড়য়ঃ ন স্বস্তি।" "প্রাণের নেতা আমাকে চোখ দাও, আমি দেখব—এমন দেখা যাতে 'নয়ন ন তিরপিত ভেল'। আমি উচ্চরন্ত সূর্য্যকে দেখব আমাকে স্বস্তি দিয়ো। সে জিজ্ঞাসা করেছিল "কেন প্রাণ প্রথম প্রৈতি যুক্তঃ"।

শক্তির লীলা প্রাণেরই স্পন্দন, আনন্দেরই রূপ। কখনো সে সৃজন করে, কখনো সে ধারণ করে, কখনো সে লয় পাইয়ে দেয়। যে শক্তি ধারণ করে আমরা তাকেই বলি বৈষ্ণবী শক্তি, তাকেই আমরা দিই প্রাধান্য। নটরাজের পদাঘাতে ধূর্জ্জটির জটিল জটাজালের মধ্যে যে তাণ্ডবী ধ্বংসলীলা আছে তা আমাদের অভিভূত ভীত ত্রস্ত করে, কিন্তু আনন্দ দেয় না। মৃত্যু ধাবতি পঞ্চমঃ—শুধু বহিঃপ্রকৃতিতে নয়, অন্তরের অন্তরতম মণিপুরেও। তাঁর ভয়ে যে সূর্য্য তাপ দিচ্ছে, ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ অগ্নি সবাই কাজ করে যাচ্ছে। পৃথিবীর এক পিঠে যেমন অন্ধকার, অন্যদিকে তেমন আলো, একদিকে যেমন দুঃখ, অন্যদিকে তেমন আনন্দ। দুঃখের ঘনীভূত রূপই যে আনন্দ, যে আনন্দ পরম ও চরম রসঘন "রসো বৈ সঃ রসং হেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি"। যদি মানুষের মনে এই বৈষ্ণবী শক্তির ক্রিয়া না থাকতো কেই বা বাঁচতো? "কো হেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" তাই ব্রহ্মানন্দবল্লীতে তৈত্তিরীয়োপনিষদে ঋষি বল্লেন 'এষ হেবানন্দয়তি'—ইনিই জীবকে আনন্দ দান করেন। তাই বৈষ্ণবী শক্তিকে বলা হলো অনন্তবীর্য্যা বিশ্বের বীজ, পরমা মায়া। এই শক্তির সাধনাই বৈষ্ণব সাধনার ইতিহাস।

ঋগ্বেদের বিষ্ণু সূক্তে দেখি এই শক্তি বিশ্বজন্যা "ত্বং বিষ্ণো সুমতিং বিশ্বজন্যা"। সায়নাচার্য্যের টীকায় তিনি সকলের উপাস্য ও জ্যোতির্ম্ময়। তখনও তিনি প্রিয় নন্ প্রেমিক নন্—মহান প্রভূবৈঃ পুরুষঃ, 'মহন্তুয়ং ব্রজং সমুত্তম'। কিন্তু এই মহান্ পুরুষই কি ভগবান্। ভগবান্ আমরা কাকে বলি—যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যময়—তিনি কি শুধু শব্দ স্পর্শ রসগুণগন্ধময়, তাঁর মধ্যে আছে বীর্য্য ও যশ, শ্রী ও হ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, তাঁর চোখ নেই তবু তিনি দেখেন, কান নেই শোনেন, পা নেই চলেন, সব কিছু নেতি ও ইতির সমন্বয় তিনি। তিনি অকাম সকাম, আপ্তকাম, আত্মারাম, সত্য, শিব ও সুন্দর। তাঁকে আমরা কল্পনা করেছি যে তিনি সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপী, শিবতর, শিবতম 'ঈশাবাস্য' তিনি নারায়ণ—সমষ্টিগত নরের আশ্রয়। কিন্তু মানুষের সবচেয়ে বড় আশ্রয়ই হচ্চে প্রেমের আশ্রয়, ভালবাসার আশ্রয়। তাই মানুষ সবচেয়ে পছন্দ করে তাঁকে প্রেমের ঠাকুররূপে। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ত আছেই, কিন্তু মাধুর্য্যই তার চরম বিকাশ। তাই মানুষ ধরা দেয় সেই নারায়ণী শক্তির কাছে। এর পূর্ণ প্রকাশ দেখি শ্রীমদ্ভাগবতে। কত ভক্ত কত দিক দিয়ে সেখানে প্রকাশ পেয়েছে—সূত, নারদ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, ঋষভ, পৃথু, কপিল, বিদুর, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, শুকদেব, রন্তিদেব, অম্বরীষ, ভরত, অক্রূর, অবধূত, গোপীরা, ব্রাহ্মণপত্নীরা, দ্রৌপদী, কুন্তী, দেবহূতি, যশোদা, দেবকী, রুক্মিণী, সত্যভামা এবং সর্ব্বোপরি শ্রীরাধা বা মহাভাব।

রাগানুরাগমার্গে একেই বলা হলো—

'সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং
হৃষিকেন হৃষিকেশ সর্বেন ভক্তিরুচ্যতে।

সেখানে "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা নেই" "সব সমর্পিয়া একমন হইয়া" নিশ্চিন্ত পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন। নবরসের প্রথম রস শৃঙ্গার এবং শেষ রস শান্তম্। শান্তম্‌এর অবস্থা হচ্চে মন বাক্ চিত্ত যেখানে নির্ব্বাপিত, স্থির, অচঞ্চল, উপাধিবিহীন। শান্তম্‌এর মধ্যে লীলা নেই, গতির ছন্দ নেই, পাওয়ার আবেগ নেই, চাওয়ার বেগ নেই। কিন্তু রাগানুরাগে আছে শুধু উন্মুখী ভক্তের মদীয়া রতি নয়, লীলাপিয়াসী ভগবানেরও তদীয়া রতি—

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে
তাইতো আমি এসেছি এ ভবে।

বৈষ্ণব সাধনার ইতিহাসে এই লীলাই হচ্চে সত্য। এই আগন্তুক রসই নিত্যরস, নিরাকার নয় চিদাকার তাই—

কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার সহায়।

তাই 'মানুষীম্ তনুমাশ্রিতম্ হয়ে "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" দেখা দিলেন। তাই বৈষ্ণব কবি গাইলেন—

কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এই রাগানুরাগ তথ্য বা দার্শনিক তত্ত্ব সমস্ত বৈষ্ণবাচার্য্যরা ঠিক একভঙ্গীতেই গ্রহণ করেন নাই—মূল সত্য একই। কিন্তু আচার্য্য ভেদে দৃষ্টি ভেদে ও দর্শনবিভাগ ভেদে তাদের বিচারে কিছুটা প্রভেদ আছে। প্রাচীনকাল হইতেই বিষ্ণু ও কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া এই বৈষ্ণব দর্শন গড়িয়া উঠিয়া বিশাল বটক্রমে পরিণত

হইয়াছে। ঋগ্বেদে আমরা বিষ্ণু সূক্তে বিষ্ণুর উল্লেখ পাইয়াছি। উপনিষদেও আমরা বিষ্ণুর উল্লেখ পাই। তৈত্তিরীয়োপনিষদে দেখি মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা ইন্দ্র বৃহস্পতির সঙ্গে বিস্তীর্ণ পাদক্ষেপকারী বিষ্ণুও আমাদের কল্যাণকারী হউন 'শংনো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ' এই প্রার্থনা আছে প্রথম অনুবাকে।

সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন দেখিয়েছেন—বাসুদেব কৃষ্ণের সর্ব্বপ্রাচীন উল্লেখ রয়েছে ছান্দোগ্য উপনিষদে (খৃঃ পূঃ সপ্তম অষ্টম শতাব্দী)। মথুরা নগরীতে যাদব জাতির অন্তর্গত সাত্বত বৃষ্ণিকুলে তাঁর জন্ম। ঘোর আঙ্গিরস তাঁর গুরু—পুরুষযজ্ঞবিদ্যা তিনি দান করিতেছেন। জৈন উত্তরাধ্যয়ন সূত্র, মহাভারত ও পুরাণ অনুসারে তাঁর পিতার নাম বসুদেব। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণ একজন মানুষ। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে (খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী) তিনি ভক্তির পাত্র ক্ষত্রিয়প্রধান। পাতঞ্জল মহাভাষ্যে (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) তিনি দেবত্ব লাভ করেছেন। বেসনগর গরুড়স্তম্ভে হেলিও ডোরসের সময় তিনি 'দেবদেব' হইয়াছেন। মহাভারতে শিশুপাল, জয়দ্রথ ও কংস তাঁকে স্বীকারই করেন নি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি বলিয়াই খ্যাতি পাইয়া আসিয়াছে। যুগে যুগে ইতিহাসের পাতায় পাতায় জ্ঞানকর্ম্মভক্তিযোগের এই অপূর্ব্ব ব্যাখ্যান শুধু শ্রান্ত তপ্ত দুর্ব্বলকে 'ক্লৈব্যং মাস্ম' শিক্ষা দেয় নাই—অনপেক্ষ প্রেমসাধনেরও শিক্ষা দিয়াছে—"মামেকং শরণং ব্রজ"। ভারতবর্ষের ইতিহাসে গীতার সক্রিয় প্রভাব আজও পূর্ণমাত্রায় প্রকট।

সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকে মহাকবি অশ্বঘোষের রচনাতে, নাগার্জ্জুনের লেখায় কালিদাসের রঘুবংশে, বাণভট্টের কাদম্বরীতে, বামকণ্ঠের সর্ব্বতোভদ্রে আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্যের ধ্বন্যালোকে, কাশ্মীরের গীতার ব্যাখ্যানেও এই বৈষ্ণব সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

তার পর এলেন আচার্য্যের দল—নম্বুদ্রি শঙ্করাচার্য্য, যামুনাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, নিম্বকাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, জ্ঞানেশ্বর, বল্লভাচার্য্য দক্ষিণে সারযোগী ও আলবার সম্প্রদায় শ্রীধরস্বামী নীলকণ্ঠসূরি প্রভৃতি টীকাকারেরা। দেশ তখন বৌদ্ধপ্লাবন ও বিকৃত তন্ত্রাচারে পূর্ণ। এদের মধ্যে কেউ বৈদান্তিক, কেউ দ্বৈতবাদী, কেউ অদ্বৈতবাদী, কেউ ভেদাভেদবাদী কেউ বা অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তবাদী। 'পঞ্চরাত্র' বা 'সাত্বত' আগম নামক সুপ্রাচীন বৈষ্ণব আগমের উল্লেখ মহাভারতাদি গ্রন্থে পাওয়া যায় এবং এই আগম প্রতিপাদিত বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহবাদ ভগবান বাদরায়ণ খণ্ডন করলেও রামানুজ বা অন্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তার যুক্তিযুক্ততা অস্বীকার করেন নাই। প্রাচীনকালে শাণ্ডিল্যবিদ্যা বা ভক্তিযোগেরও উল্লেখ আছে। যদিও বিজয় সেন ও বল্লাল সেনের উপাধি ছিল অরিরাজ বৃষ্যশঙ্কর, অরিরাজ নিঃশঙ্ক শঙ্কর, লক্ষ্মণ সেন ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তাঁরই আশ্রয়ে পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী

শ্রীজয়দেব ভণিতমিদমুদয়তি হরিচরণ স্মৃতিসারম
সরস-বসন্ত-সময়-বন-বর্ণনমনুগতমদনবিকারম্।

ভারতবর্ষে বৈষ্ণব সাধনার ইতিহাসে কবি জয়দেব নতুন যুগ পত্তন করেছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে অবলম্বন করে ভক্ত ও ভগবানের নতুন লীলাবাদ ও রসাস্বাদ বাংলা দেশে নতুন রূপ গ্রহণ করল। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীপদ্মপুরাণ, শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে বহুদিন হতেই এই রসগাথা গেয় হইয়াছে, কিন্তু বাঙালী কবি জয়দেবই একে নূতন রসসিঞ্চিত করে বাংলা দেশের অনুকূল পবনে ভাসিয়ে দিলেন। তখন বৌদ্ধতান্ত্রিকবাদের নিশ্চল বীভৎস আচার-বিচার বাহ্যানুষ্ঠান অভিচারে প্রাণের স্বয় স্রোতস্বতী অবরুদ্ধ, তখন সমাজজীবনে বীরাচার ও পশ্বাচারের বদলে দরকার হইয়াছিল "মধুকর কোমলকান্ত পদাবলী"র। বীরভূমে অজয়ের তীরে কেন্দুবিল্বের কবিকুঞ্জে যে বাঁশী বাজিয়াছিল

সঞ্চরদধর সুধা-মধুর ধ্বনি মুখরিত মোহন বংশম
বলিত দৃগঞ্চল চঞ্চল মৌলিক কপোল বিলোলাবতংসম্

সেই বাঁশরী আবার তিনশত বৎসর পরে চণ্ডীদাসের অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছিল—

আকুল শরীর মোর বেআকুল মন
বাঁশীর শবদে মোর আউলাইলো বান্ধন

প্রায় সেই সময়েই মিথিলায় কবি বিদ্যাপতির আবির্ভাব। চণ্ডীদাস কজন ছিলেন, বড়ু, দ্বিজ বা দীন, তিনি ছাতনায় ছিলেন, না নান্নুরে ছিলেন, বাঁকুড়া তাহাকে পাইবে, না বীরভূম—চণ্ডীদাস পদাবলীর রস-বিচারে এসব অগ্রাহ্য। যিনি বা যাঁরাই লিখুন, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও পদাবলী বাংলার অপূর্ব্ব জিনিষ। এই পরিবেশের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইলেন।

প্রেমবন্যা নিতাই হইতে অদ্বৈত তরঙ্গ তাতে
চৈতন্য বাতাসে উথলিল
আকাশে লাগিল ঢেউ স্বর্গে না এড়ায় কেউ
সপ্ত পাতাল ভেদি গেল
আর চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরমানন্দ।

বাংলা দেশে যখন 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়' প্রায় ঠিক সেই সময়ে আসামে মহাপুরুষ শঙ্করদেবের আবির্ভাব। ভারতের এই প্রত্যন্তিক প্রদেশের চলোর্ম্মি-ইতিহাস ও কৃষ্টি-সংঘর্ষের বিচার করিলে দেখা যায় যে প্রাচীন আর্য্য সভ্যতা এখানে আগন্তুক। তাহার পূর্ব্বে অষ্ট্রিক, নিগ্রোবটু, কিরাত, বোড়ো, তিব্বতীয় ও দ্রাবিড় মঙ্গোলিয়ানরা এখানে আসিয়াছে। আলৌহিত্য ব্রহ্মপুত্রের এপারে ওপারে মিকির, কুকি, খাসি জয়ন্তীয়ার পার্ব্বত্য জাতিরা পরবর্ত্তীকালে 'সান্' জাতির অহম শাখার অভিযান, শ্রীহট্ট কাছারে মগধগৌড় সভ্যতার ঢেউ, প্রাগজ্যোতিষ কামরূপে তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, আসাম সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিচিত্র "মোহসইকে" পরিণত করিয়াছে। অর্দ্ধসভ্য ও অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিদের কথা ছাড়িয়া দিলে ঐতিহাসিক যুগে আসামে দুইটি ধর্ম্মের

প্রচলন বেশী দেখা যায়—একটি তন্ত্রবাদ ও একটি বৈষ্ণববাদ—পরবর্ত্তী যুগে উত্তর আসামে শিবপুজারও বিশেষ প্রচলন হইয়াছিল। যদিও শ্রীহট্ট ও মণিপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, নিজ আসামে মহাপুরুষ শঙ্করদেব মাধবদেবের প্রচলিত বৈষ্ণববাদই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

মহাপুরুষীয় বৈষ্ণববাদ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এই কথাটা বিশেষ করিয়া মনে রাখা প্রয়োজন যে মহাপুরুষ শঙ্করদেবের ধর্ম্মবিজয় তখনকার দিনের বিকৃত তন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযান। প্রধানতঃ আচার্য্য রামানুজের বৈষ্ণববাদের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করিলেন। সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের কথা যে, এই মহাপুরুষ ব্রাহ্মণ না হইয়াও নিজের চরিত্র, বিদ্যা, বুদ্ধি ও ভগবদ্ভক্তির প্রেরণায় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর সব জাতির গুরু হইলেন।

কামরূপ কামাখ্যায় তন্ত্রের প্রভাব সম্বন্ধে বলিতে গেলে একটি বিরাট প্রবন্ধের প্রয়োজন। কেহ কেহ বলেন আসামেই তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্ভব। যোগিনীতন্ত্র ও শক্তিসঙ্গমে কামরূপের বহু উল্লেখ আছে। বৌদ্ধতান্ত্রিক বজ্রযোগিনী সাধনায় অর্ঘ্যদানের পদ্ধতিতে কামাখ্যা ও শিরিহট্টের নাম আছে। সাধনমালা গাইকোয়ার সিরিজ দ্বিতীয় ভাগে ইহা বর্ণিত আছে, শ্রদ্ধেয় রাজমোহন নাথ তাহা দেখাইয়াছেন। তন্ত্রসারে আছে "মূলাধারে কামরূপং"। লামা তারানাথের গ্রন্থ হইতেও দেখা যায় যে, মগধ গৌড় হইতে বিতাড়িত বহু বৌদ্ধতান্ত্রিক সন্ন্যাসী পুর্ব্বাঞ্চলে কুকীদের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। বহু প্রাচীন কাল হইতেই প্রাগজ্যোতিষ ও কামরূপের নাম আমরা শুনিয়া আসিতেছি। মহাভারত ও পুরাণের কথা ছাড়িয়া দিলেও সপ্তম শতাব্দীর ভাস্করবর্ম্মার নিধানপুর তাম্রশাসনে প্রাগজ্যোতিষাধিপতি নরক ভগদত্ত হইতে তাঁর বংশের উৎপত্তি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার তিনশত বৎসর পরে ধর্ম্মপাল বর্ম্মদেবের প্রথম তাম্রশাসনেও এই লিপি আছে। এই তাম্রশাসনে প্রমাণ করা হইয়াছে, তাঁকে যিনি আদিদেব, অর্দ্ধযুবতীশ্বর, যাঁর গলার একদিকে দোলে লীলাপদ্ম, অন্যদিকে উদ্যতফণা ফণী, যাঁর বর বপুর একদিক যুবতীসুলভ স্তনভারনম্র আর একদিক ভস্মাচ্ছাদিত, যিনি শৃঙ্গার ও রৌদ্ররসের প্রতীক। বাণ অনিরুদ্ধ উষার কাহিনী, উলুপী বভ্রুবাহন চিত্রাঙ্গদার কথাও আমরা পড়িয়াছি। মোটের উপর মনে হয় বহু প্রাচীন কাল হইতেই বৈদিক আর্য্যধর্ম্ম আর্য্যউপনিবেশের সঙ্গে সঙ্গে প্রাগজ্যোতিষ ও কামরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ভাস্কর বর্ম্মা মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক। শ্রীপদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মতে কামরূপের একটি গ্রামেই পঞ্চম শতাব্দীতে দুইশত ব্রাহ্মণ বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। শালস্তম্ভ, বংশের রাজারা "কামেশ্বর মহাগৌরী"র উপাসক ছিলেন। কামাখ্যা ও হাটকেশ্বরের মন্দির তারাই নির্ম্মাণ করেন। ঐ সব মন্দিরে দেবদাসীদের উৎসর্গ করা হইত। শঙ্করবিজয় গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে শঙ্করাচার্য্য কামরূপে আসিলে অভিনবগুপ্ত তাঁকে তান্ত্রিক অভিচার ক্রিয়ার দ্বারা অসুস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মীননাথ প্রমুখ কাপালিক সিদ্ধদের কথাও কামরূপে শোনা যায়। সহজিয়া সাধনও প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। শ্রীশঙ্করদেবের চরিতকার দ্বিজ রামানন্দ বলেন যে সেই সময় সারা কামরূপ বিকৃত তন্ত্রাচার ও ধর্ম্মের নামে ব্যভিচারে পূর্ণ ছিল। "রতিখোয়া"র দলের কাহিনী সেদিন পর্য্যন্তও শোনা যাইত। কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি এই সব কাহিনীর উদ্ধার করিয়াছেন। নগ্না যুবতীকে সামনে রাখিয়া মদ্য মাংস ও নানা উপচারের মধ্যে নির্জ্জনে গভীর রাত্রে এই সব তথাকথিত সাধনা চলিত। কামরূপে "ভোগী" সম্প্রদায় বলিয়া আর একটি বিকৃত আচারের উদ্ভব হয়। এই সব লোকেরা দেবীর নিকট নিজেদের আত্মবলি দিবার সঙ্কল্প করিত এবং তাহারা এক বৎসরের মধ্যে যথেচ্ছ ভোগ করিবার অধিকার পাইত। যোগিনী-সাধন, দূতীযাগ, মদ্যমাংস মৈথুনের ব্যবস্থায় আগম নিগম যামলের পবিত্র শিবোক্ত ধর্ম্ম বিকৃত পশ্বাচারে পরিণত হয়। এই পরিবেশের মধ্যেই মহাপুরুষ শঙ্করদেবের আবির্ভাব। শঙ্করদেব শিরোমণি ভুঁইয়া চণ্ডীবরের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি অন্যান্য সকলের মত সংসার ধর্ম্ম ও গার্হস্থ্য জীবন যাপন করেন। পরে তিনি দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া ভারতের তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করেন। সন্তপ্রধান ভক্ত কবীরের সঙ্গে তার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। ক্রমশঃ তিনি আচার্য্য রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। কেহ কেহ বলেন যে তিনি অদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন ও তাহার নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন, পরে মতভেদ হওয়ায় চলিয়া আসেন। তিনি গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত এই দুই গ্রন্থকেই প্রাধান্য দিতেন। আত্মিক উন্নতির জন্য সংসার ত্যাগ বা সন্ন্যাস গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন তিনি মনে করিতেন না। সংসারের মধ্যে থাকিয়াও বিষয় বিষ-বিকারজীর্ণ না হইয়াও ভগবদ্প্রেম লাভ করা যায়, তিনি মনে করিতেন।

উপরিবা (উপেক্ষা করিবে না) শাস্ত্রর নীতি   হইব সমাবস্থ অতি
সমস্ত প্রাণীক কর দয়া।
সত্য শৌচ ধর্ম্ম ধরি   মনত জপবা হরি
তেবে না বান্ধিবে বিষ্ণু মায়া।

ইহা ছিল তাহার শিষ্য দামোদরদেবের বাণী। গুরুর অনুবৃত্তি করিয়া তিনি আরো বলিয়াছিলেন—

তেওঁ পরম বৈষ্ণবী দুর্গাদেবীক পূজা করাতো কাকো বাধা না দিছিল, কিন্তু জীবহিংসা করি তেওঁক পূজা করিব খুঁজিলে বর আপত্তি করিছিল।

মহাপুরুষ শঙ্করদেব রামানুজের মত ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে সীমা টানিয়া দিয়াছিলেন, সেই জন্য তার মধ্যে দাস্য ভাবই প্রধান ছিল।

কৃষ্ণর কিঙ্করে কহে শঙ্কর

তিনি কিন্তু মূর্ত্তি পূজার পক্ষপাতী ছিলেন না। গ্রামে গ্রামে "নামঘর" ও "নামঘোষা"র (কীর্ত্তন) প্রবর্ত্তন হইল। প্রধান প্রধান সত্র বা পাট বাটীতে "শ্রীমদ্ভাগবত" গ্রন্থসাহেবের ন্যায় পূজিত হইতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীধর স্বামীর টীকার অবলম্বনে অনুবাদ করেন। নানা নাটকও তিনি লেখেন।

কবারে বিষয়ত বিবকতি।
বৃক্ষত বাঢ়িবে প্রেম ভকতি ॥
ওপজাইবে অতি বৈষ্ণবী জ্ঞান।
মায়াক করিবে দহি নির্ব্যান ॥
চৈতন্য মূর্ত্তি পূর্ণানন্দ হরি।
থৈবেক হেন্তে এরে একে করি।
তেবে সে মন হইবে উপশান্ত।
কহিলো পরম তত্ত্ব একান্ত ॥
নাম বিনে নাহি কলিত গতি।
কলির লোক হইবে পাপমতি ॥

তাঁর প্রধান শিষ্য মাধবদেব; ১১৮ বৎসর বয়সে শঙ্করদেবের মৃত্যুর পর তিনিই এই সম্প্রদায়ের নেতা হন। রত্নাকর কণ্ডলী, কানাই দামোদরদেব প্রভৃতি ব্রাহ্মণরাও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় বারের তীর্থযাত্রার সময় শ্রীধাম পুরীতে শঙ্করদেবের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ ঘটে। দুইজনের মধ্যে কোন কথা হইয়াছিল কি না তাহা জানা নেই। জনশ্রুতি যে মহাপ্রভু কমণ্ডলু হইতে জল ঢালিয়া জানাইয়া দেন যে অব্যভিচারিণী শক্তি জলের স্রোতের মত—সে সাগরে গিয়াই মেশে। মাধবদেবের নামঘোষা বিখ্যাত।

"যে মুক্তাবপি নিস্পৃহা প্রতিপদ প্রোন্মিলৎ দানং দদে
যামস্থায় সমস্ত মস্তকমণিং কুর্ব্বন্ত যং সেবসে তান্
ভক্তাঞ্চ পিহঞ্চ ভক্তিমাপতং ভক্ত প্রিয়ং শ্রীহরিং বন্দে
সততমর্থয়ে অনুদিবসং নিত্যং শরণ্যং ভজেম।"

"মুক্তিত নিস্পৃহ থিঠো, সেহি ভকতক নমো
রসময়ী মাগোহো ভকতি
সমস্ত মস্তকমণি নিজ ভকতর বশ্য
ভজো হেন দেব যদুপতি।

মুক্তি কাকে বলছেন তাঁরা—সকল প্রকার বন্ধনর পরা এরাই বিমল আনন্দত থাকাই হৈচে মুক্তি। আর নিস্পৃহ কি—হেঁপাহ ন থকা অর্থাৎ বাধা এরাই বিমলআনন্দ থাকি বলেও থি হেঁপাহ ন করি কর্ত্তব্য কামত আবদ্ধ থাকা।

নিছক কবি হিসাবেও এই মহাপুরুষরা বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের চেয়ে কিছু কম ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বলিতেছেন—

পদ্মপত্র সম আয়ত লোচন
ভ্রুব যুগে করে কান্তি।
নাসা তিলফুল অধর রাতুল
দশন মুকুতা পান্তি

মনে হয় যেন পদাবলী পড়িতেছি।

শিরত কিরীটি করে কঙ্কণ কেয়ুর
মকর কুণ্ডল স্থলে পারত নূপুর
শ্যামল শরীরে পীত বস্ত্র করে কান্তি
হিয়াত প্রকাশে অতি শ্রীবৎসর পান্তি।

মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন যে "আচণ্ডালে ধরি দিবি কোল" এঁরা বলছেন -

চণ্ডালে করিছ হরি কীর্ত্তন
বুলিয়া নিন্দে থিটো অজ্ঞজন
তাক সম্ভাষণ থি জনে করে
আজন্মর পুণ্য তেখনে হরে
চণ্ডালো হরিনাম লয়ে মাত্র
করিবে উচিত যজ্ঞর পাত্র।

সাহিত্য সঙ্গীতে, দার্শনিক বিচারে, সামাজিক উদারতায় মহাপুরুষ শঙ্করদেব, মাধবদেব, দামোদরদেব ও তাঁদের শিষ্য সম্প্রদায়রা তখনকার দিনে আসামে এক প্লাবন আনিয়াছিলেন সে কথা অস্বীকার করা যায় না। ভক্তিরত্নাবলী, ভক্তিরত্নাকর, কান্তিমালা টীকা, বালীয়দমন প্রভৃতি নাটক, বিদগ্ধমাধবের অনুবাদ, সঙ্গীত পারিজাত, ব্রজবুলি ভাষায় বড় গীত, চারি অঙ্গ, ষড় অবয়বের ব্যাখ্যা, একেশ্বরবাদ, নামকীর্ত্তন, ব্রাহ্মণ শূদ্র সব নির্ব্বিশেষে একত্র নামগান—তখনকার বিকৃত তন্ত্রাচারের বিরুদ্ধে শুধু বিপ্লব আনিয়াছিল তা নয়, সমাজে একটা সুসংহত দার্শনিক মতবাদেরও সৃষ্টি করিয়াছিল, সমাজে সকলের স্থান স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। যে কেউ "শরণ" লইত তাহাদের বলা হইত "শরণীয়া"। অবশ্য তখনকার দিনে এইরূপ উদার মতবাদের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দেওয়ার জন্য লোকের অভাব ছিল না। রাজসভাতেও শঙ্করদেব লাঞ্ছিত হন ও তিনি দেশত্যাগ করিয়া কোচনৃপতি নরনারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শঙ্করদেবের মৃত্যুর পর মাধবদেবই গুরুর স্থান অধিকার করেন। সঙ্গে ছিলেন নারায়ণঠাকুর ও দামোদরদেব। দামোদরদেবের এক শিষ্য ছিলেন নাম ভট্টদেব। শঙ্করদেব ব্রহ্ম ও জগৎ দুইই সত্য স্বীকার করিতেন, কিন্তু জীব ও শিবের মধ্যে সীমা টানিয়া দিয়াছিলেন। তিনি মধুর বা শৃঙ্গার ভাব গ্রহণ করেন নাই। তাই তাঁর চিন্তায়, সাধনায়, সাহিত্যে শ্রীরাধা বা মহাভাবের সাক্ষাৎ মেলে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদের সঙ্গে এই তাঁর প্রধান বিভেদ। বিষ্ণুর অবতার ছাড়া তিনি অন্য কোন দেবদেবী মানেন নি—মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ও বিশেষ স্বপক্ষে তিনি ছিলেন না। তিনি বলিতেন—ব্রহ্মই হচ্ছে পুরুষোত্তম—ভক্তিযোগ দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়। তিনি নির্গুণ অথচ সগুণ। ভট্টদেব ও দামোদরদেবও সেই কথাই বলিতেন কিন্তু তাঁরা নামকীর্ত্তনের উপরই বিশেষ জোর দিতেন। ভট্টদেব তন্ত্র ও পুরাণবর্ণিত ও শাস্ত্রোক্ত পাঠপূজাপদ্ধতি পুনপ্রচলন করেন এবং বিষ্ণু ও কৃষ্ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মহাপুরুষিয়া ও দামোদরিয়াদের মধ্যে এই লইয়া বিভেদের সৃষ্টি হয় এবং দামোদরিয়াদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহ পূজাপাঠ করিতে পারিবে না ইহা স্থির হয়। এই সময় বংশীগোপাল বলিয়া এক ব্রাহ্মণ যুবক মাধবদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মীপুর প্রভৃতি স্থানে

বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার ও সত্রাদি স্থাপন করিয়া নামকীর্ত্তন প্রচলন করেন। যাদুমণিদেব ও অনিরুদ্ধদেব ইহাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন। ক্রমশঃ মহাপুরুষীয় বৈষ্ণববাদ নানা দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। রাজানুগ্রহে ও শিষ্যদের অর্থে এই সব সত্রাধিপতি গোস্বামীরা ক্রমশঃ মোহান্তদের মত ভূম্যধিকারী ও অর্থশালী হইয়া উঠেন। উদাসী ভক্তেরা অবশ্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেন। এই সাধনার ইতিহাসে এক শঙ্করদেবের বংশের কনকলতা ছাড়া সত্রাধিষ্ঠাত্রী কোন নারীর নাম পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব গোস্বামীরা রাজনীতিতেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন।

মোটকথা পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে আসামে মহাপুরুষ শঙ্করদেব, মাধবদেব প্রভৃতি ভারতীয় বৈষ্ণবসাধনার একটি দিককে উজ্জ্বল করিয়া ধরেন, যাহার পূত স্পর্শ, সাহিত্যে, সমাজে এক বিপুল বিপ্লব আনিয়া আসামকে ভারতীয় সনাতন ধারার সহিত এক করিয়া দিয়াছিল। সেই মহাপুরুষদের প্রণাম জানাই।

জনক-শুকদেব সংবাদ

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এসসি

পুরাণকারগণও কোনও প্রাচীন গল্প লইয়া নিজ নিজ বক্তব্য বিষয়ের উপযোগী করিয়া বর্ণনা করিতেন। যেমন বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের ধ্রুবোপাখ্যান ও প্রহ্লাদ-কথায় কতকটা বৈষম্য আছে।

(১)

ব্যাসপুত্র শুকদেব আচার্য্য গৃহ হইতে অধীতবিদ্য হইয়া ফিরিলেন। ব্যাস দেখিলেন পুত্রের মুখ বিষণ্ণ, মলিন ও চিন্তাগ্রস্ত।

ব্যাস বলিলেন পুত্র তোমাকে বিষণ্ণ ও চিন্তাগ্রস্ত দেখিতেছি কেন? ব্রহ্মভূত প্রশান্তাত্মার ত এ লক্ষণ নহে। তুমি আমার নিকট পুনরায় ব্রহ্ম-বিদ্যা অধ্যয়ন কর।

কয়েকদিন অধ্যাপনার পর শুকদেব বলিলেন, আমি এ সকলই জানি। বেদ বেদান্ত শাস্ত্র আমি অধ্যয়ন করিয়াছি ও তাহাদের অর্থ অবগত আছি। কিন্তু ঐ সকল শাস্ত্র বাক্যে আমার প্রত্যয় আসিতেছে না।

ব্যাস দেখিলেন ব্যাপার গুরুতর। চিন্তা করিলেন। পরে বলিলেন, পুত্র, মিথিলার রাজা জনক আমার বন্ধু। তিনি ব্রহ্মবিদ তোমার উপদেষ্টা হইবার উপযুক্ত পাত্র। তুমি তাঁহার নিকট গমন করিয়া আমার পরিচয় দিয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভের ইচ্ছা জ্ঞাপন কর।

(২)

যথাসময়ে শুকদেব জনক সন্নিধানে গমন করিয়া নিজের পরিচয় ও আগমন কারণ নিবেদন করিলেন। জনক তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া বলিলেন, আপনি এখানে কিছুদিন অবস্থান করুন, ক্রমে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা হইবে।

যতই জনককে দেখিতে লাগিলেন, শুকদেবের মনে হইতে লাগিল লোকটি ঘোর বিষয়ী। কখনও স্থপতিগণের সহিত এক বিরাট হর্ম্ম্য-রচনার আলোচনায় ব্যাপৃত। কখনও কোনও প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তার সহিত ঐ প্রদেশের আয় ব্যয় নিরুপণে নিযুক্ত। কখনও সেনাপতি-দিগের সহিত সীমান্ত রক্ষার জন্য সৈন্য ব্যবস্থা করিতেছেন। কখনও দস্যুদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার আয়োজন দেখিতেছেন। এইরূপ নানাবিধ রাজকার্য্যে তিনি দিবসের অধিকাংশ সময়ই ব্যাপৃত থাকেন। তত্ত্বকথা ভাবিবার বা আলোচনা করিবার তাঁহার সময় কৈ। শুকদেব বিষণ্ণ হইতে লাগিলেন।

(৩)

মিথিলায় অগ্নি লাগিয়াছে। ভীষণ ব্যাপার! এরূপ ভয়াবহ ব্যাপার বহুকাল লোকে দেখে নাই। শুকদেব আজ জনকের নির্ম্মম রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। জনকের আদেশ-বাণী আজ কঠোর, পূর্ব্বের মত নম্র ও শান্ত নহে। সৈন্যগণ, শান্তিরক্ষকগণ, অগ্নিযোদ্ধৃগণ সকলে নিপুণতার সহিত এবং অবহিত ভাবে তাঁহার আদেশ পালন করিতেছে। নির্দ্দয় জনক আজ নরহত্যার আদেশ দিয়াছেন। যে যোদ্ধা আজ কাপুরুষতাবশে কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিবে তাহার তখনই প্রাণদণ্ড হইবে। যে দরিদ্র আজ লোভে পড়িয়া দীপ্ত গৃহ হইতে সামগ্রী অপহরণ করিবে তাহারও তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা। দরিদ্রদের এক পল্লী জনকের আদেশে ভাঙ্গিয়া পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে। দরিদ্রদের ক্রন্দন ও অনুনয়ে জনকের দৃকপাতও নাই।

একদল বণিক জনকের নিকটে আসিবার জন্য কাতর চেষ্টা করিতেছে। সৈন্যরা আসিতে দিতেছে না। বণিকরা বলিতেছে, মহারাজের আদেশে সৈন্যগণ তাহাদের বিপনী সকল অধিকার করিয়াছে। তাহাদের সর্ব্বস্ব নষ্ট হইতে বসিয়াছে। তাহারা মহারাজের কাছে সেই কথা জানাইতে আসিয়াছে। একজন সৈন্যাধ্যক্ষ কঠোর ভাবে তাহাদের জানাইল—মহারাজের আদেশ, এই ভীষণ দুর্দ্দিনে যদি কেহ কার্য্যহন্তারক হয়, তাহার অবিলম্বে প্রাণবধ করা হইবে। বণিকরা ভীত হইয়া চলিয়া গেল।

তবে শুকদেবের একটা খটকা রহিয়া গেল। জনকের প্রাসাদে আগুন লাগিয়াছে। রাজমহিষীদের গৃহ সকল পুড়িতেছে, মহার্ঘ বস্ত্রাদি ও অলঙ্কার সকল নষ্ট হইতেছে। কিন্তু জনকের সেদিকে কোনও লক্ষ্য নাই। রাজপুর-মহিলাবৃন্দ জনককে জানেন, তাঁহারা তাঁহার নিকটে

কোনওরূপ আবেদন নিবেদন করিতে আসিতেছেন না। ক্রমে জনকের প্রিয় পুস্তকগৃহে অগ্নি লাগিল। মহার্ঘ শাস্ত্র ও অন্যান্য পুস্তক সকল পুড়িতে লাগিল। জনক সেদিকেও ভ্রুক্ষেপ করিলেন না।

অগ্নিকাণ্ডের প্রথমেই জনক শুকদেবকে দেখিবার জন্য এক মন্ত্রীকে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী ক্রমে শুকদেবকে নগরের এক বন মধ্যে লইয়া গেলেন। এই সময় শুকদেব মন্ত্রীকে জনকের এই রুদ্র মূর্ত্তির কথা বলিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী বলিলেন, মহাত্মন্ মহারাজা জনক মহাজ্ঞানী! তিনি জানেন এইরূপ দুঃসময়ে কোমলভাবে কোনও কাজ হয় না। তাই তাঁহার এই ছল নির্ম্মম মূর্ত্তি। দরিদ্রদের কুটীরের কথা বলিতেছেন যে, কুটীরগুলি ধ্বংস না করিলে তাহাতে আগুন লাগিয়া পরের অনেক পাড়া নষ্ট হইত। মহাজনদের করুণ ক্রন্দনের কথা বলিতেছেন, তাহার কারণ শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন। এই অগ্নিকাণ্ডে সহস্র সহস্র ব্যক্তি খাদ্য ও বস্ত্রহীন হইবে। ঐ সকল বিপনীর খাদ্য ও বস্ত্র তাহাদিগকে দিয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করা হইবে। পরে সুসময় আসিলে বণিকগণের ক্ষতিপূরণ করা হইবে। জনক মহাপুরুষ। মহাপুরুষের হৃদয় "কুসুমাদপি কোমল" আবার প্রয়োজন হইলে "বজ্রাদপি কঠোর" হয়।

৪

বন ও সন্নিকটস্থ প্রান্তরে গৃহহীনগণ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মহারাজও আসিয়াছেন। মন্ত্রীর কথামত লোকদিগের অন্ন-বস্ত্রাদির ব্যবস্থা করা হইল। এইবার শুকদেব, জনক ও তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ একটু বিশ্রাম লইবার অবসর পাইলেন। একজন পার্ষদ বলিলেন, মহারাজ, এই দেখুন আপনার রত্নমুকুট আমি রক্ষা করিয়া আনিয়াছি। আর একজন বলিলেন, এই দেখুন আমি রাজমহিলাদের উপযুক্ত এক বস্ত্রপেটিকা উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি। একজন যোদ্ধা বলিলেন, আমি আপনার প্রিয় ধনু ও বানসহ তূণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। এক পণ্ডিত বলিলেন, দেখুন মহারাজ, আমি আপনার প্রিয় বেদান্তসূত্রাদি দশ বারখানি গ্রন্থ লইয়া আসিয়াছি। বিদূষক বলিল, মহারাজ কি আনিলেন। জনক চকিত হইয়া বলিলেন, তাইত ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই বলিয়া নিজ দেহাবরণের এক খুটকে হস্ত দিয়া একটি ক্ষুদ্র পাখী বাহির করিলেন। বলিলেন, অগ্নিকাণ্ডে ভীত হইয়া পাখিটী এক ঝোপের তলায় পড়িয়াছিল আমি তুলিয়া লইয়াছিলাম। পাখিটকে তিনি হাতের উপরে রাখিলেন। সেটি বন দেখিতে পাইয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

শুকদেব লজ্জিত হইয়া দেখিলেন—তিনি নিজের গ্রন্থের পুটলিটি লইয়া আসিয়াছেন।

(৫)

পুনর্নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রথমে সাময়িক পত্রকুটীর সকল নির্ম্মিত হইল। লোকেরা সেইগুলিতে আশ্রয় লইল। স্থপতিগণ রাজপ্রাসাদ সংস্কার কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। সমস্ত কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া জনক শুকদেবের দিকে মনোযোগ দিবার সময় পাইলেন।

একদিন তিনি শুকদেবকে বলিলেন, মহাত্মন্, এইবার আমি আপনার সহিত প্রতিশ্রুত ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব এ রাজধানী এখন বাসের অযোগ্য। আপনাকে আর আটকাইয়া রাখিব না।

শুকদেব বলিলেন, মহারাজ আপনি আমার গুরু—আপনার নিকট হইতে আমি ব্রহ্মবিদ্যার সন্ধান পাইয়াছি।

জনক বলিলেন, সে কি! আমি ত আপনাকে কোন উপদেশ দিই নাই।

শুকদেব বলিলেন, মহারাজ আপনাকে ও আপনার কার্য্য-কলাপ দেখিয়া আমি এই মহামন্ত্রের অর্থ বুঝিয়াছি—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।

ভগবানের দ্বারাই এই বিশ্বব্যাপ্ত রহিয়াছে। তাহা হইতেই ভূতগণের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া মানব সিদ্ধি লাভ করে।

আপনি ক্ষত্রিয় রাজা। জগদ্ধিতের দ্বারাই আনন্দ পান। আপনি তাহাই করিয়া যান। আমিও আমার পথ পাইয়াছি।

জনক বলিলেন, সে কি?

শুকদেব বলিলেন, আমি ব্রাহ্মণ, হরিকীর্ত্তন করিয়াই আমি আনন্দ পাইব। তাই জগতের হিতার্থ আমি ভাগবত কীর্ত্তন করিয়া বিচরণ করিব। উহা হইতেই লোকের উপকার হইবে। আমিও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিব।

শুকদেব জনককে নমস্কার করিলেন।

জনক শুকদেবকে নমস্কার করিলেন।

সুইসারল্যাণ্ড

শ্রীচিত্রিতা দেবী

১৪ই আগস্ট। আজ মধ্যরাত্রে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, আর আমরা কতদূরে। মনকে তো দেশকালের বন্ধনে বাঁধা যায় না, তাই আজ সমস্তক্ষণ মনটা ঘুরে মরছে উৎসবমুখরিত কলকাতার পথে পথে। ভাল লাগছে না এই কাস্টমস্‌এর ব্যাপার—আজকের দিনে যদি দেশে থাকতে পেতাম! এদিকে পর পর গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, একটী একটী করে পার হচ্ছে ফ্রান্সের সীমানা। এত প্রশ্নোত্তরের কী যে দরকার জানিনা। মানুষের পৃথিবীতে মানুষ কেন স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারবে না। মানুষের একটা বুদ্ধি দূর দেশকে যতই নিকটতর করে তুলছে, একদিক থেকে যতই তাকে কাছে টানছে, তার অন্য বুদ্ধিটা ততই তাকে নিজের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে, আর বিস্তৃত করে চলেছে পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান। এদিকের পরীক্ষা শেষ করে সুইস মাটিতে প্রবেশ করি। যায়গাটার নাম 'বল'। গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, আর চারপাশে থেকে কৌতূহলী দৃষ্টির ছুরি বিঁধছে আমাদের সর্ব্বাঙ্গে। চোখ তুললেই

একটি হ্রদ

হয় তাড়াতাড়ি অপ্রস্তুত ভাবে চোখ ফিরিয়ে নেয়, নয়তো লজ্জিতভাবে মৃদুহাস্যে মাথা নাড়ে, খুকুকে দেখে হাত নাড়ে, খুকু বলে ওঠে, হ্যালো, তারা য়্যালা—বলে হেসে ওঠে। দু'একজন গাড়ীর কাছে এগিয়ে এসে আলাপ জমাবার চেষ্টা করে। নো ফ্রাঁসা শুনে দমে যায়। আ-আঙলিয়া, আ-উঈ।

আমরা যে সময়ে চলেছি, এইটে এদেশের ছুটীর মরসুম। দলে দলে লোক ইংলণ্ড ও ফ্রান্স থেকে চলেছে সুইসারল্যাণ্ডে, ক্লান্ত শরীরটাকে একটু দম দিয়ে নিয়ে আসবার জন্যে। আমরা কবে কোথায় যাব, কবে কোথায় আশ্রয় নেব কিছুই তেমন করে ঠিক করা নেই, শুধু এইটুকু স্থির আছে যে ইয়োরোপের হিমতীর্থটীকে দেখে নিতে হবে ভাল করে। কিন্তু এখানে এসে বোঝা গেল ইয়োরোপ ঠিক তীর্থযাত্রার উপযুক্ত নয়। এখানে প্রত্যেকটী জিনিষ নির্দ্দিষ্ট হওয়া চাই। এখানকার মুহূর্ত্তেরা কালসমুদ্রের স্ফুরণলীলা মাত্র নয়—এদেশের প্রতি মুহূর্ত্ত পূর্ব্ববর্ত্তী মুহূর্ত্তদের বিবেচনায় গড়া। আগে থেকে ব্যবস্থা করিনি তাই কোথাও যায়গা পাওয়া গেল না। যতগুলো হোটেল ছিল সহরে, অভিজাততম থেকে দীনতম, সব দেখলাম ঘুরে ঘুরে। রাস্তা জুড়ে বড় বড় কোচ দাঁড়িয়ে আছে, চারদিকে লোক গিস্‌গিস্ করছে—আর আমরা হোটেলে ঢুকছি আর বেরিয়ে আসছি। সরি সার, সরি মাদাম্—জায়গা নেই। এদিকে রাত হয়ে এল, ওদিকে রাতের আশ্রয় মিলল না। সমস্ত দেশটার ওপর ভক্তি চটে গেল যেন। কী এমন অপূর্ব্ব যায়গা—সেই একই তো গাছপালা, বাড়ীঘর। শুধু গরমে আর ক্লান্তিতে কষ্ট হচ্ছে খুব। হোটেলে ভর্ত্তি সহর অথচ কোথাও থাকবার উপায় নেই—এ কি বিড়ম্বনা। সবাই ফ্রান্সের সীমা পার হয়ে এখানে রাত কাটাতে চায় এবং আমাদের মত এমন হঠাৎ কেউ আসে না। এদের প্ল্যান সব আগে থাকতে ঠিক করা, হোটেল সব আগে থাকতে বুক করা। রাত

একটি পাহাড়ী গ্রাম

নটা পর্য্যন্ত যখন শোবার ব্যবস্থা হোল না, তখন ঠিক করা গেল—এবারে কিছু খাবার আয়োজন করা যাক। না হলে সেটাও যাবে ফস্কে। অন্তরে যে ক্ষুধারূপদেবী জাগ্রতা হয়েছেন, তাঁকে কিছু অর্ঘ্য দিয়ে শান্ত করেই আমরা চলব জুরিখের পথে। অন্ধকার রাতে অজানা পথ দিয়ে ছুটে যাব—আমরা সুখশয্যা তুচ্ছ করে, "উৎসাহ দিলাম সারথীকে।" "রাখো তোমার কবিত্ব, সোজা ভাষায় বল না—ঘুম যখন কপালে নেই তখন ছোট।" "আহা এই তো বুঝলে না—কবি বলেছেন, বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়, আমরা বলব উল্টোটা—সুকোমল শয্যাতল, সে মোদের নয়।" এর মধ্যে সবচেয়ে সুখী খুকু। কারণ সে অনেকক্ষণ থেকে পিছনের সীটটী একলা দখল করে মাথার নীচে একটী কুশন দিয়ে দিব্যি আরামে ঘুমুচ্ছে। এখন ওকে তুলে খাওয়ানো, ওরে বাবা, ভাবতেও ভয় করছে।

ইতিমধ্যে শহরের প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। ছোট একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়া গেল। কালো পোষাকের ওপর সাদা লেসের এপ্রণ পরা কর্ত্রী এসে হাত মুখ নেড়ে অনেক কিছু বকে গেলেও, কি যে ওদের আছে, আর কি যে আমরা খাব তা বোঝাও গেল না, বোঝানও গেল না। এদেশে এসেই কি কবি লিখেছিলেন—"অনেক কথা যাও যে বলে, কোন কথা না কয়ে, তোমার ভাষা বোঝার আশায় দিয়েছি জলাঞ্জলি।" এপাশে কোণের টেবিলে বসেছিলেন একটী সুন্দরী। বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর চুলে। সাধারণ মেয়েদের মত রংবেরঙের চুলের কুণ্ডলী ঝুলছে না। এর কালো মসৃণ চুল, মাথার মাঝখানে সিঁথী করে টেনে নিয়ে ঘাড়ের একটু উঁচুতে একটী চিকণ কালো বাংলা খোঁপা। অনেকক্ষণ ধরে আমাদের লক্ষ্য করেছিলেন, এবারে আর থাকতে না পেরে তার গোলগাল স্বামীটিকে নিয়ে উঠে এলেন আমাদের টেবিলে। বল্লেন, তিনি আমাদের সাহায্য করতে উৎসুক, কারণ তিনি লিত্‌লবিত্‌ ইংরিজি জানেন। আমাদের খাগুসমস্যা থেকে উদ্ধার করে, একগাল হেসে ভদ্রমহিলা বল্লেন, ইয়ের স্তেত্‌ ইস্‌ ফ্রী তুদে,'
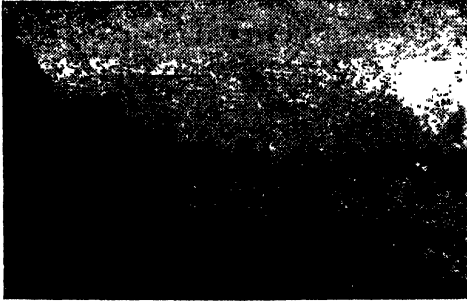
রাইন নদী

আই এম্‌ গ্ল্যাড্‌ ইত্‌ ইস্‌ ভেরী বেতর্‌ ইন্দীদ্‌। এতক্ষণ পরে বিদেশীর মুখে স্বাধীনতার কথা শুনে মন কেমন করে উঠল। এই মুহূর্ত্তে ভারতবর্ষ মধ্যরাত্রির সীমানায় পৌঁছেচে। যে পতাকার জন্যে কাল পর্য্যন্ত লাঞ্ছনার সীমা ছিল না, আজ সেই পতাকা দেশের প্রত্যেকটী ইংরেজি প্রতিষ্ঠানের মাথায় উড়ছে—একশ বছরের স্বপ্ন আজ সার্থক হোল। কিন্তু যারা অসীম দুঃখ বরণ করে দীর্ঘদিনের তপস্যায় তিল তিল করে জীবন উৎসর্গ করে একে সত্যে পরিণত করেছেন,তাঁরা আজ কোথায়। তাদের চরম বেদনার মূল্যে কেনা এই স্বাধীনতা ভোগ করবে কারা? যারা কোনদিন দেশের জন্যে সিকিপয়সাও ত্যাগ করেনি, যারা চিরকাল ভোগসুখে লালিত হয়ে, আজ স্বাধীনতার সুখটীও পুরোমাত্রায় দখল করতে বসেছে—এই সব আমাদের মত লোকেরা। বিশ্ববিধানে শিবঠাকুরের যে কন্যে রাঁধেন বাড়েন তাঁর কপালে আর খাওয়া নেই। তাঁর দিন রান্না করতেই বয়ে যায়। আর যিনি সারাবেলা আলস্যে কাটালেন তিনিই খেয়ে দেয়ে মুখ মোছেন। এদিকে ভদ্রমহিলা অনর্গল বকে যাচ্ছেন। তাঁর স্বামীটির বেশ চেহারা—এখানকার ঘী দুধ মাখন খাওয়া নাদুস-নুদুস। নিজে ফ্রেঞ্চ ছাড়া কিছুই জানেন না, তাই বিদুষী স্ত্রীর সাহচর্য্যে তাঁর মুখ মাঝে মাঝে বেশ চক্‌ চক্‌ করে উঠছে। ইয়োরোপের সর্ব্বত্রই বিভিন্ন ভাষা জানা একটা গর্ব্বের বিষয়। ইংরেজ যেমন ইংরেজি ছাড়া আর কিছু শেখা প্রয়োজন মনে করে না, অন্য ভাষার প্রতি কেয়ারও করে না—এদের সে কম্‌প্লেক্স নেই। খাওয়া শেষ হলে অনেক ধন্যবাদ দিলাম,—"এবার চলি।" মেয়েটী বল্লে "কোথায় থাকছ?" "সম্ভবত পথেই।" সে কি? কেন? এক সঙ্গে অনেক প্রশ্ন। "ওঃ হো আগে থেকে বুক করো নি? আচ্ছা একটু বসো, আমি দেখছি।" মিনিট কুড়ি ধরে অজস্র টেলীফোন করে এসে বল্লে—"তোমাদের হোটেল ঠিক করেছি—এই নাও ঠিকানা—
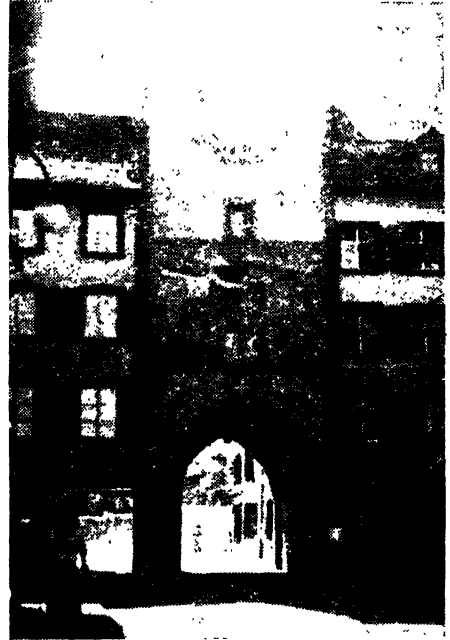
একটি গ্রামের তোরণ

সহরের বাইরে জুরিখের পথেই পড়বে। তোমাদের জন্যে নদীর ধারে ঘর ঠিক করতে বলেছি।"

পূর্ণিমার কাছাকাছি শুক্লপক্ষের কোন একটী তিথি বোধহয় হবে। পাশ দিয়ে বয়ে যায় রাইন নদী। চাঁদের আলোয় রহস্যময় হয়ে উঠেছে চারিদিক—দেশটা যে বিলিতি সেকথা মনেই হচ্ছে না। ঐ নদীটার নাম অনায়াসেই হতে পারত গেঁয়োখালি কিম্বা ইছামতী। রাস্তাটা ক্রমশ সরু হয়ে ছোট একটা সহরে ঢুকে পড়ে। এই ত সেই রাইন ফেলডন্‌। তাতো হল, এখন হোটেলটা কোথায় খুঁজে পাব। রাস্তায় জনমনিষ্যি নেই—সব যে যার ঘরে লেপের নীচে, শুধু আমাদের ছোট গাড়ীটা আবছা আলোয় হেডলাইট ফেলতে ফেলতে সরু গলি দিয়ে

এগিয়ে যাচ্ছে। পথের একদিকের দোকানপাতির দরজা বন্ধ। অন্যদিকে প্রকাণ্ড এক দেয়াল চলেছে। এত বড় বাগান ঘেরা বাড়ী কার ?—"প্রত্যেকটা গেটের ওপর টর্চের আলো ফেলে দেখ" আদেশ করলেন সারথী। এতক্ষণে দেয়ালের একটা দিক শেষ হোল—প্রকাণ্ড গেট, ভেতরে আলো জ্বলছে। খুট্ করে টর্চ টিপলাম—বড় বড় অক্ষরে নাম লেখা—আরে এইতো আমরা খুঁজছি। কী কাণ্ড এযে বিশাল ব্যাপার। প্রকাণ্ড বাগান, একেবারে যাকে বলে রোম্যান্টিক। বড় বড় গাছের নীচে বসবার আসন—দূরে দেখা যায় সবুজ ঘাসে ঢাকা টেনিস লন, ওপাশে ফলের বাগানে, গাছের মাথাগুলি দুলছে। আলো পড়ে এপ্‌লফুলগুলি ঝিক্‌মিক্ করে উঠছে, এদিকে রঙীণ ফুলের কুঞ্জের নীচে লুকানো আছে বন্যা-আলো। সেই আলোর বন্যায় আর চাঁদের মায়ায় সমস্ত জায়গাটা অপার্থিব মনে হচ্ছে। একেই কি বলে নন্দনকানন। স্পষ্ট বুঝতে পারছি কেন এসব দেশে এসে ছেলেদের

এঙ্গাডাইন

মাথা ঘুরে যায়। যদি ওই পুষ্পকুঞ্জের নীচে দাঁড়িয়ে কোন অপ্সরী তার সোনালী চুলের কণা দুলিয়ে, এই রহস্যময় আলোয়, তার স্বপ্নভরা চোখ তুলে কোন বিদেশী তরুণের দিকে তাকায়, তবে সে তরুণের মাথা ঠিক রাখাই অন্যায়—তার যৌবন ধর্মের অপমান। এপল-অর্চার্ডের পাশ দিয়ে দেখা যায় রাইন নদী বয়ে যাচ্ছে, আর সেইখানে লতাকুঞ্জের মাঝে ছোট্ট একটু সাদা সেতু—সর্ব্বদা সশস্ত্র সৈন্য পাহারা দিচ্ছে তাকে, কারণ এ নদীর পরপারে জার্মানী।—এখনও সকলের জন্যে জার্মানীর দ্বার উন্মুক্ত নয়।

অনেক কার্পেট মোড়া, মখমলের গদী আর কুশন দিয়ে, ফুল আর পুষ্পপাত্র দিয়ে সাজানো সব ঘর আর বারান্দা, করিডর আর কর্ণার পার হয়ে আমাদের ঘরে এসে ঢুকলাম। মাদাম-র বলেছেন, "আপনাদের সঙ্গে ছোট বাচ্চা আছে, তার জন্যে পাশের একটা ঘর ঠিক করেছি।"

—"না না, এইখানেই ওর খাটটা এনে দাও—এখানেই শোবে।" এতবড় প্রকাণ্ড ঘর, তিনটে বেশ ভাল মাপের ঘর যার মধ্যে ঢুকে যেতে পারে, সেই ঘরেও ছোট্ট খুকুর শোবার যায়গা হবে না—লোকটা বলে কী, ম্লেচ্ছ কিনা কত আর বুদ্ধি হবে। বিদেশে হোটেলে এসে ছোট বাচ্চাদের পাশের ঘরে রেখে, এদেশের মাতৃদেবীরা, যদিও বেশ ঘুমোন, আমি তা পারব না।

বিশাল ঘরের শ্বেতপাথরের মেজে, তার ওপরে এখানে ওখানে রঙীণ কার্পেট, সোফা, ডিভান, চেয়ার টেবিল, আলমারী, আধুনিকতম সজ্জা টেবিল—কী নেই। কিন্তু সবচেয়ে চমৎকার বিছানা দুটী। নীচু স্প্রীংএর খাটে দেড়ফুট উঁচু নরম বিছানা। সারা দিনের ক্লান্তিতে বিপর্য্যস্ত আমাদের বেশবাস। প্রকাণ্ড আয়নায় ছায়া পড়েছে। একবার সেই প্রতিবিম্বের দিকে আর একবার বিছানার দিকে তাকিয়ে সঙ্কোচে সরে এলাম। আগে স্নান সেরে নিতে হবে। স্নান টান

জুরিখের পথে একটি গ্রাম

সেরে রাত ১২॥টায় যখন শুতে এলাম, তখন ঈশ্বর বলে সেই যে একজনের কথা শুনতে পাই, তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। যখন মনে মনে ভেবে রেখেছি সারারাত এই ঠাণ্ডায় ওকে গাড়ী চালাতে হবে, আর শীতে বেচারীর আঙুলগুলি অসাড় হয়ে আসবে, তখন কে জানত যে আমাদের জন্যে এমন দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যা প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। বড় বড় কাঁচের জানলার ক্রীমরঙের ভারী পর্দাগুলি সরিয়ে দিয়ে বিছানার মধ্যে একেবারে আধহাত গভীরে ঢুকে গেলাম—আর চাঁদের আলোর ঝরণা নেমে এল আমাদের ঘরে, সাদা চাদরের ওপর আর সাদা সাটিনের পালকের লেপের ওপর রাশিরাশি যূঁইফুলের মত ঝরে পড়ল, আর তার সঙ্গে মিশে গেল রাইনের মৃদু গুঞ্জন।

দিন সাতেক ঐ উপত্যকায় কাটিয়ে আবার আমরা পাহাড়ের উদ্দেশে

পাড়ি দিই। রাস্তা যদিও এক এক যায়গায় খুব খাড়াই তবু পিচে বাঁধানো বলে চালাতে বেশি কষ্ট হয় না। একটার পর একটা পাহাড়ী গ্রাম সব পার হয়ে চলেছি। কাশ্মীরের সঙ্গে তুলনা চলে অনেক জায়গায়—তবে এখানকার লোকেরা কাশ্মীরের মত তীক্ষ্ণ সুন্দর নয়। এরা বেশ মোটা-সোটা গোলগাল; ছেলেদের চুলগুলি কদম ছাঁটা। ইয়োরোপের অন্যান্য জাতের তুলনায় এদের জীবন অনেক বেশী সরল ও অনাড়ম্বর। ইংরেজদের মত ঘোরতর গো-খাদক ত এরা নয়ই, এমন কি মাংসও খুব ভালবাসে না। দুধ, মাখন, ক্রীম, পণীর, এই সব খেতে খুব ভালবাসে। গাঁয়ের সরু সরু বাঁধানো পথে কিম্বা গোচারণ মাঠে,
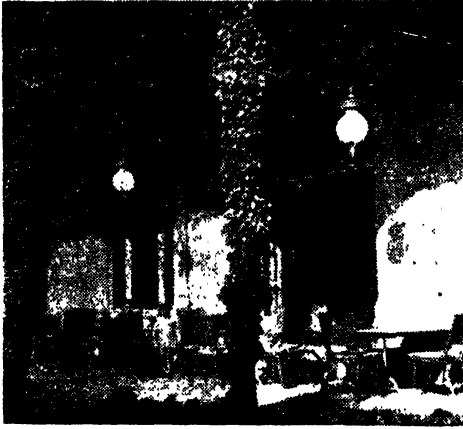
সালিন হোটেলের বারান্দা

ফুটফুটে চেহারা, টুকটুকে গাল, বাচ্চারা খালি পায়ে বেড়াচ্ছে ঘুরে। গ্রামের মাঝখানে ছোট একটী স্কোয়ার—তেকোণা একটু ঘাসে ঢাকা জমিতে, হয় ক্রুশবিদ্ধ যীশু নয়ত শিশু কোলে মেরীর মূর্ত্তি। কোথাও পাহাড়ের ওপরে ছোট একটা চার্চ। প্রায় প্রত্যেকটী বাড়ীর সঙ্গেই একটু করে ফুলের বাগান, নেহাৎ যাদের নেই, তাদেরও জানলার নীচে, ফুলের গাছ সাজানো, দেয়ালে নানা ধাঁচের আল্পনা ও ছবির ফ্রেস্কো। তাদের মধ্যে অনেকগুলি একেবারে আমাদের দিশী নক্সার মতো। আর লোকগুলি সব সময় হাসিমুখে সাহায্য করতে উৎসুক। এদিকের লোকেরা যথেষ্ট পরিশ্রমী, অথচ ন্যাকামির আতিশয্য নেই।

আল্পসের নীচু সারির মধ্যে দিয়ে চলেছি। হাজার চারফুটএর বেশী উঁচু নয়। কিন্তু পাহাড়গুলো কেমন অদ্ভুত, অনেক উঁচু হয়ে হঠাৎ কেমন যেন শেষ হয়ে যায়। হিমালয়ে যেমন শ্রেণীর পর শ্রেণী ঢেউএর মত পাহাড়ের সমুদ্র—মনে হয় যেন এর শেষ নেই। এখানে সেরকম নয়। কয়েকটা গ্রাম পার হয়ে একটা পাহাড়ে নদীর উপত্যকায় এসে পৌঁছানো গেল। কী এর নাম জানি না—কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই, বড় বড় পাইন গাছ, মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত বিশাল প্রস্তর খণ্ড, আর তারপরেই সবুজের উঁচু নীচু তরঙ্গ, মাঝে মাঝে বাবলা জাতীয় গাছ, ধূসর রঙের মোটা মোটা গরুর দল ঘুরে বেড়ায়—এত মোটা যে, যেন নড়তে পারে না, একেবারে গজেন্দ্রগামিনী হয়ে চলে। আর তাদের গলায় বাঁধা মস্ত বড় বড় ঘণ্টা বাজে ঠং ঠং। অনেক দূর থেকে সে ঘণ্টার মিষ্টি আওয়াজ মাথার মধ্যে রিন্ রিন্ করে বাজতে থাকে, মনে পড়িয়ে দেয় সেই আমাদের বাংলা দেশের গ্রামগুলিকে। আর সেই ঘণ্টার তালে তাল মিলিয়ে, পায়ে পায়ে নুড়ির মল বাজিয়ে ছোট নদী চলেছে বয়ে। যেন ছোট্ট একটা মিষ্টি মেয়ে, নুপুর-পরা পায়ে আর কাঁকন পরা হাতে চলেছে ছুটে। পাশেই একটা উইপিং উইলো নদীর ওপরে প্রায় উপুড় হয়ে পড়েছে। এখানে নদীর ধারে বসে আমরা সঙ্গে আনা কিছু খাবার খেয়ে নিলাম, নদীর জলে হাত পা নিলাম ধুয়ে।

কুরফুরষ্টান্ বলে একটা যায়গায় এসে মস্ত উঁচু পাহাড়টার আড়ালে সূর্য্য গেল ডুবে। ছোট একটা সাধাসিধে পান্থনিবাসে রাত কাটাবার ব্যবস্থা ঠিক ছিল। এবারে ভ্রমণ প্রোগ্রাম রীতিমতো মাইল মেপে করে নেওয়া গেছে, রাত্রিবাসের ব্যবস্থা সব আগে থেকে ঠিক। বাড়ীটার পিছনে প্রকাণ্ড কালো পাহাড়টা অন্ধকার রাতে একটা দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে—একেবারে সোজা উঠে গেছে, ধূসর মলিন আকাশটাকে ঘন কালো কালির আঁচড় কেটেছে পিরামিডের মতো। পাশেই একটা ছোট ষ্টেশন কেমন যেন ঝিমিয়ে রয়েছে। হোটেলের উঠোনটায় আর বাড়ীর থামের সঙ্গে আর গাছের সঙ্গে তার বেঁধে আলো জ্বালানো হয়েছে,. সেখানে সব চেয়ার টেবিল পেতে বসে গেছে, মদের স্রোত চলেছে। আর মাঝে মাঝে বিকট উল্লাসধ্বনি চারিপাশের স্তব্ধতাকে গলা টিপে মারছে। সব মিলিয়ে জায়গাটা অত্যন্ত অবসাদ-দায়ক। সেই অনেক দূরের দেশের ফেলে আসা একটা বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে।

(আগামী সংখ্যায় শেষ)

পরিচয়

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

দুনম্বর কামরায় লোকটি উঠ্‌লো। বস্‌লো একটা দুশো টাকা দামের স্যুটকেসের পাশে।

আমার সঙ্গে চোখোচোখি হ'তেই বল্‌লে—'আরে আরে!' সমস্ত মুখে তার হঠাৎ চেনার আলো এসে পড়লো যেন!

ব'লে উঠ্‌লো—'কী আশ্চর্য্য, তোমার সঙ্গে এমন ক'রে দেখা হ'য়ে যাবে কে জান্‌ত?'

আমিও তাই ভাবছিলুম। আমার জানা ছিলনা।

আপাদমস্তক আমার দেখ্‌তে লাগ্‌লো।

'বদ্‌লাওনি বিশেষ!' বল্‌লে সে।

'তুমিও না'—প্রাণ খুলে আমিও বলি।

'একটু মুটিয়েছ!'—খানিকটা পর্য্যবেক্ষণের পর অবশ্য।

'তা মুটিয়েছি। কিন্তু তুমি ত আমার চেয়ে মোট্‌কা।' আমার এটা বলবার মানে নিজের স্থূলত্ব কমানো।

এর পর বেশ জোরের সঙ্গেই আমি বলি—'তুমি চিরকাল একরকমই রয়ে গেলে!'

বললুম বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবছিলুম—কে রে বাবা লোকটা? কোনো পুরুষেই আমি তাকে চিনি না। মনেও করতে পারছি না যে কখনো দেখেছি। স্মরণ শক্তি আমার কম নয়, বরঞ্চ প্রখরই। অবশ্য লোকের নাম আমি ভুলি, অনেক সময় মুখও মনে পড়ে না, জামা-কাপড় ত কেউই মনে রাখে না। তবে এটা ঠিক, মনে রাখবার মতন লোককে আমি মনে রাখি। যখন এমন হয়, চেহারাও মনে নেই, নামও মনে নেই, তখনো ধরা দিইনা। কি ক'রে ব্যাপারটা সাম্‌লে নিতে হয় আমি জানি, মাথাটা শুধু ঠাণ্ডা রাখ্‌তে হয় আর বুদ্ধিটা সাফ্‌ রাখতে হয়। তারপর সব ঠিক হ'য়ে যায়।

বন্ধু বল্‌লে—'কতকাল পরে দেখা তোমার সঙ্গে।'

'এক যুগ' আমি বলি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ভাবটা দেখাই যেন আমার মনেও বেদনা কম হয়নি।

'কিন্তু কেটে গেল কত শিগ্‌গির বছরগুলো?'

'যেন ঝড়ের মতন—উৎসাহের সঙ্গে আমি যোগ দিই।

'আমি অবাক্ হই ভেবে কোথায় গেল সেই আমাদের পুরোণ দলবল! কোথায় গেল সব!"

এরকম পুরোণ লোকদের সঙ্গে দেখা হলে পুরোণ দল-বলের কথা এসেই পড়ে, আমি বরাবর দেখেছি! তখনই সুযোগ আসে পুরোণ দলের মধ্যে বক্তাটি কোন্ ঘুঘু সেটি জান্‌বার।

'সেখানে আর যাও কি?' প্রশ্ন করে সে।

'আর—না'—স্পষ্ট করেই আমি বলি। এমন কথা-বার্ত্তার মধ্যে 'সেখানটা' একেবারে উড়িয়ে দেওয়াই নিরাপদ।

'হ্যাঁ, সেখানে যাওয়া তোমার উচিত নয়।'

'এখন ত নয়ই।'

'বুঝেছি। কিছু মনে কোরো না ভাই!'

খানিকক্ষণ চুপচাপ কেটে যায়। বর্দ্ধমানকর্ড দিয়ে ট্রেণ ঝড়ের মতন বেরিয়ে যায়।

আবার সে সুরু করে—'পুরোণ বন্ধুদের যার সঙ্গেই দেখা হয়, তোর কথা বলে। জান্‌তে চায় কেমন আছিস্ তুই!'

'বেচারারা' মনে মনে বলি। মুখে কিছু নয়।

এইবার একটা সোজা কথা বলার দরকার হয়েছে। এ পদ্ধতিটি খাটিয়ে এর আগে আমি সুফল পেয়েছি। হঠাৎ জোর দিয়ে ব'লে উঠি—

'হ্যাঁরে বিলু কোথায় আছে জানিস্? আমাদের সেই বিলু কি করছে জানিস তুই?'

একথায় কোনো বিপদ নেই। সব দলেই একজন বিলু প্রায়ই থাকে।

'জানি বৈকি! বিলু আছে দিল্লীতে। আমার সঙ্গে বড়দিনের সময়ে দেখা হয়েছিল। তার ওজন এখন আড়াই মণ। এ খবর তুই রাখিস্ না।'

তা রাখি না, মনে মনেই বলি।

'আর পেটো কোথায়? পেটো?'

'বিলুর ভাই পেটো? তার কথা বলছিস্?'

'হ্যাঁরে হ্যাঁ বিলুর ভাই পেটো। তার কথা প্রায়ই আমার মনে হয়।'

'আরে, পেটো আর সে পেটো নেই রে ভাই' ব'লেই সে হাস্তে সুরু করে, হাসির বেগ কম্‌লে বলে—'পেটোটা বিয়ে করেছে।'

বিয়ে করেছে কোনো লোক এ কথা শুন্‌লেই হাসা ভালো, বিয়েটা যেন ভারী হাসির ব্যাপার। পেটো বিয়ে করেছে শুনে হাস্‌তে হাস্‌তে আমার খুন হ'য়ে যাওয়া উচিত। কাজেই আমি হাসতে আরম্ভ করি, যতক্ষণ না ট্রেণ থামে ততক্ষণ কি আর হাসিটা চালাতে পারব না? বর্দ্ধমান ত আর পঞ্চাশ মাইল! হাসি ঠিক্ মতন চালাতে জান্‌লে পঞ্চাশ মাইল পার ক'রে দেওয়া যায়।

কিন্তু বন্ধু আমায় তা করতে দিলে না। বল্‌লে—'কতদিন ভেবেছি তোমায় একখানা চিঠি লিখি, বিশেষ ক'রে যখন তোমার অতবড় ক্ষতি হ'য়ে গেল—'

ক্ষতি কি রে বাবা? আমি ত ভেবেই পাই না, টাকা নাকি? কত টাকা? কি ক'রে হারালুম? খানিকটা গেছে? না সর্ব্বস্ব? আমি কি পথে বসেছি?

'এতবড় ক্ষতি সহ্য করা শক্ত'—গম্ভীরভাবে ও বলে।

সত্যি তাহ'লে আমি পথে বসেছি! কি জবাব দেব ভেবে পাই না। ওর কথা থেকে কোনো সূত্র পাই যদি—অপেক্ষা করি।

'আত্মীয় বিয়োগ সব সময়েই দুর্ভাগ্যের'—বলে ও।

আত্মীয় বিয়োগ? বাঁচা গেল। আনন্দে আমি উচ্ছ্বসিত হই—মরার ব্যাপার নিয়ে অনেকক্ষণ কথা চালানো যায়। এখন কে মলো সেইটে শুধু জানা দরকার।

আমি যোগ করি—'দুর্ভাগ্যের ত বটেই। কিন্তু এর আর একটা দিকও ভাব্‌বার আছে—'

'তা বটে ঐ বয়সে—'

'ঠিক বলেছ, ঐ বয়সে আর এমন আরামে জীবন কাটিয়ে'—

'শেষ পর্য্যন্ত তেম্‌নি শক্ত ছিল ত?—'

'শক্ত ছিল ব'লে?'—এবার আমি কথা পেয়েছি—'শক্ত মানে? মরবার আগে পর্য্যন্ত বিছানায় সোজা হয়ে ব'সে তামাক খাওয়া—

'সে কি হে?' ওর চোখে বিস্ময়—'তোমার ঠাক্‌মা কি তামাক—'

'বল্‌তে দাও'—নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায় কপাল চাপ্‌ড়াই—'কি বল্‌ছিলুম—তামাক খাওয়া? তিনি তামাক খাবেন কেন? কব্‌রেজের তামাক খাওয়া দেখে, গীতা শোনা ছিল তাঁর সবচেয়ে আনন্দের—

বল্‌তে বল্‌তে দেখি ট্রেণ বর্দ্ধমানে এসে গেছে।

বন্ধু জানলা দিয়ে দেখে চম্‌কে উঠ্‌লো—'শক্তিগড়ে থাম্‌লোনা? আমার যে সেখানে নাব্‌বার কথা! এই কুলী, গাড়ী কতক্ষণ থাম্‌বে?'

'দশমিনিট বাবু। লেট হয়েছে, আগেই ছেড়ে যাবে।'

পকেট থেকে এক গোছা চাবি বার ক'রে বন্ধু সুটকেস্ খুল্‌তে গেল—তালা খুল্‌লোনা—ও বল্‌লে 'আমায় যে টেলিগ্রাম করতে হবে, টাকা এতে র'য়ে গেল, ওদিকে গাড়ী ছেড়ে দেয়—'

আমার ভয় হচ্ছিল তালা না খোলা পেয়ে ও যদি না নাবে।

একখানা নোট এগিয়ে দিয়ে বলি, 'এই নিয়ে কাজ সারো।'

'ধন্যবাদ' ব'লে লাফিয়ে নেবে পড়লো ও। জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি ওয়েটিংরুমের দিকে চলেছে, কোনো তাড়া নেই যেন!

কুলিরা চেঁচায়, 'গাড়ী খুল্‌লো!'

গর্দ্দভটা ত এলো না, আমার টাকা ত গেল, তার দামী সুটকেস্‌টাও যে পড়ে রইলো!

জান্‌লা দিয়ে আমি দেখ্‌তে লাগলুম—আস্‌ছে কিনা। চেকার এক ভদ্রলোককে নিয়ে এলো, দেখুন এটা আপনার কিনা।

ভদ্রলোক চিন্‌লেন, আমাকে নয়—তাঁর সুটকেসকে—হাওড়ায় যা ভুল গাড়ীতে কুলিরা তুলে দিয়েছিল।

সুটকেস নিয়ে তিনি চ'লে গেলেন।

এর পর থেকে নতুন লোক আলাপ করতে এলে বেশী চালাক সাজ্‌বার চেষ্টা করব না।*

---

* বিদেশী অনুসরণ

পল্লী কৃষি-প্রতিষ্ঠান

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

বিভিন্ন দিকে পল্লীবাসীদের এবং পল্লী অঞ্চলের উন্নতি কল্পে অনেক সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় পল্লী প্রতিষ্ঠান আছে। উদাহরণ স্বরূপ, পল্লী কৃষি সমিতি, ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি, পল্লী সংগঠন সমিতি পল্লীমঙ্গল সমিতি, সমবায় সমিতি এবং এইরূপ অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাদের পরস্পরের কার্য্যে পরস্পরের মধ্যে তেমন কোনো যোগাযোগ ও সহযোগিতা নাই, প্রত্যেকেই নিজের পদ্ধতিতে এবং নিজের গণ্ডীর মধ্যে কাজ করিতেছে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই ইহাদের অনেক কাজ অনেক বিষয়ে প্রায় একই রকমের; কেবল ইহাই নহে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একই ব্যক্তিরা ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিয়া থাকেন। আমি যখন সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিলাম তখন বহুবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, পল্লী অঞ্চলে এই-রূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র যদি একটি প্রতিষ্ঠান থাকে তাহা হইলে সকল দিকেই সুবিধা হয়। অন্ততঃ একই ব্যক্তিরা বিভিন্ন জাতিগঠনকারী বিভাগের কর্ম্মচারীদের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথক পৃথক পরিদর্শনের জন্য বারবার উপস্থিত থাকার কষ্ট ও অসুবিধা হইতে অব্যাহতি পাইবেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান পল্লীবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিবে এবং সকল প্রয়োজনীয় উপদেশ দিবে; সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে সমবেত ভাবে কাজ করিবার জন্য পল্লীবাসীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করিবে; এবং তাহাদের নিজের উন্নতি ও দেশের উন্নতির জন্য তাহাদিগকে অত্যাবশ্যকীয় সাধারণ দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবার চেষ্টা করিবে। বিভিন্ন জাতিগঠনকারী বিভাগের কর্ম্মচারীগণ একই সময়ে একত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিবেন। একবার একটি জাতিগঠনকারী বিভাগের একজন অতি উচ্চ কর্ম্মচারীর সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল; কিন্তু এই প্রস্তাবে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন যে, পল্লী অঞ্চলে আমার প্রস্তাব অনুযায়ী কেবলমাত্র একটি প্রতিষ্ঠান থাকিলে বিভিন্ন জাতিগঠনকারী বিভাগগুলির কোন অস্তিত্বই থাকিবে না; কেননা প্রত্যেক বিভাগ বিশেষ কোন কাজ দেখাইতে পারিবে না; তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক বিভাগ প্রতি বৎসরে যত সমিতি গঠন করে তাহার সংখ্যার দ্বারাই প্রত্যেক বিভাগের কার্য্য তৎপরতা ও কার্য্য দক্ষতা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রধানতঃ বিবেচিত হয়। এই আলোচনার কথা এ স্থলে উল্লেখ করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হইল, কিন্তু যাঁহাদের উপর জাতি-গঠনকারী বিভাগগুলির পরিচালনের ভার ন্যস্ত ছিল তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তাহার কতকটা আভাষ ইহা হইতে জানা যাইবে। দুঃখের বিষয় এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী এখনও বর্ত্তমান।

নানা প্রকারের আকস্মিক দুর্ঘটনার সময় পল্লীবাসীদের সাহায্য করিবার ও উপদেশ দিবার জন্য অনেকবার গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে এবং ইহার জন্য বহু অর্থ ব্যয় এবং সময় ও শক্তি নিয়োগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক বারেই তখনকার উদ্দেশ্য সাধনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানগুলি লোপ পাইয়াছে। পল্লী অঞ্চলের স্থায়ী উন্নতি বিধান করিবার জন্য এই সকল প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ী ও কার্য্যকরী করিবার জন্য কোনো চেষ্টা হয় নাই। কেবলমাত্র একটি উদাহরণ দিতেছি; স্বেচ্ছাধীন পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের সময়ে (১৯৩৮-৪০) বাঙ্গলা দেশের পল্লী অঞ্চলে প্রায় ৫০,০০০ "পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ" কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল এবং এই সকল কেন্দ্র কেবল যে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করিয়াছিল তাহা নহে, ইহারা উন্নত কৃষি সম্বন্ধে প্রচার কার্য্যও করিয়াছিল। এই সকল কেন্দ্র গঠন করিবার ও পরিচালনা করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ও হইয়াছিল; ইহা ছাড়া প্রত্যেক বৎসরে প্রত্যেক কেন্দ্রেও দক্ষ কর্ম্মী-দিগকে পদক ও প্রশংসাপত্র দেওয়ার জন্য অর্থ ব্যয়ও কম হয় নাই। স্বেচ্ছাধীন পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের বিশেষ কর্ম্মচারী হিসাবে এই সকল কেন্দ্রকে স্থায়ী পল্লী-কৃষি-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলাম কিন্তু তখনও আমার এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। "অধিকতর খাদ্য উৎপাদন কর" প্রচার কার্য্যের সময়েও আমার এইরূপ প্রস্তাব কর্ত্তৃপক্ষদের মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। ১৯৪২ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত আমি "অধিকতর খাদ্য উৎপাদন কর প্রচার" কার্য্যের বিশেষ কর্ম্মচারী ছিলাম।

"পল্লী কৃষি-প্রতিষ্ঠান" যে কেবল কৃষি ও তৎসম্পর্কীয় বিষয়াবলীর উন্নতি সাধনে নিযুক্ত থাকিবে তাহা নহে; আমার উদ্দেশ্য ছিল ইহার কার্য্যাবলীর সহিত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষিজাত পণ্যের ক্রয় বিক্রয়, চালান, পল্লীবাসীদিগের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ প্রভৃতি বিষয়ও যুক্ত থাকিবে এবং ক্রমে ক্রমে ইহাকে এমন এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইবে যাহা পল্লী অঞ্চলের সকল দ্রব্যের ও সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের আধার বস্তু হইবে। প্রত্যেক পল্লী প্রতিষ্ঠানে পৃথক পৃথক বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক শাখা থাকিবে এবং ইহার ক্রিয়াশীলতার দ্বারা গ্রামের সকলের সকল রকমের প্রয়োজন মিটিবে।

অবশ্য উপরোক্ত ধরণের ও আকারের পল্লীপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে বহু সময় লাগিবে। কিন্তু ইহার সূচনা করা একান্ত দরকার। পল্লী অঞ্চলের লোকেদের "দেহ ও প্রাণ" একত্র রাখিবার জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা ইহার প্রথম কাজ হইবে। এই সকল দ্রব্যাদির মধ্যে যে সকল দ্রব্যাদি মাটি হইতে অধিকতর পরিমাণে শস্য উৎপাদনে অত্যাবশ্যক সেই সকল দ্রব্যাদি প্রথমত সরবরাহ করাই পল্লী প্রতিষ্ঠানের

প্রধান কর্ত্তব্য হইবে। ইহাতে যে কেবলমাত্র পল্লীবাসীদিগকে বাঁচাইয়া রাখা হইবে তাহা নহে, ইহাদ্বারা দেশের অনেক বড় বড় সমস্যারই সমাধান হইবে। সুতরাং প্রথমেই প্রত্যেক পল্লী কৃষিপ্রতিষ্ঠানকে একটি আদর্শ বীজাগার স্থাপন করিয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। বীজাগারের পরিচালনা সুষ্ঠভাবে হওয়া দরকার; বীজাগারের সহিত একটি গ্রন্থাগার ও একটি প্রদর্শনী ঘর থাকিবে; গ্রন্থাগারে উপযুক্ত পুস্তক, পুস্তিকা, সাময়িক পত্রিকা, প্রচার পত্রিকা প্রভৃতি এবং প্রদর্শনী ঘরে নানাবিধ শস্যের, সারের, কৃষিযন্ত্রাদির নমুনা, ছবি, নক্সা প্রভৃতি থাকিবে। প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য কাজের জন্য অন্যান্য শাখা উহার সহিত যুক্ত হইবে।

যাতায়াতের সুবিধা আছে এইরূপ মধ্যবর্ত্তী স্থানে বীজাগার স্থাপিত হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং বীজাগারের আশেপাশে এমন স্থান থাকা দরকার যাহাতে ভবিষ্যতে পল্লী-প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শাখা স্থাপিত হইতে পারে ও সভা, মেলা, প্রদর্শনী প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইতে পারে। একটি নির্দ্দিষ্ট নক্সা অনুযায়ী সকল বীজাগার নির্ম্মিত হইলেই ভাল হয়।

সমবায় সমিতির আইন অনুসারে প্রত্যেক পল্লী কৃষি-প্রতিষ্ঠান গঠিত করা উচিৎ। ইহার সুচারু পরিচালনার জন্য উপযুক্ত বিধি উপবিধি প্রভৃতি প্রণয়ন করা আবশ্যক। এক একটি পল্লী কৃষিপ্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত এলাকার সাক্ষাৎভাবে নির্ভরশীল প্রত্যেক পরিবারের একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিকে পল্লী কৃষি-প্রতিষ্ঠানের সভ্য করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। সভ্যদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করাই পল্লী প্রতিষ্ঠানের প্রথম কাজ হইবে।

শস্য বপনের প্রত্যেক ঋতুর আরম্ভের অনেক পূর্ব্বে সভ্যদিগের প্রয়োজনীয় বীজ, সার, কৃষিযন্ত্র প্রভৃতির একটি তালিকা অতি যত্নপূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়া উহার একটি মোট হিসাব কৃষিবিভাগকে পাঠাইতে হইবে; কৃষিবিভাগ উক্ত হিসাব অনুযায়ী দ্রব্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করিবে। বীজের সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিবিভাগ বীজের উৎপাদিকা শক্তির একটি লিখিত বিবরণী পাঠাইবে। কৃষিবিভাগের স্থানীয় কর্ম্মচারী বীজাগারে বীজ উপযুক্তভাবে রক্ষিত হইতেছে কিনা সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

কৃষিবিভাগ হইতে দ্রব্যাদি বীজাগারে পৌছিলে পল্লী কৃষি সমিতি উহা সভ্যদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও নিরপেক্ষ ভাবে বন্টন করিয়া দিবে। যে সকল সভ্য নগদ মূল্যে বীজ বা সার ক্রয় করিতে পারিবে না, উপযুক্ত খত লইয়া তাহাদিগকে বীজ ও সার সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা থাকা দরকার; সাধারণতঃ শস্য কাটার পর তাঁহাদিগকে উক্ত খত অনুযায়ী সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। যদি কোন বীজাগারে শস্য রক্ষিত করিবার ব্যবস্থা থাকে এবং পল্লী কৃষিপ্রতিষ্ঠান উহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারে তাহা হইলে সভ্যদিগের নিকট হইতে খত অনুযায়ী নগদ অর্থ না লইয়া উপযুক্ত পরিমাণ শস্য গ্রহণ করা যাইতে পারে।

অংশ বিক্রয় করিয়া, ঋণ করিয়া ও টাকা জমা রাখিয়া পল্লী কৃষি-প্রতিষ্ঠান অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবে। কৃষিবিভাগে বীজ, সার প্রভৃতি সরবরাহের জন্য অনুরোধ পত্রের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। সাধারণতঃ সভ্যদের মধ্যে বীজ বিতরণের পরেই অবশিষ্ট অর্থ কৃষিবিভাগকে দিতে হইবে; কিম্বা কৃষিবিভাগের সহিত চুক্তি অনুসারে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

যদিও পল্লী প্রতিষ্ঠানগুলি সমবায় সমিতির আইন অনুযায়ী গঠিত করাই লক্ষ্য হওয়া উচিৎ; কিন্তু প্রথম অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই বহু বাধা উপস্থিত হইবে। বিশেষতঃ প্রথমেই সভ্যদের সংখ্যা এত অধিক হইবে না যে যাহার দ্বারা উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা যায়; এবং উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিলে পল্লী কৃষিপ্রতিষ্ঠানকে কার্য্যকরী করা যাইবে না এবং তাহা না করিলে স্থানীয় ব্যক্তিদের উৎসাহও বর্দ্ধিত করা যাইবে না। সুতরাং যে সকল ধনাগারের (ব্যাঙ্ক) কার্য্যতালিকার মধ্যে পল্লী অঞ্চলের উন্নতিবিধান অন্তর্ভুক্ত আছে সেই সকল ধনাগার প্রথম অবস্থায় বীজাগার স্থাপন ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ইহাই আশা করিতে হইবে যে তাঁহারা কঠোর পুঁজিপতি বা মহাজনের খেলা খেলিবেন না; পল্লীবাসীদের বন্ধু, নেতা ও পথপ্রদর্শক হিসাবেই তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করিবেন। তাঁহারা যে ক্ষতি স্বীকার করিয়া বীজাগার পরিচালনা করিবেন এ কথা বলিতেছি না; তাঁহারা ন্যায়সঙ্গত লাভেই সন্তুষ্ট থাকিবেন ইহাই বলিতেছি।

সুষ্ঠুভাবে বীজাগার পরিচালনার জন্য প্রত্যেক ধনাগারকে উপযুক্ত কর্ম্মচারীবৃন্দ নিযুক্ত করিতে হইবে; এই সকল কর্ম্মচারীদের মধ্যে স্থানীয় সম্মানীয় কয়েকজন ব্যক্তি থাকা বাঞ্ছনীয়। বীজ বিতরণে এবং বীজাগারের অন্যান্য কার্য্যে সাহায্য করিবার ও উপদেশ দিবার নিমিত্ত একটি পরামর্শ সমিতি গঠিত হওয়াও আবশ্যক। সমবায়ের উপকারীতা পল্লী অঞ্চলে প্রচার করা বীজাগারের কর্ম্মীবৃন্দের এই সমিতির অন্যতম প্রধান কার্য্য হইবে; কারণ পল্লী অঞ্চলে সমবায় প্রণালীতে পল্লী কৃষি প্রতিষ্ঠান গঠিত করা এবং প্রতিষ্ঠানের উপর বীজাগারের ভার ন্যস্ত করাই ধনাগারের চরম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইবে।

বর্ত্তমানে পশ্চিম বঙ্গে কৃষিবিভাগ কর্ত্তৃক পরিচালিত ৮৮টি বীজাগার আছে এবং এই সকল বীজাগারের মারফৎ বৎসরে প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের বীজ, সার, কৃষিযন্ত্র প্রভৃতি সরবরাহ হইয়া থাকে। কিন্তু শুনিতে পাই এই সকল বীজাগার লোকসানে চলিতেছে। কিন্তু এই বীজাগারে লোকসান হইবার কারণ নাই। অনেক ক্ষেত্রে নূতন শস্যের বীজ বা নূতন সার বা নূতন কৃষিযন্ত্র প্রচলনের জন্য এবং অধিকতর খাদ্য উৎপাদনের জন্য কিম্বা কৃষকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য বিনামূল্যে বা কম মূল্যে বীজ, সার, কৃষিযন্ত্র প্রভৃতি সরবরাহের প্রয়োজন হইতে পারে; কিন্তু এই সকল সরবরাহের হিসাব পৃথকভাবে রাখিতে হইবে; বীজাগারের খাতায় উহাদের হিসাব রাখা উচিৎ হইবে না।

কৃষি বিভাগ কর্ত্তৃক বীজ সরবরাহ সম্বন্ধে অনেক প্রকারের অনেক অভিযোগ শোনা যায় এবং এই সকল অভিযোগের শেষ নাই। ইহা

ছাড়া জনসাধারণের ধারণা এই যে বীজ সরবরাহ সম্বন্ধে কৃষি বিভাগ অকর্মণ্যতারই পরিচয় দিয়াছেন এবং ইহার ফলে সাধারণের তহবিল হইতে বিপুল পরিমাণ অর্থ নষ্ট হইয়াছে। যত শীঘ্র কৃষি বিভাগ বীজাগারের পরিচালনা ত্যাগ করেন ততই মঙ্গল। সুতরাং দায়িত্বপূর্ণ ও বিশ্বস্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর বীজাগারগুলির ভার অর্পণ করিবার জন্য চেষ্টা করা একান্ত দরকার। অন্ততঃ পরীক্ষামূলকভাবে কয়েক স্থানের বীজাগারের ভার উপযুক্ত ধনাগারের উপর ন্যস্ত করা আশু কর্ত্তব্য। কৃষি বিভাগের সহিত ধনাগার কর্তৃক পরিচালিত বীজাগারের লেন দেন সমবায়-প্রণালীতে গঠিত পল্লী-কৃষি-প্রতিষ্ঠানের মতই হইবে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন সাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী লইয়া এক একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্ম্মের এবং অভাব মোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্য্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারেন তবেই স্বায়ত্বশাসনের চর্চ্চা দেশের সর্ব্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে।"

অভিশাপ

শ্রীঅশোককুমার মিত্র

এমনিতেই মন খারাপ, তার উপর আবার আর এক বিপত্তি! ঘরকাতুরে বাঙালী আমি, দেশ-ঘর, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপড়শী, পরনিন্দা-পরচর্চা, এমনকি পাড়ার অমন জমাটি রবিবারের রকটি পর্য্যন্ত ছাড়িয়া বহু দূরদেশে চাকরির খাতিরে পাড়ি দিতেছি। একমাত্র ভরসা ছিল যে গৃহিণী তাঁহার বাপের বাড়ী থাকার বায়নাক্কা না করিয়া আমার সঙ্গ নিয়াছেন, কিন্তু এমনই বরাত, পাঞ্জাব মেলটা যেই বেনারস ষ্টেসন ছাড়িয়া আরও পশ্চিমের দিকে রওনা দিল অমনি বৌএর মুখখানা হাঁড়ির মত হইয়া গেল!

—"তীর্থস্থানের ওপর দিয়ে গাড়ীখানা চলে গেলো, আর বিশ্বনাথ দর্শন হলো না আমার, যেমনি কপাল আমার···"

তর্ক করিয়া যুক্তি দেখাইয়া লাভ নাই। মাসীপিসীর "আদর" খাইতে খাইতে "জয়েনিং টাইম" যে ফুরাইয়া গিয়াছে, তাহা আর কাহাকে বুঝাইব? নরম সুরে ভাল কথা বলিতে গেলাম, "পরের বারে এই পথেই তো আবার···"

কথাটা ভাল করিয়া শেষ করিতে পর্য্যন্ত দিলেন না তিনি!

—"জানি জানি, থাক্, হয়েছে, আর সোহাগ দেখাতে হবে না!"

একেবারে চুপ হইয়া গেলাম। মুখটা যতটা পারি গোমড়া করিয়া জানালার বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। পাঞ্জাব মেল, দুর্দান্ত গতি এর, বাতাসের ঝাপ্‌টায় চোখ আপনি ঝাপ্‌সা হইয়া যায়।

ও বেঞ্চ হইতে উঠিয়া আসিয়া আমার পাশে বসিয়া বৌ অতি আদরের সুরে তখন প্রশ্ন করেন—"হ্যাঁ গো, বেনারসই যে কাশী, আগে বলোনি তো?"

কি উত্তর দিব? চুপ করিয়া ছিলাম, চুপ করিয়াই রহিলাম।

—"কি রাগ হলো নাকি? না হয় পরের বারেই দেখবো গো, বাবা বিশ্বনাথ এবার টানলেন না, এই আর কি—তাই না?"

গম্ভীরভাবে উত্তরে বলি—"তাই হবে বোধহয়"।

পাঞ্জাব মেলটা তখন বেনারস ও প্রতাপগড়ের মাঝে। একেই বেশ একটু "লেট" হইয়া গিয়াছে, তায় আবার এই লম্বা প্রায় আশি মাইল একটানা পথ। ট্রেণখানা দুড়দুড় করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে মাঠ, ঘাট, নদী, নালা ভাঙ্গিয়া। কোনোদিকে চোখ ফিরিয়া তাকাইবারও সময় নাই যেন। ছোট ছোট ষ্টেসনগুলো, মায় তার কর্ম্মচারীগুলো পর্য্যন্ত যেন ভয়ে জড়সড় হইয়া গিয়াছে। কি, না—"ডাকগাড়ী আস্‌ছে, তায় আবার লেট্ রান করছে"। ছোট ষ্টেসনগুলোর ষ্টেসনমাষ্টারদের ভাব অনেকটা—"আজ গেল বুঝি চাকরীটা!" ডাকগাড়ীটাকে কোনরকমে পাচার করিয়া দিতে পারিলেই যেন বাঁচিয়া যায় তা'রা। বিদ্‌ঘুটে দৈত্য একটা!

জানালার বাহিরের দিকে তাকাইয়া আমি তখন ভাবিতেছিলাম, কলেজে ফোর্থ ইয়ারে-পড়া অবিবাহিতা, কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা ওই মেয়েটির কথা! যে নামিয়া গেলো বেনারস ষ্টেসনে তা'র প্রেমিক প্রফেসারের সহিত। হাওড়া ষ্টেসন-প্লাটফর্মে দেখিয়াছিলাম তাঁদের। আমাদের তুলিয়া দিতে আসিয়া, ওদের কলেজের ডিমন্‌ষ্ট্রেটর আমার বন্ধু বিমল আড়ালে ডাকিয়া ফলাও করিয়া ওদের প্রেমোপাখ্যানটা বলিয়াছিল আমায়। প্রস্তাবও করিয়াছিল, "যাও না, ওদের সঙ্গে এক কামরায়, অনেক রঙ্গরস দেখতে পাবে'খন।" ইঙ্গিতে গৃহিণীর দিকে দেখাইয়া দিতেই বিমল বলিয়াছিল, "ওই তো মুশকিল—বৌ নিয়ে পথঘাট চলা। রাজ্যিসুদ্ধ লোক তোমার বৌএর দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকবে, কেউ কেউ তা'কে দৃষ্টি দিয়ে গিলতে থাকবে যেন, কিন্তু তুমি কোন' পরস্ত্রীর দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়েছো কি, অমনি বৌএর দৃষ্টিশাসন।"

রসালো প্রসঙ্গটা আবার উত্থাপন করিয়া বিমল বলিয়াছিল, "বাড়ীতেও পড়ান বলে পূজার ছুটিতে হাওয়া বদলানোর অজুহাতে প্রফেসার তাঁর ছাত্রীকে নিয়ে চলেছেন বেনারসের কোন্ এক অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লীতে।" কেমন একটা দৃষ্টিকটু অদ্ভুত মুখভঙ্গি করিয়া আবার বলিয়াছিল, "প্রেম করা হচ্ছিল, এদিকে বিজ্ঞানও করা চাই। অত সইবে কেন রে ভাই—এখন ঠেলা সামলাতে চলেছেন বেনারসে।"

সমাজসংস্কারদুরন্ত মনটা সাময়িকভাবে বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল তখন। স্ত্রী পানের ডিবা হইতে দু'খিলি পান মুখে পুরিয়া, ষ্টেসন প্লাটফর্মেই মুখটি উঁচু করিয়া আলগোছা আলগোছা খানিকটা জরদা মুখে ফেলিলেন। মাথার ঘোমটাটা আবার ঠিক করিতে করিতে আমাদের দিকেই আগাইয়া আসাতে প্রসঙ্গটা স্বইচ্ছায় তখন চাপা দিয়াছিলাম। কিন্তু এখন, বাহিরের দিকে তাকাইয়া হঠাৎ তাঁহাদের কথাই কেবলই মনে পড়িতে লাগিল।…জীবনের গতি ওদের এই পাঞ্জাব মেলের মতই প্রবল হয়তো, কিন্তু এ প্রেমোপাখ্যানের পরিণতি কোথায় কে জানে?…দু'জনেই পরস্পরকে সত্যই যদি ভালবাসিয়া থাকে, সমাজের একটা সামান্য বিবাহ-বন্ধন নিতে এদের বাধা কোথায়?… সন্তান-সন্ততি নিয়া সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘর বাঁধলেই বা বিপত্তি কিসের?…

ছোট একটি ষ্টেসনকে দূর করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া পাঞ্জাব মেলটা আগাইয়া চলিল। আমিও ভাবিলাম, "দূর্-তোর মরুকগে, দাও ফেলে ছেঁড়া কাঁথা। পরের ব্যাপারে অযথা মাথা ঘামাই কেন?"…

এই ঘটনার পর বহুদিন গত হইয়াছে। শুনিয়াছি প্রফেসার তাঁ'র প্রিয়া ছাত্রীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। স্বামীস্ত্রী হইয়া ঘর বাঁধিয়াছেন তাঁরা। সুখেশান্তিতে আছেন—কি, দুঃখদৈন্যে দিন কাটাইতেছেন সে খবর আর পাই নাই, পাইবার চেষ্টাও করি নাই।

দোষ আমারই। ছেলেমেয়েগুলোকে বাড়ীতে রাখিয়া বিশ্বনাথের মন্দির দেখিতে গিয়াছি, সঙ্কটার মন্দিরের পাণ্ডাটিকে কিছুতেই বুঝাইতে পারি না যে আমরা সন্তান-কামনায় সেখানে যাই নাই। তা'র দৃঢ় ধারণা, সন্তান-কামনাই আমাদের মন্দিরপ্রবেশের একমাত্র উদ্দেশ্য! কথা কাটাকাটি, ঝগড়াঝাটি করিয়া কোনরকমে পাণ্ডাটাকে পাঁচসিকা দিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিলাম। মা সঙ্কটার ক্রোধ আমাদের উপর পড়িবে কিনা, মা সঙ্কটাই জানেন! মন্দিরের বাহিরে আসিতেছি, হঠাৎ দেখি প্রফেসার দম্পতী মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন। থমকাইয়া দু'দণ্ড তাকাইয়া দেখিতেছি, গৃহিণী পিছন ফিরিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন—"আবার কোনো পাণ্ডার পাল্লায় পড়লে নাকি?"—"না, এই আসছি" বলিয়া দ্রুতপদে আগাইয়া গেলাম।

বেনারস বা কাশীর বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া চাকুরীস্থলে পরিবার নিয়া ফিরিতেছি। লটবহরের শেষ নাই। কোলেরটির পথে খাবারের ব্যবস্থা। তার উপরেরটির ট্রেণে খেলবার জন্য রাজ্যের খেলনা, অন্য সকলের জন্য খাবার-ভর্ত্তি টিফিন কেরিয়ার, জলের কুঁজো, অভিধানের মত দেখিতে গিন্নীর একটি পানের ডিবা। সঙ্গে জরদার কৌটা, টাইম টেবিল, ছাতা, লাঠি, সাজি, ধামা, পুটলী, ট্রাঙ্ক, বেডিং সব নিয়া পঁচিশটা 'মাল'। বিশ্বনাথের প্রসাদের বোঁচকাটি আবার মালের মধ্যে গোনা হইবে

না—যতবার 'মাল' গণিব, ওইটি একটি অস্বস্তিকর "আইটেম্"। মালগুলো এবং এই বিশেষ 'আইটেমটি'ও লেডিজ ওয়েটিং রুমে স্ত্রীপুত্রকন্যাদের কাছে রাখিয়া আসিলাম। পশ্চিমগামী আপ্ পাঞ্জাব মেলটি আসিতে দেরী আছে অনেক। আমাদের ওয়েটিং রুমে আসিয়া আরামকেদারায় পা ছড়াইয়া বসিলাম একটু। হঠাৎ দেখি আমার সেই বহুপুরাতন পরিচিত প্রফেসার আমাদের ওয়েটিং রুমে ঢুকিলেন। সঙ্গে স্ত্রী—তাঁর সেই পুরাণো প্রিয়া ছাত্রী। প্রফেসারের চেহারা ভুলিবার নয়। ভদ্রলোক বেঁটে, কালো এবং খুব মোটা না হইলেও উচ্চতার সাথে তাহার দৈর্ঘ্য সামঞ্জস্য রাখে নাই, তাই মোটাই দেখায় তাহাকে। পরণে ধবধবে ধুতিপাঞ্জাবি, পায়ের রংয়ের সঙ্গে বৈষম্যটা প্রকট হইয়া চোখে লাগে যেন। চুল খুব ছোট করিয়া ছাটা, দাড়ি কামানো, গোঁফটিও প্রায়, কিন্তু নাকের ঠিক নীচে একটা পোকার মত কি যেন সমস্তক্ষণ বসিয়া থাকিয়া দর্শকের মনে একটা অস্বস্তি জাগায়। নাকে একগাদা নস্যি ঠাসা, ডানহাতের দুই আঙুলের মাঝে একথাবা নস্যি সবসময়ই তৈয়ারী—যে কোন মুহূর্তেই নাকের গর্তে যাইতে প্রস্তুত। প্রফেসারের সাথে বেখাপ্পা বেমানান তাঁর স্ত্রী। চমৎকার ধবধবে রং এঁর, লম্বায় স্বামীর চেয়ে কম হইবেন না। মুখ-চোখ নিখুঁত সুন্দরতো বটেই, বুদ্ধি ও দীপ্তিও যেন উছলাইয়া পড়িতেছে তাঁর সারা শরীর হইতে, অত্যন্ত অপ্রতিভ আধুনিকা এক রমণী। কিন্তু তাঁর ওই মুদ্রাদোষ। চিনিতে তাই এঁকেও কষ্ট হয় না মোটে—চশমাটা ঠিকই আছে, তবুও ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ অন্তর নাক কুঁচকাইয়া চশমাটা যেন ঠিক করিয়া লইতেছেন! পরস্ত্রী হইলেও বেশ দু'দণ্ড হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিলাম এঁর দিকে। গৃহিণী পাশে থাকিলে হয়তো চিমটি কাটিয়া, দূরে থাকিলে দৃষ্টিশাসনে জানাইয়া দিত, আমি অত্যন্ত অভদ্র এবং অসভ্য, পরস্ত্রীর দিকে অমন্ করিয়া তাকাইতে নাই।

প্রফেসার তাঁর নিজের সুটকেশটি একটি চেয়ারের উপর রাখিয়া, স্ত্রীকে পাশের কামরায় নিয়া গেলেন। ভাবিলাম, ফিরিয়া আসিলে আলাপ করিব। ডিমন্‌ষ্ট্রেটার বন্ধু বিমলের কথা বলিলে নিশ্চয়ই আলাপ জমানো সহজসাধ্য হইবে। কিন্তু আমরা পুরুষ, এত সহজে এই সামান্য কাজটিও পারি না। মেয়েরা পারে ঠিকই।··

পাঞ্জাবমেলটা বেনারস এবং প্রতাপগড়ের মাঝে তখন। গৃহিণী কি যেন একটা ভাবিতেছেন—মনটা বোধহয় তাঁর ভাল নয়। পাশে বসিয়া প্রশ্ন করাতে গৃহিণী ওই প্রফেসারের স্ত্রীর সাথে ওয়েটিং রুমে তাঁর আলাপের গল্প সুরু করিলেন। দরকারী অদরকারী, ব্যক্তিগত কত গল্পই না হইয়াছে এঁদের, ওই অতটুকু সময়ের মধ্যে!···

প্রফেসার-পত্নীর সন্তান-কামনার বহু প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।···তাঁহারা কাশী তীর্থ করিয়া এখন হরিদ্বার হৃষিকেশ চলিয়াছেন।···বহু সুখ ঐশ্বর্য্য থাকা সত্ত্বেও নিঃসন্তান থাকিয়া তাঁহারা বড় দুঃখী।···গৃহিণীর দরদী মন এঁদের জন্য কাঁদিতেছে। মুখটা তাই ভারী করিয়া গৃহিণী আবার কামরার বাহিরে তাকাইয়া আছেন।··· বহুদিন আগে বেনারস ও প্রতাপগড়ের মাঝে যাহা চিন্তা করিয়াছিলাম তাহারই পারম্পর্য্য খুঁজিবার প্রয়াসে আমার মন এখন ব্যর্থ-প্রচেষ্টায় এলোমেলো ফিরিতে লাগিল।

পাঞ্জাবমেলটা বিরাট একটা মাঠের মাঝে 'সিগনাল' না পাইয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

বুনিয়াদী শিক্ষার ঐতিহাসিক পট-ভূমি

শ্রীমোহিতকুমার সেনগুপ্ত

মহাত্মা গান্ধী বুনিয়াদী শিক্ষার কথা দেশবাসীর নিকট প্রচার করেন ১৯৩৭ সালে। উৎপাদন-মূলক কর্ম্মের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়া শিশুকে স্বাবলম্বী করিবার প্রয়াসই হচ্ছে বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য। কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষার কথা গান্ধীজী জগতের সম্মুখে প্রথমে আনিয়াছেন এ কথা বলিতে অবশ্য পারা যায় না। কিন্তু উৎপাদনমূলক কর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা দিবার কথা এবং শিক্ষার ভিতর দিয়া স্বাবলম্বী, শোষণহীন সমাজ গঠনের কথা গান্ধীজীই প্রথমে বলিয়াছেন। জগতে কোন ভাবধারাই হঠাৎ আসে না, তাহার পশ্চাতে থাকে একটা ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাস। বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে। শিক্ষা বিষয়ক কি কি অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে সুদৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

গান্ধীজী নিজের শিক্ষা-জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গিয়া দেখিলেন যে বিদ্যালয়ে তিনি যাহা শিখিয়াছিলেন কর্ম্মজীবনে তাহা বিশেষ কাজে লাগিল না। নিজে স্বীকার না করিলেও বলিতেই হইবে, গান্ধীজী বিদ্যালয়ে ভাল ছেলেই ছিলেন। কিন্তু Barristerই পড়িবার জন্য বিলাত গিয়া দেখিলেন যে অপরিচিত পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার শিক্ষা তিনি বিদ্যালয়ে পান নাই। বিদ্যালয়ে পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়া এমন কিছুই শেখেন নাই যাহা তাঁহাকে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে সাহায্য করিতে পারে। তখন হইতেই মহাত্মাজীর মনে হইল বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির চাই আমূল পরিবর্ত্তন। শিশুর জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধবিহীন শিক্ষার মূল্য বড় বেশী দেওয়া যায় না—সত্যিকার শিক্ষা সৌধ গড়িয়া উঠিবে শিশুর সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে ভিত্তি করিয়া।

কর্ম্ম উপলক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়া প্রবাসী ভারতীয়দের দুঃখ কষ্ট দেখিয়া গান্ধীজীর মন গলিয়া গেল। ভারতীয়দের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য গান্ধীজী আন্দোলন সুরু করিলেন। সে সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সকল সংবাদপত্র প্রচলিত ছিল তাহার বেশীর ভাগই পরিচালিত হইত ইউরোপীয়দের দ্বারা। তাহার ফলে ভারতীয়দের অভাব অভিযোগ স্থান পাইত না সংবাদ ও সাময়িকপত্রে। ভারতীয়দের অভাব অভিযোগের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য একখানি সংবাদপত্র বাহির করিলেন তিনি। তারপর সংবাদপত্র ও ছাপাখানা লইয়া গিয়া Phoenix colony স্থাপন করেন। গান্ধীজী ঠিক করেন এই colony হইবে নূতন আদর্শে। এখানে সকল কর্ম্মীই পাইবে সমান মর্য্যাদা। সংবাদপত্রের editor হইতে compositor পর্য্যন্ত সকলকেই সমান হারে মাসে ৩ পাউণ্ড হিসাবে বেতন দেওয়া হইবে। আমরা বলিতে পারি যে এই Pheonix colonyতেই আরম্ভ হইল মহাত্মাজীর সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত শোষণহীন সমাজের বাস্তব পরীক্ষা। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে ১৯৩৭ সালে বুনিয়াদী শিক্ষায় সমাজের যে রূপের চিত্র মহাত্মাজী সকলের সামনে ধরিয়াছেন তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে Phoenix colonyতে।

আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়দের সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য গান্ধীজী আরম্ভ করিলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলন। দলে দলে ভারতীয়দের জেলে দেওয়া হইতে লাগিল। এখন সমস্যা দাঁড়াইল, যাহারা জেলে যাইতেছে তাহাদের পরিবারবর্গের প্রতিপালন লইয়া।

অনেক চিন্তা করিয়া গান্ধীজী Tolstoy farm নামে একটী কৃষি উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। স্থির হইল যে এই Farmএর অধিবাসীরা ছোট বড় সকলেই কিছু না কিছু উৎপাদন করিবে এবং ইহাদের লক্ষ্য হইবে Tolstoy Farmকে স্বাবলম্বী করিয়া তোলা। এই Farmএর সকল কাজই অধিবাসীদের পালাক্রমে করিতে হইবে। আমার মনে হয় সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বাবলম্বী সমাজ-গঠন করিবার যে অভিজ্ঞতা গান্ধীজী Tolstoy Farm পরিচালনা করিবার সময় অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই ভবিষ্যতে বুনিয়াদী-বিদ্যালয়ের আদর্শ-সমাজের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

Tolstoy Farmএ গান্ধীজী শিক্ষাবিষয়ক আর একটী সমস্যার সম্মুখীন হইলেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে অর্থের সন্ধানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোক গিয়াছিল। Tolstoy Farmএর অধিবাসীবৃন্দ ছিল নানা ভাষাভাষী। ইহাদের শিশুরাও ছিল বিভিন্ন ভাষাভাষী। এই সকল শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা কি করা যায় ইহা হইল গান্ধীজীর সমস্যা। হিন্দী, উর্দ্দু, গুজরাটী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষাভাষী শিক্ষক নিযুক্ত করা Tolstoy Farmএর অধিবাসীদের ছিল সাধ্যাতীত। তাই গান্ধীজী শিশুশিক্ষার এমন একটী মাধ্যমের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন যাহা সমভাবে সকল শিশুর সম্বন্ধে প্রযোজ্য। কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিলেই সকল শিশুকেই একই সময় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। তাই গান্ধীজীর পরিচালনায় এখানে চামড়ার কাজ, চাষের কাজ, কাঠের কাজ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। এইখানেই বলা যাইতে পারে, কর্ম্মকেন্দ্রিক হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদানের গোড়াপত্তন।

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলন শেষ হইল। গান্ধীজী দেশে ফিরিলেন। মহাত্মা গোখেলের পরামর্শে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি আসিলেন শান্তিনিকেতনে। কবির প্রতিষ্ঠিত নূতন বিদ্যালয়ের রূপ দেখিয়া গান্ধীজী মুগ্ধ হইলেন।

এখানে নাই সাধারণ বিদ্যালয়ের মত শিশুদের মধ্যে একটা আড়ষ্ট ভাব। শিশুরা বদ্ধ ঘরের মধ্যে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিক্ষকের মুখনিসৃত অমৃত পান করিতে পারে না। ইহারা মুক্ত আকাশের তলে গাছের ছায়ায় বসিয়া প্রকৃতির মধুর রূপ দেখেন এবং তাহাদের আগ্রহ বিবেচনা করিয়া শিক্ষক পাঠ দান করেন এমন বিষয়—যার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে তার জীবনের অভিজ্ঞতার। এখানে শিশু ও শিক্ষকের সম্বন্ধও মধুর। শিক্ষক ও ছাত্র এখানে একই পরিবারভুক্ত দাদা ও ভাই। এখানে শিক্ষক ও ছাত্র মিলিয়ে সব কাজেই আগাইয়া আসে। আমার মনে হয় গান্ধীজী শান্তিনিকেতন হইতেই প্রেরণা পাইয়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে একটী ছোট-খাট সমাজ বা পরিবার হিসাবে গ্রহণ করিবার কথা বলিয়াছেন।

১৯২১ সালে আরম্ভ হইল অসহযোগ আন্দোলন। মহাত্মাজী দেখিলেন, চলতি স্কুল কলেজে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহাতে প্রকৃত শিক্ষা হইতেছে না। এই সকল স্কুল কলেজ হইতে যাহারা বাহির হইতেছে তাহাদের আত্ম-প্রত্যয়, দেশাত্মবোধ, সেবাবৃত্তি এবং চরিত্রের দৃঢ়তা কোনটাই জাগরিত হইতেছে না। ইংরাজী বাংলা ইতিহাস ভূগোল গণিত ইত্যাদি বিষয়ের ভাসা ভাসা জ্ঞান লইয়া কেরাণী-গিরি করা ছাড়া সাধারণ ছেলেদের অন্য কোন ক্ষমতাই বিকাশ লাভ করে না। তাই গান্ধীজী সকলকে আহ্বান করিলেন। ছেড়ে এস তোমরা গোলামখানা, তোমরা মানুষ হও। গান্ধীজীর ডাকে দলে দলে ছেলে-মেয়েরা বাহির হইয়া আসিল গোলামখানা হইতে। National School এবং National Collegeএ ছেলে মেয়েরা দলে দলে ভর্ত্তি হইল। National School এবং Collegeএ চরখা কাটা ছাড়া বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না। সাধারণ স্কুল এবং কলেজ হইতে দোকানে আফিসে ও স্কুলে picketing করা, রাজনৈতিক procession-এর দল ভারি করা ছাড়া দেশের কোন কাজও এই সব ছেলে-মেয়েরা করিবার সুযোগ পায় নাই। তাই মনের খোরাক না পাইয়া অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকেরা ফিরাইয়া লইয়া গেল সেই পুরাতন গোলামখানায়। ইহাতে সূক্ষ্মদর্শী গান্ধীজীর চোখ এড়াইল না যে, সুচিন্তিত পরিকল্পনার অভাবেই National College ও Schoolগুলি অল্পদিনেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন হইতেই, আমার মনে হয়, গান্ধীজী চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, চরকা কাটার মধ্যে শিক্ষণীয় সম্ভাবনা কি আছে, তাহা দেখিয়া কাজে লাগাইতে হইবে।

বুনিয়াদী শিক্ষার ঠিক পূর্ব্বগামী এবং অগ্রদূত বলা যাইতে পারে মধ্যপ্রদেশের বিদ্যামন্দির পরিকল্পনাকে। এখানে আমরা দেখতে পাই বিদ্যালয়কে গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন ভাবে কল্পনা করা হয় নাই। বিদ্যামন্দিরকে গ্রামের প্রাণকেন্দ্ররূপে কল্পনা করা হইয়াছে। শিক্ষক হইবেন গ্রামের নেতা, সব কাজেই থাকিবে শিক্ষকের হাত। বিদ্যালয়কে ছোট-খাট সমাজ মনে করিতে হইবে। কৃষি, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ইত্যাদি যে সকল বিষয় শিখিলে সুখে জীবন যাপন করা যাইবে তাহাই শিখান হবে। কিন্তু বিদ্যামন্দির পরিকল্পনায় কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষার বীজ নিহিত থাকিলেও ইহা স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করা হয় নাই। বিদ্যালয়ে শিল্প কয়টী থাকিবে এবং শিল্পের মাধ্যমে কি, কেমন করিয়া এবং কতটুকু শিক্ষা দেওয়া যাইবে সে বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। বিদ্যামন্দির মহাত্মাজীর পরিকল্পনা না হইলেও তাঁহার সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত রবিশঙ্কর শুক্ল মহাশয় ইহার মূলে আছেন। এই পরিকল্পনার ত্রুটী লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় মহাত্মাজী উৎপাদনমূলক কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হইবার শিক্ষা ব্যবস্থার কথা দেশবাসীর নিকট প্রচার করিয়াছিলেন। বুনিয়াদী শিক্ষা অজ্ঞানতার তিমিরে আচ্ছন্ন ভারতে নূতন আলোকের সন্ধান দিয়াছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমি বলিতে চাহিয়াছি যে এই আলোকের সন্ধান গান্ধীজী হঠাৎ পান নাই—ইহার পশ্চাতে আছে তাঁহার ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।

পূর্ব্ব-আফ্রিকায় ভ্রমণ

ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ

আফ্রিকায় ডোডামার কাজ শেষ কোরে ভারত সেবাশ্রম সংঘের কর্ম্মীদের টাবোরা নামে একটী সহরে যাওয়ার ঠিক হোল। নির্দ্দিষ্ট দিনে আমি এবং স্বামী পরমানন্দজী ছাড়া আমাদের অন্যান্য সকলে টাবোরা রওনা হোয়ে গেলেন। আমরা এখান থেকে সিংগিডা নামে একটী ছোট সহরে যাওয়ার জন্য ডোডামাতে থাকলাম। ১৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৪৮) সকাল ৬টার ট্রেণে আমরা সিংগিডা অভিমুখে রওনা হ'লাম। এখানের রেলওয়েটি জার্ম্মাণ রাজত্বের সময় থেকে একটী পৃথক কোম্পানীর অধীনে ছিলো। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীর পরাজয়ের পর টাঙ্গানিকা টেরিটোরী বৃটিশের হাতে চলে যায় এবং সেই সঙ্গেই এই রেলওয়ে কোম্পানী সরকারের অধীনস্থ হয়। টাঙ্গানিকা রেলওয়ে—শুধু টাঙ্গানিকা রেলওয়েই নহে, এদেশের দুইটী রেলওয়েই প্রধানতঃ হিন্দুদের প্রচেষ্টাতেই স্থাপিত হোয়েছে বলা যায়। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যখন লাইন পাতা সুরু হয়, কত হিন্দু যে তখন হিংস্র জন্তু ও বর্ব্বর মানুষের শিকারে পরিণত হোয়েছে—আজ তা হিসাবে পাওয়া কঠিন। বোধ হয় সেই কারণেই জার্ম্মাণরা অধিকসংখ্যক হিন্দুকে কোম্পানীতে চাকুরী দান কোরে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন কোরেছিলো। আজও তাই এই দেশের রেলওয়েতে

গুলিতে ষ্টেশনমাষ্টার, গার্ড, টিকিট-পরীক্ষক, বুকিং-ক্লার্ক, লাইন-ইন্‌স্পেক্টর প্রভৃতি পদে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। দু'চারজন বাঙ্গালীও এই রেলওয়েতে গার্ড ও ষ্টেশন মাষ্টারের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। পূর্ব্ব-আফ্রিকায় কয়লার খনি নেই, তাই কাঠের সাহায্যে এঞ্জিন চালানো হয়—সেই জন্য উহা খুব শক্তিশালী দ্রুতগামী নয়। রান্না-বান্নাও এদেশে কাঠ কয়লার সাহায্যে করা হয়। সহরে কাঠ জ্বালাতে দেওয়া হয় না। ভারতে বোম্বাই, বরোদা প্রভৃতি সহরে কাঠ জ্বালাতে বা কয়লা ব্যবহার কোরতে দেওয়া হয় না—গ্যাস ও ধোঁয়া থেকে সহরকে মুক্ত রাখার জন্য। এদেশের বড় বড় সহরগুলিতেও সেই নিয়ম। কয়লা তো পাওয়া যায় না, কিন্তু কাঠ জ্বালাবারও উপায় নেই। কাঠ কয়লায় পাক-ক্রিয়াদি সম্পন্ন কোরতে হয়। অবশ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে কাঠ কয়লার আগুনে পক্ক দ্রব্য বেশ উপকারী—সহজ-পাচ্য। গবাদি পশুও সহরে রাখার নিয়ম নেই। দু'টী কারণে এই নিয়ম করা হোয়েছে! একটা সহর পরিষ্কার রাখার জন্য—অপরটী 'সেট্‌সী ফ্লাই' (Setse fly) নিবারণের জন্য। আমাদের দেশে গোরু মহিষ প্রভৃতির গায়ে ডাঁশ নামে এক প্রকার মাছি কামড়ায়। রক্তপানই তাদের উদ্দেশ্য। সেই ডাঁশ জাতীয় মাছিকেই এদেশে 'সেট্‌সী ফ্লাই' বলে। তবে আমাদের দেশের চেয়ে এদেশের গুলি মারাত্মক। এগুলির এক একটির বিষ অত্যন্ত বেশী। গোরুকে কামড়ালে এত বেশী ক্ষতিকারক হয় না, কিন্তু মানুষকে কামড়ালে sleeping sickness হয়। যাকে এই ডাঁশ কামড়ায় সে কামড়ানোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে—শতপ্রকার চেষ্টা কোরেও তাকে জাগানো যায় না। তিন চার দিনের মধ্যেই রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই 'সেট্‌সী ফ্লাই' যাতে সহরে আসতে না পারে সেই জন্য গবাদি পশু সহরের বাইরে নির্জ্জন স্থানে রাখার ব্যবস্থা। প্রত্যেক সহরের বাইরে তিন চার মাইল দূরে দূরে এই 'ফ্লাই' পরীক্ষা বা নিবারণের জন্য অফিস আছে। কোন মোটর সহরের বাইরে থেকে সহরের দিকে এলে এই সমস্ত অফিসগুলো হোতে মোটরের চাকা, আশপাশ ভালভাবে পরীক্ষা কোরে তবে সহরের দিকে যেতে দেওয়া হয়। যাতে মোটরের সঙ্গে এই মাছি সহরে আসতে না পারে। আমরা একবার এক গ্রীক ভদ্রলোকের বিশেষ আমন্ত্রণে তাঁর 'সাইসেল ষ্টেট' পরিদর্শন কোরতে গিয়েছিলাম। সহর থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে সেই ষ্টেট। মোটরে যাওয়ার সময় যদিও এই 'সেট্‌সী ফ্লাই' নিবারক অফিসগুলি দেখেছিলাম কিন্তু তার কর্ম্মপদ্ধতির সহিত পরিচিত ছিলাম না। ফেরবার সময় দেখলাম—আমাদের মোটরগুলি দাঁড় করিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা করা হোল। তখনই এই অফিসগুলির কাজ বুঝতে পারলাম।

আমরা সিংগিডা যাওয়ার জন্য ইটিগী নামক ষ্টেশনে নামলাম। ষ্টেশন মাষ্টার জনৈক শিখ। পরম আদরে আমাদের তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। দুধ ইত্যাদি পান করিয়ে রেল কোম্পানীর বাসে আমাদের পাঠানোর ব্যবস্থা কোরে দিলেন। ঘণ্টা চারেকের পর যখন আমাদের বাস সিংগিডায় পৌছুল তখন রাত ৮টা। সহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এসে বাস থেকে আমাদের নিয়ে গেলেন। একটা দ্বিতল বাটির সম্পূর্ণটিতেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হোয়েছে—অথচ আমরা মাত্র দু'জন। কী আর করা যাবে—আমরা দোতলার একটী ঘরে বসে প্রার্থনা সেরে নিলাম, সহরের লোকজন এসে সমবেত হোল আলাপ-আলোচনার জন্য। ভারত থেকে কোনো ধর্ম্মপ্রচারক এর আগে এই সহরে আসেন নি—তাই সকলেই আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হোলো আমাদের দেখে ও পেয়ে। কিছুক্ষণ পরে সকলে বিদায় নিলো। আমরা খেতে গেলাম।

সিংগিডা একটি জেলার হেড্‌ কোয়াটার্স। ইসমাইলী খোজা ও হিন্দুর বাস প্রায় সমান সমান। প্রধান ব্যবসায় ভারতীয়দের হাতেই। গুজরাট ও কাথিয়াবাড় প্রদেশে 'খোজা' নামে একটী মুসলমান সম্প্রদায় আছে। পূর্ব্ব-আফ্রিকার প্রায় প্রত্যেক সহরেই এই সম্প্রদায়ের বসতি আছে।

সিংগিডায় একটী বিষয় লক্ষ্য কোরলাম—সেটা হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ। মুসলমান যারা হজরত মহম্মদের অনুবর্ত্তী, তারা কেবল হজরত মহম্মদকেই অবতার বা পয়গম্বররূপে মানে; কিন্তু মুসলমানের মধ্যে অন্য আরও অনেক সম্প্রদায় আছে, যারা আরও অনেক অবতারে বিশ্বাস করে। খোজা মুসলমানগণ দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত—একটি ইস্‌মাইলী, অপরটী ইস্নাসারী। ইস্নাসেরীগণ শ্রীভগবানের একটি অবতার ও দশটি পয়গম্বরকে মানে—কিন্তু ইসমাইলীগণ শ্রীভগবানের দশটি অবতার এবং আটচল্লিশটি মহান্ পুরুষকে মান্য করে। ইস্‌মাইলীগণ হিন্দুদের দশ অবতারের কয়টিকে মানে এবং দশম অবতার কল্কির পরিবর্ত্তে তারা আগা খাঁকে পূজা করে। তাই এই সম্প্রদায় প্রকৃত মুসলমান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এরা মসজিদে যায় না। প্রার্থনার জন্য কেবলমাত্র এই সম্প্রদায়ের জন্য 'জমিয়েৎখানা' নামে পৃথক হল বা মন্দির আছে। জমিয়েৎখানার বিরাট মঞ্চোপরি আগা খাঁর ছবি এবং চারিদিকে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, পরশুরাম প্রভৃতি অবতারগণের মূর্ত্তি শোভা পায়। জমিয়েৎখানার প্রবেশ দ্বারে 'ওঁ'কার চিহ্নিত। এমন কি হলের মধ্যেও ওঁকার মূর্ত্তি লক্ষিত হয়। প্রার্থনার সময় নরসিংহ মেহতা, তুলসীদাস, কবীর, মীরাবাঈ প্রভৃতি সাধক-সাধিকা রচিত ভজনাবলী গীত হয়। যদিও বর্ত্তমানে এই সম্প্রদায়ের একমাত্র গুরু আগা খাঁ, তথাপি এরা পিতামহ ব্রহ্মাকে আদি গুরুরূপে মানে। ইসমাইলীরা কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে হিন্দু সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হোয়ে যায়, তাই আজ পর্য্যন্ত হিন্দু রীতি-নীতি তাদের অস্থি মজ্জায় বিজড়িত। তাদের আকৃতি প্রকৃতি, তাদের আচার বিচার, সামাজিক নিয়ম প্রথার মধ্যে এখনও হিন্দুত্বের ছাপ বিদ্যমান। উৎসব অনুষ্ঠানে এখনও হিন্দুরা তাদের নিমন্ত্রণ করে এবং হিন্দুরাও তাদের বিবাহ বা তদ্‌জাতীয় কোনো অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়। আমাদের সভায় ইসমাইলীরাও আসতে লাগলো। দু'একজন সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন লোকের প্ররোচনায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সামান্য একটু মনোমালিন্য দেখা দিয়েছিল—আমাদের প্রচারে সেটাও একেবারে নিশ্চিহ্ন হোয়ে গেলো।

আফ্রিকার আদিবাসীগণকে নিগ্রো বলে। কিন্তু এদের মধ্যে বহু প্রকার ভেদ আছে। প্রাদেশিক বিভাগানুসারে মাসাই, গোগো, মটুসী, মিয়ামেজী প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত। এই দেশের অধিবাসীদের যারা খৃষ্টান বা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কোরেছে, তাদের মোটামুটি সোয়েলী বলে। যারা আজও কোনো ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়নি—তাদেরই নানা প্রকার শ্রেণী বিভাগ। এরা ভূতপ্রেত বা যাদু ইত্যাদি মানে। অনেক সময় দেবতা বা কোনো এক শক্তির উদ্দেশ্যে স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির জন্য মানৎ করে। অনেকে মন্ত্র বা দ্রব্যগুণের প্রভাবে সিংহের শক্তি অর্জ্জন কোরতে পারে। এখানে শুনিলাম—এখান থেকে প্রায় দু'শ মাইল অভ্যন্তরে এক প্রকার জাতি বাস করে—যারা এখনও নিতান্তই অসভ্য। তারা উলঙ্গ থাকে, কাঁচা মাংস খেয়ে জীবনধারণ করে, এদের মধ্যে কেউ কেউ দ্রব্যগুণে সিংহের ন্যায় হিংস্র হোয়ে মানুষ মেরে তার মাংস ভক্ষণ করে। দু'একজন খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারককে এইভাবে হত্যা করা হোয়েছে বোলে শুনলাম। সোয়েলীদের বিবাহপ্রথা মুসলিম বা খৃষ্টান ধর্ম্মমতে সম্পন্ন হয়। কিন্তু এই মাসাই, গোগো প্রভৃতি জাতির বিবাহের কিছু সমস্যা আছে। যতদিন একটি যুবক কন্যার অভিভাবকের জ্ঞানিতভাবে নিজহাতে একটি সিংহ শিকার কোরতে না পারবে, ততদিন সেই যুবকের বিবাহ হবে না। নিজহাতে সিংহ শিকার কোরবে—তবে তার বিবাহ হবে। এর দ্বারা পাত্রের বীরত্ব পরীক্ষা করা হয়। যার হস্তে কন্যারত্নকে সমর্পণ করা হবে, শ্বাপদ-সঙ্কুল হিংস্র জঙ্গল অথবা কুটিল সংসার পথের যাবতীয় বাধা-বিপত্তি অপসারিত কোরতে উপযুক্ত কিনা বোধ হয় ইহাই পরীক্ষা কোরে তবে কন্যা সম্প্রদান করা হয়; নতুবা দুর্ব্বলতা কাপুরুষতায় সমাচ্ছন্ন যে কোনো ব্যক্তিকে কন্যা দান কোরে লাভ কী? হিন্দু শাস্ত্রের স্বয়ম্বরা প্রথার কিছু অংশ এরা গ্রহণ কোরেছে। এর থেকে বহু প্রাচীনকালে আফ্রিকা মহাদেশের সহিত হিন্দুস্থানের সংযোগ বা সম্বন্ধ ছিল তা প্রমাণিত হয়। মাসাইগণ গৈরিক রঞ্জিত কাপড় পরে। আমাদের দেশে গোরক্ষপুরের "কাণ ফাটা" সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীর ন্যায় কাণে বলয় ধারণ করে, দণ্ড নিয়ে বিচরণ করে। ফল-মূল এবং গোরু হত্যা না কোরেই তারা তাজা রক্ত পান করে।

সিংগিডায় আমরা চার দিন থেকে টাবোরা অভিমুখে রওনা হ'লাম। ট্রেণে শ্রীযুত সুধীর চক্রবর্ত্তী নামে একজন বাঙ্গালী গার্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে গেলো। বহুদিন পরে বাংলা ভাষায় কথা বলার সুযোগ পেলাম। ট্রেণ চলছে, এমন সময় অন্য কামরা থেকে শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আমাদের কামরার দরজা জানালা বন্ধ কোরতে লাগলেন। আমরা দু'জনেই মাত্র এই কামরায় ছিলাম। জানালা বন্ধ করার কারণ জিজ্ঞেস করায় বললেন—"এই স্থানে 'সেট্সী ফ্লাই' আছে।" যাহারা প্রায়ই এই লাইনে যাতায়াত করে তাদের সেটা জানা আছে—তাই তারা আগেই জানালা বন্ধ করে দেয়; কিন্তু আমাদের জানা ছিল না—তাই আমরা বন্ধ করি নাই।

সিংগিডায় ভারতীয়গণের মধ্যে পাশ্চাত্য আদর্শ বহুল পরিমাণে প্রবেশ কোরেছে। শুনলাম ভারতের স্বাধীনতা-দিবস উপলক্ষে এখানে সাড়ে চার হাজার শিলিং অর্থাৎ তিন হাজার টাকার মদ্য পান করা হয়। যাদের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জিত হোয়েছে সেই সাধকগণের প্রথম সঙ্কল্প ছিলো মাদক দ্রব্য বর্জ্জন। সেই সাধক মণ্ডলীর জীবিত কালেই আজ বিদেশে ভারতীয় সমাজে এই জাতীয় দুর্নীতির প্রশ্রয় পাওয়া ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্ব্বস্বদানকারী সৈনিকবৃন্দের অবমাননারই নামান্তর। আমাদের মতে ভারতীয় কোনো জাতীয় উৎসব উপলক্ষে দেশে কিংবা বিদেশে কোনো ভারতীয় মদ্যপান কোরতে পারবে না—এইরূপ নির্দ্দেশ ভারত সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের প্রচারের প্রভাবে এখানে কেউ কেউ মদ্যপান ছাড়লো বটে কিন্তু নেশার উন্মত্ততায় যাদের কর্ণ বধির হোয়েছে তাদের নিকট থেকে আমাদের অনুনয় বিনয় ফিরে এলো।

সন্ধ্যায় আমরা টাবোরায় পৌছুলাম। স্থানীয় লোহানা মহাজন-সমিতির বাড়ীতে আমাদের মিশনের সকলে অবস্থান কোরছেন। যাঁরা আমাদের সম্বর্দ্ধনা জানাতে এসেছিলেন তাঁরা ষ্টেশন থেকে আমাদের সেখানেই নিয়ে গেলেন। কয়েকদিন পরে সোদরোপম সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণের সহিত মিলনে সত্যই মনে প্রাণে বেশ একটা আনন্দ অনুভব কোরলাম। বক্তৃতার জন্য এখানেই একটি মণ্ডপ নির্ম্মিত হোয়েছে। শ্রীশ্রীসঙ্ঘ-দেবতার পূজা আরতির জন্য বেশ পরিপাটি একটা সুন্দর মন্দিরও নির্ম্মাণ করা হোয়েছে! টাবোরা-টাঙ্গানিকা টেরিটোরীর মধ্যপ্রদেশের রাজধানী। সহরটী বেশী বড় নয়—বাংলা দেশের কুমিল্লা সহরের মতো। তবে সমৃদ্ধিতে কুমিল্লা কেন—ঢাকার দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ।

টাবোরায় বেশীদিন থাকার সৌভাগ্য আমাদের হোল না। দু'চার দিনের মধ্যেই আমাদের দু'জনের অন্য সহরে যাওয়ার 'প্রোগ্রাম' ঠিক হোল। আমাদের যাওয়ার আগে এখানে বিরাটভাবে একটি বৈদিক যজ্ঞের আয়োজন করা হোল। আফ্রিকানদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টাই অবশ্য এই যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। তাই আফ্রিকানদের আমন্ত্রণ জানানো হোল। শত শত আফ্রিকান এই যজ্ঞে যোগদান কোরলো। এই দৃশ্য দেখে স্থানীয় হিন্দুরা বেশ উৎসাহিত হোল। অবশ্য আমরা প্রথম থেকেই প্রত্যেক সহরে আফ্রিকানদের নিয়ে যজ্ঞ, উৎসব, পূজা-আরতি, শোভাযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠান করে আসছি—তথাপি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আফ্রিকানদের যে বেশ একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে সেটা টাবোরাবাসীদের নিকট প্রমাণিত করার জন্য এইরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। আফ্রিকাবাসীগণ যোগদান কোরতে পারে হিন্দুর এমন কোন জাতীয় অনুষ্ঠান ইতিপূর্ব্বে আফ্রিকার ভূমিতে অনুষ্ঠিত হয়নি। তাই আফ্রিকাপ্রবাসী হিন্দুগণের মনে সাধারণ একটা অবিশ্বাস রয়েই গিয়েছিলো যে, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আফ্রিকানগণের কোনো আকর্ষণ বা শ্রদ্ধা নেই। প্রত্যেক সহরে আমাদের এই জাতীয় অনুষ্ঠানের পরই সকলের অন্তর থেকে পূর্ব্বেকার সেই ধারণা দূর হোয়ে যায়।

পঁচিশে সেপ্টেম্বর দুপুরে শুনলাম—আজই মফঃস্বলে যেতে হবে। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর টেলিফোন এলো, যে সহরে যাওয়ার জন্য

প্রোগ্রাম পাঠানো হোয়েছিল সেখান থেকে আমাদের নিতে এসেছেন। তাই তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র এবং প্রচারের সাজসরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে তৈরী হোয়ে রইলাম। অল্প কিছুক্ষণ পরেই বিখ্যাত মিল-মালিক শেঠ অমৃতলাল জেঠাভাই এলেন আমাদের নিতে। বুকেনী সহর টাবোরা থেকে ৯৩ মাইল; সেইখানেই অমৃতলালের মিল ও ব্যবসার কেন্দ্র। আমরা বুকেনী যাওয়ার জন্য শেঠজীর মোটরে উঠলাম। জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে রাস্তা। ঘণ্টা দু'একের মধ্যে আমরা বুকেনীতে পৌছুলাম। ছোট্ট সহরের বুক চিরে যে কালো রাস্তাটা সহরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত গেছে সেই রাস্তার উপর দিয়ে আমাদের মোটর জোরে হর্ণ বাজিয়ে চলেছে শেঠ অমৃতলালের বাড়ীর দিকে। আমরা সহরে পৌছুলাম—এই বার্ত্তা সহরের হিন্দুগণকে জানিয়ে দেওয়াই বোধ হয় হর্ণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো।

ছোট্ট সহর। পনেরটি হিন্দু পরিবারের বাস; ভারতীয় মুসলমান একজনও নেই, কয়েকটি আরবীয় মুসলমান, কতিপয় ইটালিয়ান সোমালিল্যাণ্ডের অধিবাসী, দু'চারজন গ্রীক এবং দশ বারোটী ইউরোপীয়ান পরিবারের বাস এই সহরে। বাকী সবই আফ্রিকান। অমৃতলালের বাড়ী পৌছুতেই গ্রামের সকল হিন্দু এলো আমাদের অভিনন্দন জানাতে। নানা কথাবার্ত্তার পর রাত্রে বক্তৃতা হবে—একথাও জানিয়ে দিলাম।

সন্ধ্যায় জনসভা। এদেশে জনসভা সাধারণতঃ সন্ধ্যার পর হয়। লোকজন আসতে আসতে প্রায় ৯টা বাজলো। হিন্দুধর্ম্ম সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বক্তৃতা হোল। বক্তৃতার পর নানা রকম আলোচনায় রাত্রি প্রায় ১২টা বেজে গেলো। আমরা বাঙ্গালী, তাই অনেকেই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিষয়ে অনেক প্রশ্ন কোরে তাঁর সম্বন্ধে অনেক তথ্য জেনে নিলো। প্রত্যেক সহরেই আমাদের তাঁর সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নেরই সম্মুখীন হোতে হয়। (ক্রমশঃ)

মৃত মর্ম্মবাণী

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

জানি
সংখ্যাতীত প্রাণী
নির্জ্জীব কঙ্কাল—দিনে দিনে করহানি
অভিশপ্ত হয়ে ফিরিতেছে দ্বারে দ্বারে।
ভাগ্যের দুর্য্যোগে পথচলা
বেদুইন সম মরু ঝটিকার মুখে, হোলোনাক আর কিছু বলা
শাসনে শোষণে সদা রূঢ় অত্যাচারে
যুদ্ধোত্তর ধ্বংসের প্রাকারে
মৃত মর্ম্মবাণী।

কাঁদে
আজ অবসাদে
দেশের ক্ষুধিত আত্মা: অন্তর বিষাদে
তন্দ্রাচ্ছন্ন অমারাত্রি। মাঠে ঢাকা কুয়াশার মত
হেরি প্রেতাত্মিতধূসর রহস্য যত: বেদনায় মুহূর্ত্তেরা গত।
স্মৃতির অরণ্যে চাঁদ নেমে আসে মিছে,
ক্লান্ত কপোতের ব্যথা জাগে
স্নায়বিক অনুভূতি সান্ত্বনার কোন অনুরাগে
আনে না চেতনা মম প্রীতি শুভেচ্ছায়
দিন আসে, আর দিন যায়
অশ্রু দৃষ্টিপাতে।

কবি!
মনে হয় সবি
মিছে হোলো: চেয়ে দেখো দূরে গ্রামছবি
শ্মশানের বহ্নিমান চিতা ধূমে! ক্ষীণ কণ্ঠ কানে আসে মম
শবাচ্ছন্ন প্রান্তরের পথ বেয়ে কোথা দোলে বায়ু
বিদ্রোহীর সম!

এদিনের এ নগরী শোভে ক্ষুণ্ণমনে
পল্লী পথে ঝরে দুঃস্বপনে
জীবন-করবী।

তথাগতের পথে

নরেন্দ্র দেব

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মাটিরতলা থেকে খুঁড়ে-বার-করা এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি দর্শকেরা সেই সঙ্গে নালন্দার প্রত্নশালা বা মিউজিয়মটি দেখে না আসেন।

নালন্দার মৃত্তিকা গর্ভে পাওয়া গেছে যাকিছু স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন, ব্রোঞ্জ ও শিলামূর্তি প্রভৃতি ভাস্কর্য্য শিল্পের ঐশ্বর্য্য, প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা, অলঙ্কার, যন্ত্রপাতি, মাটির ও ধাতু নির্মিত তৈজসপত্র, অস্ত্র শস্ত্র ইত্যাদি সমস্তই এখন সযত্নে রক্ষিত আছে নালন্দার নবনির্ম্মিত প্রত্নশালায়।

ফণী-ফণাযুক্ত দেবী মূর্তি

(নালন্দায় প্রাপ্ত মধ্য যুগের প্রারম্ভে প্রস্তুত প্রস্তর মূর্তি)

নালন্দা পরিদর্শনের পর শ্রীমান অভ্রীশ আমাদের বাড়ী নিয়ে গেলেন। কারণ, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল সব ঘুরে ঘুরে খুঁটিয়ে দেখতে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর স্নানপর্ব শেষ ক'রে আমরা মধ্যাহ্ন ভোজে বসে গেলুম। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন বাবাজীদের পাঁড়ে ঠাকুরটি ছিলেন অনুপস্থিত। কাজেই, বৌমা তাঁর পঞ্চকন্যাকে নিয়ে এত রকমের রান্না করেছিলেন যে খেয়ে শেষ করা যায় না। বারবার মনে পড়ছিল অভ্রীশের মহান পিতা আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। সেও এমনি সকলকে খাওয়াতে ভালবাসতো। আমিরী ছিল তার মেজাজ। চির আনন্দময় বন্ধুটি ছিলেন তাই চিরদিনই অমিতব্যয়ী।

আহারের পর আমাদের একটু গড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে অভ্রীশ বলে গেলেন, ৩টে থেকে ৪টের মধ্যে এসে মিউজিয়ম দেখাতে নিয়ে যাবেন। আমরা মিউজিয়ম দেখে ৫টার ট্রেণে রাজগীর ফিরবো স্থির হ'য়েছিল।

নর্তকী (নালন্দায় প্রাপ্ত মধ্যযুগীয় প্রস্তর মূর্তি)

যথাসময়ে নালন্দার প্রত্নশালায় গিয়ে প্রবেশ করা হ'ল। প্রত্নশালাটি খুব বড় নয় বটে, কিন্তু সংগ্রহের দিক থেকে কারো চেয়ে কম সমৃদ্ধ নয়। বর্ণনার সুবিধার জন্য মিউজিয়মে সংগৃহীত বস্তুগুলিকে চারটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ ক'রে নেওয়া যাক, যথা—

১। শিলালিপি, তাম্রশাসন ইত্যাদি।

২। ধাতু প্রস্তর ও মৃত্তিকা নির্মিত বিবিধ মূর্তি।

৩। মুদ্রা, শীলমোহর, অলংকরণোপযোগী কারুকার্যখচিত কলাকাদি।

৪। হাঁড়ি-কুড়ি কুঁজো, কলসি, ভাঁড় খুরি জালা প্রভৃতি।

১। শিলালিপি ও তাম্রশাসন

এই চারশ্রেণীর দ্রব্যাদির মধ্যে শিলালিপি ও তাম্রশাসন ইত্যাদি সব কিছুর চেয়ে অধিক মূল্যবান, কারণ এইগুলি থেকেই আমরা নালন্দার প্রকৃত ইতিহাস কি জানতে পারি। শিলালিপি ও তাম্রশাসন ছাড়া চুণবালির তৈরী টালির উপরও অনেককিছু অনুশাসন, বিজ্ঞপ্তি ও ঘোষণা উৎকীর্ণ করা আছে দেখা যায়। নৃপতি দেবপাল, ধর্মপাল ও সমুদ্রগুপ্তের যে তাম্রশাসনগুলি এখানে আবিষ্কৃত হ'য়েছে সেগুলিও নিরাপত্তার জন্য সযত্নে কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

ভূমিস্পর্শ মুদ্রাযুক্ত বুদ্ধমূর্তি। (নালন্দায় প্রাপ্ত মধ্যযুগীয় প্রস্তর মূর্তি)

নালন্দায় যে শিলালিপিগুলি রয়েছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ২টি। একটি যশোবর্মদেবের এবং দ্বিতীয়টি বিপুলশ্রীমিত্রের। যশোবর্মদেবের শিলালিপিতে নালন্দায় নৃপতি বালাদিত্য যে মন্দির নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন সেই মন্দিরের জন্য অষ্টমশতাব্দীতে কনৌজেশ্বর যশোবর্মদেবের রাজত্বকালে তাঁর মন্ত্রীপুত্র 'মালদার' দানের কথা উৎকীর্ণ করা আছে। দানের বিবরণের চেয়েও উক্ত শিলালিপিতে নালন্দার যে বিশদ বর্ণনা আছে সেইটিরই সার্থকতা বেশী, তবে সে বর্ণনার মধ্যে যে অত্যুক্তি আছে একথাও অস্বীকার করা যায় না। একটুখানি এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

"এই নালন্দা থাকে—পণ্ডিতমণ্ডলী সকল সৎশাস্ত্র ও শিল্পকলায় গভীর জ্ঞানের জন্য বিশ্ববিখ্যাত,—এই নালন্দা—বড় বড় সম্রাটগণের প্রতিষ্ঠিত শ্রেষ্ঠ নগরগুলিকেও যে তুচ্ছ জ্ঞানে উপহাস করে······

যার সারিসারি মন্দির ও মঠের চূড়াগুলি মেঘচুম্বী—দেখে মনে হ'য় যেন সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং এটাকে ধরণীর পুষ্পহার রূপে পরিকল্পনা করেছেন—অনন্ত আকাশের কোলে যা উজ্জ্বল জ্যোতিতে দীপ্যমান! যে ভবন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী শ্রমণগণের পরম আনন্দ-নিকেতন—যাঁরা নিজেরা জনে জনে সর্ববিদ্যা ও জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার—এর প্রাসাদোপম হর্মরাজি ও দেবদেউলে সংলগ্ন বিবিধ উজ্জ্বল মণিরত্ন থেকে বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে দীপ্ত রশ্মিজাল, যেন সুমেরু শিখরের তুল্য শোভা ধারণ করে আছে। যেখানে দেবযোনী বিদ্যাধরগণের সুন্দর আবাস। এইখানে রাজা বালাদিত্য শুদ্ধোদনের পুত্র ভগবান বুদ্ধের জন্য এই অনুপম বিশাল শ্বেত প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন—যেন কৈলাশ পর্বতকে লজ্জা দিয়ে অপমান করবার অভিপ্রায়ে। ···

এই প্রাসাদটি দেখে মনে হয় যেন এর বিস্তার সারা পৃথিবী জুড়ে, চন্দ্রের শোভা ও সৌন্দর্যকে এ যেন ম্লান করে দিয়েছে, হিমালয় শৃঙ্গাবলীর যে শৃঙ্খলাবদ্ধ সৌন্দর্য—এ যেন তাকে রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে, আকাশের শ্বেতশুভ্র প্রবাহকেও কলঙ্কিত ক'রেছে এবং বিরূপ সমালোচনা সাগরের প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্ট করেছে। এ যেন উপলব্ধি করতে পেরেছে যে এহেন পৃথিবীতে ঘোরা তার পক্ষে সম্পূর্ণ বৃথা! যেখানে কিছুই তার হারাবার সম্ভাবনা নেই, এ তাই স্থির হ'য়ে আজ মাথা উঁচু করে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। যেন বিরাট এক যশোস্তম্ভ এ জয় করে ফেলেছে···

বিপুলশ্রীমিত্রের যে শিলালিপি ৭নং মঠে পাওয়া গেছে তাতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা শ্রমণদের কীর্তি কাহিনী লিপিবদ্ধ করা আছে। তারা দেবীর মন্দির নির্মাণ ও তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গণ ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা এবং একটি মঠ স্থাপনের বিষয় উল্লিখিত আছে। মঠটির বর্ণনায় বলা হয়েছে যে এটি বিশ্বের শোভাবর্দ্ধক একটি গৃহ, যা দেবরাজ ইন্দ্রের প্রাসাদকেও আশ্চর্যরূপে অতিক্রম করেছে!

শিলালিপি ও তাম্রশাসন ছাড়াও মূর্তির পাদপীঠে ও শীর্ষ দেশের চক্রচ্ছটায় এবং মন্দির গাত্রের কোনও কোনও ইটের উপর কিছু কিছু লিপি উৎকীর্ণ করা আছে দেখা যায়। এগুলি সবই প্রায় 'উৎসর্গ'-লিপি। কোনও কোনওটিতে দু'চার ছত্র বৌদ্ধ শ্লোকও সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ করা আছে দেখা যায়। যেমন ঐশ্বর্য দেবতা জাম্ভালার মূর্তিতে আছে—'এটি 'কাকা'র দান'। ত্রৈলোক্যবিজয়ের প্রস্তর মূর্তির পশ্চাতে লেখা আছে—

আকাশ-লক্ষণম সর্ব আকাশঞ্চাপি অলক্ষণম।
আকাশ-সমতা যোগাৎ সর্বাগ্র সমতাস্ফুট॥
—উদয় ভদ্রস্য।

তারা দেবী'র মূর্তিতে আছে—

ওঁ তারে তত্তারে তারে স্বাহা।
ওঁ পদ্মাবতী, ওঁ কুরুকুল্যে স্বাহা।

যে ধর্মা······(অসম্পূর্ণ)

২। ধাতু, প্রস্তর ও মৃত্তিকার মূর্তি

'শিলালিপি' ও তাম্রশাসনের পর নালান্দায় প্রাপ্ত মূর্তিগুলির দিকে অদ্রীশ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। প্রত্নশালায় সংগৃহীত যে মূর্তি সর্বাগ্রে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে হ'চ্ছে বিবিধ বুদ্ধ মূর্তি, বোধিসত্ত্বের মূর্তি ও বৌদ্ধদেবদেবীর মূর্তি। নালন্দা ছিল মহাযানপন্থী বৌদ্ধদের একটি প্রধান কেন্দ্র। কাজেই ভগবান তথাগত বুদ্ধের মূর্তি ছাড়াও নালন্দায় অসংখ্য বোধিসত্ত্বের মূর্তি ও নানা মহাযানী দেব দেবীর মূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই মূর্তিগুলির অধিকাংশই পালযুগের শিল্প নিদর্শন। কিছু কিছু গুপ্তযুগের ভাস্কর্য কলাও এখানে পাওয়া গেছে।

এখানকার মূর্তিগুলি কিন্তু অন্যান্য বুদ্ধ স্থানে প্রাপ্ত মূর্তির চেয়ে আকারে অনেক ছোট এবং বেশীর ভাগ মূর্তিই মৃত্তিকা ও প্রস্তরের পরিবর্তে ধাতুতে নির্মিত। বৌদ্ধযুগের মূর্তি ছাড়াও ব্রাহ্মণ্যযুগের ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন স্বরূপও কিছু কিছু মূর্তি এখানে পাওয়া গেছে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সময় এখানকার অতুলনীয় বৌদ্ধ কীর্তিকে গ্রাস করে ব্রাহ্মণ্যযুগের কীর্তিতে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা হয়েছিল, যেমন উড়িষ্যায় পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের ন্যায় বহু বৌদ্ধ তীর্থস্থানকে হিন্দুতীর্থে পরিণত করা হয়েছে।

বিদ্যায় জ্ঞানে আদর্শে অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় নালন্দা একদা খুবই উন্নত হয়েছিল, কিন্তু নালন্দার মূর্তি শিল্প বা ভাস্কর্যকলা যতই ভালো বলে মনে হোক না কেন, একথা অস্বীকার করা চলে না যে, তা সারনাথ ও মথুরার প্রাচীন ভাস্কর্য কলার সমকক্ষ হ'তে পারেনি। কিন্তু ছোট ছোট ধাতু-নির্মিত ঢালাই করা মূর্তিগুলি দেখা গেল নালন্দার মূর্তি শিল্পের একটা বৈশিষ্ট্য। প্রত্নশালায় এই ধাতু নির্মিত মূর্তি শিল্পের নানা বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া গেল। তার মধ্যে বিশেষ করে কয়েকটি মূর্তিতে ধাতুশিল্পের অতি সূক্ষ্ম কারুকার্যের পরিচয় আছে।

তথাগত বুদ্ধের ব্রোঞ্জনির্মিত প্রতিমূর্তিগুলির মধ্যে যেটির অপূর্ব শিল্পকলা সর্বাগ্রে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটির সংখ্যা ১-৫৩২। প্রস্ফুটিত শতদল পদ্মের উপর এই মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত। ভগবানের জ্যোতির্ময় মুখে একটা স্নিগ্ধ সৌম্য দেবভাব যেন স্বতঃস্ফূর্ত! বোধিসত্ত্বের যতগুলি মূর্তি এখানে আছে তার অধিকাংশই দেখে মনে হবে চমৎকার! অন্যান্য বৌদ্ধতীর্থে যেসব বোধিসত্ত মূর্তি দেখতে পাওয়া যায় সেগুলির সঙ্গে তুলনায় এর কোনটিই নিরেশ মনে হয় না। যেমন 'পদ্মপাণি' মূর্তি যাঁর একহাতে মৃণালদণ্ডে কমলকলি বিরাজিত। অনেকগুলি বিভিন্ন ধরণের মূর্তি এখানে দেখতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে তিনটি মূর্তি খুব বড়।

শ্রীশ্রীঅবলোকিতেশ্বরের একটি মূর্তি (সংখ্যা ১২-৮) বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এঁর হাতে আছে অক্ষমালিকা, মৃণালদণ্ড ও অমৃতভাণ্ড। সিংহাসনের উপর অধিষ্ঠিতা দেবী 'বজ্রপাণির' মূর্তি (সংখ্যা ৯-১৫৭) যথার্থই অপূর্ব! উল্লেখযোগ্য অন্যান্য মূর্তি মধ্যে মঞ্জুশ্রী, জাম্ভাল, তারা, ত্রৈলোক্যবিজয়, প্রজ্ঞাপারমিতা, মরিচী, হরিতি, সরস্বতী, অপরাজিতা প্রভৃতি দেবদেবীর নাম করা যায়।

বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি ছাড়া হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিও এখানে পাওয়া গেছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একমাত্র শিব-পার্বতীর বিহার রত শৃঙ্গার-রসাশ্রিত লীলামূর্তি।

৩। মুদ্রা, শিলমোহর, কারুকার্য্যখচিত ফলকাদি

নালন্দার বিভিন্ন বিহার ও মঠে যে সব মুদ্রা, শিলমোহর ও
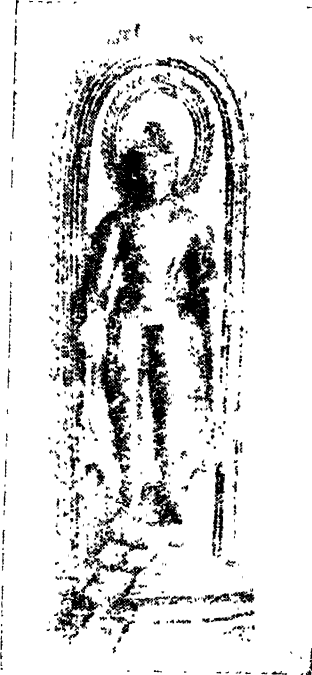
বরদামুদ্রাযুক্ত বুদ্ধমূর্তি
(নালন্দায় প্রাপ্ত মধ্য যুগের প্রারম্ভে প্রস্তুত ব্রোঞ্জ মূর্তি)

কারুফলকাদি পাওয়া গেছে সেগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক। নালন্দার প্রত্নশালায় এই শিলমোহর অসংখ্য সংগৃহীত ও সুরক্ষিত হয়েছে। অনাগত ঐতিহাসিকদের কাছে এগুলি অমূল্য সম্পদ। এই শিলমোহরগুলির মধ্যে কোনও কোনওটিতে শ্রীবুদ্ধমূর্তি উৎকীর্ণ করা, অন্য কোনওটিতে 'ত্রিপিটক' থেকে শ্লোকের অংশ উদ্ধৃত করা আছে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব শিলমোহরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর উপর এই লিপি খোদিত আছে—"শ্রীনালন্দামহাবিহারীয় ভিক্ষু সঙ্ঘস্য" এই লিপির উপর শীর্ষদেশে খোদিত আছে ধর্মচক্র এবং তার দু'পাশে দুটি মৃগ শিশু। এই শিলমোহরগুলি থেকে একটা বিষয় জানা যায়

যে, এই নালন্দার প্রত্যেক বিহার ও মঠের নিজেদের পৃথক পৃথক শিলমোহর ছিল।

এ ছাড়া অনেক রাজা মহারাজা ও সম্রাটেরও শীলমোহর পাওয়া গেছে এখানে—যথা :—গুপ্তরাজবংশের নরসিংহ গুপ্ত ও দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত, আসামাধিপতি ভাস্করবর্মণ, কনৌজের শ্রীহর্ষবর্দ্ধন, এবং আরও বহু নৃপতি ভূপাল ও রাজকুমারের শীলও রয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে ভারতের নানা প্রদেশের ভূস্বামিগণ শিক্ষা ও সংস্কৃতির এই শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানটির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও উন্নতির জন্য সর্বদা উদার ও মুক্তহস্ত ছিলেন। রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা ও দাক্ষিণ্য প্রকাশের পক্ষে নালন্দা অপেক্ষা যোগ্যতর আর কোনও শিক্ষাকেন্দ্র তখন ছিল না। নালন্দার গৌরব ও খ্যাতি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। হাজার

বোধিসত্ব পদ্মপাণি (অভয় মুদ্রাযুক্ত)
(নালন্দায় প্রাপ্ত মধ্য যুগের শেষে প্রস্তুত ব্রোঞ্জ মূর্তি)

হাজার বছর পূর্বের এই বৌদ্ধভারতীয় প্রাচীন কীর্তি স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে গর্বে ও গৌরবে সমস্ত অন্তর যেন ভরে ওঠে! কেবলই মনে হয়—একদা যে ভারতবর্ষ উন্নতির এতটা উচ্চ শিখরে উঠতে পেরেছিল তার আজ এতদূর অধঃপতন সম্ভব হ'ল কেমন করে?

৪। নালন্দার মাটির জিনিস

এখানে মাটির তৈরী যে সব তৈজসপত্র মাটির নীচে থেকেই পাওয়া গেছে সেগুলিও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। নালন্দার প্রত্নশালায় এই অতীত ভারতের মৃত্তিকার বাসন প্রচুর সংগৃহীত আছে। সব রকমের মাটির জিনিস যা যা সে সময় ব্যবহার হ'ত, প্রায় তার সবগুলিই এখানে দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি দেখেই বোঝা যায় এদেশে এক সময় মৃৎশিল্প কত বেশী অগ্রসর হয়েছিল যার প্রত্যক্ষ নিদর্শন রয়েছে এই সংগ্রহশালার প্রত্যেক মৃৎপাত্রটির মধ্যে। ঘর-সংসারে ব্যবহারোপযোগী গৃহস্থের প্রয়োজনীয় যাবতীয় পাত্র তখন এমন সুরুচি-সঙ্গত ও সুদৃশ্য আকারে প্রস্তুত করা হ'ত যে দেখলেই বোঝা যায় সেদিনের ভারতবাসীরা ছিলেন সৌখীন, বিলাসী ও সূক্ষ্মরুচি-সম্পন্ন মানুষ। তাই, তাঁদের ডাল ভাতের হাঁড়ি তিজেলগুলিও ছিল যেমন সুন্দর, পানীয় জলের কুজা কলসও ছিল তেমনি সুদৃশ্য। মাটির পুতুলও কয়েকটি পাওয়া গেছে। সেগুলিও ভারি চমৎকার। মাটির মূর্তিও দু'একটি বেরিয়েছে, সে মূর্তি গঠন সৌষ্ঠবে উচ্চ শ্রেণীর ভাস্কর্যকলাকেও লজ্জা দেয়। মাটিকে এমন সুন্দর ভাবে ব্যবহার করতে জগতে আর কোথাও বড় একটা দেখা যায় না।

নালন্দার ইতিহাস একটু ব'লে এবার শেষ করবো। যদিও বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র হিসাবে নালন্দা কখনো গণ্য হয়নি, তথাপি বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে নালন্দার উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায়। তথাগতের প্রধান শিষ্যগণের অন্যতম আচার্য সারিপুত্ত নালন্দার সন্নিকটেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীভগবান বুদ্ধদেব রাজগীর যাতায়াতের পথে নালন্দায় বিশ্রাম করতেন। নালন্দার উপকণ্ঠেই জৈন ধর্মের জনক শ্রীনিগন্থনাথ পুত্ত ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। মগধেশ্বরের সুপ্রসিদ্ধ রাজকীয় প্রমোদ উদ্যান এই নালন্দারই কাছাকাছি ছিল। তবে শ্রীনালন্দামহাবিহারের বিশেষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়রূপেই একদা খ্যাতি বিস্তৃতি লাভ করেছিল। সম্রাট অশোকের অপরিমিত দাক্ষিণ্যেই নালন্দায় প্রথম বিহার ও ভিক্ষুসঙ্ঘের মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সারিপুত্তের স্তূপের উদ্দেশে তিনিই এখানে প্রথম তাঁর স্মৃতি পূজা নিবেদন করেছিলেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসের কোনও নির্দিষ্ট তারিখ আজও পাওয়া যায় নি, তবে অনুমান হয় যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকেই এর জন্ম হয়েছিল, কারণ, বৌদ্ধ মহাযানপন্থার প্রবর্তক বিশ্ববিখ্যাত রাসায়নিক শ্রীনাগার্জ্জুন যিনি একদা এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাঁর অভ্যুদয় ঘটেছিল। অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত হবার আগে তিনি এখানকারই ছাত্র ছিলেন। তারানাথের ইতিহাসে আমরা এর উল্লেখ দেখতে পাই।

অল্প কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই নালন্দার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চতুর্দিকে প্রসারিত হয়ে পড়েছিল। দশ হাজার ছাত্রের বিনা দক্ষিণায় থাকা, খাওয়া ও বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার অতি সুন্দর ব্যবস্থা ছিল এখানে। যাতে ছাত্রগণ নিশ্চিন্তভাবে নিরুদ্বিগ্নচিত্তে তাদের শিক্ষায় সমস্ত মনটি নিবিষ্ট ক'রতে পারে সেই জন্য সকল দুর্ভাবনা থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া হ'ত। রাজা মহারাজাদের অকৃপণ দানেই এই বিরাট ব্যয়সাধ্য ব্যাপার সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে কোনওদিনই অর্থাভাবে ব্যয় সংকোচ করতে হয়নি, কাজেই

এর শ্রীবৃদ্ধি কখন বাধা পায়নি। গুপ্তরাজাদের মধ্যে সম্রাট শক্রাদিত্য ছিলেন নালন্দার একজন শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। এঁর উত্তরাধিকারী পরবর্তী গুপ্ত রাজারাও যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে সমভাবে পোষণ করে এসেছিলেন এ পরিচয় পাই আমরা প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হিয়ুয়েন সিয়াঙের বর্ণনা থেকে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়াণ এসেছিলেন ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে। তাঁর বিবরণীর মধ্যে কিন্তু কোথাও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা, এমন কি তার অস্তিত্বের পর্যন্ত কোনও উল্লেখ নেই। কাজেই, অনুমান হয় বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্ররূপে নালন্দার খ্যাতি তখনও পর্যন্ত এতটা বিস্তারলাভ করেনি। নালন্দার প্রসিদ্ধি পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্তী কালে ঘটেছিল। হিয়ুয়েন সিয়াঙ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশদ বর্ণনা রেখে গেছেন, কারণ, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তদানীন্তন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও নালন্দার প্রধান অধ্যক্ষ পণ্ডিত শীলভদ্রের অধীনে তিনি প্রায় সাতবৎসর ছাত্র হিসাবে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাও করেছিলেন। বিভিন্ন বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্মসাধন প্রণালী ছাড়া তিনি হেতুবিদ্যা, (Logic) শব্দ-বিজ্ঞান (Grammar) চিকিৎসাবিদ্যা (Medicine) এবং বেদ উপনিষদ প্রভৃতি হিন্দুধর্মশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে তিনি যে সুন্দর বর্ণনা রেখে গেছেন আগামীবারে তা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত ক'রে নালন্দাপর্ব শেষ করবো।

মায়ের দেশে

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

মার ঋণ শুধিবার আছে কি উপায় ?
প্রণাম করিব ক'টি মায়ের দু'পায় ?
গর্ভধারিণী মাতা ছিল একজন।
তিনি ছাড়া মা যে মোর দেখি অগণন।
যেই দিকে চাই দেখি মায়ে ভরা দেশ।
মাতৃকাগণে কেবা গুণে করে শেষ ?
লক্ষ্মী মা গোলোকেই থাকেন বটে,
আসেন যে মাঝে মাঝে ঝাঁপি ও ঘটে।
অন্নদা দুই বেলা অন্ন যোগান,
বৎসরে তিন দিন সেবা নিয়ে যান।
ষষ্ঠী অশথ তলে পাতায় ঢাকা।
বটতলে মা শীতলা সিঁদুর মাখা।
মা মনসা সবচেয়ে ভয় করি তাঁয়।
মঙ্গলচণ্ডী মা দোলেন দোলায়।
শৈশবে পাইনু মা সরস্বতা।
তিনি ছাড়া আজো মোর নেইক গতি।
জন্মভূমি মা তাঁর নামটি জপি।
দেশমাতা গরীয়সী স্বর্গাদপি।
যে যুগে জনম লভি ধন্য জীবন।
যুগমাতা সে যে ঐ মায়ের মতন।
দাইমার কথা আমি কেমনে ভুলি ?
মাটি হ'তে প্রথমেই নিলেন তুলি।
লালিত হইনি শুধু মায়েরই ক্রোড়ে,
পিসীমা তুলিল মোরে মানুষ ক'রে।
ভুলিনি সে কাঙালিনী ঝি-মার কথা।
দিদিমা সহিল পুরা মায়েরই ব্যথা।
মনে পড়ে গেলে পরে মামার বাড়ী,
মাসীমা মামীমা মোরে দিত না ছাড়ি'।
যতদিন দড় মোর হয়নি ডানা,
কাকীমা-র নীড়ে ছিনু কোকিলছানা।
সহপাঠীদের টানে বাল্যে কতই,
নব নব মা'র দেখা পেয়েছি স্বতই।
বড় হ'যে মা পেয়েছি কৃপায় প্রিয়ার,
জ্যৈষ্ঠের ষষ্ঠীতে ফোঁটা পাই তাঁর।
পরিচয় দিব বল' আর কত মা'র।
আয়তন ক্রমে বাড়ে এই তালিকার।
তুলসী মা অঙ্গনে করি প্রণতি।
দুগ্ধে পালন করে মা ভগবতী।
জড়ে জীবে উদ্ভিদে মা নাই কোথা ?
হেথায় পালন করে, শাসন হোথা।
বাংলার ঘরে ঘরে মা মোর রাজে।
তাহাদের মুখ বায় শঙ্খ বাজে।
চন্দন বাটে কেউ, কেউ রাঁধে ভোগ,
কারো কর-পরশনে ঘুচে সব রোগ।
আল্তা কাহারো পায়, পরণে তসর,
ধূলিধূমে কারো মোটা বসন ধূসর।
কারো করে হেমভূষ', কারো বা শাঁখা,
কাহারো শূন্য হাত করুণা মাখা।
সব শেষে এক মায়ে করিব প্রণাম,
অন্তিমে যার জলে চির বিশ্রাম।

কতকটা শাসন ক্ষমতার লোভে, কতকটা সংগঠনের ইচ্ছায় বা অন্য কোন কারণে আমাদের রাষ্ট্র-ধুরন্ধরগণ মিঃ জিন্নার ভারত বিভাগ প্রস্তাব সমর্থন করিলেও তাহার দুই-জাতি-নীতি (Low-nation-theory) স্বীকার করেন নাই। আজ অনেক সময়ই মনে হয়, আমাদের রাজনীতি-বিদদের অপেক্ষা মিঃ জিন্না বড় রাজনীতিক ছিলেন। সাম্প্রদায়িক দৈত্যকে সুষ্ঠুভাবে লালন পালন করিয়া দুই জাতি-নীতিকে অস্বীকার করা সুচিন্তিত বলিয়া মনে হয় না। পাকিস্তান ইস্‌লাম রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষিত হইবার পর আমরা 'সেকুলার ষ্টেট্'—অর্থাৎ লোকায়ত রাষ্ট্র বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছি। প্রতিবেশী ইস্‌লামীয় রাষ্ট্রের নানারূপ সাম্প্রদায়িক অত্যাচারকে নীরবে সহ্য করিয়া দেশে লোকায়ত্ত রাষ্ট্রের আদর্শ রক্ষা করা সম্ভব নয়, বিশেষ করিয়া জনসাধারণের পক্ষে ধর্ম-নিরপেক্ষে সুবিচার করিবার মনোভাব অর্জন করা সহজ নয়। তাই পুর্বপাকিস্থানের অনাচারে আজ ভারতীয় জনসাধারণ উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে—স্থানে স্থানে সেকুলার ষ্টেটের আদর্শ ক্ষুণ্ন হইতেছে।

এ অবস্থায় ভারত রাষ্ট্রের একটা সুস্পষ্ট নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। 'দুই-জাতি' নীতি স্বীকার না করিলেও, পাকিস্থান রাষ্ট্রের অত্যাচারে তাহা বহুলাংশে সফল হইয়াছে, অর্থাৎ পাকিস্থান তাহার নীতিতে অটল থাকিয়া তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছে ও করিতেছে। অতএব ক্ষতিপূরণ সমেত পাকিস্থান হইতে হিন্দুদের লইয়া আসাই সমীচীন। পাকিস্থান গভর্ণমেণ্ট যদি ন্যায্য দাবী স্বীকার না করেন তাহা হইলে পুর্বপাকিস্থানের হিন্দুদের লোকসংখ্যা অনুপাতে আরও জমি পশ্চিমবঙ্গকে দিতে হইবে, তাহা দিতে না চাহিলে ভারতবর্ষকে কঠোরতর নীতি গ্রহণ করিতে হইবে।

—সংহতি

* * *

মুসলীম লীগের একজন চাঁই গজনফর আলি খাঁ সাহেব এখন ইরাণে পাকিস্তান সরকারের তরফের রাজদূত। সম্প্রতি ইরাণ থেকে করাচীতে ফিরে তিনি এক সাংবাদিক বৈঠকে ইরাণীদের মনোভাব কি রকম, তাই নিয়ে বক্তৃতা করেছেন। তিনি বলেছেন, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি ইরাণীরা অত্যন্ত আসক্ত। এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির যাঁরা সত্যিকার আধার, তাঁদের প্রতিও ইরাণীদের শ্রদ্ধা অসীম। মহাত্মা গান্ধী ও জহরলাল তাঁদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র।' ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলতে আমরা যা বুঝি তা হলো সর্বমানবের কল্যাণবোধ, সত্যানুসন্ধান ও সত্যানুরাগ। যাঁদের মধ্যে এই গুণাবলী পরিপুষ্ট হয়ে প্রকট হয়েছে, তাঁরা ইরাণী কেন—বিশ্বের অন্যান্য জাতিরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। ভারত বলতে এতদিন সকলে অখণ্ড ভারতকেই বুঝেছে। খাঁ সাহেব ভারতের যে চিত্র দিয়েছেন তার মধ্যে তিনি পাকিস্তানকেও সংযুক্ত করে দেখিয়েছেন। দুঃখের বিষয় আজ তিনি কৃত্রিম খণ্ডের অধিবাসী হয়ে নিজেকে ভিন্ন জাতি বলে চালাতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু পরের দৃষ্টিতে আজ যদি তাঁর নিজের দৃষ্টি খুলে যায় তবে তা সুখেরই বিষয়। সত্যকে সত্য বলে তিনি যে অকপটে প্রকাশ করেছেন, এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। ভারত দ্বিখণ্ডিত হলেও এর সমগ্র সত্তা এখনও অবিভাজ্য।

—পদাতিক

* * * * *

ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হয় না, হইতে পারে না, এই কথা জোর করিয়া বলার দিন আসিয়াছে। কংগ্রেস-সভ্য যাঁহারা...তাঁহারাও এই কথা বলিবেন। সমগ্র দেশবাসীকে একবাক্যে এই কথা ঘোষণা করিতে হইবে।

পশুর ধর্ম্ম নাই। মানুষ মাত্রেরই ধর্ম্ম আছে। ধর্ম্মই আমাদের আশ্রয়। ধর্ম্মকে বাদ দিবার হেতু যদি এমন হয়, ধর্ম্মের নাম করিলেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, তবে ধর্ম্ম বস্তুটা বাদ দেওয়াই সঙ্গত—এইজন্য ভয় করিলে চলিবে না। এই ভয় একটা জাতিকে নিশ্চিহ্ন করিবে, সে জাতি ভারতের হিন্দুজাতি। রাষ্ট্রের দায়ে এই অহেতুক আতঙ্ক কি ভারতের নর-নারী স্বীকার করিয়া লইবে? না, না—এই প্রতিধ্বনি আমরা সর্ব্বদিক হইতেই শুনিতে চাহি।

ধর্ম্ম শুধু আমাদের ধারণ করিয়া রাখে না। ধর্ম্মে আত্মার অভ্যুত্থান হয়। ধর্ম্মের মধ্য দিয়াই মুক্তির সন্ধান মিলে। ভারতের এই ধর্ম্মতত্ত্ব পৃথিবীর কোন মানুষ অস্বীকার করিবে না। অতএব ধর্ম্মের ভিত্তির উপরই আমাদের জাতি, সমাজ, গড়িতে হইবে। ধর্ম্মই হইবে রাষ্ট্রশক্তির দৃঢ় বুনিয়াদ। হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান, বৌদ্ধ প্রভৃতি জাতি ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াই জীবনযাত্রা সুরু করিবে। ধর্ম্ম ব্যক্তির সম্পত্তি নহে, ইহা আমরা বলিয়াছি। সকল জাতির ন্যায় হিন্দুজাতিও ব্যক্তি-বিশেষ লইয়া নহে, জাতি-হিসাবে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। এই জাতির রাষ্ট্র ও সমাজ থাকিবে। হিন্দু নিশ্চিহ্ন হইতে চাহে না। কেননা হিন্দুত্বের মধ্যে যে গভীরতা আছে তাহার অনুভূতি লইয়াই বিশ্বজাতিকে সে ধর্ম্মপরায়ণ করিতে পারে। হিন্দুর ধর্ম্ম বিশাল এবং বৃহৎ। এই ভূমার ধর্ম্ম হিন্দুজাতি রাষ্ট্রের দায়ে হারাইতে পারে না। রাষ্ট্রের চেয়ে তার ধর্ম্ম বড়। ধর্ম্মের ভিত্তি দৃঢ় হইলে সে বিশ্বরাষ্ট্র গড়িবে। ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়কে ধর্ম্মনিষ্ঠ করিয়া সে সৎ'এর সন্ধান দিবে। আজ প্রত্যেক হিন্দুকে ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ-রাষ্ট্র গড়িতেছি বলিয়া আপাতঃ দায়মুক্তির ভীরুতা হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে।

—নব সংঘ

* * * * *

চিত্তরঞ্জন কারখানায় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের কাজের সুবিধা দেওয়া হইবে এবং স্থানীয় কলোনীতে উদ্বাস্তু সমাজের লোকদিগকে বসতি স্থাপনের সুবিধা দেওয়া হইবে ভারত গবর্ণমেণ্ট পূর্বে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছিলেন। এখন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, কারিগরী কার্যে অভিজ্ঞতা না থাকিলে কাহাকেও কাযে নিয়োগ করা হইবে না রেলওয়ে বোর্ড এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুগণ কারিগরও নহেন এবং অভিজ্ঞতাও তাহাদের নাই ইহা পূর্বেহ বড় কর্তাদের জানা ছিল এবং ইহা জানিয়া শুনিয়াই উপরোক্ত আশার বাণী তাহাদের শুনানো হইয়াছিল। বর্তমানে নূতন তথ্য শুনাইয়া তাহাদের হতবাক করিয়া দিবার অর্থ দুর্বোধ্য। উদ্বাস্তুদের লইয়া সর্বত্রই একটা খেলা করার সদিচ্ছা দেখা যাইতেছে। মানুষের আদিম সংস্করণ বানরকে লইয়া যেরূপ আধুনিক মানুষ রাস্তায় রাস্তায় খেলা করিয়া দুই পয়সা রোজগার করে গবর্ণমেণ্টও বিভিন্ন বিভাগগুলিতে উদ্বাস্তুদের জন্য উদ্যোগ আয়োজন করিয়া বন্ধু বান্ধব ও স্বজাতি পোষণ করিতেছেন। সরকারী নীতি সত্যই দুর্বোধ্য। শিশু রাষ্ট্রের প্রথম পাদক্ষেপেই এই অবস্থা। —পূর্ণিমা

* * *

পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের সমস্যাও কম গুরুতর নয়। এই অসহায় ভাগ্যহতের দল মার খাইতে খাইতে কোণঠাসা হইয়া এবার অনেক স্থানেই উগ্রদংষ্ট্রা বাহির করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইতেছেন। আঘাতে আঘাতে ইঁহারা শক্ত হইয়াছেন, সংখ্যা বৃদ্ধিতে ইঁহাদের সঙ্ঘশক্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অসহায়ের আবেদন অনেক ক্ষেত্রে অবুঝের দাবিতে পরিণত হইয়া গোলযোগের সৃষ্টি করিতেছে। আমাদের সব সময়েই স্মরণ রাখিতে হইবে—ইঁহারা বহুপুরুষের ভিটা, অন্নসংস্থানের উপায়, সঞ্চিত সম্পত্তি, এক কথায় সবস্ব ত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন, স্বেচ্ছায় আনন্দ করিতে আসে নাই। সুবিধাবাদী কেহ কেহ যে উপার্জনের জন্য উপায় ও স্থায়ী আশ্রয় সত্ত্বেও গাছের খাইয়া তলার কুড়াইবার ফিকিরে আছেন তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু অধিকাংশই নিরাশ্রয় সর্বহারা। ইঁহাদিগকে অন্যের সম্পত্তিতে বা অধিকারে চড়াও হইতে বাধ্য না করিয়া রাষ্ট্র যদি পুনর্বসতির উপযুক্ত আয়োজন করেন, তাহা হইলে ভারত-রাষ্ট্রের ইঁহারাই একদিন সর্বাধিক শক্তিশালী অংশ হইয়া উঠিবেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের অভিজ্ঞতায় আমাদের যে জ্ঞান হইয়াছে, তাহা কাজে না লাগাইলে আমাদের সর্বনাশ হইবে। আমরা দেখিয়াছি, দশ দিনের লঙ্গরখানা খুলিয়া বহির্দ্বারে ঠেকাইয়া রাখিয়া মানুষকে বাঁচানো যায় না, তাহার মৃত্যু বিলম্বিত হয় মাত্র। পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্র পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের লইয়া যদি আত্মশক্তি বর্ধিত করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সযত্নে ও সমাদরে আত্মীয় ও আত্মস্থ করিয়া লইতে হইবে। টাকা নাই—এই অজুহাত দেখাইয়া যখন কোনও ফল হইতেছে না, অভাবের মধ্যেই আত্মীয়-পোষণের সহৃদয়তা দেখাইবার বাধা কোথায়? যাহা অনিবার্য, তাহাকে বরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ভারত-রাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ-রাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গবাসী প্রত্যেকে এইটুকু সহৃদয়তা দেখাইয়া আহত ও রক্তাক্তদের বেদনার উপশম করিবার চেষ্টা না করিলে তাহা আত্মহত্যার নামান্তর হইবে,—যেমন করিয়াই হউক, ইহা নিবারণ করিতে হইবে।

প্রজা-বদল ও পুনর্বসতির সুষ্ঠু ব্যবস্থা যত দিন না হইতেছে, ততদিন ভারতবর্ষে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক লোকরাজ প্রতিষ্ঠা-উৎসব আমরা যত জাঁকাইয়াই করি, তাহা ব্যর্থ ও নিষ্ফল। দিল্লী ঢাকা হইতে অনেক দূর হইলেও কলিকাতা সেই অজুহাতে মুখ ফিরাইয়া থাকিতে পারে না।

—শনিবারের চিঠি

* * *

পূর্ব্ব পাকিস্থানে আগুন জ্বলিতেছে—পূব্ব দিগন্তের সমস্ত আকাশ সেই আগুনের সহস্র স্ফুলিঙ্গে রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে—পূর্ব্ববাংলার সংখ্যালঘুরা আজ আর নিরাপদ নয়। চেঙ্গিস খাঁ ও নাদির শাহী শাসনের যুপকাষ্ঠে আজ সমগ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বলি দেওয়া হইতেছে। লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারীর মান-ইজ্জত, ধন-সম্পত্তি ও জীবন রক্ষার কোন উপায় নাই। তাহাদের কাতর চীৎকার ও সহস্রমুখীন লেলিহান অগ্নিশিখা সমগ্র ভারতকে অত্যন্ত চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালী সমাজ, বাঙ্গালী জাতি এবং ভারতীয় রাষ্ট্র বিপন্ন হইতে চলিয়াছে। আজ পূর্ব্ব পাকিস্থানে কি নৃশংসতা, পৈশাচিক বর্ব্বর অভিযান চলিয়াছে সওয়াকোটি সংখ্যালঘুর উপর, তাহার সঠিক খবরও জানিবার উপায় নাই। পাকিস্থানী গভর্ণমেণ্ট সমগ্র পূব্ববঙ্গের উপর লৌহ যবনিকা টানিয়া দিয়াছে। এই অবস্থার করণীয় কি? এই গুরুতর অবস্থার প্রতিকার কি?

সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেণ্টে আবেগ বিচলিত কণ্ঠে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু পরিষ্কার ভাষায় পূর্ব্ব বাংলার ব্যাপক দুর্য্যোগের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। ভারত সরকারের কার্য্যপদ্ধতির ইঙ্গিতও এই বিবৃতিতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। পরিষ্কার ভাষায় তিনি ঘোষণা করিয়াছেন "If the methods we have suggested are not agreed to, we shall have to adopt other methods" তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছেন—আজ বাংলার সমস্যা সমাধানের উপরই অগ্রাধিকার দিতে হইবে—কিন্তু এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইলে এবং জনসাধারণ যদি ইহাই উচিত বলিয়া মনে করেন—তাহা হইলে ভারতের সর্ব্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার যে একান্ত প্রয়োজন তাহা জনসাধারণকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত্তে জনসাধারণকে অত্যন্ত শান্ত ও সংযত থাকিতে হইবে। অসতর্ক আলোচনা ও অবিবেচনাপ্রসূত কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া ধৈর্য্যের সহিত ভারত গভর্ণমেণ্টের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের উপর নির্ভরশীল ও আস্থাশীল থাকিতে হইবে। —কংগ্রেস

* * *

পাকিস্তানী জাঁদরেল পররাষ্ট্র-সচিব জাফরুল্লা খাঁ সাহেব কিছুদিন ধরে আমেরিকায় বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন। সম্প্রতি সেখানে বক্তৃ

শহরে এক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন ভারত ও পাকিস্তানের লোকগুলো যদিও একই বংশসম্ভূত তথাপি মুসলমান সমাজটি হলো উদার ঐক্য ও ভ্রাতৃভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুরা আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাসী, এই বিশ্বাস থেকেই জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তি, সুতরাং তাদের সঙ্গে মুসলমানদের সহযোগিতা একরূপ অসম্ভব। ধর্মবিশ্বাসের দরুণ দেশ-বিভাগের প্রয়োজন খাঁ সাহেব ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। তবে তাঁর বক্তৃতার আসর ঠিক করে দেওয়া ও তাঁর অসার যুক্তির প্রশ্রয় দেওয়াও যে বর্তমানে আমেরিকার প্রয়োজন, তাও হয়তো মার্কিণ রাজনীতিবিদ তাঁর আড়ালে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। —পদাতিক

*   *   *

গত কয়েক বৎসর যাবৎ কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তর কর্তৃক আভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই শিক্ষার মেয়াদ সম্প্রতি আরও এক বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতার উপকণ্ঠে ব্যারাকপুরে কেন্দ্রীয় আভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষ গবেষণা কেন্দ্রে আগামী ১লা এপ্রিল (১৯৫০) হইতে নূতন বৎসরের শিক্ষাকার্য্য সুরু হইবে। এই শিক্ষাকাল ১০ মাস স্থায়ী হয়। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের উপরাষ্ট্র-সমূহে ফিসারিজ অফিসারের পদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদানই এই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। তবে যাঁহারা বেসরকারী চাকুরী করিতে চান অথবা নিজস্ব মৎস্য চাষ কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে চান তাঁহারাও নিজ ব্যয়ে ভর্ত্তি হইতে পারেন। কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তর কর্তৃক এ পর্য্যন্ত ১৭০ জনকে শিক্ষাদান করা হইয়াছে। তাঁহারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। —আর্থিক জগৎ

*   *   *

বর্ধমান হইতে কাটোয়ার দূরত্ব ৩৪ মাইল এবং এই রাস্তার বাসভাড়া মাত্র একটাকা। সেই অনুপাতে বর্ধমান হইতে কালনার দূরত্ব ৩৬ মাইল হইলেও তাহার ভাড়া একটাকা চারি আনা ছিল। কয়েক মাসের মধ্যেই এক অজ্ঞাত কারণে বর্ধমান কালনার বাসভাড়া ট্যাক্সীর মিটারের ন্যায় পাঁচ সিকা হইতে সাত সিকায় উন্নীত হইয়াছে। কাটোয়ার মত বর্ধমান হইতে কালনা যাইবার রেলপথ নাই বলিয়াই কি এক্ষেত্রে এইরূপ একচেটিয়া রীতি অনুসরণ করা হইয়াছে ?

—দামোদর

*   *   *

ভারতীয় পার্লামেন্টে আসাম-অবাঞ্ছিত-বহিরাগত-উচ্ছেদ বিল আইনে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। পার্লামেন্টের আলোচনায় প্রকাশ পাইয়াছে, প্রায় ৫ লক্ষ বহিরাগত আসামে প্রবেশ করিয়াছে অশুভ বুদ্ধি লইয়া। অসমীয়া সদস্যগণও তাহা স্বীকার করিয়াছেন—শুধু তাহাই নয়, শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার চৌধুরী অন্যান্য রাজ্যের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে আইনের বিধান আরও কঠোরতর করিবার জন্য যুক্তি প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত থাকেন নাই। শ্রীযুক্ত দেবকান্ত বড়ুয়া স্পষ্ট ভাষায় ইহা সমর্থন করিতে গিয়া রাজ্যের প্রকৃত পরিস্থিতি ব্যক্ত করিয়াছেন। এই বিধান যে খুবই সময়োপযোগী হইয়াছে, তাহাতে সকলেই নিঃসন্দেহ এবং একথাও আমরা মনে করি, সত্য সত্যই আরও কঠোরতর বিধান বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত ছিল। —জনশক্তি

*   *   *

হুগলী জেলার কোন কোন স্থানে, বিশেষ করিয়া পাণ্ডুয়া অঞ্চলে, বলাগড় অঞ্চলে ও ধনিয়াখালী থানায় কাণাজুলি এলাকায় কর্ম্মিগণ গো-উন্নয়ন সম্বন্ধে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কাণাজুলীর শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ প্রমুখের প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয় ও অনুসরণীয় বিজ্ঞান সম্মতভাবে গোপালন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক কর্ম্মীবৃন্দ অনায়াসেই ইহা দেখিয়া আসিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দও যেরূপ উৎসাহের পরিচয় দিতেছেন, তাহা উল্লেখ না করিলে বক্তব্য অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। জনসাধারণ ও সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দ সর্ব্বত্রই যদি এইরূপভাবে পরস্পরের সহযোগে গো-উন্নয়ন কল্পে মনোনিবেশ করেন, আমাদের বিশ্বাস আছে, অত্যল্প সময়ের মধ্যেই দর্শনীয় সুফল পাওয়া যাইবে। —নির্ণয়

*   *   *

পশ্চিমবঙ্গ বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন (১৯৪৮)এর কার্য্যকারিতা পরীক্ষার জন্য গত জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই কমিটি পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের বরাবরে তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের সংশ্লিষ্ট একটি বিজ্ঞপ্তিতে রিপোর্টের সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটির মতে ১০০ টাকার নিম্নস্থ ভাড়া বাড়ীর ভাড়া শতকরা ৫ টাকা এবং ১০০ টাকার উর্দ্ধস্থিত ভাড়া বাড়ীর ভাড়া শতকরা ১০ টাকা মাত্র বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে এই খাতে শতকরা ২০ টাকা পর্য্যন্ত ভাড়া বৃদ্ধি করা চলে। যে সমস্ত বাড়ী ব্যবসা কিম্বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় উহাদের বেলায় পূর্ব্ব বর্ণিত শ্রেণীভেদে যথাক্রমে শতকরা ১০ টাকা ও ১৫ টাকা ভাড়াবৃদ্ধি মঞ্জুর হইয়াছে। অপর পক্ষে বর্ত্তমান আইনের বিধান অনুসারে এই জাতীয় গৃহের বেলায় শতকরা ৪০ টাকা পর্য্যন্ত ভাড়া বৃদ্ধি করা চলে। এককালীন ৩ মাসের ভাড়া না দিলে সরাসরি ভাড়াটিয়াকে উঠাইয়া দিবার যে ধারা বর্ত্তমান আইনে আছে উহার পরিবর্ত্তে এইরূপ সুপারিশ করা হইয়াছে, উপর্য্যুপরি ২ মাসের ভাড়া না দিলে ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের মামলা আনা যাইতে পারে, তবে মোকদ্দমার খরচ এবং শতকরা ১২½ ভাগ সুদ সমেত সম্পূর্ণ বকেয়া ভাড়া মিটাইয়া দিলে ভাড়াটিয়াকে আর উচ্ছেদ করা যাইবে না। কমিটির মতে "সেলামী" প্রথা দূরীকরণের একমাত্র কার্য্যকরী উপায় হইল কলিকাতায় নূতন গৃহনির্ম্মাণ দ্বারা ভাড়া বাড়ীর বৃদ্ধি। বাড়ীওয়ালাদের কিছু সংখ্যক বাড়ী গবর্ণমেণ্ট যদি নিজ তদারকীতে ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলেও কিঞ্চিৎ কাজ হইতে পারে বলিয়া কমিটি মনে করেন। —আর্থিক জগৎ

*   *   *   *   *

গত দেড়শত বৎসরে আমরা এই ইতিহাস ভুলিয়াছি। "মাস্ক-মায়া ও মসীজীবি" কেরাণীর দল গড়িবার আদর্শে মশগুল হইয়াছিলাম।

তাহাই ছিল যেন সকল শিক্ষার আদর্শ। তার ফলে জন্মিয়াছে কুব্জ-পৃষ্ঠ ও মুব্জ দেহ একটা জাতি। এই অধঃপতনের অপমান-বোধ প্রখর হইয়া দেখা দেয় বাঙ্গালীর মধ্যে "স্বদেশী" যুগে। তারপর চলিয়া গিয়াছে ৪৫ বৎসর। তার অন্তে আসিয়াছে পরদেশী শাসন-ক্ষমতার অবসান। বাঙ্গালী-জীবন ঘৃণ্য ও অস্বাভাবিক যে ব্যবস্থার অত্যাচারে পিষ্ট হইতেছিল তার বিনাশ হইয়াছে। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে ভারত-রাষ্ট্রের সম্মান রক্ষা করিবার দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে বাঙ্গালীর উপরেও। আগামী দশ বৎসরের মধ্যে প্রমাণিত হইবে—বাঙ্গালী সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টায় কতটুকু মনঃসংযোগ করিয়াছে। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে তাকে নূতন যুগের নূতন শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, এই দেড়শত বৎসরের শিক্ষার যে অভ্যাস ও সংস্কার তার চরিত্রে ও মনে দানা বাঁধিয়াছে তাহা ভুলিয়া যাইতে হইবে।

—সৈনিক

* * * *

বারাসাত মহাকুমা অফিসে ও সিমেন্টের আবেদন 'ফরম' না মিলিবার দরুণ জনসাধারণ ঐ দুইটি বস্তুও আবেদন করিতে বেশ বেগ পাইতেছে। মহকুমার দূর গ্রাম হইতে সাধারণকে একবার ফরমের খসড়া আনিতে গাড়ী ভাড়া খরচ করিতে হইতেছে, তার উপর মুহুরীকে পারিশ্রমিক দিয়া তাহা নকল করাইতে হইতেছে, জমা দিতে যাইতে হইতেছে আবার তদ্বিরের জন্য ট্রেণভাড়া খরচ করিতে হইতেছে। প্রতি ইউনিয়নে যদি এক-আধখানি করিয়াও এরূপ ফর্ম আসিত তবে জনসাধারণের এক দফা গাড়ী ভাড়া বাঁচিত। সরকারের 'ফর্ম' অবিলম্বে সরবরাহ করা উচিত এবং প্রতি ইউনিয়নে একটি করিয়াও 'ফর্ম' অবিলম্বে না পাঠাইলে জনগণ বড়ই অসুবিধা ভোগ করিবে।

—সংগঠনী

* * *

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এবারকার সাংবাদিক সম্মেলনে কাশ্মীর প্রসঙ্গের আলোচনায় যে কঠোর ভাষা প্রয়োগ ও দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল বলিয়াই আমরা মনে করি। পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট দিনের পর দিন নিয়মিত ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে জঘন্য মিথ্যা ও কুৎসা রটনা করিয়া চলিয়াছে, ইহাই তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতির একমাত্র কারণ নহে ; কাশ্মীর সমস্যার আলোচনা করিতে গিয়া বিদেশী সাংবাদিকগণও পাকিস্তানের এই জঘন্য মিথ্যা প্রচারকার্য্যে উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছেন, ইহাই প্রধান মন্ত্রীর ক্ষোভ ও ক্রোধের কারণ। পাকিস্তান কোনদিন সত্য প্রচার করে না এবং যাহা বলে তাহা মিথ্যা, ইহা আমাদের নিকট নূতন সংবাদ নহে। কিন্তু সম্প্রতি বৃটেন ও আমেরিকার অনেকগুলি পত্রিকা পর্য্যন্ত এই মিথ্যা প্রচারে এমনভাবে ব্রতী হইয়াছে যে, কাশ্মীর সমস্যার প্রকৃত অবস্থাই চাপা পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের মনে হয়, এবার নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের আবার নূতন করিয়া প্রথম প্রশ্নটিই উত্থাপন করা উচিত। পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট কাশ্মীর হইতে তাঁহাদের হাত সরাইয়া লইবেন কিনা, শেষবারের মত নিরাপত্তা পরিষদকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। শুধু এইখানেই ভারত গবর্ণমেণ্টের থামিয়া থাকিলে চলিবে না, কাশ্মীরকে ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলরূপে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করিয়া লইতে হইবে, গণভোটের প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ভারতীয় রিপাব্লিকের অন্যতম অঞ্চল কাশ্মীরকে রাজধানী দিল্লীর ন্যায়ই অচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করিয়া রক্ষার ব্যবস্থাদি করিতে হইবে। হীন বিদ্বেষ ও অমানুষিক হিংসার সাহায্যে মুসলীম লীগ ভারতবর্ষ খণ্ডনে সমর্থ হইয়াছে। এখন পাকিস্থান সেই নীতি ও পন্থার সাহায্যই কাশ্মীর অধিকার এবং পূর্ব্ববঙ্গ হইতে হিন্দুদের উৎসাদনে ব্রতী হইয়াছে। ন্যায়, নীতি, সভ্যতা ইত্যাদির কথা পাকিস্থানকে শুনানো অর্থহীন, তাহা আশা করাও বাতুলতা। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ও পাকিস্থানীদের স্বার্থ বলি দিতে যাঁহাদের দ্বিধা হয় না, অর্থাৎ যাহাদের বিশ্বাসঘাতকতার সীমা এতদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে, তাঁহাদের সম্বন্ধে তোষণনীতি যেমন পরিত্যাজ্য, মানবতা ও সভ্যতার আবেদনও তেমনি ত্যজ্য। লীগের হিন্দুধ্বংসাত্মক নীতির নিকট যে আত্মসমর্পন করা হইয়াছে, তাহার উপর যবনিকা চিরকালের জন্য পতিত হইয়াছে, ইহাই আমরা দেখিতে চাই।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

* * * *

নৌকাগঠন ও সংস্কার সম্বন্ধে অসুবিধা অনুভূত হচ্ছে। আগে চলতি পান্‌সিতে এক আনা খরচে বালি (হাওড়া) থেকে হাটখোলা (কলিকাতা) যাওয়া চলতো। গৃহস্থ বাড়ির মেয়েরা পানসি ভাড়া ক'রে বিশেষ বিশেষ তিথিতে কালীঘাট যেতেন। গঙ্গার দুই ধারে আত্মীয়স্বজনদের বাড়ীতে নৌকায় যাতায়াত চলতো, তা ছাড়া মাল বোঝাই পানসিও গঙ্গাবক্ষে সর্বদাই দেখা যেতো। মাহেশের (হুগলী) রথযাত্রায় গঙ্গার উপর চলতো শুধু পানসি আর পানসি। এখন তাড়াতাড়ি হুড়োহুড়ির যুগে বাস ও লরির ছুটোছুটি চলেছে। পানসি প্রায় উঠে গেছে। তাই পানসির মিস্ত্রী বা কারিগর পাওয়া দুর্ঘট হয়েছে। বরাহনগর ও আগড়পাড়ায় দুই এক ঘর মিস্ত্রী আছেন। খোঁজ করলে আরও দুই চার ঘর পাওয়া যেতেও পারে। এঁদের সন্ধান ক'রে নিয়ে এসে বাচের পানসি তৈয়ারি বা সংস্কার করতে হবে।

আমাদের ধারণা এই যে, ভাল করে চেষ্টা করলে গঙ্গার দুই তীরের গ্রাম ও সহরে বাচ্‌খেলার হাওয়া উঠবে। কলিকাতা থেকে নৈহাটী পর্যন্ত গঙ্গার উভয় তীরে বহুসংখ্যক উচ্চ বিদ্যালয় আছে, কলেজও আছে। নানারকমের ব্যায়াম সমিতিও সর্বত্র আছে। বাচের নৌকা গঠনের দিকে মন পড়বে। দেখতে দেখতে কয়েক বৎসর যদি নানা স্থানে সর্বশুদ্ধ একশত বাচের নৌকা গঙ্গার উপর ভাসে তবে নদীমাতৃক দেশে ব্যায়ামের একটা স্বাভাবিক পথ খুলে যাবে। সম্মিলিত চেষ্টায় এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করা একান্ত আবশ্যক। —সাধারণী

* * *

হাওড়া জেলার আমতা থানা। জয়পুর ইউনিয়ন। জয়পুর গ্রাম-নিবাসী শ্রীকিশোরীমোহন হাজরা সম্পন্ন গৃহস্থ। দেশকর্ম্মী জমি-

যায়গা আছে। শিক্ষিত হ'লেও চাকুরী করেন না। কিন্তু কৃষিকর্মে খুব উৎসাহী। গত বৎসর ধারের জমিতে কম্পোষ্ট বা পচাই সার দিয়ে তিনি একটি জমিতে যে ধান ফলিয়েছেন তাতে হিসাবে একরে সাতান্ন মণ ধানের উৎপাদন হয়। তিনি এমোনিয়াম সালফেট বা এমোনিয়া ফসফেট বা হাড়ের গুঁড়ো ব্যবহার করেন নাই। কচুরীপানা, ছোট ছোট লতা, গাছ-গাছড়া, গাছের পাতা, আবর্জ্জনা ইত্যাদি দিয়ে বাড়ীতে কম্পোষ্ট তৈয়ারী করে সেই সার দিয়েছেন। সে সার আমরা দেখেছি। চমৎকার! কিন্তু যে কোন লোক করতে পারে। ইহা ছাড়া, জমিরও উর্ব্বরাশক্তি আছে। কারণ, দামোদরের বন্যার জল ঐ মাঠের উপর দিয়া বাহিয়া যায়। সুতরাং পলিও পড়ে। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী জমিতে যেখানে দশ মণ ধান হয়, সেখানে ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিঘায় ১৯ মণ ধান হওয়া বড় কম কথা নয়। আমরা সেই জমি দেখিয়াছি। ধান কাটিয়া লওয়ার পরে মাঠে যে নাড়া থাকে তাহাও দেখিয়াছি। উহার পুষ্টি, রং, পার্শ্ববর্ত্তী জমির নাড়ার অপেক্ষা ভাল। মুড়াগুলি পরিধিতে বড় এবং এক একটি মুড়াতে ২৬।২৭টী ধানের গাছ। কাটা খড়ের লম্বতা প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট। পশ্চিমবঙ্গেরও মাটিতে ৮০ হাত বিঘায় যে ১৯ মণও ধান ফলিতে পারে, ইহা তাহার প্রমাণ। কিশোরীবাবু এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞানমতে পথ প্রদর্শন করিলেন। আমরা আশাকরি, সমগ্র কৃষক সমাজ তাঁহার এই পথ অনুসরণ করিবেন।

—সত্যাগ্রহ পত্রিকা

* * *

সম্প্রতি বঙ্গভঙ্গ প্রভৃতি কারণে কলিকাতায় লোক সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে কয়েকটি কলেজ হওয়া একান্ত আবশ্যক বলিয়া স্যার রাধাকৃষ্ণন প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সভ্যগণ সুপারিশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কলেজ ষ্ট্রীটে এবং দক্ষিণ কলিকাতায় কলেজের আধিক্য থাকিলেও কলিকাতার অন্যস্থানে উহার অভাব দৃষ্ট হয় এবং চারিদিকে কলেজ থাকিলে উক্ত কলেজগুলিতে এত ভিড় হয় না। বস্তুতঃই উত্তর কলিকাতা, বরানগর, ইণ্টালি, খিদিরপুর, আলিপুর, বেহালা প্রভৃতি স্থানে কলেজ নাই। উক্ত কমিশন বারাকপুর গভর্ণমেণ্ট হাউস, হেষ্টিংস হাউস (আলিপুর), বেলভেডিয়ারে জাতীয় লাইব্রেরীর সীমানার মধ্যে যে সমস্ত খালি জায়গা ও পাকা ঘর-বাড়ী আছে, তাহা কাজে লাগাইয়া কলেজের অভাব পূর্ণ করিতে বলেন।

আমাদের মনে হয়, বারাকপুর গভর্ণমেণ্ট হাউসে এবং বরানগরে কোন খালি জায়গায় বাড়ী করিয়া কলেজ হইলে উত্তর প্রান্তস্থ জায়গাসমূহের ছাত্রগণের শিক্ষা ব্যবস্থা হইবে। বর্ত্তমান সময়ে বরানগর, দক্ষিণেশ্বর, পানিহাটি, বেলঘরিয়া, কামারহাটি প্রভৃতি স্থানে জনসংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, অচিরে উক্ত অঞ্চলগুলিতে দুইটি কলেজ হইলে তত্রস্থ স্থানসমূহের ছাত্রদেরও সুবিধা হইবে এবং কলিকাতার কলেজ-সমূহেও ভিড় কমিবে। বেলভেডিয়ারে বোর্ডিংসহ কলেজ হইলে ছাত্রগণ জাতীয় লাইব্রেরীরও সুবিধা পাইতে পারিবে। হেষ্টিংস হাউসেও একটী কলেজ হইলে চেত্‌লা, আলিপুর, কালীঘাট, প্রভৃতি স্থানের ছাত্রদের সুবিধা হইবে। এইরূপ ঢাকুরিয়া যাদবপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এবং বেহালা বড়িষায় কলেজ হওয়া বিশেষ আবশ্যক। নিৰ্জ্জন স্থানে কলেজ থাকিলে ছাত্রদের পড়াশুনারই বেশী মনোযোগ থাকে।

—বঙ্গশ্রী

* * *

২২শে মাঘ নয়া দিল্লীর নাগরিক সম্বর্দ্ধনার উত্তরে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের রাষ্ট্রপতিরূপে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রথম বক্তৃতা দেন। ভারতের শাসনতন্ত্রের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, এমন একটি আদর্শ সমাজ গঠন এই শাসনতন্ত্রের লক্ষ্য, যে সমাজ দারিদ্র্য, ব্যাধি এবং অজ্ঞতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিবে। শাসনতন্ত্রে এমন বিধান করা হইয়াছে, যাহাতে ধনী অধিকতর ধনী এবং দরিদ্র অধিকতর দরিদ্র হয়, এইরূপ ভাবে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হইবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কল্যাণ এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হইবে। তিনি আরও বলেন যে, স্বাধীনতার জন্য অনেকেই অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখ-দারিদ্র্যহীন সমাজ গড়িবার জন্য আরও বেশী ত্যাগস্বীকার এবং অধিকতর আত্মলোপের প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে এইরূপ ত্যাগস্বীকার করিলেই আদর্শ সমাজ গড়িয়া উঠিবে, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথম আমাদের শাসক শ্রেণীরই, কংগ্রেসসেবীদেরই এই ত্যাগস্বীকারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা উচিত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন লক্ষণই আমরা দেখিতে পাই নাই। বরং ত্যাগস্বীকারের পরিবর্ত্তে ক্ষমতাপ্রিয়তাই তাঁহাদের মধ্যে অধিকতর পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে।

—মাসিক বসুমতী

* * *

কলকাতায় জনচলাচল অত্যধিক মাত্রায় বেড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে যান-চলাচল আরও বেড়েছে। এর ফলে পথে মানুষের জীবন সর্বদাই বিপন্ন। ফুটপাথগুলিতে সর্বদাই ভীড়। মানুষকে অনেক সময়েই রাস্তায় নামতে হয়। অথচ তিন চারটি ট্রাম বাসের আড়াল থেকে কোন্ মুহূর্ত্তে কোন্ যানটি যে এসে দেহের ওপর অধিষ্ঠিত হ'বেন তা বুঝে ওঠা শক্ত হ'য়ে পড়ে। আর পুলিশের অমনোযোগের সুযোগ নিয়ে চালকরাও প্রত্যেকে প্রতিযোগীর ভাব নিয়ে ইচ্ছামত বেগে গাড়ী চালিয়ে যান।

স্পীড কণ্ট্রোল করবার মত আইনের (আপাততঃ খাতাকলমে চালু আছে কিনা জানি না) পুনঃপ্রবর্ত্তন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কর্মকর্ত্তারা এ' বিষয়ে অবহিত হোন।

—সৈনিক

* * *

শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী যখন ভারতরাষ্ট্রের গবর্ণর জেনারেল ছিলেন, তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা একটি কমিটি নিয়োগ করেন রাষ্ট্রের শাসনকার্য্যে যে ব্যয়বাহুল্য দেখা দিয়াছে, তাহা কাটিয়া-ছাঁটিয়া নূতন ব্যবস্থা করিবার জন্য। এই কমিটির অনুসন্ধানের ফলে তাঁহাদের

রিপোর্টে আমরা অনেক নূতন কথা শুনিতে পাই। গত ২৯শে অগ্রহায়ণ তাহা চুম্বকরূপে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দের মাহিনা বিদঘুটেরূপে (fantastic) বাড়িয়াছে। এই অভিযোগ প্রমাণ করিবার জন্য কমিটি বলিয়াছেন—খাদ্য মন্ত্রীর নিজস্ব মুন্সী (private secretary) একজন রাজনৈতিক কর্ম্মী ছিলেন; ৮০০৲ টাকা বেতনে ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয়; ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁহাকে আঞ্চলিক খাদ্য কমিশনাররূপে দেখিতে পাওয়া যায়; বেতন তাঁহার ১,৮০০৲ টাকা। পশুবিদ্যার একজন অধ্যাপক ২৮০৲ টাকা বেতনে প্রথম নিযুক্ত হন; তাঁহার পরের পদলাভ হয়, ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে ৬০০৲ টাকা বেতনে; পদের উপাধি পশুশক্তির সদ্ব্যবহার বিষয়ে সহকারী পরামর্শদাতা (Assistant Cattle Utilization Adviser); ১৯৪৮ সালের মার্চ্চ মাসে ঐ বিভাগেই ডেপুটি পরামর্শদাতারূপে তাঁহার বেতন দেখা যায়—১,১৫০৲ টাকা। এর উপর মাগ্‌গী ভাতা, ভ্রমণের ব্যয়, বিশেষ ভাতা প্রভৃতি নানা ভাতা আছে। সেইজন্যই দেখিতে পাই পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীবৃন্দেরও বেতনের পরিমাণ ৬ কোটি ৭৯ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকার কিঞ্চিদধিক; নানাবিধ ভাতার পরিমাণ ৩ কোটি ৯৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার কিঞ্চিদধিক। এইরূপ না হইলে নাকি পদমর্য্যাদা রক্ষা পায় না। অথ ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা। —প্রবাসী

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

চার

"সন্তান যার তিব্বত চীন, তাহারে গড়িল উপনিবেশ,"—প্রাচীন হিন্দু ভারতের গৌরবোজ্জ্বল যুগে ভারতীয়ের দ্বারা উপনিবেশ গঠনের ইতিহাস ও কাহিনী শুনিতে আমরা অভ্যস্ত। বর্ত্তমান যুগে বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত আন্দামানে উপনিবেশ গঠনে আমাদের সেরূপ আগ্রহ কই ?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আন্দামানের উপনিবেশ গঠন কার্য্য সিপাহী-বিদ্রোহের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত সিপাহীদের দ্বারা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হয়। অতঃপর ভারতবর্ষ (তদানীন্তন ভারতবর্ষ অর্থে, কাবুল সীমান্ত হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত, সিংহল ও এডেন এই বিরাট অংশ) হইতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীরা পোর্টব্লেয়ারের সেলুলার জেলে প্রেরিত হইত। এই জেলের নিয়ম অনুযায়ী দণ্ডিত ব্যক্তিরা প্রথম কিছুদিন জেলের কয়েদীর মত জেলেই বাস করিত, পরে তাহাদের গতিবিধি ও অবস্থিতি সন্তোষজনক হইলে তাহাদের ধীরে ধীরে জেলের বাহিরে ছাড়া হইত এবং স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিবার সুবিধাও দেওয়া হইত। পূর্ব্ববর্ণিত শের আলি এই ভাবেই নাপিতের কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

উপনিবেশ গঠনের উদ্দেশ্যেই ভারত সরকার এইরূপে কয়েদীদের বাহিরে বাস করিবার অনুমতি দিয়া তাহাদের স্বাধীন জীবিকার্জ্জনে সাহায্য করিতেন, এবং যে যে-কাজ করিতে চাহিত, তাহাকে যথাসাধ্য সেইরূপ জীবিকাতেই সাহায্য করা হইত। পোর্টব্লেয়ার হইতে ১৫।২০ মাইল দূর দূর স্থানে এই সমস্ত কয়েদীদের দ্বারা গঠিত অনেকগুলি গ্রাম আছে। মালাবার উপকূলের যে সমস্ত মোপ্‌লাগণ দাঙ্গা করিয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহাদের একটি বড় দল এখনও পর্য্যন্ত বিব্‌লীগঞ্জ নামক স্থানে গ্রাম গঠন করিয়া বসবাস করিতেছে। এইরূপ একজন মোপলার সহিত আলাপ করিয়া ইহাদের সাংসারিক ব্যবস্থার বিষয় কিঞ্চিৎ অবগত হইয়াছিলাম।

এই সমস্ত কয়েদীদের সমাজ ব্যবস্থা অভিনব। যে জীপ গাড়ীখানিতে চড়িয়া আমরা আন্দামানের সমস্ত গ্রাম গুলি ঘুরিয়াছিলাম, সেই গাড়ীর ড্রাইভার মোপলা দাঙ্গায় কয়েদীরূপে ১৭ বৎসর বয়সে এখানে আসিয়াছিল। এখানে আসিয়া কিছুদিন জেলে থাকিবার পর যখন স্বাধীনভাবে বাহিরে বিচরণ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিল, তখন কিছুদিন উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া চাষের কাজ করিবার চেষ্টা করিয়া শেষে হতাশ হইয়া উহা ছাড়িয়া দেয়। এই সময় সে এক অফিসারের সহিত পরিচিত হয়। অফিসার তাহাকে নিজের মোটর গাড়ী ধুইবার কাজে

নিযুক্ত করে এবং পরে তাহাকে গাড়ী চালাইতে শিক্ষা দেয়। তদবধি সে ড্রাইভার। ড্রাইভার হওয়ার পরে এই মোপ্‌লাটি সেলুলার জেলের এক কয়েদী নারীর সহিত পরিচিত হয়। ঐ মেয়েটি রাজপুত হিন্দু। সে তাহার স্বামীকে বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। পরে রাজানুগ্রহে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড লইয়া আন্দামানে প্রেরিত হইয়াছিল। উভয়ের মধ্যে কিরূপে প্রণয় সঞ্চার হইয়াছিল জানি না, কিন্তু একদিন উভয়ে একত্র হইয়া 'জেলার' সাহেবের নিকট গিয়া বিবাহের অনুমতি প্রার্থনা করে। কয়েদীদের বিবাহ করিতে হইলে এইরূপে অনুমতি লইতে হইত। 'জেলার' সাহেব ইহাদের বিবাহ দেওয়াইলেন এবং পরে ইহাদের তিনটি মেয়ে ও দুইটি ছেলে হয়। মেয়ে তিনটি হিন্দু ও ছেলে দুইটি মুসলমান বলিয়া পরিগণিত, কারণ এদেশে হিন্দু মুসলমানে বিবাহ হইলে পিতার ধর্ম্ম পুত্র ও মাতার ধর্ম্ম কন্যা পাইয়া থাকে। এই ড্রাইভার তাহার বড় মেয়ের বিবাহ দিয়াছে ছোট নাগপুরের এক সাঁওতাল হিন্দুর সহিত। এই জামাতাটি ছোট নাগপুরের এক দুর্দ্দান্ত দস্যুসর্দ্দারের পুত্র। নরহত্যা ও ডাকাতির অভিযোগে সে চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাহার পিতার সহিত একত্রে অভিযুক্ত হয়। পিতার ফাঁসী হইয়া যায় এবং পুত্র যাবজ্জীবন কারাদণ্ড লইয়া এইখানে থাকে। এমন উপযুক্ত সাঁওতাল পাত্রটিকে দেখিয়া পাত্রীর মোপ্‌লা পিতা ও রাজপুত মাতা রাজযোটক বিবাহের আশায় ইহার হস্তেই কন্যা সম্প্রদান করে। ইহাদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহারা সকলেই উর্দ্দু ভাষাভাষী এবং এই জামাতাটি কিছু ইংরাজী শিখিয়া এখানকার Local Born Association-এর একজন বিশিষ্ট সভ্যরূপে পরিগণিত। সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ড্রাইভার এই সমস্ত পারিবারিক কাহিনী অকপটে অবলীলাক্রমে সকলের নিকট বর্ণনা করিতে একটুও দ্বিধাবোধ করে না। এমনই ইহাদের সমাজ।

এইরূপ আর একজন বাঙ্গালী বৃদ্ধার কাহিনী শুনিলাম। ইহার নাম ভগবতী। বর্ত্তমানে বয়স আন্দাজ ৫৫।৬০। ইহার পিত্রালয় ছিল আসানসোলে। পিতার কয়লার খনি এবং অন্যান্য ব্যবসা ছিল। খুব অবস্থাপন্ন ঘরের সেকালের আমোলের কিঞ্চিৎ শিক্ষিতা এই ভগবতী দেবীর বিবাহ হয় সেকালের আমোলের এক নব্যশিক্ষিত যুবকের সহিত। যুবক ছিল পুলিসের সাব-ইন্‌স্পেক্টার; অত্যন্ত মদ্যপায়ী ও চরিত্রহীন। ভগবতী দিনকয়েকের মধ্যেই ইহাকে রীতিমত ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিল এবং একদিন শেষ রাত্রে স্বামী বাটী ফিরিলে ভগবতী দেবী স্বামীদেবতাকে কাটারী দিয়া অভ্যর্থনা করার ফলে স্বামীর মৃত্যু হয়। ইহাতে ভগবতীর প্রাণদণ্ড হয়, কিন্তু পরে রাজানুগ্রহে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া এইখানে আসে। এখানে আসার পর কিছুদিন যাবৎ জেলে বাস করিয়া যখন অবাধভাবে দ্বীপে বিচরণ করিবার অনুমতি পায়, তখন সে পোর্টব্লেয়ার হইতে কিছু দূরে এক গ্রামে কিছু জমী লয়। শিক্ষিতা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকন্যা ভগবতী দেবী তখন বেশ মজবুত হইয়া উঠিয়াছিল। নিজেই বাঁশ কাঠ দিয়া একখানি চালাঘর গঠন করিয়া মাটী দিয়া ঘরের মেঝে ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে বাগান করিয়া নিজে রান্নাবান্না করিয়া স্বাধীনভাবে বাস করিতে থাকে। এই সময় হইতে এক বিহারী কাহার জাতীয় কয়েদী ভগবতীকে নানাভাবে সেবা করিতে আরম্ভ করে, উদ্দেশ্য তাহাকে বিবাহ করিবে। কিন্তু উচ্চবংশের ভগবতী তাহাকে কিছুতেই গ্রহণ করে নাই। পরে চৌদ্দবৎসর পার হইয়া যাইবার পর ভগবতী তাহার স্বহস্তনির্ম্মিত কুটীরটি সেই বিহারীকে দান করিয়া দেশে ফিরিয়া আসে। ইত্যবসরে ভগবতীর পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল, বিধবা মাতা পুত্র ও পুত্র-বধূদের লইয়া সংসার করিতেছিলেন। কয়েক মাস দেশে থাকিয়া ভগবতী বুঝিতে পারিল যে, সংসারে বা সমাজে তাহার স্থান নাই। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে একাকী কলিকাতায় আসিয়া পুলিসের সাহায্য লইয়া পুনরায় আন্দামানে ফিরিয়া আসে এবং সেই বিহারীকে প্রদত্ত কুটীরখানি ফিরাইয়া লইয়া ও তাহারই আগ্রহাতিশয্যে তাহাকে বিবাহ করিয়া সেইখানেই বাস করিতে থাকে। ভগবতী দেবীর সন্তানসন্ততি হইয়াছে। জ্যেষ্ঠপুত্র আন্দামানের বনবিভাগে চাকুরী করে। এক কয়েদী পরিবারের কন্যার সহিত ছেলের বিবাহ হইয়াছে, পৌত্রের বয়স প্রায় ৪।৫ বৎসর হইবে। ভগবতী দেবীর এখনও এই আত্ম-গৌরব আছে যে, ঐ 'কাহার'টা বাবার চাপরাসী হইবার উপযুক্তও নহে এবং সে তাহাকে বিবাহ করিলেও কোন-

দিনই তাহাকে ঘরের লোক বলিয়া গ্রহণ করে নাই এবং আলাদা একটি চালাঘরেই সে বরাবর বাস করে। আমরা মোটরে করিয়া যাইতে যাইতে ভগবতী দেবীকে দেখিলাম। বৃদ্ধা তাহার ঘরের সামনের বারাণ্ডায় বসিয়া শাক বাছিতেছিল; পৌত্র নিকটেই খেলা করিতেছিল। দেখিলে বাঙ্গালী বলিয়া কিছুতেই অনুমান করা যায় না; পরণে আছে একটি সায়া ও একটি ব্লাউজ, কাপড় নাই। আমরা কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীজীবানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গাড়ীতে করিয়া যাইতেছিলাম; জীবানন্দবাবু ভগবতী দেবীকে দেখাইয়া উপরোক্ত কাহিনীটি বিবৃত করিলেন ও বলিলেন যে ফিরিবার সময় একবার ভগবতী দেবীর কুটীরে নামিয়া আমাদের সহিত তাহার আলাপ করাইয়া দিবেন। কিন্তু এই আলাপ আর হয় নাই, কারণ ফিরিবার সময় আমরা অন্যপথ দিয়া আসিয়াছিলাম। মদ্যপায়ী লম্পট স্বামীর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া যে শিক্ষিতা ধনীকন্যা নির্ম্মম প্রতিবাদ করিবার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিল আজ হইতে ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে, আমাদের অচলায়তন সমাজ সেই নারীকে সংসারক্ষেত্রে ফিরাইয়া লইবার সৌভাগ্য আজও পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে নাই। বাঙ্গালীর মেয়ে বিহারীকে বিবাহ করিয়া উর্দ্দু ভাষাভাষী হইয়া স্বদেশ আসানসোল হইতে নয়শত মাইল দূর দ্বীপে তাহার সমগ্র জীবন সভ্যসমাজের অজ্ঞাতসারে এইরূপ হীনভাবেই অতিবাহিত করিতেছে।

আন্দামানের কয়েদী জীবনের উপরোক্ত দুইটি ইতিহাস দেওয়ার পর আর একজনের ইতিহাস দেওয়া প্রয়োজন বোধ করি। তিনি আকুজী নামে পরিচিত এবং ইহার কাহিনী আন্দামানের কয়েকজনের নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আকুজী বোম্বাইয়ের কাচ্ছি মুসলমান। বাল্যজীবনে কি এক অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া আকুজী আন্দামানে আসেন এবং কিছুদিন পরে যখন স্বাধীনভাবে বসবাস করিবার অনুমতি পান; তখন তিনি সমুদ্রে মাছ ধরিবার কাজ আরম্ভ করেন। ছোট ডিঙ্গি লইয়া কিছুদিন মাছ ধরিবার পর তিনি ধীরে ধীরে আরও কয়েকজন বন্দীকে সঙ্গে লইয়া প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরিতে আরম্ভ করেন এবং যে অতিরিক্ত মাছ পোর্টব্লেয়ারে বিক্রীত না হইত সেগুলিকে শুঁট্‌কী করিয়া জাহাজে চালান দিবার ব্যবস্থা করেন। তদানীন্তন ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ তাহাকে শুঁট্‌কী মাছের চালান দিবার কার্য্যে সাহায্য করেন এবং ঐ ব্যবসা ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করার পর তাঁহার নৌকা এবং শ্রমিক সংখ্যা বৰ্দ্ধিত হইয়া বেশ বড় ব্যবসা আরম্ভ হয়। এই সময় তিনি 'জেলার' সাহেবের হুকুম লইয়া স্বদেশ হইতে নিজের পূর্ব্ব বিবাহিত স্ত্রীকে আনাইয়া লন। আন্দামানের কয়েদীদের এ সুবিধাও দেওয়া হইত। অতঃপর বন্দী-জীবনেই তাঁহার সংসারযাত্রা ও বাণিজ্য এই ভাবেই চলিতে থাকে এবং চৌদ্দ বৎসর পরে যখন তাঁহার মুক্তির সময় আসে, তখন আকুজীর কারবার রীতিমত জাঁকিয়া বসিয়াছিল এবং তখন তিনি প্রায় লক্ষপতি। আকুজী মুক্তির পরোয়ানা হাতে পাইয়া বোধ হয় প্রাণ ভরিয়া হাসিয়াছিলেন এবং ভালো ভাবে অফিস করিয়া শুঁট্‌কী মাছ, নারিকেল এবং অন্যান্য জিনিষের চালানী ব্যবসাতে আরও বিশেষ ভাবে মনোযোগ দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে R. Akoojee & Sons নামক কারবার আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপে সুবিখ্যাত। এই কারবারের এখন নিজস্ব ১২৭খানি সমুদ্রগামী নৌকা আছে। কতকগুলি পাল তোলা নৌকা, অপরগুলি ডিজেল ইঞ্জিন চালিত, এগুলিকে জাহাজ বলিলেও চলে। নিকোবর, নন্‌কৌড়ী এবং গ্রেট নিকোবর দ্বীপের সমস্ত নারিকেল-শাঁস ও ছোবড়ার একচেটিয়া ব্যবসা ইঁহারই। ইঁহার নৌকাগুলি মাদ্রাজ এবং সিঙ্গাপুর, মালয় ও সুমাত্রায় নিয়মিত ভাবে যাতায়াত করে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন স্থানে যাইবার জন্য ভারত সরকার আকুজীর সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন। এই কারবারে বর্ত্তমানে সর্ব্বসমেত হাজার কি দেড় হাজার কর্ম্মচারী কাজ করে। একদা কয়েদীরূপে যে অসহায় যুবক আন্দামানের নিকটবর্ত্তী সমুদ্র অঞ্চলে মাছ ধরিতে ধরিতে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেন, এখন সেই লোকের স্বহস্ত নির্ম্মিত কারবারের জেনারেল ম্যানেজার মাসিক বারশত টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। আন্দামানের বিভিন্ন নরনারীকে লক্ষ্য করিয়া পুরাতন সংস্কৃত প্রবচনকে আর একবার স্মরণ করা যায়, "পুরুষস্য ভাগ্যং স্ত্রীয়াণাং চরিত্রং দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।" (ক্রমশঃ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন বিপ্লবান্দোলনের এইখানেই পরিসমাপ্তি। ইহার পর হইতে ভারতে যাহা কিছু ঘটিয়াছে—তাহাই গণ-অভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে—ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মধ্যে তাহা আর সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে নাই। এই সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা লণ্ডনে সার মাইকেল ওডায়ারের হত্যাকাণ্ড। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সময় যিনি পাঞ্জাবের ছোটলাটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, দীর্ঘদিন পরেও ভারতবাসীরা তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারে নাই। তাই তাঁহার স্বদেশে গিয়াও তাঁহার প্রাণনাশ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন একজন ভারতবাসী—তাঁহার নাম উধম সিং আজাদ। ইহার জন্য বিচারে উধম সিং-এর প্রাণদণ্ড হয়।

যাহা হউক, এদিকে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ কারাগারে থাকাকালেই ১৯৩২ সালের শেষদিকে বিলাতে আবার একটি গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন হইল—উহাই তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক। উহাতেও বিশেষ কিছুই কাজ হইল না। এই বৎসরই ১৭ই আগষ্ট ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড সাহেব তাঁহার সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ঘোষণা করিলেন। এই বাঁটোয়ারায় আইনসভাসমূহে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্যসংখ্যা নিরূপিত করিয়া দেওয়া হইল। মুসলমানদের জন্য যে পৃথক্ নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহা তো আরও সম্প্রসারিত করা হইলই, উপরন্তু হরিজনদের জন্যও স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা ও আসনের ব্যবস্থা করিয়া বর্ণহিন্দুগণ হইতে তাঁহাদিগকে পৃথক্ করিয়া ফেলার চেষ্টা হইল। সুবৃহৎ হিন্দু-সমাজকে এইভাবে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া ফেলাই ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল। গান্ধীজী এই বাঁটোয়ারায় অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন এবং ইহার প্রতিবাদে ২০শে সেপ্টেম্বর হইতে আমৃত্যু অনশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট দিনে যারবেদা জেলে অনশন আরম্ভ হইল। গান্ধীজীর অনশনে সমগ্র ভারত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

দেশের গণ্যমান্য সকল মনীষীই তৎপর হইয়া উঠিলেন—সকলেরই একমাত্র চিন্তা হইল কি করিয়া সমস্যাটির সমাধান করিয়া গান্ধীজীর অনশনের অবসান ঘটানো যায়। শাসকবর্গ জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, বর্ণহিন্দু ও হরিজন—সংশ্লিষ্ট এই উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সম্মতি ব্যতিরেকে ঘোষিত বাঁটোয়ারার কোনও পরিবর্ত্তন সাধন করা হইবে না। উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে যাহাতে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া সম্ভব হইতে পারে, তজ্জন্য খুবই চেষ্টা চলিতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলন হইল পুণায় এবং একটি চুক্তিও সম্ভব হইল। উহাতে স্থির হইল যে, আইন-সভায় হরিজনদিগের পৃথক্ আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবে বটে, কিন্তু স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-প্রথার পরিবর্ত্তে যুক্ত-নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত থাকিবে। মহাত্মাজীর অনশনের পঞ্চম দিবসে সম্পাদিত এই চুক্তিটি "পুণা চুক্তি" নামে খ্যাত। মহাত্মা গান্ধী ইহার পর তাঁহার অনশন ত্যাগ করিলেন।

প্রদেশগুলিতে দ্বৈত শাসনের অবসান, প্রাদেশিক শাসন-স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা এবং ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের ভিত্তিতে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে ১৯৩৫ সালে একটি নূতন ভারত-শাসন আইন পাশ হইল। এই আইনটিতে কতকগুলি বিষয়ে কিছু কিছু ক্ষমতা পূর্ব্ববর্ত্তী আইনগুলি অপেক্ষা আইন-পরিষদের কাছে দায়ী মন্ত্রীমণ্ডলীর হস্তে ছাড়িয়া দেওয়ার ভড়ং দেখান হইল বটে, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা বড়লাট ছোটলাটগণের হস্তেই রহিয়া গেল। স্থির হইল যে ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই শাসন তন্ত্র বলবৎ হইবে।

নূতন শাসন তন্ত্র চালু করিবার জন্য যে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইল, তাহাতে কংগ্রেস দল পাঁচটি প্রদেশের আইন-সভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জ্জন করিলেন এবং আরও চারিটি প্রদেশের আইন-পরিষদে সর্ব্বাপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ১লা এপ্রিল যখন নূতন শাসন তন্ত্র চালু হইল, তখনও পর্য্যন্ত কংগ্রেসপক্ষ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে মুশলিম লীগ দল প্রদেশে প্রদেশে অস্থায়ী মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনে গভর্ণরদিগকে সাহায্য করিয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ শাসন-তন্ত্রের প্রাদেশিক অংশটুকুই চালু করা হইল এবং গভর্ণমেণ্ট আশা করিতে লাগিলেন যে উহার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাটুকুও ভবিষ্যতে সুবিধামত চালু করা সম্ভব হইবে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এই নূতন শাসন-তন্ত্রকে "দাসত্বের নূতন সনদ" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। অবিশ্বাসভরে কংগ্রেসদল কয়েক মাস যাবৎ দূরে দূরেই রহিলেন—সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াও মন্ত্রিত্ব গ্রহণে রাজি হইলেন না। অবশেষে ঐ বৎসরের ২২শে জুন তারিখে তৎকালীন বড়লাট লর্ড লিনলিথগো এক বিবৃতি মারফত এই আশ্বাস দান করিলেন যে প্রদেশের দৈনন্দিন শাসনকার্য্য পরিচালনায় প্রদেশের ছোটলাটগণ মন্ত্রিগণের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই আশ্বাসের ফলে জুলাই মাসে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিহার, সংযুক্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—এই সাতটি প্রদেশে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করিলেন। কিছুদিন পরে সিন্ধু ও আসামেও অন্যান্য দলের সহিত কংগ্রেস দল যৌথ মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করিলেন।

ইউরোপের আকাশে কিছুদিন হইতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মেঘ ঘনাইয়া উঠিতেছিল। পাছে যুদ্ধ বাধিলে ভারতবর্ষকেও সেই যুদ্ধে

জড়িত করা হয় এবং প্রদেশসমূহে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী কার্য্যরত থাকার ব্যাপারকে সেই যুদ্ধে কংগ্রেস দলের পরোক্ষ সমর্থন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, সেই আশঙ্কায় এই সময় নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি এইরূপ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন যে, ভারতীয় জনগণের পূর্ণ অনুমোদন ব্যতীত ভারতকে কোনও যুদ্ধে জড়িত করার অথবা তদুপলক্ষে ভারতীয় সম্পদ নিয়োগ করার যে কোন প্রচেষ্টার বিরোধিতা করা হইবে। কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীগুলিকেও বৃটিশ গভর্ণমেন্টের এবম্বিধ প্রস্তুতিতে কোনও সাহায্য না করিবার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল। ইহার পর ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকেই সত্যই যুদ্ধ বাধিল। ১৫ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এইরূপ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন যে, ভারত যুদ্ধে যোগদান করিবে কিনা, তাহা একমাত্র ভারতের জনগণই স্থির করিবে এবং ভারতে বা অন্য কোথাও সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠাকে সুদৃঢ় করিবার জন্য পরিচালিত কোনও যুদ্ধে কংগ্রেস কোনও প্রকার সহযোগিতা দান করিবেন না। তাঁহারা বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে বলিলেন—"to declare in unequivocal terms what their war aims are in regard to Democracy and Imperialism and the new order that is envisaged." ইহার অল্পদিন পরেই নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হইল, তাহাতে ১০ই অক্টোবর তারিখে বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে কেবলমাত্র তাঁহাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যই ব্যাখ্যা করিতে বলা হইল না; পরন্তু আরও দাবী করা হইল যে "India must be declared an independent nation, and present application must be given to this status to the largest possible extent."

এই দাবীর উত্তরে ১৯৩৯ সালের ১৭ই অক্টোবর বৃটিশ গভর্ণমেন্টের তরফে বড়লাট লর্ড লিনলিথগো এক বিবৃতি দান করিলেন। তাহাতে তিনি ঘোষণা করিলেন,—"At the end of the war they will be very willing to enter into consultation with representatives of the several communities, parties and interests in India, and with the Indian Princes, with a view to securing their aid and co operation in the framing of such modifications (of the Act of 1935) as may seem desirable." কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর এইরূপ আশ্বাসকে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিতে ভারতীয় জনসাধারণ আর প্রস্তুত ছিল না; সুতরাং ২২শে অক্টোবর তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে তাঁহাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে কোনও প্রকার সাহায্যদানে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন এবং যে সকল প্রদেশে কংগ্রেস দলীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল, সে সকল প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলীকে পদত্যাগ করিতে নির্দ্দেশ দিলেন।

কিন্তু বিপদের সময় বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে ব্যতিব্যস্ত করাও তখন কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল না। তাই মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলেও প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কিছুই তাঁহারা তখন করিলেন না। অবিলম্বে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা এবং কেন্দ্রে একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠনের ভিত্তিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৪০ সালের ৭ই জুলাই বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে সহযোগিতা দানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। বড়লাট কিন্তু তাঁহাদের ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। তৎপরিবর্ত্তে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থায় বৃটিশ গভর্ণমেন্ট কতটুকু কি করিতে পারেন, এক বিবৃতি মারফত তাহা ব্যক্ত করিয়া ৮ই আগষ্ট বড়লাট এক পাল্টা প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কংগ্রেসের পক্ষে তাহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না অতঃপর কংগ্রেস সেপ্টেম্বর মাসে বাক্ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সীমাবদ্ধভাবে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর অক্ষশক্তির অন্যতম জাপানও ইংরাজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল এবং ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে জাপানীরা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় অভূতপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিলেন। ইংরাজগণ সিঙ্গাপুর, মালয় ও ব্রহ্মদেশ হইতে অতি দ্রুত বিতাড়িত হইলেন এবং যুদ্ধ ভারতের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিল। জাপানীদিগের আক্রমণের ফলে ভারতের নিরাপত্তা আর অটুট রহিল না। বাহির হইতে শত্রুর আক্রমণের মুখে তখন ভারতের অচল অবস্থা দূরীকরণের আশু প্রয়োজন অনুভূত হইল। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইবার জন্য ইংলণ্ডের সমরকালীন মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ বৃটিশ গভর্ণমেন্টের কতকগুলি প্রস্তাব লইয়া ১৯৪২ সালের ২০শে মার্চ্চ দিল্লী আগমন করিলেন; কিন্তু যে সকল প্রস্তাব তিনি নেতৃবৃন্দের সমীপে পেশ করিলেন—শেষ পর্য্যন্ত তাহা মোটেই গ্রহণযোগ্য হইল না। প্রস্তাবে যে সকল প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল—তাহা সবই ভবিষ্যতের জন্য, সঙ্গে সঙ্গেই কিছু করিবার ব্যবস্থা ছিল না। উক্ত প্রস্তাবের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে পাকিস্তানের দাবী স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। দেশরক্ষার দায়িত্বও পুরাপুরি বৃটিশ গভর্ণমেন্টের হস্তেই রক্ষা করিবার ব্যবস্থা ছিল—কংগ্রেস যাহা কোনও মতেই মানিয়া লইতে পারেন না। মহাত্মাজী ক্রীপস্ সাহেবের প্রস্তাবকে "A post dated cheque on a crashing bank" নামে অভিহিত করিলেন। মুসলিম লীগও ক্রীপস্ প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন না। ফলে প্রধান দুইটি দলের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া ব্যর্থমনোরথ সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস ১২ই এপ্রিল তারিখে ভারত ত্যাগ করিলেন।

আলোচনা ফাঁসিয়া যাওয়ার পর প্রকৃত অবস্থা পরিষ্কার হইল। চরম বিপদের মুখে দাঁড়াইয়াও বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতের ব্যাপারে কতটুকু কি করিতে পারেন—তাহা একদিকে যেমন জানিতে পারা গেল, তেমনি আর এক দিকে ইহা বুঝা গেল যে ইংরাজগণ ভারতে উপস্থিত থাকিতে কোনও সমস্যারই সমাধান কোনও কালেই হইবে না। ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক কোনও বুঝা-পড়ার যদি প্রয়োজনই হয়, তবে তাহা একমাত্র বৃটিশ-বর্জ্জিত ভারতেই

হইতে পারে, যতক্ষণ তাঁহাদের সৈন্য-সামন্ত ভারতের মাটিতে অবস্থান করিবে, ততক্ষণ কোনও মিটমাটই সম্ভব হইবে না। ইংরাজগণের আদেশ-নির্দ্দেশেও ভারতের শাসন-তন্ত্র রচিত হইতে পারে না—একমাত্র মুক্ত ভারতে স্বাধীন পরিবেশের মধ্যেই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে ভারতীয়গণের দ্বারা ভারতের শাসনতন্ত্র রচিত হইতে পারে; সুতরাং সর্ব্বাগ্রে বৃটিশ-শক্তির অপসরণ আবশ্যক, যেমন করিয়া হউক তাঁহাদিগকে ভারতের মাটি ত্যাগ করাইতে হইবে। আমাদের সমস্যা আমরা নিজেরাই বুঝিব—তৃতীয় পক্ষ হিসাবে সেখানে ইংরাজগণের মাথা গলাইবার প্রয়োজন নাই। মরিতে হয়—আমরা মরিব, বাঁচিতে যদি পারি—আমরাই বাঁচিব। ইংরাজগণ ভারত ত্যাগ করিয়া যান।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সুমতির আশায় দীর্ঘকাল নিষ্ক্রিয় থাকিয়া নীরব দর্শক হিসাবে অবস্থান করা কংগ্রেসের পক্ষে আর সম্ভব হইল না। দেশের মধ্যে জনসাধারণের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছিল। ১৯৪২ সালের ১৪ই জুলাই তারিখের এক প্রস্তাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি জানাইয়া দিলেন যে, বৃটিশকে ভারত ত্যাগ করিতে হইবে এবং এই দাবী মানিয়া লওয়া না হইলে কংগ্রেস মহাত্মাজীর নেতৃত্বে অহিংস উপায়ে সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিয়া এক ব্যাপক সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবেন। ইহার পর আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে বোম্বাই-এ নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হইল, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ৫ই আগষ্ট "ভারত ছাড়" পরিকল্পনাকে একটি নির্দ্দিষ্ট রূপ দিয়া ওয়ার্কিং কমিটি উহা একটি প্রস্তাবাকারে গ্রহণ করিলেন এবং নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত আলোচনার পর ৮ই আগষ্ট উহা চূড়ান্তরূপে গৃহীত হইল। পরিকল্পনাটি ছিল মহাত্মা গান্ধীর এবং উহার উদ্দেশ্য ও আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি এক সুদীর্ঘ ভাষণ দান করিলেন। আন্দোলনটি পরিচালিত করিবার সকল দায়িত্ব মহাত্মাজীর উপরই অর্পিত হইল। "ভারত ছাড়" প্রস্তাবে বলা হইল—

"* * the immediate ending of British rule in India is an urgent necessity, both for the sake of India and for the success of the cause of the United Nations. The continuation of that rule is degrading and enfeebling India and making her progressively less capable of defending herself and of contributing to the cause of world freedom."

প্রস্তাবটি পাশ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মহাত্মাজী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দসহ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে গ্রেপ্তার করা হইল—নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটিকে ঘোষণা করা হইল বে-আইনী। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলিও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও উহার শাখাসমূহকে দুই-একদিনের মধ্যেই বে-আইনী ঘোষণা করিলেন। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুত পটবর্দ্ধন, অরুণা আসফ আলি, রামমনোহর লোহিয়া প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দলের নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার এড়াইয়া কোনও মতে আত্মগোপন করিতে সক্ষম হইলেন। যাহাতে "ভারত ছাড়" আন্দোলনটি পরিচালিত করা সম্ভব হয়, সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা এইভাবে আত্মগোপন করিলেন।

নেতাদের অধিকাংশই তো গ্রেপ্তার হইলেন—বাহিরে পড়িয়া রহিল বিশাল ভারতের বিরাট জনসমষ্টি। যে ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ করার আশায় সকলে চঞ্চল হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাতে সহসা কোথা দিয়া যেন কি ঘটিয়া গেল। সংবাদপত্রে নেতৃবর্গের গ্রেপ্তারের বিবরণ পাঠ করিয়া জনসাধারণ যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল; কিন্তু সে বিমূঢ় ভাব যখন কাটিল, তখন একটা নিপীড়িত জাতির সকল রোষ গিয়া পড়িল বৈদেশিক শাসন-শক্তির উপর। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে—অদূরদর্শী বৈদেশিক শাসকবর্গের ক্ষমতা-প্রিয়তার নিকট নতি স্বীকারেরও একটা মাত্রা আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অশুভ প্রভাব ইতিমধ্যেই ভারতীয়দের জীবনকে বিষাক্ত করিতে সুরু করিয়াছিল—তাহাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে ঘটাইতেছিল বিপর্য্যয়। অথচ যুদ্ধে তো তাহারা ইচ্ছা করিয়া যোগদান করে নাই—জোর করিয়া তাহাদের ঘাড়ে যুদ্ধ চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রিয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করার ধৃষ্টতাকে তাহারা মার্জ্জনা করিতে পারিল না। ক্ষুব্ধ জনরোষ চতুর্দ্দিকে ফাটিয়া পড়িল। গ্রেপ্তারের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিল ভারতের জনসাধারণ।

নেতা নাই—নাই নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা। জনসাধারণ কেবলমাত্র "ভারত ছাড়" প্রস্তাবের কথাই শুনিয়াছে—কিন্তু তাহাদিগকে উহা কার্য্যকরী করিতে কি কি যে করিতে হইবে, তাহা তখনও পর্য্যন্ত তাহারা জানিতে পারে নাই; কিন্তু তাহাতে কিছুই আটকাইল না। নেতৃহীন এক স্বতঃস্ফূর্ত্ত আন্দোলনে অচিরাৎ সমগ্র ভারত সজীব হইয়া উঠিল। জনসাধারণ আপনাদিগকে পরিচালিত করার ভার লইল আপনারাই। গান্ধীজী এইরূপ আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সম্ভবতঃ "ভারত ছাড়" আন্দোলনই ভারতের শেষ স্বাধীনতার আন্দোলন হইবে। পরিকল্পনাটিকে সার্থক করিতে তাঁহার মূল মন্ত্র ছিল,—"করিব—না হয় মরিব।" উহাই সম্বল করিয়া জনসাধারণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। এইরূপ নেতৃহীন স্বতঃস্ফূর্ত্ত আন্দোলন ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। এই গণ-অভ্যুত্থান রোধ করিতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও তাঁহাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিলেন। চতুর্দ্দিকে নির্ম্মম পীড়ন সুরু হইয়া গেল। যুদ্ধ উপলক্ষে তখন হাজার হাজার ইংরাজ সৈন্য ভারতের নানা স্থানে আসিয়া অবস্থান করিতেছিল—বিদ্রোহ-দমনে তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করা হইল। সরকারী অনুমোদন ব্যতীত আন্দোলনের কোনও সংবাদ প্রকাশ করা সংবাদপত্রের পক্ষে নিষিদ্ধ হইল। অশান্তির আভাষ পাইবামাত্রই দরাজভাবে গুলি চালাইবার জন্য প্রথম হইতেই নির্দ্দেশ দেওয়া রহিল।

বাংলা গভর্ণমেণ্ট ১০ই আগষ্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং উহার শাখাসমূহকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

চতুর্দ্দিকে যেন একটা থম্‌থমে ভাব বিরাজ করিতে লাগিল। কলিকাতার বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার ছাত্র ১২ই আগষ্ট ক্লাস ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং নানা ধ্বনি সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া এক সভায় গিয়া মিলিত হইলেন। সভায় তাঁহারা গান্ধীজীর "করিব—অথবা মরিব" নীতিতে দৃঢ় আস্থা জ্ঞাপন করিলেন। স্থির হইল যে নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য পরদিন ১৩ই তারিখটি যথাযোগ্যরূপে পালিত হইবে। তদনুযায়ী মূলতঃ স্কুল-কলেজের ছাত্র লইয়া গঠিত অসংখ্য শোভাযাত্রা ১৩ই তারিখে সকাল হইতেই পথে পথে বাহির হইল। বৃটিশের ভারত ত্যাগ এবং নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করিয়া তাঁহারা ধ্বনি দিতে লাগিলেন। সকল শোভাযাত্রা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। উক্ত পার্কটি শীঘ্রই এক বিরাট জনসমুদ্রে পরিণত হইল। পুলিস এতক্ষণ কিছু বলে নাই—কিন্তু সভা আরম্ভ হইবার উপক্রম হইতেই নির্ব্বিচারে উপস্থিত ব্যক্তিগণের উপর লাঠি চালাইতে লাগিল। ইহার ফলে অনেকেই আহত হইলেন। যাঁহারা সভাস্থল ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছিলেন, তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া তিনজন ছাত্র কিছু বলিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলে পুলিশ তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিল। কলিকাতায় সংঘর্ষের ইহাই হইল সূত্রপাত।

ইহার পর যুবকগণ কলিকাতার বিভিন্ন রাজপথে ট্রাম ও বাস-যাত্রীদিগকে গাড়ী হইতে নামিয়া যাইতে এবং চালকগণকে ট্রাম-বাস না চালাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীমাণী বাজারের সম্মুখে অবস্থা চরমে উঠিল। সেখানে দুই রাউণ্ড গুলিবর্ষণের ফলে বৈদ্যনাথ সেন নিহত হইলেন। চতুর্দ্দিকে পূর্ণ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দ্রুত ছড়াইয়া পড়িল।

১৪ই তারিখে ট্রামের দড়ি কাটিয়া দিয়া স্থানে স্থানে ট্রাম চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ডাষ্টবিনগুলি রাস্তার মাঝখানে টানিয়া আনিয়া ক্ষিপ্ত জনতা রাজপথসমূহে গাড়ী চলাচল বন্ধ করিয়া দিল। কত যে চিঠি ফেলার বাক্স, ফায়ার এলার্ম এবং ইলেকট্রিক ফিউস-বাক্স ভাঙ্গিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়া হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। কয়েক স্থানে পোষ্ট অফিসের উপরও আক্রমণ চালান হইল। উত্তেজিত জনগণ কোথাও কোথাও দাহ করিল চার্চ্চিল এবং এমেরি সাহেবের কুশপুত্তলিকা। পুলিশ ও মিলিটারিও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল না। লাঠি ও গুলি সমানেই চলিতে লাগিল। স্বাভাবিক অবস্থা কোথাও বজায় রহিল না। দোকান-পাট হামেশাই বন্ধ থাকিতে লাগিল। জনসাধারণ সুযোগ পাইলেই পুলিশ ও মিলিটারির গাড়ীতে আগুন লাগাইতে লাগিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইল। ইউরোপীয় পোষাকে সজ্জিত ভারতীয়রাও অনেক সময় রাস্তায় রেহাই পাইত না। জনসাধারণ তাহাদের টুপি ও নেকটাই কাড়িয়া লইয়া যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত করিত। ছাত্রগণ এবং বহু কারখানার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিতে লাগিল।

আন্দোলনের সংবাদ এবং কার্য্যক্রমের নির্দ্দেশ দিবার জন্য প্রথমে বোম্বাই সহরে এবং পরে কলিকাতায় দুইটি গুপ্ত বেতার-কেন্দ্রও স্থাপিত হয়। বহু প্রচারপত্রও বিলি করা হয় এবং স্থানে স্থানে দেওয়ালে মারিয়া দেওয়া হয়। বাংলা গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ করেন যে, ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে এই আন্দোলন উপলক্ষে নিহতের সংখ্যা ২০ এবং আহতের সংখ্যা ১৫২। হাসপাতালে প্রাপ্ত সংখ্যা অবশ্য ইহা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। কলিকাতায় গ্রেপ্তারের সংখ্যা হাজার চারেক বলিয়া অনুমান হয়।

কিন্তু মেদিনীপুরের আন্দোলন কলিকাতার আন্দোলনকেও ছাড়াইয়া গেল। ইহা এতই প্রবল ও কার্য্যকরী হইল যে সাময়িকভাবে অন্ততঃ ইহা মেদিনীপুরের অনেকাংশে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাইয়া নিজেদের স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিল। গভর্ণমেণ্টও স্বীকার করিয়াছিলেন যে, মেদিনীপুরের বিদ্রোহে যথেষ্ট সতর্কতা এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল—পরিকল্পনাও ছিল অনেকটা ত্রুটিহীন। বিদ্রোহীদিগের ছিল নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগ এবং সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইবার সময় দলের আহত ব্যক্তিগণকে সেবা-শুশ্রূষা করিবার জন্য চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারী সঙ্গে সঙ্গেই থাকিত।

বাংলা দেশের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী অনেকগুলি জিলায় বাংলা গভর্ণমেণ্ট "পোড়ামাটি" নীতির প্রয়োগ করিতেছিলেন। পাছে জাপানী আক্রমণ হয় এবং জাপানীরা সুবিধা লাভ করে, এই আশঙ্কায় এই সকল জিলা হইতে বহু নৌকা ও বাইসাইকেল অপসারিত করা হয় এবং হাজার হাজার মণ ধান ঐ সকল এলাকা হইতে সরাইয়া দেওয়া হয়। মেদিনীপুরেও এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল এবং কৃষক ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণের অবস্থা উঠিতেছিল চরমে। বিশেষ করিয়া তমলুক এবং কাঁথি মহকুমায় লোকের দুর্দ্দশার আর অন্ত ছিল না। সেখানে লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নূতন করিয়া 'সেস' ধার্য্য করা হয়—বিস্তীর্ণ এলাকা সামরিক প্রয়োজনে দখল করিয়া হাজার হাজার লোককে করা হয় গৃহহীন। জিনিষপত্রের দাম হু হু করিয়া বাড়িয়া যাওয়ায় জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাইয়া তাহাদের জীবনযাত্রার ব্যয় অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যাইতেছিল; তাহার উপর আবার অনেককে বাধ্য হইয়া "War Bond" ক্রয় করিয়া গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ-তহবিলে অর্থ সাহায্যও করিতে হইতেছিল। অধিকাংশ স্থলে মাত্র আট আনা হইতে দশ টাকা পর্য্যন্ত নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়া গভর্ণমেণ্ট বহু বাইসাইকেল প্রভৃতি হস্তগত করেন। আসন্ন দুর্ভিক্ষের ছায়া মেদিনীপুরের চারিদিকে বিভীষিকা সৃষ্টি করিতেছিল। লোকের অসুবিধা ও অভিযোগের প্রতি চরম ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া নির্ব্বিকার বিদেশী শাসকরা তাঁহাদের ইচ্ছামত কাজ করিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে মেদিনীপুর—মেদিনীপুর।

নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হওয়ার পর মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে বহু প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হইল। অবিলম্বে নেতাদের মুক্তি এবং গভর্ণমেণ্টের পীড়ন-নীতির অবসান দাবী করিয়া প্রায়ই বড় বড় শোভাযাত্রা মেদিনীপুরের আদালতগৃহ, সরকারী ভবনসমূহ ও থানার সম্মুখে বিক্ষো-

প্রকাশ করিতে লাগিল। এই সকল শোভাযাত্রীদিগকে বলপ্রয়োগে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া হইত। ইহাতে সকলেই এত উত্তেজিত হইয়া উঠিল যে বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য সকলে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। নেতারাও আর তাহাদের দাবীকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। তখন বৃটিশ সরকারের উচ্ছেদের জন্য বিদ্রোহ ঘোষিত হইল এবং থানা ও সরকারী ভবনসমূহ দখল করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে জনগণকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইল। মহিষাদলে পোষাক পরিহিত প্রায় ২০,০০০ স্বেচ্ছাসেবকের এক বিরাট শোভাযাত্রা ২৯শে আগষ্ট তারিখে থানার সম্মুখস্থ এক প্রান্তরে গিয়া সমবেত হইল এবং সেখানে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর সম্মুখেই স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিল। ক্ষিপ্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তখন সভার চারি জন প্রধান বক্তাকে গ্রেপ্তারের জন্য আদেশ দিলেন। পুলিশ তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়া জনগণের নিকট হইতে বাধা পাইল। ম্যাজিষ্ট্রেট তখন জনতার উপর লাঠি-চার্জ্জের হুকুম দিলেন—কিন্তু কনষ্টেবলগণ সে আদেশ পালন করিতে অগ্রসর হইল না। অগত্যা হতবুদ্ধি ম্যাজিষ্ট্রেট দলবল লইয়া প্রস্থান করিয়া কোনও মতে মান বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন।

মেদিনীপুরে চাউলের অভাব থাকা সত্ত্বেও "পোড়ামাটি" নীতি সফল করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন চাউল-কলের সহিত ব্যবস্থা করিয়া গোপনে সেখান হইতে বাহিরে চাউল চালান করাইতেছিলেন। ৮ই সেপ্টেম্বর দানীপুর এবং তাহার আশ-পাশের অঞ্চলের লোকেরা এই বিষয় জানিতে পারিয়া চাউল রপ্তানী বন্ধ করাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল এবং প্রায় হাজার দুই লোক চাউল-কলের নিকট সমবেত হইল। তাহারা জানাইল যে, ধান্য চালান বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি না দিলে তাহারা স্থানত্যাগ করিবে না। মিল-মালিকগণকে এই রপ্তানীকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য একজন পুলিশ অফিসারের নেতৃত্বে যে সশস্ত্র কনষ্টেবলগণ তথায় হাজির ছিল, তাহারা তখন সমবেত জনগণের উপর গুলিবর্ষণ সুরু করিল। ইহার ফলে তিনজন নিহত এবং অনেকে আহত হইল। নিরস্ত্র জনতা গুলির মুখে তখনকার মত স্থানত্যাগ করিল এবং পরবর্ত্তী নির্দ্দেশ লাভের জন্য দ্রুত সংবাদ প্রেরণ করিল দূরবর্ত্তী কংগ্রেস কার্য্যালয়ে। সংবাদ পাইয়া প্রায় জন পঞ্চাশ কংগ্রেসকর্ম্মী সহ হাজার ছয়েক গ্রাম্য লোকের এক বিরাট জনতা যাত্রা করিল ঘটনাস্থল অভিমুখে। আরও সশস্ত্র পুলিশও ইতিমধ্যেই সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কংগ্রেস কর্ম্মিগণ সেখানে গিয়া ধান্য চালান বন্ধ করিবার দাবী জানাইলেন এবং পুলিশের গুলিবর্ষণে যে তিনজন নিহত হইয়াছিল, তাহাদের মৃতদেহ প্রার্থনা করিলেন। বহু বাদানুবাদের পর পুলিশ মৃতদেহগুলি তমলুকে শব-ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার পর অর্পণ করিতে সম্মত হইল। শেষ পর্য্যন্ত পুলিশ কিন্তু আপনাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করিয়া মৃতদেহগুলি নদীতে নিক্ষেপ করে। গ্রামবাসিগণ কোনও মতে উহা জানিতে পারিয়া নদী হইতে ঐগুলি উদ্ধার করিয়া এক শোকযাত্রার ব্যবস্থা করে। পুলিশ তখন পুনরায় বলপ্রয়োগে মৃতদেহগুলি ছিনাইয়া আনে এবং একটিমাত্র চিতায় সেগুলির সৎকার করে।

ইহার পরদিন এক বিরাট সশস্ত্র বাহিনী লইয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত অঞ্চলের কয়েকখানি গ্রামে গিয়া হানা দিলেন এবং প্রায় দুইশত লোককে গ্রেপ্তার করিলেন। তাহাদিগকে আনিয়া কোনও খাদ্য ও পানীয় না দিয়া গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে সারাদিন বসাইয়া রাখা হয়। শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্য হইতে ১৩ জনকে বিচারার্থ চালান দেওয়া হয় এবং এই ১৩ জনের দেড় হইতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদের হয় কারাদণ্ড। জনসাধারণ এই ঘটনা ভুলিয়া যায় নাই। তাহারা ক্ষমতা করায়ত্ত করিবার পর মিল-মালিকগণকে ঘেরাও করে এবং তাহারা জনসাধারণের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হয়। ধান্য চালান দেওয়ার জন্য তাহারা মাপ চায় এবং ভবিষ্যতে আর কখনও ঐরূপ না করিতে প্রতিশ্রুতি দেয়। গণপঞ্চায়েৎ তাহাদের ২০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড করেন এবং উহা হইতে ১৫০০৲ টাকা নিহত ব্যক্তিগণের পরিবারবর্গকে প্রদান করা হয়। (ক্রমশঃ)

বিশ্বের বিখ্যাত পত্রাবলী

অধ্যাপক ডকৃটর শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

(লেনিনের মৃত্যুশয্যায় লিখিত পত্র)

পত্র পরিচয়

অপুর্ব্ব এই লেনিন। একটা আদর্শকে বাস্তব করবার জন্য তার কি কঠোর আত্মত্যাগ, সিদ্ধির জন্য কি নিরলস সাধনা।

১৮৭০ সালে অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহে লেনিনের জন্ম। পিতার ছিল অফুরন্ত জ্ঞান পিপাসা, মাতা ছিলেন দারিদ্র্য-হত সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা, তাঁর সম্পদের মধ্যে ছিল বিরাট মন। উত্তরাধিকার সূত্রে লেনিন লাভ করিয়াছিলেন পিতার জ্ঞানপিপাসা, মাতার বিরাট মন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়নকালে লেনিন রাজনীতির আবর্ত্তের সঙ্গে পরিচিত হন। একদা তরুণ মনের আবেগে তিনি রাষ্ট্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটী শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। ফলে লেনিন সুদূর সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হন। এই নির্ব্বাসন হইল লেনিনের তপস্যার ক্ষেত্র। এই নির্ব্বাসনই তাঁহাকে অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ দিল, বিদ্রোহ পরিকল্পনার অবসর দিল, তাঁহাকে আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মবীক্ষণের সময় দিল।

সাইবেরিয়া হইতে পলায়ন করিয়া তিনি পোলাণ্ডে উপস্থিত হইলেন। ১৯০৫ সালের বিদ্রোহের পর তিনি ইংলণ্ডে ও সুইজারল্যাণ্ডে বাস করিয়া বলশেভিক বিদ্রোহ-চক্র পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

কি অপূর্ব্ব সাহস, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ব্যাপক সংগঠন ক্ষমতা। লেনিনের বার বৎসর ১৯০৫-১৯১৭ সাল—পৃথিবীর বর্ত্তমান সভ্যতার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করিয়াছে।

১৯২৭ সালে জারতন্ত্র ধ্বংসের পর লেনিন তাঁহার মাতৃভূমি রাশিয়াতে পদার্পণ করিলেন। বলশেভিক শাসনতন্ত্রের প্রথম ভাগে স্বার্থপরতা, ব্যক্তিগত ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, কর্ম্মীদের দৃষ্টিভঙ্গী লেনিনকে ব্যথিত, মর্ম্মাহত করিয়াছিল। ১৯১৭-১৯২৪ সাল—৭ বৎসর কাল রাশিয়ার চরম সংকটের দিন। তাঁহার কয়েকটী বন্ধু ও সহকর্ম্মী নিঃস্বার্থভাবে আদর্শ ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিসম্বাদ করিতে লাগিলেন। প্রথমে আদর্শ বিচার, পরে পন্থা আবিষ্কার, সর্ব্বশেষে ক্ষমতা লোভ বলশেভিক দলকে বিব্রত করিতে লাগিল। ইহার পরিণাম বলশেভিক চক্রের অনেকের চক্ষেই ধরা পড়িল। দূরদর্শী লেনিন ক্ষুব্ধ হইলেন। ব্যক্তিত্ব সংঘাত, কর্ম্মপন্থার সংঘাত যে কি সাংঘাতিক রূপ পরিগ্রহ করিবে তাহা লেনিনের অন্তর্দৃষ্টিতে অজ্ঞাত রহিল না।

১৯২২ সাল। লেনিন অকস্মাৎ পক্ষাঘাত রোগে শয্যাগত, বাক্‌শক্তিরহিত। কি মর্ম্মন্তুদ অবস্থা! সব ঘটনাই তাঁহার চক্ষের উপরে চলচ্চিত্রের দৃশ্যের মতন প্রতিভাত হইতেছে অথচ কোন কথা বলার ক্ষমতা নাই। দেশের অভ্যন্তরে বিদ্রোহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্র। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি রাশিয়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করিতেছে, মিথ্যা, সত্য, অর্দ্ধ সত্য মিশ্রণে রাশিয়ার জনগণ চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। জারতন্ত্রবাদীগণ সুযোগের অপেক্ষা করিতেছেন। বলশেভিক চক্রান্তবর্ত্তী বন্ধুবর্গও আদর্শ সংঘাতে ক্লান্ত ও বিভ্রান্ত। তার উপর বলশেভিক সংঘের প্রধান কর্ম্মীদ্বয় ষ্টালিন এবং ট্রটস্কির মতান্তর মনান্তরে পরিণত হইয়াছে। বিরোধমূল হইল একদিকে ষ্টালিনের ক্ষমতাপ্রীতি, অন্যদিকে ট্রটস্কির আদর্শবাদ। ষ্টালিন আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের সামঞ্জস্য করিয়া লইতে প্রস্তুত; ট্রটস্কির মতে আদর্শ ব্যাপারে নূতনতম শিথিলতা বিশ্বাসঘাতকতার রূপান্তর মাত্র। লেনিন ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আতঙ্কিত হইলেন। সম্মুখে উদ্যত মৃত্যু তবু রাশিয়ার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া শান্তিতে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। তাই লিখিলেন শীর্ণ হস্তে এই পরামর্শ পত্র। দুর্ব্বল হস্তে একদিনে পত্রখানি শেষ করিতে পারেন নাই,—আরম্ভ করেন ১৯২২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর। তারপর আবার ১৯২৩ সালের ৪ঠা জানুয়ারী।

পত্রানুবাদ :

বলশেভিক দলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আমার মতামত ব্যক্ত করেছি। আমাদের দলের মধ্যে বিরোধ এবং দলভঙ্গ নিরসনের উপায় সম্বন্ধেও আলোচনা করেছি। আমাদের শত্রু দল আমাদের আভ্যন্তরীণ আত্মকলহের উপর ভরসা করে অপেক্ষা করছে, তাদের ধারণা বলশেভিক দলের মধ্যে আত্মকলহ অবশ্যম্ভাবী; কারণ আমাদের দলের প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে ভীষণ মতভেদ বিদ্যমান।

বলশেভিক দলের মধ্যে দুইটী শ্রেণী আছে এবং দুইটী শ্রেণী আছে বলেই কলহের সম্ভাবনা আছে। এই দুইটী শ্রেণী যদি ঐক্যবদ্ধ না হয় তবে বলশেভিক দলের পতন অনিবার্য। বিরোধের সম্ভাবনা বর্ত্তমান থাকতে বলশেভিক কেন্দ্রীয় সভার স্থায়িত্ব নিয়ে কোন আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মতভেদ নিরসন না হলে দলের বিরোধ প্রতিরোধ করা অসম্ভব। অবশ্য এখনো আমরা তেমন শোচনীয় পরিস্থিতির মধ্যে উপস্থিত হই নি। সুতরাং সে সম্বন্ধে অবতারণা অবান্তর।

দল ভঙ্গ নিরসন করতে হলে সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন দলের স্থায়িত্ব রক্ষা করা, দলের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করবার পূর্ব্বে আমি আমাদের দলের কয়েকটী প্রধান ব্যক্তির চরিত্র বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন মনে করি।

বলশেভিকদলের প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে ষ্টালিন এবং ট্রটস্কি প্রধানতম, এই দুই ব্যক্তি বলশেভিকদলের অনেকখানি স্থান জুড়ে রয়েছে। তাদের দুই জনের সম্বন্ধের উপর দলের অর্দ্ধেক স্থায়িত্ব নির্ভর করে; তাদের মনোমালিন্য এবং মনোমিলনের উপর দলের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করে। বলশেভিকদলকে রক্ষা করতে হলে কেন্দ্রীয় সভার সভ্যসংখ্যা ৫০ থেকে ১০০ করতে হবে। সভ্যসংখ্যা অধিক হলে দলের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রভাব অনেকটা লঘুতর হবে।

আমাদের সহকর্মী ষ্টালিন প্রধান কর্ম্মসচিব হয়েছেন। সুতরাং তার হস্তে অনেক ক্ষমতা। তিনি তাঁর বিরাট ক্ষমতা যথেষ্ট সুবিবেচনার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারবেন কিনা, সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি না। অন্যদিকে সহকর্মী ট্রটস্কি বলশেভিকদলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি এবং অপূর্ব্ব প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। সেই দিন যানবাহন বিভাগের আলোচনায় কেন্দ্রীয় সভার অধিবেশনে তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু ট্রটস্কির সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ দোষ হল, আত্মশক্তির উপর অত্যধিক বিশ্বাস এবং সূক্ষ্ম বিষয়ে অত অধিক মনোযোগ দেন যে অনেক সময় মূলবস্তুর সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলেন। আদর্শের জন্য ট্রটস্কি নিজের সঙ্গে নিজের বিরোধ করতেও দ্বিধা বোধ করেন না।

ষ্টালিন ও ট্রটস্কির চরিত্রে নানা গুণের সমাবেশ; এই গুণগুলি নিজের অজ্ঞাতে দোষ হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং বলশেভিকদলের মধ্যে অকস্মাৎ বিরোধ তীব্রতর করে তুলতে পারে এবং বলশেভিকদল ভেঙ্গে দিতে পারে।

তোমাদের বোধ হয় স্মরণ আছে, গত অক্টোবর মাসে জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ সংক্রান্ত ঘটনা। তাদের বিরোধ একটা আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ছিল না। তাঁরা বলশেভিক দলের বিরুদ্ধাচারী বলে অভিযুক্ত হয়েছিল, ট্রটস্কিও সেই অপরাধে অপরাধী বলে অভিযুক্ত হতে পারেন।

বলশেভিকদলের কেন্দ্রীয় সভার সভ্যদের মধ্যে সকলের সম্বন্ধে আমি বলব না। তবে বুখারিণ ও পিয়াটাকোভ সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। নবীনদের মধ্যে এই দুইজন সর্ব্বাপেক্ষা ধীশক্তি-

সম্পন্ন। বুখারিণ দলের সকলেরই প্রিয়। বুখারিণ বলশেভিক দলের গুণী চিন্তাশীল কিন্তু অবাস্তব, কিন্তু তাঁর অবাস্তব দিকটা আলোচনা করলে মনে হয় বুখারিণ সম্পূর্ণ ভাবে মার্কস পন্থী নয়, তাঁর ভেতরে পণ্ডিতীভাবটা অত্যধিক, কিন্তু তিনি তর্কশাস্ত্রও খুব গভীর ভাবে পাঠ করেননি। পিয়াটাকোভও যথেষ্ট শক্তিমান এবং তাঁর মনোবলও অসাধারণ; প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যে তিনি পরিপূর্ণ। তিনি দলের গঠনতন্ত্র ও পরিচালনা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে রাজনীতির জটিল ব্যাপারে তাঁর উপর নির্ভর করা যায় না।

* * * *

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯২২, লেনিন।

পুনশ্চ :—

ষ্টালিন অত্যন্ত কর্কশ ভাষী, তাঁর এই দোষ কমিউনিষ্টদের সঙ্গে ব্যবহারে সর্ব্বদাই পরিস্ফুট হয়, বন্ধুগণ হয়ত তাঁকে ক্ষমাও করতে পারেন। কিন্তু দলের প্রধান কর্ম্মসচিবরূপে এই দোষ অত্যন্ত গর্হিত, সুতরাং আমার পরামর্শ এই যে ষ্টালিনকে কর্ম্মসচিবের পদ থেকে অপসারিত করতে হবে, তাঁর স্থলে অন্য লোক নিযুক্ত করতে হবে, নতুন কর্ম্মসচিব হবেন ষ্টালিন থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থাৎ তিনি হবেন ধৈর্য্যশীল, ভদ্র, মার্জ্জিতরুচি, সহকর্ম্মীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, দলের প্রতি অনুরক্ত।

বর্ত্তমানে এই আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ষ্টালিন এবং ট্রটস্কির মধ্যে যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, এবং তার সুদূর প্রসারী ভবিষ্যৎ চিন্তা করলে আমার মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হবে না। ব্যাপারটা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়, আজকের ক্ষুদ্রতম কাজটী ভবিষ্যতে বিরাট বৃক্ষে পরিণত হতে পারে।

জানুয়ারী ৪, ১৯২৩, লেনিন

পত্র পরিণাম

বলশেভিক দলের পরবর্ত্তী ইতিহাসে লেনিনের মৃত্যুশয্যায় লিখিত পত্রখানিকে ভবিষ্যৎ বাণীরূপে প্রমাণ করিয়াছে। এই পত্রখানির মধ্যে আছে অপূর্ব্ব ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, তীব্র অনুভূতি, সহকর্ম্মীদের সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ জ্ঞান এবং বলশেভিক দলের সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা। মরণের মুহূর্ত্তেও বলশেভিক দলের অমঙ্গলের ছায়া দেখিতেছেন, অথচ আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখেও লেনিন বলশেভিকদের মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন।

পত্রখানি লেখার এক বৎসর পরে ১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারী তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ইহার পরেই চলিল অবিশ্রান্ত ষড়যন্ত্র। ষ্টালিন ও ট্রটস্কি উভয়েই বলিলেন—"আমি লেনিনের মন্ত্র উদ্‌যাপন করিব, লেনিনের অসমাপ্ত যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিব।" লেনিনকে পুরোভাগে স্থাপিত করিয়া বলশেভিক দলের মধ্যে বিরোধ তীব্র হইল, ফলে ট্রটস্কি নির্ব্বাসিত হইলেন। ষ্টালিনের বলশেভিক দলের পুরাতন সভ্যদের মধ্যে কেহ বা নির্ব্বাসিত, কেহ বা কারারুদ্ধ, কেহ বা নিহত হইলেন। জিনোভিয়েভের বিরুদ্ধে জালপত্র রচিত হইল। ট্রটস্কিকে বিদেশে হত্যা করা হইল। ষ্টালিন নিশ্চিন্ত হইলেন, বলশেভিকের দলে ষ্টালিনের একছত্র অধিকার স্থাপিত হইল।

ষ্টালিন তাঁহার ব্যবস্থা-সফলতা দ্বারা তাঁহার নীতি ও কর্ম্মপন্থাকে জয়যুক্ত করিয়াছেন, রাশিয়াকে পৃথিবীর সর্ব্বোত্তম রাজ্যে পরিণত করিয়াছেন। সুতরাং "জয়েরই জয়"।

বিপ্লব দিনের স্মৃতিধর

শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুপ্ত

সূচ্যগ্র-খিলান প্রবেশ-পথ একটি—শিলাফলকে স্মৃতি-চিহ্নিত ললাট তার—দুই পার্শ্বে ভগ্নদশ কিছুটা প্রস্তর প্রাকার, আর শীর্ষদেশে

অধুনাতন সাধারণ ডাকঘর

একটি—এইটুকুই কেবল দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক আগ্নেয় ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে।

আগ্নেয়—এ বিশেষণটি মাত্র শব্দময় অলঙ্কার হিসাবে বা ভাব-প্রবণতার উচ্ছ্বাসরূপে প্রযুক্ত হয়নি; ইহার এমন অর্থময় সুনির্বাচিত প্রয়োগ বোধ করি, আর কোথাও সম্ভব নয়! এই প্রাকার যে গৃহের পরিবেষ্টনীরূপে ছিল পাহরারত একদিন, তা সত্য সত্যই ছিল অগ্নিগর্ভ—ঊনবিংশ শতাব্দীর বারুদখানা।

এ এমন মূক ছিল না তখন; মুহুর্মুহুঃ মুখর হয়ে বজ্র নির্ঘোষে সমস্ত পরিবেশ নয়, সমগ্র শহরকেই প্রকম্পিত করে তুলেছে। মিত্রদলের পরম সহায়, শত্রুদলের চরম বিভীষিকা—এই বারুদখানার সকল শব্দময়তা আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে অনুরূপ ভয়াবহ অগ্ন্যুদ্গারণের ক্ষীণতম আশাও আর পরিলক্ষিত হয় না। নির্বাণলব্ধ আগ্নেয়গিরির একটা নিরর্থ স্তূপ যেন—প্রত্নতাত্ত্বিকের

প্রযত্ন ব্যতিরেকে কালের অমোঘ অনুশাসন সেটুকুও অচিরে সমতল করে দেবে।

কাশ্মীরি দরজা হতে অর্ধ বলয়াকারে যে পথ দিল্লী রেল-কেন্দ্রের বহিরঙ্গ স্পর্শ করে পশ্চিমাভিমুখী তার সীমান্তে সাধারণী ডাকঘর। ভগ্নাবশেষ ব্যতীত সেই বারুদখানা বা তার পরিবেষ্টনী প্রাকারের কোন চিহ্নই আজ বিদ্যমান নেই। প্রবেশ-পথের শীর্ষদেশে একটি প্রস্তর-স্মারক আজও নয়জন ইংরাজের নাম বক্ষে ধারণ করে বিরাজ করছে; ইহারাই ভারতীয় সিপাহীদের আক্রমণ প্রতিরোধে ছিল আপ্রাণ নিরত।

এই ডাকঘরের সম্মুখভাগে দুই পথের মধ্যবর্তী পথের উপরেই বারুদখানার ভগ্নাবশেষ—প্রবেশ-পথ সমন্বিত পরিবেষ্টনী প্রাকারের অংশ মাত্র।

বারুদখানার ভগ্নাবশেষ

১৮৫৭ সালে ভারত ইতিহাসের প্রজ্বলন্ত অধ্যায় একটি এইখানে রূপ নিয়েছে—মুক্তিকামী সিপাহী দলের বিপ্লবমুখর অধ্যায়টি। এই ভগ্নাবশেষ বজ্র-ভৈরব দিনগুলির জ্বালামুখী চলচ্চিত্র মানসচক্ষে জাগরূক করে তোলে।

ভাগ্যবিবর্তনের শঙ্কাকুল ও অতি-পিচ্ছিল প্রতিটি মুহূর্ত—তুলাদণ্ডে দোদুল্যমান। ব্রিটিশ সৈন্য দিল্লী অবরোধ করেছে, প্রতিরোধ অথবা আত্মসমর্পণ—এই দুই পরবর্তী উপায় মাত্র বিদ্যমান—বিপ্লবী সিপাহীদের সমক্ষে।

সিপাহীরা সঙ্কল্পে স্থির। বারুদ-খানায় বর্তমানে তারা নির্ভয়। প্রজ্বলন্ত বারুদের প্রলয়ঙ্কর গর্জন একদিকে কর্ণ বধির করে তোলে, অপরদিকে সিপাহীদের আগ্রহ করে অধীর—দুর্দম।

প্রাকার বেষ্টিত নগরীর অন্যতম প্রবেশ পথ—কাশ্মীরি দরজা

কর্মচারী ও সৈন্যসংখ্যা মিলিয়ে ব্রিটিশ পক্ষে একদিনেই যখন ১,১৭০জন নিহত হল, অথবা হল আহত, ভারতীয় সিপাহীদের আনন্দ তখন স্বভাবতই আকাশ-স্পর্শী। বিজয় একপ্রকার সুনিশ্চিত। এমন সময় ভাগ্য বিপর্যয়ে ব্রিটিশ সৈন্য বারুদখানা পুনরধিকার করে নিল। বিজয়লক্ষ্মীর প্রসন্ন মূর্তি ক্ষণবিকশিত হয়ে মেঘান্তরালে অন্তর্হিত হল!

উনবিংশ শতাব্দীর অস্ত্রাগার অধুনাতন সাধারণী ডাকঘর ভবনটিতে স্থাপিত ছিল; সংলগ্ন গৃহ ছিল বারুদখানা। প্রধান প্রবেশ পথের কথিত আছে, ভূমধ্যবর্তী একটি পথের অন্তর্বাহী বিবরমুখ এই স্থানটিতে মুক্ত ছিল; অনাবশ্যকবোধে সে গহ্বর পরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

১৮৫৭-এর বিপ্লবকালে ভারতীয় সিপাহীদের আক্রমণ প্রতিরোধে ব্রিটিশ পক্ষ হ'তে এমন বেপরোয়া অগ্নিবর্ষণ চলে যে বারুদপূর্ণ একটি কক্ষ এক সময় প্রজ্বলন্ত অবস্থায় উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়; সমগ্র শহর

তার বিপুল সংঘর্ষে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। অতঃপর সিপাহীরা করায়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে সীমাবেষ্টিত এই সুরক্ষিত ঘরগুলি তাদের দুর্গরূপে ব্যবহার করে।

ব্রিটিশ পুনরধিকারের পর কিছুদিন বারুদখানার বিশেষ রদবদল হয়নি। সর্বাধ্যক্ষ চার্লস নেপিয়ার কিন্তু শহর, বিশেষ করে লালকেল্লার সন্নিধানে বারুদখানার অবস্থান নিরাপদ মনে করলেন না। ফলতঃ, বারুদ, কার্তুজ প্রভৃতি অধিকাংশ বিস্ফোরক পদার্থ শহরপ্রান্তে প্রায় ষাট ফুট উঁচু এক মালভূমিতে—রীজ নামে খ্যাত চড়াই অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়। বিপ্লবী সিপাহীদের আক্রমণ কালেও এখানেই ব্রিটিশদের অন্যতম ঘাঁটি ছিল।

চড়াই চূড়ায় নবগঠিত শস্ত্রশালার ভাস্বর ভাগ্যোদয়ের পটভূমিকায় বিগত শৌর্যগাথার গাঁথুনি ক্রমে শ্লথ, বিস্রস্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে; কিন্তু যে ভগ্নাংশটুকু কালজয়ী হয়ে আজ পর্যন্ত বিদ্যমান, তাও উনবিংশ শতাব্দীর বলিষ্ঠ বাহুর স্পর্ধিত স্বাক্ষর বহন করছে।

বিপ্লবী ভগবান

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বন্দি তোমারে বিপ্লবী বীর, জন্ম তোমার ধন্য বলিয়া মানি,
বিপ্লবী কে সে? নিত্য যেজন বন্ধন-ভাঙ্গা-জীবনের সন্ধানী।
এই পৃথিবীর রাষ্ট্রচালক রাজনৈতিক স্বার্থে অন্ধ যারা,
সত্যসন্ধ বিপ্লবীদের বিদ্রোহী বলি আখ্যা দিয়েছে তারা।
শাসনতন্ত্রে কায়েমী স্বার্থ যাহার বাক্যে করে' ওঠে টলমল,
তারে বিপ্লবী আখ্যা দা'নতে রাষ্ট্রের মুখ হয়ে ওঠে চঞ্চল।
আইনের শত স্বেচ্ছাচারের অন্যায় দলি' যারা দাঁড়াইতে চাহে,
আহুতি বলিয়া গণ্য তাহারা রাষ্ট্রের মহাক্রোধের বহ্নিদাহে।
সেই আহুতিতে অঞ্জলিরূপে নন্দকুমার ফাঁসীতে দিয়েছে গলা,
শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে পেয়েছে ঊর্দ্ধে জীবনের পথ চলা।
ইহারি লাগিয়া দুঃখ বহিয়া মৃত্যুবরণ করেছেন যীশু ক্রুশে,
কতনা দুঃখ বরিল লেনিন্ মুক্তি দানিতে অত্যাচারিত রুষে।
লক্ষ লক্ষ নিন্দুকদের বাক্যের কাঁটা বক্ষে করিয়া জমা,
আততায়ী হাতে মরিয়া গান্ধী সেই শত্রুরে ক'রয়া গেল যে ক্ষমা।
কত বীর নিল মৃত্যুদণ্ড কতনা মনীষী লভেছে নির্ব্বাসন,
জাতির পাপের বিষে দহি' হায় সুভাষচন্দ্র হইল অদর্শন।
রাষ্ট্রের রোষে আত্মগোপনে কেহবা ধন্য লভিয়াছে ভগবানে,
কেহবা লভিল ফাঁসীর মঞ্চ, কেহ গেল কোন্ অজানার সন্ধানে।
ক্ষমতা-লোলুপ ভোগী রাষ্ট্রীয় নিষ্কণ্টকে বিলাসে বাজায় বীণা,
যারা বিপ্লবী ত্যাগীবঞ্চিত জানিনা তো আর তাহারা ফিরিবে কিনা?
যদিও ফিরেনি, বক্ষে বক্ষে তারা চিরদিন ইহলোকে বেঁচে আছে,
কেহতো গাহেনা রাষ্ট্রের নাম, বিপ্লবীবীরে বুকে সবে বাঁধিয়াছে।
কবি তারি লাগি' রচিবে কাব্য গান,
মহাকাল তারে জানায় প্রণাম মানবরূপী সে বিপ্লবী ভগবান।
ধন্যতো সেই বিপ্লবী জানি সব দুর্নীতি করে' দিয়ে চুরমার,
বজ্রকণ্ঠে গর্জিয়া ঘোষে আত্মার দাবী ব্যক্তির অধিকার।
রাজনৈতিক দস্যুর দল অপরাধ ঘোষি দেয় ইহাদের ফাঁসী,
সর্ব্বহারারা করে উপবাস রাজপুরুষেরা হর্ষে বাজায় বাঁশী।
এই দুর্নীতি বৈষম্যের যাহা 'দর্শন' তাহা হেথা লেখা নাই,
সেই দর্শন অগ্নির শ্লোকে কবির বক্ষে বাজিছে যন্ত্রণায়।
পুঞ্জীভূত গো সেই যন্ত্রণা একদা ফাটিয়া দগ্ধ করিবে মহী,
এ মহাপাপের লজ্জাদুঃখ মহাকাল আর আসিবে না কভু বহি'।
মহাক্রোধে তার ফাটিবে প্রলয় আকাশে তাহার উঠিছে ধ্বংসনাদ,
রাষ্ট্র সমাজ কোটিপতি দীন সেই ধ্বংসেতে কেহ পড়িবেনা বাদ।
বুকের রক্তে লিখেছে কবিতা সেই কবিদের ভিসুভিয়াসের বুক,
তারি অগ্নিতে হবে সবে ছাই, এ নহে মিথ্যা—ইহা নহে কৌতুক।
যুগযুগ ধরি আসে বিপ্লবী সেই অগ্নিতে হাঁকাইয়া জয়রথ,
সত্যান্বেষী গাহে জয় তার বন্দনা দেয় নদনদী পর্ব্বত।
বিপ্লবী কারে করেনা গ্রাহ্য কণ্ঠে তাহার জীবনের জয়গান,
নবজন্মের বার্ত্তা বহিয়া দিতে আসে সে যে সত্যের সন্ধান।
অন্ধরাষ্ট্রে যাহারা দৃষ্টিহীন,
তারা চিনে নাই, হৃদয়-মূল্যে পারেনি কিনিতে এই স্বর্গের বীণ্।
মহাসত্যের বিপ্লবী ভৃগু, পদাঘাত তার নারায়ণ নিলা বুকে,
আঘাত লভিয়া ভৃগুপদ নমি' আঁখি চলচল কহিলেন কৌতুকে,—
"আহা মহর্ষি,ক্ষমো অপরাধ,মোরেলাথি মেরে পেয়েছকি পদে ব্যথা?
যদি পেয়ে থাকো এই বিষ্ণুর ক্ষমা করো দেব সকল প্রগল্‌ভতা।"
বিস্ময়ে ভৃগু চাহিল চমকি', হাসিছে বিষ্ণু মহা থেকে মহীয়ান,
ভৃগু ভাবে—সব নররাষ্ট্রের বিষ্ণুর মতো হোত যদি হায় প্রাণ।
অপ্রিয় সব সত্যের যত আঘাতের তারা দিত যদি হেসে দাম,
রাজ্য তাহলে হইত স্বর্গ শাসনতন্ত্র হইত আনন্দধাম।
চরণে লুটায়ে বিপ্লবীভৃগু কহিল কাঁদিয়া বিষ্ণু শ্রীভগবানে,
"ক্ষমো এ অধমে সার্থক আজি পরীক্ষা মম সত্যের সন্ধানে!
হে ঠাকুর, মোর এই অপরাধে বল আজি কোন্ প্রায়শ্চিত্ত হবে?"
নারায়ণ কন—"প্রায়শ্চিত্ত? বরেণ্য তুমি সত্যের বৈভবে।
সত্যিকারের তুমি বিপ্লবী মোর সত্যের সন্দেহ-বিষ পানি',
সত্ত্বগুণের সত্য জানিতে লাথি মারি তার মিটায়েছ নিজ গ্লানি।
এই ভুবনেতে আছে বহু বীর শত সহস্র ঋষি মহর্ষি আছে,
'তোমার মতন নির্ভীক ভৃগু মাত্র ধরায় একটি জন্মিয়াছে।
তব সম এই সত্যান্বেষী মহাবিপ্রের নির্ম্মমাঘাত সহি'
যুগযুগ ধরি আমি ভগবান বিপ্লবীদের চরণচিহ্ন বহি'।
যারা—বিপ্লবী বীরে ঠেলিল নির্ব্বাসনে,
দুর্নীত তারা আত্মদ্রোহী নিজের পূজায় ঠেলিয়াছে ভগবানে।"
বন্দিয়া ভৃগু কহিল কাঁদিয়া—"খুলে দিলে মম চিত্তের আঁখিদ্বার,
বিপ্লবীদের তুমি ভগবান তোমারে নমস্কার।
ফিরে যাই প্রভু, বিদায় বিদায় দাঁড়াইয়া আজ বৈকুণ্ঠের দ্বারে,
নিয়ে গেনু সাথে অগ্নি স্মৃতি—পদাঘাত বহি' ক্ষমা করো বারেবারে।
পরীক্ষা নিতে আঘাত দানিয়া চিরসুন্দরে ফিরে পেনু প্রতিদান,
এই সুন্দরে বক্ষে বহিয়া বিদ্রোহী ভৃগু গাহিবে তোমার গান।
ক্ষমাসুন্দর এই গীতা তব শুনাব মর্ত্তে প্রতি রাষ্ট্রের কাছে,
তাদেরে আঘাতি' লব পরীক্ষা কঠোর সত্যে কারা ভালবাসিয়াছে?
যারা ভালোবাসে জানিব তারাই সুন্দর তারা সত্যে বেসেছে ভালো,
বিপ্লবী ভৃগু কুটীর বাঁধিয়া সেই রাষ্ট্রেতে জ্বালিবে তোমারি আলো।"
আঘাতের ভৃগু নাই যেথা, সেথা—
গাবে অপ্রিয় সত্যের কে'বা গান?
আত্মমুখর মিছে সে রাজ্য
নাই যেথা হায় বিপ্লবী ভগবান!

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সেদিনের দ্বারমণ্ডলে ও বর্ত্তমান দ্বারমণ্ডলে অনেক প্রভেদ।

কালের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে—তাহাতে ওই বিগ্রহকে একদা যে সমারোহের সঙ্গে দ্বারমণ্ডল হইতে এ অঞ্চলের সমাজপতি মহাগ্রামের ঠাকুর বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল—সুদীর্ঘকালের অন্তে নূতন কালে সেই সমারোহ করিয়া আজ আর তাঁহাকে জয়তারার আশ্রমে ফিরাইয়া আনা সম্ভবপর হইল না। সে সমারোহ দূরের কথা, তাহার শতাংশের একাংশও সম্ভবপর হইল না। দেবকী সেনের পরিকল্পনা ফলবতী হইল না। সেন ক্ষোভে দুঃখে অধীর হইয়া বলিল—এ জাতের কল্যাণ কখনও হবে না। ধ্বংস হবে—আপনি দেখবেন—এ জাত একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

ন্যায়রত্ন কিন্তু দুঃখ করিলেন না। স্বভাবগত মৃদু হাস্যরেখা তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

সেন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

ন্যায়রত্ন এবার বলিলেন—কবিরাজ, তোমার বয়স অল্প, তুমি এখনও পাথর হও নি।

সেনের মুখে তিক্ত হাসি দেখা দিল, বলিল—পাথর হয়েছি বৈ কি। পাথর হয়েছি। সহ্য তো কম করি নি। বুকের ওপরে বাঁশ দিয়ে ডলেছিল—কনফেশনের জন্য; গুঁড়ো হওয়া দূরের কথা, ভাঙেনি; তারপর আন্দামানের কষ্ট। বেরিয়ে এলাম—এসে দেখলাম—আমার বোন—বিধবা বোন হারিয়েছে। হারিয়েছে নয়—জবরদস্তি ধরে নিয়ে গিয়েছে মুসলমান গুণ্ডারা। সন্ধান পেলাম—পাঁচ সাত জনে পাশবিক অত্যাচার করেছিল তার উপর, সারা রাত্রি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, পরের দিন সকালে জ্ঞান হয়ে—কোন মতে ফিরেছিল—তারপর হ'ল থানা-পুলিশ, তখন একদিন দল বেঁধে এসে তাকে নিয়ে কোথায় যে নিখোঁজ ক'রে লুকিয়ে ফেললে—তার আর কোন সন্ধান হল না। কংগ্রেস বলে—এরা গুণ্ডা; হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়; কিন্তু আমি জানি—লীগ এই গুণ্ডাদের মামলায় সাহায্য করেছে—প্রশ্রয় দিয়েছে। যাকগে সে কথা। আমি তো তাও সহ্য করেছি। পাথর বৈ কি। তবে যে পাথরের বুকের মধ্যে ঠাণ্ডা জলের উৎস থাকে, গঙ্গা-যমুনার সৃষ্টি হয়—সে পাথর আমি নয়, যে পাথরের বুকে আগুন জমা হয়ে থাকে—টগবগ করে ফোটে—ধাতু-গন্ধক-লাভা—আমি সেই পাথর।

ন্যায়রত্ন সস্নেহে সেনের গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন। বলিলেন—আগুনই জল হয় সেন। আমার ভিতরেও আগুন ছিল। আমি দেখেছি, আমার ছেলে সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ল। আমি দেখলাম—আমার পৌত্র আমার আগুনের শিখাকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়ে—নির্ভয়ে চলে গেল—বলে গেল—মিথ্যে তোমার আগুন—মিথ্যে তোমার জ্বালা। অবাক হয়ে গেলাম। ভাল ক'রে সন্ধান করলাম—কি ক'রে সহ্য করলে বিশ্বনাথ আমার এই আগুনের জ্বালা। মহাকাল হেসে বললেন—মূঢ়, ওর আগুন যে তোর আগুনের চেয়েও অনেক বেশী তীব্র। আমি নিভে গেলাম কবিরাজ, জল হয়ে গেলাম। তবে তোমার আগুন এখনও সত্য—কালের শক্তি এখনও তোমার মধ্যে আছে, তুমি জ্বলছ—যতক্ষণ না অন্যকে ওই আগুনে জ্বালাবে, ততক্ষণ তুমি জ্বলবে।

সেন বলিল—আমি বেঁচে আছি—আপনি মৃত ন্যায়রত্ন মশায়। রূঢ় মনে হলে কিছু মনে করবেন না।

—না—না। কিছু মনে করব না সেন। তুমি সত্যই বলেছ। বহ্নিই প্রাণ। সে আমি জানি। তবে সে বহ্নিকে যে নিজেই নিভিয়ে শীতল হতে পারে—সেই শান্ত।

সেন স্তব্ধ হইয়া গেল আবার।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—আমি উঠি সেন। কলের বাঁশী বাজতে সুরু হয়েছে। উষাসমাগমে আর বিলম্ব নাই।

সে কালের দ্বারমণ্ডলে ও বর্ত্তমান দ্বারমণ্ডলে—অনেক প্রভেদ।

সে কালের দ্বারমণ্ডল—ষাট সোত্তর বৎসর পূর্ব্বের দ্বারমণ্ডল ন্যায়রত্ন নিজে দেখিয়াছেন। দুই তিনশত বৎসর পূর্ব্বের দ্বারমণ্ডলের কাহিনী তিনি জানেন।

দুই তিনশত বৎসর পূর্ব্বে উষা সমাগমের মুহূর্ত্ত হইতেই জয়তারা আশ্রমে প্রকাণ্ড বড় একটা ঘণ্টায় ধ্বনি বাজিতে সুরু করিত।

ঢং—ঢং, ঢং—ঢং, ঢং—ঢং,—ঢং—ঢং।

প্রথমে আশ্রমের গদীয়ান এবং সমাগত সন্ন্যাসীরা ঝুলানো ঘণ্টাটায় দড়ি টানিয়া ঘণ্টা বাজাইতেন, সূর্য্যোদয়ের পরও কয়েক দণ্ড পর্য্যন্ত বাজনা চলিত। জয়তারার আশ্রমে—স্থানীয় যাত্রী যাঁহারা যে যখন আসিতেন—একবার করিয়া ঐ ঘণ্টাটার দড়ি টানিয়া বাজাইতেন। তীর্থযাত্রী, দ্বারমণ্ডল বাজারের ব্যবসায়ীবৃন্দ লইয়া আসিতেন অনেকে।

এখনও জয়তারার আশ্রমে ঘণ্টা বাজে। কিন্তু সে বড় ঘণ্টাটা ভাঙিয়া গিয়াছে। এখন একটা ছোট ঘণ্টা আছে; সেটার বাজনা তেমন গুরুগম্ভীর নয়, শব্দ বেশী দূর যায় না, লোকের সমাগমও কম।

এখন দ্বারমণ্ডল জংসনে ভোর রাত্রি হইতেই দশ বারোটা মিলে সিটি বাজিতে সুরু হয়। বোধ হয় আধ ঘণ্টা অন্তর বেলা ছয়টা পর্য্যন্ত বারকয়েকই এক সঙ্গে বাজিয়া চলে। প্রত্যেক কলের সিটিরই আওয়াজ স্বতন্ত্র। সা—রে—গা—মা—পা—ধা—নি—সপ্ত সুরের কোন না কোন সুরের সঙ্গে এক একটা সিটির সুর বাঁধা আছে। এক পর্দ্দায় দুইটা সিটি থাকিলে—কোনটা খাদে বাজে, কোনটা চড়ায় বাজে। প্রায় একসঙ্গে এই দশ বারোটা সিটি বাজিয়া উঠিয়া বিচিত্র সমবেত ভোঁ—এখানকার বায়ুমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে, বৃত্তাকারে এই শব্দ ছড়াইয়া চলে। শব্দ ছড়াইয়া দেওয়াই উদ্দেশ্য। শব্দের ধর্ম্মও তাই। মানুষকে জাগায়।

দ্বারমণ্ডলের মিলগুলির শ্রমিকেরা মিলের বাসিন্দা নয়। চারিপাশে তিন চার মাইল দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে তাহারা আসিয়া থাকে। মিলের কাজ সুরু হয় ছয়টায়, কিন্তু সিটি বাজিতে সুরু হয় ভোর চারিটা হইতে। আধ ঘণ্টা অন্তর বাজে। সিটির শব্দে তাহাদের ঘুম ভাঙে। তাহারা সাজিয়া গুছাইয়া দূরত্ব অনুযায়ী সময় রাখিয়া রওনা হয় মিলের দিকে।

সেকালে, সকাল হইতেই দ্বারমণ্ডল বাজারের পণ্যসম্ভার গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিয়া এ অঞ্চলের গ্রামগ্রামান্তরের হাট অভিমুখে রওনা হইত। সেখানে দেশান্তরের মাল বেচিয়া—গ্রামের মাল কিনিয়া তাহারা ফিরিয়া আসিত সন্ধ্যার সময়। বর্ষার সময় ময়ূরাক্ষী ভরিয়া উঠিলে—বন্দর ঘাটে—দেশান্তরের নৌকা আসিত, তখন দ্বারমণ্ডল বাজার কয়েক মাসের জন্য উঠিয়া আসিয়া বসিত এই ঘাটের উপর পতিত প্রান্তরে—মেলার মত চালা ঘর সাজাইয়া বিকি কিনি করিত।

একালে ভোর হইতেই দ্বারমণ্ডলের চারিদিকের পথগুলি দ্বারমণ্ডলমুখী পণ্যভার বোঝাই গরুর গাড়ীর চাকার শব্দে এবং ধুলায় মুখরিত ও আচ্ছন্ন হইয়া উঠে; পায়েচলা পথ ধরিয়া ভার কাঁধে,ঝুড়ি মাথায়,মোট মাথায় মানুষের দল পিপড়ার সারির মত দ্বারমণ্ডলে আসিয়া হাজির হয়। তাহাদের বিচিত্র হাঁকে— দ্বারমণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠে।

তখনকার দ্বারমণ্ডলের পরিধি ছিল—চারি পাশে দুই তিন ক্রোশ। এখন পরিধি বিশ পঁচিশ মাইল।

তখনকার দ্বারমণ্ডলের কর্ম্মব্যস্ত সময় ছিল মাস কয়েক—মাত্র বর্ষার কয়েক মাস। এখন বারমাসই কর্ম্মব্যস্ত কাল। উদয় কাল হইতে রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত অবসর নাই, অবসর নাই, অবসর নাই।

ময়ূরাক্ষী পাহাড়ী নদী, মাত্র কয়েকমাস জল থাকে, রেলপথ বারোমাস উন্মুক্ত, গাড়ী চলিয়াছেই, চলিয়াছেই, চলিয়াছেই।

ভোরবেলাতেই সাইকেল ছুটিয়াছে। চারিদিকে খান তিরিশেক সাইকেল বাহির হইয়া চলিয়াছে। ন্যায়রত্ন যেদিন ভোরবেলায় নামিয়া ময়ূরাক্ষীর ঘাটে অজয়কে সঙ্গে লইয়া স্নান করিতে আসিয়াছিলেন, সেদিন সাইকেলগুলিকে ছুটিতে দেখেন নাই।

একজন সাইকেল আরোহী ন্যায়রত্নকে দেখিয়া নামিয়া পড়িল। সাইকেল খানিকে কোমরে ঠেকাইয়া রাখিয়া যথাসাধ্য হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল—চানে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ। কিন্তু তোমাকে চিনতে পারলাম না তো!

—আমি আজ্ঞে—তারাপদ পরামাণিকের ছেলে।

—শিবকালীপুরের তারাপদ প্রামাণিক?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—তারাপদ? সে তো গত হয়েছে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বাবা আজ চার বছর হ'ল মারা গিয়েছে।

—এত সকালে কোথায় এসেছিলে?

একটু হাসিয়া তারাপদর ছেলে বলিল—আসি নি কোথাও, যাচ্ছি। আমি এখন জংসনেই থাকি কিনা! কলে কাজ করি।

—কলে কাজ কর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ম্যাট্রিক পাশ করে আর পড়তে পারলাম না, কলে কাজ নিয়েছি। রবিবারে বাড়ী যাই। তারপরই সে সহযাত্রী সাইকেল আরোহীদের দিকে তাকাইয়া দেখিল—তাহারা অনেকটা দূর চলিয়া গিয়াছে, ব্যস্ত হইয়া সে হাত জোড় করিয়া বলিল—তা হলে আমি এখন যাই—আজ্ঞে।

—এস। কিন্তু—

তারাপদর ছেলে তখন সাইকেলটা ধরিয়া প্যাডেলে পা দিয়াছে।

—কিছু বলছেন?

—কোথায় যাবে?

—আজ্ঞে, ধান চালের দর নিয়ে যাচ্ছি। গাঁয়ে দিতে যাচ্ছি!

কাছের গ্রামগুলিতে বিকিকিনি সুরু হইবার পূর্ব্বেই—দ্বারমণ্ডলে আজিকার নির্দ্ধারিত দর—তাহারা বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে।

রাত্রেই হাওড়া রামকৃষ্ণপুর হইতে জংসনে সেখানকার দর আসিয়া পৌছিয়াছে।

নিত্যই এই ভাবে দর আসে এবং নিত্যই এই ভাবে জংসন হইতে দর লইয়া গ্রামগ্রামান্তরে লোকে ছোটে।

ময়ূরাক্ষীর ঘাটে আসিয়া ন্যায়রত্ন থমকিয়া দাঁড়াইলেন; ঘাটে আজ নামিবার উপায় নাই। নদীর জলধারার দুই পাশের বালুচরের উপর প্রায় শো দুয়েক গরু এবং শো খানেক ছাগল ভেড়া শুইয়া দাঁড়াইয়া জমিয়া রহিয়াছে। তাহাদিগকে আগলাইয়া পঁচিশ তিরিশ জন পাইকার—বিশ্রাম করিতেছে। ন্যায়রত্নের মনে পড়িল—আজ এখানকার বড় হাট, বৃহস্পতিবার সাধারণ হাটের সঙ্গে গো-হাটা বসিয়া থাকে। ন্যায়রত্ন আর খানিকটা পূর্ব্ব-মুখে অগ্রসর হইয়া গিয়া ছোট একটা ঘাটে নামিলেন। ঘাটে নামিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

এককালে এই ঘাটের নাম ছিল উদয় ঘাট।

প্রবাদ—এই ঘাটে তাঁহাদের গৃহ-দেবতা গোপীবল্লভ একদা আবির্ভূত হন। একখানা নৌকায় দুজন মাঝি ও ঘাটের উপর একটি মুসলমান প্রৌঢ়ার মৃতদেহ পড়িয়াছিল, আর ছিলেন গোপীবল্লভ। লোকে বলে—ওই মুসলমান প্রৌঢ়া গোপীবল্লভকে কোন স্থান হইতে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। পথে এই ঘাটে প্রৌঢ়া রান্না করিয়া গোপীবল্লভকে সেই অন্ন নিবেদন করিতে গেলে—গোপীবল্লভ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রৌঢ়াকে এবং মাঝি দুইজনকে বধ করিয়া ঘাটে নামিয়া পড়েন। ওদিকে জয়তারা আশ্রমের সন্ন্যাসী সকালে আসিয়া গোপীবল্লভকে জয়তারা আশ্রমে লইয়া যান। দীর্ঘকাল এই ঘাটটির এ অঞ্চলে—একটি পুণ্যময় স্নান-ঘাট রূপে খ্যাতি ছিল। গোপীবল্লভের উদয় তিথি—শ্রাবণ পূর্ণিমায় এখানে বহুযাত্রী স্নান করিতে আসিত। কিন্তু কিছুকাল পরে—এই অঞ্চলের মুসলমান গুরুর নেতৃত্বে—এক শ্রাবণ পূর্ণিমায়—মুসলমানেরা হানা দিয়া—ঘাটে গো হত্যা করিয়া—বাজার লুঠ করিয়া ঘাট অপবিত্র করিয়া দিয়া গিয়াছিল। সেই অবধি উদয় ঘাট পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর এখানে কেহ স্নান করে না।

ন্যায়রত্ন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

এ প্রবাদের অন্তর্নিহিত সত্যটুকু তিনি জানেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষরচিত গোপীবল্লভের উদয়-মাহাত্ম্যের মধ্যে তিনি পাইয়াছেন।

এ অঞ্চলের মুসলমানদের ধর্ম্মগুরু যাঁহারা, তাঁহারা একদা ছিলেন হিন্দুদের ধর্ম্মগুরু। মুসলমানেরা আজি যেমন মনে করে হজরতের পাদস্পর্শে মৃত্তিকা পবিত্র হয়, স্পর্শে দেহের পাপ দূরে যায়, দর্শনে অন্তর পরিশুদ্ধ হয়—একদিন হিন্দুরাও ঠিক তাই মনে করিত। ভাবিত দেবতাশ্রিত বংশ, ভাবিত দর্শনে পুণ্য, স্পর্শে মোক্ষ, আশীর্ব্বাদে অদৃষ্টের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। দেবজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বংশ। তাঁহাদেরই

কুলদেবতা ছিলেন গোপীবল্লভ। অকস্মাৎ কি হইল কে জানে—ফৌজদার ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র বাজেয়াপ্ত করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রতিকারের জন্য গেলেন নবাব দরবারে। সেখান হইতে একদিন ফিরিলেন ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া। সঙ্গে এক রূপসী মুসলমান কন্যা—তাঁহার বধূ। আসিয়া প্রচার করিলেন—ঈশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যাহারা তাঁহার প্রতি আস্থাবান—যাহারা উদ্ধার চায়—তাহাদের তিনি আহ্বান জানাইলেন—এই শুদ্ধ সত্যধর্ম্ম গ্রহণ কর। ফলে কিছু ভক্তমণ্ডলী তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিল। এখানকার কুসুমপুরের মুসলমানেরা তাহাদেরই অন্যতম। কিন্তু ব্রাহ্মণের মা ইসলাম গ্রহণ করিলেন না, সমাজ তবু মানিল না, পুত্রের গৃহীত ধর্ম্ম তাঁহার উপর আরোপ করিয়া দিল। বিধবা একদিন গোপীবল্লভকে লইয়া নৌকায় খরস্রোতা ময়ূরাক্ষীতে আসিলেন। জয়তারা আশ্রমের নাম শুনিয়াছিলেন, বন্দর-ঘাটে আসিয়া নৌকার বহরের মধ্যে নৌকা বাঁধিতে সাহস করিলেন না। একটু দূরে আসিয়া এইঘাটে নৌকা বাঁধিলেন। লোক পাঠাইলেন জয়তারা আশ্রমের সন্ন্যাসীর কাছে। 'গোপীবল্লভকে গ্রহণ করুন।' অভাগিনীকে একটু আশ্রয় দিন। কিন্তু গভীর রাত্রে নৌকায় ডাকাতি হইয়া গেল। মাঝি দুইজনকে এবং প্রৌঢ়াকে হত্যা করিয়া বিগ্রহের অলঙ্কার—প্রৌঢ়ার সম্বল অপহরণ করিয়া বিগ্রহ ফেলিয়া দিয়া তাহারা চলিয়া গেল। তিনটি প্রাণীকে নিঃশব্দে হত্যা করা কঠিন কাজ ছিল না। প্রভাতে সন্ন্যাসী আসিয়া বিগ্রহ লইয়া গেলেন। গোপন রাখিলেন প্রৌঢ়ার পরিচয়। প্রবাদ কিন্তু প্রচার হইয়া গেল মুখে-মুখে। প্রতাপান্বিত ইসলামধর্ম্মাবলম্বী গুরুও প্রকাশ করিলেন না কোন কথা। কিন্তু মাতৃহত্যার এই ক্ষোভ তাঁহার অন্তরে গাঁথা হইয়া রহিল। তিনি শক্তি সঞ্চয়ে মন দিলেন। তারপর একদিন ওই উদয় তিথিতেই আসিয়া এই ঘাট অপবিত্র করিয়া বাজার লুঠ করিয়া বহু নরহত্যা করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য, জয়তারার আশ্রমে প্রবেশ করিলেন না। এই ঘটনার পর —তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। দীর্ঘকাল পরে এক বৃদ্ধ একদিন আসিয়া জয়তারা আশ্রমের প্রান্তভাগে কুটীর বাঁধিল। একদিন রাত্রে ফকীর আসিল এই মাহাত্ম্য রচনাকারীর কাছে। নিজের পরিচয় দিয়া বলিল—আমার দেহ জীর্ণ হইয়াছে। এ দেহের প্রতি মমতাও নাই। জীবনে যাহা করিয়াছি তাহার জন্য বেদনাও নাই। মমতা আছে শুধু ওই গোপীবল্লভের উপর। না হইলে ওই বিগ্রহকে ভাঙিয়া ময়ূরাক্ষীর জলে বিসর্জ্জন দিতাম। আপনি গোপীবল্লভকে লইয়া আসিয়া গৃহে প্রতিষ্ঠা করুন। জয়তারার আশ্রম কপালিনীর আশ্রম—ওখানে গোপীবল্লভের পরিচর্য্যা ঠিক হয় না। যশোদার স্নেহ—রাধিকার প্রেম, রাখাল-সখার সৌখ্য—এ নহিলে গোপীবল্লভ পরিতৃপ্ত হন না। জয়তারা আশ্রমের সন্ন্যাসী—আমার পরিচয় জানেন, তাঁহার সঙ্গে আমার কথাও হইয়াছে, তিনি সম্মত আছেন, গোপীবল্লভকে লইয়া আসুন।

মহাগ্রামের ঠাকুরবংশের গৃহে আজ গোপীবল্লভ আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। যদি কোন দিন আমার বংশ অবিশ্বাসী হয়—অক্ষম হয়—তবে গোপীবল্লভ আবার গিয়া অধিষ্ঠিত হইবেন ওই জয়তারার আশ্রমে।

এই সেই উদয় ঘাট।

এ ঘাটে কেউ স্নান করে না।

ন্যায়রত্ন সেই ঘাটেই নামিলেন। ঘাটের পাশেই একটা দহ। জংসন ষ্টেশনের পাইপ আসিয়া এই দহে নামিয়াছে। পাড়ের উপর একটা শেড। শেডের মধ্যে পাম্প বসানো আছে। ষ্টীমের শব্দ তুলিয়া পাম্পটা চলিতেছে।

ঘাটে নামিয়া স্নান করিতে করিতে ন্যায়রত্ন চোখের জল ফেলিলেন প্রৌঢ়ার উদ্দেশ্যে, ফকীরের উদ্দেশ্যে!

স্নান সারিয়া উঠিলেন।

উপরের দিকে মুখ তুলিয়া সূর্য্য প্রণাম করিতে গিয়া প্রণাম করা হইল না—একটা বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়িয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য অবাক হইয়া রহিলেন।

ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী আসিতেছে গ্রামগ্রামান্তর হইতে। কলরব করিয়া ছুটিয়া চলিয়া আসিতেছে—জংসন ম্বারমণ্ডলের দিকে। জংসন ম্বারমণ্ডলের মিলের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে—হাজার হাজার মণ শস্য কণা ছড়ানো রহিয়াছে।

নিচে চোখ নামাইলেন। মাঠের পথে পিঁপড়ার সারির মত মানুষের সারি।

কলের ভোঁ বাজিতেছে।

পিছন ফিরিয়া ন্যায়রত্ন জংশনের দিকে চাহিলেন।

আকাশমুখী সারি সারি চিমনী। ধোঁয়া উঠিতেছে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের মত। কুণ্ডলী পাকাইয়া আকাশে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

বিপুল বলশালী বিরাটকায় জংসন দ্বারমণ্ডল—গতিশীল পৃথিবীতে রুগ্ন জীর্ণ প্রাচীন গ্রামমণ্ডলীকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে। দিগন্ত হইতে মানুষের দল ছুটিয়া আসিতেছে। দিগন্তরে বার্ত্তা বহন করিয়া জংসনের দুত ছুটিয়াছে। প্রচণ্ড মন্থর ওই যে ঘর্ঘর শব্দ কয়েক দণ্ড পরেই প্রবলবেগে চলিতে সুরু করিবে। ইহার মধ্যে তাঁহার মত বৃদ্ধ এবং গোপীবল্লভের পুরাণো কথা লইয়া আবেগ প্রকাশের এখানে অবসর কোথায়? এই তো কাল মহাকাল! দেবকী সেন—তুমি মিথ্যা ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছ! স্নান সারিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

কে আসিতেছে?

দেবু পণ্ডিত? হ্যাঁ দেবু পণ্ডিতই বটে। সঙ্গে অনেকগুলি লোক!

(ক্রমশঃ)

পূর্ব্ববঙ্গের শরণার্থী সমস্যা

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে অন্ততঃ কুড়ি লক্ষ হিন্দু পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া আসেন। ভারত সরকার পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে আগত ৫০ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীদের লইয়া সে সময় এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, বাঙ্গলার সমস্যার প্রতি তখন তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি পড়ে নাই। তারপর দুই বৎসর অবস্থা মোটের উপর চলনসই ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের অমুসলমান সম্প্রদায়ের মনে অবশ্য নিজেদের ধনপ্রাণের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা কোন সময়েই জন্মে নাই, সুবিধা সুযোগ পাইলেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া আসিয়াছেন বহু লোক, তবু জন্মভূমির প্রতি মমতায় সুদিনের আশায় অধিকাংশ হিন্দু এতদিন পূর্ব্ববঙ্গের ভিটামাটিতে থাকিয়া গিয়াছেন। ইহার পর গত ডিসেম্বর মাস হইতে পূর্ব্ববঙ্গের পরিস্থিতি আবার হিন্দুদের পক্ষে অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। গুণ্ডা, বিহারী মুসলমান, গুজব ও সরকারী নিষ্ক্রিয়তা, সব কিছু একত্রিত হবার ফলে এবার ঢাকা, বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে প্রকাশ্যভাবে হিন্দু নিধন যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে। আত্মরক্ষায় আকুল হইয়া এবার অসংখ্য নিরুপায় নরনারী ভারতে আসিবার জন্য ঘর ছাড়িয়াছে, কিন্তু পথে আনসার বাহিনী, গুণ্ডা, শুল্ক-অফিস ইত্যাদির জুলুমে যে সামান্য সঙ্গতি সঙ্গে লইয়া তাহারা আসিতেছিল, তাহাও হইয়াছে নিঃশেষ। মাঝে মাঝে পথের মাঝখানে ট্রেণ ও ষ্টীমার থামাইয়া নিষ্করুণভাবে হিন্দু যাত্রীদের লুণ্ঠন, অত্যাচার, অসম্মান ও হত্যা করা হইয়াছে।

বাস্তুত্যাগী অসংখ্য নিঃস্ব ও রিক্তপ্রায় লোক প্রতিদিন ভারতে আসিতেছে। আসামেও কিছু আশ্রয়প্রার্থী যাইতেছে, তবে পশ্চিম বাঙ্গলায় আসিতেছে অবিরাম বিপুল জনস্রোত। ট্রেণ ও ষ্টীমারে অত্যাচারের চূড়ান্ত হওয়া সত্ত্বেও এগুলিতে আগত আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা কম নয়, এ ছাড়া নানাস্থানে পাকিস্তান পার হইয়া পায়ে হাঁটিয়া প্রচুর লোক প্রতিদিন ভারতে আসিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বনগাঁর নিকট বেনাপোল সীমান্তে এবং রানাঘাটের নিকট জয়নগর—দর্শনা সীমান্তে এইভাবে পদব্রজে আগমনকারী সর্ব্বহারা হতভাগ্য জনতার সারি এখনও যে কোনদিন যে কোন সময় দেখা যায়। দর্শনা বা বেনাপোলের পাক-ভারত সীমান্ত হইতেই ভারতীয় বসতি সুরু হয় নাই, উভয় স্থানেই দেড় দু মাইল ফাঁক মাঠ পড়িয়া আছে এবং সেই মাঠের উপর ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সেবাব্রত চলিতেছে। আশ্রয়প্রার্থীরা পাকিস্তান সীমান্তের শুল্ক আফিসে আটক পড়িতেছে অন্ততঃ ৪।৫ ঘণ্টা, ইহারও পূর্ব্বে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমন কি দিনের পর দিন তাহাদের পথে কাটিয়াছে। মুক্তির বিনিময়ে আনসার বাহিনী বা গুণ্ডাদের হাতে সর্ব্বস্ব তুলিয়া দিয়া তাহারা যেরূপ করুণ অবস্থায় সীমান্ত সংলগ্ন প্রান্তর অতিক্রম করিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী যে কোন ব্যক্তিকেই অশ্রুসজল করিয়া তুলিবে। বানপুর—দর্শনা সীমান্তে মাত্র একটি দিনের হৃদয়বিদারক অভিজ্ঞতায় কথা বলিতেছি। সকাল শেষ হইয়া সূর্য্যকিরণ তখন প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। দর্শনা শুল্ক-অফিস পার হইয়া সামান্য জিনিষপত্র সমেত আবালবৃদ্ধবনিতার স্রোত রেলপথ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। জয়নগর হইতে দর্শনা পর্য্যন্ত যে দেড় মাইলের মত মুক্ত প্রান্তর, সেখানে কোন সৈন্য বা পুলিশের ব্যবস্থা নাই বলিয়া সেবার ইচ্ছা থাকিলেও স্বেচ্ছাসেবকদের পক্ষে সেখানে পাকিস্থানীদের নাগালের মধ্যে যাওয়া বিপজ্জনক। অবসন্ন আশ্রয়প্রার্থীদের সেই দেড় মাইল মাঠ যেন আর শেষ না। শিশু, নারী ও বৃদ্ধরা অপরিসীম ক্লান্তিতে একবার বসিতেছে আর খানিকটা চলিতেছে। জয়নগর আসিয়া পৌছাইবার পর কেহ কেহ জল চাহিয়া জলপাত্র হাতে লইবার আগেই অজ্ঞান হইয়া যাইতেছে। সেই দুপুরের দুরন্ত রোদে আশ্রয়প্রার্থীদের জয়নগরের আশ্রয় হইল সাধারণক্ষেত্রে খোলা মাঠ, আর বহুভাগ্য থাকিলে কোন গাছতলা। দুইটি সরকারী ক্যাম্প রহিয়াছে, কিন্তু কাজের সঙ্গতি সে দুটির যৎসামান্য, বেসরকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সেবাকার্য্য চালাইতেছে, একদল ছাত্র প্রাণপণ করিয়া আর্ত্তের অশ্রুমোচনে দিনরাত সেখানে

কর্ম্মব্যস্ত। কিন্তু পাউডার গোলা জলের মত সামান্য পরিমাণ দুধ, আর শুকনো চিড়া সম্বল লইয়া তাহারাও যেন অসংখ্য ক্ষুধাতুরের সামনে দাঁড়াইবার সাহস পাইতেছে না। দৃষ্টি সীমানার মধ্যে দর্শনায় রাইফেল-ধারী পাকিস্তানী সেনা টহল দিতেছে, ভারতীয় সীমানার মধ্যে উপরোক্ত খোলা মাঠে সাইকেলারোহী জুলুমবাজ আন্সারের অতর্কিত আবির্ভাব ঘটিতেছে যখন তখন, আর এখানে সৈন্যবিহীন জয়নগরে ভরসা মাত্র জন বারো পুলিস ও তাহাদের সঙ্গে একজন মাত্র অফিসার। একটি মাত্র টিউবওয়েলে জলের আশায় সব সময় লাইন দিয়া আছে কমপক্ষে একশত নরনারী। জয়নগর হইতে আশ্রয়প্রার্থীদের লইয়া আসিবার জন্য শাটলের ব্যবস্থা আছে, একটার সময় যে শাটল ট্রেন আসিবার কথা, তাহা আসিল চারটের পর। বলা বাহুল্য, গাড়ী আসিতে এইরূপ বিলম্ব হওয়ায় অপেক্ষারত শত শত নরনারীকে বাধ্য হইয়া প্রখর রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। বহু দুঃখ সহ্য করিয়া এবং বহু আশা লইয়া যাহারা পাকিস্তান সীমান্ত পার হইয়াছে, ভারতে এইভাবে হইল তাহাদের প্রথম অভ্যর্থনা। ইহার পর এই সব আশ্রয়প্রার্থীকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়াইতে হইবে। আশ্রয় শিবিরগুলি ছেঁচাবেড়ার বা পরিত্যক্ত সামরিক শিবির হিসাবে অত্যন্ত জরাজীর্ণ অবস্থার। আসন্ন কালবৈশাখী ও বর্ষার প্রকোপে ইহাদের কি দুর্গতি হইবে কে জানে? এছাড়া ক্ষুধায় অন্ন ও রোগে চিকিৎসাও ইহাদের ভাগ্যে নিয়মিতভাবে জুটিবে কিনা সন্দেহ। অবশ্য আগের তুলনায় সরকারী কর্তারা বর্ত্তমানে সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া শরণার্থীদের রক্ষাব্যবস্থা, প্রাথমিক সেবাকার্য ইত্যাদি ব্যাপারে অনেক বেশী সচেতনতা দেখাইতেছেন, কিন্তু আশ্রয়-প্রার্থীদের সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় নিরাপত্তার দিক হইতে না হইলেও সেবাকার্য্যের ও পুনর্বাসনের দিক হইতে পরিস্থিতির শোচনীয়তা এখনও কিছুই কমে নাই।

পাকিস্তানের মতিগতি যেরূপ, তাহাতে আশ্রয়প্রার্থী সমস্যার এখানেই শেষ নয়। এক কোটি কুড়ি লক্ষ পাকিস্তানী হিন্দুর মধ্যে আগের বারে ২০লক্ষ আসিয়াছে, এবার আসিয়াছে ৫ লক্ষের মত। এই আশ্রয়প্রার্থীদের এবং পূর্ব্ববঙ্গের দাঙ্গায় নিহতদের বাদ দিলেও এখনো অন্ততঃ ৯৫ লক্ষ হিন্দু পূর্ব্বপাকিস্তানে রহিয়াছে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সুর নরম হইতে দেখিয়া অতঃপর পাকিস্তানী দুর্ব্বৃত্তদের অধিকতর সক্রিয় হওয়া বিচিত্র হয় এবং সেক্ষেত্রে ভারতে শেষ পর্য্যন্ত কত লোক আসিবে বলা যায় না। ভারতসরকার এবার পূর্ব্ববাঙ্গলার আশ্রয়-প্রার্থী সমস্যা সমাধানে কতকটা আগ্রহ দেখাইতেছেন, আসাম উড়িষ্যা, বিহার প্রভৃতি কোন কোন প্রদেশ কিছু আশ্রয়প্রার্থীর জন্য ব্যবস্থা করিতে সম্মত হইয়াছে। এসব আশার কথা সন্দেহ নাই। তবু পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়-প্রার্থীদের প্রধান দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গকেই লইতে হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও তাহাই হইবে। কেন্দ্র হইতে ৬ কোটি টাকা বা তাহারও বেশী আর্থিক সাহায্য পাওয়া গেলেও এবং সে টাকা অপব্যয় না হইয়া পুরোপুরি সদ্ব্যয় হইলেও তদ্বারা পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র অর্থনীতিকে জনবাহুল্যের বিপদ হইতে রক্ষা করা যাইবে না। এইরূপ অসংখ্য সর্ব্বহারাকে মানুষের মত জীবনধারণের সুযোগ দেওয়া বহুব্যয়সাধ্য ও অত্যন্ত কঠিন কাজ। গত ২৪শে মার্চ্চ পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত জে সি গুপ্তের একটি প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী ডাঃ রায় বলিয়াছেন যে ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে আশ্রয় ও পুনর্বসতির জন্য সরকারের ব্যয় হইয়াছে ৪ কোটি টাকার কিছু বেশী। ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই সমস্যার অনেক বেশী ব্যাপকতা আশঙ্কা হয়। কাজেই এইরূপ ক্রমবর্দ্ধমান প্রচণ্ড সমস্যা সমাধানের উপযোগী ব্যবস্থা সরকারই বা কেমন করিয়া করিবেন? বর্তমানে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারকে যে সাহায্য করিতেছেন, তাহার মূল্যও অপরিমেয়। এই বেসরকারী সাহায্য বন্ধ হইলে সরকার নিঃসন্দেহে অধিকতর বিপন্ন হইবেন। যদিও কেন্দ্রীয় সরকায় পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থী সমস্যার উপর বর্ত্তমানে যুদ্ধকালীন সমস্যার গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন, তবু সমগ্র আশ্রয় ও পুনর্বসতি ব্যবস্থা এপর্য্যন্ত চলিতেছে পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া। পশ্চিম পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের জন্য বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যস্থতায় যে আগ্রহ দেখাইয়াছিল, এক্ষেত্রেও সেইরূপ আগ্রহের একান্ত প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের আত্মরক্ষার পক্ষে বর্ত্তমান পরিস্থিতি ভয়াবহ। কেন্দ্রীয় সরকার আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন বলিয়া পশ্চিম পাঞ্জাবের আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বসতি বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে এবং সাফল্যজনকভাবে সম্ভব হইয়াছে। পূর্ব্বপাঞ্জাব ও পূর্ব্বপাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্য ছাড়া যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লী, মধ্যভারত, মৎসপ্রদেশ, রাজপুতানার রাজ্যগুলি, বিন্ধ্যপ্রদেশ এবং বোম্বাই—ইহাদের প্রত্যেকটিতে ৫০ হাজার হইতে ১ লক্ষ লোকের স্থান হইয়াছে। পশ্চিম বাঙ্গলায় এখনই এক বর্গমাইলে ৮৫০জনের মত লোক বাস করে। এই প্রদেশ খাদ্যশস্যের হিসাবে মোটেই স্বাবলম্বী নয়। বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে এ তুলনায় প্রতি বর্গমাইলে বাস করে যথাক্রমে ২৭৩, ২৯১, ৫১৮ ও ৫২১জন। এমন কি সমৃদ্ধ বেলজিয়াম, ব্রিটেন, জাপান, জার্ম্মাণী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাইল পিছু জনসংখ্যার ঘনত্ব যথাক্রমে ৭১০, ৭০৩, ৪৮২, ৩৭৩ ও ৪৩। কাজেই এরূপ জনবহুল এবং খাদ্যের হিসাবে ঘাটতি পশ্চিমবঙ্গের উপর যদি জনতার চাপ পড়ে তাহা হইলে সহস্র সরকারী শুভেচ্ছা বা আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভাঙ্গিয়া পড়িবেই। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যাহারা উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছে তাহাদের মানসিক বল সংরক্ষণের জন্য অবিলম্বে উন্নততর আহার, বাসস্থান ও সাহায্যের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে এবং সেই দায়িত্বের অধিকাংশ পশ্চিম বঙ্গ সরকারকেই লইতে হইবে। কিন্তু স্থায়ীভাবে আশ্রয়প্রার্থী সমস্যার মীমাংসার কথা যখনই বিবেচনা করা হইবে, তখনই এই আশ্রয়প্রার্থীদের মাত্র একাংশের দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়া বাকী আশ্রয়প্রার্থীদের ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দের পশ্চিমপাঞ্জাবের শরণার্থী সমস্যা সমাধানের ভিত্তিতে অবিলম্বে অন্য ভারতীয় প্রদেশগুলিতে ছড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করা দরকার। অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলা নিষ্প্রয়োজন যে, পশ্চিম বাংলা ব্যতীত অন্য কোন প্রদেশে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির সময় তাহাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি বা সামাজিক জীবন যাহাতে বিচ্ছিন্নতার জন্য বিপর্য্যস্ত হইয়া না যায়, তৎপ্রতি ও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইরূপ আশঙ্কার জন্যই আশ্রয়প্রার্থীরা বিপন্ন হইয়াও বর্ত্তমানে অন্য প্রদেশে যাইতে কেমন উৎসাহ পাইতেছে না। যাহা হউক, সরকারের এখন সবদিক মানাইয়া ব্যবস্থা করা উচিত। সত্য কথা বলিতে গেলে—পূর্ব্ববঙ্গের দুঃস্থ ভাই বোনেদের আর্ত্তনাদে পশ্চিম বাঙ্গলার নিজস্ব হাজার সমস্যা আজ চাপা পড়িয়া গিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীদের বসবাসের সম্ভাব্যতা ও এই করুণ পরিস্থিতির জন্যই বর্ত্তমানে বিচার করা যাইতেছে না; তবু যাঁহাদের হাতে রাষ্ট্রের ভালমন্দের ভার, তাঁহাদিগকে সর্ব্বনাশা ভবিষ্যত এড়াইবার জন্য সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইতেই হইবে। স্পর্দ্ধিত পাকিস্তানের সম্বিৎ ফিরাইতে ইহার বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা হিসাবে যুদ্ধ ঘোষিত হয় ভালই, যদি কোন কারণে এই যুদ্ধ ঘোষণা বিলম্বিত বা অসম্ভব হয়, আশ্রয়প্রার্থী সমস্যার অনিবার্য্য প্রসারের উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ না করা পশ্চিমবঙ্গের আত্মরক্ষার প্রশ্নের হিসাবে মারাত্মক হইবে। ২৬।৩।৫০

নয়

কালা-পুথ্‌রি নাম বটে, কিন্তু শাদা কালো কোনো পুকুরেরই নিশানা নেই কোথাও। কোনো একদিন হয়তো ছিল, কিন্তু কবে মজে বুজে গিয়ে একাকার হয়ে গেছে বরিন্দের এই ঢেউ-খেলানো মাটির সঙ্গে। তবু কালা-পুথ্‌রি নামের এই অঞ্চলটাই অপেক্ষাকৃত সমভূমি। রৌদ্রদগ্ধ রুক্ষতা চোখে লাল ধুলোর ঝাপটা ছুঁড়ে মারে না, শুষ্ক শূন্যতা মুখর হয়না ক্ষুধার্ত শকুনের কান্নায়। কিছু আম-কাঁটালের ছায়া আছে, কয়েক ঝাঁড় বাঁশ আছে; দু একটা নারকেল গাছও আছে—তবে ফলন ভালো হয় না, ডাবগুলো শাঁসে জলে পুরন্ত হয়ে উঠবার আগেই কাঠ-বেড়ালীতে খেয়ে শেষ করে দেয়। কখনো কখনো আকন্দ ফুলের গন্ধ আসে, বুনো ভাঙের ঝোপে ঝোপে ঘোরে নেশাগ্রস্ত গিরগিটি, বসন্তের বাতাসে আকুল ভাঁট ফুলের বনে মরা মাটির স্বপ্নকামনার মতো রঙীণ প্রজাপতি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায়।

আহীরদের পাড়ার সঙ্গে স্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে একটা। রুক্ষ, উত্তপ্ত উদগ্র জীবন নয়--চিরপরিচিত বাংলাদেশের মধুমান বিশ্রান্তি। ভাং আর গাঁজার নেশায় রাত দুটো পর্যন্ত উদ্দাম আনন্দে গান গায়না এরা; বিকেলের আলো নেববার সঙ্গে সঙ্গে এরা যে রেড়ীর তেলের দীপ জ্বালায়, পাংশু তারাগুলো আকাশে শাণিত হয়ে ওঠবার আগেই সে প্রদীপ নিবিয়ে স্বপ্নহীন ঘুমের মধ্যে এলিয়ে পড়ে এরা। স্বপ্নহীন? না—ঠিক বলা হয় না। রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমের ঘোরে নতুন চষা মাটির মিষ্টি গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে এরা স্বপ্ন দেখে—বোরোধান মঞ্জুরীর ভারে ভেঙে পড়ছে, স্বপ্ন দেখে—মেঘে ছাওয়া আকাশের সীমায় সীমায় একাকার হয়ে গেল, মেঘবরণ গমের ক্ষেত।

কিন্তু রাত্রের স্বপ্নের বুকে দিনের ধারালো আলো এসে বিঁধতে থাকে একটার পর একটা সাঁওতালী তীরের মতো। বাঘের থাবার মতো ক্ষেতের ফসলে হাত পড়ে মহাজনের—লোভ নামে জমিদারের। তাও সইছিল এতকাল—এই-বারে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

কালা-পুথ্‌রি এবং আশে পাশে আরো প্রায় ছোট বড়ো পনেরো খানা গ্রাম নিয়ে তুরীদের এলাকা। এই গ্রামগুলির দুপাশে দু হাজার বিঘে ধানী জমি। আর এই মাঠের মধ্য দিয়ে সরীসৃপ তির্যকতায় প্রবাহিত হয়ে গেছে কামারহাটির ডাঁড়া। একটি ছোট সরু খাল—গরমের দিনে শুকনো খট্‌খটে হয়ে থাকে, কোথাও কোথাও এক হাঁটু কাদাব মধ্যে বাড়তে থাকে ব্যাং আর গজাল মাছের সংসার; কিন্তু ডাঁড়ার পরাক্রম দেখা দেয় বর্ষার সময়। হঠাৎ একদিন ঘোলা জলের স্রোত পাক খেতে খেতে ছুটে যায় তার ভেতর দিয়ে—শুকনো ঘাস পাতা আর শ্যাওলা তীরের মতো বয়ে যায় ফিরিঙ্গিপুর আর হাঁসমারীর বিলের দিকে।

এর আগে তুরীরা মাছ ধরত ডাঁড়ায়, নতুন ঘোলা জল বয়ে আসতে দেখলে খুশি হয়ে উঠত তাদের মন। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে বছরের পর বছর ধরে ডাঁড়া নিচ্ছে সর্বনাশীর মূর্তি। নদীর মুখের দিকটায় বালি পড়ে পড়ে ক্রমশ তার ধারা খুঁজছে একটা নতুন মুক্তির মুখ,—প্রতি বছর ডাঁড়া দিয়ে আরো বেশি, আরো বেশি করে জল নামছে। এখন বারোমাসই ডাঁড়ায় জল থাকছে, কোথাও কোথাও এক মানুষ পর্যন্ত। সন্দেহ হচ্ছে ডাঁড়ার মধ্য দিয়েই নদী তার নতুন পথ কেটে নিতে চায়।

ফল হয়েছে মারাত্মক। ডাঁড়ার সংকীর্ণ খাতে অত অজস্র জল আর ধরছে না, দুকূল ছাপিয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে, বরবাদ করে দিচ্ছে দু হাজার বিঘে জমির ফসল। কিন্তু বিশাল হাঁসমারী আর ফিরিঙ্গিপুব বিলের জলকরের লোভে জমিদার ভৈরব নারায়ণ এই ডাঁড়ার মুখ বন্ধ করতে রাজী নন। আম কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায়, আকন্দ আর ভাঁট ফুলের গন্ধে সমাকুল ঘুমন্ত গ্রামগুলিতে তাই এসে লেগেছে আহীরপাড়ার আগ্নেয় উত্তাপ।

শুধু আহীরপাড়া নয়। প্রত্যক্ষ ইন্ধন এসেছে জয়গড় মহল থেকে।

রাজবংশীরা কিষাণ সমিতি গড়েছে সেখানে। ভৈরবনারায়ণের তরফ থেকে এক একটা ঘা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে ঠিকরে পড়ছে আগুনের ফুলকি। এক আই-এ পাশ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার নগেন সরকার বাঁকা বাঁকা কথা কইতে শিখেছে জমিদারের লোকের সঙ্গে। ইস্কুল বসিয়েছে চাষাদের ভেতরে। শুধু তাই নয়। ভৈরবনারায়ণের কনিষ্ঠ কুমার বাহাদুরের অন্নপ্রাশনে একটি বেগার আসেনি জয়গড় মহল থেকে, আসেনি এক মুঠো বাড়তি নজরাণা। নগেন সরকারের কিষাণ সমিতি ঠিক করেছে—ন্যায্য পাওনা-গণ্ডার একটি পয়সা বেশি দেবেনা জমিদারকে।

সেই নগেন ডাক্তার কাঁচা মাটির এবড়ো-খেব্ড়ো রাস্তায় বাইশ মাইল ভাঙা সাইকেল চালিয়ে এসেছিল কালা-পুখ্রিতে। পঞ্চায়েতের পরামর্শটা তারি। তারপর—

তারপরেই কালা পুখ্রিতে ধূমায়িত হইয়াছে অগ্নি সম্ভাবনা।

সোনাই মণ্ডলের বাড়ির উঠোনে হয়েছে আজকের বৈঠকের আয়োজন। রেড়ীর তেলের প্রদীপ জ্বলছেনা এখন, অন্ধকার উঠোনটায় আরক্তিম হয়ে আছে মাটিতে পোঁতা তিনটে মশালের আলো। নগেন ডাক্তার উপস্থিত থাকতে পারেনি, কী একটা বিশেষ কাজের তাড়ায় ফিরে গেছে জয়গড়ে। মশালের আলোয় ভূতের মতো ত্রিশ চল্লিশটি মানুষ রঞ্জনের জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে।

ঝম ঝম করছে রাত। কোনো বাঁশ ঝাড়ের ঘুণে ছিদ্র করা বেণুরন্ধ্র থেকে এলো-মেলো হাওয়ায় উঠছে বেসুরো বাঁশির স্বর। এই চৈত্র মাসেও আমগাছগুলোতে কখনো কখনো ঝপ ঝপ করে বাদুড় পড়ছে, কচি আমের কড়ার সন্ধানেই কিনা কে জানে। বাতাসে বাতাসে মশালের শিখাগুলো দুলে দুলে চঞ্চল ছায়া নাচিয়ে যাচ্ছে, আর মানুষগুলি স্তব্ধতার মধ্যে তলিয়ে বসে আছে। যেন কোনো দেবমন্দিরের সামনে এসে একটা বিচিত্র পবিত্রতার প্রভাবে তারা অভিভূত হয়ে গেছে, কারো মুখে কোনো কথা আসছে না।

—ধূ—ধূ—ধূম্—

কোথায় একটা হুতুম প্যাঁচা ডাকল। ইন্ধন ফুরিয়ে গিয়ে দপ্ করে নিবে গেল একটা ম্লান মশাল। উঠোনের চঞ্চল আলোটা আরো বিবর্ণ পিঙ্গল হয়ে উঠল। তখন যেন হঠাৎ কথা খুঁজে পেয়ে নড়ে চড়ে বসল একজন।

—ঠাকুরবাবু তো এখনো এলনা।

সকলের মনে ওই একটি জিজ্ঞাসাই জমে উঠছিল এতক্ষণ ধরে। তাই কয়েক মুহূর্ত জবাব দিলেনা কেউ। তারপর আর একজন একটা বিড়ি ধরিয়ে বললে, কালোশশী খবর দিতে গেছে।

—রেখে দাও তোমার মেয়েমানুষের কারবার। তারপর আবার কালোশশী!—প্রথম লোকটি বললে অবজ্ঞাভরা গলায়।

—না, ঠিক যাবে কালোশশী। কথার খেলাপ করবেনা।

—কী করে বুঝলে? বিশ্বাস আছে নাকি ওকে?

—অবিশ্বাসের কী হল? কালোশশী সব পারে—বিড়িতে একটা জোরে টান দিয়ে, আগুনটাকে একেবারে আঙুলের কাছাকাছি নামিয়ে এনে প্রত্যয়ের সঙ্গে বললে দ্বিতীয়জন।

—কেন রং ধরেছে বুঝি চোখে?—আবহাওয়াটা এতক্ষণে সহজ হয়ে আসছিল। তারই সুযোগ নিয়ে চাপা গলায় টিপ্পনি কাটল কোনো তৃতীয় জন।

—সামলে ভাই সামলে—আর একটি কণ্ঠ।

—ওর ঝাঁপিতে তাজা তাজা গোখরো আর চন্দ্রবোড়া থাকে। বিষদাঁত কামায়না কালোশশী। ছেড়ে দিলেই কিন্তু ছোবল মারবে—তৃতীয় জন আবার বললে রসানি দিয়ে।

দুটো হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে এতক্ষণ যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল সোনাই মণ্ডল। ভাবছিল, না স্বপ্ন দেখছিল সেই বলতে পারে। হঠাৎ মুখ তুলে চাপা গলায় ধমক দিলে একটা।

—এই কী হচ্ছে এসব? হাসি-মস্করার সময় নাকি এখন?

মুহূর্তের মধ্যে আবার স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল সমাবেশের ওপর। ঠিক কথা—অন্যায় হয়ে গেছে। দেবমন্দিরের

পবিত্রতার মাঝখানে বসে সুযোগ নিয়েছি অন্যায় প্রগল্‌ভতার।

আবার চারদিকে ঝম ঝম করে চলল—বরেন্দ্র ভূমির লাল মাটির ওপরে ঘনীভূত রাত্রি। বেসুরো বাঁজি বাজতে লাগল ঘুণে-কাটা বাঁশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। কচি আমের অম্ল-রসে মুখের স্বাদ বদল করে বাদুড় উড়ে চলল নতুন কোনো খাদ্যের সন্ধানে।

একজন উঠে পড়ল।

—মশালটা নিবে গেছে। যাই আর একটা জ্বালিয়ে আনি।

ছিঁড়ে যাওয়া কথার সূত্রটায় আর একবার জোড় লাগল। আলোচনার সূচনা যে করেছিল, সে এতক্ষণে তিক্ত গলায় বললে, না—মেয়েমানুষের ওপরে ভরসা করে বসে থাকাই অন্যায় হয়ে গেছে। নিজেদের কাউকে পাঠালেই ভালো হত।

কালোশশীর তরফে যে ওকালতি করছিল এবারে নীরব হয়ে রইল সে। তার নিজের মনেও বোধ হয় খটকা বেধেছে একটু। সত্যিই তো, কী বলা যায় কালোশশীর মতিগতি? কোন্ দিকে যেতে হয়তো কোথায় চলে গেছে নিজের খেয়ালে। কোন্ পদ্মবিলের ধারে সাপ ধরতে গিয়ে হয়তো নিজের সাপের ঝাঁপির ওপরেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে তালগাছের তলায়; ঘুমের মধ্যে শুনছে কানে কানে প্রেমের চাপা ফিসফিসানির মতো নতুন-ধরা কোনো কাল নাগের গর্জানি।

যে উঠে গিয়েছিল, সে আর একটা নতুন মশাল জেলে নিয়ে এল, পুঁতে দিলে নিবে যাওয়া মশালটার জায়গায়। তাজা আর তেজী আলোয় উঠোনটা আভাসিত হয়ে উঠল নতুন করে।

—তাই তো, ঠাকুরবাবুর আসতে বড্ড দেরী হচ্ছে।—উদ্বিগ্ন মন্তব্যটা ছেড়ে দিলে একজন!

—ও আর আসবেনা। মিছিমিছি বাবুদের কথায় ভুলে এতখানি রাত জাগাই সার।—একটা মস্ত হাই তুলে গামছার খুঁটে দু ফোঁটা চোখের জল মুছে নিলে প্রথম লোকটি। তার গলায় বিস্বাদ বিরক্তিটা এবার স্পষ্ট প্রকটিত হয়ে পড়ল, এতটুকুও আর ছাপা রইল না।

—মাধো! কড়্‌কড়্‌ করে যেন বাজ ডেকে উঠল সোনাই মণ্ডলের গলায়—সারা সভাটার ওপর দিয়ে আতঙ্কের চমক বয়ে গেল একটা; অত বাবুগিরি থাকলে জমায়েতে আসতে নেই।

মাধো অথবা মাধব কিন্তু বশ মানল না। এবার আরো তিক্ত গলায় বললে, আমাদের বাবুগিরী তুমি কোথায় দেখছ মোড়ল? সেই সন্ধ্যে থেকে বসে আছি, এখন তিন পহর রাত হতে চলল। এখনো দেখা নেই। ডাক্তারবাবু তো উস্কানি দিয়ে সরে পড়ল, ঠাকুরবাবু হয়তো নাক ডাকিয়ে আরামে ঘুমুচ্ছে এতক্ষণ! মাঝখান থেকে সারারাত বসে বসে আমরা মশা তাড়াচ্ছি।

—দু ক্রোশ ঘাঁটা পার হয়ে আসতে হবে ঠাকুরবাবুকে। চারটিখানি কথা নয়।

মাধব তাচ্ছিল্য-মাখানো স্বরে বললে, তাতিয়ে দেবার বেলায় তো বাবুদের হামেশা গাঁয়ে পা পড়ে আর কষ্ট করার বেলায় বুঝি নয়? তখন আমরা।

সোনাই মণ্ডল আবার ভয়ঙ্কর কণ্ঠে বললে, মাধো!

—অত ভয় দেখাচ্ছ কিসের? সত্যি যা তা মুখের ওপর বলব—তার উত্তর এল মাধবের।

—আঃ থাম্ থাম্ মাধব—

—কেন বাজে বক্‌বক্ জুড়ে দিলি?

—চুপ ক'রে বসে একটা বিড়ি খা বরং—

কথার গতি লক্ষ্য করে শঙ্কিত হয়ে উঠছে সবাই। পাঁচ সাতটি কণ্ঠে আবহাওয়াটাকে লঘু করে তোলবার প্রয়াস মুখর হয়ে উঠল।

কিন্তু শয়তান চেপে বসেছে মাধবের মাথায়। মাধব বললে, আমরা তো এসব ঝামেলার ভেতর পা বাড়াতে চাইনি। কী হবে খামোকা জমিদারকে ঘাঁটিয়ে? অসুবিধে হচ্ছে, জমিতে জল ঢুকছে? বেশ, না পোষায় উঠে যাও এখান থেকে। নতুন জমিদারিতে গিয়ে পত্তনি নাও। কিন্তু বাবুরা সব এটা সেটা বুদ্ধি সেঁধিয়ে দেবে মগজে, আর কাজের বেলা কারো টিকিটি দেখবার জো নেই। যা খুশি তোমরা করো, আমি আর নেই এসবের ভেতরে।

—হতভাগা, উজবুক, বলছিস কী এসব?—দাঁতে দাঁত চেপে বললে সোনাই মণ্ডল।

—যা বলছি, পাকা কথাই বলছি। তোমাদের বুদ্ধিতে

আর আমি নেই। জমিদারের দৃষ্টিতে পড়ে ধনে-প্রাণে যাব, তখন ডেকেও জিজ্ঞেস করতে আসবে না বাবু ভাইয়েরা।

—এই, চুপ কর্।

—কী বলছিস যা তা?

—এতো বেইমানি!

সমাবেশের মধ্য থেকে আবার বিমিশ্র গলায় কলরব উঠল।

—কী, বেইমানি!—এবার গর্জে উঠল মাধব, সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল।—এত করলাম তোমাদের জন্তে আর এখন হয়ে গেলাম বেইমান! বেশ, সেই কথাই ভালো। তোমরা যা খুশি তাই করো। দাঁড়ায় বাঁধ বাঁধো, জমিদারের সঙ্গে মারামারি করো, ভিটে মাটি শুদ্ধু উচ্ছন্নে যাও, তোমাদের দলে আমি নেই। এই আমি তোমাদের পঞ্চায়েত ছেড়ে চললাম, আর কোনোদিন আমায় ডেকোনা।

—মাধো—মাধো—

—বেইমান—

—মাধো—

কিন্তু এক মুহূর্ত আর দাঁড়ালো না মাধব, একটি ডাকেরও সাড়া দিলে না। এক গাছা লাঠি পড়েছিল হাতের কাছে, সেইটে কুড়িয়ে নিয়ে হন্ হন্ করে হেঁটে চলে গেল বাইরে অন্ধকারের মধ্যে।

আচমকা, অপ্রত্যাশিত ভাবে যেন ঘূর্ণি হাওয়া বয়ে গেল একটা। চক্ষের নিমেষে ভেঙে চুরে একাকার করে দিযে গেল সমস্ত। ক্রোধে, বিস্ময়ে আর নিরাশায় সভা মূক হয়ে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর আত্মস্থ হয়ে, আগুনঝরা গলায় সোনাই বললে, থাক।

—কী সাংঘাতিক মানুষ!

—যাবার জন্তেই ছটফট করছিল। ফাঁক পেয়ে পালিয়ে গেল।

—যাবেই তো। এসব কাজে কি আর সমান বুকের পাটা থাকে সকলের!

—ও আসবে কেন আমাদের ভেতর। ওর ছেলে সহরে গিয়ে কোন্ সাহেবের আর্দালি হয়েছে, ওর এখন মেজাজ গরম। নেহাৎ গাঁয়ে থাকে বলেই লজ্জায় পড়ে এসেছিল।

—বেইমান!

সোনাই মণ্ডল একবার তাকালো সভাটার দিকে। নতুন আনা মশালটার উজ্জ্বল দীপ্তিতে তার মাথার পাকা চুলগুলোকে অস্বাভাবিক সাদা দেখালো। চোখ দুটো চকচকিয়ে উঠল দুখণ্ড আগুনের মতো।

—চুপ, সব চুপ!—অদ্ভুত কর্কশ গলায় সে নির্দেশ দিলে। তার গলার আওয়াজেই যেন চমকে উঠে আবার ধু-ধু-ধুম্ করে আতঙ্কিত জবাব দিলে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা হুতুম প্যাঁচাটা।

ফোঁস ফোঁস করে সাপের মতো কয়েকটা নিঃশ্বাস ফেলল সোনাই মণ্ডল, যেন অনেকক্ষণ ধরে দম আটকে ছিল তার। ভাঁজ করা হাঁটু দুটোকে সে মুঠো করে চেপে ধরলে অসহ্য ক্রোধে, হাতের কাছে মাধবের গলাটা থাকলে নিষ্পিষ্ট হয়ে যেত ওই মুঠোর মধ্যে।

—সব বেইমানেরই বিচার হবে একদিন, তার দেরী নেই। কিন্তু—আগুন-ঝরা চোখ দুটোকে বরিন্দের মাঠের জনশ্রুতির স্কন্ধকাটার সন্ধানী চোখের মতো তীক্ষ্ণতর করে সে সভাটার ওপর আর একবার বুলিয়ে নিলে: তোমাদের কারো যদি অমনি করে পালাবার মতলব থাকে, তা হলে এই বেলা সরে পড়ো। কোনো বেইমানের জায়গা নেই এখানে।

একসঙ্গে মাথা নীচু করে রইল সকলে। মাধবের অপরাধ যেন তাদের সকলকে স্পর্শ করেছে, নিজেদের মনের মধ্যে তাকিয়ে তারা যেন আত্মবিশ্লেষণ শুরু করলে। যেন খুঁজে দেখতে চাইল কোথায় লুকিয়ে আছে ভীরুতা, তলিয়ে আছে মিথ্যে, সঞ্চিত হয়ে আছে বিশ্বাসঘাতকতার কালো কলঙ্ক।

একটা টর্চের আলো সভার ওপর দিয়ে পিছলে গেল।

—কে—কে—কে?

সকলের হয়ে যেন সহস্র কণ্ঠে প্রশ্ন করল সোনাই মণ্ডল। যাদের কাছে লাঠি ছিল, যেন অবচেতন একটা প্রেরণাতেই তারা লাঠিগুলো ধরল মুঠো করে।

—আমি রঞ্জন।

—ঠাকুরবাবু!

—ঠাকুরবাবু এসেছে।

—শালা মাধব থাকলে বুঝতে পারত—

—ব্যাটা বেইমান—

কিন্তু অতগুলো গলার কল-কাকলি কোনো স্পষ্ট অর্থ নিয়ে পৌঁছে দিলে না রঞ্জনের মনের কাছে। মৃদু হেসে সে তাকালো হাতের ঘড়িটার দিকে: রাত একটু বেশি হয়ে গেল। তা আমার দোষ নেই। খেয়ার মাঝি ঘুমুচ্ছিল, একঘণ্টা লাগল তাকে ডেকে তুলতে। সে যাই হোক, এখন তা হলে আমাদের কাজ শুরু করা যেতে পারে।

সোনাই মণ্ডলের পাশেই ঝুপ করে বসে পড়ল রঞ্জন।

—একটু দাঁড়ান ঠাকুরবাবু, আর একটা মশাল জ্বেলে আনি—তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল একজন।

* * * *

কিন্তু কালোশশী ?

জমিদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেঁটে চলেছিল রঞ্জনের পাশাপাশি। যতক্ষণ না বিপজ্জনক অঞ্চলটা পার হয়েছে, ততক্ষণ কেউ কোনো কথা বলেনি। শুধু অন্ধকারের আড়ালে আড়ালে দুটো ছায়ার মতো খানিকক্ষণ নিঃশব্দে পাশাপাশি পথ কেটেছে।

তারপর দূরে যখন জমিদার-বাড়ির আলোটা ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল, দুপাশে রইল শুধু মাথা-সমান-উঁচু বিন্না ঘাসের বন, প্রকৃতি ছাড়া দুজনের মাঝখানে কিছুই আর জেগে রইল না, তখন কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগল রঞ্জনের। অন্ধকারে আরো অদ্ভুত মনে হতে লাগল রহস্যময়ী কালোশশীকে, চারিদিকের ঝিঁঝিঁর ডাকের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে ঝিঁঝিঁ করতে লাগল রক্তের মধ্যে।

—কালোশশী ?—রঞ্জন ডাকল।

জবাব দিল না কালোশশী। যেন নিজের মধ্যে তলিয়ে গেছে।

—কালোশশী ?—রঞ্জন আবার ডাকল।

—কী বলছ ?—যেন ঘুমের ঘোর ভেঙে তাকালো মেয়েটা। রঞ্জনের মনে হল, হাল্‌কা মেঘের আবরণে ঢাকা দুটো ম্লান নক্ষত্রের মতো চকচক করে উঠল কালোশশীর চোখ।

—ঘরে ফিরবি না তুই ? সারা রাত ঘুরবি পথে পথে ?

—ঘর ?—অন্ধকারে কালোশশীর মুখ দেখা গেল না, শুধু কানে এল চাপা একটা হাসির শব্দ।

—তোর মরদ রাগ করবে না ?

কালোশশী আবার হাসল কিনা কে জানে, কিন্তু হাসির শব্দটা এবারে আর শুনতে পাওয়া গেল না। মৃদুকণ্ঠে বললে, না রাগ করবে না। রাগ করার মতো অবস্থাই নেই তার।

—সে কি! কেন ?

—সে এতক্ষণ মদ খেয়ে গোপালপুরের ভুঁইমালী পাড়ায় গিয়ে পড়ে আছে।

—ওঃ!—রঞ্জন চুপ করে গেল। একটা প্রশ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল নিজের মনের মধ্যে। কালোশশীর জন্য কি তার সহানুভূতি বোধ করা উচিত ? উচ্ছৃঙ্খল স্বামীর বিশৃঙ্খল জীবনযাত্রা কি কালোশশীর মনে সঞ্চার করে কোনো গৃহবধূর আর্তি, কোনো পুরলক্ষ্মীর আকুলতা ? অথবা ওদের দাম্পত্যজীবন শুধু কিছুক্ষণের জন্য একটা জৈন-বন্ধন, তারপরেই দুটো সমান্তরাল রেখা ? কোনো-দিন কেউ কারো সঙ্গে মিলবে না, এগিয়ে যাবে নিজেদের নির্বিঘ্ন গতিপ্রবাহে !

তাই তো স্বাভাবিক। দয়াল দাস, পরশুরাম, লক্ষ্মণ সর্দার। লক্ষ্মণ সর্দারের সঙ্গেও আজ আর সুর মিলবে না। এমন কত আসবে, কত যাবে। তাজা সাপ নিয়ে খেলা ভালোবাসে কালোশশী। আজ হয়তো লক্ষ্মণকে নিয়েও তার খেলা শেষ হয়ে গেছে, তাই নিজেই তাকে সে ছুঁড়ে দিয়েছে গোপালপুরের মদের দোকানে, ভুঁইমালীদের পাড়ায় ?

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। দিনকয়েক আগে সাইকেলে করে আসবার সময় পথের মধ্যে যখন দেখা হয়েছিল কালোশশীর সঙ্গে। বলেছিল, ভারী বিপদে পড়েছে পরশুরামের জন্য। সে-সম্পর্কে একবার আলাপ করতে আসবে রঞ্জনের কাছে।

—হাঁারে, পরশুরামের খবর কী ?

—পরশুরাম ?—কালোশশী যেন চমকে উঠল একবার।

—তোকে এখনো শাসাচ্ছে নাকি ?

—নাঃ!—কালোশশী একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলল।

—তোর আশা ছেড়ে দিয়েছে তাহলে ?

কালোশশী আবার চোখ তুলল। আবার হালকা মেঘের আড়াল থেকে চকচক করে উঠল দুটি বিষণ্ণ নক্ষত্র ?

—তা তো জানিনা। তবে তীরে বিষ মাখিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার খোঁজে। কুঁচিলার বিষ, গোখরো সাপের বিষ।

—সে কি কথা !—রঞ্জন ভয়ানকভাবে চমকে উঠল : আর তুই রাত-বিরেতে এমন করে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে বেড়াস ? ভয় করে না তোর ?

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে না কালোশশী। তারপর মাঠ থেকে উঠে-আসা একটা আচমকা হু হু করা হাওয়ায় আলগাভাবে একট কথা ছেড়ে দিলে : না, ভয় করে না। কী হবে ভয় করে ?

—তার মানে ? মরতে ভয় নেই তোর ?

—নাঃ !—আবার আর একটা হু হু করা হাওয়ায় কালোশশীর কথাটা উড়ে চলে গেল। একটা চাপা দীর্ঘ-শ্বাসও কি মিশে গেল তার সঙ্গে।

—এসব আবার কী কথা রে ? তোর হল কী ?—রঞ্জনের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল কালোশশী। তারপর—

অন্ধকারে রঞ্জন এবার আর তার চোখ দুটোকে দেখতে পেল না। নক্ষত্রের আলোটা মেঘের আড়ালে বুঝি একেবারেই ঢাকা পড়ে গেছে। রঞ্জন জানলনা, হঠাৎ কোথা থেকে কয়েক বিন্দু জল এসে জমেছে কালোশশীর চোখের কোনায় কোনায়।

—আচ্ছা বাবু, আমাকে একবার শহরে নিয়ে যাবে ?

একটা বেখাপ্পা প্রশ্ন। রঞ্জন আশ্চর্য হয়ে গেল।

—হঠাৎ আবার শহরে যাবার সখ হল কেন তোর ?

—কী জানি, বল্‌তে পারি না।—ধরা গলায় কালোশশী বললে, আর ভালো লাগে না এমন করে। সারাজীবন খালি কি সাপ ধরেই বেড়াব ? শহরে হয়তো সাপ নেই—সাপ ধরবার জন্ত হাত নিশপিশ করবে না সেখানে। এই সাপের ঝাঁপি ফেলে দিয়ে দিন কয়েক নিজের খুশিমতো ঘর বাঁধব সেখানে।

—কী বলছিস কালোশশী ?

কালোশশী তেমনি ধরা গলায় বললে, না, আর ভালো লাগে না এমন করে। তুমি আমায় নিয়ে চলো বাবু।—জল-ভরা যে চোখ দুটোকে এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না, হঠাৎ তাদের মধ্যে থেকে যেন বিদ্যুতের মতো কী ঝিকিয়ে উঠল : আমি তোমার কাছে থাকব, তোমার সব কাজ করে দেব। সত্যি বলছি বাবু, আমি আর সাপ ধরব না। সাপ ধরতে আর আমার ভালো লাগে না।

এতক্ষণ ধরে জমাট মেঘে বর্ষণ নামল এইবারে। হু হু করে বন্যার মতো অজস্র ধারায় কেঁদে ফেলল কালোশশী।

রঞ্জন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। মাথার মধ্যে একটার পর একটা রক্তের ঢেউ এসে সমুদ্র-গর্জনের মতো ভেঙে পড়তে লাগল। কী বলতে চায়, কী বলতে চায় কালোশশী ? এই অন্ধকার ভরা মাঠের মধ্যে, হু হু করা বাতাসের এই আকুলতায়—কোন্ খান থেকে সরে গেছে একটা পাথরের কবাট ? কোন্ বনস্পতির ছায়া স্বপ্নে নীড়ের কামনা উতরোল করে দিয়েছে বনহংসীর বুকের রক্তকে ?

—কালোশশী !—রঞ্জন ডাকল। নিজের গলার স্বরেই চমকে উঠল সে।

কিন্তু কোথায় কালোশশী ! চক্ষের পলকে একটা ছায়ার মতো মিলিয়ে গেছে রাত্রির অতলান্ত গভীরতায়।

—কালোশশী !

না, কালোশশী কোথাও নেই। বিহ্বলের মতো সামনে তাকালো রঞ্জন। খানিক দূরে একটা আলেয়া এগিয়ে আসছিল তার দিকে ; তার ডাক শুনে যেন থমকে দাঁড়ালো, তারপর দপ্ করে নিবে গিয়ে মিলিয়ে গেল নিশীথ-সমুদ্রের একটা বুদ্বুদের মতো। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালার দুর্গতি—

আজ বাঙ্গালার দুর্গতি দেখিয়া মানুষমাত্রই বিচলিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-পাকিস্তানে ইসলামের নামে যে অমানুষিক তাণ্ডবলীলা চলিতেছে, তাহার বিবরণ দিতে আজ লেখনীও পরাজিত হইয়াছে। যে কথা মানুষ কখনও চিন্তা পর্য্যন্ত করে নাই, যে কথা চিন্তায় উদিত হইলে মানুষ ভয়ে ও ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিত, আজ সেই সকল বিষয় কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিয়া মানুষ তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তনের কথা চিন্তা করিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র হিন্দু অধিবাসীদের উপর তাণ্ডব রূপে নির্ম্মম অত্যাচার চলিয়াছে—গত ২০শে ডিসেম্বর খুলনা বাগেরহাটে যে আগুন জ্বলিয়াছে, আজ তাহা সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইয়া শুধু হিন্দুর সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে না, তাহার ফলে দুষ্কৃতকারীদেরও ধ্বংসের কারণ হইতেছে। ঢাকা সহর, ফরিদপুর জেলার বহু স্থান ও বরিশাল জেলার সর্ব্বত্র যে সকল ঘটনার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া কোন লোকই স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইতেছে, তাহার গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া তাহাকে আশ্রয়হীন অবস্থায় পথে ঘাটে শৃগাল কুকুরের মত হত্যা করা হইতেছে, তাহাদের ধন সম্পত্তি লুঠ করিয়া ভাগ করিয়া লওয়া হইতেছে, মাতার সম্মুখে সন্তানকে হত্যা করিয়া চরম নৃশংসতার পরিচয় দেওয়া হইতেছে, নারীধর্ষণ নিত্যকার ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। হিন্দু যে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পলায়ন করিয়া আসিবে তাহারও উপায় নাই, কয়লার অভাবে ষ্টীমার যাতায়াত প্রায় বন্ধ, ট্রেণের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, মধ্যপথে ট্রেণ থামাইয়া হিন্দু হত্যা চলিতেছে, লুণ্ঠন চলিতেছে। গত ৩ মাসেরও অধিককাল হইয়া গেল, পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র এই ধ্বংসলীলা চলিয়াছে, প্রায় ১০ লক্ষ হিন্দু নিজ পিতৃভূমি ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ গভর্ণমেণ্ট ইহার প্রতীকার ব্যবস্থা না করিয়া বরং এই কার্য্যে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। এমন সব ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা মানুষ মানুষের কাছে বলিতে পারে না, তাহা অত্যাচারিতের মুখ দিয়া প্রকাশিত হওয়াও কষ্টকর। ভারতের প্রধান মন্ত্রী এই খবর পাইয়া মার্চ মাসে ২ বার

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত সর্ব্বত্যাগী উদ্বাস্তুদের সাহায্যরত ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বেচ্ছাসেবকগণ—রাণাঘাট সাহায্য কেন্দ্র

কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, অত্যাচারিতদের মুখে অত্যাচার কাহিনী শুনিয়া গিয়াছেন ও এই অবস্থার প্রতীকারের জন্য

ভারত সেবাশ্রম সংঘের সেবাকার্য্য—রাণাঘাট সাহায্য কেন্দ্রে আশ্রয়প্রার্থীদের বস্ত্রাদি প্রদান

সাধ্যমত ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আইনানুগ ভাবে সকল চেষ্টাই করিয়া দেখিবেন এবং শেষ পর্য্যন্ত সকল চেষ্টা বিফল হইলে তিনি শেষ ব্যবস্থা করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। পশ্চিম বাংলার একদল লোক যুদ্ধ করিয়া পূর্ব্ব বাংলাকে দখল করিবার জন্য বার বার পণ্ডিতজীকে অনুরোধ করিয়াছেন এবং পণ্ডিতজী এখনও যুদ্ধ-ব্যবস্থা না করাব জন্য তাঁহারা অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। দুর্দশা দেখিয়া লোকের এরূপ অধীর হওয়া আদৌ বিচিত্র নহে—কিন্তু তাঁহাদের সকল দিক বিবেচনা করিয়া পণ্ডিতজীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে আমরা অনুরোধ করি। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, প্রয়োজন হইলে তিনি যুদ্ধে নামিতেও পশ্চাদপদ হইবেন না। কিন্তু এখনও পূর্ব্ববঙ্গে প্রায় এক কোটি হিন্দু বাস করিতেছেন। গত কয়মাসে হয়ত কয়েক সহস্র হিন্দুকে হত্যা করা হইয়াছে—আজ যদি যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়, তবে ঐ ১ কোটি হিন্দুর একজনকেও জীবিত রাখা হইবে না। সে জন্য পণ্ডিতজী এখান হইতে সশস্ত্র সৈন্য দ্বারা রক্ষিত জাহাজ পাঠাইয়া চাঁদপুর গোয়ালন্দ, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, বরিশাল, মাদারীপুর, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের জাহাজঘাট হইতে হিন্দু আনয়নের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ সকল জাহাজঘাটে ষ্টীমার ছিল, কিন্তু কয়লা না থাকায় ষ্টীমারগুলি অচল ছিল। এখান হইতে কয়লা পাঠাইয়া তাহাদের সচল করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিবার জন্য অত্যাচারিত হিন্দুর দল ঐ সকল ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া জমা হইয়াছিল—তাহারা এখন জাহাজ পাইয়া এদেশে চলিয়া আসিতেছে। বিনা ভাড়ায় জাহাজ পাইয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিবার সুযোগ পাইলে আরও

ভারত সেবাশ্রম সংঘের রাণাঘাট আশ্রয় শিবিরের রন্ধনশালা

বহু লক্ষ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিবে। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র হিন্দুগণ অর্থাভাবে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিবার সাহস করে নাই—তাহারা নিরুপায় হইয়া পাকিস্তানীদের হাতে অত্যাচারিত হইতেছে। যে সকল হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের একাংশকে বিশেষ ট্রেণের ব্যবস্থা করিয়া প্রান্তিক রাষ্ট্রসমূহে প্রেরণ করা হইতেছে, বাকী অংশকে সকল প্রকার সাহায্য দানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার হইতে পণ্ডিতজী ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং সে জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি সচিব শ্রীমোহনলাল সাকসেনা সে জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে থাকিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং কেন্দ্র হইতে একদল সরকারী কর্ম্মচারী আসিয়া পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্ম্মচারীদের সহিত একযোগে কাজে লাগিয়াছেন। কিন্তু দুর্দ্দশার পরিমাণ এত অধিক যে, সাহায্যের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি করা যাউক, কোন সাহায্যই পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে জাতির দুর্নীতিপরায়ণতা কিরূপ বাড়িয়াছে, তাহাও চিন্তার বিষয় হইয়াছে। সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হইলে, শুধু দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিরা তাহা পাইবার জন্য ব্যগ্র হন না—যে সকল পূর্ববঙ্গবাসী বহুকাল পূর্বে এদেশে আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও একদল লোক সুযোগ বুঝিয়া সাহায্য গ্রহণ করিতে অগ্রসর হন। তাহার ফলে অনেক সময় অপাত্রে সাহায্য অর্পিত হয় এবং বহু প্রকৃত প্রার্থী সাহায্য লাভে সমর্থ না হইয়া দুর্দ্দশা ভোগ করিতে থাকে। সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে। প্রকাশ, গত বৎসর সাহায্য বণ্টন ব্যাপারে দুর্নীতির অভিযোগে বহু সরকারী কর্ম্মচারীকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। যে সকল প্রতিষ্ঠান সাহায্য বণ্টনের ভার পাইয়াছে, তাহাদের কর্ম্মীদের মধ্যে দুর্নীতি দেখা গিয়াছে। আজ জাতির এই অধঃপতন দেখিয়া সকল লোকই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে।

সে যাহাই হউক না কেন, সরকার পক্ষ হইতে বর্ত্তমানে যে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা যাহাতে ভাল করিয়া বণ্টিত হয় ও প্রকৃত প্রার্থীরা সাহায্য লাভ করে, সে বিষয়ে প্রত্যেকের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার—

স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টকে শিক্ষা ব্যবস্থা লইয়া এক দারুণ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসায় তাহাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইতেছে—তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র ও নিরাশ্রয়। সে জন্য সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগ হইতে সর্ব্বত্র বহু টাকা দান করা হইতেছে। কলিকাতা ও সহরতলী অঞ্চলে যে সকল উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় ছিল, তাহাদের ছাত্রসংখ্যা অপ্রত্যাশিত ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সে সকল বিদ্যালয়ে স্থানাভাব হইয়াছে—আর বহু স্থানে নূতন উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সেগুলি পরিচালনা করা আরও কঠিন হইয়াছে। অথচ গত ২ বৎসরে দেশের আর্থিক অবস্থার ক্রমাবনতির ফলে জনগণের পক্ষে শিক্ষাপ্রচারে অর্থ সাহায্য করা সম্ভব হইতেছে না। ইহাই শিক্ষাসংস্কার ব্যবস্থার উপযুক্ত সময়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে বিষয়ে কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। ব্যবস্থায় প্রথমে যতই গলদ দেখা যাউক না কেন, তাহা সুসম্পাদিত হইলে তাহা দ্বারা দেশবাসী ভবিষ্যতে যে উপকৃত হইবে, সে বিষয় সন্দেহ নাই। সর্ব্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রবর্ত্তনের দ্বারা নূতন শিক্ষা পদ্ধতি চালানো হইতেছে। বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থা আজ হয় ত ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ক্রমে যে তাহা সম্পূর্ণতা লাভ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কলেজী শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি সংশোধনেরও চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন কলিকাতায় কয়েকটি কলেজে ছাত্র সংখ্যার আধিক্য দেখিয়া তাহাদের পরিচালনার নিন্দা করিয়াছেন। সে জন্য বর্ত্তমান বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের ১৮টি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়কে কলেজে উন্নীত করা হইতেছে ও সে সকল বিদ্যালয়ে আই-এ ও আই-এস্‌সি পড়াইবার ব্যবস্থা হইতেছে। তাহা ছাড়া গ্রামের ১৮টি কলেজে অর্থ সাহায্য দান করিয়া তাহাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা উন্নততর করিবারও ব্যবস্থা হইতেছে। কারিগরি শিক্ষা দানের জন্য আসানসোলের নিকট ধাদকা, শিবপুর ও জলপাই-গুড়ীতে নূতন বিদ্যালয় খোলা হইতেছে এবং হুগলী ও কৃষ্ণনগরের কারিগরি-শিক্ষা বিদ্যালয়ের সংস্কারের ব্যবস্থা

হইতেছে। সে জন্য ভারতগভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান বর্ষে (১৯৪৯-৫০) ২০ লক্ষ টাকা ও আগামী বর্ষে (১৯৫০-৫১) ৫০ লক্ষ টাকা পশ্চিমবঙ্গকে ঋণ দান করিতে সম্মত হইয়াছেন। এই সকল বিদ্যালয় যাহাতে সুপরিচালিত হইয়া দেশবাসীর উপকারে সমর্থ হয়, সে জন্য সকলের এই কার্য্যে সাহায্য ও সহযোগিতা দান প্রয়োজন। দেশের দলাদলি ও দুর্নীতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে। যেখানে সেরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইবে, কঠোর হস্তে সেখানে সরকারী শিক্ষা বিভাগকে কর্ত্তব্যে অগ্রসর হইতে হইবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহকে যে অর্থ দান করা হইতেছে, সে অর্থ সদ্‌ভাবে ব্যয়িত না হইলে, তাহা দেশের পক্ষে দারুণ অমঙ্গল সৃষ্টি করিবে। দেশকে উন্নতির পথে চালিত করিবার আজ যে স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, আমরা যেন স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া তাহার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি না করি, দেশবাসী সকলের প্রতি ইহাই আমাদের নিবেদন।
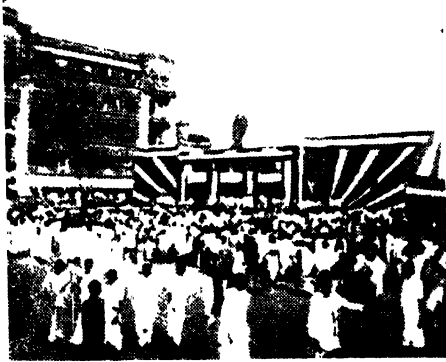
নেতাজীর জন্মদিনে গৃহীত একটি ফটো—মহাজাতি সদনের সম্মুখভাগ
ফটো—শ্রীতড়িৎ সাহা

কলিকাতায় প্রধান মন্ত্রী—

ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু গত মার্চ্চ মাসে ২ বার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। প্রথম বারে তিনি ৬ই মার্চ্চ সোমবার বেলা ১১টায় কলিকাতায় আসিয়া বৃহস্পতিবার ৯ই মার্চ্চ বিকালে চলিয়া যান। দ্বিতীয়বার তিনি ১৪ই মার্চ্চ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় কলিকাতায় আসেন ও ৩ দিন থাকিয়া চলিয়া যান। পণ্ডিত নেহরু কলিকাতার লাটপ্রাসাদে বসিয়া পশ্চিম বাংলার সকল দলের ও সম্প্রদায়ের নেতাদের সহিত পশ্চিমবঙ্গ সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি বনগাঁ ও রাণাঘাটে যাইয়া তথায় পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত শরণার্থীদের দুরবস্থা ও স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন। যাহাতে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও মধ্যপ্রদেশে স্থান ও আশ্রয় প্রদান করা হয়, সে জন্য পণ্ডিতজী ঐ সকল প্রদেশের রাষ্ট্রপাল ও প্রধান মন্ত্রীদের কলিকাতায় ডাকিয়া সে বিষয়ে তাঁহাদের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন এবং তাহার পর হইতে ঐ সকল প্রদেশে প্রত্যহ সহস্র সহস্র আশ্রয়প্রার্থীকে প্রেরণকরা হইতেছে। যাহাতে প্রাদেশিকতার জন্য বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী আশ্রয়প্রার্থীরা কোনরূপ অসুবিধা ভোগ না করে, সে জন্য প্রান্তিক রাষ্ট্রের পরিচালকগণকে পণ্ডিতজী বিশেষ সাবধানতার সহিত কাজ করিতে বলিয়া গিয়াছেন। আনন্দের বিষয়, উড়িষ্যা প্রদেশের রাষ্ট্রপাল, প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য নেতারা বাঙ্গালী আশ্রয়প্রার্থীদিগকে উপযুক্ত বাসস্থান ও কাজ প্রভৃতি দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। আসাম ও বিহারে সে জন্য উদ্যোগ আয়োজন ও কার্য্য চলিতেছে। আমাদের বিশ্বাস, জাতির এই দুর্দ্দিনে সকল প্রদেশের লোক প্রাদেশিকতা ত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃভাবে সকলকে গ্রহণ করিবেন এবং সকলকে রাজনীতিক্ষেত্রে সমান অধিকার দান করিয়া সকলের অভাব অভিযোগ দূর করিতে মনোযোগ দান করিবেন।

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল—

সম্প্রতি যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে একটি নব নির্ম্মিত গৃহের উদ্বোধন হইয়াছে। ঐ গৃহে ৭৫ জন রোগীর স্থান হইবে এবং তাহা নির্ম্মাণ করিতে ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা সাধারণের নিকট দানরূপে পাওয়া গিয়াছে। ১৯২৩ সালে মাত্র ৪টি রোগীর উপযুক্ত স্থান লইয়া ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়ের চেষ্টায় ঐ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—বর্ত্তমানে তথায় ৫ শত রোগী রাখার স্থান হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় প্রথম হইতেই ঐ হাসপাতালের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। তাঁহাদের চেষ্টার জন্য আমরা ডাক্তার

বিধানচন্দ্র ও ডাক্তার কুমুদশঙ্করকে দেশবাসীর পক্ষ হইতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। দেশবাসী সহৃদয় জনগণের সাহায্যেই এই হাসপাতাল পুষ্ট হইয়াছে—তাঁহাদের অধিকতর দানে হাসপাতাল আরও বর্দ্ধিত হউক, সঙ্গে সঙ্গে এই প্রার্থনা জানাই। ভারতে প্রতি বৎসর ৫ লক্ষ লোক যক্ষারোগে প্রাণত্যাগ করে—কাজেই তাহার তুলনায় এই হাসপাতাল অতি ক্ষুদ্র। আজ দেশে এইরূপ বহু হাসপাতালের প্রয়োজন আছে।

কলিকাতা পুলিসে মহিলা—

কলিকাতা পুলিসে মহিলা সাব-ইন্সপেক্টার ও সহকারী সাব-ইন্সপেক্টার গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রথম নিযুক্ত ৩২ জনকে ৭ মাস শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—তন্মধ্যে ১ জন পদত্যাগ করিয়াছেন—৯ জন সাব-ইন্সপেক্টার ও ২২ জন সহকারী সাব-ইন্সপেক্টার হইয়াছেন। আরও নূতন ১২ জনের শীঘ্রই শিক্ষারম্ভ হইবে। এই সকল মহিলা পুলিসের দ্বারা কলিকাতার অধিবাসীরা উপকৃত হইলে তাহাদের চাকরী গ্রহণ সার্থক হইবে।

বিমান-পরিচালন-প্রতিযোগিতা—

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী ভারতবর্ষে প্রথম দিল্লী হইতে কলিকাতা বিমান পরিচালন প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। প্রথম হইয়াছেন—এলাহাবাদ বিমান ট্রেণিং কেন্দ্রের ভাইস-প্রিন্সিপাল ক্যাপ্টেন নামযোশী, তাঁহার বয়স ৩৩ বৎসর। দ্বিতীয় হইয়াছেন মধ্যপ্রদেশের মিঃ এডমণ্ডসন, তৃতীয় হইয়াছেন বেরিলির লেপ্টেনান্ট কণ্ট্রাক্টার ও চতুর্থ হইয়াছেন লক্ষ্ণৌয়ের জি-ও-সি মেজর-জেনারেল মিশ্রী চাঁদ। ২৪শে হইতে ২৬শে ফেব্রুয়ারী তিনদিন বারাকপুরে বিমান-পরিচালন প্রদর্শনীও হইয়াছিল। শ্রীবীরেন রায় এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এ সময়ে কি সামরিক, কি অসামরিক সকল বিভাগেই বিমান-পরিচালন ব্যাপারে ভারতীয় যুবকগণের অধিক আগ্রহান্বিত হওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে।

নিয়ন্ত্রণপ্রথা ও কংগ্রেস সভাপতি—

নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া ভারত পার্লামেণ্টে খাদ্য ও কৃষি বিভাগের ব্যয়বরাদ্দ সম্বন্ধে আলোচনাকালে বলিয়াছেন—"দেশে খাদ্যশস্যের কোন অভাব নাই—কেবলমাত্র সরকারের খাদ্যশস্যের কোন অভাব নাই—কেবলমাত্র সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যবস্থার গলদের জন্যই খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রাখিতে হইতেছে। পাশ্চাত্য নীতি ও চিন্তাধারায় পুষ্ট সরকারী কর্ম্মচারীরা পল্লীঅঞ্চলের কৃষি অবস্থার কোন সংবাদ রাখে না বা বুঝে না। যুদ্ধকালে যে খাদ্য নিয়ন্ত্রণপ্রথা চালু করা হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহা অব্যাহত রাখার কোন যৌক্তিকতা নাই। সরকারের রেশনিং প্রথার ভিতর যে কি দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতেছে তাহা কাহারও অজানা নাই। একমাত্র দিল্লীতে যদি ৫ লক্ষাধিক ভুয়া রেশন কার্ডের অস্তিত্ব অনুমিত হয়, তবে কলিকাতায় তাহা ১০।১২ লক্ষের অধিক যে হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।" গান্ধীজি বার বার এই নিয়ন্ত্রণ প্রথা তুলিয়া দিবার কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু আজ যাঁহারা গান্ধীজির নাম ভাঙ্গাইয়া শাসন কার্য্য পরিচালনা করেন, তাঁহারা স্বার্থরক্ষা ও স্বজন পোষণের জন্য এই নিয়ন্ত্রণপ্রথা চিরদিনের জন্য বহাল রাখিতে চান। সকল ক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে—তাই আজ ধ্বংসলীলাও সর্ব্বত্র প্রকট। কে আমাদিগকে এই দারুণ দুঃসময়ে সদুপদেশ দিয়া রক্ষার ব্যবস্থা করিবে জানি না। তবে বর্ত্তমানের শাসন ব্যবস্থা যে আমাদের সত্বর ধ্বংস সাধন করিবে, সে বিষয়ে এখন সকলেই একমত হইয়াছেন।

কেন্দ্রীয় সাহায্য কমিটী—

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রত্যহ গড়ে যে প্রায় ৬ হাজার করিয়া শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছে, তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য দেশের সর্ব্বত্র বহু সমিতি ও প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। ঐ সকল সমিতির কার্য্য সংঘবদ্ধ করিয়া সুপরিচালিত করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। মহামান্য রাষ্ট্রপাল ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু তাহার সভাপতি, শ্রীমতী ফুলরেণু গুহ তাহার সম্পাদক এবং রাষ্ট্রপালের প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীগারেন্দ্রচন্দ্র সেন সমিতির কোষাধ্যক্ষ হইয়াছেন। সকল সাহায্য সমিতির নিজ নিজ কার্য্যবিবরণ ঐ কেন্দ্রীয় সমিতিকে জ্ঞাপন করা ও কার্য্যপদ্ধতি বিষয়ে কেন্দ্রীয় সমিতির পরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নচেৎ কোন শরণার্থী দুইবার সাহায্য পাইবে, আর কেহ বা কোন সাহায্যই লাভ করিবে না।

বঙ্গীয় রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী—

সম্প্রতি বঙ্গীয় রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর বার্ষিক সভায় বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতি ও ডাঃ শ্রীনীহাররঞ্জন রায় সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শান্তি ও সংস্কৃতির জন্য বার্ষিক মেডেল এবার শ্রীঅরবিন্দ ঘোষকে প্রদান করা হইয়াছে। বার্ষিক উৎসবের দিন সোসাইটী গৃহে স্বর্গত বৈদিক পণ্ডিত বেদাচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রামী মহাশয়ের চিত্র উন্মোচন হইয়াছে। মহামান্য রাষ্ট্রপাল উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া পুঁথি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। সোসাইটী একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। তথায় বহু মূল্যবান পুরাণবস্তু সংগৃহীত আছে। আজ সে সকল জিনিষ সম্পর্কে গবেষণা ও আলোচনার সময় আসিয়াছে।

নেপাল ও ভারত রাষ্ট্র—

১৯২৩ সালে নেপালের সহিত তৎকালীন বৃটীশ ভারতের সন্ধির ফলে নেপালে বৃটীশ প্রভাব বিস্তৃত হয়। তদবধি বৃটীশ নেপাল হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সেই সৈন্যদল দ্বারা ভারত রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে। সোভিয়েট তুর্কীস্থান ও নেপাল পরস্পর সংলগ্ন—সম্প্রতি চীন গভর্ণমেণ্ট তিব্বতের উপর তাহার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে—তিব্বতের পরই নেপাল অবস্থিত। সে জন্য স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্র সম্প্রতি নেপালের সহিত তাহার বন্ধুত্ব সন্ধি সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সে জন্য নেপাল হইতে পররাষ্ট্র বিভাগের প্রধান পরিচালক মেজর জেনারেল বিজয় সামসের জং বাহাদুর দিল্লী আসিয়া আলাপ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। এই নূতন সন্ধি-ব্যবস্থা রুসিয়ার মনোমত না হওয়ায় গত ৭ই সেপ্টেম্বর রাষ্ট্র-সংঘের সভায় নেপালকে সংঘের সদস্যপদ প্রদান করা হয় নাই। রুসিয়া ও তাহার দলভুক্ত সদস্যগণ ঐ পথে বাধা দিয়াছেন। নূতন সন্ধির ফলে ভারতরাষ্ট্র নেপালের অর্থনীতিক উন্নতি বিধানের ভার গ্রহণ করিবেন—তাহার পর নূতন ব্যবস্থায় ভারত ও নেপাল উভয়েই উপকৃত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে নেপালে সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠারও আয়োজন করা হইবে। নেপাল ভারতের বন্ধু হওয়ায় নেপালের মধ্য দিয়া সোভিয়েট তুর্কীস্থান বা কম্যুনিষ্ট তিব্বত হইতে ভারতাক্রমণের সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে।

রবীন্দ্র পুরস্কার—

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট এখন হইতে প্রতি বৎসর বিজ্ঞান ও কলা বিষয়ে একটি করিয়া ৫ হাজার টাকা মূল্যের রবীন্দ্র পুরস্কার সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থকারকে দেওয়া স্থির করিয়াছেন। ১৯৪৯-৫০ সালে বিজ্ঞান বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন পুস্তক প্রকাশিত না হওয়ায় উভয় পুরস্কারই কলা বিষয়ক গ্রন্থকার-দ্বয়কে প্রদান করা হইয়াছে—'বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদি-পর্ব্ব' রচনার জন্য অধ্যাপক ডাঃ নীহার রঞ্জন রায় ও 'জাগরী' নামক উপন্যাস রচনার জন্য শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী এবার পুরস্কার পাইয়াছেন—উভয় গ্রন্থই স্ব স্ব ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা উভয় লেখককেই অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। ডাঃ রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের চারু কলা বিভাগে বাগেশ্বরী অধ্যাপক এবং খ্যাত-নামা বক্তা ও পণ্ডিত।

উদ্বাস্তু সমস্যা ও সাহিত্যিকবৃন্দ—

গত ১৬ই চৈত্র বিকালে কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলকুমার বসুর সভাপতিত্বে কলিকাতার সাহিত্যিকবৃন্দের এক সভায় শরণাগতদিগের সাহায্যের উপায় নির্দ্ধারণের কথা আলোচিত হইয়াছিল। যে সাম্প্র-দায়িকতা ও প্রাদেশিকতা আজ আমাদের জাতীয় জীবন কলুষিত করিয়া আমাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে, তাহা দূর করিতে হইলে সাহিত্যিকগণের সে বিষয়ে যত্ন ও চেষ্টা লওয়া একান্ত প্রয়োজন। দেশের এই দুর্দ্দিনে লোক যাহাতে শুধু সরকারী কর্ম্মচারীদিগের ও নেতাদলের কার্য্যের নিন্দা না করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদনে অবহিত হন, সাহিত্যের মধ্য দিয়া সে বিষয়েও প্রচার কার্য্য প্রয়োজন। ঐ সভায় শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীপ্রমথ-নাথ বিশি, শ্রীমনোজ বসু প্রভৃতিও এ বিষয়ে কর্ত্তব্য সম্পর্কে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

সৈন্য বাহিনীর সংগঠন—

দেশকে সুরক্ষিত করিতে হইলে যে সৈন্য বাহিনীর সংগঠন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, সে কথা কাহাকেও বলিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ভারত রাষ্ট্র স্বাধীন হইবার পর

দেশীয় রাজ্যগুলিকে ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রের অধীন করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল রাজ্যের সৈন্যদল এতদিন পর্য্যন্ত স্বস্ব-প্রধান ছিল। গত ১লা এপ্রিল হইতে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, মহীশূর ও হায়দ্রাবাদ—তিনটি বড় রাজ্যের সৈন্যদল পরিচালনার ভার ভারত রাষ্ট্রের সেনাপতি গ্রহণ করিয়াছেন। রাজস্থান, পেপসু, মধ্য-ভারত ও সৌরাষ্ট্র সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে—ঐ সকল স্থানের রাজপ্রমুখদিগের উপর সৈন্যাধ্যক্ষের কার্য্য ভার দেওয়া হইয়াছে ও রাজপ্রমুখগণকে ভারত-রাষ্ট্রের নির্দ্দেশ মত কাজ করিতে বলা হইয়াছে। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সৈন্যদল পরিচালনার ভার গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ভারত রাষ্ট্র কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। যে সকল ছোট ছোট দেশীয় রাজ্য ভারত রাষ্ট্রের অধীন হইয়াছে, তাহাদের সৈন্যবাহিনী, হয় ভারতীয় রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইবে, না হয় তাহারা পুলিস প্রভৃতি বেসামরিক কাজে লাগিবে। এই সৈন্যবাহিনী সংগঠন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার পর ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে তাহার শক্তির পরিমাণ করা সম্ভব হইবে। যাহারা ভারতরাষ্ট্রকে এখনই যুদ্ধে নামিতে বলিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই সংবাদ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

আসামে অশান্তি—

গত আড়াই বৎসর ধরিয়া পূর্ব্বপাকিস্তান হইতে প্রায় ১০ লক্ষ মুসলমান আসামে যাইয়া আসামের জঙ্গল-সমূহে ও পতিত জমিসমূহে বাস করিতেছে। আসামে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আসামকে পাকিস্তানের অন্তর্গত করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। আসাম-গভর্ণমেণ্ট এতদিন প্রবাসী বাঙ্গালীদিগকে তাহাদের শত্রু ভাবিয়া তাহাদের তাড়াইবার জন্য ব্যস্ত ছিল—মুসলমানগণের এই আগমনে বাধা দেয় নাই। সম্প্রতি এ বিষয়ে আসাম গভর্ণমেণ্টের চেতনা হইয়াছে ও আসাম হইতে পাকিস্তানী মুসলমানদিগকে তাড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ফলে বহু মুসলমান আসাম ছাড়িয়া পূর্ব্ব-পাকিস্তানে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে—তাহারা পূর্ব্ব-পাকিস্তানে ফিরিয়াই হিন্দুদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে ও তাহার ফলে গত ২ মাসে প্রায় দুই লক্ষ হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসামে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাদের আশ্রয় প্রদান ও খাদ্যদান এখন আসাম গভর্ণমেণ্টের পক্ষে চিন্তার বিষয় হইয়াছে। যে সকল মুসলমান আসামে আছে, কম্যুনিষ্টদের প্ররোচনায় এখন তাহারা নবাগত আশ্রয়প্রার্থী বাঙ্গালী হিন্দুদের সহিত সর্ব্বত্র বিরোধ আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহার ফলে এখন আসামের সর্ব্বত্র অশান্তি দেখা দিয়াছে। উপদ্রব ও অশান্তি ক্রমে সর্ব্বত্র প্রচার লাভ করিতেছে এবং আসামের কামরূপ, গোয়ালপাড়া, কাছাড় ও দরং জেলায় তাহার এমন সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছে যে সে জেলাগুলি উপদ্রুত অঞ্চল বলিয়া গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আসাম সীমান্ত প্রদেশ—চীন ও ব্রহ্মদেশে অরাজকতা চলিতেছে, তাহা সীমান্তের মধ্য দিয়া আসামে প্রবেশ করিলে তাহা ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে সমূহ ক্ষতিকর হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সমস্যার মত আসাম সমস্যাও আজ সারা ভারতের চিন্তার বিষয় হইয়াছে।

পশ্চিম পাকিস্তানে দুর্য্যোগ—

পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তস্থিত পাঠান অধিবাসীরা পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া 'আজাদ পাঠানিস্তান গভর্ণমেণ্ট' গঠন করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীরা চিরকাল বৃটীশ সৈন্যদলের সহিতও যুদ্ধ করিয়াছিল। বৃটীশ তাহাদের দেশ জয় করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। পাঠানীস্থান দাবী করিয়া পাঠানগণ পাকিস্তানী সৈন্যদিগকে তাহাদের দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতেছে—ফলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড চলিতেছে। প্রকাশ, আফগানিস্তানের প্রধান মন্ত্রী এই কার্য্যে পাঠানদিগকে অর্থ ও অস্ত্রাদি দিয়া সাহায্য করিতেছে। ইন্দোনেশিয়ার গণতন্ত্রের সভাপতি ডাঃ সুকর্ণ ও পাঠানদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। সকল দেশের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিলে পাঠানরা শীঘ্রই তাহাদের দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিবে ও পশ্চিম পাকিস্তানের একাংশ স্বাধীন পাঠানীস্থান বলিয়া গণ্য হইবে।

সিকিম রাজ্য—

সম্প্রতি সিকিম রাজ্যের সহিত ভারতীয় রাষ্ট্রের যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহার ফলে সিকিম ভারত-রাষ্ট্রের অন্তভুক্ত হইয়াছে ও ভারতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক নিযুক্ত দেওয়ান সিকিমের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন।

সিকিমের অধিবাসীদের দাবী অনুসারে সিকিমে শাসন কার্য্যের জন্য একটি নির্ব্বাচিত-প্রতিনিধি-গঠিত পরামর্শ পরিষদ স্থাপিত হইবে—ফলে জনগণের সহিত দেশ শাসনের সাক্ষাৎ সম্পর্ক হইবে। সিকিম চীন সীমান্তে অবস্থিত—সিকিম ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে আসায় ঐ সীমান্ত রক্ষার জন্য ভারতকে আর চিন্তিত হইতে হইবে না, তাহা ছাড়া সিকিম হইতে ভারত বহু পরিমাণ খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য আমদানী করিতে সমর্থ হইবে।

ঝাড়গ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাপীঠ—

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী কর্ম্মীদিগের চেষ্টায় বহু স্থানে বালকগণের জন্য ছাত্রাবাস ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও বালিকাদের জন্য ঐরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অধিক নহে। সে জন্য স্বামী শর্ব্বানন্দ মহারাজের চেষ্টায় মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে বালিকাদের জন্য ঐরূপ একটি ছাত্রাবাস ও বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। ঝাড়গ্রামনিবাসী শ্রীযুত দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চেষ্টায় ঝাড়গ্রামের রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্য রাজবাড়ীর নিকটে ১৬ বিঘা উৎকৃষ্ট জমী দান করিয়াছেন ও গৃহনির্ম্মাণের জন্য নগদ ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ১৬ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ঐ জমীর উপর একটি একতলা গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। তথায় ৫০ জন ছাত্রী ও ৬ জন শিক্ষয়িত্রী বাস করিতে পারিবেন। রন্ধনশালা প্রভৃতির জন্যও পৃথক গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। বাঙ্গালার দেশপাল ডাঃ শ্রীকৈলাসনাথ কাটজু সম্প্রতি ঝাড়গ্রাম পরিদর্শনের সময় ঐ নূতন গৃহের উদ্বোধন উৎসব সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন। ছাত্রীদের জন্য আরও গৃহ নির্ম্মাণ প্রয়োজন। সে জন্য ৪০ হাজার টাকা চাই। বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার সহিত হাতের কাজও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

স্বামী শর্বানন্দ—ঝাড়গ্রাম

শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব, রাজাসাহেব—ঝাড়গ্রাম

উচ্চশিক্ষা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানটিতে বিদ্যালয়ের সহিত কলেজও প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে গ্রাম্য ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে। স্বামী শর্ব্বানন্দ মহারাজের সহিত একদল স্বার্থত্যাগী শিক্ষিত কর্ম্মী এই প্রতিষ্ঠানটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে গড়িয়া তোলার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস এই সদনুষ্ঠানের জন্য অর্থের অভাব হইবে না।

দেশবাসী সহৃদয় জনগণের সাহায্য ও সহানুভূতির উপর এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি নির্ভর করিবে।

শ্রীঅনিলকুমার গায়েন—

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত লাক্ষী গ্রামের শ্রীঅনিলকুমার গায়েন এই বৎসর ইংল্যাণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অফ্ ফিলসফি ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ Mathematical Investigation into effect of Non-normality on Standard Tests—সংখ্যাবিজ্ঞানের কতকগুলি প্রশ্নের সমাধান। বাঙ্গালীদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম সংখ্যা-বিজ্ঞানে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের "ডক্টরেট" ডিগ্রী লাভ করিলেন। বিলাতে থাকাকালে ডাঃ গায়েন ঐ দেশীয় বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় (Scientific Journal) কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লেখেন। ইনি ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিতে (Applied Mathematics) এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সুবর্ণ পদক লাভ করেন। এম-এ পাস করিয়া পরে প্রেসিডেন্সী ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনার কাজে লিপ্ত ছিলেন। আশা করি, শিক্ষা ও কাজের দ্বারা ডাঃ গায়েন দেশের ও দশের মঙ্গল সাধন করিবেন।

শ্রীঅনিলকুমার গায়েন

যাদুকর পি-সি-সরকার—

সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় যাদুকর শ্রীযুক্ত পি-সি-সরকার আগামী মে মাসে সদলবলে আমেরিকা যাইতেছেন। আমেরিকার যাদুকর সম্মিলনীর সভাপতি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি এবারকার নিখিলবিশ্ব-যাদুকর-সম্মিলনীতে ভারতবর্ষের যাদুবিদ্যার প্রতিনিধিত্ব করিবেন। তৎপর তিনি ইংলণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশেও যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিবেন। প্রত্যেকটি দেশ হইতেই তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াছেন এবং কয়েকটি দেশের যাদুকর সম্মিলনী ইতিমধ্যে তাঁহাকে তাহাদের 'সম্মানিত সদস্য' নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সরকার পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুবিদ্যার পুরস্কার নিউইয়র্ক হইতে "স্ফিনিক্স (Sphinx) স্বর্ণপদক" পাইয়া সমগ্র এশিয়ার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

যাদুকর পি-সি-সরকার

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ—

গত ২রা এপ্রিল রবিবার অপরাহ্ণে কলিকাতা লাট-প্রাসাদে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের প্রথম বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসব হইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছেন—আইন করিয়া রাষ্ট্রভাষা তৈয়ার করা যায় না—সমগ্র

ভারতের বোধগম্য ভাষা একটি—তাহা হইল সংস্কৃত ভাষা। পরিষদের কর্মসচিব ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বলিয়াছেন—পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের জন্য একটি স্থায়ী বাসভবন ও গবেষণা বিভাগ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগ, পরিষদের মুখপত্র হিসাবে পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি আশু প্রয়োজন। বিভিন্ন স্থানে সরকারী টোল-প্রতিষ্ঠা, আয়ুর্বেদ, অর্থনীতি প্রভৃতির পরীক্ষা প্রচলন ও দরকার। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম—সংস্কৃত ভাষা প্রসারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার নানাবিধ চেষ্টা করিতেছেন এবং কর্মসচিব যতীন্দ্রবাবুর চেষ্টায় এ বিষয়ে নূতন পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতেছে। সকল প্রদেশে এইভাবে সংস্কৃত প্রচারের ব্যবস্থা হইলে সংস্কৃতই স্বাধীন-ভারতে যে রাষ্ট্রভাষারূপে পরিগণিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রেখা

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

রহড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম—

সকলেই জানেন বসুমতীর মালিক স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দানে তাঁহার প্রদত্ত জমী, বাড়ী ও অর্থ পাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কর্ত্তৃপক্ষ গত ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ২৪ পরগণা জেলার খড়দহ রেল ষ্টেশনের নিকটস্থ রহড়া গ্রামে এক বালকাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথায় ২ শত অনাথ বালককে আশ্রয় দান করিয়া শিক্ষা দান করা হইতেছে—তাহাদের জন্য আশ্রমের মধ্যে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে এবং একটি শিল্প বিদ্যালয়ও খোলার আয়োজন করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে প্রায় ৬০ বিঘা জমীর উপর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত—১৯৪৯ সালের হিসাবে জমীর মূল্য ৭৫ হাজার টাকা। তাহার উপর প্রায় ১ লক্ষ ৭ হাজার টাকার গৃহাদি অবস্থিত। সতীশবাবুর প্রদত্ত ৩ লক্ষ টাকার সুদ ছাড়াও সাধারণের দান এবং সরকারী সাহায্যে আশ্রম পরিচালিত হয়। ১৯৪৯ সালে আশ্রমের বার্ষিক ব্যয় হইয়াছে ৮৫ হাজার টাকা—তন্মধ্যে শুধু খাদ্য বাবদে ৪৮ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক ৮ হাজার টাকা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। আশ্রমে মিশনের কয়েকজন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী আছেন, তাহা ছাড়া বেতনভোগীও বহু কর্ম্মী রাখিতে হয়, তাঁহাদের বেতন বাবদ ১৯৪৯ সালে প্রায় ৫ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। বালকগণকে বাসস্থান, খাদ্য, পরিধেয়, শিক্ষা প্রভৃতি সমস্তই বিনামূল্যে দান করা হয়। এই ধরণের প্রতিষ্ঠান বাঙ্গলা দেশে আর কোথাও নাই। আশ্রম-পরিচালক স্বামী পুণ্যানন্দ অসাধারণ বুদ্ধিমান ও অক্লান্তকর্ম্মী। তাঁহার চেষ্টায় আশ্রমের জন্য এক বৎসরে (১৯৪৯) বিভিন্ন সরকারী বিভাগ হইতে ৫৬ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ৯ হাজার টাকা কোম্পানীর কাগজের সুদ বাবদ পাওয়া গিয়াছে এবং বাকী সমস্ত টাকা স্বামীজি ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের চেষ্টায় চাঁদা ও দান হিসাবে সংগৃহীত হইয়াছে। ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালে ২৩ হাজার টাকায় ২১ বিঘা জমী ক্রয় করা হইয়াছে ও তাহার উপর আশ্রমের জন্য তরকারী চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে মাত্র ১২ মাইল দূরে গ্রামের মধ্যে আশ্রম অবস্থিত। দেশহিতকামী ব্যক্তি মাত্রেরই আশ্রমটি পরিদর্শন করা ও তাহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আশ্রমে একটি মন্দির ও প্রার্থনাস্থান নির্ম্মাণের জন্য ৪০ হাজার টাকা ও রন্ধনশালাদি নির্ম্মাণের জন্য ২০ হাজার টাকা অবিলম্বে প্রয়োজন। স্থায়ী অর্থ ভাণ্ডারে অধিক অর্থ সংগৃহীত হইলে আশ্রমে আরও অধিকসংখ্যক নিরাশ্রয় বালক স্থান পাইতে পারে। আমরা এ বিষয়ে সহৃদয় ও দানশীল দেশবাসীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

কংগ্রেস-সভাপতি সম্বর্দ্ধনা—

পশ্চিম বঙ্গের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান 'বেঙ্গল ট্রেডার্স এসোসিয়েসনে'র পক্ষ হইতে গত ১৫ই মার্চ্চ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ও ভারতীয় পার্লামেণ্টের সদস্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ মহাশয়কে এক সম্মিলনে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। ছোট ব্যবসায়ীদের অভাব অভিযোগ যথা সময়ে যথাস্থানে জানাইবার কোন ব্যবস্থা নাই। কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে অন্যান্য প্রদেশের ব্যবসায়ীরা সদস্য হইয়া আসিয়াছেন, কাজেই তাঁহাদের ব্যবসায় সংক্রান্ত অভিযোগ তথায় আলোচিত হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালার কোন ব্যবসায়ী কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের সদস্য নহেন। সুরেন্দ্রবাবুকে এ কথা জানানো হইলে তিনি সকল ব্যবসায়ীকে তাঁহাদের অভাব অভিযোগের কথা যথাসময়ে তাঁহাকে জানাইতে বলিয়াছেন ও তিনি সে সকল বিষয়ে পার্লামেণ্টে আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। পশ্চিম বাঙ্গালার বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিম বঙ্গের সকল ব্যবসাই প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে—বিশেষ করিয়া ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের অসুবিধার অন্ত নাই। এখন যদি সংঘবদ্ধ ভাবে সে সকল অসুবিধা দূর করার ব্যবস্থা না করা হয়, তবে বহু ব্যবসায়ী তাহাদের ব্যবসা বন্ধ করিতে বাধ্য হইবে। এমন অনেক অভিযোগ আছে, যাহার প্রতীকার করা সম্ভব, কিন্তু সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে বা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে উপযুক্ত সময়ে জানাইবার সুযোগ ও সুবিধা নাই। সুরেন্দ্রবাবুর মত কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের অন্যান্য বাঙ্গালী সদস্যগণ যদি আজ বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের অভিযোগ দূর করিতে অগ্রসর না হন, তবে বাঙ্গালা দেশের সমূহ ক্ষতি হইবে। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে

শ্রমিক, ধনী ও মধ্যবিত্ত তিন সম্প্রদায়ই বিপন্ন হইয়াছে। সকল দিক বজায় রাখিয়া কি করিলে তিন সম্প্রদায়ই উপকৃত হইতে পারেন, সেই জন্য পার্লামেণ্ট সদস্যগণের অবহিত হইয়া আলোচনা করা প্রয়োজন। সুরেন্দ্রবাবু এ বিষয়ে সকলকে সকল প্রকার সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দান করিয়া সকলের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

আচার্য্য শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ—

সম্প্রতি কলিকাতা চেতলা শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপে সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে বঙ্গের প্রথিতযশা বৈষ্ণব সাহিত্যসেবী ও শিক্ষাব্রতী আচার্য্য শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথের বয়স ৭১ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তাঁহার জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৌরোহিত্য করেন এবং প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় সভায় উদ্বোধন করেন। সভায় সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর পক্ষ হইতে কবি শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। আচার্য্য রাধা-গোবিন্দ নাথকে "ভাগবতভূষণ" উপাধি দানে ভূষিত করা হয়।

পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ সম্বর্ধনা

পার্লামেণ্টে নেহরুর ভাষণ—

দুইবার কলিকাতা আগমনের পর পণ্ডিত জহরলাল নেহরু দিল্লীতে ফিরিয়া গিয়া বাজেট আলোচনা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ভারতের একদল লোকের মধ্যে গভীর নৈরাশ্য ও উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছে। পণ্ডিত শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের মত লোকও পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন, "পণ্ডিত নেহরু যদি মনে করেন যে পাকিস্তান বৈদেশিক রাষ্ট্র বলিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট সেখানকার সংখ্যালঘুদিগকে রক্ষা করিতে অসমর্থ, তাহা হইলে তাহা স্পষ্টভাবে স্বীকার করুন। লোকের মনে উচ্চ আশা জাগাইয়া তাহার পর পাকিস্তানের হাতে তাহাদের রক্ষার ভার ছাড়িয়া দেওয়া অনুচিত।" পণ্ডিত নেহরু স্বীকার করিয়াছেন—পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা যাহাতে নিরাপদে বাস করিতে পারে তাহা দেখার দায়িত্ব ভারত সরকারের এবং যদি তাহারা স্বদেশে নিরাপত্তা না পায়, তবে তাহাদিগকে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা ভারত সরকারকেই করিতে হইবে। পণ্ডিতজী সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন। অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। এই ক্ষেত্রে ভারতের দায়িত্বকেও তিনি অস্বীকার করেন না। তবু উহা সমাধানের জন্য মাথা গরম করিয়া তিনি অসংযত উক্তি করেন নাই। সে দায়িত্ব কি ভাবে তিনি পালন করিবেন বা করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা ধৈর্য্য ধরিয়া আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে, অসহিষ্ণু হইয়া, উত্তেজিত হইয়া এক্ষেত্রে জনসাধারণ সমস্যার সমাধান ত কিছু করিতে পারিবেন না—বরং উহাকে আরও জটিল করিয়া তুলিবেন। পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের উপর অত্যাচার হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট তথায় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট উভয়কেই এখন বিব্রত হইতে হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যাহারা আসিবেন, তাহাদের আগমনের ব্যবস্থা করা সরকারের যেমন কর্ত্তব্য, তেমনই যদি পশ্চিমবঙ্গ হইতে যাহারা চলিয়া যাইবেন, তাহাদের যাওয়ার ব্যবস্থা সরকার না করেন, তবে মানবতার দিক দিয়া কর্ত্তব্যচ্যুতি হইবে। ধীর ও স্থির ভাবে আজ জনগণকে সকল দিক চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। শুধু পণ্ডিত নেহরুকে গালি দিলে দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিবে না। সাধারণের পক্ষে যাহা বলা সম্ভব, রাষ্ট্র-পরিচালক হিসাবে পণ্ডিতজীর পক্ষে তাহা প্রকাশ করা যে সম্ভব নহে, একথা যেন আমরা একবারও বিস্মৃত না হই।

শোক-সংবাদ

পরলোকে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

বিপ্লবী যুগের খ্যাতনামা কর্ম্মী, 'দৈনিক বসুমতী' সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ২২শে চৈত্র বুধবার ভোরে তাঁহার কলিকাতা সিঁথিস্থ বাসভবনে ৭২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৮৭৯ সালে হুগলী জেলার চন্দননগরে তাঁহার জন্ম হয়। প্রথম জীবনে তিনি কিছুকাল মেডিকেল কলেজে পাঠ করেন ও কয়েক বৎসর শিক্ষকতা করেন। ১৯০৫ সালে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন ও মানিকতলা বোমার মামলায় ১৯০৮ সালে ধৃত হন। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তিনি ১০ বৎসর আন্দামানে বাস করিয়াছিলেন ও ১৯১৯ সালে মুক্তিলাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সে সময়ে 'নির্ব্বাসিতের আত্মকথা' নামক তিনি বন্দীজীবনের যে কাহিনী পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, তাহা বাংলা সাহিত্যে অন্যতম উপাদেয় গ্রন্থ। পরে তিনি সাংবাদিকের জীবন আরম্ভ করেন এবং ফরোয়ার্ড ও অমৃতবাজার পত্রিকায় কয়েক বৎসর ও কলিকাতা কর্পোরেশনে কয়েক বৎসর কাজ করেন। অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি গত ৫ বৎসর দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক হইয়াছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি সে পদে কাজ করিতেছিলেন। ১৯৪৯ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার রচনা চিরকাল লোক আগ্রহের সহিত পাঠ করিত। বাঙ্গালাদেশে তিনি অন্যতম রস-সাহিত্যিক ছিলেন এবং 'বিজলী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার বহু রস রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা ও ইংরাজি উভয় ভাষাতেই সমান দক্ষতায় তিনি রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন অসাধারণ মেধাবী কর্ম্মীর অভাব হইল।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরলোকে রসময় ধাড়া—

সাংবাদিক জগতে সুপরিচিত রসময় ধাড়া মহাশয় গত ২রা এপ্রিল মধ্যপ্রদেশে ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি গত কয় বৎসর পুত্রের নিকট তথায় বাস করিতেন। তিনি লিবার্টি, সার্ভাণ্ট, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রভৃতি বহু ইংরাজি সংবাদ-পত্রের সম্পাদক-সংঘের সদস্য ছিলেন-ও তাহার সাহিত্য-প্রতিভা কম ছিল না। ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কেও তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

অনিল বিশ্বাস—

অনিল বিশ্বাস নামক কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল কলেজের এক ছাত্র 'ক্যাম্বেল হাসপাতাল রিলিফ এসোসিয়েসনের' পক্ষ হইতে মহামান্য রাষ্ট্রপাল ডাঃ কাটজুর নির্দ্দেশে বানপুর-জয়নগর সীমান্তে মেডিকেল সাহায্য দান করিতে গিয়াছিলেন—গত ৩১শে মা

পাকিস্তানী আক্রমণকারীদের গুলীতে তিনি আহত হন। তিনি চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেন ও ২৭শে মার্চ জয়নগর গিয়াছিলেন। আহত অবস্থায় তাঁহাকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে আনা হয় ও ২রা এপ্রিল রবিবার রাত্রিতে তিনি মারা গিয়াছেন। তাঁহার পিতা শ্রীনগেন্দ্রকুমার বিশ্বাস আসাম গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগে কাজ করিতেন। অনিল ১৯৪৪ সালে শিলং হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া সেই
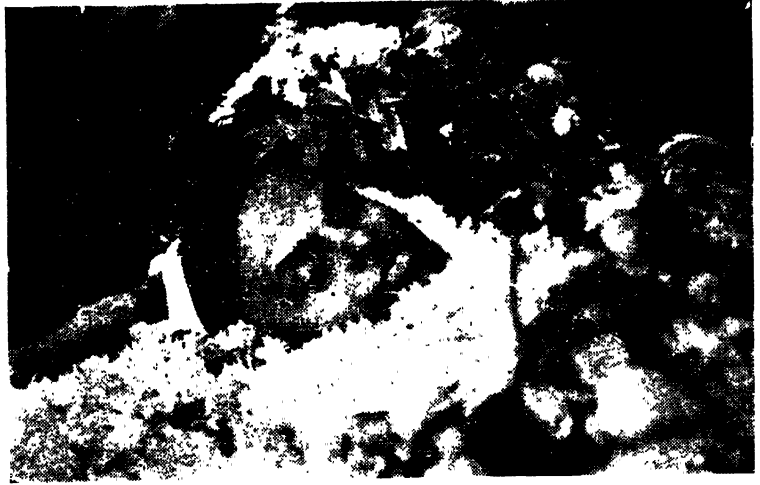
অনিল বিশ্বাস ফটো—ডি-রতন

বৎসর ঢাকা মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলে ভর্ত্তি হন ও দেশ বিভাগের পর ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে যোগদান করেন। ৩রা এপ্রিল সোমবার অনিলের মৃতদেহ এক মাইল মিছিল করিয়া নিমতলা শ্মশান ঘাটে লইয়া গিয়া দাহ করা হইয়াছে।

পরলোকে ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস—

কলিকাতার প্রবীণতম চিকিৎসক ও খ্যাতনামা কংগ্রেস-নেতা ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস গত ২১শে চৈত্র মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টায় গোরাচাদ রোডস্থ চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে ৯৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৫৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর শ্রীহট্ট জেলায় সুন্দরীমোহনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ঐ জেলায় কালেক্টারের দেওয়ান ছিলেন। ১৮৮২ সালে ডাক্তারী পাশ করিয়া তিনি প্রথমে দেশে ও পরে ১৮৯০ সাল হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনে কাজ করেন। দশ বৎসর পরে চাকরী ছাড়িয়া তিনি স্বাধীন ব্যবসা করিয়াছিলেন। তিনি আর-জি-করের কলেজে ও পরে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনার পর গত অসহযোগের সময় হইতে ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজে অধ্যাপক ও অধ্যক্ষের কাজ করেন। প্রথম জীবন হইতেই তিনি শুধু রাজনীতিক আন্দোলনে নয়, দেশের সকল জনহিতকর আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন, তিনি অসাধারণ মেধাবী পণ্ডিত ছিলেন—মাত্র কয় মাস পূর্ব্বেও সাধারণ সভায় যখন তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন, তাঁহার এই বৃদ্ধ
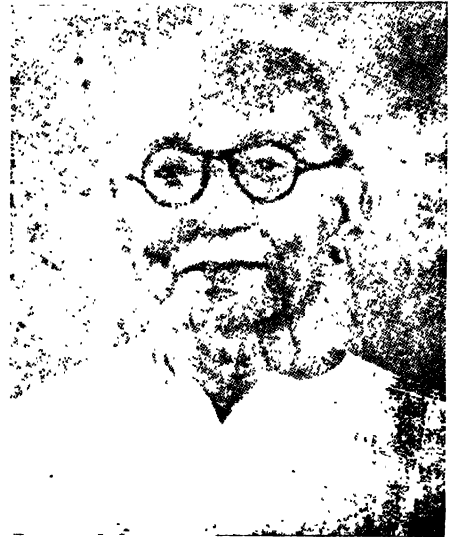
ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস

বয়সে কণ্ঠস্বর, স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি সকলকে বিস্মিত করিয়াছে। মাত্র কয়দিন তিনি রোগে শয্যাগত ছিলেন।

তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি সে আন্দোলনের সহিত সম্পূর্ণভাবে যোগদান করিয়া দেশ-সেবা করিয়াছেন ও গত ৩০ বৎসর কাল জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান কলেজের উন্নতিতে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এরূপ কর্ম্মময় জীবন সাধারণতঃ দেখা যায় না।

পরলোকে কে-সি-নাগ—

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ গত ৭ই চৈত্র ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন

কে-সি-নাগ আই-সি-এস্

করিয়াছেন। ঢাকা জেলার বারদীর প্রসিদ্ধ নাগ বংশে তাঁহার জন্ম; নাগ মহাশয় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত মৈমনসিংহে ব্যারিষ্টারী করিয়া ব্যবহারাজীব হইতে ধর্ম্মাধিকরণের জন্য নির্ব্বাচিত হন। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই সম্মান লাভ করেন। জেলা জজের পদেও তিনি অনুরূপ সাফল্যের সহিত (সিলেকশন গ্রেডে) ছিলেন এবং বিখ্যাত তারকেশ্বর মোহন্তের মামলা প্রভৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমার ভার সরকার তাঁহার হস্তে বিভিন্ন সময়ে অর্পণ করেন; তাঁহার তারকেশ্বর মামলার রায় শুধু যে জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহা নহে, ইহা সুষ্ঠু বিচারের জন্য হাইকোর্ট ও প্রিভিকাউন্সিলে সমর্থিত ও প্রশংসিত হয়। ১৯৩৩ সনে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির পদে উন্নীত হয়।

১৯৩৮ সনের নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী বিচারপদ্ধতিকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য ত্রিপুরার মহারাজা সাগ্রহে তাঁহাকে ত্রিপুরার প্রধান বিচারপতি করিয়া লইয়া যান এবং গত বৎসর পর্য্যন্ত তিনি এই দায়িত্বশীল পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন।

পরলোকে অমূল্যধন আঢ্য—

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন কাউন্সিলার অমূল্যধন আঢ্য গত ২১শে চৈত্র ৮৩ বৎসর বয়সে কলিকাতা চেতলায় নিজভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কর্পোরেশন ও অন্যান্য বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া সারা জীবন জন-সেবা করিয়া গিয়াছেন। ধনী ব্যবসায়ী হইয়াও জনকল্যাণ সাধনে তাঁহার অসাধারণ আগ্রহ দেখা যাইত। দেশের কৃষি ও গোজাতির উন্নতির জন্য তাঁহার বহুবিধ প্রচেষ্টার ফলে দেশ উপকৃত হইয়াছে।

বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণ ও ধর্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধান

অধ্যাপক ডক্টর রমা চৌধুরী

জাতির জীবনে আজ অকস্মাৎ এক মহা সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। পরাধীন ভারতে, বিদেশী রাজশক্তির স্বার্থান্বেষী প্ররোচনায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের যে ঘনকৃষ্ণ মেঘ আমাদের জাতীয় জীবনকে তমিস্রাচ্ছন্ন করে রেখেছিল, ব্যর্থ করে দিয়েছিল তার আলোর পথে সুন্দর, সহজ, স্বাভাবিক বিকাশকে, সেই ঘোর কুটিল মেঘই আজ সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হয়ে স্বাধীন ভারতের নবোদিত সহস্ররশ্মির সহস্র দিক্ প্রসারী অম্লান দ্যুতিকে পরিম্লান করতে সমুদ্যত। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে নোয়াখালির ধ্বস্তবিধ্বস্ত, রক্তপ্লাবিত পথে পথে যে ভয়ানক সমস্যার সম্মুখীন আমাদের হ'তে হয়েছিল, স্বাধীনতা লাভের স্বল্প ত' বৎসরের মধ্যেই সেই দারুণ সমস্যাই পুনরায় ব্যাপকতর রূপে, ভীষণতর রূপে আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে—অর্থাৎ, ব্যাপকভাবে বলপূর্বক তথাকথিত ধর্মান্তরীকরণ, বিবাহ বা ধর্ষণের অতি শোচনীয় সমস্যা। হিন্দু সমাজের জীবনে এই সমস্যা অবশ্য নূতন নয়—মধ্যযুগে মুসলমান শাসকগণের রাজত্বকালে বহুবারই তাকে এরূপ নিদারুণ বিপদের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে, তৎকালীন সমাজপতিরা এই সমস্যার ন্যায়ধর্মানুমোদিত সমাধানে

সম্পূর্ণ অপারগ হয়েছিলেন। সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়, প্রাণভয়ে ধর্মান্তরগ্রহণে বাধ্য নরনারী এবং পশুবলের নিকট পরাজিতা অসহায়া নারীকে অশুচি, অসতী বলে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করা যে সকল যুক্তি থেকেই ন্যায় ও নীতি বিরোধী, সে সম্বন্ধে দ্বিমত হ'তে পারেনা।

বলপূর্বক ধর্মান্তরগ্রহণ করান যে চলেনা, তা' স্বতঃসিদ্ধ সত্য। কারণ, ধর্ম প্রাণের জিনিষ, হৃদয়েরই নিধি—যা' আমরা বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করি, হৃদয় দ্বারা অনুভব করি, স্বেচ্ছায় গ্রহণ করি, তাই কেবল হ'তে পারে আমাদের প্রকৃত ধর্ম। প্রাণের ভয় দেখিয়ে, বলপূর্বক নিষিদ্ধ মাংসাদি ভক্ষণ করিয়ে, অর্থহীন কতকগুলি আচারানুষ্ঠান করতে বাধ্য করিয়ে যে ধর্মগ্রহণ করান হয়, তাকে "ধর্ম" নামে অভিহিত করাই মূঢ়তামাত্র। একই ভাবে, বিবাহও মনেরই জিনিষ—পবিত্রতা ও সতীত্ব হৃদয়েরই ধর্ম। সেজন্য পশুপ্রবৃত্তি দুরাত্মাদের অত্যাচারে নারীর দৈহিক ও মানসিক পবিত্রতার বিন্দুমাত্র হানি হয়না। সুতরাং তৎকালীন সমাজপতিগণের বিধিবিধান যাই হো'ক্ স্বয়ং হিন্দু শাস্ত্র কোনোক্রমেই এই সব দুঃস্থ, নিপীড়িত নরনারীকে জাতি ও সমাজচ্যুত কর্‌বার বিধান দিতে পারেনা। হিন্দু সংস্কৃতির মূল ভিত্তি ন্যায়, নীতি ও ঔদার্য। পুণ্যশ্লোক, প্রাতঃস্মরণীয় ঋষিরা যে ন্যায়ধর্মে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্বক অত্যাচারিত, নিরপরাধ জনগণের উপর এরূপে পুনরায় অত্যাচার কর্‌বেন, একের দোষে অন্যকে দণ্ড দেবেন, নৃশংস অত্যাচারীর পাপে অসহায় অত্যাচারিতকেই পাপীরূপে পরিত্যাগ কর্‌বেন—তা' অসম্ভব। অথচ, এরূপ নিষ্ঠুর বহিষ্করণ শাস্ত্রের নামে, ধর্মের নামে অনুষ্ঠিত হয় বলে অদ্যাপি অনেকের মনে ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান যে, শাস্ত্রমতেই এই সব দুর্গত, লাঞ্ছিত নরনারী অশুচিরূপে পরিত্যাজ্য। কিন্তু আমাদের পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে বহুস্থলে সুস্পষ্ট বিহিত হয়েছে যে, বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণ ও বিবাহ সমাজের চক্ষে সম্পূর্ণ অসিদ্ধ, সেজন্য এরূপ নরনারীর কোনোরূপ প্রায়শ্চিত্তের পর্যন্ত প্রয়োজন নেই। কোনো কোনো স্মৃতিকার লঘু প্রায়শ্চিত্তের পরে এঁদের সসম্মানে সমাজে পুনঃ প্রবেশ অনুমোদন করেছেন, কিন্তু পরিত্যাগবিধি কুত্রাপি নেই। ঈদৃশ দু' একটী বিধি এস্থলে উদ্ধৃত কর্‌ছি।

প্রথমেই একটী সাধারণ ন্যায়ের বিধান ধরা যাক্। যুক্তি, ন্যায় ও নীতির দিক্ থেকে, যা' স্বেচ্ছায় করা হয়, কেবল তা'র জন্যই কর্মকর্তা স্বয়ং দায়ী—কেবল এরূপ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্মের জন্যই তিনি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিন্দা-প্রশংসা, তিরস্কার-পুরস্কার প্রভৃতির পাত্র হ'তে পারেন—বলপূর্বক তাঁকে যা' করতে বাধ্য করা হয়, সেজন্য নিশ্চয়ই তিনি বিন্দুমাত্র দায়ী নন। বিশ্ববিশ্রুত মনুস্মৃতি এই যুক্তি ও ন্যায়ানুমোদিত বিধিই সুন্দরভাবে বল্‌ছেন :—

"বলপূর্বক যা' দত্ত হয়, বলপূর্বক যা' ভুক্ত হয়, বলপূর্বক যা' লিখিত হয়, বলপূর্বক যা' কৃত হয়—মনুর মতে, তা' সবই অকৃত বা অসিদ্ধ।" (৮-১৬৮)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ও বিষ্ণুসংহিতার মতেও : "বলপূর্বক ও ছলপূর্বক যা' সাধিত বা লিখিত হয়, তা' প্রমাণরূপে পরিগণ্য নয়।"

(যাজ্ঞবল্ক্য ৯১, বিষ্ণু ৭-৬)

অত্রিসংহিতা, অত্রিস্মৃতি, বশিষ্ঠস্মৃতি ও বৌধায়নস্মৃতি অতি প্রাচীন ও সম্মাননীয় স্মৃতিগ্রন্থ। এদের সবগুলিতেই প্রায় একই শ্লোক উদ্ধৃত করে' প্রমাণ করা হয়েছে যে, নারীরা চিরপবিত্রা, সেজন্য তাঁদের কোনোরূপ পাপ বা অপরাধ হ'তে পারেনা। বিশেষভাবে, ধর্ষিতা নারী সম্পূর্ণ নির্দোষ। তন্মধ্যে কয়েকটী শ্লোক নিম্নলিখিতরূপ :—

"বলপূর্বক ধর্ষিতা, অথবা চৌর-হস্তগতা, অথবা স্বয়ং বিপন্না, অথবা প্রতারিতা নারী অদূষিতা বলে তাকে ত্যাগ করা সম্পূর্ণ অনুচিত। নারীরা অতুল পবিত্রতাভাজন, তাঁরা কোনোক্রমেই দোষদুষ্টা হন না। অসবর্ণ কর্তৃক যে নারী সন্তান-সম্ভাবিতা হন, সেই নারী সন্তানজন্মের পূর্ব পর্যন্ত অশুদ্ধা থাকেন। কিন্তু তার পরে তিনি বিমল কাঞ্চনেরই ন্যায় শুদ্ধা হন। নারীদের সোম শুচিতা, গন্ধর্ব শুভবাক্য ও অগ্নি সর্বপবিত্রতা দান করেছেন, সেজন্য নারীরা সর্বদাই নিষ্কলুষা। বস্ত্রের মধ্যে কৌপীন শুচি, কিন্তু নারীদের মধ্যে সকলেই শুচি। অশ্বের মুখ, গাভীর পৃষ্ঠ ও ব্রাহ্মণের চরণ পবিত্র, কিন্তু নারীদের সর্বাঙ্গই পবিত্র।"

(অত্রিস্মৃতি)

মহাভারতের মোক্ষধর্ম পর্বেও সুস্পষ্ট ভাবে বিহিত আছে যে, সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষই যখন নারীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেছেন, তখন পুরুষের ত্রুটী বা অক্ষমতার জন্য নারীর অপমান সংঘটিত হ'লে, সেজন্য পুরুষই সম্পূর্ণ দায়ী, নারী নয়। মহাভারত বল্‌ছেন :—

"স্ত্রীর কোনোরূপ অপরাধ হয় না, কেবল পুরুষেরই অপরাধ হয়। মহাদোষ অনুষ্ঠিত হ'লেও, কেবল পুরুষেরই অপরাধ হয়। সর্বব্যাপারে পুরুষাধীনা বলে, নারীদের কোনো অপরাধ হয় না।" (মোক্ষধর্ম)

ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে, মহাভারতের প্রসিদ্ধতম টীকাকার নীলকণ্ঠ অধিকতর স্পষ্ট করে' বল্‌ছেন :—

"সর্বকার্যে নারী পুরুষের অধীনা বলে, বলাৎকারকৃত ব্যভিচারাদিতে নারীদের কোনোরূপ অপরাধ হয় না।"

উপরি উদ্ধৃত উদাহরণ থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত হ'বে যে, বলপূর্বক ধর্মান্তরিত নরনারী ও ধর্ষিতা নারীদের সম্বন্ধে ন্যায্য বিধিবিধান আমাদের শাস্ত্রকারগণ দিয়েছেন। পরম সুখের বিষয় যে, পূর্ববারের ন্যায় এবারও পণ্ডিতমণ্ডলী বিধান দিয়েছেন যে, পূর্ববঙ্গস্থ বা পূর্ববঙ্গাগত অত্যাচারিত সহস্র সহস্র নরনারী সম্পূর্ণ নিষ্পাপ বলে' তাঁদের প্রায়শ্চিত্তাদির কোনোরূপ প্রয়োজন নেই। এই সুচিন্তাপ্রসূত বিধান যে কেবল ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত, তাই নয়, শাস্ত্র সম্মতও সমভাবে। শাস্ত্রে অনুমোদন লাভ না করলে অদ্যাপি আমাদের মনের সন্তুষ্টি হয় না সেজন্য আমাদের হৃতসর্বস্ব, নিপীড়িত, অপমানিত ভ্রাতাভগ্নীর তৃপ্তি শান্তির জন্যে শাস্ত্রের এরূপ উদার ও উন্নত মতবাদসমূহের বহুল প্রচার আজ অত্যাবশ্যক।

ঘড়ী

ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

সময়নির্দ্দেশক যন্ত্রবিশেষকে আমরা 'ঘড়ী' বলি। এই শব্দটি সংস্কৃত 'ঘটী' বা 'ঘটিকা' শব্দের প্রাকৃত রূপ। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় 'ঘটী' বা 'ঘটিকা' শব্দের মৌলিক অর্থ 'ক্ষুদ্র পাত্র'। শব্দটির এই অর্থবিবর্ত্তনের প্রকৃত কারণ এই যে, প্রাচীন ভারতে ক্ষুদ্র জলপাত্রের সাহায্যেই সাধারণতঃ সময় নিরূপণ করা হইত। অবশ্য সময়নির্দ্ধারণের আরও নানা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল; তন্মধ্যে এজন্য জলপূর্ণ বাটীর ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক ছিল বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু সুপ্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে সময়নির্দ্দেশক যন্ত্র অর্থে 'ঘটী' বা 'ঘটিকা' শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই না। আফ্‌গানিস্থানের অন্তর্গত কাবুলের নিকট আবিষ্কৃত কুষাণবংশীয় নরপতি হুবিষ্কের একখানি লিপিতে (খ্রীষ্টীয় ১২৯ অব্দ) কালাত্মক 'ঘটিক' শব্দটির ব্যবহার দেখিয়াছি।

ঋগ্বেদে দিন ও রাত্রিভেদে অহোরাত্রের দুইটি বিভাগের উল্লেখ আছে। আবার দিনমানকে প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবনের কাল হিসাবে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে দেখা যায়। কখনও বা দিনমানের পঞ্চ বিভাগ কল্পিত হইত; যথা—(১) প্রাতঃ বা উদয়, (২) সঙ্গব, (৩) মাধ্যন্দিন বা মধ্যাহ্ন, (৪) অপরাহ্ন, এবং (৫) সায়ং সায়াহ্ন বা অস্তগমন। ইহার প্রতিভাগে তিন মুহূর্ত্ত অর্থাৎ ২ ঘণ্টা ২৪ মিনিটকাল গণনা করা হইত। ঋগ্বেদে মুহূর্ত্তের (৪৮ মিনিট) উল্লেখ হইতে ইহাকে কালগণনার একটি সুপ্রাচীন মান বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদ ৬।৯।১, ১০।৩৪।১১, ৩৫৩।৮ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। শতপথব্রাহ্মণে (১৩।৩।২) অহোরাত্রকে ত্রিশ মুহূর্ত্তে এবং বৎসরকে ৩০ × ৩৬০ = ১০৮০০ মুহূর্ত্তে বিভক্ত করা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩।১০।১) দিনমানের পঞ্চদশ মুহূর্ত্তকে চিত্র, কেতু প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত দেখা যায়। কিন্তু বৈদিকযুগে কি রীতিতে মুহূর্ত্তের পরিমাণ নিরূপিত হইত তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। পরবর্ত্তীকালীন ধর্ম্ম ও অর্থ-শাস্ত্রে দিনমান ও রাত্রিমান উভয়কে আটভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতি ভাগের জন্য নরপতির কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা হইয়াছে। ইহাতে প্রতি ভাগের পরিমাণ ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট হইত। কানে-কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, ৬৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু বিশাল ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র কালবিভাগের পদ্ধতি একরূপ ছিল না। দুই চারিটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার বুঝা যাইবে। মনুসংহিতা (১।৪৬) বলেন, ১৮ নিমেষ ($\frac{৮}{৪৫}$ সেকেণ্ড) = ১ কাষ্ঠা (৩$\frac{১}{৫}$ সেকেণ্ড), ৩০ কাষ্ঠা = ১ কলা (১ মিনিট ৩৬ সেকেণ্ড), ৩০ কলা = ১ মুহূর্ত্ত (৪৮ মিনিট), এবং ৩০ মুহূর্ত্ত = ১ অহোরাত্র (২৪ ঘণ্টা)। অমরকোষের (৩।১১-১২) কালবিভাগ কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র; কিন্তু ইহাতেও মুহূর্ত্ত প্রধান মানরূপে নির্দ্দিষ্ট। এই মতে—১৮ নিমেষ ($\frac{২}{১৩৫}$ সেকেণ্ড) = ১ কাষ্ঠা ($\frac{৪}{১৫}$ সেকেণ্ড), ৩০ কাষ্ঠা = ১ কলা (৮ সেকেণ্ড), ৩০ কলা = ১ ক্ষণ (৪ মিনিট), ১২ ক্ষণ = ১ মুহূর্ত্ত (৪৮ মিনিট), এবং ৬০ মুহূর্ত্ত = ১ অহোরাত্র (২৪ ঘণ্টা)। অভিধানপ্রদীপিকা সংজ্ঞক পালি অভিধানে বলা হইয়াছে—১০ অক্ষর ($\frac{৩৬}{১২৫}$ সেকেণ্ড) = ১ ক্ষণ (২$\frac{২২}{২৫}$ ১০ ক্ষণ = ১ লয় (২৮$\frac{৪}{৫}$ সেকেণ্ড), ১০ লয় = ১ ক্ষণলয় (৪$\frac{৪}{৫}$ মিনিট), ১০ ক্ষণলয় = ১ মুহূর্ত্ত (৪৮ মিনিট), ১০ মুহূর্ত্ত = ১ ক্ষণমুহূর্ত্ত (৮ ঘণ্টা), এবং ৩ ক্ষণমুহূর্ত্ত = ১ অহোরাত্র (২৪ ঘণ্টা)।

উদ্ধৃত গণনাগুলিতে মুহূর্ত্তকে কালবিভাগের প্রধান মান স্বীকার করা হইয়াছে; কিন্তু মুহূর্ত্তের বিভাগ সম্পর্কে কিছুমাত্র মতৈক্য দেখা যায় না। ইহার কারণ এই যে, মুহূর্ত্তকে স্থলবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে বিভক্ত করা হইত এবং এ বিষয়ে কোন প্রাচীন সর্ব্বসম্মত নিয়ম ছিল না। আবার প্রাচীন ভারতের অপর একটি সুপ্রচলিত কালবিভাগ রীতি অনুসারে অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত অর্থাৎ ২৪ মিনিট সময়কে অন্যতম প্রধান কালমান স্বীকার করা হইত বলিয়া জানা যায়। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই—২ ত্রুটি ($\frac{৩}{৫০}$ সেকেণ্ড) = ১ লব ($\frac{৩}{২৫}$ সেকেণ্ড), ২ লব = ১ নিমেষ ($\frac{৬}{২৫}$ সেকেণ্ড), ৫ নিমেষ = ১ কাষ্ঠা (১$\frac{১}{৫}$ সেকেণ্ড), ৩০ কাষ্ঠা = ১ কলা (৩৬ সেকেণ্ড), ৪০ কলা = ১ নাড়িকা (২৪ মিনিট), ২ নাড়িকা = ১ মুহূর্ত্ত (৪৮ মিনিট), এবং ১৫ মুহূর্ত্তে এক দিনমান বা রাত্রিমান। এই নাড়িকা বা নাড়ী অর্থাৎ অর্দ্ধ মুহূর্ত্তের অপর নাম ঘটী বা ঘটিকা এবং দণ্ড।

জ্যোতিষগ্রন্থাদির মতে ত্রুটি প্রভৃতির দ্বারা কালবিভাগ কাল্পনিক; সুতরাং প্রাণ অর্থাৎ নিঃশ্বাসের সাহায্যে কালভাগ কর্ত্তব্য। এই রীতিতে অনেকক্ষেত্রে মুহূর্ত্তকে পরিত্যাগ করিয়া কালবিভাগ করা হইয়াছে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত (১।১১-১২) অনুসারে—৬ নিঃশ্বাস বা প্রাণ (৪ সেকেণ্ড) = ১ বিনাড়ী (২৪ সেকেণ্ড), ৬০ বিনাড়ী = ১ নাড়ী (২৪ মিনিট), এবং ৬০ নাড়ী = ১ অহোরাত্র (২৪ ঘণ্টা)। কোন কোন গ্রন্থে বলা হইয়াছে—দশটি গুরুস্বর উচ্চারণকাল = ১ প্রাণ (৪ সেকেণ্ড), ৬ প্রাণ = ১ পল (২৪ সেকেণ্ড) এবং ৬০ পল = ১ দণ্ড (২৪ মিনিট)। এস্থলে বিনাড়ীকে 'পল' এবং নাড়ী বা নাড়িকাকে 'দণ্ড' বলা হইয়াছে। জ্যোতিষিগণ ৬০ গুরুস্বরবিশিষ্ট এক শ্লোক পাঠ করিয়া 'পল' বা বিনাড়ী নির্দ্ধারণ করিতেন; ঐ শ্লোকটী ৬০ বার পাঠ করিয়া 'দণ্ড' নিরূপিত হইত। জ্যোতিস্তত্ত্বে যে ৬০ গুরুস্বরবিশিষ্ট শ্লোক পল বা বিনাড়ী এবং দণ্ড বা ঘটিকা নিরূপণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"মা কান্তে পঙ্কস্তান্তে পর্য্যাকাশে দেশে স্বপ্নী:
কান্তং বক্ত্রং বৃত্তং পূর্ণং চন্দ্রং মত্বা রাত্রৌ চেৎ।
পুংস্কাম: প্রাটংশ্চেতশ্চেতো রাহু: ক্রূর: প্রাপ্তাৎ
তস্মাদ্ধান্তে হর্ম্ম্যস্তান্তে শষ্যোকান্তে কর্ত্তব্যা॥" (লীলাখেল বৃত্ত)

সূর্য্যসিদ্ধান্তে (১৩।২০-২২) বলা হইয়াছে যে, শঙ্কু যষ্টি, ধনুক, চক্র ইত্যাদি ছায়া মাপিবার নানা যন্ত্র, জলযন্ত্র-কপালযন্ত্রাদি, ময়ূরমূর্ত্তি, নরমূর্ত্তি, বানরমূর্ত্তি এবং বালুকাযন্ত্রের সাহায্যে সময় নিরূপিত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থে আরও বলা হইয়াছে যে, সময় নিরূপণ কার্য্যে পারদচলাচলের ছিদ্র, জল, রশি, দড়ি, তৈল, পারদ এবং বালুকা ব্যবহৃত হয়। 'হব্‌সন্‌-জব্‌সন্‌' সংজ্ঞক অভিধানেও মধ্যযুগীয় ভারতে ব্যবহৃত পানঘড়ী বা পানীঘড়ী, ধূপঘড়ী এবং রেতঘড়ী বা রেত্তা ঘড়ীর উল্লেখ দেখা যায়। ইহার প্রথমটিতে জল, দ্বিতীয়টিতে রৌদ্র এবং তৃতীয়টিতে বালুকা দ্বারা কাল নির্দ্ধারণ করা হইত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অর্দ্ধমুহূর্ত্ত জ্ঞাপক প্রধান কালমানকে নাড়ী বা নাড়িকা, ঘটী বা ঘটিকা এবং দণ্ড বলা হইত। তিনটি শব্দই কালপরিমাপক বস্তু বিশেষের নাম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। দণ্ড বলিতে মূলত: ছায়া মাপিবার যষ্টি বা শঙ্কু বুঝাইত। নাড়ী শব্দের অর্থ নল এবং ঘটী অর্থ ক্ষুদ্র জলপাত্র। এই তিনটি বস্তুই কালপরিমাপে সর্ব্বাধিক ব্যবহৃত হইত। সেজন্য এই তিনটি সদাব্যবহৃত বস্তু কালক্রমে ২৪ মিনিটের কালপরিমাণ অর্থে রূঢ় হইয়া যায়।

প্রাচীন সাহিত্যে কালপরিমাপক যন্ত্রের যে সকল বর্ণনা দেখা যায়, তাহাতে বুঝিতে পারি যে, নাড়ী এবং ঘটী একই যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ছিল। তবে যন্ত্রটি সর্ব্বত্র একপ্রকার ছিল না। সূর্য্যসিদ্ধান্তে (১২।২৩) সম্ভবত: নাড়ী(নল)-বিহীন ঘটীর উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, নিম্নে ছিদ্রসংবলিত নির্দ্দিষ্ট আকারের একটি তাম্রপাত্র জলের উপর বসাইলে অহোরাত্রির ষাট ভাগের এক ভাগ সময়ে ইহা জলপূর্ণ হইয়া ডুবিয়া যাইবে; ইহার নাম কপালযন্ত্র। কপাল ও ঘটী শব্দ দুইটি সমর্থক। শব্দকল্পদ্রুমধৃত (দণ্ড শব্দ দ্রষ্টব্য) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বলা হইয়াছে,

ষট্‌পলং পাত্রনির্ম্মাণং গভীরং চতুরঙ্গুলম্।
স্বর্ণমাষৈ: কৃতচ্ছিদ্রং কুণ্ডৈশ্চ চতুরঙ্গুলৈ:॥
যাবজ্জলপ্লুতং পাত্রং তৎকালং দণ্ডমেব চ॥ *

এ সম্বন্ধে অল্‌বীরূনীর গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড, ৩৪শ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩৩৪) একটি বর্ণনা আছে। অলবীরুনী জ্যোতিষী ব্রহ্মগুপ্ত, কাশ্মীরীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌ উৎপল, বায়ুপুরাণ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কালের সূক্ষ্ম পরিমাণ বিষয়ে বিভিন্ন ভারতীয় লেখকের মধ্যে ঐকমত্য নাই। উৎপলের গ্রন্থ হইতে তিনি নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে ছয় অঙ্গুলি গভীর একটি গোলাকার গর্ত্ত খনন করিতে হইবে। ঐ গর্ত্তের ব্যাস হইবে দ্বাদশ অঙ্গুলি এবং উহাতে তিন মনা পরিমিত জল ধরিবে। ঐ গর্ত্তের নিম্নভাগে ছয়গাছি চুল প্রবেশ করিতে পারে এইরূপ একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র করিতে হইবে। যে সময় মধ্যে তিন মনা পরিমিত জল ঐ ছিদ্রপথে বাহির হইয়া যায়, উহাই এক 'ঘটী'।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একটি ব্যবস্থায় নির্দ্দিষ্ট আকারের নিম্নে ছিদ্রবিশিষ্ট একটি পাত্র জলের উপরে বসাইয়া উহা কতক্ষণে ডুবিয়া যায়, সেই সময়ের গণনা করা হইত। দ্বিতীয় ব্যবস্থায় ঐরূপ একটি পাত্রে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জল যতক্ষণে নিঃশেষে বাহির হইয়া যায়, উহার দ্বারা কালনিরূপিত হইত। উভয় পদ্ধতির গণনাতেই অনেকক্ষেত্রে বাটীর ছিদ্রে একটি নাড়ী অর্থাৎ নল সংযুক্ত করা হইত। তখন নলযুক্ত যন্ত্রটিকে ঘটী বা নাড়ী উভয় নামেই অভিহিত করা হইত। অর্থশাস্ত্র (শামশাস্ত্রী, পৃষ্ঠা ১০৭) অনুসারে "সুবর্ণমাষকাশ্চত্বারশ্চতুরঙ্গুলায়ামা: কুম্ভচ্ছিদ্রমাঢ়কমম্ভসো বা নাড়িকা," অর্থাৎ চার মাষা স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ নলপথে কোন পাত্র হইতে এক আঢক জল বাহির হইতে যে সময় লাগে, উহাই এক নাড়িকা।

"নাড়িকা তু প্রমাণেন কলা দশ চ পঞ্চ চ।
উন্মানেনাম্ভস: সা তু পলান্যর্দ্ধত্রয়োদশ॥
হেমমাষৈ: কৃতচ্ছিদ্রা চতুর্ভিশ্চতুরঙ্গুলৈ:।
মাগধেন প্রমাণেন যক্ষপ্রস্থস্য সংস্মৃত:॥"
"দ্বাদশার্দ্ধপলোন্মানং চতুর্ভিশ্চতুরঙ্গুলৈ:।
স্বর্ণমাষৈ: কৃতচ্ছিদ্রং যাবৎপ্রস্থজলপ্লুতম্॥"

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, নাড়িকাজ্ঞানোপায়মাহ। উন্মানেনেতি সার্দ্ধেন। অম্ভস উন্মানেন, উন্মীয়তে অনেনেত্যুন্মানং পাত্রম্। অর্দ্ধেন যোগে ত্রয়োদশ সার্দ্ধদ্বাদশেত্যর্থ:। উন্মানরূপেণ ঘটিতানি সার্দ্ধদ্বাদশপলানি সা নাড়িকা। সার্দ্ধদ্বাদশপলতাম্রনির্ম্মিতপাত্রেণ সা নাড়িকা জ্ঞাতব্যেত্যর্থ:। কিং প্রমাণং তৎ পাত্রং কার্য্যং তদাহ, মাগধেন প্রমাণেন জলপ্রস্থস্য সংস্মৃত ইতি। সার্দ্ধদ্বাদশপলজলেন হি মাগধদেশপ্রস্থ: পূর্য্যতে। তৎ প্রমাণং পাত্রং কার্য্যমিত্যর্থাৎ সিদ্ধম্। ননু তথাপি পাত্রেণ কথং নাড়িকাজ্ঞানং ক্রিয়াপরিচ্ছেদ্যত্বাৎ কালস্যেত্যাশঙ্ক্য ক্রিয়াসিদ্ধয়ে প্রস্থাদি বিশিনষ্টি হেমেতি। মাষ: পঞ্চগুঞ্জ:। হেম্নো মাষৈশ্চতুর্ভিশ্চতুরঙ্গুলেন শলাকারূপেণ রচিতৈ: কৃতচ্ছিদ্রা। এতদুক্তং ভবতি, সার্দ্ধদ্বাদশপলতাম্রময়ং মাগধপ্রস্থসংমিতমূর্দ্ধ্বায়তং পাত্রং চতুর্ম্মাষচতুরঙ্গুলহেমশলাকয়া কৃতাধশ্ছিদ্রং জলে স্থাপিতং তেন ছিদ্রেণ যাবতা কালেন পূর্য্যতে তাবান্‌ কালো নাড়িকেতি।" বলা হইয়াছে যে, পাত্রটি সাড়ে বার পল তাম্রে নির্ম্মিত হইবে এবং উহার নিম্নস্থিত ছিদ্রে চারি মাষা পরিমিত স্বর্ণে নির্ম্মিত চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ শলাকা সংযুক্ত থাকিবে।

আইন-ই-অকবরী গ্রন্থে বলা হইয়াছে, "হিন্দু দার্শনিকেরা দিন ও রাত্রিকে চারিভাগে ভাগ করেন। ইহার এক ভাগের নাম প্রহর। দেশের অধিকাংশস্থানে এক প্রহরে নয় ঘড়ীর বেশী বা ছয় ঘড়ীর কম হয় না। অহোরাত্রের ষাট ভাগের এক ভাগের নাম ঘড়ী। ঘড়ীর ষাট ভাগের

---

* শব্দকল্পদ্রুমে (নাড়িকা শব্দ দ্রষ্টব্য) বিষ্ণুপুরাণ ও উহার শ্রীধরস্বামীকৃত টীকা হইতে নিম্ন শ্লোকত্রয় উদ্ধৃত হইয়াছে।—

এক ভাগকে পল এবং পলের ষাট ভাগের এক ভাগকে বিপল বলা হয়। সময় নিরূপণের জন্য একশত টাঙ্ক পরিমাণ তাম্র বা অন্য কোন ধাতু দ্বারা একটি পাত্র নির্ম্মাণ করা হয়। *** পাত্রটির আকার বাটীর ন্যায়; নিম্নভাগ কিঞ্চিৎ সরু; ইহা বিস্তারে ও উচ্চতায় ১২ অঙ্গুলি। এই পাত্রের নিম্নে ছিদ্র করিয়া ৫ অঙ্গুলি দীর্ঘ এক মাষা স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত একটি নল প্রবেশ করাইতে হয় এবং পাত্রটি অপর একটি জলপূর্ণ বৃহৎ পাত্রের উপর স্থাপন করিতে হয়। যতক্ষণ সময়ে পাত্রটি জলে পূর্ণ হইয়া যায়, উহাকে এক ঘড়ী বলা হয় এবং ইহা দিগ্বিদিকে ঘোষণা করিবার জন্যে ঘণ্টায় একবার আঘাত করা হয়। পাত্রটি দ্বিতীয়বার জলপূর্ণ হইলে ঘণ্টায় দুইবার আঘাত করা হয়। এইরূপ তিনবার, চারিবার ইত্যাদি।" সম্রাট্ বাবরের আত্ম-জীবনীতে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বে কেবল ঘড়ীর সংখ্যাই ঘণ্টাতে বাজানো হইত, প্রহরের সংখ্যা বাজানো হইত না। বাবরের আদেশে ঘড়ীর সংখ্যা বাজাইবার পরে সামান্য একটুক্ষণ বাদে প্রহরের সংখ্যা বাজাইবার ব্যবস্থা হয়। ঘণ্টা বাজাইয়া ঘড়ী (২৪ মিনিট) জ্ঞাপন করিবার ব্যবস্থা হইতে কালক্রমে ঘড়ী অর্থে ঘণ্টা শব্দ রূঢ় হইয়া যায়। পরবর্ত্তি-কালে কালগণনার প্রধান মান ২৪ মিনিট হইতে ৬০ মিনিটে পরিবর্ত্তিত হইলে এই নূতন মানের ঘড়ী এবং ঘণ্টা নামকরণ হইয়াছে।

সাধারণতঃ কাংস্য দ্বারা ঘণ্টা নির্ম্মিত হইত। আইন-ই অক্‌বরীতে বলা হইয়াছে যে, মিশ্র ধাতুতে ঘণ্টা নির্ম্মাণ করা হইত, ইহার আকার ছিল রুটি সেঁকিবার তাওয়ার মত; তবে তাওয়ার অপেক্ষা ঘণ্টা অনেক বেশী পুরু হইত। একগাছি রশিতে ইহা ঝুলানো হইত। ঘণ্টা বাজাইয়া ঘড়ী সংজ্ঞক কাল পরিমাণ বিজ্ঞাপন করা হইত বলিয়া ইহার নাম ছিল ঘড়িয়াল। ঘণ্টা বা ঘড়িয়াল বাজাইবার কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিকে ঘড়িয়ালা বা ঘড়িয়ালী বলা হইত। পরবর্ত্তী-কালে ঘণ্টাকে ঘড়ী এবং ঘণ্টাবাদককে ঘড়িয়াল বলা হইত বলিয়া জানা যায়।

১৬৬৯-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে টমাস বাউরী নামক জনৈক ইংরেজ ভ্রমণকারী বঙ্গোপসাগরের তীরবর্ত্তী দেশসমূহের এক ভৌগোলিক বৃত্তান্ত সংকলিত করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৯৫-৯৬) জল ঘড়ীর বর্ণনা দেখিতে পাই। বাউরী সাহেব বলেন যে, এক বা অর্দ্ধ পাইন্ট্ জল ধরে এইরূপ একটি নিম্নে ছিদ্রযুক্ত হালকা পাত্র জলপূর্ণ একটি বৃহৎ পাত্রের উপর বসানো হইত। ক্ষুদ্র পাত্রটি ভাসিতে ভাসিতে ডুবিয়া যাইত। একজন পর্য্যবেক্ষক সর্ব্বদা পাত্রটির নিকটে বসিয়া থাকিত। সে নিমজ্জিত পাত্রটি অবিলম্বে তুলিয়া পুনরায় ভাসাইয়া দিয়া ঘণ্টাতে এক ঘা মারিত। পাত্রটি দ্বিতীয়বার ডুবিয়া গেলে সে দুইবার ঘণ্টাতে আঘাত করিত। এইরূপে সপ্তমবারে সাতটি ঘা দিয়া প্রহর বুঝাইবার জন্য আরও একবার ঘণ্টায় আঘাত করিত। ইহার পর যতক্ষণ দুই প্রহর না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে 'ঘড়ী' বাজাইবার পরে প্রহর বুঝাইবার জন্য একটি ঘা মারিতে থাকিত। বেলা ৯টাতে এক প্রহর, ১২টাতে দুই প্রহর, ৩টাতে তিন প্রহর এবং সূর্য্যাস্তে চারি প্রহর বাজানো হইত। কাংস্যনির্ম্মিত গোলাকার ঘণ্টায় ঘড়ী ও প্রহর বাজানো হইত। উহা ছিদ্রমধ্যস্থিত রশি দ্বারা ঝুলানো থাকিত। বাউরী সাহেব বলিয়াছেন যে, হিন্দুস্থানের সম্পন্ন মুসলমানেরা সকলেই গৃহদ্বারে একটি চালার নীচে এই যন্ত্রটি রাখিয়া থাকেন; সর্ব্বদা দুইজন লোক পাত্র পর্য্যবেক্ষণ ও ঘণ্টাবাদনের জন্য নিকটে উপস্থিত থাকে, কখনও উহাদের একজন ঘুমাইলে অপর ব্যক্তি জাগিয়া যন্ত্র পর্য্যবেক্ষণ করে। সেই সময়ে ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিকেরাও মফঃস্বলের কুঠীসমূহে এই যন্ত্র দ্বারা সময় নির্দ্ধারণ করিতেন। ওয়ালেস্ নামক অপর একজন ইংরেজ লেখক দেশীয় বাণিজ্যপোতে উক্ত যন্ত্র দ্বারা সময় নির্দ্ধারণের ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন। 'হব্‌সন-জব্‌সন্' সংজ্ঞক অভিধানে 'ঘড়ী' শব্দ দ্রষ্টব্য। দক্ষিণ ভারতের অনেক অঞ্চলে আজিও বিবাহের লগ্ন নির্দ্ধারণের এই জল ঘড়ীর জন্য ব্যবহার প্রচলিত আছে। কর্ণাটদেশীয় পুরোহিতেরা সকলেই এক একটি ঘটী যন্ত্র রাখিয়া থাকেন বলিয়া শুনিয়াছি। বিলাতী ঘড়ীদ্বারা লগ্নাদি নির্দ্ধারিত হইলেও এই কার্য্যে পুরোহিত বিশেষভাবে ঘটী যন্ত্র ব্যবহার করেন এবং ঐ অনুষ্ঠানের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রাপ্য লাভ করিয়া থাকেন।

উপরের আলোচনা হইতে ঘটী বা ঘটিকা অর্থাৎ ঘড়ী শব্দের কত প্রকার অর্থ বিস্তার ঘটিয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে। প্রথমতঃ ঘটী শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র পাত্র। দ্বিতীয়তঃ যে জলপাত্র সাহায্যে অহোরাত্রির ৬০ ষাট ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ২৪ মিনিট সময় নির্দ্ধারণ করা হইত, উহাকে ঘটী বলা হইত। তৃতীয়তঃ, ২৪ মিনিট কালের পরিমাণের নাম হইল ঘটী বা ঘড়ী। চতুর্থতঃ যে ঘণ্টা বাজাইয়া এক ঘড়ী বা ২৪ মিনিট সময় উত্তীর্ণ হইবার সংবাদ ঘোষণা করা হইত, উহার নাম হইল ঘড়ী। পঞ্চমতঃ সময় নির্দ্দেশক যে কোন যন্ত্রেরই ঘড়ী নাম হয়। ষষ্ঠতঃ প্রাচীন ঘড়ী অর্থাৎ ২৪ মিনিটের পরিবর্ত্তে পরবর্ত্তীকালে স্বীকৃত ৬০ মিনিটের প্রধান কাল মান বুঝাইতে ঘড়ী শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এইরূপে ঘণ্টা শব্দেরও অর্থ বিস্তার ঘটিয়া কাংস্য নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ হইতে পরে আধুনিক ৬০ মিনিট বোধক প্রধান কাল মানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

রঞ্জিট্রফি ফাইনাল ঃ

বরোদা ঃ ৪৩৭ ও ২৫৮ (৬ উইকেটে)

হোলকার ঃ ৪১৯ ও ২৭২

বরোদায় অনুষ্ঠিত আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বরোদা ৪ উইকেটে হোলকারদলকে পরাজিত ক'রে রঞ্জিট্রফি বিজয়ী হয়েছে। প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে বরোদা এক ইনিংস ১২৫ রাণে মাদ্রাজকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে। দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে হোলকার প্রথম ইনিংসের রাণে দিল্লী ডিষ্ট্রিক্ট দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে বরোদা দলের সঙ্গে মিলিত হয়। হোলকার টসে জিতে প্রথম ইনিংসে ৪১৯ রাণ ক'রে। দলের সর্ব্বোচ্চ ১৪০ রাণ করেন মুস্তাক আলি। বরোদার প্রথম ইনিংসে ৪৩৭ রাণ উঠলে বরোদা ১৮ রাণে অগ্রগামী হয়। বিজয় হাজারে দলের সর্ব্বোচ্চ ১৩০ রাণ করেন। হাজারে এবং গুল মহম্মদ পঞ্চম উইকেটের জুটিতে ১৮৮ রাণ করেন। এই রাণ ১৯৪৬ সালে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ৫ম উইকেটে প্রতিষ্ঠিত ১২৮ রাণের রেকর্ড ভঙ্গ করে। সি এস নাইডু ১৮২ রাণে ৫টা উইকেট পান। দলের উল্লেখযোগ্য রাণ এস কে ভাইচারে ৭৪, গুল মহম্মদ ৭২। হোলকার দল ১৮ রাণ পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ২৭২ রাণ তুলে। সি টি সারভাতের ৬৬ এবং জে এন ভায়ার ৬৪ রাণ উল্লেখযোগ্য। আমীর ইলাহী ৬৬ রাণে ৪ এবং বিবেক হাজারে ৬৬ রাণে ৩টে উইকেট পান।

বরোদা দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে; জয়লাভের তখন ২৫৫ রাণ প্রয়োজন, হাতে সময় ৫ ঘণ্টা ৫ মিনিট। খেলা ভাঙ্গবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট আগে বরোদা দল ৬ উইকেটে ২৫৮ রাণ তুলে ৪ উইকেটে জয়লাভ করে। বিজয় হাজারে এবারও দলের সর্ব্বোচ্চ ১০১ রাণ করেন। সি এস নাইডু ৯০ রাণে ৪টা উইকেট পান। অধিকারী নট আউট ৪২ রাণ করেন। এই নিয়ে বরোদা তিনবার রঞ্জিট্রফি পেল।

রঞ্জিট্রফি প্রতিযোগিতার বিভিন্ন অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত ফলাফল—

উত্তরাঞ্চল: দিল্লীতে দিল্লী এ্যাণ্ড ডিষ্ট্রিক্টস ১১৮ রাণে রাজপুতানাকে পরাজিত করে। পাতিয়ালায় দক্ষিণ পাঞ্জাব ৬ উইকেটে সার্ভিসেস একাদশ দলকে পরাজিত করে।

ফাইনাল: দিল্লীতে দিল্লী ডিষ্ট্রিক্ট প্রথম ইনিংসের রাণের উপর দক্ষিণ পাঞ্জাবকে পরাজিত করে।

পূর্ব্বাঞ্চল: জামসেদপুরে বিহার ৩১৬ রাণে উড়িষ্যাকে পরাজিত করে। জামসেদপুরে বিহার ৪৭ রাণে উত্তর প্রদেশকে হারায়। জোড়হাটে হোলকার এক ইনিংস এবং ৫৫ রাণে আসামকে পরাজিত করে।

ইন্দোরে হোলকার পশ্চিম বাংলাকে ১০৬ রাণে পরাজিত করে।

পূর্ব্বাঞ্চল-ফাইনাল: ইন্দোরে হোলকার ৫ উইকেটে বিহারকে পরাজিত করে।

দক্ষিণাঞ্চল: মাদ্রাজে মাদ্রাজপ্রদেশ ৩ উইকেটে মহীশূরকে পরাজিত করে। সেকেন্দ্রাবাদে হায়দ্রাবাদ ৮ উইকেটে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারকে পরাজিত করে।

দক্ষিণাঞ্চল-ফাইনাল: মাদ্রাজ ১২৭ রাণে হায়দ্রাবাদকে পরাজিত করে।

পশ্চিমাঞ্চল : আমেদাবাদে গুজরাট ৬ উইকেটে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে। বরোদায় বরোদা এক ইনিংস ও ১৮ রানে বোম্বাইকে পরাজিত করে।

বরোদায় বরোদা এক ইনিংস ৫৭ রাণে কাথিয়ার দলকে হারায়।

পশ্চিমাঞ্চল-ফাইনাল : বরোদায় বরোদা প্রথম ইনিংসের রাণে গুজরাট দলকে পরাজিত করে।

প্রথম সেমি-ফাইনাল : মাদ্রাজ, পশ্চিমাঞ্চল ফাইনাল-বিজয়া বরোদা এক ইনিংস এবং ১২৫ রাণে দক্ষিণাঞ্চল-ফাইনাল বিজয়ী মাদ্রাজকে পরাজিত করে।

দ্বিতীয় সেমি-ফাইনাল : নিউ দিল্লী, পূর্ব্বাঞ্চল-ফাইনাল-বিজয়ী হোলকার প্রথম ইনিংসের রাণে উত্তরাঞ্চল-ফাইনাল বিজয়ী দিল্লী দলকে পরাজিত করে।

অল-ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টনচ্যাম্পিয়ান-সীপ ঃ

লণ্ডনের অল-ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়াসীপ প্রতি-যোগিতায় জয়লাভ করা 'world title' লাভের সমান। মালয়ের ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ান ওয়াঙ পেং সুন খ্যাতনামা ডেনিস ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় পল হোমকে ষ্ট্রেট সেটে পরাজিত ক'রে পুরুষদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছেন। দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড় বি এন শেঠ সুইডিস চ্যাম্পিয়ান খেলোয়াড় নিলস জনসনের কাছে ১৫-৭, ১৫-৬ পয়েণ্টে হেরে যান। অপর দু'জন ভারতীয় খেলোয়াড় ভি চন্দর এবং এ বর্ম্মাকে প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দেওয়া হয়। খেলার ৫টি বিভাগেই বিদেশী খেলোয়াড়রা চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১২ বছর আগে ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা শেষ বারের মত সকল বিষয়েই বিজয়ী হয়েছিলো। এ বছর একমাত্র সিঙ্গলস ছাড়া বাকি সকল বিষয়েই ডেনমার্কের খেলোয়াড়রা জয়লাভ করেছেন।

গত বছরের সিঙ্গলস বিজয়া ডেভী ফ্রিম্যান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় হিসাবে সুপরিচিত। তিনি একাদিক্রমে অনেক বছর ধরে আমেরিকায় ব্যাডমিণ্টন খেলায় প্রভুত্ব বজায় রেখেছিলেন। বর্ত্তমানে অবসর গ্রহণ করায় এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নি।

খেলার ফলাফল :

পুরুষদের সিঙ্গলসে ওয়াং পেং সুন (মালয়) ১৫-৭, ১৫-১০ পয়েণ্টে পল হোমকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে মিসেস্ টনি আহম (ডেনমার্ক) ১১-৪, ১১-৬ পয়েণ্টে মিস এ্যাসিজ্যাকবসেনকে (ডেনমার্ক) মাত্র ১২ মিনিটে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলসে জর্ণ স্কারুপ এবং প্রোবেন ডাবলেনটিন (ডেনমার্ক) ৯-১৫, ১৫-২, ১৫-১২ পয়েণ্টে পল হোম এবং বর্জ ফ্রেডারিকসেনকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলসে মিসেস টনি আহম এবং মিস ক্রিষ্টেন থোর্নডাহল ১৬-১৭, ১৫-৫ এবং ১৫-৮ পয়েণ্টে পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়িণী মিসেস বেটী উবার এবং মিসেস কুইনী এ্যালেনকে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে মিসেস টনি আহম এবং পল হোম (ডেনমার্ক) ১৫-৩, ১৫-৪ পয়েণ্টে জর্ণ স্কারুপ এবং মিসেস রোষ্টগার্ড ফ্রোহনীকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

মহিলাদের প্রাদেশিক হকি ঃ

ভূপালে অনুষ্ঠিত মহিলাদের ইণ্টার-ষ্টেট হকি চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালের দ্বিতীয় দিনে মধ্য প্রদেশদল ১-০ গোলে পশ্চিম বাঙ্গলাদলকে পরাজিত করেছে।

সাঁতারে রেকর্ড ভঙ্গ ঃ

১০০ গজ ব্যাক ষ্ট্রোক : গিরটজী উইলিমা (১৫ বছরের ডাচ বালিকা) সময়—১ মিঃ ৪৬সেঃ। সরকারী রেকর্ড : কোর কিং (ডাচ), সময়—১মিঃ ৫১ সেঃ (১৯৩৯)।

অষ্ট্রেলিয়ান সাঁতারু জন মার্শেল নিম্নলিখিত বিষয়ে পৃথিবীর নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

২০০ গজ ফ্রিষ্টাইল : ২মিঃ ৫.৪ সেঃ

২০০ মিটার : ২মিঃ ৪'৬ সেঃ

৪৪০ গজ ফ্রিষ্টাইল : ৪মিঃ ৩৪.৩৮ সেঃ (১২.৩.৫০)

৪০০ মিটার ফ্রিষ্টাইলঃ ৪মিঃ ৩৩.১ সেঃ (১২.৩.৫০)

২০০ গজ ব্রেষ্টষ্ট্রোক : বব ব্লাউনার ; সময়—২মিঃ ১৩.১সেঃ

১০০ গজ ব্রেষ্টষ্ট্রোক : জো ভার্দুয়ার (আমেরিকা) ৫৯.৪

সেকেণ্ডে উক্ত দূরত্ব অতিক্রম ক'রে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিষ্ঠিত কিথ কার্টারের (আমেরিকা) রেকর্ডের সমান করেছেন।

ন্যাশনাল এ্যামেচার বক্সিং চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ন্যাশানাল এ্যামেচার বক্সিং চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলা এবং বোম্বাই প্রদেশ যুক্তভাবে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। সাতটি বিষয়ের মধ্যে বাঙ্গলা জয়ী হয়েছে ব্যাণ্টমওয়েট, লাইটওয়েট এবং লাইট হেভীওয়েটে। অপরদিকে বোম্বাই প্রদেশ জয়ী হয় ফ্লাইওয়েট, ওয়াণ্টার ওযেট এবং মিডলওয়েটে।

ফেদার ওয়েটে মাদ্রাজ জয়ী হয়।

ন্যাশনাল হকি চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাঞ্জাব ৪-২ গোলে ভূপালকে হারিয়ে পুনরায় চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে।

অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ বোট রেস ঃ

গত ১লা এপ্রিল ৯৬ বাৎসরিক অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ বোট রেসে কেম্ব্রিজ ৩ই লেংথে অক্সফোর্ডকে পরাজিত করেছে। প্রতিযোগিতার দূরত্ব ৪½ মাইল। আজ পর্য্যন্ত কেম্ব্রিজ ৫২ বার জয়লাভ করেছে, অক্সফোর্ড ৪৩ বার জয়ী হয়। একবার ১৮৭৭ সালে ড্র যায়।

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত স্বরলিপি "সুরবিহার" (১ম খণ্ড)—৪৲
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত "মহামায়া"—১৷৷৹
পরিমলবন্ধু দাস প্রণীত "পতিতের দাবী"—1৹,
"শ্রীভগবানের দায়বোধ"—1৹
শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী প্রণীত "বিরহি-মাধব"—১৲
শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত শিশু-নাটিকা "স্বাধীনতা জাগলো"—৷৷
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত সংক্ষেপিত "দুর্গেশনন্দিনী"—১৲
মনোরঞ্জন ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "পরিবর্ত্তন"—১৲

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

আগামী আষাঢ় হইতে "ভারতবর্ষের" অষ্টত্রিংশ ব আরম্ভ হইবে। বিগত ৩৭ বৎসর যাবৎ "ভারতবর্ষ" বাঙলা সাহিত্যের কিরূপ সেবা করিয়া আসিতেছে, তাহা আমাদের পাঠকগোষ্ঠীর অবিদিত নয়। আশা করি, সকলে আমাদের সহিত পূর্বের মতই সংযোগিতা করিবেন।

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৭৷৷৹, ভি-পিতে ৭৸৵৹, ষাণ্মাসিক মণিঅর্ডারে ৪৲, ভি-পিতে ৪৷৵৹। ভি-পিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা **মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক**। ভি-পির টাকা অনেক সময় বিলম্বে পাওয়া যায়, ফলে পরবর্ত্তী সংখ্যা পাঠাইতেও বিলম্ব হয়। গ্রাহকগণের টাকা ২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে না পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা আমরা ভি-পিতে পাঠাইব। পুরাতন ও নূতন সকল গ্রাহকই অনুগ্রহপূর্বক মণিঅর্ডার কুপনে পূর্ণ ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে গ্রাহক নম্বর দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ "নূতন" কথাটি লিখিয়া দিবেন।

কর্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

তপোবনে দুষ্মন্ত

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শীত (ব্রোঞ্জ)

ভাস্কর—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৭

দ্বিতীয় খণ্ড | সপ্তত্রিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

বিলাতী খ্রীষ্টান ও ভারতীয় হিন্দু

রাজশেখর বসু

ষাট সত্তর বৎসর পূর্বে শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর বিতর্কের প্রধান বিষয় ছিল ধর্মমত। রামমোহন বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত অনেক মনীষী পাদরীদের সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধ করেছিলেন। তার পর রাজনীতির চাপে ধর্মের সমালোচনা ক্রমশ লুপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু ফ্যাশন ও রুচি নিরন্তর বদলায়, কালক্রমে পুরনো বিষয়ও রুচিকর বা কৌতূহলজনক হতে পারে। এই বিশ্বাসে আধুনিক বিলাতী খ্রীষ্টীয় সমাজের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুসমাজের কিঞ্চিৎ তুলনা করছি। হিন্দুর সম্বন্ধে যা লিখ্‌ছি তা প্রধানত বাঙালীর উদ্দেশে হলেও বহু অবাঙালী সম্বন্ধেও খাটে। সম্প্রতি 'হিন্দু' শব্দের অর্থ প্রসারিত হয়েছে—ভারত-জাত-ধর্মাবলম্বী সকলেই হিন্দু। এই প্রবন্ধে কেবল সনাতনপন্থী হিন্দু অর্থে 'হিন্দু' শব্দ প্রয়োগ করছি।

রিলিজন শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নেই। হিন্দুধর্ম বললে যা বোঝায় তা ঠিক রিলিজন নয়, কিন্তু বৈষ্ণব বা ব্রাহ্ম ধর্মকে রিলিজন বলা চলে। ক্রীড অর্থাৎ নির্দিষ্ট বিশ্বাস বা মূলমন্ত্র না থাকলে রিলিজন হয় না। খ্রীষ্টধর্মের ক্রীড আছে, যথা—ট্রেনিটি বা ঈশ্বরের ত্রিত্ব, যিশুর অলৌকিক জন্ম, মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাঁর ক্রুসারোহণ, মৃত্যুর পর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ, মানুষের পরিত্রাণের নিমিত্ত যিশুশরণের আবশ্যকতা, ইত্যাদিতে বিশ্বাস। ব্রাহ্মধর্মেরও ক্রীড আছে। অনেকে মনে করেন হিন্দুরও আছে, যথা—বেদ, জাতিভেদ, পুনর্জন্ম ও মূর্তিপূজায় আস্থা, খাদ্যাখাদ্য-বিচার, ইত্যাদি। কিন্তু এর একটিও হিন্দুত্বের সুনির্দিষ্ট বা অপরিহার্য লক্ষণ নয়। আমরা 'বেদবাক্য' বলি, কিন্তু

তা কেবল কথার কথা। সাধারণ হিন্দু বেদের কোনও খবরই রাখে না, সুতরাং বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠে না। আজকাল জাতিভেদ পুনর্জন্ম প্রভৃতি না মানলেও হিন্দুত্বের হানি হয় না। যে নিজেকে হিন্দু বলে, দু-একটি নৈমিত্তিক কর্ম (যেমন শ্রাদ্ধ) সনাতন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করে, এবং যার সঙ্গে অন্যান্য হিন্দুর অল্পাধিক সামাজিক সম্বন্ধ থাকে সেই হিন্দু। আচার ব্যবহার হিন্দুর লক্ষণ নয়। নিত্য নিষিদ্ধ খাদ্য খেলে, বিজাতীয় পোশাক পরলে, সিভিল বিবাহ বা মেম বিবাহ করলে, এবং সম্পূর্ণ নাস্তিক হলেও হিন্দুত্ব বজায় থাকে।

বিলাতের (ব্রিটেনের) অধিকাংশ লোক খ্রীষ্টধর্মের দুই শাখার অন্তর্ভুক্ত—প্রোটেস্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিক। প্রথম শাখার লোকই বেশী, কিন্তু তাদের মধ্যেও নানা সম্প্রদায় আছে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র চার্চ বা ধর্মসংঘ আছে। সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী সংঘ চার্চ অভ ইংলাণ্ড। বিভিন্ন প্রোটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়ের ক্রীডের প্রধান অংশ এক হলেও খুঁটিনাটি নিয়ে বিবাদ আছে, সেজন্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ের গির্জা আলাদা, পাদরী-নিয়োগের পদ্ধতিও আলাদা। কিন্তু ক্যাথলিকদের দলাদলি নেই, বিলাতের তথা সকল দেশের ক্যাথলিক একই ধর্মসংঘের অন্তর্গত এবং ধর্মকর্মে পোপের শাসনই চূড়ান্ত বলে মানে।

ব্রিটিশ রাজ্যে সকল ধর্মাবলম্বী নানা বিষয়ে সমান অধিকার ভোগ করলেও চার্চ অভ ইংলাণ্ডের প্রতি কিছু পক্ষপাত করা হয়। পূর্বে এই সংঘ যে সরকারী অর্থ-সাহায্য পেত তা এখন বন্ধ হয়েছে, কিন্তু সংঘের সম্পত্তি নানাপ্রকার কর থেকে মুক্ত। চার্চ অভ ইংলাণ্ডের অনেক বিশপ হাউস অভ লর্ড্স-এ সদস্যরূপে আসন পান। ব্রিটেনকে লোকায়ত রাষ্ট্র বা secular state বলা চলে না, অন্তত কংগ্রেসের নেতারা ভারতকে যেমন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র করতে চান বিলাত তেমন নয়। বিলাতের রাজাই চার্চ অভ ইংলাণ্ডের প্রধান, তাঁর অন্যতম উপাধি Defender of the Faith। পাকিস্থানী নেতারা যেমন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ইসলামী নীতির প্রতিষ্ঠা চান, ব্রিটিশ নেতারাও তেমনি বলে থাকেন যে christian ideal না মানলে রাষ্ট্রের মঙ্গল নেই। বিলাতী রেডিওতে প্রত্যহ যে ধর্মকথা প্রচারিত হয় তা প্রধানত প্রোটেস্টাণ্ট খ্রীষ্টধর্ম, ক্যাথলিক প্রভৃতি সম্প্রদায় বিশেষ প্রশ্রয় পান না। কয়েক বৎসর থেকে নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) ও যুক্তিবাদী (rationalist) সম্প্রদায় তর্ক করছেন যে ব্রিটিশ প্রজা কেবল প্রোটেস্টাণ্ট নয়, কেবল খ্রীষ্টানও নয়। বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নানা সম্প্রদায় বিলাতে বাস করে, তারা নিজ নিজ মত প্রচারের অধিকার পাবে না কেন? প্রবল আন্দোলনের ফলে কর্তারা নিতান্ত অনিচ্ছায় অখ্রীষ্টান যুক্তিবাদী সম্প্রদায়কেও কিছু কিছু প্রচারের অধিকার সম্প্রতি দিয়েছেন। পাদরীরা তাতে মোটেই খুশী হন নি।

কয়েক বৎসর পূর্বেও বিলাতে রবিবারে থিয়েটার সিনেমা বল-নাচ ফুটবল-ম্যাচ প্রভৃতি নিষিদ্ধ ছিল, পাছে ওই দিনের পবিত্রতা নষ্ট হয়। গত যুদ্ধের সময় সৈন্যদের আবদারের ফলে এই নিয়মের কড়াকড়ি এখন অনেকটা কমেছে। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পাদরী বাহাল থাকেন, সপ্তাহে একদিন উপাসনায় যোগ দেওয়া ও ধর্মকথা শোনা সৈন্যদের অবশ্য কর্তব্য। অবিশ্বাসী সৈন্যরা নিষ্কৃতি পেতে পারে, কিন্তু তাতে অনেক বাধা। সম্প্রতি বিলাতের সমস্ত বিদ্যালয়ে নিয়মিত ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। যে শিক্ষক খ্রীষ্টধর্মে নিষ্ঠাহীন অথবা যিনি নিষ্ঠার ভান করতে পারেন না তাঁর চাকরির আশা নেই।

বিলাতে খ্রীষ্টধর্ম রক্ষার জন্য যে সুনিয়ন্ত্রিত প্রবল চেষ্টা এবং নিষ্ঠাবান জনসাধারণের উৎসাহ দেখা যায়, ভারতে হিন্দুধর্মের জন্য সেরকম কিছু নেই। এদেশের গুরু ও পুরোহিতের সঙ্গে কতকটা মিল থাকলেও বিলাতী পাদরীদের প্রভাব আরও বেশী ও ব্যাপক। চার্চ অভ ইংলাণ্ড, স্কটিশ চার্চ এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চ প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী। এই সকল ধর্মসংঘের কর্তৃত্বেই পাদরীদের শিক্ষা, নিয়োগ, বদলি, শাসন, পদোন্নতি এবং বেতনের ব্যবস্থা হয়।

এদেশে ব্রাহ্মদের একাধিক সমাজ আছে, প্রত্যেক ব্রাহ্ম বলতে পারেন যে তিনি অমুক সমাজের। এই বিষয়ে ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টানে সাদৃশ্য আছে কিন্তু সনাতনপন্থী

হিন্দুর পৃথক পৃথক সমাজ বা ধর্মসংঘ নেই। মঠ অনেক আছে, মঠের সম্পত্তি এবং উপাসকেরও অভাব নেই, কিন্তু মঠের নাম অনুসারে গৃহস্থ হিন্দুর সাম্প্রদায়িক পরিচয় দেবার রীতি নেই। মঠ ও চার্চ একজাতীয় সংঘ নয়। এদেশের গুরু ও পুরোহিতদের আর্থিক অবস্থা যেমনই হ'ক, তাঁরা স্বাধীন, কোনও সংঘের শাসন তাঁদের মানতে হয় না।

ষাট সত্তর বৎসর পূর্বে বাঙালী হিন্দুর পক্ষে আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে উদাসীন হওয়া সহজ ছিল না। পইতা না থাকা এবং সন্ধ্যাবন্দনা না করা ব্রাহ্মণের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত গণ্য হত। অব্রাহ্মণকেও নানা রকম অনুষ্ঠান পালন করতে হত। প্রকাশ্যে মুরগি খাওয়া চলত না, কিন্তু মদ খাওয়া মার্জনীয় ছিল। কুলগুরু এবং পুরোহিতদের প্রতিপত্তি এখনকার চেয়ে বেশী ছিল, কিন্তু মঠধারী বা সন্ন্যাসী গুরুর বাহুল্য ছিল না। কালক্রমে হিন্দুর ধর্মানুষ্ঠানে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ক্রিয়াকর্ম ছাড়া হিন্দুকে কোনও কালেই কোনও রকম ক্রীড মানতে হয় নি এবং আজকাল অনেক অনুষ্ঠানও বর্জন করা চলে। যিশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের একজাত পুত্র—এ কথা আধুনিক খ্রীষ্টানকেও মানতে হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম বা বিষ্ণুর অংশ, কিংবা শুধুই মানুষ বা কাল্পনিক পুরুষ—আধুনিক হিন্দু যেমন ইচ্ছা বিশ্বাস করতে পারে।

সেকালের তুলনায় একালের হিন্দুর অনেক অন্ধ সংস্কার দূর হয়েছে, কিন্তু এখনও যা আছে তা পর্বতপ্রমাণ। অনেক সুশিক্ষিত হিন্দু ফলিত জ্যোতিষ ও মাদুলি-কবচে বিশ্বাস করেন, তার প্রমাণ নিত্য নূতন নূতন রাজজ্যোতিষীর অভ্যুত্থান এবং খবরের কাগজে তাঁদের বড় বড় বিজ্ঞাপন। স্বামী, বাবা, ঠাকুর ইত্যাদি উপাধিধারী অনেক মন্ত্রদাতা গুরুর উদ্ভব হয়েছে, এঁদের শিষ্যও অসংখ্য। এই শিষ্যরা কেবল ধর্মকামনায় বা পারমার্থিক জ্ঞানলাভের জন্য অথবা শোকদুঃখে সান্ত্বনার জন্য গুরুবরণ করেন না, অনেকে বিশ্বাস করেন যে তাঁদের চাকরির উন্নতি, ভাল জায়গায় বদলি এবং রোগের নিবৃত্তিও গুরুর অলৌকিক শক্তিবলে সাধিত হবে। সব রকম সাংসারিক সংকটে তাঁরা গুরুর উপর নির্ভর করে থাকেন।

পাশ্চাত্ত্য দেশেও, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কিছু কিছু গুরুর প্রভাব আছে, কিন্তু এখানকার মত ব্যাপক নয়। ব্রিটেন ও অন্যান্য কয়েকটি দেশে ভাগ্যগণনা ও মাদুলি-কবচের ব্যবসায় প্রতারণারূপে গণ্য এবং আইন অনুসারে দণ্ডনীয়। কিন্তু আস্থাবান লোক সেখানেও কিছু আছে, তাদের জন্য গোপনে এই সকল ব্যবসায় চলে। মোটের উপর বলা যেতে পারে যে এদেশের শিক্ষিত সমাজের অন্ধ বিশ্বাস বিলাতী শিক্ষিত সমাজের তুলনায় অনেক বেশী। কিন্তু হিন্দুর সৌভাগ্য এই, যে ক্রীডের বন্ধন থেকে সে চিরকাল মুক্ত।

অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে এডোআর্ড গিবন তাঁর বিখ্যাত রোমান সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস রচনা করেন। এই গ্রন্থে এক স্থানে তিনি লিখেছেন—

The various modes of worship which prevailed in the Roman world were all considered by the people as equally true, by the philosopher as equally false and by the magistrate as equally useful. And thus toleration produced not only mutual indulgence, but even religious concord. The philosophers of antiquity...viewing with a smile of pity and indulgence the various errors of the vulgar, practised the ceremonies of their fathers, devoutly frequented the temples of the gods; and sometimes condescending to act a part on the theatre of superstition, they concealed the sentiments of an atheist under the sacerdotal robes. Reasoners of such a temper were scarcely inclined to wrangle about their respective modes of faith or worship. It was indifferent to them what shape the folly of the multitude might choose to assume; and they approached with the same external reverence the altars of the Libyan, the Olympian, or the Capitoline Jupiter.

প্রাচীন রোমান ফিলসফারদের ধর্মমত সম্বন্ধে গিবন যা লিখেছেন তা অসংখ্য আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুর সম্বন্ধেও

খাটে। এই মিলের কারণ—রোমান ও হিন্দু নাগরিক দুইই পেগান ও ক্রীডশূন্য। সাধারণত দেখা যায়, পৌরুষের অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের প্রবর্তিত ধর্মই ক্রীডের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ জৈন খ্রীষ্টান মুসলমান ও শিখ ধর্মে ক্রীড আছে। কিন্তু অপৌরুষেয় ধর্ম, যেমন গ্রীক ও রোমানদের পেগান ধর্ম এবং সনাতন হিন্দু ধর্ম ক্রীডবর্জিত। যারা তেত্রিশ বা তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা করে এবং সেই সঙ্গে এক পরমাত্মাকে মানতেও যাদের বাধে না, তারা সহজেই মাঝে মাঝে পুরাতন দেবতা বর্জন এবং নূতন দেবতা গ্রহণ করতে পারে। অন্য ধর্মের প্রতি তাদের আক্রোশও থাকে না। ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি এখন আর পূজা পান না, কিন্তু শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ দেবতার আসন পেয়েছেন, ভারতমাতা ও বঙ্গমাতাও দেবতা-রূপে গণ্য হয়েছেন। রূপকের আশ্রয়ে জন্মভূমিকে দুর্গা কমলা ও বাণীর সঙ্গে একীভূত কল্পনা করা হিন্দুর পক্ষে সহজ, কিন্তু একেশ্বরপূজকের তা ক্রীডবিরুদ্ধ। এই কারণেই 'বন্দেমাতরম্' অন্যতর জাতীয় সংগীত রূপে গণ্য হয় নি, লোক ভোলাবার জন্য তাকে শুধু 'সমান মর্যাদা' দেওয়া হয়েছে। বহু আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু বকরিদের খাসির মাংস অথবা খ্রীষ্টান ইউকারিস্ট সংস্কারে নিবেদিত রুটির টুকরো পেলে বিনা দ্বিধায় খেতে পারেন, কারণ তাঁদের দৃষ্টিতে এসকল বস্তু খাদ্য মাত্র। কিন্তু খ্রীষ্টান মুসলমান এবং গোঁড়া ব্রাহ্মর পক্ষে হিন্দু দেবতার প্রসাদ খাওয়া সহজ নয়, তাঁরা মনে করেন এপ্রকার খাদ্যে পৌত্তলিক বিষ আছে, খেলে আত্মা ব্যাধিগ্রস্ত হবে।

মধ্যযুগে ইওরোপে দার্শনিক ও প্রাকৃতিক বিষয় সম্বন্ধে যে সকল মত প্রচলিত ছিল তার ভিত্তি বাইবেল এবং আরিস্টটল প্রভৃতি গ্রীক পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত। এই অদ্ভুত সমন্বয়ের বিরুদ্ধে কোনও খ্রীষ্টান কিছু বললে তার প্রাণসংশয় হত। ষোড়শ শতাব্দে ভিয়েনা নগরে সের্ভেটস নামে এক শারীর বিজ্ঞানী ছিলেন। হৃৎপিণ্ডে রক্তের গতি সম্বন্ধে তিনি প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে লেখেন। তাঁর আরও গুরুতর অপরাধ—বাইবেলে জুডিয়া প্রদেশের যে বর্ণনা আছে তার প্রতিবাদে তিনি বলেন, জুডিয়ায় দুগ্ধমধুর স্রোত বয় না, এ স্থান মরুভূমির তুল্য। এ প্রকার শাস্ত্রবিরুদ্ধ উক্তির জন্য তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়। সূর্য ঘোরে না, পৃথিবীই ঘোরে—এই মত প্রকাশের জন্য গালিলিওকে কারাগারে যেতে হয়েছিল, অবশেষে তিনি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় অন্যরকম লিখে অতি কষ্টে মুক্তি পেয়েছিলেন।

আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রে পৃথিবী সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, যেমন—সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণ করে, বাসুকি বা দিগ্‌গজগণের মস্তকের উপর পৃথিবী আছে, ইত্যাদি। ষষ্ঠ শতাব্দে আর্যভট বলেছেন, পৃথিবীই আবর্তন করে। দ্বাদশ শতাব্দে ভাস্করাচার্য বলেছেন, পৃথিবীর যদি কোনও মূর্তিবিশিষ্ট আধার থাকত তবে সেই আধারের জন্য অন্য আধার এবং পর পর অসংখ্য আধার আবশ্যক হত ; পৃথিবী নিজের শক্তিতেই আকাশে আছে। আর্যভট ও ভাস্করাচার্য ক্রীডহীন হিন্দুসমাজে জন্মেছিলেন তাই শাস্ত্রবিরুদ্ধ উক্তির জন্য তাঁদের পুড়ে মরতে হয় নি।

বাইবেলের মতে খ্রীষ্ট জন্মের চার হাজার বৎসর পূর্বে জগতের সৃষ্টি হয়েছিল এবং ঈশ্বর ছ দিনের মধ্যে আকাশ ভূমি পর্বত এবং সর্বপ্রকার উদ্‌ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টি করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগে ভূবিজ্ঞানী লায়েল তাঁর গ্রন্থে লিখলেন যে পৃথিবীর বয়স বহু কোটি বৎসর। কিছুকাল পরে ডারউইন প্রচার করলেন যে বহুকালব্যাপী ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে পূর্বতন জীব থেকে নব নব জীবের উৎপত্তি হয়েছে। লায়েল ও ডারউইনের উক্তিতে সর্ব শ্রেণীর খ্রীষ্টান (মায় গ্ল্যাডস্টোন) খেপে উঠলেন। তখন পাষণ্ডদের পোড়াবার রীতি উঠে গিয়েছিল তাই লায়েল ডারউইন ও তাঁদের শিষ্যরা বেঁচে গেলেন। তার পর বহু বিজ্ঞানীর চেষ্টার ফলে নূতন মত সুপ্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু এখনও পাশ্চাত্ত্য দেশে মান্যগণ্য বাইবেল-বিশ্বাসী অনেক আছেন যাঁরা আধুনিক ভূবিদ্যা ও অভিব্যক্তিবাদ জানেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং নিউজিলাণ্ডের কয়েকটি স্থানে বিদ্যালয়ে বাইবেল-বিরুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের শিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ।

আমাদের শাস্ত্রে জগৎ ও জীবের উৎপত্তি বিষয়ক অনেক কথা আছে। এদেশের কোনও গোঁড়া হিন্দু আবদার করেন নি যে স্কুল-কলেজে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিজ্ঞান শেখানো বন্ধ করতে হবে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে ব্যবহারে হিন্দু উদারতা দেখায় নি, তার ফলে তাকে অনেক

দুর্গতি ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু ধর্মের মার্গ-বিচারে বা পারমার্থিক বিষয়ে তার বুদ্ধি সংকীর্ণ নয়, যত মত তত পথ—এই সত্য তার জানা আছে, সেজন্য বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মমতের বিরোধ অসম্ভব।

নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টানের সংখ্যা বিলাতে ক্রমশ কমছে। পাদরীরা খেদ করছেন যে গির্জায় পূর্বের মত লোকসমাগম হয় না, প্রতি বৎসরেই উপাসকের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। বহু শিক্ষিত লোক এখন কেবল নামেই খ্রীষ্টান, তাঁরা খ্রীষ্টীয় ক্রীড এবং বাইবেল বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাবলীর উপর আস্থা হারিয়েছেন। অনেকে বুঝেছেন যে খ্রীষ্টের উপদেশে এমন কিছু নেই যা তাঁর পূর্বে আর কেউ বলেন নি, এবং যে সদ্‌গুণাবলীকে খ্রীষ্টীয় আদর্শ বলা হয় তা খ্রীষ্টধর্মের একচেটে নয়। অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞানী দার্শনিক ও সাহিত্যিক স্পষ্টভাবে খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করেছেন। বাইবেল-ব্যাখ্যায় অনেক পাদরী এখন রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। কেউ কেউ সাহস করে বলছেন যে ক্রীডে অলৌকিক ও যুক্তিবিরুদ্ধ যা আছে তা বর্জন না করলে খ্রীষ্টধর্ম রক্ষা পাবে না। কিন্তু সনাতনপন্থী খ্রীষ্টানদের প্রতিপত্তি ক্রমশ কমে এলেও এখনও খুব আছে। সেণ্ট পল ক্যাথিড্রালের ডান ইংগের উদার মতের জন্য তাঁর অনেক ভক্ত হয়েছে, কিন্তু গোঁড়ার দল তাঁর উপর খুশী নয়। বার্মিংহামের বিশপ বার্ণিজ তাঁর গ্রন্থে ক্রীড সম্বন্ধে অনেক তীক্ষ্ণ ও অপ্রিয় কথা লিখেছেন। এঁরা প্রতিষ্ঠাশালী লোক, নয়তো চার্চ অভ ইংলাণ্ডের কর্তারা এঁদের পদচ্যুত করতেন। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি সাধারণের আস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্য আজকাল বিলাতে প্রবল চেষ্টা হচ্ছে এবং অর্থব্যয়ও প্রচুর হচ্ছে। কিন্তু ফল বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না।

গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে অন্যান্য ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ দুটি রাজনাতিক ধর্মের উদ্‌ভব হয়েছে—কমিউনিজ্‌ম ও নাৎসিবাদ। এই দুই ধর্মে দেবতার প্রয়োজন নেই, ক্রীডই সর্বস্ব। মধ্যযুগের ধর্মান্ধ খ্রীষ্টান ও মুসলমানের সঙ্গে অনেক কমিউনিস্ট ও নাৎসির সাদৃশ্য দেখা যায়। নাৎসিবাদ এখন মৃতপ্রায়, কিন্তু কমিউনিজ্‌ম অন্য সকল ধর্মকে কালক্রমে গ্রাস করবে এমন সম্ভাবনা আছে। এর প্রতিকারের জন্য নিষ্ঠাবান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট সম্প্রদায় উঠে পড়ে লেগেছেন।

পাশ্চাত্য দেশ বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক সভ্যতার শীর্ষে অবস্থিত। আমাদের তুলনায় ব্রিটিশ প্রভৃতি উন্নত জাতির অন্ধ সংস্কার অত্যন্ত অল্প। তথাপি ধর্মের মার্গবিচারে পাশ্চাত্য বুদ্ধি এখনও বাধামুক্ত হয় নি। বিজ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ ভারতবাসীর পরিচয় নগণ্য, আমাদের যান্ত্রিক ঐশ্বর্য অতি অল্প, অন্ধ সংস্কারেরও অন্ত নেই। কিন্তু ভারতের ধর্মবুদ্ধি নিগড়বদ্ধ নয়। এদেশের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে যে নৈতিক দার্শনিক ও পারমার্থিক তত্ত্ব আছে তাতে বৈচিত্র্যের অভাব নেই, প্রত্যেক হিন্দু নিজের রুচি অনুসারে ধর্মমত গঠন করতে পারে। কোনও চার্চ বা সংঘ তার উপর চাপ দিয়ে বলে না—দশ অবতার তোমাকে মানতেই হবে, গায়ত্রী জপতেই হবে, শিবরাত্রিতে উপবাস করতেই হবে, নতুবা তোমার হিন্দুত্ব বজায় থাকবে না।

ধর্ম বুদ্ধির এই স্বাধীনতা—যা ক্রীডধারী খ্রীষ্টান প্রভৃতির নেই, এতে হিন্দুর কোন্ উপকার হয়েছে? বিশেষ কিছুই হয় নি। কালিদাস বলেছেন, গুণসন্নিপাতে একটিমাত্র দোষ ঢেকে যায়। এর বিপরীতও সত্য—রাশি রাশি ত্রুটি থাকলে একটি মহৎগুণ নিষ্ফল হয়ে যায়। হিন্দু যদি তার ত্রুটির বোঝা কমাতে পারে তবে তার স্বাধীন উদার ধর্মবুদ্ধি স্ফূর্তিলাভ করবে, তার ফলে একদিন হয়তো সে দ্বন্দ্বহীন মানব সমাজ প্রতিষ্ঠার উপায় খুঁজে পাবে,—অনুদার ক্রীডাশ্রয়ী ধর্ম বা ক্রীডসর্বস্ব রাজনীতিক ধর্মের পক্ষে যা অসম্ভব।

কালের মন্দিরা

শ্রী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মুক্তি

চোর ধরার উত্তেজনায় সুগোপার রাত্রে ঘুম হয় নাই। ভোর হইতে না হইতে সে রাজপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজকুমারী রট্টা তখনও শয্যা ত্যাগ করেন নাই; শয়ন মন্দিরের দ্বারে যবনী প্রতীহারীর পাহারা। সুগোপা কিন্তু যবনীর নিষেধ মানিল না, শয্যাপাশে উপস্থিত হইয়া ডাকিল—'সখি ওঠ ওঠ, অশ্বচোর ধরা পড়িয়াছে।'

রাজকুমারীর চক্ষু দুটি খুলিয়া গেল; যেন দুইটি খঞ্জন একসঙ্গে নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, 'দূর হ' প্রেতিনী! কী সুন্দর স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, তুই ভাঙ্গিয়া দিলি।'

সুগোপা পালঙ্কের পাশে বসিয়া বলিল—'ওমা, কি স্বপ্ন দেখিলে? ভোরের স্বপ্ন সত্য হয়। বল বল শুনি।'

রট্টা বলিলেন—'কমল সরোবরে এক হস্তী ক্রীড়া করিতেছিল; আমি তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে হস্তী আমাকে দেখিতে পাইল; তখন সে সরোবরের মধ্যস্থল হইতে একটি রক্তকমল শুণ্ডে তুলিয়া আমার দিকে আসিতে লাগিল। আমি অঞ্জলি বাঁধিয়া হাত বাড়াইলাম; হস্তী তীরের নিকটে আসিয়া কমলটি আমার হাতে দিতে যাইবে, এমন সময় তুই ঘুম ভাঙ্গিয়া দিলি।'

সুগোপা বলিল—'ভাল স্বপ্ন। গ্রহাচার্য ঠাকুরের নিকট ইহার অর্থ জানিয়া লইতে হইবে। এখন ওঠ, চোর দেখিবে না?'

আলস্য ত্যাগের ভঙ্গিমায় দেহটি লীলায়িত করিয়া রট্টা উঠিলেন। চোর দেখিবার কৌতূহল নাই এমন মানুষ বিরল, তা তিনি রাজকন্যাই হোন আর মালাকর-বধূই হোন। তবু রট্টা পরিহাসচ্ছলে বলিলেন—'তোর চোর তুই দেখ না, আমি দেখিয়া কি করিব?'

সুগোপা বলিল—'ধন্য! চোর তোমার ঘোড়া চুরি করিল, তবে সে আমার চোর হইল কিরূপে?'

রট্টা বলিলেন—'তুই চোরের চিন্তায় রাত্রে ঘুমাইতে পারিস নাই, সাত সকালে আসিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গাইলি। নিশ্চয় তোর চোর।'

সহাস্য মুখে রট্টা স্নানাগারের অভিমুখে চলিলেন। সুগোপাও রঙ্গ পরিহাস করিতে করিতে, গত রাত্রির চোর ধরার কাহিনী শুনাইতে শুনাইতে তাঁহার সঙ্গিনী হইল।

সূর্যোদয়ের দণ্ড দুই পরে রাজকীয় সভাগৃহে কিছু জনসমাগম হইয়াছিল। রাজার অনুপস্থিতিতে রাজসভার অধিবেশন হয় না, মন্ত্রিগণ স্ব স্ব গৃহে থাকিয়া কাজকার্য পরিচালনা করেন, তাই রাজসভা শূন্যই থাকে। কিন্তু আজ কোট্টপাল মহাশয় প্রাতেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে কয়েকটি সশস্ত্র অনুচর। তদ্ব্যতীত পুরীর কয়েকজন দৌবারিক ও প্রতীহার আছে। অবরোধের কঞ্চুকীও চোরের খবর পাইয়া আসিয়া জুটিয়াছে। মন্ত্রীরা বোধ করি চোর ধৃত হওয়ার সংবাদ এখনও পান নাই, তাই আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই।

রাজকুমারী রট্টা সভায় আসিলেন; সঙ্গে সখা সুগোপা। রট্টার পরিধানে হরিতালবর্ণ ক্ষৌমবস্ত্র, বক্ষে দূর্বাহরিৎ কঞ্চুলী, কেশ-কুণ্ডলীর মধ্যে শ্বেত কুরুবকের নব-মুকুল চন্দ্রকলার ন্যায় জাগিয়া আছে—যেন সাক্ষাৎ বসন্তের জয়শ্রী। রট্টা আসিয়া সিংহাসনের পাদপীঠে বসিলেন। সুগোপা তাঁর পায়ের কাছে বসিল।

অভিবাদন শেষ হইলে রট্টা চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন—'চোর কোথায়?'

কোট্টপালের ইঙ্গিত পাইয়া তাঁহার দুইজন অনুচর বাহিরে গেল; অল্পকাল পরে বদ্ধহস্ত চোরকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহাদের পিছনে গত রাত্রির তোরণ-প্রতীহার ও যামিক-রক্ষিদ্বয়ও আসিল।

চোরকে সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড় করানো হইল।

রট্টা স্থিরদৃষ্টিতে চোরকে নিরীক্ষণ করিলেন। সুগোপা তাঁহার কানে কানে প্রশ্ন করিল—'চিনিতে পারিয়াছ?'

রট্টা বলিলেন—'হাঁ, চিনিয়াছি। কল্য জলসত্রে এই ব্যক্তিই আমার অশ্ব চুরি করিয়া পলাইয়াছিল। অশ্বচোর, তোমার কিছু বলিবার আছে?'

চিত্রক এতক্ষণ সংযতভাবে দাঁড়াইয়া রাজকন্যার পানে চাহিয়া ছিল। রাত্রে অন্ধকূপ বাসের ফলে তাহার বস্ত্রাদি কিছু বিস্রস্ত ও মলিন হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাহার হাবভাব দেখিয়া তাহাকে তস্কর বলিয়া মনে হয় না। বরং কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অকারণে অপদস্থ হইলে যেরূপ ভর্ৎসনাপূর্ণ গাম্ভীর্যের ভাব ধারণ করেন, তাহার মুখভাব সেইরূপ। সে একবার শান্ত অথচ অপ্রসন্ন-নেত্রে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—'এ আমি কোথায় আনীত হইয়াছি জানিতে পারি কি?'

কোট্টপাল চোরের ভাবভঙ্গী দেখিয়া উষ্ণ হইয়া উঠিলেন, কঠোরকণ্ঠে বলিলেন—'রাজসভায় আনীত হইয়াছ। তুমি রাজকন্যার অশ্ব চুরি করিয়াছিলে সেজন্য তোমার দণ্ড হইবে। এখন কুমারীর কথার উত্তর দাও; তোমার কিছু বলিবার আছে?'

চিত্রক তেমনই ধীরস্বরে বলিল—'আছে। ইহা কি দণ্ডাধিকরণ? বিচার-গৃহ?'

কোট্টপাল বলিলেন—'না। তোমার বিচার যথাসময় হইবে। এখন প্রশ্নের উত্তর দাও—কী জন্য অশ্ব চুরি করিয়াছিলে?'

চিত্রক কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে রট্টার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর গম্ভীর স্বরে বলিল—'আমি অশ্ব চুরি করি নাই, রাজকার্যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলাম মাত্র।'

সভাস্থ সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। চোর বলে কি? কোট্টপাল মহাশয়ের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; চোরের এমন ধৃষ্টতা? রট্টার চোখেও সবিস্ময় রোষের বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইয়া উঠিল; তিনি ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিলেন—'তুমি বিদেশী মনে হইতেছে। তোমার পরিচয় কি?'

চিত্রক রাজকুমারীর রোষ দৃষ্টির সম্মুখে কিছুমাত্র অবনমিত না হইয়া অকম্পিতস্বরে বলিল—'আমি মগধের দূত, পরম ভট্টারক পরমেশ্বর শ্রীমন্মহারাজ স্কন্দগুপ্তের সন্দেশবহ।'

সভাস্থ কাহারও মুখে আর কথা রহিল না; সকলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া ইতি-উতি চাহিতে লাগিল। মগধের দূত! স্কন্দগুপ্তের বার্তাবাহক! স্কন্দগুপ্তের নামে হৃৎকম্প উপস্থিত হইত না এমন মানুষ তখন আর্যাবর্তে অল্পই ছিল। সেই স্কন্দগুপ্তের দূতকে চোর বলিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে।

কোট্টপাল মহাশয় হতভম্ব। রাজকুমারী রট্টার চোখে চকিত জিজ্ঞাসা। সুগোপার মুখ শুষ্ক। সকলে চিত্রার্পিতবৎ নিশ্চল।

এই চিত্রার্পিত অবস্থা কতক্ষণ চলিত বলা যায় না; কিন্তু ভাগ্যক্রমে এই সময় রাজ্যের মহাসচিব চতুরানন ভট্ট দেখা দিলেন। চতুরানন বর্ণে ব্রাহ্মণ; চতুর স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি। তৎকালে ভারতভূমিতে বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বহু জাতীয় এবং বহু ধর্মীয় রাজা রাজত্ব করিতেন; উত্তরে শক হূণ ছিল, দক্ষিণে দ্রাবিড় গুর্জর ছিল। কিন্তু মন্ত্রিত্ব করার বেলায় দেখা যাইত একটি ক্ষীণকায় উপবীতধারী ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর আসনটি অধিকার করিয়া আছেন।

সচিব চতুরানন সভায় প্রবেশ করিয়া কঞ্চুকী মহাশয়কে সংক্ষেপে দুই চারি প্রশ্ন করিয়া ব্যাপার বুঝিয়া লইলেন। তারপর সভার মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রথমে হস্ত তুলিয়া রাজকুমারীকে আশীর্ব্বাদপূর্বক তিনি বন্দীর দিকে ফিরিলেন। চতুরানন ভট্টের চোখের দৃষ্টি ক্ষিপ্র এবং মসৃণ; কোথাও বাধা পায় না। চিত্রকের আপাদমস্তক নিমেষ মধ্যে দেখিয়া লইয়া তিনি আদেশ দিলেন, 'হস্তবন্ধন খুলিয়া দাও।'

এতক্ষণ কে কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না, এখন যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। কোট্টপাল মহাশয় স্বয়ং চিত্রকের বন্ধন খুলিয়া দিলেন।

চতুরানন ভট্ট তখন স্মিতমুখে সুমিষ্ট স্বরে চিত্রককে সম্বোধন করিলেন—'আপনি মগধের রাজদূত?'

চিত্রক এই মসৃণ-চক্ষু মৃদুবাক্ প্রৌঢ়কে দেখিয়া মনে মনে সতর্ক হইয়াছিল, বলিল—'হাঁ। আপনি?'

চতুরানন বলিলেন—'আমি এ রাজ্যের সচিব। মহাশয়ের নাম? মহাশয়ের অভিজ্ঞান?'

মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরী তর্জনী হইতে উন্মোচন করিতে করিতে চিত্রক তড়িৎবৎ চিন্তা করিল, রাজলিপিতে দূতের নাম কোথাও আছে কি? যতদূর স্মরণ হয়—নাই। সে বলিল—'আমার নাম চিত্রক বর্মা।'

চতুরানন একটু ভ্রূ তুলিলেন—'আপনি ক্ষত্রিয়?' দৌত্য কার্যে সাধারণত ব্রাহ্মণ নিয়োগই বিধি।

চিত্রক বলিল—'হাঁ। এই দেখুন আমার অভিজ্ঞান মুদ্রা।'

অভিজ্ঞান দেখিয়া চতুরাননের চক্ষে সম্ভ্রম ফুটিয়া উঠিল। তিনি হস্তদ্বয় পরস্পর ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন—'দূত মহাশয়, আপনি স্বাগত। দেখিতেছি উভয় পক্ষেই একটু ভুল হইয়া গিয়াছে। আপনি না বলিয়া অশ্বটি গ্রহণ না করিলেই পারিতেন—রাজকুমারীর অশ্ব—'

চিত্রক স্মিত হাস্য করিয়া রট্টার পানে আয়ত নয়ন ফিরাইল, বলিল—'রাজকুমারীর অশ্ব তাহা আমি অনুমান করিতে পারি নাই।'

এই বাক্যের মধ্যে কতখানি প্রগল্‌ভতা এবং কতখানি আত্মসমর্থন ছিল তাহা ঠিক ধরা গেল না, কিন্তু রট্টা চিত্রকের চক্ষু হইতে চক্ষু সরাইয়া লইয়া মনে মনে ভাবিলেন, এই দূতের বাক্‌পটিমা আছে বটে, অল্প কথা বলিয়া অনেক কথার ইঙ্গিত করিতে পারে!

চতুরানন বলিলেন—'অবশ্য অবশ্য। তারপর গত রাত্রেও যদি আপনি নিজ পরিচয় দিতেন—'

চিত্রক বলিল—'কাহার কাছে পরিচয় দিব? যামিক রক্ষীর কাছে? তোরণ প্রতীহারের কাছে?'

চতুরানন চিত্রকের মুখের উপর পিচ্ছিল দৃষ্টি বুলাইয়া একটি নিশ্বাস ফেলিলেন—'যাক, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে—নির্বাণ দীপে কিমু তৈলদানম্। এখন আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু তৎপূর্বে, আপনি যে রাজ-বার্তার বাহক তাহা কোথায়?'

চিত্রক বলিল—'সম্ভবত আমার থলিতে আছে, যদি না আপনার যামিক-রক্ষীরা ইতিপূর্বে উহা আত্মসাৎ করিয়া থাকে—'

যামিক-রক্ষীরা সভার পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত ছিল, তাহারা সবেগে মস্তক আন্দোলন করিয়া এরূপ অবৈধ তস্করবৃত্তির অভিযোগ অস্বীকার করিল? চিত্রক তখন থলি খুলিয়া দেখিল, লিপি আছে। সে সযত্নে লিপি-কুণ্ডলী বাহির করিয়া একটু ইতস্তত করিল—'রাজলিপি কিন্তু রাজার হস্তে দেওয়াই বিধি।'

মন্ত্রী বলিলেন—'সে কথা যথার্থ। কিন্তু মহারাজ এখন রাজধানীতে উপস্থিত নাই—রাজকন্যাই তাঁহার প্রতিভূ। আপনি দেবদুহিতার হস্তে পত্র দিতে পারেন।'

চিত্রক তখন দুই পদ অগ্রসর হইয়া যুক্তহস্তে লিপি রাজকুমারীর হস্তে অর্পণ করিল।

পত্র লইয়া রট্টা ক্ষণকাল দ্বিধাভরে রহিলেন, তারপর ঈষৎ হাসিয়া লিপি-কুণ্ডলী মন্ত্রীর হাতে দিলেন। হাসির অর্থ—রাজনীতির বিধি তো পালিত হইয়াছে, এখন যাহার কর্ম সে করুক।

লিপি হস্তে লইয়া মন্ত্রী চতুরানন কিন্তু চমকিয়া উঠিলেন, 'এ কি। লিপির জতুমুদ্রা ভগ্ন দেখিতেছি!' তিনি তীক্ষ্ণ সন্দেহে চিত্রকের পানে চাহিলেন।

চিত্রক তরল কৌতুকের কণ্ঠে বলিল—'কাল রাত্রে আপনার যামিক রক্ষীরা আমার সহিত কিঞ্চিৎ মল্লযুদ্ধ করিয়াছিল, হয়তো সেই সময় জতুমুদ্রা ভাঙিয়া থাকিবে।'

কথাটা অসম্ভব নয়, কিন্তু মন্ত্রীর সংশয় দূর হইল না। তিনি যামিক রক্ষীদের পানে চাহিলেন; যামিক রক্ষীরা মস্তক অবনত করিয়া স্বীকার করিল, মল্লযুদ্ধ একটা হইয়াছিল বটে।

চিত্রক মুখ টিপিয়া হাসিল; বলিল,—'আমার দৌত্য শেষ হইয়াছে। এবার অনুমতি করুন আমি বিদায় হই।'

চতুরানন বলিলেন—'সে কি কথা। আপনি মগধের রাজদূত; এতদূর আসিয়াছেন, এখনি ফিরিয়া যাইবেন? ভাল কথা, আপনার সঙ্গি-সাথী কি কেহই নাই?'

চিত্রক নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'যখন যাত্রা করিয়াছিলাম তখন তিনজন সঙ্গী ছিল; পথে নানা দুর্ঘটনায় তাহাদের হারাইয়াছি—অশ্বও গিয়াছে। এদিকে পথ বড় জটিল ও বিপদসঙ্কুল।—যাক, এবার আজ্ঞা দিন।' বলিয়া রট্টার দিকে চক্ষু ফিরাইল।

রট্টা কিছু বলিবার পূর্বেই মন্ত্রী বলিয়া উঠিলেন—'কিন্তু

এখনি আপনার দৌত্য শেষ হয় নাই, আপনি যাইবেন কি প্রকারে ? পত্রের উত্তর—'

চিত্রক দৃঢ়স্বরে বলিল—'পত্রের উত্তর সম্বন্ধে আমার কোনও কর্তব্য নাই। আমি শ্রীমন্মহারাজের পত্র আপনাদের অর্পণ করিয়াছি, আমার দায়িত্ব শেষ হইয়াছে।' বলিয়া অনুমতির অপেক্ষায় আবার রট্টার পানে চাহিল।

এবার রট্টা কথা বলিলেন, ধীর প্রশান্ত স্বরে কহিলেন,—'দূত মহাশয়, বিটঙ্করাজ্যে আসিয়া আপনার কিছু নিগ্রহ ভোগ হইয়াছে। নিগ্রহ অনিচ্ছাকৃত হইলেও আপনি ক্লেশ পাইয়াছেন। কিন্তু অতিথি-নিগ্রহ বিটঙ্ক দেশের স্বভাব নয়। আপনি কিছুদিন রাজ-আতিথ্য স্বীকার করিলে আমরা তৃপ্ত হইব।'

চিত্রক এতক্ষণ পলায়নের একটা ছিদ্র খুঁজিতেছিল। বিটঙ্করাজ্য তাহার পক্ষে নিরাপদ নয়। সে বুঝিয়াছিল, কূটবুদ্ধি মন্ত্রী তাহার দৌত্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন নাই। উপরন্তু শশিশেখর যে-কোনও মুহূর্তে আসিয়া হাজির হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় যত শীঘ্র এ রাজ্য ত্যাগ করা যায় ততই মঙ্গল। এতক্ষণ চিত্রক সেই চেষ্টাই করিতেছিল। কিন্তু এখন রাজকুমারী রট্টার কথা শুনিয়া সহসা তাহার মনের পরিবর্তন হইল। কুমারী রট্টার দিক্-আলো-করা রূপের ছটায়, তাঁহার প্রশান্ত গম্ভীর বাচন-ভঙ্গিমায় এমন কিছু ছিল যে চিত্রকের মন হইতে পলায়ন-স্পৃহা তিরোহিত হইয়া গৌরবপূর্ণ হঠকারিতা জাগিয়া উঠিল। সে ভাবিল, বিপদের মুখে পলাইব কেন ? দেখাই যাক না, চপলা ভাগ্যদূতী কোন পথে লইয়া যায়। জীবনের সকল পথের শেষেই তো মৃত্যু, তবে ভীরুর মতো পলাইব কেন ?

সে যুক্তকরে শির নমিত করিয়া বলিল—'দেবদুহিতার যেরূপ আদেশ।'

রট্টার মুখের প্রসন্নতা আরও পরিস্ফুট হইল; তিনি মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'আর্য চতুরভট্ট, দূত মহাশয়ের স্থান ব্যবস্থা করুন।'

চতুর ভট্ট এবার একটু বিপন্ন হইলেন। গত পঁচিশ বৎসরে বিটঙ্করাজ্যে পররাষ্ট্রের কোনও দূত আসে নাই, তাই রাজ্যে দূতাবাসের কোনও পাকা ব্যবস্থা নাই। কদাচিৎ মিত্ররাজ্য হইতে রাজকীয় অতিথি আসিলে রাজপুরীর মধ্যে কোনও এক ভবনে তাঁহার স্থান হইয়াছে। কিন্তু এই দূতটিকে কোথায় রাখা যায়! মগধের দূতকে ভালভাবেই রাখিতে হয়; নগরের পান্থশালায় স্থান নির্দেশ করা চলেনা।......স্কন্দগুপ্তের পত্রে কী আছে তাহা এখনও দেখা হয় নাই; এতদিন পরে মগধ কি বিটঙ্ক-রাজ্যের উপর একরাট্ অধিকার দাবী করিতে চায় নাকি ? ......সে যাহোক পরে দেখা যাইবে, এখন দূতটাকে কোথায় রাখা যায় ? দূতের দূতীয়ালিতে কোথায় যেন একটা গলদ রহিয়াছে—বিদায় পাইবার জন্য এত ব্যগ্র কেন ? উহাকে সহজে দৃষ্টিবহির্ভূত করা হইবে না—

চক্ষু অর্ধ-মুদিত করিয়া চতুর ভট্ট চিন্তা করিলেন; তারপর নিম্নস্বরে কঞ্চুকীর সহিত আলাপ করিলেন। তাঁহার ভ্রূযুগলের বক্রতা আনীত হইল। তিনি বলিলেন—'মগধের রাজদূতের জন্য যথোচিত সম্মানের স্থান নির্দিষ্ট হইবে; রাজপুরীর মধ্যেই তিনি অবস্থান করিবেন। সুবিধা হইয়াছে, মহারাজের সন্নিধাতা হর্ষ মহারাজের সঙ্গে চষ্টনদুর্গে গিয়াছে; হর্ষের স্থান শূন্য আছে। দূত মহোদয় সেই স্থানেই থাকিবেন।'

এই ব্যবস্থায় সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। রাজপুরীতে স্থান দিয়া মগধ-দূতকে সম্মান দেখানো হইল, অপিচ সন্নিধাতার অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট পর্যায়ে স্থান দিয়া অধিক সম্মান দেখানো হইল না। চতুর ভট্ট সুখী হইলেন; দূত রাজপুরীর প্রাকার মধ্যে রহিল, ইচ্ছা করিলেও পলাইতে পারিবে না।

কঞ্চুকীর দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন—'লক্ষ্মণ, তোমার উপর দূতপ্রবরের সেবার ভার রহিল। এখন তাঁহাকে বিশ্রাম মন্দিরে লইয়া যাও।' বলিয়া অর্থপূর্ণ ভাবে কঞ্চুকীর পানে চাহিলেন।

লক্ষ্মণ কঞ্চুকী চতুর ভট্টের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়াছিল। সে চিত্রকের নিকটে আসিয়া বহু সমাদর সহকারে তাহাকে বিশ্রাম মন্দিরে আহ্বান করিল।

চিত্রক রাজকুমারীকে যুক্তকরে অভিবাদন করিয়া কঞ্চুকীর অনুবর্তন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সহসা একটা কথা স্মরণ হওয়ায় সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—'দেবদুহিতাকে একটি সংবাদ জানাইতে ইচ্ছা করি।

গত রাত্রে আমি যে অন্ধকূপে বন্দী ছিলাম সেখানে একটি স্ত্রীলোক বন্দিনী আছে।'

রট্টা নেত্র বিস্ফারিত করিয়া চাহিলেন—'স্ত্রীলোক!'

'হাঁ। বন্দিনীর নাম পৃথা।'

সুগোপা রট্টার পদমূলে বসিয়া শুনিতেছিল, সে চমকিয়া —পৃথা!

চিত্রক বলিল—'হতভাগিনী পঁচিশ বৎসর ঐ কারাকূপে বন্দিনী আছে। যখন প্রথম হূণ অভিযান হয় তখন পৃথা পূর্বতন রাজপুত্রের ধাত্রী ছিল—এক হূণ যোদ্ধা তাহাকে বলাৎকার পূর্বক ঐ স্থানে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিল—'

(ক্রমশঃ)

সামরিক জাতি ও বাঙালী

শ্রীভাস্কর গুপ্ত

বৃটিশ আমলে বাঙালীকে জোর করিয়া সাম্রাজ্যের স্বার্থে অসামরিক জাতি প্রতিপন্ন করা হইয়াছিল। সেদিন বাঙালী তাহার সে কলংক কতখানি গভীর বেদনার সহিত স্মরণ রাখিয়াছে আজ তাহা প্রমাণ করিবার দিন আসিয়াছে। ঘরে বাহিরে বাঙালীর আজ দুর্দিন।

জাতি হিসাবে বাঙালী সামরিক কিংবা অসামরিক তাহা বিচার করিবার জন্য সূক্ষ্ম তর্কের অবতারণা আজ নিষ্প্রয়োজন। শত শহীদের আত্মদানে অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য আমাদের যে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি প্রয়োজন, এই বোধই প্রমাণ করিবে আমরা সামরিক জাতি। কিন্তু বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। তাই আজিকার জরুরী অবস্থাকে রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব আরোপ করিয়া তাহাকে জাতির জীবনে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

একদা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার দুর্দিনে বাংলার জাতীয় জীবনের উন্মেষের জন্য যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, বাংলার বর্তমান দুর্দিনে অসহায়, ততোধিক অসহিষ্ণু মনের ক্ষণস্থির দৃষ্টিতে বাঙালীর মর্মে তাহার ঝঙ্কার পরিলক্ষিত হইতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন বাঙালীর ইতিহাস চাই। মৃত-পতিত জাতির অন্তরে প্রাণের সঞ্চার করিতে তাহাকে তাহার ইতিহাস শুনাইতে হইবে। ঋষি বঙ্কিম চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কথা দুইটি শুধু কানে বাজে। বাঙালী সে প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারে নাই। বাঙালীর জীবনে তার মর্মার্থ উপেক্ষিত।

আমরা অনেক সময় একটি সত্য বিদ্রূপ ছলে বলিয়া থাকি—mass এর স্মৃতিশক্তি দুর্বল। বাঙালীর সহিত এই massএর তবে পার্থক্য কোথায়? বাঙালীর সে দুর্দিন কাটিয়াছে, সে প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। বর্তমানে এমনি এক দুঃসময়ে আবার আমরা বাঙালীর ইতিহাস খুঁজিতে বসিয়াছি, প্রয়োজন ফুরাইলে হয়তো আবার বিস্মৃতি আসিবে। তবু বাঙালী এই বিস্মৃতির মধ্যেই পথ চলিতে চলিতে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হইয়াছে; প্রয়োজনীয় পরিবেশে বাঁচিতে শিখিয়াছে। বাঙালী মরিবে না।

একদা ইংরাজ আমাদের আত্মবিশ্বাস দুর্বল করিবার জন্য আমাদের যে প্রলোভনে ফেলিয়াছিল, পরবর্তী যুগে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে বাংলার অমরপ্রাণ ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, কানাই, সত্যেন, বাঘা যতীন। সেই সঙ্গে বাঙালীর সুপ্ত শৌর্য জাগরিত হইয়াছে। বাঙালী তাহার ইতিহাস দেখিতে পাইয়াছে।

মুসলমান আমলে মুসলমান রাজশক্তির শান্তিভঙ্গের উদ্দেশে বাংলার জমিদারগণ বিদ্রোহের সংগঠন করিতেন। এই সংগঠনের উদ্যোক্তা ছিল বাঙালী। সে শক্তির পরিচয় ইতিহাস হইতে মুছিয়া যায় নাই। সয়ের-উল-মুতাক্ষরীণের লেখক গোলাম হুসেনের উদ্ধৃতি এখানে জেনে রাখুন: বাংলার এই জমিদারবর্গ অত্যন্ত দুর্দান্ত প্রকৃতির; মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করা তাহাদের স্বভাবে দাঁড়াইয়াছে। ফুরসৎ পাইলেই তাহারা বিদ্রোহ বা গোলমাল করিবে।"

বাংলার বার ভুঁইয়াদের কথা বাঙালীর স্মরণ থাকা উচিত। বার ভুঁইয়ারা প্রায় অর্ধ স্বাধীন ছিল। তাহাদের সৈন্যবাহিনী ও নাবিক-বাহিনী ছিল এবং নিজ ব্যয়ে এই বাহিনীদ্বয় প্রতিপালিত হইত। এইরূপে নিজ নিজ এলাকায় শান্তি ও শাসন সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পাঁচ নম্বর রিপোর্টে এই বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তাহাতে দেখা যায় একমাত্র বর্ধমানের রাজা প্রতি বৎসর সৈন্যবাহিনীর জন্য ব্যয় করিতেন পাঁচ লক্ষ টাকা, এখনকার তুলনায় এক কোটি।

বারভুঁইয়ার আমলে তাদের স্থায়ী সৈন্যবাহিনী 'নগদী' নামে পরিচিত ছিল; মাসে মাসে তাহারা যে মাহিনা পাইত তাহার দরুণ জমিদারী সেরেস্তার নানা খাতাপত্রে এই 'নগদী' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। প্রত্যেক পরগণায় সেইরূপ 'থানাদারী' সৈন্য ছিল। প্রয়োজন হইলে রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের সাহায্যে গ্রাম হইতে সৈন্য সংগ্রহ করা হইত। বাংলার পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত বিষ্ণুপুর (বীরভূম) রাজ্যের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে এই সৈন্যবাহিনী সংগঠনের বহু তথ্য পাওয়া যাইবে।

বাঙালী তাহার সে ইতিহাস অচিরে ভুলিয়া গিয়াছে। বৃটিশের

কৌশলে সহজেই তাহারা প্রাণ-ধর্মকে পরিহার করিয়া বুদ্ধির আশ্রয়ে নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের সার্থকতা উপভোগ করিতে চাহিয়াছে। তাহারই ফলে আমাদের যাহা কিছু পরিশ্রম করিয়া দিতেছে অপরে। আমাদের মাতা ভগিনীদের নিরাপত্তা তাহাও রক্ষা করিতেছে অবাঙালী। বাঙালী ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া ক্রমে আত্মপ্রবঞ্চনায় নিজের অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে লইয়া চলিয়াছে। ইহার জন্য দায়ী করিতে পারি অন্যকে, কিন্তু দায় আমাদের।

যে নিরাপত্তার উপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে তাহার জন্য প্রস্তুতি কোথায়? এই নিরাপত্তার উপর জাতীয় জীবন গঠনের যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক তাহা বুঝিবার আগ্রহ কোথায়? বাঙালীর সামরিক জীবন গঠন করিবার পূর্বে ইহাই ভাবিবার কথা। বাংলার যুবসম্প্রদায়কে এই ভাবনার অংশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। বাংলা সরকার বাঙালী জনসাধারণের কাছে সেই আবেদন তুলিয়া ধরিয়াছেন কিন্তু তাহাতে আজ পর্যন্ত যে সাড়া পাওয়া গিয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে লজ্জা পাইতে হয়। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে কত দূরে ফেলিয়া আসিয়াছি। আজ বৃটিশ নাই। বাঙালী আপন কলঙ্ক আপন হাতেই সারা অঙ্গে লেপন করিতে বসিয়াছে। এই নিষ্ঠুর সত্যকে আজ স্বচ্ছ দিবালোকে পরখ করা দরকার।

মেঘমল্লার

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

হন্ হন্ করে এগিয়ে চলছিলো কান্তি কবরেজ, সারাদিনের ক্লান্তি বয়ে। ছুটছিলো বল্লেই হয়। ওদিকে যে দিগন্তে ঘন দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে সেদিকে তেহঁসের একেবারেই হুঁশ নেই। ঈশান দিকে দৈত্যবেশী প্রকাণ্ড শ্যেন পাখীটা লুকিয়েছিল এককোণে, হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে আকাশের সবটুকু নীল ছোঁ মেরে নিয়ে গেল কালোর পাখনায় ঢেকে। বড়ো ডানার ঝাপটা আর তড়িৎশিখার চঞ্চু এঁকে বেঁকে আকাশে বাতাসে ছোবল দিতে লাগল। তার দিকে শুধু একবার তাকিয়ে দেখলে কান্তিচরণ, তারপর পদক্ষেপটা আরো দ্রুত করে দিলে। নিষ্ফল আক্রোশের তর্জন গর্জন কিছুক্ষণ পরে ডুবে যায় বর্ষণের দাক্ষিণ্যে, প্লাবনের শত ফুটোয়।

নদীর ধারে মণীশ মিত্তিরের মস্ত বড় বাংলোর কাচ ঘেরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে পরিতোষ প্রকৃতির এই লীলা অভিরাম দেখছিলো। বৈকালিক চা-পাতকদের আসর জমেছে। মিক্সড্ ব্রিজপার্টি বসবে এখনি। সভ্য-সভ্যারা এখনো জড়ো হন নি সবাই।

হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়—আরে, এই দুর্য্যোগে চলেছে কোথায় লোকটা, মারা পড়বে নাকি—ও মশাই, শুনুন্ শুনুন্, দাঁড়িয়ে যান্।

মিসেস মিত্তির মুখটা তুলে দেখে নেন্—ও, কান্তি কবরেজ—বলে তাঁর অতি অপ্রসন্ন দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিয়ে হাতের বোনার দিকে গভীর মনোযোগ দেন্।

আর সকলে মুখ চাওয়া-চায়ি করে।

পরিতোষ একটু অবাক্ হয়ে যায়—ব্যাপার কি—

মণীশ পাইপটা এ্যাশট্রের উপর ঠুকে বললে—বলি প্রিয় বন্ধু, তুমি কি ডেমোক্রেসীর বেনোজল ঢোকাতে চাও আমাদের এই প্রেষ্টিজের অচলায়তনে—জানো আমি একজন বিলাতফেরত এফ্ আর, সি, এস্, কোলিয়ারীর বড় ডাক্তার, নতুন হাঁসপাতালের সার্জ্জেন সুপারিটেনডেণ্ট, নাম ডাক্ পশার কতো! বত্রিশ টাকা ফি নি, আমার বাড়ী ঢুকবে কান্তি কবিরাজ! একটা লোফার! স্বভাবচরিত্র কেমন কে জানে, পয়সা না নিয়ে গরীবের নাড়ী টেপে, দেয় সূচিকাভরণ মকরধ্বজ—

মিসেস্ মিত্তির আঁকা ভ্রুটা নাচিয়ে বল্লেন—যাক্‌গে ওসব কথা, যা বাজে বকতে পারেন আপনার বন্ধু, জানলেন্ মিঃ চৌধুরী, কথায় কথায় ছড়া আর ছোবল—হ্যাঁ আপনাকে না হয় একটা অরেঞ্জ স্কোয়াশ্ দিক্, তার চেয়ে জোরালো ত আনার চলবে না?

—না থাক্,—

সে কী, কী করে যে এতদিন ইউরোপ আমেরিকায় কাটালেন্, ভাবি তাই—

ঠিক বলেছো অলকা, বেচারী আর মানুষ হলোনা, তা না হলে, এখনো কবিতা পড়ে, বর্ষার দিকে চেয়ে থাকে, ধুতি চাদর ওড়ায়! ছ'বছর পাশাপাশি কাটিয়েছি,

আমার গ্রের এ্যানাটমীর নীচে থাকতো ওর সঞ্চয়িতা। সময় মত যে দুএকটা ছাড়ি তা ওরই কল্যাণে।

সত্যি মিঃ চৌধুরী, তা হলে. আজকের দিনে কবিতা পাঠই হোক্—

ড্রয়িংরুমের বুক-কেসে ঝক ঝক্ করছে রবীন্দ্র রচনাবলার সুন্দর শোভন রাজসংস্করণ—নিত্যব্যবহারে তৈল সিক্ত নয়।

পরিতোষ চুপ করে বসে তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে—নিবন্ত দিনের একটা খাপছাড়া সুর বেত্রাহত হয়ে ঝিম ঝিম বৃষ্টির রিম রিম শব্দে তাকে কেবলই মনে করিয়ে দেয় কান্তি কবিরাজের কথা—একেলা কোন পথিক তুমি—

সে জিজ্ঞেস্ করে—ভাই মণীশ, লোকটা কে হে—

মণীশ বলে—

কইত কবীর সুনো ভাই প্যারে
কৈসে প্রীতম পাবে
তপন রহ জেহ কে বুঝাবে

বর্ষা এসেছে—নিতান্ত নীলোৎপলপত্র কান্তিভিঃ প্রিয়া বিরহিত হয়ে অভিসারে চলেছে হে, গীতগোবিন্দ পড়েছো ত, যেটি না থাকলে ক্ষীর নীর হয়ে যায়, শর্করা কর্করত্ব প্রাপ্ত হয়—

মিসেস্ মিত্তির ধমক্ দেন্—কী যে হচ্ছো দিন দিন, ডিস্‌গাসটিং, মুখের আলগা নেই—

হো হো করে হেসে ওঠে মণীশ—পরিতোষ যে পথের সন্ধানই পেলে না, তাইতো বিরামবিহীন বিজুলীঘাতের ভিতর কোন পথিক্ একেলা চলেছে তার জন্য ওর মন উন্মনা, বুড়ো কান্তি কবরেজের ভিতরও রস আছে, আর পরিতোষ কিনা একটা ভরজোয়ান—অতনু হেরে যায় বারে বারে—না, অলকা পরিতোষের একটা ব্যবস্থা করে দাও তোমার সখা মহলে।

জবাব দেবার আগেই টেলিফোন বেজে ওঠে, ডাক্তার উঠে যায় ভিতরের ঘরে, খানিকপরে বেরিয়ে আসে বেরুবার সাজে।

অলকা আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে—বেরুচ্চো নাকি, এই বাদলায়—

হাঁা, এই মাত্র দেবীগড় থেকে টেলিফোন এলো, ম্যানেজার বলছে এখনই যেতে হবে, কোলিয়ারীর খাদে স্টে—ইন্ হাঙ্গার ষ্ট্রাইক্। কখন কি হয়! যাবে নাকি পরিতোষ—কান্তি কবিরাজের দেখা মিলতে পারে—

সাঁঝের অন্ধকারের মাঝে অতিকায় জন্তুর দুটো জলজলে চোখের মত জলতে জলতে গাড়ীটা নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়—

অলকা চেয়ে দেখে শুধু বলে—যা দুর্য্যোগ, তেমনি হাঙ্গামা, না বাপু ভাল লাগচে না—

ব্রিজের সঙ্গিনী সন্ধ্যা মুচকি হেসে বলে—অলকাদি, এক মিনিটের অদর্শনেই এই, বিরহ মধুর হলো আজি মধু রাতে।

যা, যত সব ফাজলামি— কার ডিল্—

পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যেই মণীশ আর পরিতোষ পৌছল কোলিয়ারীর দোরগোড়ায়—হানটান করছিলেন ম্যানেজার—সামনে ভিজতে ভিজতে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা বিক্ষুব্ধ জনতা।

পাইপটা চেপে ডাক্তার সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার, ম্যানেজ্ করতে পারছেন না, টিয়ারগ্যাস এখনও ছাড়েন নি—চোখের জল যে ফুরিয়ে গেল—

না ডাঃ মিত্র, ঠাট্টা নয়, যে কজন খাদের ভিতর রয়েছে তার ভিতর সোনাও আছে।

কবরেজ এসেছে ত'—টিপ্পুনী কাটেন ডাঃ মিত্র।

ওই ত এসে গোল বাধিয়েছে, সে যাবেই নীচে, তাকে ধরে রাখা যাচ্চে না।

তা যেতে দিলেই হয়।

আমাদের ত আপত্তি নেই, আপত্তি ও তরফের—

কি বলে তারা,—

তারা বলে কবিরাজ নাকি খাবারের পুঁটলী নিয়ে বসে আছে, সে নাকি বলছে যে, সোনা না খেয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে, সে সোনাকে বোঝাবে, আর সোনাই যদি রাজী হয়ে যায়, তাহলে ত ধর্মঘটের শিরদাঁড়াই ভেঙে গেল—তাই কবরেজকে কেউ নীচে যেতে দেবে না—

পরিতোষ জিজ্ঞাসা করে—দাবীটা কি—

ডাক্তার হেসে জবাব দেয়—খুব সোজা ও সরল, কে একজন মরেছিল, ওরা বলে খাদ চাপা পড়ে, এরা বলে কলেরা হয়ে, ব্যাপারটা কিছু নয়—ওটা উপলক্ষ—

তা ক্ষতিপূরণ দিলেই হয়—

বন্ধ থাক্, পলিটিক্স ইকনমিক্সে ঢুকে কাজ নেই, আমাদের রোমান্সই ভাল—জীবন কাব্যে উপেক্ষিতদের নিয়ে ড্রয়িংরুমে বসে সরস আলাপ করলেই চলবে, এখন কি কর্ত্তে হবে, ম্যানেজার সাহেব?

একবার স্যার, নামতে হবে পিটের মধ্যে ওদের একবার পরীক্ষা করা দরকার।

বেশ ত চলহে পরিতোষ, কাব্যের নায়িকাকে একবার দেখে আসা যাক্—তার আগে, একবার কবরেজকে ডাকাও দিকিন, ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে বোঝা যাক্।

কবিরাজ এলো—লম্বা কালো বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে, ভাসা ভাসা চোখ। ডান নাকের পাশে একটা তিল, দৃঢ় চোয়াল, গলায় কণ্ঠি। খাঁটি বোষ্টম—বিনয়ে গদ গদ। টাকের নীচে একটি ঊর্দ্ধমুখী নিবাত নিষ্কম্প শিখা। এত সূক্ষ্ম ও কচি যে ঘন ঘন আন্দোলনেও অর্কফলা নড়ে না, তবু এটিই যেন ওকে অদৃশ্য শক্তি জোগায়।

হাতজোড় করে এসে বলে—কি বলছেন হুজুর—

—ব্যাপার কি কবরেজ—

কাঁদো কাঁদো সুরে সে বলে—ধর্মঘট বুঝিনা হুজুর, তিনদিন খায়নি মেয়েটা, ওদের প্রাণে মারবেন না—একবার যেতে দিন হুজুর, নিজের হাতে তৈরী করে এনেছি খাবারগুলো, আমি বল্লে সোনা না করতে পারবে না—

পাশ থেকে বাউরী পিসী, ঝগড়ু সর্দ্দার সবাই তেড়ে আসে—ডাক্তার সাহেব ছাড়া কারুকে নীচে যেতে দেবে না তারা, কবরেজকে ত নয়ই।

কেঁদে ফেলে বুড়ো মানুষটা—কদিন খায়নি হুজুর, সে যে ক্ষিধে সহ্য করতে পারে না—বড্ড ভালবাসে সরুচাকলি—তাই তৈরী করে নিয়ে এলুম—

পরিতোষ বোকার মত জিজ্ঞাসা করে—তোমার কে হয়—

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে কবিরাজ—এতদিন কেউ তাকে জিজ্ঞেস করেনি এ কথা, সোনা তার কে হয়।

সবাই মুচকি হাসে।

চোখ মুছে বলে—ভিন্ গাঁয়ে গেছলাম হুজুর রুগী দেখতে, ফিরে এসে দেখি এই কাণ্ড—হুজুর নাড়ীটা যদি দুর্ব্বল দেখেন ত একপুরিয়া মকরধ্বজ এনেছিলাম, অনুপান সমেত মধুর সঙ্গে মেড়ে, খলও এনেছি—

ম্যানেজার এক ধমক্ দেন—আচ্ছা পাগল ত, শুনছো ওরা ধর্ম্মঘট করেছে, খাবেনা দাবেনা, কাজ করবেনা, ঐ গর্ত্তেই তিলে তিলে প্রাণ দেবে—যতক্ষণ না কর্ত্তারা ওদের সর্ত্তে রাজী হয়—

ভাগো, ভাগো—বলে পুলিশের লোক তাড়া দেয়।

পরিতোষকে নিয়ে ডাক্তার, ম্যানেজার আর পুলিশের কয়েকজন লোক নেমে যায় খাদের ভিতর। ইলেক্‌ট্রিকের আলো কাটা কয়লার চাঙড়গুলোর উপর তীব্র হয়ে পড়েছে। ট্রলি করে এক মাইল পথ ভিতরে গিয়ে দেখতে পায়, একটা কয়লার থামের পাশে ভূতের মত নড়ছে কয়েকটি ছায়াশুদ্ধ কায়া।

মণীশ এগিয়ে এসে বলে—তোরা ভেবেছিস্ কি, কালই তোদের হাঁসপাতালে চালান করে দেবো, জোর করে খাইয়ে দেবে—

উঠে বসে দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি। শক্ত সমর্থ হলেও অনাহারে অনিদ্রায় ধুঁকচে, চোখের নীচে কালি। দেহের কোণে কোণে বন্য যৌবনের বন্যা সৃষ্টির ঢল নামিয়েছে। মাথায় গোঁজা তিনদিনের শুকনো পাপ্‌ড়িঝরা লালফুল। নিঃস্পৃহ কণ্ঠে বলে—হুজুর চাইনে ত বেশী কিছু, আমাদেরও ত মান-ইজ্জত দাবীদাওয়া আছে—

চমকে ওঠে পরিতোষ—মান-ইজ্জত, বেঁচে থাকার অধিকার। ঝাণ্ডা হাতে পার্কে রাস্তায় ফ্যাক্টরীর সামনে বহু বার শুনেছে কিন্তু এই পাতালপুরীর প্রেত রাজ্যে এই সব বুলি যেন বুলেট। অন্ধকারের মধ্যে যেন আলোর বিস্ফোরণ।

সোনাই নাকি এখানকার ছোকরা কুলি মরদদের মাথা একেবারে চিবিয়ে খেয়েছে। তার চোখে আছে নাকি শাণিত বিদ্যুৎ, অঙ্গে অবয়বে উদ্ধত যৌবনের আকর্ষণ, কথায় ঘুমপাড়ানো মধুমিশ্রিত নেশা। দুএক পাতা ইংরিজীও সে নাকি জানে মিশনারীদের কল্যাণে। সবাই অবাক্ হয়ে যায় এই স্বাস্থ্যসবলার বুদ্ধিমত্তায়, গলে যায় তার সাহচর্য্যে। ও কুঁড়েতে রাতবিরেতে আড্ডাও জমে জোর, মহুয়া চলে মাদলের তালে তালে। ওর মায়ের নামে নানা বদনাম থাকলেও ওকে সবাই সমীহ

করে চলে। অপবাদ যে দিতো না তা নয়, কিন্তু ওর খাপখোলা তলোয়ারের মত চেহারায় কোথায় যেন একটা সংযত শুচিশ্রী ছিলো, কুৎসা লেগেও যেন লাগতো না। মা-পিসীদের নন্‌-কণ্ডাকটার আঁচলবন্দিনী সে নয় যে বৈদ্যুত বর্ষণ ঢুকবে না। তার প্রতি জীবকোষের চেতনায়, মোহিনী মন্ত্র বাজে, তবু সে অধরার মত ঘুরে বেড়াতো, সম্পূর্ণা স্বেচ্ছাচারিণী। কত লোকে তার প্রসাদের জন্য এসেছে, কেউ লুকিয়ে, কেউ বুক ফুলিয়ে, লাস্যময়ীকে ধরতে পারেনি কেউ সম্পূর্ণভাবে। মেয়েটি যেন মদের পাত্র কানায় কানায় ফেনায় ভর্ত্তি, কিন্তু নিজে মাতাল নয়।

কান্তি কবরেজের আড্ডা ঐখানেই, রোজ সন্ধ্যের পর যাওয়া চাইই তানপুরোটি নিয়ে। বিষ্ণুপুরের লোক, গাইয়ে বাজিয়ে বংশ—সাঁঝের পর একটু সঙ্গত চাই। ওদিকে চলবে জোর হুল্লোড়, আর এদিকে চলবে একটু সুর সাধনা। সোনার সঙ্গে কি যে সম্বন্ধ কবরেজের, কেউ জানতো না, তবে তার মার অসুখের সময় অনেক করেছে কবিরাজ। সেই সূত্রেই বাইরের সম্বন্ধটা লোকমত-সহ হয়ে এসেছে।

ফিরতে ফিরতে সে সব কথাই শুনছিলো পরিতোষ, ডাক্তারের কাছে।

কিন্তু কবরেজ—জিজ্ঞাসা করে পরিতোষ।

আমি জানি ওর ইতিহাস—ডাক্তার জবাব দেয়—বাঁকুড়া জেলার এক গণ্ড গ্রামে ওর বাড়ী, ভদ্রবংশের ছেলে, জমিজমা ছিল, বাপ কবরেজী করতেন, তার সঙ্গে চলতো তবলায় চাঁটি। ছেলেকে পড়িয়েছিলেন ইংরাজী স্কুলে, কিন্তু পড়ার চেয়ে আখড়ার আড্ডায় ঘুরে বেড়াত সে। গাঁয়ের বাইরে বাউরী পাড়ায় থাকতো এক গুণী ওস্তাদ, ধ্রুপদসিদ্ধ। কেউ কেউ বলতো তাকে দেখেছে নাকি দ্বারকেশ্বরের শ্মশানে গভীর রাতে মড়ার খুলির ওপর বসে তানপুরো হাতে সুরসুন্দরীর সাধনা করতে। যত সব বখাটে ছোড়াছুঁড়ীর আড্ডা ছিল সেইখানে। সেইখানেই সোনার মার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে।

বল কি হে, এ যে একেবারে "তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্ব্বনাশ"—

ঠিক তাই, বাপ জানতে পেরে কান্তিচরণকে এমন উত্তম মধ্যমের উৎক্রান্তি যোগে ফেললেন যে রথক্রান্তি হবার যোগাড়। শেষকালে বাপই বাউরীর মেয়েটাকে টাকাকড়ি দিয়ে দামোদর পারে পাঠিয়ে দিলেন। আর ছেলেকে পাঠালেন কাশীতে—জাত ব্যবসা শিক্ষার জন্য ত্র্যম্বক্‌ শাস্ত্রীর কাছে।

বল কি ?

কয়েক মাস ছিলো কান্তিচরণ পুণ্য বারাণসীধামে, নাড়ী জ্ঞানটা হয়েছিল কিছু। কিন্তু রক্তে নেশা লাগলে ছাড়ানো দায়। একদিন চুপি চুপি পালিয়ে এলো কাককে কিছু না বলে, ফিরে এসে দেখে পাখী উড়ে গেছে, বন্ধু বিষ্ণুপদকে দিয়ে খোঁজও করিয়েছিল এধার ওধার, বাপের অজান্তে। তারপর কি ভেবে গাঁয়ে বসেই বাপের ব্যবসায় ধরলো। তবে বিয়ে আর করেনি—। কবরেজী আর তানপুরো নিয়েই মশগুল। এ হলো প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা।

বছর কয়েক আগে কি এক কাজের ফেরে কান্তি কবিরাজ কোলিয়ারীর দিকে এসেছিল—হঠাৎ রাস্তার দিকে চেয়ে অবাক্‌ হয়ে যায়—সোনা এসেছিল সহরে বাজার করতে। কান্তি কবরেজ চমকে ওঠে—হুবহু যেন সেই, তেমনি মুখ, তেমনি চোখ, তেমনি রং, তেমনি বয়স, শুধু একটু বেশী পালিশ করা, একটু বেশী চটক্‌ওয়ালা একটু বেশী বুদ্ধি উজ্জ্বল শিক্ষাদীপ্ত। মাঝখানের পঁচিশ বছর কি মুছে গেলো নাকি—কালের যাত্রা কি স্থগিত ছিলো।

খোঁজখবর নিয়ে, তল্পিতল্পা গুটিয়ে কান্তি কবিরাজ ঐখানেই এসে জুটলো তানপুরো আর তার অরিষ্ট, আসব বটিকা নিয়ে। আশপাশের পাঁচটা কোলিয়ারীর সাঁওতাল কৈবর্ত্ত বাউরী পাড়ায় পসারও কিছু জমিয়ে ফেল্লে। একা থাকতো রাঁধতো খেতো, কারুর কোন ঝামেলায় নেই। শুধু সোনাদের বাড়ী মাঝে মাঝে যেতো, ওর মাকে দেখতে। মা তখন বিছানা নিয়েছে। স্বেচ্ছায় তার চিকিৎসা আর সেবার ভার আস্তে আস্তে কবিরাজ তুলে নেয়। মেয়ে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, বর্ত্তে গেল কবিরাজকে পেয়ে। মাও ত্রিশ বছর আগেকার ফেলে-আসা প্রথম যৌবনের সঙ্গীটিকে চিনতে পারেনি, পরিচয়ও

দেয়নি কবিরাজ। বিকারের ঝোঁকে একদিন শুধু নাম করেছিল, সেদিন কবরেজের চোখ শুকনো ছিল না।

তুমি জানলে কি করে—

সে এক মজা, হঠাৎ একদিন এমন বাদল রাতে দরজা ঠেলাঠেলি—দেখি কবরেজ সামনে দাঁড়িয়ে—

হুজুর এক জায়গায় কলে যেতে হবে।

বল্লাম—সঙ্গীণ রুগী জানোইত, এখানে এটিকেটের দাম বেশী, সঙ্গে অন্ত ডাক্তার না থাকলে কলই নিই না, তারপর রাতে ডবল ফি—

কবরেজ বল্লে—তাই দেবো, হুজুর

গৃহিণী শুনে চটে বল্লেন—কবিরাজের কল নেবে তুমি, ছিঃ ছিঃ তুমি না একজন এফ্ আর সি এস্—

আমি বল্লুম—মৃত্যুর কাছে প্রেষ্টিজ্—

লোকটার চেহারা দেখে কেমন একটু মায়া হয়েছিল। যেন বাজপড়া লম্বা ঝাউগাছ, অগ্নিশুদ্ধ হয়ে ভিতরে তখনও জ্বলছে, স্বয়ং দীপ্ত।

বল্লুম—আচ্ছা, চলো যাবো—ডবল ফি আর দিতে হবে না।

গিন্নী গজগজ্ করতে লাগলেন—বল্লেন—কালকে ক্লাবে কত কথা হবে...

যাহোক্ বেরিয়ে পড়ে দেখি ছোট্ট কুঁড়েয় কঙ্কালসার প্রৌঢ়া ধুঁকছে—পাশে বসে আছে সোনা—প্রায় শেষ অবস্থা, নানা রোগের আর অত্যাচার সমাচারের জড়িত ইতিহাস দেহের উপর দাগা বুলিয়ে গেছে অনেক, সেখানে মেরামতী করা চলবে না—বল্লুম তাই; কিন্তু দেখেছিলাম ওর অদ্ভুত নাড়ীজ্ঞান

কবিরাজ একমনে নাড়ী দেখে বল্লে—হুজুর, চিকিৎসা হলে এখনও বাঁচে, মৃত্যু নাড়ী নয়—

আমার ত মনে হয় মেরে কেটে দিন চার পাঁচ— বল্লুম আমি।

কি বলছেন—তিন সপ্তাহের আগে নয়—আজ শুক্লা সপ্তমী, এর পরে যে অমাবস্যা আসবে সেইটে পেরুবে কিনা সন্দেহ, এই কদিন সুচিকিৎসা হলে এখনকার মত টিঁকে যেতেও পারে, হুজুর যদি ভাল ওষুধ দেন— আমার যে ওষুধ নেই, টাকারও অভাব। দামী মুক্তা-ভস্ম হরিতাল ভস্ম পাব কোথায়, তা না হলে মা কালীর নাম করে চরকসুশ্রুতের আশীর্ব্বাদে চেষ্টা করে দেখতুম একবার—বাঁচিয়ে দিন ওকে, বাঁচিয়ে দিন, মৃত্যু নাড়ী নয়।

মেয়ের বা মার যত কাতরতা নাই থাক্, তার চেয়ে আকুল হয়ে উঠেছে কবিরাজ—বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা, তখনও জানি না ভেতরের ইতিহাস।

তবু কি রকম টানে পড়ে গিয়েছিলাম—রোগী দেখতে যেতাম মাঝে মাঝে, শুনতাম ওর কাহিনী। ক্লাবে কানাঘুষো হয়, গৃহিণীর মুখ ভার, আঁধার সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে—দুএকজন বন্ধু স্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন যে, সোনা ও তার মার পূর্ব্ব ইতিহাস মোটেই ভদ্রসম্মত নয়, তবু দেখতে যেতুম—কি সেবা শুশ্রূষাটাই না করতো কবিরাজ নিজে। হলো না কিছু—কিন্তু বেঁচে রইলো কবিরাজ যা বলেছিল ঠিক ততদিন। প্রথম প্রথম কত হাহুতাশ কত কাতরতা, কত কথা বলবো—এসব গল্প তখনি শোনা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যতই দিন যেতে লাগলো আশা কমতে লাগলো, ততোই যেন থিতিয়ে যায় ও। যে রাতে সোনার মা মারা গেলো, সেদিন সন্ধ্যেয় রুগী দেখতে গিয়ে অবাক্ হয়ে গেলুম—সেদিনও এমন জলঝড়বৃষ্টি— দেখি তার ভাঙা মরচে পড়া তানপুরোটা তুলে নিয়ে কবিরাজ ধরেছে ধ্রুপদে মেঘমল্লার—"ঘোরে ঘোরে বরখত বদরবা"।

ডাক্তার লোক, কত রকমে কত মৃত্যুর সামনাসামনি দাঁড়িয়েছি, কিন্তু সেদিন যে শান্ত স্তব্ধ গম্ভীরের পরিবেশ দেখেছিলাম তা অপূর্ব্ব। সৃষ্টিটা আগাগোড়াই অঙ্কসার খেলা নয় বন্ধু, দুয়ে দুয়ে পাঁচও হয়।

হঠাৎ আমায় দেখে চমকে উঠে বল্লে—কি আর দেখবেন হুজুর, আজ ভোর রাত কাটবে না, তাই ওস্তাদজীর কাছে শেখা একটা পুরাণো গান ধরেছিলাম—সোনার মা বড্ড পছন্দো করতো এক সময়।

সোনা তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদচে, ওর কোলে মাথা রেখে—

তারপর—

খোঁজখবর আর নিইনি, আসেওনি এদিকে, শুধু রোজ সন্ধ্যেয় ও যায় সোনাদের বাড়ী নিত্য নিয়মিত,

শত দুর্যোগে বজ্রাঘাতেও ব্যতিক্রম নেই, জিজ্ঞেস করলে বলবে—মা-মরা মেয়ে, বাপের স্নেহ পায়নি, দিনকাল খারাপ। দুষ্টু লোকে হাসে, বলে—কচি খুকী আর কি, কি আমার দরদ রে, বুড়ো বয়সেও রস শুকোয়নি, কবরেজ গভীর জলের মাছ।

দুই বন্ধু চুপ হয়ে যায়। গাড়ী বারান্দায় মোটরটা নিঃশব্দে ঢোকে, রাতের গভীরে অন্ধকার চেপে আসে, পরিতোষের কানে কিন্তু লেগে থাকে কান্তি কবরেজের কাতরানি—হুজুর, চারদিন খায়নি, কচি মেয়ে না খেয়ে রইলো, কি করে ভাত মুখে তুলি বলুন, নিজের হাতে রেঁধে নিয়ে এয়েছি। আমি বল্লে—ঠিক খাবে, খাবে না হুজুর……"

সমাজ জীবনে মহাকাব্যের নারী

শ্রীসুনীতিকুমার পাঠক

আলংকারিক মতে মহাকাব্য বলতে যে গ্রন্থই বুঝাক, ব্যাপক অর্থে ভারতীয় সাহিত্যে মহাকাব্য বলতে রামায়ণ ও মহাভারতকে বুঝায়। ডাঃ ভিনটারনিজের মতে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে দুইটী গ্রন্থ পূর্ণ অবয়ব লাভ করেছিল, মহাভারতটীতে বোধ হয় আরো কিছু বেশী দিন লাগে।১ ঐ দীর্ঘ দিন ধরে প্রাচীন ভারতের সামাজিক জীবনের যে ব্যাপক প্রগতি ও পরিবর্তন ঘটেছিল তার চিত্র বহুলাংশে গ্রন্থ দুইটীতে মিলে। সনাতন ধর্মের অনুশাসন সে যুগে ভারতের জনজীবনকে সব দিক দিয়ে ঘিরে রেখেছিল তাই সমাজ ও ধর্মজীবন পরস্পর সাপেক্ষ ছিল। এই ব্যাপক ধর্মের সাধনাই ছিল সে যুগের জীবনদর্শনের মূল তথ্য।

ঐ ধর্মচর্যায় পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই সচেষ্টভাবে আপন কর্তব্য পালন করতেন। স্ত্রী ছিলেন পুরুষের সহধর্মিণী। মহাভারতে সাধ্বী ভার্যাকে স্বামী বলেছেন,

"ধর্ম অর্থ ও কামমূলক কার্য-সকল, শুশ্রূষা ও সন্ততি নারীর উপর নির্ভর করে, পিতৃপুরুষের ও আপনার ধর্মকার্য স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পন্ন হয়।"২

সংসারের দৈনন্দিন সুখদুঃখ ও অভাব ও অভিযোগের মধ্য দিয়ে কিভাবে নিজের পরিবারকে পবিত্র ও কল্যাণময় করে তুলতেন তার পরিচয় দুইটী গ্রন্থেই মিলে। মহাভারতে অনুশাসন ও শান্তিপর্বে এবং রামায়ণে অত্রিপত্নী ও সীতাদেবীর সংবাদ প্রভৃতিতে নারীধর্মের সুমহান মর্যাদা ও উচ্চ নীতির কথা বলা হয়েছে।৩ এই আদর্শ নীতির বাস্তব পরিচয় সে যুগের বহু কাহিনীর মধ্যে দেখা যায়। সেকালের প্রায় সকল সামাজিক অনুষ্ঠানে নারীর বিশেষ স্থান ছিল এবং তাঁরাও সাধ্যমত শক্তি ও প্রচেষ্টা নিয়োগ করে সেই মহান আদর্শ বজায় রাখতে চেষ্টা করতেন।

মহাভারতে বলা হয়েছে যে পূর্বে কোন বিবাহের ব্যবস্থা ছিল না।৪ বংশবিস্তার ও জৈবিক প্রয়োজনে সমাজে স্ত্রীপুরুষের অবাধ মিলন চলত। পরে সামাজিক বিশৃংখলা দূর করার জন্যে বিবাহপ্রথার সৃষ্টি হয়। সমাজ ও দেবতাকে সাক্ষী রেখে ব্রাহ্ম, দৈব আর্ষ ও প্রাজাপত্য বিবাহের বিধান করা হয়, কিন্তু সকলের তাতে প্রয়োজন মিটে নি, তাই ক্ষত্রিয়দের জন্যে আসুর ও গান্ধর্ব, বৈশ্যদের রাক্ষস ও শূদ্রের পৈশাচ বিবাহের প্রথা যোগ করা হয়। সামাজিক আদর্শের দিক দিয়ে আসুর ও পৈশাচ পদ্ধতির নিন্দা করা হয়েছে।৫ এসকলের বিস্তৃত বিবরণ মহাভারতে অনুশাসন পর্বে বিবাহকথন অধ্যায়ে দেখা যায়।৬

সে সময় আর্য ও আর্যেতর জাতির মধ্যে মিলনের কয়েকটী উদাহরণ পাওয়া যায়। রাবণের পিতা বিশ্রবা মুনি ও কৈকসী রাক্ষসী, অর্জুন ও নাগকন্যা উলূপী, ভীম ও হিড়িম্বা রাক্ষসীর উদাহরণ মিলে। গান্ধর্ব কন্যা চিত্রাংগদা ও ঐরাবত কন্যা অর্জুনের সংগে৭ মিলিত হন। এসব বিবাহে সকল স্থানে শাস্ত্রীয় অনুমোদনের উল্লেখ নাই।

তখন শুল্ক বা পণপ্রথা প্রচলিত ছিল। তবে ধনরত্ন ও ধেনুসহ সালংকারা কন্যা দান প্রশংসা করা হয়েছে।৮। সীতা, দ্রৌপদী, অম্বিকা, দময়ন্তী প্রভৃতির বিবাহে বীর্যশুল্কের উল্লেখ দেখা যায়। কেকয়ী ও মাদ্রীর বিবাহে বরপক্ষকে অর্থ দিতে হয়েছে। স্বয়ংবর বিবাহে প্রায়ই কোন এক কন্যার জন্য পাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতা

১। A History of Indian Litereture Vol I. পৃঃ ৪৬৫, ৫১৬।

২। মহাভারত, বঙ্গবাসী সংস্করণ (=মহা) অশ্ব ৯০।৪৭।৪৮।

৩। রামায়ণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ (=রামা) অযোধ্যা ১১৮ অধ্যায়।

৪। মহা, আদি ১২২ অধ্যায়; বন ৩০৬।১৫।

৫। মহা, আদি ৭৩।৮—১১।

৬। মহা, অনু ৪৪ অধ্যায়।

৭। মহা, ভীম, ৯০।৭-৯।

৮। মহা, অনু, ৫৭।২৫, আদি ১২০।১২-১৩।

দেখা দিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়েরা বাহুবলের দ্বারা নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিতেন। অন্যদিকে কোন বিখ্যাত পুরুষের কাছে বহু রমণীই পাণিপ্রার্থিনী হতেন। দময়ন্তী, সাবিত্রী, শকুন্তলা প্রভৃতি স্বয়ংবরা ও সীতা, দ্রৌপদী, কুন্তী, উর্মিলা প্রভৃতি পিতৃদত্তা ছিলেন। দেবযানী প্রভৃতি অনেকে নিজেরা স্বামী নির্বাচন করেও পিতার অনুমোদনে বিবাহ করতেন।

প্রণালীর দিক দিয়ে যেমনি হোক, বিবাহের মূল লক্ষ্য ছিল সুপুত্র লাভ। যার ফলে দ্রৌপদী, কুন্তী, মাধবী৯ প্রভৃতি নারীর বহু-স্বামিকত্ব, অন্যপূর্বা বা বিধবার বিবাহ ও পৌনর্ভব পুত্রের১০ পরিচয় মিলে। "পুত্রের জন্য ভার্যা ও পিণ্ডের জন্য পুত্র" একথা বহুবার বলা হয়েছে। অপুত্রিকা বা বন্ধ্যা রমণী মাংগলিক অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণের অধিকারী ছিলেন না।১১ কল্যাণসংযুক্ত সুপুত্র লাভ ভাগ্যের বস্তু ছিল।১২ এই পুত্রকামনায় স্বীয় পরপুরুষ পরিচর্যা ও স্বামীর অন্য নারী সংগ করা আপদ্ধর্ম বলে সমর্থন করা হয়েছে। পাণ্ডু কুন্তীকে এবিষয়ে আদেশ করেন।১৩ সমাজে দেবরবিবাহও প্রচলিত ছিল। যম সাবিত্রীকে উপদেশ দিয়েছেন।১৪

সাধারণতঃ সমান বর্ণ কুল ও মর্যাদার পাত্রপাত্রীর মধ্যে বিবাহ হোত।১৫ দারিদ্র্যের জন্যে বিবাহ হয় নি, এমন দেখা যায়।১৬ সত্যবতী, সুকন্যা, গাধিকন্যা, শান্তা ও লোপামুদ্রা প্রভৃতির মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে ব্যাপকভাবে বহু বিবাহ ও অনুলোম বিবাহের প্রচলন দেখা যায়। শূদ্রার গর্ভজাত সন্তানকে সম্পত্তির অধিকারী করা হোত না বিদুর তার রাজ্য পান নি।১৭ প্রতিলোম বিবাহে পুরুষেরা ভয় পেতেন, তবে দ্রৌপদী সূতপুত্র কর্ণকে বিবাহ করতে চান নি।১৮

বিবাহের বয়স সম্পর্কে ত্রিশ বৎসরের পাত্রের সংগে দশ বৎসরের কন্যা বা একুশ বৎসরের পাত্রের সংগে সাত বৎসরের কন্যার বিবাহ বিধেয় ছিল ১৯। কিন্তু স্বয়ংবরা কন্যাদের বর্ণনায় একথার সামঞ্জস্য মিলে না। মনে হয়, যৌবনপ্রাপ্তের পরেও বিয়ে হোত। মনুসংহিতায় স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, মেয়েদের যেমন করে হোক বিয়ে দিতে হবে তা নয়। সুপাত্রের অভাবে কন্যার কুমারী অবস্থায় আজীবন বাস করা দূষণীয় নয়। রামসীতার বিবাহের বয়স নিয়ে পণ্ডিতগণ ভিন্নমত।

পুত্রের ন্যায় কন্যাসন্তানলাভ ধর্মের অংগ ছিল। গান্ধারী শত পুত্রের জননী হয়েও দৌহিত্রের নরক থেকে মুক্তিলাভের আশায় কন্যা কামনা করেন।২০। জামাইএর মর্যাদাও অসীম ছিল। কন্যার বিবাহের জন্য পিতাকে চিন্তাকুল হতে হয় বলে কন্যা-পিতৃত্বকে দুঃখ বলা হয়েছে।২১। পুত্রসন্তানের মত কন্যারও জাতসংস্কার হোত।২২ দত্তক হিসাবে কন্যা দান ও গ্রহণের বিধি ছিল।২৩ পৃথা কুন্তিভোজের দত্তকন্যা। পুত্রের অভাবে কন্যাকে সম্পত্তির অধিকারী করার বিধান ছিল।২৪

কুমারী অবস্থায় দেবযানী, উত্তরা প্রভৃতি রমণীরা পিতৃগৃহে বিদ্যাশিক্ষা করেন ও সত্যবতী, শকুন্তলা, কুন্তী, গান্ধারী প্রভৃতি গৃহকর্ম করতেন।২৫ শবরী, বিদুলা, সুলভা, বেদবতী, অনসূয়া প্রভৃতি বিদুষী নারীর কথা উল্লেখযোগ্য। বিবাহের পরে পতির ধর্ম অনুসরণ করাই সেযুগের নারীর আদর্শ ছিল। গৌতম, অত্রি, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিদের পত্নীরা তপস্যা করতেন। চিরকুমারী সুলভা প্রভৃতি অনেকে এককভাবে তপস্যা করতেন। সাধারণতঃ পতিগৃহে পতি ও তাঁর আত্মীয় ও গুরুজনের সর্বাংগীণ সেবা করা হয়েছে।২৭ পতিব্রতারা নিজেদের চরিত্রবলে এমন যশস্বী ছিলেন যে সবাই তাঁদের ভয় করতেন। গান্ধারী কৃষ্ণকেও অভিশাপ দিয়েছিলেন।২৮

সমাজে স্বামী ও স্ত্রীর পবিত্র কর্তব্য পরস্পরসাপেক্ষ ছিল। স্ত্রীর কাছে পতিই পরম দেবতা, স্বামীর স্ত্রী দ্বারা সম্মানিত হলে দেবতারা সন্তুষ্ট হন। দ্রৌপদী পুত্রদের থেকে স্বামীদের প্রতি অধিক অনুরক্ত ছিলেন,

---

৯। মহা, উদ্যোগ ১১৫।১২০ অধ্যায়।

১০। মহা, আদি ১২০।৩৩ শ্লোকের নীলকণ্ঠ।

১১। ঐ অনু ১২৭।১৩।

১২। ঐ শা ১৪০।১৪ ; শা ৭।১৩ ; শা ৩১৭,৭। রামা, বাল ১৪ অধ্যায়।

১৩। মহা আদি ১২০ অধ্যায়।

১৪। ঐ মহা, বন, ২৯৬ অধ্যায়, আদি ১২০।৩৫ , অনু ৮।২২, অনু ৪৪।৫২ ; শা ৭২,১২।

১৫। ঐ আদি ১৩১।১৯ , উদ্যোগ ৩৩,১২১ ; অনু ৯৪।২২ ; রামা বাল ৭৩ অধ্যায়।

১৬। মহা অনু ৪।১০ ; বন ৯৭-৯৮ অধ্যায়।

১৭। মহা আদি ১০৯।২৫।

১৮। ঐ আদি ৮১।১৮—৩০ ; আদি ১১৫।১৩—১৩ ; আদি ১৮৭।২৩

১৯। ঐ অনু, ৪৪।১৪ নীলকণ্ঠ।

২০। ঐ আদি ১১৮,১১।

২১। রামা, উত্তরা ৯।১১ অযোধ্যা ১১৭।৩৪—৩৬।

২২। মহা, আদি ২৩০,১৮, অনু ৪৫।১১।

২৩। ঐ আদি ১১১।১১২ অধ্যায়।

২৪। ঐ শান্তি ৩৩।৪৫।

২৫। ঐ আদি ১০০।১০৫।৯০ অধ্যায়, আদি ৭৯।৩—৫।

২৬। মহা উদ্যোগ ১০৯।১৯ ; ১৩০ অধ্যায় ; শান্তি ৩২০ অধ্যায়, রামা উত্তরা ১৭, রামা অযোধ্যা ১১৭।

২৭। মহা স্ত্রীপর্ব ২৫ অধ্যায়, বন ২০৫ অধ্যায়, আদি ১৮২ অধ্যায়, রামা অযোধ্যা ১১৭-১১৯ অধ্যায়।

২৮। মহা বন ৬৩।২৯৬ অধ্যায় অনু ১২৩ অধ্যায়।

একথা কুন্তী বলেছেন।২৯ নারীর একচারিণী ব্রত ও পুরুষের এক-পত্নীকতার প্রশংসা করা হয়েছে।৩০ তবে স্থান বিশেষে নারীর বহুপতিকতার নিন্দা করা হলেও পুরুষের বহুপত্নীকতার বিধান দেওয়া হয়েছে।৩১ প্রসংগত পতিপত্নীর এইরূপ পরস্পর নির্ভরতার আদর্শ বৌদ্ধ সাহিত্যে দেখা যায় এবং তাঁদের কর্তব্যের তারতম্য অনুযায়ী শ্রেণী-ভেদ করা হয়েছে।৩২ অঙ্গুত্তর-নিকায়ে সাত প্রকার স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে। স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ চার প্রকারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পতিগৃহে যাবার আগে কন্যার আত্মীয়বর্গ নানা উপদেশ দিতেন।৩৩ বিবাহের পরে দীর্ঘদিন পিতৃগৃহে কন্যার বাস নিন্দার বিষয় ছিল।৩৪ পতিগৃহের থেকে মাঝে মাঝে পিতৃগৃহে থাকার কথা দেখা যায়।৩৫

গৃহকার্যে দক্ষ রমণীই উপযুক্ত ভার্যা। গৃহিণীকে নিয়েই গৃহ। মেয়েদের সংসার কর্মের আদর্শ প্রণালী মহাভারতে গৃহস্থধর্ম, স্ত্রীধর্ম ও স্ত্রীস্বভাবকথন অধ্যায় ও উমা-মহেশ্বর সংবাদ প্রভৃতি বহুস্থানে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।৩৬ গার্হস্থ্য জীবনে অতিথিসৎকার অন্যতম প্রধান কাজ ছিল, মেয়েরা প্রায়ই সাগ্রহে এই কাজের ভার নিতেন: শকুন্তলা, দ্রৌপদী, শবরী, বেদবতী, সীতা প্রভৃতির বহু উদাহরণ মিলে। অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে দেখা হোত—তাই আপন স্ত্রীকেও অতিথির সেবায় নিযুক্ত করা হোত। সীতা ও দ্রৌপদী প্রভৃতি রাজ্ঞীরাও রন্ধনাদি করতেন। অভিষেক ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় নারীর মর্যাদা পর্বের প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।৩৭

ভ্রাতা জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে মাতার ন্যায় সম্মান করতেন ও কনিষ্ঠা ভগিনীকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন।৩৮ সপত্নীদের মধ্যে ঈর্ষ্যার অভাব ছিল না। কুলরমণীগণ দাসদাসীর সংগে সম্প্রীতি ব্যবহার করতেন।

স্বামীর মৃত্যুর পরে বিবাহের বিধান ছিল। মাদ্রী প্রভৃতি কেহ কেহ সহমৃতা হতেন, সত্যভামা প্রমুখ যদুবংশীয় ও ভানুমতী-প্রমুখ কৌরব রমণী বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। কুন্তী বিধবা হওয়ার পরে দীর্ঘকাল সংসারে বাস করেন ও শেষে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। স্বামীর পরে পুত্রের অধীনে স্ত্রীলোকের বাস করার কথা বলা হয়েছে।৩৯ পুত্রহীনা বিধবারা পিতৃগৃহে ফিরে যেতেন এমন উল্লেখ আছে। মোটের উপর বিধবার সাধারণত জীবন কঠোর দুঃখময় ছিল, যেমন জল থেকে ডাঙায় তোলা মাছের অবস্থা।৪০

সে কালে মেয়েদের মধ্যে অবরোধ প্রথা ছিল। অসূর্যম্পশ্যা কথাটী বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। যজ্ঞ, বিবাহ, স্বয়ংবর, অরণ্য বা বিপৎকালে মেয়েদের দেখার দোষ ছিল না। লঙ্কাপুরীতেও এই ব্যবস্থা ছিল।৪১ তবে কিষ্কিন্ধ্যায় বালীর পত্নী তারা নিঃসঙ্কোচে কথোপকথন করেন। অন্তঃপুরে স্ত্রাধ্যক্ষ নিযুক্ত করার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করার বিধান ছিল। অনেক সময় অনাবৃত অবস্থায় সাধারণ মেয়েদের দেখা যেত। তবে শিবিকার ব্যবহার ছিল। মুনি ঋষি অনেক সময় সস্ত্রীক দেশ পর্যটন করতেন, এমন কি সভা সমিতিতেও যোগ দিতেন।৪২

সে কালের ভারতের নারী সমাজের এক বৃহৎ অংশ দাসী বা অন্তঃপুরিকাদের সহচরী ছিলেন। প্রায়ই যজ্ঞে বিবাহে বিভিন্ন ধনরত্ন গবাদি পশুর মত বহু সংখ্যক সুন্দরী যুবতী উপঢৌকন দেওয়া হত।৪৩ তাঁরা প্রায়ই পুরুষদের পরিচর্যায় নিযুক্ত হতেন। প্রভুর সন্তোষ বিধানের জন্যে নিজেদের উৎসর্গ করে কৃতার্থ বোধ করতেন। বাড়ীর দাসীই মহাভারতে প্রভুর বংশরক্ষা করেন ও রামায়ণে প্রভুগৃহের শান্তির নীড় ধ্বংস করেন।

রেণুকা, প্রমদ্বরা, শর্যাতি, অহল্যা ও রম্ভা প্রভৃতি উচ্ছৃংখল নারী চরিত্রের উদাহরণ। পাতিব্রত্যের আদর্শবিচ্যুত রমণীকে রামায়ণে অনার্যা বলা হয়েছে ও মহাভারতে তাদের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে।৪৪ স্বৈরাচারিণীদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান ছিল। রেণুকার হত্যাকাণ্ড রামচন্দ্র সমর্থন করেছেন।৪৫ ব্যভিচারী পুরুষদেরও শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজধর্মে পরস্ত্রীসেবা গর্হিত কর্ম বলা হয়েছে।৪৬

রাজনীতিতে সেকালের মেয়েরা প্রত্যক্ষভাবে মন্ত্রণা দিতেন। দ্রৌপদী, গান্ধারী, সীতা প্রত্যেকেই স্বামীকে এবিষয়ে সাহায্য করেছেন।৪৭ শত্রুর কাছে অনেক সময় বিষকন্যা প্রেরণ করা

২৯। মহা উদ্যোগ ৯০।৪৪।

৩০। ঐ সভা ৬৮।৩৫, শান্তি, ১৪৮ অধ্যায়, শান্তি ২৬৫।

৩১। ঐ আদি ১৯৫।২৭, ১৯৬।৭, ২১৮।১৬, অশ্ব ৮০।১৪।

৩২। সিগালোবাদসুত্ত অত্থকথা, সুমঙ্গলবিলাসিনী।

৩৩। সুজাতা সুত্ত অঙ্গুত্তর-নিকায়।

৩৪। মহা আদি ৭৭।১২।

৩৫। মহা বন ২২।৪৭-৫১, ৩২।১।

৩৬। মহা শান্তি ২৪২ অধ্যায়, অনু ১৫৬।৯৩।১৪৬ অধ্যায়।

৩৭। ধর্মানুষ্ঠানে মহাকাব্যের নারী, ভারতবর্ষ ১৩৫৬, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা।

৩৮। মহা অনু ১০৫।১৯, সভা ২।৪।

৩৯। আদি ১২০।৩৩, বন ৭০।২৬, আদি ৭৪।৪৬, আশ্রম ১৭।২০, ১০।২০, মৌ, ৭।১৪, অনু ৪৬।১১।

৪০। মহা উদ্যোগ ৩৩।৭৪, আদি ১৫৮ অধ্যায়।

৪১। রামা লঙ্কা ১১৬ অধ্যায়।

৪২। রামা কিষ্কিন্ধ্যা ৩৩ অধ্যায়, আদি ৮০।২২, মহা উদ্যোগ ৮৬,১৬।

৪৩। মহা আদি ১৯৮।১৬, ৮১।৩৭, ২২১।৪৯, সভা ৫২।২৯।

৪৪। রামা অযো ১১৮ অধ্যায়।

৪৫। রামা অযো ৫১।৩৩; মহা, শান্তি, ১৬৫ অধ্যায়, অনু ১০৪ অধ্যায়।

৪৬। মহা শান্তি ৯০।৩২.৩৫।

৪৭। ঐ বন ২৯ অধ্যায়, উদ্যোগ ১২৯ অধ্যায়, রামা আরণ্য ৯ অধ্যায়।

হোত।[48] ঋষ্যশৃঙ্গকে আনতে সুমন্ত্র সুন্দরী যুবতী প্রেরণের মন্ত্রণা দিয়েছেন।[49] রাজা ভার্যা ও ভগিনীর সংগে অবস্থা অনুযায়ী প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যবহার করতেন।[50]

এই মহাকাব্য দুইটীতে নারীর আদর্শ কর্তব্য ও পবিত্র জীবনযাত্রার পদ্ধতির সংগে সংগে সেগুলি অনুকরণের তৎপরতা ও অসমর্থতায় যে সকল বিচ্যুতি ঘটেছিল সে সকল চিত্রের অভাব নেই। অনেক ক্ষেত্রে আদর্শের সংগে বাস্তব মিল রাখতে পারে নি, কিন্তু আদর্শের মূল্য তাতে হ্রাস পায় নি। এই ইতিহাস দীর্ঘ দিন ধরে রচিত হয়েছিল বলে অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী হয়ে গেছে। যেমন গুরুকন্যা ও শিষ্যের বিবাহ নিষেধ করা হলেও উদ্দালক কচ ও উতঙ্ক গুরুকন্যাকে বিবাহ করেন ও গুরুপত্নীরাও তাঁদের পরিচর্যা করেন।[51]

এই দুই মহাকাব্যের মধ্যে বর্ণাশ্রমপন্থী সমাজের চিত্রই পরিস্ফুট হয়েছে। সমসাময়িক যুগের যে চিত্র বৌদ্ধসাহিত্যে মিলে, তার সংগে এর আদর্শের মিল নেই। মহাভারতে ব্রাহ্মণাদির অনুলোম বিবাহে সমানবর্ণা কন্যারই অগ্রমহিষীর বিধান রয়েছে, কিন্তু পালি নিকায়ে প্রসেনজিতের অগ্রমহিষী মল্লিকা মালাকার কন্যা ছিলেন।[52]

রামায়ণের নারী ও মহাভারতের নারীর মনোবৃত্তির একটু ভিন্ন ধারা লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণে মেয়েরা পুরুষের অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেও স্বামীর কল্যাণ চিন্তা অনুক্ষণ করেছেন। মহাভারতে এমনটী নয়। আরও সীতা বিরাধের হাতে নিগৃহীত ও রাবণের হাতে লাঞ্ছিত অথচ দ্রৌপদী, দময়ন্তী, সাবিত্রী প্রভৃতি নারীরা নিজের তেজস্বিতায় আত্মরক্ষা করেছেন।[53] সীতার সতীত্ব হারাবার সম্ভাবনা ছিল বলেই রাম অগ্নিশুদ্ধির প্রয়োজন মনে করেছিলেন, অথচ মহাভারতে দময়ন্তী, চিন্তা প্রভৃতি রমণীরা স্বামীর থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকলেও পুনর্মিলনের সময় নল ও শ্রীবৎস এই পরিশুদ্ধির প্রশ্ন ভাবেন নি। রামায়ণে শুধু সীতা নয়, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, মন্দোদরী ও তারা বড় বেশী পুরুষের উপর নির্ভরশীল। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, "সীতা রাজ্ঞী হইয়াও কুলবধূ, দ্রৌপদী কুলবধূ হইয়াও প্রধানতঃ প্রচণ্ড তেজস্বিনী রাজ্ঞী।"

আরও মহাভারতে পরশুরামের কয়বার সমাজ নিঃক্ষত্রিয়[54] করার পর ক্ষত্রিয়াণীদের ক্ষেত্রজ পুত্ররূপে ক্ষত্রিয়ের উদ্ভব হয় সুতরাং একচারিণীর পাতিব্রত্যের প্রশংসা থাকলেও বাস্তবে বিপরীত দৃষ্টান্ত মিলে। এই দুই গ্রন্থের নারী পুরুষের কাছে উপেক্ষিত ভোগের সামগ্রী মাত্র, এমন চিত্রের অভাব নাই। সমাজের সর্বত্রই প্রায় নারী-ধর্ষণের প্রচেষ্টা হয়েছে। পুরুষের অক্ষমতায় ধর্ষিত রমণীকে সমাজে পরিবেত্তাদিও[55] প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পুনশ্চ গ্রহণের বিধান করা হয়েছে। কীচক, জয়দ্রথ, দুঃশাসনের থেকে দ্রৌপদী ও রাবণের থেকে সীতা ও বেদবতীকে অতি সন্তর্পণে নিজেদের দৃপ্ততায় সতীত্ব রক্ষা করতে হয়েছে, অথচ যুধিষ্ঠির পণের সামগ্রী হিসাবে ধর্মপত্নী দ্রৌপদীকে ব্যবহার করেছেন ও রাম রাক্ষসগৃহে বন্দিনী থাকার পর সীতার উপর অশোভন পরুষবাক্য বলতে দ্বিধা বোধ করেন নি।[56]

তখনও আর্য সমাজ আর্যেতর জাতির সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত। সেটা শুধু দৈহিক বলের সংগ্রাম নয়, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে অনার্যদের মধ্যে আর্যদের বিশেষত্ব স্থাপন করার চেষ্টা চলছিল। ফলে অনেক আর্যেতর নীতি আর্য সমাজে ঢুকে গেছে এবং কতক আর্যপ্রথা লোপ পেয়েছে। আজ তা বিশ্লেষণ করা শক্ত। আরও রামায়ণের চেয়ে মহাভারত আয়তন ও রচনা কালের দিক দিয়ে ব্যাপক ও বিস্তৃত বলেই দ্বিতীয়টিতে অধিক বিচিত্র প্রকারের সামাজিক চিত্র ফুটে উঠেছে। তাই এর সামাজিক বিধানে পারম্পর্য নিরূপণ করা দুষ্কর কাজ।

ডাঃ উিনটার নিজে এ প্রসংগে বলেছেন যে কুন্তী গান্ধারী বীর-জননী ছিলেন, কিন্তু কৌশল্যা কৈকেয়ী পৌরাণিক সাহিত্যের সাধারণ রাজমাতা। এও অনুমান করা যেতে পারে যে, মহাভারত পশ্চিম ভারতের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও অধিক সংগ্রামশীল যুগে রচিত, আর রামায়ণ পূর্ব ভারতের অধিক উন্নত সভ্যযুগে লিখিত। এই দুই মহাকাব্যে ভারতের দুই বিভিন্ন যুগের চিত্র দেয় না, বরং দেশের দুই ভিন্ন প্রান্তের সমসাময়িক চিত্র যুগপৎ ফুটে উঠেছে।[57]

সেই বহুধা বিভক্ত সমাজ চিত্রের মধ্যে নারীর যে সহজাত গুণটী প্রকাশ পেয়েছে তা হোল তনুতা, মৃদুতা ও বিক্রমতা।[58] সেই সমাজে নারী যেমন পুরুষকে ছেড়ে স্বতন্ত্র ছিল না[59] পুরুষও তেমন নারীকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণতা পায় নি। মহাভারতে এর প্রমাণ মিলে :

অর্ধং ভার্যা মনুষ্যস্য, ভার্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্যা মূলং ত্রিবর্গস্য, ভার্যা মূলং তরিষ্যতঃ॥[60]

৪৮। মহা শান্তি ১২০।১৫ নীলকণ্ঠ।

৪৯। রামা বাল ৮-৯ অধ্যায়।

৫০। মহা শান্তি ১৩৮।১৫১-১৫২।

৫১। মহা বন ১৩২।৮ আদি ৭৭ অধ্যায়, অশ্ব ৫৬ অধ্যায়।

৫২। ঐ অনু ৪৮ অধ্যায়, সংযুক্তনিকায় কোশল, ১ বর্গ ৮, ২ বর্গ ৬।

৫৩। মহা বিরাট ১৬।৮, আদি ১৫৮।১১, বন ৭।৬৩, রামা আরণ্য ২-৩ অধ্যায়।

৫৪। মহা আদি ৬৪।৫০, আদি ১০৪।৫১।

৫৫। মহা শান্তি ৩৫।২৭।

৫৬। মহা সভা ৬১।৬৩ অধ্যায়, রামা লঙ্কা ১১৭ অধ্যায়।

৫৭। A History of Indian Literature—I পৃঃ ২০৭।

৫৮। মহা অনু ১২।১৪।

৫৯। ঐ অনু ৪৬।১৪, ২০।২০।

৬০। ঐ আদি ৭৪।৪১।

রাশি ফল

জ্যোতি বাচস্পতি

জন্মরাশি

যদি বৃষ আপনার জন্মরাশি হয়, অর্থাৎ চন্দ্র আকাশে যে সময় বৃষ নক্ষত্রপুঞ্জে ছিলেন, সেই সময় যদি আপনার জন্ম হ'য়ে থাকে, তাহ'লে এই রকম ফল হবে।

প্রকৃতি

আপনার অনুভূতি বেশ গভীর, কিন্তু সে অনুভূতির মধ্যে তীক্ষ্ণতা বা তীব্রতা ততটা থাকবে না, যতটা থাকবে স্থিরতা ও দৃঢ়তা। আপনি সাধারণতঃ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও উচ্চাভিলাষী হবেন এবং চেষ্টা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা অনেক দুষ্কর কর্ম সিদ্ধ করতে পারবেন। আপনার প্রকৃতিতে কতকটা রক্ষণশীলতা আছে, একটু গোঁড়ামিও বলা যেতে পারে, কেননা, যে মত বা পথ আপনি একবার নিজের ব'লে গ্রহণ করবেন, সহজে তা ছাড়তে চাইবেন না। আপনি যে পরিবর্তন বা সংস্কারের একান্ত বিরোধী তা নয়। কিন্তু পুরানোকে ভেঙে চুরে একেবারে বাতিল করতেও আপনি নারাজ। আপনার সেই রকমের সংস্কার কাম্য হবে, যাতে ভিতরে পুরানো কাঠামো বজায় রেখে বাইরে অদল-বদল করা চলে।

আপনার পছন্দ না পছন্দ পরিষ্কার ভাবে নির্দিষ্ট। তার মধ্যে বেশ একটা জোর লক্ষিত হওয়া সম্ভব। আপনি যা ভালবাসেন তা সবখানি হৃদয় দিয়েই গ্রহণ করবেন, যা আপনার বিরাগ উদ্রেক করে তাকে সযত্নে বর্জন করবেন।

নিজের সম্বন্ধে আপনার মনে একটা গর্ব থাকা সম্ভব এবং যাতে সম্ভ্রমহানি না হয় সে দিকে আপনার বিশেষ লক্ষ্য থাকবে। অপরের কাছ থেকে প্রশংসা পাবার আকাঙ্ক্ষা আপনার মনে প্রবল এবং যেখানে আপনার প্রতিষ্ঠা পুরোমাত্রায় বজায় থাকবে না সে স্থান আপনি তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করবেন। নিজের স্বার্থের দিকে আপনার বিশেষ লক্ষ্য থাকবে এবং আপনি কম বেশী আত্মপরায়ণ হ'তে পারেন। অনেক সময় অহমিকা ও আত্মপরায়ণতার জন্য আপনার শত্রুর সৃষ্টি হ'তে পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

আপনার মধ্যে মিতাচার ও মিতব্যয়িতার একটা সংস্কার থাকবে বটে, কিন্তু আপনার বিশেষ প্রিয় অথবা কোন রকম সখের জিনিষের জন্য মাঝে মাঝে অপব্যয় করতে যেমন আটকাবে না, তেমনি কোন বিশেষ সম্ভোগের জন্য মাঝে মাঝে অমিতাচারীও হ'য়ে উঠবেন। এ বিষয়ে সংযম আবশ্যক। কেননা আপনার আবেগের গভীরতার জন্য এক এক সময় এত বাড়াবাড়ি হ'তে পারে—যা আপনার দৈহিক বা মানসিক সুস্থতাকে বিপন্ন ক'রে তুলতে পারে।

আপনার মধ্যে কর্তৃত্ব করবার ইচ্ছা ও শক্তি দুইই আছে এবং সুযোগ পেলে যে কোন ব্যাপারে হোক উচ্চপ্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেন। ধৈর্য ও একটানা পরিশ্রম করবার শক্তি আপনার অসাধারণ। আপনার মধ্যে পরিশ্রম করবার শক্তি যেমন আছে, তেমনি পরিশ্রমের পর স্বচ্ছন্দ বিশ্রামও আপনি চান।

স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে আপনি কম বেশী ঈর্ষাপ্রবণ হবেন এবং অনেক সময় প্রীতির পাত্রের সামান্য ব্যতিক্রমেই তার উপর কঠোর ব্যবহার করতে পারেন। স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে বাড়াবাড়ির জন্য কিছু অখ্যাতি বা লোকনিন্দাও হ'তে পারে সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত। মোট কথা স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে আপনি কম-বেশী আত্মপরায়ণ হবেন এবং যে পরিমাণে প্রীতি অর্পণ করবেন প্রতিদান চাইবেন তার বহুগুণ বেশী। এইজন্য স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে আপনাকে কম-বেশী দুঃখ পেতে হবে।

শিল্পকলার দিকে আপনার একটা সহজ আকর্ষণ আছে এবং সেদিকের দক্ষতাও আপনার কম বেশী থাকা সম্ভব, কিন্তু শিল্পকলার অনুশীলনে আপনি খুব বেশী আত্মনিয়োগ করতে পারবেন না, যদি না তা থেকে আপনার বাস্তবিক কোন লাভ হয়।

অর্থ ভাগ্য

আর্থিক ব্যাপারে মোটের উপর আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলা যায়। অর্থ উপার্জন ও সঞ্চয়ের অনেক সুযোগ আপনার জীবনে আসবে। কিন্তু অনেক সময় অতিরিক্ত সাবধানতা বা দৃষ্টি কৃপণতার জন্য আপনি অর্থপ্রয়োগে ইতস্ততঃ করবেন এবং তাতে ক'রে বেশী লাভের সুযোগ ঠিক মত নিতে পারবেন না। তা ছাড়া ব্যয় বিমুখতার জন্য অনেক সময় পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারেন। সে বিষয়ে সতর্কতা আবশ্যক।

কোষ্ঠীতে গ্রহসংস্থান যদি একেবারে খারাপ না হয়, তাহ'লে আপনার আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। পিতৃপক্ষ থেকে অথবা কোন আত্মীয়ার তরফ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্থ বা সম্পত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু জায়গা-জমি, বাড়ীঘর, কিম্বা প্রাপ্য সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা বিবাদ বিসম্বাদের আশঙ্কাও আছে। আপনার গৃহভূমির ব্যাপারে কম-বেশী ব্যয় হবে এবং জীবনের শেষে ব্যক্তিগত অর্থ সম্পত্তি থাকা খুবই সম্ভব।

কর্ম জীবন

কর্মের ব্যাপারে আপনার উচ্চাভিলাষ আছে বটে, কিন্তু সে উচ্চাভিলাষ অনেকটা সীমাবদ্ধ হবে। আপনার ব্যবহারিক বুদ্ধি বেশ পরিণত ব'লে এবং সাবধানতা আপনার স্বভাবসিদ্ধ ব'লে, আপনি সাধারণতঃ পক্ষপাতী হবেন সেই সব কাজের যা আবহমানকাল

বর্ণ

সাদা এবং সব রকমের ফিকে ও হালকা রঙ্ আপনার প্রীতিপ্রদ হওয়া উচিত। ফিকে হলদে বা ফিকে নীল আপনার বিশেষ সৌভাগ্য-বর্দ্ধক। ধবধবে সাদা রঙও আপনার পক্ষে ভাল। সব রকমের গাঢ় ও মেটে বা ঘোরাল রঙ্ আপনার বর্জন করাই ভাল।

রত্ন

আপনার ধারণের উপযোগী রত্ন—মুক্তা, শ্বেতপ্রবাল, চন্দ্রকান্তমণি (Moon stone) প্রভৃতি। হাতীর দাঁতও ব্যবহার করতে পারেন।

যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি এই রাশিতে জন্মেছেন তাঁদের জনকয়েকের নাম—শ্রীশ্রীকৃষ্ণ, মহারাণী ভিক্টোরিয়া, সেনর মুসোলিনী, জে সি রকফেলার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, লর্ড এস্ পি সিংহ। প্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কেপ্লার, দেশপ্রিয় জ্যোতিন্দ্রমোহন, প্রসিদ্ধ রস-সাহিত্যিক জেরোম কে জেরোম।

গোবিন্দদাসের পদাবলী

শ্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী

কয়েকমাস আগে ডিটেক্‌টিভ গল্প লেখক মণিলাল অধিকারী তাঁর দেশ ঘাটাল থেকে গোবিন্দদাসের পদাবলীর একখানি ছিন্ন পুঁথি আমাকে এনে দিয়েছিলেন। পুঁথিখানির পাঠোদ্ধার করতে আমি অনুরুদ্ধ হয়েছিলাম। তাঁর মুখে শুনেছিলাম এই পুঁথিখানি এবং এমনি আরও বহু পুঁথি শ্রীখণ্ড থেকে ঘাটালে বাহিত হয়ে এসেছিল। তার কারণ—তাঁর পূর্ব্ব পুরুষের বাসস্থান পরিবর্ত্তন।

পুঁথিখানি এপিঠ-ওপিঠ ক'রে লেখা। ৬' পৃষ্ঠা থেকে ছাব্বিশ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত আছে। উপাদান হচ্ছে তুলট কাগজ। আকার ও আয়তন হচ্ছে—লম্বায় সাড়ে এগার ইঞ্চি ও চওড়ায় সাড়ে তিন ইঞ্চি। অক্ষর প্রকরণ হচ্ছে—অব্যবহিত পূর্ব্ব যুগের।

প্রতিটি পদের শেষ পংক্তিতে প্রথানুযায়ী গোবিন্দদাসের নাম উল্লিখিত আছে। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যে চণ্ডিদাস-সমস্যার মতই গোবিন্দদাসকে নিয়ে আরেক সমস্যা। গোবিন্দ ঠাকুর, গোবিন্দ কবিরাজ এঁরা সবাই গোবিন্দদাস। আমাদের আলোচ্য পদাবলীর লেখক গোবিন্দদাস হচ্ছেন ৺সতীশচন্দ্র রায়ের ভাষায়—"মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি" (শ্রীশ্রীপদ কল্পতরু, ৫ম খণ্ড—পরিশিষ্ট—পৃঃ ৬৮, বঃ সাঃ পঃ প্রঃ)। কবিরাজ মহাশয়ের দাস শব্দটির ব্যবহার সম্বন্ধে ৺সতীশচন্দ্র রায় বলেছেন—"গোবিন্দ কবিরাজ কোন কোন ভণিতায় যে ভাবে দাস' শব্দটির ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে উহা যে বাঙ্গালী বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদিগের স্বাভাবিক দীনতাসূচক উপাধি মাত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকেনা যথা—

'তরুণ-অরুণ রুচি পদ অরবিন্দ
নখ মণি নিছনী দাস গোবিন্দ ॥' (১৮ সংখ্যক পদ)
'লহু লহু হাস ভাষ মৃদু বোলত
চলইত গতি অতি মন্দ।
দিনজনে নিজ নিজ দেই সব ভারণ
বঞ্চিত দাস গোবিন্দ ॥' (১৩২ সংখ্যক পদ)
এমন- কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়;
না জানি কি জানি হয়ে পরিণাম
দাস গোবিন্দ কয় ॥' (১৫০ সংখ্যক পদ)

এরূপ স্থলে 'দাস' শব্দটা যে নামের অংশরূপে নহে কিন্তু বাঙ্গালী পদকর্ত্তাদিগের রীতি অনুসারে ব্যবহৃত দীনতাসূচক উপাধি মাত্র, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।" (শ্রীশ্রীপদকল্পতরু—৫ম খণ্ড পরিশিষ্ট—পৃঃ।

কবিরাজের জীবনী ও পদ রচনা ভঙ্গী নিদর্শন সমেত ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ২৭১ থেকে ২৭৬ পৃষ্ঠার মধ্যে আলোচনা করেছেন এবং ঐ গ্রন্থের ২৮৯ পৃষ্ঠায় বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দ দাসের পদ রচনার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনার কিয়দংশ এখানে প্রয়োজন বোধে তুলে দিচ্ছি :—'পদকর্ত্তাগণের মধ্যে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহার রচিত পদে বিদ্যাপতির রসপূর্ণ উচ্ছ্বাসের অপ্রস্ফুট প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে; মৈথিল কবির পদে অনুভবের তীব্রত্ব ও উদ্দীপনা শক্তি বেশী, কিন্তু গোবিন্দের পদে স্বার্থত্যাগ ও পবিত্রতা অধিক, কবিত্বের হিসাবে গোবিন্দ বিদ্যাপতি হইতে নিম্নে দাঁড়াইবেন, কিন্তু বহু নিম্নে নহে। বিদ্যাপতি যেরূপ গোবিন্দ-দাসের আদর্শ, চণ্ডিদাস সেইরূপ জ্ঞান দাসের আদর্শ; জ্ঞানদাসের কতক গুলি পদ চণ্ডিদাসের চরণ ভাঙ্গা; তাহা মিষ্টত্বে মনোহর ও ভাব সম্বন্ধে মূলের ঈষৎ ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া বলিয়া গ্রহণ করা যায়; জ্ঞানদাস বর্ণিত নায়কের প্রেম বিকাশ চেষ্টা নানাবিচিত্র বর্ণপাতে সুন্দর এবং সেই সৌন্দর্য্য সততই নির্ম্মল অশ্রুজলে উজ্জ্বল হইয়াছে।

১ পদাংশটি গোবিন্দদাস কবিরাজের কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। প্রবন্ধ মধ্যে পরে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য দেখতে অনুরোধ করি।

কবিরাজ সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে ২৩৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"ষোড়শ শতাব্দীর শেষে গোবিন্দদাস নামে দুইজন বড় পদ-কর্তা ছিলেন। দুইজনই শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন; ইঁহাদের নাম গোবিন্দদাস কবিরাজ এবং গোবিন্দদাস চক্রবর্ত্তী। তিনি আবার লিখেছেন যে (২৩৬ পৃঃ)—"ষট্ ত্রিংশবর্ষের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় আমি গোবিন্দদাসের জীবনী এবং কবিতা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।" তিনি কি আলোচনা করেছেন তা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি বলে আর অন্যান্য যাঁদের অনুরূপ সৌভাগ্য হয়নি তাঁদের জানান দরকার বলে আমি কবিরাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী এখানে উদ্ধৃত করলাম।" আনুমানিক খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষের দিকে গোবিন্দদাস কবিরাজের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম চিরঞ্জীব, মাতার নাম সুনন্দা, মাতামহের নাম দামোদর। সঙ্গীত দামোদর গ্রন্থের রচয়িতা দামোদর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। গোবিন্দের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন রামচন্দ্র কবিরাজ। মাতুলালয় শ্রীখণ্ডেই গোবিন্দদাসের জন্ম হয়। অল্প বয়সে পিতৃ-বিয়োগ হওয়াতে দুই ভাই মাতামহাবাসে পরিবর্দ্ধিত হন। পরে পৈতৃক স্থান কুমার নগর ও পরে সেখান হইতে তেলিয়া বুধরী গ্রামে যাইয়া বসবাস করেন।

(৩) নীলাচলে কনকাচল গোরা প্রভৃতি গোবিন্দদাস কবিরাজের রচিত বলে অভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত থাকায় আমার সংগৃহীত পুঁথির পদগুলি কবিরাজের রচনা বলে ধ'রে নিয়েছি।

পুঁথিখানির মধ্যে কম বেশ সত্তরটি পদ আছে। প্রথম দিকের দুটি পদ সম্পূর্ণ পাইনি, তার কারণ পুঁথিখানির প্রথম পৃষ্ঠা পাইনি, আর চতুর্থ পৃষ্ঠার উপর-পিঠের প্রান্ত একটু ছেঁড়া আছে।

পদগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে তাদের প্রত্যেকটি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বিষয়ক। এর আগে গোবিন্দ দাস কবিরাজের যে ৪৬০টি পদ পাওয়া গিয়াছে তাদের অধিকাংশই রাধা-কৃষ্ণ-বিষয়ক, শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ অল্পই। সেই কারণে এই পদগুলির কিছু মূল্য আছে এবং পদগুলি প্রকাশিত হওয়াও দরকার। এখানে ধারাবাহিকভাবে পদগুলির যথাযথ পাঠ উদ্ধৃত করছি:

(২য় পৃষ্ঠার উপর পিঠ থেকে)

...[illegible] কি নিতাই বহি আর ॥১॥
দেখ দেখ গৌর গুণমণি।
করুণায় কোন বিহি মিলায়ল আনী ॥ ধ্রু॥
জপ যজ্ঞ পাত্র মধুর নিজ নাম।

গোবিন্দদাসের পদাবলীর পুঁথি—২য় পৃষ্ঠা (নীচের পিঠ) ফটো—শ্রীদাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায়

গোবিন্দের স্ত্রীর নাম মহামায়া এবং একমাত্র পুত্রের নাম দিব্য সিংহ।" (পৃঃ ২৩৬)।

এরপর ডক্টর সেন ২৩৮ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেছেন—"কবিরাজের পদগুলির ভাষা 'বিশুদ্ধ' (অর্থাৎ যতদূর সম্ভব কম বাঙ্গালা পদবর্জ্জিত) ব্রজবুলি এবং তাহাতে তদ্ভব অপেক্ষা তৎসম এবং অর্দ্ধ-তৎসম পদেরই আধিক্য। ইঁহার লেখায় ছন্দের বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। অনুপ্রাসের ও উপমা রূপকাদি অর্থালঙ্কারের প্রয়োগ কবিরাজের মত আর কোন পদ-কর্ত্তাই করিতে পারেন নাই। শব্দের ঝঙ্কারে এবং পদের লালিত্যে গোবিন্দদাস কবিরাজের গীতি-কবিতাগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।" তাঁর একটি মন্তব্যের উল্লেখ করা এখানে দরকার (২৩৭ পৃঃ) "গোবিন্দদাস বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কোন পদ রচনা করিয়াছেন কিনা জানা নাই। গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত বাঙ্গলাপদগুলিকে গোবিন্দ-দাস চক্রবর্ত্তীর রচনা বলিয়া ধরা হইয়া থাকে।"

এখন এই সব সাক্ষ্য-প্রমাণের বলে আর কতকগুলি পদ যেমন:—

(১) গৌরাঙ্গ করুণাসিন্ধু অবতার,
(২) পতিত হেরিঞা কান্দে,

পাত্র গাও আয় আপন গুণগাম ॥
নাচে নাচায় বধির জড় অন্ধ
করিহোনা পেখল ঐছন গৌর পরবন্ধ ॥
আপে ভরি ভুবন করু ভোর।
নিজ ভাব নাহি সভারে করু কোর ॥
ভাখণ প্রেমে যখিল নর নারী।
গোবিন্দ দাস কহে জাও বলিহারি ॥৩॥

সিন্ধুড়া।

গৌরাঙ্গ করুণা সিন্ধু অবতার
নিজ গুণ গাঁথিঞা নাম চিন্তামণি
জগতে পরায় নিহার ॥১॥ ধ্রু ॥
কলি তিমিরাকুল অখিল লোকহেরি
বদন হৈ চাঁদ পরকাশ।
লোচন প্রেম সুধা রস বরিষণে
জগজন তাপ বিনাস ॥২॥
ভকত কল্পতরু অন্তরে অঙ্কুর

রূপ হিয়া মহাধাম।
তছু পদ তলে অবলম্বন পখিক পরায়ণ
নিজ নি কাম
ভাব গজেন্দ্র চড়ায়ত অকিঞ্চন
ঐছন পহুক বিলাস।
সংসার কালকূট বিষে দঘল
এক নহি গোবিন্দদাস ॥ ৩ ॥ ৮ ॥

বিভাস।

পুলক বলিত অতি ললিত হেমতনু
অনু খন নটন বিভোর।
কত অনুভাব অবধি নাহি পাইএ
প্রেম সিন্ধু নয়ন হিলোর ॥১॥
জয় জয় ভুবন মঙ্গল অবতার
কলি যুগ বারণ মদ বিনি বারণ
হরি ধনি জগতে বিথার ॥ধ্রু॥
নিজ রসে ভাসি হাস খনে রোয়ই
গদ গদ আকুল বোল।
প্রেম ভরে গর গর না জানে আপন পর
পতিত কানেরে দেই কোর ॥২॥
ইহ রসে নিমগন সকল সুরাসুর
দিন রজনি নাহি জান।
গোবিন্দ দাস বিন্দু নাপি কান্দএ
শ্রীবল্লভ পরমাণ ॥৩॥ ৫ ॥

সিন্ধুড়া।

পতিত হেরিঞা কান্দে থির নাহিক বান্ধে
করুণ নয়নে চায়।
নিরুপম হেম জনু উজর গোর তনু
অবনী ঘন পড়ি জায় ॥১॥
গোরা পহু নিছনী লৈঞা মরি
ও রূপ মাধুরী চরিত পীরিতি
তিলেক পাশরিতে নারি ॥ধ্রু॥
বরণ আশ্রম কিঞ্চন কিঞ্চন
কার কোন দোষ নাহি মানে।
কমলা শিব বিহি দুলহ প্রেম নিধি
দান করেন জনে জনে ॥
ঐছন সদয় হৃদয় রসময়
পহুর ভেল পরকাশ।
প্রেম ধনে ধনি করএ অবনি
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস ॥৩॥ ৬॥

কেদার ॥

প্রেমে ঢল ঢল কনয়া কলেবর
নটন রসে ভেল ভোর।
এদিন যামিনি আবেশে অবস
প্রিয় গদাধর কোর ॥১॥
গোরা পহু করুণাময় অবতার।
যোগুণ কুর্ত্তন পতিত হবগত
সভাই পয়ল নিস্তার। ধ্রু॥
হরি হরি বোলি ভুজ যুগ তুলি
পুলকে দ্বিগুণ তনু।
অরুণ দিঠি জলে অবনি ভাসল
সুর ধুনী ধারা বহে জনু ॥২॥
ঈষত হাসনি মধুর ভাষণি
পাষাণ মিলাইয়া যায়।
অখিল জগজন প্রেমে পুরল
গোবিন্দদাস বঞ্চিত তায় ॥৩॥ ৭।

সিন্ধুড়া ॥

পদতলে কত কল্পতরু সঞ্চয়
সিঞ্চিত প্রেম মকরন্দ
তাঁকর ছায় সুরা সুর নরবর
পরম আনন্দে নিরধন্দ ॥১॥
পেখলু গৌরচন্দ্র নটরাজ।
জঙ্গম হেম কল্পতরু চঁয়ল
বিবুধ বহিগ মাঝ ॥ধ্রু॥
নয়ন নীরদ জিনি কত মন্দাকিনী
ত্রিভুবন ভরল তরঙ্গে।
নিত্যানন্দ চন্দ্র ধাম দিনমণি ভ্রমই
প্রদক্ষিণ রঙ্গে ॥ ২ ॥
তাকর চরণ সমাধি এ সঙ্কির
চতুরালন করু আসে।

* * * * * *

[শেষ চরণ ৪র্থ পৃষ্ঠার ওপর দিকের গোড়াতে ছিল, তা পাওয়া যায়নি। ১১শ পদের ১ম চরণের গোড়ার কিছুটা পাওয়া যায়নি।]

লথত বৃন্দ।

অখিল ভুবন উজর কারি
কুন্দন কনক কাঁতিয়া ॥
অগতি গতি কুমুদবন্ধু হেরত উছল রসিক সিন্ধু
হৃদয় কুহর তিমির উদিত দিনহ রাতিয়া ॥১॥
সহজ সুন্দর মধুর দেহ আনন্দে আনন্দে না বান্ধে থেহ
ঢুলি ঢুলি ঢুলি চলত মত্ত করিবর ভাঁতিয়া।
নটন ঘটন ভৈ গেল ভোর মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল
রোয়ত হসত ধরণী খসত সোয়ত পুলক পাঁতিয়া ॥২॥
মহিম মহিমা কো কহু ওর নিজ পরধনি করএ কোর
প্রেম অমিঞা হরখি বরখি তরখি ত মহি মাতিয়া।
সোরসে উত্তম মধ্যম ভাষ বঞ্চিত একলা গোবিন্দদাস
কে জনে কি থেনে কৌরে গঠন কাঠ কঠিন ছাতিয়া ॥৩॥১১॥

শক্তির উৎস সন্ধানে

শ্রীকামিনীকুমার দে

(মেজট্রন বা মেজন)

যুদ্ধের সময় এটম বোমায় পরমাণুতে নিহিত কল্পনাতীত শক্তির পরিচয় পাইয়া মানুষ অবাক্ বিস্ময়ে বিশ্বের শক্তিভাণ্ডারের কথা ভাবিয়াছে। এই শক্তি কিন্তু এখনও মানুষের সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয় নাই। বৈজ্ঞানিকের গবেষণা চলিয়াছে ইহার উৎস অনুসন্ধানে। যুদ্ধের পর 'মেজন' (meson) লইয়া যে গবেষণা হইতেছে ইহা হইতেই এই উৎসের সন্ধান মিলিবে বলিয়া বৈজ্ঞানিক মহলের বিশ্বাস।

বর্হিজগৎ হইতে যে অতি-জাগতিক রশ্মি অনবরত পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতেছে তাহা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পৌঁছিয়া যদি কোন পরমাণুকে আঘাত করে তবে পরমাণুটি ভাঙ্গিয়া গিয়া যে ধ্বংসাবশেষ থাকে তাহার মধ্যে মেজনের সন্ধান মিলে। বর্ত্তমানে যে সকল বিরাট শক্তির পরমাণু-ভাঙ্গা যন্ত্র তৈয়ার হইয়াছে তাহাতেও পরমাণু ভাঙ্গিয়া গেলে পর মেজন পাওয়া যায়। বস্তুতঃ কোটি কোটি মুদ্রাব্যয়ে যে অতি বৃহৎ পরমাণু-ভাঙ্গা যন্ত্রসকল বসান হইতেছে তাহার একটি প্রধান কারণই হইল মেজন তৈয়ার করা। গবেষণার জন্য ইতিপূর্ব্বে কখনও এত অর্থ ব্যয় করা হয় নাই।

মেজন সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে পরমাণুর গঠন কিরূপ তাহা দেখা আবশ্যক। পরমাণু যেন একটি ক্ষুদ্র সৌরজগৎ—খালি চোখের দৃষ্টি-গোচর ক্ষুদ্রতম বস্তু অপেক্ষা অন্ততঃ ২৫ লক্ষাংশ ছোট। ইহার উপাদান তিন রকমের জড়কণা—ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। ইলেক্‌ট্রন হাল্‌কা, প্রোটন ও নিউট্রন প্রত্যেকেই ইলেক্‌ট্রনের ১৮৩৬ গুণ ভারী। ইলেক্‌ট্রন ঋণতড়িৎযুক্ত : প্রোটন ইলেক্‌ট্রনের সমপরিমাণ ধনতড়িৎযুক্ত, আর নিউট্রন তড়িৎবর্জ্জিত। বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুতে এক বা অধিক ইলেক্‌ট্রন গ্রহের মত কেন্দ্রিণের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কেন্দ্রিণ ভারী কণা প্রোটন ও নিউট্রন লইয়া গঠিত, কেন্দ্রিণের ব্যাস সমগ্র পরমাণুর লক্ষাংশ। এই অল্প জায়গায় প্রোটন ও নিউট্রন জড়াজড়ি করিয়া আছে। এখন প্রশ্ন হইল—পরমাণুর এই উপাদানগুলি কোন্ বলের প্রভাবে পরমাণুর ভিতরে অবস্থিত থাকে? শক্তির উৎস অনুসন্ধানে এই প্রশ্নের মীমাংসারই প্রথম প্রয়োজন। কারণ এই বলই সকল শক্তির জনক। আমরা কোথাও এই শক্তি পাই কয়লা পোড়াইয়া, কোথাও বা এটম বোমা ফাটাইয়া বা অন্য উপায়ে। ঘূর্ণায়মান ইলেক্‌ট্রনগুলি যে বলের আকর্ষণে পথ ছাড়িয়া চলিয়া যায় না সেই বলকে আমরা বুঝি। যেহেতু ইলেক্‌ট্রন ঋণতড়িৎযুক্ত আর প্রোটন ধনতড়িৎযুক্ত, অতএব বিপরীত বিদ্যুতশক্তির আকর্ষণের বলেই তাহারা ঘুরিতেছে। এই বলের পরিমাণ নির্ভর করে প্রধানতঃ প্রত্যেক পরমাণু ও তাহার প্রতিবেশী পরমাণুর ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটনের সংখ্যার উপর।

কেন্দ্রিণের অভ্যন্তরে কিন্তু ব্যাপার জটিল। প্রোটনগুলি পরস্পরকে বিকর্ষণ করে—তাহা হইলে কোন্ বলের প্রভাবে তাহারা এমন আঁট হইয়া থাকে? প্রবলতর কোন বল নিশ্চয়ই এখানে কাজ করিতেছে; ইহা মাধ্যাকর্ষণ হইতে পারে না—কারণ বিদ্যুৎ বল মাধ্যাকর্ষণের বল অপেক্ষা বহুগুণ বেশি। বেশির ভাগ কেন্দ্রিণ হইতে একটি মাত্র প্রোটন বা নিউট্রনকে ছিনাইয়া লইতেও কল্পনাতীত প্রবল বলের প্রয়োজন হয়। এই বলের পরিমাণ ৪০ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট, অতএব কেন্দ্রিণের অভ্যন্তরে আমাদের জানা বিদ্যুত বল ও মাধ্যাকর্ষণ ব্যতীত তৃতীয় একটা প্রচণ্ড বল কার্য্যকরী। একটা বিশেষ কেন্দ্রিণ আঁটা বল যে আছে তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। প্রোটন হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রিণ। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রিণের উপর অন্য প্রোটন কণাসমূহের সুনিয়ন্ত্রিত প্রবাহ ফেলা হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই প্রোটন কণাগুলির শক্তি একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কম থাকে ততক্ষণ বিদ্যুৎ বিকর্ষণ বল কাজ করে। তারপর শক্তি বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহারা যথেষ্ট নিকটবর্ত্তী হইতে পারিয়াছে তখন দেখা যায় সহসা এই বিকর্ষণ বল এক প্রবল আকর্ষণ বলের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে। এই দূরত্ব একটি প্রোটনের ব্যাস অপেক্ষা সামান্য মাত্র বেশি। এই বল মাধ্যাকর্ষণের ১০৩৬ গুণ (অর্থাৎ এক এর পিঠে ৩৭টি শূন্য দিলে যে বিরাট অঙ্ক হয় তত গুণ)। এই বলের প্রকৃতি এখনও বৈজ্ঞানিকের অজ্ঞাত। মেজন গবেষণা দ্বারা ইহার প্রকৃতি জানিতে পারা যাইবে। মনে হয়, মেজন কেন্দ্রিণ নিহিত শক্তির জড়ে রূপান্তর। কেন্দ্রিণের উপাদান-কণিকা প্রোটন ও নিউট্রনকে ভাঙ্গিবার মত বল প্রয়োগ করিতে পারিলে মেজন আবির্ভূত হন।

মেজন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে। এণ্ডারসন (Anderson) ও নেডারমিয়র (Neddermeyer) কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ষ্ট্রীট ও ষ্টেভেন্‌সন্ হার্ভার্ডে উইলসনের বাষ্পকক্ষে (Wilson cloud chamber) অতি-জাগতিক রশ্মির পথ অনুধাবন করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন—ইহা ইলেক্‌ট্রন অপেক্ষা ভারী এবং প্রোটন অপেক্ষা হাল্‌কা কোনও কণার পথ-রেখা। এণ্ডারসনেরই পরিকল্পনা মত মাঝামাঝি ভার বিশিষ্ট বলিয়া এই কণার নাম দেওয়া হয় মেজট্রন, সংক্ষেপে বলা হয় মেজন (meson)। প্রথমে মেজনের জন্মবৃত্তান্ত জানা ছিল না। পরে বৈজ্ঞানিকেরা উচ্চ পর্ব্বত শিখরে এবং বেলুন ও উড়োজাহাজযোগে অতি উর্দ্ধে যন্ত্র নিয়া দেখিতে পান যে বায়ুমণ্ডলের

উচ্চস্তরে ইহাদের উৎপত্তি হয়। এখানে অতিজাগতিক রশ্মি (বহু কোটি ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তিবিশিষ্ট প্রোটন কণার প্রবাহ যাহা আলোকের গতিতে অনবরত পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতেছে) বায়ুমণ্ডলের কোন পরমাণু কণিকাকে আঘাত করিলে তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়া মেজনের সৃষ্টি করে।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত মেজনের দুইটি রূপ ধরা পড়িয়াছিল। ভর ইলেকট্রনের ২১২ গুণ, তবে একরকম ধনতড়িৎযুক্ত আর একরকম ঋণতড়িৎযুক্ত। প্রথমে মনে করা হইয়াছিল—মেজন বুঝি এই দুই রকমেরই। কিন্তু পরে আরও ছয় রকম মেজন ধরা পড়িয়াছে, মনে হয় অতি-জাগতিক রশ্মির সংঘাতে প্রথমেই ২১২ ভরের মেজন উৎপন্ন হয় নাই। প্রথমে হয়ত ৩১৩ ভরের ধন ও ঋণ তড়িৎযুক্ত মেজনেরই সৃষ্টি হয়। এই মেজন ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে (এণ্ডিস পর্ব্বতশিখরে) আলোক চিত্রে ধরা পড়ে। পরে ইহা কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ সাইক্লোট্রন যন্ত্র সাহায্যে তৈয়ার করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ৯০ ভরের নিস্তড়িৎ এবং ৮০০ হইতে ৯০০ ভরের নিস্তড়িৎ এবং ধন ও ঋণ তড়িৎযুক্ত মেজনের অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে। সম্ভবতঃ আরও বিভিন্ন রকমের মেজন আছে। মেজনের এই যে প্রকার ভেদ, ইহা পদার্থবিদের নিকট এক নূতন সমস্যার উদ্ভব করিয়াছে।

কেন্দ্রিণের অভ্যন্তরে মেজনের কার্য্য প্রণালীও অনুধাবন করা হইয়াছে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে কালিফোর্ণিয়ার সাইক্লোট্রণ যন্ত্র সাহায্যে ১০ কোটি ইলেক্ট্রোণ ভোল্ট শক্তি বিশিষ্ট নিউট্রণ প্রবাহ প্রোটনের উপর ফেলা হয়। কেন্দ্রিণে নিউট্রণ ও প্রোটন যত কাছাকাছি থাকে পূর্ব্বোক্ত নিউট্রণ তেমন কাছাকাছি গেলে দেখা গেল প্রোটন হইতে বিদ্যুৎ শক্তি ছুটিয়া আসিয়া নিউট্রণকে প্রোটনে রূপান্তরিত করিল, আর প্রোটন নিউট্রণে পরিণত হইয়াছে। এই পরীক্ষা হইতে এবং অন্যান্য গবেষণা হইতে জানা গেল যে কেন্দ্রিণের উপাদান প্রোটন ও নিউট্রণের ভিতর অনবরত বিদ্যুত শক্তির আদান প্রদান চলিয়াছে। প্রতি সেকেণ্ডে বহু লক্ষবার প্রোটন হইতে নিউট্রণে বিদ্যুত শক্তি চলিয়া গিয়া নিউট্রণকে প্রোটনে রূপান্তরিত করিতেছে আর বিদ্যুৎমুক্ত প্রোটন নিউট্রণে পরিণত হইতেছে।

আমরা জানি তড়িৎপ্রবাহ চারিদিকে একটা বলক্ষেত্র (field of force) উৎপাদিত করে। কিন্তু এই প্রবাহ কেন্দ্রিণ আঁটা বলের মত প্রচণ্ড বল উৎপাদিত করিতে পারে না। কেন্দ্রিণ আঁটা বলের (New clear Binding force) মূল সম্ভবতঃ তড়িৎশক্তিবিশিষ্ট মেজন প্রবাহ। সম্ভবতঃ কেন্দ্রিণের অভ্যন্তরে অনবরতঃ মেজনের সৃষ্টি হইতেছে এবং মেজন প্রবাহ প্রোটন হইতে নিউট্রণে গিয়া ইহার রূপান্তর সাধন করিয়া আবার ফিরিয়া আসে—আবার যায় আবার আসে।

গত অর্দ্ধশতাব্দীর একটি বড় আবিষ্কার হইল—গামা রশ্মি, রঞ্জন রশ্মি, অতিনীল রশ্মি, দৃশ্য আলো ইন্‌ফ্রারেড্ রশ্মি, রেডিও তরঙ্গ এই সকলেরই জন্ম ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রণের বলক্ষেত্রে। সেখান হইতে 'ফোটন' নাম ধেয় শক্তি কণিকা সমষ্টি ছুটিয়া আসে—আলোক রশ্মি ফোটনেরই প্রবাহ, সম্ভবতঃ কেন্দ্রিণ-শক্তির বলক্ষেত্র হইতে অনুরূপ প্রবাহই মেজন। ফলতঃ এণ্ডারসনের আবিষ্কারের পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ জাপানী পদার্থবিদ্ হিদেকি ইউকাওয়া (Hideki Yukawa) কেন্দ্রিণের বলক্ষেত্রে এই রকম শক্তি কণিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। শক্তি আবার ভরবিশিষ্ট জড় কণিকারূপে আবির্ভূত হইবে ইহা আমরা পূর্ব্বে ভাবিতে পারিতাম না। কিন্তু আইনষ্টাইনের শক্তি ও জড়ের সমত্ব [শক্তি = ভর × আলোকের গতির বর্গ ($E = mc^2$) হইতে শক্তি যে জড়রূপে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা বুঝা যায়। ফোটনের ও ভর আছে—তবে এই ভর নগণ্য বলিয়া ধরা পড়ে না, মেজনের ভর বেশি এবং তাহাতে ইহাই বুঝা যায় যে মেজন অসাধারণ শক্তির কণিকা (quantum)।

পরমাণুর কেন্দ্রিণ যখন ভাঙ্গা হয় তখন বেশি শক্তির কেন্দ্রিণ শক্তি মুক্ত হইয়া অন্য কেন্দ্রিণে পরিণত হয় কিন্তু কেন্দ্রিণের উপাদান কণিকা নিউট্রণ প্রোটনের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় না বা কেন্দ্রিণের বলক্ষেত্র হইতে মেজন কণা মুক্ত হয় না। এটম বোমাতে এই মুক্ত শক্তিটুকুকেই কাজে লাগান হয়। ইহা কেন্দ্রিণের বৃহৎ শক্তি ভাণ্ডারের সামান্য অংশ মাত্র। মেজন গবেষণা দ্বারা ভবিষ্যতে আর এক রকম শক্তি পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা হয় ; এবং ইহা পাওয়া যাইবে কেন্দ্রিণ ভাঙ্গিয়া নয়—কেন্দ্রিণের উপাদান কণা ভাঙ্গিয়া, এই শক্তি কেন্দ্রিণভাঙ্গা শক্তি অপেক্ষা বহু সহস্র গুণ বেশি হইবে।

সুইসারল্যাণ্ড

শ্রীচিত্রিতা দেবী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

উঠেছি খুব ভোরে। যেতে হবে অনেকদূর। প্রথমে সাত হাজার ফুট উঠে, একটু নেমে আবার দু-হাজার ফিঠ উঠলে সেন্টমরিৎস। সেখানে আজ রাতে পৌঁছতেই হবে। ধীরে ধীরে সুরু হয়, যাকে সত্যি বলা যেতে পারে পাহাড়ে রাস্তা। একেবারে খাড়াই উঠে গেছে। বরফের নীচে বছরে ৮ মাস থাকে বলে পীচগুলো সব গেছে ধুয়ে—পাথরের গুঁড়োয় পিছল পথ ঘুরে ঘুরে কোথাও উঠেছে খাড়া, কোথাও বা নেমে গেছে সোজা। চাকার নীচে পাথরগুলো সরে সরে যাচ্ছে। বরফের নীচের মরে যাওয়া ঘাসে ফ্যাকাশে দুই পাহাড়ের মাঝখানে ছোট একটু ফাঁক। এই ফাঁকটুকুর নাম ফ্রুয়েলা পাস। সেখানে গাড়ীটাকে রেখে নেমে দাঁড়াই—একদিকে প্রকাণ্ড পাহাড়। তার মাথার ওপরে, আর বরফের ছাপলাগা সাদাটে রঙের গায়ের খাঁজে খাঁজে তুষার স্তূপ জমে আছে। তা থেকে বহু শীর্ণ জলধারা নেমে—এসেছে—আর এপারে খোলা ঢালু গড়ানে পাথরের জমি। ঐ দেখা যায়, দূরে, অনেক নীচে ছোট একটী গ্রাম, তার পাশ দিয়ে শীর্ণ জল রেখা। পপলার গাছের শ্রেণী, আর তার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ছে কোথাও ছোট একটা খাদ অথবা ঝরণার ঝিরঝির ধারা। দার্জ্জিলিংএর মতো একেবারেই নয়। দার্জ্জিলিংএর দিকের প্রত্যেকটী পাহাড় উদ্দাম সবুজ অজস্র বন্যপ্রাণের প্রাচুর্য্যে উপচে পড়ছে। এখানে বিধাতার প্রসাদের উপর মানুষের হাতের ছোঁয়া লেগেছে—যেন সুন্দরী মেয়ের প্রসাধিত মুখ। প্রকৃতির রূপকে এরা সর্বক্ষণ মেজে ঘসে রাখে। কারণ সেই রূপই যে এদের প্রধান মূলধন। সেই রূপের আকর্ষণেই দলে দলে লোক, পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে ছুটে আসে। আর দেখতে দেখতে পাহাড়টা হঠাৎ শেষ হয়ে গেল—একেবারে মাথায় চড়ে বসেছি। পাহাড়ের চূড়োর ওপরে বেশ একটু চওড়া যায়গা—শীতকালে এ সমস্ত যায়গা বরফে ঢাকা থাকে—আর পৃথিবীর নানাপ্রান্ত থেকে উত্তেজনা-লোভীর দল আসে খেলতে। St. moritzকে কেন্দ্র করে এ সমস্ত জায়গা তুষার ক্রীড়ার রঙ্গভূমিতে পরিণত হয়। এখানে বসে গাড়ীটাকে একটু বিশ্রাম দিতে হবে, যন্ত্রের মধ্যে দিতে হবে ঠাণ্ডা জল। ওর ভেতর থেকে একটা শোঁ শোঁ আওয়াজ হচ্ছে, যন্ত্রটা হাঁপিয়ে উঠেছে যেন। এদিকে তাকিয়ে দেখি আমাদের প্রয়োজনের জন্যই যেন পাশে একটা ছোট সাদা বাড়ী। তার ঢালু সবুজ ছাদে এখনো বরফ লেগে রয়েছে। ভারতবর্ষ হলে এমন সুন্দর যায়গায় এমন অপূর্ব্ব পরিবেশে শৈল শিখরে তৈরী করত একটী মন্দির। দলে দলে লোক অগম্য পথ পার হয়ে সমস্ত শরীর দিয়ে পথশ্রমকে অনুভব করে এবং মন দিয়ে তাকে অস্বীকার করে, সেইখানে উপস্থিত হত, আর তাদের চোখের সামনে যখন মন্দিরের দ্বার খুলে যেত, তখন তারা মনে করত তাদের জীবন ধন্য। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের জীবনধারার আদর্শ একেবারে বিপরীত। যেখানে যত ভাল যায়গা আছে, পাহাড়ের চূড়ায়, আর নদীর কিনারায়, সর্ব্বত্র ভারতবর্ষ তৈরী করে মন্দির, আর ইয়োরোপ তৈরী করে হোটেল, কিম্বা কাফেখানা। শরীরকে আরাম দেওয়াই ইয়োরোপের আশা, মনকে আনন্দ দেওয়া ভারতের। একটী ছোট-খাট সাদা মানুষ বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। আমাদের যা কিছু প্রয়োজনের সমস্যা সমাধান করে, ভদ্রলোক, হ্যাম ও টম্যাটো পূর্ণ
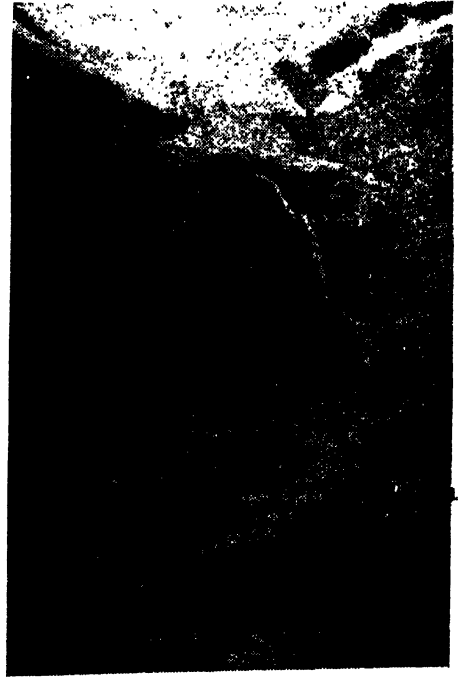
নদীর জন্ম

ধূমায়মান বৃহৎ অমলেট ও এপলক্রীম নিয়ে এলেন। ভাগ্যে এখানে চার্চ না থেকে হোটেল আছে। আমাদের খেতে দিয়ে ভদ্রলোক এসে বসলেন—"ভারী চমৎকার যায়গা", বল্লাম আমরা, "নাম কী জান?" ভদ্রলোক বললেন—"ডেভস্—অর্থাৎ দেবস্, দেবতাদের বাসস্থানের মত রমণীয় যায়গা কিনা তাই এই নাম।" "বাঃরে, ভীষণ ভাল লাগল, আপনি সংস্কৃত জানেন?"—"একটু একটু" লজ্জিত হলেন মস্তে, "তোমাদের দেশের কথা বল, গান্ধীর

কথা বল।—তিনি কিন্তু একটু অদ্ভুত লোক, নয় কী?" একটু মুচ্‌কি হাসলেন ভদ্রলোক, "কী হিসেবে বলছ একথা?" "নইলে অহিংস যুদ্ধ কি করে বলেন। অহিংসা এবং যুদ্ধ দুটো দুই বিপরীতধর্ম্মী কথা।"—"কেন,—নিজেকে বাঁচাবার জন্যে এই যুদ্ধ, অপরকে মারবার জন্যে নয়।" "কিন্তু তোমাদের গীতায় তো অহিংসার কথা নেই।" "ও তুমি গীতা পড়েছ?—ইংরিজি অনুবাদ?" —"না জার্মান অনুবাদ, তাছাড়া মূল সংস্কৃত থেকেও পড়েছি। সেই জন্যেই তো ভাবি; গান্ধীজী যদি অহিংসপন্থী, তবে বৌদ্ধ না হয়ে গীতায় বিশ্বাসী হলেন কেন—গীতা তো যুদ্ধের বিজ্ঞাপন।"—"তাই নাকি? গীতা পড়ে এই বুঝেছ তুমি! গীতায় সকল প্রবৃত্তিকে নিরুদ্ধ
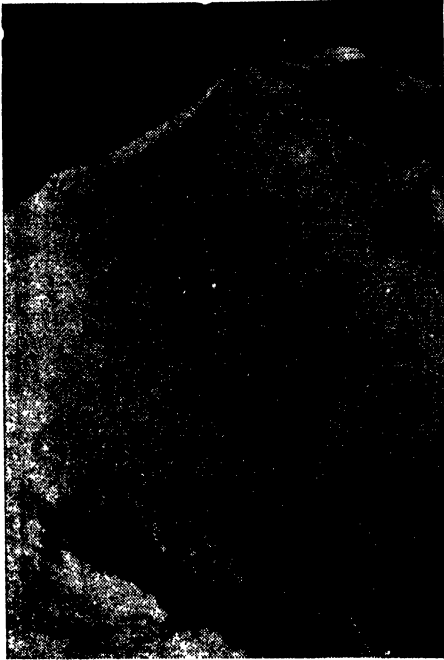
এঙ্গাডাইনের শিখরচূড়া

করতে বলেছে—হিংসা তো অতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, হিংসার বলি সবার আগে। কাজ করতে হবে তাই কাজ করো, সুখের আশায় কোরনা। Arts for arts sake ইত্যাদি সব কথা আজকাল শোনা যায় এদেশে. গীতায় অনেকদিন আগেই সেকথা বলেছে। কাজের জন্যই কাজ, ধর্মের জন্যই ধর্মপালন কর। ধর্ম সুখ সম্পদ্‌ আহরণের উপায় নয়। যুদ্ধ কর লোভের জন্য নয়, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালনের জন্য। শরণাগতকে রক্ষার জন্য, পাপের ধ্বংসের জন্য পুণ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে প্রাণ দাও এবং নাও—হিংসার বশে অথবা লোভের তাড়নায় কোন কাজ কোর না। হিংসা অহিংসার কথা দূরে থাক্‌ গীতায় তো মৃত্যুই সবচেয়ে তুচ্ছ হয়ে গেছে'। সমস্ত ইন্দ্রিয়াবেগ ও স্থূল প্রবৃত্তি বুদ্ধিকে অতিক্রম করে না গেলে, মানুষ কখনই এমন স্তরে এসে পৌঁছতে পারে না যেখান থেকে জীবন ও মৃত্যুকে একেবারে এক করে দেখতে পাওয়া যায়, যেখান থেকে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় যে এ দুটো দুই অবস্থামাত্র,—একই সৃষ্টি লীলার দুই প্রকাশ, একই নৃত্যের দুই পদক্ষেপ, একই আত্মার দুই রূপ। যাই হোক গীতার ব্যাখ্যা করার উপযুক্ত আমরা নই, আর তা এমন এক কথায় হবার নয়, তবে তুমি যদি সত্যি উৎসুক হও তাহলে, গান্ধীজি নিজে গীতার যে টীকা ও অনুবাদ করেছেন সেইটে পড়, তুমি নিজেই বুঝতে পারবে, গান্ধীজী তাঁর মন্ত্র গীতা থেকে পেতে পারেন কিনা।" ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ ভদ্রলোকের যথেষ্ট জানা আছে, আরো জানবার অসীম কৌতূহল। "তোমাদের টাগোর, গান্ধী, বিবেকানন্দর কথা বল—ভারতবর্ষে আমি একবার যাব, সেই ভারতবর্ষ, যেখানে বেদস্‌ লেখা হয়েছিল।"—এই সুদূর আল্পস্‌ শিখরে এক সাধারণ বিশ্রামাগারে যে

তুষার রাজ্য

এমন একজন শিক্ষিত লোকের দেখা পাব—যে এখনও অবসরকালে সংস্কৃত চর্চা করে—সেকথা কখনও ভাবিনি।

সেণ্ট মরিৎস্‌ জায়গাটা ছোট, কিন্তু টুরিস্টদের আড্ডা। এত জনপ্রিয় যায়গা বলেই যাত্রীনিবাসের চড়া দামে যাত্রীদের প্রাণান্ত। এখান থেকে বহু হাঁটাপথ আল্পসের বিভিন্ন শিখরচূড়ার দিকে গেছে। ভোরে উঠে দেখি দলে দলে লোক, মোটা পাইকের জুতো পরে, কাঁধে বিলিতী ঝুলি ঝুলিয়ে চলে গেল। আমাদেরো মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে হেঁটে যেতে। কিন্তু সময় নেই, সঙ্গে ছোট মেয়ে। একদল আমেরিকান উঠেছে এখানে।—তারা কাল হেঁটে যাবে engadine-এ আর বেচারা আমরা যাব ট্রেণে। সেখানে মোটর যাবার রাস্তা নেই। বিদ্যুৎ অনেক কারসাজী করে ট্রেণকে তোলে টেনে। এই দলের মধ্যে যে মেয়েটী সবচেয়ে বেশী লাফাচ্ছে, আর নিজের ভ্রমণের নানা অভিজ্ঞতা বলছে, তার পরণে হাঁটু অবধি টাইট একটা চীনে পাজামা আর ওপরে ছোট একটু রঙীন ব্লাউস উদ্ধত যৌবনকে শাসন করবার ভঙ্গী করছে মাত্র। আশ্চর্য্য—ওর শীত করছে না? মেয়েটী এত

বেশী পাহাড়ের কথা, বলছে, তবু তার ঢঙে ঢাঙে চলনে বলনে. হাসিতে কটাক্ষে নিছক ভ্রমণের আনন্দের চেয়ে নিজেকে দেখাবার সুখটাই প্রবল হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে।

ভোরে উঠে তৈরী হয়ে নিলুম। খুকু তার ছোট্ট দস্তানাদুটো বারবার ঠিক করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখছে—'গ্লেশিয়ার কী? কেন সেখানে বরফ গলে যায়না'—ইত্যাদি প্রশ্নে ব্যাকুল, নদীর জন্ম দেখতে পাবার আশায় অধীর। খুকুর মা বাবারও সেই দশা। ট্রেণে এসে বসা গেল। ভ্যালি পার হয়েই পাহাড়ে চড়ে বসল ট্রেণটা, আর একেবারে সোজা পাহাড়ের গা বেয়ে টিকটিকির মত এগোতে লাগল, গতি কিন্তু অতি ধীর, প্রায় হেঁটে ওঠার মতই। ছোট ছোট কয়েকটা ষ্টেশন পার হয়ে এক যায়গায় এসে ট্রেণ থামে। নীচে দেখা যায় একদল লোক উঠছে হেঁটে। খুকুর বাবার উৎসাহ আর বাধা মানল না। ট্রেণের চালক কনডাক্টরদের সঙ্গে আলোচনা করে জানা গেল, হেঁটে উঠতে লাগবে ২৷৷ঘণ্টা, আর ট্রেণ পৌঁছবে একঘণ্টা পরেই। অতি ধীরে চলে বলেই এত কম পথ যেতে এত সময় লাগবে। "তবে আমি চলি, দেড় ঘণ্টা তুমি ও খুকু অনায়াসে কাটিয়ে দেবে।" ওঁর অদম্য উৎসাহে বাধা দেওয়া গেল না—

ক্যামেরাটা কাধে ঝুলিয়ে পাহাড়ের খাঁজে দাঁড়িয়ে দলটাকে চেঁচিয়ে ডাকলেন হোই হোঃ—ওরা ফিরে দাঁড়ালো। উনি নেমে চলে গেলেন, পায়ে পায়ে অনুভব করতে আল্পসের হৈমসত্তা।

এদিকে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে বরফ লেগে রয়েছে, আর সেই বরফ গলা জল নীচে দিয়ে নদীর আকারে কখন যাচ্ছে বয়ে, কখনো বা পাথরের রাশির মধ্যে যাচ্ছে হারিয়ে। পাহাড়ের মাথাগুলি শুকনো ধূসর আর নীচের ঢালু জমিতে সবুজের বন্যা। বরফগলা জলধারা যে সব পথ দিয়ে নেমে গেছে একদিন, তাদের সেই পথরেখা গভীর দাগ কেটে দিয়ে গেছে পাহাড়ের পাথরের বুকে। এই ধরণের অদ্ভুত সব সুন্দর যায়গা পার হয়ে ট্রেণের যাত্রা হয় শেষ—সামনে তাকিয়ে দেখি, একী ব্যাপার—"কী অপূর্ব্ব শোভা তোমার—কি বিচিত্র সাজ।'

"সামনের পাহাড়ে ধুধু করছে বরফ, মসৃণ সাদা ঝক্‌ঝক্ করছে, আর আলো পড়ে অজস্র রং জ্বলে উঠছে। তুষার রাশির মধ্যে থেকে রোদে গলে নেমে এসেছে কয়েকটী শীর্ণ জলরেখা। তিন-চারটে জলধারা একত্র হয়ে একটা প্রকাণ্ড পাথর টপকে ঝরে পড়ে নীচে, একটা ছোট লেকের মত তৈরী হয়ে নদী হয়ে বয়ে যায় ওপাশ দিয়ে। ঝরণার জল পড়ে হ্রদের মত যা তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত ঘনত্ব, যেন গলিত আইসক্রীম। খুকু পাগলের মত 'নদী' কবিতা বলছে—

তাহার মাথার উপরে শুধু
সাদা বরফ করিছে ধুধু,
কবে একদা রোদের বেলা—
তাহার মনে পড়ে গেল খেলা
তাই ঝুরুঝুরু ঝিরি ঝিরি
নদী বাহিরিল ধিরি ধিরি।

এদিকে রূপোর মত ঝলমলে সাদার উপর, সূর্য্যের আলো পড়ে অবিশ্রান্ত নানা রঙের ঝরণা যাচ্ছে খেলে, অন্য দিকে পাহাড়ের মাথায় মাথায় মেঘ করেছে কালো। পাহাড়ের নীল, আর আকাশের কালো, মিলে গেছে কেমন একটা পেলব রংএর কালিমায়, তার সঙ্গে মিশে গেছে ওপারের নদীর জল ঘন সবুজ। কোন দিকে দেখব—প্রতি নয়নক্ষেপে নূতন রূপ ফুটে ওঠে। ওই পাহাড়ের শুভ্র ইঙ্গিত যা মানুষের মনকে

লুসার্ণের লেক
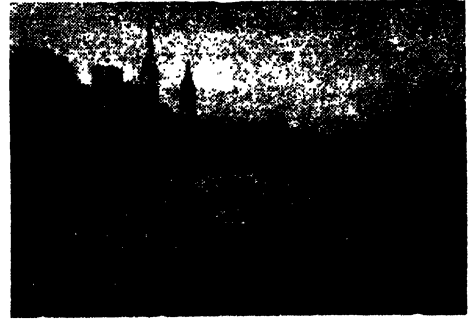
সৌন্দর্য্যানুভূতির চরম সীমায় টেনে নিয়ে যায়, তা প্রত্যহ সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এবং তার পরেও অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে, কোন মুগ্ধ দৃষ্টির অপেক্ষা না রেখেই আপনা আপনিই প্রতি মুহূর্ত্তে অসংখ্য নূতন রূপে ফুটে ফুটে ঝরে যাচ্ছে। বিধাতার সৃষ্টিতে দানের তো কোন হিসাব নেই। এত অজস্র অপব্যয়, সৌন্দর্য্যের এই প্রচুর সমারোহ, তবু তার মধ্যে মানুষের মন কেন আসক্তির পাঁকে বাঁধা। লোভের সীমা নেই। সবটাই এক সঙ্গে দেখতে হবে। সব কিছুই নিতে হবে, মনে করে রাখতে হবে, ক্লান্ত চোখ ভুলে যায়। যন্ত্রের চোখে যা ধরে রাখছি তুলে। সে মাধুরী, সে পরিবেশ, সে মোহময় মায়া-লোকের স্বপ্ন, চোখে দেখে যার আশ মেটেনা, মন যাকে বেশীক্ষণ বহন করতে পারেনা, ক্যামেরার সাধ্য কি তার সন্ধান দেয়।

আমাদের গ্রামের নিষ্কর্ম্মা দল

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

গ্রামে যাঁহারা চাকুরী বা বিশেষ কোনো কাজ-কর্ম্ম করিতেন না—মাছ ধরিতেন, তাস-পাশা খেলিতেন, গান গাহিতেন এবং দিনরাত তামাকের আসর জাগাইয়া রাখিতেন, তাহাদিগকে লোকে 'খুড়ো' বলিয়া ডাকিত—এরূপ খুড়ার সংখ্যা অনেক ছিল। জীবনযাত্রা তখন এত জটিল ছিল না—সামান্য পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে সহজেই অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হইত, কাজেই তখনকার দিনের গ্রামবৃদ্ধের অর্দ্ধেকেরও উপর খুড়ো ছিলেন। তাঁহারা যেন গ্রাম ও গ্রামের আনন্দ উৎসবকে আগুলিয়া থাকিতেন। তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলাম—

পাড়াগাঁয়ের অকেজো দল গ্রামকে তারা ভবন জানে,
জটলা করে এক সাথেতে, দিবস-নিশি তামাক টানে।
বকুল তলে চাটাই পেতে সারা দুপুর খেলায় পাশা,
চীৎকার এবং হাস্য করে, সংশোধনের নাইক আশা।
রাত্রে কবির আখড়া দেওয়া, খোল বাজায়ে নৃত্যকরা,
'মতি' রায়ের নূতন পালা এক সাথেতে সবাই পড়া,
জরুরি কাজ এ সব তাদের বকুনি খায় গেলেই গৃহে,
তবু আমি ভক্ত তাদের, মুগ্ধ আমি তাদের স্নেহে।

২

বরযাত্রী যায় তারাই আগে, বরযাত্রীরে ঠকায় তারা,
'নষ্টচন্দ্রে' রাত্রি সারা, ঘুরে বেড়ায় সকল পাড়া।
তারাই করে 'পরিবেশন' ভোজে-কাজে তারাই লাগে,
'অষ্টপ্রহর' তারাই করে, মেলার চাঁদা তারাই মাগে।
তারাই করে নিত্যপূজা, তারাই ত যায় নিমন্ত্রণে,
আত্মীয়তা তারাই রাখে, আপন করে সকল জনে।
সকল লোকের কার্য্য করে, অকেজো তাই সবাই বলে
স্মরি তাদের গুণের কথা ভাসি আমি নয়নজলে।

৩

গ্রামে কোন অতিথ এলে আদর করে তারাই ডাকে,
গ্রামের রোগী দুখীর খবর সবার আগে এরাই রাখে।
রাত দুপুরে ডাক্‌লে পরে লম্ফ দিয়ে তারাই আসে,
সম্পদেতে সুখের সুখী মুক্ত-প্রাণে তারাই হাসে!
গ্রামবাসীদের বিপদকালে তারাই আগে কোমর বাঁধে,
গ্রামের মৃত গঙ্গা লভে চড়ে কেবল তাদের কাঁধে।
গ্রামে গ্রামে হে ভগবান অকেজো দল এমনি দিয়ো,
তারাই গ্রামের গৌরব যে আমার পরম বন্দনীয়।

এই নিষ্কর্ম্মা দলের অগ্রণী ছিলেন—শ্রীমন ঘোষাল মহাশয় ও লোটন ঘোষ—তাই লিখিয়াছিলাম—

ভালবাসি ইহাদের সঙ্গ
নয় মায়ামৃগ, খাঁটি কনক কুরঙ্গ।
মুখে হাসি সারা দেহে স্ফূর্ত্তি
উল্লাস ধরিয়াছে মূর্ত্তি
বুকের অমৃত হ্রদে সদাই তরঙ্গ।
প্রণিপাত বিশ্বের নাথকে
আনিল মানুষ করে কে দোলের রাত কে?
এলো যেন রামধনু থেকে রে,
সারা গায়ে নানা রঙ মেখেরে,
কে দিল মানব রূপ 'উগ্রী' প্রপাতকে?

তাঁদের অভাব অনটন ও আলস্যের জন্য কত লোকে বিদ্রূপ করিত, ভৎর্সনা করিত, কিন্তু তাঁরা নির্ব্বিকার। কেহ বা ছড়া কাটিয়া তাঁহাদিগকে বলিত—

'শিমুলের ফুল যেন বিহীন সৌরভ'

তাঁরা সব শুনিতেন ও হাসিতেন ভাবটা যেন—

"বোঁটায় ফোটা ফুল ত বটি
পায়ে ফোটার কাঁটা ত নই।"

এ দলের অনেকের দুবেলা অন্নই জুটিতনা, অনেকেই 'ডেঙ্গো' ভোগ্‌লাও ছিলেন—কত দুঃখ শোক সহিতেন--কিন্তু দিতেন আনন্দ—সত্যই তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা চলে—

"আতসবাজির ব্যবসা করে
গৃহের প্রদীপ জ্বল্‌লো নাক।"

শৈশবে তাঁহাদের জন্যই গ্রামকে সর্ব্বদা হাস্যমুখর দেখিতাম, তেমন মুখভরা প্রাণখোলা হাসি আর দেখিনা। মনে হয় সব জিনিসের চেয়ে হাস্যই এখন দুর্লভ হইয়াছে। ঘোষাল বাড়ীর বৈঠকখানায় দিন রাত দাবা পাশা তাস ও সঙ্গীত চলিত, সময় সময় এমন অট্টহাস্য উঠিত যে বহুদূর হইতে শুনা যাইত। একবার এক পথিক সুদীর্ঘ উচ্চ হাস্য শুনিয়া বলিয়াছিল—'বাবা সকল! সব হাসি ফুরিয়ে ফেল না—কালকের জন্য একটু রাখো।' দাবা পাশায় জয়লাভ করিয়া হাস্যের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যও চলিত। তাসের খেলায় বোম ও ছক্কা দিয়া ব্যোমবিদারী হাস্যের হল্লোড় উঠিত—বৃদ্ধেরাও বালকসুলভ আনন্দ ও চপলতা প্রকাশ করিতেন।

নীলকণ্ঠ, মতিরায়ের দলের গান যত দূরেই হোক, তাঁহারা শুনিতে যাইতেন এবং নূতন গান নূতন সুর গ্রামে আমদানী করিতেন। মতিরায়ের—

ওমা শৈল সুতা সপত্নি।

নীলকণ্ঠের—'শঙ্করমৌলি নিবাসিনী সঙ্গে' এবং অহিভূষণের 'ত্রাহি গঙ্গে গতিদায়িনী' তিনটী গানই গাওয়া হইত এবং কোনটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিচার করা হইত। 'শ্রীমন' মামা নীলকণ্ঠের প্রশংসায় শতমুখ হইলেও—এ তিনটী গানের মধ্যে মতিরায়ের গানটীই শ্রেষ্ঠ বলিতেন। ঘোষাল বাড়ীর বৈঠকখানায় কত হাসির গান শুনিতাম, অধিকাংশই নীলকণ্ঠের—একটী গান—

লুচি তোমার মান্য ত্রিভুবনে।
কি সুন্দর শুচি অরুচির রুচি
দেখলে বাঁচি জীবনে।
তোমার সুদর্শন মূর্ত্তি কিবা চমৎকার।
শশধর সূর্য্য সম সে আকার,
তোমাতে বিকার বল জন্মে কা'র?
নমস্কার ওই চরণে।
তোমার কন্যা কচুরী সুন্দরী—
খাস্তা মণি নাম সস্তা নয় আদুরী,
বড় লোকের বাড়ী বিয়ে দিলে তারি
দেখতে পায় না দীনজনে।
তোমার দুটী ভাই রুটী আর পরোটা,
যে জন জানে না সেই বলে পর ওটা,
দালপুরি সেটা হয় তোমার জেঠা
ভুঁড়ি মোটা সেই কারণে।

সবটা আমার মনে নাই—আর একটী গান—তাহারও কতক উদ্ধৃত করিতেছি—

বার মাস তোর পাইনে দেখা পাকা আম,
জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে তোমার আশারে—
আসি পূর্ণ কর, আস্বাদনে
আহারেতে দাও আরাম।
তোমায় কে দেশে আনতে পারে?
ছিলে লঙ্কা সাগর পারে,
রাবণ বধিবারে যেথায় গেলেন রাম।
সঙ্গে ছিল হনুমান
সেই ত করলে অনুমান।
জানিয়ে মেটো করিয়ে এঁটো
আঁটি গুলি দেশান্তরে ফেলে দিলে অবিশ্রাম।
তোমার মালদহেতে মামার বাড়ী
নাম ফজ্‌লী কুমরোজালি,
প্রভৃতি—

আর একটী গান ছিল বাঁশের সম্বন্ধে—

'বাঁশের বাঁশরী শ্যামের করে' তাহাতে বাঁশের বহুরূপ ও বহুগুণের বর্ণনা ছিল। এ ছাড়া গাইতেন—

'ও মন ভবের স্কুলে
এসে যে দিন ভর্ত্তি হলে।'

গান শুনে আমরা খুব হাসিতাম—কখনো বা বাজিকরদের গান সে আসরে হইত—যথা—

'কাল রূপে বাঘ এলো
যারে ছুঁলে সেই মলো।'
মাথা নাড়লে বাসুকী,
'শ্রীখণ্ড' লণ্ডভণ্ড 'দেয়ানগঞ্জের' আছে কি?

ভূমিকম্প ও স্থানীয় ঘটনা লইয়া রচিত এ সব গান 'হাঘোরেরা' বাড়ী বাড়ী গাহিয়া ভিক্ষা করিত। এদিকে সে আসরে যেমন হালকা হাসির এই সব গান হইত, সময় সময় খুব উচ্চাঙ্গের বৈঠকী ও আধ্যাত্মিক গীতও হইত—যেমন

'অবিদ্যা ধনে করিল অন্ধকার'—
এ মায়া প্রপঞ্চময় ভবের রঙ্গমঞ্চমাঝে
রঙ্গের নটবর হরি যারে যা সাজাও
তাই সে সাজে।

রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দাশুরায় প্রভৃতির কত গানই সেখানে শুনিতাম।

যাত্রা ও অভিনয় সম্বন্ধে কত হাসির কথার আলোচনা চলিত—'শ্রীমন মামা' সেই সব গল্প সংগ্রহ করিয়া আনিতেন এবং নিজস্ব ভঙ্গীতে বলিয়া আসর সরগরম করিতেন।

এক গ্রামে 'সাবিত্রী' সত্যবানের পালা হইতেছিল, দলটী অখ্যাত—জুরিদের কণ্ঠ কর্কশ এবং ভঙ্গী অপ্রীতিকর। যখন 'যমরাজ' সত্যবানকে পুণর্জীবন দান করিয়া ফিরিতেছেন, জনৈক রসিক শ্রোতা দাঁড়াইয়া যাত্রার দলের ধরণে বলিল—'হে দণ্ডপাণি যমরাজ! সত্যবানকে ত্যাগ করিয়া যানক্ষতি নাই—সাবিত্রীর শঙ্খ সিন্দুর অক্ষয় হোক—কিন্তু নিতান্ত রিক্ত হস্তে ফিরিবেন না—এই চারটি জুরিকে নিয়ে যান।'

অন্য এক জায়গায় এক সখের দলের 'রাবণবধ' পালা হইতেছিল—কিন্তু গান না জমায় লোক অতিষ্ঠ। রাম রাবণের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম, এমন সময় শ্রোতার মধ্য হইতে মতিরায়ের দলের এক প্রাচীন অভিনেতা অহিফেনের ঝোঁকে হঠাৎ দাঁড়াইয়া গম্ভীরভাবে রামকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—'তুমি দশরথাত্মজ রাম! চতুর্দ্দশ বর্ষ বহুক্লেশ ভোগ করেছ—প্রাণহানিকর যুদ্ধে কাজ নাই আমি বলছি তুমি দেশে ফিরে যাও,—শোন্ তুই দশস্কন্ধ রাবণ, তুই লঙ্কাধিপতি—তোর অভাব কি? তোর অন্দর রূপসীতে পরিপূর্ণ, যাও প্রত্যাবর্ত্তন কর লঙ্কায়। শেষে সীতাকে ডাকিয়া বলিল—মা লক্ষ্মি তুমি রাজর্ষি জনকের কন্যা, রঘুকুলপতি রামচন্দ্রের সীতা, অযোধ্যায় গিয়ে রাজরাজেশ্বরী হওগে—যুদ্ধ কেন? পালা সাঙ্গ। ওহে জুরিরা গান ধর—

তুই কি ধরে আনিরে রামধন—

সকলের সঙ্গেই তাঁদের গ্রাম্য কৌতুক চলিত, গোপীনাথ ঘোষাল মহাশয় তাঁর গ্রাম সম্বন্ধে ভগ্নীপতি এক নবাগত জামাতাকে বলিলেন—

'নিমাই আমি কুলপড়া জানি—যে কুল মন্ত্রঃপূত করিয়া দিব তার গায়ে কোনো দাগ লাগিবে না—এই দোয়াত কলম কাছেই, সাধ্য নাই কাহারো গায়ে আঁচড়টী দেয়। কথাটা নিতান্ত আজগুবি ও মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য নিমাইবাবু তিনটী মন্ত্রঃপূত কুলেই কলমে করিয়া অবহেলে কালির দাগ দিয়া সগর্ব্বে বলিলেন—দেখুন এখন কি বলতে চান? ঘোষাল মশায় বিষণ্ণ মুখে বলিলেন—'বলবো—আর কি? বলবার কি মুখ রেখেছ? তিন কুলে কালি দিলে হে।'

আর একবার একটি পরিচিত কৃষক যুবক আসিয়া তাঁকে বলিল—খুড়ো ঠাকুর, বাবার কাশী প্রাপ্তি হয়েছে, খুব পুণ্যবান ছিলেন কিনা—ঘোষাল মহাশয় উত্তর দিলেন—"তাঁর কাশী প্রাপ্তি হয়েছে—তা বেশ—তোমার ও তো দেখছি গলা খুস খুস করছে।"

তাঁর একজন আত্মীয় তাঁকে বরযাত্রী যাবার নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া বলেন—পাত্র চক্রবর্ত্তী, বিবাহ 'সুনীতে' হইবে, পাত্রের বাবার নাম 'দিগম্বর' কন্যার পিতার নাম 'ফকির।' ঘোষাল মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—রাজযোটক হয়েছে তবে আমার কৌপীন নাই, ঝুলিটাও ছিঁড়ে গিয়েছে—'কি সাজ পরে বরযাত্রী যাই?'

বক্সী মহাশয় প্রবীণ হইলেও খুব আমুদে ছিলেন। কঠোর দুঃখকে তিনি আনন্দে সহনীয় করিয়া লইতেন—যুধিষ্ঠির আদি করে মহাপুরুষেরা কত কষ্ট সহ্য করেছেন—আমরা অতি সামান্য লোক এতে অধীর হলে চলবে কেন? 'এই ছিল তাঁর সান্ত্বনা। বছর বছর বন্যায় অজন্মা হওয়ায় গ্রামের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা তাঁদের মনের সন্তোষামৃতে অর্দ্ধাসনের অভাব পূরণ করিতেন। একদিন বকসী মহাশয়ের সারা দিনের পর অপরাহ্ণে অতিকষ্টে চাউলের যোগাড় হয়, কিন্তু অবেলায় আড়াল গ্রামের তাঁর বন্ধু 'ভিখু' মিঞা আসিয়া গোপনে তাঁহার নিজের অনশনের কথা জানান। বকসী মশায় তাঁকে সমস্ত চাল দিয়া দেন—বাড়ীর লোকে সকলেই বিরক্ত—কিন্তু তাঁর আনন্দ ধরে না—যেন বলিতে চান—

সুধা খেয়ে স্বর্গে থাকুক
অভাগা আর অভাগী।
আয় ছুটে আয় আমার কাছে
আনন্দের কে ভাগ নিবি?

গোপাল বড়াল অর্থাভাবে 'মশারী' কিনিতে পারিতেন না—বিনা মশারীতেই ঘুমাইতেন—রাত্রে একজন পরিচিত পথিক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'বড়াল খুড়ো' মশারী নেই, শুয়ে আছেন মশায় কামড়ায় না? বড়াল মশায় প্রসন্ন বদনে বলিলেন—' না বাবু মশায়, কামড়াবার উপায় নেই—প্রতিদিন অত্যধিক পরিমাণে দুধ ঘি খাওয়ার একটা গুণ আমি লক্ষ্য করি—গায়ে বসলেই মশার হুল পিছলে যায়—গাঙ্গুলী বকসী কি তোমাদের মত যারা কচু পুঁই ডিঙিলি বেশী খায়, তাদের গায়ে মশা বসে উড়তে চায় না।

কেবল গোপাল বড়াল কেন খুড়োর দলের অনেকেই সামান্য লেখাপড়া জানিতেন—অবস্থাও অত্যন্ত অস্বচ্ছল—বড়াল মশায় বলতেন 'আমি দশভুজা দর্শন করতে যাইনে।' যদি জিজ্ঞাসা করা হইত কেন? অমনি বলিতেন দর্শনে নানা বাধা—'চোখের দুপাশে হাত ঢাকা দিয়ে তবে মাকে প্রণাম করতে হবে কিনা—সরস্বতী লক্ষ্মী দুবোনের সঙ্গে যে আড়ি—মুখ দেখাদেখি নেই।

মা মঙ্গলচণ্ডীর সেবাইত হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ভগ্নীপতি তারণ রায় মহাশয় মাঝে মাঝে গ্রামে আসিতেন—এবং বয়স হইলেও হাস্যে নৃত্যে গানে মুগ্ধ করিতেন। তিনি 'কর্ত্তাভজার' দলের 'মশায়' ছিলেন—ঐ দলের গান—

অপরাধ মার্জ্জনা কর প্রভু,
তুমিই রঙ্গের রঘু।
এবং 'গিন্নী যে রন্না ঘরে
আমরা করবো কি?'

প্রভৃতি সাধন সঙ্গীত গাহিতেন।

মাঝি গ্রামের হংসেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় একজন বিখ্যাত হাস্যরসিক ছিলেন; তিনি অতি অসম্ভব কথাও এমন সুন্দরভাবে বলিতেন যে লোকে অবাক হইয়া শুনিত। তাঁর সকল ঘটনার 'অকুস্থল' 'নাসিগ্রাম'—সেখানে পঁচাত্তর ছড়া কলা—এক ডালে তিন জাতের আম, ও কপিলা গাই প্রভৃতি আছে বলিতেন। রাধানাথ ঘোষাল সব শুনিয়া হাসিয়া বলিতেন—হংস খুড়ো তোমার গল্প আরব্য উপন্যাসের চেয়েও মনোরম আর তোমার 'নাসিগ্রাম' বোগদাদকেও হার মানিয়েছে।' এইরূপ হাস্য বিদ্রূপেই তাঁদের দিন কাটিত।

কৈলাশ নাপিত ও গোপাল বড়াল উৎকৃষ্ট 'মাছুড়ে' ছিলেন—মাছ ধরিবার কত যন্ত্রই তাঁদের ছিল। মাছের যখন খেলা হইত তখন সারা রাত্রিই মাছ ধরিতেন। এই উপলক্ষে বহু ভূতের সঙ্গে তাঁহাদের নাকি আলাপ পরিচয় হইত—এমন কি ভৌতিক কলিকায় তামাক পর্য্যন্ত খাইয়াছেন বলিতেন। এই সব গল্পের মধ্যে একটি গল্প কৈশোরে আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল তাহাই নিবেদন করিতেছি।

একটী গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উজাড় হইয়া যায়। দুচার জন লোক যারা বাঁচিয়া ছিল গ্রাম ত্যাগ করে। উক্ত গ্রামের এক জামাতা সুদূর দিল্লীতে থাকিত—কোনো সংবাদই জানিত না। বিবাহের দুই বৎসর পরে এক সন্ধ্যায় সে সেই গ্রামে শ্বশুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। 'দেউড়ীতে সেই দারোয়ান, বাড়ী ঘরে সেই আলো লোকজন। তবে লোকের মুখে কথা কম—এবং আদর আপ্যায়িত ও হাসিও কম। তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হতেই—সে হাতছানি দিয়ে ডেকে বললে—'দেখ এই গাছের শিকড় তুলে আগে কানে পরো তার পর সব বলবো।'

গোটা গ্রাম ও এবাড়ীর সবাই মরে ভূত হয়েছে আমিও হয়েছি, তোমাকে মেরে ফেলে এই দলে মেশাবার ষড়যন্ত্র হচ্ছে, কিন্তু ঐ শিকড় কানে থাকলে ভূত কিছুই করতে পারবে না। তুমি এ বাড়ীর কোনো জিনিষ খেয়ো না—বলো শরীর ভাল নাই—রাত্রে দোতালার এই ঘরে এই খাটে তুমি ঘুমুবে, আমি সারারাত্রি জাগলে থাকবো—কো

অনিষ্ট হতে দেব না—তোরে গ্রাম থেকে বার হবার পথ দেখিয়ে দেব। একটা অনুরোধ রেখো—এখন বিয়ে করোনা! আমি কালই—অমুক গ্রামের স্বজাতি জমিদারের গৃহে কন্যা হয়ে জন্মাবো—দশ বৎসর পর তোমার সঙ্গে আবার আমার বিয়ে হবে। তোমায় একবার দেখবার, আর এই অনুরোধ করবার জন্যই এতদিন এখানে ছিলাম। স্বামী পত্নীর কথায় সম্মত হইল।

অতি প্রত্যুষে উঠিয়া স্বামীকে পথ দেখাইয়া পত্নী সতৃষ্ণ সজল নয়নে চাহিয়া রহিল। জামাতা দুশ্চিন্তায় রাত্রি অতিবাহিত করিয়া ভয়ে বিস্ময়ে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। অনেক দূর গিয়া এক বড়লোকের বাড়ির বৈঠকখানায় বসিল, গৃহস্বামী পথিককে ক্লান্ত দেখিয়া যত্ন করিয়া জলযোগ করাইলেন এবং থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এই সময়ে হঠাৎ বাড়ীতে একটা আনন্দধ্বনি উঠিল—গৃহস্বামীর একটী পৌত্রী ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। জামাই বুঝিতে পারিল যে, তাহার পত্নীই জন্মগ্রহণ করিয়াছে—চক্ষে জল আসিল। তার পর নিজ গ্রাম অভিমুখে রওনা হইল।

আমি এই পর্য্যন্ত শুনিয়া আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম—সেই মেয়ের সঙ্গে জামাইএর বিয়ে হয়েছিল ত? বক্তা হাসিমুখে বলিলেন—নিশ্চয়ই বিয়ে হয়েছিল। সে বিয়েতে আমি বরযাত্রীও গিয়েছিলাম—খুব ধুমধামের বিয়ে।—এমন অকাট্য প্রমাণের পর গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে আমার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না, ভূতের পাতিব্রত্যর প্রতি আমার বড়ই মমতা হইয়াছিল।

শ্রীচন্দ্ররায় গ্রামের মেলাটীর কর্ত্তা ছিলেন এবং 'খুড়ো'র দলের ঘোষাল মশায়ের সহকারী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত চতুর এবং দুষ্টলোকের ভীতি ছিলেন। তখন প্রায়ই 'শিয়ালমারারা' সাধু সাজিয়া গ্রামের লোককে ঠকাইত। একবার তাঁকে ঠকাইতে গিয়া জুয়াচোর ধরা পড়ে। তিনি মাত্র তাহার চিম্‌টা গাছটি কাড়িয়া লইয়া বলিলেন 'বাপু পাখিমারার' ঘরে চড়ুই বাসা বাঁধতে এসেছ—যাও চিম্‌ঠে রেখে চলে যাও আর কিছু বলবো না। 'তুমি খাও ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে।' তাঁর রসিকতা একটু রূঢ় গোছের ছিল—একটি লোক আসিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া বলিল—রায় খুড়ো আমার ছেলে আমাকে বেদম মেরেছে—বলুন ত কি করি? নালিশ করবো কি? রায় খুব সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—আমার উপদেশ শুনবে কি? সে আগ্রহে উত্তর দিল—'বলেন কি? নিশ্চয়ই শুনবো।' তখন খুড়ো তাকে বললেন 'এক কাজ করো—নরম দেখে একখানা ইঁটের সন্ধান কর—আর তাতে মাথা ঠোকো গে।'

একবার দূর গ্রামের দুজন লোক, তাদের প্রতিবেশী জুয়া-খেলায় মোটা টাকা পাওয়ায় আনন্দের আতিশয্য প্রদর্শন করিতেছিল। রায় তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—বাপু হে, ছাগলের একটা ছানা দুধ খায় আর দুটা কেবল আনন্দেতে লাফায়, তোমাদের যে সেই অবস্থা দেখছি।'

গ্রামে ঘুড়ি ওড়ানো প্রতিযোগিতা, হাড়ুডুডু, রায় বেঁশে ও বাউলের দল ছিল। রায়বেঁশে খেলায় এবং সঙ দেওয়ায় দীনু সর্দ্দারের নাম ছিল। আমাদের গ্রামের মধ্য দিয়া বিবাহের মিছিলের সঙ্গে রায় বেঁশে দল গেলে—দীনু ও সাতুকে সম্মান দেখাইত। না দেখাইলে শক্তি পরীক্ষা হইত এবং প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহারা জয়লাভ করিত। তবে নিজের 'সাক্‌রেদ'দের কাছে উহাদিগকে পরাজিত হইতে দেখিয়াছি—'সর্ব্বত্র বিজয়ং ইচ্ছেৎ পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্' কিনা। ভীম সর্দ্দার নামে এক বিখ্যাত রায় বেঁশেকে দেখিয়াছি তখন সে বৃদ্ধ। আমি তাহাকে যুবকসুলভ চপলতায় নাচ দেখাইতে বলায় সে বলিয়াছিল—'বাবু যে নাচবে সে চলে গিয়েছে।

আমাদের গ্রামের নিষ্কর্ম্মা দলের আসরে সর্ব্বদা আনন্দ হাসি ও রসিকতার মধ্যেও সময় সময় দুই করুণ সঙ্গীত গীত হইত এবং সে গান সত্যই প্রাণভরা আকুতিতে পূর্ণ--

"এই সময়ে তারা তোমায় নিবেদন করে রাখি'
সে সময় পারি না পারি, সচেতন থাকি না থাকি।'

আর একটী গান—

'সেদিন তোমায় বুঝবো হরি
কেমন দীনের বন্ধু তুমি।'

এই নিষ্কর্ম্মা দলের মধ্যে একটা প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল—তাঁহাদের কাহারো মৃত্যু হইলে অপরেরা বালকের ন্যায় রোদন করিতেন। নোটন ঘোষের মৃত্যু হইয়াছিল 'বিজয়া দশমীর' দিন। সারা জীবন আনন্দ বিলাইয়া 'আনন্দময়ীর' সঙ্গে সঙ্গেই সে মিলাইয়া যায়।

এ দলটি গুণীর দল নহে--প্রভাবশালীর দল নহে, কিন্তু তবু কি বৈশিষ্ট্য ছিল যার জন্য তাদের অভাবে গ্রাম ফাঁকা ফাঁকা লাগে—আর—

জলে ভরে আসে চক্ষু আমার,
এখনো তাদের নামে,
তাদের ছবিই বড় হয়ে রাজে
বক্ষের অলবামে।

তথাগতের পথে

নরেন্দ্র দেব

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নালন্দার বর্ণনা প্রসঙ্গে হিয়ুয়েন সিয়াঙ্‌ বলেছেন—“এখানে যে সহস্রাধিক গুরু অধ্যাপক ও শ্রমণ রয়েছেন, তাঁরা সকলেই উচ্চতর মেধাবী এবং যোগ্যতায়ও শ্রেষ্ঠ। বর্ত্তমানে তাঁদের জ্ঞানের গৌরব ও বিদ্যার বিশেষত্ব এত বেশী যে তাঁদের মধ্যে শতাধিক জনের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দ্রুত দূর দেশান্তরে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। তাঁদের সকলেরই চরিত্র নির্ম্মল ও আচরণ নির্দোষ। তাঁরা নৈতিক নিয়ম শৃঙ্খলা ও বিধি বিধান সর্বান্তঃকরণে মেনে চলেন। আশ্রমের নিয়মাবলী অত্যন্ত কঠোর এবং ছাত্র, গুরু ও অধ্যাপকদের সকলেরই পক্ষে সেগুলি মেনে চলা একেবারে বাধ্যতামূলক। ভারতের সমস্ত প্রদেশই তাঁদের শ্রদ্ধা করেন এবং তাঁদের উপদেশ মেনে চলেন। গভীর তত্ত্বমূলক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও তার উত্তর প্রদান সারাদিনেও শেষ হয় না। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত নানাবিষয় নিয়ে বিচার বিতর্ক ও আলোচনা চলে। যুবক ও বৃদ্ধ সমভাবে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। যাঁরা ত্রিপিটকের বিষয় নিয়ে প্রশ্নোত্তরে যোগ দিতে পারেন না তাঁদের সকলেই হেয় জ্ঞান করেন, কাজেই তাঁরা আর লজ্জায় লোকসমাজে মুখ দেখাতে পারেন না। কত দেশের কত বিভিন্ন নগর থেকে বড় বড় পণ্ডিতেরা দলে দলে আসেন শাস্ত্রীয় আলোচনায় যোগ দিতে এবং তাঁদের সংশয় ও সন্দেহ নিরসন ক'রে নিতে। এখানে বিচার বিতর্কে জয়ী হ'তে পারলে সে পণ্ডিতের নাম যশ ও খ্যাতি সত্বর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁদের জ্ঞানের নির্ঝর ও বিদ্যার স্রোতও বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে প্রবাহিত হয়। এই জন্য অনেকে নালন্দায় কখনো পদার্পণ না করেও নিজেদের নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলে পরিচয় দেন, কারণ এর একটা বিশিষ্ট গৌরব আছে। এই পরিচয় দিয়ে সর্বদেশেই তাঁরা অসামান্য আদর যত্ন ও সেবা পান।

শ্রীভগবান বুদ্ধদেবের বরাভয় মূর্তি
(নালন্দায় প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ্‌ নির্মিত এই মূর্তি মধ্যযুগের প্রারম্ভে প্রস্তুত বলে বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন)

গদা ও চক্রপাণি বিষ্ণু মূর্তি
(মধ্যযুগের শেষের দিকে তৈরী এই ব্রোঞ্জ্‌ মূর্তিটিও নালন্দায় পাওয়া গেছে)

যদি অপর কোনও অঞ্চলের কেউ সভায় যোগ দিতে এবং আলোচনায় অংশ নিতে ইচ্ছা করেন, তবে প্রবেশ পথে দ্বারপাল সর্বাগ্রে তাঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করেন। যাঁরা সে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেন না। তাঁরা মুখ চুণ করে ফিরে আসেন। বিতর্ক সভায় প্রবেশাধিকার পান না। এখানে উচ্চ শিক্ষার জন্য ঢুকতে হ'লে আগে প্রাচীন ও আধুনিক সকল রকম শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান সঞ্চয় করা প্রয়োজন। কাজেই, যে সব অজ্ঞাত পরিচয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছাত্র এখানে পড়তে আসতেন তাঁদের প্রত্যেককেই দ্বার পণ্ডিতগণের নিকট কঠিনতর্কে জয়ী হ'য়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারলে তবেই ছাড়পত্র দেওয়া হ'ত। এই পরীক্ষায় যাঁরা পাশ হতেন তাদের সংখ্যা প্রতি দশজনের মধ্যে সাতজন মাত্র।

যে সব তাম্রশাসন, শিলালিপি প্রভৃতি পাওয়া গেছে তা'থেকেও জানা যায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কত-বড় এক শিক্ষায়তন ছিল এবং বিভিন্ন রাজন্যবর্গ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য এবং এর স্থায়িত্ব-কল্পে কতদূর কি করেছিলেন। দেবপালের যে তাম্রশাসন পাওয়া গেছে

(৮১৫—৮৫৪) তাতে জানা যায় "সুমাত্রার অধীশ্বর যে বিহারটি এখানে নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন তার ব্যয় নির্বাহার্থে এবং সন্ন্যাসীদের ভরণপোষণ এবং পুথিপত্র অনুলিপনের জন্য পালবংশের এই রাজা রাজগীর জেলায় পাঁচখানি গ্রাম দান করেছেন।" এই তাম্রশাসন খানি থেকে আরও একটি বিশেষ সংবাদ জানা যায় যে সে সময় ভারতবর্ষের বাহিরেরও একাধিক নৃপতি এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অকাতরে দান করেছিলেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক রাজা মহারাজাদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করা চলে কনৌজাধিপতি হর্ষবর্ধনের, যিনি গুপ্তবংশের শেষ সম্রাট। এঁরই রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হিয়ুয়েন সিয়াঙ্ ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। হিয়ুয়েন সিয়াঙের বিবরণের মধ্যে পাওয়া যায় মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন এখানে একটি পিতলের সুন্দর মঠ নির্মাণ করেছিলেন এবং সেই সংঘারামের ব্যয় নির্বাহের জন্য একশত গ্রামের যত খাজনা আদায় হয় তার সমস্তই এখানে পাঠাতেন। এ ছাড়া এই গ্রামগুলির দুইশত সঙ্গতিপন্ন অধিবাসী—এই আশ্রমের জন্য প্রয়োজনীয় চাউল ঘৃত ও দুগ্ধ সরবরাহ করতেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যে ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হ'ত তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ হ'চ্ছে এখানে বৌদ্ধ রাসায়নিক প্রবর আচার্য নাগার্জুনের সমসাময়িক সুবিজ্ঞ নামে এক ব্রাহ্মণ সুপণ্ডিত এখানে অন্ততঃ ১০৮টি হীনযানী ও মহাযানী বৌদ্ধ মঠ নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

ষোড়শভুজা দেবী মূর্তি (বৌদ্ধ শীলধর্ম উপদেশ করেছেন। এটি নালন্দায় প্রাপ্ত দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রস্তুত ব্রোঞ্জ্ মূর্তি)

মৈত্রেয় (ইনি আগামীকালের বুদ্ধ) (এটি নালন্দায় প্রাপ্ত মধ্যযুগে নির্মিত ব্রোঞ্জ্ মূর্তি।)

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় একদা ভারতবর্ষকে অসংখ্য শ্রেষ্ঠ দার্শনিক—ব্যাকরণকার, নৈয়ায়িক ও ধর্মগুরু উপহার দিয়েছিল যাঁদের কীর্তিকলাপ আজও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। বৌদ্ধগণের 'মহাযান' মত এইখানেই পূর্ণতা ও পরিণতি লাভ করেছিল এবং এইখান থেকেই দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হ'য়েছিল।

যাঁদের অসাধারণ প্রতিভা ও অগাধ পাণ্ডিত্য অতীতে একদিন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে জগতের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিল তাঁদের মধ্যে মাত্র অল্প কয়েক জনের নাম আমরা পেয়েছি। কিন্তু এই অল্প কয়েকজনের নামই এমন অবিস্মরণীয় যে, নালন্দা যে এমন বিশ্ববিশ্রুত হ'য়ে উঠেছিল কেন তা সহজেই বোঝা যায়।

মহাযান পন্থার প্রতিষ্ঠাতা আচার্য নাগার্জুন ছিলেন নালন্দার সর্বপ্রথম সর্বাধ্যক্ষ। সিংহল থেকে আগত বৌদ্ধ মধ্যম পন্থার প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত আর্যদেব, যোগাচার সম্প্রদায়ের আসঙ্গনাথ এবং তাঁর খ্যাতিমান অনুজ বসুবন্ধু যাঁর সুনাম অগ্রজ আসঙ্গনাথ অপেক্ষাও বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল, এঁরা সকলেই একে একে পরের পর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য পদে বৃত হয়েছিলেন। এর পর কালিদাসের উপমাখ্যাত দিঙ্‌নাগের নাম উল্লেখযোগ্য। নাগার্জুনের ন্যায় ইনিও ছিলেন একজন দ্রাবিড়ী পণ্ডিত। মধ্যযুগীয় নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের প্রবর্তকরূপে এঁর ভারত বিস্তৃত খ্যাতি ছিল। ইনি বহু আর্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দার্শনিক তর্ক ও শাস্ত্র বিচারে পরাস্ত করে 'তর্কপুঙ্গব' উপাধি পেয়েছিলেন। এঁরপর ধর্মপাল ও চন্দ্রপাল তাঁদের অপ্রমেয় জ্ঞান গৌরবে নালন্দাকে ধন্য করেন। ধর্মপালের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন অসাধারণ পণ্ডিত শীলভদ্র। শীলভদ্র যখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ পদ অলংকৃত করছিলেন, সেই সময় ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন চীন পরিব্রাজক হিয়ুয়েন সিয়াঙ্। হিয়ুয়েন সিয়াঙ্ তাঁর বিবরণীর মধ্যে প্রাচীন ঋষি তুল্য জ্ঞানী বলে শীলভদ্র সম্বন্ধে যে উচ্চ প্রশস্তি গান করেছেন তা শুনে ভারতবাসী মাত্রেরই গৌরব বোধ হয়। এর পর ধর্মকীর্তির নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পণ্ডিতদলে তাঁর খ্যাতি ছিল। প্রথিতযশা

হিন্দু দার্শনিক ও তর্ক চূড়ামণি শ্রীকুমারিল্ল ভট্টকে, একমাত্র ইনিই তর্ক যুদ্ধে পরাস্ত করতে পেরেছিলেন। ধর্মকীর্তির পর নালন্দার প্রধান অধ্যক্ষ পদে বৃত হয়েছিলেন শ্রীমৎ শান্তরক্ষিত। তিব্বত থেকে এঁর নিমন্ত্রণ এসেছিল বৌদ্ধ গ্রন্থরাজি তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ ক'রে দেবার জন্য। ইনি বহু ভাষাবিদ্ ছিলেন। সমগ্র বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ ক'রে ইনি তিব্বতেই দেহরক্ষা করেছিলেন খ্রীষ্টিয় ৭৬২ অব্দে। এঁরপর আর একজন খ্যাতনামা পণ্ডিতের নাম করতে হয়, তিনি আচার্য প্রবর শ্রীযুক্ত পদ্মসম্ভব। ইনিও আমন্ত্রিত হয়ে তিব্বতে গিয়েছিলেন এবং লামা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা দ্বারা সমগ্র তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন, যার প্রভাব আজও সেখানে কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব নির্ভর করে অধ্যাপকদের বিদ্যাবুদ্ধি মেধা শিক্ষা সংস্কৃতি ও শিক্ষাদান প্রণালী সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর। এদিক থেকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল সেদিনের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানভাণ্ডার। চন্দ্রপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভামিত্র, জিনমিত্র, জ্ঞানচন্দ্র, শীঘ্রবুদ্ধ প্রভৃতি অধ্যাপকগণের বহুবিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য নালন্দাকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগারে পরিণত করেছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন করতে এবং সেখান থেকে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় ক'রে নিয়ে যেতে দেশবিদেশ থেকে বহু রাষ্ট্রের অধ্যাপকেরা আসতেন, তার মধ্যে চীন-পরিব্রাজকগণই ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছেন। ফা-হিয়ান ও হিয়ুয়েন সিয়াঙ্ ছাড়াও ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ইচিঙ্ নামে আরও একজন চীন-পরিব্রাজক ও পরবর্তীকালে আরও ১১জন চীন-পরিব্রাজক ও কোরিয়ার একাধিক জ্ঞান পিপাসুরা পরের পর নালন্দায় এসেছিলেন ছাত্র হয়ে। ইচিঙ্ নালন্দার যে বর্ণনা রেখে গেছেন তা' হিয়ুয়েন সিয়াঙের বিবরণ অপেক্ষাও বিশদ ও সুসম্পূর্ণ। তাঁর বর্ণনার মধ্যে আছে যে, প্রত্যেক ভিক্ষু এখানে এমন একটি আদর্শ নৈতিক জীবন যাপন করতেন যে বৌদ্ধ জনসাধারণের নিকট তাঁরা শ্রেষ্ঠ মানবের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হ'য়ে উঠেছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া হ'ত তা কেবলমাত্র বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, হিন্দুশাস্ত্র হিন্দুদর্শন ও হিন্দুর বেদ উপনিষদও এখানে পড়ানো হ'ত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সময় নিরূপণের জন্য 'জলঘড়ি' ব্যবহার করা হ'ত।

এতবড় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ও যে একদিন ধ্বংস হ'য়ে গেছল, তার দু'টি প্রধান কারণ ইতিহাস আমাদের নির্দেশ করে। প্রথমতঃ ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিকার দ্রুত পরিবর্তন, অর্থাৎ, আচার্য শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য স্বামীর অসামান্য প্রতিভাবলে হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুদয় এবং বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষীয়মান প্রভাব থেকে এখানে নানা প্রদেশের রাজশক্তির মুক্তিলাভ।

দ্বিতীয়তঃ মোসলেম আক্রমণকারীদের নির্মম অত্যাচার, কারণ তাঁরা ইস্‌লাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনও ধর্মকেই তখন শ্রদ্ধা করা দূরে থাক, সহ্য পর্যন্ত করতেন না। মোসলেম আক্রমণকারীরা সমস্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুদের হত্যা এবং বিতাড়িত ক'রে বৌদ্ধ বিহার ও মঠগুলি লুণ্ঠন ও অগ্নিসহযোগে ধ্বংস দ্বারা বহু প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত ক'রে দিয়েছিলেন।

মোসলেম ঐতিহাসিক মিনহাজ্ সাহেব ইতিহাস প্রসিদ্ধ বক্তিয়ার খিলজির দিগ্বিজয়ের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে জানা যায় যে অহিংস বুদ্ধদের হাত থেকে বক্তিয়ার যখন সমগ্র মগধ সাম্রাজ্য জয় করে নিয়েছিল তখন সে মগধ থেকে বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসাবশিষ্ট যাকিছু তা' সমস্তই নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছিল। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথও লিখে গেছেন—'তুর্কীরা সমগ্র মগধ সাম্রাজ্য জয় ক'রে নিজেদের অধিকারে রেখেছিল এবং অনেক বৌদ্ধমঠ ও মন্দির ধূলিসাৎ করেছিল। নালন্দায় তাদের অত্যাচার চরমে উঠেছিল। সন্ন্যাসীরা প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে দূর দেশে পলায়ন করেছিল।

বক্তিয়ারের অত্যাচারের কিছুকাল পরে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা অনেকেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য একটা আন্তরিক চেষ্টা করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে চেষ্টার কোনটাই ফলবতী হয়নি। কাজেই ভারত গৌরব এই মহাবিদ্যালয়ের শোচনীয় অপমৃত্যুই ঘটে গেল।

চীন-পরিব্রাজক হিয়ুয়েন সিয়াঙের বর্ণনা থেকে নালন্দা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য আরও কিছু উদ্ধৃত ক'রে 'নালন্দা' প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই। তিনি লিখছেন "এখানকার স্থানীয় প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে জানা যায় যে, নালন্দা সংঘারামের দক্ষিণে যে আম্রকানন আছে তার মধ্যস্থিত জলাশয়ে যে নাগ থাকেন—তাঁর নাম 'নালন্দা'। এই জলাশয়ের তীরে যে বৌদ্ধ সংঘারাম স্থাপিত হয়েছিল তার নামকরণ করা হয়েছিল ঐ নাগেরই নামানুসারে। কিন্তু, প্রকৃত তথ্য এ নয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে বলে ভগবান তথাগত একদা অতীতকালে এখানে বোধিসত্ত্বরূপে লীলা করেছিলেন। তিনি এক মহাদেশের নৃপতি হয়ে এইখানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। জীবের দুঃখে দয়াপরবশ হ'য়ে তিনি ক্রমাগত তাদের কষ্টদূর করাটাকেই একটা মহা-আনন্দ-জনক কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাঁর এই অপরিমিত করুণা ও দাক্ষিণ্যের জন্য তাঁকে সকলে বলতো 'অনন্তদাতা' (ন-অলন-দা) তাঁরই পুণ্যস্মৃতি রক্ষা কল্পে এই সংঘারাম ও মহাবিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছিল—নালন্দা। এ স্থানটি পূর্বে বিস্তীর্ণ এক আম্রকাননই ছিল। পাঁচশত শ্রেষ্ঠী বণিক সম্মিলিতভাবে দশ কোটী স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে এই আম্রকানন ক্রয় করে প্রভু বুদ্ধের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। বুদ্ধদেব এখানে তিনমাস অবস্থান করে ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন। শ্রেষ্ঠীরা এবং স্থানীয় জনসাধারণ তার সুফল লাভ করেছিল। তাদের আস্তিক্যবুদ্ধি ও ধর্মপ্রাণতা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।

শ্রীভগবান বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের দীর্ঘকাল পরে এখানকার রাজা বীরবিক্রম শক্রাদিত্য বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত ত্রিরত্ন ও অদ্বৈতযান একান্ত ভক্তিভরে ও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। জ্যোতিষ-গণনার সাহায্যে তিনি এই পরমস্ত স্থানটি নির্বাচন ক'রে এখানে এই বিরাট সংঘারাম নির্মাণ করিয়েছিলেন। ভিত্তি স্থাপনের জন্য যখন মৃত্তিকা খনন কার্য্য চলেছে সেই সময় নাগের শরীরে আঘাত লাগে। রাজসভায় তখন একজন বিশিষ্ট ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন, ইনি নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ভুক্ত একজন নাস্তিক্যবাদী মহাপুরুষ। তিনি এই দুর্ঘটনা

প্রত্যক্ষ ক'রে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে—'স্থানটি যদিও খুবই উৎকৃষ্ট ও পবিত্র এক পুণ্যভূমি, এখানে যে সংঘারাম নির্মিত হচ্ছে সেটি অবশ্য বিশ্ববিখ্যাত হ'য়ে উঠবেই। পঞ্চভারতের মধ্যে এই সংঘারাম আদর্শরূপে গণ্য হবে। সহস্রবৎসরব্যাপী এর ক্রমোন্নতি অব্যাহত থাকবে। জগতের যে কোনও দেশের যে কোনও শ্রেণীর ছাত্র এখানে এসে তার অধীত বিদ্যায় চরম পারদর্শী হয়ে উঠবে। কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশকেই রক্ত বমন করতে হবে, কারণ নাগ দেহ আঘাতে বিক্ষত হয়েছে।

এঁর ভবিষ্যৎবাণীর প্রথমাংশ প্রায় সবটুকুই সত্য হয়ে উঠেছিল। শেষাংশ সত্য হয়েছিল কিনা জানা যায় না। নৃপতি শক্রাদিত্যের পুত্র মহারাজ বুদ্ধগুপ্ত পিতার পরলোক প্রাপ্তির পরে সিংহাসনারূঢ় হয়ে পিতার পরিকল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত এই সংঘারামের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান হন এবং এর দক্ষিণ অংশে তিনি আর একটি সংঘারাম নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

এঁদের পরবর্তী রাজেন্দ্রবৃন্দও এই সংঘারামের উন্নতি কল্পে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। যেমন মহারাজ তথাগতগুপ্ত তাঁদের পূর্বপুরুষ-গণের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে এর পূর্বাংশে আর একটি সংঘারাম নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। মহারাজ বালাদিত্যও সিংহাসনে আরোহন করবার পর এর উত্তর পূর্বাংশে আর একটি সংঘারাম নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। বালাদিত্যের পুত্র বজ্রাদিত্য সিংহাসনে বসে পিতার মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণে এর পশ্চিমাংশে আবার একটি সংঘারাম নির্মাণ করিয়েছিলেন।

এরপর ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নৃপতিগণেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নালন্দার প্রতি। মধ্যপ্রদেশের এক মহীপাল নালন্দার উত্তরাংশে এক বিরাট সংঘারাম তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্প্রাঙ্গণ ঘিরে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টনী নির্মাণ করিয়ে মধ্যে একটি বিরাট তোরণ দ্বার প্রস্তুত করিয়ে দিয়েছিলেন। এইভাবে পরের পর শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রিয়, শিল্পকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যে রুচিবান নৃপতিগণের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা একদিন বিশ্বের বিস্ময় হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ যুগের এতবড় এক মহাগৌরবের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ভারতে আর কোথাও নেই।

নালন্দার শতাধিক মঠ মন্দির বিহার ও সংঘারামের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ স্থান ও বিশেষ বিশেষ ঘটনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। যেমন পশ্চিমাংশের সংঘারামের অতি নিকটে একটি বিহার ছিল যেখানে অতীতে একদা প্রভু তথাগত এসে তিনমাস অবস্থান করেছিলেন। দক্ষিণাংশের সংঘারাম থেকে মাত্র শতপদ দূরে একটি স্তূপ ছিল যেখানে বহু দূরাগত এক ভিক্ষুককে ভগবান বুদ্ধদেব দর্শন দিয়েছিলেন। এই দক্ষিণাংশেই সুরভি ভৃঙ্গার হস্তে দণ্ডায়মান, বোধিসত্ব অবলোকিতে-শ্বরের মূর্ত্তি, দেখে মনে হয় তিনি যেন বুদ্ধ মন্দিরে প্রবেশের জন্য যাত্রা করে দক্ষিণাবর্তে মুখ ফিরিয়েছেন। এই মূর্তির দক্ষিণে একটি স্তূপে ভগবান বুদ্ধদেবের নখ ও চুল যা' তিনি এখানে তিনমাস অবস্থানকালে কেটেছিলেন তা' সযত্নে রক্ষিত আছে। শোনা যায় রুগ্ন শিশুদের আরোগ্য কামনায় এখানে প্রদক্ষিণ করিয়ে নিয়ে গেলে তারা আরোগ্য হয়ে যেত। দক্ষিণ পূর্ব দিকে পঞ্চাশ পা গেলে প্রাচীর ঘেরা একটি বৃক্ষ আছে মাত্র ৮।৯ ফুট উঁচু, কিন্তু গুঁড়িটি দু'ভাঁজে মোড়া। শোনা যায় এখানে বুদ্ধদেব তাঁর দাঁতন কাঠি ফেলে দিয়েছিলেন। সেই দাঁতন কাঠির শিকড় গজিয়ে বৃক্ষ হয়ে উঠেছে। হাজার হাজার বছর কেটে গেছে এ গাছটি আর বাড়েওনি, কমেওনি।

উত্তরাংশে ২০০ ফুট উঁচু একটি বিরাট বিহার ছিল। শোনা যায় তথাগত এখানে বহু শিষ্য ও ভক্তগণকে নানা উপদেশ ও শাস্ত্রবিধি ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিতেন।

এখান থেকে উত্তরে আরও একশ' পা গেলে একটি বিহার দেখতে পাওয়া যায় যেখানে বোধিসত্বের একটি সুন্দর মূর্তি স্থাপিত আছে। শোনা যায় ভক্তরা যখন এখানে ভগবানের পূজা দিতে আসেন তখন এই
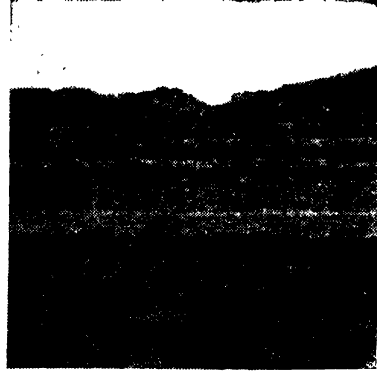
নালন্দার বুদ্ধ-বেদী (পর পর চারজন বুদ্ধ এখানে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হয়েছিলেন।)

বোধিসত্বের মূর্তিটিকে তাঁরা জনে জনে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখেন।

এই বিহারের আরও উত্তরে ছিল নালন্দার সর্ব্বোচ্চ মন্দির, যার উচ্চতা প্রায় তিনশ' ফুটের কাছাকাছি। এই অতি বিরাট বিহারটি মহারাজ বালাদিত্যের তৈরী বলেই খ্যাত।

এরই দক্ষিণ পশ্চিমে একটি সুরম্য বেদী আছে, শোনা যায় যে অতীতে পর পর চারজন বুদ্ধ এখানে ধ্যানাসনে বসেছিলেন। এরই দক্ষিণে ছিল মহারাজ শিলাদিত্যের পিতলে নির্মিত ধাতব বিহার। সেটির উচ্চতাও ১০০ ফুটের কম নয়। এখান থেকে ২০০ পা পূবে গেলেই বুদ্ধদেবের দণ্ডায়মান মূর্তি দেওয়ালের বাইরে স্থাপিত ছিল। এটি প্রায় ৮০ ফুট উঁচু। পাশে একটি ছ'তলা উঁচু সিঁড়ি ও চাতাল গাঁথা ছিল ভক্তরা যার উপর উঠে এই মূর্তির চূড়ায় পুষ্পাঞ্জলি দিত। কথিত আছে রাজা পূর্ণবর্মা এটি নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

এই মূর্তির উত্তরে কয়েক পদ গেলেই ইটের তৈরী একটি বিহার

দেখা যায়। এখানে 'বোধিসত্ত্ব তারা'র এক বিরাট মূর্তি স্থাপিত ছিল। এই মূর্তিটির বিশেষত্ব ছিল এই যে এটি দেখলেই মনে হ'ত এর আপাদ মস্তক একটা পবিত্র দৈবীভাবে বিমণ্ডিত। এই সংঘারাম থেকে ৮।৯ লী দূরে অবস্থিত 'কলিকা' গ্রামের নাম উল্লেখ যোগ্য। সম্রাট অশোক এখানে একটি স্তূপ নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ, এই গ্রামে এই খানেই সেই ভুবনবিদিত আচার্য মুদ্গলপুত্র ভুমিষ্ঠ হয়েছিলেন। প্রাচীন মুদ্গলপুর গ্রামের ৩।৪ লী পূবে আর একটি স্তূপ দৃষ্টি গোচর হবে। এখানে মহারাজ বিম্বিসারের প্রথম ভগবান বুদ্ধের পাদ নখকণা স্পর্শ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। এখান থেকে আরও কিছু দক্ষিণ পূর্ব কোণে প্রায় ২০ লী তফাতে আমরা একটি নগর পাই যার নাম ছিল "কালপিনাক" এখানেও সম্রাট অশোক একটি স্তূপ নির্মাণ করিয়ে দিয়ে ছিলেন আচার্য সারিপুত্তের স্মৃতিরক্ষা কল্পে, কারণ সারিপুত্তের জননী এইখানেই তাঁকে কোলে পেয়েছিলেন।

(ক্রমশঃ)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মধ্যযুগের সূচনা

শ্রীননীগোপাল গোস্বামী এম্-এ

শ্রীচৈতন্যকে ভক্তেরা 'স্বয়ং ভগবান' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই স্বয়ং ভগবানের দর্শনলাভ সে যুগের অনেকের ভাগ্যেই হইয়াছিল। সুতরাং শ্রীচৈতন্যকে যাঁহারা দেখিলেন, তাঁহাদের সহিত শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহা সহজেই বলা যাইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা এই ভগবানকে দর্শন করিলেন, তাঁহারা ইঁহাকে কোথায় কি ভাবে দেখিলেন তাহার মীমাংসাতেই যত সমস্যা! সমগ্র জীবন-ব্যাপী মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ইনি মানুষের জন্য যে প্রেমের সন্ধান দিয়া গেলেন, যাহার শিহরণে তাঁহার সমস্ত শরীর 'কদম্বকোরকের ন্যায় কণ্টকিত হইয়া উঠিত, নয়নযুগল হইতে অজস্র অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িয়া এমন কি শ্রীমদ্ ভাগবতের পুঁথির অক্ষর পর্য্যন্ত অবলুপ্ত করিয়া দিত, (১) তাহা যে কি বস্তু, তাহা যদি তাঁহারা সকলে মিলিয়া বুদ্ধিযুক্তি করিয়া স্থির করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী পুরুষকে আর হতাশার অনল বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অন্ধকারে 'হাতড়াইয়া' চলিতে হইত না, ধর্ম্মকে আজ স্বার্থান্বেষির ক্রীড়নক হইয়া পড়িতে হইত না। ডকটর রাধাকৃষ্ণন্ বড় দুঃখেই তাই বলিয়াছেন—

"History is full of tragic illustrations of religions throwing itself on the side of powers, the statusquo and vested interests and resisting the growth of liberal institutions."—('Religion and Religions'—S. Radha-Krishnan. p p 105)

ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাতে যে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মকে বাদ দিয়া কোন কথা বলিয়াছেন, তাহা নহে। আমরা বলিতেছি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম পৃথিবীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে; কিন্তু যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া এই মতবাদ গঠিত হইয়া উঠিল সেই 'স্বয়ং ভগবান' শ্রীচৈতন্যকে যে কোন্ বৈশিষ্ট্যের মালা পরাইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইতে চাহিয়াছিলেন তাহার মীমাংসা আজও হয় নাই। আমরা দেখিতেছি, ভগবান আমাদেরই মত লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদেরই দুয়ারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়া গেলেন; কিন্তু কেনইবা তিনি আসিলেন, আর কেনইবা তিনি চলিয়া গেলেন, তাহা আমরা আজও উপলব্ধি করিতে পারি নাই। অবশ্য শ্রীচৈতন্যের কৃপা-লাভে ধন্য হইয়া জগতে যাঁহারা 'মধুর বৃন্দা-বিপিন-মাধুরী-প্রবেশ-চাতুরী'র পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গেলেন, তাঁহাদের কার্য্য-ধারা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে যে পরিমাণ আধ্যাত্মিক শক্তি থাকা দরকার, দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার তাহা নাই। এই জন্য তাঁহাদের কার্য্য-প্রণালীর সহিত আমার হয়তো আলোচনার গুরুতর প্রভেদ হইবে। আমার হইতেছে ঐতিহাসিকের বৃত্তি, এ আলোচনায় ঐতিহাসিকের ন্যায় তথ্য-বিনির্ণয়ের চেষ্টা থাকিলেও পারমার্থিক আলোচনায় যে এরূপ রচনার স্থান নাই তাহা বলাই বাহুল্য। কাজেই তত্ত্ব ব্যাখ্যান ছাড়িয়া ইতিবৃত্তের আশ্রয়ে ঘটনার যাথার্থ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পরেই নীলাচলে চলিয়া যান। ফলে গৌড়ের ভক্তবৃন্দের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠিতে তাঁহার যে পরিমাণ প্রত্যক্ষ সহায়তা পাওয়া দরকার ছিল, তাহা সম্ভবপর হয় নাই। অবশ্য যদিও ভক্তবৃন্দ 'প্রত্যেকেই নীলাচলে মহাপ্রভু-সমীপে মিলিত হইয়া শক্তি-সঞ্চয় করিতেন, কিন্তু ইহাতে ফল হইত ভিন্নরূপ। কেননা, মহাপ্রভু যদি সকল ভক্তকে তাঁহার নিকট রাখিয়া সর্ব্ব-প্রকার শিক্ষা-দীক্ষায় নিজহাতে গড়িয়া তুলিতে পারিতেন, তাহা হইলে যেমন জিনিসটি পাওয়া যাইত তেমনটি হইল না। কিন্তু মহাপ্রভুর পক্ষে সব দিকে লক্ষ্য দেওয়া সম্ভবপরও ছিল না। আর দিলেই বা কি হইবে? যে 'প্রেম' তাঁহার জীবন-যজ্ঞের মূল প্রতিপাদ্য, 'ভাষার অতীত তীরে' যাহার জন্ম, তাহা কখনও মানুষকে বলিয়া-কহিয়া

---

(১) ভক্তি-রত্নাকর—৩য় তরঙ্গ, শ্লোক সংখ্যা-২৭৬ অনুরাগবল্লী দ্বিতীয় মঞ্জুরী প্রেমবিলাস, চতুর্থ বিলাস

বুঝানো যায় না।১ কেহ কেহ বলেন, মহাপ্রভু মাধব-মতের উপরই রং ফলাইয়া লীলা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মাধবাচার্য্যের মতের সহিত তাঁহার আচরিত ধর্ম্মের তুলনা করিলেই দেখা যায় যে, ইহা আমাদের নিছক্ কল্পনা মাত্র।২ তিনি ছিলেন ভাব প্রধান মানুষ, দিন-রাত এক অনির্ব্বচনীয় ভাবধারায় মগ্ন থাকিতেন। কাজেই কোন মতবাদের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা পড়িয়া যে কথা তাঁহার বিরহ মথিত, হৃদয়ে অশ্রুর অক্ষরে চির-লিখিত, সেই 'আত্মহারা পাগলকরা' প্রেম-সমুদ্রকে সীমাবদ্ধ স্রোতস্বিনীর মধ্যে ধরিয়া রাখিবার বৃথা প্রয়াস তিনি পান নাই, আর এই অভিনব ধর্ম্ম কি করিয়া দেশের নানাস্থানে প্রচার করিতে পারা যায় সে-সকল কথাও তাঁহার মনে তেমন করিয়া উদিত হয় নাই।

এই জন্যই বাঙ্‌লাদেশে ধর্ম্মপ্রচারের ভার নিত্যানন্দের উপর অর্পিত হয়। কিন্তু নিত্যানন্দ যে সব ব্যাপারেই মহাপ্রভুকে অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিতেন, তাহা তাঁহার কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া মনে হয় না।৩ এই জন্য অনেকেই তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া পড়েন। এমন কি অদ্বৈত আচার্য্যের সহিতও কার্য্য-প্রণালী লইয়া তাঁহার মতভেদ হয়। কিন্তু অদ্বৈত প্রভু তখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। অন্তরে যাহা কিছু ধর্ম্মোৎসাহ ছিল, জরাহেতু তাহা কার্য্যে প্রকাশ করিবার সামর্থ তাঁহার ছিল না। বিশেষতঃ তিনি ছিলেন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। চিরদিন জ্ঞানানুশীলনেই তিনি রত ছিলেন। কাজেই ঝগড়া-দ্বন্দ্ব করিয়া কালক্ষেপণ করা অপেক্ষা অধ্যয়ন-অধ্যাপনার মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করিতে তিনি অধিকতর ভাল বাসিতেন। পক্ষান্তরে নিত্যানন্দ পরমোৎসাহী পুরুষ। কাজেই অদ্বৈতের অসন্তোষ নিত্যানন্দের পথে কোন বিঘ্ন উৎপাদন করে নাই। নিত্যানন্দের আদেশে বিভিন্ন ব্যক্তিগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে গমন করিত এবং তাহাদের চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া নানা শ্রেণীর লোকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারকল্পে কোন বিশিষ্ট কেন্দ্র গঠিত হয় নাই, বিভিন্ন ব্যক্তিকে বেষ্টন করিয়া বিভিন্ন দলের উৎপত্তি হইতেছিল এবং এই সমুদয় দলের নেতাগণ তাঁহাদের আপনাপন দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা যিনি যেভাবে মহাপ্রভুকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তিনি সেইভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন। কাজেই ভক্তগণ তাঁহাদের আপনাপন অনুভূতির তারতম্য অনুসারে স্বভাবতঃই নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছিলেন এবং এই সমস্ত ভক্তগণের মধ্যে মতগত কোন বৈষম্য না থাকিলেও যে সমবেত কার্য্যের যোগ ছিল না, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই জন্যই দেখা যায়, নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দ (মুরারি, কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবন দাস, জয়ানন্দ প্রভৃতি) এবং বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতির রচনার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই নবদ্বীপের ভক্তগণ মহাপ্রভুকে 'অবতার' বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ মহাপ্রভুর দর্শন পান তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের পরে এবং সে সময়ও তাঁহারা তাঁহাকে যতীবেশধারী বলিয়াই প্রশংসামুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন।১ ইহা হইতে মনে হয়, নবদ্বীপের ভক্তগণের মধ্যে উন্মাদনার মাত্রা ছিল বেশী, আর বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের মধ্যে উন্মাদনা থাকিলেও তাহার সহিত জ্ঞানেরও সবিশেষ সংযোগ ছিল। যে যুগে মহাপ্রভু লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই যুগে আরও দুই মহাপুরুষ বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহাদের নাম কবীর ও নানক। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে মহাপ্রভুর চরিত্র মাধুর্য্য ছিল বিশ্বের আকর্ষণ-সামগ্রী।২ কাজেই সে-যুগের যাঁহারাই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া পারেন নাই। এই জন্য সে-সময়ের বহুলোকই তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই বিরাট পুরুষের যখন তিরোভাব হইল, তখন সকলেই ভাঙ্গিয়া পড়েন। শোকে মুহ্যমান হইয়া কয়েক বছর যাইতে না যাইতে নিত্যানন্দ চলিয়া গেলেন। রহিলেন বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য। কিন্তু তাঁহারও দিন ঘুরাইয়া আসিয়াছিল। কয়েক বছর পরে তাঁহাকেও আমরা হারাইলাম। তা'র পর শ্রীবাস, নরহরি সকলেই একে একে চলিয়া গেলেন। ওদিকে বৃন্দাবনেও বিদায়ের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের সর্ব্ব বৃহৎ স্তম্ভস্বরূপ রূপ সনাতনের তিরোভাব হইল। নীলাচলের অবস্থা হইল আয়ও ভয়াবহ। মহাপ্রভুর তিরোধানের ছয় বছরের৩ মধ্যেই গজপতি প্রতাপরুদ্র৪ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে

১। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত শ্রীপদামৃত মাধুরী ৩য় খণ্ড, ভূমিকা—পৃঃ ৷৫০—৸০

২। Dr. S. K. De :—Early History of the Vaisnav Faith and Movement in Bengal—pp. 16 -18.

৩। ডক্টর শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—'বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজ তত্ত্ব'—পৃঃ ২৪—২৭।

১। Dr. S. K. De—Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal—p p. 339.

২। Theism in Mediaeval India (The Hibbert Lectures, Second series—Delivered in Essex Hall, London, October—December, 1919 - By J. Estilin Carpenter, D. Litt.—p p. 488.

৩। Journal of the Asiatic Society, Bengal—Vol, LXIX, 1900—pp. 185.

ওড়িস্যার মাদলা-পঞ্জি দৃষ্টে জানা যায় যে, প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের ৩ বৎসর পূর্ব্বে পরলোক গমন করেন। কিন্তু 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়' নাটক, 'ভক্তি-রত্নাকর' এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পরবর্ত্তীকালে প্রতাপরুদ্র মৃত্যুমুখে পতিত হন। ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার (চৈতন্য-চরিতের উপাদান—পরিশিষ্ট, পৃঃ ৫৪) এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

৪। প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের কৃপাপ্রাপ্তির পূর্ব্বে "সরস্বতী বিলাস" নামে একখানি স্মৃতির গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের

তাঁহার পুত্র কালুয়াদেব রাজা হন। কিন্তু তিনি মাত্র ১ বৎসর ৫ মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। তারপর মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধর কর্তৃক নিহত হইলে প্রতাপরুদ্রের কথারুয়া দেব নামে অপর এক পুত্র রাজা হন। কিন্তু গোবিন্দ বিদ্যাধর তাঁহাকেও হত্যা করে এবং নিজেই সিংহাসন অধিকার করিয়া বসে। সে সময়ের অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিত্য-সেবার কার্য্যেও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আবার রাজ্য-বিপ্লব মিটিতে না মিটিতেই দেব-বিদ্বেষী কালাপাহাড় ওড়িষ্যায় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার লুঠতরাজ ও অত্যাচারের পর ১৯ বৎসরকাল অরাজক অবস্থাতেই কাটিয়া যায়।[৫]

মহাপ্রভু চলিয়া গিয়াছেন, প্রভুদ্বয়ও[৬] চলিয়া গেলেন। কাজেই ব্যক্তির পরিচালনার অভাবে বৈষ্ণবধর্ম্মিগণ চারিদিকই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। আমরা দেখিয়াছি ধর্ম্মপ্রচারে সমবেত কার্য্যের যোগ না থাকিলেও মতগত বৈষম্য কিছু ছিল না। পার্থক্য যাহা ছিল তাহা ব্যক্তিগত সাধনপ্রণালীতে মাত্র।[৭] কিন্তু প্রচার কার্য্যে সমবেত যোগসূত্রের অভাবে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইল, সম্ভবতঃ তাহারই ফলে উত্তরকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ (১) গৌরাঙ্গ নাগরবাদী, (২) অদ্বৈত সম্প্রদায়, (৩) গদাধর সম্প্রদায়, (৪) নিত্যানন্দ বিদ্বেষী সম্প্রদায় প্রভৃতি চারিটি পরস্পর বিবদমান উপশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়েন।'[৮]

তারপর ষোড়শ শতকের শেষপাদ ও সপ্তদশ শতকের প্রথমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের দ্বিতীয়বার বন্যা নামে। শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর এবং তাঁহাদের পশ্চাতে শ্রীমতী জাহ্নবী ঠাকুরাণী ও বীরচন্দ্র—এই চারিজনের চেষ্টায় বাংলাদেশে এবং শ্যামানন্দের চেষ্টায় ওড়িষ্যায় নূতন উদ্যমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। এই খানেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যযুগের সূচনা।

আচার-পদ্ধতির কিছুই উল্লেখ নাই। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শিবের স্তব-স্তুতি দেখা যায়, অবশ্য কোন কোন পুঁথিতে হয়গ্রীব বিষ্ণুর স্তুতিও আছে। প্রতাপরুদ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণও দেখা যায় না। এই সব কারণে ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে (Early History of the Vaisnava Faith and Movement, pp. 67-68, foot note) মনে করেন যে, প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের অতি মানুষী চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই।

৫। বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড—পৃঃ ৫৮১

৬। শ্রীচৈতন্যকে মহাপ্রভু এবং শ্রীঅদ্বৈত এবং শ্রীনিত্যানন্দকে প্রভু বলা হইয়া থাকে—

> শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরাদ্বৈত নিত্যানন্দাবধূতকাঃ।
> অত্র ত্রয়ঃ সমুন্নেয়া বিগ্রহা প্রভবশ্চতে।
> একো মহাপ্রভুজ্ঞেয়ঃ শ্রীচৈতন্যদয়াম্বুধিঃ।
> প্রভুদ্বৌ শ্রীযুতৌ নিত্যানন্দাদ্বৈতৌ মহাশয়ৌ।
> গোস্বামিনো বিগ্রহাশ্চ তে দ্বিজশ্চ গদাধরঃ।
> পঞ্চতত্ত্বাত্মকা এতে শ্রীনিবাসশ্চ পণ্ডিতঃ॥১২॥
>
> —গৌড়গণোদ্দেশ দীপিকা

শ্রীমৎ বিশ্বম্ভর, অদ্বৈত ও অবধূত নিত্যানন্দ ইঁহাদের মধ্যে তিনজন ভগবদ্বিগ্রহ প্রভু নামে বিখ্যাত। এই তিনজনের মধ্যে এক দয়ার যোগ্য সাগর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়া বিদিত। আর নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত এই দুই মহাশয় প্রভু নামে অভিহিত; ইঁহারা গোস্বামী বিগ্রহ, দ্বিজগদাধর ও শ্রীনিবাস পণ্ডিত—এই সকল পঞ্চতত্ত্বরূপে কথিত হইয়াছেন।

এই বিষয়ে শ্রীপাদ্ স্বরূপ গোস্বামীর বচন—

> যদুক্তং তত্র গোস্বামি শ্রীস্বরূপপদাম্বুজৈঃ।
> ত্রয়োঽত্র বিগ্রহাজ্ঞেয়াঃ প্রভবশ্চাত্র তে ত্রয়ঃ।
> একো মহাপ্রভুর্জ্ঞেয়ো দ্বৌ প্রভু সম্মতৌ সতাং॥১৩॥
>
> —গৌড়গণোদ্দেশ দীপিকা

কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন—

> এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন।
> দুই প্রভু সেবা করে মহাপ্রভুর চরণ॥
>
> —চৈতন্য চরিতামৃত

৭। ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৫০২-৫০৩

৮। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার চৈতন্য চরিতের উপাদান—পৃঃ ১৮৭

দাদ্‌রা
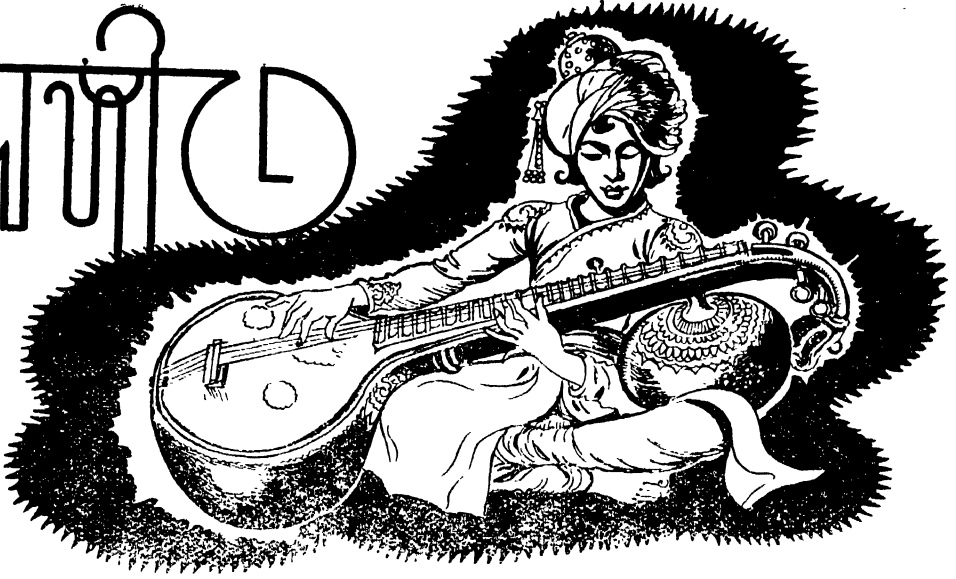
দূর হতে মোর ভাবতে ভালো লাগে,
আমার তরে একটি তারা জাগে।
চাঁদের দেশে করুণ মলিন বেশে,
সুপ্ত স্মৃতির মৌন অনুরাগে।
এপার হতে শুনতে যে তার গান,
কান পেতে রই আকুল মনপ্রাণ।
অন্তবিহীন বিরহের ঐ পারে,
মিলন মধুর মন্ত্র মোরে ডাকে।

ওপারের ঐ একটি ছুটী তারা,
মোর দেউলের সন্ধ্যা প্রদীপখানি।
আমার দেশে আমার ছিল যারা,
দূর হতে আজ দেয় মোরে হাতছানি।
মোর কাননের একটি ঝরা ফুল,
কোন ভুবনে সৌরভে আকুল।
স্বপন শেষে কোন সে অচিন দেশে,
বেদন বিধুর বিফল পরশ মাগে।

কথা ও সুর ॥ সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীতারাপদ চক্রবর্ত্তী, স্বরলিপি ॥ শ্রীনীহারকণা মুখোপাধ্যায় এম-এ

II র্সা র্সা ণদা | ণা র্সা ঋর্জ্ঞা I র্সা র্মা র্মর্জ্ঞা | র্জ্ঞর্ঋা র্সা র্সা I
এ ০ ০ ০ ০ ০০ দূ র হ তে মো র

র্সণা ণা দা | ণা র্সা র্সঋা I ণর্সা র্সা -া | -া -া -া I
ভা ব তে ভা লো ০০ লা গে ০ ০ ০ ০

র্সা র্সণা র্জ্ঞ-র্ঋা | ঋর্সা ণা -া I পা র্সণা ণদা | পা মজ্ঞা মজ্ঞা I
আ মা০ র ত রে ০ এ ক টি তা রা০ ০০

মা পা -া | -া -া -া I পা র্সণা দ-পা | পা , ণদা পমা I
জা গে ০ ০ ০ ০ চাঁ দে র দে শে ০

মা দপা ম-জ্ঞা | জ্ঞা পমা জ্ঞ-রা I রা জ্ঞা মা | পা দা ণা I
ক রু ণ ম লি ন বে শে ০ ০ ০ ০

পা ণা ণদা | পা মা মা I জ্ঞা জ্ঞপা পমা | জ্ঞা ঋা ঋজ্ঞা I
সু ০ প্ত স্মৃ তি র মৌ ০ ন অ মু ০

জ্ঞঋা সা -া | -া -া -া I | II
রা গে ০ ০ ০ ০

II র্সা র্সণা দা | ণা র্সা -া I র্সণা ণা দা | ণা র্সা র্স-ঋা I
এ পা র হ তে ০ শু ন তে যে তা র

ঋর্সা -া -া | -া -া -া I র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I
গা ০ ০ ০ ০ ন কা ন পে তে র ই

র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্রর্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I র্জ্ঞা -া -া | -া -া র্রা I
আ কু ল ম ন ০ প্রা ০ ০ ০ ০ ০

র্মা -া -া | -া -া -া I র্জ্ঞা র্মা র্ম-জ্ঞা | ঋা র্সা র্সা I
০ ০ ০ ০ ০ ণ অ ন ন্ত বি হী ন

ণা ণা সর্জ্ঞা | র্জ্ঞঋা র্সা র্সা I র্সণা দা -া | -া -া -া I
বি র ০ হে র ঐ পা রে ০ ০ ০ ০

দা দর্সা র্সণা | দা পা পা I পা ণা ণ-দা | পা মজ্ঞা মজ্ঞা I
মি ল০ ন ম ধু র ম ০ ন্ত্র মো রে০ ০০

মা পা -া | -া -া -া II |
ডা কে ০ ০ ০ ০

চাঁদের দেশে ইত্যাদি।

II জ্ঞা জ্ঞা -া | রা জ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | রা জ্ঞা -া I
ও পা ০ রে ঐ এ ক টি দু টী ০

সজ্ঞা জ্ঞা -া | -া -া -া I সা সা রা | জ্ঞা মা মা I
তা রা ০ ০০ ০০ ০ মো র দে উ লে র

মা -া . মা | মা মা মা I গা মা -া | মজ্ঞা রা -া I
স ০ ন্ধ্যা প্র দী প খা নি ০ ০ ০ ০

জ্ঞা পা পা | পা পা -া I জ্ঞা পা পা | দা দর্সা ণণা I
আ মা র দে শে ০ আ মা র ছি লো ০০

দপা মা -া | মজ্ঞা রসা রা I জ্ঞা পা পা | পা পা -া I
যা রা ০ ০ ০ ০ আ মা র দে শে ০

জ্ঞা পা পা | দা দর্সা ণণা I দপা মা -া | -া -া -া I
আ মা র ছি লো ০০ যা রা ০ ০ ০ ০

পা ণা ণদা | পা মা মা I জ্ঞা পা পমা | জ্ঞা ঋা ঋজ্ঞা I
দূ র হ তে আ জ দে র মো রে হা ত

জ্ঞঋা সা -া | -া -া -া} I র্সণা ণা দা | ণা র্সা র্সা I
ছা নি ০ ০ ০ ০ মো র কা ন নে র

র্সণা ণা দা | ণা র্সা র্সঋা I ঋর্সা -া -া | -া -া -া I
এ ক টি ঝ রা ০ ফু ০ ০ ০ ০ ল

জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | রজ্ঞা জ্ঞা -া I জ্ঞা -া জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা -া I
কো ন ভু ব নে ০ সৌ ০ র ভে আ ০

জ্ঞা -া -া | -া -া র্রা I র্সা -া -া | -া -া -া I
কু ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ল

জ্ঞা জ্ঞর্মা র্মজ্ঞা | ঋা র্সা -া I ণা ণা সজ্ঞা | জ্ঞঋা র্সা র্সা I
স্ব প০ ন শে ষে ০ কো ন সে অ চি ন

র্সণা ণা দা | -া -া -া I দা দর্সা র্সণা | দা পা পা I
দে শে ০ ০ ০ ০ বে দ০ ন নি ধু র

পা পণা ণদা | পা মজ্ঞা মজ্ঞা I মা পা -া | -া -া -া II
বি ফ০ ল প র০ ০শ মা গো ০ ০ ০ ০

চাঁদের দেশে ইত্যাদি···।

উদ্বেলিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া

অতুল দত্ত

সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের যে বিরোধ—সাম্যবাদের সহিত ধনতন্ত্রের যে সঙ্ঘর্ষ, তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই এখন আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির চাকা ঘুরিতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জ্জাতিক ধনতন্ত্রের পরিপোষক; আন্তর্জ্জাতিক সাম্যবাদ পরিপুষ্ট হইবার উৎস সোভিয়েট রুশিয়া। বিভিন্ন দেশে ধনতন্ত্রের চিতাভস্মের উপর সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা—তথা বিশ্বসাম্যবাদের আদর্শকে নিকটতর করা সোভিয়েট রুশিয়ার রাষ্ট্রগত স্বার্থ। পক্ষান্তরে, পৃথিবীর যত অধিক পরিমাণ ভুমিতে ধনতন্ত্র অক্ষুণ্ণ থাকে, ততই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর নিরাপত্তা। সাম্যবাদের প্রসার নিবারণ এবং সাম্যবাদী রাষ্ট্রকে চূর্ণ করা মার্কিন ধনতন্ত্রের স্বার্থ।

এই দুইটি বিরুদ্ধ শিবিরের রাজনৈতিক সংঘর্ষ এখন চরম তীব্রতায় পরিণত হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পূর্ব্ব-ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিতে সাম্যবাদের পতাকা উড্ডীন হওয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চঞ্চল হইয়াছিল; ১৯৪৭ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায় সাম্যবাদ প্রসারিত হওয়ায় সে প্রমাদ গণে। তাহার পরই ইউরোপের অবশিষ্টাংশে ধনতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য মার্শাল পরিকল্পনা এবং আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জ্জাতিক সাম্যবাদী শক্তির আঘাত প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে উত্তর আটলান্টিক চুক্তি। ইউরোপ সামলাইবার জন্য ধনতান্ত্রিক আমেরিকা যখন ব্যস্ত, তখন এশিয়ার বৃহত্তম দেশটি ধনতন্ত্রের আওতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য মার্কিন ধনতন্ত্রের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত। এখন চীনের চতুঃসীমার মধ্যে সাম্যবাদকে আটক রাখিয়া চতুর্দ্দিক হইতে উহাকে আঘাত করাই দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের ও তাহার সমর্থক রাষ্ট্রগুলির নীতি।

ব্রহ্মদেশ

চীনে সাম্যবাদী শক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রত্যক্ষভাবে বিপন্ন হইয়াছে ব্রহ্মদেশ। চীন-ব্রহ্ম সীমান্তের দৈর্ঘ্য এক হাজার মাইল। ব্রহ্মদেশে সাম্যবাদ প্রসার লাভ করিলে সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবে। সাম্যবাদী শক্তি তখন প্রবেশপথ পাইবে ভারত মহাসাগরে, সমগ্র মালয় উপদ্বীপে পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক শক্তির প্রভাব বিনষ্ট হইবে। বর্ত্তমানে বর্ম্মা গভর্ণমেণ্টের প্রভুত্ব কয়েকটি বিক্ষিপ্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত; দেশের অর্দ্ধেকের বেশী অধিবাসীর উপর তাহার কোনও প্রভাব নই। বর্ম্মা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষিত সৈন্যের সংখ্যা মাত্র ২০ হাজার। পক্ষান্তরে, বর্ম্মী সাম্যবাদীরা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ৪০ হাজার বর্গ মাইল অঞ্চলে। তাহাদের সৈন্য সংখ্যা ১০ হাজার। দক্ষিণপন্থী কারেন্ বিদ্রোহীরা বর্ম্মা গভর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট বিব্রত রাখিয়াছে। সম্প্রতি কারেন্দের প্রধান কেন্দ্র টঙ্গুর পতন ঘটিলেও ইহাদের সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে এখনও সময় লাগিবে। চরম দক্ষিণপন্থী কারেন্দের সহিত আপোষ করিয়া কমুনিষ্টদের বিরুদ্ধে যুক্ত ফ্রণ্ট গঠনে বর্ম্মা গভর্ণমেণ্ট সাহসী হইতেছেন না।

সাম্যবাদের বিরুদ্ধে ব্রহ্মের জাতীয় গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবার অছিলায় ব্রহ্মদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে আগ্রহের অভাব পশ্চিমে নাই। কিন্তু অসুবিধা এই যে, বর্ম্মীদের জাতীয়তা-বোধ অত্যন্ত উগ্র; বহিঃশক্তিকে তাহারা অত্যন্ত সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। সাম্যবাদ প্রতিরোধের জন্য বাহিরের শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিলে হিতে বিপরীত ঘটিবার সম্ভাবনা। অবশ্য, বর্ম্মা গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যে বাহিরের সাহায্যে বঞ্চিত থাকিলেও কোনও গোপন সাহায্য যে তাঁহারা পাইতেছেন না, ইহা মনে করিবার কারণ নাই। থাকিন্ নু গভর্ণমেণ্টকে এই বিপদের মধ্যে রাখিয়া তাঁহার সাম্যবাদ-বিরোধী মিত্ররা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। সম্প্রতি বর্ম্মী জনসাধারণের বৈদেশিক বিরোধী মনোভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বৃটিশ কমনওয়েলথের পক্ষ হইতে ব্রহ্মদেশকে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড সাহায্য করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের আর্থিক সঙ্কট দূর করিবার উদ্দেশ্যেই এই সাহায্যের ব্যবস্থা। সামরিক সঙ্কট অতিক্রম করাইবার জন্য প্রকাশ্যে সামরিক সাহায্য আসিতেও হয়ত অধিক বিলম্ব হইবে না।

ইন্দোচীন

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় সাম্যবাদের প্রসার নিবারণের প্রধান সাম্রাজ্যবাদী ঘাঁটী এখন ইন্দোচীন। ইন্দোচীনের জাতীয় আন্দোলনে কমুনিষ্টদের প্রভাব থাকিলেও উহা নিছক সাম্যবাদী তৎপরতা নহে। জাতীয় আন্দোলনের নেতা ডাঃ হো চি মিন্ এক সময়ে আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট দলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বটে, কিন্তু ইন্দোচীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি ১৯৪৫ সালে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানকার বর্ত্তমান জাতীয় দলের (ভিয়েৎ মীন্) শতকরা ৮০ জনই কম্যুনিষ্ট নহে।

১৯৪৬ সালে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট ইন্দোচীনে ডাঃ হো চি মিনের গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া উহার সহিত চুক্তি করিয়াছিলেন। পরে, তাঁহারাই চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ১৯৪৬ সালে ডিসেম্বর মাসে আক্রমণ আরম্ভ করেন। ইন্দোচীনের জাতীয়তাবাদীরা তখন ইন্দোনেশিয়ার দক্ষিণপন্থী-দের মত জাতিসঙ্ঘে ধর্ণা দেয় নাই। তাহারা নিজ শক্তিতে এই ঔদ্ধত্যের উত্তর দিয়াছিল—বাহিরের কাহারও শরণাপন্ন হয় নাই। গত তিন বৎসর তাহারা অমিত বিক্রমে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে; দেড় লক্ষ ফরাসী সৈন্য (ইহাদের অধিকাংশ বিদেশী ভাড়াটিয়া সৈন্য—সেনিগেলি, মুর এবং জার্ম্মাণ) কতকগুলি সহর অঞ্চলে কেবল অধিকার প্রতিষ্ঠিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। এই পক্ষে সৈন্যক্ষয়

হইয়াছে ২০ হাজারের উপর। ইন্দোচীনের দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চলে হো চি মিন্ গভর্ণমেন্টের কর্ত্তৃত্ব বিস্তৃত; ফরাসী এলাকাতে—এমন কি খাস সাইগঁতেও ভিয়েৎ মীনের গোপন তৎপরতা প্রবল।

ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সামরিক অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক শলাপরামর্শও প্রচুর চলিয়াছিল। কিন্তু কোনও ফলোদয় হয় নাই। দক্ষিণে কোচিন্ চায়নায় তাহারা যে শাসন প্রতিষ্ঠা করে, তাহার সমর্থনে কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তি বা দল জোটে নাই। অবশেষে, তাহারা বাও দাইয়ের শরণাপন্ন হয়। এই ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে 'টাইম্সের' সংবাদদাতা বলিয়াছেন, "**Successor to the traditional Annamite monarchy, Bao Dai before the war was little more than a carefully preserved historical survival living at the court at Hue, capital of Annam. For a brief period he headed a puppet Government which the Japanese set up in March, 1945. He abdicated after the war and went to live in Hongkong as a private citizen.** এই "ইতিহাসের সাক্ষীটি" ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে ১৯৪৯ সালে মার্চ্চ মাসে ইন্দোচীনে আসেন এবং দালাতের শৈলাবাসে আশ্রয় লন। পরে, গত ডিসেম্বর মাসে বাও দাইকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হইয়াছে; সাইগঁতে তিনি নিজ গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই উমেদারের প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করিবার জন্য ফরাসী সৈন্যের সংখ্যা তিন লক্ষে পরিণত হইয়াছে। বৃটেন্ আমেরিকা প্রভৃতি গণতন্ত্রের ধ্বজাবাহী শক্তিগুলি ইঁহার গভর্ণমেন্টকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। বাও দাইয়ের সাহায্যের জন্য আসিতেছে মার্কিণ ডলার, মার্কিণ অস্ত্রশস্ত্র।

দেশের জনগণের অনাকাঙ্খিত একটি মধ্যযুগীয় নৃপতিকে বৈদেশিক সৈন্য ও বৈদেশিক অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা বলপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত করাইবার এই চেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদীগুলির লজ্জা নাই। হো চি মিন্ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে প্রচারিত হইতেছে যে, উহা কম্যুনিষ্ট প্রভাবাধীন। সোভিয়েট রুশিয়া ও তাহার অনুগত রাষ্ট্রগুলি যখন এই গভর্ণমেন্টকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তখন উহার কম্যুনিষ্ট কলঙ্ক নাকি সন্দেহাতীত। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ১৯৪৬ সালে ফরাসী গভর্ণমেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে এই গভর্ণমেন্টকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন; ইহার প্রতি ইন্দোচীনের জনসাধারণের পরিপূর্ণ আনুগত্য সর্ব্বজন-স্বীকৃত। আর, সোভিয়েট রুশিয়া কর্ত্তৃক স্বীকৃতিই যদি এই গভর্ণমেন্টের অস্পৃশ্য হইবার কারণ হয়, তাহা হইলে ইন্দোনেশিয়ার হাত্তা গভর্ণমেন্টেরও জাতিচ্যুতি ঘটা উচিত।

ইন্দোনেশিয়া

ওলন্দাজদের সহিত আপোষ করিয়া ইন্দোনেশিয়ার দক্ষিণপন্থী নেতারা যে "স্বাধীনতা" আনিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে সেখানে বিক্ষোভ কম নহে। ১৯৪৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কম্যুনিষ্টদের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর তাহাদের প্রকাশ্য তৎপরতা হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু হেগ্ চুক্তিতে ইন্দোনেশিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ না করায় এবং এখানকার অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে মার্কিণ স্বার্থের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব বিস্তৃতিতে উগ্র জাতীয়তাবাদীরা এখন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। ইহাদের সমর্থনে পুষ্ট হইয়া কম্যুনিষ্টদের পুনরায় আত্মপ্রকাশ অসম্ভব নহে। আপাততঃ ইন্দোনেশিয়ার নেতারা তাঁহাদের নবলব্ধ স্বাধীনতা সংহত করিবার কাজে এক বিচিত্র সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদ তাঁহার নিজ স্বার্থে ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপগুলির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিতে বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিল। এই চেষ্টার ফলে কতকগুলি দ্বীপে ওলন্দাজদের অনুগত শাসন-শক্তির প্রতিষ্ঠাও হইয়াছিল। এই সব দ্বীপের ঐক্য-বিরোধী আন্দোলন এখন ইন্দোনেশীয় নেতাদের পক্ষে নূতন সমস্যা সৃষ্টি করিতেছে।

শ্যাম

মালয় উপদ্বীপের কেন্দ্রস্থলে এই রাজ্যটি দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্যগুলির মত রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের দেশ। গত তিন বৎসরে এখানে চারবার ষড়যন্ত্র ও তিনবার পাণ্টা ষড়যন্ত্রের চেষ্টা হইয়াছে। জাপানের সহযোগী—স্থানীয় সমরবিভাগের সমর্থিত পিবুল সংগ্রামের দল এখন শ্যামে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত। এই দলের বিরুদ্ধে নৌ-বিভাগের সমর্থিত জাপ-বিরোধী প্রিদি ফ্যানোমিয়ঙ্গের দলের ষড়যন্ত্র ও পাণ্টা ষড়যন্ত্র চলিয়া থাকে। শ্যামে ত্রিশ লক্ষ চীনার বাস। চীনে কম্যুনিষ্টদের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই চীনাদের সম্পর্কে আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে। প্রতিক্রিয়াপন্থী পিবুলের প্রতি শ্যামের দারিদ্র্যপীড়িত জনসাধারণ সন্তুষ্ট নহে। সুতরাং, চীনা কম্যুনিষ্টদের পক্ষে প্রিদিকে আশ্রয় করিয়া শ্যামের সংখ্যালঘু চীনাদের সমর্থনে পিবুল-বিরোধী তৎপরতায় প্রশ্রয় দেওয়া সহজ।

মালয়

"মরিয়াও রাম মরে না"! মালয়ের বনেজঙ্গলের বৃটিশ-বিরোধী গেরিলা যোদ্ধারা "নিশ্চিহ্ন" হইবার পর আবার আত্মপ্রকাশ করে; দীর্ঘ দেড় বৎসরে ৬০ হাজার সৈন্য নিয়োগ করিয়া এবং ২ কোটী পাউণ্ড ব্যয় করিয়াও মালয়ের গেরিলাদিগকে উচ্ছেদের কাজ যখন শেষ হয় না, তখন গত জানুয়ারী মাসে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ পুনরায় সর্ব্বাত্মক অভিযান আরম্ভ করেন। এই অভিযান তিন মাস চলিবার পর এখনও গেরিলা যোদ্ধাদের সংখ্যা ৩ হাজারের উপর বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন—সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রচারে এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, মালয়ের স্বাধীনতা-সংগ্রাম জনসমর্থনবিহীন চীনা কম্যুনিষ্টদের তৎপরতা মাত্র। মালয় এবং সিঙ্গাপুরের শতকরা ৪৩ ভাগ অধিবাসী চীনা এবং তাহারা বৈষম্যমূলক ব্যবহার পাইয়া থাকে। মালয়ের বর্ত্তমান সংগ্রামে এই চীনারা প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে এবং এই সংগ্রামে কম্যুনিষ্টদের প্রভাবও বেশী। কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা যে, ইহা নিছক কম্যুনিষ্টদের

তৎপরতা। সর্ব্বজাতীয় মালয়বাসীর দুর্দ্দমনীয় স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষা এই সংগ্রামে প্রতিফলিত। জনসাধারণের ঐকান্তিক সমর্থক ব্যতিরেকে কোনও দেশের গেরিলা তৎপরতা অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে না। চীনের গেরিলাদের এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য যে, জন-সমর্থনরূপী জলরাশির মধ্যে গেরিলা যোদ্ধারা মীনের মত বিচরণ করে।

ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জ

স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারের ফলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের খাস তালুক ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় যে কোনরূপ অসঙ্গতি থাকিতে পারে, এই ধারণারসঞ্চার কাহারও মনে হয় নাই। সম্প্রতি হাম্‌বালাহাপ্, গোরিলাদের আকস্মিক তৎপরতায় অত্যন্ত বিস্ময়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। বস্তুতঃ, ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জের বাহিরের চাক্‌চিক্যের অন্তরালে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ প্রবল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তৈয়ারী পণ্যে এখানকার বাজার ভরিয়া গিয়াছে। কোনও শ্রমশিল্প গড়িয়া ওঠে নাই; তৈয়ারী পণ্যের মূল্য যোগান হয় কাঁচা মাল বেচিয়া। ইন্দোনেশিয়ার মুদ্রামূল্য হ্রাস পাওয়ায় ফিলিপাইনের কাঁচা মাল কঠোর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়াছে। আমেরিকার অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রভাবও ফিলিপাইনে পড়িতেছে। কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ। কুইরিণো গভর্ণ-মেণ্টের দুর্নীতির জন্য, মার্কিণ প্রভুদের নিকট উহার দাসসুলভ আনুগত্যের জন্য এবং ভূমিব্যবস্থার সংস্কারে অসম্মতির জন্য অসন্তোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। মধ্য লুজনে কম্যুনিষ্টদের প্রভাবাধীন হাম্‌বালাহাপ্ গেরিলাদের সংখ্যা পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজার বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে। কৃষক শ্রেণীর ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষ ইহাদিগকে নৈতিক শক্তি ও সমর্থন যোগাইতেছে।

ভাঙা দেউলের দেবতার প্রতি

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

ভাঙা দেউলের শিলা বিগ্রহ
শিলায় বাঁধিয়া হিয়া
সাক্ষী দিবারে রয়েছো যুগন্ধর!
যুগে যুগে হল যত নিগ্রহ
ইতিহাস তার নিয়া
সুখে দুখে কাল চলে দ্রুত মন্থর।
সাঁঝের আরতি কখন গিয়েছে থেমে
পুষ্প পত্র অন্নসত্র আমার নিবেদন
একেকটী করি ইষ্টক খসি নেমে
(আজি) সামান্য মানবে জানায় দেবতার আবেদন।
বাতাস নিথর নারব ঘণ্টা কাঁসি
স্তোত্র মন্ত্র পুরোহিত দ্বারপাল
কোথা ধুপ দীপ আলিপনা দাস দাসী
দেবতার আজি দেহভরা জঞ্জাল।
ধূপ নাই তাই সন্ধ্যা সমীর বুঝি
বন কুসুমের গন্ধ বহিয়া আনে
দীপ নাই তাই জোনাকিরা খুঁজি খুঁজি
দেবতার ঠাঁই পঞ্চ প্রদীপ দানে।
যে করিত পূজা, যে দিল দেউল
মানস করিয়াছিল যে বহুল
পূজার মন্ত্রে হল কোন ভুল
আজ তারা গেল কোথা?
বাদুড়েরা উড়ে, কড়ি ভেঙে পড়ে
উই মাটি তুলে বল্মীক গড়ে
সরীসৃপেরা মাঝে মাঝে নড়ে
গহ্বরে হেথা হোথা।
পল্লীর প্রাণ কোথা ভগবান
পল্লীর গান কোথা?
ভাঙা দেউলের ভগ্ন দেবতা
এখনো কি কোনো ক্ষণে
সেই সেদিনের উৎসব কথা
থেকে থেকে পড়ে মনে?
আজি জনহীন ভূমিতলে লীন
সমতল হ'ল সব
আনন্দ নাই আঁধারের ঠাঁই
আলোকের পরাভব
আরতি সন্ধ্যা আজিকে বন্ধ্যা
নীরব স্তব্ধ গান
ভাঙা দেউলের দেউলে দেবতা
আজি হৃত সম্মান।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

ছয়

২০-এ সেপ্টেম্বর আন্দামানে অবতরণ করিয়া ২৮-এ সেপ্টেম্বরের জাহাজে পোর্টব্লেয়ার হইতে প্রস্থান করি। এই কয়দিনের মধ্যে আন্দামানের যে চিত্রটি সমগ্রভাবে দর্শন করিয়াছি তাহা পরে বলিব, কিন্তু যেজন্য আন্দামানের নাম, সেই বিখ্যাত সেলুলার জেলের (Cellular jail) বিবরণই সর্ব্বাগ্রে দেওয়া উচিত।

২৩-এ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ শুক্রবার সকালে আমরা সেলুলার জেল দেখিয়াছিলাম। এই জেল এবং ইহার সংলগ্ন হাসপাতাল ও কয়েকটি জেলসংক্রান্ত কোয়াটার্স বাড়ী ইট-শুরকীর গাঁথুনী। ইহা ছাড়া সারা পোর্টব্লেয়ারে ইটের গাঁথুনী আর নাই। সমস্তই কাঠের; কাঠের মেঝে, কাঠের দেওয়াল, কাঠের চাল (Shingles)। শুনিলাম এই জেল-তৈরীর জন্য সমস্ত ইট এবং লোহা আজ হইতে প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে জাহাজে করিয়া কলিকাতা হইতে ভারত সরকারের অর্থে বহন করিয়া আনা হইয়াছিল এবং এইভাবে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়াছিল, তাহা ভারতের দেনারূপে ইংরেজের খাতায় পাওনা লেখা হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত আমরা সেই দেনার দায়ে প্রতি বৎসর ইংরাজকে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড সুদ দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

সেলুলার জেলটির নামকরণ হইয়াছে ইহার গঠন-প্রণালী হইতে। এই জেলে কয়েদীদের প্রত্যেকের জন্য এক একটি স্বতন্ত্র কক্ষ আছে। জেলের জায়গাটি সমুদ্রের উত্তর। ইহার একধারে সমুদ্র, অপরদিকে হাসপাতাল। হাসপাতালের সম্মুখে জেলে যাইবার পথের অপর পার্শ্বে বিখ্যাত জিমখানা গ্রাউণ্ড। এই ময়দানের সম্মুখে জিমখানা ক্লাব। এই ক্লাবের বারাণ্ডা হইতে ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ময়দানে সমবেত পোর্টব্লেয়ারবাসীর নিকট বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই জেলখানার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া নেতাজী যে ফটো উঠাইয়াছিলেন, সেই আলোকচিত্র সংবাদপত্রের মারফৎ ভারতের সমস্ত সংবাদপত্রপাঠক অবশ্যই দেখিয়াছেন।

জেলের প্রধান ফটক দিয়া জেলের ভিতর প্রবেশ করিলে দক্ষিণদিকে জেলের অফিস, বামদিকে জেলের গুদাম ঘর পড়ে। এই গুদাম ঘরে নানা আকারের হাতকড়ি, বেড়ী, ফাঁসী-কাষ্ঠের দড়ি এবং মানুষকে যন্ত্রণা দিবার নানারূপ যন্ত্রপাতি আছে। দক্ষিণদিকের অফিস ঘরে জেলার সাহেবের কেরাণী। সেই কেরাণীর মারফৎ জেলার সাহেবের নিকট হইতে জেল দেখিবার অনুমতি আনাইয়া তবে জেলের ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। ঠাকুরদাসবাবুর সহিত আমরা তিনজনে এই অফিস ঘরে গিয়া নাম সহি করিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইলাম। ঠাকুরদাসবাবুর পরিচিত জেলের কেরাণীবাবু আমাদের গাইডরূপে সঙ্গে সঙ্গে জেল দেখাইবার জন্য ভিতরে চলিলেন।

জেলখানার প্রশস্ত উঠান য়া ভিতরে ঢুকিয়া সম্মুখে কারখানার ন্যায় ছোট একটি টিনের চাল দেখা যায়। উহা জেলখানার কামারশালা। ঐখানে হাতকড়ি ইত্যাদি মেরামত করা হয় এবং লোহার বেড়ী ও অন্যান্য নানাবিধ পীড়াদায়ক যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হয়। এই কামারশালা হইতে প্রস্তুত হওয়ার পর এইগুলি জেলের পূর্ব্ববর্ণিত গুদাম ঘরে চলিয়া যায়। এই চালাটি জেলখানার একটি উঠানের উপর ভিতর দিকে অবস্থিত। গেট দিয়া প্রবেশ করিয়া প্রথমেই বামদিকে আছে জেলের রন্ধনশালা। বর্ত্তমানে এই জেলের অধিকাংশ ভাগই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। ইহার এক অংশে সামান্য মাত্র কয়েকজন স্থানীয় কয়েদী আছে, বাকী অংশ সমস্তই খালি। নিচের বারাণ্ডায় কতকটা স্থান পি ডবলিউ ডি'র খালি টিন ও ড্রাম রাখিবার গুদামরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

রন্ধনশালায় বড় বড় গাঁথানো উনান আছে। বহুদিন যাবৎ এই উনানে আগুন জ্বলে নাই, হাঁড়িও চাপে নাই; ইহার সিলিং-এ চামচিকায় বাসা বাঁধিয়াছে। রন্ধনশালার

পরেই ফাঁসীর জায়গা। ফাঁসীমঞ্চে একসঙ্গে তিনজনকে ফাঁসী দিবার ব্যবস্থা আছে। ফাঁসী ঘরে ঢুকিয়া মনে হইল এই ঘরে কত হতভাগ্যই না আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূর দ্বীপে আসিয়া তাহাদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। শুনিলাম এই ঘরে শেষ ফাঁসী হইয়াছে তিনজন ভারতীয়ের। জাপানীরা এই ফাঁসী দিয়াছে ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। বুড়ামুদ্দিন, আকবর আলি এবং মিঃ ব্যানার্জ্জী নামক তিনজন ভারতীয় জাপানীদের অধিকারে আন্দামানের সমুদ্রতীর রক্ষার ভার পাইয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাহাদের উপর সন্দেহ হওয়াতে জাপানীরা তাহাদের গুপ্তচর বিবেচনা করিয়া প্রাণদণ্ড দেয় ও একসঙ্গে তিনজনকে এই ফাঁসীমঞ্চে ফাঁসী দিয়াছিল। এই ফাঁসীমঞ্চের তলায় ফাঁসীর পর দণ্ডিত ব্যক্তির দেহ যেখানে ঝুলিয়া পড়ে, সেই স্থান হইতে দেহটি গ্রহণ করিয়া জেলখানা হইতে দেহটি বাহির করিয়া দিবার জন্য একটি ছোট লোহার গেট আছে, সেই পথ দিয়া বাহিরে দণ্ডায়মান আত্মীয়বর্গের নিকট মৃতদেহ দেওয়া হইত। ফাঁসীমঞ্চের পিছনে আর একটি দরজা আছে, সেই দরজা দিয়া ভিতরে জেলের যে অংশ আছে, সেই অংশে চারিটি cell বা কক্ষ আছে। সেই কক্ষগুলির নাম condemned cell, অর্থাৎ ফাঁসীর হুকুম হইয়া যাইবার পর সেই কক্ষে আসামীরা তাহাদের শেষ কয়টি দিন অতিবাহিত করিত। এই কক্ষ হইতে শেষদিনে বাহির হইয়া হাঁটিয়া ফাঁসীর ঘরে যাইতে আসামীদের পাঁচছয় মিনিট সময় লাগিত। আমাদের গাইড বলিলেন, ইহাই আসামীদের last journey। যে পথ দিয়া আসামীরা শেষ হাঁটা হাঁটিত, সেই পথ দিয়া আমরা হাঁটিয়া আসিলাম, আশ্চর্য্য সকলেই আমরা কেমন যেন স্থির স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলাম।

ফাঁসী কক্ষের ব্যবস্থা ভারতের অন্যান্য স্থানেও যেরূপ, এখানেও সেইরূপ। ঘরের মেঝেটি উঁচু, সেই মেঝের মধ্যভাগে দুইখানি তক্তা মুখে মুখে লাগানো আছে। সেই তক্তাগুলির তলায় প্রায় দশ ফিট গর্ত্ত, যেন একটি বড় চৌবাচ্ছার উপর কাঠের ঢাকা দিয়া ঢাকার উপরিভাগটি ফাঁসী কক্ষের মেঝে হইয়া আছে। এই তক্তার উপর আসামীকে দাঁড় করাইয়া তাহার দুইটি হাত পিছন দিকে বাঁধিয়া ও গলায় আল্‌গা করিয়া একটি দড়ির ফাঁসে লাগাইয়া সেই দড়িটি উপরের আড়কাঠের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তারপর সময় হইলে Hangman বা ফাঁসীদানকারী ঘরের পার্শ্বে অবস্থিত একটি লোহার হাতল টানিয়া দেয়। হাতলটি টানিলেই দুইখানি তক্তা এক নিমেষে সরিয়া যায় এবং আসামী ঝুপ করিয়া ঐ চৌবাচ্ছার ন্যায় গর্ত্তের ভিতর ঝুলিয়া পড়ে। সরিয়া-যাওয়া তক্তা দুইখানি আবার আস্তে আস্তে পূর্ব্ববৎ ফিরিয়া জোড়া লাগিয়া যায়। এইরূপে ফাঁসীতে ঝুলিয়া মৃত্যু হইতে এক আধ মিনিট সময় লাগে। এই মৃত্যু শ্বাসবন্ধ হইবার জন্য ঠিক হয় না, ইহাতে শিরদাঁড়ার সর্ব্বোচ্চ 'Atlas' নামক হাড়খানি ভাঙ্গিয়া যায় ও আসামীর মৃত্যু হয়। যতক্ষণ না মৃত্যু হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দড়িটি অল্প অল্প কাঁপিতে থাকে, তারপর দড়িটি স্থির হইয়া যায়। নিয়ম অনুযায়ী একজন ডাক্তার পনর মিনিট পরে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গিয়া সেই দেহটিকে ঝোলানো অবস্থাতেই পরীক্ষা করিয়া death certificate দেন। তখন দড়ি খুলিয়া মৃতদেহটি বাহির করা হয়। ফাঁসীর মৃত্যুতে শবদেহ বড় বিভৎস আকার ধারণ করে। আসামীর চোখ ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসে, জিহ্বা বাহির হইয়া পড়ে এবং দাঁত দিয়া জিব কামড়াইয়া ফেলার ফলে জিব কাটিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। সময় সময় নাক, কান ও চোখ দিয়া রক্ত পড়ে এবং আসামী মলমূত্র ত্যাগ করিয়া ফেলে। পায়ের পাতাগুলি পায়ের সহিত সরল রেখায় ঝুলিয়া পড়ে। দেশের নামে আদর্শের জন্য এইরূপ বিভৎস মৃত্যু সারা পৃথিবী জুড়িয়া শত শত স্বদেশবৎসল মহাপ্রাণ যুবক স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছেন এবং আজও করিতেছেন। জানি না, কবে সেই মহাপুরুষ আসিবেন যিনি এই প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থাকে বন্ধ করিবেন। ভাবিয়াছিলাম, মহাত্মা গান্ধী অহিংসার নামে এই কাজ করিতেও পারেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, তিনি নিজেও গোহত্যা বন্ধ করেন নাই, তাহার শিষ্যবর্গও গডসেকে ফাঁসী দিতে দ্বিধা করিলেন না। গান্ধীজীর অহিংসা কেবল প্রার্থনা সভার বক্তৃতাতেই নিবদ্ধ রহিল, কলিযুগের এই অহিংসাবাদ কেবল ক্ষত্রিয়কে শূদ্র করিয়াই ফেলিল, তাহাকে ব্রাহ্মণ করিতে পারিল না, হয়ত ক্ষাত্রধর্ম্মও নষ্ট হইতে পারে।

ইতঃপূর্ব্বে অন্যান্য জেলে অনেকগুলি ফাঁসীর মঞ্চই

দেখিয়াছি, প্রতিবারেই অন্তর কেমন ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। এবারও সেইরূপ হইল, কিম্বা হয়ত একটু বেশী করিয়াই স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। ফাঁসী কক্ষ হইতে বাহির হইয়া এবার জেলের ঘরগুলি দেখিতে চলিলাম। লক্ষ্য করিলাম যে, দলের মধ্যে এক গাইড্ ছাড়া আর কেহই কোন কথা কহিতেছিলেন না, সকলেই যেন কি এক অব্যক্ত কারণে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সাত

সেলুলার জেলের নক্সাটি কাগজে আঁকিয়া দিলে তবে উহা সহজে বুঝা যায়। আন্দামানের এই জেলের গঠন অনেকটা মুঙ্গের জেলের মত।

মনে করুণ একখানা চারিতলা সমান উঁচু মনুমেণ্ট আছে। ঐ মনুমেণ্টের উপরিভাগে সমতল চবুতর। গরুর গাড়ীর চাকার ধুরার সহিত যেভাবে কোয়াগুলি (Spokes) আবদ্ধ থাকে, মনে করুণ ঐ মনুমেণ্টের সহিত সেইভাবে সাতটি সারি আবদ্ধ আছে। এক এক সারিতে আছে পাশাপাশি অনেকগুলি করিয়া cell এবং তাহাদের সম্মুখে আছে প্রশস্ত বারাণ্ডা, প্রত্যেক সেলের উঁচুতে একটি করিয়া ছোট জানালা এবং সম্মুখে একটি করিয়া লোহার এক পাল্লা দরজা। দেওয়ালের ভিতর দিয়া সেই দরজায় তালা দিবার ব্যবস্থা আছে। এক একটি cell বা কক্ষ ছয় ফিট প্রশস্ত ও নয় ফিট দীর্ঘ। এই সেলের দরজার দিকে কয়েদী কম্বল পাতিয়া শয়ন করিত, জানালার দিকে নর্দ্দামা, সেইখানেই সে মলমূত্র ত্যাগ করিত। নখ কাটা, দাড়ি কামাইবার কোন আয়োজনই ছিল না; শিক্ষালাভ জ্ঞানদান, মায়া মমতা ভালবাসার নামমাত্রও ছিল না, কোনরূপে প্রাণধারণের উপযোগী আহার, একটি সঙ্কীর্ণ কক্ষে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া সেইখানেই ভোজন-শয়ন-নিদ্রা, মানুষকে রাজশক্তি এইরূপে পশুর পর্য্যায়ে নামাইয়া নিজেদের সভ্য ও শিক্ষিত বলিয়া গর্ব্ববোধ করিত এবং এখনও এই অমানুষ বর্ব্বর ব্যবস্থার আমূল সংশোধন করিবার কোন আয়োজনই কোথায় দেখা যাইতেছে না। পৃথিবীর এই পুঞ্জীভূত পাপ ও গ্লানি, মানবত্বের উপর এই প্রবল অত্যাচারই বোধ হয় আজও পর্য্যন্ত পৃথিবীতে শান্তির অন্তরায় হইয়া মানুষকে নিরন্তর যুদ্ধ ও ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দিতেছে। সেগুলি দেখিয়া মনে পড়িয়া গেল রবীন্দ্রনাথের অমর বাণী

মানুষ কেন যে মানুষের প্রতি
ধরে আছে হেন যমের মুরতী—

আন্দামানের সেলুলার জেল তিন তলা বাড়ী। মধ্যখানের গম্বুজের উপর সারাদিন রাত্রি পাহারা থাকিত এবং স্থানটি এমনই যে, এখান হইতে সমস্ত জেলের সর্ব্বত্রই দৃষ্টিগোচর হয়। কোথাও কোন কয়েদী পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলে এই স্থান হইতে সমস্তই দেখা যায় এবং এখান হইতে ঘণ্টা বাজাইয়া সকলকে সজাগ করা হয়।

এই গম্বুজের নীচে আর একটি জিনিষ দেখিলাম। উহা অপরাধীকে বেত্রাঘাত করিবার যন্ত্র। উহার আকার অনেকটা ক্রুশের মত লোহার তৈরী। উহার উপর অপরাধীকে দাঁড় করাইয়া তাহার পা এবং হাত লোহার ফ্রেমে আটকাইয়া দিয়া চামড়ার বেত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া এক এক ঘা করিয়া আঘাত করা হইত। ঐ সময় অপরাধীকে ব্যাণ্ডেজের কাপড়ের মত এক অতি পাৎলা কাপড় এক পরদা মাত্র পরাইয়া দেওয়া হইত। আসামীর মুখ যেখানে থাকিত সেখানে হাত দিয়া মনে হইল এখনও সেখানে কত হতভাগ্যের চোখের জল, মুখের লালা বোধ হয় যেন জমাট হইয়া আছে। শুনিয়াছি হিন্দু মহাসভার নির্ব্বাচন বোর্ডের বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী মহাশয় এইখানে এইরূপে আবদ্ধ হইয়া বেত খাইয়াছিলেন। পাঁচ, দশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ এমন কি একশ ঘা পর্য্যন্ত বেত এইভাবে দেওয়া হইত। প্রতি ঘা বেতের সহিত আহত স্থানটি দড়ির মত ফুলিয়া উঠিত, সময় সময় রক্ত বাহির হইত। এই বেত লাগাইবার আবার রীতি ছিল। এক ঘা যেখানে পড়িত, অপর ঘা ঠিক তাহার উপর পড়িত না। অনেক সময় পাঁচ সাত ঘা পড়ার পর অপরাধী অজ্ঞান হইয়া যাইত। তখন তাহাকে ফ্রেম হইতে নামাইয়া আহত স্থানে মলম দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। দু' চারদিন পরে আবার আঘাত করা হইত। এইরূপে তাহার পাওনা বেত্রদণ্ড ক্রমে ক্রমে দেওয়া হইত।

এই গম্বুজের নীচে বেত্রদণ্ডের স্থানের পার্শ্বে কয়েদীদের দিয়া নারিকেল ছোবড়ার কাজ করান হইত। কাঠের মুগুর দিয়া নারিকেল পিটাইয়া coir প্রস্তুত করান হইত, বেতের ঝুড়ি, টুক্‌রী, চেয়ার ইত্যাদি করানো

হইত। বান্ধবহীন দ্বীপে বাংলার কত ছেলে এইভাবে তাহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় এখানে ছোবড়া টিপিয়া, বেত বুনিয়া অতিবাহিত করিয়াছেন তাহার হিসাব কে দিবে ?

সেলুলার জেলের যে সাতটি শ্রেণীবদ্ধ ত্রিতল কক্ষমালা ছিল, তন্মধ্যে যে সারিতে বাংলার বিপ্লবীগণ বাস করিতেন সেই ঘরগুলি এখন আর নাই। যুদ্ধের সময় বোমার আঘাতে তাহা ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ সাতটি শ্রেণীর দুইটি শ্রেণী ভাঙ্গা হইয়াছে। কতক গিয়াছে যুদ্ধের বোমায়, কতক স্বাধীন হওয়ার পর এই কুখ্যাত জেলকে ভাঙ্গিবার পরিকল্পনায়। অবশিষ্ট অংশ আর ভাঙ্গা হয় নাই। তৈরী বাড়ী ভাঙ্গিয়া লাভ নাই, কিছু অংশ ভাঙ্গার পর কর্ত্তাদের এই ' সুবুদ্ধি উদয় হওয়ায় ইহা রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই জেলের অঙ্গনে সমুদ্রের তীরের উপর ছোট একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমবাংলার মন্ত্রী মাননীয় শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি মহাশয় যখন এখানে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি এই স্মৃতিস্তম্ভ বীর সহিদগণের উদ্দেশ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। সমুদ্র তাহার অবারিত বায়ু এই স্মৃতিস্তম্ভের উপর অহর্নিশ বীজন করে, আর ইষ্টকনির্ম্মিত সেলুলার জেলের প্রাণহীন ত্রিতল কক্ষশ্রেণী অপলক দৃষ্টিতে স্মৃতিস্তম্ভের দিকে চাহিয়া চাহিয়া পূর্ব্ব-পরিচিত সেই সমস্ত অমর হতভাগ্যদেরই হয়ত বা স্মরণ করে। (ক্রমশঃ)

পূর্ব্ববঙ্গের শরণার্থী সমস্যা (২)

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব্ববঙ্গ সমস্যা উপলক্ষ করিয়া প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর উপর্য্যুপরি দুইবার কলিকাতায় আগমন সারাদেশে নানা জল্পনা কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে আবহাওয়া যেরূপ উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে পাকিস্তানের সহিত ভারতের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ অনেকে অনিবার্য্য বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন। বার বার অন্যায় সহ্য করিতে বাধ্য হইয়া যাহারা ভিতরে ভিতরে মরিয়া হইয়া উঠিতেছিলেন, জোড়াতালি দিয়া সমস্যা ঝুলাইয়া রাখা আর তাঁহাদের পছন্দ হইতেছিল না। এই অবস্থার লোকের সংখ্যাও যথেষ্ট। কলিকাতায় পণ্ডিত নেহেরুকে দুইবারই ইহারা বহু আশা লইয়া প্রাণ খুলিয়া সম্বর্দ্ধনা জানাইয়াছেন।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই আশা ব্যর্থ হইয়াছে। কংগ্রেসের চিরাচরিত তোষণনীতির ফলে মুসলীম লীগ অস্বাভাবিক অবস্থার ভিতর দিয়া বিস্ময়কর পরিণতি লাভ করিয়াছে। লীগের দুই জাতিতত্ত্ব মানিয়া না লইয়াও কংগ্রেস ইস্লামিক রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনে সম্মতি দিয়াছে। এবারও ভারতের কংগ্রেস-সরকার পাকিস্তান কর্ত্তৃপক্ষের সুমতির উপর বাজী ধরিয়া পাকিস্তানের দুই কোটি হিন্দুর ভাগ্য এবং ভারতের বিশেষ করিয়া পশ্চিমবাংলার আর্থিক ভবিষ্যত লইয়া জুয়া খেলিলেন। এবার পূর্ব্ব পাকিস্তানে হিন্দুদলন যে সময় প্রশ্নাতীত সত্য প্রমাণিত হইয়াছে, সে সময় পণ্ডিত নেহেরু অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ সক্রিয় প্রতিবাদ জানাইবার পরিবর্ত্তে সংঘর্ষ এড়াইবার যা হোক একটা উপায় সন্ধানে যত্নবান হইলেন। ন্যায় ও সত্যের পথে চলিবার জন্য প্রস্তুতি ও শক্তিসঞ্চয়ের প্রশ্ন বাঙ্গালী বড় করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত নয়, এ অভ্যাস থাকিলে প্রবলপ্রতাপ ইংরেজের বিরুদ্ধে সারা বাংলা জুড়িয়া সুদীর্ঘ কাল সশস্ত্র বিপ্লব চলিত না। শেষ অবধি পূর্ব্ববঙ্গ পরিস্থিতি লইয়া পণ্ডিত নেহেরু পার্লামেণ্টে যে নির্বীর্য্য ভাষণ দিলেন, তাহাতে হতাশ, দুঃখিত ও বিক্ষুব্ধ হইলেন অনেকেই। এই ভাষণে হতভাগ্য আশ্রয়প্রার্থীদের ভারতে অতিথিসুলভ সুবিধা লাভের প্রতিশ্রুতি ছিল, কিন্তু ইহার মূল কথা হইল 'পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব পাকিস্তান সরকার না লইলে সে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ভারতের সাধ্য নয়।' বলা বাহুল্য, এই মনোভাবের অর্থই হইল মোটের উপর পাকিস্তানের

হিন্দুদের পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে দেখা। এইরূপ হতাশাজনক বিবৃতির পর প্রধান মন্ত্রী একাধিকবার ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহার প্রধান মন্ত্রী থাকার সময় ভারত-সরকারের বৈদেশিক নীতির পরিবর্ত্তন হইবে না। পণ্ডিতজীর এই বিবৃতির পর পাকিস্তানের সহিত ভারতের যুদ্ধসম্ভাবনা তিরোহিত হইল। এই সময় পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি খান পূর্ব্ববঙ্গ সফর করিতেছিলেন।

অতঃপর এই পরিস্থিতির অনিবার্য্য পরিণতি হইল পাকিস্তানের সহিত ভারতের নূতন এক চুক্তি। পাক-প্রধান মন্ত্রী সসমারোহে দিল্লী আসিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সহিত ভারত ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে চুক্তি করিয়া গেলেন। এই চুক্তি সাক্ষরিত হয় ৮ই এপ্রিল, কিন্তু পণ্ডিত নেহেরু ২৮শে মার্চ্চ পার্লামেণ্টে যে বিবৃতি দেন, তাহাতেই এই চুক্তি সম্পর্কে আগ্রহ বহুলাংশে নিবৃত্ত হইয়াছিল।

পূর্ব্ব-পাকিস্তানে অসংখ্য হিন্দুর প্রাণনাশ, হিন্দুদের উপর পাইকারীহারে অত্যাচার, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠন ইত্যাদি অমানুষিক ব্যাপার নির্ব্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হইবার পর পাক-ভারত চুক্তি সম্পন্ন হইল। এই চুক্তিতে জোর দেওয়া হইল বাস্তত্যাগীদের সঙ্গে কিছু টাকা ও গহনাপত্র লইয়া যাইবার অধিকারের উপর। এ ছাড়া বাস্তত্যাগীরা এই বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া আসিলে তাহাদের ঘরবাড়ী প্রত্যর্পণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল। সংখ্যা-লঘুদের স্বার্থসংরক্ষণের বা তাহাদের ভরসা ফিরাইয়া আনিবার জন্য চুক্তিতে পাকিস্তান এবং ভারত উভয় রাষ্ট্রেই মন্ত্রী-সভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা হইল।

এই চুক্তি ভারতের বহু স্থানে, বিশেষ ভাবে পশ্চিম বাংলায় আশানুরূপ সমাদৃত হয় নাই। শান্তি এবং শৃঙ্খলা চায় সকলেই, কিন্তু একথা সকলেই জানে যে শক্তিমান অন্যায়কে পিঠ চাপড়াইয়া শান্ত রাখা যায় না, লোভ তাহার বাড়িয়াই চলে। পাকিস্তানের গণ্ডগোলের মূলে যাহারা আছে, পাক-ভারত চুক্তিতে তাহারা কতখানি দমিত হইবে, সে সম্পর্কেই সন্দেহ সবচেয়ে বেশী। তা ছাড়া এই চুক্তির দ্বারা পাকিস্তানের হিন্দুদের নাগরিক অধিকার পূর্ণ-প্রতিষ্ঠারও কোন ব্যবস্থা হয় নাই। পাক-প্রধান মন্ত্রী পাকিস্তানকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু তবু তিনি ইহার 'ইস্‌লামিক রাষ্ট্র' আখ্যা বাতিল করিয়া দেন নাই। বলা নিষ্প্রয়োজন, ইসলামিক রাষ্ট্রে হিন্দুরা প্রকৃত ও পূর্ণ নাগরিক অধিকার পাইতেই পারে না। চুক্তির চাপে ভারতের মর্য্যাদাও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইহাতে পাকিস্তানের মত ভারতেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হইতে মন্ত্রীগ্রহণের কথা আছে, কিন্তু যে ভারত প্রকাশ্যে ধর্ম্মনিরপেক্ষ, লৌকিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে ঘোষিত হইয়াছে, সেখানে সংখ্যালঘু স্বার্থ বলিয়া পৃথক স্বার্থের অস্তিত্ব ভারত সরকার স্বীকার করিলেন কি বলিয়া? গত মাসে কলিকাতায় নিখিল ভারত শরণার্থী সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ চৈতরাম গিদোয়ানীও এই প্রশ্ন তুলিয়া ভারত সরকারের এইরূপ একটি অমর্য্যাদাসূচক চুক্তিতে অংশগ্রহণের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। পাকিস্তানে হিন্দুদের লাঞ্ছনা ও আশ্রয়প্রার্থী-সমস্যা সম্পর্কে ভারত সরকারের মনোভাব, চুক্তিসম্পাদনের সময় ভারত সরকারের পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূলনীতির প্রশ্ন বিস্মৃতি ইত্যাদি গুরুতর ব্যাপারে ভারতে বিপুল গণবিক্ষোভ যে দেখা দিয়াছে, তাহার সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ প্রমাণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা হইতে বাংলার প্রতিনিধি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর পদত্যাগ। শ্রীযুক্ত নিয়োগীর পদত্যাগের পশ্চাতে বাণিজ্য বিভাগীয় বিশৃঙ্খলা একটি কারণ বলিয়া শুনা যায়, তবু বাংলার প্রশ্ন শ্রীযুক্ত নিয়োগীর পদত্যাগ নিঃসন্দেহে দ্রুততর করিয়াছে। পদত্যাগের পর ডাঃ মুখোপাধ্যায় পূর্ব্ববঙ্গ সমস্যা সম্পর্কে ভারত সরকারের দ্বিধাজড়িত দুর্ব্বল মনোভাব এবং সুস্পষ্ট বলিষ্ঠ নীতির অভাব বিবৃত করিয়া গত ১৯শে এপ্রিল পার্লামেণ্টে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে বাংলা বিভাগের ব্যর্থতাজনিত বেদনা এবং বিক্ষুব্ধ বাঙ্গালীর গভীর মর্ম্মব্যথা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি পার্লামেণ্টে যে ভাবে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাতে ভারত সরকারের পাকিস্তানসংক্রান্ত নীতিতে বহু সদস্যের চাপা অসন্তোষই হইয়াছে ধ্বনিত। পণ্ডিত নেহেরু ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতির কোন প্রতিবাদ করেন নাই, ডাঃ মুখোপাধ্যায় যে চ্যালেঞ্জ দিয়াছেন, তাহা এইভাবে নীরবে মানিয়া লইয়া

পাক-ভারত চুক্তির সম্পূর্ণ দায়িত্ব পণ্ডিত নেহেরু আপন স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন। অতঃপর পাকিস্তান যদি পুনরায় কোন অন্যায় সাধনে প্রবৃত্ত হয়, সেজন্য নৈতিকভাবে পণ্ডিত নেহেরুই দায়ী হইয়া রহিলেন।

পাক-ভারত চুক্তির ফলে ভারত সরকার পাকিস্তানকে আর একবার আত্মরক্ষার সুযোগ দিলেন বলিয়াও অনেকে বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন। ইহাদের মতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই রাষ্ট্র যখন দুষ্টক্ষত রূপে প্রমাণিতই হইয়াছে, তখন যতশীঘ্র ইহার পতন ঘটে ততই মঙ্গল। এই দিক হইতে দেখিতে গেলে হিন্দু লাঞ্ছনার ফলে পাকিস্তান আত্মহত্যার পথ তৈয়ারী করিয়াছিল, এই অনুকূল পরিস্থিতিতে যুদ্ধ বাধিলে হয়তো আবার খণ্ডিত ভারত জোড়া লাগিত। যুদ্ধ না হইলে অন্য উপায় পাকিস্তানের আর্থিক পতন। পাকিস্তান ভারতের উপর বহু ব্যাপারে নির্ভরশীল, কাজেই সাম্প্রতিক গোলমালে ভারতের সহিত পাকিস্তানের লেন দেন বন্ধ হইয়া যাওয়ায় পাকিস্তানে সৃষ্টি হইয়াছিল এক অচল অর্থনৈতিক অবস্থার এবং দুর্ভিক্ষ প্রায় অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। সাধারণ দেশবাসী অর্থাভাবে এত কষ্ট পাইতেছিল যে হয়তো আর কিছুদিনের মধ্যে পাকিস্তানে দেখা দিত গুরুতর আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা। ভারত পাটগ্রহণ বন্ধ রাখিয়াছিল বলিয়া পাকিস্তানের পাটের দাম অভাবিত ভাবে পড়িয়া যায় এবং পাটের দরুণ পাকিস্তানের প্রায় ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবার উপক্রম হয়। আরমাত্র তিন মাস পরে নূতন পাট উঠিলে মজুত পাট কি হইত? শুধু পাটের হিসাবেই পাকিস্তান সরকার ইতিমধ্যে দেড় কোটি টাকা শুল্ক-ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন। এছাড়া ভারত হইতে কয়লা, কাপড়, সিমেণ্ট, লোহা ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ না পাইয়া এবং ভারতে তূলা, চামড়া, খাদ্যশস্য, পাট ইত্যাদি বেচিতে না পারিয়া পাকিস্তানের পণ্যবাজারে তীব্র মন্দা সঞ্চারিত হইয়াছিল এবং জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা নিঃশেষপ্রায় হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় পণ্যাদির মূল্য অত্যন্ত কমিয়া যাইতেছিল। পাকিস্তান পণ্যবাজারের এই সঙ্কটময় অবস্থার দুর্লভ সুযোগ হাতের কাছে পাইয়াও ভারত সরকার যে গ্রহণ করিলেন না, ইহাতেও অনেকেই বিস্মিত ও হতাশ হইয়াছেন। পাক প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক চুক্তির ভিতর দিয়া পাক-ভারত বাণিজ্য পুনরায় চালু হইবার ব্যবস্থা হওয়ায় প্রকারান্তরে ইহাতে পাকিস্তানেরই জয় হইয়াছে বলা চলে। কাগজী চুক্তিপত্র পাকিস্তানের আতঙ্কিত এবং বহুলাঞ্ছিত হিন্দুদের পাকিস্তানে আটকাইয়া রাখিবে না, একথা পাক-প্রধানমন্ত্রী ভাল করিয়াই জানেন, জিনিষ ও গহনাপত্র লইয়া আসিবার অধিকতর সুবিধা পাইয়া হিন্দুরা এখন দলে দলে ভারতে চলিয়া আসিবে এবং পাকিস্তানে মুসলিম আধিপত্য হইবে নিরঙ্কুশ।* ভারতের শাসনব্যবস্থা উন্নততর বলিয়া ভারত হইতে বেশী মুসলমান সম্ভবতঃ পাকিস্তানে যাইবে না। কাজেই এই চুক্তির ফলে ভারতে যখন আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা ব্যাপকতা লাভ করিবে এবং সেই সমস্যার চাপে পশ্চিম বাংলা ও আসাম সমেত সমগ্র ভারতবর্ষ বিপন্ন হইবে চরমভাবে, হিন্দুদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হাতে পাইয়া এবং সব দিক হইতে সমুন্নত অসংখ্য হিন্দুর কর্ম্মসংস্থান সমস্যার দায়িত্ব হইতে রেহাই পাইয়া পাকিস্তান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দিকে আগাইয়া চলিবে।

অবশ্য কি হইলে ভাল হইত একথা আলোচনা করিবার অধিকার যেমন আমাদের নিশ্চয়ই আছে, যাহা ঘটিয়াছে তাহার সর্ব্বাধিক সুফল কি ভাবে পাওয়া যায় সে সম্পর্কে সচেষ্ট হওয়ার দায়িত্বও আমাদের লওয়া উচিত। দিল্লী-চুক্তিকে কার্য্যকরী করিতে হইলে পাক-ভারত সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রয়াস যেমন মূল্যবান, তেমনি মূল্যবান পাকিস্তানের জনসাধারণের এবং আমাদের আন্তরিকতার। অবস্থার উন্নতি হইয়া আশ্রয়প্রার্থীরা যাহাতে পাকিস্তানে নিজবাসভূমে ফিরিয়া যায়, তজ্জন্য অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা সকলকেই করিতে হইবে। শরণার্থী সমাগম বর্ত্তমানের মত অবিরাম বাড়িয়া চলিলে সরকার বা কাহারও পক্ষেই সে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ইতিমধ্যেই শরণার্থী-পুনর্বসতি ব্যাপারে সরকারের ক্ষমতা নিঃশেষপ্রায় মনে হইতেছে। কাজে কাজেই এ অবস্থায় ভারতে অনিশ্চিত বা ভিক্ষুকের জীবনযাপন করার এবং আপন আপন শ্রমশক্তি নিয়োগের পথসন্ধানে ব্যর্থকাম হইয়া জীবন সম্পর্কে হতাশ ও চরিত্রভ্রষ্ট হওয়ার চেয়ে পাকিস্তানের চিরপরিচিত জীবনযাত্রার মধ্যে ফিরিয়া যাইবার সুযোগ আশ্রয়প্রার্থীদের নিশ্চয়ই বেশী কাম্য। সর্দ্দার প্যাটেল সম্প্রতি কলিকাতার এক বিবৃতিতে পূর্ব্ববঙ্গের কংগ্রেস কর্ম্মীদের পূর্ব্ববঙ্গে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছেন। সত্যই পূর্ব্ববঙ্গের কংগ্রেস কর্ম্মীরা যদি সেবার মনোভাব ও দায়িত্ব লইয়া সপরিবারে পূর্ব্ববঙ্গে ফিরিয়া যান এবং আশাপ্রদ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে পারেন, নূতন আশ্রয়প্রার্থীর আগমন কমিয়া যাওয়া ছাড়া অনেক আশ্রয়প্রার্থী হয় তো বর্ত্তমানের বিরূপ মনোভাব ত্যাগ করিয়া আবার পূর্ব্ববঙ্গে ফিরিয়া যাইতে সাহস পাইবে।

---

* পাক-ভারত চুক্তির পর হিন্দুদের পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ কমিবার পরিবর্তে বাড়িয়াই চলিয়াছে। গত ২২শে, ২৩শে ও ২৪শে এপ্রিল এইমাত্র তিনদিনে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রায় অর্দ্ধলক্ষ শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দেবুকে দেখিয়া ন্যায়রত্নের বড় ভাল লাগিল।

একটি দল লোকের মাঝখানে থাকিয়া আগে আগে আসিতেছে। সম্মুখে চলমান জীবনের কেন্দ্র-বিন্দুতে যে থাকে সে এমনিভাবে মাঝখানে থাকিয়াও সর্ব্বাগ্রে চলে। যে মুহূর্ত্তে দলটি থামিবে—সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে বৃত্তাকারে ঘিরিয়া কেন্দ্র-বিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত করিবে, অনেক দিন আগের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। আলোচনা প্রসঙ্গে পৌত্র বিশ্বনাথ তাঁহাকে বলিয়াছিল—'এখানে কাজ করবে দেবু।'

বলিয়াছিল—আমার কর্ম্মক্ষেত্র হবে গোটা দেশ। আপনাদের আমলের পল্লীজীবনের সে লক্ষ্মণের গণ্ডী ভেঙে গেছে দাদু—আপনাদের পল্লীলক্ষ্মী রাবণের সোনার হরিণের মায়ায় মুগ্ধ হয়েছে। তাকিয়ে দেখুন জংসন শহরের বাজারের মণিহারির দোকানগুলোর দিকে। সতী-হরণের পালা সুরু হয়ে গিয়েছে—দশমুণ্ড রাবণের এবার ওই ইঞ্জিনেটানা মালগাড়ীর পুষ্পক রথে তিনি চলছেন। রাবণ-বধও হবে, রাক্ষসী মায়া-শক্তি সবই ধ্বংস হবে। কিন্তু তবু আর পঞ্চবটীর শান্ত আশ্রমের মত সে শান্ত পল্লীকে ফিরে পাবেন না। পল্লীর রূপ পালটাবেই। পৃথিবী আজ ছোট হয়ে এসেছে, আপনার পঞ্চগ্রাম ময়ূরাক্ষীর বাঁধের জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে চাইলেও দেশদেশান্তর ছুটে এসে জঙ্গল কেটে তোমার পঞ্চগ্রামকে টেনে বের ক'রে বিশ্বের গতির সঙ্গে বেঁধে দেবে। আর মেঠো পথে নয়—রেলপথে ছুটতে হবে—আকাশ পথে ছুটতে হবে। আমি আপনার মত দীপ্তিমান মহামহোপাধ্যায়ের পৌত্র, আজ আমাকে আমার উপযুক্ত স্থান নিতে হলে সমগ্র দেশের কেন্দ্রে গিয়ে নিতে হবে। এখানকার কাজ করবে দেবু, দেবুর সঙ্গে আরও লোক ক্রমশ আসবে। আসবে দাদু ওই দেবুদের সমাজ থেকে, আরও নিচে যারা আছে তাদের মধ্যে থেকে। আপনার চোখে পড়েছে কি না জানি না—না পড়ে থাকলে একটু ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখবেন—ওরা উঠতে সুরু করেছে। প্রাণের বীজ তাদের ফেটেছে, তার চাড়ে আপনাদের সমাজের পাথরের আঙিনার বুকেও ফাট ধরেছে।

বিশ্বনাথের ভবিষ্যদ্দর্শন ধীরে ধীরে সত্য হইয়া উঠিতেছে। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন ভাবাবেগে উদাস হইয়া পড়িলেন। সীতাহরণ সম্পূর্ণ হইয়া গেছে। সারা পল্লীঅঞ্চল আজ লক্ষ্মীহীন। জংসন শহর দিনে দিনে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছে, উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। দ্রুত তাহার কর্ম্মপ্রবাহ—ট্রেণে—মোটরে—সাইকেলে—গতির সৃষ্টি করিয়া মানুষের চলিবার শক্তিকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। পঞ্চগ্রামের প্রান্তের ময়ূরাক্ষী, ময়ূরাক্ষীর কোলের বন্যা-রোধী বাঁধ জংসন শহরের গতিরোধ করিতে পারে নাই; দেশদেশান্তরের সঙ্গে দ্রুত ধাবমান জংসন শহর পঞ্চগ্রামের মুখে দড়ি পরাইয়া কঠিন মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। দেবু ঘোষ আজ এখানকার অন্যতম নেতা। জংসনের জনতার একটা অংশের বিধানদাতা—কর্ম্মদাতা···নূতন কালে তাহার অভিধান হইয়াছে নেতা। দেবুর যোগ্যতা বাড়িয়াছে, নিঃসন্দেহে সে এখন এ নেতৃত্বের অধিকারী। অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন। বহু আঘাতের গভীরতম বেদনা-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া ন্যায়রত্ন যে অচঞ্চল দ্রষ্টার চিত্ত ও মানসিকতার অধিকারী হইয়াছেন—সে চিত্ত এবং মনও মধ্যে মধ্যে বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়ে। আনন্দ এবং বেদনা দুইই সে বিস্ময়ের মধ্যে আছে। নামহীন পরিচয়হীন এক চারাগাছ বাড়ীর আঙিনার এক কোণে অযত্নের মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়া অকস্মাৎ একদা বর্ণে গন্ধে বিচিত্র ফুল ফুটাইলে যেমন আনন্দ হয়—তেমনি আনন্দ অনুভব করেন। আবার

বেদনাও হয়। পঞ্চগ্রাম পরিত্যাগের সময় যে দেবুকে তিনি দেখিয়া গিয়াছিলেন, সে দেবুকে আজ আর খুঁজিয়া পান না। সে দেবু হারাইয়া গিয়াছে। তাই মধ্যে মধ্যে সংশয় হয়, যে দামগান চারাগাছটিকে তিনি অঙ্গন কোণে অঙ্কুরিত হইতে, বাড়িয়া উঠিতে দেখিয়াছিলেন —এ গাছটি আসলে সে গাছই নয়; কখন কে—গাছটির গোড়াটুকু রাখিয়া মাথা কাটিয়া নাম গোত্রে বিখ্যাত কোন ফুলের গাছের ডাল কাটিয়া জোড় কলম বাঁধিয়া এমন ফুল ফুটানো সম্ভবপর করিয়াছে। এ দেবু তাহার জ্ঞাতি স্বজন—গ্রামবাসী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। শুধু পৃথকই নয়—আত্মীয়তাও ঘুরিয়া গিয়াছে।

পরিবর্ত্তনের মধ্যেই জগৎ চিরনবীন—জীবন প্রবাহ গতির মধ্যেই বাঁধিয়া আছে; সব মানুষই পাল্টায়, দেবুও পাল্টাইয়াছে। বিস্ময় সেখানে নয়। বিস্ময়—দেবু পঞ্চগ্রামের জীবনপ্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্য জীবনপ্রবাহের সঙ্গে মিশিয়া গেল, স্বাদ বর্ণ গুণ সবই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেছে। এই জংসন সহরে তাহাকে আজ মানাইয়াছে ঠিক। পঞ্চগ্রামের জীবন প্রবাহ ছিল—সমতলের হ্রদ হইতে নির্গত জলপ্রবাহের মত। দেবুর জীবন—পাহাড় হইতে ঝরিয়া পড়া জলপ্রবাহের রূপ লইয়াছে। জংসনের পটভূমিতে সুন্দর এবং শোভন। এখানে আসিয়াছে সে স্বাভাবিক গতিতে। গ্রাম হইতে নগরে আসার একটা গতিধর্ম্ম আছে, গুণধর্ম্ম আছে। গ্রাম ঠেলিয়া দেয়—নগর আকর্ষণ করে। বিধবা স্বর্ণকে বিবাহ করিয়া দেবুর আর পঞ্চগ্রামের সমাজে স্থান ছিল না। যুগযুগান্তর হইতে সমাজকে লঙ্ঘন করিয়া মানুষ এমনি ভাবে নগরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। গুণধর্ম্মে যে মানুষ যখনই বড় হইয়াছে—তখনই নগর তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছে। গুণী দেবুকে আজ জংসন আপন প্রয়োজনে আকর্ষণ করিয়া সমাদর করিয়া স্থান দিয়াছে। এ পর্য্যন্তও বিস্ময়ের কিছু নাই। বিস্ময় বোধ হয় একস্থানে। এই দেবুর মধ্যে খুঁজিয়া আগেকার কালের দেবুর কোন চিহ্ন, কোন সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রূপান্তর নয়—এ যেন জন্মান্তর। তাই পঞ্চগ্রামের মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। নহিলে তিনিও তো আজ দেবুর মতই পঞ্চগ্রামের সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া জংসন সহরের প্রান্তে জয়তারার আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছেন; অরুণার সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করার অপরাধ—পঞ্চগ্রাম ক্ষমা করে নাই, সহ্য করে নাই।

ওদিকে সূর্য্য ময়ূরাক্ষীর তীরের বনসন্নিবেশের মাথা ছাপাইয়া উঠিয়া পড়িয়াছে। ন্যায়রত্নের চোখে রোদের ছটা বাজিতেই তিনি সময় সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিলেন। প্রণাম সারিয়া অগ্রসর হইলেন জয়তারার আশ্রমের দিকে।

* * *

দেবু ন্যায়রত্নকে দেখে নাই এমন নয়, দেখিয়াছিল—কিন্তু আজ তাহার কাজ অনেক। শুধু তাই নয়—ঠাকুর মহাশয় সম্পর্কে আগেকার কালের সে মধুর মনোভাবটুকু আর তাহার নাই। সমস্যায় ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশ আজ আর তাহাকে পথের সন্ধান দেয় না। সমস্যাগুলি আজ আর তাহার কাছে একমাত্র ধর্ম্মতত্ত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, জীবন এবং জীবন সমস্যা তাহার কাছে আজ আরও অনেক জটিল। ঠাকুর মহাশয় সেব তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। এই কারণেই দেবু ইচ্ছা করিয়াই ন্যায়রত্নকে এড়াইয়া গেল।

আজিকার প্রাতঃকালের এই জটলা হাটের সমস্যা লইয়া। হাটের সমস্যার পর আছে এখানকার মিলে ও আড়তে ধান বিক্রেতা চাষীদের সমস্যা। তাহার পর আছে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা—কংগ্রেসের মধ্যে দলে দলে বিরোধের সমস্যা।

হাটে কিছুদিন হইতেই একটা গোলমাল চলিতেছে। হাট জমিদারের। কঙ্কণার বাবুরা জমিদার। হাটের প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই দুই দফা করিয়া তোলার ব্যবস্থা আছে। এক দফা তোলা জমিদারের সরকার তুলিয়া থাকে, অন্য দফা লইয়া থাকেন জয়তারা আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত সেবায়েত। তরকারীর হাটে তরকারী লওয়া হয়—অন্যান্য জিনিষের কারবারীরা পয়সা দিয়া থাকে। যাহার যেমন কারবার সে তেমনি দিয়া থাকে। হঠাৎ জমিদার তরকারীর তোলা তুলিয়া দিয়া নগদ পয়সা খাজনার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং অন্যান্য কারবারীদের পয়সার হার বাড়াইয়া দিয়াছেন। দুই পয়সা, চার পয়সার স্থলে চার পয়সা দুই আনা ধার্য্য

করিয়াছেন। কাপড় গামছা, মনিহারী, খাবারের দোকানদারেরাই এই চার পয়সা দুই আনা খাজনার আওতায় পড়িয়াছে। তরিতরকারী বিক্রেতাদের খাজনা ধার্য্য হইয়াছে—এক পয়সা হইতে চার পয়সা, যে-যেমন কারবারী। এই সব সাধারণ পণ্য ছাড়াও এখানকার হাটে আজকাল আরও অনেক রকম জিনিষপত্র আসিতে সুরু করিয়াছে। শিবকালীপুরের গিরিশ ছুতার লইয়া আসে কিছু কিছু কাঠের আসবাব, ছোট ছোট জলচৌকী, লক্ষ্মীর সিংহাসন, পিঁড়ি, দীপগাছা অর্থাৎ কাঠের আসবাব, পলকা দেবদারু কাঠের ট্রে, বারকোষ, মুড়ি চাল ভাজিবার কাঠের হাতা, দুই একখানা সস্তা কাঠের চেয়ার টেবিলও থাকে। তামাকওয়ালা আসে, লোহার জিনিষপত্র লইয়া জন দুই হিন্দুস্থানী কামারও বসিতে সুরু করিয়াছে। মুরগী হাঁসেরও আমদানী হয়। কখনও কখনও দুমকা অঞ্চল হইতে শাল কাঠের গুঁড়ি এবং গরুর গাড়ীর ধুরো বা লিথে লইয়া গাড়ী আসিয়া জমে, শালপাতা বোঝাই গাড়ীও আসে প্রচুর। ইহাদের সঙ্গে ধানচালের কারবারীরা টাকা পয়সার থলি লইয়া সারিবন্দী বসিয়া থাকে, আশপাশের পল্লীর লোকেরা গামছায় বাঁধিয়া চাল লইয়া আসে—বিক্রী করিয়া সেই পয়সায় হাট করিয়া ফিরিয়া যায়। এখানে জমিদার খাজনার হার করিয়াছেন—দুই আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত। খাজনার হার ডবলেরও বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। এই লইয়া একটা জটলা আগে হইতেই চলিতেছিল, মধ্যে কয়েকদিন হিন্দু-মুসলমান বিরোধ লইয়া চাপা ছিল। আজ হাটবার, ভোর হইতেই জটলাটা নূতন করিয়া পাকাইয়া উঠিয়াছে। নূতন করিয়া ভোর বেলাতেই দেবু নিজেই উঠিয়া গিরীশ ছুতারের গাড়ীর কারখানায় আসিয়া কয়েক জনকে ডাকিয়া স্থগিত আলোচনাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে।

—ব্যাপারটাকে তোমরা এইভাবে ধামা চাপা দেবে গিরীশ?

গিরীশপ্রমুখ ব্যবসায়ীরা ব্যাপারটাকে মানিয়া লইতে চায় না, কিন্তু হাঙ্গামা করে কে? এই কারণেই কথাটা আর তুলিতে চায় নাই। দেবু কয়েকদিন আগে থাকিতেই কথাটা পাড়িয়াছে। আজ গিরীশকে খোঁচা দিয়া বলিল—ছি ছি ছি। তোমরা এ সব ধুয়ো তোল কেন? আমাকে জড়াও কেন?

গিরীশ বলিল—বস ভাই মাষ্টার, বস।

—না—বসব না। কাজের কথা বলতে এসেছিলাম। বলে চলে যাচ্ছি। আর তোমাদের কোন ব্যাপারে আমি থাকব না।

গিরীশ হাসিল। বলিল—রাগ করো না। বস, চা খাও।

—না। কি বলছ, বল?

—বলব আর কি? তোমার তো এতে কোন স্বার্থ নাই, আমাদেরই ভালোর জন্যে বলছ, তা' ডাকছি সকলকে। কিন্তু আসল লোক যে চলে গেলেন—তার কি?

—একজন গেছেন, একজন আছেন! স্বর্ণ রয়েছে, সে সব তাতেই রাজী আছে।

—স্বর্ণ আছে কিন্তু তিনি থাকলেই ভাল হ'ত।

অর্থাৎ অরুণা।

কথাটা বলিবার হেতু আছে। হাটের খাজনার হার লইয়া গণ্ডগোল সৃষ্টির মূলে ছিল অরুণা। একটা ছোট ঘটনা। অরুণা এবং স্বর্ণ এখানে বয়স্কা মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইবার একটা আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল। আন্দোলনটির উদ্দেশ্য কতখানি রাজনৈতিক, কতখানি মানবসেবামূলক—সে কথা বলা কঠিন। তবে দুইই আছে ইহাতে সন্দেহ নাই। অরুণা এবং স্বর্ণ প্রকাশ্যে না হইলেও গোপনে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাহাদের জীবনের কর্ম্মে ভাবনায় রাজনৈতিক ভাববাদ—নদীর জলধারায় নদীগর্ভের মৃত্তিকার গুণাগুণের মত মিশিয়া অবিচ্ছেদ্য হইয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক দলের গোপন আর্থিক সাহায্যও তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। এই আন্দোলনের উপর পুলিশের নজরও পড়িয়াছিল। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র ঘরের মেয়েরা সাড়া দেয় নাই। বলিয়াছিল—কি হবে? ওর চেয়ে যদি একটু আধটু নাচ গান শেখাও মেয়েদের তবে বরং কাজে লাগে। আজকাল আবার নাচ-গান না জানলে বিয়ে হচ্ছে না। সেই কারণেই লেখাপড়ার দিকটা গৌণ করিয়া শেলাই কাটাইয়ের এবং বোনার কাজকে মুখ্য করিয়া আন্দোলনের চেহারাটা পাল্টাইয়া দেয়। তাহাতে ফলও ফলিয়াছে। মেয়েরা অনেকে এ কাছে ঝুঁকিয়াছে। ক্রমে শেলাই-কাটাই-বোনার কাজের সঙ্গে চামড়ার মনিব্যাগ-তৈয়ারীর কাজও প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। ক্রমে এই সব

হাতের কাজ বিক্রী লইয়া একটা সমস্যা দাঁড়াইলে—হাটে একটা দোকান খুলিবার কল্পনা হয়। কিন্তু তাহাতেও সমস্যা দাঁড়ায় হাটে বসিয়া বিক্রী করিবে কে? ছাই ফেলিতে ভাঙা কুলার মত স্বর্ণের ভাই গৌর আছে কিন্তু সে ছাপমারা কংগ্রেসী, শুধু তাই নয়—এ জেলার ষড়যন্ত্রে দণ্ডিত আসামী। তাহার সঙ্গে প্রকাশ্য সংশ্রব রাখা চলিবে না। দেবু সমস্যাটার সমাধান করিয়াছিল—মাটীর পুতুলের কারিগর নলিন ওরফে নেলোকে দিয়া। নেলো পুতুল গড়িয়া শিবকালীপুরেই বিক্রী করিত, মহাগ্রামের হাটে যাইত। কিন্তু কোন মতেই জংসনে আসিত না। দেবু নেলোকে অনেক বুঝাইয়া—রাজী করিয়াছিল। নেলোর পুতুল এবং এখানকার মহিলা সংঘের হাতের কাজ লইয়া দোকান খোলার ব্যবস্থা হইল। মধ্যে মধ্যে অরুণা স্বর্ণও গিয়া দাঁড়াইত। দোকানটা জমিয়াও উঠিতেছিল। মনি-ব্যাগ, ছেলেদের জামা এবং নেলোর পুতুলের চাহিদাই বেশী। নেলো-উৎসাহিত হইয়া নূতন নূতন পুতুল তৈয়ারী করিতে-ছিল। হঠাৎ নেলোর পুতুল লইয়া গোল বাধিল। সে দিন নেলো একটা 'ঘাড়-দোলানো-বুড়া' পুতুল তৈয়ারী করিয়া আনিয়াছিল। তেমুণ্ডে বুড়া উপুড় হইয়া বসিয়া হাতে হুকা ধরিয়া আছে, তুলার চুল-দাড়ী-গোঁফ সমেত মাথাটা ঘাড় হইতে দুলিতেছে—যেন তামাক টানিয়া থক্ থক্ করিয়া কাশিতেছে। পুতুলটাকে সামনে বসাইয়া দিয়া মাথাটা একটু নাড়িয়া দিতেই দোকানের সামনে ভিড় জমিয়া গেল। হঠাৎ ভিড় ঠেলিয়া জমিদারের সরকার পাইক একটি ছোট ছেলের হাত ধরিয়া উপস্থিত হইল। ছেলেটি কঙ্কণার বাবুদের বাড়ীর ছেলে। দূর হইতে পুতুলটি দেখিয়া ওটির জন্ম ঝোঁক ধরিয়াছে। সরকার আসিয়াই পুতুলটি তুলিয়া লইয়া বলিল—কত দাম রে?

পুতুলটি বেশ বড়। নেলো দাম স্থির করিয়া রাখিয়া-ছিল—চার আনা। কিন্তু পুতুলটির প্রতি অত লোকের লোলুপ দৃষ্টি দেখিয়া এবং ওই দামী পোষাক-পরা বাবুদের ছোট ছেলেটিকে দেখিয়া বলিয়া বসিল—আট আনা।

সরকার ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিল—আট আনা? সোনার না—মাটীর?

নেলো লজ্জিত হইয়া বলিল—মাটিরই বটে—তবে খাটুনী বুঝুন মশায়। তা ছাড়া—।

—তা ছাড়া?

—বাবুরা যদি দাম না দেবে তো কে দেবে বলুন?

—হুঁ। এ কার ছেলে জানিস? ছোটবাবুর? ব্যারিষ্টারবাবুর—বলিয়া একটা দুআনি ফেলিয়া দিয়া পুতুলটিকে উঠাইয়া লইতে গেল।

দোকানের পিছন হইতে হঠাৎ একটা আধুলি আসিয়া পড়িল—এবং নারী কণ্ঠে কে বলিল—এই নাও আট আনা। আমি নিলাম ওটা।

কাণ্ডটা করিল অরুণা। মুহূর্ত্তে সরকারের প্রসারিত হাতখানা গুটাইয়া গেল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার হাতখানা প্রসারিত হইল, সরকার এবার পুতুলটাকে তুলিয়া লইয়া বলিল—এটা জমিদারের তোলা হিসেবে নিলাম। এবার বাঁ হাতখানা বাড়াইয়া ছুঁড়িয়া দেওয়া দুআনিটা তুলিয়া লইয়া পকেটে পুরিল।

নেলোর মনে ভাবের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। কঙ্কণার বিলাত-ফেরত ব্যারিষ্টারবাবুর ছেলে বলিয়া পরিচয় দিতেই তাহার মনে দামের প্রশ্নটা ছোট হইয়া গয়াছিল; ব্যারিষ্টার-বাবুর ছেলে কলিকাতায় থাকে—কত বিচিত্র পুতুল সে দেখিয়াছে—কিনিয়াছে—ভাঙিয়াছে; সে তাহার পুতুল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে—ইহা অপেক্ষা তাহার গৌরব আর কি হইতে পারে। সে ভাবিতেছিল—পুতুলটাকে খোকাবাবুর হাতে দিয়া বলে—এটা আপনি নিয়ে যান খোকাবাবু! দাম চাই না আমার! ঠিক এই মুহূর্ত্তেই ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল না কি বলিবে।

তাহাকে কিছু বলিতে হইল না, বলিল অরুণা। অরুণা বলিল—তোলা হিসেবে নেবেন?

—হ্যাঁ। বেগুনের দোকানে বেগুন—মুলোর দোকানে মুলো—তোলা নেওয়া হয়—পুতুলের দোকানে—

কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই অরুণা পাশের কাপড়ের দোকান হইতে একখানা দামী তাঁতের কাপড় তুলিয়া বলিল—এর দোকানের তোলাটা তা' হ'লে ধরুন। নিন।

কথার তর্ক তুলিয়া ব্যাপারটা এত শীঘ্র অমন জমাইয়া তোলা যাইত না। কাপড়ের দোকানী—হাঁ—হাঁ করিয়া উঠিল। শুধু কাপড়ের দোকানীই নয়—আরও দোকান-দারেরা মুহূর্ত্তে দল বাঁধিয়া গেল। কে একজন বলিল—চালাকী না কি?

সঙ্গে সঙ্গে সবাই প্রায় বলিয়া উঠিল—ও সব চলবে না!

সরকার ধীরে ধীরে পুতুলটি নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। ছেলেটিও হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। কান্নাকাটি দূরে থাক একটা কথাও বেচারা বলিতে পারিল না। শুধু বিচিত্র দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সকলের দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল।

ঠিক পনের মিনিট পরে হাটের মধ্যে একটা ঢেঁরা বাজিয়া উঠিল।—আগামী হাট থেকে নতুন ক'রে খাজনা ধার্য্য হবে। সেই হারে খাজনা না দিলে হাটে কাউকে বসতে দেওয়া হবে না।

ঘোষণা হইয়া গেল।

* * *

সুযোগটা সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের তরফ হইতে দেবু গ্রহণ করিল। কিছুদিন হইতে জীবনটা যেন স্তিমিত হইয়া পড়িতেছিল। কোথাও কোন উত্তেজনা নাই, জীবনে কোথাও সংঘর্ষ নাই, শীতের ময়ূরাক্ষীর শীর্ণ স্রোতের মত জীবন চলিয়াছিল। সে দিক দিয়াও দেবুদের দল সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। সামনে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ইলেকসন আসিতেছে—জেলা কংগ্রেস ইলেকসনে প্রতিযোগিতা করিবে, অথচ কোন দিক দিয়া সাধারণ মানুষকে উত্তেজনার প্রভাবে প্রভাবিত করিবার পথ নাই দেখিয়া চিন্তিতও হইয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ সুযোগ আসিয়া গেল।

দেবু হাটের ব্যাপারীদের লইয়া মিটিং করিয়া ফেলিল। সেই সুযোগে আরও একটি দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইল। এখানে ধান-কলের মালিকেরা, ধান চালের ব্যবসায়ীরা ধান কিনিবার সময় 'ঢলতা' বলিয়া মণকরা এক সের হইতে আড়াই সের পর্য্যন্ত একটা বাড়তি অঙ্কে ধান লইয়া থাকে এবং দাম দিবার সময় 'ঈশ্বরবৃত্তি' বলিয়া টাকায় দুই পয়সা হিসাবে কাটিয়া লয়। দেবু হাটের ব্যাপার লইয়া বক্তৃতা দিতে দিতে ওই কথাটাও পাড়িয়া বসিল। ফলও হইল। একটা মিটিংয়েই হাটের ব্যাপারী এবং গ্রাম্য চাষীদের দুইটি দল বেশ দানা বাঁধিয়া উঠিল।

দুইটা ব্যাপার লইয়াই বেশ খানিকটা উত্তেজনার সৃষ্টি হইতেছিল। দেবু প্রভৃতির উৎসাহের সীমা ছিল না। জংসনে হাটের ব্যাপার এবং গ্রামে গ্রামে চাষীদের লইয়া ঢলতা এবং ঈশ্বরবৃত্তির ব্যাপার লইয়া মিটিংয়ের পর মিটিং করিয়া চলিয়াছিল। ইহারই মধ্যে হঠাৎ আসিয়া পড়িল—জয়তারা আশ্রম ও মখদমশাহের দরগা লইয়া হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ। সঙ্গে সঙ্গে সব চাপা পড়িয়া গেল। একটা পাহাড়ী বন্যা আসিয়া যেন স্থানীয় বর্ষণ হেতু নদীর স্বল্প স্ফীত অবস্থাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ভাসাইয়া দিয়া গেল। নদীর স্বল্প স্ফীত অবস্থায় তাহার জলকে বাধা দিয়া ইচ্ছামত খাতে পরিচালিত করিয়া কার্য্যোদ্ধার করা যায়, কিন্তু পাহাড়ীয়া বন্যা যখন আসে তখন সে বাঁধ ভাঙিয়া আপন পথে চলিয়া যায়।

যাই হোক—সে বন্যা চলিয়া গিয়াছে, দেবু আবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে—ব্যাপারটাকে আবার জাগাইয়া তুলিতে হইবে। এখানে হাটের ব্যাপারী সমিতি নাম দিয়া একটা সমিতি গঠন করা হইয়াছিল তাহার সম্পাদক গিরীশ সূত্রধর, সেই কারণেই দেবু গিরীশের কাছে আসিয়াছে। গিরীশ অরুণার কথা তুলিল! অরুণাই এ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করিয়াছিল এবং মহিলা সমিতির ষ্টলের কর্ত্রী হিসাবে সেই হইয়াছিল—ব্যাপারী সমিতির সভানেত্রী।

দেবু বলিল—তিনি তো এখানকার চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর কথা বাদ দিতে হবে। তা ছাড়া—ষ্টল তো তাঁর নিজের নয়। মহিলা সমিতির ষ্টল, মহিলা সমিতি—তাঁর জায়গায় অন্য কাউকে বসাবে। তোমরাও তাঁর জায়গায় অন্য কাউকে সভাপতি কর। তোমরা যদি রাজী থাক—তবে আমি ফলওয়ালা আসান খাঁ পেশোয়ারীকে বলতে পারি। আসান খাঁ কাজের লোক শক্ত লোক।

ইতিমধ্যে কয়েকজনই জুটিয়া গিয়াছিল। তাহারা সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আসান খাঁ!

—হ্যাঁ। আসান খাঁ। দোষ কি হল তাতে?

—দোষ কিছু নাই মাষ্টার—তবে—।

—কি তবে?

—তবে আসান খাঁই হয় তো রাজী হবে না। রাজী হলে আর এক ফ্যাঁসাদে পড়তে হবে।

—আবার কি ফ্যাঁসাদ?

—মুসলমান ব্যাপারীরা ধুয়ো তুলেছে জয়তারার নামে যে তোলা ওঠে—সে তোলা তারা দেবে না। দিতে হ'লে

ওই তোলাকে দু ভাগ করতে হবে। একভাগ যাবে জয়তারার স্থানে, একভাগ দিতে হবে পীর সাহেবের দরগায়। তার চেয়ে আমাদের ওসব হাঙ্গামা না করাই ভাল। বুঝেচ না! জমিদার বেশী খাজনা দাবী করছে—কিছু দিয়ে মিটমাট করে নোব। তবে ভাই—।

কথাটা বলিতে গিয়া থামিয়া গেল গিরীশ, বলিল—রাগ করবে না তো?

দেবু গিরীশের মুখের দিকে চাহিল। কি বলিবে গিরীশ না জানিলেও সে যে কোন অপ্রিয় কথা বলিবে তাহা সে বুঝিয়াছে। মুহূর্ত্তের জন্য ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল তাহার, পর মুহূর্ত্তেই সে কুঞ্চন মিলাইয়া গেল, প্রসন্ন মুখে হাসিয়া বলিল—না—না—রাগ করব কেন? বল, কি বলছ?

—কাজটি ভাই উচিত হয় নি।

—কোন কাজ, বল?

—ছেলের হাত থেকে পুতুলটি কেড়ে নেওয়া।

—ছেলের হাত থেকে তো পুতুল কেড়ে নেয় নি কেউ?

—ঠিক হাত থেকে না—নিলেও ছেলের দৃষ্টি যে পুতুলের উপর পড়েছে—সে পুতুলটাকে মায়ের জাত হয়ে এমন ক'রে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে—কাজটা তিনি ভাল করেন নি। বুঝেচ না! ছেলে-পুলে হয় নি—তাই পেরেছিল তোমাদের মাষ্টারণী—মা হলে পারত' না!

দেবু একটু বাঁকা হাসি হাসিয়া বলিল—ছেলেটি যদি গরীবের হত' গিরীশ, তবে আমি তোমার কথাটা মানতাম। ও ছেলেটি বড়লোকের ছেলে, বাপ জমিদার—ব্যারিষ্টার, মামারাও বড়লোক ব্যবসাদার। ও ছেলে দিন বোধ হয় পাঁচটা টাকার খেলনা হাতে পায়, তার অর্দ্ধেক ভাঙে, কিছু হারায়, কিছু বা ফেলে দেয়। তুমি বোধ হয় জান না, ঘটনার দিন এখান থেকে আট আনা বেশী দাম বলে—পুতুলটাকে ফেলে দিয়ে গিয়ে হাজী সাহেবের মনিহারীর দোকানে নগদ দশ টাকার খেলনা কিনে নিয়ে গিয়েছে ওই বাচ্চা!

গিরীশ ঘাড় নাড়িল। বলিল—সে তুমি যাই বল ভাই। বুঝেচ না মাষ্টার। ও মানতে পারলাম না। ছেলে সে ছেলেই। বড় লোকই হোক, আর গরীব লোকই হোক। শিশুর জাত নাই।

দেবু হাসিল বলিল—একটি মুসলমানের শিশুকে যদি পড়ে থাকতে দেখ ভাই, তুমি তাকে তুলে নিতে পার? মানুষ করতে পার?

গিরীশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—পারা উচিত মাষ্টার। পারি, না পারি সে কথা আলাদা। না পারলে তোমার সঙ্গে একরকম এক হ'য়ে গেলাম আর কি! তুমি বড় লোকের ছেলেকে আলাদা জাত করছ, আমি মুসলমানের ছেলেকে আলাদা জাত করছি।

দেবু একথার উত্তর দিতে পারিল না। উত্তর তাহার আছে। কিন্তু সে থাক। ইহাদের সে কথা মাথায় ঢুকিবে না। অতীত কালের বিশ্বাসকে হৃদয়াবেগের শক্তি দিয়া যাহারা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে—তাহারা এমনি ভাবেই ইতিহাসের পাপচক্রে ঘুরিয়া মরে; মুক্তি তাহাদের হয় না।

এই ব্যাপার লইয়া অরুণাকে এখানে অনেক কথা সহ্য করিতে হইয়াছিল। কয়েকজন ভদ্রমহিলা ইস্কুলে আসিয়া অরুণাকে গালাগাল করিয়া গিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—আপনাকে দেখতে এসেছি। বলি, দেখে আসি আপনি কিসে গড়া!

—মানে?

—পাথর—না—লোহা—না আর কিছু?

—তুমি ছেলের হাত থেকে পুতুল কেড়ে নিয়েছ?

অরুণা বলিয়াছিল—নিয়েছি। আপনার বাড়ীতে কোন ছেলে ঢুকে যদি দামী খেলনা নিয়ে বুকে চেপে ধ'রে—তবে আপনি তাকে খেলনাটা দেন, না কেড়ে নেন?

—বলতে পারি না। তবে নিই যদি, তবু কি সে এ নেওয়ার সমান?

—কেন নয় বলুন তো?

—সে তুমি বুঝতে পারবে না। তোমার যে কোঁক কখনও ফলে নাই।

একজন বলিয়াছিল—সাত জন্ম তোমার ছেলে হবে না।

বেনামী চিঠির তো সংখ্যা ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত অরুণা অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। স্বর্ণকে বলিয়াছিল—স্বর্ণ সত্যিই কি আমি মা নই বলে—বুঝতে পারছি না! সে কাঁদিয়াছিল। স্বর্ণ বলে—এই আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া সে একদিন মৃত বিশ্বনাথকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিল এ কি অবস্থায় তুমি আমাকে ফেলে গেলে? আমি বাঁচব কি নিয়ে?

স্থায়রত্ন যেদিন ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে নামিলেন—সেদিন অরুণা এই কথাটা বলিয়াই তাঁহার পায়ে উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল, বলিয়াছিল—বলুন, আমি বাঁচব কি নিয়ে?

দেবু অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—তা হ'লে আমি চলি ভাই গিরীশ। আমি তা হ'লে দোষে খালাস। এর পর আমাকে দোষ দিয়ো না।

দেবু চলিয়া আসিল। বাড়ী ঢুকিয়া ডাকিল স্বর্ণ!

স্নানের জায়গা হইতে স্বর্ণ উত্তর দিল—চা টিনোনের পাশে রয়েছে প্যানের মধ্যে। ঢেলে নাও। আসছি আমি।

দেবু চা ঢালিয়া লইয়া চুমুক দিতে দিতে ভাবিতেছিল—এই সব মানুষের কথা। মেরুদণ্ডহীন হিমশীতল প্রাণহীন সব। দূর সুদূর অতীতকালের আবহাওয়া ফিরাইয়া আন—ইহারা জাগিয়া উঠিবে, বাঁচিয়া দাঁড়াইবে। হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা বাধাও—ইহারা প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে। ইতিহাসের পাপচক্রের চড়কে পিঠে বান বিঁধিয়া ঘুরপাক খাইতেছে!

ইহাদের বল—জাগিয়া উঠ, চল আজ সব ভাঙিয়া চুরিয়া বিপ্লব বাধাইয়া ইংরাজকে তাড়াইয়া গড়িয়া তুলি নূতন সমাজ, নূতন জীবন,—ইহারা নড়িবে না, ইহারা সাড়া দিবে না। ইহারা মৃত, ইহারা একটা বরফ প্লাবনের তলদেশে চাপা-পড়া শব শ্রেণী!

চোখ তাহার জ্বলিয়া উঠিল!

(ক্রমশঃ)

অবিভক্ত বাংলায় মুসলমান আধিক্যের কারণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

বাংলা ও বাঙ্গালীর জীবন আজ অভিশাপে পরিপূর্ণ। অনন্ত সুষমায় ভরা জন্মভূমি তাহার ত্রিখণ্ডে বিভক্ত। অধিবাসীর মন ধর্মের বিষের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, পানপাত্র কানায় কানায় গরলে ভরা, হিংসা, দ্বেষ, মারামারি, গৃহদাহ, নারীর অপমান, নারী হরণ, বীভৎস অত্যাচার ও ভ্রাতৃ হত্যায় হস্ত কলঙ্কিত। ভগিনী আজ ভ্রাতার নিকটে সঙ্কুচিত, কন্যা দিশাহারা ত্রস্ত। জননী ম্লানমুখী অপমানে ক্ষুব্ধা, ঈশানের বিষাণ বাজিয়া চলিয়াছে দিগন্তে, ডমরুর তাথৈ নৃত্যও অট্টহাসি। ভয়চকিত নরনারী প্রলয় নাচনে বিপর্যস্ত। পিতৃপুরুষের শতস্মৃতিবিজড়িত হাসিকান্নায় ভরা ভদ্রাসন, প্রতিবাসীর ঈর্ষা, অনুকম্পা, স্নেহপ্রীতি সকল কিছু জলাঞ্জলি দিয়া কুলায় ভ্রষ্ট আর্ত্ত পক্ষীশাবক এর ন্যায় পলায়নপর। অপমানে, অন্নাভাবে, অখাদ্য কুখাদ্য ভক্ষণে মৃত্যুপথ যাত্রীর ক্রন্দনে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ।

যখন "দাঁতের...দাঁত" দাঁতের বদলে দাঁত, "চক্ষুর বদলে চক্ষু" নীতি হইয়া দাঁড়ায়, তখন প্রেমও প্রীতির আবহান, মনুষ্যত্বের দাবী বেসুরা বোধ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু শ্মশানেই শব সাধনা সমীচীন। প্রাবৃটের অন্ধকারে দিগন্ত যখন আচ্ছন্ন, আলোকের প্রয়োজনীয়তা তখনই খুব স্বাভাবিক। রুদ্রের রুদ্র প্রকাশ যখন চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত, ভয়ার্ত্ত অন্তরে মঙ্গলময়ের প্রসন্নদৃষ্টির এষণায় মন তখনই ব্যাকুল হইবার কথা।

প্রশ্ন আসে মনে মুসলমান রাজশক্তির এতদূরে, কেন্দ্রের এত পশ্চাতে ঢেউএর প্রচণ্ডতা বেশী হইল কেন? কত শত তুরুক, মোগল ও পাঠান বাংলার মতন এই প্রত্যন্ত দেশে আসিয়াছিল? ইতিহাসের এই উত্তর নেতিবাচক হইলে বাংলায় এমন কেন হইল? বাংলায় মুসলমান আধিক্য ঘটিল কেন?

এক শ্রেণীর পণ্ডিত বলেন, বাংলার বৌদ্ধ সমাজ ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে আঘাত করিবার জন্য ইসলাম শক্তিকে এই দেশে আহ্বান করিয়াছিল। এই তথ্য মিথ্যা নাও হইতে পারে। তরাইনের রণক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজ চৌহানের পরাজয় বীরত্বের অভাবের জন্য নহে। বরং শৌর্য, বীর্য্য তাহার প্রচুরই ছিল, অভাব ছিল রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, হিন্দুর সামগ্রিক একত্ববোধ এবং রাষ্ট্রচৈতন্য। জাতির আপামর দরদের অভাবে কুতুবুদ্দিন আইবকের খালজী সেনাপতির হাতে পর পর উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং নদীয়ার স্বাধীনতা হৃত হয়। পারস্পরিক ঈর্ষাও সমাজ হিতৈষণার অভাবে উত্তর পূর্ব ভারতের রাজন্যবৃন্দ এক সঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন নাই। ইসমাইলী শক্তি পঞ্চম বাহিনীর নীতিতে বিশ্বাসী' পীর ফকির, দরবেশ কিম্বা বণিকের ছদ্মবেশে গুপ্তচর সর্বত্রই পরিভ্রমণ করিত। বিভীষণ ও এদেশে অমর। কাজেই স্থানীয় পঞ্চম বাহিনী সৃষ্টি হইয়াছিল এবং আক্রমণের পূর্বে তাহারাই ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। ইহাও অসম্ভব না হইতে পারে—বৌদ্ধ রাজত্বের পুনর্গঠনের আর আশা নাই দেখিয়া বাংলার বৌদ্ধ সমাজের একাংশ হয়তো 'ইসলাম' কবুল করিয়া রাজার জাতি হইবার সুযোগ গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে ইসলাম ধর্ম যে তুই ফোঁড় নহে, আল্লা ও তাঁহার প্রেরিত অনুচর মহম্মদ যে দেশীয় দেব দেবীর অবতার, এইরূপ প্রচার তাহাদের পক্ষে হওয়া খুবই সম্ভব।

চাপিয়া উত্তম হয়   ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া একনাম ॥
নিরঞ্জন নিরাকার   হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেত বলেত দম্বদার
যতেক দেবতাগণ   সভে হৈয়্যা একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার
ব্রহ্মা হইল মহম্মদ   বিষ্ণু হৈলা পেকম্বর
আদম্ভ হইলা শুলপানি
গণেষ হইলা গাজী   কার্ত্তিক হৈলা কাজী
ফকির হইল্যা জতমুনি ॥
*   *   *   *
যতেক দেবতাগণ   হয়্যা সভে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুরে ॥

রমাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ হইতে ঝাড়খণ্ডের পথে ইসমাইলী চমুর বাংলায় অনুপ্রবেশের বর্ণনা উল্লিখিত হইল। গৌড়ের পথে না গিয়া অতর্কিতে ইরম্মদ গতিতে নবদ্বীপে হানা দেওয়ার জন্য এই বর্ণনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। ইহাও স্বীকার্য্য যে, বৌদ্ধ জনসাধারণের একাংশ সেন রাজত্বে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নবসংগঠনের তীব্রতায় ভীত হইয়া পড়িয়াছিল এবং ইসলাম অনুপ্রবেশকে তাহারা বিধাতার আশীর্বাদ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল।

বেদ করে উচ্চারণ   বেরয়্যাঅ অগ্নি ঘন ঘন
দেখিয়া সবাই কম্পমান।
মনেতে পাইয়া মর্ম্ম   সভে বলে রাখ ধর্ম্ম
তোমা বিনা কে করে পরিতান ॥
এইরূপে দ্বিজগণ   করে সৃষ্টি সংহারণ
ই বড় হইল অবিচার।

কিন্তু গোটা জাতি তাহা চাহে নাই, যাহারা প্রথমে ইসলামকে পরিত্রাণের আহ্বান বলিয়া বুঝিয়াছিল তাহারাও শীঘ্রই নির্বিচারে "মন্দির দেহরা" ভাঙ্গায় এবং ইসলামীয় অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। বৌদ্ধ সমাজ বাংলার একাংশে শুধু বাঁচিয়াছিল না, মুসলমান প্রবেশের সাড়ে তিন শত বৎসর পরে ও শ্রীচৈতন্যের সময়ও বৌদ্ধ সঙ্ঘের অস্তিত্ব ছিল।

দ্বিতীয়তঃ বাংলার ন্যায় বিহারের জনসাধারণও বৌদ্ধ ছিল, বরং তুর্করা বিহারের রাজশ্রী বৌদ্ধ পালরাজবংশীয়ের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিল। বিহার বিজয়ের দুই বৎসর পরে নদীয়া বিজিত হয়। সেন রাজলক্ষ্মী নদীয়া হইতে লক্ষ্মণাবতী অবশেষে বিক্রমপুর স্কন্ধাবারে কিছু-কাল আত্মরক্ষা করে। সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমগ্র বঙ্গদেশ বিজিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমগ্র শ্রীহট্ট বিজিত হয়, বহু জয়পরাজয়ের পরে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার করনানী সুলতান উড়িষ্যায় আপনাদিগের অধিকার বিস্তৃত করেন। ইহার বহু-দিন পরে মীরজুমলার অভিযানে কামরূপ অঞ্চল বিধ্বস্ত হইলেও সমগ্র আসামের স্বাধীনতা ইংরেজ আগমনের পূর্বে অক্ষুণ্ণ ছিল। রাজনৈতিক বিজয়ের ইতিহাস হইতে উড়িষ্যা ও আসামের মুসলমান সংখ্যাল্পতার আংশিক কারণ পাওয়া সম্ভব হইলেও বিহারও বাংলার পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধানযোগ্য মনে হয়। এই দুই অঞ্চল প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত এক রাজ্যভুক্ত ছিল। দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা দুই অঞ্চলেই প্রকৃতপক্ষে প্রবল প্রতাপান্বিত হিন্দু ভূস্বামীগণের করায়ত্ত ছিল। বরং বাংলা দেশের রাজশক্তি দুই একবার হিন্দুর করায়ত্ত হইয়াছিল, বিহারের ইতিহাসে অনুরূপ ঘটনা ঘটে নাই। বলা হয় রাজা গণেশের পুত্র যদু জয়মল্ল ইসলাম গ্রহণ করিবার পরে জোর পূর্বক হিন্দুও বৌদ্ধ প্রজাদিগকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। ইহাও স্বাভাবিক। নব ধর্মান্তরিত লোকের উৎকট আক্রমণমূলক গোঁড়ামী সর্বযুগেই ছিল এখনও আছে।

এই সম্পর্কে মুর্শিদকুলী খাঁ কিম্বা পীরআলি নামক ভাইদের কথা প্রায়শঃ উল্লেখ করা হয়। শরীয়তী শাসনে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত ভূম্যধি-কারী, করদানে অসমর্থ ভূইঞা, চৌর্য্যাপরাধে ধৃত নাগরিক অথবা নারী-হরণকারী কামাতুরের ছিল প্রাণদণ্ড। কিন্তু ইসলাম কবুল করিলে ক্ষমার্হ হইত, কাজেই মুর্শিদকুলী, পীরআলি কিম্বা কারধর্মার এর উদাহরণে ত্রস্ত হইবার কারণ নাই। বিহারের ইতিহাসেও এইরূপ প্রচুর নজীর উল্লেখ করা যায়।

ইসলামীয় দীক্ষার ব্যবস্থা এমন ছিল যে একবার দীক্ষিত হইলে স্বধর্মে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব। প্রথমতঃ হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিত, দ্বিতীয়তঃ সমাজে প্রত্যাগত একজন হিন্দুর পরিবর্ত্তে রাজশক্তি পাইকারীভাবে গ্রামকে গ্রাম ধর্মান্তরিত করিত। প্রবাদ আছে, মুসলমানের ঘরের চালে 'বদনা' টাঙ্গাইয়া রাখা হইত—যাহাতে দূর হইতে মৌলভী 'বদনা' দেখিয়া স্বধর্মীর খোঁজ লইতে পারে। মৌলভী অনেককাল খোঁজ খবর লয় নাই দেখিয়া কোনও সদ্যদীক্ষিত মুসলমান 'বদনা' সরাইয়া ফেলে এবং গ্রামের আত্মীয়স্বজনদের অনুকম্পায় হিন্দু আচরণ অনুসরণ আরম্ভ করে। মৌলভী সাহেব কাজীর নিকটে নালিশ করিলে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ গ্রামের সকলকেই ইসলাম কবুল করিতে হয়।

ইসলামী ইতিহাসে শরীয়তী সাম্যবাদ বলিয়া একটা আওয়াজ প্রায়ই শোনা যাইতেছে। আরব, মিশর, ইরাণ ও আফগানিস্থানের ইতিহাস পাঠ করিলে এইরূপ সাম্যবাদের নজীর প্রচুর পাওয়া যায়। সর্বত্র একই কাহিনী, অমুসলমান ধ্বংসের উপর তাহাদের এই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইউরোপেও এই সাম্যবাদ চালু হইত—যদি না খ্রীষ্টান শক্তি একযোগে ইউরোপ খণ্ড হইতে ইসলামকে বহিষ্কার করিয়া দিত। ভারতে ও ইসলামের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ হত্যা, নারী-ধর্ষণ, নরহত্যা, গৃহদাহ, মন্দির অপবিত্র করণ এবং সংস্কৃতির কেন্দ্র ধ্বংস আকস্মিক ঘটনা নহে। একই কারণে বিক্রমশীলা ওদন্তপুরী ও নালন্দার বিহার ধ্বংস করা হইয়াছে। মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার ৩০০।৩৫০ বৎসর পরে দেখি,

আচম্বিতে নবদ্বীপে হইল রাজভয়
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতিপ্রাণ লয়
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র বাঁধে
ঘরদ্বার লোটে তার লৌহপাশে বাঁধে

আরও পরে কৃত্তিবাসী রামায়ণে

"ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।"

পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক ঘটনাসমূহ কি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি? ইস্লামীয় জিম্মিতত্ত্বের মধ্যে ইহার উত্তর পাওয়া সম্ভব। ইসলামীয় রাষ্ট্রে অমুসলমান অধিবাসীদিগকে বলা হইত জিম্মি। জিম্মির অর্থ আশ্রিত। আশ্রিত জনসাধারণের রাষ্ট্রপরিচালনে কোনও অধিকার থাকিত না। নিরাপত্তার পরিবর্ত্তে জিম্মিদিগকে পৃথক কর দিতে হইত নাম জিজিয়া। প্রভেদ এই যে, ইসলামীয় চমূ পূর্ববঙ্গ জয় করিয়া লাভ করে নাই। দুই দল আপোষরফার মধ্যে দেশটাকে রাজনৈতিক ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইয়াছে। কিন্তু সেখানে হিন্দুকে কথায় কথায় কেবল 'আশ্রিত' বলা হয়। তবে কি পুরাতন 'জিম্মি' তত্ত্বই আসিয়া পড়িয়াছে। 'শরীয়তে' জিম্মিকে পবিত্র ইস্লাম কবুল করাইতে পারিলে উভয়েরই বেহেস্ত বাস। পূর্ববঙ্গে কি সত্য সত্যই শরীয়তী ন্যায় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে?

কথায় বলে বন্যায় নদীর এককূল ভাঙ্গে, প্রকৃতি সেই স্খলিত মাটিতে অপর কূলে 'চর' জন্মায়। বাংলা বিহারে সভ্যতার কণ্ঠ রুদ্ধ হইলে সংস্কৃতির সেই সকল ধারক প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সংস্কৃতির দীপশলাকা হাতে, রক্তে-লেখা পথে, নেপাল, তিব্বত, আসাম, ব্রহ্ম ও শ্যামের গহন অরণ্যে প্রবেশ করেন। পুরাতন ঝরাপাতা হইতে দুর্দ্দিনের সেই সাহসী সহীদদের অনির্বাণ প্রেম ও মৈত্রীর অফুরন্ত সংবাদ জানিতে পারি। পূর্ববঙ্গ হইতে দলে দলে লাখে লাখে যে সকল নরনারী চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যেও মানব প্রেমের অফুরন্ত আগুন অনির্বাণ আছে কি?

কিন্তু ইহবাহ্য। উত্তর প্রদেশ, মধ্যভারত কিম্বা বিহারের জন সাধারণের অপেক্ষা বাংলায় মুসলিম বিস্তৃতির কারণ অন্যত্র খুঁজিতে হইবে।

চিকিৎসকেরা বলিয়া থাকেন সংক্রামক ব্যায়রাম দেখা দিলে প্রথম ধাক্কায় কিছু প্রাণহানী হয় বটে, তারপরে প্রকৃতিই সংগ্রাম করিবার মতন রোগীর দেহে বিপরীত ধর্মীয় জীবাণু সৃষ্টি করে। ঠিক এই একই কারণে বৈদেশিক শক্তির আক্রমণে হিন্দুর ক্ষয়ক্ষতি যথেষ্ট হইয়াছিল ইহা সন্দেহাতীত। কিন্তু আক্রমণমূলক শক্তিও যে জন্মিয়াছিল ইহাও ইতিহাসসম্মত। দিল্লীর রাজধানীর অদূরেই গুরু গোবিন্দের প্রেরণায় শিখজাতি, রাজপুতনার জাট কৃষক, দাক্ষিণাত্যে মারাঠা, বাংলার বারভুঁইঞা উত্থান উল্লেখযোগ্য। 'মানুষের জয়যাত্রার ইতিহাস এমনই অদ্ভুত, কখনও মসৃণ, কখনও পঙ্কিল। বাদশাহের অত্যাচার যতই তীব্র হইয়াছে মুক্তির ডাক ততই নিবীড় হইয়া তাহাদের কানে পৌছাইয়াছে, তবুও প্রাণের শঙ্কা, চিত্ত ভাবনাহীন, হইয়াছে, অদূরাগত সমুদ্র কল্লোলের মতন উন্মত্ত শত কণ্ঠে

মহারব উঠে বন্ধন ছুটে
করে ভয় ভঞ্জন।

শাশ্বত প্রাণের কণ্ঠে বিগত দিনের সহীদদের যে আওয়াজ উঠিয়াছিল তাহা কি কালারণ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে?

আজ বাংলার অবস্থা কি? দেশবাসী ভয়ার্ত্ত, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, দীনতা ও আকুতিতে চিত্ত মথিত। দিকে দিকে ক্রন্দনের রোল। হাসির ফোয়ারা দীন জাতির দীর্ণকণ্ঠে আজ স্তব্ধ। কে দিবে এই ঘুমন্ত জাতির মৃত সঞ্জীবনী, আলোর রাজ্যের জীয়নকাঠি? কে শুনাইবে আশার কথা? কোন ভগীরথ নবগঙ্গার জলস্রোতে মৃত সগরপুত্রদের মৃত দেহে প্রাণ সঞ্চার করিবে? কে ঢালিবে করুণাধারা? শুনাইবে আমাদেরও প্রাণ আছে, উচ্ছাস আছে:

আমরা যখন অচেতনে
ঘুমাই শয্যাপরে,
জগতে কেউ দেখতে না পায়
লুকানো তাঁর বাতি
আঁচল দিয়ে আড়াল করে
জ্বালান সারারাতি।

জগজ্জননীর সেই আড়ালকরা বাতির আলো কি আমরা দেখিতে পাইতেছি? নোয়াখালীর নারিকেল গুবাক কুঞ্জে মহাত্মা গান্ধির অন্তরে সেই আলোর রশ্মি একবার লুকোচুরী খেলিয়াছিল। তারপরে সবই নীরব নিথর, তুহিন-শীতল অন্ধকার।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর আম্রবাগানে বাঙ্গালীর ভাগ্য নির্দ্ধারিত হয়। বিলাসী নবাবের নিস্ক্রিয়তা, মুসলমানের বিশ্বাসঘাতকতা এবং হিন্দুপ্রধানদের স্বার্থপরতা এই ত্রয়ী সম্মেলনে বাংলার মসনদ হাত বদ্লায়। নবাব তাহার স্বার্থকেই প্রধান করিতে গিয়া মুসলমানের গোরস্থান রচনা করিল। কম্পানীর প্রতিনিধি দেখিল—পাতশাহীর স্বপ্ন চূর্ণ করিতে হইলে হিন্দুশক্তি হাতে আসা দরকার। তাই হিন্দু-প্রীতি বান ডাকিল, হিন্দুও ধরা দিল। পোষাক বদ্লাম বৈত নয়। দীর্ঘ শত শত বৎসর যাহারা হিন্দুর সর্বনাশ করিয়া নবাবের দুয়ারে পাত কুড়াইত এবার তাহারা 'ইজার' ফেলিয়া 'পান্টলুন' পরিয়া নূতন মনিবের খেদমদ সুরু করিল, ইংরাজী শিখিল, গ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিল। ধনী আসিল, দরিদ্র আসিল, পণ্ডিত আসিল, মূর্খও সেই আসরে ভীড় জমাইল—উমেদারীর জাতিভেদ নাই, পণ্ডিত মূর্খে তফাৎ নাই। শুঁড়ী ও মাতালে পার্থক্য নাই। ক্রীতদাসের হরিহর ছত্র। ফলং ছত্রভঙ্গম্। সমস্ত জাতির মানসিক ছত্রভঙ্গ অবস্থা উপস্থিত হইল।

ইসলামীয় রাজত্বে ইতর ভদ্রের মধ্যে যে গ্রামছাড়া সহরমুখো ভাব দানা বাঁধিয়া আসিতেছিল এইবার তাহা ষোলকলায় পূর্ণ হইল, ইংরাজের মেকী প্রেমে গদগদ হইয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভুলিয়া গ্রাম ছাড়িয়া সহরে ভীড় জমাইল। সহরে নূতন টাকা, বেনিয়ান গিরিতে প্রচুর রোজগার, কোম্পানীর অফিসে ১০৲ টাকা বেতন হইলে কি হয়!

উপরি রোজগারে দোলদুর্গোৎসব বার মাসে তের পর্ব, অঢেল অবস্থা। নবাবী আমলে তবু যবন সংসর্গ পরিহার করিবার একটা রেওয়াজ ছিল, কিন্তু লালচামড়ার খেদমদে সে বালাই ছিল না। গ্রামে রহিল, জমিদারের গোমস্তা, কুশীদজীবী মহাজন এবং পণ্ডিত সমাজপতি। আর রহিল ডাকসাইটে পরিবারের অকাল কুষ্মাণ্ড সন্তান। এই চতুরঙ্গ অত্যাচারের সহিত প্রকৃতির সংযোগ কম সক্রিয় ছিল না। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের পর জলপ্লাবন, নদনদীর গতি পরিবর্ত্তন, সমুদ্রের জলোচ্ছাস কেহই বড় পেছপাও ছিল না। ত্রিস্রোতা ও ব্রহ্মপুত্রের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যমুনা নদী সৃষ্টি হয়। বহুশত জনপদ জলপ্লাবনে শ্মশান হইয়া যায়। মেদিনীপুর ও বজবজ অঞ্চল লবণ জলে বিধৌত হওয়ায় লক্ষলক্ষ প্রাণ নষ্ট হয়। গবাদি গৃহপালিত পশুহানীর ইয়ত্তা ছিল না। ভাগীরথী ও পদ্মার গতিও পরিবর্ত্তিত হয়। ক্রমেই জলঙ্গী, মহানন্দা, আত্রেয়ী ও বড়ল নদ প্রভৃতির জলধারা শুষ্ক হইতে থাকে। আজও দেখা যায় এই সকল নদীতীরবর্ত্তী প্রাচীন জনপদ শ্মশান ও পরিত্যক্ত হইয়া গিয়াছে। নদীর খাত পরিবর্ত্তনের ফলে যে সকল নূতন খাল বিল ও চরের উৎপত্তি হইল, এই সকল জমিতে নূতন ঘর বাঁধিতে আসিল, ম্যালেরিয়া, মহামারী, সাপ ও বাঘের সহিত যুদ্ধ করিয়া বৃদ্ধি পাইল তাহারা কে? বাদসাহী মসনদ পরিবর্ত্তনে রাজনৈতিক ক্ষমতাশূন্য হইয়া হঠাৎ যাহারা দরিদ্র হইয়া পড়িল—নূতন জমিদারের অত্যাচারে, কুশীদজীবী মহাজনের নির্য্যাতনে যাহারা ঘরছাড়া হইল, সমাজপতির নির্মম শাসনযন্ত্রে আধমরা হইয়াও যাহারা বাঁচিয়া থাকিল তাহারাই এই চরঅঞ্চলে আসিয়া ঘর ও সংসার বাঁধিল। প্রথমতঃ ইহাদের মধ্যে না ছিল আইন, না ছিল সামাজিক বন্ধন, সর্বগ্রাসী ইসলামের একছত্র তলে ঘরছাড়া পতিত, সমাজ নির্য্যাতিত, নর ও নারী নূতন করিয়া ঘর বাঁধিল। সকল নীতি ও বন্ধন যাহারা হারাইয়াছে, নূতন চরের পলি মাটিতে আশ্রয় পাইয়া শুধু প্রচুর শস্যই উৎপন্ন করিল না, জনসংখ্যাও বিপুল ভাবে বর্দ্ধিত হইল। বাংলা দেশের ভৌগলিক নক্সা সামনে রাখিলে এই সত্যই আজ স্পষ্ট হইয়া চোখে পড়ে। শিক্ষা দীক্ষায় বঞ্চিত ইহারা হয়তো সুযোগ পাইলে আমাদেরই শক্তি বৃদ্ধি করিত! অন্যত্র যাহা সম্ভব হইয়াছে এখানে তাহা হইল না কেন—এই কথাই ঝরা পাতায় পৃষ্ঠা খুলিলে চোখে না পড়িয়া যায় না।

উদারতা, প্রেম ও মৈত্রী ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মকথা, শতাব্দীর পর শতাব্দী আর্য পূর্ব, অনার্য সংস্কার এবং সংস্কৃতি বর্ণাশ্রমের কাঠামো এবং আদর্শের মধ্যেই সমন্বিত ও সমীকৃত হইয়া আসিয়াছে, পৌরাণিক আখ্যায়িকা হইতে ঐতিহাসিক যুগ সর্বত্রই এই মিলনও সমীকরণের কাহিনী। রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্রই প্রথম গুহক চণ্ডালকে কোল দেন, বানররাজ সুগ্রীব, নল, নীল ও বীর হনুমান তাঁহার বন্ধুও সেবক, মহাভারতের যুগে এই মিলন আরও প্রসার লাভ করে। ভারত যুদ্ধে দেখি আর্যও অনার্য সকলেই মিলিত, বৈবাহিক সম্বন্ধও স্থাপিত হইয়াছে। অনার্য দেবতা আর্যের পূজ্য হইয়াছে, অনার্য রাজ শ্রীকৃষ্ণ বন্দনার বিভোর। 'আর্যীকরণ' দ্রুতগতি লাভ করে বরং সর্বগ্রাসী ও সর্বব্যাপী হইয়া পড়ে গৌতম বুদ্ধের প্রেম বিজয়ের পর হইতে। বেদ বেদান্তের কঠিন ও শুষ্ক আলোচনার পরিবর্ত্তে সুললিত সহজ প্রাকৃত ভাষায় বৌদ্ধ গাথা ও জাতক প্রচারে, সমাজের নেতৃত্বে কোনও জাতির একচেটিয়া দাবী থাকিল না, শীল ও ভদ্র মাত্রেই সমাজের নেতৃত্ব পাইল, ক্ষত্রিয় কুমার আনন্দ, ব্রাহ্মণপুত্র মৌদ্গাল্যায়ন এবং ক্ষৌরকারনন্দন উপালি সকলেই সমান। ত্রিশরণের রসায়নে, ত্যাগের তিতিক্ষায় সকলের সমান অধিকার। নীরব শ্রমণের জীবন বেদ এই মৈত্রীর পতাকাকে ভারতের প্রান্তর হইতে প্রান্তরে, ভারতের বাহিরে, সমুদ্রের অপর পারে, মরুভূমির বালুকণায় তেপান্তরে বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিল।

ভারতের ধনরত্ন চিরদিনই বাহিরের দস্যুদিগকে প্রলুব্ধ করিয়াছে, এখনও করে। কিন্তু ত্রিশরণের নিকটে ক্ষুধার্ত্ত দস্যুও মস্তক নত করিয়াছে এমনই প্রভাব ছিল বুদ্ধের পতাকাধারী অহিংসক শ্রমণের ঋদ্ধিও মৈত্রী। শকরাজ কনিষ্ক আসিয়াছিলেন ভারত লুণ্ঠন করিতে কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও এই রাজন হইলেন আর্য্যধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রক্ষক, বিখ্যাত ধর্ম ব্যাখাতা অশ্বঘোষের প্রতিপালক, এইরূপ কত পারদ, হুন ও যবন একই দেহে লীন হইয়া গিয়াছে, ইতিহাস তাহাদিগকে বিস্মৃত হয় নাই। আরবের অর্দ্ধচন্দ্র লাঞ্ছনই কেবল ভারত দেহে আলাদা রহিল কেন? ঐতিহাসিক মাত্রই তাহা জ্ঞাত আছেন, ভারতের অন্যত্র যে কারণে হিন্দু আত্মরক্ষা করিয়াছে বাংলায় তাহা সম্ভব হইল না কেন? বাঙ্গালী হিন্দু কি মৃত্যু পথযাত্রী?

পূর্বেই বলা হইয়াছে পাল রাজবংশের হাত হইতে বিহারের স্বাধীনতা নষ্ট হয়। এই সময় ছিল সমগ্র দেশে পালরাজবংশের পতনের সময়; বাংলা দেশে পাল রাজবংশের স্থলে সেন রাজবংশ রাজত্ব করিতেছে। হরিকেলে পূর্ববাংলায় চন্দ্রবংশের স্থলে বর্মন বংশ রাজত্ব করিতেছে। পাল ও চন্দ্রবংশ ছিল বাঙ্গালী। সেনবংশ ব্রহ্মক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় এবং বর্মন বংশ শৈব, প্রবার উভয়েই ভিন্ প্রদেশী।

রাজা শশাঙ্কের সময় হইতেই বাংলাদেশে বৈদিক ধর্মের জাগরণ হইতেছিল। বৌদ্ধপ্লাবনে ছিন্ন বিছিন্ন জাতিগুলি উদারতার সহিত সাধারণ ভাবে বর্ণাশ্রমের কাঠামোর মধ্যে ভিড়িয়া আসিতেছিল। পালবংশ বৌদ্ধ হওয়া সত্বে ও বাংলাদেশ এই ঔদার্য হইতে বঞ্চিত হয় নাই বরং পাল রাজবংশের প্রধান মন্ত্রী দর্ভপানি কেদার মিশ্রের বংশ বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ হওয়ায় রাজবংশ ও প্রধানামাত্যের দুই কৌলিক ধর্ম উদার পথেই সংমিলিত হইতেছিল। পাল রাজাদের সময় শুভকর্মে ব্রাহ্মণদিগকে জমি দান করিতেছেন এইরূপ বহু তাম্রশাসন পাওয়া যায়। রাজার জন্মতিথিতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয়েই সমানভাবে সম্মানিত হইতেছেন, পরম সুগত পালরাজা শিব প্রশংসায় আনন্দমুখর, রামায়ণ ও মহাভারতের সম্বন্ধে কথা বলিতে গিয়া উল্লসিত হইতেছেন। রাজকীয় লিপে পরিচয় দিতে গিয়া বৌদ্ধ পিতাও শৈবমাতা উভয়ের ধর্মের ঐক্য ঘোষণা করিয়াছেন। রাষ্ট্রের ধর্মাদর্শের অফুরন্ত ঔদার্য্যের ফলে সীমান্তের আদিম নরনারীদের মধ্যে আর্যীকরণ দ্রুত পরিণতি লাভ করিতেছিল

জাতি ভেদের কড়াকড়ি না থাকায় বিভিন্ন কোমের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে প্রতিবন্ধক হইত না। এই কারণে সমন্বয় ও সমীকরণ দ্রুত হইতেছিল। কিন্তু বর্মন ও সেন রাজবংশ সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার এই সমন্বয় ইতিহাস চক্র সম্পূর্ণ আবর্তিত হইয়া গেল। উদার্যের স্থলে সংরক্ষণী মনোবৃত্তি সক্রিয় হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি অনুযায়ী সমাজ ও বর্ণ ব্যবস্থা একান্ত হইয়া উঠিল। রাজার সর্বময় একনায়কত্বে ব্রাহ্মণ সমাজের রক্ত শুদ্ধির জন্য নানা সংস্কার ও ন্যায়শাস্ত্র রচিত হইল। বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও সম সাময়িক কুলজী গ্রন্থে রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাতন্ত্র একনায়কত্বের পরিচয় উল্লিখিত আছে। সেন রাজগুরু হলায়ুধ, অনিরুদ্ধ ভট্ট এবং বর্মন রাজগুরু ভবদেব ভট্ট হইতে জীমূতবাহন পর্যন্ত সকলেই এই নূতন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরিচালক, সমস্ত হিন্দুসমাজকে ইঁহাদের সময়ে ঢালিয়া নূতন করিয়া সাজাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেদজ্ঞান, যাগযজ্ঞ, আচার অনুষ্ঠান ও বিদ্যাবত্তার গুরুত্ব দেওয়া হইত। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও যাঁহারা এই সকল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না তাঁহাদিগকে অনাচারী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। বহুবৃত্তি নিষিদ্ধ হয়। বর্ণবিশেষে অধ্যাপনাও পৌরোহিত্য নিষিদ্ধ হয়। বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেখা যায় বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকলেই বর্ণসঙ্কর সম্ভূত এবং শূদ্র পর্য্যায়ে গণ্য। সমাজপতি বিভিন্ন সঙ্করবর্ণ ও উপবর্ণগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সমাজে বিভিন্ন স্থান ও বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দেন। এই বিবিধ বৃত্তি ও নিষেধ বিধি চালু রাখিবার জন্য রকমফের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

সমাজ দেহের বিভিন্ন সিঁড়ি সংক্ষেপ করিয়া প্রধানতঃ তিনটি প্রশ্ন মনে আসে। (১) অর্থোৎ-পাদক সমাজের প্রতি এই নব ন্যায়ের বিতৃষ্ণা, এই বৃত্তির অধিকাংশ বর্ণকেই সমাজে পতিত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। বাকী কয়েকটীর স্থান 'নবশাখ' বলিয়া বিদিত, ইহাদিগের সামাজিক মর্য্যাদা অধম শ্রেণীর কিঞ্চিৎ উপরে। (২) সমাজ-শ্রমিকের স্থান অন্ত্যজ পর্য্যায়ে পরিগণিত হয়। অন্ত্যজদিগের বিদ্যা লাভের দাবী স্বীকৃত হয় নাই। অন্ত্যজ কেন, শূদ্রমাত্রেই বেদপাঠে অনধিকারী। পাল রাজবংশের আমলে নীচ বৃত্তির জন্য যে সকল অন্ত্যজ সমাজে কোন-ঠাসা ছিল তাহাদিগকে জলাচরণীয় বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই সাম্প্রদায়ের মধ্যে বরেন্দ্রীয় কৈবর্ত্ত সম্প্রদায় মৎসবৃত্তির জন্য পালরাজত্বে ঘৃণ্য ও ক্ষুব্ধ ছিল। সম্ভবতঃ রাজনৈতিক কারণে তাহাদিগকে সৎ শূদ্র শ্রেণীতে উন্নীত করা হইয়াছিল। (৩) অম্বষ্ঠ এবং করণ কায়স্থ সম্প্রদায় এখনকার ন্যায় তখনও ধনোৎপাদক সম্প্রদায় ছিল না।

পাল রাজত্বে যাহারা অন্তর্বাণিজ্যে কিম্বা বহির্বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকিতেন ধনোৎপাদনকারী শ্রেণী হিসাবে সমাজে তাহাদের বিশেষ স্থান ছিল। বহির্বাণিজ্য নিষিদ্ধ হওয়ায় অন্তর্বাণিজ্যে ও বণিকেরা স্থান হারাইতে লাগিল। শ্রেণী বিদ্বেষ ও রাজনৈতিক কারণে বণিককুল সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বরক্ষায় অপারগ হইয়া ক্রমে কৃষিজ বাণিজ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। কাজেই ব্রাহ্মণের পরেই বুদ্ধিজীবী ও মসীজীবী সম্প্রদায় বর্ণত্তর অধিকার করিয়া বসিল। এই সকল কারণে সেন আমলে বর্ণও শ্রেণীগত সমাজাদর্শে স্ফুটিল সুস্পষ্টরূপ ধরিয়া উঠিল, "কালক্রমে দেখা গেল সমাজের একপ্রান্তে মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, অন্যপ্রান্তে স্পর্শচ্যুত, অধিকারলেশহীন অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়, আর মধ্যস্থলে সৎশূদ্র সম্প্রদায়। প্রত্যেকের মধ্যে দৃঢ় ও দুরতিক্রম্য প্রাচীর। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ও ভৌগলিক এবং অন্যান্য বিভেদ প্রাচীরে বিভক্ত অসহায়; বিবাহ—ব্যাপারে নানা বিধি নিষেধের জোরে দৃঢ় করিয়া বিভক্ত, যোগাযোগ বাধাও বিচিত্র।" সমাজপতি ব্রাহ্মণ ব্যতীত উত্তম সংকর, মধ্যম সংকর, অধম সংকর ও ম্লেচ্ছ প্রধানতঃ এই চারি সম্প্রদায়ে এবং ৩৬ উপসম্প্রদায়ে বাঙ্গালী হিন্দুকে বিভক্ত করা হইয়াছিল। কালক্রমে এই উপসম্প্রদায়ের সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে ইংরেজরাজের কৃপায় প্রায় স্বাভাবিক উপশ্রেণীতে হিন্দু সমাজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইদানীং আরও মারাত্মক বিভেদ আনিবার জন্য তপশিলী (scheduled) ও জাতি হিন্দু non scheduled এই দুই বৃহৎ ভাগে হিন্দু সমাজকে বিভক্ত করা হইয়াছিল।

এই পটভূমিকায় বৈদেশিক বিধর্মীর আক্রমণ প্রতিহত করিবার শক্তি ছিল কোথায়? পঞ্চদশ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব একটা অস্বাভাবিক ঘটনা নহে। চিন্তাশীল মানুষের প্রাণের সামগ্রীক অসহায় ভাব চৈতন্যদেবের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, অভীঃ। চৈতন্যদেবই দেখাইলেন প্রেম ধর্ম কাপুরুষ ও নিষ্ক্রিয়বাদীদের ধর্ম নহে। পুরাতন নিষ্ক্রিয় ও নেতিবাদী সমাজের স্থলে সক্রিয় বৈপ্লবিক সংস্থা গড়িয়া উঠিল। চৈতন্যের প্রেমধর্ম ইসলামের সামগ্রীক আক্রমণ হইতে সমাজের নীচ ও পতিত সম্প্রদায়কে আত্মরক্ষা করিতে সাহায্য করিয়াছিল। বাংলার দুর্ভাগ্য চৈতন্যোত্তর আচার্য গোস্বামীগণের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবের চেয়ে নিষ্ক্রিয় দাস্যভাব প্রধান হইয়া পড়ায় শীঘ্রই বৈষ্ণব-সমাজ 'নেড়ানেড়ি' সম্প্রদায়ে পর্যবসিত হয়। রাজনৈতিক আবহাওয়া হয়তো আংশিক দায়ী, স্বাধীনতা হীনতায় কোনও শক্তিই সক্রিয় থাকিতে পারে না। চৈতন্যদেবের নীলাচলে বাসের সহিত রাজনৈতিক ইঙ্গিত পাওয়া যায় কি?

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ্যবাদের সংরক্ষণী মনোবৃত্তি বাংলা দেশের অভ্যন্তরে ও প্রত্যন্ত সীমায় অনার্য ও আর্যপূর্ব বিভিন্ন কোমের ভিতরে যে প্রচ্ছন্ন "আর্যীকরণ" "ধীরে সমীরে" অগ্রসর হইতেছিল তাহা বাধা প্রাপ্ত হয়। নিম্ন শংকর ও ম্লেচ্ছ কোমের পারস্পরিক বৈবাহিক যোগাযোগরহিত হওয়ায় বিভিন্ন বিভক্ত অসহায় স্পর্শচ্যুত বিভিন্ন জলানাচরণীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সামাজিক এই বিভেদ ও বৈষম্য ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে আরও বাড়বাড়ন্ত হয়। পক্ষান্তরে ঐস্লামিক সমানাধিকার ও সামাজিক সৌভ্রাত্রের আদর্শ প্রবলবেগে তাহাদের মধ্যে কাজ করিয়া যাইতেছিল। উত্তর বঙ্গে সত্যপীর, শিলেটে জালালশাহ, চট্টগ্রামে কারফর্মা, বাকরগঞ্জের গাজীসাহেব ও মুর্শিদাবাদের মকদমী সাহেবের চেল চামুণ্ডার দল এই সকল নিরীহ জনসাধারণের সহিত দৈনন্দিন সুখে দুঃখে মিলিত

হইয়া কখনও নীরবে কখনও রাষ্ট্রের কিম্বা জমিদারের বদান্যতার সহযে কাজ গুছাইয়া লইতেছিল। ইংরেজ আগমনের পরে এই ইসলামীকরণ বরং দ্রুত হইয়াছিল। সম্ভ্রান্ত, সুধী ও পণ্ডিত মহোদয়দের ভাড় এখন সহরে, গ্রামের হর্ত্তাকর্ত্তা জমিদার কিম্বা কর্মচারী পরগণা শাসন করিবার জন্য গুণ্ডাশ্রেণী মৌলভী এবং মৌলানাদের হাতে রাখিতেন, পীর দরগায় সিন্নি দিতেন এবং মহরম নওরোজে ক্ষুদে বাদশার অভিনয় করিতেন। খালবিল ও চরে অলক্ষ্যে যে অভিনয় কায়েম হইল তাহার খোঁজ রাখা তাঁহাদের কর্ত্তব্যেই ছিল না।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম জনসংখ্যা গণনা করা হয়। এই সময় বাংলাদেশে হিন্দু প্রবলভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায় ছিল। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের আদম সুমারীতেও ঢাকা জেলায় হিন্দু গরিষ্ঠ সম্প্রদায় ছিল। ইহার পরেই হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে। ১৭৭৬ সালের মন্বন্তরে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে লোক সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ লোক দুর্ভিক্ষে, জলপ্লাবনে এবং অনাহারে মৃত্যু কবলিত হয়। এই সময়ের মধ্যেই নদ নদীর খাতের উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয়। দশশালাও সূর্য্যাস্ত আইনে প্রাচীন জমিদার সম্প্রদায়ের অনেকেই জমিদারী হারাইয়া বসেন। কলিকাতার বেনিয়ান কিম্বা প্রাচীন জমিদারদের বিশ্বাসঘাতক কর্মচারী সূর্য্যাস্ত আইনের সুযোগে রাতারাতি বড়লোক হইয়া পড়েন। প্রাচীন জমিদার (নাটোর, পুঁঠিয়া, বর্দ্ধমান, নদীয়া প্রভৃতি) রাজন্যগণের হস্তচ্যুত জমিদারীতে নবাগত ভুঁইফোড় জমিদার, সমাজপতি ও কুশীদজীবীর ত্রিবিধ সম্মেলনে বাঙ্গালী হিন্দুর ভিত—নিম্নশংকর ও অন্ত্যজ সম্প্রদায় দলে দলে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হইয়াছে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। বাঙ্গালী হিন্দু মৃত্যুপথ যাত্রী নহে।

পূর্ব বাংলা হইতে দলে দলে ত্রস্ত, ভয়ার্ত্ত হিন্দুর পশ্চিমবঙ্গে আগমন নিছক প্রকৃতির খেয়াল নহে।

প্রকৃতির বিচারে কৃত্রিমতার ভেজাল পাপ খায় না। রুদ্রের অভিশাপ নিছক ব্যর্থ হইবার নহে। কথায় কথায় বলা হয় বাঙ্গালীর ব্যবসায়িক ধৈর্য নাই, বাঙ্গালী পরিশ্রম করিতে সঙ্কুচিত। শত শত বৎসরের অনভিজ্ঞতায় আজ হয়তো অনেকেই রণক্ষেত্রে পরাজিত হইতেছে কিন্তু ইহাই শেষ কথা নহে, শৈথিল্য ও কর্মহীনতা তাহার সহজাত ধর্ম নহে। ধনপতি, সিংহবাহু কিম্বা চাঁদসদাগরের সন্ততি সুযোগ সুবিধাও সহৃদয়তা পাইলে পুনরায় বেসাতী লইয়া সাত সমুদ্রে ডিঙ্গা ভাসাইবে, ইহাই বিশ্বাস। ভাগ্যের পাশাখেলায় পরাভূত লক্ষ লক্ষ গৃহহারা পশ্চিমবঙ্গের দুয়ারে আজ সমাগত—তাহাদিগকে নৈরাশ্যের নহে, আশার কথাই, জানাইতে হইবে—স্তব্ধ মূক মুখে দিতে হইবে নূতন সাবলীল স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী, বলিতে হইবে দীনহীন ভাবা পাপ এবং অজ্ঞতা। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ, যে সর্বদা আপনাকে দুর্বল ভাবে, সে কোনও কালে বলবান হইতে পারে না। যে সত্যই আপনাকে সিংহ জানে, সে পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিলেও সিংহ।

মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ
সব তুচ্ছতার উর্দ্ধে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ।
তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।

সেতু-বন্ধ

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

বারে বারে রাম বাঁধিছেন সেতু বারে বারে হয় ক্ষয়,
ব্যর্থ বানর-বাহিনীর সব শ্রম,
বিপুল-বীর্য রাঘবের আশা বারে বারে করে লয়
অতি উদ্ধত জলনিধি দুর্দম।
সেতু-বন্ধন হবে নাকি তবে ? বিপুল এ আয়োজন
মিথ্যা কি হবে বারিধি-স্পর্ধা ফলে ?
তুষিতে সাগরে নরে ও বানরে করে তার বন্দন,
পূজে সমারোহে পুষ্প বিল্বদলে।
দম্ভী-সিন্ধু-স্বভাব না যায় তোষণে না হয় ফল
অতি দুরন্ত তরংগ-সংঘাত,
থামে না কোপন অস্থির-জল উদ্ধত চঞ্চল
পাষাণ-ভিত্তি করিছে সলিলসাৎ।

তোষণ, পোষণ, পূজা, বন্দন ব্যর্থ দেখিয়া রাম
রুষিত-চিত্তে ধরিয়া ধনুর্বাণ
শাসিতে সাগরে দেখাইতে তারে দর্পের পরিণাম
করিলেন ঘোর মহাশরসন্ধান।
স্বীয় মূর্খতা-পরিণতি স্মরি ভীত মহা-পারাবার
অপগতমোহ জীবনান্তের ত্রাসে
কহিল "দেবতা কর দয়া করি এ শায়ক-সংহার
তোমার সেবায় নিযুক্ত কর এ দাসে।"
আজি এ ভারতে ভাবিতে হইবে সিন্ধু-শাসন-কথা
তোষণ-নীতির নিষ্ফল পরিণাম
আপন বীর্যে বিদূরিতে হবে দুষ্ট-দন্ত ব্যথা
নহিলে মিথ্যা রামধুন রামনাম।

—দশ—

দিন সাতেক পার হয়ে গেছে।

এক পশলা জোরালো বৃষ্টি ঝরে গেছে 'বরিন্দে'র লাল-মাটির ওপর। কাঁচা সড়কের ওপর এঁটেল কাদার 'ডহ' সৃষ্টি হয়েছে এক আধটা, জোয়ালে হাড় জিরজিরে রোগা গোরু থাকলে কখনো কখনো তাতে আটকে বসেও যাচ্ছে গাড়ির চাকা—কাঁধ দিয়ে ঠেলে তুলতে হচ্ছে গাড়োয়ানকে। কাঁদড়ের স্থির ঘোলাটে জলে অল্প অল্প তিমৃতিরে স্রোত এসেছে। দু-চার আঙুল জল জমেছে ফেটে চৌচির শুকনো 'নয়ানজুলী'র ভেতরে, কোথা থেকে প্রাণ পেয়েছে শুকনো কয়েকটি কলমিলতা; তিন চারটি পাতা নিয়ে শীর্ণ মাথা মেলে দিয়েছে ওই জলটুকুর ওপরেই। মাটির বুকের ভেতর থেকে শীর্ণ কয়েকটি সবুজ আগুনের শিখার মতো ঘাসের অঙ্কুর উঠছে এদিকে ওদিকে।

আর মুসকিল হয়েছে আউশ ধান নিয়ে। প্রায় একমাস ধরে টানা খরা চলছিল, এইবার আসছে জোরালো বর্ষার পালা। প্রথম পশলায় তারি জানান। এখনি মাঝে মাঝে আকাশের কোণায় কোণায় কালো মেঘ থম্ থম্ করে ওঠে, ঘনিয়ে আসতে চায়—কিন্তু 'বরিন্দের' প্রচণ্ড হাওয়ায় ঠিক জমাট হয়ে বসতে পারে না; একটা কালো রাজহাঁসের পাখা যেমন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে শেয়ালে, তেম্‌নি ভাবে বাতাসের ঝাপটায় শতচ্ছিন্ন হয়ে মিলিয়ে যায় দিকে দিকে।

কিন্তু ক'দিন আর? এক সময়ে ঠিক জড়ো হয়ে আসবে, একজোড়া শক্ত লোহার কবাটের মতো আড়াল করে ফেলবে আকাশকে। পূবে-পশ্চিমে উত্তরে-দক্ষিণে জলতে থাকবে লাল বিদ্যুৎ, বাজ পড়বে গুম্ গুম্ করে—এক একটা আকাশ ছোঁয়া তালগাছের বুককে দু' ফাঁক করে দিয়ে মাটির তলায় পালিয়ে যাবে সর্বনাশা আগুন। তারপর বৃষ্টি—বৃষ্টি—বৃষ্টি। এক নাগাড়ে চলতে থাকবে—দু' দিন, তিন দিন, চার দিন, পাঁচ দিন। তারও পরে কোথায় কতদূরে গঙ্গা, কোথায় বা মহানন্দা! পাগলের মতো জলের তোড় ছুটবে মালিনী নদী দিয়ে—মাঠ-ঘাট বন-বাদাড় একাকার করে দিয়ে জন্ম হবে 'চাকালে'র। সে তো সায়র!

এদিকে ধান পেকে উঠছে। ওই সর্বনাশা জলের ঢল নামবার আগে কাটতে না পারলে কম্‌সে কম সাত-আট হাজার বিঘে ধান বরবাদ। একেই তো পোকাধরা ধান এবারে, তার পরে ঢল নেমে এলে—

তিন চারজন মাতব্বর গোছের কৃষক জড়ো হয়েছিল আলিমুদ্দিনের দাওয়ায়। আলোচনা তারাই করছিল।

আলিমুদ্দিন বললেন, তোমাদেরি দোষ। এত দেরী করে রোও কেন?

—করব কী সাহেব। আগে পানি না পড়লে ক্ষেতে লাঙল দিয়ে কী করব! তা ছাড়া মাটিও দেখছেন। ভিজলে মাখন, নইলে পাথর।

সালিম মুন্‌সী শাদা দাড়িটার মধ্যে হাত বুলিয়ে নিলে কয়েকবার।

—সত্যি দিনকাল যেন বদলে যাচ্ছে। আগে ফাগুনের আগেই জল নামত—এখন ক্রমেই যেন পিছিয়ে যাচ্ছে। সেই নামতে নামতে চোতের শেষ। এমনি চলতে থাকলে প্রথম ফসল আর চাষার ঘরে উঠবে না।

জোনাবালি আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। আজও আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একখানা ঘন কালো জলভরা মেঘ উঠে এসেছে। একটা চাপা আওয়াজ ভেসে আসছে গুর্ গুর্ করে। নাঃ—এল বলে। বেশি দেরী নেই আর।

জোনাবালি বললে, আব্বাজানের মুখে শুনেছি, আগেকার আমলে ক্ষেতে ক্ষেতে সেচের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন নবাব আর জমিদাররা। বৃষ্টি না হলে পাছে চাষার কষ্ট হয়, এজন্যে পুকুর কাটিয়েছিলেন বরিন্দের চারদিকে। আর এখন? নেবার কুটুম সব—একটা আধলা দেবার বেলা কেউ নেই।

হঠাৎ যেন একটা কথা মনে পড়ল আলিমুদ্দিনের।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি দেখেছি বটে। মাঠে ঘাটে চারদিকেই তো ছোট বড় অনেক পুকুর পড়ে আছে। ওইগুলোর কথাই বলছ বুঝি?

—জী।

—তা তোমরা কেন ওসব পুকুর থেকে সেচের ব্যবস্থা করে নাও না।

—পানি কই হুজুর, শুধু তো কাদা।

—নিজেরা কাটিয়ে নিলেই তো পারো।

—বাপ্‌স! সভয়ে সলিম বললে, অত পয়সা কোত্থেকে আসবে চাষার ঘরে। আর সবাই মিলে-জুলে যদি কাটিয়েও নিই—শাহু কি আর রক্ষা রাখবে তা হলে! দেওয়ানী নয় হুজুর, ঠেলে দেবে ফৌজদারীতে। নইলে একশো টাকা আক্কেল সেলামী দিয়ে তিন হাত নাকে খত টানতে হবে শাহুর সদর কাছারীর সামনে।

—তাই নাকি!

—জী। তবে আর বলছি কী!

—হুঁ!—আলিমুদ্দিন ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। দিনের পর দিন একটার পর একটা অবাঞ্ছিত আঘাত আসছে, আর সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। খালি মনে হচ্ছে—এ তিনি চান নি—এ তিনি চান নি। দুই আর দুইয়ে চারের মতো যাকে অত্যন্ত সরল আর তরল বলে ধারণা জন্মেছিল, দেখা যাচ্ছে তা অত সহজ নয়। অনেক দিন ধরে কঠিন হাতে লাঙলের আঁচড় কাটতে হবে, বেছে বেছে ভেঙে ফেলতে হবে অনেক সর্বনাশা মাটি-পোকার বাসা, গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলতে হবে পাথরের মতো শক্ত অনেক মাটির চাঙাড়। তারপর:

তারপর: এই মাটিতে পাকিস্তানের ফসল। গরীবের দুনিয়া।

বাজার করে ফিরল জিব্রাইল। কাঁধে ধামা।

—মুরগী পাওয়া গেল না হুজুর। বলছে মড়ক লেগেছে। মাছও নেই।

—তরকারী এনেছ তো?

—তা এনেছি। আলু পেঁয়াজ, শাক।

—ব্যাস্ ব্যাস্, ওতেই চলবে।

জিব্রাইল ভেতরের দিকে পা বাড়াচ্ছিল, কী ভেবে হঠাৎ থেমে দাঁড়াল।

—জী, একটা কথা। শাহু ডেকে পাঠিয়েছে।

নিজের অজ্ঞাতেই ভ্রুকুঞ্চিত করলেন আলিমুদ্দিন। লোকটাকে আর যেন তিনি সহ্য করতে পারছেন না। নিতান্তই কাজের খাতিরে যেতে হয়, তাই যাওয়া। নইলে মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে, বৈঠকের ভেতরে সকলের সামনেই একটা নির্মম থাবা দিয়ে লোকটার মুখোস তিনি ছিন্নভিন্ন করে দেন।

—কেন?

—বিকেলে ভারী জমায়েতের ব্যবস্থা করেছেন। আপনার সঙ্গে তাই নিয়ে আলাপ করবেন।

—এখুনি যেতে হবে?—গলার স্বরে তাঁর একটা চাপা বিদ্রোহ প্রকাশ পেল।

—জী হাঁ। এখুনি।

হুকুম! সারা শরীরের মধ্যে জ্বালা করে উঠল। পালনগরে শাহুর ইস্কুলে না হয় মাস্টারীই নিয়েছেন, তাই বলে কোনো দাসখৎ লিখে দেননি তিনি। একটা হাতছানি দিয়ে ডাকলেই যে দৌড়ে গিয়ে শাহুর নাগরা জুতোর নিচে পোষা কুকুরের মতো লুটিয়ে পড়তে হবে—স্বীকার করে তো নেননি এমন কোনো প্রতিশ্রুতি। তিনি মাস্টার। স্বাধীন বিবেক নিয়ে পথ চলাই তাঁর কাজ—যা সত্য তাকে ঘোষণা করাই তাঁর দায়িত্ব। তাঁর নৈতিক কর্তব্য ছাত্রদের কাছে—দেশের কাছে। শিক্ষক শুধু খোদার বান্দা—দুনিয়ার মালিক ছাড়া কারো কাছে সে মাথা নত করতে জানেনা।

গড়গড়া টানছিলেন আলিমুদ্দিন, একটা টান দিয়ে সরিয়ে দিলেন নলটা। তিক্ত স্বরে বললেন, কিসের ওয়াজ?

—লীগের একটা আলোচনা হবে বলছিলেন—জিব্রাইল ভেতরে চলে গেল।

সলিম মুন্‌সী বললে, হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই বটে। আমাদের গাঁয়েও ঢোল পড়েছে।

জোনাবালি বললে, আচ্ছা মাস্টার সায়েব, কী হবে লীগ দিয়ে?

অন্য সময় হলে পরমোৎসাহে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা

করতে বসতেন আলিমুদ্দিন। উদ্দীপনা জেগে উঠত মনের ভেতর, দপ দপ করে জলে উঠত চোখ। বলতেন ইসলামের কথা, তার আদর্শের কথা, দুনিয়ার তামাম গরীবের বেহেস্ত গুলিস্তাঁ পাকিস্তানের কথা। কিন্তু সাতদিন ধরে কেন যেন তেমন করে আর জোর পাচ্ছেন না।

হ্যাঁ—পাকিস্তান চান বই কি। কিন্তু এই বনিয়াদের ওপর? ফতেশা পাঠানদের ওপর ভর দিয়ে? না।

তবু—লীগ, লীগ। কায়েদে আজমের নির্দেশ। তাঁর স্বপ্ন, তাঁর সাধনা।

আলিমুদ্দিন উঠে দাঁড়ালেন।

—আচ্ছা ভাই সাহেব সব, আমি তা হলে চলি। বিকেলে আপনারা আসবেন।

—জী, আসব।

দু পা বাড়িয়েছেন আলিমুদ্দিন, এমন সময় পেছন থেকে ভীরু কণ্ঠের ডাক এলো: সাহেব!

তাকিয়ে দেখলেন, সলিম।

—কিছু বলবে মিঞা সাহেব?

—এই বলছিলাম—সলিম একটা ঢোঁক গিললে, আমরা পুকুর-টুকুর সম্বন্ধে যে সব কথা বলছিলাম, সেগুলো যেন আর শাহুকে—কথাটা অসমাপ্ত রেখেই সে থেমে গেল।

—কেন?—আলিমুদ্দিন ভ্রূকুঞ্চিত করলেন: আমি তো ওকথাটা গিয়েই বলব ভাবছিলাম। একাজ তো শাহুর করাই উচিত। প্রজাকেই যদি না বাঁচালো, তা হলে কিসের জমিদার! আর তা ছাড়া ফসল ভালো হলে জমিদারেরই তো লাভ—বাকী বকেয়া কিছু পড়ে থাকবে না প্রজার কাছে।

—ফসল ভালো না হলেও বাকী বকেয়া কোনোদিন থাকে না শাহুর কাছে। বাদিয়া পাড়ার পাইকেরা আছে। জোনাবালি বললে, তাই ফসল ভালো না করলেও শাহুর চলবে।

—আচ্ছা, আচ্ছা, সে আমি দেখব—আলিমুদ্দিন দ্রুত পা চালালেন।

না, আর কথা বলবার সাহস নেই—আলোচনা জাগিয়ে তোলবার আগ্রহ নেই একবিন্দু। হঠাৎ তাঁর মনে হল: এই দিগ্‌দিগন্তব্যাপী রাঙা মাটির ঢেউ খেলানো বরেন্দ্র-ভূমির প্রান্তরে তিনি দাঁড়াবেন কোথায়, কোন্‌খানে পা রাখবেন? সমস্ত মাঠটাই যেন আলাদ, খরিশ আর চিতি বোড়ার গর্তে ঝাঁঝ্‌রা হয়ে গেছে—কতকাল আর নাগ্‌রা জুতোর নিচে চেপে রাখা যাবে কাল-সাপের এই সব বিবরগুলো?

ধুলো-ভরা পথটায় এখন এলোমেলো কাদার ছোপ। কোথাও কোথাও মাটি পিছল, চলতে হয় পা টিপে টিপে। সন্ত্রস্ত সতর্ক পায়ে চললেন আলিমুদ্দিন। দূরে দূরে ধান-সিঁড়ি জমির ওপর সবুজ গাঢ় সবুজ—রঙের ধান; তার ভেতর দিয়ে একটা বাঁক নিয়ে বয়ে গেছে মালিনী নদী। যেন সবুজ ইস্‌লামী পতাকায় ঝকঝক করে উঠছে রজতশুভ্র চন্দ্ররেখার দীপ্তি।

মাটিতে জড়ানো ওই যে সবুজ পতাকা, ওই পতাকা তুলে ধরবে মাটির মানুষেরাই। ওই চাঁদের আলো গলানো নদীর রেখা, ও তো মাটির মানুষেরই চোখের জল। শাহুর নাগরা জুতোর তলায় আর এ পতাকাকে এমন ভাবে লাঞ্ছিত হতে দেওয়া যাবে না। একে বাঁচাতে হবে—বাঁচাতেই হবে।

কিন্তু কী করে?

অসহায়ভাবে মনের মধ্যে যেন একটা উত্তর খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। পারবেন? সাহস হবে তাঁর শাহুর বিরুদ্ধে মাথা তুলে এই মানুষগুলোকে এককাট্টা করতে? সব মানুষকে খোদার আইনে ভাগ করে দিতে পারবেন তার পাওনা মাটি, তার মেহনতী ফসল, তার সাচ্চা ইমান?

—আদাব মাস্টার সাহেব। আপনাকেই খুঁজছিলাম।

—কে?—চমকে উঠে তাকালেন আলিমুদ্দিন। এলাহী বক্স—বাদিয়াপাড়ার মাতব্বর।

—কী হয়েছে এলাহী?

—আমার বেটিটা বুঝি আর বাঁচল না মাস্টার সাহেব। এলাহীর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

পা দুটো পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেল, যেখানে ছিলেন সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়লেন আলিমুদ্দিন মাস্টার: কী হয়েছে।

—কাল রাত থেকে খুব চেঁচামেচি করছে, আর খুব

জর। সরকারী দাওয়াখানা থেকে ওষুধ নিয়ে তো আসছি, কিন্তু—এলাহী কথা বলতে পারল না।

দেশ সেবার প্রথম হিড়িকে অনেক কিছুই করেছিলেন আলিমুদ্দিন—এমন কি বছর খানেক কম্পাউণ্ডারীও। এলাহীর হাত থেকে ওষুধের শিশি আর প্রেসক্রীপশনটা তুলে নিলেন কৌতূহলবশে।

—কী ওষুধ দিলেন ডাক্তার, দেখি?

এক মুহূর্তের জন্তে চোখ পড়ল প্রেসক্রীপ্‌শনের দিকে। তারপরেই চোখে আগুন জ্বলে উঠল।

—এই ওষুধ দিয়েছে ডাক্তার?

এলাহী সভয়ে বললে, জী।

ভয়ঙ্কর গলায় আলিমুদ্দিন বললেন, তোমাদের ডাক্তার না এল-এম-এফ?

—কী জানি হুজুর, অতশত জানিনা।

—এসো আমার সঙ্গে। ডান দিকে বাঁক নিলেন আলিমুদ্দিন। ভুলে গেলেন, শাহর আহ্বানে তিনি চলেছিলেন বিকেলের জরুরি ওয়াজ সম্বন্ধে আলোচনা করতে, ভুলে গেলেন তাঁরই হাতে-গড়া মুস্‌লিম-লীগের আজকে একটা স্মরণীয় অনুষ্ঠান।

দ্রুতবেগে চলতে লাগলেন আলিমুদ্দিন। রক্তের মধ্যে একটা অসংযত চাঞ্চল্য। কোথায় যেন নিঃশব্দ বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে একটা। পায়ের একটা কড়ে আঙুলে যেন ছোবল লেগেছে বিবর-ছিদ্রিত বরিন্দের মাঠে লুকোনো কোনো একটি নাগশিশুর। এলাহী বক্স সভয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল।

কিন্তু ডিস্‌পেন্‌শারী পর্যন্ত আর যেতে হলনা। পথেই দেখা হল সরকারী ডাক্তারখানার ডাক্তার খোদাবক্স খন্দকারের সঙ্গে। সাইকেলে করে বেরিয়েছেন রুগী দেখতে।

—ডাক্তার সাহেব!—আলিমুদ্দিন ডাকলেন।

—এই যে, কী খবর মাস্টার সাহেব?—সাইকেলে চলতে চলতেই জবাব দিলেন ডাক্তার।

—একটা দরকারী কথা আছে নামুন।

ডাক্তার নামলেন। হাসলেন এক গাল।

—বিকেলে মিটিংয়ের কথা বলছেন তো? হাঁা, সে আমার মনে আছে।

—না, মিটিং নয়।—আলিমুদ্দিন হাতের প্রেসক্রীপশনটা মেলে ধরলেন: এইটে।

—কিসের প্রেসক্রীপ্‌শন?—বিস্ময় ফুটল ডাক্তারের স্বরে।

—আপনারই।

—হাঁা-হাঁা-তাইতো।—মনোযোগ দিয়ে একবার চোখ বুলোলেন ডাক্তার: রাজিয়া খাতুন—চব্বিশ বছর, ম্যালেরিয়া। সিন্‌কোনা মিক্‌শ্চার। কী হয়েছে তাতে?

—না, কিছু হয়নি।—থমথমে গাঢ় গলায় আলিমুদ্দিন বললেন, কিন্তু রাজিয়া খাতুনের কেসটা কি সম্পূর্ণ শুনেছেন আপনি?

—কী আবার শুনব? জ্বর হয়েছে—ম্যালেরিয়া!—তাচ্ছিল্যভরে ডাক্তার বললেন, ওতেই সেরে যাবে।

—যদি না সারে?

আলিমুদ্দিনের জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন খোদাবক্স খন্দকার। লোকটার হাল-চাল এমন যে—যেন জেরা করতে এসেছে। যেন সাক্ষাৎ সিভিল-সার্জন এসে উপস্থিত হয়েছেন ডিস্‌পেনশারী ইন্‌স্‌পেক্‌শনে।

—না সারে মরবে। সবাইকেই বাঁচাবার গ্যারান্টি দিয়ে কেউ ডাক্তারী করতে আসে না মিঞা সাহেব।

—তা আসে না। কিন্তু রোগটা জেনে ওষুধ দেয়।

ডাক্তারের মুখ লাল হয়ে উঠল। অপমান করছে তাঁকে—মূর্খ বলছে প্রকারান্তরে। অহেতুক অনধিকার চর্চা।

খোদাবক্স বললেন, নিজের কাজ নিজে করুন মিঞা সাহেব, আমার কাজটা আমাকেই ছেড়ে দিন।

—না।—আলিমুদ্দিন হঠাৎ পথ আটকে দাঁড়ালেন। আগুন-ঝরা গলায় বললেন: না। মানুষের জীবন নিয়ে কেন আপনারা এই ছিনিমিনি খেলেন, তার কৈফিয়ৎ দিয়ে যেতে হবে।

—কৈফিয়ৎ!—বাঁকা ঠোঁটে জ্বালা-ভরা হাসি হাসলেন ডাক্তার: আপনি আমার মনিব নন। কৈফিয়ৎ দিতে হয় দেব সিভিল সার্জনকে, নইলে শাহুকে। আপনাকে নয়।

শাহু! আলিমুদ্দিনের মাথার মধ্যে যেন একটা আগুনের চাকা পাক খেতে লাগল। শাহুই বটে! মনে পড়ল, খোদাবক্স খন্দকার সম্পর্কে শাহুর চাচাতো ভাই।

—পথ ছাড়ুন—খোদাবক্স বললেন।

—না, জবাব দিয়ে যেতে হবে।

—জবাব ?—ডাক্তারের খুন চেপে গেল। অপমান! আরো বিশেষ করে এলাহী বক্সের সামনে! বাঁ হাত দিয়ে আলিমুদ্দিনকে একটা ধাক্কা দিয়ে ডাক্তার বললেন, সরে যান।

ধাক্কাটা হয়তো একটু জোরেই লেগেছিল। অথবা ধাক্কা নয়—বিস্ফোরকের মুখে আগুন দেবার জন্যে ওইটুকু মাত্রই বাকী ছিল হয়তো। মাথার মধ্যে আগুনের চাকা-টার আবর্তন আরো দ্রুত, আরো ক্ষিপ্র হয়ে উঠল। সাত দিনের সঞ্চিত বিষ বিদীর্ণ হয়ে পড়ল এক মুহূর্তে।

প্রকাণ্ড একটা ঘুষির ঘায়ে ধূলোর ওপর গড়িয়ে পড়লেন খোদাবক্স খন্দকার। আর্তনাদ করে উঠল এলাহী।

—এ কী করলেন মাস্টার সাহেব।

একটা ক্লান্ত বন্য জন্তুর মতো নিশ্বাস ফেলছিলেন আলি-মুদ্দিন। দুটো চোখে যেন সমস্ত রক্ত এসে জড়ো হয়েছে তাঁর। জবাব দিলেন না—দাঁড়িয়ে রইলেন স্থাণুর মতো।

ডাক্তার ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। ঝাড়লেন গায়ের ধূলো। হায়নার মতো এক সার দাঁত বের করে যেন হাসলেন মনে হল। সে দাঁতের ওপর রক্তের একটা আবরণ নেমে এসেছে।

—আদাব, পরে বোঝা পড়া হবে—সাইকেলটা তুলে নিয়ে উঠে পড়লেন ডাক্তার—মিলিয়ে গেলেন ঝড়ের বুকে। চাকার তলা থেকে একরাশ লাল কাদা ছর্ ছর্ করে ছুটে বেরিয়ে গেল দু পাশে।

আরো, অনেক, অনেকক্ষণ পরে নীরবতা ভাঙল—এলাহী।

—হুজুর ?

—অ্যাঁ ?—যেন ঘুম-ভাঙা চোখ মেলে জানতে চাইলেন আলিমুদ্দিন।

—এযে ভারী বিশ্রী হয়ে গেল।—ভয়ে ভয়ে জড়ানো গলায় এলাহী বললে।

—হাঁা, তা হল।—আলিমুদ্দিন মাষ্টার নিজের মধ্যে ফিরে এলেন। ছিঃ ছিঃ—করলেন কী! এতদিনের এত সংযম, এত আত্ম-সংযমের শেষ পর্যন্ত এই পরিণাম। একটা সামান্য তুচ্ছতার আঘাত সইতে পারলেন না, ভেঙে পড়লেন টুকরো টুকরো হয়ে! একটা সামান্য পোকার ওপরে করলেন শক্তির এমন জঘন্য অপব্যবহার!

এক মুহূর্ত অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, চলো এলাহী।

—কোথায় ?

—তোমার বাড়িতে। তোমার মেয়েকে একবার আমি দেখব। যদি না সারাতে পারি, সদরে পাঠিয়ে দিয়ো। যা দরকার, সব খরচা আমিই দেব।

এলাহী আবার ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেলল: মাস্টার সাহেব।

বিরক্ত গলায় আলিমুদ্দিন বললেন, চলো, চলো। বেশি দেরী কোরোনা। আমার আবার সময় নেই, একটু পরেই শাহুর বাড়িতে দৌড়তে হবে।

* * * *

ফতেশা পাঠান গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন। ঘন ঘন পাক দিচ্ছিলেন কাঁকড়া-বিছের লেজের মতো গোফজোড়ায়। মামলাটা অত্যন্ত জটিল। কোনো পক্ষেই রায় দেওয়া সহজ নয় তাঁর পক্ষে। খোদাবক্স খন্দকার তাঁর নিজের আত্মীয়, তার অপমানের আঁচটা তাঁরও গায়ে লাগে। অন্য সময় হলে এতক্ষণে দুটো পাইক বরকন্দাজ পাঠিয়ে বেঁধে আনতেন মাষ্টারকে, জুতোর ব্যবস্থা করতেন তাঁর কাছারী বাড়ির সামনে। কিন্তু মাষ্টারের গায়ে হাত দেওয়া সহজ নয়। গ্রামের লোকের মনে জনপ্রিয়তার এমন একটা জায়গা করে নিয়েছেন মাষ্টার, যে বেশি কিছু করতে গেলে ঘটনাটা অনেকদূর পর্যন্ত গড়াতে পারে।

তা ছাড়া আপাতত যেমন করে হোক ওই মাষ্টারকে তাঁর মুঠোর মধ্যে রাখা চাই। অনেক কাজ হবে—অনেক কাজ হবে। অফুরন্ত সুযোগ আসছে। প্রজাদের ভেতরে ঘনিয়ে-আসা অসন্তোষের উলটো পথে চালিয়ে দেবার প্রধান উপকরণ হয়ে দাঁড়াবে ওই মাষ্টার। তার পর ওই বশ-না-মানা সাঁওতালেরা। কিছুতেই জব্দ করতে পারেননি—ওই খাজনা-না-দেওয়া তীর-শানানো মানুষগুলো তাঁর বুকের মধ্যে বিঁধে আছে কাঁটার মতো। সব শেষে কুমার ভৈরবনারায়ণ। পাশাপাশি বাস করা কঠিনতম প্রতিদ্বন্দী। এক ঢিলে শুধু দুটো নয়—এক ঝাঁক পাখি

বধ করবার প্রতিশ্রুতি। একটা কাঁচা কাজের ভেতর দিয়ে এতখানি ভবিষ্যৎকে উড়িয়ে দেওয়া যায়না।

গোঁ গোঁ করতে করতে খোদাবক্স বললেন, এর যদি ব্যবস্থা না করেন, তা হলে আমি আদালতে যাব।

—আহা-হা দাঁড়াও, ছেলেমানুষি করছ কেন?—বিপন্ন স্বরে বললেন ফতে শা।

—ছেলেমানুষি! খাঁচার ভেতরে খোঁচা-খাওয়া একটা বেবুনের মতো মুখ খিঁচোলেন ডাক্তার: রাস্তার মাঝখানে আমায় ঘুষি মারল, দাঁত দিয়ে এখনো রক্ত পড়ছে। তার ওপর মানহানি। আপনি একে ছেলেমানুষি বলবেন!

—দাঁড়াও, দাঁড়াও—দেখছি! আঃ—কী মুশ্‌কিল! আবার গোঁফের প্রান্ত দুটো পাকালেন শাহু।

—আমি আপনাকে বলে রাখছি—ডাক্তার চৌকির ওপরে একটা হিংস্র কিল মারলেন:—বলে রাখছি—কিন্তু বলাটা শেষ হলনা। তার আগেই বারান্দায় চটির শব্দ উঠল। ঘরে ঢুকলেন আলিমুদ্দিন মাষ্টার।

—আদাব মাষ্টার সাহেব, আসুন, আসুন—কেমন যেন থতমত খেয়ে স্বাগত জানালেন শাহু। ডাক্তার আগুন-ঝরা চোখ দুটোকে ঘুরিয়ে নিলেন দেওয়ালের আরেক দিকে।

আলিমুদ্দিন শাহুর অভিবাদনের কোনো জবাব দিলেন না। সোজা এগিয়ে গেলেন ডাক্তারের কাছে।

—মাফ করুন ডাক্তার সাহেব।

অকৃত্রিক বিস্ময়ে খোদবক্স মুখ ফেরালেন। কিছু একটা বলতে গিয়েও বলতে না পেরে হতভম্বভাবে মুখটাকে আধখানা ফাঁক করে রইলেন ফতে শা।

আলিমুদ্দিন বললেন, ভারী অন্যায় করে ফেলেছি—ঝোঁকের ওপর মাথা ঠিক ছিলনা। মাফ করুন। ফতেশাই স্বাভাবিক হয়ে এলেন আগে।

—বাঃ, তবে তো চুকেবুকেই গেল। কী বলো খোদাবক্স?

খোদাবক্স হাঁড়ির মতো মুখ করে রইলেন।

দু হাত জুড়ে নাছোড়বান্দা আলিমুদ্দিন বললেন, বলুন, মাফ করলেন? আর তা ছাড়া আমার এই অন্যায়ের জন্তে শাহু যদি কিছু জরিমানা করেন, তাও দিতে রাজি আছি আমি।

এবার খোদাবক্সের হয়ে শাহুই তাড়াতাড়ি কথা কয়ে উঠলেন: আরে না—না, সে কী কথা! এ তো একটা তুচ্ছ ব্যাপার। এর জন্যে এত ঝামেলা করবার কী আছে। খোদাবক্স তো আমার ভাই হয়, ওর তরফ থেকেই আমি বলছি—আপনি নিজে যখন মাফ চাইলেন, সেই সঙ্গেই সব চুকে বুকে গেল।

—হ্যাঁ, তা হলে চুকে বুকেই গেল। আর এ নিয়ে ঝামেলা করবার কী আছে।—শাহুর কথাগুলোরই কেমন একটা পুনরাবৃত্তি করলেন ডাক্তার, তার ভেতরে একটা ব্যঙ্গের খাদও মেশানো রইল কিনা, বোঝা গেল না। কিন্তু তার পরেই ছটফট করে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার: আমি যাই ফতে ভাই। ভালুক গাঁয়ে আমার তিন চারটে রুগী আছে।

ডাক্তারের সাইকেলের শব্দ অনেকদূর মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কেউ কোনো কথা কইলেন না। তারও পরে শটকার নল তুলে একটা টান দিলেন শতে শা, একবার নড়ে-চড়ে বসলেন আলিমুদ্দিন। কী যে ঠিক বলা উচিত, খুঁজে পেলেননা শাহু; আর আলিমুদ্দিন যেন নিজের মনের মধ্যেই তলিয়ে রইলেন।

তার পর:

হঠাৎ কী একটা কথা মনে পড়ল শাহুর। মনে পড়ল, খোদাবক্স আসবার আগে পর্যন্ত তা নিয়ে বিশ্রী অস্বস্তি বোধ করছিলেন তিনি।

—হ্যাঁ, সকালে আপনার চাকর জিব্রাইলকে দিয়ে একটা খবর পাঠিয়েছিলাম। পাননি?

—পেয়েছিলাম।—অন্যমনস্কভাবে মাষ্টার জবাব দিলেন।

—এলেন না তো।

—আসব মনে করেছিলাম, সময় পাইনি।

—ওঃ!—শাহু একটু চুপ করে রইলেন: লীগের নামে খুব সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। প্রায় পঞ্চাশ টাকা চাঁদা উঠেছে, আরো উঠবে মনে হয়।

—খুব ভালো কথা! নিজের অজ্ঞাতেই একটা উৎসাহের উত্তাপ অনুভব করলেন আলিমুদ্দিন।

—আজ বিকেলে তাদের জমায়েত হবার ঢোল দিয়েছি। আপনি তাদের লীগের উদ্দেশ্য, তার কাজ—সব ভালো করে বুঝিয়ে বলবেন। তা ছাড়া কাল সন্ধ্যেয়

আমার এক ভাই ইস্‌মাইলও এসেছে পাবনা থেকে। সে তো সব কথা শুনে লাফিয়ে উঠল। বললে, পাবনায় এ নিয়ে তারা খুব কাজ করছে, এখানে যে এতদিন কিছু হয়নি, সে শুনে তাজ্জব বনে গেল। সেও কিছু বলবে।

—বেশ তো।—এতক্ষণে আলিমুদ্দিন প্রসন্নভাবে হাসলেন।

—সকালে আপনাকে ডেকেছিলাম—একটু অনুযোগ-ভরা স্বরে শাহু বললেন, ইসমাইলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। আপনি এলেননা—সে শিকারে বেরিয়ে গেল। ফিরতে অনেক দেরী হবে।

—আচ্ছা, বিকেলেই আলাপ হবে না হয়।—আলিমুদ্দিন ক্লান্তভাবে একটা হাই তুলিলেন: আর কোনো কথা আছে।

—না, এই জন্যেই ডাকছিলাম।

—তা হলে আমি এখন উঠি শাহু। আমার এখনো খানা-পিনা হয়নি!

—বলেন কি—এত বেলায়!—শাহু চমকে উঠলেন: তা হলে এখানেই—

—নাঃ থাক, জিব্রাইল বসে থাকবে। আদাব তা হলে—

আলিমুদ্দিন উঠে পড়লেন: বিকেলে তা হলে জমায়েতের সময় দেখা হবে।

কিন্তু বিকেলের জমায়েতে যা ঘটল, তার জন্যে আগে থেকে কারু মনে এতটুকুও আশঙ্কা ছিল না। শুধু ঝড় এলনা—বজ্র ভেঙে পড়ল আকাশ থেকে।

ক্রমশঃ

জবাব

বাস্তুত্যাগী

মহাভারতের চৈতী শাখায় ফুটাতে চেয়েছ ফুল?
মুন্সী তুমি যে, কথার মালার গাঁথন হয়নি ভুল।
ছেড়ে আসা গ্রামে প্রেতায়িত ছায়া নামিছে সর্ব্বনাশী
আজানের সাথে তাল দেয় শিবা দগ্ধ ভিটায় বসি।
মোল্লা হাঁকিছে নবদীক্ষিতে এবার বখ্‌ত যায়।
কাফের কুত্তা কম্‌বখ্‌তের ঠাঁই নাই দুনিয়ায়;
শরিয়ৎ নীতি ঘোষিতেছে ঘুঘু—শূন্য খামারের পরে
পোষা সারমেয় গাজীসাহেবের দুয়ারে কাঁদিয়া মরে;
আছে যে সেথায় পালিকা তাহার গোঁসাই বাড়ীর বধূ—
শ্বেতসীমন্ত বোরখায় ঢাকা লুণ্ঠিত হৃদিমধু।
কারো মায়া পেয়ে ছাড়ে নাই দেশ অভাগা বাস্তুত্যাগী
বন্দিনী মার মুক্তি যুদ্ধে ভুলের ফসলভাগী।
কবির কণ্ঠে ধ্বনিয়াছে তব মরমীর আহ্বান
সার্থক তব লেখনীধারণ, কবি-ই-পাকিস্তান!
ত্যাগের মাপেতে বাসা মেলে যদি পৃথিবী মোদের বাসা
ছাড়িয়া এসেছি পত্নীর প্রেম কন্যার ভালোবাসা!

কাফের কামিনী রাষ্ট্রপূজায় হারেমে কল্‌মা পড়ে
ছায়া ঘেরা তার শান্তির নীড় উড়াইল কোন ঝড়ে?
সন্তান পতি লুঠিছে ধূলায় আগুনে জ্বলিছে গেহ
লাঞ্ছিতা নারী অশ্রুবিহীনা পিশাচ মথিত দেহ।
স্বাধীন হবার দুবছর পরে ত্যজিয়াছি নিজবাস
বিশ্বসভায় অসময়ে কবি একি তব পরিহাস?
অতীত মথনে মোদের চিতায় ঝরিবে না অমৃত
ঘরের দানবে সামলাও কবি হইও না বিস্মৃত।
বিকৃত ক্ষুধার আহার জোটানো হয় যদি মুশকিল
হানিবে তোমারে তোমারি অস্ত্র তোমারি ইস্রাফিল।
তোলো নবসুর বীণায় তোমার নরপশু বশকরা
রাষ্ট্রচেতনা বাঁচাতে মোদের ছুটিয়া আসুক ত্বরা—
কবরে আমরা রয়েছি জাগিয়া স্মরি রোজ কেয়ামৎ
দেখিতে তোমার নবসাধনার নবজাত শরিয়ৎ।*

* চৈত্র ১৩৫৬এর "ভারতবর্ষে" 'বাস্তুত্যাগী' কবিতা পাঠে।

উদ্বাস্তু সমস্যা—

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত বিভাগের পর হইতে পূর্ববঙ্গের লোক ক্রমে ক্রমে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছিল। তাহার পর গত ২০শে ডিসেম্বর হইতে পূর্ববঙ্গে যে নারকীয় অনাচার আরম্ভ হইয়াছে, তাহার পর আর কোন হিন্দু পূর্ববঙ্গে বাস করা নিরাপদ বলিয়া মনে করিতেছে না। তাহার ফলে যাহারা বহু পুরুষের বাসভূমি ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছিল, তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ত নাই। এ বিষয়ে আমরা গত কয়েক মাস ধরিয়া আলোচনা করিয়াছি ; এমন কি, ৮ই এপ্রিল নেহরু লিয়াকৎ চুক্তি সম্পাদনের পরও প্রত্যহ গড়ে ১০ হাজার হিন্দু পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিতেছে। তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ত নাই। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট তাহাদের সাহায্য ও পুনর্বসতির জন্য ১০ কোটি টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করিলেও তাহাতে কোন ফলোদয় হইবে বলিয়া মনে হয়না। উদ্বাস্তুদের আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে প্রেরণেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে—হাজার হাজার লোক সে সকল প্রদেশেও প্রেরিত হইয়াছে ও হইতেছে। পশ্চিম বাঙ্গালায় যাহারা আসিতেছে, তাহাদের জন্য বহু সাহায্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহাদের মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা দানের অভাব দেখা যাইতেছে। চুক্তিতে বলা হইয়াছে, যাহারা আবার পূর্ববঙ্গে ফিরিয়া যাইবে, তাহাদের তথায় বাসের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু সে বিষয়েও কিছু করা হয় নাই। বরং যাহারা পূর্ববঙ্গে ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট নিজেদের ইসলামি গভর্ণমেণ্ট বলিয়া ঘোষণা করে—কাজেই তথায় হিন্দুদের মর্য্যাদা দান বা স্বার্থ রক্ষার কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না। অথচ ভারত রাষ্ট্র লৌকিক গভর্ণমেণ্ট বলিয়া নিজেদের ঘোষণা করিয়াছে ও ভারত রাষ্ট্রে মুসলমানদের সমান অধিকার ও মর্য্যাদা দানের ব্যবস্থা আছে। এ অবস্থায় হিন্দু আর পূর্ববঙ্গে বাস করিতে চাহে না—শেষ পর্য্যন্ত কেহ বাস করিতে পারিবে বলিয়াও মনে হয় না। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির সর্ত্ত ভাল হইলেও যদি পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট তাহা মান্য না করে, তবে তাহার সার্থকতা কোথায়, সাধারণ লোক এখনও তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। সে জন্য দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সকল লোক চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যহ যে ১০ হাজার করিয়া উদ্বাস্তু পশ্চিম বঙ্গে আসিতেছে, তাহাদেরও অনেকে নানা কারণে মৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হইবে। এই ধ্বংস লীলার মধ্যে আজ বাঙ্গালীকে বাস করিতে হইতেছে।

শ্যামাপ্রসাদ ও ক্ষিতীশচন্দ্র—

গত ৮ই এপ্রিল দিল্লীতে বাঙ্গালার সমস্যা লইয়া ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সহিত পকিস্তান প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁর যে চুক্তি হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদে ভারত-রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী পদত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছেন। পণ্ডিত জহরলালের সহিত এই পদত্যাগ লইয়া তাঁহাদের বহু আলোচনা হইয়াছিল, কিন্তু চুক্তির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে পণ্ডিতজী তাঁহাদের বুঝাইতে সমর্থ হন নাই। বাংলা হইতে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের প্রায় সকল সদস্য—বিশেষ করিয়া পণ্ডিত শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মৈত্র এবং শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার, শ্যামাপ্রসাদ ও ক্ষিতীশচন্দ্রের এই কার্য্য সর্বতোভাবে সমর্থন করিয়াছেন। দুইজন উপযুক্ত মন্ত্রীর পদত্যাগের পর আজ বাঙ্গালী তাহাদের অসহায় মনে করিতেছে। বাঙ্গালার অবস্থা সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদ ও ক্ষিতীশচন্দ্র যত ওয়াকিবহাল ছিলেন—এরূপ আর কেহ নাই। চুক্তির মধ্যে যাহাই থাকুক না কেন, তাহা যে পাকিস্তান সরকার কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবেন না—এ বিষয়ে বাঙ্গালী-মাত্রই একমত। পাকিস্তান ইতিপূর্ব্বে বহুবার ভারত রাষ্ট্রের সহিত বহু চুক্তি করিয়াছে কিন্তু কোনটির সর্ত্ত পালনের ব্যবস্থা করেন নাই। কাজেই আজ চাপে পড়িয়া মিঃ লিয়াকৎ আলি যাহাই করিয়া থাকুন না কেন, তাহা যে মান্য করা হইবে না—তাহা স্পষ্টই বুঝা

যাইতেছে। চুক্তি সম্পাদনের পর প্রায় এক মাস অতীত হইয়াছে, পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের রক্ষার কোন ব্যবস্থা ত' দূরের কথা, এতটুকু শুভ মনোভাব পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই। পূর্ববঙ্গ হইতে সকল হিন্দু চলিয়া আসিতেছে এবং আনসারগণ পূর্ববঙ্গে পূর্বের মত হিন্দুদের উপর অবাধে অত্যাচার চালাইতেছে। পণ্ডিত নেহরুর অসাধারণ বুদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ না থাকিলেও আজ বাঙ্গালী তাঁহার কার্য্য সমর্থন করিতে পারিতেছে না। পশ্চিম বাংলার শাসন ব্যবস্থা দ্রুত পরিবর্ত্তন করা হইতেছে—এই পরিবর্ত্তনের ফল কি হইবে তাহাও বলা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ও অসাধারণ বিচক্ষণ লোক—তিনিও বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালীকে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হন নাই। চুক্তির মর্ম্ম দেশের লোক বুঝিতে পারে না—কাজেই তাহা কার্য্যে পরিণত করায় ব্যবস্থা কি ভাবে হইবে? বাঙ্গালী আজ সত্যই বিভ্রান্ত—তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে।

কলিকাতায় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ—

কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীত্ব ছাড়িয়া দিয়া ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত ২১শে এপ্রিল কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি এই পদত্যাগ ব্যাপারে যে সাহস ও নির্ভীকতা প্রকাশ করিয়াছেন, সেজন্য বাঙ্গালী মাত্রেই তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। সেদিন হাওড়া ষ্টেশনে তাঁহার সম্বর্দ্ধনায় তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি কলিকাতায় আসিয়া উদ্বাস্তু দুর্গতদের সাহায্য ও পুনর্বসতি ব্যাপারে কার্য্য করিতেছেন। কয়দিন তিনি শিয়ালদহ ষ্টেশনে, বনগ্রামে ও রাণাঘাটে যাইয়া দুর্গতদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। আজ বাঙ্গালীর এই দুর্দিনে তাঁহার এই কার্য্য তাঁহাকে আরও মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি ও আশা করি, তাঁহার দ্বারা বাঙ্গালী তাহার এই দুর্দিনে প্রকৃত উপকার লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি—

৬দিন ধরিয়া দিল্লীতে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁর আলোচনার পর ৮ই এপ্রিল উভয়ে এক চুক্তি-পত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন। তাহার পূর্বে পাকিস্তানের অবস্থা সত্যই সঙ্গীণ হইয়াছিল। পাকিস্তান হইতে পাট চালান বন্ধের ফলে পাটচাষীরা চরম দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিল। কয়লার অভাবে পাকিস্তানে ষ্টীমার ও রেল চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পাকিস্তানে বস্ত্র রপ্তানী বন্ধ হওয়ায় তথায় লোকের দারুণ বস্ত্রাভাব দেখা গিয়াছিল। তাহার পর ভারত রাষ্ট্রে মুসলমানের জীবন বিপন্ন হওয়ায় তথায় মুসলমানগণ বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়াছিল। হিন্দুদের উপর অনাচারে ব্যথিত হইয়া মিঃ লিয়াকৎ আলি চুক্তি সম্পাদন করিতে আসিয়াছিলেন—এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। পণ্ডিত নেহরু পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর অনাচার বন্ধের কোন উপায় না দেখিয়া শেষ পর্য্যন্ত এই চুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার ফলে ভারতীয় রাষ্ট্রের কোন লাভের সম্ভাবনা নাই—কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র অর্থনীতির দিক দিয়া প্রচুর লাভবান হইবে। চুক্তিতে পাকিস্তানবাসী অনাচারী আনসার সম্প্রদায় সম্বন্ধে কোন কথা নাই। পাকিস্তানে যে কোন অনাচার ঘটুক না কেন, রাষ্ট্রনায়কগণ বলেন, রাষ্ট্রের সহিত সে সকল অনাচারের কোন সম্বন্ধ নাই—একদল গুণ্ডা প্রকৃতির লোক ঐ সকল অনাচার করিতেছে। অথচ সে সকল গুণ্ডাপ্রকৃতির লোককে দমন করিবার ইচ্ছা বা শক্তি পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের আছে বলিয়া মনে হয় না। পণ্ডিত নেহরু কি ভাবিয়া এই চুক্তি করিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন—দেশবাসী কেহই এই চুক্তির ফলে সন্তুষ্ট হয় নাই। কারণ চুক্তির পরও পাকিস্তানে অনাচার সমান ভাবেই চলিয়াছে—পাক-গভর্ণমেণ্ট তাহা বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত করেন নাই। ভারত রাষ্ট্রে দুষ্কৃতকারী বলিয়া বহু সহস্র লোককে গ্রেপ্তার করা হইলেও পাকিস্তানে একজন দুষ্কৃতকারীও ধৃত হয় নাই। চুক্তি রক্ষার এই নমুনাই দেখা যাইতেছে।

আসা-যাওয়া—

৮ই এপ্রিল লিয়াকৎ-নেহরু চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। তাহার পরও কিরূপ সংখ্যায় হিন্দু পূর্ব পাকিস্তান হইতে চলিয়া আসিতেছে ও কিরূপ মুসলমান পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্ববঙ্গে চলিয়া যাইতেছে, সে সম্বন্ধে নিম্নে আমরা ৫দিনের হিসাব দিলাম। ইহা হইতে সম্প্রীতির নমুনা পাওয়া যাইবে—

	পূর্ববঙ্গ হইতে আগত হিন্দুর সংখ্যা	পূর্ববঙ্গে গত মুসলমানের সংখ্যা
এপ্রিল		
২৩।২৪	৩২৭৭২	৮৭৭৫
২৫	১৪৬৬৮	৩৮৭৫
২৬	১৬২১১	৬০৮৯
২৭	১৫৪১০	৭০৯১
২৮	১৩২২২	৬২৩৩

করাচীতে যাইয়া পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন—চুক্তির ফলে উভয় রাষ্ট্রেই লোক এখন শান্তিতে বাস করিতেছে! শান্তিতে বাসের ইহাই কি নমুনা?

কলিকাতায় সর্দার পেটেল—

ভারত রাষ্ট্রের ডেপুটী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই পেটেল কলিকাতায় আসিয়া ৬ দিন অবস্থান করিয়া গিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ২ দফায় কয়েক দিন কাটাইয়া গিয়াছেন। সর্দারজী চুক্তি সম্পাদনের পরে আসিয়াছিলেন ও যাহাতে চুক্তির সর্ত্ত পালিত হয়, তাহার ব্যবস্থায় মনোযোগী ছিলেন। চুক্তির ফলে বহু সরকারী কর্মচারী বদবদল করা হইয়াছে—দিল্লী হইতে কয়েকজন অভিজ্ঞ সরকারী কর্মচারীকে বাঙ্গালা দেশে আনিয়া বিভিন্ন কার্য্যের ভার প্রদান করা হইয়াছে। বাঙ্গালায় বহু হিন্দুকে গ্রেপ্তার করিয়া হায়রাণ করা হইয়াছে। বহু নিরীহ নিরপরাধ হিন্দু অযথা ধৃত হইয়া প্রহৃত ও নির্য্যাতীত হইয়াছেন। চুক্তি সম্পাদন যদি এইভাবে করা চলে, তবে ভারতীয় রাষ্ট্রের কি লাভ হইবে জানি না—পাকিস্তান বহুভাবে লাভবান হইবে। অথচ সর্দারজীর কলিকাতায় অবস্থানের সময়েই পূর্ববঙ্গে হিন্দু নির্য্যাতন বাড়িয়া গিয়াছিল—সে সম্বন্ধে সর্দারজী কি ব্যবস্থা করিয়াছেন জানা যায় নাই। সর্দারজীর কলিকাতায় উপস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের মন হইতে ভয় দূর না করিয়া বরং অযথা নির্য্যাতনের আশঙ্কা বাড়াইয়া দিয়াছিল।

হিন্দু নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার—

যে সকল দেশনেতা এক সময়ে হিন্দু মহাসভা-আন্দোলন পরিচালন করিতেন, নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি সম্পাদনের পর সকল প্রদেশেই তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হইয়াছে। তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ জানানো হয় নাই—অনেকে বৃদ্ধ ও অসুস্থ ছিলেন, তাহা সত্বেও তাঁহাদের অব্যাহতি দেওয়া হয় নাই। কংগ্রেসের নামে এখন দেশের শাসন কার্য্য চলিতেছে, কাজেই কংগ্রেস ছাড়া অন্য সকল রাজনীতিক-দলের লোকই রাষ্ট্র-বিরোধী বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। হিন্দু নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারে দেশের জনগণের মধ্যে যে অসন্তোষ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা অবশ্যই নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি রক্ষার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে। বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থা ক্রমে স্বৈরাচারে পরিণত হইতে চলিয়াছে—লোকের মনে এরূপ সন্দেহও ক্রমে জাগ্রত হইতেছে।

ডাক্তার বিধানচন্দ্রের দিল্লী গমন—

হঠাৎ জরুরী আহ্বান পাইয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে গত ২৯শে এপ্রিল দিল্লী যাইতে হইয়াছিল এবং তথায় তিনি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পণ্ডিত নেহরু ও শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর পদত্যাগের ফলে বাঙ্গালা দেশে এক নূতন অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে—আজ বাঙ্গালীর দুঃখ দুর্দ্দশার শেষ নাই—উদ্বাস্তু সমস্যা ও পাকিস্তান কর্ত্তৃক সীমান্তে গণ্ডগোল সৃষ্টি সর্বদা বাঙ্গালী হিন্দুর মনকে বিব্রত করিতেছে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র কি বাঙ্গালার প্রকৃত মনোভাব কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া এ অবস্থার প্রতীকারের উপায় স্থির করিতে পারিয়াছেন? চুক্তির সর্ত্ত কি পূর্ব পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট মান্য করিতেছে বা করিবে? তাহার ত কোন লক্ষণ আজিও দেখা যায় নাই। বিধানচন্দ্র সাহসী ও বুদ্ধিমান—বাঙ্গালী আজ তাঁহার মুখাপেক্ষী—পশ্চিম বাঙ্গালাকে রক্ষা করিতে তিনিই একমাত্র সমর্থ ব্যক্তি। তাই তাঁহার দিল্লী গমনে লোক নূতন কর্মপদ্ধতির আশায় আশান্বিত হইয়াছে।

নদীয়া জেলার অবস্থা—

ভারত ও বাঙ্গালার মত স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে নদীয়া জেলাও বিভক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি তিনটি সমস্যা নদীয়া জেলাকে বিব্রত করিয়াছে—ভারতীয় রাষ্ট্রের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে, পাকিস্তান হইতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু নদীয়া জেলায় আসিয়াছে। এখন আবার চুক্তির পর দলে দলে

মুসলমানগণ কুষ্টিয়া জেলা হইতে নদীয়ায় আসিতেছে। নদীয়া ও কুষ্টিয়া জেলার সীমানা ভালরূপ নির্দ্দিষ্ট নহে—এ অবস্থায় সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমানগণ নদীয়া জেলা হইতে কুষ্টিয়ায় যাইয়া গৃহ নির্মাণ করিয়াছে, কিন্তু তাহারা নদীয়া জেলার ঘরবাড়ী, সম্পত্তি প্রভৃতিও রক্ষা করিতেছে। গত ৫।৬ মাস ধরিয়া এ সমস্যার সমাধানে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের কোন আগ্রহ দেখা যায় নাই। ফলে দেশবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ত নাই। মুসলমানগণ বহু হিন্দু গ্রাম লুঠ করিয়াছে—তাহারও কোন প্রতীকার হয় নাই। কে কোন স্থানে থাকিবে তাহা স্থির না থাকায় চাষও প্রায় বন্ধ। এ সময়ে কঠোরতার সহিত ব্যবস্থা না করিলে নদীয়ার মত সমৃদ্ধ জেলা শ্মশানে পরিণত হইয়া যাইবে।

কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্র নগর—

স্বর্গত কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কৃষ্ণনগরের অধিবাসী ছিলেন। দেশ যে আজিও তাঁহার কথা বিস্মৃত হয় নাই, গত ২১শে এপ্রিল তাহা দেখা গিয়াছে। নদীয়া কৃষ্ণনগর সিটি রেল ষ্টেশনের পূর্বদিকে যে নূতন সহর গড়িয়া উঠিতেছে, বাঙ্গালার মন্ত্রী শ্রীযুত ভূপতি মজুমদার ঐ দিন তথায় যাইয়া নূতন নগরের নাম 'দ্বিজেন্দ্রনগর' দিয়া আসিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য, স্বাদেশিকতা ও কর্মধারা আজিকার দুর্দিনে বাঙ্গালীকে নূতন প্রাণ দান করুক, আমরা ইহাই প্রার্থনা করি। যাঁহারা 'দ্বিজেন্দ্র নগর' প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাঁহারাও দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র।

সাংবাদিকতা শিক্ষাদান—

ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সংঘের পক্ষ হইতে ২ বৎসর পূর্বে কলিকাতায় সাংবাদিকতা শিক্ষাদানের ব্যবস্থার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পরিকল্পনা পেশ করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা এখনও কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় গত ৬ই এপ্রিল সংঘের পক্ষ হইতে একদল প্রতিনিধি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সাংবাদিকতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রদেশেই ঐ বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে—কিন্তু কলিকাতায় সংবাদপত্রের সংখ্যা সর্বাধিক হওয়া সত্বেও এ বিষয়ে কিছু হয় নাই। অথচ উপযুক্তভাবে শিক্ষিত সাংবাদিকের অভাব কলিকাতা সহরেই সর্বাপেক্ষা অধিক। কলিকাতায় ধনী সাংবাদিকের সংখ্যাও কম নহে—কাজেই এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলে সত্বর সাংবাদিকতা শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে।

সংস্কৃত শিক্ষার প্রচার—

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র দেশে সংস্কৃত শিক্ষার পুনঃপ্রচারের জন্য বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা সমিতিকে নূতন করিয়া গঠন করিয়াছেন ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ঐ সমিতির সম্পাদক হইয়াছেন। যাহাতে বাঙ্গালার সংস্কৃত শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিও সংস্কৃত শিক্ষাদানকারী পণ্ডিতমণ্ডলী উপযুক্ত সরকারী সাহায্য লাভ করেন, তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সম্মান, মর্য্যাদা ও অর্থার্জনের উপায় স্থির করা না হইলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছাত্রাভাবে বন্ধ হইয়া যাইবে। লোক কেন সংস্কৃত পড়িবে, বর্ত্তমান যুগে শুধু জ্ঞানার্জনের জন্য কত লোক ঐ কাজ করিবে, এসকল বিষয়ে প্রচার কার্য্যের প্রয়োজন। পূর্ব্বে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী সমাজে যে সম্মান পাইতেন, এখন আর তাহা পান না। আমরা সংস্কৃত সমিতির পরিচালকগণকে এ বিষয়ে প্রচার কার্য্য করিতে অনুরোধ করি। শিক্ষকগণের জন্য সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যাহাতে ছাত্র পান, সে ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন। সংস্কৃতকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করা হইলে প্রয়োজনের তাগিদে লোক সংস্কৃত শিক্ষা করিত। এ বিষয়েও আন্দোলন উপযুক্তভাবে করা হয় নাই।

মজার খবর—

সংবাদপত্রে ১লা মে এক মজার খবর বাহির হইয়াছে। ইহা ১লা এপ্রিল প্রকাশিত হইলেই শোভন হইত। দিল্লীর ৬শত জন কোটিপতি ধনী এক প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন যে তাঁহারা আর কালো বাজারে ব্যবসা করিবেন না। আচার্য্য শ্রীতুলসী নামক এক সাধু এই ব্যাপারের মূলে আছেন। হঠাৎ 'বিড়াল বলে, মাছ খাবো না, কাশী যাবো' গোছের এই প্রতিজ্ঞার কারণ কি? ঐ সকল ধনী এত অধিক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন

যে এখন আর তাহার তাল সামলাইতে পারিতেছেন না। তাই আয়-কর, বিক্রয়-কর প্রভৃতি ফাঁকি দিবার জন্য বোধ হয় এই এক নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। যাহাদের কালো-বাজারের ফলে গত ১০ বৎসরে ভারতের কোটি কোটি লোক অন্নাভাবে মারা গিয়াছে, তাহাদের ঐ প্রতিজ্ঞার মূল্য কি? তাহারা এখন ঐ কথা বলিলেও কি তাহাদের ক্ষমা করা উচিত? আমরা এই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া হাসিব কি কাঁদিব, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

কলিকাতা রাজ্যপাল ভবনে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সমাবর্তন উৎসবে গৃহীত চিত্র—[১] শিক্ষা মন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী [২] রাজ্যপাল ডাঃ কাটজু [৩] পরিষদ সচিব ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

ভারত পাকিস্তান বাণিজ্য চুক্তি—

গত ২৫শে এপ্রিল ভারতের সহিত পাকিস্তানের যে বাণিজ্য চুক্তি হইয়াছে তদনুসারে পাকিস্তান সরকার ভারতকে ৪০ লক্ষ মণ কাঁচা পাট সরবরাহ করিবে এবং ভারত পাকিস্তানকে ২০ হাজার টন পাটজাত দ্রব্য প্রদান করিবে। তাহা ছাড়া পাকিস্তানকে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলিও দেওয়া হইবে—(১) সুতি মিহি কাপড়—৪৫ হাজার গাঁট (২) সুতা—৫ হাজার পাউণ্ড (৩) সরিষার তৈল—৭ হাজার টন (৪) তামাক—৫ হাজার পাউণ্ড (৫) লোহার চাদর বা টিন—৫ হাজার টন (৬) চাকা, টায়ার প্রভৃতি—১ হাজার টন (৭) তক্তা—১২ হাজার টন (৮) সিমেণ্ট—৫০ হাজার টন (৯) পশমজাত দ্রব্য —৫০ লক্ষ টাকার। ভারতীয় টাকায় এই বাণিজ্যের লেন-দেন হইবে। সবজী, মাছ, ফল, দুধ, পান, তুলাবীজ, সোডা এশ, কাঁচা চামড়া প্রভৃতিও বিনা বাধায় পাকিস্তান হইতে ভারতবর্ষে আসিবে। পাকিস্তান ১লক্ষ ৫০ হাজার টন গম ভারতকে প্রদান করিবে ও পাকিস্তান ভারত হইতে প্রয়োজনীয় কয়লা পাইবে। পাকিস্তান ভারতকে প্রয়োজনীয় তুলা দিবে। এই চুক্তির ফলে কোন পক্ষ অধিক লাভবান হইবে তাহা স্থির করা কঠিন। পাকিস্তানের অর্থনীতিক ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়িয়াছিল—কাজেই তাহারা যে এই চুক্তির ফলে আপাততঃ আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

জীবনযাত্রার মানের উন্নতি—

গত ১৯৪৩ সাল হইতে ভারতে জনগণের জীবনযাত্রার কিরূপ অধগতি হইয়াছে, তাহা সর্বজনবিদিত। মানুষ যত অর্থই উপার্জন করুক না কেন, খাদ্য ও বস্ত্রের মূল্য না কমিলে তাহার পক্ষে ব্যয় সঙ্কুলান করা সহজসাধ্য হইবে না। কি ভাবে তাহা করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনার জন্য গত ২৪শে এপ্রিল দিল্লীতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীরা ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতিগণ জাতীয় পরিকল্পনা সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এক বৎসরের জন্য একটি কর্ম্মসূচি গ্রহণ করা হইয়াছে এবং প্রধানমন্ত্রীরা ও কংগ্রেস সভাপতিরা একযোগে কাজ করিয়া সে বিষয়ে সাফল্য লাভের চেষ্টা করিবেন। ৩টি প্রধান লক্ষ্য স্থির হইয়াছে—(১) মোটের উপর আয় ও ব্যয়ের সমতা রক্ষা (২) যন্ত্রাদি সাহায্যে উৎপাদনের বিধান ও (৩) জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান সুস্পষ্টরূপে বৃদ্ধি। বাংলা দেশে লোক মাছ ও দুধ খাইয়া জীবন ধারণ করিত—বর্ত্তমান অবস্থায় মাছ ৩৲ টাকা সের ও দুধ ১৲ টাকা সের—কাজেই কেহই উহা খাইতে পায় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও কলিকাতায় মাছের সের ।০ আনা ও দুধের সের ৵০ আনা ছিল। এই সকল দ্রব্য উৎপাদনের কোন ব্যবস্থা নাই। উৎপাদনের অভাবে

আজ কলিকাতায় তরিতরকারীও দারুণ দুর্মূল্য। সরকারী ব্যবস্থা যদি উৎপাদন বৃদ্ধির সাহায্য করে, তবেই আয়-ব্যয়ের সমতা আসিবে—নচেৎ কোন অর্থনীতিই এই সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিবে না।

উদ্বাস্তু সাহায্য—

পূর্ববঙ্গে সাম্প্রতিক অনাচার আরম্ভ হওয়ার পর হইতে গত ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত মোট ১২ লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন বলিয়া সরকারী হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সরকার তাহাদের সাহায্যদান ও পুনর্বসতির নানা ব্যবস্থায় মন দিয়াছেন। ১৬ হাজার উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বসতির জন্য ১৩৭০ একর জমীতে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গৃহাদি নির্ম্মিত হইতেছে। ৫০৮১জন অনাথ স্ত্রীলোক ও শিশু ৫টি সরকারী আশ্রয় শিবিরে বিনামূল্যে আহার, বাসস্থান ও শিক্ষা পাইতেছেন। সরকার হইতে এইরূপ বহু ব্যবস্থা হইলেও দুর্গতদের সংখ্যার অনুপাতে তাহা সামান্যই বলিতে হয়। ১২ লক্ষ লোকের জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা কিছুতেই সম্ভব হইবে না। আমরা বহু আশ্রয় শিবির ও উদ্বাস্তু বসতি স্থান ঘুরিয়া দেখিয়াছি—মানুষের দুর্দ্দশা দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়। তাহাদের মধ্যে কত লোক যে মহামারিতে প্রাণ দিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। সরকারী ব্যবস্থা আরও উন্নততর হইলে হয় ত উদ্বাস্তুদের এত দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইত না। দুর্গত সাহায্য ব্যাপারের মধ্যেও দুর্নীতি দেখা যায়—ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

বাঙ্গালা প্রদেশের আয়তন বৃদ্ধি—

কুচবিহার রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হওয়ার পর ইহাকে পশ্চিম বাংলার সহিত যুক্ত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালকগণ বাঙ্গালীর ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে সকল উদ্বাস্তু আসিতেছে, তাহাদের বিহার, আসাম, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশে স্থান দানের ব্যবস্থা হওয়ায় তাহারাও উপকৃত হইতেছে। এ সময়ে পশ্চিম বঙ্গের আয়তন বৃদ্ধির কথা ও শুনা যাইতেছে। ত্রিপুরা রাজ্য ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইলেও তাহা এখনও কেন্দ্রীয় শাসনের অধীন আছে। শুনা যায়—ত্রিপুরা রাজ্য, শ্রীহট্টের করিমগঞ্জ অঞ্চল ও বিহারের পূর্ণিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে—কারণ ঐ সকল স্থান এখন বাঙ্গালী উদ্বাস্তুতে পূর্ণ হইয়াছে। ময়ূরভঞ্জকে উড়িষ্যা হইতে পৃথক করিয়া তাহাও পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার কথা উঠিয়াছে। ময়ূরভঞ্জে বহু বাঙ্গালী বাস করে—বর্ত্তমানে তথায় বহু বাঙ্গালী উদ্বাস্তুও গমন করিয়াছে। শুনা যায়, সর্দ্দার পেটেল ঐ স্থানগুলি বাংলার মধ্যে দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। উদ্বাস্তু বাঙ্গালীকে রক্ষা করিতে হইলে বাংলার আয়তন বৃদ্ধি করা যে বিশেষ প্রয়োজন, তাহা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গালীকে রক্ষা না করা হইলে সমগ্র ভারতও একদিন বিপন্ন হইতে পারে।

ভারতে বিভিন্ন রোগে মৃত্যু—

ভারতে বিভিন্ন রোগে প্রতি বৎসর ৬০ লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু হয়। ইহাদের মধ্যে অর্দ্ধেক ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মা রোগে মারা যায়—ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা ২৪ লক্ষ ও যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর সংখ্যা ৫ লক্ষ। বিশ্বস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান হইতে এই মৃত্যু নিবারণের জন্য ব্যাপক চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে—গভর্ণমেণ্টও সে বিষয়ে সাহায্য দান করিতেছেন। উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, বোম্বাই ও দিল্লীতে ৬ জন বিদেশী বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে কার্য্য করিতেছেন। পশ্চিম বাংলার অবস্থা আজ সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়—লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর আগমনে শুধু রোগে নহে—অর্দ্ধাহারে ও কদাহারে প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক মারা যাইতেছে। সকল প্রকার চেষ্টা এখন এই দুর্গতদের সেবায় প্রযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট এজন্য শুধু অর্থ দান না করিয়া পশ্চিম বাংলায় আজ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করিলে বহু লোককে মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। বাংলাদেশে কর্ম্মী বা স্বেচ্ছাসেবকের অভাব নাই—তাহাদের উপযুক্ত ভাবে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিলে দেশ উপকৃত হইবে। আমরা সকল প্রদেশের কর্ম্মীদিগকে পশ্চিম বাংলার প্রতি মনোযোগ দান করিতে আহ্বান করি।

বিজ্ঞান চর্চ্চা ও গবেষণা—

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের চেষ্টায় ভারতে ১১টি বিজ্ঞান চর্চ্চা ও গবেষণার কেন্দ্র খোলা হইবে স্থির হইয়াছে। গত ৩রা জানুয়ারী পুনায় জাতীয় রসায়ন গবেষণাগার ও ২১শে জানুয়ারী দিল্লীতে জাতীয় পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত ২২শে এপ্রিল ধানবাদের নিকট

দিগওয়াদিতে জাতীয় জ্বালানী গবেষণাগারের উদ্বোধন হইল। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ঐ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সকল ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয়, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভারত পৃথিবীর উন্নত ও বিজ্ঞানসমৃদ্ধ দেশগুলির মধ্যে মানব কল্যাণে বিজ্ঞানকে নিয়োগ করিয়া আপনার স্থান করিয়া লইবে। দিগওয়াদাতে যে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা দ্বারা কয়লা সম্পদ সংরক্ষিত ও যথাযথ সুব্যবহৃত হইবে। লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে—১৯৪০ সালে স্বর্গত বৈজ্ঞানিক ডাঃ এচ-কে সেনকে সভাপতি করিয়া যে কমিটী গঠিত হইয়াছিল, তাহার নির্দ্দেশ মতই ঐ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সকল গবেষণাগার যদি সত্যই মানুষের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হয়, তবেই ইহাদের প্রতিষ্ঠা সার্থক হইবে। যাহাতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুধু মানুষের ধ্বংসের জন্য না হয়, তাহার ব্যবস্থা আজ জগতের সর্ব্বত্রই প্রয়োজন হইয়াছে।

শ্যামাপ্রসাদ সম্বর্দ্ধনা বন্ধ—

গত ৩০শে এপ্রিল রবিবার বিকালে কলিকাতা দেশবন্ধু পার্কে কলিকাতাবাসী জনগণের পক্ষ হইতে ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এক সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল—হঠাৎ পুলিস কমিশনারের আদেশে তাহা বন্ধ করিতে হইয়াছে। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ ত এমন কিছু রাষ্ট্র-বিরোধী কাজ করেন নাই, যাহার ফলে এরূপ আদেশ জারি হইতে পারে? তিনি রাষ্ট্রপাল ডক্টর কাটজুর সহিত দুর্গতদের সেবা করিতেছেন—সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। এ অবস্থায় সম্বর্দ্ধনা সভা বন্ধ করিয়া দিয়া কর্ত্তৃপক্ষ কি সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন?

শ্রীকালীপদ বাগচী—

খ্যাতনামা কংগ্রেস-সেবক শ্রীকালীপদ বাগচী গত কয়েক বৎসর মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরপাড়া ডাকঘরের অন্তর্গত খয়রামারীতে থাকিয়া কংগ্রেসের সেবা করিতেছেন। কয় মাস পূর্বে তাঁহাকে মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে বহিষ্কারের এক আদেশ হইয়াছিল। সম্প্রতি তিনি আবার মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি পাইয়াছেন। উদ্বাস্তু ও সীমান্ত সমস্যা লইয়া কাজ করিতে যাইয়া তাঁহাকে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। অথচ, গভর্ণমেণ্ট হইতে এ বিষয়ে কোন তদন্ত করিয়া কেন এরূপ অন্যায় আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা স্থির করা হয় নাই বা অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা হয় নাই। শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের

শ্রীকালপদ বাগচী

অনাচারের পথে বাধা ঘটাইলে যদি লোককে বিপন্ন হইতে হয়, তবে তাহা শাসন কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে প্রশংসার বিষয় নহে। আমাদের বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাহা জনগণকে জানাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

কলেরা ও বসন্ত—

গত কার্ত্তিক মাস হইতে কলিকাতা ও সহরতলা অঞ্চলে বৃষ্টি হয় নাই। তাহার ফলে এ অঞ্চলে কলেরা ও বসন্ত রোগ এত ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়াছে যে শ্মশানে শব লইয়া গিয়া লোককে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইতেছে। এ অঞ্চলের সর্ব্বত্র অধিবাসীর সংখ্যা দ্বিগুণ ত হইয়াছেই, অনেক স্থলে তাহা অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। দারুণ গ্রীষ্মে সর্ব্বত্র জলাভাব—এমন কি খাদ্যাভাব পর্য্যন্ত অত্যন্ত বেশী। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য না কমিয়া দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। অখাদ্য খাইয়া ও অনাহারে

থাকিয়া মানুষ রোগাক্রান্ত হইতেছে এবং প্রত্যহ শত শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ইহার প্রতীকার ব্যবস্থা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। মানুষের দুর্গতি ও দুরবস্থা এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে অচিরে এ অঞ্চল জনশূন্য হইবে বলিয়া ভয় হয়। উদ্বাস্তু সমস্যা আজ সকল শ্রেণীর লোককেই বিব্রত, বিপন্ন ও বিপর্য্যস্ত করিয়াছে।

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ভূতপূর্ব্ব প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে এম-এ, ডি-লিট সম্প্রতি রাষ্ট্র সংঘ প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতি বিভাগ কর্ত্তৃক বিদেশে
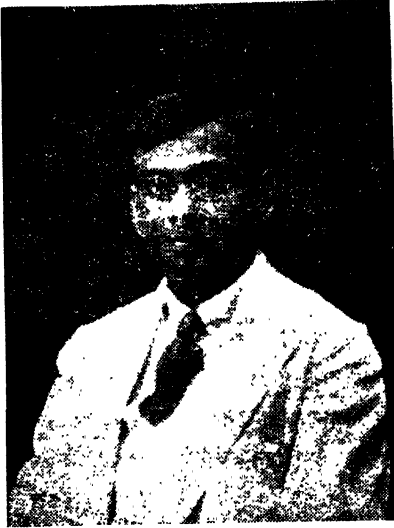
অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে

বক্তৃতা করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি কলিকাতায় থাকিয়া পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষা ও সংস্কৃত কলেজে গবেষণা বিষয়ক কমিটীর সভাপতিরূপে কাজ করিতেছেন। এবার তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। পুনায় ভাণ্ডারকর ইনিষ্টিটিউট তাঁহাকে মহাভারতের আর একটি পর্ব্ব সম্পাদনের ভার দিয়াছেন। অধ্যাপক দে তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য সর্ব্বজনপরিচিত। তাঁহার নূতন সম্মান লাভে বাঙ্গালী মাত্রই গৌরব বোধ করিবেন।

পাকিস্তানে হিন্দুর লাঞ্ছনা—

নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি সম্পাদনের পরেও যে সকল হিন্দু পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের পাকিস্তানী আনসারগণ পথে নানা ভাবে লাঞ্ছিত করিতেছে। পাকিস্তানের অনাচারীরা নূতন কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। তাহারা হিন্দুদিগকে সাহায্য করিবে বলিয়া আসিয়া হিন্দুদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করে ও পরে সুযোগ বুঝিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করে। এইরূপ বহু ঘটনার বিবরণ প্রত্যহ সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত হইতেছে। এ সকল ঘটনা পাকিস্তান কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া কোন ফল হয় না। তাহারা বলে—দুর্ব্বৃত্তদল ঐসকল কার্য্য করিতেছে, ঐ সকল কার্য্যের সহিত রাষ্ট্রের কোন সম্বন্ধ নাই। রাষ্ট্র যদি আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষায় সমর্থ না হয়, তবে সে যে কিরূপ রাষ্ট্র, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। ইহার পর কি ভাবে লিয়াকৎ-নেহরু চুক্তি পালিত হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া আমরা শঙ্কিত হইতেছি।

হরিদ্বার কুম্ভমেলায় বৈরাগী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ ব্রহ্মকুণ্ডের অভিমুখে—
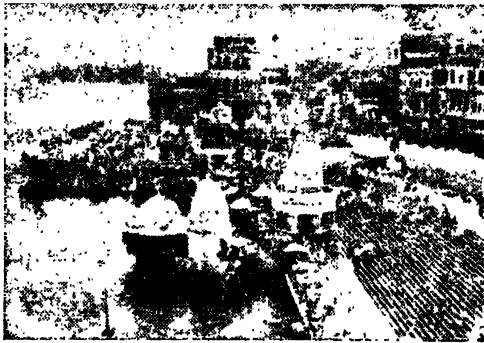
দ্বাদশ বর্ষান্তরে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ যোগ—পুণ্যার্থী লক্ষ লক্ষ নরনারী ও সন্ন্যাসী এই ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটে সমবেত হন

নাসিকে কংগ্রেস অধিবেশন—

গত ৩০শে এপ্রিল নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় স্থির হইয়াছে যে আগামী জুলাই মাসে নাসিকে কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অধিবেশন হইবে। মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী ঐ অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন। কংগ্রেসের বর্ত্তমান অবস্থা যে কি—তাহা স্থির করা কঠিন। কংগ্রেসের নামে দেশের সর্ব্বত্র যে অনাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে, কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ তাহার প্রতীকারের কোন ব্যবস্থা করেন নাই। উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ ও পশ্চিম বাঙ্গলায় কংগ্রেসের মধ্যে ভীষণ দলাদলির ফলে সকল প্রকার দেশহিতকর কার্য্য বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। কয়েকজন নেতা দেশশাসন ও কংগ্রেস পরিচালন উভয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করায় তাঁহারা কোন কাজই ভাল করিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ হন না। দেশ শাসন ব্যাপারে সর্ব্বত্রই ত্রুটি দেখা দিয়াছে। কংগ্রেস পরিচালনেও যে নিষ্ঠার প্রয়োজন, সর্ব্বত্রই তাহার অভাব দেখা যায়। এ অবস্থায় নাসিকে কংগ্রেসের অধিবেশন শুধু অযথা অর্থব্যয় ও শক্তিনাশে মাত্র পর্য্যবসিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা প্রয়োজন। কংগ্রেস যদি জাতিকে নবজীবন দান করিতে না পারে, তবে তাহার অস্তিত্বের প্রয়োজন কি থাকিতে পারে?

৫ কোটি টাকা—

ভারত রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু করিয়াছেন ও সে জন্য শ্রী বি-জি-রাও আই-সি-এস মহাশয়কে বিশেষ কার্য্যভার দান করিয়া দিল্লী হইতে কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছেন। সংবাদটি আনন্দের সন্দেহ নাই। কিন্তু পশ্চিম বাঙ্গালার উদ্বাস্তুদের সেবাকার্য্য দেখিলে মনে আর আনন্দ থাকে না। সরকারী টাকার শতকরা ৫০ ভাগেরও অধিক নানা ব্যাপারে ব্যয়িত হয়—কিছু যে অপব্যয় হয় না, এমন কথা বলা যায় না—কাজেই হয় ত শেষ পর্য্যন্ত শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ প্রকৃত অভাবগ্রস্তের হাতে পড়ে। এই ব্যবস্থার আশু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। আমরা রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকেও নানাপ্রকারে দুর্গতের সেবা করিতে দেখিয়াছি—সেখানে সংগৃহীত অর্থের শতকরা ৭৫ ভাগ দুর্গতগণ পাইয়া থাকে—আর মাত্র ২৫ ভাগ বা তাহা অপেক্ষা কম অর্থ সেবক প্রভৃতির বাবদ ব্যয়িত হয়। সরকারী ব্যবস্থায় ব্যয় হ্রাস করা যদি সম্ভব না হয়, তবে সকল অর্থই সরকারের ঐরূপ কোন সেবা প্রতিষ্ঠানের মারফত ব্যয় করা উচিত। আমরা উদ্বাস্তু সাহায্য কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনের সময় অব্যবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছি—সে জন্য এই সকল অপ্রিয় উক্তি করিতে বাধ্য হইলাম।

সাবাস তরুণ দল—

গত কয় মাস ধরিয়া পশ্চিম বাঙ্গালায় তরুণ কর্ম্মীর দল যে ভাবে উদ্বাস্তুদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া তাঁহাদের কার্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। দেশের সর্ব্বত্র উদ্বাস্তু সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকলেই নিজ নিজ সাধ্যমত সাহায্য কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। অবশ্য রাষ্ট্রপালকে সভাপতি করিয়া যে কেন্দ্রীয় সমিতি গঠিত হইয়াছে, অনেকেই তাহার অধীনে কাজ করিতেছেন। দেশের দুর্দ্দিনে তরুণের দল যে ভাবে সাড়া দিয়াছে, তাহা দেখিয়া দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। বিশেষ করিয়া সকল কলেজের ছাত্ররাই বিশেষ বিশেষ স্থানে যাইয়া নানাপ্রকার দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া দুর্গতদের দুঃখ নিবারণে অগ্রসর হইয়াছেন। সরকারী ব্যবস্থা যদি সন্তোষজনক হইত, তবে এই সকল

অধিক পরিমাণে লাভবান হইতে পারিত। আমরা রাষ্ট্র-পরিচালকবর্গকে অনুরোধ করি, তাঁহারা সকল সেবা-প্রতিষ্ঠানকে সংহত করিয়া দেশের কল্যাণে নিযুক্ত করুন—তবে দুর্গতদের সেবা করা সার্থক হইবে।
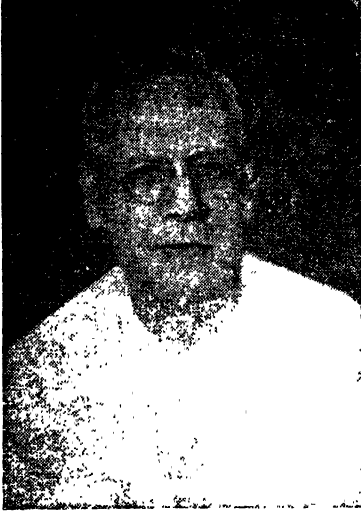
কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিদ্যা কলেজের নব-নিযুক্ত প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

সমাজ সংস্কার—

মুসলমান রাজত্বকালে বহু অবাঙ্গালী পরিবার নানা কারণে বাঙ্গলা দেশের তৎকালীন রাজধানী মুর্শিদাবাদে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন—লালগোলার রাজপরিবার তাঁহাদের অন্যতম। ঐ বংশের স্বনামখ্যাত মহারাজা সার যোগেন্দ্রনারায়ণ রাও বাহাদুর দান ও শিক্ষা-প্রীতির জন্য সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন—তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তাঁহার চেষ্টায় এক সময়ে সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলায় জলকষ্ট নিবারণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাঁহার পৌত্র রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ও পিতামহের বহুগুণের অধিকারী হইয়াছেন—তিনি শুধু অকাতরে অর্থদান করেন না—বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। তাঁহার লিখিত বহু প্রবন্ধ ও কবিতা নানা মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তিনি কনোজী ব্রাহ্মণ—পূর্ব্বে তাঁহাদের পরিবারের পুত্রকন্যাদের কনোজী ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য পরিবারে বিবাহ হইত না। সে জন্য যে সকল অসুবিধা ও কষ্ট হইত তাহার বিবরণ আমরা অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত শ্রীকান্তের প্রথম পর্ব্বে বিঠোরা গ্রামে একটি পরিবারের বিবরণে দেখিতে পাই। বাঙ্গালা দেশে লালিত পালিত অবাঙ্গালী মেয়েদের বাঙ্গালার বাহিরে বিবাহ হইলে তাহাদের কিরূপ কষ্ট হয় শরৎচন্দ্র ঐ স্থানে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। রাজা ধীরেন্দ্র নারায়ণ ঐ কথা

নব-বিবাহিত লালগোলার রাজকুমার শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ও হেতমপুর রাজকুমারী শ্রীমতী প্রণতি দেবী

চিন্তা করিয়া সম্প্রতি সমাজ সংস্কারেও ব্রতী হইয়াছেন। তিনি নিজ কনিষ্ঠা কন্যার সহিত কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও দেশসেবক শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার একমাত্র পুত্র বীরেন্দ্রনারায়ণের সহিত নদীয়ার মহারাজা ৺ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়ের দৌহিত্রী ও হেতমপুরের রাজকন্যা প্রণতি দেবীর বিবাহ হইয়াছে। রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ এই ভাবে স

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

হকি লীগ ঃ

ক্যালকাটা হকি লীগের বিভিন্ন বিভাগের সব খেলা শেষ হয়ে গেছে। প্রথম বিভাগের লীগে কাষ্টমস ১১ বছর পর হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে কোন একটা খেলাতেও না হেরে। এ বছরের লীগ খেলায় তারা মাত্র ২টো গোল খেয়েছে, অপরদিকে গোল দিয়েছে ৪৯টা। ১৯টা খেলার মধ্যে ১৬টা খেলায় জিতেছে আর খেলা ড্র করেছে ৩টে খেলায় যথাক্রমে ডালহৌসীর সঙ্গে ১-১ গোলে, ভবানীপুর এবং মোহনবাগানের সঙ্গে গোল না ক'রে।

প্রথম বিভাগের লীগে কাষ্টমস, মোহনবাগান এবং ভবানীপুর এই তিনটি ক্লাবের মধ্যে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ নিয়ে জোর প্রতিযোগিতা চলেছিল। শেষ পর্য্যন্ত কোন দল লীগ পাবে এ সম্পর্কে জোর ক'রে কিছু বলা সম্ভব হয়নি এমনই পয়েণ্টের ব্যবধান ছিল। তবে কাষ্টমস দলের উপরই অনেকে ভরসা করেছিলেন কারণ কাষ্টমস দলের খেলার পিছনে যথেষ্ট নৈতিক বল ছিল। তারা হকি লীগ বেশীবার পেয়ে রেকর্ড করেছে। মোহনবাগান বা ভবানীপুর এ পর্য্যন্ত লীগ পায়নি। কাষ্টমস দলে পূর্ব্বের সেই দুর্দ্ধর্ষ খেলোয়াড় না থাকলেও তাদের পূর্ব্ব-সাফল্য দলের পক্ষে যথেষ্ট অনুপ্রেরণার কারণ ছিল। কাষ্টমস, মোহনবাগান এবং ভবানীপুর এই তিন দলের খেলার ফলাফলের উপরই লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ নির্ভর করেছিল। ১০ই এপ্রিল মোহনবাগান ভবানীপুরের খেলা গোলশূন্য অবস্থায় ড্র গেলে কাষ্টমস লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের পথে কিছুটা বেশী এগিয়ে যায়। তিন দলের মধ্যে পয়েণ্টের ব্যবধান তখন এইরকম দাঁড়িয়েছিল।

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্টস
কাষ্টমস	১৬	১৫	১	০	৪৬	২	৩১
ভবানীপুর	১৭	১৩	৪	০	৩৫	১০	৩০
মোহনবাগান	১৬	১৩	৩	০	৩৬	৬	২৯

কাষ্টমসের তখনও মোহনবাগান এবং ভবানীপুরের সঙ্গে খেলা বাকি। সুতরাং কাষ্টমসের লীগ চ্যাম্পিয়ান-সীপ সম্পর্কে তখনও কোন স্থির নিশ্চয়তা ছিল না। ১২ই এপ্রিল কাষ্টমস-ভবানীপুরের খেলা ড্র গেল এবং কোন পক্ষেই গোল হ'ল না। ফলে সমান ১৭টা ম্যাচ খেলে কাষ্টমস পেল ৩২ পয়েণ্ট, মোহনবাগান ৩১ অর্থাৎ মাত্র ১ পয়েণ্টের ব্যবধান। তখনও উভয় দলের খেলা বাকি ২টো তার মধ্যে বড় এবং শেষ খেলা কাষ্টমস—মোহন-বাগান। সুতরাং এই শেষ খেলার আগে অপর ১টা খেলায় কাষ্টমস এবং মোহনবাগানের যদি কোন ভাগ্য বিপর্য্যয় না ঘটে তাহলে শেষ খেলায় উভয় দলের মধ্যে এই ১ পয়েণ্টের ব্যবধান অবস্থায় একটা যে জোর লড়াই হবে এ সকলেই আশা করছিলেন। কিন্তু মোহনবাগান—পোর্টকমিশনার্স খেলা গোলশূন্য ড্র যাওয়ায় তার সম্ভাবনার আশা অনেক কমে গেল।

অপরদিকে কাষ্টমস ৩-০ গোলে গ্রিয়ারকে হারিয়ে সমান ১৮টা ম্যাচ খেলে মোহনবাগানের থেকে ২ পয়েণ্ট এগিয়ে গেল। অর্থাৎ এই অবস্থায় মোহনবাগানকে লীগ পেতে হলে শেষ খেলায় কাষ্টমসকে হারিয়ে প্রথমে তার সঙ্গে সমান পয়েণ্ট করতে হবে তারপর আবার খেলতে হবে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পাওয়ার জন্যে। খেলাধূলায় অনেক অঘটনই ঘটে থাকে, বিশেষ ক'রে এক্ষেত্রে সেই রকম কিছু একটা দেখার প্রত্যাশায় ক্রীড়ামোদীরা অধীর আগ্রহে রইলেন। কাষ্টমস-মোহনবাগানের খেলা হ'ল ১৫ই এপ্রিল। শেষ পর্য্যন্ত খেলাটা গোলশূন্য ড্র গেল। ফলে কাষ্টমস মোহনবাগানের থেকে ২ পয়েণ্ট অগ্রগামী থেকে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেল। মোহনবাগান রাণার্স আপ পেয়েছে সেই সঙ্গে কাষ্টমসের মত লীগের খেলায় অপরাজেয় রেকর্ড স্থাপনের সম্মান লাভ করেছে। ১৯৩৯ সালে কাষ্টমস শেষবার লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পায়।

কালীঘাট ক্লাব দ্বিতীয় বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে। তৃতীয় বিভাগের গ্রুপ 'বি' লীগে ক্যালকাটা আর্মড পুলিস লীগ বিজয়ী হয়েছে।

প্রথম বিভাগ হকি লীগ বিজয়ীদল ঃ

(১৯৩৯ সাল হইতে)

১৯৩৯ কাষ্টমস ; ১৯৪০ বি জি প্রেস ; ১৯৪১ পুলিস ; ১৯৪২ পোর্ট কমিশনার্স ; ১৯৪৩ রেঞ্জার্স ; ১৯৪৪ পোর্ট কমিশনার্স ; ১৯৪৫ মহমেডান স্পোর্টিং ; ১৯৪৬ পোর্ট কমিশনার্স ; ১৯৪৭ খেলা হয় নাই ; ১৯৪৮ পোর্ট কমিশনার্স ; ১৯৪৯ পোর্ট কমিশনার্স; ১৯৫০ কাষ্টমস ;

১৯৫০ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগে যে সব খেলোয়াড় ১০টি এবং তার বেশী গোল ক'রেছেন তার নামের তালিকা। দীনদয়াল (গ্রীয়ার)—২০ ; ইন্দরাজৎ রাই (কাষ্টমস)—১৭ ; রাজকাপুর (কাষ্টমস)—১৪ ; কারাপিট (আর্মেনিয়ান্স)—১২ ; কুনয়াল সিং (মোহনবাগান)—১১ ; আমির সিং (পাঞ্জাব স্পোর্টস)—১১ ; রেণ্টন (গ্রিয়ার)—১১ ; ডি কোস্টা (মেজারার্স)—১১ ; টডম্যান (কাষ্টমস)—১১ ; ব্রাকেন (পোর্ট)—১০ ; কুশলসিং (মোহনবাগান)—১০ গোল।

হকি লীগ তালিকা

প্রথম বিভাগ

	খেলা	জয়	ড্র	পরা	স্ব	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
কাষ্টমস	১৯	১৬	৩	০	৪৯	২	৩৫
মোহনবাগান	১৯	১৪	৫	০	৩৮	৭	৩৩
পাঞ্জাব স্পোর্টস	১৯	১৪	৪	১	৩৪	১০	৩২
ভবানীপুর	১৯	১৩	৫	১	৩৫	১১	৩১
পোর্ট কমিশনার্স	১৯	১০	৬	৩	২৯	১২	২৬
মেসারার্স	১৯	১১	৩	৫	৩১	১৪	২৫
গ্রীয়ার	১৯	১০	৪	৫	৪১	১৭	২৪
পুলিশ	১৯	৯	৫	৫	২৬	১৯	২৩
রেঞ্জার্স	১৯	৭	৬	৬	২২	২৪	২০
ডালহৌসী	১৯	৬	৬	৭	২৭	২৭	১৮
আর্মেনিয়ান্স	১৯	৫	৫	৯	২০	১৬	১৫
ইস্টবেঙ্গল	১৯	৫	৪	১০	১৩	২১	১৪
সেণ্টজোসেফ	১৯	৫	৪	১০	১৮	২৯	১৪
কলেজিয়ান্স	১৯	৪	৫	১০	১০	২২	১৩
পার্শি	১৯	৫	৩	১১	১৬	৪৩	১৩
রাজস্থান	১৯	৩	৬	১০	১৭	৩১	১২
ক্যালকাটা	১৯	৪	৪	১১	২০	৪৬	১২
মহমেডান স্পোর্টিং	১৯	৪	৩	১২	১২	৩৪	১১
বি জি প্রেস	১৯	০	৫	১৪	৩	৩৩	৫
ই আই আর	১৯	১	২	১৬	৭	৫০	৪

আগা খাঁ কাপ ঃ

বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট আগা খাঁ হকি টুর্ণামেণ্ট প্রতিযোগিতার ফাইনালে টাটা স্পোর্টস ক্লাব ১—০ গোলে গত বছরের বিজয়ী পাঞ্জাব পুলিসকে পরাজিত করেছে।

লেডী টেগার্ট কাপঃ

মহিলাদের হকি টুর্ণামেণ্ট লেডী টেগার্ট ফাইনালের দ্বিতীয় দিনে ওয়াণ্ডারার্স ১-০ পাইওনিয়ার দলকে পরাজিত করে কাপ বিজয়ী হয়ে

প্রদর্শনী টেনিস ঃ

অষ্ট্রেলিয়ান টেনিস খেলোয়াড় জিয়োফ উইম্বলডন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় যো পথে ক'লকাতায় কয়েকটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেছেন

প্রথম খেলায় জিয়োফ ব্রাউন ৬-৪, ৬-৩ গেমে কুমারকে পরাজিত করেন। সুমন্ত মিশ্র ৮-৬ গেমে ব্রাউনকে হারিয়েছেন। ভারতবর্ষের এ খেলোয়াড় দিলীপ বসু ২-৬, ৭-৫, ৬-২ গেমে পরাজিত করেন। তিনটি সিঙ্গলস খেলার মধ্যে ২টি খেলায় পরাজিত হ'ন।

উইম্বলডন টেনিস ঃ

আগামী উইম্বলডন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ যোগিতায় ভারতবর্ষের পক্ষে নিম্নলিখিত খে নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

(১) দিলীপ বসু (ভারতীয় ১নং খেলোয় এসিয়ান চ্যাম্পিয়ান) (২) সুমন্ত মিশ্র (ভার এবং এসিয়ান চ্যাম্পিয়ান রাণার্স আপ)

(৩) নরেশকুমার (ভারতীয় ৪নং খেলোয়াড়

বক্সিং ঃ

টেরী এ্যালেন (ইংলণ্ড) ১৫ রাউণ্ডে প্রাটেসাকে (ফ্রান্স) হারিয়ে পৃথিবীর এবং ই ফ্লাইওয়েট চ্যাম্পিয়ানসীপ সম্মান লাভ করেছেন

এফ এ কাপ ঃ

ইংলণ্ডের 'এফ এ কাপ' ফুটবল প্রতি ফাইনালে আর্সেনাল ২—০ গোলে লিভারপু হারিয়ে তৃতীয় বার 'এফ এ কাপ' বিজয়ী ইতিপূর্ব্বে ১৯৩০ এবং ১৯৩৭ সালে আর্সেনাল এ কাপ পায়। এ পর্য্যন্ত আর্সেনাল দল পা এ কাপের ফাইনালে খেলেছে। লিভারপু ১৯ ফাইনালে হেরে যায়। ১০০,০০০ দর্শক উইম্বলি এ বছরের এফ এ কাপ ফাইনাল খেলা দেখ উপস্থিত হয়েছিলো। গেটে ৪০,০০০ পাউ উঠেছিলো।

আশুতোষ চৌধুরী কাপ ঃ

হকি খেলায় বঙ্গবাসী কলেজ ৩—০ গোলে কলেজকে হারিয়ে এ বছরের আশুতোষ চৌ পেয়েছে।

বাইটন কাপ ঃ

১৯৫০ সালের বাইটন কাপ ফাইনালে বোম্বাইয়ের আগা খাঁ কাপ বিজয়ী টাটাস্পোর্টস ক্লাব ২—০ গোলে লুসিটানিয়ান্সকে হারিয়ে পর পর দু'বছর বাইটন কাপ বিজয়ী হয়েছে। টাটাস্পোর্টস প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে শিখ রেজিমেণ্ট সেণ্টারকে (আম্বালা) ৩—০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে যায়। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে লুসিটানিয়ান্স ২—০ গোলে পাঞ্জাব স্পোর্টসকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে। পাঞ্জাব স্পোর্টস গত বোম্বাইয়ের টাটাস্পোর্টস ক্লাবের কাছে যায়। বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস ক্লাব একই বছরে আগার্খাঁ কাপ এবং বাইটন কাপ বিজয়ী হয়ে রেকর্ড করেছে। ইতিপূর্ব্বে ১৯৩৬ সালে বোম্বাই কাষ্টমস একই বছরে আগার্খাঁ কাপ এবং বাইটন কাপ বিজয়ের প্রথম রেকর্ড স্থাপন করে।

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী প্রণীত "জাহানারার আত্মকাহিনী—৪৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "পদচিহ্ন"—৪৷৹

পশুপতি ভট্টাচার্য প্রণীত যৌন-বিজ্ঞান "বিবাহের পরে"—৩৷৹

বরেন বসু প্রণীত উপন্যাস "রঙরুট"—৩৲

রেকর্ড পরিচিত

[মে ১৯৫০—এইচ্. এম্. ভি. বাংলা রেকর্ড]

রবীন্দ্রগীতির রেকর্ড—পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। এতদুপলক্ষে পাঁচখানি রবীন্দ্রগীতির রেকর্ড প্রকাশ করিয়া এইচ্. এম. ভি'র কর্ত্তৃপক্ষ সময়োচিত কার্য্যই করিয়াছেন। চারিটি একক সঙ্গীতের রেকর্ড—সুধা মুখোপাধ্যায় (এন্ ৩১১৯৯), সুপ্রীতি ঘোষ (এন্ ৩১২০০), সত্য চৌধুরী (এন্ ৩১২০১) এবং সন্তোষ সেনগুপ্ত (এন্ ৩১২০২) এবং একটি দ্বৈত সঙ্গীতের রেকর্ড, জগন্ময় মিত্র ও গীতা মিত্র (এন্ ৩১১৯৮) এ মাসের এইচ্. এম্. ভি. বাংলা রেকর্ডের তালিকায় স্থানলাভ করিয়াছে। শিল্পীবৃন্দের প্রত্যেকেই খ্যাতনামা—সকলেরই একাধিক রবীন্দ্রগীতির রেকর্ড ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়া জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে। আলোচ্য গানগুলিও তাহাদের গীতি-নিপুণতার সাক্ষ্য দিতেছে। কুমার শচীন দেববর্ম্মণের আধুনিক গানের রেকর্ড (পি ১১৯০৮)। গত পূজার আগে শিল্পীর "হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস্" লেবেলে পরিবেশিত প্রথম বাংলা রেকর্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। এটি তাহার দ্বিতীয় রেকর্ড। কণ্ঠসম্পদ ও গীতি বৈশিষ্ট্যে গান দুইটি শিল্পীর জনপ্রিয়তাকে অধিকতর বর্দ্ধিত করিবে।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

আগামী আষাঢ় হইতে "ভারতবর্ষের" অষ্টত্রিংশ বর্ষ আরম্ভ হইবে। বিগত ৩৭ বৎসর যাবৎ "ভারতবর্ষ" বাঙলা সাহিত্যের কিরূপ সেবা করিয়া আসিতেছে, তাহা আমাদের পাঠকগোষ্ঠীর অবিদিত নয়। আশা করি, সকলে আমাদের সহিত পূর্বের মতই সহযোগিতা করিবেন।

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৭৷৹, ভি-পিতে ৭৸৵৹, যাণ্মাসিক মণিঅর্ডারে ৪৲, ভি-পিতে ৪৷৵৹। ভি-পিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা **মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক**। ভি-পির টাকা অনেক সময় বিলম্বে পাওয়া যায়, ফলে পরবর্ত্তী সংখ্যা পাঠাইতেও বিলম্ব হয়। গ্রাহকগণের টাকা ২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে না পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা আমরা ভি-পিতে পাঠাইব। পুরাতন ও নূতন সকল গ্রাহকই অনুগ্রহপূর্ব্বক মণিঅর্ডার কুপনে পূর্ণ ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে গ্রাহক নম্বর দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ "নূতন" কথাটি লিখিয়া দিবেন।

কর্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ